মানসী
ও
মর্ম্মবাণী

(সচিত্র মাসিক পত্রিকা)

১০ম বর্ষ—১ম খণ্ড

(ফাল্গুন ১৩২৪—শ্রাবণ ১৩২৫)

সম্পাদক—

মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়

ও

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ, বার-এট-ল

কলিকাতা

১৪-এ রামতনু বসুর লেন, "মানসী" প্রেসে

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১৩২৫

ষাণ্মাসিক সূচীপত্র

(ফাল্গুন ১৩২৪—শ্রাবণ ১৩২৫)

বিষয়-সূচী

লেখক-সূচী

চিত্রসূচী (পূর্ণ পৃষ্ঠা)

মানসী

ও

মৰ্ম্মবাণী

(সচিত্র মাসিক পত্রিকা)

১০ম বর্ষ—১ম খণ্ড

(ফাল্গুন ১৩২৪—শ্রাবণ ১৩২৫)

সম্পাদক—

মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়

ও

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ, বার-এট-ল

কলিকাতা

১৪-এ রামতনু বসুর লেন, "মানসী" প্রেসে

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১৩২৫

ষাণ্মাসিক সূচীপত্র

(ফাল্গুন ১৩২৪—শ্রাবণ ১৩২৫)

বিষয়-সূচী

লেখক-সূচী

চিত্রসূচী (পূর্ণ পৃষ্ঠা)

বসন্তের রাণী

মানসী
ও
মর্ম্মবাণী

১০ম বর্ষ | ফাল্গুন ১৩২৪ সাল | ১ম খণ্ড
১ম খণ্ড | | ১ম সংখ্যা

ক্ষুদ্র-মঙ্গল

হে অনন্ত, হে বিরাট, হে অদ্ভুত, হে রহস্যময়,
চিরদিন তোমারি তোমারি জয়—
আমারি আমারি পরাজয়।
ক্ষুদ্র পারাবত-ডানা মেলি মম,
ঘুরি ঘুরি হে বিরাট, আকাশে তোমার,
ক্লান্ত, শ্রান্ত, রুদ্ধ-শ্বাসে,
ধরাপৃষ্ঠে ফিরিয়া এসেছি বারবার।
হে অতলস্পর্শ সিন্ধু,
নাই নাই নাই তব কূল ও কিনারা;
লবণপুত্তলি সম, ডুবে যাই, গলে যাই,
তব মাঝে, হয়ে আত্মহারা।
সম্বর সম্বর তব মহাতেজ,
হে অরূপ, হে বিরাট রুদ্র—
হের হের ঐ যে আহ্বানে মোরে চিরসখী ক্ষুদ্র।

ওগো ক্ষুদ্র, এস এস এস,
আমার সমীপে এসে বোস।
ঝঙ্কারি উঠিল হৃদি-বীণ,
হেরি তব শ্রীমুখ-নলিন্।

আমি চিরদিন,
তোমারেই বাসিয়াছি ভাল;
আমি নিশিদিন
তোমারই আননের আলো,
হে ক্ষুদ্র, তোমারি চাঁদমুখ,
হেরিয়াছি, হইয়া উৎসুক।
চুম্বি বিম্বাধর,
কাঁপি থর থর,
পাইয়াছি পাইয়াছি কি অপূর্ব্ব সুখ!
তোমার ও সুকপোল,
তোমার গালের টোল,
তোমার চিবুক মাঝে
যে সুন্দর তিল রাজে,
হেরিয়াছি বারবার, হেরিয়াছি বারবার,
ওগো ক্ষুদ্র,—তবু মোর মিটে নাই ভুক;
কি মোহন—কি মোহন তব চাঁদ মুখ!
তব সাথে করিয়া আলাপ,
ঘুচেছে—ঘুচেছে মনস্তাপ।

হয়ে তব সৌন্দর্য্য-বিভোর,
সুখের—সুখের নাহি ওর।
লাল গোলাপের দলে,
সরসীর শতদলে,
ফুল্ল পদ্ম-করবীতে,
বকুলের চারি ভিতে,
হয়ে মহা কুতূহলী,
ঝঙ্কারি ঝঙ্কারি অলি,
চুষে যথা মধু,
তেমতি—তেমতি আমি,
ওগো আমি নিশি যামি,
তোমার ও মুখমধু,
করিয়াছি পান,
ওগো মোর বধূ!
তবুও তবুও মোর,
ওগো চির মন-চোর,
তবু এ নিশার ঘোর নহে অবসান।
চিরদিন মধুর মধুর, তোমার ও চরণ-নূপুর।

করগো করগো নৃত্য,
উনমত্ত কবিচিত্ত:
হউক আনন্দে ভরপুর।
কুন্তল-জলদ মাঝে
চম্পক-বিজুলি রাজে,
সেই সঙ্গে, মহারঙ্গে
নাচুক আমারো এই মানস-ময়ুর।
হে আমার অতুল অতুল,
তোমার রূপের নাহি কূল!
তোমার শ্রবণমূলে
দুল হয়ে কিবা দুলে
সোনালি রঙ্গের বনফুল।
হাতে কিবা শোভিছে কাঁকন,
কণ্ঠহার মরি কি মোহন!

শ্রীঅঙ্গে দুকুল—
তোমার রূপের নাহি কূল,
হে আমার অতুল অতুল!
তোমার শ্রীমুখ-পানে চাই,
তোমার মঙ্গলগীতি গাই,
এমনি গো হয়েছি তন্ময়,
—যে দিকে ফিরিয়া চাই,
তোমারে দেখিতে পাই,
সারা বিশ্ব করিতেছে, তব জয় জয়!

মুক্তা সম নিশির শিশিরে,
ভকতের নয়নের নীরে,
হেরি তোমা আঙ্গুরে আনারে,
প্রজাপতি-ডানার মাঝারে,
চারিধারে পলকে পলকে,
তোমার ও শ্রীমুখ ঝলকে।

ময়ুরের কোটি আঁখি মাঝে,
তোমার ও মুখ-চন্দ্র রাজে।
বালকের বদন-ইন্দুতে,
সধবার সিন্দুর বিন্দুতে,
সুন্দরীর কাঁচপোকা-টিপে,
গৃহস্থের সাঁঝের প্রদীপে,
ওগো ক্ষুদ্র পলকে পলকে,
তোমার ও সু-মুখ ঝলকে।

মানিনীর কম্পমান বুকে,
গৃহস্থের গ্রাম্য সুখ দুঃখে,
ভ্রমরের মধুর গুঞ্জনে,
কিশোরীর সলাজ চুম্বনে,
জাতি, যূথী, চন্দ্রমল্লিকায়,
হে রূপসী, তব রূপ ভায়।

চন্দনা ও সুরীর গ্রীবায়,
ওগো ক্ষুদ্র, তব রূপ ভায়।
সুমধুর লঘু ত্রিপদীতে,
সনেটের ক্ষুদ্র কল-গীতে,

কালংড়া ও ঠুমরীর মাঝে,
তব অশরীরী রূপ রাজে।
সারা বিশ্বে পলকে পলকে,
তোমার ও শ্রীমুখ ঝলকে!
বিরহিণী নারীর নিশ্বাসে,
ঝুরু ঝুরু মলয় বাতাসে,
ক্ষুদ্র রোষে, ক্ষুদ্র অভিমানে,
ব্যাপিকার নয়নের বাণে,
নায়িকার সুনীল নীচোলে,
হাব-ভাবে, গদগদ বোলে,
রসরঙ্গে, আনন্দ-যৌতুকে,
কলহাস্যে, তরল কৌতুকে,
প্রেমালাপে, মধুর বচনে,
ইঙ্গিতে ও আঁখির মিলনে,—
সারা বিশ্বে, পলকে পলকে,
তোমার ও শ্রীমুখ ঝলকে।
রূপসী-দেহের চারি ভিতে,
অফুরন্ত রতন খনিতে,
তার সেই চাঁচর চিকুরে,
তার সেই নয়ন-মুকুরে,
তার সেই চিত্তচোরা হাসে,
তার সেই বিত্তচোরা ভাষে,
তার সেই বদন-অম্বুজে,
তার সেই মৃণাল-দু'ভুজে,
তার সেই অপাঙ্গ-ভঙ্গিতে,
তার সেই সলীল গতিতে,
তার সেই কটি-তনিমায়,
তার সেই বর্ণ-সুষমায়,
তার সেই চরণের নখে,
—চন্দ্রবিম্ব যথায় চমকে—
সারাবিশ্বে, পলকে পলকে,
তোমার ও শ্রীমুখ ঝলকে।
সরসীর বুদ্বুদে, হিল্লোলে,
বালকের আধআধ বোলে,
অর্চ্চনার ঘণ্টারোলে, শাঁকে,
উৎসবের উলুউলু ডাকে,
কুঞ্জবনে পক্ষী-কলরবে,
মাসঙ্কের পুষ্পের সৌরভে,
মানবের লঘু লঘু সুখে,
মানবের লঘু লঘু দুঃখে,
মাঝিদের সারিগান-মাঝে,
গৃহস্থ-বধূর গৃহ-কাজে,
ভিখারীর গৌরাঙ্গ-সঙ্গীতে—
মূর্ত্তি তব রাজে চারি ভিতে!

এইরূপে হইয়া লোলুপ,
হেরিব হেরিব তব রূপ।
ঘুচিবে ঘুচিবে কুস্বপন,
হইবে হইবে জাগরণ।
খসি যাবে আঁখির বাঁধন,
হেরিব অপূর্ব্ব দরশন।
বুঝিব, হেরিব মহারঙ্গে,
নাহি ভেদ সমুদ্রে তরঙ্গে;
অনুতে বিভুতে নাহি ভেদ,
নাই নাই মিলন বিচ্ছেদ;
মহাজ্ঞানে ক্ষুদ্র জ্ঞান লয়,
একদিন হইবে নিশ্চয়।
তব সাথে গাঢ় আলাপনে,
একদিন অতি শুভক্ষণে,
ওগো ক্ষুদ্র, বুঝিব অবশ্য,
তোমার ও অদ্ভুত রহস্য।
হৃদি-মেঘে অমনি দামিনী,
চমকি উঠিবে সুহাসিনী—
সে আলোকে, চপলা-চমকে,
বিপুল বিরাট-বার্ত্তা বুঝিব পলকে!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

সত্য-মিথ্যা

আমাদের মাসিক পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর প্রবন্ধগুলি যখন প্রথম প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল, তখন সেগুলির মধ্যে এমন একটা নূতন কিছুর আস্বাদ পাইয়াছিলাম, অথবা আস্বাদ পাইব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম, যাহা ইদানীং অন্য কোনও নবীন সাহিত্যিকের কাছে পাই নাই, অথবা পাইবার আশা করিতেও পারি নাই। মনে মনে বলিলাম—The coming man;—এতদিন পরে বোধ হয় সাহিত্যক্ষেত্রে একটি মনের মতন মানুষ পাওয়া গেল। কিন্তু কোথায় গোল বাধিল ঠিক বলিতে পারি না;—আমার রসাস্বাদ করিবার শক্তিই কমিয়া থাকুক, অথবা নব নব রসের পরিপাক করা ক্রমশঃই আমার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিতেছে, যে কারণেই হউক্, এখনও আমার মন বলিতেছে না যে অজিত বাবু—has arrived! অথচ সরস প্রবন্ধরচনায় তিনি নিপুণ, এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। এবং যাঁহারা তাঁহার রচনা পাঠ করিবার সুযোগ পান নাই, তাঁহারা বাস্তবিকই একটা ভাল জিনিষ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। তিনি নবীন; এখনও যদি তিনি তাঁহার শূন্য আসন অধিকার করিয়া না থাকেন, তাহাতে লজ্জা কিম্বা পরিতাপের কিছু নাই। তাঁহার নবীনতার সমস্ত দোষ-গুণ লইয়া তিনি আমাদের মনোরঞ্জন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। তাঁহার নবীন, সজীব, সরস রচনাভঙ্গি লঘু ললিত গতিতে নগ্ন নিরাবরণ সত্যের সন্ধানে বিশ্ব-সাহিত্যের কক্ষে কক্ষে বিচরণ করিতেছে। কবীরের গান হইতে রামেন্দ্রবাবুর 'কর্ম্মকথা' পর্য্যন্ত সমস্তই তিনি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছেন। বাংলা সাহিত্যে কেন, আধুনিক বিশ্ব-সাহিত্যের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই নগ্ন নিরাবরণ সত্যকে সাধকের চক্ষে বোধ হয় দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন।—আবরণ তাঁহার দৃষ্টি-শক্তিকে প্রতিহত করিয়া তাঁহার অন্তরাত্মাকে পীড়িত করিয়াছে; তিনি ব্যগ্রভাবে বলিয়াছেন—

> ফেল গো বসন ফেল, ঘুচাও অঞ্চল,
> পর শুধু সৌন্দর্য্যের নগ্ন আবরণ—
> সুরবালিকার বেশ কিরণ-ভূষণ।

কিন্তু সভ্যতার সমস্ত কৃত্রিম আবরণ শ্লথ বসনের মত তাঁহার সম্মুখে খসিয়া পড়িয়াছিল কি? কবিবরের যেমন 'ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে মরে পরশ-পাথর', তেমনি তিনি নিজে তাঁহার অন্তরে বাহিরে ঐ নিরাবরণ সত্যের অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মসাধনা সম্বন্ধে অজিত বাবু বলিতেছেন—"রবীন্দ্রনাথ আবাল্য উপনিষদের স্তন্যরসে পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত;—খৃষ্টীয় স্বর্গমর্ত্ত্যের কল্পিত ব্যবধানের তত্ত্ব…তাঁহার কাছে অত্যন্ত স্থূল ও ভ্রান্ত ভিন্ন আর কি হইতে পারে?…রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র উপনিষদের অধ্যাত্মযোগতত্ত্বের দ্বারা অনুপ্রাণিত নন্, এবং কেবলমাত্র বৈষ্ণবের লীলাতত্ত্বের দ্বারাও অনু-প্রাণিত নন্। এই দুই তত্ত্বই তাঁহার জীবনের সাধনায় জৈব মিলনে মিলিত হইয়া এক অপরূপ নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।"—কথাগুলি একটু ভাবিয়া দেখা দরকার। জীবনদেবতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কবি বলিতেছেন—

> মাতৃস্নেহ-বিগলিত স্তন্য ক্ষীররস
> পান করি হাসে শিশু আনন্দে অলস,—
> তেমনি বিহ্বল হর্ষে ভাবরসরাশি
> কৈশোরে করেছি পান; বাজায়েছি বাঁশী
> প্রমত্ত পঞ্চম সুরে; প্রকৃতির বুকে
> লালন-ললিত চিত্ত শিশুসম সুখে
> ছিনু শুয়ে; প্রভাত-শর্ব্বরী-সন্ধ্যা-বধূ
> নানা পাত্রে আনি দিত নানাবর্ণ মধু
> পুষ্পগন্ধে মাখা। আজি সেই ভাবাবেশ,
> সেই বিহ্বলতা যদি হয়ে থাকে শেষ,
> প্রকৃতির স্পর্শমোহ গিয়ে থাকে দূরে,—
> কোনও দুঃখ নাহি। পল্লী হ'তে রাজপুরে

এবার এনেছ মোরে—দাও চিত্তে বল!
দেখাও সত্যের মূর্ত্তি কঠিন নির্ম্মল!

কবির এই আত্মকাহিনীর মধ্যে তাঁহার কৈশোরের যে ছবিটি দেখিতে পাই, তাহা ত আবাল্য উপনিষদের স্তন্যরসে পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইবার ছবি নহে। তিনি কঠিন নির্ম্মল সত্যের মূর্ত্তি দেখিতে চাহেন। উপনিষদের ভিতর দিয়া সত্যের মূর্ত্তি যদি তাঁহার সমক্ষে প্রকট হইয়া উঠিত, তাহা হইলে তিনি যে মুক্তিলাভ করিতেন,সে মুক্তি কোনও রাজপুরে পাওয়া যায় না; তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, সে মুক্তির জন্য কোনও পল্লী হ'তে কোনও রাজপুরে আসিবার দরকার হয় না; তাঁহার সঙ্গে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মুক্ত হইয়া যাইত, দ্বৈতরহস্যের মধ্যে অদ্বয়-তত্ত্ব ফুটিয়া উঠিত,—একমেবাদ্বিতীয়ং; এবং সেই একম্ আর কেহ নহেন—আমি। যে দিন জগতের কোনও ব্যক্তি এই অদ্বয়তত্ত্ব সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবেন, সেদিন তিনি কেন—সমস্ত চরাচর তাঁহার সহিত মুক্তিলাভ করিবে। এ মুক্তি বৌদ্ধের নির্ব্বাণবাদ (Nihilism) নহে। ইহা অত্যন্ত positive, একান্ত সত্য;—আমি যেমন সত্য, ইহাও তেমনি সত্য; ইহাই বৈদান্তিক Salvation। কবি এখন পল্লী হইতে রাজপুরে আসিয়া সত্যের দেখা পাইবেন আশা করিতেছেন। যেরূপ সাধনা করিলেন, সেইরূপ সিদ্ধিলাভও হইল। ব্রহ্মকে রাজবেশে ভগবানরূপে তিনি উপলব্ধি করিলেন;—সহসা অতর্কিতভাবে ব্রহ্ম তাঁহার আঁধার ঘরের রাজা, তাঁহার দুঃখরাতের রাজার বেশে ভক্তের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। ইহা উপনিষদের তত্ত্বও নহে, বৈষ্ণব তত্ত্বও নহে; ইহা সাধক কবির mystic স্বানুভূতি। কবি বৈদান্তিক অথবা বৈষ্ণব mystic নন্ বলিয়া তাঁহাকে কম শ্রদ্ধা করিলে চলিবে না। তাঁহার এই দ্বৈতরহস্য একান্ত তাঁহার নিজের জিনিষ; বৈষ্ণব অথবা শাক্তরসপুষ্ট সাধারণ বাঙ্গালী হয়ত আনন্দ-ঘন ব্রহ্মকে রাজভাবে উপলব্ধি করিয়া তৃপ্তি অনুভব করিবে না; কিন্তু আধুনিক ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস-রচয়িতা H. G Wells রবিবাবুর মন্ত্রশিষ্য হইয়া তাঁহার King of the Dark Chamberকে খৃষ্টীয় সমাজের সমক্ষে দাঁড় করাইয়া পাদরি-মহলে বিষম গোল বাধাইয়া দিয়াছেন। 'নেশন'-পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত Mr. Britling sees it through উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে গত ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে এই তত্ত্বটি ইংরাজসমাজে প্রথম প্রচারিত দেখা যায়। গত ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের শেষ-ভাগে মিঃ ফ্রেড্রিক হ্যারিসন্ মাসিক পত্রের প্রবন্ধে কথোপকথনচ্ছলে এই আঁধার ঘরের রাজাকে লইয়া সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। এই রাজাকে লইয়া বৈষ্ণব কি করিবেন? রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিয়াছেন—'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান?' তিনি জানিতেন না যে বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণব কখনও গান করে না। শঙ্খ-চক্রগদাপদ্মধারী বৈকুণ্ঠের রাজা নারায়ণকে লইয়া বৈষ্ণব কি করিবে? বৈষ্ণব চায়,—বৈকুণ্ঠ নয়,—গোলোক;—বৈকুণ্ঠের বহু উর্দ্ধে অবস্থিত গোলোক। এই গোলোক তাহার বৃন্দাবনের রূপান্তর মাত্র। এখানে রাজার স্থান নাই। বৈষ্ণবের সখা কখনও বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি; রস পরিপুষ্টির জন্য বৈষ্ণব বিরহ-মিলন পরকীয়াপ্রীতি, এমন কি মথুরার রাজার, অভিনয়ও করিয়াছেন; কিন্তু ঐ রাজার অভিনয় বৈষ্ণব সাহিত্যের মর্ম্মান্তিক ট্র্যাজেডি। বৃন্দাবনের তথা গোলোকের সহিত বৈষ্ণবসখার এই যে নিরবচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, আবার ভক্তের সহিত সখাভাবে বঁধুভাবে নন্দনন্দনরূপে এই যে আনন্দঘন ব্রহ্মের অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক, এই দ্বৈতাদ্বৈতরহস্যের সহিত বেদান্তের দ্বৈতা-দ্বৈতরহস্য সহজেই উপমেয়। বৈষ্ণব করযোড়ে কোনও রাজার সম্মুখে দাঁড়াইতে প্রস্তুত নহেন; দূরে, বহুদূরে অবস্থিত স্বর্গের কল্পনা করিতেও বোধ করি তিনি হাঁপাইয়া উঠেন; স্বর্গের রাজার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া তিনি সরিয়া পড়িলে বাঁচেন। যিনি অদ্বয়ভাবে ব্রহ্মের সহিত মিশিতে চাহেন, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানকে উপাস্য করিয়া কি করিবেন? রবিবাবুর বিচিত্র mystic mood গুলির ভিতরে দেখা যায় যে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রহিয়াছে; এই রাজা-প্রজা ভাবটাই

বোধ হয় খুব প্রবল। তাঁহার রাজার দুলাল স্বর্ণশিখর রথে আরোহণ করিয়া রাজপথ দিয়া চলিয়া যান; দূরে বাতায়ন হইতে ভক্ত তাঁহাকে চকিতের জন্য দেখিতে পান; ভক্তির আবেগে গলার হার ছিঁড়িয়া ভক্ত তাঁহার চরণতলে নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু

মোর হারছেঁড়া মণি নেয়নি কুড়ায়ে,
রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে

তবু সেই ত্যাগটুকুতেই ভক্তের আনন্দ। তাঁহার ভগবান মহারাজের ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত হইয়া সহসা ভক্তের কুটীরে আসিয়া দেখা দিলেন,—তখন কোথায় শঙ্খ, কোথায় আসন,—ভক্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। বৈষ্ণবের খুব কাছাকাছি যে রবিবাবু যান নাই এমন নহে; তাঁহার এমন একটি mystic mood দেখিতে পাই যখন ভক্ত বধূভাবে বঁধুর কাছে আসিয়াছেন, কিন্তু—

ওগো বর, ওগো বঁধু,
এই যে নবীনা,
বুদ্ধিবিহীনা,
এ তব বালিকা বধূ।

এই বর ও বালিকা-বধূর সম্পর্ক প্রায় 'নববঙ্গ দম্পতির প্রেমালাপ' এর আধ্যাত্মিক সংস্করণ দাঁড়াইল; বৈষ্ণবের মধুর রসের আশা এখানে একেবা'রই করা যায় না। পাছে কাম-গন্ধ পাওয়া যায়, এই জন্য কবি সাবধান হইয়াছেন। কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলে এই খানেই বৈষ্ণবের জিৎ। রাধাকৃষ্ণের প্রেমে কামগন্ধ নাই, এ কথা বৈষ্ণবকবি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন; বোধ হয়, না বলিলেও কোনও ক্ষতি ছিল না। কৃষ্ণ বলিতেছেন, আমার দেহ মন প্রাণ লইয়া লীলা করিয়া যদি তুমি সুখী হও, তাহাতেই আমার আনন্দ; শ্রীরাধিকার প্রীতি তদ্বৎ, অথবা আরও উচ্চদরের। ৺ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এইটি ভাল করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—

"বেদান্তের ব্রহ্ম মহাশয় যেমন অটল, নির্ব্বিকার, হ্লাদিনী রাধিকার ভালবাসাও তেমনই ধৈর্য্যচ্যুতিকরী, বিবেকহারিণী,মহোল্লাসকরী। শ্রীমতী জাতিকুল বিসর্জ্জন করিয়া ব্রহ্ম গোবিন্দকে ভালবাসে এবং বিনিময়ে কিছু চাহে না। গোবিন্জী বড় ফঁপরে পড়িয়া গিয়া ঋণী হইয়াছেন। ঠাকুরাণীর নিঃস্বার্থ পীরিতির বিনিময়ে যাহা কিছু তিনি দিতে প্রস্তুত, তাহা ঠাকুরাণী অঙ্গীকার করে না। সর্ব্বশক্তিমান এবং পরম চতুর হইয়াও গোবিন্দ এমন কিছু বস্তু আবিষ্কার করিতে অক্ষম যাহাতে দেবীর লোভ হইতে পারে। স্ববশ, স্বতন্ত্র, নির্ব্বিকার গোবিন্দ উপস্থিত অবশে প্রেমপরতন্ত্র ও রাধাবশ। নিরুপায় গোবিন্দ রাধাঋণ পরিশোধ করিবার জন্য, রাধা তাঁহাকে যতটা ভালবাসে তিনি রাধাকে ততটা ভাল বাসিবার চেষ্টা করেন। পারেন না। ঋণশোধরূপ উদ্দেশ্য ও চেষ্টা এই দুটী বস্তু গোবিন্দের ভালবাসাকে রাধার অহেতুক সহজ ভালবাসা হইতে ন্যূন করিয়া ফেলে! রাধার গোবিন্দপ্রীতিতে কোনও উদ্দেশ্য বা চেষ্টা নাই—তাহা নিরতিশয় সহজ স্বাভাবিক, সুতরাং গোবিন্দ ঋণী, ঠাকুরাণীই মহাজন। গোবিন্দ ভুবনমোহন বটে, কিন্তু শ্রীমতী ভুবনমনমোহিনী। গোবিন্দও ব্রহ্ম, রাধিকাও ব্রহ্ম, তবে বড় ব্রহ্ম; প্রীতিই, আনন্দই হ্লাদিনী রাধাই ত গোবিন্দের ব্রহ্মত্ব। আশ্রয়জাতীয় প্রীতি বিষয়জাতীয় প্রীতি অপেক্ষা গরীয়সী; অর্থাৎ রাধার কৃষ্ণে প্রীতিটীর তুলনায় কৃষ্ণের রাধাতে প্রীতি কিঞ্চিৎ লঘু। রাধার কৃষ্ণের উপর যে প্রীতি তাহার পরাকাষ্ঠা জাতিকুলবিসর্জ্জন নহে; ততোধিক। 'যদিই' গোবিন্দ অন্য ললনাতে লালসাবান হয়েন, তাহা জানিতে পারিলে 'সমর্থা' নায়িকা সাক্ষাৎ শুদ্ধ ঘন-স্নেহ-মূর্ত্তি শ্রীরাধিকা, হর্ষ ঈর্ষার অপূর্ব্ব রসমেলন আবিষ্কার করিয়া যে কোন প্রকারে হউক অনুনয় দৈন্য বা সেবার দ্বারা সেই ললনাকে বশীভূত করিয়া গোবিন্দের অঙ্কসিংহাসনে স্থাপিত করিয়া গোবিন্দকে সুখী করিতে পারেন। গোবিন্দ এতটা প্রীতির পরিশোধ সম্ভাবনা ঘটাইতেও অসমর্থ, যেহেতু অন্য দ্বিতীয় পুরুষই নাই যাহাতে রাধিকার অনুরাগ হইতে পারে, এবং গোবিন্দ অঋণী হইবার জন্য সেই পুরুষ সহ রাধার মিলনে আনুকুল্য করিতে পারেন। তজ্জন্য

গোবিন্দ বড়ই জব্দ হইয়া আছেন; বড় সুখে মধুর-ভাবে জব্দ। একটা আসল কথা বলিব, শুন, মন দিয়া শুন। রাধাগোবিন্দ নিত্যতৃপ্ত; লীলা করিয়া তাঁহাদের কোনও নিজতৃপ্তি সম্পাদন করিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। প্রশ্ন উঠে যে তবে লীলার হেতু কি? হেতুটী তাঁহার অসীম করুণা। এই যে রাধার জয়ে পরাজিত গোবিন্দের আনন্দলীলা ইহার উদ্দেশ্য এই যে, হতভাগ্য জীবের সৌভাগ্য হউক; জীব এই মধুর হইতে সুমধুর অলৌকিক প্রীতিদেবীর জয়লীলারস চর্চ্চা ও আস্বাদন করুক। যদি অকাম শুদ্ধ প্রীতির উদ্দেশ পাইয়া থাক, তবে ললিতার মত ঠাকুরাণীর পূজা কর, ঠাকুরাণীকে পাইলেই তত্র তাঁহার প্রিয় তদধীন গোবিন্দকেও পাইবেই পাইবে। ইহা যুগল উপাসনা, চরম ইষ্ট। কামের ক্ষয় ও যুগল প্রীতির উদয় অর্থাৎ রাধাগোবিন্দের কৃপায় রাধাগোবিন্দ সামীপ্যপ্রাপ্তি অপেক্ষা ইষ্টতর সম্পত্তি রাধাগোবিন্দের ভাণ্ডারেও নাই। আত্মসমর্পণ হইতে অধিক দান সর্ব্বশক্তিমানেরও সাধ্যাতীত।"

৮অধ্যাপক মহাশয় এই বৈষ্ণব করুণার, এই গোবিন্দজীর কৃপার, এই বৈষ্ণব Doctrine of Grace এর তত্ত্বটী ভাল করিয়া বলিবার অবসর পাইলেন না। কিন্তু বোধ হয় বৈষ্ণব তত্ত্বটী মোটামুটি বুঝাইতে তিনি সফলপ্রযত্ন হইয়াছেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম সেবার ধর্ম্ম, আত্মোৎসর্গের ধর্ম্ম; এখানে অহঙ্কারের স্থান নাই। অহং এখানে ত্বাম্-এতে লীন হইতে পারিলেই পরিতৃপ্ত; এই 'আমি' ও 'তুমি'র লীলা করিবার জন্য 'আমি' হইতে 'তুমি'-কে বিসৃষ্ট করিয়া, সেই 'তুমি'র মধ্যে 'আমি'কে লীন করিবার জন্য এই চিরন্তন বৈষ্ণবলীলা অনাদ্যন্ত চলিতেছে। বেদান্তের অহং বৈষ্ণবের প্রীতিঠাকুরাণীতে রূপান্তরিত হইয়া গোবিন্দজীত্বম-রূপ রহস্যের মধ্যে আপনাকে উৎসর্গ করিয়া বিসর্জ্জন দিয়া লীলান্বিত হইতেছে। এই জন্যই ক্ষেত্রবাবু বলিয়াছেন গোবিন্দও ব্রহ্ম রাধিকাও ব্রহ্ম, তবে বড় ব্রহ্ম। বেদান্তের নির্ব্বিকার নিরুপাধিক অদ্বয় ব্রহ্ম যেমন সাক্ষী ব্রহ্ম ও বিসৃষ্ট ব্রহ্মে দ্বিধা বিভক্ত বলিয়া কল্পিত করা হয়, ইহাও সেইরূপ। তবে বেদান্তের ব্রহ্ম আত্মনির্ভর আত্মপ্রতিষ্ঠ, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ; আমার কল্পিত বিসৃষ্ট ব্রহ্ম আমাতে লীন; আমি বড়, একক, বিরাট, মহান। আমি সেবা করিব কাহাকে? একা আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় কিছু নাই; আমার কল্পিত বিসৃষ্ট ব্রহ্মকে লইয়া আমি লীলা করি; সেই তৎকে অহং-এর মধ্যে আকৃষ্ট ও অহং-হইতে বিসৃষ্ট করিবার অভিনয় করিতেছি। I am the Lord —যীশুর এই উক্তিটিকে খৃষ্টান ভাল করিয়া বুঝিল না, বোধ হয় কখনও ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করে নাই; তাহা হইলে খৃষ্টধর্ম্ম সেন্ট পলের রচনায় পর্য্যবসিত হইত না। সেন্ট পল যীশু খৃষ্টকে Lord করিয়া দাঁড় করাইলেন। যীশুর I am the Lord, —আমি অহংই একমাত্র ব্রহ্ম, কর্ত্তা, পুরুষ,—বেদান্তের এই চরম সূত্র, এই পরম সত্যটী কদর্থে মাটি হইয়া গেল। লোকে যীশুখৃষ্টকে লর্ড ঠাওরাইয়া তাঁহার পূজা আরম্ভ করিয়া দিল। যীশুর Come unto Me and ye shall be saved—এই Me—এই আত্মানং বিদ্ধি, তাহা হইলেই তোমার মুক্তি হইবে;—এত বড় এত মোটা কথাটা কেমন করিয়া যে বিকৃত হইয়া দাঁড়াইল যে, যীশুখৃষ্টের কাছে গেলেই মুক্তিলাভ হইবে তাহা বিস্ময়জনক। শ্রীকৃষ্ণ যখন আপনার মধ্যে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিলেন, তখন তিনি কি বিস্মিত মানবকে এই তত্ত্বটী বুঝাইলেন না যে, কে কাহাকে মারে, কে কাহার হিংসা করে? দিব্যচক্ষে চাহিয়া দেখ, সমগ্র বিশ্ব আমাতে অহং-এতে লীন। যাক, ও সকল কথা। আমি বলিতে চাই যে, বেদান্ত ও বৈষ্ণব তত্ত্ব অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ; কিন্তু মজা এই যে, বেদান্তে আমি বড়, বৈষ্ণবতত্ত্বে আমি ছোট। জ্ঞানমার্গ অনুসরণ কর, আত্মানং বিদ্ধি, তোমার মুক্তিলাভ হইবে; ভক্তিমার্গ অনুসরণ কর, আপনাকে তৃণাদপি সুনীচ কর, ভোক্তা না হইয়া ভোগ্য হও, 'অহং'কে 'ত্বম'-এর সেবায় উৎসর্গ কর, তোমার মুক্তিলাভ হইবে।

অজিত বাবুর রচনা পড়িয়া মনে হয় যে তিনি এই তত্ত্বটী বোধ হয় বুঝিয়াছেন, আবার মনে হয় বুঝিতে চেষ্টাও করেন নাই। তাঁহার 'কাব্যপরিক্রমা'য় লেখা আছে,—"বৈষ্ণবের লীলাতত্ত্বের আভাস উপনিষদের মধ্যে নানা স্থানে থাকিতে পারে, কিন্তু সেই তত্ত্ব উপনিষদের মধ্যে পরিস্ফুট আকার লাভ করিয়াছে একথা কোন মতেই বলা যায় না।......উপনিষদের যোগতত্ত্বে বেদান্ত শাস্ত্র তৈরি হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইতে কাব্যকলা সমুৎসারিত হয় না। বৈষ্ণবের লীলাতত্ত্বে অনুভূতির বিচিত্রতা ও প্রসার এমন বাড়িয়া যায় যে কাব্যকলাকে আশ্রয় করিয়া তাহা আত্মপ্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না। এইজন্য উপনিষদ হইতে আমরা দর্শন-শাস্ত্র পাইয়াছি, কিন্তু বৈষ্ণব ভক্তিবাদ হইতে কেবল দর্শন-শাস্ত্র নহে, অপূর্ব্ব ভক্তি-কাব্য সকলও সম্ভাবিত হইয়াছে।" ইহার বিরুদ্ধে বলিবার আমার বিশেষ কিছু নাই। কিন্তু তাঁহার 'বাতায়ন'-গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন,—"বাংলা দেশের বৈষ্ণব ধর্ম্মের পিছনে সেই নিরাবরণতার কাঠিন্য না থাকাতে তাহা ভক্তিকে বিশ্বপ্রকৃতিতে, মানবের জ্ঞান ও কর্ম্মের সাধনায় বিস্তারিত না করিয়া আপনাতেই আপনি পর্য্যাপ্ত হইবার চেষ্টা পাইয়াছে। ভক্তিই বল, জ্ঞানই বল,—কিছুই আপনাকে আপনি খাইয়া বাঁচিতে পারে না। বিশ্বের মধ্যে তাহাদিগকে প্রসারিত করিয়া না দিলে তাহারা মাদকতার সৃষ্টি করে। কেবলি রাধিকা সাজিয়া, কখনো বিরহ, কখনো মিলন, কখনো মান, কখনো অভিমানের কাল্পনিক লীলায় হৃদয়-বৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়া যে সাধনা, তাহার সঙ্গে বিশ্বের জ্ঞান বিশ্বমানবের বিপুল ইতিহাসের বিচিত্র সৃজনলীলার কোন যোগ থাকে না। বৈষ্ণব-কাব্যে তাই মাধুর্য্যের উচ্ছ্বাস আছে প্রচুর, কিন্তু সে মাধুর্য্যের মধ্যে কোন বড় সত্যের প্রতিষ্ঠা নাই। তাহা অশান্ত, চির-অপরিতৃপ্ত।" বৈষ্ণব mysticism সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহার পরে অজিত বাবুর এই মন্তব্য সম্বন্ধে আর কিছু বলা অনাবশ্যক। তিনি ইহার মর্ম্মস্থানে আদৌ পৌঁছাইতে পারেন নাই।

এখন যদি বুঝিতে চেষ্টা করা যায় যে রবিবাবু সম্বন্ধে অজিত বাবুর উক্তিগুলি সমর্থনযোগ্য কি না, তাহা হইলে কিছু মুস্কিলে পড়িতে হয়। তাঁহার জীবনের সাধনায় বেদান্ততত্ত্ব ও বৈষ্ণবতত্ত্ব জৈব মিলনে মিলিত হইয়া এক অপরূপ নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে কি না, সেই biologico-spiritual process এর বিশ্লেষণ করিবার সামর্থ্য আমার নাই। অজিত বাবু নিজেই বলিয়াছেন,—তাঁহার ভক্তিকাব্যের এই নবরূপকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার কি পরিমাণ অংশ উপনিষদের এবং কি পরিমাণ অংশ ভক্তিতত্ত্বের—তাহা নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। অতঃপর সেই খৃষ্টীয় স্বর্গমর্ত্ত্যের কল্পিত ব্যবধানের তত্ত্ব রবিবাবুর কাছে অত্যন্ত স্থূল ও ভ্রান্ত হইতে পারে; কিন্তু স্বর্গের রাজা না হইলেও, রবিবাবুর ভগবান রাজার মত দূর হইতে ভক্তের পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন; এই ভাবই বোধ হয় সাধক কবির স্থায়ী mystic mood; তিনি বৈদান্তিক নন্, বৈষ্ণবও নন্, কিন্তু তাহাতে তাঁহার গৌরব ক্ষুণ্ণ হইবে কেন? অভিসারিকার কুঞ্জে রবিবাবুর লীলাময় পুরুষ মালাগাছটি রাখিয়া চলিয়া যান্ না; সুপ্তোত্থিতা নায়িকা দেখিলেন,—এ ত মালা নয়, 'এ যে তোমার তরবারি!' এই বীরবেশে অভিসার বৈষ্ণব সাহিত্যে নাই, বৈষ্ণব কখনও কল্পনাও করিতে পারে না; কিন্তু তাই বলিয়া কি এই mystic mood এর সম্মুখে আমরা নতশির হইব না? আমরা কি জানি না যে এই moodও একান্ত সত্য;—লীলাময় পুরুষ বলি-তেছেন—I bring thee a sword, not peace—এ উক্তি আমাদের পরিচিত নহে কি?

রামেন্দ্র বাবুর 'কর্ম্মকথা' সম্বন্ধে অজিত বাবু যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সেখানেও তাঁহার সহিত আমার মতভেদ রহিয়াছে। 'আচার' প্রবন্ধটাই তাঁহাকে বিশেষভাবে পীড়িত করিয়াছে। কিন্তু রামেন্দ্র বাবু বলিতেছেন—"এই সকল কৃত্রিম বিধানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অযথা সংযম ঘটিতে পারে, সঙ্কীর্ণতার প্রশ্রয়

হইতে পারে, এ সকলও আমি অস্বীকার করিতে পারিব না।...সমাজ হইতে এই সকল কৃত্রিম আচার উঠাইয়া দিলে মানবসমাজ একেবারে পশুসমাজে পরিণত হইবে। ...বাস্তবিক পশুসমাজে যেমন সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে, মনুষ্যসমাজে তাহার কিছুই নাই। পশুসমাজের সদস্যগণ কোনরূপ কৃত্রিম আচারের দাস নহে। এ বিষয়ে তাহাদিগকে ষোল আনা প্রশংসাপত্র দেওয়া যাইতে পারে। লোকাচার ও দেশাচারের যত কিছু খুঁটিনাটি, যত কিছু বন্ধন, সমস্তই এই মনুষ্যসমাজেই বর্ত্তমান।" সমালোচক বলেন—"এই কঠিনতা যতই বিস্ময়কর হোক্, ইহাকে জীবনের পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতে পারি না। জীবন কোন এক জায়গায় বাঁধা পড়িতে চাহে না বলিয়াই, তাহাকে অবিরত চলিতে হয় বলিয়াই বিধাতা তাহাকে কঠিন করিয়া সৃষ্টি করেন নাই।" এখন প্রশ্ন এই যে, কেন ইহাকে জীবনের পরিচায়ক বলিয়া মনে করিব না? পাশ্চাত্য মনীষিরা জড়ত্ব ও জীবন বলিয়া দুটো কল্পিত মাপকাটি লইয়া সমস্ত জিনিষের পরিমাপ করেন বলিয়া আমাদের কাছেও কি ঐ দুটি জিনিষ একান্ত পৃথক ও আবশ্যক? এটা জড়ত্বের পরিচায়ক, ওটা প্রাণের পরিচায়ক, এ সব অত্যন্ত সাধারণ পাশ্চাত্য বুক্‌নি ব্রাহ্মণ্যসাহিত্যপুষ্ট বাঙ্গালীর মুখে শোভা পায় না। যে ব্রাহ্মণ্যসভ্যতা জড় ও জীবনের দ্বন্দ্ব ও বিরোধ ঘুচাইবার জন্য একান্ত সাধনা করিয়াছিল; জড় ও জীবনের মধ্যে সমস্ত ব্যবধান লুপ্ত করিয়া দিয়াছিল; শিবং, শান্তং, আনন্দং-এর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সমস্ত মানবজীবনকে বিধিব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রিত করিয়া কর্ম্মকাণ্ডে ভর দিয়া জীবনটাকে একটা বিরাট যজ্ঞাহুতিতে পরিণত করিয়াছিল; রবিবাবুর বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে ব্রাহ্মণ্যসভ্যতা বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসকে হেয় মনে করিয়া স্পষ্ট বলিয়াছিল—'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়'; উপনিষদের বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ততঃ গীতার পৌরাণিক যুগ পর্য্যন্ত কর্ম্ম-কথা প্রচার করিয়া আসিয়াছিল; সেই ব্রাহ্মণ্যসভ্যতার শেষ কথা এখনও বলা হয় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নানা ভাববিপর্য্যয় ও ধর্ম্মবিপ্লবের মধ্যে রামেন্দ্র-বাবু বাঙ্গালীকে কর্ম্মরূপ যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা শুনাইয়াছিলেন; বেদজ্ঞ ত্রিবেদীর মুখে ইহা অশোভন হয় নাই। নানা ঐতিহাসিক কারণে ব্রাহ্মণ্যসভ্যতা সংসারারণ্যের মাঝখানে লোকচক্ষুর অন্তরালে বিচিত্র আচার ও বিধি-ব্যবস্থার গণ্ডির মধ্যে হোমাগ্নি জ্বালিয়া রাখিয়াছে; জগতের নাগরিকগণের কলকোলাহল সেখানে পৌছায় নাই; হয়ত সে বাহিরের কোনও সংবাদ রাখে নাই; কিন্তু সে ঐ আচার ও বিধি-ব্যবস্থার সাহায্যে আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছে; আমাদের পক্ষে ইহাই পরম লাভ। কারণ জগতের সঙ্গে এখনও তাহার বোঝা-পড়া বাকি আছে। একদিন ভারতবর্ষের স্ত্রীপুরুষের শিক্ষা দীক্ষার ভার ভারতবাসীকে লইতে হইবে। তখন আচার ও বিধি-ব্যবস্থা অনায়াসেই রূপান্তরিত হইবে। ওগুলো ত বহিরা-বরণ। পুরাতন আচার ও বিধিব্যবস্থার দিন ফুরাইলে কিন্তু নূতন আচার ও বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। কখনও স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরাচারের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার চরম বাণী উদ্গীরিত হইবে না। এক সময়ে যে আচার ও বিধিব্যবস্থা সমাজের পক্ষে উপাদেয় ছিল, কালক্রমে তাহা হেয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, এ কথা রামেন্দ্র বাবু ত অস্বীকার করেন নাই। স্বনামখ্যাত ফরাসী লেখক আনাতোল ফ্রাঁস তাঁহার Revolt of the Angels নামক পুস্তকে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, স্বর্গের রাজা ভগবান বেশী দিন রাজত্ব করিতে করিতে বিগ্‌ড়াইয়া যান, তখন শয়তান তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া ভগবান হইয়া বসেন; কালক্রমে সয়তানও বিগ্‌-ড়াইয়া যান, তখন ভগবান তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া আবার রাজা হইয়া বসেন; অমরাবতীর ইন্দ্রত্ব লইয়া দেবাসুরের চিরন্তন বিরোধের কথা কালচক্র-নেমির ঘর্ঘরশব্দমুখরিত ভারতবর্ষের পৌরাণিক সাহিত্যে ধ্বনিত হইয়া উঠে নাই কি? আচারের নামে শিহরিয়া উঠিলে চলিবে কেন? সমাজরক্ষার্থ আচার আবশ্যক; আচার-রক্ষার্থ সমাজ প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত হয় না।

আচার বিগড়াইয়া গেলে, অথবা আচার-পীড়িত হইয়া সমাজ বিগড়াইয়া গেলে বিদ্রোহ হইবেই; কিন্তু সে বিদ্রোহ যেন Revolt of the Angels হয়; তজ্জন্য নূতন শিক্ষার ও দীক্ষার প্রয়োজন।

অজিত বাবু লিখিয়াছেন,—"এ কাল যে আবরণ মোচন করিবার কাল—বহুযুগসঞ্চিত সংস্কারের একটি একটি করিয়া আবরণ খসাইয়া সমাজকে, মানুষকে, মানুষের সম্বন্ধগুলিকে, বিশ্বজগৎকে একেবারে তাহার যথাযথ মর্ম্মস্থানে দেখিবার জন্য এ কালের মানুষের মন যে চেষ্টা করিতেছে, তাহার প্রমাণ আধুনিক সাহিত্য হইতেই প্রচুর পাওয়া যায়। হেন্‌রিক্ ইব্‌সেন্, মেটর্লিঙ্ক, বার্ণার্ড শ, এচ জি ওয়েল্‌স্, হাউপ্টম্যান, বদ্‌লেয়ার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণের যে কোন রচনা পড়িলেই দেখা যাইবে যে, হয় সমাজের কোন পাকাপোক্ত সংস্কারের পর্দ্দা তুলিয়া সমাজের ভিতরকার জীবন-নাট্যলীলাকে তাঁহারা উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইতেছেন, নয় স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধঘটিত সংস্কারকে ছিন্ন করিয়া তাহাদের সম্বন্ধের যথার্থ স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য চেষ্টা করিতেছেন।" এ কথা আমি মানি। আড়াই বৎসর পূর্ব্বে "ভারতবর্ষ" পত্রে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, য়ুরোপীয় সাহিত্যে কেমন করিয়া ইব্‌সেনের আবির্ভাব হইয়াছিল। এইখানে কিন্তু একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। নিরাবরণ সত্যকে দেখিবার ও দেখাইবার চেষ্টা উনবিংশ শতাব্দীর বহুপূর্ব্বে য়ুরোপে হইয়াছিল। সম্প্রতি বিলাতের টাইম্‌স্ পত্রিকা (২রা নভেম্বর ১৯১৭) মার্টিন লুথার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"He found himself in a world in which the greatest things in life were smothered by an artificial dress. There were artificial sins, artificial good works, artificial pardons, non-natural ideals, artificial obligations of all kinds." সর্ব্বপ্রকার কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। আবার কোথা হইতে সভ্য প্রটেষ্টাণ্ট্ জগতে এত নূতন কৃত্রিম বন্ধন আসিয়া জুটিল যে গত অর্দ্ধ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সাহিত্য সমস্তটাকে লইয়া আবার নাড়াচাড়া করিতে আরম্ভ করিল? সন্ন্যাসী লুথার ত সন্ন্যাসিনী ক্যাথ্‌রিণ বোরিয়াকে বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্মের আবশ্যকতা ও পবিত্রতা জগতের সম্মুখে ঘোষণা করিয়াছিলেন। আজ সেই গার্হস্থ্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রটেষ্টাণ্ট জগতের অসংখ্য নরনারী বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইয়াছে কেন? প্রেমকে অস্বীকার তাঁহারা করেন না; কিন্তু পাশ্চাত্য রমণী চিত্রাঙ্গদার মত প্রশ্ন করিয়া বসেন—"এ প্রেমের গৃহ আছে?" বিবাহ-বন্ধন নহিলে যদি গৃহ না হয়, না হউক; সে বন্ধনে যে ধরা দিয়াছে, সেই ত প্রেমকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। বিবাহ-বন্ধনটার কোনও সংস্কার চলে না কি? প্রেমের সঙ্গে গৃহের সামঞ্জস্যবিধান বোধ হয় সম্ভবপর নয়; তবে বন্ধনে ধরা দিই কেন? ফিওডোর সলোগবের আলোচনা ইংরাজি অনুবাদে দিতেছি:—"Love says 'No' to the world, the lyrical 'No';—marriage says 'Yes' to it, the irónic 'Yes'. To be in love, to strive, yet not to possess—that is the poetry of love, sweet but illusive. Externally love contradicts the world and conceals its fatal discord. To be together, to say 'Yes' to some one, to yield oneself—that is the way in which life reveals its irreconcilable contradictions. And how to be together when we are such solitary souls? And how to yield oneself? Mask after mask falls off and it is terrible to see Janus-faced actuality. A weariness comes on—what has become of love which had prided itself on being stronger than death?" ঠিক আমাদের রবিবাবুর উক্তির রুষীয় সংস্করণ বলিয়া মনে হয় না কি?—

এর-ই মাঝে শ্রান্তি কেন আসে ?
উঠিবারে করি প্রাণপণ,
হাসিতে আসে না হাসি, বাজাতে বাজে না বাঁশী,
সরমে তুলিতে নারি নয়নে নয়ন।

কেন তুমি মূর্ত্তি হয়ে এলে ?
রহিলে না ধ্যান ধারণায় ?
সেই মায়া উপবন, কোথা হ'ল অদর্শন,
কেন হায় ঝাঁপ দিতে শুকাল পাথার ?

আরও মনে পড়ে রবি বাবুর সেই—

বাঁশী বেজেছিল, ধরা দিনু যেই
থামিল বাঁশী।
এখন কেবল চরণে শিকল
কঠিন ফাঁসি।

নরওয়ের ইব্‌সেন বলিলেন—গৃহ যখন পুতুল খেলার ঘরে পরিণত হয়, তখন এই চরণে শিকল এই পরাণে ফাঁসি দিয়া মরে— পুরুষ নয়, নারী। নারীকে পুরুষ নিজের বিলাসের সামগ্রী করিয়া exploit করিতেছে। সুইডেনের ষ্ট্রীণ্ড্‌বর্গ পুরুষ ও নারীর কথোপকথনচ্ছলে ইহার যে উত্তর দিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ ইংরাজি অনুবাদেই দিতেছি, বাকিটা বাংলায় ভাষান্তরিত করিলাম।—

স্ত্রী। এল্‌বার্ট, আমি তোমার ওপর নির্ভর করতে পারি, কেমন ? পারি না কি ? যে কাজে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করেছি, তুমিও সে কাজ করবে ?

স্বামী। সেটা কি কাজ ?

স্ত্রী। নিপীড়িতা নারীদিগের জন্য তুমি কিছু করবে ;—কেমন, করবে না ?

স্বামী। সেই নিপীড়িতা নারীরা কোথায় ?

স্ত্রী। কি ? তুমি কি আমাদের মহদনুষ্ঠান থেকে সরে দাঁড়ালে ? আমাদের বিপদে ফেলে ছেড়ে যাচ্ছ না কি ?

স্বামী। কোন্ অনুষ্ঠানের কথা বলচ ?

স্ত্রী। নারীদিগের উন্নতি,—The Women's Cause !

স্বামী। আমি এর কিছুই জানি নে।

স্ত্রী। তুমি এর কিছুই জান না ? ওঃ, বটে ! তুমি অবশ্য স্বীকার করবে যে নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা শোচনীয়।

স্বামী। না, আমি ত দেখি না যে তা'দের অবস্থা পুরুষদের অবস্থার চেয়ে একটুও খারাপ। পুরুষদের exploiterদের হাতে থেকে পুরুষগুলোকে উদ্ধার কর দেখি, তা'হলে নারীরাও মুক্তিলাভ করবে।

স্ত্রী। কিন্তু যে সকল অভাগিনীরা আত্মবিক্রয় করতে বাধ্য হয়, আর যে সকল পাষণ্ড Scoundrels—

স্বামী। The Scoundrels who pay ! Has ever a man taken payment for a pleasure which both enjoy ?

স্ত্রী। সে কথা হচ্চে না, কিন্তু এটা কি অন্যায় নয় যে আইনে একজন শাস্তি পাবে আর একজন পাবে না ?

স্বামী। There is no injustice in that. The one has degraded herself until she has become a source of infection, and therefore the state treats her as it treats a mad dog. Whenever you find a man degraded to that degree, well, put him under police control, too. Oh, you pure angels, who despise men, and look upon them as unclean beasts !......আচ্ছা, ব্যাপারটা কি ? (স্ত্রীর হাতে একখানা পাণ্ডুলিপি দেখিয়া) ওঃ পার্লামেণ্টে একটা বিল্-এর প্রস্তাব করতে হবে ? আমি তোমার যন্ত্রস্বরূপ হব ? Is that moral ? Strictly speaking, is it honest ?

অধিক উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। ষ্ট্রীণ্ডবর্গ দেখাইলেন কেমন করিয়া এক দণ্ডের মধ্যে দুটো কথা কহিতে না কহিতেই স্ত্রী স্বামীকে exploit করিতে চায়।

আধুনিক নাট্যজগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক রচয়িতা ব্রিও এই গৃহস্থ সমস্যার যে নিখুঁত চিত্র দিয়াছেন তাহা দেখিয়া মনে হয় যেন তিনি বলিতেছেন যে, গৃহ Doll's Houseএ পরিণত হইলেও, সে গৃহ ভাঙ্গিবার অধিকার কোনও নারীর নাই, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না অন্য কোনও ভাল ব্যবস্থা সমাজে সম্ভবপর হয়। তিনটি ভগিনী। বড় দুটীর মধ্যে এঞ্জেলি যৌবনে পতিতা, কেরোলিন চিরকুমারী; কনিষ্ঠা জুলী,—গৃহিণী। নাটকের শেষ অঙ্কে তিন বোনের দেখা হইয়াছে; জুলী গৃহত্যাগে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

জুলী। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছিলুম, কেরোলিন। আমি শীগ্‌গির চলে যাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি আমার স্বামী আস্‌চেন। আমি তাঁকে আর দেখ্‌তে ইচ্ছে করি না। তাই আমি যাচ্ছি।

কেরো। তুমি কি করবে?

জু। তুমি যা' কর আমি তাই করব; কোথাও একটা বাসা ভাড়া করব, আর কিছু কাজ নেব।

কেরো। কি রকম কাজ?

জু। আমি জানি না,—যা' পাই।

কেরো। অমন কোরো না, জুলী, কোরো না! (কম্পিত কণ্ঠে) যদি তুমি একটু জান্‌তে!

জু। কি?

কেরো। একা থাকার যন্ত্রণা।

জু। আমি ভয় করিনে। আমি এত পরিশ্রম করব যে, বসে বসে ভাববার সময় আমার থাক্‌বে না।

কেরো।—তুমি কাজ কর্‌বে! (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) যে নারী একাকিনী থাকে, তা'র পক্ষে অর্থ উপার্জ্জন করা সহজ নয়।

জু।—বাজে কথা।

কেরো।—আমি ভাল করে জানি ব'লেই বল্‌চি। দোকানে কাজ নিয়ে গেলুম; তা'রা যে রকম ঘৃণা ও অবজ্ঞাভরে সময়ে সময়ে তাহা প্রত্যাখ্যান করে, সে রকম অবজ্ঞা তা'রা পুরুষ মানুষকে দেখাতে সাহস করে না। এটা অত্যন্ত সত্য কথা। কারণ আমি দ্বিগুণ অসহায়া, যে হেতু আমি নারী আর আমি কাজের উমেদার।

জু। কিন্তু অন্ততঃ তোমার নিজের ঘরের মধ্যে তুমি ত স্বাধীন।

কেরো। স্বাধীন! (কাষ্ঠহাসি হাসিয়া) সে যদি স্বাধীনতা হয়, তবে আমাকে দাসীত্ব দাও।

জু। আমার বন্ধু বান্ধব থাক্‌বে।

কেরো। তুমি তাই মনে কর? স্ত্রীলোকেরা তোমার সঙ্গে মিশ্‌বে না, কারণ তুমি স্ত্রী হ'য়েও স্বামীকে ছেড়ে একা বাস কর্‌চ, আর তুমিও স্ফূর্ত্তিহীন হয়ে থাক্‌বে। আর পুরুষরা? লোকে কি বল্‌বে যদি পুরুষরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে যায়?

জু। লোকে কি বল্‌বে তা' আমি গ্রাহ্য করি না।

কেরো। তবু নিজেকে বাঁচাবার জন্যে তোমার দরজার গোড়া থেকে তাদের হাঁকিয়ে দিতে হবে।

জুলী। তবে তুমি কি পরামর্শ দাও? আমি আমার স্বামীর ঘর করব?

কেরো। হায়, জুলী, লক্ষ্মী বোন্‌টি আমার, তুমি আক্ষেপ কর্‌চ যে তুমি যতটা চাও, তোমার স্বামী ততটা তোমাকে ভালবাসেন না। তা'তে আমি কি বল্‌ব, আমি অভাগিনী যা'কে কোনও পুরুষ কখনও বুকের কাছে টেনে নেয় নি?—যে-আমি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারি আমি যেন একটা জিনিষ একান্ত স্বতন্ত্র, অনাবশ্যক, অপদার্থ, অসম্পূর্ণ! তুমি জান না যে স্ত্রীলোকের পক্ষে সেটা কি ভয়ঙ্কর শূন্যতা।... ...না, জুলী, আবার তোমার জীবনকে নষ্ট কোরো না। যদি স্বামীর সঙ্গে বাস করতে না পার, অন্ততঃ আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ কোরো না। আমার মতন হয়ে থাক্‌তে চেষ্টা কোরো না। আমাদের তিন বোনের মধ্যে একজনই যথেষ্ট...

জুলী। তবে, যে স্বামীকে আমি ঘৃণা করি, আমার খাওয়া পরার জন্যে তার আশ্রয়ে থাকার চেয়ে, আমি ইচ্ছামত অন্য কোনও পুরুষের কাছে আত্মবিক্রয় করব।

পতিতা এঞ্জেলী।—তুমি পাগল! পাগল! তোমার

স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলিতা হও। সেইটেই তোমার পক্ষে সব চেয়ে ভাল।

জুলী।—সে ত সকলেই বলে। আমি তোমায় বল্‌চি, মিলিত হব না, হব না।

এঞ্জেলী।—তোমার বিবাহিত জীবন যতই খারাপ হোক্ শীগ্‌গির আবার তাই ফিরিয়ে পাবার জন্যে হাহাকার করবে; অথবা কেরোলিনের দারিদ্র্যকে বরণ করতে উৎসুক হবে।

জুলী।—তুমি তাই মনে কর?

এঞ্জেলী।—(উচ্ছ্বাস ভরে) তুমি জান না, তুমি বোঝ না জুলী, তাই তুমি অমন করে কথা কচ্চ। হায় তুমি বোঝ না।

জুলী।—তুমি ত নিজে এ কাজ করেছিলে।

এঞ্জেলী।—হাঁ, আমি করেছি। কিন্তু এর পুনরভিনয় করবার আগে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরতে প্রস্তুত আছি। জুলী, আমি তোর হাতে ধর্‌চি। আমি কি বল্‌ব? কেমন কোরে তোকে বারণ কর্‌ব? আমার সমস্ত লজ্জার কাহিনী যে তোকে আর কেরোলিনকে বল্‌তে পার্‌চি নে। আমার মুখ দিয়ে সে সকল কথা বা'র করাস নে।

তাহার পরে এঞ্জেলীকে জুলী তাহার পুরাতন ইতিহাস বলিতে বাধ্য করিল। এঞ্জেলী বিদায় লইল। স্বামী আসিলেন। স্বামী স্ত্রী পরস্পরের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। জুলী বলিলেন—"I was full of romantic ideas. I thought marriage something quite different from what it is"; জুলীর পিতা আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"Ah, my children, everything comes right when once you make up your mind to be like the rest of the world"; মেয়ে উত্তর করিলেন—'Yes; like the rest of the world. I dreamed of some thing better. But it seems it was impossible."

এই যে rest of the world-এর মতন হইয়া থাকা, জগৎ সংসারে আর সকলে যেমন আছে সেই রকম হইয়া থাকা, ইহারই বিরুদ্ধে সংস্কারকগণ অস্ত্রধারণ করে। কিন্তু যতদিন Something better না হয়, অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যবস্থা না হয়, ততদিন পুরাতনের পদ্ধতি ও বিধিব্যবস্থা মানিয়া চলিতেই হইবে। গতিশীলতা ও স্থিতিশীলতা, জড়ত্ব ও জীবত্ব প্রভৃতি তত্ত্বের ভিতর দিয়া এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা বৃথা।

পাশ্চাত্য জগতে নারী ও পুরুষের বিরোধ শুধু যে ঘরের কোণে প্রকাশ পায় তাহা নহে, অর্থোপার্জ্জনের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে নারী অবতীর্ণ হইয়া অনেক দিন হইতে পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ব্রিও'র 'নারীর সত্ত্ব' নামক নাটক হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।—

নারী। যদি তোমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা না চাও, তবে তোমাদের মেয়েদের ঘরে রাখ, তাঁ'দের ভরণপোষণ কর।

পুরুষ। ঠিক ঐটাই ত আমরা চাই; পুরুষ ওয়ার্ক-শপ্-এ কর্ম্মক্ষেত্রে থাকবে, স্ত্রীলোক ঘরে থাকবে।

নারী। স্ত্রী যদি আজ কাল ঘরে না থাকে, তা'র কারণ হ'চ্চে পুরুষ থাকে শুঁড়ির বাড়ীতে।

পুরুষ। পুরুষ শুঁড়ির বাড়ী যায়, কারণ তা'র ঘর-কন্না কখনও সে ভাল দেখ্‌তে পায় না, সন্ধ্যার পর বাড়ী গিয়ে খাবার পায় না; আর গৃহিণী স্ত্রীর পরিবর্ত্তে সে পায়—কোনও কারখানায় সমস্ত দিন খেটে খেটে পরিশ্রান্তা একটা মজুরণী।

নারী। তোমরা কি মনে কর স্ত্রীলোকেরা আমোদ করবার জন্যে কারখানায় কাজ করতে যায়? তোমরা কি অনুমান কর না যে তা'রা ঘরের মধ্যে শান্ত জীবন ঢের বেশী পছন্দ করে?

পুরুষ। তবে তা'রা সেখানে থাকলেই পারে।

নারী। কে তাঁ'দের খাওয়াবে পরাবে?

পুরুষ। তাঁ'দের স্বামিরা।

নারী। প্রথমতঃ তাঁ'দের স্বামী পাওয়া দরকার।

কিন্তু যাঁ'দের স্বামী নেই,—কুমারী, বিধবা, পরিত্যক্তারা? তাঁ'দের অবৈধ পুরুষসঙ্গ করতে বাধ্য করার চেয়ে কোনও একটা ব্যবসায়ে লাগিয়ে দিলে ভাল হয় না কি? তাঁ'দের মধ্যে কেউ কেউ পুরুষের সাহায্য ভিক্ষা করা থেকে অব্যাহতি পেতে চায়। তুমি কে দেখ্‌তে পাচ্ছ না যে অনেক স্ত্রীলোকের পক্ষে কাজ মানে স্বাধীনতা? তাঁ'রা কাজ কর্‌বার অধিকার চাচ্চে বোলে তুমি কি তাঁ'দের দোষ দিতে পার? তাঁ'রা ঐ অধিকারটুকুর জন্যে লড়াই কর্‌চে।

পুরুষ। আমার মনে হয় না যে সে অধিকার বাঞ্ছনীয়। নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় নয়। কঠিন পরিশ্রমের ভিতর দিয়া মনে কর তুমি নারীকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলে; তা'র হাত থেকে তা'র ছেলেপুলেদের নিয়ে অন্তত সেগুলোকে মানুষ করবার ব্যবস্থা কর্‌লে। যখন তুমি তা'কে গৃহস্থের সমস্ত কর্ত্তব্য থেকে বিচ্যুত করে ফেল্‌লে, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গার্হস্থ্য স্বচ্ছন্দতা থেকে তা'কে বঞ্চিত করলে; তুমি কেমন কোরে বল্‌তে পার সে আবার ফিরে দাঁড়াবে না, আবার তা'র পুরাণো দাসীত্ব ফিরে চাইবে না,—তা'র গৃহের শান্ত আশ্রয়, তা'র স্বামীর সেবা ও সন্তান পালনের অধিকার সে ফিরে চাইবে না?

স্ত্রী। তুমি কি দেখতে পাচ্চনা যে ঐ জিনিষগুলোই অধিকাংশ স্ত্রীলোক এখন চাচ্চে? তোমরা যেমন চাও, আমরাও তেমনি চাই যে স্ত্রীলোকেরা ঘরে থাকে। কিন্তু সেটা তোমরা কেমন কোরে সম্ভবপর করবে? এখন মদে যে টাকা উড়িয়ে দেওয়া হয়, প্রায় ততটাকা মেয়েরা কারখানায় বেতনস্বরূপ উপার্জ্জন করে। সুতরাং আসল সমস্যা হচ্চে মদ্যপানাসক্তিটাকে নষ্ট করা। কিন্তু সমাজের মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা তা'র কোনও উপায় করবে না, কারণ শুঁড়ির ভোট তারা চায়; ঠিক ঐ কারণে তোমার মত সোশ্যালিষ্ট নেতারাও কিছু করবে না। যা দাঁড়িয়েছে সেটা তোমাদের মেনে নিতে হবে। প্রত্যেক সভ্য দেশের গাঁয়ে ও সহরে বাড়ীর পুরুষ মদ্যাসক্ত হ'লে সেই বাড়ী থেকে অন্ততঃ একজন নারী এসে কর্ম্মক্ষেত্রে তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াবে; আপিসে কারখানায় দোকানে তোমাদের পাশে গিয়ে বস্‌বে। তোমরা নারীকে গৃহিণীরূপে চাও না; আর যেহেতু সে কুলটা হ'তে চায় না, অগত্যা তা'কে তোমাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কর্‌তে হবে। তাদের কাজ করবার শক্তি তোমাদের চেয়ে বেশী, তা'রা মাতাল নয়, এই জন্যে সেই নারীরা তোমাদের জায়গা অধিকার করবে।

এই যে নারী ও পুরুষের দ্বন্দ্ব পাশ্চাত্য সমাজকে বিক্ষোভিত করিতেছে, তাহাদের সাহিত্যেও যে ইহার রেখাপাত হইবে তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? কিন্তু এই সমস্ত সমস্যা আমাদের সমাজকে চঞ্চল করিতেছে কি না, তাহা সকলেরই ভাবিয়া দেখা উচিত। যে যে কারণে পাশ্চাত্য সমাজে নারী ও পুরুষ বিচিত্র, স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও কর্ম্মক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই সমস্ত কারণপরম্পরা বিশেষভাবে অনুধাবন করা কর্ত্তব্য। কেন নারী ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া পুরুষের সঙ্গে অহর্নিশ দ্বন্দ্ব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে; পুরুষের স্বামিত্বকে উপেক্ষা করিয়া নিজের স্বত্বের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে প্রয়াস পাইতেছে; মদের ভাঁটি ও ফ্যাক্টরিগুলো কেমন করিয়া মানুষকে ঘর-ছাড়া করিল; এই ঘরে বাইরের সমস্যা কেবলমাত্র economic কি না, তাহা মাঝে মাঝে আলোচনা করায় ক্ষতি কি? ঐ economic শব্দের মৌলিক তাৎপর্য্য যদি গার্হস্থ্য ও পৌর বিধি সমষ্টিকে বুঝায়, তাহা হইলে সেই বিধি ব্যবস্থার ভিতর হইতে কেন নর ও নারী দ্বন্দ্ব করিতে করিতে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল, তাহা বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া, আমাদের সাহিত্যে যদি পাশ্চাত্য সমাজের ব্যক্তিগত বিদ্রোহের প্রতিচ্ছবি ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হয়; আচার-বিনয় নিয়ন্ত্রিত ব্রাহ্মণ্যসমাজে উদ্দাম ব্যক্তিত্ব জাগাইয়া দিয়া 'জড়ত্ব' হইতে 'জীবত্বের' দিকে একটা ধাক্কা দেওয়া হয়; তাহা হইলে হয়ত নর-নারী ঘর ভাঙ্গিতে পারে, কিন্তু উল্টা দিক হইতে আর একটা প্রচণ্ড

শক্তির আঘাত না পাইলে আবার তাহারা পরস্পরের পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইবে কি? আবার তাহারা নীড় বাঁধিবে কি? এইরূপে নর-নারীকে প্রলয়ঙ্করী শক্তির ক্রীড়ণক করিয়া অদৃষ্টদেবতা আমোদ পাইতে পারেন, কিন্তু আমরা সেই অবস্থায় পৌছাইবার জন্ম সাধনা করি কেন? উদ্দাম স্বাধীনতার প্রবৃত্তিকে প্রত্যেক সমাজ নানাপ্রকারে সংযত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। বঙ্গসমাজে আচার-বিনয়-বিদ্যা প্রভৃতি কুললক্ষণ দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিলে চলিবে কেন? আচারকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া বৌদ্ধযুগের অবসানকালে নবজাগ্রত ব্রাহ্মণ্যসমাজ আত্মরক্ষা করিতে যদি সমর্থ হইয়া থাকে, তবে এখনও তাহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকি কেন? এই প্রশ্ন উঠিয়া থাকে। কিন্তু গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ্যসমাজ হাঁফ্ ছাড়িতে পারিল কই? দীর্ঘ ছয় শত বৎসর ধরিয়া মুসলমানের অধিকারের মধ্যে সে কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিল, আপনাকে স্বতন্ত্র রাখিল, সে কথাও ত একটু ভাবিয়া দেখিতে হইবে। গৃহী ও সন্ন্যাসী বৌদ্ধ কোথায় গেল, তাহার চিহ্নমাত্রও রহিল না; কিন্তু সনাতন ব্রাহ্মণ্য সমাজ টিকিয়া রহিল ত! একবার একটা প্রবল ভাবের বন্যা আসিয়াছিল। জ্ঞান-বৈরাগ্যের বিভূতি মাখিয়া বৈষ্ণব প্রেম বাঙ্গালীকে মাতাইয়াছিল; বাঙ্গালী গৃহস্থ-জীবন নূতন রসে মজিল; কিন্তু আচারভ্রষ্ট হইয়া সমাজ কেন্দ্রচ্যুত হইল না; বন্ধনমুক্ত নর-নারী একেবারে নেড়া-নেড়ীর দল গড়িয়া বাহির হইল না। কিন্তু তা'র পরেই কি সে সমাজ দুই দণ্ড স্থির হইয়া নিজের কথা ভাবিবার সময় পাইল? য়ুরোপীয় সভ্যতার সংঘর্ষ হইতে নিজেকে দূরে রাখিবার জন্ম সে নানাপ্রকারে চেষ্টা করিতে লাগিল। আজও সে চেষ্টার অবসান হয় নাই। যাঁহারা বলেন—এত চেষ্টার কি দরকার ছিল? না হয়, লুপ্ত হইত; তবুও এই পঙ্গুত্বের বড়াই কর কেন?—তাঁহাদের উত্তরে বলিব,—পঙ্গুত্বের গৌরব করিব কেন? ব্রাহ্মণ্য সমাজ বৌদ্ধ সমাজের মত লুপ্ত হইলেই কি মানবের ইতিহাসের গৌরব বাড়িত? কে বলিল যে সে সমাজ আপনার চারিদিকে অচলায়তনের অভ্রভেদী প্রাচীর তুলিয়া বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া বহুযুগ ধরিয়া জড়ত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে? বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য রচনা করিয়া যদি ব্রাহ্মণ লুপ্ত হইত, তাহা হইলে ক্ষোভের বিষয় ততটা হইত না। এত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সে যে বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া আসিয়াছে; বৌদ্ধকে নিজের দলে টানিয়া আনিয়া, মুসলমানের কাছে আত্ম-সমর্পণ না করিয়া, য়ুরোপীয় সভ্যতার স্রোতে ভাসিয়া না গিয়া, সে এতদূর পথ চলিয়া আসিয়াছে,—ইহাই কি জড়ত্বের লক্ষণ? আবার যখন চিরকুমার ডাক্তার রায় মহাশয় বাঙ্গালী গৃহকে সম্প্রতি Doll's House বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন, তখন মনে হয়, কোথায় এমন কি লক্ষণ দেখা গেল যে, হঠাৎ বাঙ্গালী নরনারী বিবাহের সাত পাঁকের মধ্যে ঘোরপাক খাইয়া পরস্পরের স্বত্ব লইয়া বোঝাপড়া করিতে বসিয়াছে? যদি Doll's House-ই হয়,—ব্রাহ্মণ্যসমাজস্থ বাঙ্গালীর ঘরের পুতলটি কে? নারী, না—পুরুষ?

নারীজীবনের এই পুতুল খেলার প্রবৃত্তিটাকে অস্বীকার করিবার জো আছে কি? য়ুরোপে স্বাধিকার-প্রমত্তা "নোরার" দিন চলিয়া গিয়াছে। এই যুদ্ধ বিপ্লবের ঘোরপাকে পড়িয়া নারী আবার বিবাহের সাত পাকের মধ্যে স্বেচ্ছায় ধরা দিতে রাজি হইয়াছেন। উল্টা দিক হইতে একটা প্রচণ্ড শক্তির ধাক্কা আসিয়া আবার নর-নারীকে পাশাপাশি দাঁড় করাইতেছে। স্বনামখ্যাতা কাউনটেস্ অভ্ ওয়ার্বিক বলিতেছেন —"এই মহাবিপ্লবে নারী আবার পুরুষের অত্যন্ত কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন; এখন আর তাঁহার বিবাহে আপত্তি নাই; জননী হইয়া শুধু যে তাঁহারা নিজের জীবনকে সফল করিবেন, তাহা নহে;—তাঁহারা মনে রাখিবেন যে, তাঁহাদের মতি গতির উপর সমগ্র পাশ্চাত্য শ্বেতজাতির জীবনমরণ নির্ভর করিতেছে; য়ুরোপের এই প্রকাণ্ড নরমেধ যজ্ঞের পরে একটা অত্যন্ত জটিল race problemএর সমাধান

তাঁহাদিগকে করিতে হইবে।” নারী আবার সেই পুতুলের ঘর সাজাইয়া খেলিতে চান। কবিবর হেমচন্দ্রের ভাষা মনে পড়িতেছে; নারী যেন বলিতেছেন—

মন দিয়ে খেল নাথ, ফিরে হবে বাজি মাৎ
সেই খেলা আবার খেলিব;
সেই পুঁজি সেই পণ সেই প্রাণ সেই মন
প্রাণনাথ সকলি সে দিব।

য়ুরোপে নারী আবার এই Doll's House এর গৃহিণী হইতে চান। মিসেস্ আলেক টুইডি লিখিতেছেন—“আমি নিজে গৃহ ভালবাসি; গৃহের সমস্ত আস্‌বাব যেন আমার জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে সম্বদ্ধ। গৃহই আমাদের জীবনের কেন্দ্র।...নারী ও পুরুষের সাহচর্য্যই এখনকার মূলমন্ত্র, বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা নহে। এই যুদ্ধবিপ্লবের মধ্যে আমাদের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যাহা মুখে ভাল লাগিত না, এখন তাহা ভাল লাগে। আগে আমি রাঁধিতে জানিতাম না; কি আহাম্মকই ছিলাম! এখন আমি রন্ধনকার্য্যে নিপুণা।—We have got to live up to ideals. Home life is an idyll; everything should be done to make it beautiful and its surroundings worthy. Our home is our pivot.…Co-operation is now the password of the sexes, not antagonism.…Life is changed for all of us. I used to say I hated porridge. I used to say I never would or could cook. It shows what a fool I was. War taught me to like the first, and become quite proficient at the second—even to making pastry in an air-raid. ইনি প্রেম ও বিবাহ-বন্ধনের চিরন্তন বিরোধের তর্ক তুলিতেছেন না। ফিওডোর সলোগবের কথা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি,—‘প্রেম জগৎকে বলিতেছে, বিবাহে আমার চরম সার্থকতা?’ ‘না, না, না’; সে বাঁশরীর স্বরে বলিতেছে—‘না, না, না’। স্বয়ম্ভূ প্রজাপতি বলিতেছেন,—হাঁ, হাঁ, হাঁ; এই হাঁ-এর ভিতরে একটা বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।’ নারী ও পুরুষের বিচিত্র সম্বন্ধের আসল নিরাবরণ সত্য কোথায়?

এইখানে শেষ করি। যাঁহার রচনাবলী পাঠ করিয়া আমার হৃদয়ের তারগুলি সুরে বেসুরে বাজিয়া উঠিয়াছে, তিনি সেই নিরাবরণ সত্যের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত আছেন দেখিয়া প্রীতিলাভ করিলাম বটে; কিন্তু তাঁহাকে মৃদুভাবে, হয়ত রূঢ়ভাবে কয়েকটা কথা বলিয়া লইলাম। তাঁহার ‘মেটার্লিঙ্ক’ প্রভৃতি অনেকগুলি উপাদেয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছুই বলা হইল না। কিন্তু আপাততঃ তিনি লিখিয়া যাউন, আর আমরা পড়িতে থাকি;—তাঁহার সঙ্গে আমাদের এই সম্বন্ধটুকু থাকিলেই যথেষ্ট হইবে।

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

ভক্তকবি তুলসীদাস

বাল্য ও যৌবন।

যে সময়ে মহাত্মা তুলসীদাসের আবির্ভাব, অভ্যুদয় ও তিরোভাব হয়, জীবনচরিত লেখা তখন ভারতবর্ষীয় গ্রন্থকারদিগের মধ্যে পদ্ধতি ছিল না। সুতরাং গোস্বামী প্রভুর জীবনের ঘটনাবলী কতকগুলি জনশ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত। লোকপরম্পরায় পুরুষানুক্রমে কিম্বদন্তী সকল, বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া আসিয়াছে। তাঁহার স্বরচিত হিন্দী “রামচরিতমানসে”র (রামায়ণের) টীকাকারদিগের মধ্যে কেহ কেহ, তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিয়া তাঁহাদের গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। বঙ্গীয় গ্রন্থকারদিগের মধ্যে “সাহিত্য-সংহিতা”কার ও শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘোষ এবং “ভারতবর্ষীয় ভক্তকবি” নামক

গ্রন্থের লেখক মহাশয় বহুকাল পূর্ব্বে তুলসীদাসের জীবনীর কিয়দংশ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থ এখন সচরাচর দৃষ্ট হয় না। আধুনিক গ্রন্থকারদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং বঙ্কুবিহারী ধর তাঁহাদের "জীবনী সংগ্রহ" ও "জীবন-চিত্র" নামক গ্রন্থে, অন্যান্য সাধক ও ভক্তদিগের সহিত তুলসীদাসেরও সংক্ষিপ্ত জীবনী সংযুক্ত করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন প্রাচীন প্রামাণিক পুস্তক নাভাজী বিরচিত হিন্দী "ভক্তমাল" গ্রন্থ এবং বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবি কৃষ্ণদাস অনূদিত বাঙ্গালা "ভক্তমাল" গ্রন্থ-দ্বয়েও তুলসীদাসের জীবন-কথা দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে নাভাজী স্বয়ং তুলসীদাসের সমসাময়িক লোক। শ্রীধাম বৃন্দাবনে তুলসীদাসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তুলসীদাস তাঁহার রচিত "ভক্তমাল গ্রন্থ" পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বকথিত গ্রন্থনিচয়ে তুলসীদাসের জীবনী সম্বন্ধে অনেক স্থলে ঘটনাবলীর মিল নাই; পরস্পর অনৈক্য ও বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। আমি এই প্রবন্ধটী রচনায় উল্লিখিত হিন্দী ও বাঙ্গালা গ্রন্থনিচয় হইতে কিছু কিছু সাহায্য লইয়া, এবং আমার প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল বিহার ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে প্রবাস সময়ে সাধু, ভক্ত ও মহাপুরুষ মুখে শ্রুত গল্পাংশ সকল অবলম্বন করিয়া, এই জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করিলাম। আশা করি ইহা হইতে সেই মহাপুরুষের জীবনের কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে।

বহু শতাব্দী ধরিয়া বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর কঠোর শাসন-তলে থাকিয়া ভারতের বৈষ্ণব ধর্ম্মকে মৃতপ্রায় দেখিয়া, শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যখন হরিনামের বিজয় নিশান হস্তে বঙ্গদেশ ও উৎকলের আবালবৃদ্ধবনিতাকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন, বিহার প্রদেশকে মহাত্মা কবীর দাস এবং উত্তরপশ্চিমকে রামানন্দ প্রভু যখন রাম-নামের বন্যায় ভাসাইয়াছিলেন, গুরু নানক যখন ইসলামধর্ম্মপ্লাবিত পঞ্চনদতীরবাসিগণকে কেশে ধরিয়া স্বধর্ম্মে ফিরাইয়া আনিতেছিলেন, তাহার প্রায় সমকালে, প্রয়াগের নিকটবর্ত্তী যমুনাতীর-স্থিত (কাহারও কাহারও মতে বান্ধা জেলার অন্তর্গত চিত্রকূট পর্ব্বতের নিকট) রাজাপুর নামক গ্রামে, এক পুণ্যপ্রথিত (সরবরিয়া বা সরযূপারী) ব্রাহ্মণবংশে, অনুমান ১৫৮৯ সম্বতে (ইং ১৫৩৩ খ্রীঃ অব্দে) মহাত্মা তুলসীদাস জন্মগ্রহণ করেন। কাহারও কাহারও মতে তিনি ১৬০০ সম্বতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। শেষোক্ত মতটাই অধিক সমীচীন বলিয়া বোধ হয়, কেন না তুলসীদাসের সন্ন্যাসকালীন স্বরচিত "প্রথম পদে", তাঁহার সন্ন্যাসের সময় "সম্বত ১৬৩১" বলিয়া তিনি নিজেই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৩১ বৎসর হয়। নতুবা অন্য লেখক-দিগের মতে ১৫৮৯ সম্বতে তাঁহার জন্মকাল ধরিলে, তাঁহার সন্ন্যাসারম্ভের সময় ৪২ বৎসর বয়স হইয়া যায়। সে সময়ে পূর্ণ যৌবনের উন্মাদনায়, কামিনীর দাস থাকা তত সম্ভবপর নহে। "ভক্তমাল" গ্রন্থকার তাঁহাকে বাল্মীকির অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কেন না, যিনি এই পাপপঙ্কমলিন কলিযুগে, রামায়ণরূপ অমৃতধারা প্রবাহিত করিয়া, সাধারণ জীবের পক্ষে, রামকথা শ্রবণ পঠন ও মননের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, তিনি যে শ্রীমহর্ষি বাল্মীকির অবতার বলিয়া সম্মানিত হইবেন, তাহা আর বিচিত্র কি?

মহাপুরুষগণের জন্ম মৃত্যু ও আয়ু সম্বন্ধে নানারূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত হয়। হিন্দী "ভক্তমাল" গ্রন্থকার নাভাজী, মহাত্মা কবীর দাসের জীবনকাল ১২০৫—১৫০৫ অর্থাৎ তিন শত বৎসর লিখিয়াছেন। সাধু ভক্ত যোগিগণের জীবনকাল বহুদিন স্থায়ী হওয়া কিছু বিচিত্র ব্যাপার নহে। প্রাচীন কালের কথা ত্যাগ করিলেও, অধুনা ২০০ শত বৎসর আয়ুবিশিষ্ট সাধু দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের আবেশ অবতার কালনার ভগবানদাস বাবাজীকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য যখন বাল্যকালে প্রবন্ধলেখকের ঘটিয়াছিল, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ২০০ বৎসরের উপর হইবে। শরীর শুভ্রবর্ণ এবং নূতন দন্তোদ্গম

হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বদা হরিনাম জপ ও শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও শ্রবণ করিতেন। সেই বয়সে তাঁহার কি সরলতা! ইহার ২৫।৩০ বৎসর পরে তাঁহার দেহ-ত্যাগ হয়।

তুলসীদাসের পিতার নাম ছিল ভানুদত্ত দুবে। কোনও জীবনীলেখক তাঁহাকে আত্মারাম দ্বিবেদীর পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "দুবে", "দ্বিবেদীর" অপভ্রংশ মাত্র। সুতরাং তিনি যে দ্বিবেদী-বংশসম্ভূত ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার পিতার নাম সম্বন্ধে মতদ্বৈধ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। তাঁহার জনকের নাম যাহাই হউক, স্বনামধন্য পুরুষ তুলসী-দাসের পিতা যে মহাভাগ্যবান ছিলেন তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কেন না, তাঁহার পুত্রের নাম আজ হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, সমুদ্র-মেখলিতা ভারতভূমির হিন্দিভাষাভিজ্ঞ লক্ষ লক্ষ নরনারীর মুখে প্রভূত ভক্তির সহিত সন্ধ্যাবন্দনার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনিয়ত উচ্চারিত হইতেছে।

তাঁহার জননীর নাম ছিল হুলসী—উল্লাসী অর্থাৎ আনন্দময়ী। সেই পরম রূপলাবণ্যবতী রত্নগর্ভা রমণী তুলসীকে গর্ভে ধারণ করিয়া, ধরাধামে ধন্যা হইয়া-ছিলেন সন্দেহ নাই। তুলসীদাস স্বরচিত রামায়ণে স্থানে স্থানে, কখনও বা দ্ব্যর্থ করিয়া জননীর নামোল্লেখ করিয়াছেন :—

শম্ভু প্রসাদ সুমতি হিয় হুলসী।
রামচরিতমানস কবি তুলসী॥

রামায়ণ—বালকাণ্ড।

অর্থাৎ—"শম্ভু-প্রসাদে, হুলসীর হৃদয়ানন্দবর্দ্ধনকারী তুলসীর হৃদয়ে সুমতি হওয়াতে, সে রামচরিতমানসের (রামায়ণের) কবি হইল।" অথবা শিবপ্রসাদাৎ আমার মনে আনন্দ উৎপন্ন হইল; তাহাতে আমি তুলসীদাস, এই "রামচরিতমানসের" কবি হইলাম। অন্য স্থানে :—

যমগণ মুহঁ মসী জগ যমুনাসী।
জীবন মুক্ত হেতু জনু কাশী॥
রামহিঁ প্রিয় পাবন তুলসী সী।
তুলসীদাস হিত হিয় হুলসী সী॥

ঐ।

অর্থ—"এই সংসারে 'রাম-কথা' যমুনার ন্যায়, যম-দূতগণের মুখের মসী (কালিমা) স্বরূপ, জীবন্মুক্তির জন্য কাশীধামতুল্য, শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয় পবিত্র তুলসী-পত্রবৎ, এবং তুলসীদাসের হিতকারিণী (মাতা) হুলসীর (অথবা হৃদয়ানন্দের) মত।"

তুলসীদাস তাঁহার রচিত রামায়ণের বহু স্থানে, উপরি-উক্তরূপ কখনও সরলার্থে, কখনও দ্ব্যর্থ করিয়া, জননীর নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে দুইটী মাত্র উদাহরণ উদ্ধৃত করা হইল।

তুলসীদাসের বাল্যজীবন সম্বন্ধেও তাঁহার জীবনী-লেখকদিগের মধ্যে মতভেদ ও অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত বন্ধুবিহারী ধর মহাশয় তাঁহার "জীবন-চিত্র" নামক গ্রন্থে, অন্যান্য সাধু ভক্তদিগের সঙ্গে, তুলসী-দাসেরও যে সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহতে তিনি লিখিয়াছেন—"শৈশবেই তাঁহার পিতা-মাতার মৃত্যু হয়। প্রতিবেশিগণ, একটী সুন্দরী বালিকার সঙ্গে তুলসীদাসের বিবাহ দেন, তাহার বয়স তখন পঞ্চদশ বৎসর।"

কিন্তু তুলসীদাসের সন্ন্যাসগ্রহণ সময়ে তাঁহার জননী যে জীবিতা ছিলেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র নাই। কেন না তুলসীদাসের পত্নী, তাঁহার স্বামীর অল্পকাল অনুপস্থিতির সুযোগ পাইয়া পিত্রালয় যাত্রাকালীন, তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর সম্মতি লইয়া গমন করিয়াছিলেন, এ কথা প্রায় সর্ব্ববাদীসম্মত বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

নিম্নলিখিত মত দুইটীও আংশিকরূপে ভ্রমাত্মক—প্রথম—"বালক তুলসীদাস অষ্টমবর্ষ বয়সে পিতৃহীন হইয়া ৺কাশীধামে আসিয়া ১২ বৎসর বিদ্যাভ্যাস করেন এবং স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া দারপরিগ্রহ পূর্ব্বক ধর্ম্ম করিতে থাকেন।"

দ্বিতীয়—"তুলসীদাসের জন্ম মূলা নক্ষত্রে—সুতরাং অতি শৈশবেই তাঁহার পিতামাতার মৃত্যু হয়। এই

অশুভক্ষণে জাত অনাথ শিশুকে কোন আত্মীয় স্বজন আশ্রয় না দেওয়াতে, তিনি একজন সন্ন্যাসীর নিকট প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।"

মতান্তরে, "গণ্ডযোগে" ভূমিষ্ঠ হওয়াতে, জন্মকালেই তিনি পিতামাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া নৃসিংহদাস নামক একজন দয়াময় সাধু দ্বারা তীর্থোত্তম "শূকর ক্ষেত্রে" (বারাহক্ষেত্রে) প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। সাধু পুরুষ, শিশু তুলসীদাসকে পুত্রাধিক স্নেহে লালন পালন করেন এবং তাহাকে সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত ও বিশেষ বুদ্ধিমান দেখিয়া, যত্নপূর্ব্বক নানাশাস্ত্রে বুৎপন্ন করিয়া, ক্রমে 'রাম মন্ত্রে' দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

শিশুকাল হইতে উদাসীন সন্ন্যাসীর আবাসে, সতত সাধুপুরুষদিগের সহিত মহাতীর্থ বারাহক্ষেত্রে বাস করিয়া, এবং সর্ব্বদা রামচরিতামৃত পান করিয়া তুলসীদাস বাল্যকাল হইতেই বিশেষ রামভক্ত হইয়া উঠেন। মধ্যে কয়েক বৎসর, সংসারকূপ মধ্যে নিপতিত হইয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু তাঁহার গুরুদেব বাল্যকালে তাঁহার কোমল হৃদয়ক্ষেত্রে যে ধর্ম্মবীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহা কিছুকাল সুপ্ত থাকিয়া, তাঁহার পত্নীর কঠোর বাক্যরূপ কশাঘাতে সহসা জাগ্রত হইয়া উঠে।

শেষোক্ত বিবরণটীই সমধিক সমীচীন বলিয়া মনে হয়। গোস্বামী ঠাকুরও তাঁহার স্বরচিত রামায়ণে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—

মৈ পুনি নিজ গুরুসন শুনি
কথা সো শূকরক্ষেত।
অসুঝি নহি তস বালপন
তব অতি রহেউঁ অচেত॥

বালকাণ্ড।

অর্থাৎ—"আমিও পুনঃ সেই (রাম) কথা, বারাহক্ষেত্রে গুরুর মুখে শুনিয়াছিলাম; কিন্তু তখন নিতান্ত বাল্যাবস্থা হেতু অতি অচেতন থাকায়, ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই।"

এই ঘটনা সম্বন্ধে তুলসীদাস আর একটী দোঁহা রচনা করেন, তাহা পরে তাঁহার "বিনয়পত্রিকা" নামক গ্রন্থে সংযুক্ত করা হয়। তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, অতি তুচ্ছ ইতর প্রাণী পশুপক্ষী পর্য্যন্ত, নিতান্ত শিশুকালে জননীর স্নেহনীড়ে লালিত পালিত হইয়া থাকে; কিন্তু জগদীশ্বর আমাকে এমনই দুর্ভাগ্য করিয়া সৃজন করিয়াছিলেন যে, জন্মমাত্রেই পিতামাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, মাতৃস্তন্যরূপ পীযূষধারা হইতে বঞ্চিত হইয়া, আবাল্য উদাসীন সন্ন্যাসীর কুটীরে প্রতিপালিত হইয়াছিলাম—

"জননী জনক ত্যজ্যো জনমি, করম বিনু বিধিহুঁ"
ইত্যাদি।

তুলসীদাসের বিনয়পত্রিকা।

আমাদের বাঙ্গালা দেশেও, গণ্ডযোগে জন্ম হইলে শিশুর পিতামাতার প্রাণহানি হইয়া থাকে বলিয়া কথিত আছে। তাই ভক্তকবি রামপ্রসাদ প্রেমভক্তিতে মাতোয়ারা হইয়া, মাতালের ভাবে গাহিয়াছিলেন ঃ—

"এবার কালী তোমায় খাব।
গণ্ডযোগে জনমিলে, সে হয় যে মা খেকো ছেলে,
এবার তুমি খাও, কি আমি খাই,
তার দুটোর একটা করে যাব॥"
ইত্যাদি।

ক্রমে দয়াময় সাধু নৃসিংহদাস বাবাজী, বালক তুলসীদাসকে পরম সুন্দর যুবকে পরিণত হইতে দেখিয়া, তাঁহাকে বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে আজ্ঞা দেন।

তুলসীদাস গুরু আজ্ঞায়, দীনবন্ধু পাঠক নামক এক সদ্‌ব্রাহ্মণের রত্নাবলী নাম্নী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ও সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা দুহিতাকে (মতান্তরে কাত্যায়নী দেবীকে) বিবাহ করিয়া সস্ত্রীক স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক কিছুকাল গার্হস্থ্য আশ্রমে বাস করেন। তুলসীদাস রত্নাবলীর রূপে গুণে আকৃষ্ট হইয়া এরূপ স্ত্রৈণ হইয়া পড়িলেন যে, তাহার অদর্শনে এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারিতেন না। রত্নাবলীকে তিনি পিত্রালয় যাইতে দিতেন না। রত্নাবলীর একটি

ভ্রাতা জন্মিয়াছিল; তাহার অন্নপ্রাশনের সময় হইতে চূড়াকরণ, উপনয়ন প্রভৃতি ক্রিয়া কলাপে বারম্বার চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইলে, সেই সহোদরের বিবাহের সময় তিনি স্বামীর অনুপস্থিতি কালে, শ্বশ্রূঠাকুরাণীর অনুমতি লইয়া, সেই ভ্রাতার সঙ্গে পিত্রালয় চলিয়া যান। তুলসীদাস অল্পক্ষণ পরে স্থানান্তর হইতে ফিরিয়া আসিয়া জননী হুলসীদেবীর নিকট সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া, পত্নীর অদর্শনে জগৎ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন, এবং নিতান্ত অধীর হইয়া, তৎক্ষণাৎ গৃহত্যাগ করিয়া পত্নীর উদ্দেশে শ্বশুরালয় প্রস্থান করিলেন। সেই প্রস্থানই তাঁহার গৃহস্থাশ্রম হইতে শেষযাত্রা হইল।

সম্বত ১৬৩১, জ্যৈষ্ঠ মাস। সেদিন ষষ্ঠী তিথি ও স্বাতি নক্ষত্র ছিল। অনবরত মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। তুলসীর দিক্‌বিদিক জ্ঞান নাই, চৈতন্য নাই, ক্রমাগত পথ অতিক্রম করিয়া চলিতেছেন। পত্নী শিবিকারোহণে ও শ্যালক অশ্বারোহণে অগ্রগামী হইয়াছেন—তিনি পদব্রজে পথিমধ্যে তাহাদের নাগাল পাইলেন না।

ক্রমে রাত্রি হইল। প্রবাদ, নিশাকালে নৌকা অভাবে, কাষ্ঠখণ্ড ভ্রমে ভাসমান শবদেহ ধরিয়া সন্তরণে যমুনা (মতান্তরে গঙ্গা) পার হইয়া গভীর রাত্রে তুলসীদাস শ্বশুরালয়ে গিয়া, প্রাচীর-বিলম্বিত সর্পকে রজ্জুভ্রমে তদবলম্বনে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করেন, পরে ক্রুদ্ধা চমকৃতা পত্নীকর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হইয়া তাঁহার জ্ঞানচক্ষুঃ উন্মীলিত হইল। এই ঘটনাগুলির সহিত বিল্বমঙ্গল ঠাকুর ও চিন্তামণি চরিতের আশ্চর্য্য মিল দেখিতে পাওয়া যায়—কেবল স্বকীয়া এবং পরকীয়া নায়িকার প্রভেদ মাত্র।

গভীর রজনীতে তুলসীদাসকে অকস্মাৎ স্বীয় শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, রত্নাবলী ক্রোধে ও লজ্জায় আত্মহারা হইয়া পতিকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কি আশ্চর্য্য! তোমার লজ্জা নাই? আবার এখানে পর্য্যন্ত আমাকে জ্বালাইতে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া আসিয়াছ? ছি, ছি! ধিক্ তোমাকে এবং শতধিক্ তোমার এমন প্রেমকে। আমার এই অস্থিচর্ম্মময় দেহে তোমার যে পরিমাণ আসক্তি দেখিতেছি, এইরূপ প্রীতি ও প্রেম যদি সচ্চিদানন্দ-ঘন শ্রীরামচন্দ্রের উপর তোমার থাকিত, তাহা হইলে কি ইহলোকে কি পরলোকে, তুমি বিমল আনন্দ অনুভব করিতে সমর্থ হইতে—তোমার ভবযন্ত্রণা ঘুচিয়া যাইত।"

এক একটা কথা কেমন ক্ষণমাহাত্ম্যে উচ্চারিত হইয়া, সুদূরপ্রসারী ফল প্রসব করে। এই সামান্য ঘটনায়, তুলসীদাসের জীবনস্রোতঃ ভিন্ন পথে প্রবাহিত হইল। প্রিয়তমা ভার্য্যার একটীমাত্র ভর্ৎসনা বাক্যে, তুলসীদাসের সুপ্ত হৃদয়ের লুপ্তপ্রায় মনুষ্যত্ব, মুহূর্ত্তমধ্যে সচেতন হইয়া উঠিল।

পত্নীর এবম্বিধ তীব্র তিরস্কারবাক্যে, তুলসীর জ্ঞানচক্ষুঃ উন্মীলিত হইল। তিনি আর সেখানে দাঁড়াইলেন না। যেমন আসিয়াছিলেন, তেমনই শ্বশুরালয় হইতে একবস্ত্রে নগ্নপদে একমাত্র লোটা সম্বল করিয়া, শ্রীরামচন্দ্রের চরণকমল ধ্যান করিতে করিতে কাশীধামাভিমুখে যাত্রা করিয়া, নিবিড় অন্ধকার মধ্যে মিশাইয়া গেলেন।

তুলসীদাসের সন্ন্যাস।

বৈরাগ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, ভগবানের অপার করুণায় তাঁহার অপূর্ব্ব ও অতুলনীয় কবিত্বশক্তির বিকাশ হইল। তিনি স্বরচিত 'প্রথম পদ' গাহিতে গাহিতে ক্রমাগত পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন।

তুলসীদাসের রচিত প্রথম পদটি এই—

ভজু মন রামচরণ দিন রাতি।
রসনা কৈস্‌না ভজত হরিপদ
ধেয়ত ক সওয়াল সাতি॥
যাক কহত হরত দুঃখ দারুণ
শুনি তিয়াতাপ নাশাতি।
রামচন্দ্রকী নাম অমিয়রস
সো রস কাহে নাহি খাতি॥

বনিতা বন্ধু সুশীল সুবর জন
দেত সলাহ সুহাতি।
আওয়ে পাতি সুজন রঘুবরকী
শুনি জুড়াত মম ছাতি॥
সম্বত ষোড়হ শৌ একতিসা
জৈঠ মাস ষঠ স্বাতি।
তুলসীদাস এহি বিনয় লিখত হ্যায়
প্রথম আরজুক পাতি॥
বিনয়পত্রিকা।

অর্থাৎ তুলসীদাস নিজের মনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"হে মন, দিবা রাত্রি রামচরণ ভজনা কর। হে রসনা, হরিপদ কেন ভজনা করিতেছ না? অন্য কি সওয়াল (বিষয়) ধ্যান করিতেছ? যাহার (নাম) কহিলে দারুণ দুঃখ হরণ হয়, যাহার (নাম) শুনিলে, ত্রিতাপ নাশ হয়, শ্রীরামচন্দ্রের সেই নাম অমিয়রস কেন পান করিতেছনা? সুশীল ও সদ্বংশজাতা বনিতা, বন্ধু (হইয়া) সুন্দর পরামর্শ দিতেছে (অর্থাৎ কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের চরণকমলে শরণ লইতে পরামর্শ দিতেছে)। আমাকে (সংসার ত্যাগ করিয়া) যাইবার জন্য সুজন রঘুবরের পত্র আসিয়াছে; ইহা শুনিয়া আমার (ত্রিতাপ দগ্ধ) হৃদয় জুড়াইয়া গেল।"

তুলসীদাসের রচিত এই প্রথম পদের শেষ চরণে, তিনি নিজেই তাঁহার সন্ন্যাসের সময় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সম্বত ১৬৩১, জেঠ (জ্যৈষ্ঠ) মাস, ষঠ (ষষ্ঠী) তিথি, স্বাতি নক্ষত্র—তুলসীদাস "বিনয়" করিয়া, এই প্রথম আর্জীর পাতি (প্রার্থনা পত্রিকা) লিখিতেছেন। তাই তাঁহার "বিনয় বা প্রার্থনা" বিষয়ক পদগুলি একত্র করিবার সময় "বিনয়পত্রিকা" নাম দিয়া, উপরোক্ত প্রথম পদটীও তাহাতে সংযুক্ত করা হইয়াছিল।

শ্রীভগবানের কৃপা হইবামাত্র যে সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তির বিকাশ হয়, তাহার আর একটী নিদর্শন আমাদের বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাস রচিত 'প্রথম পদে'ও পাওয়া যায় যথা—

ভজহু রে মন শ্রীনন্দনন্দন
অভয়চরণারবিন্দ রে।
দুলহ মানুষ জনম সৎসঙ্গে
তরহ এ ভবসিন্ধু রে॥
শীত আতপ বাত বরিখ
এ দিন যামিনী জাগি রে।
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন
চপল সুখলব লাগি রে॥
এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন,
ইথে কি আছে পরতীত রে।
কমলদল জল জীবন টলমল
ভজহ হরিপদ নিত রে॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন
পাদ সেবন দাস্য রে।
পূজন সখিজন আত্মনিবেদন
গোবিন্দদাস অভিলাষ্য রে॥
(গোবিন্দদাসের প্রথম পদ)

ভক্ত কবিগণের "প্রার্থনা" ও "নিবেদন"এ কিছু পার্থক্য আছে। "প্রার্থনা" অর্থাৎ (Prayer) ভগবানের নিকট ভুক্তি মুক্তি ইত্যাদি কিছু প্রার্থনা করা; আর নিবেদন (Resignation)—হে ভগবান,আমি তোমার শরণাগত দাস, তোমার চরণে আশ্রয় নিলাম, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর প্রভু। প্রার্থনা—সকাম; নিবেদন —নিষ্কাম।

বনিতার বাক্যে চৈতন্যোদয় হইবামাত্র তুলসীদাস শ্বশুরালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। জ্যৈষ্ঠমাস। গ্রীষ্মকালজনিত পশ্চিমোত্তর দেশের অগ্নিবর্ষী নিদারুণ উত্তাপ। সে "লু বায়ু" যিনি না উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহাকে কথায় বুঝাইবার যো নাই। বিনা ছত্রে, বিনা পাদুকায়, একমাত্র লোটা সম্বল করিয়া, ক্রমাগত পথ অতিক্রম করিতেছেন। একবারে তীব্র বৈরাগ্য—তন্ময় হইয়া চলিতে চলিতে, সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে,

৺কাশীধামের নির্জ্জন প্রান্তভাগে আসিয়া এক বিশাল বটবৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। সুকুমার দেহ, কষ্ট সহ্য করা অভ্যাস নাই। নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া, তাপদগ্ধ পদযুগলে লোটা হইতে জল লইয়া সেচন করিতেছেন, এবং কিরূপে শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন পাইবেন, তাহাই চিন্তা করিতেছেন।

সহসা সেই আসন্ন সন্ধ্যায় প্রায়ান্ধকার বটবৃক্ষমূল হইতে এক পরম সুন্দর দিব্যমূর্ত্তি প্রকটিত হইল। তুলসীদাস ইতিমধ্যে আশে পাশে কোন স্থানে মনুষ্যমূর্ত্তি লক্ষ্য করেন নাই। হঠাৎ তাহাকে সমুপস্থিত দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কিহে বাপু! তুমি কি মাটী ফুঁড়ে উঠ্‌লে না কি?"

দিব্যমূর্ত্তি উত্তর করিল, "হাঁ প্রভু! মাটী ফুঁড়ে উঠাই বটে! আমি ইন্দ্রলোকবাসী গন্ধর্ব্ব। শাপগ্রস্ত ও স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া, বহুকাল এই বটবৃক্ষমূলে অবস্থান করিতেছি। স্বর্গভ্রষ্ট হইবার সময়ে, পুরন্দরের পদযুগল ধারণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলাম। তাহাতে তাঁহার ক্রোধের কথঞ্চিৎ উপশম হইলে বলিলেন, 'আমার শাপ অন্যথা হইবার নহে। তোমাকে কিছুকাল মর্ত্ত্যে থাকিতেই হইবে। তবে তুমি কাশীধামে গিয়া থাক। পঞ্চক্রোশী কাশী, শিবের ত্রিশূলের উপর অবস্থিত। উহা দ্বিতীয় স্বর্গ—মর্ত্ত্যের মধ্যে ধর্ত্তব্য নহে। তথায় তুমি কিছুকাল বাস কর। শ্রীমন্মহর্ষি বাল্মীকির অবতার গোস্বামী তুলসীদাস ঠাকুর যখন সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্ব্বক কাশীধামে আগমন করিবেন, তাঁহার পাদোদক-কণার স্পর্শে তোমার শাপাবসান হইবে।' ঠাকুর, আজ আমার সেই শুভদিন সমাগত। আমি বহুকাল ধরিয়া আপনার আশায় এইখানে বসিয়া আছি। এক্ষণে আমি অভিশাপ-বিমুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে চলিলাম। আমি আপনার প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়াছি। আমি দিব্যলোকবাসী। আপনি ইচ্ছা করিলে, আমার নিকট কোনপ্রকার বর প্রার্থনা করিতে পারেন।"

ইহা শুনিয়া তুলসীদাস অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি কি তবে বস্তুতঃই ভগবানের প্রিয়পাত্র,—এতদিন মহামায়ায় ভুলিয়া, সংসার নরককুণ্ডে নিমজ্জিত ছিলেন? তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। ইচ্ছা করিলে, "ধনং দেহি পুত্রং দেহি" বলিয়া ঐশ্বর্য্যাদি যাহা ইচ্ছা তাহাই প্রার্থনা করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া আসিয়াছেন। ঐহিক কোনপ্রকার সুখ সম্পদ চাহিলেন না। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা, শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনলাভ—তাহারই উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন।

গন্ধর্ব্ব কহিলেন, "কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির-চত্বরে বসিয়া এক ব্রাহ্মণ প্রত্যহ বৈকালে রামায়ণ পাঠ করেন। অসংখ্য শ্রোতার মধ্যে, দেবতাগণ মানবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঐখানে রামায়ণ পাঠ শ্রবণ করিতে আসেন। সকলের অগ্রে যিনি আইসেন এবং পাঠ শেষে সকলের পশ্চাতে সভাত্যাগ করিয়া যান, তিনি কুষ্ঠীরূপধারণকারী (মতান্তরে কৃশ কুকুরের আকারধারী) ছদ্মবেশী মহাবীর হনুমান। তাঁহার চরণে শরণাগত হইলে, তিনি আপনাকে রামচরণ দর্শনের পন্থা বলিয়া দিবেন।"—এই কথা বলিয়া তুলসীদাসকে নমস্কার পূর্ব্বক সেই গন্ধর্ব্ব অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, আকাশ মার্গে অন্তর্দ্ধান করিলেন।

শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ তুলসীদাসের জীবনীলেখকগণ বলেন যে, তিনি কাশীবাস কালীন কাশীধামের অনতিদূরে প্রত্যহ প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া, শৌচের অবশিষ্ট জল একটী ঝোপের মধ্যে (অন্য মতে বদরীবৃক্ষ মূলে) নিক্ষেপ করিতেন। সেই স্থানে এক প্রেতযোগী বাস করিত। সে প্রত্যহ সেই জল পানে পরিতৃপ্ত হইয়া (কারণ প্রেতলোকের পবিত্র জল পান করিবার অধিকার নাই), তুলসীদাসকে তাহার কামনা সিদ্ধির উপায় স্বরূপ, হনুমানের শরণাপন্ন হইতে উপদেশ দিয়াছিল। আমি কিন্তু একটী পশ্চিমদেশীয় প্রাচীন সাধুর নিকট গন্ধর্ব্ব সম্বন্ধীয় প্রবাদটী শ্রবণ করিয়াছিলাম। যদি কাশীর মধ্যে এই ঘটনাটী ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রেতবিষয়ক কথা অপেক্ষা,

এই বিবরণটাই অধিক বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয়। কেন না, স্বয়ং বিশ্বনাথ যেখানে মুমূর্ষুদিগের কর্ণে তারকব্রহ্ম রাম নাম দিয়া সকল জীবকে উদ্ধার করিয়া থাকেন, কীটাদি পতঙ্গ পর্য্যন্ত উদ্ধার হইয়া শিবত্ব প্রাপ্ত হয়, সেখানে কাশীর উপকণ্ঠে প্রেতযোগীর বর্ত্তমানতা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ?

আবার দেখা যায়, প্রাচীন প্রামাণিক পুস্তক "শ্রীভক্তমাল" গ্রন্থে এই ভূতবিষয়িণী কথায়, সেই প্রেতের অবস্থিতির যে স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা "কাশীর অন্য কোন স্থানে" বলিয়া বর্ণিত আছে। সাধু তুলসীদাস দেশভ্রমণ করিতে করিতে—

কাশীর অন্যত্র সাধু অন্য কোন স্থানে।
কোন প্রয়োজনে গেলা করিয়া ভ্রমণে॥

আবার এই গ্রন্থে "শৌচক্রিয়ার" পরিবর্ত্তে "রন্ধন ক্রিয়ার" কথা উল্লিখিত আছে, যথা—

এক বৃক্ষতলে গিয়া বিশ্রাম করিলা।
পাক করি খাইবার উদ্যোগ হইলা॥

আবার এই "অন্য কোন স্থানের" নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে "রামায়ণ" শ্রবণ করিতে গিয়া, তিনি হনুমানের প্রথম দর্শন পাইয়াছিলেন, তাহাও "ভক্তমাল" গ্রন্থে লিখিত আছে—

তুলসী কহেন, তাঁর (রামের) লাগ পাব কোথা।
তেঁহ (প্রেত) কহে, কহি শুন লাগ পাবে যথা॥
এই গ্রামের অমুক যে ব্রাহ্মণের ঘরে।
তিনি (হনুমান) আসি শ্রীরামায়ণ শ্রবণ যে করে॥

তৎপরে তুলসীদাস, কর্ণঘণ্টা নামক স্থানে গমন করিয়া গুরুর নিকট "রামমন্ত্রে" দীক্ষিত হইয়া, চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন করেন, এবং তথায় ছয়মাস কাল ব্যাপী কঠোর সাধনার পর সেই মহামন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। মতান্তরে তিনি, বারাহক্ষেত্রে বাস কালীন, তাঁহার বাল্যকালের পালক ও শিক্ষাগুরু নৃসিংহদাস সাধুর নিকটই উপযুক্ত বয়সে রামমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তুলসীদাস তাঁহার স্বরচিত রামায়ণে তাঁহাকেই গুরু বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যথা বালকাণ্ডেঃ—"মৈ পুনি নিজগুরু সন শুনি কথা সো শূকরক্ষেত" ইত্যাদি পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, তুলসীদাসের কঠোর সাধনার ও তপস্যার ফলে, হনুমান কর্ত্তৃক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া সানুজ শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাকে কয়েকবার নরাকারে দর্শন দিয়াছিলেন। তুলসীদাস স্বীয় ইষ্টদেবকে দর্শন করিবার জন্য সাগ্রহ অভিলাষ প্রকাশ করিলে, হনুমান তাঁহাকে বলেন, "এজন্মে চর্ম্মচক্ষে, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে না। তিনি দেখা দিবেন সত্য, কিন্তু তুমি বুঝিতে পারিবে না যে ইনিই তোমার ইষ্টদেব।" হনুমানের নিকট বারম্বার এই কথা শুনিয়া, অগত্যা তুলসীদাস তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন।

অনন্তর একদা তিনি চিত্রকূটের ঘাটে স্নান করিয়া, পূজা অর্চ্চনাদি করিবার জন্য চন্দন ঘষিতেছিলেন; এমন সময়ে অপরূপ রূপলাবণ্যসম্পন্ন দুইটী যুবক স্নান সমাপনান্তে, তুলসীদাসের নিকট আসিয়া বলিলেন, "গোসাঁইজী, আমাদের তিলক দিয়া দাও।" তুলসীদাস তাঁহার ছদ্মবেশী ইষ্টদেবদ্বয় কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া, আনন্দ গদ্গদ চিত্তে, স্বহস্তে উভয়ের তিলক সেবা করিয়া দেন। তিনি প্রাকৃত মনুষ্য জ্ঞানে তাঁহাদের তিলক সেবা করিয়া দিয়াছিলেন। পরে হনুমানের নিকট জানিতে পারেন যে, তাঁহার ইষ্টদেবেরা তাঁহাকে দর্শন স্পর্শন দিবার জন্য ছদ্মবেশে আসিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে রচিত একটী গাথা বিহার ও পশ্চিমোত্তর প্রদেশে সর্ব্বদা সকলের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। সদ্গৃহস্থেরা পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীকে শিখাইবার জন্য ইহা সতত উচ্চারণ করিয়া থাকেন :—

চিত্রকূটকী ঘাটপর ভই সন্তন্ কী ভীড়।
তুলসীদাস তাঁহা চন্দন রগড়ে
　　তিলক দেত রাম রঘুবীর॥

অর্থাৎ চিত্রকূটের ঘাটে যখন স্নানার্থী সন্তন্ (সাধুগণের) অত্যন্ত ভীড় (জনতা) হইয়াছে, সেই সময়ে

তুলসীদাস তথায় রঘুবীর রামকে তিলক দিবার জন্য চন্দন ঘষিতেছেন।

চিত্রকূট-পদতলবাহিনী মন্দাকিনী নাম্নী তটিনীর তীরে অবস্থিত সেই ঘাট, এখন মহাতীর্থ হইয়াছে। অসংখ্য যাত্রী তথায় সতত স্নান দানাদি করিয়া থাকেন। ঠিক ঘাটের নিকটেই এখন রেলওয়ে ষ্টেশন হইয়াছে। কিঞ্চিৎ দূরে দেবদেবীপূর্ণ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইলেও, তীরের অতি নিকটে একটী পর্ণকুটীর "তুলসীদাসের ঝোপ্‌ড়া" বলিয়া আজিও পাণ্ডাদিগের দ্বারা যাত্রীগণকে প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

আর একবার তুলসীদাস, ইষ্টদেবের পূজার জন্য পুষ্পচয়নকালে, চিত্রকূট পর্ব্বতের অপরূপ শোভা সন্দর্শন করিয়া বিমোহিত হইয়া বনপথে দাড়াইয়া আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ অদূরে দেখিতে পাইলেন, অপূর্ব্ব পরিচ্ছদধারী একটী শ্যামবর্ণ ও একটী গৌরবর্ণ যুবক, ধনুর্ব্বাণ হস্তে অশ্বারোহণ করিয়া মৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছেন। তিনি সেবারেও, প্রাকৃত রাজকুমারদ্বয় পর্ব্বতারণ্যে মৃগশীকার সন্ধানে গমন করিতেছেন ভাবিয়া, তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। অল্পক্ষণ পরে হনুমান আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, "কেমন গোঁসাইজী, ঠাকুরদ্বয়কে দেখা হইল ত?" তৎশ্রবণে তুলসীদাস প্রেমাশ্রুপরিপূর্ণ নয়নে বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন, "প্রভু, এজন্মে ত প্রকৃত দর্শন ঘটিল না, তবে এই রূপেই, দক্ষিণে লক্ষ্মণ ধন্বী, বামে চ জানকী শুভা, এই ত্রিমূর্ত্তিতে আমি তাঁহাকে দেখিতে বাসনা করি।" হনুমান স্বীকৃত হইয়া, নিম্নলিখিত উপায়ে, তাঁহাকে তৃতীয় বারে "রাম রাজা" রূপ দর্শন করাইয়াছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনকালে যে স্থানে উপস্থিত হইয়া ভরত তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়াছিলেন, রামলীলার সেই পুণ্যময় স্থানকে "ভরত মিলনের" স্থান বলে। চিত্রকূটের উপত্যকা প্রদেশের সেই পরম পবিত্র স্থানে, আজিও প্রতিবৎসর এক মহা-মেলা হইয়া থাকে। সেই মহোৎসবে দর্শনার্থী বহু সহস্র নরনারীর সমাগম হয়। তদুপলক্ষে তথায় অসংখ্য পণ্য-পরিপূর্ণ বিপণি ও বিবিধ আমোদ প্রমোদের সহিত "রামলীলার অভিনয়" দেখান হয়। একদিকে এক সুউচ্চ মঞ্চের উপর সুন্দর সুন্দর বালকগণকে রাম সীতা সাজাইয়া রাজবেশ পরাইয়া, সিংহাসনে বসান হয়। দক্ষিণে লক্ষ্মণ ছত্রধারী, ভরত শত্রুঘ্ন উভয় পার্শ্বে চামর ব্যাজন করিতেছেন, হনুমান ও জাম্বুবান সিংহাসনের সম্মুখে করযোড়ে উপবিষ্ট আছেন—সমাগত জনসংঘকে এইরূপ "রামলীলা" অভিনয় দেখান হয়। একদা তুলসীদাস গোস্বামী কোন কার্য্যব্যপদেশে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন; তথা হইতে প্রত্যাগত হইবার সময়, সেই স্থান দিয়া তাঁহার আশ্রমে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। বহুলোক-কোলাহল-পরিপূর্ণ সেই রমণীয় রামলীলার দৃশ্য কিঞ্চিৎ দূর হইতে দর্শন করিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময়ে পবননন্দন সাক্ষাৎকার হইয়া বলিলেন, "কেমন গোঁসাই ঠাকুর, তোমার প্রার্থিত একাসনে রামসী [illegible] পাইলে ত?" তুলসীদাস বলিলেন, "সে কি? এ দৃশ্য ত ভরত-মিলনের স্থানে প্রতিবৎসর হইয়া থাকে—ইহাতে আবার নূতনত্ব কি?" হনুমান উত্তর করিলেন, "সে কোন সময়? সে ত অমুক মাসে হইয়া থাকে। চল, আমার সঙ্গে দেখিবে চল।" উভয়ে প্রত্যাগত হইয়া দেখেন, রামলীলার সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তর একবারে শূন্য। কোথাও জনমানবের চিহ্নমাত্র নাই। সেই সুবিস্তৃত ক্ষেত্র ধূ ধূ করিতেছে। তদ্দর্শনে তুলসীদাস অশ্রুপূর্ণ হইয়া বলিলেন, "তবে কি নাথ, এজন্মে কিছুতেই ইষ্টদেবের সাক্ষাৎ লাভ হইবে না।" অঞ্জনানন্দন বলিলেন, "আমি ত তোমাকে বারম্বার বলিতেছি, চর্ম্মচক্ষে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না। এই নশ্বর তনুত্যাগের পর, তুমি আমাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া তাঁহার সহচর মধ্যে পরিগণিত হইবে।" —এই কথা বলিয়া হনুমান অন্তর্দ্ধান করিলেন।

তুলসীদাস রামনাম মহামন্ত্রে সিদ্ধ হইয়া শ্রীবৃন্দাবন-ধামে গমন করেন। তথায় মদনগোপাল মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে সীতারাম মূর্ত্তি দেখিতে পান। শ্রীধাম বৃন্দাবনে তুলসীদাস, মদনগোপাল মন্দিরে গিয়া কৃষ্ণমূর্ত্তি

বিগ্রহের সম্মুখে দণ্ডবৎ হইতে ইতস্ততঃ করিতেছেন বুঝিতে পারিয়া, ভক্তবৎসল ভগবান মদনগোপাল, মুরলী-মুকুট গোপন করিয়া, অতুলনীয় রামভক্ত তুলসীদাসকে ধনুর্ব্বাণ হস্তে সীতারাম বিগ্রহরূপে দর্শন দিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে তুলসী পরম প্রীতিলাভ করিয়া গাহিলেন—

"মুরলী মুকুট ছিপায়কে হরি ভয়ে রঘুনাথ।"

(মুরলী ও মুকুট গোপন করিয়া হরি, রঘুনাথ হইলেন)

তৎকালে তথায় সমাগত দর্শকমণ্ডলী, মদনগোপাল-জীকে রামরূপে ধনুর্ব্বাণধারী হইতে দেখিয়া বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তুলসীদাসকে মহাপুরুষ জ্ঞানে পরম সমাদর করিতে লাগিলেন। সেই সময় তথায় হিন্দী "ভক্তমাল" গ্রন্থকার নাভাজীর সহিত তাঁহার মিলন হয়। সেই পরমবৈষ্ণব রচিত সাধুমহাত্মা-গণের চরিতামৃত পাঠ করিয়া তুলসীদাস পরম সন্তোষ লাভ করেন।

তুলসীদাস কর্ত্তৃক রামায়ণ রচনা।

তুলসীদাস কিছুদিন বৃন্দাবনে বাস করিয়া অযোধ্যায় আগমন করেন। অযোধ্যায় বাসকালীন তিনি তাঁহার মহাগ্রন্থ "হিন্দী রামায়ণ" রচনা করেন। তিনি বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন যে শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম ও প্রধান লীলা-ভূমি অযোধ্যায় বসিয়া তাঁহার চরিতামৃত লিখিলে অধিক উদ্দীপনা হইবে। রামায়ণ রচনার সময় সম্বন্ধে জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিতে হয় না। তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থমধ্যেই রামায়ণ রচনার কাল পাওয়া যায়ঃ—

সাদর শিবহিঁ নোঙাইব মাথা
বরণহুঁ বিশদ রামগুণ গাথা॥
সম্বত সোলহসৌ একতীসা।
করৌঁ কথা হরিপদ ধরি শীসা॥
নবমী ভৌম বার মধু মাসা।
অবধপুরী ইহ চরিত প্রকাশা॥
যিহি দিন রাম জন্ম শ্রুতি গাবহিঁ।
তীরথ সকল তথা চলি আবহিঁ॥

অযোধ্যাকাণ্ড।

অর্থাৎ—"সাদরে শঙ্করকে প্রণাম করিয়া, ১৬৩১ সম্বতে (বিক্রমাদিত্য রাজ্যগত সম্বত), মধু (চৈত্র) মাসে, নবমী তিথি, ভৌম (মঙ্গল) বারে, শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম-দিনে, হরিপদে মস্তক ধরিয়া, অযোধ্যাপুরীতে এই শ্রীরামচরিত প্রকাশ করিলাম।"

সুতরাং তাঁহার স্বরচিত "বিনয়পত্রিকা" ও "রাম-চরিতমানস" (রামায়ণ) গ্রন্থদ্বয় হইতেই দেখা যাই-তেছে যে তিনি সম্বত ১৬৩১ জ্যৈষ্ঠমাসে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, এবং সেই বৎসরেরই চৈত্র মাসে রামায়ণ রচনা শেষ করেন। পূর্ব্বোদ্ধৃত পদের শেষ চরণ হইতে বুঝা যাইতেছে যে তিনি শ্রীরামের জন্মদিনে তাঁহার রামায়ণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার মহাগ্রন্থে, শ্রীরামের জন্মসময় এইরূপে বর্ণনা করিয়া-ছেন—

নবমী তিথি মধুমাস পুনীতা।
শুক্লপক্ষ অভিজিত হরি প্রীতা॥
মধ্য দিবস অতি শীত ন ঘামা।
পাবন কাল লোক বিশ্রামা॥
শীতল মন্দ সুরভি বহ বায়ু।
হর্ষিত সুর সন্তন মন চায়ু॥
বন কুসুমিত গিরিগণ মণি আরা।
স্রবহিঁ সকল সরিতামৃত ধারা॥
সো অবসর বিরিঞ্চি জব জানা।
চলে সকল সুর সাজি বিমানা॥

অযোধ্যাকাণ্ড।

অর্থাৎ—"নবমী তিথি, পবিত্র চৈত্রমাস, শুক্লপক্ষ, হরির প্রিয় অভিজিৎ পুনর্ব্বসু নক্ষত্র, মধ্যাহ্নকাল, নাতি-শীতোষ্ণ, অখিল লোককুলবিশ্রামের পরম পাবন সময়, শীতল মন্দ (মৃদু) ও সুগন্ধ (ত্রিবিধ) বায়ু বহিতেছে, সুর (দেবগণ) হর্ষিত এবং সন্তন (ভগবদ্-ভক্তের) মনে বড় উৎসাহ হইতেছে, বনফুল প্রস্ফুটিত, গিরিগণের খনি রত্নময়ী হইয়াছে, নদী সকলে অমৃতধারা বহিতেছে। সেই অবসর (সময় অর্থাৎ রামজন্ম সময়) বিরিঞ্চি (ব্রহ্মা) যখন জানিতে পারিলেন, দেবতা

সকলকে সঙ্গে লইয়া, বিমানে (পুষ্পকরথে) চড়িয়া (বালকরূপী) রামচন্দ্রকে দর্শন করিবার জন্য অযোধ্যা-পুরী চলিলেন।"

কথিত আছে যে তাঁহার ইষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং নিম্নলিখিত রূপে তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া "রামায়ণ" রচনা করিবার অনুমতি দান করিয়াছিলেন :—

তুলসীদাস হনুমানের সাহায্যে শ্রীরাম দর্শনে বারবার বিফল মনোরথ হইয়া, একদা রজনীযোগে শয়ন করিয়া রামরূপ ধ্যান করিতে করিতে যেমন নিদ্রিত হইলেন, অমনি তাঁহার ইষ্টদেব স্বপ্নাবেশে তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, "বৎস! আমি তোমার অলৌকিক ভক্তিতে পরম প্রীত হইয়াছি। আমি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে এই বরদান দিতেছি যে, তুমি আপামর সাধারণ জীব-গণের ভবনদী পারের তরণী-স্বরূপা রামায়ণীকথা দেশীয় ভাষায় রচনা কর—রামলীলা প্রকাশের তুমিই উপযুক্ত এবং যোগ্য পাত্র।"

কোন কোন জীবনীলেখক বলেন, ১৫৭৫ খ্রীঃ অঃ রামায়ণ রচনা আরম্ভ হয়।' বালকাণ্ড শেষ হইলে, কোন কারণে অযোধ্যাবাসী সাধুগণ তাঁহার সহিত শত্রুতা করিতে থাকে। হরিপরায়ণ সাধু তুলসীদাস সে কারণে অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া কাশীধামে পুনরাগমন করেন এবং তথায় তাঁহার রামায়ণ রচনা সম্পূর্ণ করেন। সেই মহাতীর্থের যে স্থানে বসিয়া তাঁহার মহাগ্রন্থের রচনা শেষ করিয়াছিলেন, পুণ্যভূমি বারাণসীর পবিত্রতোয়া জাহ্নবীতীরে সেই স্থান অদ্যাপি "তুলসীঘাট" নামে বর্ত্তমান আছে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেকালের কবিরাজ

(চিত্র)

সেকালের প্রসিদ্ধ কবিরাজ গিরিশচন্দ্র বিশারদ মহাশয়ের শ্রেষ্ঠতম ও প্রিয়তম ছাত্ররূপে গণ্য হইয়াও, অধ্যয়ন সমাপনান্তে উপাধিমাত্র গ্রহণ না করিয়া কবি-রাজ দুর্গানারায়ণ সেনগুপ্ত নবীন যৌবনে যখন ক্ষুদ্র নদীতীরবর্ত্তী আপনার নিভৃত পল্লীখানিকেই নিজের ব্যবসায়ক্ষেত্ররূপে নির্ব্বাচন করিয়া লইলেন, তখন তাঁহার আত্মীয় বন্ধু ও হিতৈষিবৃন্দ তাঁহার বিষয়বুদ্ধির একান্ত অভাব দেখিয়া নিতান্তই ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইয়াছিলেন।

কবিরাজ মহাশয় সকলকে বুঝাইয়া বলিলেন যে বড় বড় সহরে চিকিৎসকের অভাব নাই এবং সেখানে ধনবানের সংখ্যাই অধিক, সুতরাং সেখানে কাহাকেও চিকিৎসার অভাবে কষ্ট পাইতে হয় না; পল্লীগ্রামে দরিদ্র লোকেরই এ বিষয়ে যথার্থ কষ্ট; যদি সেই কষ্ট তিনি কিয়ৎপরিমাণেও দূর করিতে পারেন তাহা হইলেও তাঁহার লেখাপড়া শেখা সার্থক। সহরের তৈলাক্ত-শিরে তৈল ঢালিয়া লাভ কি?

কিন্তু তাহাতে তাঁহার নিজের লাভ কি? পল্লী-গ্রামে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির উপযোগী অর্থ তিনি কোথায় পাইবেন? কবিরাজ হাসিয়া বলিলেন, "অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং—অর্থ কি কাহারও সঙ্গে যাইবে?" লোকে বুঝিল, শাস্ত্রীয় বুদ্ধি ও বিষয় বুদ্ধির একত্র মিলন সুদুর্লভ।

যাহা হউক, কবিরাজ মহাশয় ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে অসাধারণ অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে রোগীর প্রতি তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি

ও করুণার কথা দেখিতে দেখিতে চারিদিকে প্রচারিত হইয়া গেল।

অল্পদিনের মধ্যেই চিকিৎসার্থীর সমাগমে তাঁহার বিস্তৃত প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অরুণোদয়ে গাত্রোত্থান করিয়া কবিরাজ মহাশয় গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী নদীতে স্নান করিয়া আসিতেন। স্নানান্তে পূজাহ্নিক সমাপ্ত করিয়া কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করিয়া বাহিরে আসিয়া বসিতেন। উষার অন্ধকার সম্পূর্ণ বিলুপ্ত না হইতে হইতেই দূরদূরান্তর হইতে রোগিসমাগম হইতে থাকিত। কবিরাজ মহাশয় বাহিরে আসিয়া এই সকল দরিদ্র রোগিগণকে সযত্নে পরীক্ষা করিয়া তাহাদের বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করিতেন। বলা বাহুল্য তাঁহার বিতরণীয় ঔষধ ও তৈলাদি এখনকার জগদ্-বিখ্যাত কবিরাজগণের ন্যায় "বৃহদট্টালিকাচূর্ণ" বা ঔষধ-সম্পর্কহীন সুলভ তৈল মাত্র দিয়া প্রস্তুত হইত না। তাঁহার নিজের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ঔষধ সংগৃহীত ও প্রস্তুত হইত। ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে পথ্যাদিও সর্ব্বদা কবিরাজ মহাশয়ের গৃহে সঞ্চিত থাকিত। তিনি যে সকল দরিদ্র রোগীকে পথ্য সংগ্রহে অসমর্থ বিবেচনা করিতেন, তাঁহাদের ঔষধের সঙ্গে পথ্যাদিও অকাতরে বিতরণ করিতেন। রোগীর কষ্টের কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার প্রতিভাপূর্ণ বিশাল চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া উঠিত এবং অকৃত্রিম সহানুভূতি তাঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে নিরন্তর ধ্বনিত হইত। রোগীরা বলিত, কবিরাজ মহাশয়ের কথা শুনিলেই রোগযন্ত্রণা অর্দ্ধেক কমিয়া যায়।

এই সকল রোগী বিদায় করিতে বেলা প্রায় এক প্রহর দেড় প্রহর কাটিয়া যাইত। তাহার পর তিনি শুভ্র বস্ত্রের উপর একখানি উত্তরীয় মাত্র গ্রহণ করিয়া চিকিৎসা করিতে বাহির হইতেন। অবস্থাপন্ন রোগীরা কবিরাজ মহাশয়কে লইয়া যাইবার জন্য শিবিকা পাঠাইয়া দিতেন। দরিদ্র রোগী শিবিকা পাঠাইতে না পারিলে, পদব্রজে তিন চারি ক্রোশ ভ্রমণ করিতেও কবিরাজ মহাশয়ের আলস্য ছিল না।

ফিরিয়া আসিতে দুই প্রহর আড়াই প্রহর কাটিয়া যাইত। ফিরিয়া আসিয়া কবিরাজ মহাশয় পুনরায় স্নান করিয়া, আহার করিতে যাইতেন। অধিকাংশ দিন ফিরিয়া আসিয়া দেখিতেন যে রোগের সংবাদ দিবার বা কোন দূরগ্রামে লইয়া যাইবার জন্য লোক আসিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। কবিরাজ মহাশয় যদি জানিতে পারিতেন এই সকল লোকের কাহারও তখনও আহার হয় নাই, তাহা হইলে তাহাদের আহার না করাইয়া নিজে তিনি কিছুতেই আহার করিতেন না।

কবিরাজ মহাশয়ের গৃহিণীভাগ্য তেমন ভাল ছিল না। স্বামী ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে এইরূপ লোক সমাগমের সংবাদ পাইলেই, তিনি আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া শয্যাগ্রহণ করিতেন। তাঁহার আজন্ম-সহায় শিরঃপীড়া সহসা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিত। কিন্তু চিরপ্রফুল্ল কবিরাজ মহাশয় ইহাতে কিছু-মাত্র বিচলিত না হইয়া, স্বহস্তে রন্ধন করিয়া অতিথির সৎকার করিতেন এবং গৃহিণী আহারের পূর্ব্বে পীড়াগ্রস্তা হইয়াছেন জানিতে পারিলে, থালা সাজাইয়া অন্নব্যঞ্জনাদি তাঁহার কক্ষে রাখিয়া আসিয়া স্বয়ং আহারে প্রবৃত্ত হইতেন।

আহারান্তে কবিরাজ মহাশয় ছাত্রদের লইয়া বসিতেন। চিকিৎসাশাস্ত্রের ছাত্র ব্যতীত ন্যায়, দর্শন ও সাহিত্যের ছাত্রও অনেকে তাঁহার নিকট পাঠ লইতে আসিত। কবিরাজ মহাশয় সযত্নে সকলকে শিক্ষা দান করিতেন।

অপরাহ্ণে চিকিৎসাশাস্ত্র-শিক্ষার্থী ছাত্রগণকে সঙ্গে লইয়া তিনি প্রান্তরে, নদীতীরে, শস্যক্ষেত্রে উদ্ভিজ্জ ঔষধ সংগ্রহে বাহির হইতেন। ইহাতে ঔষধ সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের প্রয়োজনীয় বৃক্ষলতাদির সঙ্গে পরিচয়েরও সুযোগ ঘটিত।

সন্ধ্যায় বাটী ফিরিয়া সন্ধ্যাহ্নিক সমাপনান্তে তিনি বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া উপবেশন করিতেন। গ্রামস্থ ভদ্রমণ্ডলী এই সময় তথায় সমবেত হইতেন।

শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠে এবং সদালোচনায় রাত্রি এক-প্রহর পর্য্যন্ত কাটিয়া যাইত।

প্রতিবৎসর কবিরাজ মহাশয়ের গৃহে জগদ্ধাত্রী পূজা হইত। এই সময়ে গ্রামস্থ লোকের উপর কবিরাজ মহাশয়ের অসাধারণ প্রভাব সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। গ্রামস্থ ইতর-ভদ্র সকলে মিলিয়া কবিরাজ মহাশয়ের পূজাকে আপনার করিয়া লইয়াছিল। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সকলে মিলিয়া উৎসবের কার্য্যভার গ্রহণ করিত এবং কোথাও কোন বিষয়ের ত্রুটি ঘটিতে দিত না। তিনদিন ধরিয়া গ্রামে কাহারও বাটীতে রন্ধনের আয়োজন হইত না। বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারের মত সকলে কবিরাজ মহাশয়ের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে সমবেত হইত। কবিরাজ মহাশয়ের রোগিগণও এই সময়ে তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিত। ধনবান ও দরিদ্র কেহই সাধ্যমত সহযোগিতায় বিরত থাকিত না। ফলে এই বার্ষিক দেবীপূজা অনায়াসে, পরম সমারোহে ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে সুসম্পন্ন হইত।

২

অর্থলোভ না থাকিলেও কবিরাজ মহাশয়ের সাংসারিক ব্যয় অল্প ছিল না। নিজের সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া তিনি অভাবগ্রস্ত আত্মীয় ও বন্ধুবর্গকে নিয়মিত সাহায্য করিতেন। সংসারের অবলম্বন-স্বরূপ কোন রোগীর মৃত্যুতে কোন পরিবার বিপন্ন হইয়া পড়িলে, তিনি সেই দুঃস্থ পরিবারের ব্যয়-ভারও স্বেচ্ছায় নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লইতেন। বহু-সংখ্যক শিক্ষার্থী তাঁহার গৃহে পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতি-পালিত হইত এবং যে কোন আগন্তুক পরম সমাদরে তাঁহার গৃহে আশ্রয়লাভ করিত। দরিদ্রগণের প্রতি তাঁহার স্নেহ ও করুণার অন্ত ছিল না। তিনি যথাসাধ্য তাহাদের দুঃখমোচনের চেষ্টা করিতেন। এই সকল কারণে তাঁহাকে সময়ে সময়ে অর্থাভাবে অসুবিধায় পড়িতে হইত।

অনাবৃষ্টিবশতঃ আশানুরূপ ধান্য উৎপন্ন না হওয়ায় এবৎসর অভাব আরও বাড়িয়া গেল। সম্মুখে পূজা। কবিরাজ মহাশয় কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তাঁহার হিতৈষী বন্ধুবর্গ অনুযোগ করিয়া বলিলেন, "কেবল নিজের ঔদাসীন্যেই আপনার এই কষ্ট। দরিদ্র রোগীদের নিকট না হয় অর্থ না লইলেন, কিন্তু যাহারা অবস্থাপন্ন, তাহাদের দয়া করিয়া ফল কি? যাহারা অনায়াসে দশটাকা দিতে পারে, তাহারাও ফাঁকি দিতে ছাড়ে না। এ প্রবঞ্চনা আপনি কেন যে সহ্য করেন বুঝিতে পারি না।"

কবিরাজ মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "ঠিক কথা, এবার থেকে বড়লোকদের আর রেয়াত করা হবে না। এবার কাউকে একবার বাগে পেলে হয়!"—শুনিয়া সকলে প্রীতিলাভ করিল।

প্রাণধন মণ্ডল এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ ব্যবসাদার। তাহার তেজারতি ও মহাজনীর আয় বৎসরে লক্ষ টাকার কম নহে। প্রাণধনের একমাত্র পুত্র কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইল। প্রাণধন ব্যাকুল হইয়া কবিরাজ মহাশয়ের শরণাপন্ন হইল।

কবিরাজ মহাশয়ের হিতৈষিবৃন্দ তাঁহাকে বিশেষ-রূপে স্মরণ করাইয়া দিল যে এ সুযোগ যেন তিনি কোন প্রকারে উপেক্ষা না করেন। কবিরাজ মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "সে কথা আর বল্‌তে!"

কবিরাজ মহাশয় প্রাণধনকে বলিলেন, "দেখ প্রাণ-ধন, তোমার ছেলে আরাম হইয়া গেলে এবার আমায় রীতিমত বিদায় করিতে হইবে। এবার আর ফাঁকি দিলে চলিবে না।"

প্রাণধন করযোড়ে বলিল, "আপনি যেমন আদেশ করিবেন, আমি সেইরূপ বিদায় দিব, আমার কৃষ্ণধনের প্রাণরক্ষা করুন।"

কৃষ্ণধনের চিকিৎসা চলিতে লাগিল। কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসা-নৈপুণ্যে কৃষ্ণধন ছয়সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল।

প্রাণধন করযোড়ে বলিল, "আপনার দয়ায় কৃষ্ণধন প্রাণ পাইয়াছে। আপনার ঋণ আমি জীবনে শোধ

করিতে পারিব না। এইবার আপনার বিদায় আদেশ করুন।”

কবিরাজ হাসিয়া বলিলেন, “এত ব্যস্ত কেন প্রাণধন? আমি বেশ করিয়া ভাবিয়া বলিয়া পাঠাইব।”

“যে আজ্ঞা”—বলিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া প্রাণধন চলিয়া গেল।

তিনমাস কাটিয়া গেল। কিন্তু কবিরাজ মহাশয় বিদায়ের কথা ভাবিয়া স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

প্রাণধন মধ্যে মধ্যে তাগাদা করিয়া লোক পাঠাইতে লাগিল। কিন্তু কবিরাজ মহাশয় প্রতিবারই বলিয়া পাঠাইতে লাগিলেন যে এত ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন কি? তিনি যথাকালে সংবাদ পাঠাইবেন।

বন্ধুবর্গ নানা প্রকার প্রস্তাব উত্থাপন করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন, “একশত বিঘা জমি চাহিয়া লউন। স্থাবর সম্পত্তিই প্রকৃত সম্পত্তি।” কেহ বলিলেন, “নগদ এক হাজার টাকার কমে কিছুতেই উপযুক্ত বিদায় হইতে পারে না।” কেহ বলিলেন, “রামধনের নিকট একটি উৎকৃষ্ট দুগ্ধবতী গাভী ও গঙ্গাতীরে একখানা বাড়ী চাহিয়া লউন।”

কবিরাজ মহাশয় শুনিয়া নীরবে হাস্য করিলেন। কাহারও প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন না। পূজার সময় প্রাণধন নিজে আসিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল যে সে আর কতকাল এরূপে ঋণগ্রস্ত হইয়া থাকিবে? কবিরাজ হাসিয়া বলিলেন, “তোমরা বড় ব্যস্ত কর প্রাণধন। তোমাদের কোন বিষয়ে দেরি সয় না!”

অত্যন্ত পীড়াপীড়িতে বিপন্ন হইয়া কবিরাজ নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। অবশেষে কিছুই মীমাংসা করিতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলেন, “তোমাকে এক মোহর বিদায় দিতে হবে। কেমন হল ত?”

এত অল্প বিদায় প্রার্থনায় প্রাণধন নিজেই বিস্মিত হইয়া গেল। কিন্তু মোহর ত তাহার নিকটে নাই! প্রাণধন বলিল, “মোহর ত আপাততঃ আমার কাছে মোহর নাই, আপনি মোহরের বদলে পাঁচশত টাকা গ্রহণ করুন।”

কবিরাজ হাসিয়া বলিলেন, “তা হবে না প্রাণধন। আমি অনেক ভেবে ঠিক করেচি। একসপ্তাহের মধ্যে মোহর না পেলে আমি বিদায় গ্রহণই করবো না।”

প্রাণধন প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। সপ্তাহান্তে থলি ভরিয়া টাকা লইয়া আসিয়া প্রাণধন বিষণ্ন মুখে কহিল, “মোহর ত যোগাড় হল না কবিরাজ মশাই। এখানে কারও কাছে মোহর পেলাম না। মুর্শিদাবাদে লোক পাঠিয়েছি। কিন্তু সে আজও ফেরে নি। আপনি মোহরের বদলে এই একহাজার টাকার থলি নিন।”

কবিরাজ মৃদু হাসিয়া বলিলেন,“তা হয় না প্রাণধন! যা বলেচি তার অন্যথা হতে পারে না।”

প্রাণধন করযোড়ে বলিল, “তাহলে আমার ঋণশোধের উপায়?”

এবার কবিরাজ মহাশয়ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, “তাইত! এওত একটা সঙ্কট!”

প্রাণধন বিষণ্ন মুখে কবিরাজ মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কবিরাজ নীরবে নতমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ চিন্তার পর সহসা কবিরাজ মহাশয়ের প্রশান্ত বদন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলেন, “হয়েচে। এক কায কর। একটা টাকায় হলুদ মাখালে ত দেখতে ঠিক মোহরের মতই হবে। তুমি একটা টাকায় হলুদ মাখিয়ে আমায় দাও। তা হলেই তোমার ঋণ শোধ হবে।”

শুনিয়া প্রাণধন হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। কিন্তু কবিরাজ মহাশয় অটল হইয়া রহিলেন। অগত্যা প্রাণধন বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

বাটী গিয়া সে নানা খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রাদির সঙ্গে একটী হরিদ্রা-রঞ্জিত রৌপ্যমুদ্রা বিদায় পাঠাইয়া দিল।

কবিরাজ মহাশয় প্রফুল্লচিত্তে বিদায় গ্রহণ করিয়া বাহককে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া বিদায় দিলেন।

৩

হিতৈষী বন্ধুবর্গ যখন কবিরাজ মহাশয়ের এই অদ্ভুত বিদায়ের কথা অবগত হইল, তখন তাহাদের কবিরাজ মহাশয়ের আর্থিক উন্নতি সম্বন্ধে আর কোন আশাই রহিল না। সকলেই তাঁহাকে অনুযোগ করিয়া বলিল, "নাঃ, আপনার দ্বারা কিছু হবে না।"

কবিরাজ হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা বিদায়টা মন্দ কি হল? অত বড় লোক, কিন্তু বিদায় দিতে কেমন জব্দ হইয়া গেল! আচ্ছা এবার একটা বড় গোছ রোগী হাতে আসুক, তখন আর ছাড়াছাড়ি নেই! দেখ এবার কি কাণ্ডটা করি!"

বন্ধুবান্ধব অবিশ্বাসের হাসি হাসিল।

দোলপূর্ণিমা উপলক্ষে কবিরাজ মহাশয় নবদ্বীপে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিলেন। সঙ্গে কয়েকজন বন্ধুবান্ধবও ছিল।

গঙ্গাতীর দিয়া যাইতে যাইতে, একস্থানে বিপুল জনতা দেখিয়া কবিরাজ মহাশয় সেই দিকে আকৃষ্ট হইলেন। নবদ্বীপের তদানীন্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় জগদীশ তর্কপঞ্চানন মহাশয়কে "তীরস্থ" করা হইয়াছিল।

মুমূর্ষুর চারিদিকে তাঁহার পুত্রগণ অবনত মুখে দাঁড়াইয়া ছিল এবং তাঁহার চরণপ্রান্তে তাঁহার পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী পট্টবস্ত্র পরিহিতা জাহ্নবী দেবী উপবেশন করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার গৌরবর্ণ সুশ্রী মুখমণ্ডলে ভক্তি ও করুণার কোমল দীপ্তি ফুটিয়া উঠিতেছিল এবং তাঁহার মহিমময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া দেবীমূর্ত্তি বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিতেছিল।

কবিরাজ মহাশয় দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া এই মূর্ত্তিমতী দেবীপ্রতিমার চরণধূলি গ্রহণ করিলেন। প্রথিতযশা কবিরাজ মহাশয়কে সহসা উপস্থিত হইতে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত ও আনন্দিত হইল। কবিরাজ মহাশয় ক্ষণকাল ধীরভাবে রোগীর দিকে এবং রোগীর সহধর্ম্মিণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, একবার গম্ভীর ভাবে রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার বিষাদাচ্ছন্ন মুখমণ্ডল হর্ষপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি ভক্তিভরে জাহ্নবী দেবীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মা, ইহাঁকে 'তীরস্থ' করিবার উপদেশ কে দিল? তুমি সাক্ষাৎ সাবিত্রী স্বরূপা। তোমার বৈধব্য ঘটাইবার ক্ষমতা স্বয়ং যমরাজেরও নাই। ইহাঁকে ঘরে ফিরাইয়া লইয়া চল। ইহাঁর মৃত্যুর এখনও বহুবিলম্ব আছে।"

সমবেত জনতা বিস্ময়ে গুঞ্জন করিয়া উঠিল। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়ের বিজ্ঞ পুত্রগণ অবিশ্বাসভরে নীরবে মস্তক সঞ্চালন করিলেন।

জাহ্নবী দেবী উৎসাহ-ভরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, কবিরাজ মহাশয়ের মস্তকে হস্ত দিয়া বলিলেন, "বাবা আশীর্ব্বাদ করি চিরজীবী হও। কিন্তু অভাগিনী বৃদ্ধাকে আশা দিয়া নিরাশ করিও না।"—বলিতে বলিতে তাঁহার বিশাল নেত্র-প্রান্ত বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল।

কবিরাজ আবেগভরে কহিলেন, "মা, ভাগীরথী সাক্ষী। যদি পণ্ডিত মহাশয়কে আরোগ্য করিয়া ঘরে ফিরাইয়া না লইয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে আমার সমস্ত চিকিৎসাগ্রন্থ গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দিয়া, চিরদিনের মত ব্যবসায় পরিত্যাগ করিব।"

কবিরাজ মহাশয়ের মুখে এ কথা শুনিয়া সকলে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

সেই দিনই দেখিতে দেখিতে গঙ্গাতীরে পণ্ডিত মহাশয়ের আত্মীয় স্বজন এবং কবিরাজ মহাশয়ের জন্য কুটীর রচিত হইল। প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীতে প্রতিকক্ষ পূর্ণ হইয়া উঠিল। কবিরাজ মহাশয় চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিলেন। সপ্তাহের মধ্যেই রোগের বিশেষ উপশম দেখা দিল। পণ্ডিত মহাশয় কেবল বিদ্যাবুদ্ধির জন্য বিখ্যাত ছিলেন না। তাঁহার সঞ্চিত অর্থও যথেষ্ট ছিল।

কবিরাজ মহাশয় হাসিয়া বন্ধুদের বলিলেন, "দেখিলে, মা জাহ্নবী কত শীঘ্র আবার সুযোগ জুটাইয়া দিলেন। এবার আর ছাড়াছাড়ি নাই। এবার দেখিতে পাইবে আমার বিষয়-বুদ্ধি আছে কি না!"

একমাসের চিকিৎসায় পরপণ্ডিত মহাশয় সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। প্রায়শ্চিত্তান্তে তাঁহার ঘরে ফিরিবার সময় উপস্থিত হইল। তাঁহার পুত্রগণ কবিরাজ মহাশয়কে ধরিয়া বসিলেন, তাঁহাকে উপযুক্ত "বিদায়" গ্রহণ করিতে হইবে।

কবিরাজ মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়ই। এবারে আর ছাড়াছাড়ি নাই। কিন্তু আমি ত এরূপ ভাবে গোপনে 'বিদায়' লইব না। দেশের সমস্ত পণ্ডিত-মণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া সভা করিতে হইবে। সেই প্রকাশ্য সভায় আমি মনোমত 'বিদায়' চাহিয়া লইব।"

সকলে তাহাতেই সম্মতিদান করিলেন। কবিরাজ মহাশয় ভক্তিভরে জাহ্নবী দেবীর চরণধূলি গ্রহণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

পক্ষকাল পরে পণ্ডিত মহাশয়ের গৃহে বিরাট সভা আহূত হইল। দেশ-বিখ্যাত পণ্ডিত মহাশয়ের নিমন্ত্রণ কেহই উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। পণ্ডিত-মণ্ডলীর সমাগমে অধ্যাপক মহাশয়ের বিস্তৃত প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সকলে আগ্রহের সহিত কবিরাজ মহাশয়ের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে শুভ্রপরিচ্ছদ-শোভিত কবিরাজ মহাশয় হর্ষদীপ্ত মুখে সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া ভক্তিভরে পণ্ডিতমণ্ডলীকে অভিবাদন করিলেন। তুমুল আশীর্ব্বাদ ও সাধুবাদ ধ্বনিতে সভামণ্ডপ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

পণ্ডিত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্যামাচরণ স্মৃতিরত্ন পরম সমাদরে কবিরাজ মহাশয়কে উপবেশন করাইয়া, উচ্চকণ্ঠে সমাগত সভ্যবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলি, কবিরাজ মহাশয় আমাদের পূজনীয় পিতৃদেবের প্রাণরক্ষা করিয়া আমাদের অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। আমি আপনাদের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, তিনি অদ্য এই সভাস্থলে আমাদের নিকট যে কোন 'বিদায়' প্রার্থনা করিবেন, আমরা প্রাণপণে তাঁহার সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিব। এক্ষণে তিনি আপনাদের সম্মুখে নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করুন।"—সকলে কৌতূহলের সহিত কবিরাজ মহাশয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

কবিরাজ মহাশয় ধীরে ধীরে দণ্ডায়মান হইয়া প্রফুল্ল মুখে কহিলেন, "একবার জননী জাহ্নবী দেবীকে এই সভায় উপস্থিত হইতে হইবে। আমি তাঁহার সম্মুখে আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিব।"—সকলে সবিস্ময়ে কবিরাজ মহাশয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কিছুকাল পরে সিন্দুরশোভিত-সীমন্তা, পট্টবস্ত্র-পরিহিতা সাক্ষাৎ সাবিত্রীরূপিণী জাহ্নবী দেবী ধীরে ধীরে সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দেবীসদৃশী মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে নীরবে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

শ্যামাচরণ ক্ষণকাল পরে কবিরাজ মহাশয়ের দিকে চাহিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "এইবার কবিরাজ মহাশয় আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন।"

কবিরাজ মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া, ক্ষণকাল অনিমেষ লোচনে জাহ্নবী দেবীর মাতৃমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া থাকিয়া করযোড়ে গদগদকণ্ঠে কহিলেন, "মা, আমি শিশুকাল হইতে মাতৃহীন। মাতৃস্নেহলাভের সৌভাগ্য আমার জীবনে ঘটে নাই। আজ এই প্রকাশ্য সভাস্থলে আপনি এই অধমকে আপনার পুত্র বলিয়া গ্রহণ করুন। আমার চিরজীবনের স্নেহপিপাসা আজ আপনার কৃপায় চরিতার্থ হউক।"—বলিতে বলিতে কবিরাজ মহাশয় ভক্তিভরে জাহ্নবী দেবীর চরণতলে পতিত হইলেন। জাহ্নবী দেবী বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে "বাবা আমার" বলিতে বলিতে তাঁহাকে উঠাইয়া লইয়া স্নেহভরে তাঁহার শিরশ্চুম্বন করিলেন।

"সাধু সাধু" রবে সমস্ত সভাস্থল কম্পিত হইয়া উঠিল। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সকলের চক্ষু অজ্ঞাতসারে সজল হইয়া উঠিল!

পথে যাইতে যাইতে কবিরাজ মহাশয় বন্ধুদের বলিলেন, "কেমন? এবার আর কাহারও বলার যো নাই যে ঠকিয়াছি। শৈশবের হারানো মাতৃস্নেহ আজ নিজের চেষ্টায় ফিরাইয়া আনিয়াছি।"—বলিতে বলিতে

তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত বিশাল চক্ষু মুহূর্ত্তে সজল হইয়া উঠিল। বন্ধুরা কেহই তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিতে পারিল না।

৪

এবৎসর জগদ্ধাত্রীপূজা মহোৎসবে সম্পন্ন হইয়া গেল। পূজার পর হইতে কবিরাজ মহাশয়ের সংসারিক ব্যাপারে অধিকতর অনাস্থা দেখা যাইতে লাগিল। এখন হইতে তাঁহার অধিকাংশ সময়ই পূজা অর্চ্চনাতেই কাটিতে লাগিল। নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত তাঁহার বাহিরে যাওয়া বন্ধ হইয়া গেল।

বন্ধুবান্ধবেরা অনুযোগ করিলে কবিরাজ মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "চিরদিন ত এপারে থাকা চলিবে না। পরপারের সম্বলও ত কিছু সংগ্রহ করা চাই।" বন্ধুরা "কি যে বলেন"—বলিয়া অবিশ্বাসের হাসি হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

রাসপূর্ণিমার প্রভাত। প্রকৃতির জলে স্থলে সর্ব্বত্র মিলনের রাগিণী বাজিয়া উঠিয়াছে। মানবের শূন্য হৃদয় থাকিয়া থাকিয়া জীবন-দেবতার জন্য অজ্ঞাতসারে হাহাকার করিয়া উঠিতেছে। ভক্তকণ্ঠে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা কাঁদিয়া গাইতেছে—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল!
লাখলাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু,
তবু হিয়া জুড়ান না গেল!"

সহসা কবিরাজ মহাশয় গ্রামের সমস্ত বন্ধু বান্ধবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

সকলে আসিয়া দেখিল, কবিরাজ মহাশয় স্নান ও পূজা সমাপ্ত করিয়া পট্টবস্ত্র ও নামাবলী ধারণ করিয়া চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া একাগ্রচিত্তে ভগবানের নাম-জপ করিতেছেন।

সকলে উপস্থিত হইলে তাঁহাদের সাদরে আপনার নিকট বসাইয়া কবিরাজ হাসিয়া বলিলেন, "আমার ডাক পড়িয়াছে। তাই বিদায় লইবার জন্য তোমাদের ডাকিয়া পাঠাইয়াছি। আমি এখনি নবদ্বীপ যাত্রা করিব। সত্বর আমার গঙ্গা-দর্শনের ব্যবস্থা করিয়া দাও।"

সকলে বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে কি? আপনি কি বলিতেছেন? এমন সুস্থ সবল শরীর!"

কবিরাজ ক্ষীণ হাসি হাসিয়া, আপনার নাড়ী দেখিয়া বলিলেন, "জীবনে কখনও নাড়ী দেখিতে ভুল করি নাই। আজ কেবল নিজের বেলাতেই ভুল হইবে? তোমরা ইতস্ততঃ করিও না। শীঘ্র যাইবার ব্যবস্থা কর। আজ একপ্রহর রাত্রির মধ্যে আমার মৃত্যু অনিবার্য্য।"

বিস্ময়ে ও বিষাদে অভিভূত বন্ধুমণ্ডলী অগত্যা তাঁহারা গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

মুহূর্ত্তমধ্যে এই নিদারুণ সংবাদ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। শুনিয়া সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল। তারপর দলে দলে লোক আসিয়া কেহ আশীর্ব্বাদ, কেহ প্রণাম, কেহ প্রীতিসম্ভাষণ করিতে লাগিল। কবিরাজ মহাশয় হাস্যমুখে সকলকে যথোচিত উপদেশ দিয়া, প্রত্যেকের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা ও বিদায় গ্রহণ করিলেন। বেলা দুই প্রহরের সময় তিনি শিবিকা-যোগে নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন। গ্রামের সমস্ত বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষবৃন্দ কেহ বা সংকীর্ত্তন করিতে করিতে, কেহ বা উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নামোচ্চারণ করিতে করিতে, এবং কেহবা হাহাকার করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিল। যাইতে যাইতে জনতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

অপরাহ্ণে এই বিপুল জনস্রোত নবদ্বীপের ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হইল। তুমুল হরি-ধ্বনি ও নাম সংকীর্ত্তনের শব্দে চারিদিক নিনাদিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাকালে পূর্ণচন্দ্র সমুদিত হইলেন। ক্ষণমধ্যে জলস্থল রজত-কিরণে প্লাবিত হইয়া গেল। ভাগীরথীর উদ্বেল বক্ষ সহস্র তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া উঠিল।

কবিরাজ মহাশয় সায়ংসন্ধ্যা সমাপনান্তে ধীরে ধীরে উত্থান করিয়া, সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর পদধূলি গ্রহণ করিলেন। তাহার পর ভক্তিভরে নামজপ

করিতে করিতে ধীরে ধীরে ভাগীরথীর জলমধ্যে অবতরণ করিয়া, কটি-পরিমাণ জলে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন।

সমবেত জনতা তীরদেশে নির্ব্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল কবিরাজ মহাশয় অটলভাবে জপ করিতে লাগিলেন। তাহার পর, তাঁহার উন্নত দেহ কয়েকবার গভীর নিশ্বাসে কাঁপিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে তাঁহার উন্নত মস্তক সন্তাপহারিণী ভাগীরথীর বক্ষের উপর ধীরে ধীরে ঢলিয়া পড়িল।

তুমুল হরিধ্বনিতে জলস্থল কাঁপিয়া উঠিল। স্বজাতিবৃন্দ দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া তাঁহার প্রাণহীন দেহ তুলিয়া আনিয়া নদীসৈকতে রক্ষা করিল। ভাগীরথীর প্রশস্ত বক্ষে এবং শ্বেত বালুকাতটে জোৎস্নার হিল্লোল এবং কবিরাজ মহাশয়ের পাপলেশহীন উজ্জ্বল বদনে শান্তি ও আনন্দের স্নিগ্ধ আলোকচ্ছটা। পতিতপাবনী ভাগীরথীর প্রসন্ন সলিলের সহিত নিঃস্বার্থ জীবনের সমুজ্জ্বল আনন্দ-ধারার কি অপূর্ব্ব সমাবেশ!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

দাক্ষিণাত্যে ভূত ও ভূতের ওঝা

বাঙ্গালা দেশের নিভৃত পল্লীগ্রামগুলি অন্বেষণ করিলে আজিও দুই-চারিজন ভূতের ওঝা মিলে। কাহাকেও ভূতে পাইলে অথবা কাহারও উপর উদেবতা "ভর" করিলে তাহারা আসিয়া দুই-একটা দুর্ব্বোধ্য মন্ত্র আওড়াইয়া, হলুদ পোড়াইয়া, সরিষা চালান দিয়া এবং আরও কত কি করিয়া ঘাড়ের ভূত নামাইয়া কিছু দক্ষিণা লইয়া চলিয়া যায়। এই সব প্রক্রিয়ায় বিফলমনোরথ হইলে ওঝাকে প্রায়ই একটা বড় সহজ উপায় অবলম্বন করিতে দেখা যায়। বেড়ী কিংবা একটা লৌহশলাকা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া, মন্ত্র আওড়াইয়া ভূতাবিষ্ট ব্যক্তির অঙ্গে ওঝা যেই ছেঁকা দিতে যায়, অমনি ভূত অদৃশ্য হয়, ঐ ব্যক্তিও প্রকৃতিস্থ হয়। কথায় বলে, "মারের চোটে ভূত পালায়।" কথাটার সার্থকতা এইস্থানে দেখা যায়।

বাঙ্গালা দেশে ওঝার অস্তিত্ব থাকিলেও, ওঝা বলিয়া কোন সম্প্রদায় নাই। সরকারী আদম সুমারির-রিপোর্টে ভূতের ওঝা কি যাদুকর বলিয়া কোন শ্রেণীবিশেষ কিংবা

জুমাদি ভূতের প্রতিমূর্ত্তি

জাতিবিশেষের উল্লেখ পাওয়া যায় না। যে ব্যক্তি প্রকৃত ওঝা, সেও ওঝা বলিয়া নিজের পরিচয় দেয় না। বোধ হয় ইহা সভ্যতা-বিস্তারের ফল। কিন্তু মান্দ্রাজের ১৯০২ খৃঃ অব্দের আদম-সুমারির (Census) রিপোর্টে, দক্ষিণ কানারার "নলকি", "পরভ" ও "পম্পদ" জাতি এবং মালাবারের "পানন" ও "মালয়" জাতিরা যাদুকর ও ভূতের ওঝা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহারা বঙ্গদেশের ওঝাদের মত নহে,—ইহাদের কিছু বিশেষত্ব আছে।

দক্ষিণ কানারা ও মালাবারের যাদুকরেরা নানারূপ যাদু দেখাইয়া ও ভূত ছাড়াইয়া অজ্ঞ লোকের নিকট নিজেদের একটু প্রতিপত্তি স্থাপিত করিয়া বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করে।

দাক্ষিণাত্যের ভূতবিদ্যা সম্বন্ধে ত্রিবাঙ্কুরের সেন্সস কমিসনার ১৯০১ খৃঃ অব্দে লিখিয়াছেন, মালাবারবাসিদের মধ্যে তিন প্রকার ভূতবিদ্যা প্রচলিত আছে—(১) যাদুমন্ত্রের দ্বারা অন্যের খাদ্যদ্রব্য বিষাক্ত করা; (২) কুত্তিচাত্তন নামক ক্ষুদ্র ভূতকে নিযুক্ত করিয়া লোকের অনিষ্টাচরণ করা এবং (৩) মন্ত্রের দ্বারা ভূতপ্রেত লোকের বাড়ীতে চালান দিয়া তাহাদের নানারূপ রোগ জন্মাইয়া দেওয়া।

মালয়জাতীয় ভূতের ওঝা

মালাবারের আর এক প্রকার ভূতের কথাও

কৰ্ত্তিতমুণ্ড মোরগ মুখে মালয়জাতীয় ভূতের ওঝা

সেন্সস কমিসনর লিখিয়াছেন। এই ভূত হৃষ্টপুষ্ট, দেখিতে এগারো বার বৎসরের বালকের ন্যায়, দেহবর্ণ মসী-নিন্দিত। ইনি লোককে বিরক্ত করিতে বড় ভালবাসেন, কিন্তু নারীর প্রেমে সহজে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। এই শ্রেণীর ভূতগুলি মালাবারের যাদুকর-ব্রাহ্মণগণের অস্ত্রস্বরূপ। তাঁহারা ইচ্ছামত যে কোন ব্যক্তির উপর এই অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এই ভূতেরা শেক্ষপিয়রের এরিয়েলের (Ariel) মত সুচতুর, সদা কার্য্যতৎপর ও প্রভুর আজ্ঞাবহ। প্রভুর আজ্ঞায় তাঁহারা যাহাদের ঘাড়ে চাপেন, তাহাদের অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। তাহাদের পরিধেয় বস্ত্রে আগুন লাগে, খাদ্যদ্রব্য হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়, শয্যা কণ্টকাকীর্ণ বলিয়া মনে হয়। যে স্থানেই থাকুক না কেন, তাহাদের চারিদিকে "ঢিল" পড়িতে থাকে, কিন্তু একটিও তাহাদের গায়ে লাগে না। এইরূপে বিরক্ত করিলেও এই ভূতেরা কখনও কাহারও গুরুতর অনিষ্ট করে না। চঙ্গনচেরীর কোন ব্রাহ্মণের এইরূপ শতাধিক 'চাত্তন' ভূত ছিল বলিয়া শুনা যায়। মূল্যবান জিনিষপত্র বাড়ীতে ইহাদের তত্ত্বাবধানে যেখানে খুসী ফেলিয়া রাখিলেও ইহাদের ভয়ে কোন ব্যক্তিই কোন জিনিষে হাত দিতে সাহসী হয় না। এই অদৃশ্য প্রহরীরা খুব

ভৌতিক নৃত্যের সাজে পরভ জাতীয় ভূতের ওঝা

সতর্কতার সহিতই প্রভুর জিনিষ পত্র রক্ষা করে। এই সব উপকারের প্রতিদান স্বরূপ ইহাদিগকে প্রচুর আহার দিতে হয়। আহার না যোগাইলে, কিংবা পরিমাণে তাহা কম হইলে তাহারা প্রভুকে তাহাদের অসীম ক্ষমতার কথা স্মরণ করাইয়া দিতে বিস্মৃত হয় না। প্রচুর খাদ্য পাইলেই তাহারা প্রভুর গোলাম হইয়া থাকে।

শুনা যায়, যাহারা এই সব ভূত-প্রেত দ্বারা অন্যের অনিষ্ট করিয়া বেড়ায়, তাহাদের নিজেরও গুরুতর অনিষ্ট হয়। তাহাদের প্রায়ই কোন সন্তান জন্মে না। পরিণামে শারীরিক ও মানসিক অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

যাদুকরেরা অনেক সময় মন্ত্রের দ্বারা মানুষের ঘাড়ে ভূত চাপায়। সাধারণতঃ রমণীদের স্কন্ধেই ভূত চাপিয়া বসে। ভূতাবিষ্ট বালিকার যৌবনোদ্ভেদ বড় বিলম্বে হয় এবং তাহারা প্রায় বন্ধ্যা কি মৃতবৎসা হইয়া থাকে।

ভৌতিক নৃত্যের সাজে পরভ জাতীয় ভূতের ওঝা

ভূত ছাড়াইবার জন্য ওঝার শরণাপন্ন হইতে হয়। ওঝা আসিয়া কিছুক্ষণ "ঝাড়া পোড়া" করিয়া গৃহস্বামীকে প্রায়ই জ্ঞাপন করে—এ বড় দুষ্ট ভূত, কিছুতেই রমণীকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে চায় না। তবে ইহার দৈনিক আহার ও বাসস্থানের কোনরূপ ব্যবস্থা করিলে সে রমণীকে ছাড়িয়া যাইতে প্রস্তুত আছে।—অনন্যোপায় হইয়া গৃহস্বামী ভূতের আহার ও বাসস্থানের জন্য মন্ত্রবাদীকে অবস্থানুসারে জমি অর্থ প্রভৃতি দিয়া সন্তুষ্ট করেন। রমণীর স্কন্ধ হইতে ভূতও তখন নামিয়া যায়।*

দক্ষিণ কানারাবাসীরা এক জাতীয় ভূতকে বড় ভয় করে। ইনি জুমাদি ভূত নামে অভিহিত। তাঁহার মুখের অংশের প্রতিমূর্ত্তি গড়াইয়া লোকে পূজা করে। দেখিতে তিনি বড় ভীষণ। তাঁহার উপরের দন্তপাটির দুই দিক দিয়া শূকরের দাঁতের ন্যায় দুইটি দন্ত বাহির হইয়াছে। আমাদের কালীদেবীর ন্যায় তাঁহারও জিহ্বা বাহির করা। চোখ দুইটা বড় ও টানা। মাথার চুলগুলি কোঁকড়ান। সুবৃহৎ নাসারন্ধ্রের নিম্নদেশ এক যোড়া বড় গুম্ফে শোভিত। মাটির কি "ডাকের" নানাবিধ গহনায় শোভিত করিয়া এই মূর্ত্তিকে পূজা করা হয়।

* Travancore Census Commissioner, 1901.

যাদুবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিবার জন্য দাক্ষিণাত্যের কোন কোন বর্ব্বর জাতি প্রথমগর্ভিণী রমণীর জরায়ু হইতে ভ্রূণ বাহির করিয়া লইয়া অনেকরূপ প্রক্রিয়া করিত। * তাহারা প্রথম জাত শিশুর মৃতদেহ কবর হইতে তুলিয়া আনিয়াও অনেক প্রক্রিয়া করে। সেই কারণে পারিয়া প্রভৃতি জাতিরা প্রথমজাত বালকের মৃতদেহ ঘরের ভিতরেই প্রোথিত করে। †

দাক্ষিণাত্যে শাসনবিভাগের রাজকর্ম্মচারী Mr. S. G. Roberts সাহেব লিখিয়াছেন—প্রথমজাত কোন শিশুর মৃত্যু হইলে যাদুকরদের ভয়ে তাহার মৃতদেহ প্রায়ই বাড়ীর সীমানার মধ্যে সমাহিত করা হয়। যাদুকরেরা কবর হইতে উঠাইয়া লইয়া মৃত শিশুর "মগজ" দিয়া এক প্রকার কাজল ও তৈল প্রস্তুত করে।

ভৌতিক নৃত্যের সাজে নলকি ভূতের ওঝা

দূরবর্ত্তী কোন লোককে বধ করিবার জন্য কিংবা কোন রমণীর ভালবাসা আকর্ষণ করিবার জন্য তাহারা এই তৈল ও কাজল ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যে শিশুর মগজ হইতে যাদুকরেরা তৈল কিংবা

*"মানসী ও মর্ম্মবাণী", "নরবলি" প্রবন্ধ, মাঘ ১৩২৪, ৬২৯ পৃঃ।

† Rev. A. C. Clayton, Madras Museum Bull. 1906, V, No. 2, 82.

ভৌতিক নৃত্য

কাজল প্রস্তুত করে, সেই শিশুর মাতার মৃতবৎসা দোষ জন্মিয়া যায়। অনেক সময় মৃত শিশুর মাথার খুলিতে একটা ছিদ্র করিয়া উহাকে করব দেওয়া হয়। তাহাদের বিশ্বাস, এইরূপ সছিদ্রমস্তক শিশুর মগজ যাদুকরের কোন কাষেই লাগে না।

ত্রিচিনোপলি জেলার পুলিস-কর্ম্মচারীরা একবার কোন যাদুকরের সাজ-সজ্জা রবার্টস সাহেবের নিকট লইয়া আসিয়াছিল। এই সাজ-সজ্জার মধ্যে, তালপাতার উপর তামিল ভাষায় উল্টা অক্ষরে লিখিত অনেক ভূতের মন্ত্র ছিল এবং উহা পড়িবার জন্য একখানি দর্পণও পাওয়া গিয়াছিল। উল্টা অক্ষরে লিখিত মন্ত্রেরই শক্তি নাকি খুব বেশী। একটা ছোট টিনের কৌটায় মৃত শিশুর মগজ হইতে প্রস্তুত কিছু কজ্জলও পাওয়া গিয়াছিল।

শনিবার রাত্রে ভূতাশ্রিত কোন গাছের পাদদেশে একটি ছোট বেদী নির্ম্মাণ করিয়া, যাদুকর কোন অনূঢ়া বালিকার মৃতদেহ সেই বেদীর উপর স্থাপিত করে। পরে মৃতদেহের উপর "ওঁ হ্রীং হ্রোং" মন্ত্র একশত বার জপ করে। জপ শেষ হইলে মৃতদেহ ভূতাবিষ্ট হইয়া উঠিয়া বসে। মদ্য ও মাংসের দ্বারা ভূতের ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর করিয়া, তাহাকে যে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হউক না কেন, সে তাহার যথাযথ উত্তর করিয়া থাকে। এইরূপ ভূতবিদ্যার আলোচনা মালাবার প্রদেশেই দেখা যায়। *

বেলারী জেলার কোন লোক পীড়িত হইলে, তে-মাথা পথে এক প্রকার যন্ত্র অঙ্কিত করা হয়। লোকের বিশ্বাস—এই যন্ত্র যে ব্যক্তি প্রথম পদ-দলিত করিবে, পীড়িতের রোগ তাহারই শরীরে প্রবিষ্ট হইবে। †

কোন রোগ যখন দুরারোগ্য বলিয়া মনে হয় তখন

* Walhouse, Ind. Ant. 1876 V, 22.

† Gazetteer of the Bellary Dist. 1904.

দক্ষিণ আর্কট জিলার লোকেরা সময় সময় যাদু-করের আশ্রয় লইয়া নিরাময় হইতে চেষ্টা করে। যাদুকর প্রথমে একটা নূতন হাঁড়ি পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া মুছিয়া উহার ভিতর হরিদ্রারঞ্জিত চাউল, তুলার বীজ এবং আরও অনেক দ্রব্য রাখে। তৎপরে নিশীথ রাত্রে একটা প্রজ্জলিত শলিতা এবং ঐ হাঁড়িটা অতি সংগোপনে কোন তে-মাথা পথে লইয়া যায়। তথায় মন্ত্রপাঠ করিয়া হাঁড়িটা ভাঙ্গিয়া ফেলে। এইরূপ করিলে পীড়িত ব্যক্তি নাকি ব্যাধিমুক্ত হয়। লোকের একটা বিশ্বাসও আছে যে পরদিবস প্রত্যূষে ঐ ভাঙ্গা হাঁড়িটা যাহার চোখে পড়িবে, তাহার শরীরেই ঐ দুষ্ট রোগ প্রবেশ করিবে।*

Fawcett সাহেব লিখিয়াছেন—ভূতাবিষ্ট ব্যক্তিকে ওঝা রাত্রে গ্রামের সীমানায় লইয়া যায়। তথায় চাউল, কয়লা ও অন্য দ্রব্যের গুঁড়া দিয়া মাটিতে একটা মূর্ত্তি অঙ্কিত করে। এই সব চূর্ণের দ্বারা কয়েকটা পিণ্ডও প্রস্তুত করে। মূর্ত্তির হাতে, পায়ে ও তলপেটে এই পিণ্ডগুলি, কিছু নারিকেলের খোলা, কয়েকটা পাণ ও কতকগুলি সিকিও স্থাপিত করে। পায়ের পাতা হইতে একটু দূরে কিছু অন্ন, দধি ও শাক রাখিয়া দেওয়া হয়। মূর্ত্তির উপর কিছু চুণ ও এক প্রকার শস্যও ছড়াইয়া দেওয়া হয়। ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিকে মূর্ত্তির মাথার কাছে বসাইয়া ওঝা মন্ত্রপাঠ করিতে থাকে। পরে একটা মেষ বলি দিয়া তাহার মস্তকটা মূর্ত্তির পায়ের কাছে রাখা হয়। ভূতের তুষ্টির জন্য কর্পূর ও ধূপ পোড়ান হয়। মূর্ত্তির উপরে স্থাপিত একটা বাটি মদে পরিপূর্ণ করিয়া বোতলটা উহার মাথার কাছে রাখা হয়। মূর্ত্তির উপরের চুণ দ্বিখণ্ডিত করিয়া দুইটা নারিকেল ভাঙ্গা হয়। ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিকে মূর্ত্তির বামদিক দিয়া উহার পায়ের দিকে লইয়া যাওয়া হয়। ঐ স্থান হইতে ঐ ব্যক্তিকে দক্ষিণ দিক দিয়া কয়েক পদ মূর্ত্তির মস্তকের দিকে, পরে কয়েক পদ বামে, পুনরায় মূর্ত্তির পায়ের দিকে আনিয়া উহাকে গৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ঐ ব্যক্তি আর মূর্ত্তির দিকে ফিরিয়া দৃষ্টিপাত করে না। এই রূপে ঐ ব্যক্তির ভূত ছাড়ান হইয়া থাকে।*

গোবিন্দ নাম্বিয়র মহাশয় মালাবার দেশের ভূত ছাড়ান সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—গ্রামের "হাতুড়ে" বৈদ্য যখন রোগ ধরিতে পারে না, কিম্বা যখন তাহার ঔষধে রোগের কোন উপশম হয় না, তখন তাহার পরামর্শে কোন গণককে ডাকা হয়। তিনি আসিয়া প্রথমে রোগীকে কিছুক্ষণ পরীক্ষা করেন। পরে বলেন যে

কালিকটের সমুদ্রতীরে প্রাপ্ত দারুময় স্ত্রীমূর্ত্তি

* Gazetteer of the South Arcot Dist. 1906.

* Journal Anthrop. Soc. Bombay, ii, 1890, pp. 282-5

রোগীকে ভূতে পাইয়াছে। অতএব ওঝার ডাক পড়ে। ওঝা প্রথমে নিজে না আসিয়া তাহার শিষ্যদের পাঠাইয়া দেয়। শিষ্যেরা যখন কিছুতেই ভূতকে "বাগে" আনিতে পারে না, তখন মন্ত্রবাদী স্বয়ং আসিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং "ভূতের নাচের" জন্য একটা দিন ঠিক করিয়া ফেলেন। পরে ঐ নির্দ্দিষ্ট দিনে নানারূপ দুর্ব্বোধ্য যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া, ঐ যন্ত্রগুলির ঠিক মধ্যদেশে এক ভীষণ ভূতের মূর্ত্তি অঙ্কিত করেন। কথনও বা মূর্ত্তি অঙ্কিত না করিয়া, সুরঞ্জিত অন্নের দ্বারা ভূতের প্রতিমূর্ত্তি গড়া হয়। এই মূর্ত্তির মাথার কাছে রোগীকে বসান হয়। শরীরের গ্রন্থিগুলিতে ছোট ছোট লাঠি বাঁধিয়া ও পশুবিশেষের লোম, চামড়া, লেজ প্রভৃতিতে অদ্ভুত ভাবে সজ্জিত হইয়া ওঝা স্বয়ং রোগীর সম্মুখে, মূর্ত্তির অপরদিকে উপবেশন করিয়া অনবরত ভূতের মন্ত্রপাঠ করিতে থাকেন। পরে কয়েকটি মোরগ বলি দিয়া উহাদের রক্তে ভূতের প্রতিমূর্ত্তিকে স্নান করান। শেষে ঢাকের বাজনার তালে তালে বাঁশীর শব্দের সহিত মন্ত্রবাদী অদ্ভুত ভঙ্গি করিয়া নৃত্য করিতে থাকেন। নাচিতে নাচিতে যখন একরূপ উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠেন, তখন দুইচারিটা জীবন্ত মোরগ দাঁতে করিয়া চিরিয়া তাহাদের রক্ত পান করেন। *

দক্ষিণ কানারার পরভ জাতীয় ওঝাদিগের সাজ বড় অদ্ভুত। ভূতশান্তি করিতে যাইবার সময় উহাদের কেহ বা মাদুর কিংবা অন্য কোন হাল্‌কা দ্রব্যে নির্ম্মিত ৫।৬ ফুট উচ্চ একটি চূড়া মাথায় পরে। এই চূড়ায় অনেকরূপ যন্ত্র ও নানা আকারের সর্প অঙ্কিত থাকে। কেহ বা ভীষণদর্শন ভূতের সাজে সজ্জিত হইয়া ভূতাবিষ্টের সম্মুখে নানা ভঙ্গিতে নৃত্য করিয়া কল্পিত ভূতের সহিত লড়াই করে। অবশেষে তাহাকে পরাজিত করিয়া ইচ্ছানুরূপ স্থানে পাঠাইয়া দেয়।

'নলকি' জাতীয় ওঝারাও ভূতের ছদ্মবেশ ধারণ

ভূত-ছাড়ান

---

* Indian Review, May 1900.

করিয়া ভূতের মন্দিরে প্রথমে ভূতের পূজা করে। কতকগুলি ভূত আবার কেবল পূজাতেই তুষ্ট হয় না, রক্তপাত করিয়া তাহাদের তৃপ্তিসাধন করিতে হয়। তজ্জন্য ওঝা প্রথমে দুই-চারিটা মোরগ বলি দিয়া ভূতকে তৃপ্ত করে। পরে মন্ত্র আওড়াইয়া নানা ভঙ্গিতে নৃত্য করিয়া ভূতগ্রস্ত ব্যক্তির স্কন্ধ হইতে ভূত নামাইয়া ফেলে।

অনেক ভূতুড়ে ওঝা পায়ে ঘুঙর পরে। যে বিশেষ ভূতকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে, নাচিয়া নাচিয়া তাহার স্তুতিগান করে। এইরূপে তাহারা ভূতশান্তি করিয়া থাকে।

মালাবার দেশে যাদুকরেরা কি প্রকারে শত্রুবধ করে তাহা Fawcett সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন—সোনা, রূপা কি অন্য কোন ধাতুর পাতে নানাপ্রকার দুর্বোধ্য যন্ত্র আঁকিয়া, শত্রুর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করা হয়। এই যন্ত্র আর একখানি পাতে মুড়িয়া, ঐ শত্রুর যাতায়াতের পথে কোন স্থানে মাটির মধ্যে পুঁতিয়া রাখা হয়। সেই স্থান দিয়া চলিয়া যাওয়ার পর হইতেই ঐ ব্যক্তির শরীরের মধ্যে যাদুমন্ত্রের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। ঐ ব্যক্তি দিন দিন একটু একটু করিয়া শুকাইতে থাকে। অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া হতভাগ্য অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।*

১৯০৫ খৃঃ ১৮ই নভেম্বর তারিখের "মান্দ্রাজ মেল" নামক সংবাদ পত্রে অন্য আর এক রকমেও দাক্ষিণাত্যে "শত্রুমারণ" ক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছিল। যে ব্যক্তির অনিষ্ট করিতে হইবে, ময়দা, মাটি কি অন্য কোন নরম জিনিষ দিয়া তাহার প্রতিমূর্ত্তি গড়ান হয়। লোক-টির যে যে অঙ্গের হানি করা অভিপ্রেত, প্রতিমূর্ত্তিরও সেই সেই অঙ্গে মন্ত্রপূত লৌহ শলাকা প্রবেশ করান হয়। যেমন কোন ব্যক্তির দক্ষিণ অঙ্গ ব্যাধি-গ্রস্ত করা অভিপ্রেত হইলে, প্রতিমূর্ত্তির দক্ষিণ অঙ্গে লৌহ শলাকা প্রবেশ করাইতে হইবে, উন্মাদগ্রস্ত করিতে হইলে প্রতিমূর্ত্তির মাথার মধ্যে লৌহ শলাকা বিদ্ধ করিতে হইবে ইত্যাদি। তাহার পর যাদুকর অনেক রূপ মন্ত্র আওড়াইয়া নিশীথ রাত্রে মূর্ত্তিটাকে কোন শ্মশানে ভূগর্ভে রাখিয়া দেয়। অনেক সময় এইরূপ প্রতিমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে, সদ্যঃসমাহিত কোন শিশুকে কবর হইতে বাহির করিয়া আনিয়া, ঐ মৃতদেহে পূর্ব্বোক্তরূপে লৌহ শলাকাদি প্রবেশ করাইয়া পুনরায় সমাহিত করে। যতদিন এই মূর্ত্তি ভূগর্ভে থাকে, ততদিন ঐ ব্যক্তির অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে থাকে; এবং কোনরূপ প্রতিক্রিয়া না করিলে নানারূপ যন্ত্রণা পাইয়া লোকটির ভবযন্ত্রণা শেষ হইয়া যায়। সুতরাং ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পাইবামাত্র ঐ ব্যক্তি অপর আর এক যাদুকরের শরণাপন্ন হয়। মন্ত্রের শক্তিতে যাদুকর ভূগর্ভ হইতে প্রতিমূর্ত্তিটাকে তুলিয়া আনিয়া, উহার শরীর হইতে মন্ত্রপূত লৌহ শলাকা-গুলি বাহির করিয়া ফেলে। এই প্রতিক্রিয়ার ফলে লোকটিও দিন দিন সুস্থ হইতে থাকে।

১৯০৩ খৃঃ অব্দে কালিকটে একটা কাঠের স্ত্রীমূর্ত্তি ভাসিয়া আসিয়াছিল। তাহার পদদ্বয় উল্টা দিকে ফিরানো; বাম কর্ণটি ছিন্ন; নাভির ঠিক উপরের একস্থান চৌকোণা করিয়া কাটা। মূর্ত্তির প্রায় সব অঙ্গে আরবী ভাষায় লিখিত যাদুমন্ত্র। মাথায় ও অন্যান্য অঙ্গে লৌহ শলাকা বিদ্ধ। ইহা দেখিয়া কেহ কেহ বলিয়াছিলেন যে এই প্রতিমূর্ত্তি কোন যাদুকরীর; তাহার যাদুর শক্তি ব্যর্থ করিবার জন্য মূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গে যাদুমন্ত্র লিখিত হইয়াছে এবং তাহাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য মূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গে লৌহ শলাকা বিঁধিয়া জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছে।*

অনেক ব্যবসাদার ভূতের ওঝা আবার কোন না কোন মন্দিরের পূজারী। কোনও রমণীকে ভূতে পাইলে নিশীথ রাত্রে তাহাকে মন্দিরে আনয়ন করে। ভূতকে পূজারী বা ওঝা জিজ্ঞাসা করে সে কি রকম ভূত, কেন সে ঐ স্থানে আসিয়াছে এবং কি হইলে সে রমণীকে ছাড়িয়া যাইবে। রমণী

* Madras Museum Bull. 1900, iii, No I, 5.

* Nature, 18th Oct. 1906.

উন্মত্তের মত এদিক ওদিক লাফাইতে থাকে। এই অবস্থায় ভূত রমণীর মুখ দিয়া ওঝার প্রশ্নগুলির উত্তর দেয়। উত্তর না দিলে ওঝা বেত দিয়া রমণীকে প্রহার করিতে থাকে। প্রহারের জ্বালায় অস্থির হইয়া অবশেষে রমণী উত্তর দেয়। পরে তাহার কথা-মত পূজা দেওয়া হয়। পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া ভূত যখন রমণীকে ছাড়িয়া যাইতে স্বীকার করে, তখন রমণীর মাথায় একখণ্ড বড় পাথর চাপাইয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে বলা হয়। রমণী বেগে স্থানত্যাগ করে; গমনের বেগে পাথরখানি তাহার মস্তক হইতে যে স্থানে পড়ে, সেই স্থানেই ভূতটা থাকিয়া যায় বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস। ভূতকে সেই স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য নিকটবর্ত্তী কোন বৃক্ষে রমণীর একগুচ্ছ চুল পেরেক দিয়া পুঁতিয়া রাখা হয়। *

ভূত ছাড়াইবার সময় কোন কোন ওঝার উপর মন্দিরের দেবতা "ভর" করেন। ওঝা তখন অনেক কথা বকিয়া যায়। এই কথাগুলি অন্য লোকে দৈববাণী বলিয়া গ্রহণ করে। ভূতগ্রস্ত রমণীর গলায় দেবতার নির্ম্মাল্য দিয়া গাঁথা একগাছি মালা পরাইয়া ওঝা রমণীর মাথার চারিদিকে মন্ত্রপূত একটা ময়ূরপুচ্ছ ঘুরাইতে থাকে। লোকের বিশ্বাস, ওঝার ময়ূরপুচ্ছকে ভূতপ্রেত প্রভৃতি উপদেবতারা বড় ভয় করে। এই-রূপে রমণী ভূতের কবল হইতে মুক্তি পায়।

ওঝারা অনেক সময় চিকিৎসকের কাযও করে। পীড়ার হেতু অদ্ভুতরূপে আবিষ্কার করিয়া তাহারা রোগ সারিয়া দেয়। Rev. J. Cain সাহেব গোদাবরী জেলার কোন ওঝাকে 'কোয়ি' জাতীয় এক ব্যক্তির রোগের কারণ নির্দ্ধারণ করিতে স্বচক্ষে দেখিয়া লিখিয়া-ছেন—রোগীকে কোন স্থানে বসাইয়া, ওঝা তাল-পাতার পুঁথির একখানা পাতা হাতে লইয়া পড়িতে পড়িতে রুগ্ন ব্যক্তিকে কয়েকবার প্রদক্ষিণ করে। পরে লাঠির দ্বারা মাটিতে নানাবিধ যন্ত্র অঙ্কিত করে এবং গান করিয়া নাচিতে নাচিতে পুনরায় রোগীকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। রোগী ওঝার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। হঠাৎ রোগীর দিকে সে অগ্রসর হইয়া রোগীর পিঠের দুই তিন স্থানে খুব জোরে কামড়াইয়া দেয়। পরে সমবেত লোক-দিগকে নানারকমের কতকগুলি শস্য দেখাইয়া বলে যে রোগীর পিঠ হইতে এই শস্যগুলি পাওয়া গিয়াছে, এবং ইহাই রোগের একমাত্র কারণ।

যাদুকরদের অনেকরূপ নিগ্রহও সহ্য করিতে হয়; কারণ লোকের বিশ্বাস, ইহারাই রোগ কি ভূত প্রেত চালান দিয়া লোকের অনিষ্ট করে। তবে যদি ইহাদের সম্মুখের দাঁত কোনরূপে ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে আর তাহারা স্পষ্ট করিয়া যাদুমন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারে না। ইহাদের বিশ্বাস মন্ত্র স্পষ্টরূপে উচ্চারিত না হইলে কোনই ফল হয় না। তাই তাহারা সুযোগ পাইলেই, লোকের অনিষ্টকারী যাদুকর-দিগকে ধরিয়া বাঁধিয়া, তাহাদের সম্মুখের দন্ত উৎপাটন করিয়া ফেলে।

Mr. S. P. Rice সাহেব তাঁহার "Occasional Essays on Native South Indian Life" নামক পুস্তকে ওরিয়াদের (Orias) সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—একটি বালিকা পীড়িত হইয়া তাহার আত্মীয় স্বজনদের বলে যে স্থানীয় কোন যাদুকর তাহাকে "যাদু" করিয়াছে। লোকটির নামও বালিকা তাহাদিগকে বলিয়া দেয়। তাহারা লোকটিকে বলপূর্ব্বক তাহার বাড়ী হইতে রাস্তায় টানিয়া আনিয়া, তাহার বুকের উপর উপবেশন করিয়া, হাতুড়ি ও সাঁড়াসি দিয়া সম্মুখের দুইটা দাঁত উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিল।

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

* Gazetteer of the Madura Dist. 1906, i.

কবির প্রিয়া

উঠেছিলে কবে সিন্ধু-মথনে,
অয়ি নিখিলের কবির প্রিয়া!
কোন্ সে নবীন স্বজন-উষায়
চিত্ত-সাগর হিল্লোলিয়া!—
আঁখির পলকে মিলাল আঁধার,
আনন্দে ধরা উঠিল হাসি,
রিণিকি ঝিনিকি হেম-মঞ্জীরে
জাগিল মোহন ছন্দোরাশি;
কল্লোল জাগে উর্ম্মিমালায়,
বিহগ-কণ্ঠে কাকলী ফোটে,
মর্ম্মর জাগে অটবী লতায়,
গুঞ্জনে বায়ু গাহিয়া ওঠে;
চাহে আঁখি মেলি মুগ্ধ মানব—
নিরখি' পুলকে আপনহারা,
হৃদয়-গুহায় রুদ্ধ রাগিণী
কল্লোলি' বহে নির্ঝরধারা;
মূকের কণ্ঠে উথলায় গান;
ভক্তের মত জুড়িয়া পাণি
গাহে শতবার—মানসী আমার!
নেহারি' তোমারে ধন্য মানি।

ওগো নন্দিতা মানস-প্রতিমা,
কবির প্রেয়সী চিরন্তনী!
ওগো প্রমূর্ত্তা কল্পনাময়ী!
চিরবাঞ্ছিতা পরশমণি!
কুণ্ডল তব নবমেঘজাল,
খঞ্জন ছুটি আয়ত আঁখি,
গণ্ড বিকচ-গোলাপ-কুঞ্জ,
বান্ধুলী ঠোঁট রেখেছে ঢাকি;
অঙ্গুলি তব চম্পক-কলি,
করে কল্যাণ ঝরিয়া পড়ে,
বাহু ছুটি তব কমল-মৃণাল,
অশ্রুতে তব মুকুতা ঝরে;
পায়ে পায়ে তব বিকশে কমল,
গমন-লীলায় ছন্দ জাগে,
বিজলী ঝলকে নয়ন-বিভায়,
কৌমুদী ফোটে নখর-রাগে;
কণ্ঠে তোমার বীণাঝঙ্কার,
হাস্যে বিকশে কুন্দমালা,
অঙ্গে তোমার ইন্দ্রজালের
মোহন মদির মাধুরী ঢালা।
এত কাছে—তবু হারাই হারাই,
এত জানা, তবু অপরিচিতা!
ওগো চিন্ময়ী মর্ম্মগেহিনী!
চিরযৌবন-আনন্দিতা!

যে করে জ্বালাও সন্ধ্যাপ্রদীপ,
সে কর বিশ্ব-শিয়রে জাগে,
সীমন্তে শুভসিন্দুররেখা
বিকশে উষার অরুণ-রাগে!
আঁখি হেরি তব নভোনীলিমায়,
কেশপাশ কালো জলদ-দলে,
যে হাসি ফুটায় প্রভাত কমল
লুটায় সে হাসি অধর তলে!
মর্ম্মকারার বন্দিনী ওগো
বাহিরিলে কবে ভুবন মাঝে,
সকল ধ্বনিতে জাগে সঙ্গীত,
সকল শোভায় মাধুরী রাজে!
ক্ষণিকে করিতে নিত্য অমর,
বক্ষে রেখেছ অমিয়-মধু,
অয়ি নিখিলের কবির প্রেয়সী!
অয়ি বিশ্বের মানসী-বধূ!

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

স্পর্শমণি

(উপন্যাস)

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের চুম্বক ।—কুলীন ষষ্ঠী-দাসের ষষ্টিসংখ্যক পত্নীর একতমা দ্রবময়ীর গর্ভে, মাতুলালয়ে রুদ্রকান্তের জন্ম। ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে মাতৃবিয়োগের পর তিনি পলাইয়া পশ্চিম চলিয়া যান। দ্বিতীয় কাবুল যুদ্ধের শেষাবস্থায় কমিসেরিয়েটে চাকরি লইয়া, প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিয়া, অবিবাহিত অবস্থায় প্রৌঢ় বয়সে স্বগ্রামে ফিরিয়া আসেন। কিছুদিন তথায় অবস্থানের পর, কলিকাতায় আসিয়া বাড়ী কিনিয়া বাস ও জমিদারী ক্রয় করিতে লাগিলেন। বিবাহ করিলেন না, মাতুলপৌত্র মুরারিকে আনিয়া পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। মুরারি বওয়াটে ছেলে, কোপন স্বভাব রুদ্র-কান্তের শাসনে সে পলাইয়া গেল। রুদ্রকান্ত তখন তাঁহার পিতার অন্য এক শ্বশুরালয় হইতে, সতীনাথ ও সুধীর নামক তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়কে আনয়ন করিয়া, সতীনাথকে পুত্রস্থানীয় করিলেন। মুরারিও ক্রমে ফিরিয়া আসিল।

সতীনাথ মেডিক্যাল কলেজ হইতে ডাক্তারী পাস করিয়া বাহির হইল। এক ব্রাহ্ম বিধবা তারাসুন্দরীর বাড়ীতে ডাক্তারী করিতে গিয়া, তাঁহার যুবতী বিদুষী কন্যা কল্যাণীর প্রেমে পড়িয়া গেল। তারাসুন্দরী ব্রাহ্মের স্ত্রী হইলেও হিন্দু আচার পালন করিতেন এবং কন্যাকেও সেই ভাবে শিক্ষাদীক্ষা দিয়াছিলেন। সতীনাথকে অতি সুপাত্র বিবেচনা করিয়া তারাসুন্দরী পুলকিত হইলেন।

সতীনাথ মুরারিকে ধরিল, কল্যাণীর সহিত বিবাহে জেঠা মহাশয়ের সম্মতি সংগ্রহ করিয়া দিতে। রুদ্রকান্ত সম্মতি ত দিলেনই না, সতীনাথকে দূর পল্লীগ্রামে তাঁহার জমিদারীতে কার্য্যোপলক্ষে পাঠাইলেন। সতীনাথকে হঠাৎ যাত্রা করিতে হইল, কল্যাণীর সহিত সাক্ষাতের অবসরও হইল না।

নানা কার্য্যের ঝঞ্চাটে সতীনাথের ফিরিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে মুরারি একদিন তারাসুন্দরীর ভৃত্যের নিকট মিথ্যা সংবাদ দিল যে জেঠামহাশয়ের আগ্রহে, নিতান্ত অনিচ্ছায় সতীনাথ বিক্রমপুরে বিবাহ করিতে গিয়াছে। ইহা শুনিয়া মর্ম্মভেদী নৈরাশ্যদুঃখে তারাসুন্দরী কলিকাতার বাস উঠাইয়া, হুগলি গিয়া তাঁহার গুরু শাস্ত্রদর্শী পবিত্রচেতা উন্নতমনা বিদ্যানাথ ভট্টাচার্য্যের বাটীর নিকট একটি বাটী ভাড়া করিয়া, তাঁহার তত্ত্বাবধানে বাস করিতে লাগিলেন।

মাসাধিক কাল পরে সতীনাথ জমিদারী হইতে ফিরিতেছিল। ট্রেণে অন্যের পরিত্যক্ত একখানা সংবাদপত্র কুড়াইয়া পাইয়া পড়িল—"ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক ৺নবীনমাধব মুখোপাধ্যায়ের কন্যা কল্যাণী দেবীর সহিত সিভিলিয়ান মিষ্টার নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষালের অমুক তারিখে শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।"—কলিকাতায় ফিরিয়া দেখিল, কল্যাণীরাও নাই, কোথায় গিয়াছে কেহ বলিতে পারিল না।

ক্রোধে ক্ষোভে অপমানে, হুগলি নিবাসী বন্ধু মঞ্জুভূষণের সহায়তায়, উক্ত নগরস্থ বিদ্যানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দৌহিত্রী, বিধবা রাজলক্ষ্মীর কন্যা, বালবিধবা অন্নপূর্ণার কনিষ্ঠা ভগিনী উমাকে বিবাহ করিয়া ফেলিল। বিবাহের পরদিন বধূসহ ফিরি-বার সময় পথে গাড়ী হইতে দেখিতে পাইল, একটি জানালা খুলিয়া কল্যাণী দাঁড়াইয়া আছে।

উমাকে বিবাহ করিয়া আনিল, কিন্তু একদিনের জন্যও স্ত্রীর সহিত সতীনাথ সাক্ষাৎ করিল না। বহির্ব্বাটীতে শয়ন করিত। রুদ্রকান্তও উমার প্রতি খুব কঠোর ব্যবহার করিতেন। পিত্রা-লয়ে যাইতে অথবা তথা হইতে আগত কাহারও সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিতে দিতেন না—পাছে দরিদ্র আত্মীয় সাহচর্য্যে ধনী-বধূর কুশিক্ষা হয়।

সতীনাথ ক্রমে জানিতে পারিল, যে কল্যাণীর বিবাহের কথা সে সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছিল, সে কল্যাণী নবীনমাধবের কন্যা নহে, অপর একজন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক হৃদয়মাধবের কন্যা, ছাপার ভুলে হৃদয়মাধব স্থানে নবীনমাধব হইয়াছিল।

মুরারি উমার সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া বেড়ায়, কিন্তু উমা সাবধানে থাকে। রুদ্রকান্ত অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শুশ্রূষার জন্য সতীনাথ ও উমা নিযুক্ত হইয়াছে, স্বামীস্ত্রীর ব্যবধান অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে।]

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অন্নপূর্ণা শুনিল।

শীতের প্রভাত। তেজ থাকিলেও সকাল বেলার রৌদ্রটুকু আরামপ্রদ। পথের ধারে একতারা বাজাইয়া ভিখারী গাহিতেছিল—

"আদরে হৃদয়ে রাখ আদরিণী শ্যামা মাকে।
মন, তুমি দেখ আর আমি দেখি
আর যেন কেউ নাহি দেখে।"

পূজান্তে বিশ্বনাথ তাঁহার বাহিরের ঘরে তক্তা-পোষের উপর চুপ করিয়া একা বসিয়া ছিলেন। বর্ষণক্লান্ত শরতের মেঘের মত তাঁহার মনের মেঘও যেন আজ হাল্‌কা বাতাসে ভাসিয়া চলিয়াছে। রাগ রাগিণী সম্বন্ধে গায়কের দায়িত্ব জ্ঞান কিছুমাত্র না থাকিলেও, গানের বিষয়টুকুই তাঁহার ভাবপূর্ণ হৃদয়ে যেন ভক্তির লহরী তুলিতেছিল; কণ্ঠেও তাঁহার মৃদু মৃদু গুঞ্জনধ্বনি অস্পষ্ট শুনিতে পাওয়া গেল—"মন তুমি দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিলেন; "এ অজ্ঞান তিমিরাবৃত নেত্রে জ্ঞানের আলো কবে ফুটিয়ে তুল্‌বি মা?—তুলবি কি কখনও? এ হৃদয়ভরা প্রীতির নৈবেদ্য কবে প্রীতি-ময়ী তোর চরণতলে পৌঁছাবে মা? আদরিণী মা আমার, কবে তোর চিদানন্দময়ী মূর্ত্তি দেখাবি মা? এ আশা-হীনের চিত্তে এ দুরাশা কখনও কি পূর্ণ হবে?"

বাড়ীর সাম্‌নে রাস্তার পরপারে মুদির দোকান। দোকানী দাঁড়ি পাল্লা ধরিয়া জিনিষ ওজন করিতেছিল, মুখে ক্রেতাদের সহিত দরদস্তর ও পথচারী পথিকদের সহিত "দাদাঠাকুর প্রাতঃপেন্নাম হই গো—কিহে ঘোষালের পো আর যে দেখ্‌তেই পাইনে, ভাল আছ ত?—কিগো সৌরভী মাসী, তিরপুনী চ্ছানে গেছলে নাকি? জামাইটা পত্তি পেয়েচে?"—ইত্যাদি শিষ্টাচার রক্ষা করিতেছিল। বিশ্বনাথের মনে হইল, ঐতদিকে মন দিয়াও মুদি তাঁহার ক্রেতাদের মনস্তুষ্টি করিতেছে, বিক্রেয় দ্রব্যের ওজন ও মূল্যের হিসাবেও ভুল করিতেছে না। তবে সংসারের দাঁড়িপাল্লা ধরিতে তাঁহারই কেবল ভুল হইয়া যায় কেন? আসল লক্ষ্যে মনকে ধরিয়া রাখিতে পারেন না কেন?

মাছের পেতে মাথায় মেছুনীরা হাত দুলাইয়া হন্‌হন্ করিয়া পথ চলিতেছে। পাছে কথা কহিয়া সময় বৃথা ব্যয়িত হইয়া যায়, তাই গুলপোরা মুখখানা টেপাই আছে। পশারীরা ঝাঁকাভরা লাউ বেগুন সিম কড়াই-শুঁটী প্রভৃতি মাথায় লইয়া ছুটিয়াছে। সেদিন ইমাম-বাড়ীর হাট, তাই সেই দিকেই তাহাদের দ্রুত গতি, খুচরা ক্রেতা ডাকিয়াও সাড়া পাইতেছে না। বুড়ী কুন্নির মা পুষ্করিণীজাত কলমীদলে ও গৃহজাত কাঁচা-লঙ্কায় ঝুড়ি ভরিয়া, বাঁকা কোমর যথাসাধ্য সোজা করিয়া পথ চলিতেছে। "শাগ চাইগো—কাঁচালঙ্কা" হাঁকিয়া বাড়ী বাড়ী সরবরাহ করিয়া দুই চারি পয়সা যাহা পাইবে তাহাই তাহার জীবিকা। লোভনীয় দ্রব্যের আকর্ষণে যত না হউক, বিক্রেত্রীর প্রতি করুণায় অনেক বাড়ীর গৃহিণীরাই বিনা প্রয়োজনেও তাহার জিনিষ কিনিয়া থাকেন। টিকেউলি রোমজানের মা এত সকালেই ঢেঁকিতে কয়লা কুটিতে সুরু করিয়া দিয়াছে। নদীতটে কোলাহল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ভিখারী ভিক্ষা কুড়াইয়া কুড়াইয়া এইবার বিশ্বনাথের বাড়ীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়া গাহিতেছিল—

গিরি, মনে আমার এই বাসনা
জামাতা সহিতে আনিব দুহিতে
গিরিপুরে করব শিব স্থাপনা।
ঘর জামায়ে করে রাখব কৃত্তিবাস,
গিরিপুরে করব দ্বিতীয় কৈলাস;
আঁখিতারা উমায় করব বারমাস
বৎসরান্তে তারে আন্‌তে যেতে হবে না।

সামনের খোলা দরজা দিয়া ভিতরের নিকান পৌঁছান উঠানটুকু দেখা যাইতেছে। একপাশে খুঁটির গায়ে রজ্জুবদ্ধ মুঙলী গাই। ভৃত্য বৃন্দাবন বামজানু মুড়িয়া দক্ষিণ জানুর ঠেসে, মার্জ্জিত পিতলের বোগ্‌নোয় দুধ দুহিতেছিল। পাড়ার কয়েকটী কৌতুহলী নিত্যদর্শক ছেলেমেয়ে ধামি ভরা মুড়ির কতকগুলি গালে পুরিয়া, দুগ্ধ দোহনের অদ্ভুত ক্রিয়া বিস্ময়পূর্ণ চোখে চাহিয়া দেখিতেছিল। কুণ্ডলীকৃতলাঙ্গুল বিড়ালটী "ভিজা" উপাধি না পাইলেও, তদ্রূপ প্রশংসিত অবস্থায় মিটি মিটি চাহিয়া কার্য্যাভাবে হাই তুলিতেছিল; সকাল বেলার রোদটুকু উপভোগের প্রলোভনও হয়ত সেই সঙ্গেই বা

থাকিবে। অন্দর ও বাহিরের মধ্যপথে একখানি পিতলের সরায় দুইটী আলু ও কিছু চাউল লইয়া অন্নপূর্ণা ভিখারীর গান শুনিতেছিল। সেই শরৎ প্রভাতের আগমনী গানে তাহারও মনের মাঝে যেন কোন পুরাতন স্মৃতি জাগাইয়া তুলিয়াছিল—তাহার স্বপ্নপূর্ণ চোখে জলের রেখাটুকুতে তাহা সুপরিস্ফুট। শ্রোত্রীকে মনোযোগিনী দেখিয়া গায়ক ভাবাবেশে তদ্গতচিত্তে গলা কাঁপাইয়া মাথা দুলাইয়া ঐ একই গান বারবার করিয়া গাহিতেছিল।

অন্নপূর্ণা ভিখারীকে ভিক্ষা দিয়া বিদায় করিতেই বিদ্যানাথ ভিতরে আসিলেন। তাঁহাকে কাছে আসিতে দেখিয়া অন্নপূর্ণা অপ্রতিভ ভাবে মৃদু হাসিয়া চোখের জল মুছিল। উৎকণ্ঠিত হইয়া মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তার কি বল্লেন দাদামশাই ?"

বিদ্যানাথ বার-দুই "তারা-তারা" উচ্চারণ করিয়া কহিলেন, "যে ভয় করা যাচ্ছিল, তাই। এতদিন অস্বীকার করে এলেও আর ত স্বীকার না করে উপায় নেই।"

অন্নপূর্ণার বক্ষস্পন্দন এত দ্রুত হইয়া উঠিয়াছিল যে বাহিরেও তাহার শব্দ যেন স্পষ্ট শোনা যাইতে লাগিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল্লেন ?"

বিদ্যানাথ চিন্তিত মুখে কহিলেন, "নবীনমাধব এই রোগেই মারা গেছেন ; যক্ষ্মাই বলা যায় একরকম।"

তবে কল্যাণীও তাহাদের ছাড়িয়া চলিল ! আতঙ্কের প্রথম আক্রমণেই অন্নপূর্ণার মনে হইল, এত বড় দুঃখ কাকীমা সহিবেন কেমন করিয়া ! সত্যই কি ভগবান এমনই নির্দ্দয় হইবেন ? তিনি যে ধর্ম্মকেই একমাত্র আশ্রয় করিয়াছেন, তবে তাঁহার কপালে এত দুঃখ কেন ?

অন্নপূর্ণার চিন্তিত বিবর্ণ মুখের পানে চাহিয়া, একটু-খানি ইতস্ততঃ করিয়া বিদ্যানাথ কহিলেন, "একটা কথা ক'দিন থেকেই ভাবচি, সতীকে একবার আস্তে বল্লে হয় না ? হয়ত তাতে কল্যাণীর মনটাও কিছু ভাল হতে পারে।"

অন্নপূর্ণা বিস্মিত হইল। ভাবিতে লাগিল—"মন ভাল রাখাইবার মত কোনও বিদ্যা যে সতীনাথের আছে, সে ত এই দীর্ঘকাল আত্মীয়তার অভিজ্ঞতায় তাহার কোন পরিচয় এ পর্য্যন্ত জানিতে পারে নাই ; বরং উল্টা প্রমাণই ত পাইয়াছে ! তা ছাড়া, সে আসিবেই বা কেন ? আর কল্যাণীর মত কুমারী যুবতী-কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করার তাহার প্রয়োজনই বা কিসের ? তবে কি—?" সন্দেহটাকে প্রশ্রয় দিতেও সে সাহস করিল না। কেবল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বিদ্যানাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বিদ্যানাথ তাহার ব্যথিত মুখের পানে চাহিয়া, মৃদু নিশ্বাস ফেলিয়া, তাহার মাথার চুলের উপর হাত রাখিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "সেই যে ওর বিশ্বনাথ, দিদি ! সতীরও যে ক্ষমা চাওয়া দরকার। সংসার পথের প্রথমেই যে ভুল ও করেচে, তা শোধরাবার ত আর উপায় নেই। মাপ চাইবার সুযোগও আর কখনও পাবে কিনা তা বিশ্বনাথই জানেন।"

অন্নপূর্ণা অন্তরে বাহিরে শিহরিয়া উঠিল। চোখের উপর যে অন্ধকার মলিন পর্দ্দাখানা ভিতরের গোপন দৃশ্যপটকে আবৃত রাখিয়াছিল, হঠাৎ রঙ্গভূমির পট উত্তোলনের মতই সেখানা উঠিয়া গিয়া ভিতরের প্রচ্ছন্ন অংশটুকুকে প্রকাশ করিয়া ধরিল। তাই কল্যাণী, এত ভালবাসিয়াও, অন্নপূর্ণাকে তাহার অন্তরের কথা খুলিয়া বলিতে পারে না ! ভুলিয়াও কখনও সতীনাথের আলোচনা ত করেই না, উমার সম্বন্ধেও কোন কথা কহিতে যেন কুণ্ঠানুভব করে।

কল্যাণীর যে আত্মগোপনতা এতদিন অজ্ঞাতে তাহার মনকে অভিমানের ব্যথায় পীড়িত করিত, আজ তাহার সত্যরূপ দেখিয়া, তদপেক্ষা গভীরতর ব্যথাই সে অনুভব করিল। তাহারাই তবে কল্যাণীর সুখের পথে কাঁটা দিয়াছে ! তাহাদের নিদারুণ লোভের বশেই আজ কল্যাণী মরণপথের যাত্রী—তবু সেই যেন অপরাধিণী। নিজের ব্যর্থতার বেদনা ভুলিয়া সে যে পরোক্ষে উমার সুখের হন্ত্রী হইয়াছে, এই অনুশোচনাতেই কুণ্ঠিত হইয়া থাকে। সতীনাথ উমাকে ভালবাসে না শুনিয়া

কল্যাণী ত সুখী হয় না, বরং ব্যথাই পায়। অন্নপূর্ণা ভাবিয়া পাইল না, কল্যাণীকে যে এত ভালবাসিত, সে উহাকে বিবাহ করিল না কেন? বিষয়ের লোভে, জেঠামহাশয়ের আদেশ পালনের জন্য? কারণ যাহাই হউক, এ ছাড়া সতীনাথের অন্য উপায়ই বা কি ছিল? গুরুজনের সহিত বিবাদ করিয়া তাঁহাদের অসম্মতিতে বিবাহ করা ত আর উচিত হইত না।

তখনই আবার অন্নপূর্ণার স্মরণ হইল, উমাকেও ত সে কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদন অনুসারে গ্রহণ করে নাই। তবে সতীনাথ কি শুধু খেয়ালেই চলিয়া থাকে?

মনের ভাব মুখে প্রকাশ পাইল কি না, অন্নপূর্ণা বুঝিতে পারিল না। কিন্তু তাহার মনের অব্যক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতেই যেন বিশ্বনাথ কহিলেন, "কল্যাণীর বিয়ের মিছে খবর পেয়ে, রাগ করে সতীনাথ উমাকে বিয়ে করেছিল। দোষ শুধু তাঁরই ত নয়; সে ছেলে-মানুষ, বুঝতে পারেনি। দোষ আমারই বেশী। ঠিক এমনটা না হোক, কিছু যে গলদ ভিতরে আছে, সে তার মুখ দেখেই তখন বোঝা আমার উচিত ছিল। কোনও খবর নিলাম না ত! সস্তায় মেয়ে পার কর্‌তে চেয়ে-ছিলাম, তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে ফেল্লাম। সুতরাং আমাকেও তার অপরাধের ভাগ সমান করেই নিতে হবে। মানুষ তুচ্ছ অবহেলায় নিজের কতবড় দুঃখের পথ নিজের হাতেই যে গড়ে তোলে! তারা-মা!" চিন্তিত বিষণ্ণ মুখে বিশ্বনাথ পুনরায় বাহিরে চলিয়া গেলেন।

অন্নপূর্ণা ঠাকুরঘরে গিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া সদ্যোধৌত সানের মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া বলিল—"ঠাকুর কেন এমন হল?"—আজ সতীনাথের 'পরে তাহার কোন অভিমান বা রাগ ছিল না; সহানুভূতির ব্যথায় সহিত তাহার দুই চোখ দিয়া গভীর করুণার ধারা ভিজা মাটি আরো ভিজাইয়া তুলিল। কল্যাণী ও সতীনাথের ভাল-বাসার অব্যক্ত গভীর বেদনা সে যেন আজ নিজ হৃদয়ে অনুভব করিতেছিল। আত্মযুদ্ধে বিক্ষিপ্তচিত্ত সতীনাথের চরিত্রের দৃঢ়তায় সে মনে মনে সেই সঙ্গে তাহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিতও হইল। এত ভালবাসিয়াও, এমন করিয়া যে নিজেকে প্রলোভন হইতে বিমুক্ত রাখিতে পারে, সে ত দেবতা! হায়, অভাগিনী কল্যাণী এমন হৃদয়ে আসন বিছাইয়াও, সংসারে ভিখারিণীই রহিয়া গেল! অজেয় কর্ম্মফল—নির্ম্মম ভাগ্যলিপি—তবু কেহ কেহ এসকল মানিতে চাহেন না! যদি কর্ম্মফল নাই, তবে এমন অঘটনগুলা ঘটে কেন?

বনে দাবানল জ্বলিয়া উঠিলে তাহার সংবাদ জানিতে দূরান্তরের অধিবাসীদের বিলম্ব হয় না। তারাসুন্দরীর শান্তির ঘরে যে অগ্নিসংযোগ হইয়াছে, সে সংবাদ প্রচা-রিত হইতেও তেমনি বিলম্ব হইল না। বিশ্বনাথের সতর্ক সাধানতায়, অন্নপূর্ণার প্রাণান্ত চেষ্টাতেও, সে নিষ্ঠুর সংবাদ তারাসুন্দরীর কাছে গোপন রহিল না। ডাক্তার যখন বিশ্বনাথের মনের সংশয় সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন, তখন গৃহমার্জ্জনরতা মোক্ষদা দাসীর কর্ণে সে সংবাদটুকু অশ্রুত রহিল না। যক্ষ্মা নামটা তাহার জানা ছিল, তাহার দুই পুত্র এই কাল-ব্যাধিতেই যে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে! মোক্ষদার ইচ্ছা না থাকিলেও, কেমন করিয়া যে তাহারই মুখ দিয়া ঐ কথাটা গোপনে একজন দুইজন করিয়া অনেক জনের কর্ণে প্রবেশ করিল, তাহা সেও বলিতে পারে না।

তারাসুন্দরী গঙ্গাস্নানে গিয়া প্রতিবেশিনীদের সতর্ক ইঙ্গিতে তাহা বুঝিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর জজের রায় শুনিতেই কেবল বাকী ছিল, নতুবা চক্ষু ত তাঁহার অন্ধ হইয়া যায় নাই। প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্ত্তটাই যে এই আশঙ্কা বহন করিয়া আনিত।

নদীর জল যেখানে গভীর সেখানে উচ্ছ্বাস কম। তীরের নিকট অগভীর জলেই তরঙ্গের উদ্দাম চাপল্য দেখিতে পাওয়া যায়। তারাসুন্দরীর গভীর দুঃখ বাহিরে প্রকাশ পাইল না, তাহার সবটুকুই ভিতরে। ভিতরটা যে পুড়িয়া ভস্ম হইতেছিল, অগ্নিতাপ ঝলসিতের মত চোখে মুখে তাহারই গভীর চিহ্ন অতি দ্রুতগতিতে

আঁকিয়া তুলিলেও, চোখে এক দিনও জল দেখা গেল না; মুখেও কোন আক্ষেপের ভাষা বাহির হইল না। দেখিয়া শুনিয়া রাজলক্ষ্মী একদিন অন্নপূর্ণার কাছে গোপনে কহিলেন, "ঘা খেয়ে মনটা ওঁর কি শক্তই হয়ে গ্যাছে!"

বিশ্বনাথ সেই অনলস সেবাপরায়ণা কন্যাগতপ্রাণা জননীর অসীম ধৈর্য্য দেখিয়া মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কল্যাণী প্রস্তুত হইয়াছে।

কল্যাণীর রোগ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে জটিল পথেই অগ্রসর হইতেছিল। শীতের পূর্ব্বেই সে শয্যাগ্রহণ করিল, এখন আর উঠিয়া বসিবারও সামর্থ্য নাই। জ্বর নিয়মিত লাগিয়াই থাকে। কোনদিন একটু বেশী, কোনদিন কিছু কম,—একেবারে বিচ্ছেদ হয় না। দুর্ব্বলতা ক্রমেই বাড়িতেছিল। আহারে রুচি নাই, বুকের বেদনার সঙ্গে কাসি দেখা দিল। হিমশীর্ণ লতাটীর মত দেহের তরুণ লাবণ্যটুকু দেহেই মিলাইয়া যাইতেছিল। চোখের ঔজ্জ্বল্য ও মুখের প্রসন্ন হাসিটুকু কেবল তেমনি অটুট ভাবে আঁকা রহিল।

তারাসুন্দরী ও বিশ্বনাথের পরিবারে দিন যে কি ভাবে কাটিতেছিল তাহা তাঁহারাই জানেন। যে দিন জ্বর একটু কম থাকে, অথবা জ্বরের উপর পুনরায় জ্বর না আসে, মনে অমনি আশা জাগিতে চায়। কিন্তু সে আশার সুযোগও এখন এত বিরল হইয়া গিয়াছে যে কদাচিৎ সে সুখটুকু মিলে।

বুদ্ধিমতী কল্যাণীও নিজের অবস্থা বুঝিতেছিল, কিন্তু সে ভাবের আভাসটুকুও প্রকাশ করিত না। সে এখনও তেমনি মার কাছে ছেলেমানুষী করে; অন্নপূর্ণাকে বায়না আবদারে যতক্ষণ পারে নিজের কাছে আবদ্ধ করিয়া রাখে। বিশ্বনাথের সঙ্গে দেখা হইলে দুইটা ভাল কথা শুনিয়া লয়, ভাল ভাল গ্রন্থ হইতে বাছা বাছা অংশ চিহ্নিত করিয়া রাখে, তাহার অর্থ বুঝিতে চায়। বিশ্বনাথ অনেক সময় তাহার কাছে আসিয়া বসেন, যাহাতে তাহার মনে আনন্দ উৎসাহ জন্মায় এমন সব কথা কহিয়া তাহাকে খুসী রাখিতে চেষ্টা করেন। সদ্‌গ্রন্থ হইতে উপদেশ দেন। স্কুলের কায ছাড়িয়া দেওয়ায় তাঁহারও সময়ের আজকাল অভাব ছিল না। গুরুশিষ্য দুই জনেই এখন চতুষ্পাটীর উন্নতির দিকে মনোযোগী হইয়াছেন। তা ছাড়া সময় পাওয়ায় পূজার্চ্চনার কালও বাড়াইয়া লইতে পারিয়াছেন। পুস্তক প্রণয়নে ও পঠে তাঁহার সময়ের সদ্ব্যবহার হইতে পায়। বাকী সময় কল্যাণীর সঙ্গেই অতিবাহিত করিয়া থাকেন।

দাদামহাশয়কে সর্ব্বদা কাছে পাইয়া কল্যাণীর রোগশয্যা সুখশয্যা বলিয়া মনে হইত। তাঁহার জ্ঞানদীপ্ত মুখের পানে চাহিয়া, নির্ম্মল স্নেহের স্পর্শানুভব করিয়া, মন তাহার গভীর শ্রদ্ধায় পূর্ণ হইয়া উঠিত। জীবনের ব্যর্থতার দুঃখের অংশটা এখন আর তাহাকে পীড়িত করিতে পারে না। মনে হইত, "এমন ভাবে দুঃখের ব্যথায় অন্তরশোধনের মন্ত্র গ্রহণ না করিলে, এমন করিয়া কি দাদামশাইকে বুঝিতে পারিতাম? না, এত অমূল্যরত্ন লাভ করিতাম? ভগবান মঙ্গলময়, তাই অমঙ্গলের বাহিকরূপে তিনি মঙ্গলেরই প্রতিষ্ঠা করেন। আমার দিন ত এত শীঘ্রই ফুরাইয়া আসিত; কেবল সংসারের বিলাস-সুখের পঙ্কিল আবর্ত্তে পা দিয়াই চলিয়া যাইতাম, পরমানন্দ চিরসুন্দরের সত্যরূপ উপলব্ধি করিতে পারিতাম না।"

নিকটাগত মুক্তির আভাস সে যেন অনেক দিন হইতেই অনুভব করিয়া আসিতেছে। অন্তর যাহার ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত, জগতে তাহার চোখে কিছুই যে অসুন্দর নাই। অনির্দ্দেশের পথে চলিতে মনে তাহার ভয়ের আভাসমাত্র জাগাইতে পারে না। মনে হয়, মৃত্যুর এত রূপ! তবে মরণে লোকে ভয় পায় কেন? সে এতদিন তাহার দ্বিধাগ্রস্ত জটিলতার আঁধার জীবনের অতল সলিলে ডুবিয়া হাবুডুবু খাইতেছিল। দুঃখ ও

দ্বন্দ্বের অতীত কোন লোকের শুভবার্ত্তা বহিয়া, যে তাহার নিকটাগত হইয়াছে, তাহাকে বন্ধু বলিয়া স্বাগত সম্ভাষণ করিতে কেনই বা সে দ্বিধা করিবে?

নবম পরিচ্ছেদ।

"নৌকাডুবি"।

কিছুদিন হইতে কল্যাণীর জ্বর কমের দিকে না থাকিয়া বাড়ের দিকেই চলিতেছিল। এমন সময় সময় হয়, আবার দুই পাঁচদিন কমও থাকে। অন্নপূর্ণা আজকাল তাই সংক্ষেপে রান্নাবান্না তাড়াতাড়ি সারিয়া লইয়া, দুপুর বেলাটা তাহার কাছে আসিয়া বসিয়া থাকে; দুই একখানা গল্পের বা অন্য কোন বই লইয়া পড়িয়া শোনায়। সেদিন মঞ্জুভূষণের স্ত্রী কল্যাণীকে দেখিতে আসিয়া "নৌকাডুবি" উপন্যাসের সুখ্যাতি করিয়াছিল। অন্নপূর্ণা বইখানা তাহার নিকট হইতে চাহিয়া আনাইয়াছে। সেই বইখানাই অলস মধ্যাহ্ন-যাপনের তাহাদের আজকাল একমাত্র পাঠ্য ও আলোচ্য। কল্যাণীকে ঔষধ খাওয়াইয়া তারাসুন্দরী এইমাত্র স্নান সারিয়া, হবিষ্যান্নের জোগাড় করিতে গিয়াছেন। অন্নপূর্ণা কল্যাণীর ললাটে হস্তস্পর্শে তাহার জ্বরের তাপ পরীক্ষা করিয়া কাছে আসিয়া বসিতেই মৃদু হাসিয়া কহিল, "দিদি, গল্পটা আজ শেষ করবে না? আহা কমলার ভারি দুঃখ. না দিদি? কিন্তু হেমের জন্যেও খুব মায়া করে—করে না ভাই?"

তাকের উপর হইতে বইখানা পাড়িয়া আনিয়া অন্নপূর্ণা তাহার কাছে ঘেঁসিয়া বসিলে কল্যাণী সরিয়া তাহাকে স্থান করিয়া দিল। অন্নপূর্ণা বইয়ের পাতা না খুলিয়া, স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া কহিল, "কেন রে, হেমের ত আর বিয়ে হয় নি, তার ত পথ খোলা রয়েচে। বেচারী কমলাই না জালে জড়িয়ে পড়্ল! কি করে এ জালের গেরো খুল্বে আমি ত কিছু ভেবেই পাচ্চিনে।"

গল্পের পরিণাম দু'জনেরই অজ্ঞাত—অথচ অতি দুরূহ স্থানে তাহারা আসিয়া পৌঁছিয়াছে—নিজে নিজে মীমাংসা করিয়া লইতেও পারিতেছে না।

কল্যাণী একটা ছোট রকম নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "যাকে এত ভালবাস্ত, যখন জানলে সে তার স্বামী নয়, তখন কি ভয়ানক দুঃখই না ওকে সইতে হয়েছিল! ওর অবস্থা ভয়ানক নয়?"

কল্যাণী গল্পাংশে তন্ময় হইয়া নিজের অবস্থার কথা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। তাহারও অবস্থা যে কতকটা কমলারই মত, সে কথা যেন মনেই পড়িল না। অথবা সতীনাথের প্রেমে তাহার মনে কোন সন্দেহ কখনও বুঝি তেমন করিয়া জাগে নাই। নিরুপায়ে রুদ্রকান্তের মতানুবর্ত্তী হওয়া ছাড়া যে তাঁহার পথ ছিল না। তা ছাড়া, কল্যাণীর মনের কথাও ত তিনি কিছুই জানেন না। বিবাহের কথা কতলোকের সঙ্গে হয়, ভাঙ্গিয়াও যায়, তাই বলিয়া কে কাহাকে অপরাধী করিয়া থাকে? কল্যাণী যে এত বড় লজ্জাহীনা—মনে মনে স্বয়ম্বরা—তাহা তিনি কেমন করিয়াই বা জানিবেন? সতীনাথের প'রে কল্যাণীর বিদ্বেষ ছিল না, ক্রোধও ছিল না। তাহার স্বার্থহীন প্রেমে পরছিদ্রানুসন্ধানের প্রবৃত্তি নাই। সে তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিল, এখনও বাসে, কিন্তু সে ভালবাসা ব্যর্থতা জানে না। সে ভালবাসা তাহার সার্থক হইয়াছে। সেদিন দাদামহাশয়ের মুখে সে এই কথারই মীমাংসা শুনিয়াছে। ভগবানকে প্রত্যক্ষরূপে পাওয়ার প্রসঙ্গে বিদ্যানাথ বলিয়াছিলেন, "দেবতা ত শুধু ভক্তি চান্ না, ভক্তি প্রেম স্নেহ—যে যা দেবার অধিকারী, তিনি তার কাছ থেকে তাই নিয়ে থাকেন। তুমি যে তোমার অপরিমেয় প্রেমের বন্ধনে তাঁকে বন্দী করে আপন করে নিয়েচ, তোমার দেবতা মানবের মূর্ত্তিতেই তোমার পূজা গ্রহণ করেচেন। তোমার কামনাহীন অকলুষ প্রেম সেই প্রেমময়ের পাদপদ্মেই অর্পিত হয়েচে। প্রেমের ঠাকুর, তিনি যে এমনি সিংহাসনই খুঁজে বেড়ান। আহা, শান্তিময় তোমায় শান্তি দেবেন।"

কল্যাণীর মনে পড়িল, সে দিন কি পূর্ণানন্দেই তাহার জীবন সার্থক মনে হইয়াছিল! কামনাপূর্ণ জাগতিক প্রেম কত তুচ্ছ কত ক্ষুদ্র বলিয়াই সেদিন সে বুঝিতে

পারিয়াছিল ! ফুল কি শুধু মানবের ভোগের জন্যই সৃষ্ট ? দেবপূজাতে উৎসৃষ্ট হওয়াই যে ফুলের জীবনের পরম সার্থকতা। তবে তাহার জীবন বৃথা হইবে কেন ? তাহার মানস দেবতাকে পূজার দেবতায় মিশাইয়া কেনই বা সে ধন্য হইতে না পারিবে ?

কল্যাণীর মনের খবর অন্নপূর্ণার জানা ছিল না ; সে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া আছে দেখিয়া কল্যাণী যেন একটু খানি লজ্জা পাইল। সে জোর করিয়া সে ভাবটাকে কাটাইয়া ফেলিবার জন্য হাসিয়া কহিল, "আমি ত উপন্যাস বেশী পড়িনি, তাই আমার বোধ হয় এত ভাল লাগ্‌চে, মনে হচ্চে যেন সত্যিকার মানুষ ওরা।"

অন্নপূর্ণা পুস্তকপৃষ্ঠার পঠিতাংশ চিহ্নিত স্থানটুকু বাহির করিয়া কহিল, "সে, লেখকের গুণে। আচ্ছা, পড়ি তবে শোন। কমলা রমেশের চিঠি পেয়েচে সেখানটা হয়ে গেছল না ?"

কল্যাণী মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া কহিল, "এইখানটায় রমেশের চরিত্রটাকে ভারী কাহিল করা হয়েচে কিন্তু। এতদিন এমন ভাবে কাটিয়ে, কেনই যে ওর এমন মতিভ্রম হল ! ভালবাসার এতবড় অপমান কমলা যখন জানতে পার্ব্বে, তার মন তখন না জানি কি বলবে ?"

অন্নপূর্ণার মনের ভিতরটা বাতাসে আন্দোলিত বৃক্ষশাখার মত দুলিতেছিল। সতীনাথের কথা কি সে তবে সব খুলিয়া বলিবে ? বলা কি উচিত নয় ? ভালবাসার এতবড় অপমান যে তাহার জীবনে ঘটে নাই সে কি তাহা শুনিয়া যাইবে না ? সতীনাথ কাণ্ডজ্ঞানহীন, অদূরদর্শী, মূর্খ—সবই হইতে পারে ; কিন্তু প্রতারক নয়, এটুকুও কি সান্ত্বনা নয় ? আহা, সেও যে আভাগা ! উমাহেন রত্নের অধিকারী হইয়াও তাহাকে যত্ন করিতে পারিল না, সেও কি কম দুঃখে ?

অন্নপূর্ণা স্থির করিতে পারিল না কথাটা প্রকাশ করায় কল্যাণীর শারীরিক ক্ষতি হওয়া সম্ভব কিনা। দাদামহাশয় ধীরে ধীরে তাহার কাছে এই কথাটাই জানাইতে বলিয়াছেন। জীবনের অমীমাংসিত প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যাওয়াই ভাল। তা ছাড়া, লুকোচুরি কাটিয়া গেলে কল্যাণীর মনেও যে শান্তি আসিবে ইহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন। একথা প্রকাশে কল্যাণীর কিসের লজ্জা ? সে ত উমার স্বামীকে কাড়িয়া লয় নাই ! দুর্ভাগিনী উমাই যে তাহার স্বামীর—প্রেমে না হউক,—অধিকারে ধনী হইয়াছে। এই গোপনতার ব্যথা যে কল্যাণীর সরল মনে অহরহ বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তিনি নিজের মন দিয়াই তাহা অনুভব করিতে পারিতেছেন। প্রকাশে লজ্জা সঙ্কোচ কমিয়া গেলে, সতীনাথকে বন্ধু ভাবে আহ্বান করা সম্ভব হইবে। জটিলতার উচ্ছেদ করিতে পারিলে কল্যাণী হয়ত শান্তি পাইবে।

বিদ্যানাথের অনুমতি থাকিলেও অন্নপূর্ণা যেন সঙ্কোচের হাত এড়াইতে পারিতেছিল না। পাছে অত্যধিক আনন্দ বা নৈরাশ্যের আঘাতে তাহার জীর্ণ দেহকে আহত করে, এই ভয়ে সে কতদিন বলি-বলি করিয়াও বলিতে পারে নাই,—আজও পারিতেছিল না। সতীনাথ যে ভাবে কল্যাণীর সংস্রব ত্যাগ করিয়াছে, তাহাতে মনে মনে সে তাহাকে প্রশংসা করিলেও, কল্যাণীর তরফ হইতে আশা কিছুই পাইল না। দাদামহাশয় বলিয়াছেন, কল্যাণী যে এখানে আছে সে খবর সতীনাথ জানে। তবু ত একদিনও কৈ কোন ছুতায় দেখা করিল না ! দীর্ঘ তিন বৎসরের মধ্যে একটা সংবাদও লইল না ! ভুলিয়া যে গিয়াছে, বর্ত্তমান ব্যবহারে তাহাও ত প্রমাণ করে না। তবে সে কি আসিতে বলিলেই আসিবে ? নির্ব্বাপিত প্রায় বহ্নিকে আর ইন্ধন যোগে জ্বালাইয়া তুলিয়া ফল কি ? শুধু অমীমাংসিত জটিল প্রশ্নের মীমাংসায় তাহারই কি কিছু প্রয়োজন আছে ? হয়ত আছে। এ সুযোগ ছাড়িয়া দিলে হয়ত আর কখনও তাহা মিলিবে না। ইহার ব্যথা যতই থাক, সুখও বুঝি আছে ! এই না কল্যাণী বলিতেছিল; ভালবাসার এতবড় অপমান কমলা সহিবে কেমন করিয়া ? কমলা যাহাকে স্বামী বলিয়া জানিয়া আসিয়াছে, এইমাত্র যাহার প্রণয়, পত্রিকা পাঠ করিল, যখন জানিবে সে

তাহার স্বামী নয়, তখন দারুণ ঘৃণায় রমেশের চিরদিনের আত্মবিসর্জ্জনের মূল্যও তাহার চোখে অত্যন্ত হ্রাস হইয়া যাইবে না কি? স্বামী-প্রেম-অনভিজ্ঞা অন্নপূর্ণার মনে পড়িল, সেদিন কি একখানা কবিতা পুস্তকে পড়িয়াছিল,

"আমি আমার অপমান সহিতে পারি,
প্রেমের সহেনা ত অপমান;
অমরাবতী ত্যেজে হৃদয়ে এসেছে যে,
তোমারও চেয়ে সে যে মহীয়ান।"

প্রেম বুঝি প্রণয়াস্পদেরও উপরে! তাই আমরা ক্ষতির ব্যথায় যত না হউক, ভগবানের করুণায় যদি কখনও সন্দিহান হই তাহাতে অধিক যন্ত্রণা পাইয়া থাকি। কল্যাণী ত মেল ট্রেণে চড়িয়া বসিয়াছে, এখন উহার ক্ষতি করিবে কে? হয়ত এই মৃতসঞ্জীবনী সুধার স্পর্শে শুষ্ক তরু আবার মুঞ্জরিয়া উঠিতেও পারে। আহা, সতীনাথ কেন সকল কথা দাদামহাশয়ের কাছে খুলিয়া বলিল না? দুই স্ত্রী ত কুলীনের ঘরে নিন্দার কথা নয়। কল্যাণী উমা উভয়কে সহ্য করিবার শক্তি যে উভয়েরই ছিল।" কল্যাণীর প্রতি গভীর সমবেদনায় আজ উমার সপত্নী-চিন্তাও সরলা অন্নপূর্ণার মনে বিভীষিকা জাগাইতে পারিল না—অসম্ভব মনে হইল না। মমতাভরা চিত্তে স্বার্থের স্থান কোথায়?

অন্নপূর্ণার মনের বিভিন্ন চিন্তা তাহার মুখেও হয়ত কিছু ছায়া ফেলিয়াছিল। সে অন্যমনে পুস্তকের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া যাইতে লাগিল। পাঠ সুরু করিল না দেখিয়া কল্যাণী মৃদু অনুযোগের স্বরে কহিল, "পড়্‌লে না দিদি, এক্ষুনি ত আবার তোমার বাড়ী ফেরবার সময় হবে। কি ভাব্‌চ দিদি—নিশ্চয় কিছু ভাব্‌চ—ভাবচ না?"

ভূমিকা করিয়া কথা আরম্ভ করিতে গেলে আরম্ভ করাই হয়ত কঠিন হইবে। তাই অন্নপূর্ণা বক্তব্যটা সহজ করিয়া লইবার জন্য একেবারেই কহিল, "সেদিন রুদ্রকান্ত বাবুকে দেখতে গিয়ে দাদামশায়ের সঙ্গে সতীনাথের অনেক কথা হয়েছিল শুনলাম।"

কল্যাণী নীরবে তাহার বক্তব্যের শেষাংশটা শুনিবার অপেক্ষা করিয়া রহিল। কোন প্রশ্ন করিল না, চোখে মুখে ব্যগ্রতার আভাস মাত্র ফুটাইয়া তুলিল না। অন্নপূর্ণা কহিল, "তোরা যে এখানে আছিস্ তাও সে জানে বল্লে।"

কল্যাণী বিস্মিত হইল। তাহার রক্তহীন মুখখানাতে একটা শ্রী-পূর্ণ ভাব প্রকাশ পাইল। এতদিনের পর স্মৃতির আবার এ আন্দোলন কেন? তাহাদের সংবাদ লইবার জন্যই কি? কল্যাণী যে মৃত্যুশয্যায়, সে কথাও তবে তিনি শুনিয়াছেন। শুনিয়া তাঁহার মনে কি হইয়াছিল কে জানে? তখনই সে মনকে বুঝাইল, —কি আবার হইবে?

"কল্যাণী, এতদিন এমন করে আমার কাছেও কেন নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলি ভাই?"—বলিয়া অন্নপূর্ণা সস্নেহে তাহার হাতখানা নিজের কম্পিত হস্তের ভিতরে চাপিয়া ধরিল। কল্যাণী নীরবে ভাবিতে লাগিল—দিদি তবে সব শুনিয়াছেন। কল্যাণী এখন তবে তাঁহার অবসর যাপনের গল্পের বিষয়ে দাঁড়াইয়াছে। তাহার অসীম স্পর্দ্ধার কথাও হয়ত আর তাঁহার অজ্ঞাত নাই। ছি ছি, আর দুইটা দিনও কি তিনি সহিতে পারিলেন না? তিনি তবে দাদামশায়ের কাছে সকল কথাই বলিয়াছেন। যখন এত বলিয়াছেন, তখন কি আর তাহার কথাই জানিতে চাহেন নাই? না চাহিলে এ কথা তুলিবেনই বা কেন?—কল্যাণীর দুই চোখে জল ভরিয়া আসিল;—দুঃখে নয়, লজ্জায় ও অপমানে।

অন্নপূর্ণা তাহার শীর্ণ আঙ্গুলিগুলি ক্রীড়াচ্ছলে নাড়িতে নাড়িতে কহিল, "অনাথের বিয়ের সময় এসে মুরারি বাবু তোমাদের কথা দাদামশায়ের কাছে সব বলেছিলেন। সতী অবশ্য কিছুই বলেনি। দাদামশায় তোমাদের এখানে থাকার কথা জানালে, সে কেবল বলেছিল সে তা জানে।"

অন্নপূর্ণা চুপ করিয়া কল্যাণীকে বিশ্রাম লইবার অবসর দিল। এক সঙ্গে সব কথা শুনিবার মত শক্তি তাহার আছে কি না কে জানে? শুধু দুঃখে নয়, আনন্দেও যে ভগ্নহৃদয়কে আহত করিয়া থাকে।

"আঃ—তিনি তবে তাহার কথা লইয়া আলোচনা

করেন নাই!”—মনে মনেও যে মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহাকে সন্দেহ করিয়াছিল, ইহাতে কল্যাণীর নিজের মনের উপর রাগ হইল। এত লঘুচিত্ত সে!

কল্যাণীকে নীরব দেখিয়া অন্নপূর্ণা কহিল, “মুরারি বাবু বল্লেন, সতীনাথ বিদেশে কোথায় গেছ্‌লেন, সেখানে কোন্ খবরের কাগজে হৃদয় বাবুর নাম ভুল করে নবীন বাবুর মেয়ে কল্যাণীর এক ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে বিয়ে হয়েচে পড়ে, রাগের মাথায় বন্ধুর পরামর্শে উমাকে ঝাঁ করে বিয়ে করে ফেলেছিলেন। সে সময় তোমরাও নাকি কারুকে খবর না দিয়ে চলে এসেছিলে, কাজেই সত্যি বলে' তাঁর মনে বিশ্বাসও হয়ে গেছল। তারপর অবশ্য নিজের ভুল বুঝতে পাল্লেন। কিন্তু তুই ত জানিস কল্যাণী, এতে তিনিও সুখী হতে পারেননি। সত্যি বলচি, এখন তাঁর জন্যে মায়াই করে, রাগ হয় না। তিনি যে নিজের হাতেই তাঁর সাধ করে পোঁতা গাছের মূল কেটে ফেলেচেন। আহা তিনিও বড় অভাগা, বড় দুঃখী।”

অন্নপূর্ণা তাহার মুষ্টিধৃত কল্যাণীর হস্তখানার দ্রুত কম্পনেই তাহার মানসিক আবেগ অনুভব করিতেছিল। কল্যাণী মুখখানা ফিরাইয়া লইয়া বলিল, “তবু তোমরা আমায় এত ভালবাস দিদি? আমার জন্যে তোমাদের—”

“একি, তুই কাঁদচিস কল্যাণী! তুই কি উমা ছাড়া রে—তোর অধিকারই যে আগে। আমরা যে তোর সুখের ঘরে চোরের মত সিঁদ কেটেচি! প্রথম থেকেই দাদামশায়ের এ বিয়েতে একটুও ইচ্ছে ছিল না। সেই জন্যেই হয়ত মন তাঁর তখন অমন করে কেঁদেছিল।”—বলিতে বলিতে অন্নপূর্ণা গভীর স্নেহে কল্যাণীকে বাহুবেষ্টনে ধরিয়া মৃদু স্বরে কহিল, “অন্যায় কল্লাম কি রে? বড় কষ্ট দিলুম কি কল্যাণী?”

হাত দিয়া চোখ মুছিয়া অন্নপূর্ণার বদ্ধ বাহুর বেষ্টনে মুখ লুকাইয়া মৃদুস্বরে কল্যাণী কহিল, “না দিদি, মুক্তি দিলে ভাই। এমন করে তোমাদের চোখে নিজেকে লুকিয়ে বেড়ানতে আমি যে হাঁপিয়ে মরে যাচ্ছিলুম! আমার অপরাধের বোঝা ভারীই হয়ে যাচ্ছিল।”

“অপরাধ ত তোর নয় ভাই,—তাঁর মুখই যে বলে দিচ্ছিল। মন তাঁর নিজের বশে নেই। কেন লোভে পড়ে বুঝলুম না, দাদামশায়ের অনিচ্ছা বুঝেও নিজেদের জেদ দেখালুম!

কল্যাণী এইবার মুখ তুলিয়া প্রবাহিত অশ্রুধারা হাত দিয়া মুছিতে মুছিতে মৃদু হাসিয়া কহিল, “তিনি যে উমার স্বামী, আমার ভগিনীপতি, এতেই আমি খুব সুখী হয়েচি দিদি।”

অন্নপূর্ণা তাহার রুক্ষ চুলগুলি হাত দিয়া গুছাইতে গুছাইতে স্নেহভরা কণ্ঠে কহিল, “তা আমরা খুব জানি, তাই তোকে এত ভালবাসি রে! তুই যে শুধু পরের কথাই ভাবলি, নিজের কথা কখনও ত ভাবলিনে!” অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, “আচ্ছা, উমাকে—আর—সতীনাথকে—দেখ্‌তে ইচ্ছে করে? তাদের আস্‌তে বল্‌ব?”

কল্যাণী চুপ করিয়া অনেকক্ষণ স্থির হইয়া রহিল। দেখিতে ইচ্ছা করে বৈ কি! একবার জন্মশোধ দেখিয়া, পায়ের ধূলা লইয়া, সকল অপরাধের ক্ষমা চাহিয়া লওয়া বাকী রহিয়াছে যে। অপরাধী ত তিনি নহেন, সে যে তাঁহাকে অবিশ্বাস করিয়া, তাঁহার অজ্ঞাতে লুকাইয়া পলাইয়া আসিয়াছিল। এ তাহারই প্রায়শ্চিত্ত। তাঁহার অসীম স্নেহ সে কি অনুভব করিতে পারে নাই? তবে সে কেন লোকের মিথ্যাকথায় ভুলিয়াছিল? দেখিতে ইচ্ছা করে না, এত বড় মিথ্যা কেমন করিয়া বলিবে? ইচ্ছা করে বৈ কি, কেবল অনুচিত বোধে সে ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দেয় না। তাঁহার ভুল যেমনই হউক, অভাগিনী কল্যাণীর ভুলের যে আর সংশোধন করা চলিবে না। তাহার ইহ-জীবনের পূজা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে, এইবার পূজার নির্ম্মাল্যটুকু নদীর জলে ভাসাইয়া দেওয়াই শুধু বাকী। তবেই তাহার জীবনের সকল আকাঙ্ক্ষার শেষ হইয়া যায়।

সে পাশ ফিরিয়া শুইয়া, স্বর নামাইয়া কহিল, “এখন থাক্‌না ভাই, যাবার সময় তাঁদের একবার আসতে বোল। উমাকে আমি রাতদিনই মনের সঙ্গে

আশীর্ব্বাদ করি, তবু তাকে দেখিনি ত কখনও, দেখতে বড় ইচ্ছে করে দিদি।”—সতীনাথের কথা সে মুখ ফুটিয়া না বলিলেও, সে যে শেষ সময়ে তাঁহাকেও দেখিতে চায় সেটুকু ভাবেই বুঝা গেল।

অন্নপূর্ণা মুখ ভার করিল ব্যথিত স্বরে কহিল, “কেন ওকথা বলে কষ্ট দিস কল্যাণী? জানিস না কি—?”

“জানি দিদি, জানি বলেই সইয়ে রাখতে চাই। একেবারে সত্যিটা যখন আস্‌বে, সইতে পারবে কিনা তাই ভয় হয়; স্রোতের মুখে ইট কাঠ ফেলে তার গতি ত বন্ধ করতে পার্‌বে না ভাই!”

অন্নপূর্ণা উঠিল। কল্যাণীর দিকে পিছন ফিরিয়া, জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। এবার আর তাহার উচ্ছ্বসিত অশ্রুধারা কোন বাধা মানিল না।

কল্যাণী মৃদুস্বরে ডাকিয়া কহিল, “দিদি, রাগ কল্লে ভাই?”

অন্নপূর্ণা মাথা নাড়িয়া জানাইল—না, সে রাগ করে নাই।

জীবনের দুর্ব্বহ লুকোচুরির হাত এড়াইয়া আজ যেন কল্যাণী লঘু নিশ্বাস ফেলিয়া বুকের বোঝা হাল্কা করিতে পারিল। বৃথা সন্দেহে কেন এতদিন আত্ম-প্রতারণায় কাটাইয়াছিল? তাই এখন তাহার মনে অনুতাপ হইতেছিল। নিজের সঙ্কীর্ণ মন লইয়া ইঁহাদের মনের প্রসারতা বুঝিতে পারে নাই, তাই না লজ্জায় আত্ম-গোপন করিতে চাহিয়াছিল! মনের উপর তাহার রাগ ধরিতেছিল। সংশয়ের চেয়ে নিশ্চয়তা—তা সে যে মূর্ত্তিতেই আসুক—অনেক ভাল।

সতীনাথের মনের সংবাদে সে আজ তাহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছে। আর, সে উত্তরটুকু কত মিষ্ট! তিনি তাহাকে ভুলিয়া যান নাই। ঘৃণা করিয়া অথবা সংসারের কোন স্বার্থহানির লোভে তাহাকে ত্যাগ করেন নাই। তাহার প্রেমে সন্দেহ করিয়া নৈরাশ্যে আত্মহত্যার মত অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। সে ভালবাসা কত তীব্র, কত গভীর, তাঁহার বর্ত্তমান জীবনই ত তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। উমা-হেন সর্ব্ব-গুণবতী স্ত্রীও তাঁহার ক্ষোভের ব্যথা নিবারণ করিতে পারে নাই। তাঁহার ভালবাসা শুধু চোখের নেশা, দুদিনের মোহ ত ছিল না। মানুষ ভ্রমের দাস, তিনিও ভুল করিয়াছিলেন—তবু সে ভুলের প্রশ্রয় দিয়া দ্বিতীয় বার ভুল করিতে চাহেন নাই। কল্যাণীর সকল ইতিহাস, অবস্থান সব জানিয়াও তাহার চোখের কাছে আসিয়া দাঁড়ান নাই। তাহাকে প্রলোভিত করেন নাই, এ ভালই করিয়াছেন। তিনি এমন মহৎ বলিয়াই না সে তাঁহাকে এত ভালবাসিয়াছে! হাঁ, এতই ভালবাসে—আজ আর সে তাহার মনের কাছেও অস্বীকার করিবে না। সত্যই সে তাঁহাকে ভালবাসে। সখারূপে, গুরুরূপে, প্রিয়রূপে, স্বামিরূপে, তাহার আরাধ্য দেবতার রূপেই সে তাঁহাকে ভালবাসে। তাহার বিশ্বেশ্বর স্বামীকে সে বিশ্বনাথের অংশরূপেই ভালবাসে। হউন তিনি উমার স্বামী, বিশ্বনাথও ত বিশ্বের স্বামী; তাই বলিয়া তাঁহার কোন ভক্ত পূজকের পূজার ব্যাঘাত লাগে কি? তাহার এ নীরব পূজাতেই বা বাধিবে কেন?

ক্রমশঃ

শ্রীইন্দিরা দেবী।

পেটেণ্ট ঔষধ-কর্ত্তা। ওহে, সেদিন যে বাবুটি এক ডজন সর্ব্বব্যাধিমুক্তিসুধা কিনে নিয়ে গেলেন, তিনি কি কোনও প্রশংসা-পত্র পাঠিয়েছেন?

কর্ম্মচারী। আজ্ঞে না; তিনি মারা গেছেন। তাঁর ছেলে, বাপের অনেক টাকা কড়ি পেয়ে আমাদের ধন্যবাদ দিয়ে একখানা চিঠি লিখেছেন বটে। এই যে—(পত্র দান)

কর্ত্তা। (পত্র পড়িয়া)—থাক, এখানা আর ছাপিয়ে কায নেই।

শ্রীঅমিয়ভূষণ বসু।

বৌদ্ধ ভাষ্যকার ধর্ম্মপাল

ধম্মপাল (ধর্ম্মপাল) "নেত্তিপকরণের" প্রসিদ্ধ টীকাকার। বড়ই দুঃখের বিষয় যে আজ পর্য্যন্ত এই সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হয় নাই। আমরা এই প্রবন্ধে ধর্ম্মপাল সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিব। ইঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে 'নেত্তিপকরণ' সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি।

"নেত্তিপকরণে" বৌদ্ধ দর্শনশাস্ত্রের কতকগুলি জটিল তত্ত্বের ব্যাখ্যা আমরা দেখিতে পাই। অধ্যাপক Hardy সাহেব যে নেত্তিপকরণ সম্পাদন করিয়াছেন, তাহাতে কতকগুলি তত্ত্ব অসম্পূর্ণ আছে বলিয়া মনে হয়। ১৯১৬ সালের জুন মাসে একজন সিংহলী ভিক্ষুর নিকট হইতে আমি একখানি সিংহলী ভাষায় লিখিত 'নেত্তিপকরণের' পাণ্ডুলিপি পাই, তাহাতে 'বিপস্সনা-সম্পাতের' যে ব্যাখ্যা আছে তাহা Hardy সাহেব সম্পাদিত 'নেত্তিপকরণে' নাই। এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনা পরে করা যাইবে। সম্প্রতি ঐ পাণ্ডুলিপিখানি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট আছে।

বৌদ্ধ সাহিত্যে নেত্তিপকরণের দুইটী নাম দেখিতে পাওয়া যায়। (১) বৌদ্ধ-সদ্ধম্ম পরিজ্ঞাত হইবার বিশেষ উপায় ও পদ্ধতি এই গ্রন্থে বিবৃত থাকায় ইহার নাম নেত্তি হইয়াছে। (২)

নেত্তি শব্দের প্রকৃত অর্থ কি হইতে পারে? নেত্তি অর্থে বুঝায়, যাহা লইয়া যায়। Hardy সাহেব ইহার অর্থ করিয়াছেন,যাহা নির্ব্বাণ পথে লইয়া যায়। (৩) ধর্ম্মপাল নেত্তি শব্দের তিনটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলেন—(ক) যাহা সদ্ধম্মে সমানয়ন করে তাহাই নেত্তি; (খ) যাহা দ্বারা নীত হওয়া যায় তাহাই নেত্তি; ইহাই R. C. Childers-এর মত। (৪) ধর্ম্মপালের মতে, ধর্ম্ম-প্রচারকগণ তাঁহাদিগের শিষ্যগণকে পরিচালিত করিবার জন্য এই নেত্তিকে প্রকরণ বা উপায় স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া, ইহার "নেত্তিপকরণ" নাম হইবার অন্যতম কারণ।—(গ) বৌদ্ধ শিষ্যগণ যে প্রকরণ সাহায্যে নির্ব্বাণ লাভ করিবে, নির্ব্বাণের পথে অগ্রসর হইবে, তাহা এই নেত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত।

এই নেত্তির নাম বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের তালিকায় কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় না। ডাক্তার Rhys Davids তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে (Buddhism, American Lectures) ইহার নাম গন্ধও করেন নাই। তাঁহার বিদুষী পত্নী শ্রীমতী Caroline Rhys Davids M. A. তাঁহার সুপরিচিত গ্রন্থে পালি সাহিত্য সমালোচনা-কালে ইহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। (৫) আধুনিক বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ভাষাভিজ্ঞ বিদুষী শ্রীমতী Mabel Haynes Bode Ph. D. ব্রহ্মদেশের পালি সাহিত্যের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া ইহার নাম গন্ধও করেন নাই, অথচ নেত্তিপকরণের একটি সুন্দর ব্রহ্মদেশীয় পাণ্ডুলিপি বর্ত্তমান আছে। (৬)

যদিও ইহাকে পিটকের সহিত সমপর্য্যায়ে ফেলিতে পারা যায় না, তথাপি ইহা যে বৌদ্ধদিগের বিশেষ

১। নেত্তিগন্ধ অথবা কেবল নেত্তি নামে অভিহিত হইয়াছে। Nettipakarana, Ceylonese edition, p 3. or The History of the Ceylonese Manuscripts by Sharadai, p. 72.

২। Nettipakarana-atthakatha by Dr. F. Spenser (Incomplete copy) p. 39.

৩। E. Hardy's Nettipakarana (Introduction), P. VIII.

৪। Pali Dictionary by R. C. Childers, p. 263.

৫। Buddhism by Mrs. Rhys Davids.

৬। The Pali Literature of Burma (Prize Publication Fund, Vol. II, R. A. S.)

প্রামাণিক গ্রন্থ তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না; কেন না স্বয়ং বুদ্ধদেবই ইহার প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। (৭) বুদ্ধদেবের নিজের উক্তি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। স্বয়ং সম্বুদ্ধের বচন অবলম্বন করিয়াই সূত্রগুলির উৎপত্তি হইয়াছে এবং এই সমস্ত সূত্র হইতেই নেত্তি সমুদ্ভূত; (৮) সুতরাং নেত্তি যে বৌদ্ধদিগের অতি পুণ্যপূত গ্রন্থ তাহা প্রত্যেক বৌদ্ধই স্বীকার করিয়া লইবেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের নিকট সুপ্রসিদ্ধ মহাকাত্যায়ন এই নেত্তি অবলম্বন করিয়া উপদেশ দেওয়ায় নেত্তি সুপ্রচারিত হইয়া গিয়াছিল এবং গৌতমবুদ্ধ সংগীতিতে ইহার প্রামাণ্য প্রকটিত করিয়াছিলেন। এই 'নেত্তিপকরণ' প্রকৃতপক্ষে নবঙ্গ বুদ্ধশাসনের অনবদ্য সুন্দর ভাষ্যগ্রন্থ।

এই 'নেত্তিপকরণে'র যতগুলি পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হইয়াছে, (৯) তৎসমুদয়ের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় যে ভিক্ষুদিগের নিকট মহাকাত্যায়ন ইহা প্রচার করিয়াছিলেন। নেত্তির টীকা অনুটীকায় এই একই কথা দ্যোতিত হইয়াছে। কিন্তু মূল গ্রন্থে "কচ্চায়ন" এই নামটি প্রমাণস্বরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং নেত্তির প্রকৃত সূচনা কোন্ মহোদয় ব্যক্তি করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে স্বতঃই সন্দেহ আসিয়া পড়ে। ধর্ম্মপাল উপদেশ করিয়াছেন, "বহুমানাস্পদ মহাকচ্চায়ন বলিতেছেন" (১০) এইরূপ যে উক্তি নেত্তিপকরণে দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বে নেত্তিপকরণে সেগুলির সম্বন্ধ ছিল না। প্রথম সঙ্গীতিতে এইরূপ উক্তিগুলি সংযোজিত হইয়াছিল। "শাসন-বংশ" স্থবির বিমলসারের বহু যুক্তিপরম্পরা সম্বলিত একখানি সুন্দর বৌদ্ধ গ্রন্থ। ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে ধর্ম্মপাল নামক কোনও পুণ্যাত্মা নেত্তির একখানি টীকাগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। (১১) এই গ্রন্থেই লিখিত আছে যে তিনি আরও সাতখানি টীকা সংকলিত করেন। (১২)

"গন্ধবংশের" মতে ধর্ম্মপাল নেত্তির অর্থকথা রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এই গ্রন্থ হইতে নেত্তি সম্বন্ধে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়। (১৩) ইহাতে আরও লিখিত আছে যে, নেত্তি মহাকাত্যায়নের একখানি গ্রন্থ। স্থবির ধর্ম্মরক্ষিতের অনুরোধক্রমে ধর্ম্মপাল ইহার অর্থকথা প্রণয়ন করেন; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে অর্থকথায় লেখক যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারই উপর নেত্তির প্রকৃত রচয়িতা কে তাহা নির্ভর করিবে। পূর্ব্বে যাহা উল্লেখ করা গিয়াছে তাহাতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, বর্ত্তমান আকারের নেত্তি ধর্ম্মপালের সময়েও বিদ্যমান ছিল—অর্থাৎ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে এইরূপ পাঠযুক্ত নেত্তির অস্তিত্ব ছিল না। এখন দেখিতে হইবে যে, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পণ্ডিত ধর্ম্মপাল নেত্তির অর্থকথার রচয়িতা ধর্ম্মপাল কি না। শাসনবংশের (১৪) রচয়িতা বিমলসার ইঁহাকে প্রসিদ্ধ টীকাকার বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন তাহা আমরা

৭। Sasanavamsaatthakatha (Burmese Edition) p. 9.

৮। Buddhist Scriptures and their accounts by Dr. B. M. Barua M. A., D. Litt. (London)

৯। "[(i) B palm leaf Ms. of the India Office in Burmese Characters (see Catalogue of the Mandalay Mss. in the India Office Library by Prof. Fausboll J. P. T. S. 1896 p. 41)

(ii) palm leaf Ms. of the India Office (Phayre collection)

(iii) S : paper Ms. (brought from Subhuti by Professor Rhys Davids)]—Hardy's Nettipakarana, p. XXXV,

১০। Netti, Ceylonese Ms. p. 32.

১১। Sasanavamsa (Ceylonese edition p. 38)

১২। Ibid, p. 38.

১৩। Gandha Vamsa, Burmese Ms. p. 49.

১৪। "The Sasana Vamsa (now edited for the first time) has been known for many years to scholars. Prof. Kern in his recent Manual of Indian Buddhism (Grundriss der Indo-arischen Philologie und Alterthumskunde, III. Band, 8 Heft, p-9) speaks of it as highly important for

পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু আর একখানি গ্রন্থে চারি জন ধর্ম্মপালের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

এই গ্রন্থখানি "গন্ধবংশ" নামে পরিচিত। এই চারি জন ধর্ম্মপালের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি জম্বুদ্বীপবাসী ছিলেন, এবং ইনি ১৪ খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে নেত্তিও একখানি। ইঁহার নাম জিনালঙ্কার প্রণেতা বুদ্ধদত্তের পরে এবং আনন্দের পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। এই আনন্দ, অভিধর্ম্মের বুদ্ধঘোষ-রচিত অর্থকথার ভাষ্যকার। অতঃপর আমরা দ্বিতীয় ধর্ম্মপালের নাম চুল্লধর্ম্মপাল রূপে দেখিতে পাই। ইনি আনন্দের শিষ্য এবং একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। প্রথম ধর্ম্মপালের ন্যায় ইনিও জম্বুদ্বীপবাসী ছিলেন। তৃতীয় ধর্ম্মপাল জম্বুদ্বীপবাসী ছিলেন না, সিংহলবাসী ছিলেন। ইনি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের অথবা তাহার কিঞ্চিৎ পরে জীবিত ছিলেন। পরিশেষে যে আর একজন ধর্ম্মপালের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি জম্বুদ্বীপে অবস্থান-কালে কয়েক খানি গ্রন্থ-রচনা করিয়াছিলেন। (১৫) এক্ষণে এই চারিজনের মধ্যে কোন্ ধর্ম্মপাল যে নেত্তির রচয়িতা হইবেন, তাহাই সমস্যার বিষয়। বুদ্ধঘোষের অর্থকথা যেরূপ আকারে আমরা পাই, তাহাতে নেত্তির কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। সমন্তপাসাদিকা, সদ্ধম্মপকাসিনী, বিসুদ্ধজনবিলাসিনী, মধুরত্থবিলাসিনী, অভিধম্মসদীপনী, মনোরথপূরণী, পপঞ্চসূদনী, সারত্থপকাসিনী, কংখাবিতরণী, সম্মোহবিনোদিনী প্রভৃতি অর্থকথাতে আমরা নেত্তিপকরণের নাম পাই নাই। তবে অর্থসালিনীতে নেত্তির অপর ভাগ পেটকোপদেশের আভাস পাওয়া যায়। (১৬)

ecclesiastical history of Ceylon. The late Prof. Minaev's Recherches sur le Bouddhisme contains criminal remarks on this text...Childers, Hardy, Zoysa mention the Sasana-Vamsa as a very interesting historical work.—(Sasana Vamsa) edited by Bode p. V. (Introduction.)

১৫। Dido's Accounts of the Ceylonese Manuscripts p. 53,

(১৬) Atthasalini, Ceylonese edition, p. 92.

পরমত্থদীপনীর ভাষার সহিত অর্থকথার ভাষা তুলনা করিলে, সাদৃশ্য স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়। ইহাই অধ্যাপক Hardy সাহেবের মত। অর্থকথায় নেত্তি ও পিটক গ্রন্থ ব্যতীত যে সমস্ত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের মধ্যে একটি শ্লোক বুদ্ধদেবের অর্থকথায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্লোকটী নেত্তিভাষ্যের 'সংগহ' নামক শ্লোকাবলীর মধ্যের শ্লোক বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। ইহাতে দুইটি গ্রন্থের উল্লেখ আছে—একখানি পেটকোপদেশ, অপরখানির নাম অর্থশালিনী। প্রথম খানির রচয়িতার নাম "মহাকচ্চায়ন" এবং দ্বিতীয় খানি প্রণয়ন করিয়াছেন 'বুদ্ধঘোষ'। উল্লিখিত গ্রন্থ হইতে সহজেই নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় যে নেত্তি-রচয়িতা নিশ্চয়ই ধর্ম্মপাল ছিলেন এবং ইনি বুদ্ধঘোষের সমসাময়িক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ধর্ম্মপালের জীবিতকালের পূর্ব্বে নেত্তি মহাকাত্যায়নের নামে সূচিত হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মপালের কত পূর্ব্বে তাঁহার নামে ইহা সূচিত হইয়াছিল, সে কথা বলা যায় না।

সদুত্তরনিকায়ে একটি আখ্যায়িকা আছে, তদনুসারে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে এক সময়ে মহাকাত্যায়ন ভিক্ষুদিগের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া, একটি শ্লোকের দুইটি চরণের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এই দুইটি চরণে অধর্ম্ম ও অনর্থ, ধর্ম্ম ও অর্থ এই ভাবাত্মক শব্দ ছিল। তিনি ইহার ব্যাখ্যা করিয়া শিষ্যদিগকে "ইহা মহাকচ্চায়ন প্রদত্ত ব্যাখ্যা" এইরূপে কালে সংরক্ষণ করিতে উপদেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশও সসম্মানে প্রতিপালিত হইয়াছিল। বুদ্ধবচনের ন্যায় তাঁহার বচনও সম্মানিত ও গুরুকৃত হইয়াছিল। আরও দুইবার মহাকাত্যায়ন প্রদত্ত ব্যাখ্যা বুদ্ধ কর্ত্তৃক অনুমোদিত এবং বুদ্ধশিষ্যগণ কর্ত্তৃক প্রমাণ স্বরূপে গৃহীত হইয়াছিল। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, নেত্তিও বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রের সমকক্ষ গ্রন্থরূপে গৃহীত হইয়াছিল।

শ্রীবিমলাচরণ লাহা।

—মানসী ও মর্ম্মবাণী

খণ্ডিতা

জয়দেব

তোমার কবিতা, কবি, রাধার নিকুঞ্জ সম
উজ্জল নির্ম্মল,
সকলি সরস শ্যাম মধুর কোমল কান্ত
শান্ত ঢল ঢল।
আসে সেথা রয়ে রয়ে কালিন্দীর কলতান
হৃদি-রসায়ন,
আনে বাঁশরীর সাড়া, কদম্বের ফুলরেণু
মুগ্ধ সমীরণ।
হিন্দোলা হিল্লোল আসে, রাসের রভস মধু
অপার্থিব রাগ,
আসে নব অনুভূতি, হরির হাতের দেওয়া
আনন্দের ফাগ্‌

ভাষার অলকনন্দা, ভাবের শ্রীবৃন্দাবন,
গোবিন্দের গীত,
যৌবন-যমুনা-জলে ভাসায়ে আনিলে তুমি
আনন্দ-সচ্চিৎ।
তুমি গোবিন্দের লাগি গাঁথিয়াছ মণিহার,
ফণি মনে হয়,
তব আরতির দীপ করে যেন হরশিরে
সুধাংশু উদয়।
তোমার ব্রজের রেণু ভোলায় বিভূতি সম
রুক্ষ অভিরাম ;—
ক্রুদ্ধ হয়ে আসি ভ্রমে, তাই পুষ্পধনু লয়ে
অবষ্টব্ধ কাম।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

বিবি বউ

(গল্প)

১

সুপ্রভার বিবাহে বড়ই গোল বাধিল।—তাহার জ্যেষ্ঠতাত বিলাত ফেরত ব্যারিষ্টার। তিনি যদিও পৃথক বাড়ীতে থাকিতেন, তথাপি বিবাহ-সভায় তাঁহাকে আসিতে বলিল কে? বরপক্ষ এই আপত্তি তুলিয়া সভা হইতে বর উঠাইয়া লইয়া গেলেন। তাঁহাদেরও যে বিশেষ দোষ দেওয়া যায়, তাহা নহে। তাঁহারা ত গোড়াতেই বলিয়াছিলেন যে বিলাত ফেরতের সংস্রব থাকিলে তাঁহারা এ কাজ কিছুতেই করিবেন না। সুপ্রভার পিতা বিহারী বাবু তাঁহাদিগকে কথা দিয়াছিলেন যে তাঁহার দাদা এ বিবাহে থাকিবেন না; তাঁহারা একান্নভুক্ত নহেন এবং দাদার সহিত তাঁহার কোনও সংস্রবই নাই। বরপক্ষ যখন নানা মিষ্টবচনের মধ্যে এই কথাটিরই বারংবার উল্লেখ করিতে লাগিলেন, তখন বিহারীবাবু মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইলেন এবং মিঃ চ্যাটার্জ্জি বিস্ময় বিস্ফারিত-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

পাত্রটি সুরূপ, সদ্বংশজাত ও বিদ্বান; কাজেই কন্যা-পক্ষের আকিঞ্চন সহজে অনুমেয়। কিন্তু পাত্রের পিতা যখন বলপূর্ব্বক পাত্রকে সভাস্থল হইতে টানিয়া লইয়া চলিলেন, তখন একটা অপমানের তরঙ্গ কন্যাপক্ষের মস্তকের উপর দিয়া অতি নির্ম্মমভাবে বহিয়া গেল। মিঃ চ্যাটার্জ্জি প্রথমতঃ মনে করিয়াছিলেন যে ব্যাপারটা তাঁহার উপর বাক্যবাণ-বর্ষণেই নিঃশেষ হইয়া যাইবে। ইহা কোনও সভ্য সমাজে যে এতদূর গড়াইতে পারে, তাহা তাঁহার ধারণার অতীত ছিল। বরপক্ষ যখন ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের মত রাস্তা দিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে সারি

বাঁধিয়া চলিয়া গেলেন, তখন মিঃ চ্যাটার্জ্জির চক্ষু দিয়া অগ্নির জ্বালা বাহির হইতেছিল। তিনি সহোদরের হাত ধরিয়া অন্তঃপুরের দিকে টানিয়া লইয়া গেলেন। সেখানে বিবাহের সমস্ত উৎসব বন্ধ হইয়া গিয়াছে, নিমন্ত্রিতা মহিলাগণ পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ী ব্যতীত অন্য কোনও কর্ম্মেই রত ছিলেন না।

বিহারী বাবুকে অন্তরালে আনিয়া তাঁহার দুইটি হস্ত আপন হস্তদ্বয়ের মধ্যে লইয়া মিঃ চ্যাটার্জ্জি বলিলেন, "বিহারী, অপরাধ আমারই।" বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া আসিল। কিন্তু বিহারীবাবু তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। তাঁহার গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুধারা ছুটিল—তাহাতে ক্রোধ, লজ্জা ও ক্ষোভ সকলই মিশানো ছিল। তিনি সবলে আপনার হস্ত মুক্ত করিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। মিঃ চ্যাটার্জ্জি সে বেদনার তীব্রতা অনুভব করিয়া ম্রিয়মাণ হইলেন; বুঝিলেন, ভাইয়ের মনের অবস্থা তখন মার্জ্জনা করিবার মত নহে। আর কিছুই সেখানে তাঁহার করিবার নাই দেখিয়া তিনি দীর্ঘ-শ্বাস ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

বিহারীবাবু একেবারে শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িয়া-ছিলেন। তিনি এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে একেবারে অন্ধকার দেখিতেছিলেন। এ বিবাহে তিনি দাদাকে নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত করেন নাই। কিছুদিন হইতে ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে মনের মিল না থাকায়, মিঃ চ্যাটার্জ্জির হঠাৎ অনাহূত ভাবে আবির্ভাব বিহারী বাবুর কল্পনার মধ্যেও আসে নাই।

পূর্ব্বে দুই ভাইয়ে যখন একত্র থাকিতেন, তখন এই বিলাত-ফেরত-সংসর্গ কন্যার বিবাহের প্রতিকূল হইবে, এমন কথা বিহারীবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই হইত। সেজন্যও বটে, এবং অন্য কারণেও বটে, বিহারীবাবু ভ্রাতার স্নেহ বন্ধন কাটাইতে মনস্থ করিলেন। সুপ্রভা যেমন বড় হইয়া পড়িতে লাগিল, জ্যেষ্ঠের প্রতি কনিষ্ঠের বিরক্তির ভাব তেমনই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। গতিক বুঝিয়া মিঃ চ্যাটার্জ্জি একেবারে টালা হইতে টালিগঞ্জে গিয়া স্বতন্ত্র বাসা ভাড়া করিলেন। মাঝে যে দীর্ঘ দুইটি বৎসর কাটিয়াছে, তাহাতে দুই ভাইয়ের মধ্যে ব্যবধান ক্রমে বাড়িয়াই গিয়াছে। কিন্তু আজ সুপ্রভার বিবাহে মিঃ চ্যাটার্জ্জি অনেক চেষ্টা করিয়াও গৃহে তিষ্ঠিতে পারেন নাই। তিনি নিজে অকৃতদার; বড়ই স্নেহে ও সোহাগে সুপ্রভাকে তিনি মানুষ করিয়াছিলেন। আজ ভাই তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তিনি কি বলিয়া সুপ্রভাকে আশীর্ব্বাদ না করিয়া পারেন? তিনি সকাল সকাল কোর্ট সারিয়া, লাভচাঁদের বাড়ী হইতে নেক-লেস্, ব্রোচ ও ব্রেসলেট, বড়বাজার হইতে ঢাকাই রেশমী ও বেনারসী শাড়ী এবং বৌবাজার হইতে প্রচুর মিষ্টান্ন ও ফুল লইয়া সুপ্রভাকে সন্ধ্যাকালে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছিলেন। এ অভাবনীয় ব্যবহারের জন্য বিহারীবাবু একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। এখন হঠাৎ আধঘণ্টার মধ্যে এই যে ঘটনাটি ঘটিয়া গেল, তাহাতে তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিয়াছিল।

এমন সময়, উত্তেজিত স্বরে কথা কহিতে কহিতে, একেবারে দশ বার জন লোক সে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল এবং তাঁহাকে প্রায় শূন্যের উপর দিয়া সে বিছানা হইতে মেজের উপর এবং মেজে হইতে দ্বারদেশে এবং সেখান হইতে উঠানে আনিয়া উপস্থিত করিল। তাহারা সকলেই এক সঙ্গে কথা কহিতেছিল সুতরাং বিহারী বাবুর তাৎকালীন মনের অবস্থায়, তাহাদের বক্তব্য বিষয় বুঝিতে কিছু বিলম্ব হইল। ততক্ষণ রমণীর দলও উঠানে আসিয়া জুটিয়া গেলেন এবং বিহারীবাবু কোনও অভিমত ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বেই, তাঁহারা বিচার বিতর্ক ও সিদ্ধান্ত-স্থির করিয়া রায় দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্যাপার এই, বিহারী বাবুর সম্পর্কে মামাতো ভাই নিশানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র যামিনীকান্ত অন্য অকূলের কাণ্ডারী ও সুপ্রভার বরপাত্র রূপে বিদ্যমান, এখন মাত্র সম্প্রদানের অপেক্ষা। জাতির দায়, চিন্তার অবসর নাই।

বিহারী একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন। বোধ হয় একবার দাদার সেই অশ্রুসজল মুখখানি কেবল

তাঁহার নয়নদ্বয় খুঁজিয়া বেড়াইল। এ বিপদে দাদা থাকিলে বোধ হয় সুপরামর্শ দিতে পারিতেন। সুপ্রভাকে তিনি যেমন ভালবাসেন, আর কি কেহ তেমন বাসে?

বিবেচনার বিষয় অনেক ছিল। যামিনীকান্ত প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করিয়াছে। সেই কার্য্যটি করিতেই তাহার দুই যুগ কাটিয়া গিয়াছে। এখন সে ইণ্টারমিডিয়েট পড়ে কিংবা কমার্শ্যালে পড়ে, তাহার প্রকৃত সংবাদ কেহ রাখে না। নিশানাথ বাবুর বিষয়-সম্পত্তি সম্বন্ধেও মতভেদ রহিয়াছে। তবে পাত্রটি দেখিতে মন্দ নয়; সুস্থ, বলিষ্ঠ ও বুদ্ধিমান—এই যা'।

বিহারী বাবুকে অন্যমনস্ক দেখিয়া নিশানাথবাবু একটু ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, "বিহারী, তোমার জাত আমার জাত একই কথা ভাই। আজ তোমার জাত যায় দেখে নিশ্চিন্ত থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তাই পাঁচজনের কথায় আমি হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়েছি। তোমার যদি 'ইতস্ততঃ' থাকে, তবে ও কথা এখন থাক। পরে ধীরে সুস্থে ভেবে চিন্তে যা' হয় করা যাবে। —সেই ভাল, কি বল?"

বিহারী সে অনুযোগের স্বরে চমকিত হইলেন। প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীগণ নিশ্বাস রোধ করিয়া তাঁহার উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে, দেখিতে পাইলেন। তিনি মনঃস্থির করিয়া ফেলিলেন ও নিশানাথ বাবুর হাত দুই হস্তে গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "দাদা, আজ যে উপকার করলে, চিরকাল তা' স্মরণ থাকবে।"

নিশানাথবাবু গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন, "সে কি কথা! এ ত আপনা আপনি। তুমি কি আমার পর, বিহারী? তোমার জন্যে যদি এতটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে না পারি, তবে ত সকলই বৃথা। আমি ঐ পাড়াগেঁয়ে ভূতদের মত সমাজকে ভয় করিনে। তুমি দেখো, ঐ অসভ্য জানোয়ারদের সঙ্গে কাজ না করে' তুমি ঠকেছ কি জিতেছ—বুঝ্‌লে ভায়া? ছেলেটা এম্ এ পাশ করেছে বলেই আমাদের যা আকিঞ্চন ছিল। তা, আজকাল এম্ এ পাশ রাস্তাঘাটে গড়াগড়ি যায়। আর ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমার ভূতোও না হয় দু' বছর বাদে এম্-এ পাশ করে বেরিয়ে আস্‌বে, তখন বুঝে নিও ভায়া।"

"তা বটেই ত! তা বটেই ত"—বলিয়া সকলে সমর্থন করিলেন।

ভূতো ওরফে যামিনীকান্ত ছাদে জলপানের খুরি সাজাইয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে উঠানে আসিয়া সবে দাঁড়াইয়াছিল। ব্যাপারটা তখনও পরিষ্কার ভাবে তাহার কানে পৌঁছায় নাই। প্রাঙ্গণে ললনাকুল যখন শাঁখ বাজাইয়া উঠিলেন এবং তাহার দু'চার জন সমবয়স্ক তাহাকে প্রায় কাঁধে তুলিয়া লইয়া গিয়া চেলি পরাইতে ও চন্দনের ফোঁটা কাটিতে প্রবৃত্ত হইল, তখন সে হাসি সংবরণ করিতে পারিতেছিল না। সুপ্রভার বিবাহে আজ সে পিঁড়ি ধরিয়া সাত পাক ঘুরাইবে, এই বলিষ্ঠ যুবক সুপ্রভার সহিত এই বন্দোবস্তটাই শুধু করিয়া লইয়াছিল। তৎপরিবর্ত্তে তাহাকে বরের আসনে বসিয়া সুপ্রভার পাণিপীড়ন করিতে হইবে, কোন্ দুষ্ট বিধাতা কল টিপিয়া এই খেলা পাতিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছেন, তাহা সে কোনও মতেই বুঝিতে পারিতেছিল না।

রসুনচৌকী আবার সানাইয়ে সাহানার তান ধরিল।

২

'ভূতো দা' যখন একেবারে মহামহিমান্বিত স্বামিপদে উন্নীত হইলেন, তখন সুপ্রভার মনের ভাব কি হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস এক অন্তর্য্যামী ভিন্ন কেহই জানে না। সে প্রথম স্বামিগৃহে আসিয়া মস্ত বড় একটা ছাপার ভুলের মত সংসারে নিতান্ত অসংলগ্ন হইয়া রহিল। সচরাচর হিন্দু মেয়ের যে বয়সে বিবাহ হয়, সুপ্রভার বয়স তাহা অতিক্রম করিয়াছিল। সুতরাং তাহার যা ননদ হইতে আরম্ভ করিয়া পাড়ার রামী শ্যামী পর্য্যন্ত সকলেই তাহাকে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে জর্জ্জর করিয়া তুলিল। তারপর সে লেখাপড়া জানে, ইংরেজী

বাঙ্গালায় তাহার অভিজ্ঞতা আছে—এ খবর রটিতেও বিলম্ব হয় নাই। বেথুন কলেজে পড়া মেয়ে, বিলাত ফেরতের ভাই ঝি পিয়ানো বাজানো, ছবি আঁকা, হয়ত বা গাড়ি হাঁকাইতে অভ্যস্তা—বেহ্মজ্ঞানী হইতে আর বাকী কি? সকলেই তাহার উপর বিরূপ হইয়া রহিল।

সুপ্রভা বুঝিতে পারিল না তাহার অপরাধটা কোনখানে। তাহার জ্যাঠা মহাশয় যে তাহাকে এত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া লেখাপড়া শিখাইলেন, সে সবই কি ভুল? সে মনে করিল যে, তাহার বিদ্যাটা ত ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিবার মত জিনিষ নয়! লেখাপড়া শিখিয়া যদি সে অন্যায়ই করিয়া থাকে, তবে সে অন্যায় ত মুখের কথায় রহিত হইতে পারে না। কাহারও ফরমাস মত যে নিজেকে গড়িয়া ফেলা যাইতে পারে, ইহা ত তাহার জ্ঞানগোচরে এ পর্য্যন্ত আসে নাই। সুতরাং সে পরের সমালোচনায় নিজের উপর আস্থা হারাইল না। তাহার বিদ্যা কোনও কাজে লাগুক আর নাই লাগুক, তবুও সে বিদ্যা; অজ্ঞতার অন্ধকারের মধ্যে আলো, জীবনে সকল জিনিষের চেয়ে ভাল।

সুপ্রভার শাশুড়ী নাই, সংসারে সে আর তার বিধবা যা। ননদ বিবাহোপলক্ষে পিত্রালয়ে আসিয়াছিলেন। কিছুদিনের জন্য তিনি তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়া শ্বশুরাবাসে চলিয়া গেলেন। তিনি সঙ্গতিপন্ন লোকের বধূ; ইচ্ছা করিলে ভাল মেয়ের সঙ্গে ভাইয়ের বিবাহ দিতে পারিতেন। তাঁহার পিতা কুক্ষণে এই অলক্ষুণে 'বিবি বউ' ঘরে আনিয়াছেন, এ সোণার সংসার ছারখার হইয়া যাইবে—এইরূপ ভবিষ্যৎ বাণী করিয়া তিনি গাড়িতে উঠিলেন। সুপ্রভা মাথা হেঁট করিয়া সব শুনিল এবং পরক্ষণেই তাহার বাক্স হইতে একখানি বই বাহির করিয়া লইয়া জানলার কোণে গিয়া বসিল।

অদৃষ্ট যখন বৈশাখের সায়াহ্নমেঘের মত অন্ধকার করিয়া আসিত, তখন সে টেনিসনের কবিতা, বার্ণসের কবিতা অথবা দেশী বিলাতী ম্যাগাজিনের গল্প পড়িতে বসিত। দুঃখ ভুলিবার জন্য,সান্ত্বনা লাভ করিবার জন্য,সে পুঁথির শরণ লইত। এই নিঃসঙ্গ ও নিরবলম্ব জীবনে যখনই সঙ্গীর জন্য তাহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিত,তখনই সে তাহার অল্প কয়েক খানি গ্রন্থকে যেন সবলে হৃদয়ে চাপিয়া ধরিতে চাহিত। ননদ চারুবালা যেদিন গৃহতলে অলক্তকচিহ্ন ও সুপ্রভার হৃদয়ে দারুণ অভিসম্পাতের শোণিতারুণ রেখা রাখিয়া চলিয়া গেল, সেই দিন হইতে তাহার জীবন যেন আরও তিক্ত হইয়া উঠিল। সকলেই তাহাকে বিরক্তির চোখে দেখিতে লাগিল।

একদিন তাহার শ্বশুর স্পষ্টই বলিলেন, "দেখ বাছা, অত বিবিয়ানা আমাদের এ হিন্দুর বাড়ীতে চলবে না। সেদিন নিতান্ত তোমার বাবার জাত যায়, তাই তোমাকে ঘরে এনেছি। কিন্তু ওসব অনাসৃষ্টি অনাচার সইতে পারব না, বাপু! পড়াশুনা নিয়ে থাকৃতে হয়, বুট পরে বিবি সেজে বই নিয়ে মুখ গুঁজে থাকৃতে চাও, বাপের বাড়ীতে গিয়ে থাক। আমার এখানে ওসব বে-চাল চল্‌বে না।"

অবোধ বালিকা এইবারে বই রাখিয়া উঠিল এবং বিছানা পাতিবার উপলক্ষ করিয়া নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। নিতান্ত দয়া করিয়া যাহারা গৃহে আনিয়াছে, পায়ে স্থান দিয়াছে, তাহাদের উপর ত রাগ করা চলে না। এতই ঘৃণার সামগ্রী সে! তাহার চোখে জল আসিল। একজন তাহাকে একটু সান্ত্বনা দিতে পারিত, তাহাকে বলিয়া দিতে পারিত যে, সে নিতান্ত হেয় নয়;—সে তাহার স্বামী। কিন্তু পরিচিত 'ভুতো দা' স্বামী হইয়া প্রায় অপরিচিতের মত হইয়া পড়িতেছিল। এ ক'দিন তাহার বড় একটা দর্শনই পাওয়া যাইত না। পাড়ায় তাহাদের সখের নাট্যসমাজে আজ ক'দিন জোর রিহার্সেল চলিয়াছে। যামিনীকান্ত আহার বিশ্রামের সময় পর্য্যন্ত পাইতেছিল না। একদিন প্রসঙ্গক্রমে নাটকের কথাটা তুলিয়া যখন দেখিল যে তাহাতে সুপ্রভার হৃদয় ঠিক গৌরবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল না, তখন সে নিতান্ত বারিবিচ্ছিন্ন

মীনের মত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। যামিনী জানিত সুপ্রভার বিদ্যার কাছে তাহাকে মাথা নত করিতে হইবে। সে চিরদিন কিছু তাহার অজ্ঞতা চাপিয়া রাখিতে পারিবে না। একদিন না একদিন স্ত্রীর নিকটে তাহাকে অবজ্ঞার পাত্র হইতেই হইবে। এই আশঙ্কায় তাহার স্বাভাবিক পৌরুষাভিমান বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। স্ত্রী-জাতিকে যতই সম্মানের চোখে আমরা দেখি না কেন, পুরুষের হৃদয়ে এমন একটি আভিজাত্যের গৌরব আছে যে তাহাতে আঘাত লাগিলে সে কোন ক্রমেই সহিতে পারে না। যামিনীকান্ত এই বিদুষী বধূকে গৃহে আনিয়া কেবলই আশঙ্কা করিতে লাগিল যে পরীক্ষার অপ্রিয় মুহূর্ত্ত ক্রমশই নিকটবর্ত্তী হইতেছে। বাঙ্গালা এবং ইংরাজী উভয় ভাষাতেই তাহার জ্ঞান মূর্ত্তিমন্ত। সুতরাং কথা কহিতে গেলেই ত ধরা পড়িয়া যাইবে। তাহাদের থিয়েটারে যে 'জনার' অভিনয় হইবে, তাহাতে জনার ভূমিকাই গ্রহণ করিয়াছিল যামিনীকান্ত। কিন্তু সুপ্রভা যদি তাহাকে জনার কথাগুলি বেশ সুসঙ্গতরূপে ব্যাখ্যা করিতে বলে, তবেই ত গোলমাল বাধিবে। এইরূপ নানা অলীক অমূলক ও কাল্পনিক আশঙ্কার বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়া যামিনীকান্ত প্রায় ফেরার হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সকালে দুপুরে, সন্ধ্যায়, সব সময়ে তাহার নাটকীয় আড্ডাই একমাত্র আশ্রয়স্থান হইয়া দাঁড়াইল। অধিক রাত্রে ফিরিয়া সে যখন শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিত, তখন প্রায়ই সুপ্রভা ঘুমাইয়া থাকিত। সুপ্রভা যেদিন জাগিয়া থাকিত, সেদিনও যামিনীকান্ত বিনা বাক্যব্যয়ে পাশ বালিশটি সজোরে বক্ষে চাপিয়া হাই তুলিতে আরম্ভ করিত। সুপ্রভা একদিন সাহস করিয়া বলিল, "রোজ এত রাত্রি করলে অসুখ হবে না ত ?"

"কিছু না"—বলিয়া যামিনী পাশ ফিরিল। তবুও সুপ্রভা ছাড়িল না; বলিল, "দেখ আমার একলা থাকতে বড় ভয় করে।"

"কেন তুমি ত আর কচি খুকীটি নও।"

না। কেন না শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়া অবধি বয়সের জন্য তাহাকে অনেক লাঞ্ছনাই সহিতে হইতেছে। সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। যামিনী বোধ হয় মনে মনে একটু লজ্জিত হইল এবং একটু শোধরাইয়া লইবার জন্য বলিল, "তুমি ত ততক্ষণ বই পড়েই বেশ কাটিয়ে দিতে পার!"

যামিনী ভাবিয়াছিল যে কথাটি তাহার মনোমত হইবে। কিন্তু ইহার মধ্যে যে কতখানি বেদনা ও অভিমান সঞ্চিত হইয়া ছিল, তাহার কোন খোঁজই সে রাখিত না। সুপ্রভা শুধু একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। সে ভাবিল, লেখাপড়া শিখিয়াছে বলিয়াই তাহার যত অপরাধ! সুপ্রভা আর কোনও কথা বলিল না দেখিয়া যামিনীও ক্ষুণ্ণ হইল। সে মনে করিল, "এ সব বিলাতী ধরণের মেয়েদের অন্ত পাওয়া ভার।" নিজ গ্রহ ও অদৃষ্টের প্রতি দোষারোপ করিতে করিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া সুপ্রভা দেখিল, তাহার বইয়ের বাক্সটি অদৃশ্য হইয়াছে। সে উঠিবার পূর্ব্বেই তাহার স্বামী দ্বার খুলিয়া রাখিয়া বাহিরে গিয়াছিলেন। কাজেই সে প্রথমতঃ বুঝিতে পারিল না, যে অন্য বাক্সের স্থানে ভুলক্রমে তাহার বাক্সটি তিনি লইয়া গিয়াছেন অথবা অন্য কেহ বাক্সটি সরাইয়াছে। তাহার অপর বাক্স, যাহা মূল্যবান বস্ত্র ও অলঙ্কারে পরিপূর্ণ ছিল, তাহা স্থানচ্যুত হয় নাই; অথচ বইয়ের বাক্সটি যে স্থানে রক্ষিত হইয়াছিল, সেই স্থানটিই শূন্য। গৃহকর্ম্মের অবসরে সদর ও অন্দরের সর্ব্বত্র খুঁজিয়া যখন কোথাও সে বই ও বাক্সের এতটুকু চিহ্ন মিলিল না, তখন তাহার মন দুঃখ অপেক্ষা চিন্তার ভারে অবসন্ন হইয়া পড়িল। যাহাঁরা এমন করিয়া তাহাকে শাস্তি দিবার ষড়যন্ত্র করিতে পারে, তাহাদের সঙ্গে কেমন করিয়া সে বনাইয়া থাকিবে, এই চিন্তায় সে হাঁপাইয়া উঠিল। তাহার বিবাহিত জীবনের একটি মাস সবে কাটিয়াছে, ইহারই মধ্যে যদি এমন ঘটিল, তবে দীর্ঘ জীবন এত

ভাবিয়া সে আকুল হইল। যেখানে আদর পাইবার আশা থাকে, সেখানে উপেক্ষা, লাঞ্ছনা অবমাননা পাইলে প্রাণে বড়ই আঘাত লাগে। সুপ্রভার হৃদয় আঘাতে আঘাতে জর্জ্জর হইয়া উঠিল।

৩

সুপ্রভা ছুটি পাইয়াছে। যে শ্বশুরবাড়ীতে অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঠিক বিদ্রোহ না করিলেও, তাহার মন যে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল, একথা কাহারও জানিতে বাকী ছিল না। সে জন্যও বটে এবং আর একটি ঘনয়মান সংশয়ের জন্যও বটে, তাহাকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সে সংশয়টি আর কিছু নহে, যামিনী বধূর প্রতি বিমুখ হইয়াছে, এই আশঙ্কা করিয়াই নিশানাথ বাবু সুপ্রভাকে রওনা করিয়া দিয়াছেন। সেও যে ইহা বুঝিতে পারে নাই, তাহা নহে; তথাপি আশা মানুষকে নাচাইয়া বেড়ায়। সুপ্রভা ভাবিয়াছিল, হয়ত তাহার বুঝিতে ভুল হইয়াছে, হয়ত শ্বশুরবাড়ীতে তাহার একটি আশ্রয়-স্থান সে রচনা করিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু যখন মাসের পর মাস অতীত হইতে চলিল, অথচ কেহই তাহাকে লইবার জন্য যত্ন করিল না, কেহই তাহাকে একটি স্নেহ সম্ভাষণ দিয়া শুধাইল না, তখন সে বিশ্বাস হারাইতে আরম্ভ করিল। ভাবিল যে বিধাতাও তাহার প্রতি বিমুখ হইয়াছেন। সে যে অত্যাচার লাঞ্ছনা পাইয়া আসিয়াছিল, তাহা সে ভুলিয়া গেল। তাহার বই পড়ার বাতিক কমিয়া গেল। তাহার মন অনেক সময় সেই অনাদর-ম্লান দিনগুলির স্মৃতি অতি আদরের সহিত আলোচনা করিয়া কাটাইত।

তাহার পিতা তাহাকে আগের মত আর সময়ে অসময়ে ডাকিতেন না। এখন সে সম্মুখে গেলেই, তাঁহার মুখমণ্ডল বর্ষণোন্মুখ মেঘখণ্ডের মত জলভারাবনত হইয়া পড়ে। সেই জন্য সেও বড় কাছে ঘেঁষিতে চাহিত না। বিহারী বাবু যে তাঁহার কৃতকর্ম্মের জন্য লজ্জিত, তাহা সে না বলিলেও বুঝিত। তাহার জেঠা মশায়ের সহিত এই বিবাহ লইয়া তাহার পিতার যে মনোমালিন্য আরও বাড়িয়াছে, সে কথাও তাহার শুনিতে বাকী নাই। জেঠামহাশয় তাহার জন্য দুঃখ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার সাধের পুত্তলিকে যাহারা এমন করিয়া জলে ফেলিয়া দিয়াছে, জীবনে তিনি আর তাহাদের মুখদর্শন করিবেন না।" আজ হইতে আমি মনে করিব সুপ্রভা মরিয়াছে"—এই কথা বলিয়া তিনি এ গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন। তাহাকে ঘিরিয়া যে একটা অশান্তির দাবাগ্নি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল, ইহা মনে করিয়া সুপ্রভা মরমে মরিয়া যাইত।

এইরূপে প্রায় বৎসরাধিক কাটিয়া গেল, তথাপি শ্বশুরবাড়ী হইতে সুপ্রভার কেহ খোঁজ লইল না। সুপ্রভার মাতা অনুযোগ জুড়িয়া দিলেন, কিন্তু বিহারী বাবু অটল রহিলেন। তিনি অযাচিত ভাবে কন্যাকে কিছুতেই পাঠাইবেন না। একবার যে ভুল করিয়াছেন, সারা জীবন তাহার জন্য অনুতাপ করাই যদি বিধাতার অভিপ্রেত হয়, তবে সে ভুল আবার করিয়া কাজ নাই।

কিন্তু সুপ্রভা এ সমস্যার একটি সহজ সমাধান করিয়া দিল। একদিন সে তাহার বাবার কাছে গিয়া বলিল যে সে আজ বৌবাজার যাইবে। বিহারীবাবু আফিসের কাপড় পরিতেছিলেন, গড়গড়ার নল তাঁহার হস্ত হইতে পড়িয়া গেল, তিনি সভয় বিস্ময়ে কন্যার দিকে চাহিয়া রহিলেন। সুপ্রভা একখানি পত্র তাহার পিতাকে দেখাইল। সে পত্রে তাহার বা শ্বশুরের জীবন-সংশয়কর পীড়ার সংবাদ দিয়াছে এবং শেষ দেখা দেখিবার জন্য তাহাকে যাইতে লিখিয়াছে। বিহারী বাবু সন্দিগ্ধ ভাবে বলিলেন, "ভূতো ত যেতে লেখেনি।" সুপ্রভা বলিল, "না-ই বা লিখ্‌লেন্! ব্যারাম ত হয়েছে ঠিক! সেই জন্যে বোধ হয় লেখ্‌বার অবকাশ হয়নি। আমায় যেতে হবে, বাবা।"

একথার উপর আর কথা চলে না। বিহারীবাবু তৎক্ষণাৎ গাড়ী ডাকিতে চাকরকে পাঠাইয়া গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিতে চলিলেন। গৃহিণী কন্যার

সহিত প্রয়োজনীয় দ্রব্য গুছাইতে বসিলেন। সুপ্রভা তাঁহাকে বিরত হইতে বলিয়া একটি তোরঙ্গে মাত্র থান-কয়েক কাপড় লইয়া গাড়ীতে উঠিল। গহনার বাক্সটিও লইতে ভুলিল না।

৪

সুপ্রভা আসিয়া দেখিল শ্বশুরের জীবনবর্ত্তি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। কয়েকদিন রাত্রি জাগিয়া তাহার মা পাশের ঘরে একটি মাদুর বিছাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার স্বামী আফিসে চলিয়া গিয়াছেন। যখন তিনি ফিরিয়া আসিলেন, তখন সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে দেখিতে পাইলেন মুমূর্ষু পিতার পার্শ্বে সুপ্রভা বসিয়া আছে। সুপ্রভার সে মূর্ত্তিটি তাহার চোখে বড়ই সুন্দর দেখাইল। বিরলাভরণা, নাতিশুক্লবসনা করুণার্দ্রনয়না এই শুশ্রূষাকারিণী তাহার স্ত্রী হইলেও হইতে পারে। এতদিন সে কেবল স্ত্রীর সৌখীন, বেশ-বিন্যাস-কুশলা, পাণ্ডিত্যাভিমানিনী মূর্ত্তিই মনে মনে কল্পনা করিয়া তাহার প্রতি একান্ত বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল যে এমন একজন রমণীকে লইয়া 'ঘর করা' একান্ত অসম্ভব—বিশেষতঃ তাহার মত 'খুথ্‌খু সুথ্‌খু' ব্যক্তির পক্ষে। কুলীনের পক্ষে দ্বিতীয় দারে বাধা নাই—এতদিন সে চেষ্টাও যে একেবারে হয় নাই, তাহা নহে। তবে বিলাত ফেরতের বাড়ীতে ক্রিয়া করার জন্য যেটুকু দোষ স্পর্শিয়াছিল, তাহার জন্য অনেক কন্যাসম্প্রদানেচ্ছু হটিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আজ সুপ্রভাকে দেখিয়া তাহার লজ্জা উপস্থিত হইল।

সে ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া সুপ্রভা ধীরে ধীরে বলিল, "বাবা এখন ঘুমুচ্ছেন, তুমি কাপড় ছেড়ে হাতে মুখে জল দিয়ে এস গে।"

যামিনীকান্ত কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া পিতার শয্যাপার্শ্বে জড়সড় হইয়া বসিল এবং সুপ্রভার শুশ্রূষা-তৎপরতা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। নিশানাথ একটু চৈতন্যলাভ করিয়া যামিনীকান্তকে দেখিয়া বলিলেন, "তুমি কি ছোট বৌমাকে আনতে পাঠিয়েছিলে?"

যামিনীকান্ত উত্তর করিল, "না।"

নিশানাথ একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তবে, আজ হঠাৎ এঁদের মনে পড়্‌ল যে! তা' বেশ ত! তোমার ঘরকন্না এখন তোমারই বুঝে নেওয়া ভাল; আমি ত যেতে বসেছি।"

সুপ্রভা মাথা হেঁট করিল; কিন্তু শ্বশুর ঐ কয়েকটি মর্ম্মান্তিক কথা বলিতে যাইয়া যেরূপ ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, তাহাতে সুপ্রভা তাঁহাকে ক্ষিপ্রতার সহিত শুশ্রূষা না করিলে, তখনই হয়ত তাঁহার মূর্চ্ছা হইতে পারিত।

যামিনীকান্ত একটু বিমর্ষ হইয়া পড়িল; সে বুঝিল যে সুপ্রভাকে দেখিয়া তাহার পিতা সন্তুষ্ট হন নাই এবং এখন তাহাকে বিদায় করিয়া দিতে পারিলেও তাঁহার মনে কতকটা শান্তি যে পুনরায় না আসে, তাহা নহে।

যামিনী সে রাত্রি শুধু ঐ শেষোক্ত সংকল্প স্থির করিয়াই কাটাইল। একবার সুপ্রভার বর্ষাবিধৌত জ্যোৎস্নার মত মুখখানির কথা মনে পড়িতে লাগিল, আবার তাহার পিতার মুমূর্ষু অবস্থার স্পষ্ট ইঙ্গিত স্মরণ হইল। পিতার অবাধ্য হওয়া তাহার পক্ষে অসাধ্য।

কিন্তু তাহার সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইতে বিলম্ব ঘটিয়া গেল। নিশানাথের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতে দেখা গেল এবং সুপ্রভার অক্লান্ত শুশ্রূষা সত্ত্বেও তিনি এক সপ্তাহের মধ্যেই দেহরক্ষা করিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর যামিনীকান্ত স্ত্রীর সহিত ভাল করিয়া মিশিতে পারিল না। পিতার অন্তিম কালের ইচ্ছা যে সে মানিয়া চলিতে পারে নাই—ইহাই তাহাকে সর্ব্বক্ষণ পীড়া দিতে লাগিল। সে সময়ে যদি সে সুপ্রভাকে তাহার বাপের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিতে পারিত, তবে ত আজ এই অবাধ্যতার অপরাধ এমন ভাবে তাহাকে শাস্তি দিত না! কেন সে পারে নাই? পিতার শুশ্রূষার অভাব ঘটিত? কখনই না—সে নিজে এবং তাহার বন্ধুবান্ধবেরা নিশ্চয়ই এ শুশ্রূষার ভার

লইতে পারিত। যামিনী আপনাকে ক্ষমা করিতে পারিল না।

পিতৃ-শ্রাদ্ধের উপলক্ষে ভগিনী দু'দিনের জন্য আসিয়া 'বিবি বউ'কে উপলক্ষ করিয়া অনেক কথাই শুনাইয়া গিয়াছে। শ্রাদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ভ্রাতাকে সাহায্য করিবার সময় কিন্তু সে অতি সংক্ষেপে জবাব দিয়াছিল, "ওঁর হাতে টাকা নেই। কি করি বল ?" পিতার অসুখের সময়ও সে ভগিনীর সাহায্য চাহিয়াছিল, কিন্তু ভগিনী তখন সাহায্য করা দূরে থাক্, এদিক দিয়াও মাড়ায় নাই। এখন যামিনী বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িল। শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন প্রাতে হঠাৎ দুঃস্বপ্নের দোহাই দিয়া ভগিনী সরিয়া পড়িলেন।

এরূপ ভাবে আশ্রয়হীন হইয়া যামিনী হতাশ হইয়া পড়িল।

সুপ্রভা সমস্তই বুঝিল। সে যামিনীকে নির্জ্জনে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "শ্রাদ্ধে কি অনেক লোক বলা হয়েছে ?"

যামিনী অন্যমনস্ক ভাবে বলিল, "মন্দ নয়। প্রায় তিন শ হবে।"

সুপ্রভা বলিল, "কাল তিন শ লোকের জলপান দিতে হবে, অথচ আজ এমন করে' চুপ করে' বসে' ভাব্‌লে ত আর জিনিষপত্র আপনি এসে ঘুরে উঠ্‌বে না। এই নাও, আমার এই ক'খানা গহনা কোথাও রেখে তিন চার শ' যা পাও নিয়ে এস। তার পর তখন টাকা হ'লে ঘরের জিনিষ ঘরে নিয়ে এলেই হবে।"

যামিনী কথাগুলি শুনিল, বিস্মিত হইল এবং সজল নেত্রে একবার চাহিয়া দেখিল; একবার মনে বুঝি ঈষৎ সন্দেহও আসিয়াছিল যে এই স্বার্থত্যাগের অন্তরালে হয়ত গর্ব্ব আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু একবার চাহিয়াই সে বুঝিল যে সুপ্রভার দৃষ্টিতে কত লজ্জা, কত সঙ্কোচ, কত নির্ভর মাখানো ছিল।

শ্রাদ্ধের ব্যয় এইরূপে নির্ব্বাহিত হইল। যামিনী-কান্তের মনের মেঘ কতকটা কাটিয়া গেল। সে লক্ষ্য করিল যে এখন তাহার দিদির 'বিবি বউ' ভ্রমেও আর বেশবিন্যাস করে না বা বই লইয়া বসে না। সে নিজে এক সংবাদ পত্রের অফিসে কাজ করিয়া সন্ধ্যায় বাড়ীতে ফেরে। আফিস হইতে ফিরিয়া একবার তাহার আড্ডায় যাওয়া চাই। যেদিন যাইতে একটু বিলম্ব হয়, সে দিন ছোকরার দল বাহিরে আসিয়া চেঁচামেচি জুড়িয়া দেয়। "কি হে যামিন্ দা একেবারে জমে' গেলে নাকি ?" "কার্টেন লেক্‌চার শোনা হচ্চে না কি ?" ইত্যাদি প্রশ্ন-সম্ভাষণে বেচারীকে বিব্রত করিয়া তোলে। সব সময়ে যে তাহাতে সুরুচির পরিচয় থাকে, তাহাও নহে। যামিনী লজ্জিত ভাবে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে দলে গিয়া মিশে। যখন ফেরে, তখন রাত্রি ১১টা বাজিয়া যায়।

যামিনীর মধ্যে মধ্যে মনে হইত যে তাহার স্ত্রীর সময় কাটানো বোধ হয় শক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কেন না এবার ত বাপের বাড়ী হইতে সে কোনও বইয়ের বাক্‌স আনে নাই; যে বাক্সটি আনিয়াছে, তাহাতেও বইয়ের চিহ্ন সে দেখে নাই। একদিন প্রভাতে হঠাৎ সুপ্রভা দেখিল তাহার শয়ন গৃহে সেই হারানো বাক্সটি রহিয়াছে—সে বিস্মিত হইল না। সে দিন যামিনী আফিসে গেলে, সুপ্রভা নিজ হস্তে বইগুলি ঝাড়িয়া মুছিয়া বাহিরের ঘরের আলমারীতে গুছাইয়া রাখিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে সে বাহিরের ঘর ও আলমারী পরিষ্কার করিয়া রাখিল। যামিনী সেদিন ঘরে ঢুকিতেই দেখিতে পাইল যে লক্ষ্মীর আলিপনার মত আজ কাহার করচিহ্ন সমস্ত গৃহকে সুশ্রী ও সুশৃঙ্খলাযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। সুপ্রভার বইগুলিও যে তাহার অযত্নরক্ষিত বইগুলির পার্শ্বে স্থান পাইয়া সমস্ত আলমারীটিকে একটি মৌন সৌন্দর্য্যে বিভবযুক্ত করিয়া তুলিয়াছে—তাহাও যামিনীর দৃষ্টি এড়াইল না।

৫

যামিনী যাহা রোজগার করিত, তাহাতে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন। সে 'প্রতিধ্বনি' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার সংবাদদাতার কার্য্য

করে। আমোদ-প্রমোদ ও ক্রীড়া কৌতুক সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করাই তাহার প্রধান কার্য্য ছিল; আফিসের কার্য্যও কিছু কিছু তাহার করিতে হইত। সে যে কি কাজ করে সুপ্রভা তাহার খোঁজ লয় নাই। পাছে স্বামীর মনে কোনও সঙ্কোচ উপস্থিত হয়, এই জন্যই সে তাহার ব্যক্তিগত ব্যাপার সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করিতে বিরত ছিল। কিন্তু সংসার আর কোনও মতেই চলে না। আফিসে অতিরিক্ত পরিশ্রম ও আড্ডায় রাত্রি জাগরণ করিয়া করিয়া যামিনীর স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার বলিষ্ঠ দেহ আনত হইয়া পড়িল।

সুপ্রভা তাহার নিতান্ত আদরের সামগ্রী লেখা-পড়া ছাড়িয়া দিয়া গৃহকর্ম্মে একরূপ মনোনিবেশ করিয়াছিল। এমন দিন ছিল, যখন পড়াশুনা কিছু না কিছু করিলে তাহার দিন যেন কাটিত না। সে নেশা সে হেলায় পরাজয় করিয়াছে। কিন্তু আবার এ কি বিপদ! স্বামী অসুস্থ হইয়া পড়িলে, সে কেমন করিয়া বাঁচিবে? সে ভাবিত হইল।

যামিনী স্ত্রীর কাছে পরীক্ষা দিতে হওয়ার আতঙ্ক হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে, কিন্তু তাহার মানসিক দৈন্য তাহাকে এখনও লজ্জা দিতে ছাড়ে নাই। সে ভাবিত, তাহার স্ত্রী বোধ হয় কোনও বিদ্বানের হাতে পড়িলে সুখী হইতে পারিত। তাহার মত একজন অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত স্বামীর হস্তে পড়িয়া যে এমন বিদুষী রমণী চিরকাল অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে বাধ্য —ইহা সে একরূপ স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মনে করিয়াছিল। সেই জন্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা ব্যবধান যেন কিছুতেই ঘুচিল না। মনের যে স্বাভাবিক আদান প্রদানে উভয়ে উভয়ের জীবনকে সরস ও স্নিগ্ধ করিয়া তুলিতে পারিত, তাহার একান্তই অভাব ঘটিয়াছিল। যামিনী অসুখের কথা পর্য্যন্ত স্ত্রীকে খুলিয়া বলিতে পারিল না।

একদিন সুপ্রভা তাহার মা'কে বলিল, "দিদি, আমার ত ভাই ভাল বোধ হচ্ছে না। একজন ভাল ডাক্তারকে দেখালে হ'ত না?"

সুপ্রভার ছলছল অনুনয়পূর্ণ চোখ দুটিতে যে কি আশঙ্কা ও আবেগ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা তাহার মায়ের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সে অনাথা বিধবাকে এরই মধ্যে সুপ্রভা একান্ত আপনার করিয়া লইয়াছিল। তিনি সুপ্রভার কথায় দু'এক বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন; বলিলেন, "ডাক্তারে ঠাকুরপোর অসুখ সারতে পারবে না বউ! আর তারই বা টাকা কোথায়?"

মায়ের কথায় সুপ্রভা চক্ষু বিস্ফারিত করিল। তিনি যে কেন এ কথা বলিলেন সুপ্রভা তাহা বুঝিতে পারিল না। সুপ্রভার মৌন প্রশ্ন তাহার মা বুঝিতে পারিলেন; তিনি বলিলেন, "বুঝতে পাচ্ছনা? কাঁচা বয়সে সংসারের চাপে বেচারী শুকিয়ে যাচ্ছে। টাকার অভাবেই ওকে পাগল করে' দিলে। তোমার গয়নাগুলি ছাড়িয়ে আনতে পারে নি বলে বেচারী মুখ দেখাতে লজ্জিত হয়। তার পরে কি করে' সংসার চলবে, সেই ভাবনায় ভাবনায় ও ব্যামো করে ফেলেছে। ভগবান না বাঁচালে আমাদের আর উপায় নেই বউ।"

সুপ্রভা বলিল, "কেন, উনি যা আনছিলেন তাতে ত সংসার বেশ চলে যাচ্ছিল!"

মা বলিলেন, "হাঃ পোড়া কপাল, ওকে কি আর বেশ চলে' যাওয়া বলে? সেই চিন্তাই ত ওর সর্ব্ব-ক্ষণ; বলে, বাবা একটা বে' দিয়ে গেলেন, অথচ তাকে খাওয়াব কি, তার ঠিকানা নেই, তার পরে সে কাগজওয়ালারা চিঠি দিয়েছে যে এইমাস থেকে মাইনে বন্ধ করে দেবে। সেই ভাবনায় ও আরও অস্থির হয়ে পড়েছে।"

"তারা কি এমন অবিচার করবে দিদি? আমি একবার সে চিঠিখানা দেখতে পারি?"

"সে ভাই ইংরেজিতে লেখা"—বলিয়াই মা থামিয়া গেলেন। তাঁহার মনে পড়িল ইংরেজি চিঠি সুপ্রভা পড়িলেও পড়িতে পারে। তিনি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত

হইলেন এবং যামিনীর শয্যার উপর হইতে চিঠিখানা তুলিয়া লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। যামিনী তখন নিদ্রিত ছিল।

সুপ্রভা দু'তিন বার চিঠিখানি পড়িল এবং সযত্নে পুনরায় খামে রাখিয়া দিল। 'প্রতিধ্বনি' পত্রের সম্পাদক লিখিতেছেন, "বহুদিন আপনার অনুপস্থিতি হেতু আফিসের কার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে, এজন্য অস্থায়িভাবে আপনার স্থলে লোক নিযুক্ত করা হইল। সুতরাং বর্ত্তমান মাস হইতে আপনার বেতন নূতন ব্যক্তিকে দেওয়া হইবে।" সম্পাদক পরিশেষে দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন যে যদি সপ্তাহে অন্ততঃ কিছু প্রবন্ধও তিনি জোগাড় করিয়া দিতে পারিতেন, তাহা হইলেও সত্ত্বাধিকারীকে বলিয়া কহিয়া তিনি তাঁহার অর্দ্ধ বেতন মঞ্জুর করিয়া দিতে পারিতেন।

সুপ্রভা ভাবিতে লাগিল। সেদিন সে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত লেখা পড়ায় কাটাইল। তাহার মা ভাবিলেন, যাক্ ঐ করিয়া যদি অভাগীর মনে শান্তি হয়, তবে থাক্ ও লেখাপড়া লইয়া; অদৃষ্টে কি যে আছে!" তিনি মাঝে মাঝে যামিনীর খবর লইতে লাগিলেন এবং সুপ্রভা ঘরে গেলে নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করিতে গেলেন। সুপ্রভা বাহিরের ঘরের আলমারী হইতে তাহার একখানি গ্রন্থ বাহির করিয়া, তাহা হইতে একটি প্রবন্ধ সংকলন করিতেই রাত্রি করিয়া ফেলিয়াছিল। পরদিন সে প্রভাতে একখানি খামে পুরিয়া প্রবন্ধটি সম্পাদকের নাম লিখিয়া পাঠাইয়া দিল। চাকরকে বলিয়া দিল, "জিজ্ঞাসা করিলে বাবুর নাম বল্‌বি, জবাব নিয়ে আসিস্।"

যথাকালে চাকর জবাব লইয়া ফিরিল। কম্পিত হস্তে চিঠি খুলিয়া সুপ্রভা দেখিল, সম্পাদকের সুর বদলাইয়া গিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, "আপনার অসুখ সারিতেছে না বলিয়া আমরা সকলেই দুঃখিত। আপনি যাহাতে পুরা বেতনে আরও এক মাসের ছুটি পান, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য আমি অদ্যই সত্ত্বাধিকারীর সহিত দেখা করিতে চলিলাম। আপনার প্রেরিত প্রবন্ধটি পাইলাম। অতি সুন্দর হইয়াছে। এই সপ্তাহেই যাইবে। আরও এমন দু'একটি দিতে পারিলে যথার্থ উপকার হয়। ভাল প্রবন্ধের সংখ্যা বড়ই অল্প। আগামী সপ্তাহে এইরূপ আর একটি প্রবন্ধ চাই-ই চাই।"

পরদিন প্রত্যূষে আফিসের খামে টাইপ করা চিঠি আসিল। যামিনী বৌদিদিকে ডাকিয়া শুনাইল, সত্ত্বাধিকারী পুরা বেতনে তাহার ছুটি মঞ্জুর করিয়াছেন। তাহার মুখে চোখে গর্ব্ব-পুলকিত দীপ্তি দেখিয়া বৌদিদি আনন্দে আত্মহারা হইলেন। তিনি বৌকে ডাকিতে ছুটিলেন। বৌ সংবাদ শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল না—আনন্দে অধীর হইল না; কৃতজ্ঞতায় কাঁদিয়া ফেলিল এবং যোড়করে ভগবানকে ধন্যবাদ দিল।

তাহার স্বামী ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

৬

সুপ্রভার শুশ্রূষার মধ্যে এমন একটা ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল যাহা তাহার স্বামীর অজ্ঞাতসারে সঞ্জীবনীর কার্য্য করিতেছিল। তাহাতে স্নেহের অধীরতা ছিল না, অনাবশ্যক যত্নের আধিক্য ছিল না, উচ্ছ্বসিত করুণার আবিলতা ছিল না। রোগীর পক্ষে যাহা কল্যাণকর, তাহার সুস্পষ্ট ধারণামূলক নিপুণতা ছিল, আর সেই সঙ্গে চোখের কোণে প্রচ্ছন্ন স্নেহের যে অকারণ মসৃণতা ফুটিয়া উঠিত, তাহাতে রোগীর মনে অপূর্ব্ব শান্তি আনিয়া দিত।

চারুবালা ভ্রাতার অসুখের সংবাদ পাইয়া দুই তিনবার দেখিতে আসিয়াছিলেন। বিবি বউয়ের আচরণে তিনিও বিস্মিত না হইয়া পারেন নাই। বিবাহের পূর্ব্বেও তিনি সুপ্রভাকে দুই একবার দেখিয়াছিলেন, বিবাহের পরেও দেখিয়াছেন, কিন্তু এমন দৈন্য তাহার কখনও দেখেন নাই। এই শীর্ণ চেহারা, এমন মলিন বসন, এমন গৃহকর্ম্ম-নিপুণতা, এমন শুশ্রূষা-পরতা তিনি সুপ্রভার পক্ষে কখনও সম্ভব বলিয়া মনে করেন নাই। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? তাঁহার মনে বিবি বউয়ের প্রতি অনুকূলভাব একটুও ছিল না। হিন্দুর ঘরে এমন

বউ কখন কি লক্ষ্মীশ্রী আনিতে পারে ! এ বউ আসা অবধি সংসারে আগুন লাগাইয়াছে। তাহার পিতার মৃত্যু, ভ্রাতার অসুখ—এ সবই যে বিবি বউয়ের জন্য, সে কি আর বলিতে হইবে ? হতভাগিনী বৌদিদি কেন যে বোঝে না, চারুবালা সেইটি-ই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। বৌদিদির অন্য কথা নাই—শুধু টাকা দাও, নহিলে ভাইয়ের প্রাণ বাঁচে না। কেন, সংসার ত দিব্য চলিয়া যাইতেছে !

সংসার দিব্য চলিয়া যাইতেছে বটে ; কিন্তু সুপ্রভা আপনাকে বলি দিতে বসিয়াছে। এই দুই মাস তাহার চোখে ঘুম নাই বলিলেও চলে। সে স্বামীকে ঘুম পাড়াইয়া প্রবন্ধ লিখিতে বসে—আর কোনও কোনও দিন প্রভাত-বিহগের সঙ্গীতে আসন পরিত্যাগ করে। তাহার জেঠা মহাশয়ের কাছে লোক পাঠাইয়া সে অনেক আধুনিক পুস্তক ও পত্রিকা আনাইয়া লইয়াছে।

যামিনীকান্ত এ সকল কিছুই জানিত না। সে তাহার পুরা মাহিয়ানা পাইতেছে ও পাইবে, এই আশায় তাহার রোগশীর্ণ দেহে বলসঞ্চয় করিয়াছিল। কিন্তু একদিন তাহার মনে একটা প্রকাণ্ড সংশয়ের ধাক্কা লাগিল—তখন সে অনেকটা সুস্থ হইয়াছে। সম্পাদক তাহাকে একখানি দুইশত টাকার চেক পাঠাইয়াছেন এবং লিখিয়াছেন "এ টাকা অতিরিক্ত প্রবন্ধের জন্য দেওয়া হইল ;—জনসাধারণ প্রবন্ধগুলি বিশেষ আদরের সহিত পাঠ করিতেছে—কাগজের গ্রাহক-সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। 'স্ত্রীশিক্ষা' ও 'গৃহকর্ম্ম' শীর্ষক প্রবন্ধটি যে সংখ্যায় বাহির হইয়াছিল, তাহা পুনর্ব্বার মুদ্রণের আবশ্যক হইয়াছিল। পৃথিবীর সর্ব্বদেশের স্ত্রী-শিক্ষা পদ্ধতির এরূপ সম্পূর্ণ ও সারগর্ভ আলোচনা এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় হয় নাই।"

সুপ্রভা দেখিল, চেক ও চিঠি—এবং স্বামীর বদন মণ্ডলে সংশয়ের অন্ধকার। তাহার মন দমিয়া গেল। এখন সে যে কি করিবে, স্থির করিতে পারিল না। স্বামীর নিকট সমস্ত বলিয়া ক্ষমা চাহিবে ? একবার লেখাপড়ার জন্য সে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, আবারও যদি হয় ? এ চিন্তায় তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল। সেই দিনই রাত্রে একটি কাণ্ড ঘটিল, যাহাতে সে ভয়ে অস্থির লইয়া পড়িল।

তখন রাত্রি ১টা বাজিয়াছে। প্রতিদিনের মত সুপ্রভা স্বামীকে ঘুম পাড়াইয়া লিখিতে বসিয়াছিল, কিন্তু আজ তাহার হৃদয়ে আশঙ্কার যে তরঙ্গ উঠিতেছিল তাহাতে তাহার সমস্ত চিন্তার সূত্র ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিল। একখানি রুষীয় উপন্যাসের দুষ্প্রাপ্য ইংরেজী সংস্করণ হইতে সে বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করিতেছিল। "প্রতিধ্বনি"তে চারি পাঁচ সংখ্যায় তাহার কতক অংশ বাহির হইয়াছে। আগামী সংখ্যায় আর কতক অনুবাদ করিয়া না দিলেই নয়। কিন্তু কিছুতেই সে মনঃসংযোগ করিতে পারিতেছিল না।—অনেকক্ষণ ব্যর্থচেষ্টার পর তাহার শ্রান্ত অবসন্ন দেহ ঘুমের ভারে অবনত হইয়া পড়িল। টবিলের উপর মস্তক রক্ষা করিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

যামিনীকান্ত ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখে, সুপ্রভা শয্যায় নাই। সে পা টিপিয়া টিপিয়া পড়িবার ঘরে আসিল এবং একটু দেখিয়াই সমস্ত বুঝিতে পারিল। সে নিজেও সেই উপন্যাসের ক্রমশঃ প্রকাশ্য অনুবাদ আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়াছে। কিন্তু তাহা যে সুপ্রভার লেখা, এ সংশয় তাহার কখনও মনে আসে নাই। "প্রতিধ্বনি"তে লেখকের নাম দিবার প্রথা ছিল না। তখন সে চেকের রহস্য, তাহার পুরা বেতনের রহস্য—সমস্তই বুঝিতে পারিল। কিছুই না বলিয়া, উপন্যাসখানি ও যে অংশটুকু সে দিন অনুবাদ করা হইয়াছিল, তাহা লইয়া সে শয়নগৃহে ফিরিল।

একটু পরেই সুপ্রভা জাগিয়া দেখিল, তাহার বহি ও প্রবন্ধ অপহৃত হইয়াছে। বুঝিল, সে ধরা পড়িয়াছে। ভয়ে ও লজ্জায় তহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। সে প্রদীপটি নিবাইয়া, ধীরপদে শয়নকক্ষে আসিল।

যামিনীকান্ত কোনও সাড়া না দিলেও সে বুঝিল যে তিনি জাগিয়া আছেন। সে কিছুই না বলিয়া ধীরে ধীরে শয্যার প্রান্তে বসিয়া স্বামীর দুইখানি পদ আপনার

অঙ্কে তুলিয়া লইল। তাহার এই মৌন মার্জ্জনা-ভিক্ষা যামিনীর মর্ম্ম-স্পর্শ করিল এবং সে উঠিয়া অতি যত্নে স্ত্রীর মস্তক নিজের বক্ষে টানিয়া লইল।

তার পর দিন সুপ্রভার জন্ম অনেক টাকার বাঙ্গালা ইংরেজী বহি গাড়ী বোঝাই করিয়া হাসিতে হাসিতে যখন যামিনীকান্ত বাড়ীতে ফিরিল, তখন সুপ্রভার মনে আর আশঙ্কার লেশমাত্র রহিল না।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

মেছুনী

"মেছুনীটের দেমাক ভারি, লজ্জা নেইকো মোটে,
মাথাটা তার বড়ই গরম, মুখটা ভারি ছোটে"—
সদাই আমার নিন্দে করে যে সব অলপ্পেয়ে,
দেখেনা কি অবস্থাটা চোখের মাথা খেয়ে?

যার সাথে মোর বিয়ে হল, মস্ত সে এক জেলে,
আমায় বেছে নিয়েছিল অনেক মেয়ে ফেলে।
ঝাঁকড়া কালো কোঁকড়া চুলে কাট্‌ত চেরা সীঁথি,
খড়ুই ভরা রুই কাত্‌লা আন্‌ত ধরে' নিতি।
কস্তা পেড়ে শাড়ী পরে', হাতে সোনার বালা,
মাছ বেচ্‌তাম গাঁয়ের মাঝে কাঁখে নিয়ে ডালা।
ভদ্রঘরের অনেক বৌয়ের হয়না কপাল হেন,
ছোট লোকের মেয়ের দেমাক না-ই বা হবে কেন?
সেই যে দেমাক জন্মে গেল, আজও দেমাক করি;
কিসের খাতির? কারুর বাপের খাই না আমি পরি?

কোলে পেলাম সোণার খোকা বছর খানেক বাদে,
কাটতে লাগল সময়টুকু আমোদে আহ্লাদে।
সয় কি গো সুখ অভাগিনীর কপাল যাহার ফুটো?
মাথার সিঁদুর মুছে নিল হঠাৎ ওলাউঠো।
দুষ্ট লোকের চেষ্টা হলো কুপথে মো'য় টানে,
গর্জ্জে গেলাম আঁশের বঁটী নিয়ে তাদের পানে।
গালি দিতাম—দেখ্‌তে পেতাম বাড়ীর পাশে যাকে,
বলো দেখি লজ্জা সরম কেমন করে' থাকে?

ছুটলো যে মুখ, তখন থেকে চল্ল ছুটে বেজায়;
মাথার আঁচল নেমে এসে জড়িয়ে গেল মাঝায়।
দশবছরের ছেলে রেখে মিনষে গেল মরে',
মানুষ করে' তুল্লাম তায় অনেক দুঃখু করে'।
বিয়ে দিলেম—সে হলো এক মস্ত মরদ জেলে;
সেও পালাল ফাঁকি দিয়ে একটী খোকা ফেলে।
কাঁদি তারেই বুকে বেঁধে—আঁধার চারি দিক্;
বলো দেখি কেমন করে' মাথার থাকে ঠিক।

সেই যে মাথা বিগ্‌ড়ে গেল, মেজাজ হলো চড়া,
কারো কথা সয়না গায়ে, শুনাই কড়া কড়া।
অভাগিনী বৌকে আমার দেই না বাহির হ'তে,
দু'ক্রোশ দূরে মাছ কিনে আজ হাঁকছি পথে পথে।
বারো আনা দাম দিতে চায়—এক টাকাতে কেনা;
তাই কি নগদ পয়সা দেবে?—সবাই রাখে দেনা।
বলা সহজ 'মেছুনীটার কথা নয়ক মিষ্টি';
এ অবস্থায় মুখে কি আর হবে সুধাবিষ্টি?

শ্রীকালিদাস রায়।

হেমচন্দ্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ। *

উপক্রমণিকা।

বঙ্গের প্রাচীন কবিগণ। সংসাররূপ বিষবৃক্ষে উৎপন্ন যে দুইটি অমৃতফলের বিষয় বুধগণ উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কাব্যামৃতরসাস্বাদ একতর। যে সকল প্রতিভাশালী কবির রচনাপাঠে মনে হয় যথার্থ ই "কবিতা অমৃত আর কবিরা অমর"—যাঁহাদের কাব্যসুধা যুগযুগান্তর ধরিয়া মানবের তৃষিত প্রাণ শীতল করে, প্রকৃতির প্রিয় লীলাভূমি আমাদের এই সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা রত্নপ্রসবিনী বঙ্গভূমি সেইরূপ বহু কবিসন্তানের জননী।—

"এই না সে দেশ?
কবিরঙ্গভূমি লহরী অশেষ
বহিছে যেখানে—যেখানে দিনেশ
অতুল উষাতে উদয় হয়?
যেখানে সরসী কমলে নলিনী,
যামিনী ভুলায় যেথা কুমুদিনী,
যেখানে শরৎ চাঁদের চাঁদিনী,
গগন ললাট ভাসায়ে বয়?

এই দেশেই, দ্বাদশ শতাব্দীতে, কেন্দুবিল্বগ্রাম পবিত্র করিয়া মহাকবি জয়দেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই দেশেরই—

"ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে
মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-কূজিত-কুঞ্জ-কুটীরে"

গীতগোবিন্দের মহাকবির "মধুরকোমলকান্ত পদাবলী" গীত হইয়া বঙ্গবাসীর হৃদয় অনির্ব্বচনীয় প্রেমরসে আপ্লুত করিয়াছিল।

এই দেশেই, চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে, বিদ্যাপতির কণ্ঠ হইতে "কোকিল-বাণী" নিঃসৃত হইয়া বাঙ্গালার কাব্য-কুঞ্জে চিরবসন্তের সৃষ্টি করিয়াছিল। বিদ্যাপতি তাঁহার অঙ্কিত চিত্রে প্রেমের যে রূপ দেখাইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার অমৃতকণ্ঠে যে মধুর বোল শুনাইয়াছিলেন, গৌড়বাসী আজিও অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া সেই রূপ দর্শন করিতেছে—সেই মধুর বোল শ্রবণ করিতেছে—

"জনম অবধি হাম, রূপ নেহারনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল, শ্রবণহি শুনলু, শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥"

এই দেশেই, বিদ্যাপতির সমকালে, নান্নুরের চণ্ডীদাস তাঁহার মধুর পদাবলীতে বাঙ্গালীকে যে গান শুনাইয়াছিলেন তাহা "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল"—"আকুল করিল" তার প্রাণ। সে আকুলতা আজিও বাঙ্গালার কাব্যসাহিত্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

এই দেশেই, পঞ্চদশ শতাব্দীতে, ফুলিয়ার কৃত্তিবাস "কীর্ত্তির বসতি"—"যাঁর কণ্ঠে সদা কেলি করেন ভারতী"—"কবি পিতা বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট করি" সুমধুর তানে রামায়ণ গান করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন।

তাহার পর, এই দেশেই, কবি কাশীরাম বাঙ্গালীকে "মহাভারতের কথা অমৃত সমান" শুনাইয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছিলেন। সে অমৃত আজিও বঙ্গের গৃহে গৃহে সযত্নে বিতরিত হইতেছে। সে অমৃত পান করিয়া হিন্দু মৃত্যুর ভয় ভুলিয়াছে!

তাহার পর, ষোড়শ শতাব্দীতে, যখন মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের প্রেমে "শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে যায়"—যখন সমগ্র দেশে এক নূতন জীবনস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তখন জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস প্রভৃতি অসংখ্য বৈষ্ণবকবির আবির্ভাব হইয়াছিল।

তাহার পর আর একজন যথার্থ কবির আবির্ভাব হইয়াছিল—

"কবিতা-পঙ্কজ-রবি শ্রীকবিকঙ্কণ।
ধন্য তুমি বঙ্গভূমে, যশঃ সুধাদানে

---

* এই পরিচ্ছেদের কিয়দংশ ৩রা ফাল্গুন দিবসে খিদিরপুরে হেমচন্দ্র পাঠাগারে সারস্বত সম্মিলনে পঠিত হইয়াছিল।

অমর করিলা তোমা অমর-কারিণী
বাগ্দেবী। ভোগিলা দুঃখ জীবনে, ব্রাহ্মণ।
এবে কে না পূজে তোমা, মজি তব গানে?"

মুকুন্দরাম স্বভাব-কবি। তাঁহার কাব্য, প্রতিভার প্রেরণায় রচিত—কোথাও কষ্টকল্পনা বা কৃত্রিমতা নাই। তাঁহার কাব্য-রচনার ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন—

"শুন ভাই সভাজন, কবিত্বের বিবরণ
এই গীত হৈল যেই মতে—
উরিয়া মায়ের বেশ, কবির শিয়র দেশ
চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে;
* * * *
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে।
করিয়া পরম দয়া, দিয়া চরণের ছায়া
আজ্ঞা দিল করিতে সঙ্গীত,
করে লয়ে পত্র মসী আপনি কলমে বসি,
নানাছন্দে লিখিলা কবিত্ব।"

মা'র প্রত্যাদেশে লিখিত মুকুন্দরামের এই অযত্ন-সম্ভূত অথচ অকৃত্রিম চণ্ডীর গান, গৌড়বাসী, মা'র নির্ম্মাল্যের ন্যায় পবিত্র মনে করিয়া মাথায় তুলিয়া লইয়াছিল।

তাহার পর ঘনরাম, ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস, রামেশ্বর প্রভৃতি বহু কবির প্রতিভালোকে বঙ্গদেশ উজ্জ্বল হইয়াছিল।

পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মা'র প্রিয়পুত্র কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ যে কালীকীর্ত্তন গান করিয়াছিলেন তাহার মধুর স্বরলহরী বাঙ্গালার হাটে, মাঠে, ঘাটে, বাটে সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইয়া বঙ্গবাসীর হৃদয়-বীণা অননুভূত-পূর্ব্বভাবে ঝঙ্কৃত করিয়াছিল। রামপ্রসাদের গানের তুলনা বঙ্গসাহিত্যে আর নাই—জগতের আর কোন সাহিত্যে আছে কি না সন্দেহ।

রামপ্রসাদের সমকালেই রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছিল।

"ভারতের রচিতের অমৃতের ভার।
ভাষা গীত সুললিত অতুলিত সার॥"

ভারতচন্দ্রের কাব্য স্থানে স্থানে অশ্লীলতাদোষদুষ্ট, কিন্তু অতুলনীয় পদলালিত্য ও অপূর্ব্ব শব্দসম্পদের জন্য তাঁহার কাব্য চির-আদরণীয়। তাঁহার অবদান, চিরদিন

"যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে।
রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে॥"

ভারতচন্দ্রের পর, উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে নিধুবাবু, হরুঠাকুর, রামবসু, দাশুরায়, মধুকান প্রভৃতি বহু কবির উদ্ভব হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাঁহারা কেহই তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের সহিত তুলনায় উচ্চ আসন পাইবার যোগ্য নহেন। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের পর যথার্থ কবি বহুদিন বঙ্গদেশে আবির্ভূত হন নাই। এই সময়ের কথা স্মরণ করিয়া কবি হেমচন্দ্র পরে লিখিয়াছিলেন—

"আর কি আছে সে সুরভিঘ্রাণ,
আর কি আছে সে কোকিল গান?
আর কি এখন সুগন্ধময়,
গউড় নিকুঞ্জে মলয় বয়?
মুকুন্দ, ভারত, প্রসাদে শেষ,
শুকায়ে গিয়াছে সুধার লেশ।"

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে একজন কবি কিছু সম্মান ও আদর লাভ করিয়াছিলেন। এক সময়ে বাঙ্গালীর উপর কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রভাব নিতান্ত সামান্য ছিল না।

"হাস্যরস কবিতায় তোমার সোসর
নাহি দেখি আর কারে।"

ঈশ্বরগুপ্ত ব্যঙ্গ রসিকতায় অদ্বিতীয়,—বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় "তিনি আপন অধিকারের ভিতর রাজা।" কিন্তু তাঁহার শিষ্য বঙ্কিমচন্দ্রই বলিয়াছেন:—

মনুষ্য-হৃদয়ের কোমল, গম্ভীর, উন্নত, অস্ফুট ভাবগুলি ধরিয়া তাহাকে গঠন দিয়া অব্যক্তকে তিনি ব্যক্ত করিতে জানিতেন না। সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে তিনি তাদৃশ পটু ছিলেন না। তাঁহার সৃষ্টিই বড় নাই। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ইঁহারা সকলেই এ কবিত্বে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রাচীনেরাও তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভারতচন্দ্রের ন্যায় হীরামালিনী গড়িবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল না। কাশীরামের মত সুভদ্রাহরণ কি

শ্রীবৎসচিন্তা, কৃত্তিবাসের মত তরণীসেন বধ, মুকুন্দরামের মত ফুল্লরা গড়িতে পারিতেন না। বৈষ্ণব কবিদের মত বীণার ঝঙ্কার দিতে জানিতেন না। তাঁহার কাব্যে সুন্দর, করুণ, প্রেম এ সব সামগ্রী বড় বেশী নাই।"

ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় ভারতচন্দ্রের মাধুর্য্য ও পদলালিত্য ছিল না, কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যের দোষগুলি বিদ্যমান ছিল—গুপ্ত কবির কাব্যও অশ্লীলতা-দোষদুষ্ট। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর বিদ্যালয়ের বালকদিগের জন্য রচিত হয় নাই, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যালয়ের বালক দিগের জন্য রচিত পুস্তকেও অশ্লীল উপাখ্যানাদি সন্নিবিষ্ট করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।

বীররস প্রভৃতির বর্ণনায়ও গুপ্তকবি সাফল্যলাভ করেন নাই।

"বিশ্বনাশী বজ্রাগ্নিরে অবহেলা করি,
জিনিল যে বাহুবলে দেবকুলরাজে"

সেই বীরশ্রেষ্ঠ সুন্দউপসুন্দের যুদ্ধ ও গৃহ-বিচ্ছেদের বৃত্তান্ত "তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যে"র রচয়িতার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কবি ঈশ্বরচন্দ্র যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে—

সুন্দ উপসুন্দ।

সুন্দ উপসুন্দের প্রতি—

আর কেন মত্ত হোলে রূপবতী হেরে।
মর মর হতভাগা কেরে তুই কেরে॥
সমরেতে এখনিই যাবি শেষে হেরে।
দেব দেব দেব তোরে একেবারে সেরে॥
মরণ নিকট তোর রহিয়াছে যে রে।
পড়িবে কালের হাতে পালাতে না পেরে।
পায়ে ধোরে এই নারী আমারেই দেরে।
বিষয় বিভব যত তুই গিয়ে নেরে॥
ফের যদি কথা কোস আঁখি ঠেরে ঠেরে।
পাঠাইব যমালয় এক চড় মেরে॥
কোন মুখে কুলাঙ্গার নিতে চাস্ এরে।
মর মর হতভাগা কেরে তুই কেরে॥

উপসুন্দ। মুকুরেতে মুখ দেখ কালামুখো কালা।
বচনে করিস্ কেন মিছে ঝালা পালা॥
আমারে দিলেন শিব নারী কণ্ঠমালা।
তুই তারি পতি হবি এতো ঘোর জ্বালা॥
ভাল চাস প্রাণ নিয়ে পালা পালা পালা।
নহে তোর দেহ চিরে করি ফালা ফালা।
তুই নিবি প্রিয়তমা, এ রূপসী বালা।
নে তবে কেমনে নিবি আয় দেখি শালা॥***

ভারতচন্দ্রের কাব্যের পর এইরূপ কাব্য পাঠ করিতে কাহার ভাল লাগিবে? গুপ্তকবির রচনা সমসাময়িক সমাজে যতই আদর প্রাপ্ত হউক না কেন, উহার আদর যে দিন দিন হ্রাস পাইবে তাহাতে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু এক সময়ে যে ঈশ্বরগুপ্ত বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কেন সে খ্যাতি লুপ্ত হইল, রঙ্গলাল, মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের যশঃপ্রভা কিরূপে খাঁটি বাঙ্গালার ও খাঁটী বাঙ্গালীর শেষ কবি ঈশ্বর গুপ্তের প্রতিভা-জ্যোতিঃ মলিন করিয়া দিল তাহা বুঝিতে হইলে, ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রবর্ত্তনে এই সময়ে দেশে যে মহান যুগপরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল তাহার বিষয় স্মরণ করা প্রয়োজন।

বাঙ্গালায় নবযুগের প্রবর্ত্তন। ইংরাজ অধিকারের সহিত বাঙ্গালায় কেবলমাত্র রাজনীতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় নাই। ইংরাজের সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গালীর ধর্ম্মে, সমাজে, সাহিত্যে সর্ব্বত্রই আদর্শের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। ইংরাজ এদেশে নূতন ভাব ও চিন্তার ধারা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। অন্য দেশ হইলে হয় ত ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্যে ইংরাজের আদর্শ অবিকল অনুকৃত হইত। কিন্তু যে দেশ এককালে ধর্ম্মজগতে সর্ব্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল, যে দেশের স্মৃতিকারগণের সূক্ষ্মদর্শিতার ফলে শত সহস্র বিপ্লব ও অরাজকতার মধ্যেও হিন্দু সমাজ আপনার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, যে দেশ বাল্মীকি বেদব্যাস হইতে কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি কত জগদ্বিখ্যাত কবির কাব্যসুধা পানে বিভোর ছিল, সে দেশ ইংরাজের আদর্শ সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিতে পারে না, গ্রহণ করিল না।

"জগতের অলঙ্কার আছিল যে জাতি
জ্বালিল উন্নতি-দীপ অরুণের ভাতি"

সে জাতির মধ্যে কেবলমাত্র পূর্ব্বগৌরবের মহিমোজ্জ্বল স্মৃতি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল,সে জাতি বিদেশীয় আদর্শ গ্রহণ করিল না। প্রতীচীর উন্মুক্ত জ্ঞানভাণ্ডার হইতে সে জাতি জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হইল, আত্মোন্নতির জন্য চেষ্টিত হইল। সেই জন্য রামমোহন রায় বা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম অবধারণের জন্য চেষ্টিত হইলেন। সেই জন্য দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর হিন্দু বালবিধবা ও বহুদারপরায়ণ-কুলীন-পত্নীর দুঃখে বিগলিত-হৃদয় হইয়া ইংরাজী আদর্শে সমাজ পুনর্গঠিত করিবার চেষ্টা না করিয়া, বিপুল পরিশ্রম ও অপূর্ব্ব অধ্যবসায়ের সহিত প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লইয়া স্মৃতিকারগণের সূত্রের প্রকৃত মর্ম্ম নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। সাহিত্যেও বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ, প্রাচী ও প্রতীচীর জ্ঞানার্ণব মন্থন করিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য অমূল্য রত্ন সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমাদের দেশের একটি মহান যুগপরিবর্ত্তনের কাল। দেশের ইতিহাসের জ্ঞানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত একস্থানে লিখিয়াছেন যে, যদি এই বহুঘটনাময় সন্ধিকালের কোন একটি বিশেষ যুগকে বাঙ্গালীর মানসিক উদ্দীপ্তির যুগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিশেষ ভাবে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। বাস্তবিক এই কয়েক বৎসরের ইতিহাস স্মরণ করিলে দত্ত মহাশয়ের উক্তির তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। রাজনীতিক ক্ষেত্রে, এই সময়েই হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'হিন্দুপেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী' পত্র নির্ভীক ভাবে দেশবাসীর জন্য রাজনীতিক অধিকার-লাভের চেষ্টা পাইয়াছিল, এই সময়েই নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি বঙ্গ-বিখ্যাত মনীষিগণের নেতৃত্বে দেশের রাজনীতিক উন্নতি বিধানের জন্য চেষ্টা পাইতেছিল, এই সময়েই মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে স্বহস্তে শাসন ভার গ্রহণ করিয়া জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালনের প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করিয়াছিলেন। সমাজ সংস্কারের জন্য এই সময়েই বিদ্যাসাগর হিন্দুবিধবার পত্যন্তর গ্রহণের এবং কিশোরীচাঁদ মিত্র কুলীনদিগের বহুবিবাহ প্রথা নিবারণের জন্য আন্দোলন করিয়াছিলেন। এই সময়েই মতিলাল শীল ও রাজেন্দ্র দত্ত জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন, এই সময়েই কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এই সময়েই স্ত্রীশিক্ষার অধিকতর বিস্তারের চেষ্টা হইয়াছিল। এই সময়েই কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক গবেষণা করিয়া দেশের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রেও এই সময়ে নূতন জীবনস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যেই রাজা রাধাকান্ত দেবের 'শব্দকল্পদ্রুম' সমাপ্ত হয় এবং মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অনুবাদকার্য্য আরব্ধ হয়। এই শতাব্দীতে এই দুইখানি গ্রন্থের ন্যায় গ্রন্থ আর প্রকাশিত হয় নাই। এই সময়েই কৃষ্ণমোহনের রোপিত 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' ফলভারে নত হইয়া পড়িয়াছিল এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির চেষ্টায় অনুবাদক সভা প্রতীচীর অমূল্য সাহিত্যভাণ্ডার হইতে রত্নরাজি আহরণ করিয়া দেশে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়-কুমার প্রভৃতির সংস্কৃত-বহুল ভাষার প্রতিবাদ করিয়াই যেন এই সময়ে টেকচাঁদের (প্যারীচাঁদ মিত্রের) 'মাসিকপত্র' ও 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই যুগেরই শেষভাগে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা ও টেকচাঁদের আলালী ভাষার সংমিশ্রণ করিয়া 'দুর্গেশনন্দিনীর' অপূর্ব্ব ভাষার সৃষ্টি করিলেন—সেই ভাষা ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত হইয়া যে ভাষার সৃষ্টি করিল, সেই সর্ব্বভাব-প্রকাশক্ষম ভাষা আজ বাঙ্গালা ভাষায় আদর্শ বলিয়া গৃহীত। এই সময়েই মহারাজ প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা

ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়গণের চেষ্টায় জাতীয় নাট্যকলার উন্নতি সাধিত হয় এবং পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ ও পরিহাসরসিক দীনবন্ধু মিত্রের নাটকাদি রচিত হয়। সাময়িক সাহিত্যেও এই সময় অনেক উন্নতি সাধিত হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' এই সময়েই প্রকাশিত হয়। টেকচাঁদের 'মাসিক পত্রিকা,' কালীপ্রসন্নের 'সর্ব্বশুভকরী' ও 'পরিদর্শক' এই সময়েই প্রকাশিত হয়। কিন্তু সাময়িক সাহিত্যে যুগান্তর আনিয়াছিলেন পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। যখন হরিশ ও গিরিশের হিন্দু পেট্রিয়ট বাঙ্গালীকে রাজনীতিক আন্দোলনের অভিনব পন্থা প্রদর্শন করিল তখন "তুমি ঈশ্বরগুপ্ত আমিও ঈশ্বরগুপ্ত" প্রভৃতি প্রলাপসূচক বাক্যসম্বলিত সংবাদপত্র পাঠে লোকের আগ্রহ হ্রাস পাইল এবং হিন্দু পেট্রিয়টের আদর্শে অনুপ্রাণিত নবপ্রবর্ত্তিত "সোমপ্রকাশ" উপযুক্ত সমাদর প্রাপ্ত হইল। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নির্ভীক ও ওজস্বিনী ভাষায় লিখিত সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলী আজিও সাময়িকপত্রসম্পাদকগণের আদর্শরূপে গৃহীত হইতে পারে।

এই সময়ে বাঙ্গালার কাব্য সাহিত্যের গতিও পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তাহার বিষয় পরে বিবৃত হইতেছে।

বাঙ্গলা কাব্যসাহিত্যে নূতন যুগ। যুগপ্রবর্ত্তক রঙ্গলাল। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অসামান্য প্রভাব ছিল। সংবাদপত্র-সম্পাদকগণের সর্ব্বত্রই সমসাময়িক সমাজে অসামান্য সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি দেখা যায়, সুতরাং 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদক পরিহাসরসিক কবি ঈশ্বরচন্দ্র যে তাৎকালীন সমাজে অসাধারণ প্রভাব সঞ্চারিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রসিদ্ধ কবিগণের ন্যায় প্রতিভাশালী ছিলেন না—কেবল ব্যঙ্গকবিতারচনাতেই তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। সুতরাং এই সময়ে কাব্যামোদিগণের মধ্যে ভারতচন্দ্রের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত ছিল। মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি কবিগণ ভারতচন্দ্রেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কাব্যরচনা করিতেন। এই সময়ে বিদ্যাসুন্দরের অনুকরণে অনেকগুলি বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। কিন্তু সচরাচর অনুকরণে যেমন হইয়া থাকে, কোনটিতেই মূলের ন্যায় রচনা-লালিত্য, ছন্দ-পারিপাট্য ও শব্দসম্পদ প্রভৃতি গুণ ছিল না, কিন্তু প্রায় সবগুলিতেই অশ্লীলতা দোষ বিদ্যমান ছিল। বলা বাহুল্য হীরকভ্রমে পণ্ডিতগণ কাচের আদর করিতেন না। ভারতচন্দ্রের আদর পূর্ব্বের ন্যায় অক্ষুণ্ণ রহিল। কিন্তু এই সময় বাঙ্গালার কাব্যসাহিত্য অশ্লীল আদিরস পরিপূর্ণ গ্রন্থের আবর্জ্জনার ভারে দূষিত হইয়া উঠিল। তখন ইংরাজী শিক্ষার ও সভ্যতার বিস্তারের সহিত দেশবাসীর রুচি পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। সুতরাং একশ্রেণীর পাঠকগণের মনোরঞ্জক হইলেও গুপ্তকবি বা ভারতচন্দ্রের অনুকারকগণের কাব্য ইংরাজী-শিক্ষিত দেশবাসীকে প্রীতিদান করিতে অসমর্থ হইল। ফলে বাঙ্গলা কাব্যসাহিত্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অনাদরের ও ঘৃণার সামগ্রী হইয়া উঠিল। কাশীপ্রসাদ ঘোষ, মধুসূদন দত্ত ও রামবাগানের দত্ত পরিবারস্থ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইংরাজী কাব্যরচনায় মনঃসংযোগ করিলেন। নিকৃষ্ট শ্রেণীর আদিরসই তখন বাঙ্গালা কাব্যের প্রাণস্বরূপ হইয়া উঠিল। যে দুই একজন শিক্ষিত লোক মাতৃভাষায় কাব্যরচনা করিয়া যশোলাভের জন্য উৎসুক হইলেন, তাঁহারাও এই হীন আদর্শ গ্রহণ করিয়া পাঠকের মনোরঞ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই সময়ে কলেজে ছাত্রাবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু যে সকল কবিতা 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহা স্থানে স্থানে এরূপ অশ্লীল আদিরস পরিপূর্ণ যে তাহা পাঠ করিতে লজ্জা হয়। অথচ ইহাও সত্য যে একশ্রেণীর পাঠক এই সকল কবিতার প্রতি আসক্তি প্রকাশ করিতেন। আমরা বঙ্কিম বা দীনবন্ধুর দোষ প্রদর্শন করিতেছি না, আমরা কেবল তাৎকালীন বাঙ্গলা কাব্যের আদর্শ ও

তাৎকালীন কবিগণের প্রভাব প্রদর্শনের জন্য এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করিতেছি।

এই সময়ে একজন ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালী বিশুদ্ধ নীতিপূর্ণ কবিতা রচনা করিয়া দুই একজন গুণগ্রাহী বিদ্যোৎসাহী ধনীর সহানুভূতি আকৃষ্ট করেন। তিনি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। রঙ্গপুরের অন্তর্গত কুণ্ডীর প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী ৺কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আক্ষেপোক্তি করেন :—

> আধুনিক যুবজনে, স্বদেশীয় কবিগণে,
> ঘৃণা করে নাহি সহে প্রাণে।
> বাঙ্গালীর মনঃপদ্ম, কবিতা সুধার সদ্ম,
> এইমাত্র রাখ হে প্রমাণে॥

রঙ্গলাল "পদ্মিনী উপাখ্যানের" ভূমিকায় লিখিয়াছেন "কালীচন্দ্র বাবু এই ইঙ্গিত ভিন্ন নিরবদ্য পদ্যগ্রন্থ প্রণয়ণে আমার প্রতি সর্ব্বদাই সোৎসাহ বাক্য লিখিয়া পাঠাইতেন। পরন্তু কিয়দ্বর্ষাতীত হইল মদনুগ্রাহকবর স্বদেশহিততৎপর সুনির্ম্মলচরিত্র মৃত রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর এতদ্দেশীয় অধিকাংশ ভাষা-কাব্যনিচয়ের অশ্লীলতা ও অপবিত্রতাসত্ত্বে তত্তাবৎপাঠে এতদ্দেশীয় বালক বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অবস্থার লোকদিগের প্রগাঢ় আনুরক্তি দর্শনে বিখেদিত হইয়া আমার প্রতি বিশুদ্ধ প্রণালীতে কোন কাব্যরচনার্থ ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করেন।"

এই অনুরোধের ফলে রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' প্রকাশিত হয়।

রঙ্গলাল কোন শ্রেণীর কবি ছিলেন, তাঁহার কিরূপ প্রতিভা ছিল, আমরা এস্থলে তাহা বিচার করিব না। বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে একটি কার্য্যের জন্য তাঁহার নাম চিরদিন উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে। যে সকল কাব্যপাঠে পাঠকের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল সন্ধুক্ষিত হইয়া উঠে, সেই সকল কাব্যের আবর্জ্জনার আতিশয্যে যখন বঙ্গসাহিত্য প্রপীড়িত, তখন রঙ্গলালই বাঙ্গালীকে "ঘৃণিত উলঙ্গ আদিরসের প্রেম পরিহার পূর্ব্বক বিমলানন্দদায়িনী কবিতার প্রীতিরসে প্রবৃত্ত" করাইয়াছিলেন। রঙ্গলাল ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ কৃতবিদ্য ছিলেন। তিনি কাব্যরচনা করিয়া ইহাও প্রতিপন্ন করিলেন যে, যে সকল রস বিশ্বজনীন, যে সকল ভাব বিশ্ববাসী সকলেরই প্রাণে আঘাত করে, তাহা বিদেশীয় সাহিত্য হইতে স্বদেশীয় সাহিত্যে আনিলে জাতীয় সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়, জাতীয় বিশেষত্ব নষ্ট হয় না। তিনি ইহাও দেখাইলেন যে, যেমন অন্যান্য ক্ষেত্রে তেমনই সাহিত্যক্ষেত্রেও পরিমার্জ্জিত-রুচি ইংরাজী-শিক্ষিত দেশবাসীকে জাতীয় সাহিত্যে নূতন যুগের অবতারণা করিতে হইবে। রঙ্গলালকে এই জন্য আমরা নবযুগের অগ্রদূত বা বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যের একজন প্রধান যুগপ্রবর্ত্তক বলিয়া বিবেচনা করি। তিনিই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভাবলে আদিরস-পরিপ্লাবিত বঙ্গীয় কাব্যসাহিত্যের স্রোত ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের ভাষায় "অশ্লীলতার পঙ্কিল সলিলে যে সময়ে কবিত্বপদ্ম কলুষিত হইতেছিল, সেই সময়ে উন্নতহৃদয় রঙ্গলাল আপনার অলৌকিক শক্তির প্রভাবে ভাষার স্রোত ও রুচির স্রোত ফিরাইয়া গিয়াছেন, পরিমার্জ্জিত রুচি, বিশুদ্ধ ভাব ও রসমাধুর্য্যপূর্ণ কাব্যে সকলকে মুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন।"

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে 'পদ্মিনী উপাখ্যান' প্রকাশিত হইলে সকল শ্রেণীর পাঠকগণের নিকট উহা উপযুক্ত সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল। রঙ্গলাল ভারতচন্দ্রের শিষ্য হইলেও, পদ্মিনীর ন্যায় বহুরসপূর্ণ কাব্য বাঙ্গালী বহুদিন পাঠ করে নাই। আদিরসপ্লাবিত বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যে যে এরূপ বীররসাত্মক পদ লিখিত হইতে পারে, তাহা বাঙ্গালী যেন নূতন করিয়া শিখিল—

> "স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
> কে বাঁচিতে চায়?
> দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
> কে পরিবে পায়?
> কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
> নরকের প্রায়,
> দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে
> স্বর্গসুখ তায়।"

বঙ্গের গৃহে গৃহে কাব্যরসামোদী পাঠকগণ এই

সকল পদ কণ্ঠস্থ করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালার কুল-লক্ষ্মীগণের হৃদয় নিম্নোদ্ধৃত পদাদি পাঠকালে অননুভূত-পূর্ব্বভাবে স্পন্দিত হইতে লাগিল।

"এসো এসো সহচরীগণ!—এস সহচরীগণ!
হুতাশন গ্রাসে করি জীবন অর্পণ॥
ধর সবে মনোহর বেশ,—বাঁধ বিনাইয়া কেশ,
চলহ অমরাবতী করিব প্রবেশ॥
ওরে সখি! আজিরে সুদিন,—ঘটিয়াছে ভাগ্যাধীন;
শুধিব জীবন-দানে পতি-প্রেম-ঋণ।
আজি অতি সুখের দিবস,—পাব সুখ মোক্ষ যশ;
বিবাহের দিন নহে এরূপ সরস॥
পরিণয়-প্রমোদ উৎসবে,— ভেবে দেখ দেখি সবে;
পতি যে পদার্থ কিবা কে জানিত তবে?
সবে তবে চললো বালিকা—যথা মুদিতা মালিকা;
অলি যে আনন্দ দাতা জানে কি কলিকা?
সকলেতে জেনেছ এখন,—পতি অতি প্রাণধন,
যার জন্য যুবতীর জীবন যৌবন॥
হেন ধন নিধন অন্তরে,—এই ছার কলেবরে;
রাখিবে এ ছার প্রাণ আর কার তরে?"

'পদ্মিনী উপাখ্যান' প্রকাশের সহিত জাতীয় কাব্য-সাহিত্যের প্রতি শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত। রঙ্গলালের সাধু চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ "কর্ম্মদেবী"র ভূমিকায় রঙ্গলাল লিখিয়াছেনঃ—

"এইক্ষণে পরমাহ্লাদসহকারে বক্তব্য এই যে, যে লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত কাব্যকুসুম [পদ্মিনী উপাখ্যান] বিক্ষেপিত হইয়াছিল, সেই লক্ষ্য ব্যর্থ হয় নাই। সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি পদ্মিনী প্রকাশের পর গত বৎসর-ত্রয় মধ্যে আমাদিগের দেশীয় ভাষায় ভাষিতা বিমলানন্দদায়িনী কবিতার প্রতি কথঞ্চিৎ দেশীয় লোকের অনুরাগ জন্মিয়াছে; কোন কোন প্রচুর মানসিক শক্তিশালী বন্ধু যাঁহারা প্রথমোদ্যমে ইংলণ্ডীয় ভাষায় কবিতা রচনা অভ্যাস করিতেন, তাঁহারা অধুনা মাতৃভাষায় উত্তমোত্তম কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, অতএব ইহাও সাধারণ আনন্দের বিষয় নহে।"

উপরি-উদ্ধৃত মন্তব্যের শেষভাগে যে সকল শক্তিশালী কবির প্রতি ইঙ্গিত আছে; তন্মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তই সর্ব্বপ্রধান। মধুসূদন প্রথমে ইংরাজী ভাষায় কাব্যগ্রন্থাদি রচনা করিয়া যশোলাভের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু দেশীয় ব্যক্তির পক্ষে বিদেশীয় ভাষায় কাব্যরচনা করিয়া যশস্বী হওয়ার চেষ্টা যে ব্যর্থ হইবে তাহা Captive Ladie র সমালোচন প্রসঙ্গে "বেঙ্গল হরকরা"-সম্পাদক কিছু অভদ্রভাবে এবং সহৃদয় ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন কিছু ভদ্রভাবে মধুসূদনকে বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। দূরদর্শী বেথুন মধুসূদনকে স্বদেশীয় সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিভা নিয়োজিত করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু 'পদ্মিনী উপাখ্যান' প্রকাশের পরেই মধুসূদন তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। তখন বুঝি কবির হৃদয়ে অনুতাপ জাগিল—

হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পরধন-লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি
অনিদ্রায় অনাহারে সঁপি কায় মন,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন।
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে—
"ওরে বাছা! মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি অজ্ঞান তুই যারে ফিরি ঘরে!"

মধুসূদন বঙ্গলক্ষ্মীর আদেশ শুনিলেন—

"পালিলাম আজ্ঞা সুখে, পাইলাম কালে,
মাতৃ-ভাষা রূপে খনি পূর্ণ মণি-জালে।"

অভিমানবশে ক্ষণকালের জন্য জননীকে পরিত্যাগ করিয়া পরে অনুতাপানলদগ্ধ হৃদয়ে সন্তান যেভাবে স্নেহময় মাতৃক্রোড়ে ফিরিয়া আসে এবং জননীর প্রাণপণ সেবা করিয়া যেভাবে আত্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে, মধুসূদন সেই ভাবে বাঙ্গালার ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিলেন এবং সেই ভাবে বঙ্গসাহিত্যের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার একমাত্র সঙ্কল্প হইল:—

"রচিব মধুচক্র গৌড়-জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য" প্রকাশিত হইল। শিক্ষিত বাঙ্গালীসমাজে তিলোত্তমা আদৃত হইল বটে, কিন্তু সাধারণ্যে উহা তেমন সমাদর প্রাপ্ত হইল না। বঙ্গসাহিত্যের ঐতিহাসিক পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যের সমালোচন প্রসঙ্গে যথার্থই লিখিয়াছেন, "ইহাতে উৎকৃষ্ট রস আছে, কিন্তু সেই রস কর্ণের অনভ্যস্ত কর্কশায়মান নূতন ছন্দ, দুরান্বয়, 'ভুষেন,' 'অস্থিরি,' 'কাস্তিল' 'কেলিনু' প্রভৃতি মাইকেলি নূতনবিধ ক্রিয়াপদ, ব্যাকরণদোষ প্রভৃতি কণ্টকাবৃত কঠিন-ত্বকে এরূপ আচ্ছাদিত যে তাহা ভেদ করিয়া স্বাদগ্রহ করিতে সকলের পক্ষে পরিশ্রম পোষায় না।" বাস্তবিক যাঁহারা ভারতচন্দ্রের মধুর ও প্রাঞ্জল অমৃতপদাবলীর রসাস্বাদনে অভ্যস্ত, তাঁহাদের নিকট মধুসূদনের শ্রুতিকটু শব্দের নিপুণ বিন্যাস আদৃত না হওয়ায় বিস্ময়ের কারণ নাই।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মধুসূদনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য 'মেঘনাদ-বধ' প্রকাশিত হইল। "মেঘনাদবধ মাইকেল-সাগরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন। ইহাতে কবি কবিত্ব, পাণ্ডিত্য, সহৃদয়তা ও কল্পনাশক্তির একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন।" কিন্তু এইগ্রন্থও পণ্ডিতসমাজে তেমন সমাদৃত হয় নাই। তাহার কারণ সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

"মেঘনাদ এইরূপ গুণশালী ও সৌভাগ্যসম্পন্ন হইলেও নির্দ্দোষ নহে। তিলোত্তমাসম্ভবের কবিতায় দূরান্বয় ও ব্যাকরণ-দোষ যত দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, ইহাতে তত দেখা যায় না সত্য বটে, কিন্তু দানিনু, চেতনিলা, অস্থিরিলা প্রভৃতি চক্ষুঃশূলস্বরূপ নূতন ক্রিয়াপদের কিছুমাত্র ন্যূনতা নাই। তা ছাড়া, 'দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত' 'মরি কিবা' 'হায়রে যেমতি' ইত্যাদি কতকগুলি কথার এত শ্রাদ্ধ হইয়াছে যে, সেগুলি দেখিলে হাস্যসম্বরণ করিতে পারা যায় না। উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, নিদর্শনা প্রভৃতি অনেক অলঙ্কার অনেকস্থলে উৎকৃষ্টরূপে সম্বদ্ধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু এমত অনেক স্থলও আছে, সেখানে সেই অলঙ্কারগুলি অতি কষ্টে বুঝিয়া লইতে হয়। ২।৩টি কথাদ্বারা উৎকৃষ্ট কবি যে সকল অলঙ্কার নির্ম্মিত করিয়া থাকেন, মেঘনাদে সেগুলি প্রস্তুত করিতে কখন কখন দুই তিন পংক্তিও লাগিয়াছে। মাইকেলের আর একটি দোষ এই, তিনি বোধ হয় অভিধান দেখিয়া অপ্রচলিত কঠিন কঠিন শব্দ বাহির করিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন, এই জন্য তাঁহার রচনাও দুর্ব্বোধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কবির রচনায় যেরূপ কোমল ও সর্ব্বদাপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগদ্বারা প্রাঞ্জলতা, মনোহারিতা, চিত্তাকর্ষকতা ও মধুরতা জন্মিয়া থাকে, ইহাতে তাহার কিছুই হয় নাই।"

মধুসূদনের সতীর্থ ও পরমবন্ধু রাজনারায়ণ বসু, যিনি কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ডে' সুদীর্ঘ সমালোচনা করিয়া বঙ্গের শিক্ষিত সমাজের সহিত মধুসূদনের তিলোত্তমার পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন, তিনিও সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে,—

"জাতীয় ভাব বোধ হয় মাইকেল মধুসূদনেতে যেমন অল্প পরিলক্ষিত হয় অন্য কোন বাঙ্গালী কবিতে সেরূপ হয় না। তিনি তাঁহার কবিতাকে হিন্দু পরিচ্ছদ দিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই হিন্দু পরিচ্ছদের নিম্ন হইতে কোট পাণ্টালুন দেখা যায়। আর্য্যকুল-সূর্য্য রামচন্দ্রের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ না করিয়া রাক্ষসদিগের প্রতি অনুরাগ ও পক্ষপাত প্রকাশ করা, নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে হিন্দুজাতির শ্রদ্ধাস্পদ বীর লক্ষ্মণকে নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় আচরণ করানো, খর ও দূষণের মৃত্যু, ভবতারণ রামচন্দ্রের হাতে হইলেও তাহাদিগকে প্রেতপুরে স্থাপন—বিজাতীয় ভাবের অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে এই তিনটি এখানে উল্লিখিত হইতেছে। বাঙ্গালা কবিদিগের মধ্যে কবি-কঙ্কণ যেমন জাতীয়ভাবসম্পন্ন তেমন অন্য কোন কবি নহেন। কবির রচনাতে প্রাঞ্জলতা না থাকিলে তাহা মধুর ও মনোহর হয় না। সকল শ্রেষ্ঠ কবিদিগের মধ্যে মিণ্টনের রচনা তত প্রাঞ্জল নহে, কিন্তু তাঁহার অন্যান্য গুণ যেরূপ আছে তাহাতে মাইকেল কখনই তাঁহার সমতুল্য হইতে পারেন না। মিণ্টনে যেরূপ ভাবের গভীরতা, শব্দবিন্যাসের রাজগাম্ভীর্য্য ও রচনার জমজমাট দৃষ্ট হয়, মাইকেলের কবিতাতে তত দৃষ্ট হয় না। কিন্তু মিণ্টনের প্রাঞ্জলতার অভাব মাইকেলে বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়। 'যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে' 'নাদিল দম্ভোলি কড়্ কড়্ রবে' ইত্যাদি বিকট বিকট প্রয়োগ দ্বারা মাইকেল

মধুসূদনের কাব্য পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত রসভঙ্গ দোষ মেঘনাদবধের স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। গম্ভীর বিষয় বর্ণনা কালে মাইকেল মধুসূদন 'খেদাইনু' 'নাদিলা' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাতে হাস্যের উদ্রেক হয়। দশরথের প্রেতাত্মা রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিবার সময় তিনি 'রামভদ্র' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, ইহাতে ঐ প্রকার ভাবেরই উদ্রেক হয়। দ্বিতীয় সর্গের শেষে ঝড় থামিবার পর শান্তির অবস্থার বর্ণনার মধ্যে গৃধিনী, শকুনি ও পিশাচের পালে পালে আগমনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে বীভৎস রসের প্রবর্ত্তনাদ্বারা শান্তিরসের ভঙ্গ করা হইল।"

হেমচন্দ্রের আবির্ভাবকাল। মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের দোষও যেমন অসাধারণ, গুণও তেমনই অসাধারণ। যখন একদিকে বঙ্গসাহিত্যের সুধী সমালোচকবৃন্দ মধুসূদনের কাব্যের তীব্র সমালোচনা ও দোষপ্রদর্শন করিতেছিলেন এবং একদল সাহিত্যিক 'ছুচুন্দরীবধ কাব্য' প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া মধুসূদনের রচনার দোষগুলি বড় করিয়া দেখাইতেছিলেন; এবং অপর দিকে কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ নব্যযুগের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভার প্রশংসা করিতেছিলেন এবং প্রকাশ্যসভায় অভিনন্দিত করিয়া তাঁহার উপযুক্ত সমাদর করিতেছিলেন, সেই সময়ে নূতন যুগের আর একজন তরুণ কবির আবির্ভাব হইল। তিনি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। হেমচন্দ্র বাল্যাবধি ইংরাজী ভাষা অভ্যাস করিয়া আসিতেছিলেন এবং সংস্কৃত ভাষা অবগত ছিলেন না বলিয়া "নিতান্তসঙ্কুচিতচিত্তে" কাব্যযশঃপ্রার্থী হইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছিলেন, কিন্তু অত্যল্পকাল মধ্যেই তাঁহার যশঃপ্রভা বিস্তৃত হইয়া পড়িল। বিদেশীয় আদর্শ ও বিকৃত রুচির জন্য মধুসূদন যাহা করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, হেমচন্দ্র তাহা সম্পাদন করিতে সমর্থ হইলেন। হেমচন্দ্রও মধুসূদনের ন্যায় বিদেশীয় কবিগণের নিকট প্রচুর পরিমাণে ঋণী কিন্তু তাঁহার কাব্য দেশের আবাল-বৃদ্ধবনিতার এতদূর প্রিয় হইয়াছিল যে, যখন মাইকেল যশঃশৈলের সর্ব্বোচ্চ শিখরে সমারূঢ় ছিলেন এবং যখন হেমচন্দ্রের মহাকাব্য বৃত্রসংহারের রচনা আরব্ধ হয় নাই, তখনই হেমচন্দ্র মধুসূদনের সমকক্ষ কবি বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। সেই জন্য যখন উদারহৃদয় হেমচন্দ্র প্রতিদ্বন্দ্বী কবি মধুসূদনের বিয়োগবেদনায় ব্যথিত হইয়া কাঁদিয়াছিলেন—

> "সাহিত্য-কুসুমে প্রমত্ত মধুপ বঙ্গের উজ্জ্বল রবি।
> তোমার অভাবে দেশ অন্ধকার শ্রীমধুসূদন কবি॥"—

তখন সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন যে বাঙ্গালার "মহাকবির সিংহাসন শূন্য হয় নাই"—তিনি বলিয়াছিলেন, "হেমচন্দ্র থাকিতে বঙ্গমাতার ক্রোড় সুকবিশূন্য বলিয়া আমরা কখনও রোদন করিব না।"

বৃত্রসংহার মহাকাব্য রচনার পূর্ব্বে, এবং অনতিকালমধ্যে, কি গুণে হেমচন্দ্র মহাকবির সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহার কারণ আমরা পরে অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা পাইব। এই স্থলে এই কথা স্মর্ত্তব্য যে, হেমচন্দ্র বিদেশীয় সাহিত্যের নিকট ঋণী হইলেও, তিনি কখনও জাতীয়তা হারান নাই। তিনি কখনও বিদেশীয় আদর্শকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তিনি বিদেশীয় কবিগণের ভাব সঙ্কলন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু, স্বদেশীয় কবিগণের পদাঙ্কও অনুসরণ করিতে বিরত হন নাই। তাঁহার কাব্যে একদিকে যেরূপ সেক্ষপীয়র, মিল্টন, দান্তে, ড্রাইডেন, টেনিসন, লংফেলো, বায়রণ ও শেলীর প্রভাব দেখা যায়, অপর দিকে তাঁহার কাব্যে স্বদেশীয় কবিগণের প্রভাবও লক্ষিত হয়। তাঁহার কাব্যে কোথাও বৈষ্ণব কবিগণের মাধুর্য্য ও প্রসাদগুণ, কোথাও কাশীরাম ও কৃত্তিবাসের সরলতা ও প্রাঞ্জলতা, কোথাও 'কঙ্কণ কবি'র চরিত্রাঙ্কণ ক্ষমতা, কোথাও ভারতচন্দ্রের সুমধুর পদলালিত্য, কোথাও ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যঙ্গ রসিকতা সুপরিস্ফুট হইয়াছে। আর কোন কবির কাব্যে বাঙ্গালী একাধারে এতগুলি গুণের সমাবেশ দেখে নাই। কিন্তু হেমচন্দ্রের যাহা নিজস্ব তাহার উপরই তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠিত। তাহা তাঁহার গভীর স্বদেশপ্রেম ও অপূর্ব্ব স্বজাতি-

প্রিয়তা হইতে উদ্ভূত। যখন স্বদেশপ্রেমিক রামগোপালের বাগ্মিতা এবং হরিশ, গিরিশ ও কৃষ্ণদাসের লেখনী বাঙ্গালীর রাজনীতিক অধিকারবিস্তৃতির জন্য প্রয়াস পাইতেছিল, যখন পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল ও কৃষ্ণমোহন দেশের অতীত গৌরব-কাহিনী উদ্ধারের চেষ্টা পাইতেছিলেন, যখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজা রামমোহনের প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করতঃ হিন্দুধর্ম্মের মহিমা প্রচারে উদ্যত হইয়াছিলেন, যখন বিদ্যাসাগর ও ভূদেব শাস্ত্রসাগর মন্থন করিয়া দূরদর্শী প্রাচীন স্মৃতিকারগণের সূত্রের যথার্থ মর্ম্ম অবধারণের জন্য প্রযত্ন করিতেছিলেন, যখন কালীপ্রসন্ন সারস্বতাশ্রমে 'পুরাণ সংগ্রহ' করিয়া প্রচার করিতেছিলেন, বাঙ্গালীর সেই সন্ধিযুগে দেশবাসী 'ভারত সঙ্গীতে'র স্বদেশপ্রেমিক কবির প্রতীক্ষা করিতেছিল। যে কবির তূর্য্যনিনাদে মৃতপ্রাণ সঞ্জীবিত হইয়া উঠে, যে কবির বীণার সুরতরঙ্গ জাতীয় সুখে উচ্ছ্বসিত, জাতীয় দুঃখে বিমূর্চ্ছিত, জাতীয় গর্ব্বে উদ্বেলিত, জাতীয় দৈন্যে সংক্ষোভিত হইয়া পড়ে, দেশবাসী সেই 'জাতীয় কবি'র প্রতীক্ষা করিতেছিল। সেই জন্য 'ভারত সঙ্গীতে'র কবি, মধুসূদনের প্রতিষ্ঠাকালেই, অপূর্ব্ব সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূজনীয় আচার্য্য শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষায় —হেমচন্দ্রের এই সর্ব্বজনপ্রিয়তার কারণ—"বাঙ্গালী যাহা চায়, হেমেচন্দ্রের প্রতিভা তাহাই দিয়াছে।"

মধুসূদনের তিরোধানের পর বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্রকে মহাকবি-সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলে হেমচন্দ্র 'বৃত্রসংহার' মহাকাব্য প্রণয়ন করিয়া তাঁহার কবিসাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবার যোগ্য। বৃত্রসংহার হেমচন্দ্রের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ—বাঙ্গালীর চিরগৌরবের বস্তু। সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক ও চিন্তাশীল সন্দর্ভ-লেখক, পূর্ব্ববঙ্গের বিদ্যাসাগর, রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর যথার্থই বলিয়াছেন, "হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার —মধুসূদনের মেঘনাদবধ হইতে তুলনায় অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত।"

মধুসূদন যথার্থ কবির স্বরূপ-বর্ণনায় বলিয়াছেন—

"সেই কবি মোর মতে, কল্পনা-সুন্দরী
যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামী-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ-কিরণ।
আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ যার আজ্ঞা মানে;
অরণ্যে কুসুম ফোটে যার ইচ্ছা বলে;
নন্দন-কানন হ'তে যে সুজন আনে
পারিজাত-কুসুমের রম্য পরিমলে;
মরুভূমে—তুষ্ট হয়ে যাহার ধেয়ানে
বহে জলবতী নদী মৃদু কলকলে।"

এই উচ্চ আদর্শ লইয়া বিচার করিলে কয়জন কবি মহাকবি হেমচন্দ্রের সহিত তুলিত হইতে পারেন? যাঁহার মহাকাব্যে কোথাও গগনমণ্ডল প্রদীপ্ত করিয়া শিবের ক্রোধাগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে, কোথাও কোমল-হৃদয়া দৈত্যবধূর করুণায় পাষাণও বিগলিত হইয়া গিয়াছে, কোথাও দৈত্যেন্দ্রের দম্ভভরে মেদিনী কম্পমানা হইয়াছে, কোথাও স্বরীশ্বরীর গৌরব-বিভায় নন্দনকানন জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিয়াছে, কোথাও সুরেন্দ্রের তপঃপ্রভাবে নিয়তি বাধ্য হইয়াছে, কোথাও স্বজাতিপ্রেমিক দধীচির দেহত্যাগে পরহিত-ব্রতের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত ফুটিয়া উঠিয়াছে, কোন্ কবি তাঁহার সহিত উপমিত হইতে পারেন? যে হেমচন্দ্রের অপূর্ব্ব শৃঙ্গনাদে অচেতন প্রাণে চেতনা আসিয়াছে, যে হেমচন্দ্রের শুভশঙ্খরবে পতিতপাবনী গঙ্গা অপূর্ব্ব রঙ্গে কলকলস্বরে চলিয়াছে, যে হেমচন্দ্রের প্রাণোন্মত্তকারী ভেরী-নিনাদে পূর্ব্বগরিমাস্মৃতি-গর্ব্বিত জাতির ধমনীতে শোণিত-প্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, যে হেমচন্দ্রের মৃদুবংশীরবে প্রেমযমুনায় উজান বহিয়াছে, যে হেমচন্দ্রের কাঁসরঘণ্টাধ্বনিতে বিশ্বেশ্বরের আরতি-সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি সুপ্রকাশিত হইয়াছে, যে হেমচন্দ্রের বিষাণে মহাসতী-বিয়োগবিধুর মহেশ্বরের অব্যক্ত বেদনা অভিব্যক্ত হইয়া ত্রিভুবনকে সংক্ষুব্ধ করিয়াছে, যে হেমচন্দ্রের সেতারের মধুর ঝঙ্কারে বঙ্গের কামিনীকুসুমের সরম জড়িত

হৃদয়ের মৃদু স্পন্দনধ্বনি শ্রুত হইয়াছে, সে হেমচন্দ্রের তুলনা কোথায় ?

ধন্য সেই মহাকবি, যাঁহার কাব্য এমন করিয়া

"বীর রৌদ্র হাস্য, করুণার দৃশ্য
নয়নে তুলিয়া ধরে।"

যাঁহার কাব্যে

"সব রস যেন, মূর্ত্তিমান হেন
হৃদয়ে প্রত্যয় হয়।"

ধন্য সেই দেশ, যে দেশে এরূপ মহাকবি জন্মগ্রহণ করেন! আর, ধন্য সেই জাতি, যে জাতির সুখ, দুঃখ, আশা, নিরাশা, গর্ব্ব, দৈন্য, প্রেম, ঘৃণা, আকাঙ্ক্ষা ও অভাব লইয়া এইরূপ 'জাতীয় কবি' জাতীয় কাব্য রচনা করেন!

কোনও দেশে কোনও জাতির মধ্যে এরূপ কবি অধিক জন্মগ্রহণ করেন নাই। এরূপ ক্ষণজন্মা কবির জীবনী ও কবিত্বের আলোচনায় কাহার না আনন্দ হয় ?

আমরা এই আনন্দলাভের আশায় আজি এই মহাকবির জীবনী ও কবিত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। তাঁহার সাহিত্য-সাধনার বিস্তৃত ইতিহাসবর্ণন, তাঁহার কাব্যের যথাযথ সমালোচন করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। হেমচন্দ্রের জীবনচরিতের উপকরণগুলি একে একে বিনষ্ট হইতেছে। আমরা শ্রদ্ধার স্তিমিত প্রদীপ মাত্র সম্বল করিয়া অতীতের অন্ধকারময় কক্ষে প্রবেশ করিয়া, কালের আবরণ উন্মোচন করিয়া, তাঁহার জীবনীর উপাদানগুলি যথাসাধ্য সংগ্রহ করিতে চেষ্টা পাইব। কি প্রয়োজনীয়, কি অপ্রয়োজনীয়, তাহা বিচার করিবার শক্তি আমাদের নাই। শ্রদ্ধার আলোকে যাহা উজ্জ্বল বলিয়া প্রতিভাত হইবে তাহাই আনিয়া পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিব। যদি এই আলোচনায় একটিও নূতন সত্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তাহা হইলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইবে। যদি এই আলোচনা কেবলমাত্র পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি হয়, তাহা হইলেও, আশা করি, পাঠকগণ আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন ; কারণ, বাঙ্গালীর চিরপ্রিয় কবি হেমচন্দ্রের কথা শতবার আবৃত্তি করিলেও বাঙ্গালীর নিকট তাহা অপ্রিয় হইবে না। আর যে মহাকবির জীবন যথাযথভাবে চিত্রিত করা আমাদের ক্ষমতাবহির্ভূত, তাঁহার স্বর্গগত অমর আত্মার নিকট, গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজার ন্যায়, তাঁহারই ভাষায় প্রার্থনা করি,—

"বাণী-বর-পুত্র তুমি, দেব-অবতার।
ক্ষম অপরাধ, পদ পরশি তোমার॥"

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

ভক্তির জয়

প্রাচীরের কোণে চাঁপার গাছটি ফুল-ফোটা করি' সারা
শীতের শাসনে হাত জোড় করি' দাঁড়ায়ে রয়েছে খাড়া!
নূতন মুকুল ভয়ের তাড়ায় বাহির হয়না বড়,
কুঁড়ি ছিল যারা, সঙ্কোচে সারা—সন্দেহে জড়সড়
একটি বা দুটি ভোরের আঁধারে মুখখানি করে বা'র—
এতই গোপনে,পাতার আড়ালে খুঁজে' পাওয়া তারে ভার।
সেই ফুল দিয়ে শিবের মাথায় কোন মতে সেবা সারি'
গাছ পানে চেয়ে ক্ষুণ্ণ হৃদয়ে প্রতিদিন ফিরি বাড়ী।
শাখাগুলি যেন বুকের পাঁজর—কাঙাল বাসনারাজি
তারি মাঝে যেন ফুল হয়ে ফুটে' সাজায় প্রাণের সাজি!

বাড়ীর মালেক মহাজন শেঠ—একই নগরে বাস ;
টাকার যক্ষ—লক্ষ ঋণীর মূর্তিমন্ত ত্রাস!
তিনি নাকি শুনি পূজিবেন শিবে মনোমত মাগি' বর,
কে যেন বলেছে মহেশ্বরের প্রিয় সে নাগেশ্বর!

বহুদূর মাঝে আর গাছ নাই, এক গাছ মোর আছে,
প্রত্যূষে তাই লোক এসে তার ফুল চাহে মোর কাছে।
কহিলাম ধীরে, ফুলের সময় নহে ত এখন আর—
একটিমাত্র ফুটেছিল আজ—সেও মোর দেবতার।
বাহু আস্ফোটে জানায়ে গেল সে—থাকিবেনা হেন বাড়—
হাসিলাম শুধু—কথা মোর কিছু ছিলনাক বলিবার।

দণ্ড দুয়েক বেলা সে তখন, স্নানান্তে সাজি হাতে
পূজা উদ্দেশে চলিয়াছি পথে শিহরি' শিশিরবাতে।
মন্দিরদ্বারে কহিল প্রহরী—প্রবেশের মানা আছে!
বুঝিনু নিমেষে; শুধানু আদেশ পেয়েছ কাহার কাছে?
মৃদু হাসি' ধীরে চলি গেল দ্বারী। সহসা সমুখে দেখি—
বহু লোকজন শকট অশ্ব বহি' পূজাভার—এ কি!
অদূরে বাজিয়া উঠিল বাদ্য—পিছনে উচ্চ যানে
মহাজন শেঠ! ভ্রূকুটিনেত্রে চাহি' মোর মুখপানে
প্রবেশিল গিয়া মন্দিরমাঝে; বন্ধ হইল দ্বার;
বিস্ময়ে দূরে দাঁড়ায়ে দেখিনু কাণ্ড সে দেবতার।

যুড়ি' চারিধার গগন-বিদার জয়-জয়কার ধ্বনি!
হাজার কণ্ঠ হাঁকি' কয়—জয় ভক্তের শিরোমণি!
বহুদিন হেন পূজা উপচার পড়েনি দেবের দ্বারে;
বাহিরিল ধনী—লুটায়ে অমনি শতশির সারে সারে
প্রণমিল তারে—শিবের দুয়ারে লুটায়না অত শির!
ফিরিল ভক্ত—জয়শেষে যেন দৃপ্ত বিজয়ী বীর;
গর্ব্বিত মুখ ভক্তিতে বুঝি! উন্নত মাথা তুলি'
কহে পুরোহিত—শিবের দুয়ারে ইন্দ্রের পদধূলি!
লোকজন যত ফিরি' গেল সব জোয়ারের জলধারে;
মুক্ত দুয়ার তবু দ্বারী মোরে পশিতে দিলনা দ্বারে।

ভাবিলাম মনে এ হেন শাস্তি বিধাতা লিখিল ভালে,
কারো অনিষ্ট কোন দিন কভু করিনি ত কোন কালে।
জন্ম-নিঃস্ব—বিশ্বে অধিক আপনার কিছু নাই,
হাতে তুলে' কভু দিব কারে কিছু হেন ধন কোথা পাই!
অধিকার যাহে, কেহ যদি চাহে, মনে হয় দিতে পারি,
শুধু ফুল ক'টা—কি জানি বা কেন,এহেন মমতা তারি!
দুর্ব্বল হিয়া সদা আগলিয়া পড়ে' থাকে তারি কাছে,
চকিত নয়ন প্রহরী—কখন, কেড়ে লয় কেহ পাছে।
ভেবে দেখি যবে—ক্ষুদ্রতা হেরি' আপনারি পায় লাজ,
শিবের অর্ঘ্য পরে পাবে ভেবে শিরে পড়ে যেন বাজ!

অবনত হিয়া অবশ চরণ ফিরিব যেমন পথে—
শরতের শশী সহসা যেন সে নামিল আকাশ হ'তে!
ত্রয়োদশী বালা—হাতে হেমথালা কুসুমের মালা তাহে,
চাহি' মোর পানে স্নিগ্ধ নয়ানে ফুলটিরে যেন চাহে।
চম্পককলি কর-অঙ্গুলি রং সে চাঁপারই মত,
বাহুর গঠন চাঁপারই মতন চম্পকানন নত;
ওষ্ঠ অধর চম্পকদল, চম্পা নয়ন-পাতা—
চম্পাবরণ পরেছে বসন—তনুলতা চাঁপা-গাঁথা!
চাঁপারই মতন হাসিটি হাসিয়া কহিল মধুর স্বরে—
ফুলটি তোমার দিবে কি আমারে সঁপিতে মহেশ্বরে?

ক্ষুব্ধ হৃদয় নিমেষে জুড়াল, মন্ত্রমুগ্ধ হিয়া—
ধন্য হইনু চম্পককরে পুষ্পটি তুলি' দিয়া।
মনে হ'ল যেন গৌরী আপনি ভক্তের কাছে মাগি'
হাত বাড়াইয়া লইলা অর্ঘ্য ব্যথা ভুলাবার লাগি'।
পাষাণ ঠাকুর বেদনা বোঝেনা—পাছে লোকে করে ভুল—
পাষাণ-প্রেয়সী ছল করি' তাই রাখে বুঝি দুই কূল!
অথবা দেবতা আপনি ভুলা'তে সেবকের অভিমান,
করুণারূপিণী বালিকার হাতে সাধি' লহে সেবা-দান।
তার বেশী আর কি আছে চাওয়ার—কৃতার্থ আরাধন—
ফিরিলাম গৃহে; অশ্রুবাষ্পে ভরি' গেল দুনয়ন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

গহনার বাক্স

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ছিন্ন পুরাতন কালো সার্জ্জের চাপকানের উপর পাকানো দড়ির মত চাদর ঝুলাইয়া, একজন প্রৌঢ়-বয়স্ক ভদ্রলোক শীতসন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে আলিপুর হইতে খিদিরপুরের রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছেন। লোকটীর বয়স ৪০ পার হইয়াছে; রঙটি ফর্সা, গোঁফগুলি বড় বড়, দাড়ি কামানো, দেহখানি কৃশ ও দুর্ব্বল, চক্ষু দুইটি কোটরগত। ধীরে ধীরে পথ চলিতেছেন—যেন বড় ক্লান্ত, বড় পরিশ্রান্ত। ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া ট্র্যাম ছুটিয়া আসিতেছে, বাবুটি পথ ছাড়িয়া দিতেছেন। দুর্ব্বৃত্ত মোটর গাড়ী, গভীর গর্জ্জনে পশ্চাদ্দিক্ হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু বাবুটির পরমায়ু থাকায় সে চেষ্টায় বিফল হইয়া, প্রচুর ধূলায় তাঁহার মলিন বেশ মলিনতর করিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে।

বাবুটি খিদিরপুর গির্জ্জার কাছাকাছি আসিতেই পথপার্শ্বস্থ গ্যাসলণ্ঠন প্রজ্বলিত হইল। পুলের সম্মুখে চৌরাস্তায় পৌঁছিতেই খবরের কাগজের খোট্টা ফিরিওয়ালারা তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিয়া তারস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল—"নায়েক—বাবু নায়েক। পাঁচকৌড়ি বাবুর ভারি গালাগালি বেরিয়েসে। আজকের বাসুমতী—বিসোম কাণ্ড হল বাবু—বাসুমতী"—ইত্যাদি। তাহাদের প্রতি নীরব উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, মোড় ঘুরিয়া পদ্মপুকুরের রাস্তা ধরিয়া পাঁচ সাত মিনিট পরেই বাবুটি একখানি ক্ষুদ্র দ্বিতল বাড়ীর সম্মুখীন হইলেন। দ্বারপার্শ্বে জীর্ণবিবর্ণ কাষ্ঠফলকে লিখিত রহিয়াছে, "শ্রীসতীশচন্দ্র বসু এম-এ বি-এল উকীল জজকোর্ট আলিপুর।"

হাঁ—ইনিই সতীশচন্দ্র বসু,—এবং আকার-প্রকার দেখিলে হঠাৎ বিশ্বাস হওয়া কঠিন হইলেও, ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ বি-এল উপাধিধারী। আজ দীর্ঘ পঞ্চদশ বর্ষ আলিপুরে ওকালতী করিতেছেন, তথাপি ছয়টিমাত্র পয়সা বাঁচাইবার জন্য ট্র্যামে না আসিয়া, সারাদিন আদালতে হত্যা দিয়া ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হইয়াও, এই দেড় মাইল পথ পদব্রজেই আসিয়াছেন—এবং নিত্য আসিয়া থাকেন। ছয়টি পয়সা অর্দ্ধসের চাউলের দাম, দুই বেলা তাহাতে একজনের আহার হয়; জমিলে, মাসান্তে একযোড়া বস্ত্র কেনা চলে;—ছয়টি পয়সা সতীশ বাবুর ফেলিয়া দিবার জিনিষ নহে।

ঝি আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। প্রবেশ করিয়াই দুই পাশে দুইটি বৈঠকখানা;—একটি সতীশ বাবুর আফিস, অপরটি তাঁহার পুত্র বিমলকুমারের পড়িবার ঘর; বন্ধুবান্ধব আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিলে এই ঘরে শয়নের ব্যবস্থাও আছে। ভিতরে প্রবেশ করিয়া ক্ষুদ্র একটি প্রাঙ্গণ—তাহার তিন পাশে বারান্দা। একটি বারান্দার কোণে সিঁড়ি—তাহার মুখে একটি কেরোসিনের ডিবরী জ্বলিতেছে। সতীশবাবু সিঁড়ি উঠিয়া শয়নঘরে প্রবেশ করিলেন। একটি ক্ষুদ্র টেবিলের উপর বহি কাগজ ছড়ান, মাঝখানে একটি ল্যাম্প জ্বলিতেছে। সমস্তটা-কাঠের একখানি চেয়ার তাহার সম্মুখে।

রামটহল রামটহল বলিয়া সতীশবাবু ভৃত্যকে ডাকিলেন, কিন্তু তাহার সাড়া পাইলেন না। চেয়ারে বসিয়া জুতার ফিতা খুলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এমন সময় তাঁহার পত্নী সরমা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। বর্ত্তমান যুগের "ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ" ও "নারী-অধিকার" তত্ত্বে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা সরমা উবু হইয়া বসিয়া স্বামীর জুতা খুলিয়া লইলেন, চটি জুতা পরাইয়া দিলেন। সতীশ তখন উঠিয়া, চাপকানের পকেট হইতে অদ্যকার উপার্জ্জন চারিটি টাকা বাহির করিয়া স্ত্রীর হস্তে দিয়া,

চাপকান কামিজ ও গোঞ্জ একে একে পরিত্যাগ করিলেন। সরমা টাকা চারিটি টেবিলের উপর রাখিয়া, স্বামী-পরিত্যক্ত বস্ত্রগুলি আলনায় ঝুলাইয়া তাঁহার ধুতিখানি আনিয়া দিলেন। টাকা চারিটি বাক্সে বন্ধ করিতে করিতে বলিলেন—"তুমি হাত মুখ ধুয়ে ফেল, আমি জলখাবার নিয়ে আসি।"

সতীশ বলিলেন—"মনোরমা কোথা ?"—মনোরমা তাঁহার কন্যার নাম।

"রান্নাঘরে রুটি বেল্‌ছে।"

"বিমল ?"

"গড়ের মাঠে খেলা দেখতে গেছে, এখনও ফেরে নি।"

দেওয়ালে ঘড়ির পানে চাহিয়া সতীশ দেখিলেন, প্রায় ছয়টা। "এখনও ফেরে নি"—বলিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া তিনি হস্তপদাদি ধৌত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

একটি রেকাবীতে খানকতক পেঁপের টুকরা ও দুইটি ক্ষুদ্র রসগোল্লা আনিয়া সরমা টেবিলের উপর রাখিলেন। জানালার উপর সোরাই-ভরা জল ছিল, এক গেলাস জল ঢালিয়া আনিলেন।

জলযোগ করিতে করিতে সতীশ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজকের সারাদিনের খবর কি বল।"

সরমা বলিলেন—"আজ সেই ঘট্‌কী এসেছিল। একটি পাত্রের সন্ধান দিয়ে গেল।"

"কি রকম পাত্র ?"

"ছেলে বি-এ পড়ছে। বাপ মুঙ্গেরের সবজজ। নাম-টাম সব লিখে দিয়ে গেছে।"—বলিয়া সরমা আঁচল হইতে খুলিয়া এক টুকরা কাগজ স্বামীর হস্তে দিলেন।

সতীশ বাবু পড়িয়া বলিলেন—"ছেলে বি-এ পড়ছে, বাপ সবজজ—এ হাতী কেনবার ক্ষমতা কি আমার হবে ?"

সরমা বলিলেন—"ছেলে নাকি বলেছে, মেয়ে যদি পছন্দ হয়, তবে টাকাকড়ির জন্যে আটকাবে না। তার বাপ মা খুব ভাল লোক, বিয়ে দিয়ে টাকা রোজগার করার মৎলব তাঁদের মোটেই নেই।"

"ছেলে বলেছে—ছেলের বাপ মা ত বলেনি! ছেলে বল্লেই যদি হত তা হলে আর ভাবনা ছিল কি ?"

"ছেলে বলেছে, তার বন্ধুরা প্রথমে এসে দেখবে। মেয়ে যদি পছন্দ হয়, তা হলে বাপকে আমাদের চিঠি লিখতে হবে।"

সতীশ বাবু কিঞ্চিৎ ভাবিয়া, ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"আচ্ছা, মেয়ে দেখুক এসে। আমার মনোরমাকে অপছন্দ বোধ হয় হবে না।"

বিমলকুমার এই সময় আসিয়া পৌছিল। ছেলেটির বয়স পঞ্চদশ বর্ষ—হৃষ্টপুষ্ট সুস্থকায়। ফুটবল ম্যাচে কোন্ পক্ষ কিরূপ নিপুণতার সহিত বিপক্ষকে 'গোল' দিয়াছে, তাহারই বিবরণ উচ্ছ্বসিত স্বরে পিতার নিকট সে ব্যক্ত করিতে লাগিল। মনোরমাও রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া ময়দা-হাত ধুইয়া ফেলিয়া, আসিয়া দাঁড়াইল। হাসিমুখে বিস্ফারিত নেত্রে দাদার গল্প শুনিতে লাগিল। মেয়েটি সুন্দরী—ইহাকে দেখিয়া যে বর অপছন্দ করিবে, ডানাকাটা পরী ভিন্ন আর কেহই তাহার কৌমার্য্য ঘুচাইতে পারিবে না।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে দেখা গেল, পাশের ঘরে মেঝের উপর শতরঞ্জের মধ্যভাগে সতীশ বাবু বসিয়া গড়গড়ায় ধূমপান করিতেছেন—তাঁহার একদিকে বিমল, অপর দিকে মনোরমা বসিয়া নিজ নিজ পাঠ অভ্যাসে নিযুক্ত। সতীশ বাবু প্রতিদিন সন্ধ্যায় দুই ঘণ্টা কাল এইরূপে পুত্রকন্যা দুইটিকে পড়াইয়া থাকেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পটলডাঙ্গার কোনও ছাত্রবাসের একটি কক্ষে আজ প্রাতঃকাল হইতে তিনটি তরুণবয়স্ক বন্ধুতে মিলিয়া গোপন পরামর্শের ভারি ধুম পড়িয়া গিয়াছে। শচীন্দ্র (পূর্ব্বোক্ত সবজজ বাবুর পুত্র) বলিতেছে—"না ভাই, সে আমি পারব না—তোমরাই যাও।"

ক্ষিতীশ বলিতেছে—"কেন, তোর ভয়টা কিসের? এমন নার্ভাস্ হলে চলবে কেন?"

নির্ম্মল বলিতেছে—"না না, তুমিও চল হে শচীন্। তারা কি তোমাকে কোনও দিন দেখেছে যে চিন্‌তে পারবে?"

ব্যাপারটা এই—ঘটকী প্রমুখাৎ সতীশ বাবুকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, আজ রবিবার অপরাহ্নকালে বরের দুইজন বন্ধু খিদিরপুরে গিয়া কন্যা দেখিবেন। সতীশ বাবুও সম্মতি জানাইয়াছেন। বরের আত্মীয় ও বাল্যবন্ধু ক্ষিতীশ এবং নব্যকবি ও ললনাসৌন্দর্য্যের বিশেষজ্ঞ নির্ম্মল গিয়া কন্যা দেখিয়া আসিবে, এইরূপ পরামর্শই ছিল। আজ ক্ষিতীশ প্রস্তাব করিয়াছে, স্বয়ং বরও নিজের বন্ধু সাজিয়া এই কমিশনের মেম্বর হইলে মন্দ হয় না,—নির্ম্মলও উৎসাহের সহিত এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছে। বলা বাহুল্য, পরামর্শ এই তিনটি বন্ধুর মধ্যে সীমাবদ্ধ—মেসের আর কেহ এ কথার বিন্দু-বিসর্গও জানে না।

শচীন্দ্র বলিল—"তোমরা দুজনে যাচ্চ যাও। আমাকে আবার টান কেন? কথায় বার্ত্তায় যদি কোনও রকমে টের পেয়ে যায় যে আমিই বর! বিশেষ বর যাবে, সে কথা তাদের ত বলে' পাঠান হয়নি—বরের দু'জন বন্ধু যাবে, এই কথাই বলা হয়েছে।"

ক্ষিতীশ বলিল—"না হয় দুজনের জায়গায় তিনজন বন্ধুই হল। তাতে আর আপত্তি কি? কথাবার্ত্তা যা ক'বার আমরাই কইব। তুই শুধু চুপ করে বসে থাকবি, আর চোখ দুটো দিয়ে বেশ করে দেখে নিবি। তোর জিনিষ, তুই ভাল করে দেখে নিবিনে হতভাগা? এ কি কলেজে প্রেজেণ্ট হওয়া যে প্রক্সি দিয়ে কায চলে যাবে? কি বল নির্ম্মল?"

নির্ম্মল বলিল—"ঠিক ত।"

শচীন্দ্র বলিল—"আচ্ছা, বন্ধু সেজেই না হয় গেলাম। কিন্তু হঠাৎ যদি নাম জিজ্ঞাসা করে বসে?"

ক্ষিতীশ বলিল—"পাগল! সে কি একটা অজ-বুক মুখ্যু পাড়াগেঁয়ে ভূত যে নাম ধাম 'ব্যাতন' সব জিজ্ঞাসা করবে?—সে একজন এম-এ বি-এল!"

আরও কিছুক্ষণ তর্ক বিতর্কের পর শচীন্ রাজি হইল। সাজগোজ করিয়া বেলা তিনটার সময় বাহির হইয়া তিন বন্ধু ট্রামযোগে ধর্ম্মতলায় গেল। তথা হইতে যাতায়াতের ভাড়া করিয়া একখানি রবার-দেওয়া ফেটন গাড়ী লইয়া, বেলা চারিটার সময় খিদিরপুরে সতীশ বাবুর বাড়ী পৌছিল।

সতীশবাবু প্রস্তুত হইয়া আফিসঘরে বসিয়া ছিলেন, গাড়ী দাঁড়াইবামাত্র বাহিরে আসিয়া অভ্যর্থনা করিয়া যুবকত্রয়কে নামাইয়া লইলেন। বিমল সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, সে ছুটিয়া উপরে খবর দিতে গেল।

ইহাদিগকে লইয়া সতীশ বাবু আপিসঘরে প্রবেশ করিলেন। একখানি টেবিলের ধারে একখানি মাত্র চেয়ার। পাশে লম্বা চৌড়া তক্তপোষের উপর জাজিম বিছানো—তাহার উপর গুটিকয়েক তাকিয়া বালিস। সতীশ বাবু নিজে সেই তক্তপোষের উপর বসিয়া, যুবকগণকেও তথায় বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। বিমলও আসিয়া পিতার নিকট বসিল।

বর্ত্তমানকালে বরপণপ্রথা সম্বন্ধে সতীশ বাবু আলোচনা উত্থাপন করিলেন। দেখিলেন, যুবকগণের অভিমত যে, এ প্রথা একান্ত অভদ্র, নৃশংস ও বর্ব্বরোচিত। সতীশ বাবু কাহারও নাম জানিতে চাহিলেন না বটে, তবে কে কি পড়ে এবং কোথায় থাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। বরেরা কয় ভাই, কোন্ কোন্ পরীক্ষা কোন ডিবিজনে সে পাস করিয়াছে, তাহার স্বাস্থ্য কেমন এ সকল সংবাদও লইলেন।

কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর সতীশ বাবু বলিলেন—"আপনারা একটু বসুন—আমি আসছি।"—বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

বিমলকে লইয়া তিনি উঠিয়া গেলেই ক্ষিতীশ বলিল—"বোধ হয় মেয়ে আনতে গেলেন, নয়?"

নির্ম্মল বলিল—"নিশ্চয়। ভাইটির চেহারা দেখে ত মনে হয়, বোনটি মনোনীত হলেও হতে পারে।"

শচীন্ অনুচ্চস্বরে হাসিয়া বলিল—"মনোনীত হবার কথা বলছ—ঘোন্‌টি কি কবিতা ?"

নির্ম্মল বলিল—"দেখি, তোমার ভাগ্যে কি রকম কবিতা যোটে।"

কয়েক মিনিট পরে ঝুম্‌ঝুম্ মলের আওয়াজ আসিল। যুবকত্রয় মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে পরস্পরের পানে চাহিল। সতীশ বাবু কন্যা লইয়া প্রবেশ করিলেন।

মনোরমা একখানি জরি-পাড় খয়ের-রঙের শাড়ী পরিয়াছে, গায়ে সেই রঙের একটি রেশমী জ্যাকেট্, হাতে চারিগাছি করিয়া আটগাছি হরতন-চিড়িতন চুড়ী, মাথায় একটি পালিসপাত চিরুণী ও তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি প্রজাপতি-কাঁটা। টেবিলের কাছে যে একখানি মাত্র চেয়ার ছিল, কন্যাকে সতীশবাবু তাহাতেই বসাইয়া বলিলেন—"এইটি আমার মেয়ে।"

ক্ষিতীশ ও নির্ম্মল উভয়েই আশা করিতেছে—অপর জন মেয়েটির সঙ্গে কথা কহিবে। নির্ম্মলকে বাঙবিমূঢ় দেখিয়া শেষে ক্ষিতীশচন্দ্রই বলিল—"তোমার নামটি কি ?"

মেয়েটি চক্ষু না তুলিয়াই বলিল—"মনোরমা।"

"কি পড় ?"

"এখন—গ্রিম্‌স্ ফেয়ারি টেলস্ পড়ছি।"

যুবকগণ মনে ভাবিতেছিল, বালিকা 'আখ্যান-মঞ্জরী', 'চারুপাঠ'—বড় জোর 'সীতার বনবাস' অথবা 'মেঘনাদবধ' পড়ে বলিবে। সুতরাং পুস্তকের নাম ও উচ্চারণের বিশুদ্ধতা শুনিয়া তাহারা একটু চমকিত হইল—খুসীও হইল।

নির্ম্মল এইবার কথা কহিল। জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কোন স্কুলে পড় ?"

"স্কুলে পড়িনা, বাবার কাছে পড়ি।"

"বাঙ্গালা কতদূর পড়েছ ?"

সতীশ বাবু বলিলেন—"বাঙ্গলা সমস্ত ভাল ভাল বই ও পড়েছে।"

নির্ম্মল, মনোরমার দিকে চাহিয়া বলিল—"রবিবাবুর কাব্য পড়েছ ?"

"পড়েছি।"

"কোনও কবিতা মুখস্থ বল্‌তে পার ?"

মনোরমা অবনত মুখে ঈষৎ হাস্য করিল। তাহার পিতা বলিলেন—"রবি বাবুর অনেক কবিতাই ওর মুখস্থ। বল ত মা একটা—এঁদের শুনিয়ে দাও।"

মনোরমা মৃদুস্বরে গলা ঝাড়িয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—

একদা পুলকে প্রভাত আলোকে
গাহিছে পাখী

হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত আবৃত্তি করিয়া নীরব হইল।

ক্ষিতীশ বলিল—"বাঃ—সুন্দর। লেখাপড়ায় ত বেশ ভালই দেখছি। আচ্ছা, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। রান্নাবান্না কিছু শেখা হয়েছে কি ?"

মনোরমা মস্তকসঙ্কেতে জানাইল যে তাহাও হইয়াছে।

সতীশ বাবু বলিলেন—"সে বিষয়েও আমার মেয়ের খুঁৎ পাবেন না। ঘরের কাযকর্ম্ম, রান্নাবান্না—সবই মা আমার শিখে নিয়েছেন। দু'দিন বামুন পালালে বাজারের খাবার আনাতে হবে না—মোটামুটি ডাল-ভাত-তরকারী রেঁধে বাড়ীর সবাইকে খাইয়ে দিতে পারবেন।"

ক্ষিতীশ বলিল—"বেশ বেশ। এইটি শুনে সব চেয়ে খুসী হলাম। নির্ম্মল, তুমি রাগ কোরোনা ভাই, রবি বাবুর কবিতা আবৃত্তি করতে পারার চেয়ে, অসময়ে বাড়ীর লোকের উপবাস-নিবারণ করতে পারা অল্প বাহাদুরী নয়।"

এ কথা শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিলেন।

সতীশ বাবু বলিলেন—"তা ঠিক। আর কিছু যদি জিজ্ঞাসা করতে চান, তাও করুন।"

ক্ষিতীশ বলিল—"না, আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে

হবে না। দেখে শুনে আমরা খুবই খুসী হয়েছি সতীশ বাবু, আর এখন এঁকে কষ্ট দেব না।"

"আচ্ছা—একটু বসুন তবে"—বলিয়া সতীশ বাবু কন্যা লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

সতীশ বাবু অদৃশ্য হইবামাত্র ক্ষিতীশ শচীনকে এক ঠেলা দিয়া বলিল—"কি রে, পছন্দ হল ?"

শচীন বলিল—"তোমাদের কি মত, তাই আগে শুনি।"

ক্ষিতীশ বলিল—"আমার ত ভালই লাগল।"

নির্ম্মল ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"মেয়েটি সুন্দরী, তবে পরী বলা যায় না।"

শচীন বলিল—"আমার বেশ লাগলো। পরী ফরীতে আমার দরকার নেই ভাই।"

ক্ষিতীশ হাসিয়া বলিল—"কিরে, সত্যি বল্‌ছিস্ ?"

শচীন বলিল—"খুব সত্যি। নির্ম্মল, তুমি কোনও গোলমাল তুলো না ভাই। একেই আমি বিয়ে করব।"

নির্ম্মল বলিল—"পরী না হোক, মেয়েটি সুন্দরী এ কথা ত আগেই বলেছি। রঙটি একেবারে গোলাপ ফুলের মত নয় বটে—কিন্তু সে আর বাঙ্গালীর ঘরে কোথা পাবে ? সে চাইলে, পার্সী কি আর্ম্মাণী মেয়ে খুঁজতে হয়। সংস্কৃতে যাকে বলে গৌরী, এ মেয়ে তা বটে। মুখে, চোখে, গড়নেও তেমন কোন খুঁৎ নেই। তা, একে তুমি বিয়ে করতে পার শচীন্।"

শচীন বলিল—"ইচ্ছে ত তাই। কপালে এখন ফস্কে না যায়, সেইটি তোমরা দেখো দাদা।"

সরমা স্বামীকে দেখিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন— "কি বুঝলে ? পছন্দ হল। কি কি সব জিজ্ঞাসা টিজ্ঞাসা করলে ?"

সতীশ বাবু হাসিয়া বলিলেন—"তা খুবই জেরা করেছে—যেন এক একটি কৌঁসুলি বসে গেছেন!— কেবল একটি ছেলে ছিল, নিতান্ত ভালমানুষ। আর দুটো—যেন জেষ্ঠতাত! পছন্দ ত হয়েছে বলেই বোধ হল। জলটল খাবার ঠিক আছে ত ?"

"আছে—পাশের ঘরে সব সাজিয়ে রেখেছি। নিয়ে এস তাদের।"

জলযোগান্তে, গাড়ীতে উঠিবার সময় ক্ষিতীশ বলিল —"সতীশ বাবু—এক মিনিট একটা কথা আছে— একটু এই দিকে আসুন।"

সতীশ বাবু বলিলেন—"রাস্তায় কেন ? ঘরেই আসুন তা হলে —ওঁরা গাড়ীতে বসুন একটু।"

বৈঠকখানা ঘরে আসিয়া ক্ষিতীশ চুপি চুপি বলিল —"মেয়ে, বরের পছন্দ হয়েছে।"

সতীশ বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"হয়েছে ? কি করে জানলেন ?"

ক্ষিতীশ হাসিয়া বলিল—"ঐ যিনি চুপচাপ বসে ছিলেন, তিনিই বর। ওঁর বাপের ঠিকানা এই নিন, তাঁকে আপনি চিঠি লিখুন। তবে, আমরা যে ঘট্‌কী পাঠিয়েছিলাম, দেখতে এসেছি, এসব কাইগুলি গোপন রাখ্‌বেন। আপনিই যেন কারু কাছে খবর পেয়েছেন যে অমুক বাবুর একটি বিয়ের যুগ্যি ছেলে আছে সে কলকাতায় পড়ে, এই খবর পেয়ে যেন আপনি লিখছেন—বুঝলেন ?"

সতীশ বাবু বলিলেন—"আচ্ছা বাবাজী বস বস— চিঠি আমি কালই লিখ্‌ব—আর, এ সব কথা প্রকাশও করব না। কিন্তু সবজজ্ বাবু যদি অনেক টাকা হেঁকে বসেন, তা হলে কি হবে ? আমি ওকালতী করি বটে, কিন্তু অবস্থা ত দেখতেই পাচ্ছ বাবাজী—কোনও রকমে দিন গুজরান করি। বেশী টাকা আমি কোথা পাব ?"

ক্ষিতীশ বলিল—"সে জন্যে আপনি ভাববেন না। সে ঠিক হয়ে যাবে এখন। শচীনের বাপ মহেন্দ্র বাবুকে আমি ছেলেবেলা থেকে দেখছি কি না ;—তিনি সম্পর্কে আমার জেঠামশায় হন ;—একজন উচুঁদরের লোক তিনি। জেঠাইমাও খুব ভাল। এ বিয়ে যাতে হয় সে আমরা করব -আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার কাছে আর গোপন করে কি হবে—আপনার মেয়েকে আমাদের শচীনের ভা—রী পছন্দ হয়েছে।"

"আচ্ছা, কালই আমি চিঠি লিখ্‌ব"—বলিয়া সতীশ বাবু বাহিরে আসিয়া ক্ষিতীশকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। "নিতান্ত ভালমানুষ" ছেলেটির প্রতি পূর্ব্বে তিনি ততটা নজর করেন নাই—এইবার উত্তমরূপে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। সতীশ বাবুর তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিজের প্রতি স্থাপিত জানিয়া বিব্রত হইয়া শচীন্দ্র মাথা হেঁট করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কালব্যাজ না করিয়া সেই রাত্রেই সতীশ বাবু বরের পিতাকে পত্র লিখিতে বসিলেন। শচীন্‌কে তাঁহারও ভারি পছন্দ হইয়াছে—ছেলেটি যেমন শিষ্ট শান্ত, দেখিতেও তেমনি সুশ্রী। সরমা বলিতে লাগিলেন—"এমন পাত্রটি মনোর ভাগ্যে কি হবে!"

চতুর্থ দিনে মুঙ্গের হইতে পত্রোত্তর আসিল। সবজজ্ মহেন্দ্র ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন—

"এই মাঘ মাসেই শচীন্ বাবাজীবনের বিবাহ দেওয়া আমার সহধর্ম্মিণীর বিশেষ ইচ্ছা,—কারণ আগামী বৎসর বাবাজীবনের এগ্‌জামিনের তাড়া আছে এবং এগ্‌জামিন শেষ হইলে তাঁহার যোড়া বৎসর পড়িবে। কিন্তু প্রথমে মেয়েটি দেখা আবশ্যক। দুই একজন বন্ধু সমভিব্যাহারে গিয়া আপনার কন্যাটিকে দেখিয়া আসিবার জন্য বাবাজীবনকে অদ্য পত্র লিখিলাম। মেয়েটি যদি পছন্দ হয় এবং অন্যান্য বিষয়ও যদি মনঃপুত হয় তবে মাঘ মাসেই বিবাহ হইতে পারিবে।"

পত্র পড়িয়া সরমা হাসিয়া বলিলেন—"বাবাজীবন যে রাম না হতেই রামায়ণ শেষ করে গেছেন তা ত কর্ত্তার খবর নেই! অন্যান্য বিষয়টা কি?"

সতীশ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"ঐ 'অন্যান্য বিষয়' নিয়েই ত যত গোল! ওর মানে, 'দরে যদি পটে'—এই আর কি।"

পত্র লিখিয়া, পরবর্ত্তী রবিবারে শচীন্ ও ক্ষিতীশকে সতীশ বাবু নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। তাহারা আসিলে চিঠি দেখাইলেন। ক্ষিতীশ বলিল—"মেয়েটিকে আর একবার তা হলে দেখান। দেখে, এইখানে বসেই আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি।"

সতীশ বাবু অন্দরে গেলেন। গৃহিণী আপত্তি করিতে লাগিলেন—"এই স্নান করেছে—এখনও চুল শুকোয় নি, বাঁধা হয়নি—এখন দেখাব কি করে?"

সতীশ ফিরিয়া আসিয়া ইহাদিগকে বলিলেন—"তোমরা খাওয়া দাওয়া করে একটু বিশ্রাম করে নাও—ও-বেলা দেখো এখন।"

ক্ষিতীশ বলিল—"আজ্ঞে সে কি হয়? এক ঘণ্টার বেশী ত আমরা থাক্‌তে পারব না। কেন, এখন দেখাতে বাধা কি?"

সতীশবাবু গুঁইগাঁই করিয়া অবশেষে বাধা কি তাহা প্রকাশ করিলেন।

শুনিয়া ক্ষিতীশ হাসিয়া উঠিল। বলিল—"নেই বা চুল বাঁধা হল তাতে হয়েছে কি?—হাহাহা। খোলা চুলে দেখ্‌লামই বা। আপনিও যেমন! ওসব ফর্ম্মালিটি আমরা মানি-টানিনে। নিয়ে আসুন নিয়ে আসুন—জষ্ট্ অ্যাজ্ সি ইজ্। আসল কথা কি জানেন সতীশ বাবু, জেঠামশায়কে এই যে চিঠি লিখ্‌ব 'আসিলাম—দেখিলাম'—এ কথাগুলো মিথ্যে না হয়ে যায়।"

সতীশবাবু মনে মনে বলিলেন—"জ্যেষ্ঠ—তাত!"—প্রকাশ্যে বলিলেন—"আচ্ছা বসুন, নিয়ে আসি।"

সতীশবাবু যাইবামাত্র ক্ষিতীশ তাহার বন্ধুকে ঠেলিয়া বলিল—"আর একবার দেখ্‌বার জন্যে মরছিলি দম ফেটে—কেমন ফাঁকি দিয়ে দেখিয়ে দিলাম তোকে! দে হতভাগা—সন্দেশ খাইয়ে দে।"

মেয়ে দেখা হইল। আহারের পর সেইখানে বসিয়াই ক্ষিতীশ মুঙ্গেরে পত্র লিখিয়া, বন্ধুসহ বিদায়গ্রহণ করিল।

চতুর্থ দিনে আবার মুঙ্গের হইতে পত্র আসিল। সবজজ্ বাবু লিখিয়াছেন, মেয়ে পছন্দ হইয়াছে, এখন অন্যান্য বিষয় স্থির হওয়া আবশ্যক। সতীশ বাবু যদি আগামী শনিবার লুপ মেলে রওয়ানা হইয়া মুঙ্গেরে একবার

পদধূলি দেন, তবে রবিবারে সে সকল কথা আলোচনা করিয়া ঐ দিনই বৈকালের ট্রেণে তথা হইতে আবার তিনি রওয়ানা হইতে পারিবেন।

মনে মনে দুর্গানাম জপ করিতে করিতে সতীশ বাবু মুঙ্গের যাত্রা করিলেন।

*　*　*　*　*

সোমবার প্রাতে সতীশ বাবু যখন মুঙ্গের হইতে বাড়ী ফিরিলেন, তখন তাঁহার মুখ শুষ্ক, চক্ষু বসিয়া গিয়াছে—এবং তাহা কেবল গাড়ীর কষ্টের জন্যই নহে।

অনেক কাকুতি মিনতি ও কষামাজা করিয়া দর দাঁড়াইয়াছে—অলঙ্কার ও বরাভরণ প্রভৃতি দুইহাজার টাকার এবং ৫০১৲ টাকা নগদ। নিজেদের খরচের জন্যও অন্ততঃ ৫০০৲ টাকা ধরিয়া রাখিতে হয়। সুতরাং একুনে তিন হাজার।

সরমা শুনিয়া বলিলেন—"তা, আজকালের বাজারে এর কমে অমন ঘর-বর আর কোথায় পাওয়া যাবে! তুমি কি বলে এলে?"

সতীশবাবু বলিলেন—"বলেছি, বাড়ী গিয়ে পরামর্শ করে, যেমন হয় আপনাকে জানাব। তিনি বল্লেন বেশী দেরী করবেন না,—আরও দুই এক জায়গায় কথাবার্ত্তা হচ্চে, মাঘ মাসেই শুভকর্ম্মটি শেষ করতে চাই।"

দুই তিন দিন ধরিয়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অনেক পরামর্শ হইল। সরমার পিতা মৃত্যুকালে তাহাকে পাঁচশত টাকার একখানি কোম্পানির কাগজ দিয়াছিলেন, সেখানি আছে; অলঙ্কার যাহা আছে তাহা বেচিলে হাজার দেড়েক টাকা হইতে পারে। বাকী থাকে হাজার টাকা। তা, এত বন্ধুবান্ধব রহিয়াছে, হাজার খানেক টাকা ঋণ সংগ্রহ কি অসম্ভব হইবে?

সতীশ বলিলেন—"এতদিনে একখানি গহনা তোমায় দিতে পরলাম না,—যা দু'চারখানা আছে তাও বেচে ফেলব?"

সরমা বলিলেন—"তা হোক। তুমি বেঁচে থাকলে আমার অনেক গহনা হবে। আমার পাঁচটা নয় সাতটা নয় ঐ একটা মেয়ে, মনের মতন পাত্রটি যদি পাওয়াই গেল তবে তাকে হাতছাড়া করে কায নেই। তুমি চিঠি লিখে দাও যে ঐতেই আমরা রাজি—এদিকে টাকার চেষ্টায় থাক। মাঘমাসে বিয়ে, এখনও ত দেরী আছে!"

সতীশ বাবু সেইরূপই পত্র লিখিয়া দিলেন। মহেন্দ্র বাবু উত্তর দিলেন, সম্মুখে বড়দিনের ছুটি, সেই ছুটির সহিত যোগ করিয়া তিনি আরও এক-মাস ছুটির জন্য আবেদন করিয়াছেন, সপরিবারে তিনি কলিকাতায় পৌছিলে বিবাহের দিনস্থির পাকা দেখা প্রভৃতি হইবে। বাড়ীভাড়া করিবার জন্য পুত্রকে পত্র লিখিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কয়েকদিন ধরিয়া বন্ধুবান্ধবগণের নিকট অনেক হাঁটাহাঁটি করিয়া, মাত্র দুইশত টাকা ঋণসংগ্রহ হইল। এখনও বিস্তর বাকী। উপকার করিতে পারে এমত বন্ধুবান্ধব কলিকাতায় আর কেহ নাই—এখন একমাত্র ভরসা হেমন্ত দাদা। তিনি সতীশের মামাতো ভাই, বর্দ্ধমানে ওকালতী করেন, উপার্জ্জনও মন্দ নহে। গুজব, তিনি নাকি বিশ হাজার টাকা জমাইয়াছেন। একটু কৃতজ্ঞতার দাবীও ছিল—সতীশের পিতাই তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছিলেন। সতীশ বাবু নিজের দায় জানাইয়া তাঁহাকে পত্র লিখিলেন—টাকাটা পাইলে, মাসে মাসে ২৫৲ হিসাবে তিন বৎসরের মধ্যে উহা পরিশোধ করিয়া দিতে পারিবেন এমত আভাসও দিলেন। হেমন্ত বাবু লিখিলেন—"বড়দিনের বন্ধের মধ্যে একদিন আসিও, কতদূর কি করিতে পারি দেখি—তবে আমারও সময় ভাল যাইতেছে না।"

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রতিদিনই এখন কন্যাবিবাহের জল্পনা-কল্পনা চলে। মহেন্দ্র বাবু গহনার ফর্দ্দ যাহা দিয়াছেন, তাহার দুইখানিমাত্র গৃহিণীর অলঙ্কারের অনুরূপ—তবে সেগুলি কনে গহনা নহে, ওজনে অপেক্ষাকৃত ভারি। গৃহিণী বলিলেন—"তা হোক—ও আর ভেঙ্গে কায নেই, রঙ করিয়ে নিলেই নতুনের

মত দেখাবে। তু'ভরি বেশী আছে তা থাকুক; পরকে ত দিচ্ছিনে—নিজে মেয়ে জামাইকেই ত দিচ্ছি।" —বাকীগুলি ভাঙ্গিতে হইবে। স্যাকরা বলিয়াছে, বিবাহের দিন পনেরো আগে পাইলেই সময়মত সে সমস্তই ঠিক করিয়া দিতে পারিবে।—দেশ হইতে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কাহাকে কাহাকে আনিতে হইবে, সে পরামর্শও চলিতেছে।

দেখিতে দেখিতে বড়দিনের ছুটি আসিয়া পড়িল। ক্ষিতীশ ইতিমধ্যে একদিন আসিয়াছিল। সে বলিল, জেঠা মহাশয়ের আদেশ অনুসারে তুইমাসের জন্য বউবাজারে তাঁহার জন্য বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছে।

যেদিন কাছারি বন্ধ হইল, তাহার পরদিনই সতীশ বাবু অর্থসংগ্রহ করিতে বর্দ্ধমান যাত্রা করিলেন। গিয়া দেখিলেন হেমন্তদাদার মনটা কিছু ভার-ভার। জিজ্ঞাসা করিলেন—"দাদা, আমার টাকাটা ঠিক আছে ত?"

হেমন্ত বাবু বলিলেন—"ঠিক আর আছে কৈ?—আমার হাতে ত নেই, থাকলে কোনও কথাই ছিল না। রোজগার পত্রও এদানী বড়ই মন্দা পড়ে গেছে—বছর বছর খরচ যেমন বাড়ছে, আয়ও তেমনি তেমনি কম্‌ছে। কাযকর্ম্ম ভয়ানক ডল্‌। তার উপর আবার উকীলের সংখ্যা এত বেড়েছে যে রাস্তায় একটা লাঠি মারলে তিনটে উকীল মরে যায়। রাস্তায় বেরিয়ে দেখ—উকীল থাকে না এমন দশখানা বাড়ী উপরো-উপরি পাবে না। একধার থেকে তক্তা ঝুলছে —শ্রীঅমুকচন্দ্র অমুক, উকীল জজকোর্ট। বারের সে দিন আর নেই রে ভাই। এখন পেট চলা তুষ্কর—তার উপর গাড়ীঘোড়া কিনে আরও বিপন্ন হয়েছি। আমি ত আমি,—গিয়ে দেখ্‌গে, বড় বড় নামজাদা সব উকীল বার-লাইব্রেরীতে বসে হাই তুলছেন নয় গুড়ুক ফুঁকছেন।"

এই বক্তৃতা শুনিয়া সতীশচন্দ্রের বুক দমিয়া গেল। দাদা বিশ হাজার টাকা জমাইয়াছেন এ কথা তুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি শুনিয়াছিলেন। সুতরাং টাকা নাই ইহা একটা অছিলামাত্র। টাকা যথেষ্টই আছে; দিবার যদি ইচ্ছা না থাকে তবে সে স্বতন্ত্র কথা। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"তবে দাদা আমার উপায় কি হবে? বারো বছরের মেয়ে গলায় বেঁধে কি আমি ডুববো?"

হেমন্ত বলিলেন—"তুই একজন বন্ধুকে বলে রেখেছি—টাকাটা তাঁদের কাছে ধার পেলেও পাওয়া যেতে পারে। কতকটা সেই ভরসাতেই তোমাকে আসতে বলেছিলাম। বৈকালে বেরুব একবার। এখন বেলা হল, স্নান টান করে ফেল ভায়া।"

বেলা সাড়ে তিনটার সময় গাড়ী যোতাইয়া হেমন্ত বাবু বাহির হইলেন। যে সকল হাকিম ছুটিতে কোথাও যান নাই, বর্দ্ধমানেই আছেন, তাঁহাদের বাসায় গিয়া, নানা খোসগল্প ও চাটুবাক্যে তাঁহাদিগের সন্তোষবিধান করিয়া সন্ধ্যাকালে বাড়ী ফিরিলেন। সতীশ তীর্থের কাকের মত আশায় বুক বাঁধিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। হেমন্ত মুখখানি নিতান্ত বিষণ্ণ করিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—"কোথাও সুবিধে হল না। তারা বল্লে হ্যাঁ আপনাকে বলেছিলাম বটে, কিন্তু বড়ই এখন টানাটানি, তুচার মাস পরে বরং হতে পারে। —চেষ্টা ত করলাম, কি করি বল ভায়া! আমি বলি কি, কলকাতাতেই বরং আর একবার চেষ্টা করে দেখগে।"

রাত্রি নয়টা সাতাস মিনিটের প্যাসেঞ্জারে সতীশ বাবুর কলিকাতায় ফিরিবার কথা। একটা দিন থাকিবার জন্য হেমন্ত বাবু অনুরোধ করিলেন কিন্তু সতীশ বাবু তাহাতে সম্মত হইলেন না। আহারের জন্য আসনে বসিলেন মাত্র—খান তুই লুচী খাইয়াই তাঁহার ক্ষুধা ফুরাইয়া গেল। সতীশের পুত্রকন্যার জন্য হেমন্ত বাবু এক হাঁড়ি সীতাভোগ এবং এক হাঁড়ি মিহিদানা আনাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাহাই লইয়া নয়টার পূর্ব্বেই হেমন্ত বাবুর গাড়ীতে তিনি ষ্টেশন রওয়ানা হইলেন। আকাশে মেঘ করিয়াছে, বাতাস বহিতেছে—শীতটাও আজ কন্‌কনে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

ট্রেণ ছাড়িল। মধ্যম শ্রেণীর একখানি বেঞ্চির কোণে বসিয়া, জুতা খুলিয়া পা তুলিয়া পায়ে শাল ঢাকা দিয়া সতীশ বাবু চিন্তা করিতে লাগিলেন। বড় আশা করিয়াই তিনি হেমন্ত দাদার নিকট আসিয়াছিলেন। সেই আশা ভঙ্গ হওয়ায় তাঁহার বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতে লাগিল। মনোরমা জন্মিয়া অবধি তাঁহার সাধ ছিল, একটি সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র অবস্থাপন্ন পাত্রে তাহাকে অর্পণ করিবেন। সে সাধ আর পূর্ণ হইল না; এ বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। হাজার দেড়েক টাকায় হয় এমন একটি পাত্রের সন্ধান করিতে হইবে। সে পাত্র যে কেমন হইবে, তাহা মনোরমার অদৃষ্ট-বিধাতাই জানেন। বাড়ী ফিরিলে এই বিফলতার সংবাদ যখন তাঁহার স্ত্রী শুনিবে, তখন তাহার মুখখানি কেমন হইয়া যাইবে ভাবিতে সতীশ বাবুর চোখের কোণে জল আসিল। সে যে ঐ সুপাত্রটির জন্য নিজের সর্ব্বস্ব খোয়াইতেও প্রস্তুত হইয়াছিল,—কিন্তু এমনই অদৃষ্টের বিড়ম্বনা, তাহাতেও কোন ফল হইল না!

নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া ট্রেণ ছুটিয়াছে—হাওড়ায় পৌছিতে রাত্রি পৌনে একটা। আরোহিগণ যাহারা শয়নের স্থান পাইয়াছে তাহারা ঘুমাইতেছে, বাকী লোক বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে। শীতের জন্য কামরার সমস্ত জানালাগুলি রুদ্ধ। কোন্ একটা ষ্টেশনে সতীশ বাবুর বেঞ্চিটা খালি হইয়া গেল। সুযোগ বুঝিয়া, চামড়ার ব্যাগটি মাথায় দিয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন। শুইয়া শুইয়া নিজের অবস্থা চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্রমে, অল্পে অল্পে তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল।

যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন দেখিলেন গাড়ী হাওড়া ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া আছে—অপর সকলে নামিয়া গিয়াছে। উঠিয়া ব্যাগ ও ছড়িটি হাতে করিয়া ধীরে ধীরে তিনি নামিলেন। সীতাভোগ ও মিহিদানার হাঁড়ি দুইটা কুলীর হাতে দিয়া, প্ল্যাট্‌ফর্ম্ম অতিক্রম করিয়া, ঠিকা গাড়ী দাঁড়াইবার স্থানে গিয়া দেখিলেন, দুইখানি গাড়ী মাত্র দাঁড়াইয়া আছে। অনেক দরদস্তুরের পর, দেড়-টাকায় একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া গৃহাভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

বাড়ী পৌছিতে রাত্রি প্রায় দুইটা বাজিল। বৈঠকখানায় ভৃত্য রামটহল শুইয়া থাকে, ডাকাডাকিতে সে উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। সতীশ বাবু বলিলেন—"গাড়ীর মধ্যে দুটো হাঁড়ি আছে, আর ছড়িটা—নিয়ে আয়। আর এই নে, ভাড়া দিস।"—বলিয়া তিনি আপিস ঘরে প্রবেশ করিয়া বাতি জ্বালিলেন—কি প্রয়োজন ছিল।

আপিসঘরে কাযটুকু সারিয়া, ব্যাগ হস্তে সতীশ বাবু উপরে উঠিয়া গেলেন। নিজ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সরমা দাঁড়াইয়া আছে—টেবিলের উপর আলো জ্বলিতেছে।

সরমা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি পেলে?"

সতীশ বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিলেন—"পেলাম ঐ সীতাভোগ আর মিহিদানা।"—বলিয়া তিনি মেঝের উপর রক্ষিত হাঁড়ি দুইটি দেখাইয়া দিলেন।

"টাকা?"

"টাকা পাইনি।"

সরমা হাসিয়া বলিলেন—"যাও যাও ঠাট্টা করতে হবে না। টাকা পেয়েছ। এই যে বাক্সতে টাকা!—বলা হচ্ছে পাইনি।"—বলিয়া সরমা টেবিলের উপরে একটি বাক্স দেখাইলেন।

সতীশ দেখিলেন, সবুজ বনাতের ঘেরাটোপ ঢাকা একটি বৃহৎ ক্যাশবাক্স। জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কার বাক্স?"

সরমা বলিলেন—"নাও নাও, রঙ্গরস রাখ। নিজে নিয়ে এলেন, আবার জিজ্ঞাসা করছেন কার বাক্স?—সব টাকা পেয়েছ ত?"

সতীশ বাক্সটির ঘেরাটোপ মুক্ত করিয়া বলিলেন—

"আমি কখন্ এ বাক্স নিয়ে এলাম ?—পাগল না কি ! কার বাক্স এ ?"

সরমা বিস্মিত হইলেন। বলিলেন—"তুমি আন নি কি বলছ গো ? এই ত এক্ষুণি রামটহল তোমার ছড়ি, হাঁড়ি ছুটো, আর এই বাক্স রেখে গেল।"

সতীশ বলিলেন—"রামটহল এনে রেখে গেল ? কোথায় পেলে সে ? আমি এ বাক্স ত কখনও চক্ষেও দেখি নি। ডাক দিকিন রামটহলকে। আচ্ছা আমিই ডাকছি।"—বলিয়া তিনি বাহিরে গিয়া ডাকিতে লাগিলেন—"রামটহল—এ রামটহল।"

রামটহল আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন—"গাড়ী থেকে কি কি তুই নামিয়েছিস রে ?"

রামটহল বলিল—"হাঁড়ি ছুটো, ছড়ি, আর এই বাক্স। নীচে হাঁড়ি ছুটো ছিল। উপরে, ঘোড়ার দিকে সেই বসবার জায়গায় এই বাক্স ছিল। আমি ত লণ্ঠন নিয়ে বেশ করে ভিতরে দেখেছি বাবু। আর ত কিছু ছিল না।"

সতীশ বলিলেন—"আচ্ছা যা।"

রামটহল চলিয়া গেলে স্বামী স্ত্রী পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। সতীশ বাবু বাক্সটি তুলিয়া দেখিলেন, উহা বিলক্ষণ ভারি—ভিতরে ঝম্‌ঝম্ করিতেছে। বলিলেন—"এ নিশ্চয় কেউ গাড়ীতে ফেলে গিয়েছিল, কোচম্যানও জানিতে পারে নি। এখন উপায় ?"

সরমা নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে একবার স্বামীর মুখপানে একবার বাক্সটির পানে চাহিতে লাগিলেন।

সতীশ বলিলেন—"কার বাক্স জানাই বা যাবে কি করে ? খুলতে পারলে হয়ত কিছু সন্ধান পাওয়া যেত। কোনও চিঠিপত্র কাগজ টাগজ যদি ভিতরে থাকে।"

"কি করে খুলবে ?"

"খুলব কি ? না পুলিসে গিয়ে জমা দিয়ে আসব ?"

সরমা বলিলেন—"পুলিসে জমা দিয়ে কি হবে ? তারা কি আর যার জিনিষ তাকে খুঁজতে যাবে ? মাঝ থেকে নিজেরাই গাপ করে ফেলবে। অতটাকা মিছিমিছি পুলিসের পেটে যায় কেন ?"

"তা ঠিক—পুলিসের পেটেই বা যায় কেন ? চাবির রিঙটা দাও দেখি"—বলিতে বলিতে সতীশ বাবু দ্বার বন্ধ করিলেন।

সরমা আঁচল হইতে চাবির গোছা খুলিতে খুলিতে বলিলেন—"আমাদের চাবি দিয়ে খুলবে কি ?"

"দেখাই যাক্ না ! তেমন দামী বিলিতী বাক্স এ নয়—সাধারণ জিনিষ"—বলিয়া সতীশ বাবু স্ত্রীর হস্ত হইতে চাবিগুলি লইয়া, একটা বাছিয়া কলে পরাইতে চেষ্টা করিলেন। সেটা লাগিল না। আর একটা—আর একটা—তৃতীয় চাবিতে কল ঘুরিয়া গেল।

কম্পিত হস্তে সতীশ বাবু বাক্স খুলিলেন। উপরের ডালায় কতকগুলি স্বর্ণালঙ্কার সেই ক্ষীণ বাতির আলোকেও ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। ডালাটি নামাইয়া দেখিলেন, বাক্সের খোলটিও নানাবিধ স্বর্ণাভরণে পরিপূর্ণ। হার, বাজু, বালা, ফুল, কাঁটা, চিরুণী, বিছা, নথ, নেক্‌লেস, ব্রেসলেট, টায়রা প্রভৃতি—নানাবিধ অলঙ্কার। কোন কোন রকম ছুই তিনটা করিয়া। দেখিয়া সরমার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল।

সতীশ বাবু একে একে অলঙ্কারগুলি বাক্স হইতে বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন। আতিপাতি করিয়া খুঁজিলেন, কোথাও প্রকৃত অধিকারীর নামগন্ধও নাই। তখন তিনি বাম হস্তে কপাল টিপিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

সরমা গহনাগুলি একটি একটি করিয়া তুলিয়া আলোকে ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন—হাতে নাড়িয়া নাড়িয়া কোনটি কয় ভরির তাহা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। বলিলেন—"আহা কার গয়না ! বাক্স হারিয়ে এখন তার কি অবস্থা হয়েছে কে জানে ! হায় হায় !—এ কি অল্প গয়না ! চার পাঁচ হাজার টাকার ত কম নয় ! ওগো দেখ, একছড়া গিনিগাঁথা হার। এ সব কি

বাঙ্গালীর ? না মাড়োয়ারীর ? বাঙ্গালীর মেয়ে গিনিগাঁথা হার পরে নাকি ?"

পাঁচ মিনিট এইরূপে কাটিলে সতীশ বাবু বলিলেন —"আমায় একগ্লাস জল দাও ত।"

সরমা তখন বাক্স বন্ধ করিয়া স্বামীকে একগ্লাস জল আনিয়া দিলেন। তিনি জল পান করিলে তাঁহার হাত হইতে গ্লাস লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা তুমি বর্দ্ধমানে যখন শুনলে যে টাকা পাওয়া যাবে না, তখন তুমি কি করলে ?"

"কি আর করব ? ষ্টেশনে এসে ট্রেণে উঠলাম।"

"তোমার মনে কি হচ্ছিল তখন ?"

"কন্যাদায় থেকে কি করে যে উদ্ধার হব, তাই ভাবতে লাগলাম—আর নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগলাম।"

"আর কিছু ভেবেছিলে ?"

"আর কি ?"

"ভগবানকে ডেকেছিলে ?"

"তা—ডেকেছিলাম বৈ কি।"

সরমা তখন উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিলেন—"তবে আর সন্দেহ নেই। এ কারু বাক্স নয়—কেউ ফেলে যায় নি। তোমার মেয়ের বিয়ের জন্যে, ভগবানই তোমাকে এ দিয়েছেন।"

সরমার কথার স্বরে সতীশ বাবুর মনে হইল, কাব্য রচনার হিসাবে সে একথা বলিতেছে না—নিজের মনের সংশয়লেশহীন দৃঢ় বিশ্বাসের কথাই ব্যক্ত করিতেছে। স্ত্রীর এই নির্ব্বোধ সরল বিশ্বাসে সতীশের মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

সরমা বলিলেন—"কেন, তোমার কি বিশ্বাস হচ্ছে না ?"

সতীশ একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন —"আচ্ছা সে কথা ভেবে চিন্তে পরে দেখা যাবে। বাক্স এখন তুলে ফেল। রাত প্রায় শেষ হয়ে এল যে। এখন শোয়া যাক্ এস।"

সরমা আলমারি খুলিয়া বাক্সটি অনেকগুলি কাপড়ের অন্তরালে লুকাইয়া রাখিয়া, আলমারি বন্ধ করিলেন।

সে রাত্রি স্বামী স্ত্রী কেহই মুহূর্ত্তের জন্যও চোখের পাতা বুজিতে পারিলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পরদিন সতীশ বাবুর আর অন্য চিন্তা রহিল না। গহনার বাক্সটি সম্বন্ধে কি করিবেন, ইহাই ভাবিতে ভাবিতে দিন শেষ হইয়া গেল।

রাত্রে আহারাদির পর পুত্রকন্যাকে শয়ন করাইয়া সরমা স্বামীর নিকট আসিয়া বলিলেন—"তা, তুমি অত ভাবছ কেন ? ভেবে ভেবে যে একটা ব্যারাম জন্মে যাবে !"

সতীশ বলিলেন—"ভাবছি কি আর সাধে !—এমন প্রলোভনে যে ঈশ্বর আমায় কেন ফেল্লেন তা বুঝতে পারছিনে।"

সরমা বলিলেন—"ঐ দেখ, ঈশ্বর মানবে, অথচ তাঁর দয়া মানবে না !—ঈশ্বর তোমার বিপদ দেখেই তোমাকে ও গহনার বাক্স দিয়েছেন—একথা তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না কেন ?"

সে রাত্রেও কিছুই মীমাংসা হইল না। পরদিন প্রাতে উঠিয়া বিমলকে সতীশবাবু চৌমাথা হইতে কয়েকখানি ইংরাজি দৈনিক সংবাদপত্র কিনিয়া আনিতে বলিলেন। প্রত্যেকখানি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্বেষণ করিলেন, গহনা হারাণোর কথা সংবাদস্তম্ভে কোথাও পাইলেন না, কেহ সে সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনও দেয় নাই।

আরও দুইদিন কাটিল। এ দুইদিনও সতীশ বাবু সংবাদপত্র অন্বেষণে ব্যাপৃত রহিলেন, কেহই গহনার বাক্স হারাণোর বিজ্ঞাপন দিল না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—"অতগুলো টাকার গহনা হারালো, অথচ এ তিন চারদিনে কেউ টুঁশব্দটি পর্য্যন্ত করলে না !—তবে, সরমা যা বলছে তাই কি সত্যি না কি ?"

বেলা নয়টার সময় আপিস ঘরে বসিয়া গালে হাত দিয়া সতীশ বাবু খবরের কাগজ দেখিতেছিলেন, এমন

সময় ক্ষিতীশ আসিয়া উপস্থিত। সে ইহাঁকে দেখিবা-মাত্র বলিল—"এ কি মশায়, আপনার চেহারা এমন হয়ে গেছে কেন? অসুখ-বিসুখ কিছু হয়েছিল না কি?"

সতীশ বাবু ক্ষীণস্বরে বলিলেন—"না, অসুখ হয়নি। বস। বল, খবর কি?"

"জেঠামশায় এসেছেন।"

"কবে এলেন?"

"এই তিন চার দিন হল। বৌবাজারে রয়েছেন, সেইখানে তাঁর জন্যে বাড়ী ভাড়া করেছি কি না। তিনিই আমায় পাঠালেন। বল্লেন, সতীশ বাবুর সঙ্গে একবার দেখা হলে ভাল হত। আপনার মেয়েকে তিনি একদিন এসে দেখতে চান।"

"কবে?"

"সাহেবদের নববর্ষের ডালি সংগ্রহ করতে তিনি এখন ব্যস্ত রয়েছেন। ১লা জানুয়ারির পর যেদিন আপনার সুবিধে হবে, সেইদিন তিনি মেয়ে দেখতে আসবেন। আপনি যদি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান তবে দিনটাও অমনি স্থির করে আস্‌বেন।"

সতীশবাবু রাস্তার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া সজল নেত্রে ক্ষিতীশের পানে ফিরিয়া বলিলেন—"বাবাজী, এ বিবাহ হবে না।"

ক্ষিতীশ অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল—"কেন?"

"মহেন্দ্র বাবু যা চেয়েছেন, তা দেওয়া আমার সাধ্য হবে না।"

"কেন?—তিনি এমন বেশী কিছু ত চান্‌নি।"

সতীশ বাবু ধীরে ধীরে বলিলেন—"ছেলের গুণের তুলনায়, আজকালকার বাজারে, তিনি যা চেয়েছেন তা খুবই অল্প বটে,—কিন্তু সে অল্পই আমার সাধ্যের বাইরে।"

ক্ষিতীশ বলিল—"বলেন কি?"

সতীশ বাবু নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ক্ষিতীশ বলিল—"এঃ—এ যে ভারি কেলেঙ্কারি হল মশায়! সমস্ত ঠিকঠাক—এখন বলছেন হবে না?"

সতীশ বলিলেন—"কি করি বল বাবাজী! মানুষ অবস্থার দাস। এক জায়গায় কিছু টাকা পাবার আশা ছিল, সেই আশার উপর নির্ভর করেই সম্বন্ধটি করে-ছিলাম। কিন্তু সেখানে নিরাশ হতে হয়েছে।"

"তা হলে, জেঠামশায়কে গিয়ে কি বলব?"

"বোলো, তিনি মহৎ, আমি গরীব, তিনি যেন আমার অপরাধ না নেন। তিনি যা চেয়েছিলেন, তা নিতান্ত সঙ্গত হলেও, আমার ক্ষমতায় কুলিয়ে উঠলো না, তাই বাধ্য হয়ে আমাকে নিরস্ত হতে হল। তিনি অন্য পাত্রীর সন্ধান করুন।"

ক্ষিতীশ অনেকক্ষণ বিষণ্ণ মুখে মাটীর দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। শেষে বলিল—"আচ্ছা সতীশ বাবু, আপনি কত হলে পারেন?"

সতীশ বলিলেন—"সে কথায় আর ফল কি বাবাজী? মহেন্দ্র বাবু মুঙ্গেরে আমায় বলেছিলেন, আমি এই যে দর দিলাম, এর একটি পয়সা কমে হবে না।"

ক্ষিতীশ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"ভারি দুঃখের বিষয়।"

সতীশ বলিলেন—"হ্যাঁ বাবাজী। দুঃখ আমারই। মহেন্দ্র বাবুকে তুমি বুঝিয়ে বোলো, আমি চেষ্টা যত-দূর যা করবার তা করেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই ঐ পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করে উঠতে পারলাম না।"

ক্ষিতীশ বলিল—"তার চেয়ে, সকল কথা খুলে আপনিই তাঁর নামে একখানা চিঠি লিখে দিন না কেন? সেই চিঠি তাঁকে আমি দেব।"

"ঠিক বলেছ। একটু বস তা হলে"—বলিয়া সতীশবাবু উঠিয়া টেবিলের নিকট গিয়া বসিয়া পত্র লিখিতে লাগিলেন।

ক্ষিতীশকে বিদায় দিয়া সতীশ বাবু অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। স্ত্রীকে নিভৃতে ডাকিয়া কম্পিত স্বরে কহিলেন—"আমি মনস্থির করে ফেলেছি, সরমা।"

সরমা শঙ্কিত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া

রহিলেন। সতীশ বলিলেন—"প্রলোভনকে আমি জয় করেছি। সরমা, তোমার স্বামী গরীব—কিন্তু চোর নয়। আমি এইমাত্র বিবাহ ভঙ্গ করে মহেন্দ্র বাবুকে চিঠি লিখে দিয়ে এলাম। আজই ওবেলা কলকাতায় গিয়ে আমি ইংরেজি বাঙ্গলা খবরের কাগজে কাগজে গহনার বাক্স সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন দিয়ে আসব।"

সরমা বলিলেন—"কেউ যদি দাবী না করে ?"

"তা হলে ও সমস্ত গহনা বিক্রী করে, কোনও অনাথ আশ্রমে কিম্বা হাঁসপাতালে দান করব।—আমার মেয়ের অদৃষ্টে যদি ভাল পাত্র থাকে, তবে কেউ তাকে বঞ্চিত করতে পারবে না সরমা, একথা তুমি নিশ্চয় জেনো।"

সরমা বলিলেন—"আচ্ছা, সেই ভাল। তাই কর। বেলা হয়ে গেছে—এখন স্নান করে ফেল দেখি।"

বিকালে বাহির হইয়া, কাগজে কাগজে সতীশবাবু এই বিজ্ঞাপনটি ছাপিতে দিয়া আসিলেন—

গহনার বাক্স

কুড়াইয়া পাইয়াছি। কবে, কোথায় হারাইয়াছিল, বাক্সের রঙ ও গঠন, তাহাতে কি কি গহনা আছে যিনি বলিতে পারিবেন, তাঁহাকে ঐ বাক্স দেওয়া যাইবে। ১৭ নং পদ্মপুকুর রোড খিদিরপুরে দাবীদার স্বয়ং আসিয়া অনুসন্ধান করুন।

উপর্য্যুপরি কয়েকরাত্রি অনিদ্রার পর, আজ সতীশ বাবু ঘুমাইয়া বাঁচিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বড়দিনের ছুটি শেষ হইয়া গেল। সতীশ বাবু কাছারি গিয়াছেন, বিমল স্কুলে গিয়াছে; সরমা আহারের পর ছাদে বসিয়া চুল শুকাইতেছেন ও সুপারি কাটিয়া কাটিয়া ডালাতে রাখিতেছেন। মনোরমা ঘরে বসিয়া কি পড়িতেছিল, সে ছুটিয়া আসিয়া মাকে বলিল—"মা, আমাদের বাড়ীতে কে এসেছেন।"

"কোথা রে ?"

"ঐ যে সদরে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। কোচম্যান বলছে এই ত ১৭ নম্বর বাড়ী। একজন ঝি নেমেছে, রামটহলের সঙ্গে কি কথাবার্ত্তা কইচে।"

বলিতে বলিতে, নিম্ন হইতে অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনা গেল। ঝি-বেশধারিণী এক স্ত্রীলোক সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিয়া সরমাকে দেখিয়া বলিল—"আপনিই কি এ বাড়ীর গিন্নী ?"

সরমা বলিলেন—"হ্যাঁ। কেন গা ? কোথা থেকে আসছ ?"

"আমরা কলকাতা থেকে আসছি গো। আমাদের গিন্নীমা আপনার সঙ্গে দেখা করবেন বলে এসেছেন।"

সরমা দাঁড়াইয়া উঠিলেন। বলিলেন—"কোথায় তিনি ? আসুন না।"

"আচ্ছা মা, নিয়ে আসি"—বলিয়া ঝি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

সরমা বলিলেন—"মনো, যা ত মা, তোদের পড়ার ঘরে শতরঞ্চিটে চট্ করে বিছিয়ে ফেল।"

এক মিনিট পরে, অনুমান চত্বারিংশৎ বর্ষবয়স্কা, সুবেশা কিন্তু প্রায় নিরাভরণা, স্থূলাঙ্গী কিন্তু সুন্দরী একটি মহিলা সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিলেন। সরমা অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"আসুন।"

মহিলাটি সেইখানে দাঁড়াইয়া হাঁফাইতে লাগিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"আসি। ক'টাই বা সিঁড়ি, এই উঠতেই হাঁপিয়ে পড়েছি। শরীলে আর পদত্থ নেই। চলুন।"—বলিয়া তিনি সরমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সরমা তাঁহাকে সেই শতরঞ্চে বসাইয়া নিজে নিকটে বসিলেন।

মহিলাটি তখনও হাঁফাইতেছেন। একটু সুস্থ হইয়া, মনোরমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"ওটি কে ? তোমার মেয়ে ? ঐ দেখ, তোমায় তুমি বলে ফেল্লাম। তা ফেল্লামই না হয়, কি বল ? তুমি ত দেখছি, বয়সে আমার চেয়ে ছোটই হবে। তুমি বউ মানুষ আমি গিন্নীবান্নী—তুমি বলায় কোনও দোষ আছে ?"

সরমা হাসিয়া বলিলেন—"না, কিছু না।"

"তোমার কত বয়স হয়েছে, তিরিশ ?"

"না, আটাস।"

"আটাস ? তাই হবে। আমার বোধ হয় বত্রিশ কি তেত্রিশ—আচ্ছা, এর বেশী বলে মনে হয় কি ? আমার প্রথম ছেলে অবিনাশ যখন কোলে হল, তখন আমার বয়স চৌদ্দ—এই চৌদ্দ পেরিয়ে, সবে পনেরোয় পা দিয়েছি। সে ছেলে আমার আজ ষেঠের চব্বিশ বছরের, এই কার্ত্তিকে তার জন্মমাস গেছে। গেল বছর তার বিয়ে দিয়েছি। বউটি ডাগর-সাগর কি না, এই ভাদ্র মাসে তার একটি ছেলেও হয়েছে। বলতে নেই তোমাদের কল্যাণে ছেলেটি হয়েছে যেন রাজ-পুত্তুর। এখন বাঁচে, তবেই। তা, অবিনাশ যখন আমার কোলে, তখন যদি আমার বয়স পনেরো হয়, তবে দেখ না হিসাব করে আমার বয়স এখন কত ? বত্রিশ তেত্রিশের বেশী হবে কি ?"

হাসি চাপিয়া রাখা সরমার পক্ষে কষ্টকর হইতেছিল। যথাসাধ্য সংযম অবলম্বন করিয়া তিনি বলিলেন—"না, এমনই কি বেশী ?—তা, আপনি কোথা থেকে এসেছেন ?"

"বলি। হ্যাঁগা, তোমাদের পাণ বেশী সাজা আছে ? থাকে ত দাও না দুটো—আমি বড্ড পাণ খাই। আমি ত কী পাণ খাই—আমার মেঝ যা, সে বাঁকীপুরে থাকে তার স্বামী মুন্সোব—সে যা পাণ খায়—আমার দেওর বলে কি, পাণ খেয়ে খেয়েই বউ আমায় ফেল করবে। এক ডিপে পাণ আমি সঙ্গে নিয়েছিলাম, তা গাড়ীতেই ফুরিয়ে গেল। অনেকটা পথ ! এই যে পাণ এনেছ দেখছি—ওঃ, এ যে অনেক ! আচ্ছা দুটো খাই। এই মরেছি ! জর্দ্দার কৌটোটা বুঝি গাড়ীতেই ফেলে এলাম ! ঝি, যা ত মা, ছুটে গিয়ে কৌটোটা নিয়ে আয় ত। এমনি বদ্ অভ্যেস হয়ে গেছে, জর্দ্দা না হলে পাণ আবার মুখে রোচে না। তুমি জর্দ্দা খাও ?"

সরমা বলিল—"না, কখনও ত খাইনি।"

"আচ্ছা, আসুক আমার কৌটো—খেয়ে দেখো একটু; গয়া থেকে আমার স্বামী কি মাসে ডিপি করে আনান। জর্দ্দা টর্দ্দা খাওয়া যদি কখনও অভ্যেস কর ত বলে রাখছি, গয়ার জর্দ্দা আনিয়ে খেয়ো। অমন জর্দ্দা আর কোথাও পাবে না। লক্ষ্ণৌ খেয়েছি, কাশী খেয়েছি—আমার ত আর খেতে বাকী নেই কিছু—কিন্তু গয়ার তুল্য জর্দ্দা খেলাম না আজ অবধি। কেউ কেউ বলে বটে যে লক্ষ্ণৌয়ের জর্দ্দা খুব ভাল। শুনোনা ও সব কথা। ছাই—ছাই। গয়াতে ১৬৲ টাকা সের যে জর্দ্দা পাওয়া যায়, তার কাছে লক্ষ্ণৌয়ের ৮০৲ সের দাঁড়াতে পারে না—এ কথা আদালতে গিয়ে জজের সামনে আমি বলতে পারি। গয়ার চামারী সার দোকান থেকে আনিও, ১৬৲ সের। আমি তাই খাই। ৩২৲ সের আছে, ৬৪৲ সের আছে। আমাদের হল নিত্যি খাওয়া, রোজ রোজ কি অত দামের জর্দ্দা খাওয়া পোষায় ? ১৬৲ টাকাই খাই। এত হিসেব করে চলি, তবু আমার স্বামী আমায় বলেন উড়নচণ্ডী। তাঁর মত কেপ্পণ না হলেই মানুষ বুঝি উড়নচণ্ডী হয় ? আমাকে বে-হিসেবী, উড়নচণ্ডী, কত কি বলেন ! তা, তিনি স্বামী, গুরুজন, বলুন যা ইচ্ছে হয় ; সে জন্যে কে আর তাঁর নামে মোকর্দ্দমা করতে যাচ্ছে—কি বল ভাই অ্যাঁ ? এই যে ঝি, এনেছিস ?—দে।"—বলি কৌটা খুলিয়া কিঞ্চিৎ জর্দ্দা আলগোছে মুখগহ্বরে নিক্ষেপ করিলেন।

তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার স্বামী কোথায় কায করেন ?"

সরমা বলিলেন—"আলিপুর আদালতে।"

"কি কায করেন ? নাজির না সেরেস্তাদার ?—না, নাজির সেরেস্তাদার নন—তা হলে তোমার গায়ে অনেক গহনা থাকত। আমার স্বামী বলেন, নাজির সেরেস্তাদারেরা খুব বড় লোক। তিনি হাকিম কি না। বলেন, আমার পৈত্রিক আমলের যোড়া দুই শাল আছে, নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ হলে তাই গায়ে দিয়ে যাই ; কিন্তু আমার নাজির সেরেস্তাদারেরা দেখি, একদিন সবুজ শাল গায় দিয়ে আসে, একদিন নীল শাল,

একদিন বাদামী, একদিন নেবু রঙের—তাদের বাপ-পিতামহ ক যোড়া শালই রেখে গেছে কে জানে!—হ্যাঁ, কি বলছিলাম ভুলে গেলাম। তোমার স্বামী কি কায করেন বল্লে?"

"উকীল।"

"উকীল? ওঃ—তা বেশ। উকীলী কাযও বেশ ভাল। ঢের পয়সা। আমি জানি কি না, আমার স্বামীর এজ্‌লাসে অনেক উকীল কায করে—আমাদের বাড়ীতেও আসে। কারু ফী দশ, কারু বিশ, কারু পঞ্চাশ, কারু একশো—উকীলদের ঢের পয়সা। তবে প্রথম প্রথম একটু কষ্ট, একটু টানাটানি যায়। তোমার স্বামী বোধ হয় তত পুরোণো এখনও হন নি, নয় ভাই?"

"না।—আপনি কোথায় থাকেন?"

"কোথায় থাকি? সে ভাই অনেক কথা। ঝি, তুই যা ত মা, নীচে গিয়ে বসগে। দোরটা ভেজিয়ে দাও—বলি। কথাটা ভারী গোপনীয়।"

মনোরমা মার পানে চাহিল। সরমা বলিলেন—"দোরটা টেনে দিয়ে তুমি ও ঘরে গিয়ে বসগে মা।"

মনোরমা চলিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কক্ষ নির্জ্জন হইবামাত্র মহিলাটি নিম্নস্বরে বলিলেন—"আমি যে কে, কোথায় থাকি, কি বৃত্তান্ত সে সব কিছু তুমি জিজ্ঞাসা করতে পাবে না ভাই—তা বলে রাখছি কিন্তু। কথাটা রটে গেলে আমার ভয়ানক মুস্কিল হবে।"—প্রায় অর্দ্ধমিনিট কাল নীরবে কি ভাবিয়া, শেষে আঁচলের গিরো খুলিয়া তিনি এক টুকরা কাগজ বাহির করিলেন। কাগজখানি সরমার হাতে দিয়া বলিলেন—"দেখ দেখি, এই বিজ্ঞাপন কি তোমরা দিয়েছ?"

সরমা পড়িয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, আমার স্বামী

"বাক্স আছে তোমাদের ঘরে?"

"আছে।"

"কালো রঙের ক্যাশ বাক্স, ডালাটার চারিধারে সোণালী আঁজি কাটা, সবুজ বনাতের ঘেরা-টোপ দেওয়া?"

"হ্যাঁ।"

হস্তসঙ্কেতে দেখাইয়া বলিলেন—"এই—এতখানি বাক্সটা হবে।"

"হ্যাঁ।"

শুনিয়া তাঁহার মুখটি প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বলিলেন—"আঃ—বাঁচালে। আমারই বাক্স। আমিই বাক্স হারিয়েছি। হারিয়ে অবধি আমার মন এমন খারাপ ভাই—কাউকে বলিনি, আমার স্বামীকেও নয়। ভয়ে মরি! মুখে ভাত যায় না জল যায় না। তিনি ভারী কেপ্পণ আর ভারী রাগী কিনা—শুন্‌লে অনর্থ করতেন। এক আধ টাকার নয়, পাঁচ হাজার টাকার গহনা, সোজা কথা! একেই ত তিনি আমায় যখন তখন বলেন উড়নচণ্ডী! ভালয় ভালয় যে পাওয়া গেল, এই মঙ্গল। আজ সকালেই কাগজে আমি এই বিজ্ঞাপন দেখেছি। দেখে বোনঝির বাড়ী যাবার নাম করে এখানে ছুটে এসেছি।—আমার বাক্স তবে আমায় দাও।"

সরমা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—"তিনি বাড়ী না এলে—"

"কখন আসবেন?"

"সন্ধ্যার সময়।"

মহিলাটি চিন্তিত হইয়া বলিলেন—"তবেই ত মুস্কিল! ততক্ষণ কি থাক্‌তে পারব? না—পারব না। আমার বোনঝির বাড়ী আমায় আনতে তারা যদি দরোয়ান টরোয়ান পাঠায়, তা হলেই চিত্তির আর কি!"

সরমা বলিলেন—"কাল একবার আপনি আসতে পারবেন না?"

মহিলাটি একটু ভাবিয়া বলিলেন—"তা পারবো না কেন? পারবো।"

কেমন করে হারালো, আর তাতে কোন্ কোন্ গহনা ছিল, আমায় বলে যান; তিনি এলে তাঁকে আমি বলব।"

মহিলাটি কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন—"আচ্ছা সব বলি তা হলে শোন। আমরা থাকি পশ্চিমের একটা সহরে। আমার স্বামী সেখানকার হাকিম। ডেপুটি কি মুন্সেফ কি সবজজ—সেটা আর নাই বল্লাম। আমার মেঝ ছেলে, সে এখানে কলেজে পড়ে। একজন উকীল—কোথাকার উকীল সেটা আর নাই বল্লাম—তার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ করেছিল। বেচারী গরীব—এসেছিল আমাদের বাড়ী। কর্ত্তা দর যা হাঁকলেন, তাই শুনেই তার চক্ষু চড়কগাছ! সে মেয়েকে দেখে আমার ছেলের নাকি ভারি পছন্দ হয়েছিল—তাই কর্ত্তাকে আমি অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে, দেড় হাজার টাকার গহনা, দান সামগ্রী বরাভরণ পাঁচশো টাকার, নগদ পাঁচশো টাকা—এই আড়াই হাজারে রাজি করলাম। বাবুটিও স্বীকার হলেন। কর্ত্তা একমাসের ছুটি নিলেন, কলকাতায় বাড়ী ভাড়া হল, আমরা সবাই কল্‌কাতায় আসছি। ডাক গাড়ীতে রিজার্ভ পাওয়া গেলনা, প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে রিজার্ভ হল। সেই ভোরবেলা গাড়ী চড়েছিলাম, সারাদিন গেল, রাত একটার সময় হাওড়ায় এসে পৌঁছলাম। গহনার বাক্সটি আমার হাতে, কর্ত্তার হাতে তাঁর কুরিয়ার ব্যাগ, কুলিদের মাথায় জিনিষপত্র দিয়ে—"

সরমা এই সময় বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কবে? কোন দিন আপনারা হাওড়ায় এসে পৌঁছলেন মনে আছে?"

মহিলাটি বলিলেন—"ঐ যেদিন কাছারি বন্ধ হল তার পরদিন গো, বড়দিনের আগের দিন আর কি। কুলিদের মাথায় জিনিষ পত্র দিয়ে, ঠিকে গাড়ী যেখানে দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে এলাম। কেউ হাঁকে দু'টাকা, কেউ হাঁকে সাত সিকে, কেউ চায় দেড় টাকা—তা কর্ত্তা বল্লেন, এক টাকার এক পয়সা বেশী দিচ্ছিনে—যাবি ত চল। শেষে পাঁচসিকের একখানা গাড়ী ঠিক হল। জিনিষপত্র কুলিরা গাড়ীর ছাদে তুলতে লাগল, আমি গহনার বাক্সটি গাড়ীর ভিতর রাখলাম। বিষম ভারি—হাত ভেরে গিয়েছিল। উঠতে যাচ্ছি—এমন সময় আর এক গাড়োয়ান এসে বল্লে, আমায় আঠারো আনা দেবেন বাবু। কর্ত্তা বল্লেন—আঠারো আনায় যাবি? তবে চল তোর গাড়ীতেই যাই। গাড়োয়ানে গাড়োয়ানে বেধে গেল বিষম ঝগড়া।—এই মারে ত এই মারে। দেখে ত আমি ভয়ে মরি—ফৌজদারী দাঙ্গাই বুঝি দাঁড়ায়। কর্ত্তা বল্লেন—চলো কুলিলোগ, মাল উতারো—কেয়া দেখতা?—আমার হাত ধরে বল্লেন—এস। তাঁর সঙ্গে গেলাম, এমনি মনিষ্যি, গহনার বাক্সটি যে সেই আগেকার গাড়ীতেই পড়ে রইল তা আমার হুঁসই হল না!"

সরমা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার ছেলের বিয়ে কবে হবে?"

মহিলাটি বলিলেন—"কবে হবে তা ত জানিনে ভাই। সে সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেছে। সবই ঠিকঠাক ছিল—কিন্তু এই পশু না তশু—মেয়ের বাপ ওঁকে চিঠি লিখেছে—অতটাকা দেবার আমার ক্ষমতা নেই, ছেলের আপনি অন্য সম্বন্ধ করুন। সেই শুনে অবধি বাছা আমার মুখটি চূণ করে বেড়াচ্ছে—মেয়েটিকে ভারি তার পছন্দ হয়েছিল কি না! আরও দু'তিন জায়গায় কথাবর্ত্তা চলছে—কিন্তু মেয়েগুলি তেমন সুন্দর নয় তাই মন সরছে না। দেখি, ভাল মেয়ে একটি পাই যদি।—অনেক দেরী হয়ে গেল, এখন তবে উঠি ভাই। তোমার স্বামীকে সব কথা বোলো। কাল আবার আমি এসে বাক্স নিয়ে যাব।"

"আচ্ছা, আপনি একটু বসুন"—বলিয়া সরমা উঠিয়া গেলেন। দুই মিনিট পরে ঘেরাটোপ সুদ্ধ বাক্সটি আনিয়া, মহিলাটির সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন—"এই নিন আপনার বাক্স। দেখুন, এই বাক্সই আপনার ত?"

"এই ত!"—বলিয়া তিনি অঞ্চল হইতে চাবি লইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে বাক্স খুলিয়া ফেলিলেন।

সরমা বলিলেন—"দেখে নিন, আপনার সব জিনিস ঠিক ঠিক আছে ত ?"

তিনি গালে হাত দিয়া বলিলেন—"ওমা ! তুমি যে অবাক্ কল্লে ভাই ! তোমরা কি সেই মানুষ যে আমার জিনিষ তছরুপ করবে ? তা যদি হত—তাহলে ত সবই নিতে পারতে ; বিজ্ঞাপন দিতে যাবে কেন ? তা ভাই, আমায় যে বাক্স নিয়ে যেতে বলছ, তোমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করবে না ? গহনার লিষ্টিও আমি এখনও তোমায় বলিনি !"

সরমা বলিলেন—"আর কিছু দরকার নেই। আমি আপনাকে চিন্‌তে পেরেছি।"

"চিন্‌তে পেরেছ ? কে আমি বল দেখি ?"

"আপনি মুঙ্গেরের সবজজ মহেন্দ্র বাবুর স্ত্রী। যে ছেলের বিয়ের জন্যে এসেছেন, তার নাম শচীন্।"

মহিলাটি নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে সরমার মুখ পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন—"তুমি কে ?"

সরমা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"যার মেয়ের সঙ্গে আপনার ছেলের সম্বন্ধ হচ্ছিল, সেই আমি। ঐ বড়দিনের আগের দিন উনি বর্দ্ধমানে গিয়েছিলেন—এক জায়গায় হাজার খানেক টাকা পাবার কথা ছিল, সেই টাকা আনতে। টাকা পাওয়া গেল না। রাত একটার সময় ঐ ট্রেণে বর্দ্ধমান থেকে উনি ফিরলেন। ঘোড়াগাড়ী করে বাড়ী এলেন। বাক্স আগে উনি গাড়ীতে দেখেন নি। বাড়ী এসে পৌঁছে, চাকর গাড়ী থেকে অন্য জিনিষপত্রের সঙ্গে ঐ বাক্সও নামিয়ে এনেছিল, উনি ত দেখে অবাক !"

মহিলাটি গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলেন। শেষে বলিলেন—"তুমিই মেয়ের মা !"

সরমা বিষণ্ণ মুখে হাসিয়া বলিলেন—"আমিই মেয়ের মা।"

"আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বর্দ্ধমানে ঐ হাজার টাকা পাওয়া গেল না বলেই কি বিয়ে ভেঙ্গে গেল ?"

"হ্যাঁ।"

"একটি হাজার টাকার জন্যে ? হায় হায়। খাসা মেয়েটি তোমার ভাই। এখন তবে বলি, ওকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল—আহা, এমনি একটি বউ আমার হয় !"

সরমা অবনত মস্তকে বসিয়া কিয়ৎক্ষণ ভাবিলেন। শেষে মুখ তুলিয়া বলিলেন—"তা, ওকেই আপনার বউ করুন না ! আপনারই ত হাতে।"

মহিলাটি বলিলেন—"পোড়া কপাল !—আমার হাতে হলে কি আর ভাবনা ছিল ? আচ্ছা—তোমার মেয়েকে একবার ডাক ত ভাই।"

সরমা কন্যাকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন—"এঁকে প্রণাম কর।"

মনোরমা প্রণাম করিলে সবজজ্-গৃহিণী কাছে বসাইয়া, সস্নেহে তাহাকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অবশেষে পান ও জর্দ্দা খাইয়া উঠিলেন। সরমাকে বলিলেন—"আজ তা হলে উঠি ভাই। বাক্স নিয়ে চল্লাম। কাল কি পর্শু আবার আমি আসব।"—বলিয়া তিনি বিদায়গ্রহণ করিলেন।

পরদিনই তিনি আবার আসিয়া উপস্থিত। সিঁড়ি উঠিবার ক্লান্তি লাঘব হইলে, সরমাকে নিভৃতে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন—"আমার স্বামীকে অনেক বলে কয়ে দেখ্‌লাম, তিনি একটি পয়সাও কমাতে চান না। এমন কেপ্পণ দেখনি ভাই ! এ কি কম আপশোষ যে হাজার টাকার জন্যে এমন বউটি আমি হারাব ! তাই ও টাকা আমি সঙ্গে করে' এনেছি—এই নাও ক'খানা নোট। তোমার স্বামীকে বোলো, কালই যেন আমাদের ওখানে গিয়ে একবারে পাকাপাকি বিয়ের দিনস্থির করে আসেন। কিন্তু ভাই একটা কথা বলি—সাবধান সাবধান—আমি যে এই নোট দিয়ে যাচ্ছি, কাগে কোকিলেও যেন টের না পায়। আমার স্বামী শুন্‌লে অনর্থ করবেন, একেবারে ক্ষেপে যাবেন ! একেই ত আমায় যখন তখন বলেন উড়নচণ্ডী ! হাঁ ভাই, আমি উড়নচণ্ডী ?"

"না—আপনি লক্ষ্মী—আপনি কমলা"—বলিয়া সরমা সজল নয়নে সবজজ্-গৃহিণীর পদধূলি লইলেন।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

এন্‌ভের্-পাশাকে লিখিত পিয়ের-লোটির পত্র

(পিয়ের লোটির ফরাসী হইতে)

Rochefort, 4th September 1914.

প্রিয় সুহৃদ্‌বর

আমি আপনার একজন অনুরাগী ভক্ত এবং আপনার দেশের প্রতি আমি এতটা আসক্ত যে উহাকে কতকটা আমি আপনার করিয়া লইয়াছি। তাই এই পত্র লিখিতে আমি সাহসী হইলাম। ভরসা করি আপনি আমার এই ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। ত্রিপলি-যুদ্ধক্ষেত্রের মহাবীর আপনি—নিষ্কলঙ্ক ও নির্ভয়; একশো জনের বিরুদ্ধে দশজন হইয়া আপনি মাথা তুলিয়াছিলেন; থ্রেস প্রদেশে আপনিই তুর্কীকে আদ্রিনোপল্ প্রত্যর্পণ করিয়াছেন; এবং প্রায় বিনা রক্তপাতেই প্রচণ্ড বিক্রম-সহকারে আপনি নৃশংসতা ও দস্যুতা সর্ব্বত্র দমন করিয়াছেন; আমি দেখিয়াছি, বুলগারদিগের নৃশংস আচরণে আপনার চিত্ত ঘৃণা ও রোষে কতটা উত্তেজিত হইয়াছিল এবং যে সকল গ্রাম দিয়া ঐ গুপ্তহত্যাকারীরা গমন করিয়াছিল, সেই সকল গ্রামের ধ্বংসাবশেষ দেখাইবার জন্য আপনিই আপনার সামরিক মোটর গাড়ী করিয়া আমাকে লইয়া গিয়াছিলেন।

ভাল;—আপনি এখনও যাহা জানিতে পারেন নাই, আমি তাহা আপনাকে একটু বলিতে ইচ্ছা করি:—আপনার দেশে, বুলগারেরা যে-সব বীভৎস অত্যাচার করিয়াছিল, বেলজিয়ম ও ফ্রান্সে জর্ম্মাণেরা ঠিক সেই সব অত্যাচারই করিয়াছে! এবং এই সকল অত্যাচার আরও সহস্রগুণে ঘৃণিত, কেননা, বুলগারেরা আদিমকালের অসভ্য জাতি; তাহারা ধর্ম্মান্ধ; পক্ষান্তরে, জর্ম্মাণেরা সভ্যতাভিমানী। কিন্তু সুসভ্য হইলেও তাহাদের মনের অন্তস্তলে এতটা পাশবতা নিহিত রহিয়াছে যে, আত্মোৎকর্ষের শিক্ষা সাধনা তাহাদের অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই—অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত পৌছিতে পারে নাই।

আজিকার দিনে তুর্কী স্বকীয় দ্বীপগুলি পুনরধিকার করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে; পক্ষপাতিত্বে অন্ধ না হইলে এই বিষয়টি সকলেই বুঝিতে পারিবে। কিন্তু পাছে তুর্কী যুদ্ধটাকে আরও বেশী দূর লইয়া যায় সেই ভয়ে আমার হৃদয় কাঁপিতেছে…আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, প্রুসীয় জাতির দোষগুলা যে ঘৃণিত প্রাণীর মধ্যে মূর্ত্তিমান, সেই-ই আপনার প্রিয়তম দেশের উপর খুবই চাপ দিয়াছে। প্রতিশোধের অলীক অঙ্গীকারে আপনাকে ভুলাইয়া সে খুব সম্ভব আপনার জলন্ত দেশভক্তির অপব্যবহার করিয়াছে। তাহার মিথ্যা কথায় আপনি বিশ্বাস করিবেন না। সে নিশ্চয়ই প্রকৃত সত্যকে আপনার নিকট পৌছিতে দেয় নাই, পাছে আপনার বিশ্বস্ত সৈনিক-হৃদয় সেই কপটাচারী হইতে বিমুখ হয়। সে আপনার লোকের—সেইরূপ আপনারও এইরূপ বিশ্বাস উৎপাদন করিয়াছে যে, সে বাধ্য হইয়াই এই সমস্ত হত্যাকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইয়াছে; অথচ প্রকৃতপক্ষে, এই সমস্ত নারকীয় হত্যাকাণ্ড করিবে বলিয়া সে পূর্ব্ব হইতেই মৎলব আঁটিয়াছিল। তাহার পক্ষেরই জয় হইবে, এই কথা আপনাদের বিশ্বাস করাইতে সে সুসিদ্ধ হইয়াছে, অথচ এখন যেমন জগতের লোক জানে, সেইরূপ সেও জানে, পরিশেষে আমাদেরই জয় হইবে। তা ছাড়া, কথাটা অসম্ভব হইলেও, যদি বা কিয়ৎকালের জন্য আমাদের পরাভব হয়, প্রুসিয়া ও তাহার রাজবংশ মানব ইতিহাসের বিচারে জঘন্য অপরাধীর শ্রেণীভুক্ত হইয়া চিরকালের জন্য জগতের ঘৃণাস্পদ হইয়া থাকিবে!

বড়ই আক্ষেপের বিষয়, ফ্রান্সের নিকট হইতে

আপনারা কোন উপকার পান নাই ;—একথা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। ইটালীর ত্রিপলি-আক্রমণে আমরা মত দিয়াছিলাম। আরও কিছুকাল পরে, বল্‌কান যুদ্ধের প্রারম্ভে, তুর্কী আমাদের শিক্ষা-প্রতি-প্রতিষ্ঠানাদির প্রতি, আমাদের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি, যে-ভাষা আপনাদিগের প্রায় নিজের ভাষা হইয়া পড়িয়াছিল সেই ফরাসী ভাষার প্রতি যেরূপ অনুরাগ দেখাইয়াছিল তাহা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। অবিবেচনা ও অজ্ঞতাবশতঃ আমরা আপনার প্রতিবেশিদিগের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছি ; অথচ তাহাদের নিকট হইতে আমাদের ফরাসী জাতি অপকার ও উৎপীড়ন ছাড়া আর কিছুই পায় নাই। আপনাদের বিরুদ্ধে আমরা অবিরত নিন্দা ঘোষণা করিতে সুরু করিয়াছি —যদিও একটু বেশী বিলম্বে, আপনাদের প্রতি এইরূপ অবিচার করিয়াছি বলিয়াও বুঝিতে পারিয়াছি। পক্ষান্তরে একমাত্র জর্ম্মাণেরাই আপনাদের নিকট একটু সুখ-সুবিধা আনয়ন করিয়াছে—সে খুবই অল্প—কিন্তু এই মূল্যে উহাদের জন্য আপনারা আত্মহত্যা করিবেন কি ?

তার পর আরও দেখুন, এই পাষণ্ডেরা এক্ষণে আপনাদিগকে মানবধর্ম্মের বাহিরে স্থাপন করিয়াছে ; অতএব তাহাদের সহিত একসঙ্গে যাত্রা করা শুধু বিপজ্জনক নহে ; তাহার অধিক, হীনতাজনক।

আপনার দেশের উপর আপনার বিলক্ষণ প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে, আর সে প্রভাব-প্রতিপত্তি ন্যায্যও বটে ; যে মারাত্মক চালু পথের উপর দিয়া তুর্কী এক্ষণে চলিতে উদ্যত হইয়াছে, সে পথ হইতে আপনিই তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারেন।

আমার এই পত্র বহু বিলম্বে আপনার নিকট পৌঁছিবে। মিথ্যা কথার জালে জর্ম্মণী আপনাকে আচ্ছন্ন করিলেও—যখন এই পত্র আপনার নিকট পৌঁছিবে, তাহার পূর্ব্বেই হয় তো আপনার চোখ খুলিয়া যাইবে।

যাহারা আপনাকে একটু সত্য জানাইবার জন্য ব্যগ্র তাহাদের মধ্যে আমিও একজন হইতে ইচ্ছা করিয়াছি বলিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন।

আমাদের চরম জয় সম্বন্ধে আমার অটল বিশ্বাস। কিন্তু দেশ-উদ্ধারের দিনে যদি দেখি আমার দ্বিতীয় প্রাচ্য স্বদেশ, প্রুসিয়ার জঘন্য সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে চাপা পড়িয়াছে, তখন আমার আনন্দ শোকে আচ্ছন্ন হইবে !

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নীড় ও সাগর

তৃণ দিয়ে এরা বাঁধিয়াছে নীড়,
তমালতরুর শিরে,—
মহাসাগরের তীরে।
অরুণ জাগালে তবে
জাগে এরা কলরবে ;
সোনার আলোকে পালক মেলিয়া
সাঁতারে নীলিমা চিরে।
মাটির কণাটি খুঁটে খেতে হায়
ধরণীতে পুনঃ ফিরে।

উড়ে বলে এরা পাখা নাড়ি নাড়ি,
কুলাবার নাহি ঠাঁই,
আরো চাই আরো চাই !
শ্রান্ত সন্ধ্যাকালে,
ফিরিয়া তরুর ডালে,
এত বড় নীড় কেন রচেছিল,
দুইজনে ভাবে তাই।
প্রভাতে যে তারা আকাশে ধরেনি,
সে কথা স্মরণে নাই।

আঁখিতে যখন ঘোর নীল ঘন
মরণাঞ্জন আঁকে,—
—শ্যাম পল্লব ফাঁকে,
কাল বৈশাখী ঝড়ে,
গরজি সিন্ধু উচ্ছ্বসি আসি,
তরুমূল ধরি ঝাঁকে ;
কি দুর দুরাশে তৃণে গড়া বাসে,
মৌন বসিয়া থাকে ?

কোথা তীর, আর কোথা নীড়—দুয়ে
মিশেছে বা কোন্‌খানে,
এরা সে সকলি জানে।
তথাপি থাকিতে বেলা,
শেষ হয়নাক খেলা ;

লক্ষ্যক্লান্ত পক্ষ ঝাপটি
সন্ধ্যা আঁধার টানে।
কোথা নীর শেষ, কোথা তীরদেশ,
নীড় হায় কোনখানে !

হেঁয়ালির মত জীবন এদের—
তৃণে বোনা ক্ষীণ নীড়ে,
মহা সাগরের তীরে।
কখনো নীলিমা-মগ্ন,
কভু মৃত্তিকা-লগ্ন ;
অনেক দেখিয়া অনেক ঠেকিয়া
বুঝিয়াছে এরা কি রে—
এ পাখা বৃথাই, মুক্তি ত নাই,
উড়ে বসা ফিরে ফিরে !

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

সিন্দুর-কৌটা

(উপন্যাস)

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের চুম্বক।—বিজয়কুমার সুপুরুষ, ধনীসন্তান, ২৬ বৎসর বয়স, কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল। তাহার স্ত্রীর নাম বকুলমালা অথবা বকুরাণী, স্বামী-স্ত্রীতে বেশ সম্প্রীতি, একটি খুকী হইয়াছে তাহার বয়স দেড় বৎসর। বাড়ীতে বিজয়ের এক ভগিনী ও এক ভ্রাতৃজায়া আছেন, উভয়েই বিধবা।

পূজার বন্ধে বিজয় পশ্চিমভ্রমণে বাহির হইল ; নিজস্ব তিন-খানি মোটর কারের একখানি সঙ্গে লইল ; উত্তরপশ্চিমে ভাল ভাল রাস্তা আছে, ইচ্ছা, কিছু মোটর ভ্রমণও করিবে। বকুরাণী বলিয়া দিয়াছে, বিজয় যেখানেই থাকুক,নবমী পূজার দিন তাহার বাড়ী আসা চাই-ই, বিজয়া দশমীতে তাহারা একত্র থাকিবে।

কয়েকস্থান ভ্রমণ করিয়া বিজয় জব্বলপুরে পৌঁছিল। ডাক-বাঙ্গলায় প্রবেশ করিতেই দেখিল. শাড়ীপড়া অল্পবয়স্কা একটি সুন্দরী মেয়ে বারান্দায় চেয়ারে বসিয়া আছে। সন্ধান লইয়া জানিল,পল নামক এক মান্দ্রাজী সাহেব কয়েকদিন হইতে ডাক-বাঙ্গলায় বাস করিতেছে—মেয়েটি তাহারই স্ত্রী।

পলদম্পতীর সহিত বিজয়ের আলাপ হইল। পল ইনসিওরেন্স কোম্পানীর এজেন্ট, সারাদিন নিজের কাযে ঘুরিয়া বেড়ায়। বিজয় ও সুশী (পলের স্ত্রী) ডাকবাঙ্গলায় বসিয়া চা খায়, গল্প-গুজব করে। পলের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বিজয় দুই একদিন সুশীকে মোটরে বেড়াইতে লইয়া গেল। দুই একদিন পরেই বিজয় জানিতে পারিল, পল মদ্য-পায়ী, মাতাল হইয়া স্ত্রীকে প্রহারও করে। মেয়েটির কষ্টে বিজয়ের মনে করুণার সঞ্চার হইল। প্রথম প্রথম বিজয় তাহার দৈনিক পত্রে বকুরাণীকে সুশী-ঘটিত সমস্ত কথা লিখিত। ক্রমে সে বুঝিল, তাহার মন সুশীর দিকে ঝুঁকিতেছে।—নিজেকে

সামলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল—কিন্তু স্ত্রীকে সে সব কথা আর লেখে না। এমন সময় একদিন সন্ধ্যাবেলায় সুশী পলের পত্র পাইল যে তাহার চাকরি গিয়াছে, স্ত্রীকে ভরণপোষণ করিতে সে অক্ষম, রাত্রি ৯টার প্যাসেঞ্জারে সে বোম্বাই চলিল। আদালত হইতে তাহাদের বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিয়া লইতেও সুশীকে পরামর্শ দিয়াছে।

সুশীর হাতে তখন একটি পয়সাও নাই। সে কাঁদিতে লাগিল। বোম্বাই প্যাসেঞ্জার তখন জব্বলপুর ছাড়িয়া দিয়াছে। বিজয় হিসাব করিয়া দেখিল, রেলের ধারে ধারে যে পাকা রাস্তা গিয়াছে, সেই পথে মোটর ছুটাইয়া গেলে, ১২২ মাইল দূরে রাত্রি দুইটার সময় সোহাগপুর ষ্টেশনে সে ট্রেণ ধরা যায়। বিজয় তখন সুশীকে লইয়া মোটর ছুটাইয়া দিল। কিন্তু সোহাগপুরে পৌঁছিবার একমাইল বাকী থাকিতে, চাকা ফাটিয়া এবং কল খারাপ হইয়া গাড়ী বন্ধ হইয়া গেল। ট্রেণখানি তাহাদের সম্মুখ দিয়াই চলিয়া গেল।

সুশীকে লইয়া পদব্রজে বিজয় তথাকার ডাকবাঙ্গলায় গিয়া উঠিল। গাড়ী মেরামতের জন্য জব্বলপুরে মিস্ত্রী আনিতে লোক পাঠাইল। সুশীর জন্য একটি আয়া নিযুক্ত করিল, সে সুশীর শয়নকক্ষে রাত্রে শুইয়া থাকিবে।

সোহাগপুরে থাকিতে বিজয় বুঝিতে পারিল, সুশী মনে মনে তাহার প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করিতেছে। বুঝিয়া সে চিন্তিত হইল। ইতিমধ্যে শুনা গেল, পল কোথাও যায় নাই, জব্বলপুরেই আছে—মাতাল হইয়া, পকেটে টাকা ঝম্‌ঝম্ করিতে করিতে বেড়াইতেছে। এদিকে সুশীও দেখিল,তাহার বাক্স হইতে তাহার নেকলেসটি অপহৃত হইয়াছে। সুশীর মা মৃত্যুকালে তাহাকে এটি দিয়াছিলেন। বিজয় সুশীকে সোহাগপুরে রাখিয়া জব্বলপুরে আসিয়া পলকে ধরিল। যে স্বর্ণকারের নিকট সে ঐ নেকলেস বিক্রয় করিয়াছিল, নানা কৌশলে পলের নিকট হইতে তাহার সন্ধান লইয়া, নেকলেসটি উদ্ধার করিয়া, সেই রাত্রেই সোহাগপুরে ফিরিয়া সুশীর গলায় সেটি পরাইয়া দিল। জব্বলপুরে পল মাতাল অবস্থায় বিজয়ের নিকট প্রকাশ করিয়াছিল যে দেশে তাহার এক বিবাহিতা স্ত্রী জীবিত আছে।—বিজয় বুঝিল, একথা সত্য হইলে আইন অনুসারে সুশীর সহিত তাহার বিবাহ অসিদ্ধ। কিন্তু ইহার সত্যতা নির্দ্ধারণের পূর্ব্বে সুশীর নিকট তাহা প্রকাশ করা সঙ্গত মনে করিল না। দুই দিন পরে গাড়ী মেরামত হইল। মোটরখানি রেলে রওয়ানা করিবার ব্যবস্থা করিয়া, সুশীকে লইয়া বিজয় কলিকাতায় পৌঁছিয়াছে। সুশীকে গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে রাখিয়া, একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া সে এখন লোয়ার সার্কুলার রোডে নিজের বাড়ীতে যাইতেছে।]

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

বিংশ শতাব্দীর সূর্য্যমুখী।

"ছোটবউ, এখনও তোর লেখাপড়া শেষ হল না ভাই? শো শো, আলো নিবিয়ে দে। রাত জাগিস্ নে, অসুখ করবে। ক'টা বেজেছে সে খবর আছে?"

বকুরাণী তাহার শয়নকক্ষে খোলা পাখার নীচে টেবিলের কাছে বসিয়া একমনে পত্র লিখিতেছিল। শব্দে চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, দ্বারে তাহার বিধবা ননদ সৌদামিনী দাঁড়াইয়া। দেওয়ালে ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখিল, বারোটা বাজিয়া দশ মিনিট হইয়াছে। বলিল —"আমাকে বলা হচ্ছে শো শো—তুমি এত রাত অবধি জেগে আছ কেন?"

সৌদামিনী বকুরাণীর অপেক্ষা বছর দুইয়ের বড়— দুই জনে ভারি ভাব। বকুরাণীর প্রশ্নে সে ধীরে ধীরে ভিতরে আসিতে আসিতে বলিল—"আমার কথা ছেড়ে দে। আমি আর তুই? আমার কি সাত জন্মে কখনও অসুখ করে? দেখেছিস কোনও দিন?"—বলিতে বলিতে সে বকুরাণীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। টেবিলের পানে চাহিয়া বলিল—"কাকে চিঠি লেখা হচ্ছে? দাদাকে?"

দ্বিতীয় চেয়ার সেখানে না থাকায়, বকুরাণী উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—"বস্‌বে ভাই?"

"না না আমি বোসব না, তুই বোস।—আমার ঘুম হচ্ছিল না, তাই মনে করলাম ছাদে গিয়ে একটু বেড়িয়ে আসি। তোর ঘরে আলো জ্বলছে দেখে ভাবলাম দেখি তুই ঘুমুচ্ছিস্ না জেগে আছিস। এতরাত্রে নেই বা চিঠি লিখ্‌লি, কাল লিখিস'খন। আলো নিবিয়ে শো।"

বকু বলিল—"আমি ত শুয়ে ছিলাম। কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না—ছট্‌ফট্ করতে লাগলাম। তাই উঠে এই কতক্ষণ হল চিঠি লিখ্‌তে বসেছি।"

সৌদামিনী বলিল—"ঘুম যদি তোর নাই আসে,তবে ছাদে আমার সঙ্গে একটু বেড়াবি আয়।"

সৌদামিনী গভীর রাত্রে উঠিয়া ছাদে গিয়া বেড়াইতে ভালবাসে তাহা বকুরাণী জানিত। বিজয়কুমার এবার বিদেশ যাইবার পর সেও দুই একদিন তাহার সহচারিণী হইয়াছে—কিন্তু তাহা নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত। আজও এ প্রস্তাব তাহার লোভনীয় মনে হইল না ; সে বলিল—"এত রাত্রে ছাদে গিয়ে কি হবে ভাই ? এস বরং এই-খানে বসেই দুজনে গল্প করা যাক্।"—বলিয়া সে অদূর-বর্ত্তী সোফাখানির দিকে অগ্রসর হইল।

সৌদামিনী বলিল—"তবে তুই থাক্, আমি চল্লাম।"

সে রাগ করিতেছে বুঝিয়া বকুরাণী বলিল—"আচ্ছা চল চল, আমিও না হয় যাচ্ছি। কিন্তু খুকী যদি উঠে পড়ে ?"

অদূরে পালঙ্কের উপর বকুরাণীর খুকী শুইয়া ঘুমাইতেছিল। সদু ক্ষিপ্রহস্তে তাহার উভয় দিকে কয়েকটা বালিস উপরি-উপরি চাপাইয়া বলিল—"ঘুমুচ্ছে অকাতরে, উঠবে কেন ? তোর মেয়ে কি তোর মত বিরহিণী ? আর ওঠেই যদি, পাশের ঘরে ঝি রয়েছে, কাঁদলেই এসে নেবে। আয়।"

বকুরাণী বিদ্যুৎ-পাখার বেগ কমাইয়া দিয়া, সৌদা-মিনীর সহিত ছাদে গিয়া উঠিল। ছাদভরা অন্ধকার, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, কেবল মাঝে মাঝে সার্কুলার রোড দিয়া দুই একখানি মোটর গাড়ী নিঃশঙ্কচিত্তে হেডলাইট্ জ্বালাইয়া ছুটিয়া যাইতেছে। বাড়ীর পশ্চাতে অন্য-লোকের বাগান—জঙ্গল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেখানে জমাট অন্ধকার, সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া একটা গন্ধ ও ঝিল্লীর অবিরাম ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইতেছে। সেদিক পানে চাহিতেই বকুরাণীর ভয় করিতে লাগিল।

ছাদের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বকুরাণী বলিল—"তোমার যত সব অনাসৃষ্টি ! এত রাত্রে ছাদে তুমি কি জন্যে আস ভাই ? জ্যোৎস্না রাত্রি হলেও বা কথা ছিল। —এই বিষম অন্ধকার—কোলের মানুষ দেখা যায় না—কি দেখতে আস ?"

সৌদামিনী বলিল—"এই অন্ধকার দেখতেই ত আসি।"

বকু বলিল—"অন্ধকার আবার মানুষে দেখে বুঝি ?"

"কেউ কেউ দেখে বৈকি বোন্! কত লোক দিনে অন্ধকার দেখে—আমি ত তবু রাত্রে দেখি।"

বকুরাণী সৌদামিনীর হাতটি ধরিয়া বলিল—"হাঁঃ—তোমার যেমন কথা! দিনে আবার অন্ধকার দেখা যায় বুঝি ?"

"কেন, তুই দেখিসনি ?"

"কবে ?"

"মনে করে দেখ। দুদিন আগের কথা এরই মধ্যে ভুলে গেলি ?"

"কবে আবার দিনে আমি অন্ধকার দেখ্‌লাম ?"

"সেদিন যখন চিঠি পেলি যে দাদা সুশীকে নিয়ে অর্দ্ধেক রাত মোটর হাঁকিয়ে সোহাগপুরের ডাকবাঙ্গা-গিয়ে উঠেছেন—সেদিন চোখে কি দেখেছিলি ? আলো না অন্ধকার ?"—বলিয়া সে বকুরাণীর হাতটি স্নেহভরে নিষ্পেষিত করিল।

বকুরাণী কোনও উত্তর না করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছাদের আলিসা পর্য্যন্ত গেল। সেখানে দাঁড়াইয়া নিজেদের সুবিস্তৃত বহিরঙ্গণের দিকে চাহিয়া রহিল। গাড়ীবারান্দা হইতে প্রায় ফটক পর্য্যন্ত ফুলের বাগান। বাগানের উভয়পার্শ্ব দিয়া গাড়ী যাতায়াতের পথ। অল্প একটু বাতাস বহিতেছে—সেই বাতাসে বাগান হইতে ফুলের সৌরভ আসিতেছে।

উভয়ে সেখানে প্রায় দুই তিন মিনিট দাঁড়াইয়া থাকিবার পর সৌদামিনী বলিল—"তুই রাগ কল্লি রে ?"

বকুরাণী বলিল—"কেন ?"

"ঐ সুশীর কথা বল্লাম বলে ?"

"তাতে রাগ করবার কি আছে ?"

"তুই সেদিন যখন চোখ ছলছল করে আমায় এসে বল্লি যে সুশীর স্বামী পালিয়ে গেছে, দাদা তাকে নিয়ে সোহাগপুরের ডাকবাঙ্গলায় গিয়ে উঠেছেন, সেদিন তোর মুখ দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল ভাই। তোকে তখন বল্লাম বটে যে তার আর হয়েছে কি ?—কথাটা কিন্তু মোটেই আমার ভাল লাগেনি।"

বকুরাণী বলিল—"এ কি ভাল কথা যে ভাল লাগবে !"

সৌদামিনী বলিল—"আচ্ছা, তোর কি মনে হয় ? আমার ত ভাই ভয় হচ্ছে, তাঁর মন সুশীর দিকে একটুখানি ঝুঁকেছে।"

বকুরাণী বলিল—"আর, সুশীর মনও তাঁর দিকে বিলক্ষণ ঝুঁকেছে।"

সৌদামিনী সেই অন্ধকারে বকুরাণীর মুখের প্রতি চাহিতে চেষ্টা করিয়া বলিল—"দূর ! কে বল্লে তোকে ? দাদা লিখেছেন ?"

"না—সে কথা কি কেউ লেখে ?"

"তবে কি করে জানলি তুই ?"

"এখন দুজনে 'তুমি তুমি' বলে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হয়েছে।"—বলিয়া ওষ্ঠ স্ফীত করিল।

"তাই নাকি ?"

"হ্যাঁ। আজ ত কোন চিঠি পাইনি, কাল যে চিঠি এসেছে তাতে লেখা আছে—'আমি সুশীকে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি এখন কি করিবে ? তোমার কোনও আত্মীয়স্বজন যদি কোথাও থাকে ত বল, তোমায় সেখানে পৌছাইয়া দিই। ইহাতে সুশী কাঁদ-কাঁদ হইয়া উত্তর করিল, কেন তুমি কি জান না আমার বাপ নাই মা নাই ভাই নাই বোন নাই—একমাত্র খুড়ীমা আছেন, তিনি বর্ম্মায়। যদি সেখানেই আমায় যাইতে বল, তবে তাই যাইব।—সুশীর কথাবার্ত্তায় বোধ হইতেছে বর্ম্মায় যাইতে তাহার মোটেই ইচ্ছা নাই ; তাহার ইচ্ছা সে কলিকাতেই থাকে। দেখি, এদিকে কোনও জেনানা মিশনে তাহার যদি কোনও কাযকর্ম্ম জুটাইয়া দিতে পারি।'—আগে আগে দুই একখানা চিঠি তুমি ত দেখেছ সদু, যেখানেই দুজনে কথাবার্ত্তার কথা আছে, 'আপনি আপনি' আছে।"

সৌদামিনী বকুরাণীর হাত ধরিয়া টানিল। দুইজনে বেড়াইতে বেড়াইতে ছাদের অপর প্রান্তে গিয়া, ঝিল্লিমুখরিত সেই অন্ধকার বাগানটার পানে চাহিয়া রহিল।

সৌদামিনীকে নীরব দেখিয়া বকুরাণী জিজ্ঞাসা করিল—"কি ভাবছ ?"

সৌদামিনী বলিল—"ভাবছি বিষবৃক্ষ ?"

"কুন্দনন্দিনীর কথা ?"

"আর কার ? কমল যখন প্রস্তাব করলে, আমার সঙ্গে তুমি কলকাতায় চল, কুন্দ প্রথমে বলেছিল যাব। তার পর বাগানের মধ্যে বাপীতটে বসে কুন্দ ভাবছে, 'কলকাতায় ত যেতে পারব না, দেখতে পাব না যে ; আমি যেতে পারব না পারব না পারব না।'—সুশীও তেমনি বর্ম্মায় যেতে পারবে না পারবে না পারবে না। সে এই কলকাতাতেই আসবে।"

বকুরাণী নীরবে সেই অন্ধকার বাগানের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল, বুকের ভিতর মনে হইল কে যেন ছুটোপাটি করিতেছে।

সৌদামিনী বলিল—"কোথা থেকে এই আপদ সুশী এসে জুটলো ভাই ! দাদা কবে ফিরবেন তা কিছু তোকে লিখেছেন ?"

বকুরাণী ভারী গলায় বলিল—"গাড়ী মেরামত হলেই, সুশীর একটা ব্যবস্থা করে বাড়ী ফিরবেন লিখেছেন।"

"কি ব্যবস্থা করবেন ? তিনকূলে তার কেউ নেই, কোন চুলোয় সে যাবে ?"

কোন চুলোয় সে যাইবে, তাহা বকুরাণী কেমন করিয়া জানিবে ? তাই সে কোনও উত্তর করিতে পারিল না। কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"আচ্ছা সদু, তিনি যদি তাকে এইখানেই নিয়ে আসেন ?"

"কোথায় ? এ বাড়ীতে ?"

"হ্যাঁ।"

সৌদামিনী কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল —"তা হলেই কুন্দনন্দিনীর অভিনয়টা পুরোপুরি হয়।"

বকু বলিল—"তোমাকেই ত কমলমণি হতে হয়।"

স্বামী-সোহাগিনী কমলমণির সহিত এই তুলনায়, নিজের মন্দভাগ্য স্মরণ করিয়া স্বামীহীনার বুকে ব্যথা বাজিয়া উঠিল। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—"আর সে অভিনয়ে কায নেই।"

বকুরাণী বলিল—"উঃ, ঐ বাগানটা কি অন্ধকার! চল ভাই সামনের দিকে যাই—তবু বরং চোখে একটু আলো দেখা যায়।"

সৌদামিনী বলিল—"এ দিকটায় দাঁড়ালে কেমন একটি বনের গন্ধ পাওয়া যায় দেখিছিস!"

বকুরাণী বলিল—"অন্ধকার আর বনের গন্ধের চেয়ে, আমার কিন্তু ভাই আলো আর ফুলের গন্ধ বেশী ভাল লাগে।"

সৌদামিনী হাসির স্বরে বলিল—"কুন্দফুলের গন্ধ তোর কেমন লাগে লো?"

"বেশ লাগে, এস এস।"—বলিয়া বকুরাণী ননদের হস্তাকর্ষণ করিল।

ধীরে ধীরে ছাদ অতিক্রম করিয়া উভয়ে পুনরায় অপর দিকের আলিসার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। বকুরাণী বলিল—"বেশ গন্ধটি আসছে—হাস্নুহানার গন্ধ, নয় ভাই?"

"না—জহুরী চাঁপা।"

"আচ্ছা কুন্দফুল আমাদের বাগানে আছে?"

সৌদামিনী বলিল—"কুন্দফুল কি আর বাগানে হয়? বনে জঙ্গলে হয়।"

"তুমি দেখেছ?"

"দেখেছি—আমার শ্বশুরবাড়ীর দেশে।"

"কি রকম ফুল ভাই? কুন্দফুল আমি কখনও দেখিনি কিন্তু।"

"ছোট ছোট শাদা শাদা। সুন্দরীর দাঁতের সঙ্গে কবিরা তার তুলনা করেন, পড়িস নি?"

কুন্দে দন্তপাতি রাখিয়াছে গাঁথি
অধরে নবীন পল্লব দিল।

তবে নামটি যেমন ভাল, ফুলটি তেমন নয়। গন্ধ নেই।"

বকুরাণী জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, সূর্য্যমুখী ফুলে গন্ধ আছে? আমাদের বাগানে এত সূর্য্যমুখী ফোটে, কৈ কখনও ত গন্ধ পেলাম না।"

সৌদামিনী বলিল—"ও যেমন কুন্দ, তেমনি সূর্য্যমুখী।"

বকুরাণী ননদের গা ঠেলিয়া বলিল—"তুমি হলে ভাই কমল, তোমার মত গন্ধ কুন্দ সূর্য্যমুখী আমরা কোথায় পাব বল?"

সৌদামিনী বলিল—"আজ কুন্দ সূর্য্যমুখী তোর মাথায় ঢুকে গেল কেন রে?"

বকু বলিল—"তুমিই ত ঢুকিয়ে দিলে ভাই!"

সৌদামিনী বলিল—"দেখ্ ভাই, দাদাকে তুই চিঠি লেখ্ যে শীগ্গির চলে এস।"

"তাকে যদি সঙ্গে করে আনেন?"

"আনলেই বা। 'কুন্দ, এস দিদি এস'—বলে' তার হাত ধরে' তাকে ঘরে তুলে নিবি।"

বকুরাণী বলিল—"ঈস্!—ঘরে তুলে নেব! ঝাঁটা মেরে বিদেয় করে দেব না!"

সৌদামিনী হাসিয়া বলিল—"সে কি রে! এই বুঝি তুই সূর্য্যমুখী?—তুই দাদাকে কোথায় বলবি—'প্রভু, তোমার সুখেই আমার সুখ—তুমি কুন্দকে বিবাহ কর আমি সুখী হইব।'—তা নয়, ঝাঁটা?"

বকুরাণী হাসিয়া বলিল—"আমি যে বিংশ শতাব্দীর সূর্য্যমুখী—ঝাঁটাহস্তেন সংস্থিতা।"

এই সময় সদর রাস্তায় ভয়ানক জোরে ঘণ্টাধ্বনি হইতে লাগিল। উভয়ে চমকিত হইয়া রাস্তার পানে চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে দুইখানি ফায়ার এঞ্জিন মহাবেগে শিয়ালদহ অভিমুখে ছুটিয়া গেল। সদু বলিল—"এত রাত্রে আগুন!"

বকু বলিল—"বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুচ্ছিল,—হঠাৎ

জেগে দেখে আগুন!—কার সুখের ঘরে আগুন লাগলো কে জানে!

সত্ন বলিল—"দুঃখের ঘরে কি আর আগুন লাগে? সুখের ঘরেই ত আগুন লাগে ভাই!"

দুইজনে পাঁচ মিনিট কাল নীরবে সেই রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল। এমন সময় কোথায় একটা পেটা ঘড়ি বাজিল—ঢং। বকুরাণী "বলিল—একটা বেজে গেল—অনেক রাত্রি হল, চল ভাই শুইগে।"

"চল।"

উভয়ে তখন ছাদ হইতে নামিয়া গেল।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

গৃহে।

ননদ-ভা'জে এই প্রকার আলোচনার পরদিন বেলা ৭টার সময় বিজয়কুমারের বেহারা লছমন ঠিকা গাড়ীতে মালপত্র বোঝাই লইয়া আসিয়া পৌঁছিল। ভৃত্যগণ ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বাবু আসিয়াছেন নাকি?"

"হাঁ—আসিয়াছেন"—বলিয়া লছমন মালপত্র নামাইতে লাগিল। কোনও সংবাদ নাই, প্রভুর হঠাৎ আগমনে ভৃত্যগণ শঙ্কিত ও চমকিত হইয়া উঠিল। আগে সংবাদ পাইলে মালী তাহার বাগান খানিকে যে ভাবে সাজাইয়া রাখিত, তাহার কিছুই হয় নাই। বেহারার প্রতি হুকুম ছিল, আপিস কামরা ও বৈঠকখানা ঘরের সমস্ত পিতল প্রত্যহ পালিস দিয়া উজ্জ্বল রাখিবে, সে আজ্ঞা এ যাবৎ একদিনও প্রতিপালিত হয় নাই —সমস্ত পিতল কালো হইয়া আছে। বাবুর্চ্চিও বাবুর এখন ফিরিবার সম্ভাবনা নাই জানিয়া বাড়ী গিয়াছে—তবে বেশী দূরে সে থাকে না, বাবুর ফিরিবার সংবাদ আসিলেই কার্ব্বালা ট্যাঙ্ক লেনে তাহাকে সংবাদ পাঠাইবার জন্য যে বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছে।

বকুরাণীর যখন ঘুম ভাঙ্গিল, জানালা দিয়া ঘরে তখন রৌদ্র প্রবেশ করিয়াছে। দেওয়ালে ঘড়িটার পানে চাহিয়া দেখিল, বেলা সাড়ে সাতটা। খুকীকে দেখিতে পাইল না—ভাবিল ঝি নিশ্চয়ই তাহাকে তুলিয়া লইয়া গিয়াছে।

দর্পণের নিকট দাঁড়াইয়া বকুরাণী নিজ অবিন্যস্ত কেশরাশির কতকটা সুব্যবস্থা করিতেছিল, এমন সময় তোয়ালে হাতে লইয়া সৌদামিনী আসিয়া প্রবেশ করিল। একটু হাসিয়া বলিল—"কি গো সূর্য্যমুখী—সূর্য্য না উঠলে বুঝি তোমার ঘুম ভাঙ্গে না আজকাল?"

বকুরাণী বলিল—"কিন্তু সূর্য্য ওঠবার আগে কমলেরও ত ফোটবার কথা নয় ভাই!"

সৌদামিনী বলিল—"কমল আর ফুটলো কৈ? শুকিয়ে জলে ভাসছে।—সে যাক্। একটা খোস খবর আছে, কি খাওয়াবি বল্।"

"কি আবার তোমার খোস খবর?"

"দাদা ফিরে এসেছেন।"

"দূর!—মিছে কথা। কৈ তিনি?"

"এখনও বাড়ী আসেন নি। সকালের ট্রেণে পৌঁছেছেন।"

"সকালের ট্রেণে এসেছেন তবে বাড়ী এলেন না? কে বল্লে এসেছেন?"

"লছমন এসেছে। ষ্টেশনে নেমে, ঠিকে গাড়ীতে জিনিষপত্রসুদ্ধ লছমনকে রওয়ানা করে দিয়ে, তিনি সেই ছুঁড়িটেকে নিয়ে কোথা গেছেন।"

একথা শুনিয়া বকুরাণীর মুখটি ম্লান হইয়া গেল। বলিল—"লছমন কি বল্লে? তাকে দেখেছ তুমি?"

"হ্যাঁ—এই যে সে ছিল। বাবু কোথা রে জিজ্ঞাসা করতে বল্লে, বাবু ঘণ্টা খানেক পরে আসবেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সঙ্গে এলেন না কেন? সে বল্লে, এক মেমসাহেব এসেছেন, তাঁকে তিনি বাড়ী পৌঁছে দিতে গেছেন—পৌঁছে দিয়েই আসবেন।"

বকুরাণী দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। সৌদামিনী বলিল—"একে ত উঠলি তিনপোর বেলায়। যা এই বেলা স্নান টান করে নে—এক্ষুণি দাদা এসে পড়বেন।"

বকুরাণী বলিল—"যদি না আসেন ভাই?"

সৌদামিনী তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিল—"ওকি অলক্ষুণে কথা লো! না আসবেন কেন?"

"না—আমি বলছি, এখনি যদি না আসেন। এই ত শুনেছিলাম তার চাল নেই চুলো নেই, বাড়ী কোথা পেলে সে যে তাকে বাড়ী রাখতে গেলেন?—সে যদি না ছাড়ে—এ বেলা যদি সেখানেই থেকে যান!"

সৌদামিনী বলিল—"তোর বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ হয়ে গেল নাকি? বাড়ী পৌছতে গেছেন মানে কি তার বাড়ী? তার কোনও বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে তাকে পৌছে দিতে গেছেন—আসবেন এখনি। আমিও স্নান করতে যাচ্ছি, তুইও এই বেলা সেরে ফেল।"

সৌদামিনী চলিয়া গেল।

বকুরাণী বাহির হইয়া স্নানের জন্য কোনও ত্বরা দেখাইল না। ঝির নিকট হইতে খুকীকে উদ্ধার করিয়া, তাহাকে বুকে লইয়া এ ঘর ও ঘর করিয়া বেড়াইতে লাগিল। মাঝে মাঝে জানালায় দাঁড়াইয়া সদর ফটকের পানে চাহিয়া থাকে। এইরূপ করিতে করিতে ঘড়িতে আটটা বাজিয়া গেল।

সৌদামিনী স্নান শেষ করিয়া রান্না-বাড়ীর দিকে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, বকুরাণী আসিয়া বলিল—"কৈ, এখনও যে এলেন না ভাই!"

"আসবার সময় কি বয়ে গেছে? আসবেন এখনি, তুই এত উতলা হচ্ছিস কেন?"

"উতলা হচ্ছি কি সাধে! এই ত আর প্রথম বাইরে যাননি। আগেও ত গিয়েছেন—ট্রেণ থেকে নেমে কখনও কি বাড়ী আসতে এমন দেরী হয়েছে?—আগে থাকতে টেলিগ্রাফ এসেছে,—ষ্টেশনে মোটর পাঠাতে বলেছেন। এবার, আসছেন তা একটা খবরও দিলেন না! আমার কিন্তু ভাল বোধ হচ্ছে না ভাই। লছমনকে ডাকিয়ে না হয়—"

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বহিরঙ্গণে মোটর গাড়ী প্রবেশ করিবার শব্দ আসিল। উভয়ে ছুটিয়া জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু গাড়ী তখন আর দেখা গেল না—গাড়ীবারান্দার ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, তাহার গর্জ্জন শব্দটা শুনা যাইতেছে মাত্র।

অল্পক্ষণ পরে ঝি আসিয়া সংবাদ দিল—"ওগো, বাবু এসেছেন।"

বকুরাণী কাণ পাতিয়া রহিল, সিঁড়িতে জুতার শব্দ কতক্ষণে পাওয়া যায়। কিন্তু বিলম্ব হইতে লাগিল। সে তখন অস্থির হইয়া ঝিকে বলিল—"যা ত, বাবু কি করছেন দেখে আয়।"

ঝি ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"নীচের পোষাক কামরায় লছমন বাবুর জুতো খুলে দিচ্ছে;—রামা ধুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।"

বকুরাণী নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল—"এও নূতন। আগে হলে, প্রথম আমার কাছে এসে, খুকীকে আদর করে, তারপর পোষাক ছাড়তেন।"

সৌদামিনীর কক্ষ হইতে উঠিয়া বকুরাণী ধীরে ধীরে গিয়া নিজকক্ষে প্রবেশ করিল। জানালার কাছে দাঁড়াইয়া উদাস নেত্রে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ এইরূপ থাকিয়া হঠাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, কক্ষের মাঝখানে বিজয়কুমার দাঁড়াইয়া আছে। পায়ে জাপানী ঘাসের চটি—তাই শব্দ হয় নাই।

বকুরাণী মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কখন এলে তুমি?"

বিজয় ক্ষীণস্বরে বলিল, "এইমাত্র। ভাল আছ ত?

বকুরাণী নীরবে মস্তক হেলাইল।

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"খুকী ভাল আছে ত? কৈ সে?"

"ভাল আছে। ঠাকুরঝির কাছে রয়েছে—নিয়ে আসি।"—বলিয়া বকুরাণী কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

বিজয় শ্রান্তিভরে সোফায় বসিয়া পড়িল।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থ-সমালোচনা

ন্যায়দর্শন। গৌতম সূত্র, বাৎস্যায়ন ভাষ্য বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি ও টিপ্পনী সহিত। শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক সম্পাদিত। প্রথম খণ্ড। ৪৮+৪২৮ পৃষ্ঠা।

এই গ্রন্থখানি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ব্যয়ে সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাবলীর ৬৩ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ একদিকে যেমন প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যের বিলুপ্তপ্রায় রত্নগুলি মুদ্রিত করাইয়া রক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন, অপর দিকে তেমনি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থরাজির বহুল প্রচার কামনায় সেগুলি বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস করিয়া সাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, শ্রীভাষ্য প্রভৃতির ন্যায় এই বর্ত্তমান গ্রন্থখানি বঙ্গভাষাভাষী ব্যক্তিমাত্রেরই বিশেষ আদরণীয় হইবে।

ষড়্দর্শনের মধ্যে ন্যায়দর্শন সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ ও দুর্ব্বোধ্য বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। কেবল আক্ষরিক অনুবাদে ইহা সরল হওয়া সম্ভব নহে। যাঁহারা কেবল আক্ষরিক অনুবাদে অগ্রসর হইয়াছিলেন, এই কারণেই তাঁহারা সফলকাম হইতে পারেন নাই। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি একদিকে যেমন আক্ষরিক অনুবাদ দিয়া মূল বুঝাইবার বিশেষ প্রযত্ন করিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি বিস্তৃত বিবৃতি ও টিপ্পনী দ্বারা বিষয়টিকে সরলভাবে বুঝাইয়াছে, প্রাসঙ্গিক বহু বিষয়ের আলোচনা ও স্থলে স্থলে মতের সমালোচনাও করিয়াছে। গ্রন্থখানিতে গৌতমরচিত ন্যায়সূত্র ও বাৎস্যায়নকৃত ভাষ্যের মূল অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু সম্পাদক কেবল ইহাতেই নিজ কর্ত্তব্য শেষ হইল বলিয়া মনে করেন নাই। প্রত্যেক বিষয়টি সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ প্রাচীন বৃত্তি ও টীকাকারগণের মতের সম্যক্ আলোচনা ও অন্যান্য গ্রন্থের সহিত তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন। বহু শাস্ত্রে প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা না থাকিলে এ কার্য্য সম্ভব হয় না। সম্পাদক এই ব্যাখ্যা ও বিবৃতি রচনায় যেরূপ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে কেবল এই দিক দিয়াই গ্রন্থখানির মূল্য শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। জৈনদের পৃথক ন্যায়দর্শন আছে। জৈন পণ্ডিতগণ ও অজৈন দুই চারিজন বিশেষজ্ঞ ভিন্ন বাঙ্গালার সাধারণ নৈয়ায়িকগণ তাহার কোন সংবাদ রাখেন না। অথচ জৈনন্যায়ের সহিত তুলনায় সমালোচনা করিলে বহু বিষয় পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে সম্পাদক হরিভদ্র সূরি কৃত ষড়দর্শন সমুচ্চয়, বিদ্যানন্দ স্বামী কৃত পত্র-পরীক্ষা, পরীক্ষামুখ, ন্যায়দীপিকা প্রভৃতি জৈন গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া বহু বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। বাৎস্যায়ন ভাষ্যের প্রকৃত পাঠ নির্দ্ধারণ করিতে ও প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করিতে সম্পাদক বহু গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছেন। বিশ্বনাথকৃত বৃত্তি, উদ্যোতকর কৃত ন্যায়বার্ত্তিক, বাচস্পতি মিশ্র কৃত ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা ও ন্যায়সূচিনিবন্ধ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া জয়ন্তভট্টকৃত ন্যায়মঞ্জরী, বরদরাজ কৃত তার্কিকরক্ষা, দিঙ্‌নাগের প্রমাণসমুচ্চয়, প্রভৃতি বহুবিধ গ্রন্থের বিষয়বিশেষে মত এই গ্রন্থখানি হইতেই অবগত হইতে পারা যাইবে। একজন অভিজ্ঞ বিদ্বানের বহুদিনের অধ্যয়ন ও আলোচনার ফলে যেরূপ গ্রন্থ রচনা হইবার সম্ভাবনা এই গ্রন্থখানি সেইরূপ হইয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত এই গ্রন্থখানি প্রত্যেক ন্যায়শাস্ত্রাধ্যায়ীর গৃহে বিরাজ করিবে।

৩৯ পৃষ্ঠা ব্যাপী ভূমিকায় সম্পাদক বহুবিধ কথার আলোচনা করিয়াছেন। সর্ব্বাগ্রে ন্যায়দর্শনের পরিচয় ও প্রয়োজন বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। সম্পাদক বলেন, শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা মোক্ষলাভ শ্রুতিতে উপদিষ্ট। ন্যায়দর্শন ব্যতীত মনন সম্ভব নহে। সুতরাং তত্ত্বান্বেষীর পক্ষেও ন্যায়দর্শন উপেক্ষণীয় নহে। মোক্ষলাভ-প্রয়াসীর ন্যায়দর্শনে জ্ঞানলাভ প্রয়োজনীয় বলিয়াই সর্ব্বত্র ন্যায়দর্শনের প্রশংসা ও অধ্যয়নের বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কোথাও আন্বীক্ষিকী, কোথাও তর্ক, কোথাও ন্যায়নামে এই শাস্ত্র উল্লিখিত। উপনিষৎ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্‌ভাগবত, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, মনুসংহিতা, গৌতমসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ সকল হইতে ন্যায়শাস্ত্রের প্রশংসা ও প্রয়োজনীয়তা-সূচক বহু বচন সম্পাদক উদ্ধৃত করিয়াছেন। মহাভারত শান্তিপর্ব্বে ইন্দ্রকাশ্যপ-সংবাদে যে আন্বীক্ষিকীকে 'নিরর্থিকা' বলা হইয়াছে, সেখানে নাস্তিক তর্কশাস্ত্রেরই নিন্দা বুঝিতে হইবে, এ কথাও সম্পাদক প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

তাহার পর গোতম প্রণীত ন্যায়দর্শনের অধ্যায় ও সূত্রসংখ্যা সম্বন্ধে বিচার করিতে বসিয়া বলিয়াছেন, "বাৎস্যায়ন ন্যায়ভাষ্যে ভাষ্যলক্ষণানুসারে প্রথমতঃ সূত্রের ন্যায় সংক্ষিপ্ত বাক্য রচনা করিয়া পরে নিজেই ঐ নিজ বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ...পরে বাৎস্যায়নের ঐ সংক্ষিপ্ত বাক্যগুলির মধ্যে অনেক বাক্যকে অনেকে ন্যায়সূত্ররূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাচীন কালে হস্তলিখিত পুঁথিতে সূত্র ও ভাষ্য কোন চিহ্নাদি যোগ ব্যতীত লিপিবদ্ধ থাকায় অনেকের ঐরূপ ভ্রম হইয়াছে।... আবার অনেকে স্বমত সমর্থনের জন্যও ন্যায়সূত্রের কল্পনা করিয়াছেন, ইহাও বুঝা যায়।"

সম্পাদক আলোচ্য গ্রন্থে বাচস্পতি মিশ্রের "ন্যায়সূচীনিবন্ধ" অনুসারে সূত্রপাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। কোন কোন স্থলে এই সূত্রপাঠের সমালোচনাও করিয়াছেন। "ন্যায়সূত্র পাঠাদি বিষয়ে সুচিরকাল হইতেই যে নানা মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা নানা গ্রন্থের দ্বারাই বুঝা যায়। এবং তাহার দ্বারা পূর্ব্বকালে ন্যায়সূত্র নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে নানাভাবে আলোচিত হইয়া বিকৃত ও কল্পিত হইয়াছিল।...তাহাতেই...বাচস্পতি মিশ্র ...ন্যায়সূত্রের সংখ্যা ও পাঠাদি বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া যাইবার জন্য 'ন্যায়সূচীনিবন্ধ' রচনা করেন।" তিনি "লিখিয়া গিয়াছেন, এই ন্যায়শাস্ত্রে অধ্যায় ৫, আহ্নিক ১০, প্রকরণ ৮৪, সূত্র ৫২৮, পদ ১৯৯৬, অক্ষর ৮৩৮৫।"

কেহ কেহ বলেন, "প্রচলিত ন্যায়দর্শনের অধিকাংশ সূত্রই পরে অন্য কর্তৃক রচিত। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় পরে রচনা করিয়া সংযোজিত করা হইয়াছে। ঐ সকল অধ্যায়ে বৌদ্ধমতের আলোচনা থাকায় উহা বৌদ্ধযুগে রচিত এবং মূল ন্যায়শাস্ত্র কেবল হেতুবিদ্যা; উহাতে অধ্যাত্মবিদ্যার কোন কথাই ছিল না।" তাঁহাদের মতের সমালোচনা সম্পাদক এই গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে করিয়াছেন ও গ্রন্থশেষে করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

ইহার পর ন্যায়সূত্রকার গৌতম সম্বন্ধে বহুবিধ পৌরাণিক কাহিনী সঙ্কলন করিয়া সম্পাদক দেখাইয়াছেন যে, যে সকল প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা এ যাবৎ গৌতমের ন্যায়সূত্র রচনার কাল বা স্থান সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। বাৎস্যায়নের কাল নির্ণয় সম্বন্ধেও সম্পাদক ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। যাঁহারা বাৎস্যায়ন ও চাণক্যকে অভিন্ন মনে করেন এবং ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ও অর্থ ও কামশাস্ত্রকার বাৎস্যায়নকে একই ব্যক্তি বলেন, তাঁহাদের মতের বিশদ আলোচনা করিয়া সম্পাদক উহা স্বীকার করিতে সম্মত হন নাই। সম্পাদকের মতে, "ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন খৃষ্টপূর্ব্ববর্ত্তী অতি প্রাচীন।" 'বিশ্বকোষে' লিখিত হইয়াছে, 'বাৎস্যায়ন ভাষ্যে কোথাও বৌদ্ধপ্রসঙ্গ নাই।' সম্পাদক ইহা ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া বলেন, "বাৎস্যায়ন ও বাচস্পতি মিশ্রের কথার দ্বারা বৌদ্ধ দার্শনিকগণের অভ্যুদয়ের পরে বাৎস্যায়ন ন্যায়সূত্রের উদ্ধার ও ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়।"

ইহার পর সম্পাদক বিশদ আলোচনার দ্বারা উদ্দ্যোতকরের আবির্ভাব কাল যে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীরও পূর্ব্ববর্ত্তী ও বাচস্পতি মিশ্রের কাল যে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার পর ভূমিকা সমাপ্ত হইয়াছে।

তাহার পর ৪২৭ পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থে গৌতমসূত্র ও বাৎস্যায়ন ভাষ্যের মূল ১ম অধ্যায় অবধি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরবর্ত্তী খণ্ড সমূহে আর চারি অধ্যায় প্রকাশিত হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রকৃত পাঠ নির্দ্ধারণ ও ব্যাখ্যাকল্পে সম্পাদক যে প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন তাহাতে এই গ্রন্থখানি সহজবোধ্য হইয়াছে। সম্পাদক স্থলে স্থলে নিজমত প্রকাশ ও বিচারেও কুণ্ঠিত হন নাই। সেই অংশগুলিও যে দার্শনিকগণের বিশেষ আদরণীয় তাহা নিম্নলিখিত একটি দৃষ্টান্তেই পরিস্ফুট হইবে :—

"মনের ইন্দ্রিয়ত্ব মহর্ষির (গৌতমের) সম্মত।...ভাষ্যকারের কথায় বুঝা যায় তিনি মনের ইন্দ্রিয়ত্বকে সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তই বলিতেন।...পরবর্ত্তীকালে 'বেদান্ত পরিভাষ'কার ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র মনের ইন্দ্রিয়ত্বে বিবাদ করিয়াছেন—তিনি উপনিষদে ইন্দ্রিয় হইতে মনের পৃথক উল্লেখ দেখাইয়া শেষে স্বমত সমর্থন করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনের ইন্দ্রিয়াধিকরণে কিন্তু (২ অঃ ৪ পাদ ১৭ সূত্র) মনের ইন্দ্রিয়ত্বের কথা পাওয়া যায়। সেখানে ভাষ্যকার ভগবান শঙ্করাচার্য্য মনের ইন্দ্রিয়ত্ব বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত স্মৃতিপ্রমাণের উল্লেখ পূর্ব্বক মনকেও ইন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীমদ্ বাচস্পতি মিশ্রও সেখানে 'ভামতী'তে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত স্মৃতিপ্রমাণের উল্লেখ পূর্ব্বক শাস্ত্রে অনেকস্থলে যে ইন্দ্রিয় হইতে মনের পৃথক উল্লেখ আছে, তদ্বিষয়ে ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের ন্যায়ই কারণ বর্ণনা করিয়াছেন। গীতায় ভগবদ্‌বাক্যও রহিয়াছে, 'ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি।' ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আমি মন, এ কথা বলিলে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব স্পষ্টই প্রকটিত হয়। বেদান্তপরিভাষকার গীতার 'মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি' এই কথাটি উল্লেখ করিয়া তাঁহার নিজ মতের বিরোধভঞ্জন করিতে গিয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত 'ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি' এই কথাটির কোন উল্লেখ করেন নাই, কেন করেন নাই, তাহা ভাবিবার বিষয়। কোন আধুনিক টীকাকার 'ইন্দ্রিয়াণাং' এই স্থলে সম্বন্ধে ষষ্ঠীর ব্যাখ্যা করিয়া অর্থাৎ 'ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধে আমি মন' ইহাই ঐ ভগবদ্‌বাক্যের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া গ্রন্থকারের মত রক্ষা করিতে গিয়াছেন। কিন্তু ঐ ব্যাখ্যা যে ঐ স্থলে প্রকৃত ব্যাখ্যা নহে, ইহা সুধীগণ অবশ্য বুঝিয়া থাকেন। ভগবান শঙ্করও সেখানে ঐ ভাবের ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি শারীরকভাষ্যে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব স্বীকার করিয়াছেন, এখানে অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিতে যাইবেন কেন? বেদান্তপরিভাষকার এই সকল দেখিয়াও বেদান্তগ্রন্থে

—শঙ্করের মতসমর্থক গ্রন্থে মনের ইন্দ্রিয়ত্ববাদ খণ্ডনে এত বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন কেন ইহা চিন্তনীয়। ভগবান শঙ্কর শ্রুতিমূলক স্মৃতির মতানুসারে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব মানিয়া লইয়া উপনিষদের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিলেন, আর ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র তাহা মানিলেন না, নূতন মতের সৃষ্টি করিলেন...সুধীগণের ইহা চিন্তা করা উচিত।"

এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানির যথোপযুক্ত সমালোচনা করিবার স্থান আমাদের নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষত্রুটির উল্লেখেরও প্রয়োজন দেখি না। দোষের মধ্যে ছাপার ভুলই অনেকগুলি আমাদের চোখে পড়িল। যথা "মন্তবান্তর্কতঃ" (১ পৃষ্ঠা), "কুল্লকভট্ট" (৫ পৃষ্ঠা) ইত্যাদি। দুই এক স্থলে ভাষায় প্রাদেশিকতাদোষও আছে। যথা ৩৭ পৃঃ—"পারিয়াছিল না।" গ্রন্থশেষে একখানি শুদ্ধিপত্র দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে সকল ভুলগুলির উল্লেখ নাই। একখানি অতিরিক্ত শুদ্ধিপত্র সংযোজন করিলেই গ্রন্থখানি নির্দ্দোষ হইবে।

বাৎস্যায়নভাষ্যের বাঙ্গানুবাদ এই প্রথম। এই কার্য্য অতি দুঃসাধ্য বলিয়া এ পর্য্যন্ত অনেক সুযোগ্য ব্যক্তিও ইহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। অন্যান্য হিন্দুদর্শনে প্রকৃষ্ট অধিকার লাভ করিতে হইলে ন্যায়দর্শনে অভিজ্ঞতা আবশ্যক। এই গ্রন্থপাঠে শিক্ষিত বাঙ্গালী ন্যায়দর্শনে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবেন। সুতরাং এক কথায় এই গ্রন্থ প্রকাশে বাঙ্গালা ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পক্ষে হিন্দুদর্শনে প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত হইল।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

বিল্বদল—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল প্রণীত। কলিকাতা "ভারতমিহির" যন্ত্রে মুদ্রিত ও ১২১ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট হইতে ডাক্তার কানাইলাল গুপ্ত বি-এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ৬+৩+২৯৮ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা মূল্য ১৷৷০

এ গ্রন্থখানি কতকগুলি ভগবদ্বিষয়ক প্রবন্ধের সমষ্টি। লেখক ইতিপূর্ব্বে 'দিনচর্য্যা', 'আশ্রম চতুষ্টয়' প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। সমালোচ্য পুস্তকখানিও এই শ্রেণীর ধর্ম্মপ্রচার-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত। আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। লেখক সনাতনপন্থী হইলেও সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক। একটা আন্তরিকতার স্নিগ্ধ ধারা তাঁহার উচ্ছ্বসিত ভক্তি-স্রোতের সহিত মিলিত হইয়া এই গ্রন্থখানিকে ভক্তের আদরের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছে। শুধু তাহাই নহে। সংসার-তাপিত ব্যক্তিও শোকদুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া এই পুস্তকে শান্তির সন্ধান পাইতে পারে। একদিকে ইহার যুক্তিতর্ক সমন্বিত শাস্ত্র ও ধর্ম্মব্যাখ্যা জিজ্ঞাসুর চিত্তান্ধকার দূর করিবে, অপর দিকে আবার প্রেমবিহ্বল প্রাণের উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভগবদারাধনা তাপদগ্ধ সংসারীর হৃদয়মরুতে শান্তিবারি সেচন করিবে।

কিন্তু আমাদের কিছু বক্তব্যও আছে। লেখক বৈরাগ্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা আদর্শ হিসাবে সকলেরই প্রণিধানযোগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু মোহাচ্ছন্ন সংসারী কিরূপে এই বৈরাগ্যের পথে, এই 'যথার্থ সত্য অবিমিশ্র সুখের অনুসন্ধানে' অগ্রসর হইতে পারে, তাহা তিনি ভাল করিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। 'সংসার ও ভগবান' প্রবন্ধটিতেও এই আদর্শের কথাই,—'এ সংসারটি একটি মস্ত কুহেলিকা, এ জগতে কিছুই নিত্য নয়,' ভগবানই একমাত্র সত্য এবং তাঁহারই শরণাগত হও—এই কথাই অতি সুন্দর হৃদয়গ্রাহিভাবে বলা হইয়াছে। কিন্তু যে মানব 'ন ধনং, ন জনং ন সুন্দরীং, কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে' এই প্রার্থনা করিতে পারে না,—এক কথায়, যে 'সব ছাড়িয়া দিয়া' ভগবানের দিকে ছুটিতে পারে না, তাহার কি গতি হইবে? এরূপ সংসারী যদি বলে, সংসারের সহস্র বন্ধনেরই মধ্যে থাকিয়াই সে মুক্তির সন্ধান করিবে, তাহাকে কি লেখকের কোন উপদেশ দিবার নাই? তিনি এই শ্রেণীর লোকের ধর্ম্ম, ভগবান ও সংসার সম্বন্ধে মনোভাবটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, এবং তাহাদের আদর্শ ও ধারণাই যে কিছু স্বতন্ত্র তাহাও বুঝিতে পারেন নাই। তাই লেখক 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়' এই উক্তির যে অর্থ করিয়াছেন তাহা মোটেই ঠিক হয় নাই। তিনি বলেন, "ইহা কপট বৈরাগ্যের প্রতি কর্ম্মবীরের সুতীব্র কশাঘাত।" কারণ "মুক্তি হইবে অথচ বৈরাগ্য নাই এ অবস্থা কল্পনা করা যায় না।" কিন্তু এইরূপ অবস্থাই যে রবীন্দ্রনাথ উক্ত কবিতায় ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা সমগ্র কবিতাটি পড়িলেই স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। তিনি বলিতেছেন—

> অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
> লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
> মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
> তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
> নানা বর্ণগন্ধময়।

সুতরাং ইন্দ্রিয়বিষয় পরিহার করিয়া যে মুক্তিলাভ করিতে হইবে এমন কথা রবীন্দ্রনাথ বলেন নাই। গীতাঞ্জলির একটি

গানেও এই ভাব বর্ত্তমান। কবি ভগবানকে এইরূপে আহ্বান করিতেছেন—

তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে,
এস গন্ধে বরণে এস গানে।

রূপরসাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ত ভগবানেরই বিকাশ। তাহা ভাল লাগিলে মুক্তির পথে বাধা পড়িবে কেন? যে ব্যক্তি 'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন' পাতিতে পারে না, পক্ষান্তরে 'যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে' সমস্ত নিঃশেষে ভোগ করিয়া লইতে চায়, তাহার কি মুক্তি নাই? লেখক বোধ হয় বলিতে চাহেন, না। কারণ, তাঁহার মতে, "বিষয়ও বেশ লাগে ভগবানও বেশ লাগে এ যে বলে সে মিথ্যাবাদী ভণ্ড।" এইখানেই লেখকের সহিত আমাদের মতভেদ।

তাহা হইলেও, এই পুস্তক আমরা সকলকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সকলেই ইহা পাঠে আনন্দিত ও উপকৃত হইবেন। ভাব ও ভাষা সর্ব্বত্রই সুন্দর, অনেক স্থলে কবিত্বপূর্ণ। 'চিত্তের প্রতি,' 'সুন্দর,' 'তুমি কে,' 'অদৃশ্য,' প্রভৃতি ছোট ছোট প্রবন্ধগুলি এক একটি গদ্য কবিতা, পাঠে প্রাণ সম্ভাবে পূর্ণ হয়। কিন্তু যে কয়টি কবিতা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে, সেগুলির সুখ্যাতি করিতে পারিলাম না —ছন্দ ও মিল অত্যন্ত দোষযুক্ত। গদ্যের ভাষাটি ভাল, কিন্তু কথিত ও লিখিত ভাষা মিশাইয়া একটা মিশ্রিত ভাষার সৃষ্টি করা হইয়াছে। যাহা হয় একটা রকম গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। গ্রন্থে বর্ণাশুদ্ধিও যথেষ্ট। কিন্তু এ সব দোষ খুব মারাত্মক নহে। একটু অবধানতা অবলম্বন করিলেই লেখক এগুলি সারিয়া লইতে পারিবেন। প্রকাশক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নারায়ণ দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমরাও বলি, "যে সাধকের পবিত্র হৃদয়োদ্যান হইতে এ বিশুদ্ধ বিশ্বদল চয়ন করা হইয়াছে, তাঁহার এই ভক্তি-অর্ঘ্য ভগবানের পাদপদ্মে সাদরে গৃহীত হইবে এ আশা রাখি, কারণ ভগবৎপূজার যে প্রধান অঙ্গ আন্তরিকতা, তাহার বিন্দুমাত্র অভাব এখানে নাই।"

"শ্যামচাঁদ।"

আলো-কণা (কবিতাগ্রন্থ)—শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর প্রণীত। ঢাকা শিমুলিয়া হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডিমাই ১২ পেজি ৭১ পৃষ্ঠা। কাগজের মলাট, মূল্য ।৵০

সংস্কৃতে একটি কথা আছে, 'অযথাবলসারম্ভো নিদানং ক্ষয়সম্পদাম্';—শক্তির অভাব সত্ত্বেও কার্য্যারম্ভ সমূহ অমঙ্গলের কারণ। এই কথাটি যদি কবিত্বশক্তি-লেশহীন অথচ কবিযশঃপ্রার্থী তরুণ বয়স্ক লেখকগণ মনে রাখিতেন তাহা হইলে এইরূপ কবিতা পুস্তকের আবির্ভাব অনেক কমিয়া যাইত, এবং তাহাতে সকলেরই ভাল হইত। সাধনার দ্বারা শক্তির উদ্বোধন হইলে ভাল জিনিষ আপনি বাহির হইবে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে এরূপ অসার রচনা লইয়া এই সকল লেখক কেন যে সাহিত্যের আসরে নামিতে ব্যস্ত হন তাহা বুঝিতে পারিনা। যে শিশু মক্স করে তাহার হাতের লেখা কি সকলকে দেখাইবার যোগ্য? সমালোচ্য পুস্তকেও অনেক স্থলে লেখক রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিগণের কবিতার উপর দাগা বুলাইয়াছেন মাত্র এবং অন্যান্য স্থলে কবিতা রচনায় স্বীয় অক্ষমতারই পরিচয় দিয়াছেন। কবিত্বের নিদর্শন কোথাও নাই; ছন্দ ও মিলের জ্ঞানও লেখকের এখনও হয় নাই।

সুখের-মিলন—(উপন্যাস)।—শ্রীচিন্তামণি শীল প্রণীত। কলিকাতা ফাইন আর্ট প্রিন্টিং সিণ্ডিকেটে মুদ্রিত ও চোরবাগান হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডিমাই ৮ পেজি ৯৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ৸০

ইহা একখানি সাধারণ শ্রেণীর উপন্যাস। লেখক বলেন, "এই আখ্যায়িকাটি একটি সত্য ঘটনার ছায়া অবলম্বনে লিখিত কিন্তু অতিরঞ্জিত নহে।" বহিখানি পাঠ করিয়া, যদিও তেমন বিশেষত্ব বা নূতনত্ব কিছুই পাইলাম না, তথাপি মোটের উপর মন্দ লাগিল না।

গল্পের নায়ক যতীন্দ্রনাথ নামক একটি যুবক এবং নায়িকা দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা সুহাসিনী। কোন সময়ে এক দিন সুহাসিনী তাহাদের পুকুরে পদ্মফুল তুলিতে গিয়া জলমগ্ন হয়, ঘটনাক্রমে যতীন্দ্রনাথ তথায় উপস্থিত হন এবং সুহাসিনীর জীবন রক্ষা করেন। তারপর কিছুদিন পরে ঘটনাচক্রেই যতীন্দ্রনাথের সহিত সুহাসিনীর শুভবিবাহ ঘটে। বিবাহে যতীন্দ্রনাথের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাহার পিতামাতা কন্যাকর্ত্তার কাছে নগদ টাকা লওয়ার কিছুমাত্র দাবী দাওয়া করেন নাই, সম্ভবতঃ ইহাই গল্পের সত্যাংশ বা সত্য ঘটনা। লেখক এই ঘটনাকেই উপন্যাসোচিত রঙচঙ দিয়া সমাজের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। ইহার মূলে তাঁহার সদুদ্দেশ্য আছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। সমাজের হিতসাধনোদ্দেশ্যে তাঁহার এ উদ্যম আমরা প্রশংসা করি।

বর্ণনাগুলি অধিকাংশ স্থলেই বিষয়ের উপযোগী এবং ভাবব্যঞ্জক হইয়াছে। ৭১/৭২ পৃষ্ঠায় ভজহরি ও তাঁহার স্ত্রী প্রমদার কথোপকথন আমাদের ভাল লাগিয়াছে। ভাষা ও রচনা তেমন

উজ্জ্বল না হইলেও বলা যায়, রচয়িতা "সাহিত্যক্ষেত্রে হঠাৎ অনধিকার প্রবেশ" করিয়া "সেখানে ফসল নষ্ট, অযথা আচরণ ও স্থায় বিগর্হিত কার্য্য" করেন নাই। চরিত্রগুলি অধিকাংশ স্থলেই সুচরিত্র করিয়াছেন। কিন্তু এ সংসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখও ভাল নয়, নিরবচ্ছিন্ন দুঃখও আমরা পছন্দ করি না—অর্থাৎ একঘেয়ে ভালও ভাল নয়, আবার একঘেয়ে মন্দও ভল নয়। পরন্তু উভয়ের সংমিশ্রণে যে ঘটনা তাহাই চিত্তকে আকর্ষণ করে এবং বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য্য উপভোগ করায়। গ্রন্থে ঘটনা ও ও চরিত্র বর্ণনায় স্থানে স্থানে কতকগুলি কথা অনর্থক ও অনাবশ্যক বাড়ান হইয়াছে।

গ্রন্থখানিতে বর্ণনাশুদ্ধি ও ব্যাকরণদুষ্ট শব্দের অভাব দেখিলাম না, যথা স্বরস্বতী, তোস্য, অলক্ষে, স্বাধ্বী এবং যথার্থতা আপার্থিব, গণককার, প্রাধান্যতা ইত্যাদি। ৭২ পৃষ্ঠায় সন্নিবিষ্ট চিত্রখানি ভাবোদ্দীপক না হইয়া হাস্যোদ্দীপকই হইয়াছে। এরূপ ব্যর্থ ছবি না দিলে কোন ক্ষতি ছিল না।

"কমলাকান্ত।"

বিফল বসন্ত

পল্লবহীন পত্রবিহীন
পলাশ তরুর শিরে,
শীতের চিতায় জ্বালায়ে আগুন,
ফাগুন এসেছে ফিরে।
সঙ্গে এনেছে দক্ষিণ হ'তে
মৃদু মধু সমীরণ,
মোহন-মন্ত্র-গুঞ্জরে যার
জাগিছে মাধবী বন।
কুলায়-বিহীন বিহগ বিহগী
আবার বাঁধিছে নীড় ;
মল্লি মালতী মুকুলে, ভুখারী
ভ্রমর করিছে ভীড় ;
মাতিয়া উঠেছে চূত-নিকুঞ্জ
মঞ্জরী পরিমলে ;
নিখিলের হিয়া ব্যথিয়া তুলেছে
কোকিলের কুহু-কলে ;
শীত-সঙ্কোচ সুদূরে সরায়ে,
সুনীল গগনে চাঁদ
চকোরীর মন ভুলাতে আবার
পেতেছে মোহন ফাঁদ।

ছিল একদিন, পীত সাজ পরি
এসেছ আমার দ্বারে,
বরণে ও বাসে ভরিয়া ভুবন,
হে মাধব, বারেবারে ;
সেদিন আছিল মাতাল মলয়ে
মোহন-মদির-রাশি,
অলি-গুঞ্জনে বিহগ-কূজনে
বাজিত কাননে বাঁশি,
সেদিনে ফুটিত চামেলী ও চাঁপা ;—
আজি মালঞ্চ ভাঙা,
দুর্দ্দিনে আজ বেদনা কেবলি
শিমূলের সম রাঙা!
যার মুখ-মদ-নিষেকে, বকুল
কাননে ছড়ায় বাস ;
যাহার চরণ লভিতে অশোক
চিরদিন করে আশ,
যে ছিল আমার ভুবন ভরিয়া,—
সে যে আঁখি আগে নাই!
নয়ন সলিলে তুমুল তুফান
আজিকে উঠেছে তাই।
যাও ফিরে যাও, যাও বসন্ত,
মোর মধুনিশি ভোর ;
ভ্রষ্ট হয়েছে মালার কুসুম,—
শুধুই রয়েছে ডোর।

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

সাহিত্য-সমাচার

"ভবানীপুর সাহিত্যসমিতি" বাঙ্গালা প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার কয়েকটি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। আগামী ১লা বৈশাখ উক্ত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় যোগ্য লেখককে পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। পদক ও বিষয়ের নাম যথাক্রমে—

১। দ্বিজেন্দ্র পদক—"বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের অভিব্যক্তি ও দ্বিজেন্দ্রলাল।"

২। গোপাল পদক—"বৈষ্ণবযুগে বাঙ্গালার অবস্থা।"

৩। স্নেহলতা পদক—"বঙ্গনারী—সেকাল ও একাল।"

৪। নীতীশ পদক—"শ্রীচৈতন্য।"

প্রথম দুইটি পদকের জন্য সকলেই প্রবন্ধ লিখিতে পারেন। তৃতীয়টি মহিলাগণের ও চতুর্থটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ছাত্রগণের প্রবন্ধের সঙ্গে প্রধান শিক্ষকের নিদর্শন পত্র চাই। প্রবন্ধ আগামী ১০ই চৈত্রের মধ্যে ১১ নং চাউলপটি রোড, ভবানীপুর, এই ঠিকানায় সম্পাদকের নিকট পৌঁছান আবশ্যক।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি-এ মহাশয় পালি ও সংস্কৃত অবলম্বনে "সারনাথের ইতিহাস" রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থখানি যন্ত্রস্থ।

শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত "অপরাধিনী নামক একখানি নূতন গার্হস্থ্য উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ১৷৷০

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত রহস্যলহরী উপন্যাস মালার অষ্টাদশ উপন্যাস "গ্রহের ফের" প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত উক্ত উপন্যাসমালার উনত্রিংশ উপন্যাস "শমন সহচরী" যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্য মন্দিরের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি স্বর্গীয় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতি-রক্ষার্থ নিম্নলিখিত বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাঙ্গলা রচনার জন্য একটি পদক প্রদান করা হইবে:—রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের চরিত-সমালোচন'। রচনা ফুলস্ক্যাপ কাগজে মাত্র একপৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে এবং একটি বন্ধ খামের ভিতর, আগামী ১৭ই চৈত্র ১৩২৪ রবিবার, ইংরজী ৩১শে মার্চ্চ ১৯১৮ তারিখের মধ্যে সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনবিহারী মিত্র এম এ মহাশয়ের নিকট, হউইং খ্রীষ্টিয়ান কলেজ এলাহাবাদ, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। যে কোন প্রবাসী মহিলা বা ভদ্রলোকের স্বলিখিত প্রবন্ধ গৃহীত হইবে। রচনার নিম্নে বা অন্য কোনও স্থানে লেখক বা লেখিকা নাম সহি করিবেন না; তৎপরিবর্ত্তে একটি কল্পিত নাম দিবেন। তাঁহার প্রকৃত নাম ও পূরা ঠিকানা তাঁহার কল্পিত নাম সহ একটি কার্ডে লিখিয়া একটি পৃথক খামের ভিতর শীলমোহর করিয়া পাঠাইবেন। রচনা পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পূর্ব্বে এই খাম খোলা হইবে না। অন্যান্য নিয়মাদি সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিলে জানা যাইবে।

মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী প্রণীত "নূরনবী" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ১৷৷০

কলিকাতা

১৪এ, রামতনু বসুর লেন, "মানসী প্রেস" হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কি অদ্ভুত দ্রাক্ষা-রসায়ন !

স্পর্শে যার, জীবনের জীর্ণ পুরাতন সীসা

নিমেষে ধারণ করে সোণার বরণ ।

ওমর খৈয়াম ।

মানসী
ও
মর্ম্মবাণী

১০ম বর্ষ
১ম খণ্ড
চৈত্র ১৩২৪ সাল
১০ম বর্ষ
২য় সংখ্যা

গান

কান্না-হাসির দোল-দোলানো পৌষ-ফাগুনের পালা,
তারি মধ্যে চির-জীবন বইব গানের ডালা,—
এই কি তোমার খুসী, আমায় তাই পরালে মালা
সুরের গন্ধ ঢালা ?
তাই কি আমার ঘুম ছুটেছে
বাঁধ টুটেছে মনে,
ক্ষ্যাপা হাওয়ার ঢেউ উঠেছে
চির-ব্যথার বনে ?
কাঁপে আমার দিবা-নিশার সকল আঁধার আলা !
এই কি তোমার খুসী, আমায় তাই পরালে মালা
সুরের গন্ধ ঢালা ?
রাতের বাসা হয়নি বাঁধা, দিনের কাজে ত্রুটি,
বিনা কাজের সেবার মাঝে পাইনে আমি ছুটি।
শান্তি কোথায় মোর তরে হায়
বিশ্বভুবন মাঝে ?
অশান্তি যে আঘাত করে
তাই ত বীণা বাজে।
নিত্য র'বে প্রাণ-পোড়ানো গানের আগুন জ্বালা,—
এই কি তোমার খুসী, আমায় তাই পরালে মালা
সুরের গন্ধ ঢালা ?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভক্তকবি তুলসীদাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অলৌকিক ঘটনাবলী।

মহাত্মা তুলসীদাসের জীবনী সম্বন্ধে বহুতর অলৌকিক ঘটনাবলীর কথা লোকপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে, তাহার মধ্যে কয়েকটি নিম্নে বিবৃত হইল। এ সকল ঘটনার সম্বন্ধে বিচার করিয়া সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত করা দুঃসাধ্য। তবে সকল দেশীয় মহাপুরুষ কর্ত্তৃক অলৌকিক কাণ্ড সম্পাদিত হইবার কথা যখন চিরকাল প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া আসিতেছে, এবং আশুবিশ্বাসকারী সাধারণ ভক্তগণ যখন তাহা বিশ্বাসও করিয়া থাকেন, তখন সেই মহাভক্ত সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী মহাত্মা তুলসীদাস গোস্বামীর নিম্নলিখিত কথাগুলি বিবৃত করায় কোনও দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না।

একদা এক ব্রাহ্মণকন্যা, মৃতপতির সহিত সহমৃতা হইবার জন্য গঙ্গাতীরে গমন করিতেছিলেন। তুলসীদাসের সময়ে সদাশয় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সহমরণ প্রথার উচ্ছেদসাধন হয় নাই। পূর্ব্বকথিত রমণীর মৃতস্বামীর শববাহক আত্মীয়গণ ইতিপূর্ব্বে মৃতদেহ লইয়া অগ্রগামী হইয়াছেন। রমণী পথিমধ্যে মহাত্মা তুলসীদাসকে দর্শন করিয়া, তাঁহার পদতলে মাথা রাখিয়া প্রণতা হইলেন। সেই সহমরণোন্মুতা রমণীর সাজসজ্জা, এবং সীমন্তে প্রচুর পরিমাণে সিন্দূর শোভা দেখিয়া তাহাকে সধবা স্ত্রীলোক বোধে তুলসীদাস "সৌভাগ্যবতী ভব" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। এখন হিন্দীভাষায় পতিপুত্রবতী সধবা স্ত্রীলোককেই "সৌভাগ্যবতী" বলিয়া থাকে। সুতরাং সেই রমণীর সঙ্গিনীগণ তুলসীদাসের এবম্বিধ আশীর্ব্বচন শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "গোস্বামী ঠাকুর, ইহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। এই মাত্র তাঁহার মৃতদেহ দাহ করিবার জন্য গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়াছে। ইনিও পতির সহিত সহমৃতা হইবার জন্য গমন করিতেছেন। সুতরাং আপনি কিরূপে ইহাকে 'সৌভাগ্যবতী হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন ?"

তৎশ্রবণে তুলসীদাস বিস্মিত হইয়া, তাহাদের সহিত শ্মশানক্ষেত্রে গমন করিলেন, এবং সেই মৃতব্যক্তির গাত্রে বারংবার হস্তমার্জ্জনা করিয়া, তাহার কর্ণে "রাম রাম কহ বেটা" বলিবামাত্র সেই মৃতব্যক্তি পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইল।

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের মহাগ্রন্থ বাইবেলেও প্রফেট ইলাইজা কর্ত্তৃক এক বিধবা রমণীর একমাত্র মৃত পুত্রকে পুনর্জ্জীবন দান করার কথা দেখিতে পাওয়া যায়। "ঈশান নাগর" বিরচিত "অদ্বৈতপ্রকাশ" গ্রন্থ পাঠেও অবগত হওয়া যায় যে কিঞ্চিদধিক চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে শ্রীমৎ নিত্যানন্দপ্রভু, তাঁহার বাগ্‌দত্তা মৃতা পত্নী শ্রীমতী বসুঠাকুরাণীর কর্ণে "হরিনাম" মহামন্ত্র শুনাইয়া, অম্বিকানগরের গঙ্গাতীরে তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিতা করিয়াছিলেন। সেই অলৌকিক ঘটনাটি নিম্নলিখিতরূপে সংঘটিত হয়—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যখন লোকশিক্ষার জন্য নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, তখন গৃহিগণের মধ্যে হরিনাম বিলাইবার জন্য চিরকুমার নিত্যানন্দকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে আজ্ঞা দিলেন। মহাপ্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ তখন গঙ্গা-তীরে অবস্থিত অম্বিকা কালনায়, সুবলের অবতার গৌরীদাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সূর্য্যদাসের কন্যা শ্রীমতী বসুঠাকুরাণীকে বিবাহ করিবার অভিপ্রায়ে, ভাবী শ্বশুর মহাশয়ের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে বড় বড় দুইটি বিবাহযোগ্যা আইবুড় মেয়ে—বসু ও জাহ্নবা। বলরামের অবতার পরমসুন্দর শ্রীমৎ নিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং উপযাচক হইয়া বিবাহ করিতে উপস্থিত হইয়াছেন।

গৌরীদাস ও সূর্য্যদাসের বাড়ীতে আনন্দের সীমা নাই। স্ত্রীলোকেরা আনন্দ কোলাহলে এবং শঙ্খ-শব্দে গৃহ মুখরিত ও পাড়া তোলপাড় করিতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গভক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ও পরমানন্দে ভাসিতে লাগি-লেন।

কিন্তু নিত্যানন্দ সংসারত্যাগী অবধূত সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর যে জাতিপাত হয়, কুলশীল সব নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং যাঁহারা কুলমিচ্ছন্তি—পাড়াপ্রতিবেশী বন্ধুবান্ধব এ বিবাহে মত দিলেন না। কাযেই গৌরীদাস ও সূর্য্যদাস ভ্রাতৃদ্বয়কে সমাজের সম্মুখে নতশির হইয়া, নিত্যানন্দকে প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইতে হইল।

অক্রোধ ও অভিমানশূন্য নিতাই, তখন তাঁহার চির সহচর ও প্রিয়তম শিষ্য, ত্রিবেণীর উদ্ধারণ দত্তের সঙ্গে গঙ্গাতীরাভিমুখে চলিলেন।

তথায় পৌছিয়া, নির্জ্জন শ্মশান ঘাটের নিকট বসিয়া উদ্ধারণের সঙ্গে নিত্যানন্দ শাস্ত্রীয় আলাপ করিতেছিলেন। এমন সময়ে সহসা অদূরে শব্দ হইল, "বল হরি! হরি বোল!" উদ্ধারণ চমকিয়া চাহিয়া দেখিলেন, গৌরীদাস ও সূর্য্যদাসের "কুলমিচ্ছন্তি বান্ধবা" একখানি খাটুলী করিয়া, কাহার মৃতদেহ আনিয়া সৎকার করিবার জন্য গঙ্গাতীরে নামাইল। এদিকে বসুঠাকুরাণী, যিনি বৃন্দাবনলীলায় রেবতী ছিলেন, তিনি প্রাণবল্লভের সহিত পুনর্মিলন হইল না দেখিয়া সর্পদংশনে তনুত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারই মৃতদেহ আনিয়া তাহারা তীরে নামাইয়া, নিত্যানন্দের দিকে তর্জ্জনী সঙ্কেত দ্বারা বলাবলি করিতেছে—"ঐ ঠাকুরটী বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন—উহাকে বিবাহ না দেওয়াতে মেয়েটী হঠাৎ মারা গেল।" তৎশ্রবনে নিত্যানন্দ নিকটে আসিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "তাইত! মারা গিয়েছে দেখছি! আচ্ছা—আমি যদি বাঁচিয়ে দিতে পারি?" তাহাতে বান্ধবেরা উত্তর করিল, "আপনি যদি ইহাকে বাঁচাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে বুঝিব আপনি মানুষ নহেন, দেবতা। দেবতার জাতি-কুল-শীল দেখিবার কোন আবশ্যকতা নাই। তাহা হইলে আমরা অতীব আনন্দের সহিত এই বিবাহ ক্রিয়া সম্পাদন করিব।"

তখন নিত্যানন্দ বসুঠাকুরাণীর কর্ণে "হরিবোল হরিবোল!" মহামন্ত্র উচ্চারণ করিবামাত্র, তিনি শবাধারের উপর উঠিয়া বসিলেন। তখন গঙ্গা-তীর হইতে পালকী করিয়া বর-কনে লইয়া মহা আনন্দ কোলাহল করিতে করিতে শববাহকেরা বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

গোস্বামী তুলসীদাসের কাশীবাসকালীন, একব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা করিয়া সর্ব্বদাই পাপের বিভীষিকা মূর্ত্তি দেখিত —ক্ষণকালের জন্য তাহার মনে শান্তি ছিল না। সে ব্যক্তি কাশীধামে আসিয়া ব্রহ্মণপণ্ডিতদিগের নিকট "বিধান" চাহিলে তাঁহারা বলেন, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। এই কথা শুনিয়া, সেই ব্রহ্মহত্যাকারী ভাগী-রথী সলিলে জীবন বিসর্জ্জন করিবার জন্য গমন-কালীন, পথিমধ্যে তুলসীদাসের সাক্ষাৎ পাইল। তুলসীদাস বলিলেন, "আত্মহত্যা মহাপাপ, সে পাপের উদ্ধার নাই। তুমি একাগ্রচিত্তে রাম নাম জপ কর— সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইবে।" তুলসীদাসের উপদেশ-ক্রমে একাগ্রচিত্তে রামনাম জপ করিয়া সেই ব্যক্তি নিষ্পাপ হয়। তাহার পাপক্ষয়ের পরীক্ষা স্বরূপ তাহার হস্ত হইতে, বিশ্বেশ্বর মন্দিরের প্রস্তর নির্ম্মিত বৃষ খাদ্যদ্রব্য সকল ভক্ষণ করিয়াছিল। এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে, কাশীবাসী জনগণ তাঁহাকে ঈশ্বরের অংশ জ্ঞানে প্রগাঢ় ভক্তি করিতে লাগিল।

ভক্তমাল গ্রন্থে এই ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মহত্যার পরি-বর্ত্তে গোহত্যার কথা বর্ণিত আছে—

এক যে ব্রাহ্মণ সেই গোহত্যা করিয়া।
তীর্থভ্রমণ করি বেড়ায় ফিরিয়া॥
কাশীতে গেলেন বিপ্র তীর্থের রটনে।
রাম নাম মহামন্ত্র জপয়ে বদনে॥
তুলসীদাসের কাছে গিয়া প্রণমিয়া।
পূর্ব্বাপর কহে নিজ কর্ম্ম বিবরিয়া॥

তুলসীদাস আশ্চর্য্য হইয়া তাহার মুখপানে চাহিলেন

এবং ভাবিলেন, যখন পাপক্ষয় জন্য "রামনাম" জপিতেছে তখন আবার প্রায়শ্চিত্ত জন্য তীর্থভ্রমণের আবশ্যকতা কি ?

রাম নাম জপে এই ক্ষুদ্র পাপ জন্য।
তীর্থ ভ্রমণ করে আর করে অন্য॥

তুলসীদাস তখন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া—

তবে সাধু ক্রোধাবেশে কহে ব্রাহ্মণেরে।
হা রে দুষ্ট কুমতি দেখিতে নারি তোরে॥
রাম নাম জপিতেছ আর প্রায়শ্চিত্ত।
কারণ ভাবিছ আর ভ্রমিতেছ তীর্থ॥
আনুষঙ্গ এক নামে যত পাপ যায়।
কোটী কল্পে, পাপী তাহা করিতে নারয়॥

অর্থাৎ "নাম" করিবার উপক্রম হইতেই পাপী সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধ হইয়া যায়—

শ্রীমন্নাম উচ্চারণ উপক্রম হইতে।
পাপ যায় শুভ হয় সর্ব্ব তৎক্ষণাতে॥

বলিয়া তুলসীদাস তাহাকে "নাম মাহাত্ম্য" শ্রবণ করাইয়া গোহত্যা পাপ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন।

তুলসীদাসের ভক্তগণ, গোস্বামী ঠাকুরের পূজা-কালীন ব্যবহারের জন্য কয়েকটী স্বর্ণ রৌপ্যনির্ম্মিত পাত্র দিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মত, মহাত্মা তুলসীদাস গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য কেহ ছিল না। ভক্তগণ কথামৃত শ্রবণ করিতে আশ্রমে আসিতেন। এক তস্কর ঐ সকল মূল্যবান দ্রব্য অপহরণের মানসে তাঁহার আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। তুলসীদাস সমস্ত রাত্রি ধ্যান ধারণা জপাদি ভজন সাধনে অতিবাহিত করিয়া রজনীশেষে ২।১ঘণ্টা মাত্র বিশ্রাম করিতেন। চোরটা সমস্ত রাত্রি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিয়া, গোঁসাইজী নিদ্রিত হইবামাত্র যেমন তাঁহার আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করিবে, দেখিল কুটীর দ্বারে এক অনুপম রূপলাবণ্যসম্পন্ন নবদূর্ব্বাদলকান্তি দিব্যপুরুষ ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া,তাঁহার কুটীর দ্বার রক্ষা করিতে-ছেন। তস্কর তখন পশ্চাতের দ্বার ভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে গিয়া দেখিল, তথায় এক কাঞ্চন-গৌর দিব্যকান্তি অন্য এক যুবা ধনুর্ব্বাণধারী হইয়া সাধুর দ্বার রক্ষা করিতেছেন। এইরূপে সেই ব্যাপার দেখিয়া, ভয়বিহ্বলচিত্তে তস্কর তৎক্ষণাৎ তথা হইতে পলায়ন করে। কিন্তু কাঞ্চন লোভের বশবর্ত্তী হইয়া ঐ চোর ২।৩ দিন উপর্য্যুপরি চুরির চেষ্টায় বিফলমনোরথ হইয়া, চতুর্থ দিবস প্রাতঃ-কালে সাধুবাবার নিকট উপস্থিত হইয়া সেই অলৌকিক কাণ্ড সমস্ত ব্যক্ত করে। তুলসীদাস বুঝিতে পারিলেন, সেই যুবকদ্বয় আর কেহই নহে—তাঁহারই ইষ্টদেব দুই ভাই শ্রীরাম লক্ষ্মণ। তাঁহার সেই অকিঞ্চিৎকর তৈজসাদির রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার ইষ্টদেবকে দ্বারে সমস্তরাত্রি জাগরণ করিয়া কষ্ট স্বীকার করিতে হয় জানিয়া, তুলসীদাস সেই দিনই তাঁহার দ্রব্যসকল দীন দুঃখীদিগকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। তস্করকেও কিছু লইতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু সে আর তাহার অংশভাগী হইতে স্বীকৃত হইল না। সে তখন শ্রীভগ-বানের দর্শনলাভ করিয়া ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে তাহার নিজের যাহা কিছু সম্বল ছিল তাহা বিতরণ করিয়া দিয়া, সন্ন্যাসগ্রহণ পূর্ব্বক সাধুবাবার চরণে পড়িয়া তাঁহার শরণাগত হইল।

গোঁসাইজী সর্ব্বদা বলিতেন—

"যো পর কৃপা রামকে হোই।
সো পর কৃপা করে সব কোই॥"

অম্বরাধিপতি অমরসিংহ-প্রমুখ স্বাধীন নরপতিবৃন্দ পর্য্যন্ত তুলসীদাসকে বিলক্ষণ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। দিল্লীর তাৎকালিক বাদশাহ আকবর শাহও তাঁহাকে বিশেষ সম্মানের চক্ষে দর্শন করিতেন। সামান্য কুটীরবাসী দরিদ্র গৃহস্থ হইতে, দিল্লীর সম্রাট্ পর্য্যন্ত সেই শ্রীরামকল্পতরুছায়াতলবাসী সন্ন্যাসী তুলসীদাসকে বিশেষ সম্মান করিতেন। দিল্লীর বাদ-শাহের সহিত তাঁহার যেরূপে পরিচয় হয়, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল—

তুলসীদাসের অমানুষিক শক্তি ও অলৌকিক কার্য্য-

কলাপের কথা শুনিয়া, আকবরশাহ তাঁহাকে রাজধানী দিল্লীনগরীতে আহ্বান করিয়া আনয়ন করেন এবং বলেন, "গোঁসাইজী, আমাকে কিছু অদ্ভুত কৌশল (সিদ্ধাই) দেখাও, আমি তোমার শিষ্য হইব।" তুলসীদাস কহিলেন, "জাঁহাপনা, আমি অতি সামান্য ব্যক্তি আমি আপনাকে কি সিদ্ধাই দেখাইব? আমি উদাসীন সন্ন্যাসী—কেবল রামনাম করিয়া থাকি মাত্র। রঘুনাথজী ব্যতীত অন্য সিদ্ধাই কিছুই জানি না।" কিন্তু তথাপি বাদশাহ তাঁহাকে কিছু অলৌকিক কাণ্ড দেখাইবার জন্য প্রথমে অনুরোধ ও পরে আদেশ করিতে থাকেন। বারম্বার বিফলমনোরথ হইয়া, তুলসীদাস তাঁহার আজ্ঞাপালন না করিয়া তাহাকে অবমাননা করিতেছেন ভাবিয়া, অবশেষে বাদশাহ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন।

কারারুদ্ধ তুলসীদাস একাগ্রচিত্তে রামনাম জপ করিতে, মহাবীর হনুমান তাঁহাকে দর্শন দিয়া অভয় দান করিয়া যান। পরদিন অসংখ্য বানরী-সেনা আসিয়া দিল্লীনগর অবরোধ পূর্ব্বক নানাপ্রকার উৎপাৎ করিতে থাকে। নগর লুটপাট করিয়া, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, ক্রমশঃ তাহারা রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে এবং অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া নানাবিধ মহামূল্য দ্রব্য নষ্ট ও পরিশেষে বেগমগণকে আক্রমণ করে, এবং তাঁহাদের বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার দীর্ণ বিদীর্ণ করিয়া, নখাঘাত ও দন্তাঘাত দ্বারা দাসীগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। এইরূপে বিবিধ বিধানে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার পর, সভাসদগণের মন্ত্রণায় বাদশাহ তুলসীদাসকে কারামুক্ত করিয়া দেন। ইহার অব্যবহিত পরেই সমস্ত বানর দিল্লী নগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। কথিত আছে যে এই ঘটনায় দিল্লীসহর এত অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল যে, বাদশাহকে পুরাতন পুরী পরিত্যাগ করিয়া নূতন নগর নির্ম্মাণ করাইতে হইয়াছিল।

মতান্তরে, তুলসীদাসকে কয়েকদিন কারারুদ্ধ কথার পর, প্রধানা বেগমের অনুরোধক্রমে বাদশাহ তাঁহাকে নিস্কৃতি দান করিয়াছিলেন, এবং বহুতর সম্মান করিয়া বিদায় দিয়াছিলেন।

জীবনের অবশিষ্টকাল তুলসীদাস তীর্থত্তোম বারাণসী-ক্ষেত্রে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। দিল্লী হইতে বাদশাহের নিকট সম্মানিত হইয়া ফিরিয়া আসিবার পর, তুলসীদাসের সুখ্যাতি ও গৌরব দিন দিন আরও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তদ্দর্শনে ঈর্ষাপরবশ এক পাপমতি ভক্তবৈরী, গোঁসাইজীর প্রাণনাশ করিবার জন্য "মারণ" ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে। "রাখে রাম, মারে কে?" সেই শত্রুর কথা শুনিয়া তুলসীদাস কাশী-বিশ্বেশ্বরের নামে একটি পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার আততায়ী লজ্জিত ও বিফলমনোরথ হইয়া, নিজেই কাশীধাম ত্যাগ করিয়া পলাইতে বাধ্য হয়।

পত্নীর সহিত পুনর্ম্মিলন ও দেহত্যাগ।

সাধু তুলসীদাস সতত একস্থানে বাস না করিয়া নানাস্থান পর্য্যটন করিতেন। তিনি বলিতেন—

"বহতা নদী নির্ম্মলা বান্ধা সো গন্ধা হোই।
সাধুজন রম্‌তে ফিরে দাগ্‌ না লাগে কোই॥"

অর্থাৎ বহতা নদী নির্ম্মলা হয়, বাঁধা জল দুর্গন্ধময় হইয়া থাকে, সেইরূপ সাধু সন্ন্যাসীরা ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলে, তাঁহাদের চরিত্রে কোন দাগ (কলঙ্ক) লাগে না।

তুলসীদাস যখন ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পরিপূর্ণ এক প্রকাণ্ড ঝুলি থাকিত। সেই ঝুলির মধ্যে, তাঁহার পূজা অর্চ্চনার উপকরণ সামগ্রী হইতে আরম্ভ করিয়া রন্ধনোপযোগী মসলার দ্রব্যাদি পর্য্যন্ত সমস্তই পাওয়া যাইত। কোন ব্রাহ্মণ বাড়ীতে তণ্ডুল ভিক্ষা করিয়া লইয়া, স্বহস্তে পাক করিয়া খাইতেন। বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া কাহারও পাক করা অন্ন তিনি স্পর্শ করিতেন না।

একদা তুলসীদাস কোনও দূরবর্ত্তী স্থান হইতে কাশী ফিরিয়া আসিবার সময়, পথিমধ্যে এক ব্রাহ্মণবাড়ীতে আতিথ্যস্বীকার করেন। সেই বাড়ীতে এক

বর্ষীয়সী ব্রাহ্মণকন্যা ভিন্ন, দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহ ছিল না। রমণী তুলসীদাসের রন্ধনের উদ্যোগ করিয়া দিতেছেন। অন্ন পাক সমাপ্ত হইলে, ব্রাহ্মণকন্যা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যঞ্জনের জন্য হরিদ্রা ও লবণ আনিব কি?" তুলসীদাস বলিলেন, "না, লবণ ও হরিদ্রা আমার ঝুলিতে আছে।" এইরূপ যে কোন আবশ্যকীয় দ্রব্যের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তুলসীদাস বলেন যে, তাঁহার ঝুলিতে আছে। তখন রমণী হাস্যধ্বনি করিয়া বলিলেন, ঝুলির মধ্যে যখন সকলেই স্থান পাইল, তখন তাঁহার পত্নী কি দোষ করিল—তাহাকেও উহার মধ্যে স্থান দিলে ভাল হইত—তাহাকে পরিত্যাগ করা ভাল হয় নাই।

রমণীর এই বাক্যে, তাহার মুখের পানে চাহিয়া, তুলসীদাসের মনে, বহুকাল বিস্মৃত একখানি মুখের কথা মনে পড়িল। যেন সে মুখের সঙ্গে, এমুখের সাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে। তখন তিনি আকুল চিত্তে সে মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি আর কেহ নহেন, তাঁহার বহুকাল-পরিত্যক্তা পত্নী রত্নাবলী দেবী। তুলসীদাস তাঁহাকে কিছুমাত্র চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু নারীজাতির সতর্কদৃষ্টির কাছে প্রথম দর্শনেই তাঁহার পত্নীর নিকট তাঁহার সন্ন্যাসীবেশ ধরা পড়িয়াছিল। তদবধি রত্নাবলীদেবী আর তুলসীদাসকে একা ছাড়িয়া দিতেন না। জীবনের সায়াহ্নকালে আবার পতিপত্নীর পুনর্ম্মিলন হইল। দম্পতীর মধ্যে এখন যে ভালবাসা, তাহা কামগন্ধহীন—তাহাতে ভক্তি ও স্নেহ প্রগাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছিল।

পত্নীর তিরস্কারবাক্যে চৈতন্যোদয় হইয়া তুলসীদাস গৃহত্যাগী হইয়া সন্ন্যাসাবলম্বন করিলে রত্নবলীদেবীরও চৈতন্যোদয় হইয়াছিল। স্বীয় দোষে স্বামিদর্শনে চিরবঞ্চিতা হইয়া, কিছুদিন পরে তিনিও সংসারত্যাগ করিয়া বহুকাল পূর্ব্বে কাশীবাসিনী হইয়াছিলেন।

সম্বত ১৬৮০ (অর্থাৎ ১৪২৪ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার সন্ন্যাসের অর্দ্ধশতাব্দী পরে, পরমপবিত্র তীর্থ বারাণসীক্ষেত্রে জাহ্নবীতীরে তুলসীদাসের নশ্বর দেহের অবসান হয়। কিন্তু তাঁহার পুণ্যনাম হিমালয় হইতে ভারতভূমির হিন্দী ভাষাভাষী হিন্দুদিগের মধ্যে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। বিশেষতঃ বিহার ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশের প্রত্যেক নরনারীর মুখে, সন্ধ্যাহ্নিকের সহিত ত্রিসন্ধ্যা উচ্চারিত হইয়া থাকে। রত্নাবলীও সহমরণ সময়ে স্বামীর শবদেহ বক্ষে ধারণ করিয়া জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীনাভাজী বিরচিত "হিন্দী ভক্তমাল" গ্রন্থের অনুবাদক বঙ্গীয় বৈষ্ণব কৃষ্ণদাসের বাঙ্গলা "ভক্তমাল গ্রন্থ" হইতে তুলসীদাসের জীবনীর কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।—

শ্রীমান তুলসীদাস জগতে বিখ্যাত।
অলৌকিক অদ্ভুত যাহার চরিত্র॥
পূর্ব্বে তেঁহ ছিলেন বাল্মীকি মুনিবর।
লোকের নিস্তার হেতু কৈল অবতার॥
লৌকিক লীলাতে এক ব্রাহ্মণের ঘরে।
জন্মিলেন মহাশয় লোক ব্যবহারে॥
কালেতে বিবাহ করি গৃহস্থালি কৈল।
স্ত্রীর বশীভূত অতি একান্ত হইল॥
একক্ষণ স্ত্রীর সঙ্গ বিনা নাহি রহে।
যথা তথা স্ত্রীর প্রশংসা গিয়া কহে॥
বসিতে বলিলে বৈসে উঠিতে উঠয়।
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচয়॥
স্ত্রীর বাপের বাটি লোক আসে লইতে।
পুনঃ পুনঃ আইসে লোক না দেয় যাইতে॥
অনেক কষ্টেতে যদি পাঠাইয়া দিল।
স্ত্রীর বিচ্ছেদে ঘরে রহিতে নারিল॥
কান্দিয়া ডুলির পিছে পিছে চলি গেলা।
স্ত্রী তাহা দেখি অতি লজ্জিতা হইলা॥
ভর্ৎসন করয়ে বহু স্বামীর উপর।
হাঁরে মূর্খ হতভাগা নির্লজ্জ বর্ব্বর॥
স্ত্রীর অঞ্চল ধরি সদাই বেড়াও।
ছিছি ধিক ধিক ইথে লজ্জা নাহি পাও॥

লোকে উপহাস করে ঘৃণা নাহি হয়।
গলায় লহুড়ি দিয়া মরিতে জুয়ায়॥
এত আর্ত্তি যদি তব ঈশ্বরে হইত।
না জানি ভাগ্যের ফলে তবে কি ফলিত॥
এতেক ভর্ৎসনা যদি স্ত্রী তার কৈল।
শুনিয়া বিপ্রের মনে বিবেক জন্মিল॥
আপনার মনে মনে ধিক্কার করয়।
অমনি ফিরিয়া আইল ঘরে নাই যায়॥
সর্ব্বত্যাগ করি রামচন্দ্রের চরণ।
আশ্রয় করিয়া কৈল একান্ত শরণ॥
বিগ্রহ প্রকাশি কৈল সেবা চমৎকার।
অদ্ভুত হইল তবে প্রেমের বিকার॥
অল্পকালে শ্রীরামের অনুকম্পা হৈল।
অনেক সংসার সাধুর পবিত্র করিল॥
শ্রীমান রঘুনাথ লীলা চরিত্র বর্ণন।
ভাষাছন্দে করি কৈল ভুবন পাবন॥
তাহার মহিমা কিছু কহি শুন আর।
যার পদতলে ভূত পাইল নিস্তার॥

* * * *

এই প্রেত তাঁহাকে হনুমানের সাহায্যে শ্রীরাম দর্শন পাইবার কথা বলিয়া—

এত কহি তেঁহ পরব্যোমে চলি গেলা।
যথা রামায়ণ তথা তুলসী চলিলা॥
দেখেন সহস্র লোক চারি ভিতে হয়।
অবধৌত বেশ কোন জন নিরীক্ষয়॥
এইরূপ একব্যক্তি দেখেন বসিয়া।
শ্রীরাম চরিত শুনে পুলকিত হৈয়া॥
তথাই বসিয়া সাধু শরণ করয়।
মধ্যে মধ্যে দুঁহে দুহুঁ পানে নিরীক্ষয়॥
দুহার অন্তর কথা দুহাতে বুঝিয়া।
ক্ষণে ক্ষণে আনন্দে হাসয়ে মুচকিয়া॥
পাঠ ভঙ্গে লোক সব উঠিয়া চলিল।
অমনিহ হনুমান গমন করিল॥

তুলসী সম্মুখে গিয়া অষ্টাঙ্গ হইয়া।
পড়িয়া প্রণাম করে চরণ ধরিয়া॥
মৃদু হাসি হনুমান আলিঙ্গন কৈল।
তুলসী অভীষ্ট আপনার যে কহিল॥
তব প্রিয় রামচন্দ্র আমারে দেখাও।
অকপটে তোমার স্বরূপ দরশাও॥
প্রসন্ন হইয়া তবে নিজ রূপ ধরি।
বর দিলা অচিরাতে দেখা দিবে হরি॥

* * * *

তৎপরে তুলসীদাস গোহত্যাকারী ব্রাহ্মণকে পাপ মুক্ত করিয়া কহিলেন—

অতএব যদি মোর বাক্য এবে ধর।
যদি আত্যন্তিক নিজ শ্রেয় চিন্তা কর॥
সর্ব্বধর্ম্ম ত্যজি এবে রামচন্দ্র ভজ।
অন্য অভিলাষ কুটিনাটি সব ত্যজ॥
প্রায়শ্চিত্ত করিতেও না হইবে আর।
আনুসঙ্গ পাপ আর যাইবে সংসার॥
প্রেমানন্দ মহৎপদ অনায়াসে পাবে।
ইহার অধিক লাভ আর কোথা হবে॥
এতেক শুনিয়া বিপ্র চমকিত হৈল।
সাধুর চরণে তবে শরণ লইল॥
তবে কৃপা করিলেন প্রসন্ন হইয়া।
বিপ্র ভাগবত হইল সকল ছাড়িয়া॥

তৎপরে মৃত পতির সহিত সহমরণ অভিলাষিণী রমণীকে তুলসীদাস তত্ত্বকথা কহিতে লাগিলেন—

আগেতে নারীকে অতি প্রশংসা করিলা।
শেষে ক্রমেতে তত্ত্ব কহিতে লাগিলা॥
শুন দেখি মাতা তুমি সতী যে হইবে।
ইহাতে বা নরলোকে কি গতি হইবে॥
নারী কহে স্বামী সঙ্গে স্বর্গেতে যাইব।
চৌদ্দ মহেন্দ্র কাল বিষয় ভুঞ্জিব॥

তিনি রমণীকে কহিলেন, বিষয় ভুঞ্জিলে কর্ম্ম ক্ষয় হইবে না। ইহাতে দারুণ সংসার জ্বালা যাইবে না। স্বর্গও স্বাভাবিক অনিত্য।

অতএব অল্প সুখ বিষয় লাগিয়া।
মিথ্যা মায়া মোহে মর দেহ জ্বালাইয়া॥
নারী কহে মহাশয় কর্ত্তব্য কি হয়।
জন্ম মৃত্যু মায়া মোহ কি করিলে যায়॥
সাধু কহে মাতা তব শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে কিছু কহি শুন তাহার উপায়॥
জীয়ন্ত শরীর পোড়াইয়া যাহা নহে।
সর্ব্বধর্ম্ম আচরিয়া বেদে যাহা কহে॥
সুন্দর বিধানে করিলেও যে না হয়।
শ্রীরাম চরণ শ্রেয় মাত্র সুখ পায়॥
রামনাম মহামন্ত্র যে জন জপয়।
সেই ধন্য ধন্য সেই ত্রিলোক বিজয়॥
এক নামে কোটি মহাপাতক নাশিয়া।
জীবন মুকুত হয় নির্ম্মল হইয়া॥
পুনঃ পুনঃ সাধনেতে কি হয় না জানি।
চতুর্ব্বর্গ নাহি চায় অতি তুচ্ছ মানি॥
যে স্বর্গ লাগিয়া তুমি দেহ কৈলে পণ।
তার নাম শুনি তেঁহ কর্ণে হস্ত দেন॥
তাহার দর্শনে লোক পবিত্র হইয়া।
সেই রামচন্দ্র ভজে শরণ লইয়া॥

* * * *

নিত্যসুখ সেই তার নাহিক বিনাশ।
চিদানন্দ শ্রীবৈকুণ্ঠ ধামে হয় বাস॥
স্বর্গ যে অনিত্য তাহা দুঃখেতে মিশ্রিত।
হর্ষাদি মাৎসর্য্য ভয় বিচ্ছেদ বিব্রত॥
বৈকুণ্ঠ পরম ধাম নিত্য চিদানন্দ।
হর্ষ রাগ দ্বেষ মোহ নাহি মায়া গন্ধ॥
অতএব শ্রীরাম পদে শরণ যে লয়।
তাহার মহিমা কিছু কহা নাহি যায়॥
এতেক শুনিয়া স্ত্রীর মন ফিরি গেল।
মোহ দূরে গেল চিত্তে প্রকাশ পাইল॥
তবে মোর কি কর্ত্তব্য কহ মহাশয়।
কৃপা করি কর যাতে মোর হিত হয়॥

তবে সাধু রামচন্দ্র উপদেশ দিলা।
তাহার কৃপাতে তার মন ফিরি গেলা॥
তৎক্ষণাৎ প্রেম ভক্তি উদয় হইল।
জন্ম অন্ধ জন যেন চক্ষুষ্মান্ হৈল॥
শ্রীমান্ তুলসীদাস নিজ ভক্তি বলে।
শক্তি সঞ্চারণ কৈল ভাসে প্রেম জলে॥
কৃপা করি স্বামী তারে বাঁচাইয়া দিলা।
তাঁহারেও রামচন্দ্র চরণে সঁপিলা॥

আকবর বাদশাহ এই অলৌকিক কথা শুনিয়া, তুলসীদাসকে দর্শন করিবার মানসে, দিল্লীতে ডাকাইয়া আনেন। তিনি সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়-চিত্ত ছিলেন—কোন একটা ধর্ম্মে তাঁহার গোঁড়ামী ছিল না। তিনি সেই দরিদ্র সাধুকে বিশেষ যত্ন করিলেন, এবং সম্মান পূর্ব্বক বিনয় সহকারে বলিলেন, "সাধু বাবা! আমি লোক-পরম্পরায় তোমার মহিমা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। আমাকে তোমার কিছু জহুরা (সিদ্ধাই) দেখাও। আমি তোমার কিছু অলৌকিক কার্য্য দেখিতে বাসনা করি।" ইহাতে তুলসীদাস বিনয়নম্র বচনে বলিলেন—

কাঙ্গাল ভিক্ষুক আমি উদর লাগিয়া।
দ্বারে দ্বারে ফিরি বুলি যাচিঞা করিয়া॥
এইমাত্র জানি মুঞি জহুরা না জানি।
রাজা কহে কপট তোমার এই বাণী॥

তৎশ্রবণে বাদশাহ পুনরায় বলিলেন, "আমি তোমাকে এরূপ পারিতোষিক দিব যে 'উদর লাগিয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া বুলিয়া' আর তোমাকে ভিক্ষা করিতে হইবে না। তুমি আমাকে কিছু জহুরা দেখাও।" তখন—

পুনঃ পুনঃ পাতশা কহে সাধু দৈন্য করে।
তবেত পাতশা হৈল ক্রোধিত অন্তরে॥
সাধুরে লইয়া তবে কয়েদ রাখিল।
ভকত বৎসল রাম সহিতে নারিল॥
হনুমানে আজ্ঞা দিলা কুবুদ্ধি রাজার।
উচিত করিয়া কর ভক্তের উদ্ধার॥

হনুমান নিজ অনুচর কপিগণ।
পাঠাইল রাজপুরী ভঞ্জন কারণ॥
সহস্র সহস্র কপি আসিয়া পশিল।
রাজার পুরীতে আসি আক্রমণ কৈল॥
অট্টালিকা গৃহ সব ভাঙ্গিতে লাগিল।
স্তম্ভ উপাড়িয়া দূরে ক্ষেপণ করিল॥
বালবৃদ্ধ স্ত্রী আদি ধরিয়া ধরিয়া।
দূরে টান মারি ফেলে আছাড় মারিয়া॥
ঘরদ্বার লুটি অর্থ নদীতে ফেলায়।
হুঙ্কার করিয়া সব লম্ফে লম্ফে ধায়॥
বিপদ পড়িল রাজা ভাবয়ে অপার।
যুক্তি করে কোন মতে নাহি প্রতিকার॥
সহরে লোকের হৈল ক্রন্দনের রোল।
পরস্পর ডাকাডাকি পড়ি গেল গোল॥
রাজার সভায় এক হিন্দু প্রামাণিক।
শিষ্ট শাস্ত্র ধর্ম্মভীত বুদ্ধিতে অধিক॥
কর যোড় করি তেঁহ রাজারে কহেন।
এ অনর্থ হেতু কহি যগুপি শুনেন॥
তুলসীদাস সাধু যেই কয়েদ হইল।
সেই হেতু এ দুরন্ত বিপদ পড়িল॥
তবে রাজা শুনি শীঘ্র তুলসীদাসেরে।
কয়েদ হইতে আনাইয়া স্তুতি করে॥
বুঝিলাম তুমি মহাপুরুষ সুজন।
প্রিয়তম প্রভুর ভকত শ্রেষ্ঠ জন॥

তখন সর্ব্বধর্ম্মসমদর্শী মহাত্মা আকবর শাহ দিল্লীর রত্নসিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া দীনাতিদীনের ন্যায় সেই সাধু তুলসীদাসের চরণতলে পতিত হইলেন এবং বলিলেন—

"অপরাধ হৈতে মোরে বাঁচাইয়া লহ।
প্রসন্ন হইয়া শ্রীচরণ মাথে দেহ॥"

সাধুগণের স্বভাব এই যে সুখ দুঃখ মান অপমান ক্ষোভে তাঁহাদের চিত্ত কিছুমাত্র ম্লান হয় না। তখন সেই তুলসীদাস গোস্বামী সম্রাটের দীনতা দেখিয়া—

প্রসন্ন হইয়া নৃপে আশীষ করিলা।
সকল আপদ শান্তি তৎক্ষণাৎ হৈলা॥
যগুপি ভকত মনে ক্ষোভ নাহি হয়।
ভকত-বৎসল হরি তেঁহ না সহয়॥
ভক্তে অপরাধ যেই মূঢ় জন করে।
পক্ষপাত করি হরি দণ্ড দেন তারে॥
শান্তি দিয়া রাজারে চলিয়া গেলা সাধু।
মঙ্গল হইল যথা তমোনাশে বিধু॥
তাঁহার চরণ গুণ কীর্ত্তন করিয়া।
কৃষ্ণদাস প্রেম মাগে দন্তে তৃণ লৈয়া॥
"যো পর কৃপা রামকে হোই।
সো পর কৃপা করে সব কোই॥"

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবীন্দ্রীয় কথাসাহিত্যে অলোকপন্থা

অলোকপন্থা (mysticism) জিনিষটা কি তাহা কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা অন্য এক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। * সেখানে বলিয়াছি যে অলৌকিকতা দুই রকমের আছে, অধ্যাত্ম-অলৌকিকতা ও ভূতা-লৌকিকতা। পরম রহস্যময়কে কোনও এক স্থানে অবচ্ছিন্ন এবং বদ্ধ করিয়া না দেখিয়া জলস্থল আকাশের নিরবচ্ছিন্ন গতির মধ্যে তাঁহাকে ধরিতে পারি পারি পারি না—এই ভাবের রহস্যময়তাকেই 'অধ্যাত্ম অলৌকিকতা' বলা যায়। আর, মনের ভয় বিস্ময় কৌতূহলের ছবিকেই, এক কথায় ভূতের ভয়ের ছবিকেই বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া দেখার মধ্যেই আধুনিক কালে ভূতালৌকি-কতার রস ফুটিয়া উঠে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচেষ্টার মধ্যে এই দুই রকমের

* 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'—বৈশাখ, ১৩২৩

অলৌকিকতার সন্ধানই আমরা পাই,—তাঁহার আধুনিক গীতিকবিতাগুলিতে অধ্যাত্ম-অলৌকিকতা এবং কয়েকটি গল্পে ভূতালৌকিকতা। এই অলোকপন্থা ছাড়া কল্পপন্থার (romanticismএর) অতিলৌকিকতার সন্ধানও রবীন্দ্রনাথের গল্পে কিছু কিছু পাওয়া যায়। *

এই অলৌকিকতাকে আমি সাহিত্যের পরিণত বয়সের কল্পপন্থা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। বস্তুলোকের সহিত তেমন-কোনও সম্বন্ধ না রাখিয়া কল্পনার কল্পলোকের আলেখ্য আঁকিবার রীতিকেই কল্পপন্থা বলা হয়। এই কল্পপন্থী সাহিত্যের মধ্যে পৃথিবীর মাটি এবং মানুষের রক্তমাংসের সহিত পরিচয়ের অভাবই পরিলক্ষিত হয়; তবে অবশ্য ভিক্টর হুগো প্রভৃতির মত কথাসাহিত্যিকগণ, যাঁহাদের মধ্যে বস্তুরস এবং কল্পরস তুল্যভাবে পরিস্ফুট, তাঁহাদের সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। কল্পপন্থী সাহিত্যকে বস্তুহীন বলিয়া আমি শুধু ইহার আদিম স্বরূপটিরই পরিচয় দিতেছি। অলোকপন্থা সাহিত্যের পরিণত অবস্থার, সাহিত্যের পদে যখন পৃথিবীর বস্তুর ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ পাতানো হইয়াছে তখনকার জিনিষ;—কাযেই অলোকপন্থার মধ্যে জগৎ সংসারের সহিত কোনপ্রকার অপরিচয়ের প্রকাশ ফুটিয়া উঠে না, জগৎসংসারের অতীত এক পর্দ্দায় তাহার সুর চড়ানো হয় এই মাত্র। কল্পপন্থার কাছে জগৎ-ব্যাপার এখনও অনাগত; উষার অরুণরাগে হৃদয় রাঙিয়া লইয়া সে তাই বস্তুর অভিসারে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। অলোকপন্থার কাছে জগৎব্যাপার অতীত, আলোছায়ার রঙীন রহস্যময়তায় তাই চিত্তদেশ রঞ্জিত করিয়া সে বস্তুর যবনিকা তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। যৌবনের রোমান্সের সঙ্গে পরিণত বয়সের রোমান্সের এইখানেই পার্থক্য।

এই অলোকপন্থা একটা আধুনিক সৃষ্টি হইলেও সাদা চুল এবং পাকা হাড় লইয়াই তাহা উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপে জন্মলাভ করিয়াছে, তাহাকে বাল্য কৈশোর ও যৌবনের পথ মাড়াইয়া আসিতে হয় নাই,—এ কথা বলিলে কতকটা ভুল বলা হয়। মিষ্টিসিজ্‌মের ইতিহাস রচনা করিতে গেলে তাহার শৈশব এবং যৌবনলীলা আদিমকালের ভূত-পরীর গল্পের মধ্যেই খুঁজিতে হইবে। মানবের মন চিরকাল অলোকজীবী, এই ভূলোক তাহার অনন্ত ক্ষুধা কোনদিন মিটাইয়া দিতে পারে নাই—সে চিরকাল আলোকজীবী ও আলোক-ধর্ম্মী, বস্তুবেষ্টনের অঙ্গুলিফাঁক দিয়া গলিয়া অসীমে মিলাইয়া গিয়াই সে আপনার স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। প্রাচীন ভূত-পরীর গল্পের মূল খুঁজিলে আমরা মানব-মনের সেই অলোকাভিসারী রহস্যময়তার সন্ধানটিই পাই। তবে প্রাচীন ভূত-পরীর গল্পের স্থূলত্বের মধ্যে আধুনিক সাহিত্যের সূক্ষ্ম অলোক-রসটি খুঁজিতে যাওয়া বৃথা—সেই জন্যই ঐ সব পরী-কথাকে আমরা অম্লান বদনে মিষ্টিসিজ্‌মের রাজ্য হইতে নির্ব্বাসন দিয়া বসি। তবে ইহাও ঠিক যে মিষ্টিসিজ্‌মের ইতিহাস রচনায় ইহাদের একেবারে ভুলিয়া গেলে চলিবে না।

বাহিরের এই ভূত-পরীরা মানব-মনের অন্তঃপুরে ঠিক কবে আসিয়া আসন পাতিয়া বসিয়াছিল তাহার সাল তারিখ নির্দ্দেশ করাটা এখন একরূপ অসম্ভব। স্থূলকে সূক্ষ্ম করিয়া লইবার যে মানসিক প্রক্রিয়া, সাহিত্যে তাহা হয়ত বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে Tiech প্রভৃতি জর্ম্মান অলোক-পন্থীদের মধ্যে এই প্রক্রিয়া প্রথম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। যে জর্ম্মণী কল্পপন্থা ও অধ্যাত্ম-অলোকপন্থার জন্মভূমি, ভূতালোকপন্থার জন্মদানের গৌরবটা তাহারই। জর্ম্মান অলোকপন্থীদের প্রবর্ত্তিত এই ভূতালোকপন্থার ধারাটাই পোয়ে, হথর্ণ্, কোল্‌রিজ্, বালজাক্, ইব্‌সেন, ছোট গল্পের রবীন্দ্র-নাথের সাহিত্য চেষ্টার ভিতর দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া মেটারলিঙ্ক, হাউপ্টমান ও রবীন্দ্রনাথের বর্ত্তমান নাট্যসাহিত্যের মধ্যে অধ্যাত্ম-অলোকপন্থায় বিস্তৃতি-লাভ করিয়া সাগরের ডাক শুনিয়া বসিয়াছে। এই

* ১৩২৩—মাঘের 'প্রতিভা'য় এই সম্বন্ধে প্রবন্ধলেখকের একটি আলোচনা বাহির হইয়াছে।

অলোকপন্থার বিভিন্ন মূর্ত্তির এবং ইহার ক্রমপরিণতির ইতিহাস যোগ্যতর ব্যক্তির জন্য রাখিয়া, আমি সেই রহস্যের ইঙ্গিতে তাহার সূচনাটুকু মাত্র করিয়া ক্ষান্ত রহিব।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভূতালোকপন্থী কয়েকটী ছোটগল্প সম্বন্ধে আলোচনা করাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'দুরাশা', 'কঙ্কাল', 'মণিহারা' 'নিশীথে', 'জীবিত না মৃত', 'স্বর্ণমৃগ' ও 'গুপ্তধন' এই গল্পাষ্টক এই শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া মনে করা যায়। রবীন্দ্রনাথের গল্পমঞ্জুষার কয়েকটি শ্রেষ্ঠতম রত্ন যে এখানেই আছে যে সম্বন্ধে অনেকেই সাক্ষ্য দিবেন।

শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে তাহার মধ্যে আবার 'ক্ষুধিত পাষাণে'র দাবী সব চেয়ে বেশী। এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি বাঙ্গালার গল্পসাহিত্যে একটি গর্ব্বের জিনিষ।

এই গল্পের নায়ক একজন আধুনিক জগতের রেলের যাত্রী। তিনি অন্য যাত্রীদের কাছে এই গল্প ফাঁদিয়া বসিয়াছেন। তিনি বরীচে তুলার মাশুল আদায়ে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রমণীয় বরীচে শুস্তা নদীটি যেখানে উপলমুখরিত পথে নিপুণা নর্ত্তকীর মত নির্জ্জন পাহাড়ের নীচে বড় বনের ভিতর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া দ্রুত নৃত্যে চলিয়া গিয়াছে, সেইখানে সেই নদীর ধারেই আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে দ্বিতীয় শা মামুদ ভোগবিলাসের জন্য, এই নির্জ্জন স্থানে পাথর-বাঁধানো দেড়শত সোপান-ময় অত্যুচ্চ ঘাটের উপরে শৈল পাদমূলে একটি শ্বেত প্রস্তরের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আড়াইশত বৎসর পরে এখন এই পরিত্যক্ত প্রাসাদের এমনি বদনাম যে, রাত্রে চোরও এখানে আসিতে সাহস করে না। বৃদ্ধ করিম খাঁর নিষেধ না মানিয়া মাশুলকালেক্টর নায়কটি সেখানেই বাসা লইলেন। ভৃত্যেরা পর্য্যন্ত সেখানে সন্ধ্যার পর থাকিতে স্বীকৃত হইল না।

কয়েকদিন না যাইতেই বাড়ীটির একটি অপূর্ব্ব নেশা তাঁহাকে আসিয়া ক্রমশ আক্রমণ করিয়া ধরিতে লাগিল। একদিন যখন অপরাহ্লের রঙীন আভায় ঘাটের সোপান-করিতেছে এবং নিকটের পাহাড়ে বনতুলসী, পুদিনা ও মৌরির জঙ্গল হইতে একটি ঘন সুগন্ধ উঠিয়া স্থির আকাশকে ভারাক্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছে, তখন তিনি পিছনে হঠাৎ পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলেন, কিন্তু ফিরিয়া দেখিলেন কেহ নাই। ইন্দ্রিয়ের ভ্রম মনে করিবার উপায় নাই, কারণ পরমুহূর্ত্তে—এই গ্রীষ্মের সায়াহ্নে—একদল প্রমোদচঞ্চল নারী শুস্তার জলের মধ্যে যে স্নান করিতে নামিল ও অনেকগুলি বলয়শিঞ্জিত বাহুবিক্ষেপে ও সকৌতুক কলহাস্যে শুস্তার অগভীর জল বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল এবং তাঁহারই পাশ দিয়া সিক্ত অঞ্চল হইতে জল নিষ্কর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার বক্ষে এক অপূর্ব্ব কম্পন জাগাইয়া চলিয়া গেল তাহা তিনি স্পষ্ট অনুভব করিলেন। পরদিন প্রাতে ঘুম হইতে উঠিয়া এই ব্যাপারটিকে অদ্ভুত ও হাস্যকর বলিয়া তাঁহার বোধ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে দরজা ঠেলিয়া তিনি যখন একটি বৃহৎ ঘরে প্রবেশ করিলেন, "অমনি মনে হইল ঘরের মধ্যে যেন ভারি একটা বিপ্লব বাধিয়া গেল—যেন হঠাৎ সভা ভঙ্গ করিয়া চারিদিকের দরজা জান্‌লা ঘর পথ বারান্দা দিয়া কে কোন দিকে পলাইল তাহার ঠিকানা নাই।" তিনি "সেই দীপহীন জনহীন প্রকাণ্ড ঘরের প্রাচীন প্রস্তর স্তম্ভ-শ্রেণীর মাঝখানে দাঁড়াইয়া শুনিতে পাইলেন, ঝর্ঝর শব্দে ফোয়ারার জল শাদা পাথরের উপরে আসিয়া পড়িতেছে, সেতারে কি সুর বাজিতেছে বুঝিতে পারিলেন না; কোথাও বা স্বর্ণভূষণের শিঞ্জিত, কোথাও বা নূপুরের নিক্কণ, কখন বা বৃহৎ তাম্রঘণ্টায় প্রহর বাজিবার শব্দ, অতি দূরে নহবতের আলাপ, বাতাসে দোদুল্যমান ঝাড়ের স্ফটিক দোলকগুলির ঠুন্‌ঠুন্ ধ্বনি, বারান্দা হইতে খাঁচার বুলবুলের গান, বাগান হইতে পোষা সারসের ডাক তাঁহার চতুর্দ্দিকে একটা প্রেতলোকের রাগিণী সৃষ্টি করিতে লাগিল।"

এমনি করিয়া গল্পের নায়ক বাড়ীটির মোহরসে ধীরে ধীরে 'জীর্ণ' হইতে লাগিলেন। পাঠকের মনের উপরও

চারিদিকেও সহস্র রজনীর একটি রজনী যেন অতীতের বন্ধন হইতে ছিন্ন হইয়া আসিয়া তাহার সমস্ত বিলাসের উপকরণ, তাহার ফোয়ারার গোলাপগন্ধী জলধারা, তরুণী পারসীক রমণীগণের দ্রাক্ষাবনের গজল গান, তাহার ফেণোচ্ছল মদিরা ও বিলাস-লীলায়িত কটাক্ষের মোহ লইয়া ক্রমে ঘনাইয়া আসিতে লাগিল।

একরাত্রে নায়ক স্পষ্ট অনুভব করিলেন কে এক রমণী তাঁহাকে ঠেলিয়া অতি সাবধানে তাহাকে অনুসরণ করিতে আদেশ করিল। সেই দূতীর ঝোলা আস্তিনের ভিতর দিয়া শ্বেতপ্রস্তররচিতবৎ কঠিন নির্ম্মল হস্ত দেখা যাইতেছে, টুপির প্রান্ত হইতে মুখের উপরে একটি সূক্ষ্ম বসনের আবরণ পড়িয়াছে, কটিবন্ধে একটি বাঁকা ছুরি বাঁধা, দূতী নায়ককে সঙ্গে লইয়া এক ঘননীল পর্দ্দার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। সেখানে এক কিংখাবের সাজ-পরা ভীষণ কাফ্রি খোজা খোলা তলোয়ার লইয়া ঝিমাইতেছে। পর্দ্দার ভিতরে জাফ্রান্ রঙের স্ফীত পায়জামার নিম্নভাগে, জরির চটি পরা দুই-খানি ক্ষুদ্র সুন্দর চরণ গোলাপী মখ্মল আসনের উপর অলসভাবে স্থাপিত রহিয়াছে দেখা গেল।

নায়কের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের হৃদয়ও যে-অজানার রহস্যময় গোপন আকর্ষণে তীব্রভাবে আকৃষ্ট হইতেছিল, যাহার জন্য আজ এই নিশীথ অভিসারে চলিয়াছে, তাহারই ক্ষুদ্র সুন্দর চরণযুগল এই ছায়ার রাজ্য হইতে যেন স্ফুট-মহিমার মূর্ত্তি লইয়া প্রতিভাত হইল। তখন বুকের রক্ত স্তম্ভিত হইয়া গেল, বিশ্বসংসার থমকিয়া দাঁড়াইল, নিখিল সৃষ্টি যেন একটি সূচ্যগ্র সীমায় লীন হইয়া গেল, একটি মুহূর্ত্তের মধ্যে অনন্তকাল তাহার উদ্বেলিত আশা আশঙ্কা উচ্ছ্বসিত আবেগ, তাহার সুতীব্র বেদনা ও সুনিবিড় সুখ, তাহার উদগ্র মুখর অনুভূতিগুলি লইয়া এক সুবি-রাট পরিপূর্ণতায় মূক হইয়া রহিল।

কিন্তু, চরণ যুগল—এই পর্য্যন্ত! খোজাকে অতি-ক্রম করিতে যাইয়া তার খোলা তলোয়ারে পা লাগিয়া গেল—তলোয়ার মেঝেতে পড়িয়া ঝন্ঝন্ করিয়া উঠিল, সেই তীব্র শব্দের ঘায় ঘনায়মান মোহের বাষ্প ছিন্ন-বিছিন্ন হইয়া গেল, সেই পরিপূর্ণ মুহূর্ত্তটি টুক্রা টুক্রা হইয়া নিঃশব্দ কলরোলে দিগ্বিদিকে মিলাইয়া গেল! বাস্তবের উপর আবার আছাড় খাইয়া পড়িতে হইল। এই অবস্থায় জাগিয়া উঠিয়া এই জাগরণকে, এই বাস্তবকে কে ক্ষমা করিতে পারিয়াছে? লেখক কি নিষ্করুণ! পাঠকের হৃদয়ের প্রতি তাঁহার কি ভয়ঙ্কর অবিচার! ছি! এমন জায়গায় কি স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিতে আছে? এই স্বপ্ন শেষ পর্য্যন্ত দেখিবার জন্য কে আবার নিদ্রাকে বরণ করিয়া লইতে না চাহিবে?

যাক্, তবু বাঁচা গেল, এই তীব্র সুখ, এই তীব্র বেদনার আলাড়ন হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল! এই দুর্দ্দমনীয় বক্ষের দোলা তবু ত থামিল!

কিন্তু তাহাও কতক্ষণের জন্য! লেখকের নিষ্করুণ-তার এখানেই শেষ হয় নাই! গুস্তার জলে প্রমোদ-চঞ্চল নারীর জলকেলির শব্দ শোনা গেল; তাহার চরণযুগলের আভাস দেখা গেল। তাহার পর একদিন ক্ষণিকের জন্য দর্পণে যেই তরুণী ইরাণীর ছায়া আসিয়া পড়িল, "পলকের মধ্যে গ্রীবা বাঁকাইয়া, তাহার ঘনকৃষ্ণ বিপুল চক্ষুতারকায় সুগভীর আবেগতীব্র বেদনাপূর্ণ আগ্রহ-কটাক্ষপাত করিয়া, সরস সুন্দর বিম্বাধরে একটী অস্ফুট ভাষার আভাসমাত্র দিয়া, লঘু ললিত নৃত্যে আপন যৌবন-পুষ্পিত দেহলতাটিকে দ্রুতবেগে উর্দ্ধাভিমুখে আবর্ত্তিত করিয়া মুহূর্ত্তকালের মধ্যে বেদনা বাসনা ও বিভ্রমের, হাস্য কটাক্ষ ও ভূষণজ্যোতির স্ফুলিঙ্গবৃষ্টি করিয়া দিয়া দর্পণেই মিলাইয়া গেল।" তরুণীর আকৃতি এবং তাহাতে প্রতিবিম্বিত তাহার মনের ছবিও দেখা গেল। চরণে যখন ইরাণীর আভাসটুকু মাত্র পাওয়া গিয়াছিল তখনও সে আরব্য রজনীর মানসলোকচারিণী;

"Then stole I up, and trancedly
Gazed on the Persian girl alone."

বলিয়া Tennyson যাহার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার ন্যায় তখনও কল্পনার স্বপ্নস্বর্গেই তাহার আসন। তখনও সে আরব্য-উপন্যাসলোকের Spirit-রূপেই প্রতিভাত—মূর্ত্তিও তার মনোময়ী—তাহা মর্ত্ত্যমানবীর মত নহে।

কিন্তু এখন দেখিতেছি, সে ব্যক্তিগত সম্বন্ধসূত্রে আসিয়া নামিয়াছে—তাহাতে মানবিকতার রস ফুটিয়া উঠিয়াছে!

একদিন অর্দ্ধরাত্রে বিছানার মধ্যে উঠিয়া বসিয়া শুনা গেল, পাষাণ ভিত্তির একটা আর্দ্র অন্ধকার গোরের ভিতর হইতে কে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া বুক ফাটিয়া ফাটিয়া কাঁদিতেছে—"তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও—কঠিন মায়া, গভীর নিদ্রা, নিষ্ফল স্বপ্নের সমস্ত দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তুমি আমাকে ঘোড়ায় তুলিয়া তোমার বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া, বনের ভিতর দিয়া পাহাড়ের উপর দিয়া নদী পার হইয়া তোমাদের সূর্য্যালোকিত ঘরের মধ্যে আমাকে লইয়া যাও! আমাকে উদ্ধার কর।" পরদিন "মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার রাত্রে গৃহের ভিতরকার নিকষকৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্যে আমি স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিলাম—একজন রমণী পালঙ্কের তলদেশে গালিচার উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া দুই দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টিতে আপনার আলুলায়িত কেশজাল টানিয়া ছিঁড়িতেছে, তাহার গৌরবর্ণ ললাট দিয়া রক্ত ফাটিয়া পড়িতেছে, কখনও সে শুষ্ক তীব্র অট্টহাস্যে হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিতেছে, কখনও ফুলিয়া ফুলিয়া ফাটিয়া ফাটিয়া কাঁদিতেছে, দুই হস্তে বক্ষের কাঁচুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অনাবৃত বক্ষে আঘাত করিতেছে।"

আকাঙ্ক্ষা ক্রমে নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইয়া আসিয়াছে, মোহ ঘন হইতে ঘনতর হইয়াছে, ছায়াস্ফুট ভূষণশিঞ্জিত ও অঞ্চলসঞ্চালনশব্দ এখন ক্রমে কান্নাতে রূপান্তরিত হইয়া আসিয়াছে, প্রতিবিম্বে "আবেগতীব্র বেদনাপূর্ণ আগ্রহকটাক্ষপাত" এখন স্পষ্টশ্রুত মনুষ্যকণ্ঠের রোদন ধ্বনিতে পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছে।

বেশ বুঝা গেল, গল্প এখানে চরমে গিয়া পৌঁছিয়াছে—এদিক কি ওদিক, একদিকে ইহা শেষ হইয়া যাইবে। সমগ্র চেতনা আবার একটি ক্ষুদ্রতম মুহূর্ত্তের মধ্যে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল!

তখন হঠাৎ শোনা গেল পাগল মেহের আলি চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে—"তফাৎ যাও, তফাৎ যাও, সব ঝুঁট হ্যায়, সব ঝুঁট হ্যায়।"

বৃদ্ধ করিম খাঁর মুখ দিয়া লেখক এই সমগ্র ব্যাপারটার একটা অর্থ দিয়াছেন—"এক সময় ঐ প্রাসাদে অনেক অতৃপ্ত বাসনা, অনেক উন্মত্ত সম্ভোগের শিখা আলোড়িত হইত—সেই সকল চিত্তদাহে, সেই সকল নিষ্ফল কামনার অভিশাপে এই প্রাসাদের প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া আছে, সজীব মানুষ পাইলে তাহাকে লালায়িত পিশাচীর মত খাইয়া ফেলিতে চায়। যাহারা ত্রিরাত্রি ঐ প্রাসাদে বাস করিয়াছে তাহাদের মধ্যে কেবল মেহের আলি পাগল হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে; এ পর্য্যন্ত আর কেহ তাহার গ্রাস এড়াইতে পারে নাই।"

বহুশতাব্দীর জীর্ণ ও পরিত্যক্ত কোনও বাস্তব প্রাসাদ অথবা তাহার মানসছবি লেখকের এই গল্প রচনার কল্পনাকে জন্মদান করিয়াছে। মানব-মন চিরকাল এইরূপ প্রাসাদে ভূতপ্রেতের আবির্ভাবের কল্পনা করিয়া আসিয়াছে। জনাকীর্ণ সহরের কেন্দ্রে স্থিত পরিত্যক্ত বৃহৎ প্রাসাদের কক্ষশ্রেণীর ভারাক্রান্ত শূন্যতা মানবমনের যেরূপ ভীতিসঞ্চারক, জনহীন বিপদসঙ্কুল গভীর অরণ্যের গহন অন্ধকারটাও তেমন নহে। আমাদের দেশে "ভূতের বাড়ী"র কথা যেখানে সেখানে শোনা যায়—এরূপ দুই চারিটি পরিত্যক্ত বাড়ী যেখানে সেখানে দেখাও যে না যায় তাহা নহে। এই ভূতের বাড়ীর নানা গল্প ডালপালায় পল্লবিত হইয়া বিভিন্ন মূর্ত্তিতে দেশের লোকের মুখে মুখে ফিরিতেছে। এই সকল লোক-কথা জনসাধারণের যতই প্রিয়, ফুলে ফলে যতই পল্লবিত হোক না কেন, প্রকৃত সাহিত্যের শক্ত অথচ সরস মাটীতে ইহাদের শিকড় নাই। এই লোককথার ভাসমান টুকরাগুলির সাহিত্য-সম্ভাবনা রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই—তিনি আপন কল্পনা দিয়া তাহাকে পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন, আপন সৃষ্টিক্ষমতা দিয়া সাহিত্যের রাজ্যে তাহাকে চিরস্থায়ী করিয়াছেন—তাঁহারই কৃপায়, যাহা আকাশে ভাসিতেছিল, মাটীতে তাহা শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে।

"Haunted House" বা ভূতের বাড়ী বিদেশীয় লেখকদের কল্পনাকেও উত্তেজিত করিয়াছে। Balzac-এর "Christ in Flanders"-এর অপূর্ব্ব রহস্যময় প্রাসাদ এবং Poe এর "House of Usher" এর কথা অনেকের মনে হওয়া স্বাভাবিক। এই সকল রচনাও রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে পুষ্ট করিয়া থাকিবে।

আধুনিক যুগের লোকের মনের উপর আরব্য উপন্যাসের যে কি প্রচণ্ড আকর্ষণ, এই গল্পে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। লেখকের আরব্যউপন্যাস পাঠ এই গল্পে সার্থক হইয়াছে। এই গল্পের মোহ ও আকর্ষণ লেখক শতগুণে বাড়াইয়া দিয়াছেন—আরব্য উপন্যাসের রসে তার ভিয়ান দিয়া। এই আরব্য পরিপার্শ্ব-সৃষ্টিতে লেখক তাঁহার অসামান্য নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন,তাঁহার বিরাট কল্পনাশক্তি আরব্য-উপন্যাস-লোকের দৈত্যের মত একটি আরব্য-রজনীকে যেন তাহার জরীজহরৎ, মখমল কিংখাব, তাহার নারাঙ্গী নাসপাতি, আঙ্গুর ও আপেল, তাহার হীরকে প্রতিফলিত আলোক ও কাচপাত্রের মদিরার স্বর্ণাভা, তাহার জাফ্রাণ রঙের পায়জামা ও ফুলকাটা কাঁচলি, তাহার বিদ্যুদ্দাম কটাক্ষ ও বিষের ছুরী সমেত উপাড়িয়া বর্ত্তমানের প্রকাশ্য দিবালোক টানিয়া আনিয়াছে।

যে বিলাসের আকর্ষণটি এই গল্পে এমন নিপুণভাবে বর্ণিত হইয়াছে, আরব্য উপন্যাসের রসেই তাহা শোভন ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। দেহ-মনের উপর বিলাস-মোহের যে সর্ব্বজয়ী আকর্ষণ, তাহাকে সমস্ত শারীরিক কদর্য্যতা হইতে রক্ষা করিয়া, কল্পলোকের রঙে রঞ্জিত করিয়া, রহস্য-লোকের কক্ষে কক্ষে ঘুরাইয়া এমন ভাবে অন্য কেহ আঁকিয়াছেন কিনা জানি না। বাস্তব-বিলাস এই গল্পে তার বাস্তবতা বর্জ্জন করিয়াছে, অথচ তাহার আকর্ষণের তীব্রতা কিছুমাত্র কমে নাই। এই গল্পে বিলাসের যে সুন্দর idealised ছবিটি দেখিতে পাই, তাহা আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যে উপন্যাসে ও নাটকে, বহু স্থানেই এই বিলাসের মোহ আঁকিয়াছেন,কিন্তু জোলা,ফ্লোরেয়ার কিম্বা আনাতোল ফ্রাঁসের বিলাসের মত তাহা কোথাও দৈহিকতায় পর্য্যবসিত হয় নাই। Maurice এর উপভোগ কিম্বা "The Gods are Athirst"এর যে সকল বিশ্রী ব্যাপার, সাহিত্যে সে সকলের ক্ষমা নাই। অননুতপ্তা দুর্ভাগিনী Madam Bovary আমাদের করুণা লাভে সমর্থা হইলেও তাহার কার্য্যকলাপকে নিছক দৈহিকতা ছাড়া আর কিছুই বলিতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচেষ্টায় মধ্যে বিলাস জিনিষটা প্রথম স্থান পায় তাঁর যৌবনারম্ভের কাব্য "কড়ি ও কোমলে"। এই বিলাস প্রকৃতির স্বপ্ন-মোহ হইতে জাগিয়া উঠিয়া কবির বাস্তব জীবনের প্রথম আস্বাদ সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীতে বস্তুলোকের সহিত প্রথম অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সুতীব্র সাড়া; শারীর অস্তিত্বে প্রথম সুখদুঃখ-স্পন্দনাকুল সুনিবিড় উপলব্ধি। Keats এর কাব্যে ইহাই হইয়াছে তাঁহার Sensuous element। প্রথম জীবনস্বাদের বস্তুরসের মধ্যেও একটা কাব্যসৌন্দর্য্য আছে। সেই কাব্য-সৌন্দর্য্য এবং তাহারই সঙ্গে সঙ্গে কবির মানসতার (Intellectuality) স্ফুরণ "কড়ি ও কোমলের বিলাসকে নিছক দৈহিকতার আবিলতা হইতে রক্ষা করিয়াছে। নীড় নষ্ট হইয়া গেলেও "নষ্ট নীড়ের" মধ্যে এই বিলাস আছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এই বিলাস "চোখের বালি"র মহেন্দ্রে নগ্ন হইয়া দেখা দিয়াছে, কিন্তু মহেন্দ্র-বিনোদিনীর মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের অবলম্বনে এবং আড়ালে তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়াই, সর্ব্বোপরি বিনোদিনীর মানসতার সুদৃঢ়তায় বিধৃত বলিয়াই তাহা কোথাও এলাইয়া পড়ে নাই বা একান্ত হইয়া উঠে নাই, পাশ্চাত্য কথা সাহিত্যের দৈহিকতায় তাহার সাহিত্যিক অপমৃত্যু ঘটে নাই। "চিত্রাঙ্গদা" ও "ঘরে বাইরে"র মধ্যে অর্জ্জুন-চিত্রাঙ্গদা ও সন্দীপ-বিমলা ব্যাপারে এই বিলাস তত্ত্বকে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্যই—অথবা বিগ্রহ-পন্থার আড়ালেই তাহার পরমুখাপেক্ষী জীবন বহন করিতেছে। তবুও স্বীকার করিতে হইবে, এই সাহিত্যিক প্রচেষ্টাগুলির বিলাস হইয়াছে, সংসার-লোকের। 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে স্নায়ু ও ইন্দ্রিয়ের

উপর উত্তেজনায় তেমনি তীব্র ও বস্তুরস-সম্পৃক্ত হইলেও, "ক্ষুধিত পাষাণে"র বিলাস বস্তুলোকের নহে; আরব্য উপন্যাসের কল্পলোকে তাহাকে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। বিলাস তাহার স্বরূপ নষ্ট না করিয়াও "ক্ষুধিত পাষাণে"র স্বপ্ন-সৌন্দর্য্যের অতিলোকে তাহা সুন্দর Idealisation লাভ করিয়াছে। যৌন আকর্ষণকে সমস্ত পার্থিব শারীরিকতার ভিতর দিয়াও যে কবিত্ব মণ্ডিত করিয়া আঁকা যাইতে পারে, দেহরসিক মূর্ত্তিশিল্পী প্রাচীন গ্রীসীয়দের অনুসরণে টিওফিল্ গোটিয়ে বর্ত্তমানে তাহার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ—তাঁহার এই "ক্ষুধিত পাষাণে"। যৌন আকর্ষণকে সমস্ত স্থূল শারীরিকতার অতীত করিয়া অথচ তাহার সমস্ত তীব্রতা ও মাদকতা রক্ষা করিয়া, তাহার আদিম স্বরূপে মায়ালোক-মহিমায় স্বপ্নরঞ্জিত করিয়া আঁকিয়াছেন। এই মায়ালোকের যৌন ব্যাপারে অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও অনির্দ্দেশ্য আবেগ আছে, কিন্তু কোথাও তাহার তৃপ্তি নাই; তীব্র সুখদুঃখের স্পন্দন আছে কিন্তু কোথাও তাহার নিবৃত্তি নাই; অনন্ত অভিসার আছে কিন্তু কোথাও অভিলষিতার সম্পূর্ণ প্রাপ্তি নাই। তাহা নাই বলিয়াই এই ছবিতে কোথাও বাস্তব স্থূলতার কলঙ্ক লাগে নাই। পর্দ্দার আড়াল হইতে তরুণী ইরাণীর জরীর চটিপরা পা দুটি যখন অভিসারকের দৃষ্টিপথে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তখন একবার, এবং যখন শয্যার নিম্নদেশে কাঁচলির আড়াল হইতে অবিরাম ক্রন্দন ফাটিয়া ফাটিয়া ছুটিয়া উঠিতেছিল, তখন, এই গল্প বাস্তব স্থূলতার দিকে গড়াইয়া যাইতে পারিত এবং নায়ক এবং পাঠকের ক্ষণিক তৃপ্তিতে তাহা পর্য্যবসিত হইতে পারিত। কিন্তু তাহাতে গল্পের স্বকীয় সৌন্দর্য্য নষ্ট হইত, তাহার অপরূপ মোহটি নিমেষের মধ্যে খান্‌খান্ হইয়া যাইত, মায়ালোকচারী কল্পনা নিমেষে বস্তুলোকে আছাড় খাইয়া কদর্য্য অপমৃত্যু লাভ করিত। গল্পকে দুইবার তীব্র প্রেম বেদনার ঋজু-কুটিল পথে এই বিপদের মুখে টানিয়া আনিয়া, তাহা হইতে লেখক ইহাকে আশ্চর্য্য নৈপুণ্যের সহিত রক্ষা করিয়াছেন, নায়ক ও পাঠকের মনের স্থূলতার মোহকে পাগল মেহের আলিকে দিয়া সবলে 'তফাৎ' করিয়া দিয়াছেন।

গল্পের যে এই বিলাসভাব তাহা আরব্য-উপন্যাসেরই সারভাগ। আঙ্গুরগুচ্ছের মত রসঢলঢল প্রাচুর্য্যে ফাটিয়া-পড়া ভাষার ইন্দ্রজাল দিয়া, বিলাস-লীলায়িত এই আরব্য আবহাওয়া সৃষ্টিতে লেখক অপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। অতীত আবহাওয়া-সৃষ্টির দুইটি রীতি হইতে পারে; এক হইয়াছে—আধুনিক জগৎকে দৃষ্টিপথ হইতে সম্পূর্ণ সরাইয়া দিয়া নিজকে সেই সুদূর অতীতের মধ্যে হারাইয়া ফেলা। দেশ বিদেশের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি এই শ্রেণীর; এই রীতিই হইয়াছে কল্পপন্থীরীতি। অন্যটি হইয়াছে, নিজে সর্ব্ববিধ আধুনিকতায় জাগ্রত থাকিয়া, সুদূর অতীতকে বর্ত্তমানে টানিয়া আনা। অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের, পুরাতনের সঙ্গে নূতনের এই যে মনোলোকের যোগ, তাহার মধ্যে একটা অপরূপ রহস্যময়তার ভাব আছে। শত শত শতাব্দীর দূরত্বের ভিতর দিয়া অতীত যে ফিল্টারকরা অবস্থায় আসিয়া বর্ত্তমানে পৌঁছায়, তাহাতে তাহার আদিম স্থূল প্রকৃতিটি বজায় থাকিতে পারে না—এই সুদূরের যাত্রায় পায়ে হাঁটিয়া আসা তার ঘটিয়া উঠে না, তাহার হাড় ও মাংস ফেলিয়া রাখিয়া হাওয়ায় চড়িয়াই তাহাকে আসিতে হয়—কাযেই যে মূর্ত্তিতে বর্ত্তমানের অভিসারে সে আসিয়া হাজির হয়, তাহা ছায়াময়ী। রক্তমাংসের অতীতের বদলে অতীতের ভূত লইয়া এই যে মনোলোকের কারবার, ইহাই এই গল্পের বিশেষত্ব, ইহার মধ্যেই এই গল্পের অলোকরস নিহিত রহিয়াছে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীসুখরঞ্জন রায়।

বিরাট-মঙ্গল

সামান্য মুকুতা আমি নহি—
ওগো ক্ষুদ্র ! সর্ব্ব দৈন্য সহি,
কেমনে তোমার মাঝে রহি ?
ওগো ক্ষুদ্র, চির নিশিদিন,
তব মাঝে হইয়া বিলীন,
জড়পিণ্ড সম আঁখি বুজি,
জড়পিণ্ড সম দেহ গুঁজি,
থাকিবারে পারিনা গো আর—
তাই আজি করি চুরমার,
দীর্ণ করি, ভগ্ন করি শুক্তি,
ওগো ক্ষুদ্র, লভিলাম মুক্তি !

চারিধারে মহা পারাবার,
চারিধারে উর্ম্মি-হাহাকার,
বদ্ধ থাকি তোমার ঝিনুকে,
তরঙ্গ-আঘাত লাগে বুকে !
অন্ধকার কারায়, বিষাদে,
মুকুতা-পরাণ মোর কাঁদে।
আমি নহি সামান্য মুকুতা,
আমি অপরূপা ও অদ্ভুতা ;
জিনি কোটী কৌস্তভ, অমূল্য,
জিনি কোটী কৌস্তভ, অতুল্য, —
তাই আজি বিদারিয়া শুক্তি,
ওগো ক্ষুদ্র, লভিলাম মুক্তি।

আমি নহি গুহার তিমির,—
অশক্ত যে হইতে বাহির
আমি নহি সামান্য ভূপতি ;—
নারায়ণ যাহার সারথি,
আমি সেই অর্জ্জুন মহান ;
হের এ গাণ্ডীব শোভমান !
নারীরাজ্যে হয়ে ক্ষুদ্র নারী,
এ অজ্ঞাতে থাকিতে কি পারি ?
ভস্ম নহি ; জ্বলি ধক্‌ধক্
আমি তীব্র জ্বলন্ত পাবক।
দীর্ণ করি, ভগ্ন করি শুক্তি,
তাই আজি লভিলাম মুক্তি।

ক্ষুদ্র রশ্মি জ্যোতির বিকাশ,
আমি নহি তুচ্ছ পরিহাস—
আমি মহা সূর্য্যের প্রকাশ,
আমি নহি শুকপক্ষী ক্ষুদ্র,
আমি যে গরুড় মহারুদ্র !
আমার এ পক্ষের ঝাপটে,
আমার এ নখের দাপটে,
ভাঙ্গে কোটী লৌহ কারাগার ;
মোরে রোধে সাধ্য বল কার ?
আমি পূর্ণ চন্দ্রমার হাস,
দিশি দিশি যাহার প্রকাশ !
আমি নহি ক্ষুদ্র রাগ দ্বেষ,
আমি প্রেম—বিরাট অশেষ !
দীর্ণ করি, ভগ্ন করি শুক্তি,
তাই আজি লভিলাম মুক্তি।

অনন্ত অনন্ত নীলাকাশ,
ভীমকায় আমার আবাস !
সুড়ঙ্গের আঁধার গলিতে,
কে চায় আমারে আটকিতে ?
আমি নহি সামান্য তরঙ্গ ;
মহাসিন্ধু আমারি উৎসঙ্গ।
দীর্ণ করি, ভগ্ন করি শুক্তি,
তাই আজি লভিলাম মুক্তি।

মণ্ডূকের মত এ আঁধারে
কে রহিবে কূপের মাঝারে ?

কে রহিবে গর্ত্তের আবাসে ?
ভ্রূণ সম, নিরুদ্ধ-নিশ্বাসে ?
মহাবিষ্ণু-নাভিমূল মাঝে
যে মহান মহীরুহ রাজে,
চির নব-পল্লব পতাকা,
আমি সে অক্ষয় বটশাখা।
দীর্ণ করি, ভগ্ন করি শুক্তি
তাই আজি লভিলাম মুক্তি।

কি আনন্দ ! বিরাটের
ছায়া আজি চারিধারে হেরি,
কি আনন্দ ! চারিধারে
শুনি আজি অনন্তের ভেরী।
সাঙ্গ আজি, চিরসাঙ্গ লতিকার লীলা রঙ্গ,
পরশিয়া মলয় সমীর,
আজি আমি শাল বৃক্ষ, ঝটিকার মহাদোল-
আন্দোলনে, আনন্দে অধীর।
চিরসাঙ্গ, চিরসাঙ্গ, ক্ষুদ্র পিপীলিকা-গতি,
ক্ষুদ্র প্রাণ ত্রস্ত যার অতি ;
শুনিছ না হ্রেষাধ্বনি ? কে রোধিবে, কে রোধিবে
আমার এ তুরঙ্গম গতি ?
অর্দ্ধশুষ্ক, অগভীর, ক্ষুদ্র সরসীর নীরে
অর্দ্ধস্নান আজি অবসান,
উত্তাল তরঙ্গময়, ফেনময় ফণাময়
জলধিতে, এ কি মহাস্নান !
কি মোহে ছিলাম ক্লান্ত, শুনি শুনি অবিশ্রান্ত
গীতিকবিতার রণরণি !
বিরাটের ইলিয়ডে, বিরাটের ইনিয়ডে,
আজি কি অপূর্ব্ব মহাধ্বনি !
ক্ষুদ্র রাগ, ক্ষুদ্র দ্বেষ, আজি নাই আজি নাই
প্রীতির এ মহাজাগরণে,
বিশ্বপ্রেম আলিঙ্গিছে কোটী কোটী নারীনরে,
বিরাটের বিশাল প্রাঙ্গণে,
ক্ষুদ্র দেব-দেবী-পূজা, মহাবিষ্ণু-পূজা মাঝে
তিরোহিত দ্বৈতজ্ঞান ;—অপূর্ব্ব অদ্বৈত জ্ঞান
আজি মম হৃদয়ে উদয়।
আজি চির অবসান অর্দ্ধস্ফুট ক্ষুদ্র গান
অর্দ্ধ ভগ্ন হৃদয়ের তারে ;
বিরাটের সা রে গা মা, বিরাটের পা ধা নি সা,
ঝঙ্কারিয়া বাজিছে ওঙ্কারে !

নমো নমো হে বিরাট, তোমার অসীম বক্ষে
নাহি বাধা নাহিক কবাট ;
যত ক্ষুদ্র যত অণু, তোমার অসীম বক্ষে
লুপ্ত হয়ে, আজি কি বিরাট !
অহো অহো কি বিচিত্র ! ফল ফুল শাখা স্কন্ধ,
অযুত অযুত অগণন,
লুপ্ত সুপ্ত গুপ্ত ওই তোমার বিরাট বীজে,
হে অনাদি, হে আদি কারণ !
অযুত মুকুট ঐ, অযুত কুণ্ডল ঐ
অগণন কেয়ূর কঙ্কণ,
আকার করিয়া ত্যাগ, বিরাজে তোমার মাঝে,
হে উজ্জ্বল অনাদি কাঞ্চন !
শ্বেত পীত লাল আভা, অতুল-সবুজ-প্রভা,
কোটী কোটী মরকত মণি,
কোটী কোটী হীরা চুনি বিরাজে তোমার মাঝে,
হে অনাদি রতনের খনি !
একি দৃশ্য ! একি দৃশ্য ! কি আনন্দ ! কি আনন্দ !
যবনিকা উঠে ধীরি ধীরি
তোমার বিরাট দেহে, একি হেরি একি হেরি,
কোটী কোটী নদ নদী গিরি !
কোটী কোটী সমুদ্রের কি গর্জ্জন ! কি গর্জ্জন !
কোটী কোটী প্রপাত-পতন ;
আস্ফালিয়া আস্ফালিয়া, আছাড়ি আছাড়ি পড়ি,
তরঙ্গের কি ভীম নর্ত্তন !
কোটী কোটী কেশরীর অগ্নিতুল্য একি চক্ষু !

কোটী কোটী ফণা তুলি ফোঁস্‌ফোঁসে মহারোষে
কোটী কোটী মহা কালসর্প !
অযুত জীবের ঐ ধবল দশন পাঁতি,
কোটী কোটী হস্ত পদ মুণ্ড,
কোটী কপালের অস্থি, কোটী কুণ্ডলের গুচ্ছ,
কোটী পুচ্ছ, কোটী কোটী শুণ্ড,
অন্তহীন অন্তহীন, একি তব মহালীলা,
হে মহা বিরাট মহারুদ্র !
ধবল তুষার গিরি কভু হেরি দিশি দিশি,
কভু লাল,—শোণিত সমুদ্র,
কোটী কোটী দেব দেবী, কোটী নর নারী,
গন্ধর্ব্ব অপ্সরা লক্ষ লক্ষ,
জীবরাজ্যে তরুরাজ্যে জড়রাজ্যে একি লীলা !
সংখ্যাহীন রাক্ষস ও যক্ষ,
কোটী কোটী অসি ঢাল, কোটী কোটী মহাঢাক,
কোটী বজ্র, অযুত কামান,
কোটী ভূত-প্রেত-নৃত্য, কোটী মহর্ষির যোগ,
মহাধ্যানে মুদিয়া নয়ান।
বিকট দশন মেলি কোটী ভৈরবীর কেলি,
ভৈরবের তাণ্ডব নর্ত্তন,
কোটী শান্তিময়ী পুরী, কোটী কোটী রণক্ষেত্র,
একি কর্ম্মক্ষেত্র অগণন !
কোটী চন্দ্র, কোটী সূর্য্য, মঙ্গল ও শনৈশ্চর,
কোটী বুধ, কোটী বৃহস্পতি,
অন্তহীন দীপাবলী এ অপূর্ব্ব দেয়ালীতে,
করে তব মঙ্গল আরতি।
আবার নিমেষে তারা, নিবে যায় নিবে যায়,
সূচিভেদ্য মহা অন্ধকার,
প্রলয়ের রাত্রি যেন এলায়েছে এলোকেশ,
কেশে কেশে একি একাকার ;
অবাক স্তম্ভিত আমি, একি তব মহালীলা,
হে অদ্ভুত কারণের ভাণ্ড,
তরঙ্গ বুদ্বুদ প্রায়, ফুটে উঠে, মিশে যায়,
তব মাঝে অযুত ব্রহ্মাণ্ড।

তোমার বিরাট স্পর্শ, এনেছে বিপুল হর্ষ,
দেহ চিত্ত শিরায় শিরায় ;
আজি পুণ্য শুভক্ষণে জাগিয়াছে মহাজ্ঞান,
নাহি ভেদ তোমায় আমায়।
কি বিচিত্র, কি বিচিত্র ! অনিত্যের দ্বন্দ্ব ভোগ
হইল হইল তিরোধান ;
মুদিল এ চর্ম্মচক্ষু,—খুলিল খুলিল আজি,
অচঞ্চল অন্তর নয়ান।
নাহি আর ব্যবধান, ঘটাকাশ অন্তর্দ্ধান,
তব মাঝে ওহে মহাকাশ,
অবাক স্তম্ভিত হয়ে, একি হেরি অপরূপ
তোমার ও স্বরূপ প্রকাশ !
বায়ুহীন কম্পহীন প্রদীপের শিখা সম
চিত্তবৃত্তি আজি কি সুস্থির !
অপূর্ণ অপূর্ণ সুখ, হইল সম্পূর্ণ আজি
যোগানন্দে নিবিড় গভীর,
ধ্যেয় ধ্যান ধ্যাতা লুপ্ত, ঊর্দ্ধে অধে দিশি দিশি
তোমারেই দেখিবারে পাই—
দেশ কাল কার্য্য নাই ; আমার আমিত্ব নাই ;
তোমা ছাড়া আর কিছু নাই।
নাহি চন্দ্র, নাহি রবি, একি স্বয়ম্প্রভা জ্যোতি
চক্রে চক্রে মণ্ডলে মণ্ডলে,
ডুবে যাই ডুবে যাই, আপনা হারায়ে যাই
ও জ্যোতির গভীর অতলে।
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের অনাদি মূল,
নামরূপ লীলার আধার,
সীমা নাই, রেখা নাই, একাকার, একাকার !
একি মহা জ্যোতি-পারাবার !

হে অচিন্ত্য, হে অরূপ, হে অনাদি, হে অক্ষয়,
হে চিণ্ময়, হে রহস্যময়,
তোমার মঙ্গল গীতে চিত্ত আজি ভরপুর,
হে অনন্ত জয় তব জয়।

মহতের মূলাধার, মনোবুদ্ধি-অহঙ্কার
প্রকৃতি-পুরুষ অবলম্ব,
নমো নমো জয় জয়, সচ্চিৎ-আনন্দময়,
চিরদিন অপার অগম্য।
ক্ষুদ্র তারকার রশ্মি, ডুবে গেল ডুবে গেল,
পূর্ণিমার কৌমুদী হিল্লোলে ;
ক্ষুদ্র তরঙ্গিণী আজি, ডুবে গেল ডুবে গেল,
জলধির তরঙ্গ কল্লোলে।
নায়কের আলিঙ্গনে, নায়িকার দেহ চিত্ত,
হয় যথা আনন্দে অবশ,
তোমার বিরাট স্পর্শ এনেছ অতুল হর্ষ,—
অহো একি অসহ্য হরষ !
সমুদ্র-কপোত যথা, মুদিয়া যুগল নেত্র,
পাশরিয়া আপন অস্তিত্ব,
তরঙ্গের রঙ্গভঙ্গে অনুভবে পলে পলে
নীল জলধির মহানৃত্য—
আমার নয়ন সুপ্ত ;—কোটী চক্ষে হেরি তব,—
এ কি তব বিরাটদর্শন !
আমার স্পন্দন লুপ্ত,—কোটী বক্ষে কাঁপি তব,—
এ কি তব বিরাট স্পন্দন !

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

প্রাচীন সভা সমাজ ও গোষ্ঠী *

অদ্য আমরা যে গৃহ-প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছি, ইংরেজী ভাষা অনুসারে আমরা তাহাকে বলি ক্লাব। আমাদের অনেকেরই ধারণা যে এ জিনিষটি আমাদের দেশীয় প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। কিন্তু যদিও বর্ত্তমানকালে য়ুরোপীয় সভ্যতা হইতেই ভারতবর্ষে ইহার আমদানি হইয়াছে, তথাপি ইহা নির্দ্ধারিত সত্য যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সভ্যতার একটী বিচিত্র ও বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষে যে যুগে Imperialism অথবা সাম্রাজ্যবাদ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, সেই যুগেই ইহাদের বিশেষ প্রতিপত্তি লাভের পরিচয় পাওয়া যায়। এদেশে ইহাদিগের নাম ছিল গোষ্ঠী। তখন প্রত্যেক নাগরিকেরই "গোষ্ঠীবিহার" অবশ্যকর্ত্তব্য দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। গ্রামবাসিগণও নগরের দৃষ্টান্ত দেখিয়া স্ব স্ব গ্রামে গোষ্ঠী গঠন করিত এবং লোকমান্য ঋষিগণও সূত্রাকারে এই সমুদয় গোষ্ঠীর প্রকৃতি পর্য্যালোচনা ও উন্নতির উপায়

এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অঙ্কুর ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রাচীন সভ্যতার মধ্যেই নিহিত ছিল। আর্য্য সভ্যতার আদিম নিদর্শন ঋগ্বেদ। এই ঋগ্বেদের কতকগুলি সূক্ত হইতে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ক্লাব বলিতে আমরা মোটামুটি যাহা বুঝি, তাহা সুপ্রাচীন বৈদিক যুগেও বিদ্যমান ছিল। তখন ইহার নাম ছিল সভা। সভার জন্য গ্রামে ও নগরে নির্দ্দিষ্ট গৃহ থাকিত। এই সভাগৃহে মিলিত হইয়া প্রাচীন আর্য্যগণ নানাবিধ কথাবার্ত্তা ও ক্রীড়াদি দ্বারা আমোদ প্রমোদ করিতেন। ধনী দরিদ্র সকলেই এখানে সমবেত হইতেন। ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের ৪র্থ সূক্তে ইন্দ্রের উদ্দেশে বলা হইয়াছে, "হে ইন্দ্র, তুমি যাহার সখা, সে রূপবান—গো, অশ্ব, রথ ও অন্যান্য ধন সে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হয় এবং সকলের আহ্লাদকর হইয়া সভাস্থ গমন করে।" ঋগ্বেদের ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ২৮ শ সূক্ত হইতে জানিতে পারা

* ভবানীপুর ঈষ্ট বেঙ্গল ক্লাবের প্রথম সাহিত্যিক অধিবেশনে

যায় যে গাভী ও কৃষি সম্বন্ধে এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ এই সমুদয় সভায় পরস্পর আলাপের বিষয় ছিল। যে সমুদয় ক্রীড়াদি প্রচলিত ছিল তন্মধ্যে দ্যূতক্রীড়া সর্ব্বপ্রধান। আজকাল যেমন বাজী রাখিয়া Bridge ও Billiard খেলা ক্লাবের বিশিষ্টতার লক্ষণ—বৈদিক যুগেও সেইরূপ ছিল। তখন বাজী রাখিয়া পাশা খেলা হইত এবং তৎকালের ক্লাবের সভ্যগণ ইহাতে কতদূর মত্ত ছিলেন, ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৩৪ সূক্ত হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন হতভাগ্য ব্যক্তি ক্লাবে এই ক্রীড়ায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া নিম্নলিখিত রূপ বিলাপ করিতেছে—

"আমার রূপবতী পত্নী কখনও আমার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করে নাই; কখনও আমার নিকট লজ্জিত হয় নাই। সেই পত্নী আমার নিজের ও আমার বন্ধুবর্গের বিশেষ সেবা শুশ্রূষা করিত। কিন্তু কেবলমাত্র পাশার অনুরোধে আমি সেই পরম অনুরাগিণী ভার্য্যাকে ত্যাগ করিলাম।

"যে ব্যক্তি পাশাক্রীড়া করে, তাহার শ্বশ্রূ তাহার উপর বিরক্ত, স্ত্রী তাহাকে ত্যাগ করে, যদি কাহারও কাছে কিছু যাচ্ঞা করে, দিবার লোক কেহ নাই। যেরূপ বৃদ্ধ ঘোটককে কেহ মূল্য দিয়া ক্রয় করে না, সেইরূপ দ্যূতকার কাহারও নিকট সমাদর পায় না।

"আমি যখন মনে ভাবি, আর এই পাশাখেলা করিব না, তখন খেলার সঙ্গীদিগকে দেখিলে তাহাদিগের নিকট হইতে সরিয়া যাই। কিন্তু পাশাগুলি সুন্দর পিঙ্গল মূর্ত্তিতে ছকের উপর বসিয়া আছে দেখিয়া আর থাকিতে পারি না। যেরূপ ভ্রষ্টা নারী সঙ্কেত স্থানে উপপতির নিকট গমন করে, আমিও তদ্রূপ (সভায়) খেলার সঙ্গিগণের নিকট গমন করি। *

"দ্যূতকার আপনার বুক ফুলাইয়া আস্ফালন করিতে করিতে সভায় আসে, কহে আমি জিতিব। পাশাগুলি কখন ইহার অভিলাষ পূর্ণ করে, সে বিপক্ষ দ্যূতকারের প্রতি যাহা কিছু অভিপ্রায় করে, সকলই কখন সিদ্ধ হইয়া যায়।

"কিন্তু কখনও সেই পাশা যেন অঙ্কুশযুক্ত হইয়া (অর্থাৎ যেন আঁকুশির দ্বারা) আকর্ষণ করিতে থাকে, তাহারা যেন বাণের ন্যায় বিদ্ধ করিতে, ছুরিকার ন্যায় কর্ত্তন করিতে এবং তপ্ত বস্তুর ন্যায় সন্তাপ দিতে থাকে। যে জয়ী হয় তাহার পক্ষে পাশাগুলি যেন পুত্রজন্মের তুল্য, যেন মধুময়, যেন তাহাকে মিষ্টবাক্যে সম্ভাষণ করে, আর পরাজিত ব্যক্তিকে তাহারা যেন নিধন করে।

"দ্যূতকারের স্ত্রী দীনহীন বেশে পরিতাপ করে, পুত্র কোথায় বেড়াইতেছে, ভাবিয়া তাহার মাতা ব্যাকুল। যে তাহাকে ধার দেয় সে আপন ধন ফিরিয়া পাইব কিনা এই ভাবিয়া শঙ্কিত হয়। দ্যূতকারকে পরের বাটীতে রাত্রিযাপন করিতে হয়।

"আপনার স্ত্রীর দশা দেখিয়া দ্যূতকারের হৃদয় বিদীর্ণ হয়, অন্যান্য ব্যক্তির স্ত্রীর সৌভাগ্য ও সুন্দর অট্টালিকা দেখিয়া তাহার পরিতাপ হয়। সে হয়ত প্রাতে সুশ্রী ঘোটক যোজনা পূর্ব্বক গতিবিধি করিয়াছে কিন্তু সন্ধ্যার সময় নীচলোকের ন্যায় তাহাকে শীত নিবারণের জন্য অগ্নিসেবা করিতে হয় (অর্থাৎ গাত্রে বস্ত্র পর্য্যন্ত থাকে না)।"

ক্লাবে বা সভাগৃহে বাজী রাখিয়া খেলা প্রাচীনকালে কি পরিমাণে প্রচলিত ছিল, উল্লিখিত সূক্তে তাহার চমৎকার নিদর্শন পাওয়া যায়। ক্লাবের অনেক সভ্যগণ এই খেলার আকর্ষণে প্রত্যহ সভাগৃহে আসিতেন—তাঁহাদিগকে একদিনও অনুপস্থিত দেখা যাইত না। বাজসনেয় সংহিতাকার এই শ্রেণীর লোকদিগকে 'সভাস্থাণু' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। স্থাণু অর্থে স্তম্ভ—ইঁহারা সভাগৃহের অচল স্তম্ভের ন্যায় সর্ব্বদা বিস্ত-

* ৺রমেশচন্দ্র দত্ত এই স্থলের অনুবাদ করিয়াছেন, "আমিও তদ্রূপ খেলার সঙ্গীদিগের ভবনে গমন করি।" কিন্তু বস্তুতঃ সঙ্গীদিগের ভবনের কোন কথা মূলে নাই এবং উপপতির সঙ্কেত স্থানের সহিত তাহার তুলনাও হইতে পারে না। আমি এ স্থলে জিমারের অনুবাদ গ্রহণ করিয়াছি—'Wie eine Verliebte Zum Stelldichein mit dem Geliebten geht der Spieler Zu den Wurfeln." (Alt-indische Leben, p. 308)

মান থাকিতেন, ইহাই সংহিতাকারের পরিহাসের মর্ম্ম। অথর্ব্ববেদেও দ্যূতক্রীড়ার বহু নিদর্শন আছে—চতুর্থ অধ্যায়ের সপ্তম সূক্তে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজয়, ক্ষুধা অথবা মৃত্যুর তুল্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অথর্ব্ববেদের যুগে যাহাতে সভাগৃহে এই ক্রীড়ায় বিপক্ষকে পরাজয় করা যায় তাহার নিমিত্ত জপ তপ মন্ত্র তন্ত্র ও তুক-তাকের উদ্ভাবন হইয়াছিল। ব্যধি থাকিলেই প্রতি-কারের উপায় সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয়। সুতরাং যাহাতে এই জপ তপের ফল ব্যর্থ করা যাইতে পারে, তাহার উপায় স্বরূপ অন্তবিধ মন্ত্র প্রভৃতিরও সৃষ্টি হইয়াছিল।

বর্ত্তমানকালে ক্লাবে সাধারণতঃ দুইটি প্রয়োজন সাধিত হয়। পরস্পর আলাপ পরিচয় কথাবার্ত্তা, এবং ক্রীড়াদি আমোদ প্রমোদ দ্বারা চিত্তবিনোদন। বৈদিক যুগের সভায়, এ উভয় প্রয়োজনই সাধিত হইত। কিন্তু এতদ্ব্যতীত এই সভার আর একটি বিশিষ্টতা ছিল। ইহাদ্বারা বর্ত্তমানকালের Debating Club এর কার্য্যও সম্পন্ন হইত। জার্ম্মাণ পণ্ডিত জিমার * বৈদিক যুগের সভার এই বিশেষত্ব সর্ব্বপ্রথমে লক্ষ্য করেন, এবং তিনি এই বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। অন্যান্য পণ্ডিতগণ তাঁহার মত গ্রহণ করিয়াছেন। কোন বিষয় লইয়া সভ্যগণ দুই পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক পরস্পর তর্ক বিতর্ক করিতেন। কখন-কখনও ইহা কবির লড়াইয়ের আকার ধারণ করিত। তখন কবিতায় উত্তর প্রত্যুত্তর দান করা হইত; এবং যিনি এইরূপ কবিতা-রচনায় অধিকতর নৈপুণ্য দেখাইতেন, তাঁহাকে পুরস্কার দেওয়া হইত। তর্কে ও কবিযুদ্ধে এইরূপ দক্ষ ব্যক্তি 'সভেয়' নামে অভিহিত হইতেন। এইরূপ সভেয় ব্যক্তি সমাজে মাননীয় বলিয়া পরিগণিত হইতেন। লোকে এইরূপ সভেয়-পুত্র কামনা করিয়া সোমকে হব্য প্রদান করিত।

এই সভার আর একটি দিক ছিল তাহা রাজ-নৈতিক। গ্রামে বা নগরে ইহারা বর্ত্তমান কালের Local Board বা Municipalityর কার্য্য করিত। ঐতিহাসিক যুগে গ্রামে ও নগরে যে স্বায়ত্তশাসন-প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাই তাহার মূলভিত্তি। দেশের শাসনকার্য্যেও এই সমুদয় সভার অধিকার ছিল। রাজার নির্ব্বাচনে, কোন বিশেষ প্রয়োজনে আহূত রাজসভায় গ্রামের প্রতিনিধিস্বরূপ 'গ্রামনী' উপস্থিত থাকিতেন। শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া এই সমুদয় সভায় বিচার বিতর্ক মাঝে মাঝে প্রবল আকার ধারণ করিত। এই সমুদয় বিচার বিতর্কে জয়লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা সভ্যগণের হৃদয়ে কিরূপ প্রবল ছিল, অথর্ব্ব বেদের কয়েকটি সূক্তে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সভ্যগণ যাহাতে প্রতি-পক্ষের যুক্তি গ্রহণ না করিয়া স্বীয় মত অবলম্বন করেন, এই উদ্দেশ্যে অনেকে যাগযজ্ঞের পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান করি-তেন। এইরূপ যজ্ঞে যে সমুদয় স্তোত্রাদি পঠিত হইত, অথর্ব্ব বেদ (৭।১২) হইতে তাহার একটি নিদর্শন দিতেছি।

"প্রজাপতির দুই দুহিতা—সভা ও সমিতি—আমি যেন ইহাঁদের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই। সভাগৃহে যাঁহার সঙ্গে মিলিত হই তিনি যেন আমাকে সাহায্য করেন। আমি যাহা বলি তাহা যেন সমুদয় সভ্যেরই হৃদয়গ্রাহী হয়।"

কেবল যাগযজ্ঞ নহে, সভায় তর্কে জিতিবার জন্য অনেক যাদুবিদ্যারও উদ্ভব হইয়াছিল। জয়লাভেচ্ছু ব্যক্তিকে কোনও বৃক্ষ-বিশেষের পাতার মালা গলায় দিয়া, তাহার শিকড় মাদুলিতে করিয়া বাঁধিয়া এবং মুখে চর্ব্বণ করিতে করিতে, নিম্নলিখিত মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া উত্তর-পূর্ব্ব কোণ হইতে সভায় প্রবেশ করিতে হইত—"আমার প্রতিপক্ষ যেন কোনমতে তর্কে জয়লাভ করিতে পারে না, হে সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বপরাভবকারী বৃক্ষ, তুমি আমার প্রতিপক্ষদিগের তর্ককে পরাজয় কর। তাহাদিগকে অন্তঃসার শূন্য কর। সভামধ্যে যে আমার প্রতি বৈরভাব অবলম্বন করে, হে ইন্দ্র, তুমি তাহার তর্কশক্তি বিনষ্ট কর, এবং আমার পক্ষীয়দিগের তর্কশক্তি উদ্বোধন

অথর্ব্ব বেদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে (৯৪) এইরূপ আর একটি স্তোত্র আছে—

"(সভায় উপবিষ্ট) তোমাদের সকলের চিত্ত, সকলের গতি,সকলের অভিপ্রায় আমি নিয়ন্ত্রিত করিতেছি। অদূরে উপবিষ্ট যাঁহারা ভিন্নমত পোষণ করেন, তাঁহাদিগের মতি-গতিও আমি আমার অভিমুখে নিয়ন্ত্রিত করিতেছি।

"আমার মন দিয়া আমি তোমাদিগের মন বশীভূত করিয়াছি। তোমাদিগের অভিপ্রায় আমার অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তী হউক। আমি যে পথে চলি তোমরাও সেই পথে চল। ইন্দ্র অগ্নি স্বর্গ মর্ত্ত্য সরস্বতী সকলেই আমার সহায়। হে সরস্বতী, আমি যেন এখানে জয়লাভ করিতে পারি।"

এই সমুদয় যাদুবিদ্যা ও মন্ত্রের প্রভাব যাহাতে কার্য্যকর না হইতে পারে, তজ্জন্য বিপক্ষগণও অন্যবিধ যাদু ও মন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। (অথর্ব্ব ৫-৩১)

এ সকল হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সভার রাজনৈতিক ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল এবং তাহার পরিচালনাকার্য্যে সভ্যগণের উৎসাহ ও উত্তেজনারও অভাব ছিল না। আর, কেবলমাত্র যুক্তি ও তর্কদ্বারাই সেখানে কোন ব্যক্তি-বিশেষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইত। দেবতার উদ্দেশে ব্যাকুল প্রার্থনা, যাগ যজ্ঞ, মন্ত্র তন্ত্র, তুকতাক্ এ সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য, সভ্যগণকে স্বীয় মতাবলম্বী করা। সুতরাং লোকমতের শ্রেষ্ঠত্ব সকল পক্ষই তুল্যরূপে মানিয়া চলিতেন।

সভায় তর্ক বিতর্ক উপলক্ষে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণের প্রতি সম্মান রক্ষা করা সকল সময়ে সম্ভবপর হইত না। অনেকে তজ্জন্য পরে অনুতপ্ত হইতেন। এইরূপ অনুতপ্ত ব্যক্তি যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানদ্বারা তজ্জনিত পাপ মোচন করিতেন। বাজসনেয় সংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে এইরূপ এক ব্যক্তি বলিতেছেন, "সভায় আমরা যে পাপ করিয়াছি, যজ্ঞদ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি।" টীকাকার মহীধর 'পাপ' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,"মহাজনতিরস্কারাদিকং এনঃ"—অর্থাৎ "মহৎ ব্যক্তিকে তিরস্কার করার নিমিত্ত পাপ"। তৎকালে সভায় তর্ক বিতর্ক কিরূপ প্রবল আকার ধারণ করিত, ইহা দ্বারাও তাহা কিয়ৎ পরিমাণে সূচিত হয়।

এই সমুদয় সভা কখন-কখনও বিচারালয়ের কার্য্য করিতেন। ইহার বিশিষ্ট নিয়ম প্রণালী জানা যায় না, কিন্তু অনুমান করা যাইতে পারে যে ইহা অনেকাংশে পরবর্ত্তী কালের পঞ্চায়তী প্রথার অনুরূপ ছিল।

বৈদিক যুগে সভার যে বিবরণ উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, বর্ত্তমানকালে Civic life এবং Social life বলিতে আমরা যাহা বুঝি; ইহা সে উভয়েরই কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। এই দুই দিক বিভিন্ন করিয়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সাহায্যে তাহা পরিচালনা করার প্রয়োজনীয়তা তখনও অনুভূত হয় নাই। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত সম্ভবতঃ এই ধারা চলিয়া আসিতেছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থ সমূহে দেখিতে পাওয়া যায় যে তৎকালে গণতন্ত্রশাসিত শাক্য মল্ল লিচ্ছবি প্রভৃতি জাতির 'সন্থাগার' অথবা Parliament Hall রাজকার্য্যাদির অবসানের পরে বর্ত্তমানকালের ক্লাব গৃহে পরিণত হইত।

ঠিক কোন সময়ে এই দুই অংশের মধ্যে বিচ্ছেদ সাধন হইয়া বর্ত্তমান আকারের ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা নির্ণয় করা যায় না। অনুমান হয়, সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যখন সাধারণ লোকের শাসনক্ষমতা সংকীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল, তখন প্রাচীন সভার রাজনৈতিক জীবন সংকীর্ণ হইয়া সামাজিক জীবনই প্রধান হইয়া উঠিল। খৃষ্টীয় তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দীতে এই বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইয়া,বর্ত্তমান কালের ন্যায় ক্লাবের সৃষ্টি হইয়াছিল। বাৎস্যায়ন মুনি প্রণীত কামসূত্রে তাহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়; তখন প্রকৃতিভেদের সঙ্গে ইহার নূতন নামকরণ হইয়াছিল —গোষ্ঠী। কিন্তু মহাভারতে এই পরিবর্ত্তন যুগের চিহ্ন কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। সভাপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তরে মহর্ষি নারদ দেবলোকের সভা বর্ণনা করেন।

এই সমুদয় সভা দেবলোকে স্থিত হইলেও, গ্রন্থকার যে তাহার বিবরণ নরলোক হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। দেবর্ষি নারদ যথাক্রমে ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের ও পিতামহ ব্রহ্মার সভার কথা বর্ণনা করেন। এই সমুদয় বর্ণনা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহা মাত্র প্রাচীন সভার এক অংশ—সামাজিক জীবন ও আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি লইয়া গঠিত। দেবলোকবাসিগণ প্রত্যহ উদ্যানপাদপাদি শোভিত ঐ সমুদয় সভায় আগমন করেন। তথায় দিব্য ও মর্ত্ত্য যাবতীয় কাম্য বস্তু, সরস সুস্বাদু মনোহর প্রচুর চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় প্রভৃতি ভক্ষ্য দ্রব্য, সুগন্ধি মাল্য এবং সুস্বাদ শীত ও উষ্ণ সলিল প্রভৃতি সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে। ভাস্বর-কলেবর, দিব্যাম্বর, বিচিত্রাঙ্গদ, চিত্রমাল্য, উজ্জ্বল কুণ্ডল প্রভৃতি নানাবিধ ভূষণে ভূষিত পুণ্যশালী অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ তথায় গমন করিয়া থাকে। নৃত্য গীত বাদ্য হাস্য পবিত্র গন্ধ শব্দ ও দিব্য মাল্য সমুদয় তথায় সতত সমুপস্থিত থাকে। মিশ্রকেশী, রম্ভা, চিত্রসেনা, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাগণে পরিবৃত্ত হইয়া দেবগণ দিব্যতানে গান করিয়া থাকেন।

মহাভারতীয় যুগের সভা ও বৈদিক যুগের সভার পার্থক্য আমরা এখন বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। রাজনীতি সম্বন্ধীয় সভার যাবতীয় কার্য্য, বিচার বিতর্ক, প্রতিপক্ষের পরাজয়ের চেষ্টা, তজ্জন্য যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান—এ সমুদয় পৃথক্ করিয়া কেবলমাত্র ক্রীড়াদি আমোদ প্রমোদই এক শ্রেণীর সভার অবলম্বনীয় বিষয় হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহাই পরবর্ত্তী কালে গোষ্ঠী নামে অভিহিত ও বাৎস্যায়ন মুনি কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। বৈদিক যুগের পরবর্ত্তীকালে, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের অভ্যুদয় ও প্রতিপত্তির যুগে, এই গোষ্ঠী বা ক্লাব কিরূপ ছিল, উক্ত দুই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের গ্রন্থে তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুগে ইহাদের নাম ছিল সমজ্জ ও সমাজ। এই দুইটি শব্দের প্রকৃত নানা পণ্ডিতগণ ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু আমি যে অর্থে ইহার ব্যবহার করিয়াছি, এ পর্য্যন্ত কেহই তাহা করেন নাই—সুতরাং এ বিষয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক। সমজ্জ ও সমাজ যে একই বস্তু নির্দ্দেশ করে, রিস্ ডেভিড্‌স্ তাহা স্বীকার করিয়াছেন * এবং বস্তুতঃ এ বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। বিনয়পিটকে লিখিত আছে যে, বুদ্ধদেব ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণকে সমজ্জে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। † বৌদ্ধরাজচক্রবর্ত্তী অশোকও তাঁহার প্রথম গিরিলিপিতে,সমাজ বহু দোষের আকর সুতরাং সমাজ গমন কর্ত্তব্য নহে, এইরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছেন। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে ভারতবর্ষের পিউরিটানস্বরূপ বৌদ্ধসম্প্রদায়কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ এই 'সমাজ' জিনিষটি কি? বুলার ইহার অর্থ করিয়াছিলেন festive assemblies—অর্থাৎ উৎসবমিলন। শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, হরিবংশ ও ভট্টিকাব্য হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া উক্ত অর্থের যাথার্থ্য প্রমাণিত করেন। হরিবংশোক্ত 'সমাজে' বিরাট ভোজের আয়োজন হইয়াছিল এবং নানাবিধ মাংসের ব্যঞ্জন প্রস্তুত ছিল। ভট্টিকাব্যোক্ত সমাজের প্রধান অঙ্গ ছিল সুরাপান। শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর মহাশয় অনুমান করেন যে, এই সমুদয় সমাজে মদ্যপান ও মাংসের জন্য বিবিধ প্রাণিহত্যা হইত, এই নিমিত্তই বৌদ্ধ অশোক উহা রহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অনুমান সত্য বলিয়া মনে হয় না, কারণ পানভোজন ব্যতীত এই সমুদয় সমাজের অন্যান্য অঙ্গও বৌদ্ধগণ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। বিনয়পিটকে উল্লিখিত হইয়াছে যে, একদা বুদ্ধদেব যখন রাজগৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন কতিপয় বৌদ্ধভিক্ষু নৃত্যগীত ও বাদ্য শ্রবণের নিমিত্ত সমাজে গিয়াছিলেন। অন্যান্য ভিক্ষুগণ ইহাতে অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন, "কি আশ্চর্য্য! ভোগবিলাসী গৃহীর

---

* Rhys Davids—Buddhist India, p. 195.

ন্যায় ইহারা নৃত্যগীত বাদ্যে অনুরক্ত।" কথাটি বুদ্ধদেবের কাণে উঠিল, এবং উক্ত ভিক্ষুগণ ফিরিয়া আসিলে তিনি তাহাদিগকে তিরস্কারপূর্ব্বক নিয়ম করিয়া দিলেন যে, ভিক্ষুগণের পক্ষে নৃত্যগীত বাদ্যাদি দর্শন করা পাপ। (চুল্লবগ্‌গ ৫-২-৬)। এইরূপ আর একটি উপলক্ষে ভিক্ষুণীগণের পক্ষেও নৃত্যগীত-বাদ্যাদি দর্শন নিষিদ্ধ হয়। আর একবার কতিপয় ভিক্ষু এইরূপ সমাজে গমন করেন। তথায় স্নান বিলেপন ও আহারাদি সম্পন্ন করিয়া, মনোহর খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে লইয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসেন এবং বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হন। বিনয়পিটকের অন্যত্র প্রসঙ্গতঃ উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রধান রাজকর্ম্মচারিগণ সমাজে উপস্থিত ছিলেন। এই সমুদয় পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে পান ভোজনাদি ব্যতীত নৃত্যগীতবাদ্যও সমাজের অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত ছিল। এইরূপ সমাজের আরও কয়েকটি অঙ্গের বিষয় দীর্ঘনিকায়ের অন্তর্গত 'সীগাল সুত্তান্ত' হইতে জানিতে পারা যায়। এই সুত্তান্তে বুদ্ধদেব রাজগৃহের কোন গৃহপতিকে উপদেশছলে, সংসারে কি কি দোষ পরিহার করা কর্ত্তব্য তাহার এক তালিকা প্রদান করেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে 'সমজ্জাভিচরণ' অর্থাৎ সদাসর্ব্বদা সমাজে গমনকে তিনি নিম্নলিখিত ষড়বিধ দোষের আকর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন যথা—নৃত্য, গীত, বাদ্য, আখ্যান পাণিস্বর, কুম্ভথূণ। আখ্যান অনেকটা বর্ত্তমান কথকতার মত। পাণিস্বর ও কুম্ভথূণ এক প্রকারের বাজী ও ভেল্কী। সুতরাং জানা গেল যে পান ভোজন ও নৃত্যগীত বাদ্যাদি ব্যতীত এই সমুদয়ও সমাজে অনুষ্ঠিত হইত। এই সমুদয় অনুষ্ঠান যে কোন বিশেষ উপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হইত তাহা নহে, ইহার জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। বস্তুতঃ সমাজ বলিলে যে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান বুঝাইত, জৈন গ্রন্থ উত্তরাধ্যয়নের ত্রিংশ অধ্যায়ে * তাহার প্রমাণ আছে। এই অধ্যায়ে কোন্ কোন্ স্থানে জৈনধর্ম্মাবলম্বিগণ যাইতে পারিবে তাহার তালিকার মধ্যে 'সমাজ'এর উল্লেখ আছে। শান্তিপর্ব্বের ৬৯ অধ্যায়ে পররাষ্ট্রের গুপ্তচরকে কোথায় কোথায় অনুসন্ধান করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ প্রদান উপলক্ষে ভীষ্ম বলিয়াছেন—

"চারাংশ্চ বিদ্যাৎ প্রহিতান্ পরেণ ভরতর্ষভ।
আপণেষু বিহারেষু সমাজেষু চ ভিক্ষুষু॥"

অর্থাৎ বিপণি, বিহার, সমাজ ও ভিক্ষু সম্প্রদায়ে শত্রু কর্ত্তৃক চর প্রেরিত হইয়াছে জানিবে। ইহা হইতেও অনুমিত হইবে যে সমাজ বলিতে কোন সাময়িক আমোদ উৎসব নহে, পরন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানকেই বুঝাইত।

এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে সমজ্জ বা সমাজের যে উল্লেখ আছে, তাহা হইতে ইহার সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করা যাইতে পারে। ইহা সাময়িক আমোদ প্রমোদ ও উৎসব মাত্র নহে, পরন্তু সুনির্দ্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান।* ইহাতে পান ভোজন নৃত্য গীত বাদ্য কথকতা বাজী ভেল্কি প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইত। অমরকোষ অভিধানে সমজ্যা ও গোষ্ঠী, প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। গোষ্ঠী যে বর্ত্তমানকালের ক্লাবের অনুরূপ ছিল এবং তাহাতে নৃত্যগীত বাদ্যাদি অনুষ্ঠিত হইত, তদ্বিষয়ে বিস্তৃতভাবে পরে বলিব। সংস্কৃত সমজ্যা ও পালি সমজ্জ একই শব্দ তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। শব্দগত ও বস্তুগত এই সাদৃশ্য দেখিলে সমজ্জ ও সমাজ যে সমজ্যা বা গোষ্ঠীরই নামান্তর তাহা একপ্রকার সিদ্ধান্ত হইতে পারে। বিশেষতঃ অমরকোষের টীকাকার ক্ষীরস্বামী সমজ্যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করিয়াছেন, সমজন্তি মিলন্তি অস্যাং সমজ্যা—সুতরাং পরস্পরের মিলনই ইহার প্রকৃতিগত উদ্দেশ্য—আমোদ উৎসব তাহার আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠান মাত্র। পূর্ব্বে সমাজ বা সমজ্জ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে অনুমিত হইবে যে, বৌদ্ধযুগেও এদেশে ক্লাব

* Jacobi, Jaina Sutras II, p. 177.

* Rhys Davidsও লিখিয়াছেন, "There is ample evidence in the Buddhist and Jain records, and in Asoka-inscriptions, of the existence of these Sāmajjas as a regular institution." (অধোরেখাগুলি আমি যোগ করিয়াছি) Buddhist India, p. 185.

প্রভৃতি ছিল। ইহা সাধারণের মিলনক্ষেত্র ছিল এবং এখানে নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি নানাবিধ আমোদ প্রমোদ হইত। কোন বিশেষ উপলক্ষে এখানে পান-ভোজনাদিরও ব্যবস্থা ছিল। বিনয়পিটকে চারিস্থানে সমাজের উল্লেখ আছে। তাহার একস্থলে মাত্র ভোজন-ব্যাপারের উল্লেখ আছে। সীগাল সূত্তান্তেও সমাজের দোষের তালিকার মধ্যে পান ভোজনের উল্লেখ নাই। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে পান-ভোজন সমাজের নিত্য অনুষ্ঠিত ব্যাপারের মধ্যে পরিগণিত ছিল না। এখন যেমন বিশেষ দিনে Club dinnerএর ব্যবস্থা আছে, তখনও বোধ হয় সেইরূপ ছিল। সীগাল সূত্তান্তে বর্ণিত সমাজের আর একটি অঙ্গ, আখ্যান সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে বলিয়াছি আখ্যান অনেকটা কথকতার মত। ইহাতে গদ্যে পদ্যে কোন গল্প বর্ণিত এবং অনুরূপ ভাবভঙ্গী সহকারে তাহার আবৃত্তি হইত। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে, অন্যান্য দেশের ন্যায়, এদেশেও ইহা হইতেই নাটকের সৃষ্টি। নাটকের উদ্ভব হইলে তাহাও এই সমুদয় সমাজ বা গোষ্ঠীতে আদৃত হইতে লাগিল। এমন কি একশ্রেণীর একাঙ্ক নাটক 'গোষ্ঠী' নামেই পরিচিত, সম্ভবতঃ ইহাই গোষ্ঠীতে বিশেষভাবে আদৃত হইত।

বিনয়পিটক হইতে জানিতে পারা যায় যে প্রধান রাজপুরুষগণও এই সভায় আসিতেন—তাঁহারা সম্ভবতঃ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিতেন, কারণ তাঁহাদের জন্য বিশেষ আসন নির্দ্দিষ্ট হইত এইরূপ উল্লেখ আছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভারতবর্ষের পিউরিটান বৌদ্ধগণ এই অনুষ্ঠানটিকে প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই। স্বয়ং বুদ্ধদেব ইহার বিপক্ষে বিধান করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান পৃষ্ঠপোষক মৌর্য্যসম্রাট্ অশোক তাঁহার প্রথম গিরিলিপিতে লিখিয়াছেন, "ন চ সমাজো কতব্যো-বহুকং হি দোষং সমাজম্হি পসতি দেবানং প্রিয়ো প্রিয় দর্শি রাজা। অস্তি পিতু একচা সমাজা সাধুমতা যোগদান করা কর্ত্তব্য নহে—দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা সমাজে বহু দোষ দেখিতে পান—অবশ্য কোন কোন কোন স্থলে এমন সমাজও আছে যাহা দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা সাধু বলিয়াই মনে করেন।" ইহা হইতে অনুমান হয় যে 'সমাজে' পরস্পর মেলামেশা এবং আলাপাদি করায় সম্রাট অশোক কোন দোষ দেখিতেন না। পান ভোজন নৃত্যগীতাদি আমোদ প্রমোদই তাঁহার আপত্তির বিষয়ীভূত ছিল। সম্ভবতঃ বৌদ্ধযুগে এই সমুদয় আমোদপ্রমোদবর্জ্জিত পিউরিট্যান ক্লাব সমূহের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং ইহাই সম্রাটের চক্ষে সাধু বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। ইংলণ্ডে পিউরিট্যান যুগের ইতিহাস যাঁহারা জানেন, তাঁহাদের নিকট ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। এই যুগে কিরূপে নৃত্যগীত থিয়েটার ও অন্যান্য আমোদ প্রমোদ নিষিদ্ধ হইয়াছিল, ইংলণ্ডের ইতিহাসে তাহা স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। অনুরূপ ভাবের প্রেরণায় প্রাচীন বৌদ্ধযুগেও সমাজে নৃত্যগীতাদি নিষিদ্ধ হইয়াছিল। ইংলণ্ডে এই পিউরিট্যান যুগ সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। ক্রমওয়েলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যে ও সমাজে পিউরিটান প্রভাব বিনষ্ট হয়; আবার 'Merry England' এর প্রতিষ্ঠা হয়। ভারতবর্ষেও অশোকের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই বৌদ্ধপ্রভাব ক্ষীণ হইয়া আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন উৎসব ও 'সমাজের' পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়। অশোকের মৃত্যুর অনতিকাল পরে কলিঙ্গরাজ খারবেল রাজ্যলাভ করেন। তাঁহার হস্তিগুম্ফালিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি তাঁহার রাজধানীতে সমাজ ও নানাবিধ উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে উৎকীর্ণ মহারাণী বালশ্রীর নাসিক গুহালিপি হইতে জানা যায় যে, অনেকসমরবিজয়ী কেশবার্জ্জুনভীমসেনতুল্যপরাক্রমশালী ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অদ্বিতীয় পৃষ্ঠপোষক তাঁহার বীরপুত্র শাতকর্ণি চাতুর্ব্বর্ণের সংমিশ্রণ রোধ করেন এবং নানাপ্রকার উৎসব ও সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। এইরূপে বৌদ্ধযুগের আদর্শ

তুলনা এখানেই শেষ হয় নাই। দ্বিতীয় চার্লসের পুনঃ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে কেবল যে সমাজ পুরাতন প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তাহা নহে—পিউরিটান আদর্শের প্রতি-ক্রিয়াস্বরূপ সমাজে অনেক অশ্লীলতা প্রবেশ করিয়াছিল। ভারতবর্ষে ইহার ফল কি হইয়াছিল, পরবর্ত্তী যুগের গোষ্ঠী বর্ণনায় তাহা কিঞ্চিৎ পরিমাণে বুঝিতে পারা যাইবে।

আমরা ক্লাব বলিতে এখন যাহা বুঝি, প্রাচীনকালে গোষ্ঠী বলিতে ঠিক তাহাই বুঝাইত। বাৎস্যায়ন প্রণীত কামসূত্রের ১ম অধিকরণের চতুর্থ অধ্যায়ে এই গোষ্ঠীর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই বিবরণ অত্যন্ত কৌতুক-কর এবং প্রাচীন ভারতবাসীর সাধারণ জীবনযাত্রা সম্বন্ধে যাঁহারা জ্ঞানলাভ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। ইতিপূর্ব্বে কেহ কেহ ইহার আলোচনা করিয়াছেন, আমি সকল বিষয়ে তাঁহাদের সঙ্গে একমত হইতে পারি নাই। * মূলগ্রন্থ পাঠ করিয়া আমার যেরূপ ধারণা হইয়াছে তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি।

বাৎস্যায়ন নাগরিকের দৈনন্দিন কার্য্য বর্ণনা উপ-লক্ষে লিখিয়াছেন, "গৃহীত প্রসাধনস্যাপরাহ্নে গোষ্ঠী—বিচারাঃ"। টীকানুসারে পূর্ব্বভাগের সহিত অন্বয় করিলে ইহার অর্থ হয় যে, "মধ্যাহ্নে ভোজনান্তর শুক সারিকা আলাপ প্রভৃতি ক্রীড়া কৌতুক করিবে, তৎ-পরে (গ্রীষ্মকাল হইলে) নিদ্রা, এবং নিদ্রান্তে বাহিরে যাইবার উপযোগী পরিচ্ছদাদি পরিধান করিয়া অপরাহ্নে গোষ্ঠীতে গমন করিবে এবং তথায় ক্রীড়াদি করিবে।" ইহাই তাহার নিত্য কার্য্য অর্থাৎ প্রত্যহ করণীয় কিন্তু এতদ্ব্যতীত 'নৈমিত্তিক', অর্থাৎ যাহা মাঝে মাঝে ঘটে, এরূপ কার্য্যের বিধান আছে যথা—গোষ্ঠীসমবায়। টীকাকার জয়মঙ্গল ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "গোষ্ঠ্যাং নাগরকানাং কাব্যকলাবিষয়ং সমবায়নং সং-প্রধারণং প্রজ্ঞাবিবৃদ্ধয়ে। যদপরাহ্ণে গোষ্ঠীবিহার ইতি নিত্যকর্ম্মোক্তং তস্য ক্রীড়ামাত্র ফলত্বাদিদং বিশিষ্যতে।" এখানে টীকাকার প্রথমে গোষ্ঠী-সমবায়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গোষ্ঠীতে জ্ঞানবৃদ্ধির নিমিত্ত পরস্পর কাব্য-কলা বিষয়ের আলোচনা। এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে গোষ্ঠীতে গমন তো নিত্য কার্য্য বলিয়াই বিহিত হইয়াছে, সুতরাং তাহার আবার নৈমিত্তিকতা কি? তদুত্তরে টীকাকার বলিয়াছেন যে, প্রত্যহ যে গোষ্ঠীতে গমনের ব্যবস্থা আছে, তাহার উদ্দেশ্য ক্রীড়া কৌতুক আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি—কাব্য কলাবিষয়ের আলোচনা প্রত্যহ সম্ভবপর হয় না। তাহার জন্য বিশেষ অধিবেশন আবশ্যক। এই অধিবেশনের স্থান ও প্রকৃতি সম্বন্ধে চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ সূত্রে আছে, "বেশ্যাভবনে সভায়ামন্য-তমস্যোদবসিতে বা সমান-বিদ্যাবুদ্ধিশীল-বিত্তবয়সাং সহ বেশ্যাভিরনুরূপৈরালাপৈরাসনবন্ধো গোষ্ঠী তত্র চৈষাং কাব্যসমস্যা কলাসমস্যা চ।"

এই সূত্রদ্বয় হইতে প্রমাণিত হয় যে সভাগৃহ ব্যতীত, বেশ্যাভবন এবং কোন সভ্যের বাটীতে এইরূপ অধি-বেশন হইতে পারিত। এবং এইরূপ অধিবেশনে সর্ব্বত্রই বেশ্যাগণ উপস্থিত থাকিত। অন্য বিষয় আলো-চনা করিবার পূর্ব্বে এই 'বেশ্যা' শব্দের প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করা আবশ্যক।

অধ্যাপক বাবু সুবিমলচন্দ্র সরকার এম-এ এইস্থলে 'বেশ্যা' শব্দে 'স্ত্রী' অর্থ করিয়াছেন, এবং প্রাচীনকালের 'free and dignified social life' এর দৃষ্টান্তস্বরূপ লিখিয়াছেন, "Indian gentlemen of those days went to clubs with their wives." (২৪৮ পৃঃ) কিন্তু বেশ্যা শব্দের স্ত্রী অর্থ সংস্কৃত অভিধানে অজ্ঞাত এবং সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা এই শব্দের ঐরূপ অর্থ জানেন না বলিয়াছেন। আর এস্থলে বেশ্যা শব্দের স্ত্রী অর্থ করিলে 'বেশ্যাভবনে' কথার কোন সুসঙ্গত অর্থ হয় না। এই বেশ্যা শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা বাৎস্যায়নের অন্যান্য সূত্র হইতে

* বাবু সুবিমল চন্দ্র সরকার Dacca Review 1914 October—November P. 207, 245, বাবু জিতেন্দ্রলাল বসু Journal of the Bihar and Orissa Research Society. September 1917. p. 409

জানিতে পারা যায়, এবং তাহা আমাদের প্রাচীন সমাজের একটি বিলুপ্ত ও বিস্মৃত বৈচিত্র্যের পরিচয় প্রদান করে। প্রথম অধিকরণের তৃতীয় অধ্যায়ে বাৎস্যায়ন স্ত্রীশিক্ষার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ইহার সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন, "সন্ত্যপি খলু শাস্ত্রপ্রহত বুদ্ধয়ো গণিকা রাজপুত্র্যো মহামাত্র দুহিতরশ্চ", অর্থাৎ রাজকন্যা, মহামাত্র কন্যা, এবং গণিকা, শাস্ত্রদ্বারা মার্জ্জিতা-বুদ্ধি এই তিন শ্রেণীর স্ত্রীলোকও আছে। তৎকালে গণিকাগণের বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায়—রাজকন্যা ও মহামাত্র কন্যার সহিত একত্র তাহাদের নাম উচ্চারণ করায় অনুমিত হয় যে, সমাজে তাহাদের স্থান খুব নিম্ন-স্তরে অবস্থিত ছিল না। উল্লিখিত অধ্যায়ের ২০শ ও ২১শ শ্লোকে বাৎসায়ন ইহা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। চতুঃষষ্টিকলার বর্ণনা সমাপন করিয়া বাৎস্যায়ন লিখিতেছেন—

"আভিরভ্যুচ্ছ্রিতা বেশ্যা শীলরূপগুণান্বিতা।
লভতে গণিকা শব্দং স্থানং চ জনসংসদি ॥২০
পূজিতা সা সদা রাজ্ঞা গুণবদ্ভিশ্চ সংস্তুতা।
প্রার্থনীয়াভিগম্যা চ লক্ষ্যভূতা চ জায়তে ॥ ২১

অর্থাৎ সুস্বভাবা, সুরূপা ও গুণবতী বেশ্যা এই চতুঃষষ্টিকলায় উৎকর্ষলাভ করিয়া গণিকা আখ্যা প্রাপ্ত হয় এবং লোক-সভায় স্থানপ্রাপ্ত হয়। রাজা তাঁহাকে ভূমি ও গৃহাদি দান করেন, গুণিগণ ইহার 'কলানৈপুণ্য অসাধারণ' এই বলিয়া তাঁহাকে প্রশংসা করেন এবং কলাশিক্ষার্থীগণ তাঁহার নিকট যাইয়া উপদেশ লাভ করেন (জয়মঙ্গলের টীকা দ্রষ্টব্য)।

বাৎস্যায়ন গণিকার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, প্রাচীন নাটকেও তাহার ছায়াপাত দেখিতে পাই। মৃচ্ছকটিক সংস্কৃতে একখানি সুপ্রসিদ্ধ নাটক। সাধারণতঃ সংস্কৃত নাটক রাজান্তঃপুরের কাহিনী অবলম্বনে লিখিত। কিন্তু এই নাটকখানির বিশেষত্ব এই যে, ইহার আখ্যানভাগ সাধারণ লোকের জীবন-যাত্রা লইয়া রচিত। সম্প্রতি মহাকবি ভাস প্রণীত 'চারুদত্ত' নাটক আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রমাণিত হইয়াছে যে এই মূলগ্রন্থই পরবর্ত্তীকালে পরিবর্দ্ধিত হইয়া মৃচ্ছকটিক নাটকে পরিণত হইয়াছে। উভয়েরই আখ্যানভাগ এক এবং উভয়েরই নায়িকা গণিকা বসন্তসেনা এবং নায়ক দরিদ্র চারুদত্ত। চারুদত্ত দরিদ্র হইলেও সর্ব্বগুণের আধার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহাকে বসন্তসেনার প্রণয়ীরূপে অঙ্কিত করায় অনুমিত হয় যে, এই সমুদয় গণিকা তৎকালে সমাজের নিতান্ত নিম্নস্তরে অবস্থিত ছিল না। অন্ততঃ চারুদত্ত ও মৃচ্ছকটিক পাঠ করিলে এই ধারণাই পাঠকের মনে বদ্ধমূল হয়। মহাকবি ভাস দুই একস্থলে ইহাদের প্রকৃত স্বভাব সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছেন। প্রথম দৃশ্যে বিট ও শকার বসন্তসেনার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাকে ভয় ও লোভ প্রদর্শন করায় বসন্তসেনা উত্তর করিল, "আর্য্য! কুলপুত্রজনস্তু-শীলপরিতোষোপজীবিনী গণিকা খল্বহম।"

অন্যত্র সংবাহকের সঙ্গে কথোপকথন কালে বসন্তসেনা বলিলেন, "গণিকা খলু অহম" 'আমি তো গণিকা মাত্র'—তদুত্তরে সংবাহক উত্তর করিল "অভিজনেন ন শীলেন", অর্থাৎ গণিকাকুলে জন্ম বলিয়াই আপনি গণিকা, কিন্তু গণিকার স্বভাব আপনার নহে।

প্রাচীন ভারতবর্ষের এইশ্রেণীর গণিকার সহিত প্রাচীন এথেন্স নগরীর হিটিরী (Hetaerae) সম্প্রদায়ের তুলনা করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে অ্যাস্‌পেসিয়া (Aspasia) এবং থিওদোতি (Theodote) গ্রীক ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়াছেন। এথেন্সের গৌরবময় সাম্রাজ্যের যুগে এই দুই রমণী জন্মলাভ করেন। উক্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, এবং এথেন্সের সর্ব্বপ্রধান রাজনীতিজ্ঞ পেরিক্লিস (Pericles) অ্যাস্‌পেসিয়ার প্রণয়ী ছিলেন। অ্যাসপেসিয়ার বিদ্যাবুদ্ধির অসাধারণ খ্যাতি ছিল এবং এথেন্‌সের খ্যাতি-প্রতিপত্তিশালী যুবা বৃদ্ধ অনেকেই তাহার গৃহে একত্রিত হইতেন, কেহ কেহ নিজের স্ত্রী সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। বিখ্যাত দার্শনিক সক্রেতিস (Socrates) তাঁহার সঙ্গে

যে পেরিক্লিসের অনেক বিখ্যাত বক্তৃতা অ্যাসপেসিয়ারই রচনা। এইরূপে অ্যাসপেসিয়ার গৃহ এথেন্সের সর্ব্ববিধ চর্চ্চার কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কি একবার অ্যাস্পেসিয়ার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত হয় যে তিনি অ্যানাক্সাগোরাসের ন্যায় অভিনব প্রাচীন সংস্কার বিরোধী দার্শনিক মত পোষণ করেন এবং ঐ সমুদয় তথ্য লইয়া বিচার বিতর্ক করেন।

থিওদোতীও বিদুষী মহিলা ছিলেন। সক্রেতিস তাঁহার বন্ধুবর্গ লইয়া ইহার সহিত সাক্ষাৎ ও বিচার বিতর্ক করিতেন; ইহার বিস্তৃত বিবরণ জেনোফন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

গ্রীসদেশে এই সমুদয় হিটিরী বা গণিকাগণের বিদ্যা বুদ্ধি ও প্রতিপত্তি কিরূপ ছিল উল্লিখিত দৃষ্টান্ত হইতে তাহার ধারণা করা যাইতে পারে। অবশ্য সকলেই যে অ্যাস্পেসিয়া বা থিওদোতীর ন্যায় প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এরূপ নহে। বাৎস্যায়নের পূর্ব্বোল্লিখিত বর্ণনা হইতে অনুমিত হয় যে, এদেশেও এক শ্রেণীর গণিকা এইরূপ বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রতিপত্তিশালিনী ছিলেন। বাৎস্যায়ন যে লিখিয়াছেন, বেশ্যাভবনেও গোষ্ঠী সমবায় হইতে পারে, অ্যাস্পেসিয়ার দৃষ্টান্ত স্মরণ করিলে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। আর এইশ্রেণীর গণিকা কেন যে গোষ্ঠীতে উপস্থিত থাকিতেন তাহা টীকাকার জয়মঙ্গল বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "স্ত্রী প্রতিবদ্ধকলা প্রতিপত্ত্যর্থমাসাং গোষ্ঠ্যামন্তর্ভাব" অর্থাৎ যে সমুদয় কলানৈপুণ্য, যেমন নৃত্যগীতাদি কেবল স্ত্রীলোকের দ্বারাই সম্ভবে, তাহার প্রতিপত্তির জন্যই এই সমুদয় গণিকাগণকে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা হইত।

পূর্ব্বে গোষ্ঠী সমবায় সম্বন্ধে বাৎস্যায়নের যে সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছি, অতঃপর তাহারই আলোচনা করা যাউক। বাৎস্যায়ন প্রথমে গোষ্ঠীর এইরূপ বিশেষ অধিবেশনের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গণিকা ভবন, কোন সভ্যের গৃহ, অথবা গোষ্ঠীর সাধারণ সভাগৃহ, এই তিনস্থানেই ইহার অধিবেশন হইতে পারিত। কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে বিদ্যা বুদ্ধি স্বভাব বিত্ত ও বয়সে অনুরূপ ব্যক্তিগণ এইরূপ কোনস্থানে একত্রিত হইয়া যথাযথ আসনে উপবিষ্ট হইতেন—অবশ্য এই সমুদয় উপলক্ষে উক্ত গণিকাগণও উপস্থিত থাকিতেন। ইহাঁদের পরস্পর আলাপ পরিচয় ব্যতীত এই সমুদয় সভার বিশিষ্টতা ছিল দুইটি—কাব্য সমস্যা ও কলা সমস্যা। কাব্যসমস্যা শব্দে কাব্যাদির সমালোচনা ব্যতীত আর একটি জিনিষ বুঝাইত। কোন শ্লোকের একটি মাত্র পদ বলিয়া দিয়া অপর তিনটি পদের যোজনা করিবার নিমিত্ত প্রত্যেককে আহ্বান করা হইত। ছন্দ ও অর্থ বজায় রাখিয়া অপর তিনটি পদের যোজনা করিতে পারিলে এই কাব্যসমস্যার পূরণ হইত। কলা বলিতে গীত, বাদ্য, নৃত্য, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি চতুঃষষ্ঠি কলা বুঝাইত। এই প্রকারে কাব্য ও কলাচর্চ্চা করাই এই সমুদয় বিশেষ অধিবেশনের উদ্দেশ্য ছিল, কারণ সাধারণতঃ গোষ্ঠীতে ক্রীড়াদি আমোদ প্রমোদই হইত—এইরূপ কাব্য বা কলাচর্চ্চা সম্ভবপর হইত না। বিশেষ অধিবেশনে এইরূপ চর্চ্চার অবসানে যাঁহারা কলাবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন, প্রীতিবর্দ্ধনার্থ তাঁহাদিগকে উত্তম বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্য উপহার দেওয়া হইত। গ্রীস দেশেও যেমন হিটিরী মাত্রেই অ্যাস্পেসিয়া বা থিয়োদোতীর তুল্য বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্না ছিল না, ভারতবর্ষেও তেমনি গণিকামাত্রেই দেবদত্তা বা বসন্তসেনার তুল্য ছিল না। যে কারণেই ইহাদিগকে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা হউক, এবং গোষ্ঠীবিশেষের আদর্শ যতই উন্নত হউক, ইহা গোষ্ঠীর নৈতিক অবনতির কারণ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। গণিকাগণের সহিত একত্র হইয়া মদ্যপান ও উদ্যানবিহারের যে বর্ণনা বাৎস্যায়ন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এ বিষয়ে তাহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বৌদ্ধযুগের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এই বিষ ভারতবর্ষের প্রাচীন ক্লাব-জীবনে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল—কারণ ইতিপূর্ব্বে ইহার অস্তিত্বের আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অসম্ভব নহে যে ভারতবর্ষে ইহাই গোষ্ঠী জীবনের ধ্বংসের কারণ।

অতঃপর গোষ্ঠীর অন্যান্য প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা

করা যাউক। গোষ্ঠীতে এমন সকল বিষয়ের আলোচনা হইত যাহা সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে। এবিষয়ে বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন—

"নাত্যন্তং সংস্কৃতেনৈব নাত্যন্তং দেশভাষয়া।
কথাং গোষ্ঠীষু কথয়ংল্লোকে বহুমতোভবেৎ॥"

অর্থাৎ কাব্যকলাদি চর্চ্চার সময়ে বেশী সংস্কৃত-বহুল শব্দ ব্যবহার করিবে না, আবার একেবারে দেশী ভাষাও ব্যবহার করিবে না; যাহারা এই উভয় দিক বাঁচাইয়া সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য ভাষায় কথা বলিতে পারে তাহারাই গোষ্ঠীতে আদৃত হয়।

যে সমুদয় গোষ্ঠী কোন লোক বিশেষ অথবা সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি হিংসা করে, বাৎস্যায়নের মতে সেই সমুদয় গোষ্ঠীতে যোগদান করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যে সমুদয় গোষ্ঠীতে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম কানুন বিধিবদ্ধ নাই, তাহাও পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। বাৎস্যায়নের এইরূপ নির্দ্দেশ দেখিয়া মনে হয় যে তৎকালে গোষ্ঠী-সমূহে আধুনিক ক্লাবের ন্যায় বিধিবদ্ধ নিয়ম প্রণালী প্রচলিত ছিল এবং যাহাতে সমাজের এই প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানগুলি কোনরূপ হিংসাদ্বেষের ক্ষেত্রে পরিণত না হয়, তদ্বিষয়েও সাধারণের দৃষ্টি ছিল। গোষ্ঠীগুলি যে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তির মিলনক্ষেত্র ছিল তাহা বাৎস্যায়নের নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে জানা যায়—

"লোকচিত্তানুবর্ত্তিন্যা ক্রীড়ামাত্রৈক কার্য্যয়া।
গোষ্ঠ্যা সহচরন্ বিদ্বাংল্লোকে সিদ্ধিং নিযচ্ছতি॥"

অর্থাৎ যে সমুদয় গোষ্ঠীতে চিত্তানুরঞ্জিনী ক্রীড়া প্রভৃতি আমোদ প্রমোদ হয়, সেই সমুদয়ে যোগদান করিলে বিদ্বান লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বাৎস্যায়নের মতে এই সমুদয় গোষ্ঠীদ্বারা প্রভূত উপকার সাধিত হয়। ইহারা নৃত্যগীতাদি দ্বারা সাধারণ লোকের চিত্তরঞ্জন করিতে পারে, এবং নানারূপে কর্ম্ম ও দুঃস্থকে সাহায্য করিয়া সাধারণের উপকার করিতে পারে। এই কারণে তিনি গ্রামবাসিদিগকে নগরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া স্বীয় গ্রামে গোষ্ঠী স্থাপন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। যদি গ্রামবাসিগণ ইহাতে স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে নগর-প্রত্যাগত জনৈক গ্রামবাসী উক্ত নগরের গোষ্ঠী ও তাহার ফলাফল বর্ণনা করিয়া গ্রামবাসিগণের মনে ইহার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মাইয়া গ্রামে গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা করিবে।

বাৎস্যায়ন গোষ্ঠীবর্ণনা শেষ করিয়া লিখিয়াছেন, "স্বয়ং গোষ্ঠী প্রবর্ত্তনেপ্যয়মেব বিধিঃ"—অর্থাৎ যদি কেহ স্বয়ং গোষ্ঠী প্রবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলেও উপরোক্ত বিধানগুলি প্রযোজ্য। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, সাধারণ গোষ্ঠী ব্যতীত ব্যক্তিবিশেষও কোন গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে কলিঙ্গরাজ খারবেল ও অন্ধ্ররাজ সাতকর্ণি এইরূপ সমাজ বা গোষ্ঠীর প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সুতরাং লোকে যেমন সাধারণের উপকারের জন্য জলাশয়, বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে, তদ্রূপ রাজা এবং সাধারণ লোকেও সর্ব্বসাধারণের আমোদ প্রমোদের জন্য গোষ্ঠীর প্রবর্ত্তন করিতেন।

বারান্তরে "মানসী"তে 'সমাজ' সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

আত্মজগৎ

ফিরে আয় মন, ফিরে আয় ওরে,
আপনার মাঝে ফিরে আয়—
আর, ঘুরিস্‌নে মিছে বাহিরে।
তোর মাঝে যাহা মিলিবে না, তাহা
জগতে কোথাও নাহি রে।
ভাল-মন্দ'র কত সাদা কালো,
এ প্রাণে বিছানো কত ছায়া আলো,
হৃদয় কাননে, মানস গহনে,
আপনারে দেখ চাহি রে।
বৃথাই, ঘুরিস্‌নে আর বাহিরে।

সত্য করিয়া বল্ দেখি মন,
আপনারে ভুলে ছুটে যাস্,
তোর, কি চাই নূতন কিবা চাই?
স্বর্গে যে তব স্তবগান উঠে,
নরকেও তোর স্থান নাই।
হিমালয় হতে তুই যে উচ্চ,
তৃণ হতে পুনঃ অধিক তুচ্ছ,
কুঞ্চিত প্রাণে, স্বচ্ছ উদার—
আকাশেরও বেশী আছে ঠাঁই,
বল, কি চাই রে তোর কিবা চাই।

যৌবনে কত ফুটে উঠে ফুল,
লুটে সুরভিত লালসা,
পিককুল মুহু কুহরে।
প্রেম নির্ঝরে, মিলন বিরহ
দুটি সখী সুখে বিহরে।
মর্ম্মরময় মর্ম্মচূড়ায়,
জ্যোৎস্না আঁচলে স্বপ্ন ছড়ায়,
মানস-সরসী বাসী অপ্সরী
বসি তোরি ঘুম শিয়রে,
যখন, যৌবনে পিক কুহরে।

দুঃখে রুক্ষ, ধৈর্য্যে উচ্চ—
তোর মত গিরি কোথা রে;
কোথায়, বিপদের বাড়া ঘনজাল;
আঁখি হতে কোথা অফুরান ঝোরা?
ভেবে দেখ মন ক্ষণকাল!
জাহ্নবী-তীরে পূত করুণার,
গোপন হিংসা খুঁজিছে শিকার।
জন্ম-মৃত্যু-গ্রথিত-সূত্রে
দোলে জীবনের বনমাল—
ওরে, ভেবে দেখ মন ক্ষণকাল।

সন্ধ্যা-আকাশ ম্লান হয়ে যায়,
দেখি দেখি তোর পরাণের
ওই, অতি বিচিত্র বরণে।
পূজার কুসুম লালসার শ্বাসে
ঝরে তোরি তরু-চরণে।
তোর যে পুণ্য—তপনের সাথী,
তোরি পাপে ওরে শিহরিছে রাতি,
একি বিচিত্র পথে চলেছিস্,—
জীবন হইতে মরণে,—
কত না, কাঁটাফুল দলি চরণে।

ফিরে আয় মন, ফিরে আয় ওরে,
অন্তর পথে ফিরে আয়,
আর, ঘুরিস্‌নে মিছে বাহিরে।
আপনার চেয়ে সাধনার ধন
জগতে কোথাও নাহি রে।
আলো কি আঁধার, ভাল কি মন্দ,
ছন্দের পাশে বেসুর দ্বন্দ্ব,
অমৃত, গরল,—যা চাবি পাইবি
এ জীবনে অবগাহি রে,—
তাই, ঘুরিস্‌নে আর বাহিরে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

বেদ ও বাইবেলের ধর্ম্ম

ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ধর্ম্ম সকল বেদমূলক। সেইজন্য বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত সকল ধর্ম্মকেই হিন্দুধর্ম্ম বলিতে পারি। সেইরূপ ইহুদী, খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্ম বাইবেল-মূলক। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের মূল বেদে বা বাইবেলে আছে বলিতে আমরা কি বুঝি? আমাদের মনে হয় বেদে যে সৃষ্টিতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, সকল হিন্দুধর্ম্মেই ঐ তত্ত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছে। সেইরূপ বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব ইহুদী,খৃষ্টীয় ও মুসলমান ধর্ম্মে স্বীকৃত হইয়াছে। আমরা মনে করি, সৃষ্টিতত্ত্বের বিভিন্নতা নিমিত্ত বেদ ও বাইবেল মূলক ধর্ম্মে জাতিগত প্রভেদ আসিয়াছে। এই প্রবন্ধে আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

প্রথম বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করা যাক্। যখন এই বিশ্ব উৎপন্ন হয় নাই, সমস্ত দেশ জলময় ছিল, তখন ঈশ্বরের আত্মা জলের উপর ভাসিতেছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেন সৃষ্টি করিব; সেইজন্য আজ্ঞা করিলেন, "আলোক হউক।" অমনি আলোক হইল। আলোক হইবার পূর্ব্বে অন্ধকার ব্যাপিয়া ছিল। ঈশ্বর এক্ষণে আলোক ও অন্ধকারের নামকরণ করিলেন। অন্ধকারকে নাম দিলেন রাত্রি এবং আলোকের নাম রাখিলেন দিবা। ইহার পর তিনি আকাশ নির্ম্মাণ করিলেন; তাহাতে জল দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। আকাশের নাম রাখিলেন হেভ্‌ন্ (Heaven)। বাইবেল গ্রন্থের বর্ণনা হইতে মনে হয়, হেভ্‌ন্‌কে ঈশ্বর আপন হস্তে গড়িলেন; কারণ এখানে আদেশ করিবার কথা নাই।

ইহার পর আজ্ঞা দিলেন, হেভ্‌নের নিম্নস্থ জলরাশি একত্র হউক ও শুষ্কভূমি আবির্ভূত হউক। শুষ্ক ভূমির নাম রাখিলেন পৃথিবী ও জলরাশির নাম রাখিলেন সমুদ্র।

পুনরায় ঈশ্বর আদেশ করিলেন, পৃথিবী বীজযুক্ত তৃণ, গুল্ম উৎপাদন করুক এবং বীজযুক্ত ফলধারী বৃক্ষও উৎপাদন করুক। তাহাই হইল।

তৎপরে তিনি চন্দ্র ও সূর্য্যকে উঠিতে আদেশ করিলেন। তাহাদের মধ্যে একটীকে রাত্রে ও দ্বিতীয়টীকে দিবসে উঠিয়া, রাত্রি ও দিবাকে চিহ্নযুক্ত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। উহাদিগকে ঋতু এবং বৎসরের চিহ্ন হইতেও আদেশ দিলেন। তারকা সকলও সৃষ্টি করিলেন। এই সমস্ত যাহাতে পৃথিবীকে আলোক দিতে পারে সেইজন্য তাহাদিগকে আকাশে রক্ষা করিলেন।

তৎপরে জলসকলকে আদেশ করিলেন যে উহারা জলজ প্রাণী ও উড্ডীয়মান প্রাণী প্রসব করুক। ঐ সকল প্রাণী উৎপন্ন হইলে ঈশ্বর তাহাদিগকে বর প্রদান করিলেন যে তাহারা পুনরায় বহু উৎপাদন করিয়া জল ও পৃথিবী পূর্ণ করুক। তাহাই হইল।

তৎপরে ঈশ্বর পৃথিবীকে আদেশ করিলেন যে পশু, সরীসৃপ প্রভৃতি উৎপাদন করুক। তাহাই হইল। অবশেষে ঈশ্বর বলিলেন, স্বীয় আকার সদৃশ প্রাণী আমি সৃজন করিয়া সকল প্রাণীর উপর আধিপত্য প্রদান করিব। এই বলিয়া মানব নরনারীযুগল সৃজন করিলেন ও তাহাদিগকে বর দিলেন যে তাহারা সন্তান সন্ততি উৎপাদন করিয়া পৃথিবী পূর্ণ করুক এবং সকল প্রাণীর উপর আধিপত্য করুক। এই মনুষ্য সম্প্রদায় কিন্তু কৃষিকার্য্য করিত না। কারণ পরে কৃষক মনুষ্য উৎপত্তির বিবরণ দেখিতে পাই। খৃষ্টীয় প্রভৃতি সম্প্রদায় বাইবেলের এই অংশ অন্যভাবে দেখেন। সেইজন্য তাঁহারা বাইবেলে বর্ণিত দেব জাতির কোন সামঞ্জস্য করিতে সক্ষম হন নাই। যে দেবজাতির উল্লেখ আছে, তাঁহাদের মতে কখন্ তাঁহারা সৃষ্ট হন তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না।

যে উপায়ে ঈশ্বর কৃষক মনুষ্যযুগল উৎপাদন

করিয়াছেন, তাহা বাইবেলে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি মৃত্তিকা দ্বারা মনুষ্যমূর্ত্তি গঠন করিয়া তাহার নাসিকায় ফুৎকার দিয়া তাহাকে প্রাণবান্ করিয়াছিলেন। তাহার নাম রাখিলেন "আদম।" পরে তাহাকে গভীর নিদ্রায় অভিভূত করিয়া, তাহার পঞ্জরের একটী অস্থি বাহির করিয়া লইলেন। ঐ অস্থিদ্বারা একটী স্ত্রী মূর্ত্তি গঠন করিলেন। এই স্ত্রী আদমের পত্নী হইল। আদম আপন পত্নীর নাম রাখিলেন "ইভ।"

আদম ও ইভকে ইডেন নামক দেবস্থানের পূর্ব্বে অবস্থিত একটী উদ্যানে ঈশ্বর নিযুক্ত করিলেন। ঐ উদ্যানে নানা ফলবৃক্ষ ছিল। কতকগুলি বৃক্ষের ফল কৃষক নরনারীর অভোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। একটী বৃক্ষ উদ্যানের মধ্যস্থলে বিদ্যমান ছিল। উহা জ্ঞানবৃক্ষ; ঐ বৃক্ষের ফল খাইলে, এমন কি স্পর্শ করিলে আদম ও ইভ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইবে বলিয়া ঈশ্বর বুঝাইয়া দিলেন। আর একটী বৃক্ষ ছিল—উহার ফল খাইলে লোকে অমর হইতে পারে। ঐ বৃক্ষও উদ্যানে অবস্থিত ছিল। তাহার ফল ভক্ষণ করিতেও উহাদিগকে নিষেধ করিয়াছিলেন।

কৃষক নরনারীর পক্ষে যাহা নিষিদ্ধ ছিল, দেবতাদিগের পক্ষে তাহা ছিল না। বাইবেলে ঈশ্বরের আকৃতি-বিশিষ্ট যে নরনারী প্রথম সৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহারাই দেবজাতির আদিপুরুষ এইরূপ অনুমান করি। কারণ বাইবেলে দেখিতে পাই, দেবপুত্রগণ মনুষ্যের কন্যাকে বিবাহ করিত।

ইহুদীদিগের হেভ্‌ন্ নামক স্থানে দেব-সম্প্রদায়ের বাসস্থান ছিল না। পৃথিবীকে আলোক দিবার জন্যই হেভ্‌নে বা আকাশে চন্দ্র সূর্য্য তারকাগণ স্থাপিত হইয়াছিল। বৃষ্টি পতনের জন্য উহার উপরে জল তোলা ছিল। ইহুদীদিগের মতে পৃথিবীই দেবলোক। হিন্দুগণ যাহাকে ইহলোক বলে, ইহুদীগণ তাহাকেই স্বর্গলোক বলে। অতএব হেভ্‌ন্ শব্দকে স্বর্গ শব্দ দ্বারা অনুবাদ করা উচিত নয়। উহাতে অর্থবিপর্য্যয় সাধিত হয়। পৃথিবীর যে অংশে দেবগণ বাস করিতেন, তাহার নাম ইডেন। দেবগণ জমিতে লাঙ্গল দিবেন না বলিয়া, কৃষক জাতির আবশ্যক হইয়াছিল। সেই জন্য আদম ও ইভকে কৃষক জাতির আদি পুরুষ করিয়া ঈশ্বর সৃজন করিয়াছিলেন।

কৃষকপত্নী ইভকে সর্প আসিয়া বুদ্ধি দিল, জ্ঞান বৃক্ষের ফল খাইলে দেবতাদিগের মত হইবে; ইভ আদমকে সেই কথা বুঝাইয়া দিল এবং দুইজনে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইল। ঈশ্বর তাহা জানিতে পারিয়া তাহাদিগের দণ্ডবিধান করিলেন। সেই সময় হইতে আদম ও তাহার বংশ-ধরগণ মৃত্যুর অধীন হইয়াছে। তাহাদের মাটির দেহ সেই সময় হইতে মাটিতে মিশাইতে লাগিল। পাছে তাহারা অমৃত ফল ভক্ষণ করিয়া অমর হইয়া যায়, সেই জন্য তাহারা ইডেন উদ্যান হইতে বহিস্কৃত হইল। হলচালনা করিবে বলিয়াই মৃত্তিকা হইতে তাহারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এক্ষণে ইডেন উদ্যানের বাহিরে হল চালনা দ্বারা অতিকষ্টে জীবিকা অর্জ্জন করিতে লাগিল।

এই বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, যে বিশ্ব সংসার উৎপন্ন হইল, তাহা ঈশ্বরের আদেশে। অতএব ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তি সৃষ্টির মূলে অবস্থান করিতেছে। কেন তাঁহার সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা হইল? সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবেন এই ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়াই যেন তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি কোন সৃষ্ট পদার্থ তাঁহার আজ্ঞা অবহেলা করে, তখনই তাহাকে দণ্ড সহিতে হইবে। তিনি চাহেন, অপরের ইচ্ছা তাঁহার অধীন থাকে। যদি কেহ বিরোধী হয়, তাহার দণ্ড অবশ্যম্ভাবী। ঈশ্বর মানুষের সহিত একটা চুক্তি করেন। চুক্তি ভঙ্গ দোষে মানুষ দণ্ডনীয় হয়।

ইহুদী বাণিজ্যপ্রধান জাতি বলিয়াই বোধ হয় চুক্তিকে তাহারা প্রাধান্য দিয়াছিল। সেইজন্য ঈশ্বরের সহিত ইহুদী জাতি নানাকালে নানা চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিল বর্ণিত দেখি। উদাহরণ স্বরূপ নোয়ার সহিত, আব্রামের সহিত, মুসার সহিত চুক্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল চুক্তিভঙ্গ দোষে ইহুদী জাতির উপর

ঘোর দণ্ড মাঝে মাঝে নিপতিত হইয়াছে। ঈশ্বরের সহিত এইরূপ সম্পর্ক হওয়াতে ইহুদী জাতির মনে এরূপ ঈশ্বর-ভীতি উৎপন্ন হইয়াছিল যে ভগবানের নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতে তাহারা ইতস্ততঃ করিত; তাহাদের ভয় হইত, পাছে নাম উচ্চারণ-মাত্র প্রাণটি যায়। ইহুদী জাতির যত প্রফেট (বা ঋষি) উদ্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ঈশ্বরের চুক্তির কথাই সকলকে মনে করিয়া দিতেন; এবং তাহা পালন না করিলে জাতির ও দেশের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী বলিয়া প্রচার করিতেন। ইহার উদাহরণেরও অভাব ছিল না। মহম্মদের ধর্ম্মেও এই কথাই প্রচার করে, যে ঈশ্বর তাঁহাকে নবভাবে চুক্তির কথা জানাইয়াছেন। পৃথিবীতে দেবলোক অবস্থিত বলিয়া মানুষের বিচার এক-দিন পৃথিবীতেই হইবে। তখন তাহারা পুনরায় দেহ গ্রহণ করিয়া উত্থিত হইবে। এই মত যে সত্য তাহা খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বিগণ যীশুর পুনরুত্থান ঘটনা দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করাই যীশু চরিত্রের বিশেষত্ব। ইহা ইহুদী ধর্ম্মেরও মূলতত্ত্ব।

এক্ষণে দেখা যাক্ ভারতে বৈদিক ধর্ম্মের মূল কি। আমরা ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে এই মূলের সন্ধান প্রাপ্ত হই। যখন শ্রেষ্ঠ পুরুষ ভোগেচ্ছা ত্যাগ করিয়া অবস্থান করেন, তখনই দৃশ্যমান জগতের প্রলয় হয়। প্রলয় তখনই প্রাপ্ত হয় যখন তাঁহার মনে পুনঃ কামনার উদয় হয়। বেদে প্রলয় অবস্থার এইরূপ বিবরণ দেখিতে পাই। পরমব্যোম পর্য্যন্ত সকল লোকের অস্তিত্ব লোপ পাইয়া গহন গভীর জলে বিশ্ব ছাইয়া গেল। সে জলের কিন্তু কোনরূপ চিহ্ন নাই। অমর ও মর্ত্ত্য কোন জীবের ভিন্ন অস্তিত্ব আর নাই। অদ্বিতীয় পুরুষে জগতের প্রাণ প্রবিষ্ট হইয়াছে। তিনি কিন্তু ভোগেচ্ছা দ্বারা অপ্রাপ্ত ও গূঢ়প্রাণ হইয়া অবস্থান করিতেছেন। বিশ্বের সকল দেশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে। পরম পুরুষ তপস্যায় নিযুক্ত। কত যুগ যুগান্তর এইরূপে গেল কে বলিবে? সূর্য্য চন্দ্রের গতি দিয়া বা কার্য্য পরম্পরা দ্বারা কাল নির্ণীত হইয়া থাকে। কিন্তু চন্দ্র সূর্য্যই বা কোথায়, কার্য্যই বা কে করিবে?

আবার পরম পুরুষের মনে কামনার উদয় হইল। এ কামনা কাহার জন্য? স্বধা তাঁহার ভোগ্যা; উহার সরল অর্থ স্ব (বা আত্মন্) ধারণ-কারিণী। অতএব স্বধাই পুরুষ-রূপী স্ব-এর দেহ। এতকাল আত্মন্ নিজ দেহের উপর বীতরাগ ছিলেন; পুনরায় সকাম হইয়া বিশ্বদেহ প্রাপ্ত হইলেন।

যিনি এক ও অদ্বিতীয়, যিনি মনস্বরূপ, যাঁহার দেহ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; তাঁহার 'একং' অবস্থা হইতে হইতে অমরলোক ও মরলোক-যুক্ত জগৎ দেহ কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাও ঋষিগণ ভিন্ন ভিন্ন সূক্তে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, অসৎ বা কামনা 'একং'-এর মনে উদিত হইলে, তিনি জল সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে গর্ভরূপে অবস্থান করিলেন। ঋষিগণ তাঁহাকে হিরণ্যগর্ভ নাম দিয়াছেন। হিরণ্যগর্ভ হইতে অগ্নি, যজ্ঞপুরুষ ও দক্ষ (বা বিশ্বকর্ম্মা) উৎপন্ন হইয়াছিলেন। বিশ্বকর্ম্মা ঐ অগ্নিতে যজ্ঞপুরুষ দ্বারা যজ্ঞ করিলেন। দ্যাবা পৃথিবী ও ইন্দ্রাদি দেবগণ উদ্ভূত হইলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ যজ্ঞপুরুষকে হবি করিয়া যখন যজ্ঞ করি-লেন, তখন মর্ত্ত্যগণ উৎপন্ন হইলেন। এইরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভগবানের দেহ হইল, ইহার মধ্যে তিনি পরমাত্মন্ রূপে অবস্থিত। তিনিই জগতের প্রাণ। প্রাণবান মাত্রেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া জীবিত। তাঁহার মনে নিষ্কাম ভাবের উদয় হইলে বিশ্বের প্রাণ তাঁহাতে বিলীন হইয়া একত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহাকে আমরা প্রলয় বলি।

উপরি-বর্ণিত সৃষ্টি প্রকরণ হইতে হিন্দুধর্ম্মের বিশে-ষত্ব উপলব্ধ হয়। দেখা গেল ঈশ্বরের দুইটী অবস্থা হইতে পারে। একটীতে তিনি কামনাযুক্ত; অপরটীতে তিনি নিষ্কাম। সকাম ধর্ম্ম ঋগ্বেদের ঋষিদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। নিষ্কাম ধর্ম্ম উপ-নিষদের যুগের ঋষিগণ অধিক প্রচার করেন। মনে

হয় শৈব ও শাক্ত ধর্ম্ম এই কালে প্রচারিত হয়। এই কালে কোন কোন ঋষি কাম্যধর্ম্মের মধ্য দিয়া নিষ্কাম ধর্ম্ম পালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। বৌদ্ধযুগে বুদ্ধদেব কাম্যধর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্তির উপদেশ প্রদান করেন। তাহার প্রধান উপায় সকল কামনা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ।

ভগবদ্‌গীতায় আমরা নিষ্কাম কর্ম্মের যে নব ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হই, তাহাতে শাস্ত্রসম্মত কর্ত্তব্য পালনেই নিষ্কাম কর্ম্ম সাধিত হয়, এই উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মে সকাম পরমেশ্বরের লীলা দর্শন করিবার জন্য নিজেকে জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি দ্বারা প্রস্তুত করাই মনুষ্যজীবনের চরম উদ্দেশ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিশ্বসংসারে অহরহ ভগবানের লীলা ব্যক্ত হইতেছে; সেই জন্য মানব যেমন শৈশব হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত নানা ভাবের আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থ হইতেছে, সেইরূপ মানবজাতি মধ্যে নানা ভাব, জ্ঞান ও রসের বিকাশে মানব সভ্যতার ক্রম-বিকাশ সম্ভব হইয়াছে। হিন্দু চিরকাল এই ভাবে ভগবানকে দেখিয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

বসন্ত-অভিসার

ওরে ফুল ফোটে আজ বসন্ত'র,
সাজে কি লাজ-বসন তোর,
ওই অলক-দামে চিকন্‌কালো কুন্তলে ?
আয় দুল্‌বি কে কে পুন্নাগেরি শাখায় বাঁধা হিন্দোলে।

দোল-দোলনে ঢিলা হয়ে সোহাগ-বেণী যাক্ খুলে,
ঢাকা দিয়ে রাখিস্ নে মুখ, তাকা' তোরা চোখ তুলে'।
মনের কোণে রঙ্ ধরেছে,
আকাশ বাতাস বদলে গেছে,
মল্লী-চাঁপা-যূঁই-বেলাতে দখিন্ হাওয়া যায় বুলে'—
তাকা' তোরা চোখ তুলে।

চৈত্র রাতি, আকুল রতি ফুল-শরে—
ঘর ছেড়ে চল্ তমাল-বীথির পথ ধরে'।
কোন্ পুলিনে নীল-সলিলে—
খেল্‌বি খেলা সবাই মিলে,—
মন্ত্র নিবি বন-বিহারীর মন্তরে।
ও সে বাঁশীর ভাষায় ডাক দিয়েছে নাম ধরে'।
বস্‌বি কে রে মুখোমুখি তার সনে
কাঁটা দিয়ে উঠ্‌বে বুকে প্রাণ-বঁধুয়ার পর্শনে।

মান-ভাঙানোর দিন গেছেরে, কুঙ্কুমে আজ রঙ্ ভাঙা,
জ্যোৎস্নাধারা পিচ্‌কারীতে কর্ রাঙা—
উন্মাদিনী রাইকে নিয়ে
ফাগের রসে দে রাঙিয়ে,
দুলিয়ে শাখা ঝরন্ত ওই ফোটা ফুলের চিক্ টাঙা'।

কি যায় আসে ইমন, কাফি, সিন্ধু বা সফর্দ্দাতে ?
নগ্ন পরাণ ঢাকুক সুরের পর্দ্দাতে।
কপোল চাপি কান্ত হাতে
দিক্ সে চুমা চোখের পাতে,
ঝরুক্ অধর-কমল-মধু আজ রাতে,
চোখোচোখি মন্ মাতে আজ দোল্‌নাতে।

কে বিছালো ফুল-বিছানা আজ ব্রজে ?
কলঙ্ক-ভয় উপেক্ষি' আয়, মনে যদি মন মজে।
করুক্ অশোক কাঞ্চনেতে
কাণাকানি কুঞ্জে যেতে—
ওরে　টুটল রসের কুম্ভ কাহার, বাজ্‌ল চরণ-পঙ্কজে ?

পুষ্পরসের উৎসবেতে নাচ্‌বি তোরা হাত ধরে',
সমের ঘরে ডাক্‌বে কোকিল ঘুম-ঘোরে,
মাঝ-আকাশে হাসে শশী,
তর্ সহে না আয় রূপসি ;
ওলো　আজ্‌কে ঘরের বাইরে কবির কল্প-বাসর মুক্তা ঝরে।

ফল্‌লো পারিজাতের স্বপন, ফুল-মধু দেয় আল্‌পনা,
নূপুর বোলে উন্মনা।
বয় যমুনা রঙ্গিলা, আয় রে প্রাণে প্রাণ মিলা,
রস-মাধুরী সব বিলা
বঁধুর করে, যার আদরে রইবি চিরযৌবনা।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

আত্ম-পরিচয় *

নিজের কথা বলিতে সকলেই ভালবাসে, অথচ কেহ মুখ ফুটিয়া নিজের কথা বলিতে গেলে কেন যে লোকের নাসাগ্র কুঞ্চিত হয় তাহা আমি মোটেই বুঝিতে পারি না। নিজের কথা বলা যত সহজ এমন আর কিছুই নয়; আর নিজের কথা যেমন ভাল লাগে, কই, এমন ত আর কিছু লাগে না। "বদন ছাড়িতে নাহি চায়।" যিনি বড় বড়াই করিয়া বলেন যে তিনি আত্মপ্রশংসা শুনিতে পারেন না, তাঁহার সে বড়াই-টুকু সকল আত্মপ্রশংসা ছাড়াইয়া উঠে। আমি তা বলিয়া আত্মপ্রশংসার আরজি পেশ করিবার জন্য আপনাদের দরবারে উপস্থিত হই নাই। নিজের কথাই নিজে ভাল জানা যায়, কাজেই এই গুণিগণসমাজে অজানা বিষয়ের অবতারণা না করিয়া, দুটা নিজের সুখ দুঃখের কথাই যদি বলি, তবে সাঙ্গতিকেরা (ব্যাকরণ দোষ ঘটিল না ত ?)—তবে সাঙ্গতিকেরা আমায় একটুকু প্রশ্রয় দিবেন কি ?

সভাসমিতির মামুলী নিয়মানুসারে সভাপতি বক্তার পরিচয় দিয়া থাকেন; সঙ্গতে সে নিয়ম রক্ষিত হইতে দেখি নাই। সেই জন্য যদি বক্তা আত্মপরিচয় দিয়া নিজের জন্য একটু স্থান করিয়া লন, তাহা হইলে সেটা দণ্ডবিধির মধ্যে পড়িতে পারে না। অতএব এই বাসন্ত প্রদোষে, সঙ্গতের জমজমায়মান মজলিসে, বৃহৎ ভূমিকা-রূপ দোষ প্রশমন কামনায় সত্বর আত্মপরিচয় প্রদানে বিনিয়োগ করা যাক।

আমি আভাসে আত্মপরিচয় দিব, তত্ত্বজ্ঞ আপনারা সহজেই বুঝিয়া লইতে পারিবেন। আপনারা আমাকে জানেন, সুতরাং আত্মপরিচয়ের প্রয়োজন নাই ভাবিতেছেন ? না, আপনারা আমাকে জানেন না। বিশ্বময় খুঁজিলেও আপনারা আমার দেখা পাইবেন না। প্রহেলিকা নয়, সত্যই আমি বড় দুর্লভ সামগ্রী। আপনারা যাহাকে আমি বলিয়া মহাপ্রমাদে পড়িতেছেন, সে আমি নয়। আপনারা যদি জেদ করেন, শাস্ত্র আপনাদিগকে এখনি চোখ রাঙাইয়া শাসন করিয়া দিবে। আমি এই শরীরটাকে নূতন নূতন কাপড়ের মত বদলাইয়া থাকি। এই দুর্মূল্যের দিনে, যখন কাপড়ের দাম ট্যাক্সিমীটারে ভাড়ার মত বাড়িয়া যাইতেছে, তখন সেটা কম সৌখীনতার কথা নহে। বস্ত্রের মত শরীরটাকে আবার যে বস্ত্রের আবরণ পরাইতে হয়, সে কেবল কুসংস্কার। একদিন সভা করিয়া পৃথিবীশুদ্ধ লোক যদি বস্ত্রকে বিদায় দেয়, তবে সঙ্গতের অধিবেশনে আর আলোর দরকার হইবে না। জলযোগকে নির্ব্বাসন করা হইয়াছে, আর একটা খরচও না হয় কমানো গেল!

আমার বাসস্থানের স্থিরতা নাই। আমি এই ধরাধামেই বাস করি বটে। কিন্তু শুধু আমি যে ভবঘুরে, তা নয়, আমার বাসগৃহ পর্য্যন্ত বিশ্ব-ঘুরে; বৎসরে একবার করিয়া বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য এক্স্‌প্রেসে চড়িয়া সূর্য্যটাকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। বাসগৃহের ত এই দুর্দ্দশা, সর্ব্বদাই ঘুরপাক খাইতেছে। মাথা রাখিবারও যায়গা নাই। সমস্ত মাথাটা ঘেরিয়া রহিয়াছে শূন্য, শুধু শূন্য। এই মহাশূন্যের মধ্যে প্রাণটা বড় ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। পৃথিবীটা ত ত্রিশঙ্কুর মত শূন্যে ঝোলান আছে, তার উপর আবার যত শূন্যের বোঝা আসিয়া ঘাড়ে চাপে। ইহাতে যদি মাথাটা ঘুরিয়া যায়, তবে উত্তম অধম বা মধ্যম নারায়ণে কি করিবে ?

আমার পিতৃপিতামহের পরিচয় দিয়া আপনাদের সময় অপহরণ করিতে চাহি না। লোকে বলে আমি অনাদি। সেটা অসম্ভব মনে হয় না। কারণ বয়সের ত গাছ পাথর বড় দেখা যায় না। তার পর যতদূর

* বিগত ২৬শে ফাল্গুন কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটুট গৃহে সাহিত্য-সঙ্গতের ষোড়শ অধিবেশনে পঠিত।

মনে পড়ে, তাহাতে আমি বরাবরই এমনি ছিলাম বলিয়া বোধ হয়। আমি ছিলাম না এমন একটা অবস্থা চক্ষে দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। আপনারাই বলুন না, কোনও দিন কোনও শনৈশ্চর লগ্নে, মঙ্গলের দশায় 'হঠাৎ বেগে দূতের প্রবেশ' গোছের আবির্ভাব আপনারা স্মরণ করিতে পারেন কি ?

এইত গেল এদিককার কথা। আমার ব্যবসায় সম্বন্ধেও যথেষ্ট গোলযোগ রহিয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে, আমার একমাত্র কার্য্য হইতেছে সুখের পশ্চাতে ঘুরিয়া মরা। প্রজাপতির মত বিশ্বের ফুল বাগানে মধু সংগ্রহ করাই আমার কাজ। এ চাকরীটি কাহার অধীনে, কাহার সুপারিশে পাওয়া গেল, তাহা ঠিক জানি না। একদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখি, চাকরীর সনন্দ উপস্থিত। সেদিন ভারি আনন্দের দিন গিয়াছে। সে দিন—আপনারা বিশ্বাস করুন বা না করুন,—আমার জন্য আকাশ নির্ম্মল হইয়াছিল, মলয় বাতাস মৃদুমন্দ বহিয়াছিল, ফুলের সুবাস আকাশে, বাতাসে গ্রহ-নক্ষত্রে লুটিয়া লইয়াছিল, আর মাতৃস্তনে ক্ষীরধারা ছুটিয়াছিল। সেই হইতে এই চাকরী করিতেছি। গবর্ণমেণ্টের চাকরীর মত এ পাকা, কায়েমী চাকরী। ইচ্ছা করিয়া রিজাইন না দিলে এ সুখের চাকরী যায় না। এ চাকরী ত্যাগ করিলে, তাও বলি—সংসারে আর মন তিষ্ঠে না। বনে যাইতে হয়। পঞ্চাশের পর—ফিফ্‌টিফাইভ্‌ নয়—পঞ্চাশের পর বনে যাইবার অর্থাৎ এ চাকরী হইতে রিটায়ার করিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমরা ক্রমাগত এক্সটেন্সন লইয়া লইয়া চাকরীর সুখ নিঙড়াইয়া বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভুক্তভোগীদিগকে প্রায়ই বলিতে শুনি যে এ চাকরীতে লাভ নাই। ফুলের মধু আহরণ করিতে গিয়া কেবল লাভের মধ্যে কাঁটার খোঁচা খাইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। অনেকে বলে, সুখ মরীচিকা মাত্র, কিন্তু আমি এ সম্বন্ধে আপনাদিগকে প্রকৃত সংবাদ দিতে পারিলাম না। মরুভূমিযাত্রী কোনও ক্যারাভানের নিকট মরীচিকা সম্বন্ধে সঠিক খবর পাওয়া যাইতে পারে। তবে সুখের লালসার তীব্র জ্বালায় হৃদয় যখন শুষ্ক, নীরস তপ্ত বালুরাশির মত হইয়া যায়, তখন মরুসঙ্গিনী মায়াবিনী মরীচিকা দেখা দিবে বিচিত্র নয়।

আমার জ্ঞানের দৌড় আপনারা এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছেন ; হয়ত ইতিমধ্যেই সন্দেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে আমার মস্তিষ্কে কিছু গোল আছে। তা হউক, আপনাদের নিকট যখন আত্ম-পরিচয় দিতে আসিয়াছি, তখন কিছুই গোপন করিব না। আমার এ আত্মচরিত স্বকপোল কল্পিত 'খাঁটি সত্য' নহে, যেহেতু আমি প্রতিভার দাবী করি না এবং সে প্রতিভা কোন কারখানায় কি ছাঁচে কেমন করিয়া প্রস্তুত হইল তাহা দেখাইবার জন্য সার্দ্ধতিন মুদ্রা মূল্যের এক জীবন-চরিত ফাঁদিয়া বসিবার ইচ্ছাও নাই। সত্যকথা বলিতে গেলে, আমার জ্ঞান অতি অল্প। কিংবদন্তী মুরুব্বিয়ানা চালে বলে যে, আমার জ্ঞান নাই। প্রাচীনকালের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, "আমি জানি যে আমি কিছুই জানি না।" কিছুই জানি না অথচ এতবড় কথাটি জানিয়া ফেলিয়াছি, এমন স্পর্দ্ধা আমার নাই। যিনি জ্ঞানের বড় আড়তদার তিনি ও কথা বলিতে পারেন,—লোকে বলিবে, কি বিনয়! বলা বাহুল্য এ পর্য্যন্ত কেহই সক্রেটিসের কথা বিশ্বাস করে নাই। আমার মত লোকে যদি বলে 'কিছুই জানি না', তখনই সকলে বলিবে লোকটা আর কিছু না হউক, সত্যবাদী বটে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর চটি পায়ে দিয়া লাটপ্রাসাদে যাইতেন, শুনা যায়। কিন্তু আমি তদ্রূপ করিলে আমার শ্রবণেন্দ্রিয়যুগল যে অক্ষত রহিবে তাহা বলা যায় না। সুতরাং জাহাজের খবরে আমার প্রয়োজন নাই। আমি সোজাসুজি এইটুকু বুঝি যে গর্ব্ব করিবার মত জ্ঞান আমার নাই। কিন্তু তাহাতে আমার দোষ বেশী নাই—বাল্যকাল হইতেই জ্ঞানোপার্জ্জনের চেষ্টা আছে। কিন্তু অবস্থা প্রতিকূল বলিয়া সুবিধা করিতে পারি নাই। যাহা দেখি, যাহা শুনি, যাহা স্পর্শ করি, সবই আবছায়া আবছায়া। সবই ভাসা

ভাসা জ্ঞান। জিনিষের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহার মর্ম্ম জানিবার কৌতূহল আছে, কিন্তু শক্তি নাই, সুবিধা নাই। বাহিরের জগৎ ত দূরের কথা, নিজেকেও একটু ভাল করিয়া জানিবার সুযোগ এতদিনে করিয়া উঠিতে পারিলাম না। ভিতরে যে মনটা আছে, তাহাকে ত একমুহূর্ত্তও বাড়ীতে পাই না। সে যে দুষ্ট ছেলের মত সারাদিন কোথায় বনবাদাড়ে পাখীর ছানা পাড়িয়া, ফল কুড়াইয়া বেড়ায়, এবং কখন্ সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়ীতে চুপি চুপি আসিয়া ঘুমাইয়া পড়ে, তাহা বুঝিতে পারি না। তাহাকে খুঁজিয়াই পাওয়া ভার। মনটা ভুলিয়া কাহাকেও দিয়া ফেলিয়াছি বা কেহ চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, এমনও সময়ে সময়ে সন্দেহ হয়। বাল্যকাল হইতে মন লইয়া এমনি করিয়া বিব্রত থাকিতে হইয়াছে।

তার পরে এই দেহটা। এও কি ছাই ভাল করিয়া ধরা দেয়! অর্দ্ধেকটা ত পিছন ফিরিয়াই আছে। সেদিকটা সারাজীবন অজানাই রহিয়া গেল! ট্রামের টিকিটের 'পশ্চাদ্ভাগ' দেখিয়াই জীবন কাটিল, নিজের পশ্চাদ্ভাগ দেখিবার অবকাশ ঘটিল না। অধিক কি, যে চক্ষুদ্বারা সকল জিনিষ দেখিবার আশা করি, সে চক্ষু নিজকে দেখিতে পায় না, এমনই অন্ধ! আমার চেহারাটা বোধ হয় নেহাৎ মন্দ না। কিন্তু আমাদের দেশের গবেষণাকারিগণ যেমন নিজের দেশের ও জাতির কথা জানিবার জন্য ঝুলিহস্তে পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মত ধার করিতে বাহির হন, তেমনি আমার নিজের চেহারা সম্বন্ধে জানিতে হইলে আমাকে পরের শরণাগত হইতে হয়। নিজের মুখ নিজে দেখিতে পাই না। আপনারা দেখিয়া যদি বলেন, বাঃ বেশ, মন্দ নয়, তখন একটু হুঁস হয়। প্রতিবিম্ব দেখিয়া কদাচিৎ কখনও একটু আধটু আনন্দ লাভ করা যায় বটে। ইচ্ছা করে যখন কোনও কাজ না থাকে, তখন নিজের মুখখানা ভাল করিয়া দেখি। কম দেখা যায় বলিয়াই হউক, আর যার চেহারা তার কাছে খারাপ হইলেও মন্দ লাগে না বলিয়াই হউক, আয়নায় মুখ দেখিতে আমার কেন, সকলেরই সখ আছে দেখিয়া যেন সাধ মিটে না। "নয়ন না তিরপিত ভেল।" কিন্তু বেশীক্ষণ সে দ্রব্যটি উপভোগ করিতে হইলে, লোকালয় ছাড়িয়া বিজন অরণ্যে বা বিরল গৃহকোণে যাইতে হয়। ভয় হয়, পাছে কেহ দেখে। সমাজের এমনই দুরবস্থা যে মুখখানা যে ভাল করিয়া দুদণ্ড দেখিয়া লইব সে যো নাই। নিজের সহিত পরিচয় লাভ করিবার এত বড় অন্তরায়, ঘোর অবিচার নহে কি? আবার তাও বলি, যদি বিধাতা চক্ষুদুটাকে আঙ্গুলের ডগায় বসাইয়া দিতেন, তাহা হইলে আঙ্গুলগুলি আজ কাল গোঁফে তা দিতে যেমন সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত থাকে, তেমনি হয়ত দিবারাত্র মুখ দেখিতেই বিব্রত থাকিত—সংসার যাত্রা অচল হইয়া পড়িত। মুখ দেখিয়া অনেকের চোখ ফেরে না। ফোটোগ্রাফ তুলিয়া দেখিয়াছি,তাহাতেও মন উঠে না। বস্তুতঃ সত্যকার জীবনে এমন একটা গতি বা চলিষ্ণু ভাব আছে, যাহা তোমার ঐ ক্যামেরা আড় করিয়া ধরিলেই চম্পট দেয়, এবং তার পরে যে ছবি উঠে, সে রামা শ্যামা হরে'র হইলেও হইতে পারে, আমার নয়। একবার আমি ও আমার বন্ধুবর সুরেশ সমাজপতি মহাশয় একত্র ছবি তুলিতে গিয়াছিলাম। সেই সময় সে দোকানে আর একটি ভদ্রলোক তাঁহার ছবি 'ডিলিভারি' লইতে আসিয়াছিলেন। ফিতা খুলিয়া যখন তিনি ছবি বাহির করিয়া দেখিলেন, তখন তিনি ত চটিয়া লাল! তিনি বলিলেন, "এ ছবি ভাল হয় নাই, এ আমি লইব না।" তখন একজন বৃদ্ধ কর্ম্মচারী, চশমাযোড়া নাকের ডগায় নামাইয়া, দুই একবার তীব্র কটাক্ষে সেই বাবুটির দিকে এবং দুই একবার ছবির দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে ছবিগুলি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া বাবুর হাতে দিয়া বলিলেন, "কেন মশায়, কি দোষ হয়েছে?"

বাবু তখনও বিরক্তির সহিত বলিলেন, "এ ছবি কিছুই হয় নাই। অতি বিশ্রী হয়েছে।"

বৃদ্ধ কর্ম্মচারী একটু বিরক্তির সহিত হাসিয়া বলিলেন, "আবার কি হবে? যেমন চেহারা, তেমনই ত হবে।"

বাবুটি বুঝিলেন, তাঁহার চেহারার তারিফ করা হইতেছে না। বেগতিক দেখিয়া তিনি টাকা কয়েকটি গণিয়া দিয়া ছবি লইয়া বিনাবাক্যব্যয়ে সরিয়া পড়িলেন। আমার বোধ হয়, সব ফোটোগ্রাফ সম্বন্ধেই এই কথা বলা যাইতে পারে। আয়নায় দেখিয়া বা ফটো হইতে নিজের যেটুকু জানিতে পারা যায়, সে কেবল বিম্বজ্ঞান। সে ছায়ার উপর নির্ভর করিলে সেই মাংস-লোলুপ কুকুরের অবস্থা পাইতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন আয়নায় চেহারা ভিন্ন ভিন্ন দেখায়; ভিন্ন ভিন্ন ফটোতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ। যে চেনে সে কোনও মতে চিনিতে পারে; আর যে চেনে না, তাহাকে বোঝানো ভার।

এই সকল নানা কারণে আমার জ্ঞান-ভাণ্ডারে দারিদ্র্য ঢুকিয়াছে। কিন্তু তাহাতে আমার দুঃখ নাই। আমি এইটুক সার বুঝিয়া রাখিয়াছি যে, জানিবার বড় কিছু নাই। কিছুই যখন ঠিক মত জানা যায় না, সবই যখন অজ্ঞাত ও অজ্ঞাতব্য, তখন আমার আর ক্ষোভের কারণ কি? আলস্য-পরতন্ত্র বালক সময়ে সময়ে মনে করে যে এম-এ বি-এ পাস করিয়াও যখন চাকরী পাওয়া যায় না, তখন আর পড়াশুনায় দরকার কি? আমিও সেই প্রকার সান্ত্বনা লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত আছি।

জ্ঞানের অনুপাতেই শক্তি—আজকালকার শাস্ত্রে তাই বলে Knowledge is power. আমার জ্ঞান যখন অল্প, তখন শক্তি-সামর্থ্যও যে তদ্রূপ তাহা বলা বাহুল্য। এমনই অসহায় আমি, যে এক মুহূর্ত্তও ধরা হইতে আপনাকে বিচ্যুত করিতে পারি না। শিকল-বাঁধা পাখী যেমন দাঁড় হইতে উড়িয়া উড়িয়া দাঁড়ের উপরেই শেষে আছাড় খাইয়া পড়ে, তেমনই আমার অবস্থা। কল্পনা চলে আকাশে, পা রহে মাটিতে। কাজেই অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। স্বর্গের চিন্তা মনের পটে উজ্জ্বল রঙ ফলাইয়া ছবি আঁকিতে বসে, দেহটা তখন ধূলামাটির মধ্যে গড়াগড়ি খাইয়া খাইয়া ভূত হইয়া উঠে! অক্ষমত আর কাহাকে বলে? দেবতারা একক এবং সকলে মিলিয়াও নাকি একগাছি তৃণ উড়াইতে পারেন নাই, সুতরাং আমার লজ্জার কারণ নাই। তবে যখন দেখি যে আমি শত চেষ্টা করিয়াও আমার নিজের ছায়াটি পর্য্যন্ত উল্লঙ্ঘন করিতে পারি না, তখন মনটা ভারি দমিয়া যায়।

এইবার আমার আর্থিক অবস্থার পরিচয় দিয়া প্রবন্ধ শেষ করি। আমি না বলিলেও আপনারা আমার গতিক দেখিয়া নিশ্চই বুঝিতে পারিবেন যে, আমার আর্থিক অবস্থা সুবিধাজনক নহে। আমার অর্থ নাই, অথচ আমি অর্থী। আর, অর্থের প্রয়োজনই বা কি? আজকাল অর্থ দিলেও জিনিষ পাওয়া যায় না। অর্থের মূল্য দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। হয়ত এমন দিন আসিবে যে অর্থের আর কোনও মূল্যই থাকিবে না। হেমন্তে ঝরা পাতার মত অর্থ হয়ত পায়ের তলায় পড়িয়া থাকিবে, আর আমরা হেলায় তাহা লক্ষ্য না করিয়া চলিয়া যাইব। তবে, আমি ইহা কোন মতেই স্বীকার করিব না যে অর্থ অনর্থের মূল। অর্থের মূল অর্থ, অনর্থের মূল অনর্থ। তিল হইতেই তৈল জন্মে, জল হইতে নহে। শঙ্কর এতবড় নৈয়ায়িক হইয়াও এই সামান্য (অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী) বিরোধ-বিধিটা অমান্য করিলেন ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। সৎ ও অসৎ (Being and non-Being) এক হয় হউক, তাহাও সহ্য করা যায়, কিন্তু এমন ঘরকন্নার জিনিষ অর্থ যে চট্ করিয়া অনর্থ হইয়া দাঁড়াইবে, ইহা অসহনীয়। শঙ্করাচার্য্য চিরকাল রজ্জুতে সর্প ভ্রম করিয়াই গেলেন।

এতক্ষণে আমার পরিচয় পাইলেন কি? যদি না-ও পাইয়া থাকেন, দু'দণ্ড ত একরকমে কাটিয়া গেল বটে।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

বংশীধারী

কে গো তুমি বংশীধারী,
বাজাও বাঁশী কোন্ কূলে ?
হৃদয়-মম উদাস-পারা,
বেড়ায় ঘুরে দিক্ ভুলে।
ধরার বুকে ঋতুর ঘটা
বাঁশীর বুঝি রন্ধ্র ছ'টা!
বাজ্‌ছে বাঁশী বারোমাসই
মোহন তব অঙ্গুলে
কালিন্দীর ঐ কোন কূলে ?

যখন বাঁশী গভীর রাতে
ষড়জ্ সুরে তান পূরে,
রিম্‌ঝিম্-ঝিমি বর্ষা নামে
আকাশ গিরি বন জুড়ে ;
জমাট সুরে সেই আসরে,
কণ্ঠ মেলায় নিখুঁত কোরে
বনের শিখি, আকাশে মেঘ,
জলের ধারে দর্দ্দুরে ;
ঝিল্লি ধরে 'মন্দিরে'।

লীলায় আঙুল নাচিয়ে এনে
পঞ্চমেতে গাও যবে ;—
শরৎ, হিম, আর শিশির বেজে,
ফাগুন বাজে ওই রবে।
কণ্ঠ মেলায় কোকিল নিজে,
ফুলের কলি সরম ত্যজে,
ঝর্ণা ছেড়ে তুষার-গৃহ
ছুট্‌ছে পেতে দুর্ল্লভে,
পঞ্চমেতে গাও যবে।

চৈত্রে ছুঁয়ে ধৈবতেরে,
নিদাঘে গাও নিখাদে ;
চাতক চিলের কণ্ঠে ধ্বনি
ফির্‌ছে কেঁদে বিষাদে।
তীব্র অনুরণন নিয়ে—
রৌদ্র কাঁপে ঝন্‌ঝনিয়ে ;
সুরের ভরে ধরার বাঁশী
ফাটিয়ে তোলো কি সাধে ?
তোমার লীলার বিষাদে।

সপ্তমে আর তোলো না তান
ওগো সুরের সন্ধানী,
'তারা'র সুরে পাছেই ছিঁড়ে
তারায় তারায় বন্ধনই।
ষড়্‌জে পুনঃ নামিয়ে এনে,
উতল কর বাদল গানে ;
সকল সুরের রাখালরাজা
কোন্ বনে তোর রাজধানী ?
—পাইনে খেলার সন্ধানই।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত।

গার্হস্থ্য চিত্র—১

চিত্রকর—শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন।

দুই সতীন (বিংশ শতাব্দীর বগী বিন্দী)

হেমচন্দ্র

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বাল্য-জীবন।

জন্ম। সন ১২৪৫ সালের ৬ই বৈশাখ, ইংরাজী ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল, মঙ্গলবার, কবিবর হেমচন্দ্র হুগলী জিলার অন্তর্গত গুলিটা রাজবল্লভহাটে মাতামহাশ্রমে জন্মগ্রহণ করেন।
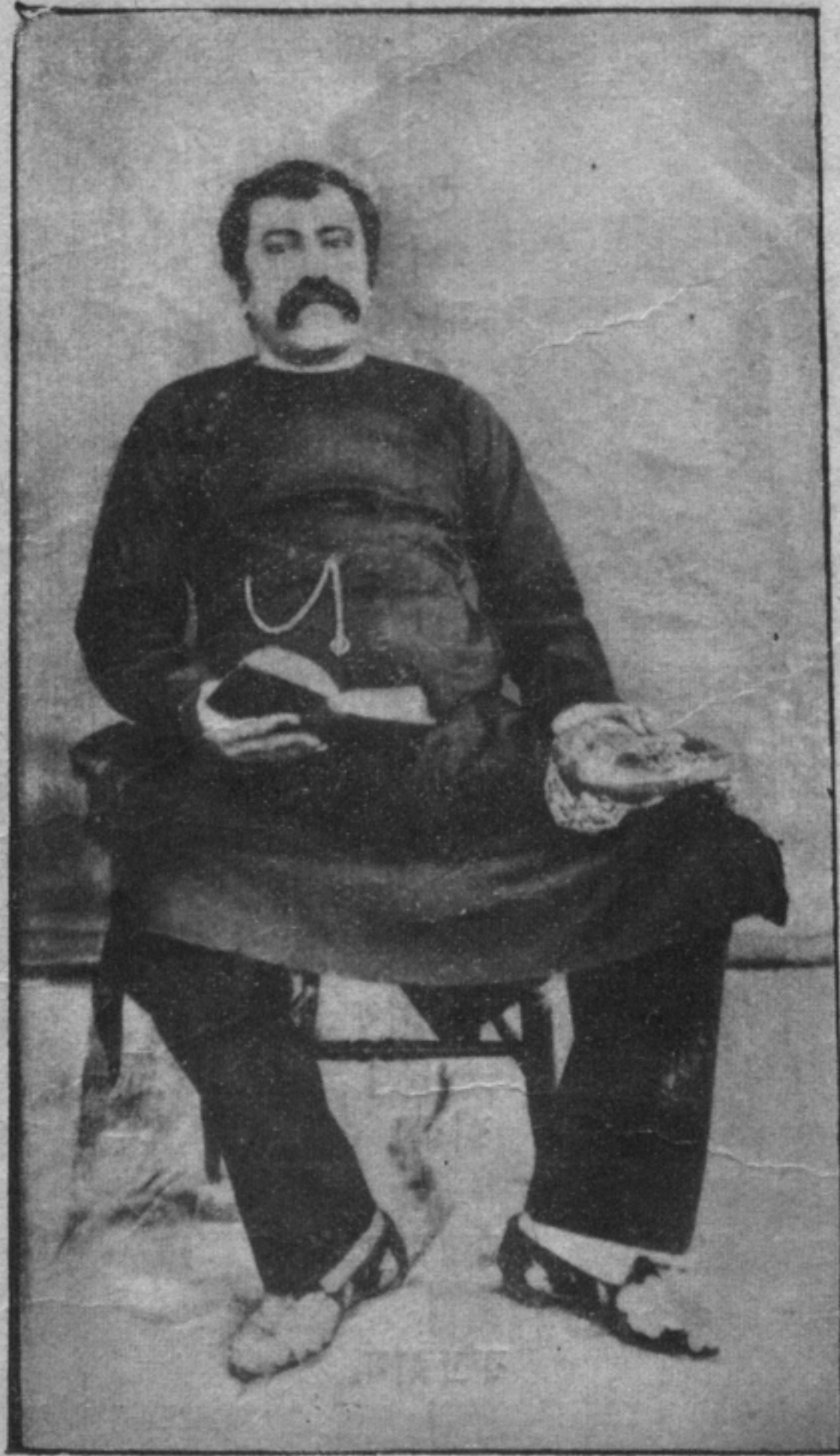
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে বারাণসীতে গৃহীত ফটো হইতে)

বংশবিবরণ। হেমচন্দ্র সমৃদ্ধির ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার পিতা কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। উত্তরপাড়ায় একটি সামান্য পৈত্রিক আবাসভবনের অংশ ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন সম্পত্তি ছিল না। কিন্তু যে বংশে হেমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশ বলিয়া বিখ্যাত ছিল। হেমচন্দ্র, রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তীর 'সন্তান'। প্রসিদ্ধ বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই বংশেই জন্মগ্রহণ করেন এবং রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তীর 'সন্তান' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত বংশলতা হইতে হেমচন্দ্রের আভিজাত্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হইবে।

হেমচন্দ্রের জননী—আনন্দময়ী

হেমচন্দ্রের মাতামহ রাজচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর অবস্থাও যে খুব ভাল ছিল, তাহা নহে। তথাপি হেমচন্দ্রের জননী আনন্দময়ী ব্যতীত রাজচন্দ্রের আর কোন সন্তান না থাকায়, হেমচন্দ্রের পিতা কৈলাসচন্দ্রকে তিনি নিজের গৃহে রাখিয়া ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের পিতারও অন্য কোন অবলম্বন না থাকায় তিনি রাজচন্দ্রের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়াছিলেন।

হেমচন্দ্রের ভ্রাতা—পূর্ণচন্দ্র

ব্রহ্মা
|
অত্রি
|
সাণ্ডিল্য
|
কলিব্যাস
|
বেদব্যাস
|
ক্ষিতীশ
|
ভট্টনারায়ণ
|
বরাহ
|
বৈনতেয়
|
বিবুধেয়
|
সুবুদ্ধি
|
গগ্না
|
জহ্নু
|
শকুনী
|
মহেশ্বর
|
মহাদেব
|
বৈনিতা
|
হরি
|
উদয়
|
মাধব
|
বিষ্ণু
|
পৃথ্বীধর
|
গঙ্গাধর
|
ভগীরথ (ফুলে মেল)
|
শ্রীপতি
|
জগন্নাথ
|
রাঘব
|
জয়রাম
|
রুদ্ররাম
|
অভিরাম
|
রামরাম
|
রত্নেশ্বর
|
গোলক

কীর্ত্তিচন্দ্র | শিবচন্দ্র | কৈলাসচন্দ্র

(কৈলাসচন্দ্র:) হেমচন্দ্র | পূর্ণচন্দ্র | যোগেন্দ্রচন্দ্র | ঈশানচন্দ্র

রাজবল্লভহাটে (রাজবোল্‌হাটে) রাজচন্দ্রের কিছু জমি ছিল, কয়েক ঘর যজমান ছিল এবং কলিকাতার উপকণ্ঠে খিদিরপুর নামক স্থানে তাঁহার একটি সামান্য আবাসভবন ছিল। রাজচন্দ্র খিদিরপুরে থাকিয়া মোক্তারী করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতে এই ক্ষুদ্রপরিবারের কোনমতে ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ হইত।

এক্ষণে খিদিরপুরে পদ্মপুকুরের দক্ষিণপার্শ্বে যে স্থানে হেমচন্দ্রের আবাসভবন অবস্থিত, উহার পূর্ব্বাংশে তাঁহার মাতামহের ক্ষুদ্র একতল বাটীতে হেমচন্দ্রের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়।

হেমচন্দ্রের মাতামহ অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার অবস্থা তেমন সঙ্গতিপন্ন না হইলেও, হেমচন্দ্রের একটি কবিতা পাঠে প্রতীত হয় যে, তিনি প্রতিবৎসর তাঁহার বাটীতে ৺দুর্গাপূজা করিতেন।

হেমচন্দ্রের পিতা কৈলাসচন্দ্র সত্যবাদী ও স্বাধীন প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বিশেষ কোন কাজ কর্ম্ম করিতেন না। রাজচন্দ্রের মৃত্যুর পর, পরিবারের আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল হইলে, কিছুদিন তিনি ঘোড়ার গাড়ীর ব্যবসায় করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের একজন সহপাঠী বলেন যে, হেমচন্দ্র এই সময়ে প্রায়ই তাঁহার পিতার রক্ষিত একখানি গাড়ীতে খিদিরপুর হইতে হিন্দু স্কুলে আসিতেন।

হেমচন্দ্রের জননী আনন্দময়ী অতি সরলা, ধর্ম্ম-শীলা, পতিপরায়ণা ও পরদুঃখ-কাতরা রমণী ছিলেন। ধনীর গৃহ না হইলেও, আনন্দময়ীর সুব্যবস্থায় কোন ভিক্ষুক বা অতিথিকে বিফলমনোরথ হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইতে হইত না। হেমচন্দ্রের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সহিত আনন্দময়ীর দানের পরিমাণও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। হেমচন্দ্র তাঁহার জননীর কোমল হৃদয়, ও দয়াদাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

কৈলাসচন্দ্রের ঔরসে আনন্দময়ীর গর্ভে চারিপুত্র ও দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। চারিপুত্র—হেমচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, যোগেন্দ্রচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্রের মধ্যে হেমচন্দ্রই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন।

পূর্ণচন্দ্র উত্তরকালে ৺বারাণসীধামে বাস করিতেন এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক হইয়াছিলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র অল্পবয়সেই গতায়ু হন। কনিষ্ঠ ঈশানচন্দ্র প্রথমে হুগলী কালেক্টরীতে কার্য্য করিতেন এবং পরে হাইকোর্টে
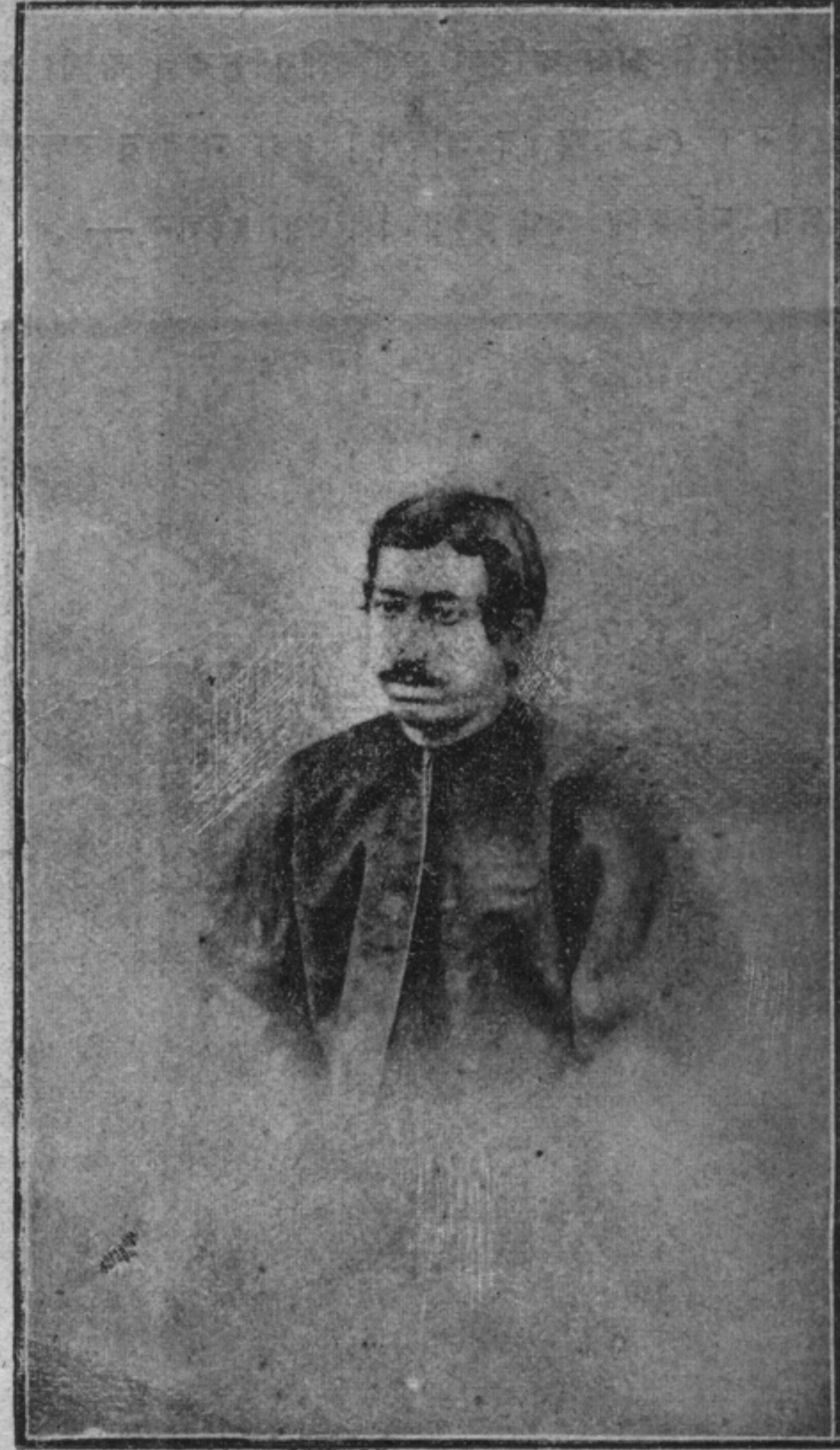
হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা—ঈশানচন্দ্র

একটি কর্ম্ম পাইয়াছিলেন। ইনি একজন সুকবি ছিলেন। ইহাঁর "বাসন্তী" ও "চিত্তমুকুরে" অনেকগুলি সুললিত কবিতা আছে। কিন্তু ইহাঁর রচিত "যোগেশ কাব্য"ই বোধ হয় ইহাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এবং বঙ্গ-সাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন অধিকার করিবে। হেমচন্দ্র অত্যন্ত ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণও তাঁহাকে সমুচিত শ্রদ্ধা করিতেন।

হেমচন্দ্রের দুই সহোদরা বসন্তকালী ও নৃত্যকালীর

মধ্যে কনিষ্ঠা নৃত্যকালীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি অল্পবয়সে বিধবা হন এবং দুইটী মাত্র কন্যা লইয়া পিতৃভবনে প্রত্যাগমন করেন। ইনিই হেমচন্দ্রের গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন। অনেকেই জানেন যে, হেমচন্দ্রের দাম্পত্য-জীবন নিরবচ্ছিন্ন সুখের ছিল না। তাঁহার সহধর্ম্মিণী চিরদিনই স্বল্পবুদ্ধি ছিলেন এবং পরে উন্মাদরোগে আক্রান্তা হন। নৃত্যকালীই সংসারে লক্ষ্মীর ন্যায় বিরাজ করিয়া সুগৃহিণীর সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। হেমচন্দ্র যে আদর্শ বিধবা নারীর ব্রহ্মচর্য্য ও ত্যাগের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া লিখিয়াছিলেন,—

বসন্তকালী ও নৃত্যকালী
(হেমচন্দ্রের ভগিনীদ্বয়)

"হায় রে আমার যদি থাকিত সম্পদ,
মিটাতাম চিরদিন মনের যে সাধ ;
সোণার প্রতিমা গড়ে বিধবা নারীর,
রাখিতাম স্থানে স্থানে ভারতভূমির ;
বিদেশের স্ত্রী পুরুষ এ দেশে আসিত,
পতিব্রতা বলে' তারে নয়নে হেরিত।
লিখিতাম নিম্নদেশে "কি স্বদেশে কি বিদেশে
রমণী এমন আর ধরাতলে নাই রে!"—

সে রমণী যে তাঁহারই সহোদরা নৃত্যকালী এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে।

বাল্যজীবনের স্মৃতি। হেমচন্দ্রের শৈশব গুলিটাগ্রামে মাতামহালয়েই অতিবাহিত হয়। নয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি খিদিরপুরে আনীত হন। শৈশবের দিনগুলি কি মধুর! বার্দ্ধক্যে অন্ধাবস্থায় ভগ্নহৃদয় কবি হেমচন্দ্র শৈশবের সেই সুখময় স্মৃতি হৃদয়ে জাগরূক রাখিয়া তাঁহার অসহ্য দুঃখ যন্ত্রণা ভুলিবার চেষ্টা পাইতেন। তাঁহার শৈশব ও বাল্যজীবনের স্মৃতি তিনি তাঁহার শেষ গ্রন্থ 'চিত্ত-বিকাশে'—'কি সুখের দিন' শীর্ষক কবিতায় স্বয়ং এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন :—

"শৈশব সময় বর্ষ বার তের
বয়ঃক্রম বুঝি হইবে তখন,
জন্মিয়া অবধি এক দিন তরে
জানিনা কখন দুঃখ যে কেমন।

তখন (ও) পূজার্হ মাতামহ মম,
সুমেরুর মত উন্নত শরীর
মাতা পিতা আদি বন্ধু সর্ব্বজন,
সে গিরি আশ্রয়ে আছেন স্থির।

সুখে হাসি খেলি সুখে আসি যাই,
সুখেতে ভাসিয়া করি ভ্রমণ,
সুখপূর্ণ ধরা, শূন্য সুখে ভরা,
সুখেরই প্রবাহ ভাবি জীবন।

আদরে লালিত আদরে পালিত,
মাতাম'র আর ছিল না কেহ,
অগত্যা তাঁহার আমাদের (ই) প্রতি,
ছিল আশৈশব অধিক স্নেহ।

আশায় নির্ভর করিয়া আহ্লাদে
জানাইলে তাঁয় মনের সাধ,
কখন(ও) অপূর্ণ থাকিত না তাহা,
পুরাতেন তিনি করিয়া আহ্লাদ।

বৎসরে বৎসরে শারদীয়া পূজা,
হইত আলয়ে আনন্দ সহ,
কতই আনন্দ পেয়েছি তখন,
মাসাবধি ধরি করি উৎসাহ।

আসিত প্রত্যহ প্রতিমা দেখিতে,
কত দুঃখী প্রাণী প্রফুল্ল মুখে,
নববস্ত্রে সবে নিজে নিজে সাজি,
সাজায়ে বালিকা বালকে সুখে।

সে আনন্দ ছবি তাহাদের মুখে
হেরি কতবার সংশয়ে ভাবি,
কার বেশী শোভা, প্রতিমার কিবা
তাদের প্রফুল্ল মুখের ছবি।

আসে যায় হেন কতই দর্শক,
গ্রাম পল্লীবাসী কতই আসে,
ভিক্ষুক যাচক গীতবাদ্যকর,
অতিথ্ অভ্যাগত কত কি আশে।

ক্রমে গৃহাগত আত্মীয় স্বজন,
কলরবপূর্ণ সদা আলয়,
প্রিয় সম্ভাষণ, মধুর আলাপ,
গৃহের সর্ব্বত্র ধ্বনিত হয়।

সদা হৃষ্টমতি কুটম্ব জ্ঞেয়াতি,
আমোদে প্রমোদে রত সদাই,
সর্ব্ব পরিজন আনন্দে মগন,
নিরানন্দ ভাব কাহার(ও) নাই।

সে আনন্দ মাঝে আমি শিশুমতি,
সদা হেসে খেলে সুখে বেড়াই,
ধনী কি দরিদ্র প্রতিবেশী ঘরে,
আমার প্রবেশ নিষেধ নাই।

সেকালের প্রথা রামায়ণ গান,
অপরাহ্ণে শুনি মোহিত হয়ে,
সমুদ্র লঙ্ঘন পুষ্পকে গমন,
শুনি স্তব্ধ হয়ে বিস্ময়ে ভয়ে।

যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

নিশিতে আবার শুনি যাত্রা গান,
সমস্ত রজনী জাগিয়া থাকি,
শুনি সে আখ্যান না ভুলি কখন,
হৃদয় ফলকে লিখিয়া রাখি।

ষাট বর্ষ আয়ু ফুরাইতে যায়,
সে সুখের দিন কবে গিয়াছে,
আজও সেদিন ভুলেনি হৃদয়,
সে সুখের স্বাদ আজও আছে।

জননীর স্তন ক্ষীরের আস্বাদ,
একবার জিহ্বা জুড়ায় যার
যে জেনেছে বাল্য ক্রীড়ার আহ্লাদ,
জগতে কিছু কি চায় সে আর।”

বিদ্যারম্ভ। রাজবল্লভহাটের গ্রাম্য পাঠশালায় হেমচন্দ্রের বিদ্যারম্ভ হয়। হেমচন্দ্রের তৃতীয় (এবং এক্ষণে একমাত্র জীবিত) পুত্র শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তিনি তাঁহার পিতামহীর মুখে শুনিয়াছিলেন যে অল্প বয়স হইতেই হেমচন্দ্র শান্ত ও ধীরপ্রকৃতি এবং পাঠে মনোযোগী ছিলেন। প্রাতে বস্ত্রপ্রান্তে এক অঞ্জলি মুড়কী লইয়া বালক হেমচন্দ্র কিরূপে পদব্রজে প্রতিদিন সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া পাঠশালায় যাইতেন এবং গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া সময়ে সময়ে ভাঙ্গা জালার পিঠে খড়ি দিয়া অঙ্ক কষিতেন হেমচন্দ্রের জননী তাঁহার পৌত্রগণের নিকট সগৌরবে তাহার বর্ণনা করিতেন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে নয়বৎসর বয়ঃক্রমকালে হেমচন্দ্র খিদিরপুরে আনীত হন এবং স্থানীয় পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন।

প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী

বাল্যবন্ধু। এই স্থানে হেমচন্দ্রের দুইজন অকৃত্রিম বাল্যবন্ধুর বিষয় কিছু না বলিলে তাঁহার বাল্যজীবনের বৃত্তান্ত অসম্পূর্ণ হইবে। হেমচন্দ্রের গৃহের অনতিদূরে, খিদিরপুর পদ্মপুকুরের পূর্ব্বপার্শ্বে প্রসিদ্ধ জমিদার ৺মোহনচাঁদ ঘোষের প্রাসাদোপম অট্টালিকা বিরাজিত আছে। মোহনচাঁদ ঘোষ ১৮০১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বাবলম্বন ও অধ্যবসায়ের বলে সামান্য অবস্থা হইতে বোর্ড অব রেভিনিউয়ের সেরেস্তাদারের পদ অধিকার এবং প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। তাঁহার ভ্রাতা তারাচাঁদও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে নিযুক্ত থাকিয়া অনেক অর্থ সঞ্চয় করেন এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুকালে তাঁহার সঞ্চিত সমস্ত সম্পত্তি ভ্রাতা মোহনচাঁদের পুত্রগণকে দান করিয়া যান। মোহনচাঁদের দুই পুত্র ছিলেন—তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্রীশচন্দ্র, হেমচন্দ্র অপেক্ষা দুই বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ যোগেন্দ্র, হেমচন্দ্র অপেক্ষা কিছু বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। হেমচন্দ্রের মৃত্যুর পর হেমচন্দ্রের পিতার অবস্থা অসচ্ছল হয়। এই সময় মোহনচাঁদ ঘোষ তাঁহার দরিদ্র প্রতিবেশীকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। এই সূত্রে দরিদ্রসন্তান হেমচন্দ্রের সহিত ধনীসন্তান শ্রীশচন্দ্র ও যোগেন্দ্রচন্দ্রের

প্রথম আলাপ হয়। পরে মোহনচাঁদের ভগিনী হেমচন্দ্রের অনুজ পূর্ণচন্দ্রকে "ভিক্ষাপুত্র" গ্রহণ করেন এবং বালকগণের ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধিত হয়। বালকগণের স্বভাব এরূপ মধুর ও কমনীয় ছিল যে, অবস্থার এতদূর পার্থক্য সত্ত্বেও তাঁহাদের মধ্যে যে গভীর বন্ধুত্ব সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা চিরদিন অক্ষুণ্ণ ছিল। শ্রীশচন্দ্র হিন্দু কলেজের একজন প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে উহার বি-এ উপাধি লাভ করেন। কিন্তু কোন বিষয় লইয়া পিতার সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি যৌবনের প্রারম্ভেই আত্মহত্যা করিয়া ইহলীলা সম্বরণ করেন। ইহাঁর বিষয় পরে পুনরায় উল্লেখিত হইবে। যোগেন্দ্রচন্দ্র ১২৪৮ বঙ্গাব্দে ২০শে পৌষে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৩০৮ বঙ্গাব্দে ২২শে ফাল্গুন দিবসে পরলোকগমন করেন। অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ও গভীর বিদ্যানুরাগের জন্য তিনি বাঙ্গালীর বরণীয় ছিলেন এবং বহুদিন স্মরণীয় থাকিবেন। তিনি প্রত্যক্ষবাদী (Positivist) ছিলেন এবং দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার এতাদৃশ প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল যে স্যর হেনরি কটন, ইংলণ্ডের প্রত্যক্ষবাদী ডাক্তার কন্‌গ্রীভ্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাঁহার সহিত দর্শনশাস্ত্রসম্বন্ধীয় আলোচনায় আনন্দ অনুভব করিতেন। 'কলিকাতা রিভিউ' ত্রৈমাসিকে প্রকাশিত যোগেন্দ্রচন্দ্রের একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ ডাক্তার কন্‌গ্রীভ্ বিখ্যাত দার্শনিক হার্ব্বার্ট স্পেন্সারকে দেখাইলে, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হন এবং যোগেন্দ্রচন্দ্রের সহিত পত্রব্যবহারে প্রবৃত্ত হন। স্যর হেনরি তাঁহার Indian and Home Memories নামক গ্রন্থের একস্থানে যোগেন্দ্রচন্দ্রের নাম এইরূপে উল্লেখ করিয়াছেন :—

"And I would not like to omit mention of my dear friend Jogendra Chandra Ghose of Kidderpore, a profound student and philosopher, who took little or no part in public life but deeply impressed by his example and teaching the many friends who cherish his memory and mourn his loss." ইহাঁর মৃত্যুর পর হবর্ণ লণ্ডনের "মানব মন্দিরে" (Church of Humanity, London) স্যর হেনরি কটন যোগেন্দ্রচন্দ্রের একটি স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই মনীষীর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।

ইংরাজী শিক্ষার প্রথম পাঠ। পাঠশালায় সামান্য বাঙ্গালা ও শুভঙ্করী শিক্ষা করিয়া যখন হেমচন্দ্র কৈশোরে পদার্পণ করিলেন, তখন তাঁহার মাতামহ রাজচন্দ্র ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, হেমচন্দ্রের পিতা কৈলাসচন্দ্র বিশেষ কোন কায করিতেন না এবং শ্বশুরের উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া ছিলেন। এক্ষণে পরিবারের আর্থিক অবস্থা নিতান্ত অসচ্ছল হইল। এই সময়ে পরোপকারী পণ্ডিত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, পাঠ্যাবস্থায় অপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া হিন্দুকলেজে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিক্ষাপরিষদের সভাপতি পুণ্যস্মৃতি-ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন এবং শিক্ষাবিভাগের সকল অধ্যাপক প্রসন্নকুমারকে স্নেহ করিতেন। প্রসন্নকুমার পূর্ব্বে খিদিরপুরে বাস করিতেন। হেমচন্দ্রের জননী আনন্দময়ী একদিন প্রসন্নকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার দুঃখ দুর্দ্দশার কথা জ্ঞাপন করিলেন এবং 'সাহেবদিগকে বলিয়া' হেমচন্দ্রের জন্য একটি ১৫।২০ টাকার চাকুরীর চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রসন্নকুমার বালক হেমচন্দ্রের সুগঠিত দেহ ও আয়তলোচনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, তাঁহাকে উত্তমরূপে শিক্ষিত করিতে পরামর্শ দিলেন। হেমচন্দ্রকে ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাইয়া উত্তমরূপে শিক্ষা দিবার সঙ্গতি নাই শুনিয়া প্রসন্নকুমার স্বয়ং হেমচন্দ্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। প্রসন্নকমারের নিকট হেমচন্দ্র ইংরাজী শিক্ষার প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। হেমচন্দ্র অসামান্য অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সহকারে মনীষী প্রসন্নকুমারের নিকট নানা বিষয় অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। প্রসন্নকুমার এই দরিদ্র বালকের কমনীয় স্বভাবে মোহিত হইয়া তাঁহাকে অনুজ সহোদরের ন্যায় স্নেহ করিতেন।

হেমচন্দ্রের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অপূর্ব্ব মেধা ও প্রখর স্মৃতিশক্তি দেখিয়া প্রসন্নকুমারও মুগ্ধ হইলেন। অতি অল্পকালের মধ্যে হেমচন্দ্র পাঠে এত উন্নতি দেখাইলেন যে প্রসন্নকুমার তাঁহাকে উচ্চতর শিক্ষার জন্য হিন্দু কলেজ সংশ্লিষ্ট স্কুলে সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টে একেবারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। বোধ হয় প্রথমে প্রসন্নকুমারই হেমচন্দ্রের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিতেন। হেমচন্দ্রের সতীর্থ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে পরে বোধ হয় হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ মিষ্টার সাটক্লিফ হেমচন্দ্রের বিদ্যানুরাগ ও দারিদ্র্যের কথা অবগত হইয়া দয়াপরবশ হইয়া স্বয়ং তাঁহার স্কুলের বেতন দিতেন।

হেমচন্দ্র বাল্যকালে প্রসন্নকুমারের নিকট যে সাহায্য পাইয়াছিলেন, তাহা কখনও বিস্মৃত হন নাই। "প্রসন্নদাদা"র নিকট তাঁহার অপরিশোধনীয় ঋণের কথা তিনি চিরদিন কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেন এবং প্রসন্নকুমারের অনুজগণকে কেবল ভ্রাতৃসম্বোধন করিতেন এমন নহে, তাঁহাদিগের প্রতি সহোদরবৎ বাৎসল্যভাব প্রদর্শন করিতেন।

হিন্দুকলেজে হেমচন্দ্রের ছাত্রজীবনের বিষয় পর পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

জজ-গিন্নী

(গল্প)

(১)

গোপালনগর, নামে নগর আখ্যা পাইলেও তাহা একটী মধ্যশ্রেণীর গৃহস্থবহুল পল্লীগ্রাম ছাড়া আর কিছুই নয়। ভদ্রগ্রাম,—স্ত্রীলোকগুলি ও পুরুষগুলি সকলেই শান্ত শিষ্ট। পুরুষগুলি প্রাতে নিজের জোৎজমির তদারক করিয়া আসিয়া, স্নানাহারের পর দিবানিদ্রা ও তৎপরে তাস দাবা খেলিয়া, গুড়ুক ফুঁকিয়া, গল্প করিয়া দিন কাটাইয়া দেন। লেখাপড়ার চর্চ্চা, সাপ্তাহিক সংবাদপত্র পাঠ বা শ্রবণেই পর্য্যবসিত। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা ঘর সংসার ছেলে মেয়ে এঁটো সকড়ি ইত্যাদির ভিতরেই অবসর মত লেখাপড়া এবং আধুনিকতার বিশিষ্ট চিহ্ন সেলাই প্রভৃতির চর্চ্চা করিয়া থাকেন। এই অন্তঃসলিলা সামান্য বিদ্যা লইয়াই নবীনা মহলে বেশ একটু গর্ব্বও জন্মিয়াছিল। কলিকাতার বি-এ এম-এ উপাধিধারিণীদের মত না হৌক, তবু তাহারাও যে তুচ্ছ নহে সামান্য নহে, সুবিধা পাইলে যে তাহারাও পাশের তক্‌মা সহজেই কাড়িয়া লইতে পারিত, এ বিষয়ে কাহারও মতভেদ ছিল না।

তরুণী দলের সকলেরই ঘটে অল্প বিস্তর বিদ্যা ছিল, কিন্তু তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিদুষী খ্যাতি পাইয়াছিল চাটুয্যে বাড়ীর বড় বৌ কিরণ। পাড়ার মেয়েদের মধ্যাহ্নিক মিলন সভাটি প্রায় কিরণের ঘরেই বসিত। সেখানে খেলা ধূলা হইতে গল্প গান পড়া সেলাই —সবই আধুনিক হিসাবে চলিত। অন্যান্য মেয়েরা কিরণকে বিদ্যাবুদ্ধির আদর্শ বলিয়াই মনে করিত।

তবে, মতভেদ যে ছিল না এমন নহে। কিরণকে সবাই ভালবাসে, মেয়েরা অধিকাংশই তাহার গুণেও মুগ্ধ, কেবল ও-পাড়ার বনলতা স্বীয় স্বল্পলব্ধ ইংরাজী জ্ঞানের গরিমায় কিরণের প্রাধান্য মানিতে চাহিত না। এজন্য প্রায় গ্রামশুদ্ধ যুবতীদলের সহিত

তাহার বনে না। তরুণীদলের মধ্যে কিরণের যাহারা গোঁড়া,তাহারা এই লইয়া প্রতিনিয়ত রাগারাগি ও বিদ্রূপ করিত; কিন্তু শান্ত স্বভাব কিরণ তাহাতে সুখী হইত না। বনলতাকে কাছে টানিবার বিফল চেষ্টা অনেক দিন অবধি করিয়া, এখন সে হাল ছাড়িয়া দিয়াছে।

এমনি করিয়া মধুর আনন্দের মধ্যেই তাহাদের দিন কাটিতেছিল। কিরণের একাধিপত্যে কোন বাধা ছিল না, এমন কি পুরুষ মহলেও তাহার প্রতিপত্তি বাড়িয়া চলিতেছিল। পুরুষেরা আর কিছু না হউক, ব্রাহ্মণবাড়ীর বধূর রন্ধনের খ্যাতিটা সানন্দে প্রচার করিতেন। স্ত্রীজাতির লেখাপড়া বা জ্ঞানবুদ্ধির প্রয়োজন অনেকেই স্বীকার করেন না; কিন্তু তাহাদের হাতের মিষ্টান্ন বা পলান্নকে অস্বীকার করার বর্ব্বরতা অল্প লোকেরই দেখা যায়। কিরণের প্রশংসা সত্যই অত্যন্ত বাড়িয়াছিল।

এই সময় হঠাৎ একটু গোল বাধিল। কলিকাতার ডাক্তার অবিনাশচন্দ্র রায়, তাঁহার সুন্দরী ও বিদুষী পত্নী নলিনীবালাকে লইয়া প্র্যাকটিস্ কবিবার অভিপ্রায়ে সেই গ্রামে আসিয়া বাসা বাঁধিলেন।

(২)

দেশটায় তখন ভাল ডাক্তার ছিল না, অন্ততঃ অবিনাশ বাবুর মত নয়। দেখিতে দেখিতে তাঁহার পশার ও অর্থ বাড়িয়া চলিল। আরও বিস্তৃত হইল তাঁহার নবীনা পত্নীর প্রশংসা!—লোকে বলে, শুধু ভাল হইলেই বড় হইলেই যশোলাভ ঘটে না, সেই ভালত্ব ও বড়ত্ব ঢাক পিটিয়া জাহির করিবার লোক চাই। এ ক্ষেত্রে ডাক্তার গৃহিণীর ভাগ্য ছিল ভাল। বনলতা এবং অন্যান্য দুই একটি মেয়ে, যাহারা কিরণের উপর 'হাড়ে চটা' ছিল,তাহারা এই নবাগতার সহিত আলাপ করিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল, এবং পাড়ায় পাড়ায় তাহার অজস্র গুণ কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

পূর্ব্বে যাহারা বলিত কিরণদিদির মত অমন লেখা-পড়া, অমন বুদ্ধি আর কারুর হয় না—তাহারা দুই একটি করিয়া নলিনীবালার দিকে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল। কেবল পূর্ব্বমতে অটল রহিল মনোরমা। সে বলিতে লাগিল—"ও যিনিই যা বলুন,—ডাক্তার-বউ আমাদের কিরণদিদির পায়ের নখের যুগ্যিও নয়।" নলিনীর যশোবিস্তার অনেকের সমবেত চেষ্টার ফল হইলেও, সত্যকথা বলিতে গেলে তাহার গুণপণারও অভাব ছিল না।

পাড়ার মেয়েরা কেহ লেখাপড়া, কেহ উলবোনা, কেহ রন্ধনপ্রণালী শিখিতে নলিনীর কাছে যাতায়াত আরম্ভ করিল। অল্পদিনের মধ্যেই নলিনী শুনিল, এই গ্রামে কিরণ-নাম্নী একজন স্ত্রীলোক তাহার স্বল্প-বিদ্যা-বুদ্ধির জন্য এদেশে বিখ্যাত। মৃদু হাসিয়া সে বলিল—"বটে, তা তোমরা আমার কাছে কি শিখ্‌তে এসেছ ভাই? তোমাদের কিরণদিই ত নাকি—"

মেয়েটি গালে হাত দিয়া বলিয়া উঠিল—"ও মা! কিরণ আর তুমি? বলে যে কিসে আর কিসে তুলনা—সেই কথা। তা ভাই, ঐটুকু জানে বলে তার যা দেমাক! কি কর্‌তে যাব তার কাছে?"

স্বর্ণরঞ্জিত কলেবর নড়াইয়া-সরাইয়া বসিতে বসিতে চক্ষুভঙ্গীর সহিত নলিনী বলিল—"দেমাক্? তা পাড়া-গাঁয়ে একটু বিদ্যায় অমন হয়।"

কথাগুলা ক্রমে কিরণের কাণেও পৌঁছিল।—সে উত্তর না দিয়া হাসিতে লাগিল। মনোরমা রাগ করিয়া বলিল—"তোরা সেখানে কেন যাস্?—দেমাক্!—সে মাগীর যেন দেমাক্ নেই!—সেদিন নাইতে যাবার ভঙ্গী দেখে আমার গায়ে যেন জ্বর আসছিল!"

নলিনীর খ্যাতি স্ত্রীমহল ছাড়াইয়া পুরুষদলেও বিস্তার লাভ করিল। তবে সেটা কেবল রন্ধনের খ্যাতি —সজল জিহ্বায় মিষ্টান্নের গুণ-রটনা! কিরণদের মধ্যাহ্নিক সমিতিতে তাহার দেবর, বালক হরিদাস আসিয়া বলিল—"মনোদিদি এইবার আমাদের বৌদির পশার বুঝি যায়;—কাল ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে খাবার গল্প কারু কাছে শুনেছ কি?"

মনোরমা রাগিয়া বলিল—"শুনেছি, তুই চুপ কর,—দিনরাত ডাক্তারগিন্নীর গল্প শুনতে ভাল লাগে না।"

কিরণ বলিল—"কেন ভাল লাগে না ?—তোর কাছে যেমন তার গল্প ভাল লাগে না, তেমনি না বনলতার কাছেও আমার কথা ভাল লাগত না। তাতে রাগতিস্ কেন তখন ?"

সুরবালা বলিল—"সত্যি বল্ত হরি, তার রান্না কি আমাদের চেয়ে এতই ভাল ? তুই ত গেছলি নেমন্তন্ন খেতে।"

"হ্যাঁ, সত্যি না ত কি ?—এমন সুন্দর মাছ-তরকারী, সন্দেশ, তোমরা খাওনি বোধ হয়।"

আর কেহ কিছু বলিল না, নতমুখে যে যার কায করিতে লাগিল। তাহাদের ভাব দেখিয়া কিরণ উচ্চহাস্য করিল।

কিন্তু রাত্রিতে যখন তাহার স্বামী অনন্ত বাবু আসিয়া বলিলেন—"কিরণ, এবার তোমার সত্যি হার হল,—অবিনাশ বাবুর স্ত্রীর মত চমৎকার খাবার তোমরা কেউই তৈরি কর্ত্তে পার না—এটা ঠিক।"—তখন আর কিরণ হাসিতে পারিল না, অলক্ষ্যে তাহার মুখখানি ম্লান হইয়াই গেল।

স্বামী তাহা বুঝেন নাই, আবার হাসির সহিত বলিলেন,—"কেমন, হার বটে কি না ?"

মুহূর্ত্তে আপনাকে সম্বরণ করিয়া কিরণ বলিল—"একশো বার,—সে সহরের মেয়ে, আমরা কি তার কাছে দাঁড়াতে পারি ?"

"তাই বলো !—তুমি মনে কর্ত্তে যে তোমার মত বুঝি—"

"কী !"—সচকিতে কিরণ উঠিয়া বলিল—"কি বল্লে তুমি ?"—বলিয়া, স্বামীকে বিস্ময়বিমূঢ় করিয়া দিয়া, ঝর ঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অনন্ত তাহার পিঠে মৃদু করাঘাত করিতে করিতে, "চট কেন ? রাগের কথা ত বলিনি"—ইত্যাদি নানা চাটুবাক্যে পত্নীর সাময়িক ক্রোধশান্তি করিলেন। এ কার্য্য শেষ হইতে রাত্রি নাকি দুইটা বাজিয়া গিয়াছিল।

পরদিন প্রভাতে স্নানে গিয়া ঘাটে কিরণ শুনিল—কল্যকার সেই ভোজের গল্পই চলিয়াছে। প্রৌঢ়া অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী রাগিয়া অস্থির, তাঁহার নাতি আসিয়া কল্য হইতে তাঁহাকে ক্ষেপাইতেছে—"বুড়ো হয়েছ, কবে ঠুস্ করে মরে যাবে, এই বেলা একদিন ডাক্তারগিন্নীর রান্না খেয়ে নাও।"—অর্থাৎ তোমরা এমন রাঁধিতে পার না, এই কথা !—কিরণকে দেখিয়া ঠাকুরাণী অর্দ্ধ ক্রন্দনের সুরে বলিলেন—"হ্যাঁ বউমা, সে মেয়ে কি রাঁধতে জানে তোমরা শিখে নিতে পার না ? ছোঁড়াদের কথার জ্বালায় আর বাঁচা যায় না।"

একমুখ হাসিয়া কিরণ বলিল—"তাই শিখব খুড়িমা ! দিন কত সবুর কর, ডাক্তার-বৌয়ের মত—"

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে বনলতার বোন স্বর্ণ বলিল—"আমার দিদি তার কাছে শিখছে,—কাল সেও রাঁধতে গেছিল।"

কিরণ বলিল—"সত্যি ?—আমিও শিখব।"

মনোরমা বলিল—"তোমার গলার দড়ি।"

"মানুষের কাছে কায শিখব তাতে দোষ কি রে ? চল্।"—বলিয়া মনোরমাকে লইয়া কিরণ চলিয়া গেল।

ঘাটে সেই কথাই চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে নলিনীর সহিত বনলতা ঘাটে আসিয়া, ভগিনীর মুখে মনোরমার নাক্ তোলা ও কিরণের টেপা হাসির কথা শুনিয়া বলিল—"তা ছাড়া আর কি কর্ব্বে ? মাগীরা গায়ের জ্বালায় নিজেদের গায়ের মাস নিজে ছিঁড়ে খাচ্ছে দেখছিস্ না ! আর মজাটা দেখেছিস স্বর্ণ ? ঐ চাটুর্য্যেদের বড় বৌ কিরণ এমন সময় নাইতে আসে, যে সে সময় নলিনীর কিছুতেই সময় হয় না। ডাক্তারবাবু চা টা খান কি না, অত সকালে ওর সময় হয় না। তা মাগী যদি একদিন একটু থেকে যায় ! নলিনী বল্ছিল, একদিন তোমাদের কিরণের সঙ্গে ভাব করিয়ে দাও না,—তা কিরণের দর্শন পাওয়া কি ওর অদৃষ্টে আছে !"

নলিনীও বলিল—"সত্যিক তাই দেখছি বটে।

কিন্তু এবার মনে করেছি, তাকে একদিন ডেকে বাড়ী নিয়ে যাব, কেমন ভাই ?"

"তোমার বাড়ী সে যাবে ?"

"দেখি ত।"

পল্লীর দরিদ্রা কৃষকরমণীরা এই নবীনার ভাবভঙ্গী, অঙ্গমার্জ্জন প্রভৃতিও আশ্চর্য্যের সহিত দেখিতেছিল। সে জল হইতে উঠিয়া পরিষ্কার তোয়ালেতে চুল মুছিয়া, দাসীর হাত হইতে সুন্দর সেমিজ লইয়া পরিধান করিল।—তাহার উপর, নূতন পাড়ের শাড়ী পরিধানেও যেন কত নূতনত্ব! গৌর দেহে প্রচুর স্বর্ণালঙ্কার, মুখ তুলিয়া সোজাভাবে মৃদুপদক্ষেপ,—সকলই পল্লীরমণীগণের বিস্ময়জনক। সখীসঙ্গে ডাক্তর-গৃহিণী চলিয়া গেলে দাস-গিন্নী বলিলেন—"হ্যাঁ একেই বলে সহরের মেয়ে।"

উমানাথ ভট্টাচার্য্যের ভগিনী কালী পিসিমা ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"তা বটেই ত! সহরের মেয়ে না হলে এমন নির্লজ্জ এমন অহঙ্কারী হয়! মানুষকে মানুষ বলে জ্ঞান নেই! আমি আহ্নিক করছি দেখেও, নামবার সময় জল ছড়িয়ে থড়খড় করে চলে যাওয়া হল!"

(৩)

কিরণের কিরণ নিষ্প্রভ করিয়া নলিনীর গৌরব গ্রামখানিতে যথেষ্ট বিস্তৃতিলাভ করিলেও, সময়ক্রমে তাহার কথা ও অজস্র প্রশংসাবাদ পুরাতন হইয়া আসিতেছিল। বিশেষ গল্প গান সেলাই ইত্যাদির যথেষ্ট প্রলোভন থাকিলেও, তাহার নিয়ত সঙ্গ গ্রামের তরুণীদের আর ভাল লাগিত না। কথায় কথায় নিজের গুণপণা ধনবত্তা জানাইবার প্রয়াস, মৃদু হাসির ভঙ্গীতে পল্লীর দৃশ্য ও মানুষের হেয়তা প্রতিপন্ন করিয়া সমালোচনা—কেহ পছন্দ করিত না।

এমনি করিয়া অল্পে অল্পে স্রোত ফিরিতে লাগিল—প্রতিপত্তিশালিনী নলিনী অল্পে অল্পে গ্রামের নারীদের বিষদৃষ্টিতে পড়িতেছিল।

পূজার ছুটী নিকট, একদিন বনলতা আসিয়া জানাইয়া গেল—"নলিনীর দিদি আসছে তার স্বামী নাকি জেলার জজ।"

দিদি!—নলিনীর দিদি! নলিনী নাকি বলিয়াছে—"আমি বা কি জানি? আমার সরোজিনী দিদির মত লেখাপড়া কলকাতার মেয়েরাও খুব কম জানে।—রাশি রাশি ইংরেজী বই সে পড়ে, বিলেত থেকে তার পড়বার জন্যে বই মাসিকপত্র আসে। আর সেলাই,—সেবারের এগ্‌জিবিশনে তার সেলাই বুনানি দেখে হাইকোর্টের এক জজসাহেবের মেম বলেছিলেন, 'এমন সেলাই আমরাও পারি নে।' আমার তুচ্ছ রান্না খেয়ে তোমরা এত প্রশংসা কর—থাম, দিদি এলে তার হাতের কাশ্মিরী রান্না তোমাদের খাইয়ে দেব। তার স্বামী যখন পেশোয়ারে ছিলেন তখন কাশ্মীরের বামুন তাহাদের পাক করত"— ইত্যাদি।

গ্রামের মেয়েরা নীরবে শুনিয়া যাইতে লাগিল। ডাক্তারবাবুর বৌ—তাঁহার কাছেই ত তাহারা হতগর্ব্ব নতশির, আবার স্বয়ং তিনি যাহার এত গুণগান করেন, না জানি তিনি কেমন? সকলেই চোখ বুজিয়া দিদির গল্প শুনিয়া যাইতেছিল এবং কবে এ আশ্চর্য্যকারিণী রমণীকে দর্শন করিয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিবে, তাহাই ভাবিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল।

আশ্বিনে সোণার রৌদ্র হাসিতেছিল; ধনবানের গৃহে প্রতিমায় সোণার রং আঁকা হইতেছে; কিন্তু এবার তরুণীদের চিত্ত সে স্বর্ণবর্ণে অনুরঞ্জিত হইল না। আগমনসম্ভাবিতা মহিয়সী মহিলার আবির্ভাব কল্পনা তাহাদের মধ্যে অনেক খানি উৎসুক্য সঞ্চার করিলেও, অনেকখানি বিদ্বেষও ঢালিয়া দিয়াছিল।

এতদিন তাহাদের ধারণা ছিল, যে যতই বড় হোক্ না কেন, তাহারাও নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। সহরের বা শিক্ষিতা বলিয়া পরিচিতা নারীবর্গের পাশে দাঁড় করাইয়া দিলে, তাহাদিগকে নিতান্ত বেমানান লাগিবে না।—তাহারা ছোট বটে, কিন্তু একেবারে খুব

ছোট নয়। এখন সহসা এই যে বড়,—ব্রাহ্মিকা অথবা বিলাত ফেরতের স্ত্রী-ভগ্নী-কন্যা নয়, সাধারণ হিন্দু পরিবারের বৌ জাতীয়া নারীই তাহাদের মধ্যে আসিয়া এত বড় হইয়া দাঁড়াইবে, ইহা অসহ্য! ইহা ভাবিলে যে সত্যই কষ্ট হয়! আর সে বড় অন্য কেহ নহে, বনলতাদের দলের চাঁই এবং গরবিনী নলিনীরই দিদি।—তাহারা যে ঐ দিদিকে লইয়া দিনকত গ্রামের মধ্যে খুব বাড়াবাড়ি করিয়া লইবে,—তাহাদের নাম লইয়া খুব হৈ চৈ এবং কিরণের দলেদের উদ্দেশে চোক ঠারাঠারি হাসি তামাসা চলিবে, ছেলেগুলা ক্ষেপাইবে—এ ভাবিয়া কান্না পায় না কি?

কিরণ কিন্তু তেমনিই হাসিত। তাহার হাসিতে প্রথমতঃ মনোরমা বিরক্ত হইল, তাহার পর রাগিয়া ঝগড়া করিল, অবশেষে কিছুতেই না পারিয়া কাঁদিয়া বলিল—"তোমার হাসি পাচ্ছে কেন তাত বুঝছি নে। হিংসে করে বল্‌ছি নে, কিন্তু দিনরাত এই 'ভাল ভাল'—'বড় বড়' শুনে শুনে আমার কাণ ঝালাপালা হয়ে গেছে!"

মনোরমার কান্না দেখিয়া কিরণ যেন চমকিয়া উঠিল। তাহার হাসিমুখে কেমন একটু লজ্জা ও বেদনার আভা দেখা গেল। সে ভাবিতে লাগিল, কেন এ সকল কথা উঠে?—এ ভাল মন্দ বিচার সমালোচনা কেন? আর তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র কিরণকেই বা এমন বিশেষ করিয়া জড়ান কেন?—তুচ্ছ সে, অতি তুচ্ছ! কিন্তু সে তুচ্ছতা লইয়া লোকে আন্দোলন করিতে ভালবাসে কেন? কি দোষে এ বিদ্রূপ সে ভোগ করিতেছে? কিরণ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, পরে ঈষৎ ম্লান হাস্যের সহিত বলিল—"ছিঃ মনো!"

চোখ মুছিয়া মনোরমা বলিল—"ছিঃ ত ছিই—তুমি ত খুব ভাল।"

কিরণ মনোরমার গালে আদরের করস্পর্শ করিয়া বলিল—"চুপ্, চুপ্, পাজি মেয়ে!—তুই শুদ্ধ আমায় জ্বালাস্‌নে ভাই! এই ভাল-মন্দর বিচার শুন্‌তে শুন্‌তে কাণ ঝালাফালা হয়ে গেল।"

মুহূর্ত্তে আপনার বেদনা ভুলিয়া কিরণকে হাসাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিরণের হাসি অভ্যস্ত, দেখিতে দেখিতে দুই সখীতে মিলিয়া আবার আনন্দকে জমাইয়া তুলিল। তখন মনোরমা বলিল—"দ্যাখ কিরুদি, তোকে এত করে বলি যে একবার ডাক্তার-গিন্নীর সঙ্গে আলাপ করে ফেল! সে তোকে জানে না, তাই এত বল্‌তে সাহস করে।"

কিরণ গালে হাত দিয়া শ্লেষহাস্যে বলিল—"ও মা! তাই নাকি? আমার আলাপটা এমন আশ্চর্য্যের জিনিষ না কি? কিন্তু দ্যাখ্, মনু, ডাক্তার গিন্নীর সঙ্গে আলাপের ইচ্ছে না থাক্‌লেও, এই জজ-গিন্নী—মানে ঐ যে নলিনীর দিদি আসছে—তার সঙ্গে আমার আলাপ কর্ত্তে একটু ইচ্ছা হয়।"

"কেন বল্ দেখি?"

মুচ্‌কি হাসিয়া কিরণ বলিল—"কি জানি।"

মনোরমা ভ্রুকুঞ্চিত করিল। একটু ভাবিয়া পরে বলিল—"জানি নে বাবু, তোমার বিট্‌কেল সাধ। ঐ অহঙ্কারী সহরের মেয়েগুলোর নাম শুনলেই আমার গা জ্বালা করে উঠে।—তাদের সঙ্গে আবার আলাপ!"

কিরণ ঈষৎ তীব্রস্বরে বলিল—"সহরের মেয়ে বলিস্ নে ভাই; একজনার দোষে সব সহরকে-সহর খারাপ হবে কেন?—না—সে কথা নয়; আমার মনে হয়,যিনি আসছেন, যদি সত্যই অমনি লেখাপড়া-জানা হন্, তবে বোধ হয়—"

কিরণ হঠাৎ থামিয়া গেল। মনোরমা বলিল—"তা হলে ত আরও মজা! দেখিস্ না তখন—"

এমন সময় কিরণের মনের চিন্তা ও মুখের বাক্যে বাধা দিয়া, একটি বালিকা ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে পাল্কী গাড়ী ঘোড়ায় চড়ে কত লোক এল,—সায়েবী পোষাক পরে ছেলেরা এল!"

উচ্চ হাসিয়া মনোরমা বলিল—"বুঝেছি গো, তোমার ভাবের লোক এসে পড়ল।"

(৪)

জজবাবুর গৃহিণী পল্লীগ্রামে আসিয়া স্ত্রীসমাজে বড় বেশী বিপ্লব না ঘটাইলেও, গ্রামশুদ্ধ সকল স্ত্রীপুরুষকেই আশ্চর্য্য করিয়া তুলিলেন। এমন অদ্ভুত মেয়ে মানুষ তাহারা কল্পনাও করে নাই। তিনি পাল্কী বা গাড়ীতে চড়িয়া আজ পাহাড়, কাল নদী, পরশু বন, ঘুরিয়া ফিরিতেছেন। বিশেষ ভদ্রলোক না থাকিলে মাঠে ঘাটে নামিয়া পড়েন, সন্ধ্যাবেলায় পায়ে হাঁটিয়া শস্যক্ষেত্রের আইলে আইলে বেড়ান।—এমন কি অতবড় লোকের স্ত্রী হইয়াও কিনা সটান্ বাগ্‌দীপাড়া ডোমপাড়ার ঘরে ঘরে বেড়াইয়া তাহাদের সহিত গল্প করিয়া আসেন!—ইহাই বুঝি আধুনিক ইংরাজি শিক্ষিত বাবু-মহলের সৌখীন ফ্যাসান্! সহরে ঘটিয়া উঠে না, চেনা লোকের মধ্যে চক্ষুলজ্জা হয়, তাই এই দূর পল্লীতে আসিয়া কয়দিনের জন্য বিলাতী স্বাধীনতার খেলা খেলাইতেছেন! বৃদ্ধেরা বিরক্ত, যুবকেরা হাসিয়া খুন, আর গৃহিণীদল রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিলেন। কেবল তরুণীরা রাত্রিতে গোপনে স্বামীকে শোনাইয়া জজ-বৌয়ের গল্প করিত। একদিন কোনও যুবতী নাকি রাত্রে আপন স্বামীকে বলিয়াছিল—"কেন, অতবড় জজবাবু তাঁর বুঝি আর মান অপমান জ্ঞান নেই? বৌকে কেমন বেড়াতে দেন! ভালমানুষের কাযই এই,—সবাই তো আর তোমাদের মত নয়। ঘরে বন্ধ হয়ে থাকলেই বুঝি ভারি মান বাড়ে? দ্যাখ, শেখ!'

ফলতঃ তরুণীবর্গ জজবাবুর পত্নী সরোজিনীকে দেখিয়া আনন্দই বোধ করিয়াছিল। ভগিনী নলিনীর ন্যায় তাঁহার অহঙ্কারের লেশমাত্রও নাই, মুখে হাসি ছাড়া ছিল না। শুনিয়া কিরণ বলিল—"কি লো মনো, আমার ভাবের লোকের প্রশংসা শুন্‌ছিস?"

মুখ টিপিয়া হাসিয়া মনোরমা বলিল—"তা ত শুন্‌ছি—কিন্তু তোমার ভাবের কত দূর? শীগ্‌গির যাবে শুন্‌ছি। মাঠ জলা বন বাদাড় যেখানে যা ছিল সব ত

কিরণ বলিল—"ভাব? ভাব ত হয়ে গেছে। তাকে যখন আমার মনে ভাল লেগেছে, তখনি ভাব হয়ে গেছে। ভাব কি আবার কাঁধে চড়ে কর্ত্তে হয়?"

মানোরমা বলিল—"ও বাবা, তাই নাকি? তোমার এমন ভাবও হয় তা ত জানতাম না ভাই! যাক, ভাবের লোককে এ খবরটা দিতে পারলে ভাল হত।

"কোন দরকার নেই। ভাব যদি সত্যি হয়, সে আপনিই টের পাবে।"

মনোরমা হাসিয়া বলিল—"দেখিস, ভাবে যে ডগমগ—ভাব একবারে উথলে পড়ছে!"

শুনিয়া কিরণও হাসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল। বলিল—"খুব রসিকতা হয়ে গেল, না? দেখ্‌-ছিস বেলা কতখানি উঠেছে? নেয়ে এসে তবে ছিষ্টি সারতে হবে,—চল একটা ডুব পেড়ে আসি।"

"তবে তুমি এগোও, আমি খোকার বিছানাগুলো নিয়ে যাচ্চি।"—বলিয়া মনোরমা দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

(৫)

একটা উঁচু জমির উপর দিয়া ঢালুভাবে রাস্তা চলিয়া গিয়াছে, তাহারই পাশে নিম্নভূমিতে শরতের শ্যামল ধান্যক্ষেত্র, অনতিদূরে শুষ্ক বিলের তলায় সামান্য জল ও বিস্তৃত বালি পড়িয়া ছিল। মৃদু বায়ু, প্রভাতের স্নিগ্ধোজ্জ্বল রৌদ্র,—বিলের ধারের কেয়াবনের তীব্র সৌরভ, পল্লী-উপকণ্ঠের বন্য শরৎ-প্রকৃতি সুন্দরী বন্যবালিকার মতই আপনার নির্ম্মল আনন্দে আপনি হাসিয়া আকুল হইতেছিল।

পথ দিয়া নলিনী-সরোজিনীর দল স্নানে চলিয়াছে। নলিনী আপনার সখীদের সহিত গল্প করিতে করিতে চলিয়াছে। কিন্তু সরোজিনীর সে দিকে মন ছিল না;—নিম্নে ধানের ক্ষেতের দিকে চাহিতে চাহিতে, মৃদু হাসির সহিত অতি মৃদু গীতের গুঞ্জন মিশাইয়া সে চলিতেছে, তাই সে অনেকখানি অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছিল।

একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থের তলায় সরোজিনী দাঁড়াইয়াছিল। নলিনীরা নিকটে আসিয়া বলিল—"দাঁড়িয়ে কেন, চল।"

সরোজিনী হাসিয়া বলিল—"আমি ত চল্‌ছিই—তোরাই যে পিছিয়ে পড়লি।"

"তোমার সঙ্গে হেঁটে কে পারবে বল?—সত্যি একটু আস্তে চল ভাই, আমরা তোমার ঢের পেছনে পড়ে যাচ্ছি।"

কথার উত্তর না দিয়া সরোজিনী গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিল, "আগে আগে চল ভাই—আগে আগে চল্।"

"নলিনী হাসিয়া বলিল—তোর জ্বালায় গেলুম দিদি! এই বুঝি গান করবার সময়?—চল্ তুই আগিয়েই চল—তা দাঁড়িয়ে কেন চল্ না।"

"চল্‌ছি। কিন্তু দ্যাখ নলিনি, তোদের গাঁয়ে বেশ একটি জিনিব দেখলাম ভাই।"

"কি দেখলি?"

চলিতে চলিতে সরোজিনী বলিল—"দেখলাম—একটা মানুষ।"—পথের ধারে একটা ছোট শিউলিগাছ-তলায় শিউলি ফুল পড়িয়া ছিল, সেইখানে একবার দাঁড়াইয়া সরোজিনী বলিল—"এইখানে দাঁড়িয়ে ছিল, একটি মেয়েমানুষ—"

"মেয়েমানুষ? তার আর আশ্চর্য্য কি দিদি?"

"কিছুনা, চল্ সে ঘাটে গেছে—তোরা বোধ হয় চিনিস তাকে। চল্।"

ঘাটে তখন বেশী মানুষ ছিল না। দূরে জেলেদের মেয়ে খোনা, কল্‌মী-দল সরাইয়া কাঁকড়া খুঁজিতেছিল,—আর নিকটে নাপিতদের বৌ ও গোয়ালাদের ঠাকুমা-বুড়ী বাসন মাজিতেছিল। আর তাহাদেরই নিকটে দাঁড়াইয়া কিরণ, আজ তাহার বেলা হইল কেন এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছিল। মনোরমা তখনো পৌছায় নাই।

এমন সময় উজ্জ্বল বসনভূষণের ছটায় ঘাট আলো করিয়া সরোজিনীর দল আসিয়া দাঁড়াইল। কিরণ নবাগতাদের দেখিয়া একপাশে সরিয়াছিল—সরোজিনী সে সকল লক্ষ্য না করিয়া তাহার নিকট আসিয়া বলিল—"এই যে! নলিনী, ইনি কে রে? তুমি কাদের বাড়ীর, ভাই?"

কিরণ একটু বিস্মিত হইলেও, তাহার অত্যন্ত হাসি পাইল। নবাগতা যে সেই জজ-গিন্নী তাহা সে চিনিয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ আজ তাঁহাকে তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। আর, এ প্রকার আলাপ! অত্যন্ত পরিচিতের ন্যায়, একেবারে নিকটে আসিয়া এ ছেলেমানুষী ভাবে কথা, হাসি পায় বৈকি! কিন্তু সে যত্নে হাসি চাপিয়া লইল। প্রশ্নকারিণীর প্রতি চাহিয়া বলিল—"আমি? আমি এই চাটুয্যেদের বাড়ীর। আপনি কি প্রকাশ বাবুর—"

মুখের কথা লুফিয়া লইয়া সরোজিনী বলিল—"আজ্ঞে তাই বটে। শ্রীল শ্রীযুক্ত আমি মহাশয়া সেই পরম পূজ্যপাদ মাননীয় অমুকচন্দ্রের বিবাহিতা বনিতাই বটি। কিন্তু ভাই, তুমি আমাকে ও আপনি-আজ্ঞে-গুলো বলো না, আমার ভারি বিরক্ত লাগে বলে রাখছি। আমার নাম সরোজিনী।"

বনলতা নলিনীর কাণে কাণে কি বলিতে লাগিল।

কিরণ সহসা এত কথা—এমন ভাবে এই সব কথা শুনিয়া, কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। এমন সময় নলিনী অগ্রসর হইয়া বলিল—"আপনিই কি কিরণমালা?"

তাহার এই নূতন ভঙ্গী দেখিয়া কিরণের ভয় হইল, এই উদ্ধতা নারী তাহাকে সরোজিনীর সম্মুখেই কোন অপমানজনক কথা বলিবে। ত্বরিতে মুখ ফিরাইয়া বলিল—"হ্যাঁ, আমি—"

বাধা দিয়া সরোজিনী বলিল—"কিরণ? নলিনী, সেই কিরণ নাকি, যার কথা তুই সেদিন বল্‌ছিলি?"

'কিরণ মাথা হেঁট করিল। তাহার নাম ইহারও কাণে প্রবেশ করিয়াছে? তাহা আবার নলিনীরই মুখে! সে ভাবিল, আজ কেন বেলায় ঘাটে আসিলাম? নলিনীর হাতে সোণার চুড়ী ঠিনিঠিনি বাজিতেছে—বনলতা ও তাহার ভগিনীর হাস্যচঞ্চল প্রচুর বাক্যালাপ

শোনা যায়। কিরণ ঘাড় নোয়াইয়া কাপড়গুলি জলে ভিজাইতে লাগিল।

সরোজিনী আপন মনে বলিতেছে—"কিরণ—কিরণ!" —কিরণ মুখ তুলিল।—সরোজিনীর প্রশ্নে কিছু উত্তর দেওয়াই তাহার ইচ্ছা ছিল কিন্তু চাহিয়াই দেখিল, সরোজিনী সরল বিস্ময়ে তাহার প্রতি চাহিয়া আছে।—কি লজ্জা! কিরণের আর উত্তর দেওয়া হইল না।

এমন সময় নলিনী ডাকিল—"দিদি!"

সরোজিনী মুখ ফিরাইয়া বলিল—"রোস্, তোদের কিরণকে আমায় দেখতে দে।"

তাহার কথায় ঘাটে একটা পরিস্ফুট হাস্যধ্বনি উঠিল। উপর হইতে মনোরমার রুষ্ট স্বরে শোনা গেল—"শীগ্‌গির বাড়ী যা কিরুদি—ছোট খুড়ী তোকে ডাক্‌ছেন।"

"এই যাই।"—বলিয়া কিরুণ জলের দিকে নামিতে চায়—সরোজিনী তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"থাম, থাম, কে ছোট খুড়ী ডাক্‌ছেন? এই এক্ষুণি ত এলে। শোন, তোমার সঙ্গে যে আমার কোন কথাই হলনা ভাই—একটু থাক্‌লেই বা!"

প্রচুর বিস্ময় ও কিঞ্চিৎ আনন্দের আবেগে কিরণ বলিল—"না যাইনি ত, ডুবটা দিয়ে নিয়ে যাই।"

সরোজিনী কহিল—"আঃ ডুব দেওয়া ত এক মিনিটে হয়ে যাবে! কিন্তু তুমি—কৈ তুমি ত একদিনও আমার সঙ্গে দেখা করতে—না না ভুল বলছি, পথে ঘাটে তোমায় একদিনও দেখতে পাইনি কেন?"

কিরণ একবার চকিতে নলিনীর প্রতি চাহিল। মৃদুস্বরে বলিল—"আমার সময় কম, তা ছাড়া আপনার মত—"

সরোজিনী বলিল—"না না, অতটা বিনয় টিনয় আমার পোষায় না। যাক্, বল ত এখন, কটার সময় তোমার সঙ্গে আমার দেখা হতে পারে?"

কিরণ কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—"বাড়ী গিয়ে সকলকে জিজ্ঞাসা করে—"

"জিজ্ঞাসা কেন?—তোমাদের খাওয়া দাওয়া চোকে কখন তাই বল না, আমি সেই সময়ই আসবো।"

স্থির হইল, কল্য বেলা একটার সময় সরোজিনী কিরণদের বাড়ী বেড়াইতে আসিবে। কিরণ তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া, "এখন তবে আসি ভাই" বলিয়া চলিয়া গেল।

কিরণ অদৃশ্য হইবামাত্র সরোজিনী বলিল, "এই তোদের কিরণ? এরি তুই নিন্দা করছিলি ভাই?"

রুষ্টস্বরে নলিনী বলিল—"কি জানি ভাই তোমায় কেন ভাল লাগল; আমি ত এ বৌটিকে কোন—"

বাধা দিয়ে বনলতা বলিল, "মিট্‌মিটে ডান্—ওর"

সরোজিনীর উচ্চ হাস্যে তাহারও কথা ডুবিয়া গেল। "ঠিক্ বলেছ বনু ভাই"—বলিয়া সে আপনার ঈষৎ স্থূল গৌরদেহখানি জলে ফেলিয়া দিয়া বলিল—"লাগে বাজি, আয় কে আগে হতে পারে—বনো?"—বনলতা তাহার আবাহন এড়াইতে পারিল না, সাঁতার দিল, কিন্তু নলিনী গেল না।

(৬)

পরদিন আহারের সময় স্বামীর পাতে মাছ ভাজা দিতে দিতে কিরণ বলিল—"একটা সুসংবাদ শোন—প্রকাশ বাবুর বৌ আমাদের বাড়ী আস্‌বেন আজ।"

মাথা না তুলিয়াই অনন্ত উত্তর করিলেন—"সুসংবাদ বটে।"

আহারান্তে পাণ লইতে গিয়া অনন্ত বাবু দেখিলেন, কিরণ দুধ চিনি নারিকেল সুজি প্রভৃতি লইয়া কি করিতেছে। বলিলেন—"খাবার ব্যাপারও আছে নাকি?—তবেই গিয়েছ! তোমাদের ও পুলি পিঠে—"

কিরণ বলিল—"চুপ কর ত! আমি যা জানি তাই ত কর্ব্ব। ভদ্রলোকের মেয়েকে ত শুধু মুখে ফেরান হয় না।"

"তবে মাছ টাছের জোগাড় দেখো—নৈলে প্রকাশ-বাবুর বৌ ছুঁয়েও যাবে না। কাল ডেপুটি বাবুর বাড়ীর

অত সুন্দর সুন্দর খাবার সে নাকি ভাল করে খায়ও নি—তাঁরা বৈষ্ণব, মাছ পাঁঠার ব্যবস্থা ছিল না কি না !"

"জানি জানি,—তুমি যাও ত—আজ আমার ঢের কায আছে।"

"ও বাবা, আজ তাঁর শুভাগমনের সূচনা বুঝি স্বামীকে তাড়ানো দিয়ে সুরু করলে !"—বলিয়া অনন্ত চলিয়া যান। কিরণ ডাক্ দিয়া বলিল—"তুমি যাও, প্রকাশবাবু আর ডাক্তার বাবুকে নিমন্ত্রণ করে এস।"

অনন্ত ফিরিলেন ; বলিলেন—"ছাখ কিরণ—"

কিরণ বলিল—"তা আমি জানি। কিন্তু তাঁরা ত অভদ্র নন যে তোমার নিমন্ত্রণ নেবেন না ! পুরুষ বাদ দিয়ে শুধু মেয়েকে খাওয়ান—আমার ত ভাল বোধ হয় না !"

"তুমি আমায় মাটি করবে কিরণ।"

"করি কর্ব্ব। এমনি কোন সোণা আছ বল ; যাও লক্ষ্মী-টি।"

অনন্ত চলিয়া গেলে কিরণ তিন চারিটী উনান জ্বালিয়া রান্না চড়াইয়া দিল। পাড়ার দুই তিনজন স্ত্রীলোকও তাহার সহকারিণী ছিল। শাশুড়ী হাসিয়া বলিলেন—"আজ বৌমার ঘাড়ে রন্ধনের ভূত চেপেছে—কতকিই রাঁধছিস্ গা ?"—বহির্ব্বাটী হইতে দেবর আসিয়া বলিল—"কি রাঁধছ বৌদিদি, খোস্‌বোতে যে পাড়া ভরে গেল।"

"যাই রাঁধি, তোমায় তা খেতে দেব না তা বলে। তুমি খালি আমার নিন্দে করে বেড়াও !—"

বেলা গড়াইয়া আসিতেছিল, মনোরমা বলিল—"গরজ পড়েছে আস্‌তে তাদের ! তোমার যেমন বুদ্ধি,—দেখো তোমার এই উদ্যোগ আয়োজন নিয়েই তারা কত ঠাট্টা তামাসা কর্ব্বে।"

কিন্তু তাহার মুখের কথা মুখেই থাকিল। সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া সরোজিনী ডাকিল—"একেবারে তোমার রান্নাঘরে গো ! আমায় নেমন্তন্ন করছ কিনা বল—তোমার কর্ত্তা গিয়ে ত খালি পুরুষদেরই ডেকে এলেন—"

নলিনী পশ্চাতে আসিতেছিল,—কিরণ ব্যস্ততার সহিত তাহাদের কাছে গিয়া বলিল—"ওমা, কখন এসে পড়েছেন জান্‌তেও পারিনি !—যদি—"

"জান্‌তে পারলে কি পাদ্য অর্ঘ্য নিয়ে আস্‌তে বুঝি ?—চল তোমার রান্নাঘরে ততক্ষণ বসি, ঢের কুটুম আস্‌বে,—রান্নার পার্ট ত তোমারই ?"

"আমার রান্না হয়ে গেছে, চলুন এ ঘরে বড্ড ধোঁয়া।"

"ধোঁয়ার জন্য কিছু ক্ষতি ছিল না, মোদ্দা তোমাকেও আর এঘরে আস্‌তে দিচ্ছি না তা হলে,—আমি গল্প স্বল্প করতেই এসেছি—বুঝেচ ত ?"

সরোজিনী আগে আগে চলিল—পশ্চাতে নলিনীর হাত ধরিয়া কিরণ তাহাদিগকে দোতালায় আনিয়া বসাইল। ঘরখানি দেখিলেই বোঝা যায় যে ইহা তাহাদের শয়নগৃহ। সরোজিনী কোন দিকে দৃষ্টি না করিয়া, টেবিলের উপর হইতে একখানি মাসিকপত্র লইয়া ছবি দেখিতে বসিল। নলিনী লক্ষ্য করিল যে ঘরখানিতে সজ্জার পরিমাণ প্রচুর না হইলেও পরিচ্ছন্নতার কোন অভাব নাই এবং গৃহকর্ত্রীর রুচিতে কিছুমাত্র 'পাড়াগেঁয়ে' আভাস পাওয়া যায় না।—খোলা জানালা পথে প্রচুর রৌদ্র ও আলোক আসিয়া ঘরের সমস্ত সজ্জাগুলিকে উজ্জল করিয়া তুলিয়াছে। গৃহভিত্তি হইতে শয্যাবস্ত্র মশারী সমস্তই এমন একটি সুন্দর শ্বেত বর্ণের শোভা-দৃশ্য উপস্থিত করিয়াছে যে নলিনীরও মন খানিকটা খুসি হইতেছিল—কিন্তু জোর করিয়া সে এইভাব সরাইয়া দিল।

কিরণ আসিয়া তাহাদের পাণ দিল। নলিনী লইল কিন্তু খাইল না। সরোজিনী প্রাপ্তিমাত্রে মুখে নিক্ষেপ করিয়া বলিল—"এই একটা পাণ ? যাও আমার জন্য ডিবেভরা পাণ আন, আমি বড্ড পাণ খাই।"

কিরণ হাসিয়া বলিল—"আপনার সুমুখেই পাণের ডিবে—"

সঙ্গে সঙ্গেই নলিনী বলিল—"শুধু শুধু কি পড়ছিস দিদি? চশমা নে না,—তোর চোখ খারাপ হবে যে।"

"ঠিক ত।"—বলিয়াই সরোজিনী আপনার কোমরে চশমা খুঁজিতে লাগিল।—"কৈ রে? আনি নি। যাক্" বলিয়া সে কিরণের প্রতি চাহিয়া, পুস্তক পৃষ্ঠার কিনারায় লিখিত একটি মন্তব্যের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিল—"লেখাটি তোমার স্বামীর?"

কিরণ বহিখানির প্রতি চাহিয়া বলিল—"হ্যাঁ"।

সরোজিনীর কোন দিকেই দৃষ্টি ছিল না, সে পাতা উল্‌টাইয়া যাইতেছিল।—কিরণ বলিল—"বই-ই পড়বেন শুধু?"

"না গো না—বই পড়ছি না, এই মন্তব্যগুলি ভারি সুন্দর লাগ্‌ছে তাই দেখছি। আমারও অমনি নোট লেখা বদ্‌অভ্যাস আছে কিনা—এ ঠিক ঠাঁই বিশেষে কথাগুলি বড্ড সুন্দর লাগল।"—বলিয়া সে বহি ফেলিয়া বিছানায় আসিয়া বসিল। ধীরে ধীরে আলাপ অত্যন্ত জমিয়া উঠিল।—তখন সরোজিনী বলিল—"আচ্ছা ভাই, কাল ঘাটে যেতে যেতে শিউলী গাছতলায় তুমি নমস্কার করছিলে কাকে বল দেখি? তোমাদের ও গাছতলাটি কি কোন দেবতার?"

"কখন? ওঃ"—বলিয়া কিরণ একটু হাসিল।

"সেই তখন, সকাল বেলায়। বলনা সত্যি"—সরোজিনীর স্বরে বেশ ঔৎসুক্য।

বনলতা বলিল—"কে সে শিউলীতলায় ত কোন ঠাকুর দেবতা কিছুই নেই।"—

সরোজিনী আবার বলিল—"বলনা ভাই, আমার ভারি শুন্‌তে ইচ্ছে করছে।"

কিরণ মৃদু হাস্যের সহিত বলিল—"ঠাকুরকেই প্রণাম করছিলাম। হঠাৎ মনে হল তাই—"

"তাই, কি?"

ভগিনীর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া নলিনী বলিল—"তাই প্রণাম করলে।—এর আবার কথা কি?—তোর এত খোঁজতালাসও ভাল লাগে ভাই!"

হচ্ছিল তখন—ও ভাই বলনা, কি মনে করে নমস্কার করলে তুমি?"—

কিরণ চুপ করিয়া ছিল, সরোজিনী তাহার মুখের কাছে মুখ আনিয়া আবার বলিল—"বলনা ভাই।"

চমকিয়া সরিয়া কিরণ বলিল—"খুব যা হোক ত আপনি?"

"আমি চিরকালই এমনি, কিন্তু তুমিও কম নও দেখছি! এত করে বল্লাম—তবু!"—কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া সরোজিনী ফিরিয়া বসিল।—তখন কিরণ বলিল—"আমার উপর রাগ কর্‌বেন না যেন।"

"মিথ্যে রাগটাগ আমি জানিনে ভাই—খালি মনে হচ্ছে, এত করে বল্লাম, কিন্তু তুমি শুন্‌লে না!"

কিরণের মুখ চিন্তাকুল, ভ্রূ কুঞ্চিত দেখা গেল। একটু নীরব থাকিয়া, সে ডেস্ক হইতে একখানি সবুজ রঙের বহি বাহির করিয়া, তাহার একটি পৃষ্ঠা খুলিয়া সরোজিনীর হাতে দিল।

"এ কি?—শারদোৎসব? তার পর—তার পর? এই যে,—সেই ত। আমি যা ভেবেছিলাম ঠিক্ তাই!"—দুই হাতে কিরণের হাত ধরিয়া সবলে টানিয়া সরোজিনী বলিতে লাগিল—শ্রীমতী—ওঃ কি ভাই তোমার বরের নাম? যাক্ গে,—এ গানটা তবে তুমিও জান?"—বলিয়া সে গুন্‌গুন্ স্বরে গান ধরিল—

"শিউলি তলার পাশে পাশে
ঝরা ফুলের রাশে রাশে
শিশির ভেজা ঘাসে ঘাসে
তরুণ রাঙা চরণ ফেলে
　　আমার হৃদয় ভুলানো এলে?—

সত্যি তখন যা বাজনা বাজছিল, আর ঐ খোলা মাঠে মধ্যে শিশির ভেজা ঘাসের উপর ঐ ঝরা ফুলের রাশ—প্রণাম কত্তেই ইচ্ছে হয় বটে।—তুমি, তুমি ভাই কিরণ—ঠিক আমারই মত।"

আমি রান্নাঘরটা একবার দেখে আসি।"—বলিয়া সে উঠিয়া গেল।

কিরণ যাইবার অল্পক্ষণ পরে নলিনী বলিল—"সন্ধ্যে হয়ে এল, যাবি কখন দিদি?"

সরোজিনী বলিল—"যাচ্ছি, তাড়াতাড়ি কি? কিরণ ফিরবে কখন, চল ত নিচে যাই।"

মনোরমা বলিয়া উঠিল—"না না, নিচে কি কর্ত্তে যাবেন? কিরুদি এক্ষুণি ফিরবে, বসুন।"

সরোজিনী তাহার প্রতি চাহিয়া বলিল—"তুমি তার বোন নাকি? তোমার নাম কি?"

মনো হাসিয়া মুখ ফিরাইল। তার পর বলিল—"আমার নাম মনোরমা।"

"মনোরমা? বেশ ত—আচ্ছা মনোরমা, তোমার দিদি গানটান গা'ন কখনও?"

"কে, কিরুদি? গায় বৈ কি, সহজে গায় না; আপনি জেদ করে শুনে নেবেন—খাসা গলা তার।"

সরোজিনী হাসিয়া বলিল—"বটে? সহজে গাওয়া হয় না আবার!"

"না, সে নিজের কথা কাউকে বল্‌তে চায় না। এই দেখুন না, ঐ যে লেখাটা আপনি খুব ভাল বল্লেন, ও ওর বরের লেখা নয়, কিরণদিদির নিজের।"

এমন সময় বনলতা বলিল—"একশবার দিদি দিদি কচ্ছ কি—কিরণ ত তোমার দিদি নয় মনো!"

মনোরমা বলিল—"কেন, দিদি নয় কেন? আমার প্রভাদিদির সঙ্গে যে কিরুদি সই পাতিয়েছে, তাই ত ওকে দিদি বলি।"

তখন সন্ধ্যা, নীচে শাঁখ বাজিয়া থামিল। অন্ধকারে আর অক্ষর চেনা যায় না—বই খানা ফেলিয়া সরোজিনী বলিল—"কৈ কিরণ?"

মনোরমা বলিল—"চুলোয় গেছে! গেছে ত আর আসবার নাম নেই।"

বনলতা বলিল—"কথাটা সত্যি, এমন বড়লোকের মেয়ে কার বাড়ী আসে? তাঁদের ফেলে"—

তখন ঘাড় তুলিয়া নলিনী বলিল—"সেটুকু ত দিদি বোঝে না, যেচে লোকের বাড়ী গিয়ে—। থাক বসে একলা!"

সরোজিনী কিছু উত্তর দিল না। তাহার মুখে ঘৃণার ভাব দেখা যাইতেছিল। এমন সময় প্রদীপ ও ধূপ লইয়া কিরণ সেইখানে আসিয়া বলিল—"গরীবের বাড়ী আসার কি ঝকমারি দেখছেন? নীচে গিয়ে কি রাজ্যের কাযের বায়না এল! মনো, যা ত ভাই লণ্ঠনটা নিয়ে আয় ত, ঘর আঁধার হয়ে গেছে।"

নলিনী এতক্ষণ চুপি চুপি বনলতার সহিত ফিস্ ফিস্ করিতেছিল, এইবার বলিল—"আমায় বাড়ী যেতে হবে শীগ্‌গির, পাল্কী ডেকে দিতে পারেন?"

কথাটা কিরণকে লক্ষ্য করিয়া, কিন্তু উত্তরে সরোজিনী বলিল—"কেন নলিন্ এত তাড়াতাড়ি কচ্ছিস্ ভাই? একটু গানটান হবে না?"

"না দিদি, খুকীর অসুখ দেখে এসেছি, শীগ্‌গির না গেলে আমার চল্‌বে না।"

খুকীর জ্বর আর নাই, তাহা দেখিয়াই তাঁহারা আসিয়াছেন,তথাপি নলিনীর জেদ দেখিয়া, অনিচ্ছাসত্ত্বেও সরোজিনী বলিল—"তবে চল।"

কিরণ তখন জলখাবারের কথা তুলিল। সরোজিনী হাসিল। নলিনী বলিল—"জলখাবারের দরকার ছিল না, কিন্তু শুনেছি আপনি নাকি এ গাঁয়ের খুব ভাল রাঁধুনী, আপনার হাতের খাবার খেতে সাধ হচ্চে, কিন্তু পুরুষদের আগে—"

সরোজিনী হাসিয়া বলিল—"রক্ষে কর বোন্! ওঁর দাবা খেলা ভাঙ্গতে সেই এগারোটা হবে, ততক্ষণ—ততক্ষণ জলখাওয়ার ভর্সা যদি—"

সকলেই হাসিয়া কথাটা চাপা দিয়া ফেলিয়া দিল। নলিনীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া কিরণ বলিল,—"আসুন।"

(৭)

নীচে পূর্ব্বদিকের বারান্দায় আহারের স্থান। ত্রয়োদশীর চাঁদের জ্যোৎস্না থামের সারির মাঝে মাঝে আলোর আসন মেলিয়া দিয়াছিল,তাহারই মাঝে কয়খানি

অতি সুদৃশ্য উলের আসন—তাহার পাতলা নীল-রঙের লেসগুলি চারিপাশে অনেক দূর অবধি লুটাইয়া ছিল। সম্মুখে ছোট বড় থালাবাটীর বিস্তৃত আয়োজন দেখিয়াই সরোজিনী বলিল—"বটে, এই বুঝি জল-খাবার? আচ্ছা।"

নলিনী বিনাবাক্যব্যয়ে আসনে গিয়া বসিল। কিরণ বলিল—"বনু, মনু তোরাও বসনা ভাই!" সকলেই বসিল, কিরণ পরিবেষণ করিতে লাগিল।

খাইতে খাইতে সরোজিনী বলিল—"ওগো এসব কি রেঁধেছ? ভারি নূতন নূতন ঠেকছে, এ জিনিসটা কি বল দেখি?"

কিরণ বলিল—"ওটা? ওটা ত মাছ, ভাই।"

"মাছ তা বুঝেচি, কিন্তু কি করে রাঁধলে? তরকারীটা কি? আরে গেল যা, কিরণ! এই মাছটাও তোমার ভারি সুন্দর লাগল যে—এ রান্না কে শেখালে তোমায় বল দেখি?"

কিরণ একটু হাসিল। বলিল—"হ্যাঁ, যাঁর কাছে শিখেছি তাঁর নাম বল্‌বার যোগ্য বটে।—শুনি যে আপনি মাংস বড় ভালবাসেন, তাই—"

কিরণের অর্দ্ধোক্তির পরই সরোজিনী বলিল—"কথাটা মিথ্যা নয়। মাছ মাংসটা আমার ভারি প্রিয় বটে। আর তার জন্যে লোকের কথাও সহ্য করতে হয় ঢের। কালকের ব্যাপার শোন না—তোমাদের এখানের ডেপুটী বাবুরা যে বিষ্ণুভক্ত তা ত আমি জান্‌তাম না; তাই বলেছিলাম, 'আপনারা মাছ খান না?' এই ভাই তাঁর পরিবারের যা কথা!—আমার নাম ধরে নয়, কিন্তু যারা মাছ পাঁঠা খায় তাদের উদ্দেশে—সে আর কি বল্‌ব তোমায়, স্পষ্ট চামার পর্য্যন্ত বলে বস্‌ল!"

সরোজিনী আর একটা পাত্রের খাদ্য মুখে দিয়াছিল। খাইতে খাইতে বলিয়া উঠিল—"এটা আবার কী রেঁধেছ?—হুবহু বিলাতী খানার মত?"

কিরণ হাসিয়া ফেলিল,—"সত্যি ওটা বিলিতিই

"নাম? নাম ধামও আছে বুঝি? কিন্তু যা হোক ভাই, এমন রান্না বোধ হয় কখনও খাইনি। লোকে ঠাট্টা করে তোমায় যা বলে, তাতে তুমি রেগো না,—তুমি সত্যি তাই।"

কথা বলিয়াই সরোজিনী কিছু অপ্রস্তুত হইল, নলিনীর মুখ রক্তবর্ণ। নীরবে আহার চলিতেছিল কিন্তু পায়সের বাটী টানিয়া লইয়া সরোজিনী বলিল—"ভেবেছিলাম আর প্রশ্ন করব না—কিন্তু আর ত চুপ করে থাকতে পারি নে। পায়স কিসের বল দেখি?"

কিরণ হাসিয়া বলিল—"কেন বলব, শিখে ফেল যদি।"

"শেখবার জন্যেই ত শুনতে চাচ্চি গো, এ জিনিষও মানুষ না শেখে? বল, কিসের এ পায়েস?"

কিরণ হাসিতে হাসিতে কথাটা উড়াইয়া সন্দেশ আনিতে রান্নাঘরে চলিয়া গেল। সরোজিনী বলিল—"এ পায়েসটা শিখে নিতেই হবে।"

এইবার নলিনী বলিল—"কেন, তুই কি পায়েস রাঁধতে জানিস না?"

"এটা জানি?"

"যা জানিস তাই বা ক'জন জানে?"

সরোজিনীর মুখে একটু প্রশান্তভাব দেখা গেল। সে গম্ভীরভাবে বলিল—"নলিনী, তুই জানিস না—যার যেটুকু ভাল বা যেটুকু গুণ আছে, সেইটুকুর জন্যেই সে প্রশংসা পাবার যোগ্য। আর,সেই টুকুই মানুষের শিক্ষার জিনিষ। কিরণকে তোরা—"

নলিনী ব্যঙ্গের স্বরে বলিল—"কিরণকে তুমি কি চোখেই দেখেছ!"

"দেখচি ত। কিন্তু দ্যাখ নলিন, একটা অন্তরের কথা আমায় বল্‌তে দে বোন!—কিরণের কাছে আমি হার স্বীকার করতে চাই। নানা রকম রান্না খেয়ে আমারও একটা গর্ব্ব ছিল যে আমি বুঝি সত্যি খুব ভাল রান্না শিখেছি,—আজ কিন্তু—"

সরোজিনীর মুখ সহাস্য গম্ভীর, মুখের অপরিসমাপ্ত কথার মধ্যেই সে সন্দেশ মুখে তুলিল। নলিনী ভাল করিয়া খাইতেছিল না, কিন্তু মনোরমার হাসির মধ্যে বিজয়ানন্দের উজ্জ্বল দীপ্তি ফুটিয়া পড়িতেছিল। ক্রমে আহার শেষ হইল।

যাইবার সময় সরোজিনী বিষাদমলিন মুখে বলিতে-লাগিল—"যাবার সময় এ আলাপ কেনই বা হল, বুড়ো বয়সের বন্ধু ভোলাও দুষ্কর হবে। তুমি চিঠি লেখা ভালবাস ত কিরণ?"

"আপনাকে চিঠি—আমি?"

"হাঁ, হাঁ তুমি! থাক থাক অত বিনয় ঝাড় কেন বলত? আসল কথা—যা বল্‌ছি, চিঠিপত্র দিও। তুমি হয়ত বিশ্বাসই কর্ব্বে না, কিন্তু আমি তোমায়—"

হাসিয়া বাধা দিয়া কিরণ বলিল "আচ্ছা আচ্ছা তাই হবে? ঠিকানাটা—"

"তার জন্যে ভেবো না, সে আমিই দেব।"—বলিয়া সরোজিনী পাল্কীতে উঠিল।

* * *

যথাসময়ে পুরুষদের আহারও হইয়া গেল। হাসি ও আনন্দ কোলাহলে পথ শব্দায়মান করিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। কিরণ তখন সকলকে খাবার দিয়া হেঁসেল তুলিয়া, স্বামীর আহার সাজাইয়া শয়ন গৃহে বসিয়া ছিল। সিঁড়িতে জুতার শব্দ শুনিয়া সে ঢাকা তুলিল এবং গেলাসে জল ঢালিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

"কিরণ! কিরণ আছ কি?"

অনন্তের কণ্ঠস্বর। ব্যস্ত হইয়া কিরণ বলিল—"আছি বৈ কি! এস না, দ্যাখদেখি রাত বুঝি একটা বাজে,—তাঁরাও কতক্ষণ চলে গেছেন,তুমি কি করছিলে নীচে?"

বাহির হইতেই অনন্ত বলিলেন—"অমনি বসে ছিলাম। কি করছ? একবার বাইরে এস না।"

"আর বাইরে কেন, এস খেতে বস।"—বলিতে বলিতে কিরণ বাহিরে আসিল।

বাহিরে উজ্জ্বল জ্যোৎস্না সম্মুখে বিস্তৃত শস্যক্ষেত্রে রজনীর মায়াময় সৌন্দর্য্য লুটাইয়া পড়িয়াছে। স্বামীর পাশে আসিয়া কিরণ বলিল—"কি বলছ?"

"কি বলছি? হ্যাঁ, একটা কথা জিজ্ঞেস করছি বটে, সত্যি বলত কিরণ, ডাক্তার বাবুর স্ত্রীকে হারাবার জন্যে এ উদ্যোগটা কতদিন ধরে করেছ?"

"কী হারাবার চেষ্টা?"

"রাগ করচ কেন, শোন। এ তুমি চেষ্টা করেই করেছ কিরণ! আর যা করেছ তার ফলও পেয়েছ যথেষ্ট। প্রকাশবাবু, ডাক্তার বাবু একবাক্যে তোমার রান্নার প্রশংসা করে গেলেন। এ খাবারগুলি যে একেবারে নূতন তায় আর কারু সন্দেহ নেই। এ তুমি ইচ্ছে করে চেষ্টা করে—"

এবার সবেগে মাথা তুলিয়া কিরণ বলিল—"হ্যাঁ তাই ত বটে। তোমরা সবাই মিলে আমায় ঠাট্টা করে ক্ষেপিয়ে অস্থির করে তুলেছিলে, আর আমি চেষ্টা করে—"

অনন্ত হাসিয়া তাহার হস্ত স্পর্শ করিয়া বলিল, "আঃ, তা অত চট কেন? আমিই কি খুসী হইনি মনে করছ? লোকের কথায় রাগ হ'ত তাই না তোমায় ক্ষেপাতাম? যাক্, সত্যি বলত এসব শিখলে কোথায়?"

"যেখান থেকেই শিখি! এস, খেয়ে নাও।"

—বলিয়া কিরণ স্বামীর প্রতি চাহিল। স্নেহ-কোমল প্রশংসমান দৃষ্টিতে তিনি তাহাকেই দেখিতেছেন!—কিরণেরও হৃদয়ে আনন্দের ঢেউ খেলিয়া গেল। সে বলিল—"খাবে কি না তাই বল দেখি? খাবার সময় গল্প!—চল।"

স্বামীর হাত ধরিয়া কিরণ তাঁহাকে আসনে আনিয়া বসাইল।

"যা হোক্, জজ-গিন্নীর জয়জয়কার হোক, তাঁর কল্যাণে খেতে পেলুম বটে!"—বলিয়া অনন্ত আহার আরম্ভ করিল।

শ্রীহেমনলিনী দেবী।

ভাষার গতি *

অনেক সময় মনে হয় ভাষার স্ত্রী দেবতা কেন? কেবল আমাদের দেশে নয়—সর্ব্বত্রই এই ব্যবস্থা। আমাদের যেমন সরস্বতী, গ্রীসে তেমনি Minerva। Museরা নয় জনই কলাধিদেবতা। সব দেশেই এইরূপ, ভাষার কর্ত্তা নাই—কর্ত্রী আছেন। বোধ হয় ভাষা ও স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে বলিয়াই বৈয়াকরণিকেরা ভাষা ও ভাষার দেবতাকে স্ত্রী আখ্যা দিয়াছেন।

স্ত্রীলোকের প্রধান ঐশ্বর্য্য রূপ (অন্ততঃ স্ত্রীজাতি তাহাই মনে করেন।) অবশ্য সব স্ত্রীলোকই সমান রূপসী নন। হইলে ভালই হইত—অনেকটা চাঞ্চল্য, অনেকটা ঈর্ষা, অনেকটা গাত্রদাহ সমাজ হইতে চলিয়া যাইত। কিন্তু রূপ থাক্ আর নাই থাক্, স্ত্রীলোক সর্ব্বদাই fair sex—fair কথাটা ঠিক যেন একটা Homeric epithet.

ভাষারও দুই মূর্ত্তি—কুরূপা ও সুরূপা। সুরূপা ভাষা, রূপসী নারীর ন্যায়, লাবণ্যে পথিক-নেত্রও মুগ্ধ করিয়া দেয়। ভাষার স্বাভাবিক লাবণ্য—ভাবপ্রবণতা; বাকী সব প্রসাধন। ভাবসম্পদ লইয়াই ভাষা গরীয়সী ও ধন্যা। ইহা থাকিলে ভাষা সমাজে উন্নতমস্তকে বাহির হইতে পারে; আর ইহা না থাকিলে, কুরূপা নারীর ন্যায়, তাহাকে পদে পাদে লোকসমাজে মাথা নোয়াইয়া চলিতে হয়। ভাবহীন ভাষা দিয়া সংসারে কেবল আদালতের নথিপত্র লেখা চলে, কিন্তু সাহিত্য-সৃষ্টি হয় না।

আবার রূপের যেমন বৈচিত্র্য আছে, ভাষারও সেইরূপ বৈচিত্র্য আছে। কোনও ভাষায় ভাববিশেষ বেশ ব্যক্ত হয়—ভাষান্তরে তাহা হয় না। যেমন গালাগালিতে হিন্দি বা ইংরাজীই প্রশস্ত। "ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে"র ভাষায় গালাগালি দিলে সুবিধা হয় না। বাঙ্গালী পল্টন যেমন নূতন জিনিস, বাঙ্গালায় বীর-রস-মিশ্রিত কাব্যও তেমনি নূতন সামগ্রী।

তবে রূপের নদীতে জোয়ার-ভাঁটা খেলে। সৌন্দর্য্যে যখন ভাঁটা লাগে তখন প্রসাধনের সাহায্যে তাহাকে বাঁচাইয়া রাখার চেষ্টা হয় মাত্র, কিন্তু সে জোয়ার আর আসে না। ভাবহীন ভাষার সেই ভাঁটার অবস্থা। যতই কৃত্রিম উপায়ে ভাষার প্রসাধন করা হউক, সে স্বাভাবিক সলীলগতি সৌন্দর্য্যের জোয়ারটী তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

স্ত্রীলোকের ন্যায়, ভাষার উপর দিয়াও, কালের স্রোত বহিয়া যায় এবং ভাষা বৃদ্ধ হইয়া পড়ে। তখন ভাষাকে ভাব ভিক্ষা করিতে বাহির হইতে হয়। ভাব কুড়াইয়াই ভাষার মূর্ত্তি, ইহাই ভাষার রূপপ্রসাধন। ভাষার অঙ্গে চিরযৌবনশ্রী বাঁধিয়া রাখিতে হইলে তাহাকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আপনার ধারা বদ্‌লাইয়া চলিতে হইবে। ভাষা প্রাচীন (antiquated) হইলে সে প্রদর্শনীর শোভা বর্দ্ধন করিতে পারে, কিন্তু দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার কাযে লাগে না।

সংস্কৃত-মাতৃক বলিয়া আমাদের ভাষার অভিব্যঞ্জিকা শক্তির অভাব বিশেষ হয় না। তাহার উপর আমাদের ভাষার উচ্চ আশাও আছে—আন্তর্জাতিক বৈঠকে বসিবার দাবী সে রাখে। নূতন ভাবকে ছাড়িয়া দিতে সে চায় না—নানা উপায়ে ভাষান্তর হইতে ভাব আত্মসাৎ করে—নিতান্ত নিজস্ব করিতে না পারিলে চিরঋণ (Permanent loan) হিসাবে রাখিয়া দেয়। এই রকমে কত উর্দ্দু কথা, কত ইংরাজী কথা সশরীরে (bodily) ভাষার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। এই সকল কথা জানে না, সমাজে এমন লোক বিরল। সেলাম, চেয়ার, টেবিল, কোট, কাগজ, কলম ইত্যাদি এখন খাঁটী বাঙ্গালা কথা—এদের এর চেয়ে ভাল বাঙ্গালা হয় না।

কিন্তু এই আদান প্রদান ব্যাপারেও একটা আইন কানুন আছে। ভাষায় যাহা নিজস্ব, আর ভাষায় যাহা ঋণ, তাহার মধ্যে একটা মাত্রা বা অনুপাত থাকা চাই। ভাষান্তর হইতে গৃহীত শব্দাবলী বা ভাব আমাদের ভাষা সহজে হজম করিতে পারে না। সকলেই সমান শিক্ষিত নয় এবং বিভিন্ন ভাষার ভাবপ্রণালী এক নয়। কাযেই ঋণবহুল ভাষা অনেকের কাছেই নিরর্থক হইয়া পড়ে ও তত্তৎ সমাজের অভিজ্ঞতা না থাকায় শব্দসমূহ জটিল ও দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠে—এবং ভাষা নিজস্বভাব ত্যাগ করিয়া কদাচারী হয়। ভাষার উন্নতি করিতে হইলে জাতীয়তাটী বজায় রাখিতে হইবে; জাতিগত বিশেষত্বের ছাপ তাহার প্রত্যেক অঙ্গে লাগাইয়া দিতে হইবে—তাহা না করিলে ভাষায় আত্মমর্য্যাদা থাকে না। যে ভাষা জাতীয় জীবনের অভিব্যঞ্জক নয়, সে ভাষা নিজেরও উন্নতি করিতে পারে না, পরকেও ভাবসম্পদ ধার দিতে পারে না, এবং এই প্রদান শক্তির অভাবে পরাধীন ভাষা, পরাধীন জাতির ন্যায় বিশ্বের সভায় স্থান পায় না।

এই ত গেল সৌন্দর্য্যের প্রথম উপাদান। এখন দ্বিতীয় উপাদানের কথা ধরা যাউক। নারীর যতটুকু রূপই থাকুক না কেন, সেইটুকু সে পূরাপুরি দেখাইতে চায়। যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে, কখনও কখনও টিপও পরে। বর্ণ সুশ্রী হইলে একখানা নীলাম্বরী শাড়ী পড়ে; শুনিয়াছি, ইংরাজ মহিলা হইলে কখনও কখনও বৈধব্যের কালো পোষাক সহজে ছাড়িতে চাহে না; স্বামীর শোকে নয়, ভাল দেখাইবে বলিয়া। কুরূপা হইলেও একখানা পরিস্কার কাপড় পরে—প্রিয়তমকে ভুলাইতে নয়, নিজের ভাবে নিজে বিভোর হইয়া থাকিতে। অনেক সময় এ সজ্জায় আড়ম্বর নাই, কিন্তু লাবণ্য-বিন্যাস আছে। রূপ থাকিলেই হয় না, রূপের বিকাশ প্রণালী জানা চাই।

নারীর যেমন সাজসজ্জা আছে, ভাষারও তেমনি প্রসাধন আছে। কোন ভাষা সাজিতে জানে, কোন ভাষা জানে না। রচনা-পদ্ধতিই ভাষার বেশবিন্যাস। আমিই বা কবি নই কেন, আর আপনিই বা বাণীর পুত্র কেন? ভাব হিসাবে হয়ত আমি আপনার অপেক্ষা বিশেষ ন্যূন নহি, কিন্তু আমার ভাষা নাই, বা ভাষা থাকিলেও, ভাবের পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষা করিতে পারি না, কিংবা যে সাজে ভাবকে ভাল দেখাইবে সেই পোষাকটীর সন্ধান জানি না। যেমন সকল ভাব সকল ভাষায় ব্যক্ত হয় না, সেইরূপ সকল ভাষা এক সাজে সকল ভাব ব্যক্ত করিতে পারে না। জর্ম্মন ভাষা বিশেষতঃ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের ভাষা, ইতালীয় ভাষা কবির ভাষা, —বিজ্ঞান বা দর্শনের ভাষা নয়।

রীতি, ছন্দ, গদ্য-পদ্য বিভাগ—ইত্যাদি ভাবপ্রকাশের সহায়কমাত্র। দৃশ্যকাব্য, খণ্ড কবিতা ইত্যাদি ভাবের স্বানুগত অভিব্যক্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই মূলসূত্রটী হারাইলেই ভাষা ব্যঙ্গের মত শুনায়। যে ভাষা যে ছন্দ যে ভাবের উপযোগী নয়, সে ভাষা সে ছন্দ সে ভাবকে বিদ্রূপ করে। বাক্যবহুলতা কাব্য নয়—বাক্যবিন্যাসই কাব্যের প্রধান অঙ্গ। কাল বা পাত্র বিবেচনা না করিয়া কতকটা বক্তৃতা দিয়া গেলেই শ্রাব্য বা দৃশ্য কাব্য মনোহারী হয় না।

এখন দেখা যাউক, আমাদের রচনার রীতি-সম্পদ কতটুকু। বৈচিত্র্য হিসাবে বাঙ্গালা সাহিত্য বেশই অগ্রসর হইয়াছে। কি গদ্য কি পদ্য উভয় বিভাগেই সে বিলক্ষণ উন্নতি করিয়াছে। বিষয় হিসাবে ইহার গদ্য বিভাগে বৈজ্ঞানিক আলোচনা অল্প বটে, কিন্তু সে অভাবের দিকে যখন সাহিত্যকগণের নজর পড়িয়াছে তখন তাহা অচিরেই দূর হইবে আশা করা যায়। পদ্য বিভাগে মহাকাব্যের অভাব—তাহার জন্য জাতীয় স্বভাব অনেকটা দায়ী, একথা বলিলে বোধ হয় বাঙ্গালী পল্টন আমার উপর সঙ্গীন উঠাইবেন না; কেননা আমার শেষ কথা যে, এ অভাবও কালে দূর হইবে।

আমাদের দেশে একই লোক গদ্য পদ্য লেখেন। ইহাঁরা যেমন দু'পায়ে হাটেন, তেমনি দু'হাতে লেখেন। অনেকে আবার উভয় বিভাগেই প্রথিতযশা। আবার

সকল শাখাতেই সমচারী। নাটক ও উপন্যাস, কবিতা ও ক্ষুদ্র গল্প, ধর্ম্মতত্ত্ব ও হাস্যকৌতুক কিছুই বাদ যায় না। কেহ চুটকী গল্প হইতে দর্শনের গবেষণা করিতেছেন, কেহ বা সনেট লিখিতে লিখিতে গীতার অনুবাদ করিতেছেন, কেহ বা আবার হাসির ছড়া বাঁধিতে বাঁধিতে ধর্ম্মতত্ত্বের বিচার করিতেছেন। ইহাঁরা বোধ হয় সকল আঙ্গুলেই কলম ধরিতে পারেন। ফলে ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব, স্বদেশতত্ত্ব—অধিকারী অনধিকারী নির্ব্বিশেষে সর্ব্বশাস্ত্রই সকলের গবেষণায় বিষয়ীভূত হইতেছে এবং যদিও সাহিত্য জগতের অপরিহার্য্য নিয়মে সাহিত্যক্ষেত্রে কার্য্য-বিভাগ (Division of Labonr) আসিয়া পড়িতেছে, তবুও মোটের উপর কোন বিভাগই ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চিত হইতেছে না।

তবে পোষাকের যেমন ফ্যাসান আছে, ভাষারও তেমনি একটা ফ্যাসান আছে। যখন একটা ফ্যাসানের ঢেউ উঠে তখন পথে, ঘাটে, মাঠে সর্ব্বত্র তাহার প্রভাব—সমস্ত জগৎ যেন পুরাতনের বিরুদ্ধে অভিযান করিতেছে। ভাষার রাজ্যেও এই রকম ফ্যাসানের ঢেউ লাগে। যখন নবেল লেখা আরম্ভ হয়, তখন ছোট-বড় সকলেই নবেল লেখে। ক্ষুদ্র গল্পের চলন হইলে, মাসিক পত্রের সম্পাদক ও কুন্তলীন ইত্যাদির পুরস্কারদাতাদিগের কায বাড়িয়া যায়। নাটকের প্রতি-পত্তি হইলে থিয়েটারওয়ালারা প্রতিরাত্রে তিনখানা নাটক দিয়াও কুলাইতে পারে না। যখন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের ধুয়া উঠে, তখন মন্ত্র-তন্ত্রের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় সংবাদ-পত্রগুলা কণ্টকিত হইয়া উঠে। ধর্ম্মতত্ত্ব ফ্যাসান হইলে, তন্ময়তায় পাঠকের আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়া আসে ও সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিতের আয় বাড়িয়া যায়। আর, কবিতার পালা পড়িলে তো রক্ষা নাই! সকলেই তখন আকাশে কাণ পাতেন, জ্যোৎস্না পান করেন, মেঘের দোলায় দোলেন—এমন কি কাকের কাকলী হইতেও ইন্‌স্পিরেশন ড্র করেন। যে সকল ভাবের মিটাইয়া ফেলে এবং ছন্দোবন্ধের বন্ধুতায় আবদ্ধ হয়। যাহা নিছক গদ্য, তাহাও ছন্দের আবরণ অঙ্গে ধারণ করে। তখন অবাক জলপান, মুস্কিল আসান, সীলেট চুণ, সমর ঋণ—এমন কি চায়ের বিজ্ঞাপন, সবই কবিতায় রচিত হয়। তখন মন্ত্র না হইলেও বিবাহ চলে, কিন্তু "প্রীতি-উপহার" না হইলে বিবাহ নামঞ্জুর! বাস্তবিক বাঙ্গালা ভাষার কাব্যানুরাগ একটা ভাবিবার জিনিস। সকল রকম রচনারই একটা কাল আছে, সেটা আবার বহুদিন স্থায়ী হয় না। উপন্যাস, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, ধর্ম্মতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব—সকলেরই উত্থান পতন আছে, কিন্তু বাঙ্গালায় কবিতার ধারা চিরন্তন —ইহা নিত্য শাশ্বত, পুরাতন। বহুল ছন্দে ইহার আবির্ভূতি, বহুপ্রাণে ইহার স্থিতি, বহুকণ্ঠে ইহার গীতি, ইহা বহুভাবময়ী। কিন্তু সাহিত্যের বেষ্টনীর দোষে গুণেই হউক বা জাতীয় প্রকৃতিবশেই হউক, আবেগ উচ্ছ্বাস ইত্যাদি আমাদের লাগে ভাল, কারণ তাহাদের উপকরণ আমাদের নিজেদের মধ্যেই পাওয়া যায়। এজন্য বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্য খণ্ডকবিতা-প্রধান (lyrical)। বহুদিনের জাতীয় অবসাদের ফলেই যে মহাকাব্য আমাদের দেশে রচিত ও পঠিত হয় না—একথা স্বীকার করা যায় না। যাঁহারা জাতীয়তার আদর্শস্থল, আজকাল তাঁহাদের ভাষাতেই বা মহাকাব্যের প্রসার বা প্রতিপত্তি কৈ?

এখন দেখা যাউক আমাদের সাহিত্যের অবস্থা ও অভিমুখীনতা (trend) কি। আমাদের জাতীয় শিক্ষার সুন্দর প্রতিচ্ছবি আমাদের সাহিত্যে পড়িয়াছে। নির্দ্দেশ-বহুলতা (allusiveness), অতীন্দ্রিয়তা (transcend-entalism), ঝঙ্কার (assonance), অনুপ্রাস (alliter-ation) ইত্যাদির কথা প্রথমেই মনে পড়ে। শেষেরটী ব্যতীত বাকী অন্য গুণগুলি নূতন। প্রকৃতির লীলাবর্ণন সংস্কৃত সাহিত্যে যে ভাবে ছিল, ইংরাজীতে ঠিক সে ভাবে নাই। তাঁহারা প্রকৃতিকে অন্য ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সে ছায়া বাঙ্গলা সাহিত্যেও ক্রমশঃ

পদ্য কোথাও প্রকৃতির অনুভূতি তেমন প্রত্যক্ষ-ভাবে বর্ণিত হইত না। Higher Pantheismই নব্যসাহিত্যের স্বোপার্জ্জিত ঐশ্বর্য্য। মনুষ্য-চরিত্র অঙ্কন ও সামাজিক স্থূল বিষয় বর্ণনা করাই প্রাচীন সাহিত্যের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হইত।

এখন সে সব ধারা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাই-তেছে। আমাদের পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বর্ত্তমান সামাজিক সমস্যা মিলিয়া মিশিয়া সাহিত্যের ধাঁজ বদলাইয়া দিয়াছে। ভাবের অভিব্যক্তি সম্পূর্ণ নূতন খাতে বহিতেছে। বক্রোক্তি (Pun) ইত্যাদি সাহিত্যের মুন্সীয়ানা একেবারে লোপ পাইতে বসিয়াছে। পয়ার, দীর্ঘত্রিপদী, লঘুত্রিপদী ইত্যাদি এখন আর সুখশ্রাব্য নয়। দ্বিপদী, ত্রিপদীতে আর কবিদের মন উঠে না, তাঁহারা চৌপদী বহুপদী পছন্দ করেন। গীতি সাহিত্য ক্রমেই সমাজের প্রীতি আকর্ষণ করিতেছে। ইংরাজী সুরের অনুকরণে গানের স্বরযোজনা হইতেছে এবং একতালার খাতির বাড়িতেছে। ইংরাজী অনুকরণে School of Poetry গঠিত হইতেছে। কেহ বা দলপতি সাজিতেছেন—কেহ তাঁহার পারিষদ হইতেছেন। ইহার মধ্যে আবার বড়, মেজো, সেজো, ন' ইত্যাদি রহিয়াছেন। এই দলের লোকেরা (দুই একজন ব্যতীত) দলপতির ভাব খুচরা বেচেন, অর্থাৎ তাঁহারা পংক্তি ফেনাইয়া পদ্য করেন। ইহাঁদের কবিতায় মূল কবির ছাপ থাকে—তাঁহার ভাষা, তাঁহার ভঙ্গী, তাঁহার রচনাবিশেষত্ব পুনঃ পুনঃ উঁকি মারিতে থাকে। ইহাঁরা অনেকেই বুঝেন না যে দুইজন বিভিন্ন-রীতি মৌলিক কবির রচনায় যতটা ভাবসামঞ্জস্য থাকে, কবি ও তদনুকারীর মধ্যে তাহার কণামাত্রও থাকে না। দেশ কাল ভেদে রাজপরিচ্ছদের তারতম্য হইয়া থাকিলেও তাহার মূল্য এক—তাহা রাজার পোষাক। কিন্তু পরিত্যক্ত রাজবেশ অঙ্গে ধারণ করিলে দীনের দীনত্ব ঘুচে না।

সাহিত্যশ্রীর তৃতীয় উপাদান অলঙ্কার। রূপ বা পরিচ্ছদ লইয়াই নারী সন্তুষ্ট হন না, তাঁহার অলঙ্কার চাই। তবে গহনা পরাটা শিক্ষিতাদিগের মধ্যে সেকেলে ফ্যাসান বলিয়া গণ্য হইতেছে এবং গহনা হইতে দৃষ্টি এখন বসনে পড়িয়াছে। সুতরাং আশা করা যায়, বরের মাতারা শিক্ষিতা হইলে এই মহার্ঘ প্রথার হাত হইতে সমাজ ক্রমশঃ নিষ্কৃতি পাইবে। রূপার গহনা তো অনেকদিন অঙ্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া এখন পায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। সোণার গহনার অবস্থা এখনও তত মন্দ নয় (গিনি প্রচলন বন্ধ হওয়ায় বরং একটু ভাল হইয়াছে); তবে ভুক্তভোগীরা সাক্ষ্য দিবেন যে গহনার চিত্রাবলী এখন আর ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবির ন্যায় নিশ্চল বা স্থাবর নয়, সিনেমার ছবির ন্যায় উহা এখন সচল ও পরিবর্ত্তনশীল হইয়া উঠিয়াছে। এবৎসর যাহা ফ্যাসান, আগামী বৎসর বা তার পরের বৎসর তাহা পুরাতন ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপে অব্যবহার্য্য হইবে। ভাঙ্গিয়া চুরিয়া না গড়াইলে আর শাশুড়ী দিদিশাশুড়ীর গহনা গায়ে তোলা যায় না।

ভাষারও অলঙ্কার আছে। কোনও ভাষা অলঙ্কার-বহুলা, কোনও ভাষা বিরলাভরণা। নব্য ভাষাসমূহ নব্যশিক্ষিতাদের ন্যায় ক্রমেই আড়ম্বর ও অলঙ্কারশূন্যা হইতেছে এবং রীতি সৌষ্ঠবের দিকে দৃষ্টি দিতেছে। বাঙ্গালা ভাষা যতদিন কেবলমাত্র সংস্কৃত-সম্পর্কিত ছিল, ততদিন উহা পত্রপুষ্পশোভিত লতার ন্যায় ছিল। বহু সমাস ও সম্পর্কিত ভাব, রচনার মধ্যে প্রবেশ করিত এবং স্থানে স্থানে ভাষাভারনিপীড়িত, ওষ্ঠাগতপ্রাণ ভাব "ত্রাহি মধুসূদন" ডাক ছাড়িত। দূরান্বয়, কষ্ট-কল্পনা, দুরূহ শব্দবিন্যাস ইত্যাদি প্রায়ই ঘটিত এবং স্থানে স্থানে রচনায় লালিত্য ও গাম্ভীর্য্য থাকিলেও, পুরাদস্তুর সংস্কৃতজ্ঞ ব্যতীত আর কেহ তাহার রস-গ্রহণ করিতে পারিত না।

সাহিত্যে অলঙ্কার পরিবর্ত্তন নূতন নয়। সংস্কৃতেও দেখা যায়, অলঙ্কার সম্বন্ধে কোন কবিপ্রসিদ্ধি ছিল না। কালিদাস ও ভবভূতি, শূদ্রক ও বাণ একভাবে লেখেন নাই। বলিতে কি, কোন মৌলিক কবিই বাঁধাবাঁধি নিয়মে থাকিতে চাহেন না—নূতন ভাবের সঙ্গে সঙ্গে

ভাষার সৃষ্টি করেন। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যেও ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহাতে নিন্দার কিছুই নাই। দেশকালভেদে প্রবৃত্তির তারতম্য ঘটিয়া থাকে এবং তদনুসারে সাহিত্যের ভঙ্গীও বদলাইয়া যায়। গ্রাম্যতা ইত্যাদি এককালে দোষ বলিয়া গণ্য হইত, এখন উহা গুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চলিত কথা কাব্যে স্থান পাইতেছে, এমন কি তাহাদের অনুকরণে নূতন কথার সৃষ্টি হইতেছে।

ভাষা যত সহজ ও সরল হইতেছে, ততই আধুনিক সমাজের উপযোগী হওয়ায় প্রাণের ভাব প্রকাশে অধিকতর সমর্থ হইতেছে। যতদিন ভাষা সংস্কৃতের নামান্তর ছিল, আধুনিক হাস্যকৌতুক ও ব্যঙ্গচিত্র ভাষায় ছিল না বলিলেই হয়। যাহা ছিল তাহা এখনকার হিসাবে কুরুচিপূর্ণ, তাহা কবি ও তরজাওয়ালাদের মুখে মুখেই থাকিত। অলঙ্কারের বাঁধন হইতে ছাড়া পাইয়া ভাষা একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রহসন, হাস্যোদ্দীপক গান, কবিতা ও ক্ষুদ্র গল্প দেখা দিতেছে। যে ভাষা প্রতিদিনের জীবনের ভাষা নয়, তাহাতে আর সব ভাব ব্যক্ত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে প্রাণ খুলিয়া হাসা কাঁদা যায় না।

আর একটী কথা বলিয়াই আমার বক্তব্য শেষ করিব। আমরা সাহিত্যজগতে বস্তুতন্ত্রতার যুগ (age of realism) আসিয়া পড়িয়াছে। কেবল বাঙ্গালায় নয়, সারা বিশ্বে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। যাহা সাংসারিক সত্য হইতে বহুদূরে, সেটাকে স্বপ্নরাজ্য মনে করিয়া, তাহা হইতে আমরা ফিরিবার চেষ্টা করিতেছি। ফ্রান্স, জর্ম্মনী, রুসিয়া, ইংলণ্ড—সর্ব্বত্রই এক স্পৃহা, এক চেষ্টা—কোন কথা লুকাইব না, মানব হৃদয়ের গূঢ়তম উদ্দেশ্যগুলি টানিয়া বাহির করিব, সমাজের ক্ষত আর চাপা দিব না।

বস্তুবাদী (realist) ও স্বপ্নবাদী (idealist) ইহাদের মধ্যে কাহার মত বা পথ ঠিক, ইহা নির্দ্দেশ করা নিতান্ত সহজ নয়—তবে বাস্তবতার বিপদগুলি ভুলিলে চলিবে না। বাস্তব হইতে হইলেই যে সব কথা খুলিয়া বলিতে হইবে তাহা নয়—সংস্কৃতে এরূপ কাব্য অসৎ কাব্য, যেমন কুমারসম্ভবের শেষ কয়েক সর্গ। অনেকের মতে ইহা কালিদাসের রচনাই নয়। অতিরিক্ত বাস্তবতায় স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সংযম না হইয়া উদ্দীপনাই হইয়া থাকে। তাহাতে লেখকের ভূয়োদর্শের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা সমাজের হিতকর হয় না। কাব্যের একটা উদ্দেশ্য আদর্শস্থাপন। হীনবৃত্তিসঞ্জাত যে সকল ব্যাপার নিত্য আমাদের সম্মুখে ঘটিতেছে, তাহার জন্য আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞানই যথেষ্ট। তাহাকে ঘৃণার্হ করিয়া চিত্রিত করাই সাহিত্যের কর্ত্তব্য। হইতে পারে, পাপ অবশ্যম্ভাবী ও সাধারণ প্রাকৃতিক ঘটনা,—তাই বলিয়া তাহার লোভনীয় চিত্র প্রদান করিতে হইবে এমন কিছু কথা নাই। লোকের যাহাতে কুশিক্ষা হয় তাহা কাব্যপ্রথার বিরুদ্ধ, সুতরাং সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

একদিন রাস্তায় এক ধোপার গাধার সহিত এক বাজীকরের গাধার সাক্ষাৎ হয়। পরস্পর পরিচয় প্রশ্নাদির পর উভয়ে নিজ নিজ চাকরীর বিষয় আলোচনা করিতে লাগিল। ধোপার গাধা নদীর ধারে নধর কচি ঘাস খাইয়া বেশ হৃষ্টপুষ্ট, বাজীকরের গাধা দুর্ব্বল ও শীর্ণকায়। ধোপার গাধা বলিল—"খাইতে পাওনা, এমন চাকরি কর কেন? ছাড়িয়া দাও।"

বাজীকরের গাধা বলিল—"ভাই, ছাড়িতে পারিনা কেন জান? এ চাকরিটায় খুব ফিউচর প্রস্পেক্ট আছে।"

ধোপার গাধা।—কি রকম প্রস্পেক্ট শুনি।

বাজীকরের গাধা।—আমার মুনিব বাজীকর, খেলা দেখাইবার সময় তাহার মেয়েকে বাঁশে বাঁধা দড়ির উপর চড়াইয়া বাজী দেখায়। সে সময় মেয়েকে সে বলে—"খুব হুঁসিয়ার। গিরেগী তো ইয়ে গাধেকে সাথ তেরী শাদী কর্ দেঙ্গে।"— একদিন কি আর মেয়েটার পা ফস্কাইবে না? ভবিষ্যৎ উন্নতির এই আশাটুকুর জন্যই, ভাই, চাকড়িটি ছাড়িতে পারি না।

স্পর্শমণি

(উপন্যাস)

দশম পরিচ্ছেদ।

"নিমেষের তরে সরমে বাধিল।"

রুদ্রকান্তের পীড়া যখন হ্রাস-বৃদ্ধির গতি হারাইয়া নিজের ঘরে স্থির হইয়া রহিল, তখন বাড়ীর লোকেরা যেন অনেকখানি নিশ্চিন্তভাবে আবার আপন আপন কাযে মনোযোগ দিবার অবকাশ পাইল। সতীনাথ ও মুরারি আবার বিষয়কার্য্য দেখিতে আরম্ভ করিল। আমলা কর্ম্মচারীরা তাহাদের খেরো বাঁধা মোটা মোটা খাতা খুলিয়া হিসাব দেখিতে এবং উকীল মোক্তার এটর্ণিরা রুদ্রকান্তের পয়সায় পকেট ভরাইয়া মামলা মোকর্দ্দমার পরামর্শ দিতে আরম্ভ করিলেন। বাড়ীর বেতনভোগী চাকর দাসীরাও পুরাতন রোগীর সেবায় শৈথিল্য দিয়া ক্রমে নিজ নিজ আরাম খুঁজিতে সুরু করিল। কেবল শ্রান্ত হইল না উমা। তাহার ত আর অন্য কোন বন্ধন নাই, প্রয়োজনও নাই—এবং জেঠামহাশয়ের সঙ্গই তাহার অভ্যস্ত। দুঃখের দিনেও যে তাঁহার সঙ্গী, তাঁহাকে ছাড়িয়া সে কোথায় যাইবে? মরণপথযাত্রী বৃদ্ধকে সে রুগ্ন শিশুর মতই মনে করে,—যতই সে তাঁহার অসহায় অবস্থার কথা ভাবে, ততই সে গভীর স্নেহে তাঁহাকে আঁকড়িয়া ধরিতে যায়। সত্যই যদি রুদ্রকান্ত চলিয়া যান, এতবড় বাড়ীখানাতে একা সে কেমন করিয়া আমৃত্যু তিষ্ঠিয়া থাকিবে? শ্রান্তি নাই ক্লান্তি নাই—একনিষ্ঠ সাধকের মত অনলস উমাই কেবল সেবার রোগশয্যা আঁকড়িয়া পড়িয়া রহিল।

শীত আসিয়া পড়ায় সহর জুড়িয়া বিপুল আয়োজন আনন্দের উৎসব চলিতেছে। নূতন নূতন থিয়েটার বায়স্কোপ সার্কাসের বিজ্ঞাপনে দ্বিতল ত্রিতল বাড়ী-গুলার বাহির অংশ খচিত হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্ম-তলায় পার্শী অ্যালফ্রেড থিয়েটারে মহাভারতের অভিনয় দেখান হইতেছিল, সতীনাথ ও মুরারি একদিন দেখিয়া আসিল। দেখিয়া মুগ্ধ মুরারি পিসিমার কাছে সালঙ্কারে তাহার বর্ণনায় তাঁহার মনটাকে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিল। উমা কোথাও যায় না বা যাইতে পায় না, তাই পিসিমার স্বাধীনতায় কোন বাধা না থাকিলেও, তিনিও চক্ষুলজ্জা রাখিয়া যাইতে পারেন না। ঠাকুর দেবতার অভিনয়—বিশেষ এমন অলৌকিক কান্তের বর্ণনা—কাযেই পিসিমা মনের অভিমান চাপিয়া এক দিন সতীনাথের কাছে জানাইলেন, উমাকে লইয়া তিনি মহাভারতের অভিনয় দেখিতে যাইবেন। শুনিয়া সতীনাথ তৎক্ষণাৎ খুসী হইয়া মত দিল এবং উৎসাহ দেখাইয়া নিজে সঙ্গী হইবার প্রস্তাব করিয়া বসিল।

রুদ্রকান্তের অনুমতি লইবার আবশ্যকতা ছিল না। তবু কি ভাবিয়া সতীনাথ সুধীরকে দিয়া তাঁহার নিকট হইতেও অনুমতি আনাইয়া লইল। রুদ্রকান্ত আপত্তি করিলেন না, উমাকে খুসী করিতে এখন তিনিও যেন সমুৎসুক। সতীনাথ সঙ্কোচবশে পিসিমার কথাই বলিয়াছিল, জেঠামহাশয় নিজে হইতে বলিয়া দিয়াছেন উমাকেও যেন লইয়া যাওয়া হয়। তিনি বোধ হয় ভাবিলেন, সে খেয়ালী ছেলে, মনে করাইয়া না দিলে হয়ত তাহার মনেও পড়িবে না, শুধু বুড়ীকেই দেখাইয়া আনিবে,—উহাকে বিশ্বাস ত কিছুই নাই। সরকার মহাশয় আগে গিয়া বক্স রিজার্ভ করিয়া আসিয়াছেন।

দুপুর বেলা সুধীর আসিয়া খবর দিল, সে ও পিসিমা থিয়েটার দেখিতে যাইবে, উমা যাইবে না। সতীনাথ নিজের ঘরে চুপ করিয়া একা খাটে শুইয়া ছিল, শুনিয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "কেন, যাবে না কেন?" সুধীর মুখ ভার করিয়া কহিল, "বল্লেন ইচ্ছে নেই। বৌদি ত কখনও থিয়েটার দেখেন নি, তাই বোধ হয় ইচ্ছেও করে না।"

সতীনাথ পুনরায় শয্যা গ্রহণ করিয়া কহিল, "না যায় ত করা যাবে কি! তোমরাই তা হলে ঠিক হয়ে নাও।" বৌদির অকারণ বৈরাগ্যে সুধীরও আজ বিরক্ত হইয়াছিল, তাই দাদার ঔদাসীন্যে ক্ষুণ্ণ হইলেও মনের উষ্মাটা মুখ দিয়া অনুরোধের কোন ভাষা বাহির হইতে দিল না। সে নীরবে চলিয়া গেল।

নির্দ্দিষ্ট ঘণ্টার ঘরে ঘড়ির কাঁটাটা পৌঁছিতেই সতীনাথ তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল এবং সন্ধান করিয়া দ্বিতলের একখানা ঘরে উমার সাক্ষাৎ পাইল।

উমা তখন ঘরের মেঝেয় কলাপাতা বিছাইয়া একরাশ পাণ সাজিয়া সবেমাত্র খিলি মুড়িতে সুরু করিয়াছে। স্বামীকে অপ্রত্যাশিতরূপে অসময়ে কাছে আসিতে দেখিয়া মনে মনে বিস্মিত হইলেও, মুখে কিছুই বলিল না। একবার চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিয়া নিজের কাযে মন দিল। তাহার আগ্রহহীন উদ্বেগরেখা-বর্জ্জিত মুখের পানে চাহিয়া সতীনাথের হিংসা হইতে-ছিল। একটুখানি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে কহিল, "তুমি নাকি থিয়েটার দেখতে যাবে না?"

উমা কায বন্ধ না করিয়া মুখ না তুলিয়াই কহিল, "না।"

"কেন, শুনতে পাইনে? সুধীর বল্‌ছিল তুমি কখনও থিয়েটার দেখ নি।"

উমা নম্রমুখেই মৃদু হাসিল, প্রতিবাদ করিল না। সতীনাথ অসহিষ্ণুভাবে কহিল, "কেন যাবে না বল্‌তে দোষ আছে কি?"

উমা মুখ তুলিয়া স্বামীর সংশয়পূর্ণ চোখে নিজের দৃষ্টি মিলাইয়া চোখ নামাইয়া ফেলিল। কহিল, "আমার ভাল লাগে না ও সব।"—জেঠামহাশয়ের এমন অসুখ, এখন কি আমোদ করিয়া থিয়েটার দেখিয়া বেড়াইবার সময়, এই সত্য কথাটা তাহার ওষ্ঠের কাছে আসিলেও সে মুখের বাহির হইতে দিল না। মার চেয়ে অধিক

উহাঁরা যদি আমোদ করিতে পারেন, সে কি বেশী আপন জন যে আত্মীয়তার বাহাদুরী লইতে যাইবে? তাই কারণটা উহ্য রাখিয়া, সংক্ষেপে নিজের অনিচ্ছা মাত্র সে জানাইল।

শুনিয়া সতীনাথের অধরে মৃদু হাসির কুঞ্চন রেখা ফুটিয়া উঠিল। কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ ভরিয়া সে কহিল, "না পড়েই পণ্ডিত, কি করে বুঝলে ভাল লাগবে কিনা?"

উমার খিলি মোড়া শেষ হইয়া গিয়াছিল। এইবার পাণে গোলাপ জলের আছড়া দিয়া সেগুলা ডিবা ও ডাবরে ভরিতে ভরিতে সে নতমুখেই কহিল, "না না দেখে ত কোন ক্ষতি হয়নি, আমি যাব না।"—স্বর মৃদু হইলেও সংকল্প যে অটল, স্বরের দৃঢ়তাতেই তাহা অনুমিত হইল।

সতীনাথ দুঃখিত হইলেও জেদ করিল না। ক্ষুণ্ণস্বরে, "জোর ত নেই, তবে থাক"—বলিয়া গমনোদ্যত হইয়া, আবার কি ভাবিয়া সহসা উমার অত্যন্ত কাছে আসিয়া কহিল, "পাণ বোধ হয় দু' একটা পেতে পারি?"

উমা একটা পাণ ভরা ডিবা হাতে করিতে, কিছু না ভাবিয়াই সতীনাথ তাড়াতাড়ি একটুখানি ঝুঁকিয়া তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া দিল। উমা লজ্জায় ডিবাটা স্বামীর হাতে না দিয়া, মেঝেয় রাখিয়া, বাকী পাণগুলা গুছাইয়া তুলিতে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

সতীনাথ প্রসারিত হাতখানা গুটাইয়া লইল। একটুখানি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া, মৃদু হাসি হাসিয়া সে আস্তে আস্তে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। সকাল বেলা নিজে গিয়া প্যাটার্ণ পছন্দ করিয়া লাভচাঁদের দোকান হইতে যে সোণার চুড়ী ও গলার হার কিনিয়া আনিয়াছিল, ইহার পর সেগুলা পকেটের বাহির করা আর চলিল না।

জুতার শব্দ সিঁড়ির নীচে ক্রমে মিলাইয়া গেল। সাজা পাণগুলা তেমনি ভাবে ফেলিয়া রাখিয়া, কিছুক্ষণ

পানে চাহিয়া, চাহিয়া তারপর উমা উঠিয়া একটা জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল।

অল্পক্ষণ পরেই সে দেখিল, বাগানের ফটক পার হইয়া বদ্ধদ্বার গাড়ীখানা সশব্দে বাড়ীর বাহির হইয়া বড় রাস্তায় পড়িল, এবং মুহূর্ত্তে উমার দৃষ্টির তরল কুয়াশার আবরণ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গেল। কোচবক্সে কোচম্যানের পার্শ্বে সরকার নিধিরামের শীর্ণ মূর্ত্তি এবং গাড়ীর ছাদে দরোয়ান বংশীবদনের জরী লাগান টুপীর কিনারাটিও অদৃশ্য হইয়া গেল।

উমা সেইখানে তেমনি ভাবেই নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। স্বামীর সেই ম্লান হাসিটুকু আজ সে যেন কোন মতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। কখনও বিদ্রূপপূর্ণ, কখনও সরল হাসি হাসিয়া কথা কহাই সতীনাথের চিরকালের স্বভাব। আজকাল উমাও এ হাসির সংবাদ মাঝে মাঝে পাইয়া থাকে—তবু আজিকার সে হাসি, সে বুঝি তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। সে হাসি হাসি নয়, সে যেন করুণ বেদনাভরা অশ্রুঝরা অভিমানের ভর্ৎসনা। তিনি যে কিছুদিন হইতে তাঁহার চালচলন সম্পূর্ণ রূপেই বদল করিয়া ফেলিয়াছেন, এ খবর উমার কাছেও আর অজ্ঞাত নাই। দাদামহাশয় সিগার চুরুট খাওয়া অপছন্দ করেন শুনিয়া তিনি নাকি ও সব একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন এমন অবিশ্বাস্য সংবাদ সে সুধীরের কাছে পাইয়াছে। এবং তাহার বিস্ময়ের মাত্রা পূর্ণ করিয়া সেদিন নাকি পিসিমার কাছে পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ করিবার সংকল্পও তিনি জানাইয়াছেন। সুধীর বলে, তিনি নাকি এখন সন্ধ্যাহ্নিকও করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মগুলা এ বাড়ীতে এমনি অশ্রদ্ধেয় যে, এই সব ছোটখাট ঘটনাগুলাই উমার কাছে রাষ্ট্রবিপ্লবের মত বৃহৎ ব্যাপার বলিয়া প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছিল। মুরারি দেখিয়া শুনিয়া একদিন ব্যঙ্গ করিয়া কহিল, "দেখ্‌চ কি বৌঠান, এইবার আলোচাল কাঁচকলার পালা সুরু হল; এরপর কোন দিন কম্বলবস্ত হয়ে লোটা হাতে করে' বেরিয়ে না পড়লে বাঁচি। বড় যে টুলো পণ্ডিত বলে ঠাকুর্দ্দা মশায়কে নিন্দে করা হত—এখন নিজেই যে ভটচাযি্য হয়ে উঠলেন। কোন্ দিন তেড়ীর পেছনে টিকি দেখব, এখন কেবল সেইদিনের প্রতীক্ষা করে আছি।"

মুরারি কথাটা পরিহাসের ভাবে বলিলেও, মনটা তাহার ঈর্ষার জ্বালায় জ্বলিতেছিল। এমন করিয়া স্ত্রীর মন ফিরাইতে হইবে,—গলায় দড়ি! এমন বিমুখ মন নাই বা ফিরিল!

উমা কিন্তু সতীনাথের এই অবিশ্বাস্য মতি-পরিবর্ত্তনের ইতিহাস শুনিয়া মনে মনে বিপুল আনন্দই উপভোগ করিয়াছিল। নিজের অনুকূলে এতটুকু প্রশ্রয় চিন্তাতেও সে গ্রহণ করে নাই। মুরারির বিদ্রূপে তাই সে ক্ষুণ্ণ না হইয়া বরং খুসীই হইয়াছিল। তিনি যে আজকাল তাহার কাছে একটু স্নেহমমতার প্রার্থী, এটুকুও সে যেন অনুভব করিয়া আসিতেছে। তবু সে খেয়াল কতটুকু, আর কতক্ষণের, তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল না। সে আদার ব্যাপারী, জাহাজের সংবাদে তাহার প্রয়োজনই বা কি? সে ভাবিত—আগুন লইয়া খেলা ত আর নিরাপদ নয়—এ বেশ আছি! অকারণ অভাব টানিয়া আনার প্রয়োজন কি? এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া সে সতী-নাথের মনোভাব বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিত না। আজও নিজেকে চোখ রাঙ্গাইয়া ভুল বুঝাইতেই চাহিল—কিছু না, সে কিছু না,—তাহারই ভ্রম।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নিষ্ফল চেষ্টা।

অস্তসূর্য্যের রশ্মিরেখা চোখে পড়ায় উমা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া, মনের রাশ টানিয়া তাহাকে গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছায় মুখ ফিরাইতেই, সহসা বিস্মিত হইয়া গেল। মুরারি কখন্ আসিয়া দরজার উপরে দাঁড়াইয়া আছে। হয়ত সে নিঃশব্দে আসিয়াছিল, নয়ত নিজের গভীর চিন্তায় উমা তাহার পদশব্দ শুনিতে পায় নাই।

মুরারি দেখিল, উমার চোখে তখনও স্বপ্নাভিভূত দৃষ্টি, চোখের কোণে জলের রেখা, নিটোল গণ্ডে মুক্তা-বিন্দুর মত দুই ফোঁটা জল তখনও টল টল করিতেছে; অথচ উমা এমনিই আত্মবিস্মৃত যে নিজে তাহা সে জানেও না। উমাকে ফিরিতে দেখিয়া মুরারি ঘরে ঢুকিয়া কহিল, "বোঠান, থিয়েটার দেখতে গেলে না যে?"

জেঠা মহাশয়ের পীড়া উপলক্ষে উমাকে সর্ব্বদাই মুরারির সঙ্গ লইতে হইয়াছে, এখনও হয়। প্রয়োজনীয় কথা না কহিলেও চলে না; সতীনাথের কাছে সাহায্য চাওয়া অপেক্ষা মুরারির কাছে চাওয়া তাহার পক্ষে সহজ, তাই সে বাধ্য হইয়া অনেক সময় তাহার সহিত কথাও কহিয়াছে। উমার সংযত ব্যবহারে মুরারিও মনে মনে তাহার প্রতি সম্ভ্রম অনুভব করিয়া থাকে। এইরূপে তাহার গোপন মোহের ভাবটাও যেন অল্পে অল্পে কাটিয়া, ক্রমে ভগিনীস্নেহ জাগাইয়া তুলিয়া মনটাকেও শান্ত করিয়া আনিতেছিল। এমন সময় উমার চোখের জলে সতীনাথের প্রতি তাহার গোপন মনোভাবের প্রকৃত সংবাদটি অকস্মাৎ ব্যক্ত হইয়া পড়ায়, তখনই তাহার সহজ স্বচ্ছন্দতা দূর হইয়া, আবার পূর্ব্ব মোহ ফিরিয়া আসিল।

অসময়ে অকস্মাৎ মুরারির আবির্ভাবে উমা একটু বিরক্ত হইল। পিসিমা ও সুধীর বাড়ী নাই, দাসীরা নীচে, সকল খবর জানিয়াও মুরারি মূঢ়ের মত উমার সম্বন্ধে এরূপ ব্যবহার করে কেন? হয়ত একদিন তাহার এই অকপট বন্ধুত্ব অকারণে উমার পক্ষে একটা জঘন্য অপরাধ বলিয়াই গণ্য হইবে। মনের বিরক্তি ভাবটা মুখে ফুটিতে না দিয়া, সে সাজা পাণগুলা অকারণ নাড়াচাড়া করিয়া কহিল, "ইচ্ছে হল না।"

মুরারি একটুখানি হাসিয়া, অনেকখানি কাসিয়া গলা সাফ ও বক্তব্যটাকে সহজ করিয়া লইয়া কহিল, "বোঠান রাগ কোর না, একটা কথা বলি, তুমি যে অভিমান করে থিয়েটার দেখতে গেলে না, এতে দিব্যি হাসিমুখে চলে গেলেন দেখলাম। যেখানে অভিমান করতে যাওয়ার মানে অপমান হওয়া, সেখানে এ বিড়ম্বনা ভোগ কেন?"—কথা শেষ করিয়া উত্তরের প্রত্যাশায় মুরারি তীব্র দৃষ্টিতে উমার আরক্ত নতমুখের পানে চাহিল।

মুরারির আরোপিত অপবাদ যে মিথ্যা, সে কথা প্রমাণ করিবার উমার কোন উপায়ই নাই। নিজের অবস্থা মুরারির চেয়ে সে ভালই জানে, তবু এই অতর্কিত আঘাতে তাহার নারীমর্য্যাদা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। স্বামী ভালবাসেন না ইহা সহ্য হয়, কিন্তু সেই উপলক্ষে অন্যের মুখে সহানুভূতিবাক্য, সে যে একান্তই অসহ্য।

উমার মুখ কাণ লাল হইয়া উঠিল, ক্ষোভে চোখেও বুঝি তাহার জল আসিয়া পড়িয়াছিল। সে উত্তর না দিয়া, কায ফেলিয়া, সাজা পাণগুলা একপাশে সরাইয়া রাখিয়াই সহসা ঘর ছাড়িয়া যাইবার জন্য মুরারির উদ্দেশে কহিল, "দোর ছাড়ুন জেঠামশায়কে খাবার দেব।"

মুরারি তাহার প্রশ্নের উত্তর না পাইয়াও ক্ষুণ্ণ হইল না—সে আজ কোনমতেই দমিবে না। যে কথা বলিবার জন্য মন তাহার বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল, সে কথা সে আজ নিঃশেষেই বলিয়া লইবে। দয়ামায়ার দিন ফুরাইয়া গিয়াছে। কিসের মমতা তাহার 'পরে? কেহ কখনও এমন দয়া করিয়াছিল কি? উমার মুখ চাহিয়া এই দীর্ঘকাল সে যে মনের সহিত সংগ্রাম করিয়া ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, আজ তাহার হিসাব নিকাশের দিন, সে আজ স্থির সংকল্প করিয়াছে—মরিবে অথবা মারিবে। যে সতীনাথ তাহার জীবনের সুখ ফুরাইয়া দিল, জন্মের সঙ্গেই শত্রুতা সাধিয়া আসিল, তাহাকেও সে সুখী হইতে দিবে না। সে দুষ্টগ্রহ, নিজে জ্বলিয়াও তাহাকে জ্বালাইবে, আজন্মের শত্রুতার শোধ তুলিবে। সাধুপুরুষ কেমন করিয়া ধার্ম্মিকের ভানে আজ স্ত্রীর মনে শ্রদ্ধার সিংহাসন অটল রাখেন, দেখিয়া লইবে।

বছরের ব্যবধানেও কাটিল না, জেঠামহাশয়ের মৃত্যুপথ চাহিয়াই যখন মিলনের দিন গণিয়া কাটাইতেছে, কে জানে হয়ত উভয়ের মধ্যে পত্রচালাচালিও হইয়া থাকে—হয়ত তাহাকে ধৈর্য্য ধরিবার পরামর্শ দিয়াই রাখিয়াছে। মাঝে হইতে বিবাহের মন্ত্র পড়িয়া উমাকে সে দখল করিয়া রাখিল কেন? রুদ্রকান্তের বৈমাত্রেয় ভ্রাতুষ্পুত্র যদি উমার স্বামী হইতে পারে, তবে মাতুলপৌত্র কেনই বা সে অধিকার রাখিতে না পারিত? যে মুরারি আজ উমার কাছে তুচ্ছ অনাদৃত মাটির ঢেলা,-সেই মুরারি যে একদিন তাহার মাথার মণি হইতে পারিত। শুধু বিষয় নয়—রুদ্রকান্তের স্নেহ নয়—তাহার সর্ব্বস্বই যে সতীনাথ অপহরণ করিয়াছে, তাহাকে পথের ভিখারী করিয়া দিয়াছে!

সতীনাথের শন্তিসুখ নষ্ট করিতে গিয়া সে যে আজ অজ্ঞাতে উমার হৃদয়েও এত বড় আঘাত দিতে বসিয়াছে, সে কথা মনের উত্তেজনায় যেন তাহার মনেও পড়িল না। ঈর্ষার তাড়নায় সতীনাথের ক্ষতির তুলনায় উমার হৃদয়-বেদনাও আজ তাহার কাছে খাটো হইয়া গিয়াছে। এতদিন তাহারই মুখ চাহিয়া সতীনাথের গোপন রহস্য সে গোপন করিয়া আসিয়াছে। আজ আর তাহা করিবে না। কেন করিবে? পাষাণী উমা দেখুক, তাহার স্বামী কি। সে তাহার প্রণয়িনীর ছবি বুকে ধরিয়া, কেবল জেঠামহাশয়ের মহাপ্রস্থানের দিন গণিতেছে। সে উমার স্বামী, কিন্তু কল্যাণীর প্রেমাস্পদ এবং ভবিষ্যৎ স্বামী। সেইটা উমা একবার বুঝিয়া, জীবন ধন্য করিয়া লউক। মুরারি যতই মন্দ হউক, তবু সে কাহারও মরণ টাকিয়া বসিয়া নাই;—নিজেকে সাধুতার আবরণে আবৃত করিয়া লোকচক্ষে শ্রদ্ধেয় হইতে চাহে না। সে যাহা, তাহা ডাকিয়া হাঁকিয়া প্রকাশ করিবার সাধ্যও সে রাখে।

উমাকে সত্যই প্রস্থানোন্নত দেখিয়া মুরারি জোর করিয়া দরজা চাপিয়া দাঁড়াইল। বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া কহিল, "সতীদার টান যে কোথায়, তাও সেদিন হুগলী গিয়ে দেখে এলাম যে। তোমাদেরই বাড়ীর পাশে তাঁরা রয়েছেন। কল্যাণী কুড়ি বছরের বুড়ী, এখনও সে থুবড়ো হয়ে রয়েচে। কেন জান? ঐ ওঁরই আশায়। জেঠা মশায় একবার সরলেই হয়, তার পর সে যখন এবাড়ীর গিন্নী হয়ে আসবে, তখন বোলো মুরারির কথা সত্যি কি না।"

উমা এই অতর্কিত অপ্রত্যাশিত আক্রমণে, চলিয়া যাইবার কথা ভুলিয়া গিয়া বিস্ময়-বিমূঢ়ভাবে সেইখানেই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কল্যাণীর পরিচয় তাহারও এখন অজ্ঞাত নাই। দিদির চিঠিতে সে আজকাল তাহার অনেক সংবাদই পাইয়া থাকে। প্রত্যাখ্যাত প্রেমে ভগ্নহৃদয়ে সে যে চিরকুমারী থাকিবার সংকল্প করিয়াছে, এ সব খবরও সে জানে। কাল্পনিক ক্রোধে কল্যাণীর প্রতি দিদির পক্ষপাতিতার ছল ধরিয়া সে কত দিন চিঠিতে তাঁহার সহিত কলহও করিয়া থাকে। অথচ দিদির চিঠি পড়িয়া সেই অপরিচিতা প্রতিদ্বন্দ্বিনীর জন্য সমবেদনায় অঞ্চলে অশ্রু মুছিতেও তাহার বাধে না।

উমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মুরারি পুনরায় আরম্ভ করিল, "তবে সব কথা তোমায় খুলে বলি শোন। শুনে, যা ভাল বোঝ কোর। আমার কি আমি বলে খালাস,—এর পর আমায় দুষো না, যে মুরারি সব জান্‌ত তবু বলে নি। ঐ যে ১৭ নম্বর বাড়ী-খানা তোমার ঘর থেকে বেশ ভালই দেখা যায়। ঐ বাড়ীতে এক বিধবা তারাসুন্দরী মেয়ে নিয়ে থাক্‌তেন। মস্ত মেয়ে, পাশের পড়া পড়ত। বাবুর সঙ্গে কেমন করে ভাবসাব হলো তা তাঁরাই জানেন। বাবু আশা দিলেন, তাকে বিয়ে করবেন। কর্ত্তাবাবু শুনে মহাখাপ্পা, কুলীনের ছেলের অঘরে বিয়ে—সর্ব্বনাশ তা হতে পারে না! মাগী এই সব দেখেশুনে ভেবড়ে গিয়ে, মেয়ে নিয়ে দে চম্পট,—শেষে কি একটা কেলেঙ্কারী দাঁড়াবে! বাবু অতশত বুঝলেন না, একেবারে রাগে রাঙা হয়ে, তাদের সাজা দেবার জন্যে, দায় ঠ্যালা গলগ্রহ তোমায় করেচেন। পছন্দ করেও নয় কিছুই নয়। এখন রাগ পড়ে গ্যাছে, মন এখন সেই বনপানে! তাদের আশাও

দিয়েছেন ; পরে যা ঘটবে তা আমিও জানি, তিনিও জানেন। এখন কেবল যে খেলনাটা কিনেচেন, বোধ হয় সুখ হয়েচে একবার সেটা পরখ করে—”

উমা সহসা আহতভাবে দুই পা পিছাইয়া, বাহিরের দিকে হাত বাড়াইয়া আদেশব্যঞ্জক দৃঢ়তাপূর্ণস্বরে কহিল “যাও—”

সূর্য্য ডুবিয়া বাহিরের আলো ম্লান হইয়া আসিয়াছে। ঘরের ভিতরেও অন্ধকার ত্বরিত পদে আপনার স্থান অধিকার করিতেছিল। ঘরের লোক দুই জনের আত্ম-বিস্মৃতিতে তাহা এতক্ষণ লক্ষিত হয় নাই। সিঁড়িতে জুতার শব্দ উঠিয়া কখন যে তাহা দরজার কাছে আসিয়া মিলাইয়াছিল, তাহাও বুঝিবার মত মনের অবস্থা সেখান-কার দুইজনের একজনেরও তখন ছিল না। সতীনাথ দরজার কাছে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া, পরমুহূর্ত্তে নীরবে নিজের গন্তব্য পথে ফিরিয়া চলিয়া গেল। সংজ্ঞাপ্রাপ্ত মুরারি উমার দিকে না চাহিয়াই, দ্রুতপদে ঝড়ের মত নীচে নামিয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ঘরে ও বাইরে।

তখন সেই প্রায়ান্ধকার কক্ষে মর্ম্মর মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া সহসা অসহ্য বেদনায় উমা দুই হাতে মুখ ঢাকিল। কাঁদিতে চাহিলেও, চোখ দিয়া তাহার এককোঁটাও জল পড়িল না। অন্তরের অগ্নির উত্তাপে অশ্রুজল যেন বাষ্প হইয়া উড়িয়া গিয়াছিল, তাই ধরণীর শুষ্কবক্ষে এককোঁটাও ঝরিয়া পড়িল না।

আজ প্রথম উমার মনে হইল, সত্যই সে দুর্ভাগিনী। স্বামীপ্রেমে বঞ্চিতা অনাদৃতা, তবুও এতদিন সে নিজেকে দুর্ভাগিনী বলিয়া স্বীকার করিত না। আজ সে অবস্থার কিসে যে এমন পরিবর্ত্তন ঘটাইল, তাহা স্পষ্ট না বুঝিলেও, মনে হইল তাহা ঘটিয়া গিয়াছে। কি যে তাহার ছিল আর কিই বা গেল, তাহা অন্যের দৃষ্টিতে ধরা না পড়িলেও, উমার মনে হইল, তাহার সবই ছিল। যে

আজ সেই অমূল্য নিধি বিশ্বাস হারাইয়া সত্যই সে জগ-তের অনুকম্পা ও ঘৃণার পাত্রী, ভিখারিণীরও অধম হইয়া গিয়াছে। স্বামী ভালবাসেন না, গ্রাহ্য করেন না, ইহা যদি সহিয়াছিল, তবে তিনি অন্যাসক্ত ইহা যে কেন সহিবে না একথা সে বুঝিতে অসমর্থ। তবু তাহার কেবলই-মনে হইতেছিল, মরণে সে যদি আজ তাঁহাকে মুক্তি দিতে পারিত! লোকের কথা কাণে না তুলিয়া, যাঁহাকে বিশ্বাসের সপ্তস্বর্গে বসাইয়া সে যথেষ্ট তৃপ্ত হয় নাই—নিজেকে যাঁহার দাসীত্বেরও অযোগ্য মনে করিয়াছে—সেই স্বামী এই! সত্যই তিনি তাহাকে জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছা করিয়া দাসীপদ দিয়াই আনিয়াছেন, সে তাঁহার সহধর্ম্মিণী, সুখদুঃখভাগিনী জীবনমরণের সঙ্গিনী নয়। বাহিরে লোকের কাছে সে তাঁহার স্ত্রী,—অন্তরে তাঁহার প্রণয়িণীর প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের ঈর্ষার অস্ত্র! সে প্রয়োজনও এখন ফুরাইয়াছে। এখন সে তাঁহার গলগ্রহ, বন্ধনরজ্জু, জীবন-পথের বিষম বিড়ম্বনা। তবু আপাদ মস্তক বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়াও সারাজীবন মরণের প্রতীক্ষায় তাহাকে এই ঘরের মাটী আঁকড়িয়াই পড়িয়া থাকিতে হইবে। কোন উপায় নাই, মরণ ছাড়া তাহার আর কোন উপায় নাই! মনে হইল তাহার কর্ত্তব্য, দায়িত্ব, এখানকার সম্বন্ধ—সমস্তই যেন সেই মুহূর্ত্তেই ফুরাইয়া গিয়াছে, সে এখান-কার অনাবশ্যক ভারমাত্র। তাহার সব বন্ধন টুটিয়া গিয়াছে, কোন কর্ম্ম নাই, আজ সে সম্পূর্ণরূপেই স্বাধীন, তবু এ স্বাধীনতায় মুক্তির আনন্দ ছিল না। সর্ব্বহারা সন্ন্যাসীর মতই এ বন্ধন, হীন শ্মশানবৈরাগ্যের স্বাধীনতা।

পিসিমার অনুপস্থিতিতে হরে’র মা ভাঁড়ারের জিনিষ বাহির করিবার জন্য বারবার তাগিদ দিয়া, অবশেষে চাবি লইয়া নিজেই বাহির করিয়া দিল। ঘরে সন্ধ্যার দীপ জ্বালা হয় নাই। রাস্তার ধারের ফুল-ভারাক্রান্ত কৃষ্ণচূড়ার শাখাটা বারান্দা ছাড়াইয়া জানা-লার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। চন্দ্রালোকে কক্ষগাত্রে তাহারই আন্দোলিত শাখার ছায়া পড়িয়া ছায়াছবির

মত বাতাসে দুলিতেছিল। উমা অপলকনেত্রে সেই দিকেই চাহিয়া রহিল; সে উঠিলও না, নড়িলও না।

রুদ্রকান্তের আহার্য্য লইয়া অপর লোকে তাঁহাকে আহার করাইতে গেল। তাঁহার মনটাও আজ শূন্য বোধ হইতেছিল, তবু প্রশ্ন করিলেন না। মনে করিলেন, হয়ত এখনও উমা বাড়ী ফেরে নাই, ফিরিলে নিশ্চয়ই এতক্ষণ কাছে আসিত; হাজার ক্লান্ত হইলেও সে তাঁহাকে একবার না দেখিয়া কখনই শুইতে যাইবে না।

পিসিমা ফিরিয়া আসিলেন। বাহিরে সুধীরের দ্রুতধাবমান পদশব্দ ও কণ্ঠস্বর শোনা গেল। রুদ্রকান্তের প্রত্যাশাপূর্ণ নেত্র বারবার দরজার দিকে ফিরিতেছিল। কৈ সে ত আসিল না! উমাকে না দেখিয়া সতীনাথও মনে মনে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। হইল কি?

নফর ঔষধের গ্লাস লইয়া কাছে আসিতেই রুদ্রকান্ত কহিলেন; "মা বুঝি শুয়েচেন? আহা, অনিয়ম পরিশ্রম দেহে আর কত সয়!"

নফর কর্ত্তাবাবুর মন বুঝিত, তাই প্রয়োজন বোধে কথাটা উমার শ্রুতিগোচর করিবার জন্য মোহিনীকে দিয়া বলিয়া পাঠাইল। শুনিয়া উমা চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। কাঠের পুতুলের মুখে যেমন ভাব দেখা যায় না, তাহার মুখেও তেমনি কোনও ভাব প্রকাশ পাইল না। মোহিনী স্মরণ করাইয়া দিল যে বৈকাল ক্রমে রাত্রে পৌঁছিয়াছে, এবং শীতের রাত্রে পাথরের মেঝে বড় বেশী আরামপ্রদও নহে।

উমা উঠিয়া নিজের ঘরে গিয়া এইবার দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। তাহার শরীর ভাল নাই, সে বিশ্রাম চায়।

মোহিনী নীচে গিয়া পিসিমার মহাভারতের ব্যাখায় দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণোদ্দেশে লজ্জানিবারণ কেমন করিয়া বস্ত্রের স্তূপ যোগাইয়াছিলেন, তাহারই অদ্ভুত বিস্তৃত ব্যাখ্যা শ্রবণে বিস্মিতচিত্ত শ্রোতৃ ও শ্রোত্রীবর্গের বিস্ময় রসে বাধা জন্মাইয়া চাপাসুরে কহিল, "আজ মাঠকরুণের কি একটা নিশ্চয়ই হয়েচেন। কর্ত্তা বাবু মা মা করে এত যে হেদ্দুতে নেগেচে, তা একবার তিন্দীমানা মাড়ালওনি। ঘরে আলো দিতে মানা কল্লে—বাবু ছিয়েচারে নে গেলেনি বলে রাগ হয়েচেন বা—"

পিসিমা শ্রোতাদের কৌতূহল অসমাপ্ত রাখিয়াই বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন, "যা যা সব সন্ধ্যেবেলাটা জটলা করে আহ্নিক নষ্ট করে দিলি। দীনান্তে যে একবার দীনবন্ধুর নাম নেব তারও ত একটু ফুরসুৎ নেই।"—তিনি যে তাহাদের উৎসাহ দিয়া কায ছাড়াইয়া কাছে জড় করিয়াছিলেন, সে কথা এখন আর মনেও পড়িল না। মনে করিয়া দিবার সাহস অভিযুক্তদের কাহারও না থাকায়, তাহারাও ব্যস্তভাবে যে যাহার কাযে চলিয়া গেল।

সতীনাথ তাঁহাদের পৌঁছাইয়া দিয়া, দরোয়ান ও সরকারকে ফিরাইয়া আনিবার ভার দিয়া, নিজে সেই গাড়ীতেই ফিরিয়া আসিয়াছিল সে খবর পিসিমাও জানিতেন। মনে করিলেন, উমা থিয়েটার দেখিতে না যাওয়ায় তখন সময়াভাবে সতীনাথ তাহাকে কিছু বলিতে পায় নাই, তাই ফিরিয়া আসিয়া মনের রাগ মিটাইয়া হয়ত কতকগুলা 'ফৈজুৎ' করিয়াছে। আজ আর এ চিন্তায় বধূর উপর তাঁহার সহানুভূতি আসিল না। "আহাম্মুক মেয়ে, যা পাস তাই পুঁজি করে নে, তা নয়! মেয়ে মানুষের এত কেন? ব্যাটা ছেলে সোণার আংটী, তার আবার বাঁকা সোজা! সোয়ামী তু-করে ডাকলে উঠবি, তা নয়।"

রঙ্গমঞ্চের অভিনব দৃশ্যপট, অভিনেতা অভিনেত্রী-দিগের অস্বাভাবিক ভাবভঙ্গি এখনও তাঁহার চোখের উপর যেন নৃত্য করিয়া ঘুরিতেছিল। হিন্দী বুঝিতে না পারিলেও, চোখের তৃপ্তিতেই মন যেন ভরিয়া রহিয়াছে। উমা সাধ করিয়া এমন জিনিষ দেখিল না বলিয়া তাঁহার ক্ষোভের ব্যথা বিরক্তিতে পরিণত হইয়া উঠিতেছিল, মালা জপেও বিঘ্নের সীমা ছিল না।

বাহিরেও যে ঘন মেঘাড়ম্বরে জ্যোৎস্নার আলো ডুবাইয়া উমার অন্তরব্যাপী অন্ধকারের মতই দুর্য্যোগ নামিতেছিল সে তাহার সংবাদ জানিতে পারে নাই।

বাগানে গাছের শাখা দুলাইয়া বাতাস রুদ্ধদ্বার কক্ষে প্রবেশের বিফল চেষ্টায় গোঁ গোঁ শব্দে আর্ত্তচীৎকার তুলিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুৎ স্ফুরণে অন্ধকারের গাঢ়ত্ব বাড়াইয়া উমার আত্মগোপনেচ্ছু মুখখানার পানে চাহিয়া নিশীথিনী যেন উপহাসের হাসি হাসিতেছিল। এইবার ঝড়ের সঙ্গে আকাশ ভরা কালো মেঘে জলের ঝরণা ঝরাইয়া দিল। শীতকালের রাত্রে বৃষ্টির বাতাস হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিতেছিল।

অন্ধকার রাতে সকাল সকাল কায সারিয়া, অথবা ফেলিয়া রাখিয়াই, চাকর বাকরেরা লেপের আশ্রয় লইয়াছে। অনুপায় ভিন্ন এমন দিনে কেহ আর স্বেচ্ছায় বিছানা ছাড়িবে না। রোগীর ঘরে কেহ আছে কিনা, যাহারা আছে তাহাদের সজাগ চক্ষু চিমনীর আগুনের উজ্জ্বলতা অথবা জেঠ মহাশয়ের গাত্রাবরণের স্থানচ্যুতির সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে কি না, এই কথাটাই উমার বারবার মনে উঠিতেছিল। তবু মন তাঁহার অন্য দিনের মত প্রতিবিধানকল্পে ছুটিয়া বাহির হইতে চাহিল না।

মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়া নলের জল উঠানে আছড়াইয়া পড়িতেছিল। কোথাও টিনের উপর জল পড়িয়া ছড়-ছড় শব্দ তুলিয়াছে, মেঘের ডাকে ঝড়ের ও জলের শব্দে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ বিকাশে বাহিরে মহা প্রলয়ের সূচনা জাগাইয়া তুলিতেছে।

বাহিরে এ বিপ্লবের চেয়ে উমার অন্তরেও বড় কম বিপ্লব চলিতেছিল না। সে যেন বিশ্বের সহিত দেনা পাওনার চুক্তি মিটাইয়া আজ স্বাধীন রাজ্যের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখান হইতে পিছনে ফিরিয়া তাকাইবার আর তাহার প্রয়োজন নাই। বাহিরের ঘনঘটাময়ী অর্দ্ধনিশীথিনীর প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি তাহাকে ভীত করিতে পারে নাই। যে আশাহীন, তাহার ভয় ভাবনা কিসের? উমার আশা ফুরাইয়াছে, তাই তাহার ভয়ও নাই ভাবনাও নাই। প্রলয়ের ভেরী-

পথের যাত্রী হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল।

এমন দুর্য্যোগ রাত্রি আরও কতবার আসিয়াছে, ভয়ে সে ঘুমাইতে পারে নাই, সেজ জ্বালিয়া ঘরের সার্শী খড়খড়ি আঁটিয়া খাটের পাশে একা বসিয়া দুর্গানাম জপ করিয়াছে। বজ্র হাঁকিয়া গেলে সভয়ে নিজের অজ্ঞাতে শিশুর মত নিজের মাথায় হাত চাপা দিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহিয়াছে, তবু লজ্জায় পিসিমা বা দাসীদের কাছে সাহায্য চাহিতে অগ্রসর হয় নাই— নিজের অবহেলিত একাকীত্ব লোকচক্ষে প্রকাশ করিবার দীনতা স্বীকারে প্রবৃত্তি হয় নাই। মনটা যখন আশ্রয় খুঁজিবার জন্য ছুটিয়া বাহির হইতে চাহিত, অনুকম্পার লাঞ্ছনা কুড়াইবার ভয়ে পা দু'খানা অচল বদ্ধ জল-স্রোতের মত তখনও একস্থানেই বদ্ধ হইয়া থাকিত। মনে পড়িত, এমন রাত্রি সেখানে কতবার আসিয়াছিল, মার দুই পাশ অধিকার করিয়া দুই বোনে যখন সুখের শয্যা গ্রহণ করিত, মা'কে সে পাশ ফিরিতেও দিতনা, "মা তুমি খালি খালি দিদির দিকে ফিরচ" বলিয়া অনুযোগ করিয়া দিদির সহিত সাধের কলহ করিত, মেঘের ডাকে দুরুদুরু সভয় বক্ষে মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়াও তাঁহার স্পর্শসুখ-কণ্টকিত দেহে মনে করিত, এরাত্রি যদি শেষ না হয় বেশ হয়, মা কাযের ছুতায় উঠিয়া যাইতে পারিবেন না! স্নেহময়ীর সে স্নেহের স্পর্শটুকু এখনও সে তাহার কল্পনায় অনুভব করিয়া পুলকে পূর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু আজ যখন সেই সর্ব্বংসহা মাতৃক্রোড়, সে নিরাপদ প্রার্থিত আশ্রয় তাহার কাছে সুলভ হইয়া দেখা দিল, তখনই তাহার কামনার রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। হায় ভ্রমান্ধ মানব, তুমি শুধু মরীচিকায় ভ্রান্ত ও প্রতারিত। বাস্তবের সহিত তোমার সম্বন্ধ কোথায়? উমার মনে হইল, আজ মাতৃক্রোড়েও তাহার সান্ত্বনা নাই, এখন তাহার এক-মাত্র সুহৃৎ বন্ধু সেই অযাচিতের আশ্রয়দাতা, প্রার্থিতের দুর্লভ—মৃত্যু।

ক্রমশঃ

শ্রীইন্দিরা দেবী।

ভিখারিণী

[Eugene Manual]

যেখানে পথের ধারে শোভিছে শ্যামল
নব দূর্ব্বাদল,
চঞ্চল বসন্ত বায়ু পরশে আকুল
ঝরিছে বকুল,
তরুশাখে গাহে পাখী ; প্রভাতের বেলা
দেখিনু, একেলা
বালিকা দাঁড়ায়ে সেথা—অশ্রু-ছলছল
নয়ন যুগল।

অযতনে রুক্ষ কেশ, বদন মলিন,
আভরণহীন
দেহ খানি কোন মতে রাখিয়াছে ঘিরে'
শতচ্ছিন্ন চীরে।
পথিকে সম্ভাষি তার করুণ কাহিনী
কহে কাঙালিনী,
এত দুঃখদৈন্য, হায়, আছে ধরণীতে
কে চাহে জানিতে!

নগরের প্রান্তভাগে শীর্ণ নদীতীরে
পাতার কুটীরে
আছে পিতামাতা তার—রোগশয্যালীন
আজি বহুদিন ;
ছোট দুটি ভাই-বোন অতি অসহায়,
তাই নিরুপায়
হেথা সে এসেছে পথে—ভিক্ষা ছাড়া আর
গতি নাহি তার।

শুনি সে কাহিনী, কেহ দয়া করি তায়
ভিক্ষা দিয়ে যায় ;
কেহ বা চাহিয়া শুধু নয়নের কোণে
চলে অন্য মনে,
অমনি বালিকা মুছি অঞ্চলে নয়ন,
চঞ্চল চরণ
ফিরে যায়, পথপ্রান্তে যেথা ভূমিতল
শষ্পে সুকোমল।
মাতি নবমঞ্জরীর মদির সুবাসে
ভরা মধুমাসে
ছুটে' ছুটে' তুলি' ফুল, ছিঁড়ি কিশলয়
খেলে সে তন্ময়।
মুক্ত কলকণ্ঠ সম ধরি উচ্চতান
গেয়ে উঠে গান—
সে সঙ্গীতে প্রভাতের আলোক উচ্ছল
আনন্দ উজ্জ্বল।

সহসা স্বপন যেন টুটি' যায় তার—
অমনি আবার
ছেয়ে যায় মুখখানি বিষাদ তিমিরে,
ফিরে আসে ধীরে
ধুলিময় রাজপথে, সজল নয়নে
প্রতি পান্থজনে
কহিতে দুঃখের কথা যুড়ি দুটি কর—
আর্ত্ত কণ্ঠস্বর।

আসিল সে ম্লানমুখে যবে মোর পাশে,
অকরুণ ভাষে
আমি কহিলাম তারে, "বৃথা আকিঞ্চন!
আজি বহুক্ষণ
দেখেছি নীরবে, এই ভিক্ষা-অভিনয়
প্রবঞ্চনাময়।
ভুলিবনা শুনি তাই শিখানো কাহিনী
ওগো মায়াবিনী।

কোথা গেল উচ্ছ্বসিত সঙ্গীত লহরী ?
দুটি আঁখি ভরি'
কোথা হ'তে এল জল ? এই হীন ছল
কে শিখালে বল্ ।"

বালিকা কহিল ধীরে মোর পানে চাহি'—
"আমি গান গাহি
শুধুই আমার লাগি ; অপরের তরে
অশ্রুধারা ঝরে ।"

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ ।

ভারতবর্ষে শরীরচর্চ্চা

উপন্যাস ও ছোটগল্প-প্লাবিত বাঙ্গালা মাসিকের পৃষ্ঠায় এপ্রকার প্রবন্ধ নিতান্ত ভয়াবহ না হইলেও, পাঠকবর্গকে যে ইহা বিরক্তি প্রদান করিতে পারে তাহা সহজে অনুমেয়। কিন্তু এই জীবনীশক্তির উন্মেষের দিনে আমরা যে আর ইহাকে অবহেলা করিয়া চলিতে পারি না, তাহা অনেকেই উপলব্ধি করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় যে, দেশে মানসিকচর্চ্চার উন্নতির সহিত আমরা শরীরচর্চ্চাকে সম্মুখগামী করিতে পারিতেছি না। আজ আমরা জগতের নিকট একটী জাতি বলিয়া পরিচয় দিতে ব্যগ্র, পাশ্চাত্য দেশের জাতীয়তার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া আমরা উন্নতির চরম সোপানে উঠিতে মনোবাক্যে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু সেই পাশ্চাত্য-দেশেরই জাতীয়তার প্রবাদ ভুলিয়া গিয়াছি যে—"A nation is known of by athletes." আমরা যে শরীরের দিক দিয়া জাতীয়তার বহুদূরে পড়িয়া আছি তাহা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই।

ভারতবর্ষ পূর্ব্বে কি ছিল, সে অসার স্বপন দেখিয়া কায নাই ; কিন্তু অধুনা যে শারীরিক উন্নতির একান্ত প্রয়োজন তাহা নিঃসন্দেহ। ভিত্তি বাদ দিয়া প্রাসাদ নির্ম্মাণ করা যায় না, তেমনই শরীরের উন্নতি বাদ দিয়া আমরা কিছুতেই উন্নতি করিতে পারি না। আমাদের শারীরিক অবস্থা যে আশানুরূপ নহে তাহা ভারতবর্ষের ছাত্রসমাজের দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে। ভারতরক্ষী ফৌজে সর্ব্বশুদ্ধ ৯০০০ আবেদনপত্র গভর্মেণ্ট পাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে মাত্র ৩০০০ ব্যক্তি ফৌজে যোগদান করিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন। অর্থাৎ অবশিষ্ট ৬০০০ ছাত্র অথবা শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে, কেহ কেহ আপন আপন আবেদন প্রত্যাহার করিয়াছেন, এবং অবশিষ্টাংশ অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন। অনুপযুক্ত হওয়ার কারণ যে এই প্রায় ৬০০০ ব্যক্তির বুকের মাপ ৩৩" ইঞ্চি হইতেও কম এবং তাঁহারা দৈর্ঘ্যেও ৬' ফিট ৬" ইঞ্চির নিম্নে। এই ত আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষিত-সমাজের শারীরিক অবস্থার উদাহরণ ! অপরপক্ষে ইংলণ্ড, জার্ম্মানি প্রভৃতি পাশ্চাত্য-দেশে রোগী বালক ও বৃদ্ধ ব্যতীত প্রায় সকল পুরুষই সরকারী শারীরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। দূরের কথা যাক, ভারতবাসী ইংরাজ ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের (Civilians) সংখ্যা মাত্র ৯০,০০০ এই সম্প্রদায়ের রোগী বালক ও বৃদ্ধ ব্যতীত প্রায় প্রত্যেক পুরুষই সরকারী শারীরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতরক্ষী ফৌজে যোগদান করিয়াছে।

একটা জাতিতে পরিণত হইতে হইলে আমাদেরও যে সর্ব্বপ্রকারে অন্যান্য জাতির সহিত সম পাদবিক্ষেপে চলিতে হইবে তাহা প্রামাণিক সত্য। দেশের স্বাস্থ্য ভাল না হইলে আমরা শিক্ষায় উন্নততম দেশের সমকক্ষ হইতে পারি না ; এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে বঙ্গদেশ ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতেও অনেক পিছনে পড়িয়া আছে, শিক্ষা আমাদের অসমাপ্তই থাকিয়া

যাইতেছে। ইংলণ্ড স্বাধীন দেশ, তাহার সহিত ভারতবর্ষের তুলনা হইতে পারে না, কিন্তু শিক্ষার অন্যান্য বিভাগে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের আদর্শ কতকটা মানিয়া চলিলেও, শরীরচর্চ্চার আদর্শকে একেবারেই অগ্রাহ্য করিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে শরীরচর্চ্চার আদর খুবই কম, কারণ এখনও অনেক বাঙ্গালীর চক্ষে ব্যায়ামচর্চ্চা বৃথা কালক্ষয়কর সখ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, ফ্রান্স, সুইডেন প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে শরীরচর্চ্চা বহুলভাবে প্রচারিত, তাহার কারণ রাজশক্তির অনুগ্রহ ও দেশের লোকের ব্যগ্র ইচ্ছা। আমাদের দেশে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া বিশেষ শক্ত নয়, শুধু পাশ্চত্যদেশের লোকের মত ব্যগ্র ইচ্ছার অভাব। ইংলণ্ডে এমন সহর অথবা গ্রাম খুবই কম যেখানে সাধারণ ব্যায়ামাগার নাই। বিলাতী মিউনিসিপালিটিগুলি পর্য্যন্ত বহু সাধারণ ব্যায়ামাগার স্থাপন করিয়া দিয়াছে, তদ্ব্যতীত শত সহস্র বেসরকারী ব্যায়ামাগারে দেশ ছাইয়া গিয়াছে। আমরা এ দেশে না পাই মিউনিসিপালিটির সাহায্য, না পাই দেশের বড়লোকের পৃষ্ঠপোষকতা। ভারতবর্ষে কতকগুলি জানিত ব্যায়ামাগার আছে তাহা প্রায়ই মূর্খ ব্যবসাদার পালোয়ানদিগের দ্বারা পরিচালিত, ও তাহাদের উৎসাহেই তাহা জীবিত থাকে। জনসাধারণের, বিশেষ শিক্ষিত সমাজের হিতের জন্য দেশের প্রত্যেক স্থানে ব্যায়ামাগার স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজনীয় তাহা বলা বাহুল্য। এ বিষয়ে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার যতটা দরকার, ততটা অপর কাহারও নহে। দেশে দানশীল ব্যক্তির অভাব নাই, অভাব কেবল উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতার। Y. M. C. A-র ব্যায়ামাগারগুলি বিনা বাধায় চলে, কারণ সেগুলি সরকারী অনুগ্রহে সঞ্জীবিত।

ধনবান ব্যক্তিদিগের যেমন শিক্ষা বিস্তারকল্পে দান করা কর্ত্তব্য, তেমনই শারীরিক উন্নতির জন্য দান একটি অবশ্যকর্ত্তব্যের মধ্যে। এন্‌ড্রু কার্ণেগীর মত দানবীর ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে অনেকগুলি ব্যায়ামাগার স্থাপন করিয়া দিয়া শত সহস্রলোকের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। শরীরের বিষয়ে শিক্ষা ও চর্চ্চা অধুনা নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা রাজা এবং প্রজা উভয়ের সমবেত চেষ্টা ভিন্ন বিস্তার করা সম্ভব নয়।

ভারতবর্ষের পালোয়ানগণ যে এখনও অনেক খেলায় জগতের শীর্ষস্থানীয়, তাহা একাধিকবার প্রমাণিত হইয়াছে, কিন্তু তাহারা ব্যাবসাদার এবং সংখ্যায় মুষ্টিমেয়। অলিম্পিক (Olympic) ক্রীড়ার মত সার্ব্বভৌম ক্রীড়ার ব্যবস্থা আমাদের দেশে নাই এবং তাহা যে এখনও মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে তাহা অনেকেই জ্ঞাত নহেন। এই সার্ব্বভৌম খেলায় প্রতিযোগিতা করিবার জন্য সমস্ত স্বাধীনদেশের লোক কত ব্যগ্র, তাহা অনুসন্ধানকারী মাত্রেই জানেন। ১৯১১ সালের অলিম্পিক ক্রীড়ায় ইংলণ্ড এক ফুটবল এবং দৌড় (relay race) ব্যতীত কিছুতেই জিতিতে পারে নাই; অমনি দেশে রব উঠিল যে বৃটনজাতি বিলাসপরায়ণ হইয়া পড়িয়া অধঃপতনের দিকে যাইতেছে। ১৯১৫ সালের এই সার্ব্বভৌম ক্রীড়ার জন্য সারা দেশময় লোক জাগিয়া উঠিল এবং খেলোয়াড়দিগের শিক্ষার জন্য উন্মুক্ত হস্তে দান করিতে লাগিল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত ঐ ফণ্ডে ৫০০০ পাউণ্ড দান করেন এবং সার রতন টাটা, সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত প্রমুখ ভারতবাসীও তাহাতে চাঁদা দিয়াছিলেন। অপরদিকে জার্ম্মানীর প্রথমস্থান অধিকার করিবার জন্য বর্ত্তমান জার্ম্মান সম্রাট্ সরকারী সাহায্য ব্যতীত জর্ম্মান খেলোয়াড়দিগের শিক্ষা ও চর্চ্চার জন্য ৪০,০০০ পাউণ্ড দান করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বিশ্বগ্রাসী যুদ্ধের জন্য ১৯১৫ সালের বন্দোবস্ত সব পণ্ড হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা প্রভৃতি বৃটিশ উপনিবেশগুলি অলিম্পিক সার্ব্বভৌম খেলায় নিজেদের প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিল। য়ুরোপীয় শিক্ষিত সমাজও যে এই সার্ব্বভৌম ক্রীড়ায় যোগ দিয়া থাকেন তাহার প্রামাণ Relay race অক্সফোর্ড অণ্ডারগ্রাজুয়েট চারিজন দ্বারা বিজিত হইয়াছিল এবং নৌকাচালন (Sculling) প্রতি-

যোগিতা করিবার জন্য অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়েরই আটজন ছাত্র নির্ব্বাচিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে এক বরোদারাজ্যে রাজসরকার দ্বারা পরিচালিত ব্যায়ামাগার আছে। গায়কবার আপন রাজ্যে অনেকগুলি সাধারণ ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিজ বরোদায় ব্যায়ামাগারটিই সুবৃহৎ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এইসকল ব্যায়ামাগারগুলি উপযুক্ত শিক্ষকদিগের দ্বারা পরিচালিত; রাজসরকার হইতে নিযুক্ত ব্যায়ামাধ্যাপক শ্রীযুক্ত জ্ঞানকর রাও এই ব্যায়ামাগারগুলির অত্বাবধারক। এই ব্যায়ামাগার ব্যতীত বরোদা রাজসরকার "ব্যায়াম" নামক একখানি মাসিক পত্রিকা গুজরাটি ভাষায় মুদ্রিত করেন, শ্রীযুক্ত জ্ঞানকর রাও এই মাসিক পত্রখানির সম্পাদকতাও করেন। বোধ হয় ভারতবর্ষের আর কোন স্থানে ব্যায়ামচর্চ্চা শিক্ষিত সমাজের দ্বারা এরূপ আদৃত হয় নাই। পূর্ব্বের মত এখনও অনেক দেশীয় রাজা পালোয়ান প্রতিপালন করেন সত্য, কিন্তু তাহাতে জনসাধারণের বড় একটা লাভ হয় না। দাক্ষিণাত্যে জামখিণ্ডীরাজ গত দুই বৎসর হইতে তথায় এক সার্ব্বভৌম ক্রীড়ার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, কিন্তু ৩০ মাইল দৌড় ব্যতীত আর কোনও ক্রীড়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে, কারণ এদেশে অশিক্ষিতের মধ্যে অবৈতনিক (amateur) খেলোয়ার অত্যন্ত মুষ্টিমেয়। আশা করা যায় দাক্ষিণাত্যের এই সার্ব্বভৌম ক্রীড়ার সময়ে ভারতের সর্ব্বজাতি প্রতিযোগিতা করিবে।

বাঙ্গলা দেশ মাত্র একখানি মাসিক পত্রিকা স্বাস্থ্যালোচনা করিবার জন্য প্রকাশিত হয়। উক্ত মাসিক পত্রিকাখানির সহিত আমার নিকট-সম্পর্ক থাকাতে বলিতে পারি যে, পত্রিকাখানির প্রসার আশানুরূপ নহে এবং উপন্যাস-পাঠানুরাগী পাঠকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা পাইবার ইহার এখনও বিলম্ব আছে। যাহা হউক, ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র বসু "স্বাস্থ্যসমাচার" খানি প্রকাশ করিয়া অনেক উপকার সাধন করিয়াছেন।

হকি প্রভৃতির চর্চ্চা ত বহুলভাবে হইতেছে। মানিয়া লওয়া গেল যে দেশের প্রত্যেক বালক ও যুবক ফুটবল প্রভৃতি খেলায় যোগদান করে। কিন্তু যে দেশ হইতে এই সব খেলা আমদানি হইয়াছে, বাঙ্গলা দেশ এখনও সে দেশের Standardএ পৌছিতে পারে নাই তাহা নিঃসন্দেহ, তাহার কারণ ফুটবল, হকি প্রভৃতি খেলা ইংলণ্ডে ব্যায়ামচর্চ্চার বিশেষ বিভাগমাত্র, কিন্তু আমাদের দেশে তাহা খেলা মাত্র। এদেশে ফুটবল খেলোয়াড়ের সুপুষ্ট পেশীবহুল শরীর কদাচিৎ দেখা যায়, আর ইংলণ্ডের ব্যাবসাদার বা সৌখীন খেলোয়াড় মাত্রেরই শরীর ব্যায়ামচর্চ্চার ফলে সুগঠিত। আমাদের দেশে ফুটবল খেলিলেই অথবা "দম" করিবার জন্য কিছুদিন দৌড় অভ্যাস করিলেই হইল। কিন্তু ইংলণ্ডে, জগতের বৃহত্তম প্রতিযোগিতার খেলা Cup Tieএর খেলোয়াড়গণ দৌড়ান ও ফুটবল খেলা ভিন্ন সাঁতার, কুস্তী, বক্সিং স্কিপিং প্রভৃতি নিয়মিত অভ্যাস করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ব্যবসাদার খেলোয়াড়ও শেষ খেলা পর্য্যন্ত কোন প্রকার মাদকদ্রব্য, এমন কি সিগারেট পর্য্যন্ত, ব্যবহার করে না বা করিতে পায় না। এই কঠিন অভ্যাসের ফলে তাহাদের দেশে খেলার Standard অত্যন্ত উচ্চ এবং আমাদের দেশে খেলার আনুষঙ্গিক ক্রিয়াগুলির অভ্যাস না থাকায় খেলার কোন উচ্চ মাপকাঠি নাই, তদ্ব্যতীত খেলা পরিত্যাগের পর খেলোয়াড়ের শরীরে ব্যায়ামচর্চ্চার কোন চিহ্ন থাকে না।

ব্যায়ামচর্চ্চার বিশেষ কোন পদ্ধতি বা বিভাগ লইয়া আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। দেশের স্বাস্থ্য ভাল করিবার জন্য অনেকেই অনেকপ্রকার চেষ্টা করিতেছেন। সাধারণ ব্যামাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যায়ামচর্চ্চার উপায় করিয়া দেওয়া যে একান্ত কর্ত্তব্য তাহাই বুঝান আমার উদ্দেশ্য। শরীরচর্চ্চাকে দেশব্যাপী ও বিজ্ঞানসম্মত করিয়া তোলা শিক্ষিত সম্প্রদায়েরই কার্য্য। ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছাত্রদিগের শরীর সুপটু করিবার দিকেও বিশেষ লক্ষ্য

লয়গুলিও মানিয়া চলেন তাহার প্রমাণ যে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে সৈন্যবিভাগের শিক্ষিত ব্যায়ামাধ্যাপক নিযুক্ত আছেন। তথায় ছাত্রদিগকে মুষ্টিযুদ্ধ (Boxing) সাধারণ ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং সকল বিদ্যালয়েই ব্যায়ামচর্চা পরীক্ষা করিবার জন্য বৎসরে একদিন "বক্সিং ডে" বলিয়া নিরূপিত আছে। সেদিন সকল ছাত্রের উপস্থিতি এবং পরীক্ষায় যোগদান Compulsory। অপরন্তু আমাদের বিদ্যালয়গুলি শিক্ষাবিভাগের আইন কাটাইয়া চলিবার জন্য অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত 'ড্রিল শিক্ষক' অথবা ক্রীয়াতত্ত্বাবধায়ক সামান্য বেতনে নিযুক্ত করিয়াই অব্যাহতি পায়। অধুনা ইংলণ্ডে সেনাবিভাগে Inch, Pullun, Clarke প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যায়ামবিশেষজ্ঞের দ্বারা ব্যায়ামশিক্ষা দেওয়া হইতেছে। সাজাইয়া রাখিবার হিসাবে এদেশে সব বিদ্যালয়েই প্রায় একটি ছোটখাট ব্যায়ামাগার আছে, কিন্তু তাহা কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়, কারণ আগ্রহ এবং উপযুক্ত শিক্ষকতার অভাব।

বিলাতের Certificated Army Physical Culture Instructorগণের মত আমাদের দেশেও ব্যায়ামশিক্ষক-সম্প্রদায় গঠন করিয়া লওয়া একান্ত প্রয়োজন। অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত লোক অনেক পাওয়া যায়। এমন শিক্ষক প্রয়োজন যে শরীরতত্ত্বের খবর রাখে, যে প্রত্যেক ছাত্রের প্রয়োজন, বল এবং গঠনানুযায়ী ব্যায়ামশিক্ষা প্রদান করিতে পারে—এক কথায় ব্যায়ামশিক্ষা বৈজ্ঞানিক প্রথায় হওয়া দরকার। প্রত্যেক পল্লী, প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক নগরে ব্যায়ামাগার স্থাপিত হওয়া উচিত। সহজে জীবিকার্জ্জনের ইহাও এক উপায়, ইহা প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেওয়া উচিত।—দেশবাসীর শরীর পুষ্ট হইলে দেশে নূতন সজীবতা আসিবে, তখন আমরা সর্ব্বতোভাবে জগতের যে কোন জাতির সমকক্ষ হইতে পারিব।

শ্রীশচীন্দ্র মজুমদার।

যমুনা দর্শনে

কে তুমি বল না ওগো প্রবাহিনী
বহিছ আপনা ভুলি,
বুকের উপরে বুক-ভাঙা শত
বিষাদ-লহরী তুলি?
কেন হেন তব দেহখানি ক্ষীণ,
কিসের বিষাদে বদন মলিন?
কেঁদে কেঁদে তুমি ডাকিতেছ কারে
বল না মরম খুলি।

আমি জানি তুমি পরমা সাধিকা—
যোগিনী যমুনা তুমি,
শ্যাম দরশন আশায় বেড়িয়া
রয়েছ এ ব্রজভূমি।

গোপকুলবধূ সখীরা কোথায়?
কোথা রাধারাণী? কোথা শ্যামরায়,
বহিতে গো তুমি একদিন যাঁর
রাতুল চরণ চুমি?

পড়িবে না আর ব্রজে কি শ্যামের
কদম-হারের রেণু?
নন্দের গৃহ রবে কি আঁধার?
কাতরে কাঁদিবে ধেনু?
ডাক ডাক তুমি, ডাক অনিবার,—
হয়ত পূরাতে বাসনা তোমার
পুনঃ দেখা দিবে কালা বনমালী
করেতে মোহন বেণু।

শ্রীমনোরমা দেবী।

মৃত্যু-অভিসার

(গল্প)

সে বৎসর পূজার ছুটিতে দিল্লী আগ্রা প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া আসিয়া, মোগল-সাম্রাজ্যের ইতিহাস আলোচনা করিবার অত্যন্ত সখ হইল। সেই সঙ্গে বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে একজন ঐতিহাসিকরূপে অবতীর্ণ হইবার প্রবল দুরাশাও আমার মনে উপস্থিত হইয়াছিল। আপিসের পর বাড়ী আসিয়া জলযোগান্তে মোটা মোটা ইতিহাস-গ্রন্থ লইয়া বসিয়া যাইতাম। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতাম। মানুশী,বার্ণিয়ে হইতে আরম্ভ করিয়া ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ,যদু সরকার প্রভৃতির অনেক গ্রন্থই একে একে পাঠ করিয়া ফেলিলাম। আমার অধ্যয়নস্পৃহা দেখিয়া আত্মীয়-স্বজনগণ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, বলিতে লাগিলেন—"শেষে কি বুড়ো বয়সে একটা মাথার ব্যারাম বাধিয়ে বসবে!—ও সব ছাড়। যা রয় সয় তাই কর।" অবশেষে তাঁহারা আমার বহিগুলি কাড়িয়া লইয়া তালাচাবির মধ্যে বন্ধ করিয়া ফেলিলেন।

আমার ঐতিহাসিক হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা এইরূপে মধ্যপথেই শেষ হওয়াতে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলাম। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, এক রজনীতে একটি বড় অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করিলাম। এমন সুস্পষ্ট সুপরিস্ফুট স্বপ্ন জীবনে আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না।

স্বপ্ন দেখিলাম, যেন আমি বিংশ শতাব্দীর ইংরাজী শিক্ষিত বাবু নহি—যেন আমি অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন লোক। শাহ আলম বাদশাহ যেন দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট। আমি দেশভ্রমণ উদ্দেশে পশ্চিমের কোনও একটি সমৃদ্ধ নগরে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম, সেই সহরের প্রান্তভাগে ভূতপূর্ব্ব নবাব হেদায়েৎ আলির ভগ্ন রাজপ্রাসাদ আছে তাহা এখানকার দর্শনীয়। বহুকালের এক বৃদ্ধা—তাহার নাম খথ-বুড়ী,—সেখানে বাস করে—আর তথায় জনপ্রাণী নাই। শুনিয়া, সেই ভগ্নাবশেষ দেখিবার কৌতূহলে আমি যেন নগর-প্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

তথায় প্রকাণ্ড এক পুরাতন ভাঙ্গা বাড়ী। তাহার প্রাচীর ও দেওয়ালের ফাটলে এত অসংখ্য বৃক্ষলতা গজাইয়া উঠিয়াছে যে প্রথম দর্শনে মনে হয়, যেন ছোট এক স্তূপের উপর নিবিড় জঙ্গল। ভগ্ন প্রাচীর বেষ্টিত বহুবিস্তৃত অট্টালিকার অবশেষ। তাহার বালি চুণ কবে খসিয়া পড়িয়াছে, ইটগুলি শৈবালে আবৃত; বারান্দায় নামাল্-নামা মস্ত একটা অশ্বত্থগাছ। জানালা কপাট কোনওটি ঝুলিতেছে, কোনটি পড়িয়া গিয়াছে—তাহার উপর উই ঢিপি—তাহার উপর কোন্ এক জংলী গাছের শাদা শাদা ফুলগুলি সে নিবিড় ভয়ানক ভগ্ন-স্তূপ দেখিয়া যেন দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে। ইহার মধ্যে একটা কবর এবং নিকটে বসিবার স্থান। কবরের চারিধার ফুল দিয়া সাজান; আর তাহারই পার্শ্বে বসিয়া এক বৃদ্ধা রমণী।

বৃদ্ধার শরীর এত কৃশ যে তাহার পঞ্জরাস্থিগুলি পর্য্যন্ত গণনা করা যায়। দেহবর্ণ কালে যে খুব উজ্জ্বলই ছিল,বর্ত্তমানের রক্তহীন পীত আভাটুকুই তাহার প্রমাণ। চক্ষু দুইটি কোটরলীন, ভ্রূযুগল শুভ্র, ললাটে চিন্তা-কালিমা—সমস্ত মুখের ভাবটি যেন অনুজ্জ্বল একটি দীপ-শিখার মত স্থির এবং ম্লান। বৃদ্ধার পরিচ্ছদ মুসলমানী ধরণের। জীর্ণ শততালিযুক্ত একটি পাইচেদার পায়-জামা, গায়ে শেলুকা, মাথায় দোপাটা, পায়ে ছেঁড়া এক জোড়া পুরজার্ জুতী।

বৃদ্ধা আমায় হঠাৎ সেখানে দেখিয়া প্রথমটা যেন চমকিয়া উঠিল। ক্রমে তাহার মুখে বিরক্তি, তাহার পর ঔদাসীন্য এবং শেষে লজ্জার আভা ফুটিয়া উঠিল।

তখন অপরাহ্ণ কাল। বৃদ্ধা সেই কবরের নিকটস্থ

বেদীতে বসিয়া কি পড়িতেছিল। চারিপাশে মাছি ও মশার ভন্ ভন্ আওয়াজে স্থানটি আরও অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।

তাহাকে দেখিয়াই বুঝিলাম—এই সেই যখ্-বুড়ী। জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি কে গা—এখানে বসিয়াই বা থাক কেন?"—নিজের পরিচয় দিতে বৃদ্ধা যতই অস্বীকার করিতে লাগিল, আমারও কৌতূহল এবং বিস্ময় ততই গাঢ়তর হইতে লাগিল। আমি নাছোড়বান্দা —অনেক কষ্টে অনেক অনুনয় বিনয়ের পর, অবশেষে বৃদ্ধাকে তাহার আত্মপরিচয় দিতে সম্মত করিলাম। সে বলিতে লাগিল—

এই যে প্রকাণ্ড পতনোন্মুখ অট্টালিকা দেখিতেছ বাবু,—ইহাই ভূতপূর্ব্ব নবাব হেদায়েৎ আলির প্রাসাদ। আমি তাঁহার একমাত্র কন্যা আমিনৎ উন্নিসা খাতুন। যেখানে তুমি দাঁড়াইয়া আছ—এ স্থান ছিল বেগম মহলের অন্তঃপুরোদ্যান।

আজ এ বাড়ীতে সর্প বাদুড় ও অন্যান্য ঘৃণিত পশু পক্ষী ছাড়া আর কেহই নাই। মানুষ কেহই এখানে আসে না। মানুষই বল, আর প্রেতই বল, থাকি মাত্র আমি। আজ ষাটবৎসর আমি এইভাবে এখানে বসতি করিতেছি। কেন, জিজ্ঞাসা করিতেছ? কারণ, এই মাটীর মধ্যে আমার সর্ব্বস্ব পোঁতা আছে। আমি যখের মত কেবল সেই প্রোথিত গুপ্ত ধন রক্ষা করিতেছি।

যে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে একদিন কত শত কর্ম্মচারীর উমেদারী করিতে হইত—আজ সেখানে মানুষ আসিতে চাহে না, ভয় পায়। দিবা দ্বিপ্রহরেও শৃগালেরা চীৎকার করিয়া অতীত দিনের নকীব-বৈতালিকগণকে উপহাস করিতেছে; সর্প সরীসৃপাদি সেই ভূমিতে মৌরশী পাট্টা লইয়াছে। অপ্রতিহত নবাবীরও এই পরিণাম!

অধুনা-ভগ্ন এই বিরাট অট্টালিকার যখন সুখ-সৌন্দর্য্যের অন্ত ছিল না, সেই সময় ষাটবৎসর পূর্ব্বে ইহারই একটি কক্ষে জগতের আলোক প্রথমে আমার রন্ধ্রের সূতিকা গৃহ, বাল্যের ক্রীড়া নিকেতন, যৌবনের স্বপ্নলোক, বার্দ্ধক্যের বিশ্রাম-বেদী এবং প্রতীক্ষিত পরলোকের সিংহদ্বার। আমার আজন্মের হাসি গান এই বাতাসে মিশিয়াছে, গোপন কথা মনের ব্যথা এই আকাশে লীন হইয়াছে, চোখের জল বুকের রক্ত এই মাটি শুষিয়া লইয়াছে। আমারই মত গতযৌবনা হতশ্রী এই পুরীর পঞ্জরাস্থিগুলি কালচক্রের কালিমায় আজ আমারই মত ভয়ঙ্কর,—তাই আমি জীবন থাকিতে এ পুরীর মায়া ভুলিতে পারি না, পারিবও না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, নবাব হেদায়েৎ আলির আমিই এক মাত্র সন্তান। সুতরাং তাঁহার স্নেহাদরের অজস্র অফুরন্ত কুবেরকোষের আমিই একমাত্র অধিকারিণী ছিলাম। আমার নয়নপ্রান্তে অশ্রুলেখা দেখিলে পিতার মুখ অন্ধকার হইয়া যাইত, মাতার আহার নিদ্রা বন্ধ হইত।

ঈশ্বর সুপ্রসন্ন না হইলে কি নবাবের একমাত্র সন্তান হওয়া যায়? তাই আমার রূপও ছিল অসামান্য, বুদ্ধিও ছিল অসাধারণ। আমার শিক্ষক বৃদ্ধ মৌলভী তাঁহার মেহেদীরঙীন নিবিড় দীর্ঘ শ্মশ্রুরাশিতে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে বিনয়াবনত মস্তকে প্রায়ই স্বীকার করিতেন যে আমি ভগবানের একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি! দাসী বাঁদীগণও আমার ব্যবহার এবং স্বভাব-মাধুর্য্যের গুণগান করিয়া করিয়া অতি বাল্য বয়সেই আমায় শিখাইয়াছিল—দৃঢ় ধারণা জন্মাইয়াছিল—যে আমি সকলের হইতে বিভিন্ন এবং শ্রেষ্ঠ; আমারই সব, কিন্তু আমি কাহারও নহি; আমি যাহা করিব তাহাতে বাধা দিবার কেহ নাই।

দর্পণে যখন মুখ দেখিতে শিখিলাম, তখন আমার বয়স ত্রয়োদশ কিংবা চতুর্দ্দশ বর্ষ। সে যে কি দেখিতাম, আজ তোমায় আর তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব? আমি আমার দেহ ও রূপ লইয়াই দিন কাটাইতে লাগিলাম।

কবে ঠিক স্মরণ নাই, কি করিয়া আমার হঠাৎ

নহে—ইহার কে যেন একজন অংশীদার আছে। এ অতুল সম্পদ যেন অজ্ঞাত আর একজন কাহারও জন্য। এ রূপকোষ সেইজনকে না দিতে পারিলে যেন নিতান্তই ইহা ব্যর্থ নিষ্ফল এবং নিরর্থক!

মনে অমনি নানাপ্রকারের প্রশ্ন, তারার মত আলোক বিকীর্ণ করিয়া, ফুটিয়া উঠিল। কে সে? এ দেবভোগ্য আয়োজন উপচার ভোগ করিবে, কে সে ভাগ্যবান?

যখন একাকিনী প্রাসাদশীর্ষে পরিভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতাম, দিগন্তবিস্তৃত গগনসীমায় অস্তমান রবির সিন্দূর-রাগ-রক্তিম কর-তুলিকা সম্পাতে সমস্ত পশ্চিমাকাশখানি সুরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, যখন দেখিতাম কলকাকলি করিয়া বিহঙ্গমিথুনেরা ক্ষিপ্র-পক্ষে নিজ নিজ কুলায় অভিমুখে উড়িয়া চলিয়াছে, যখন দেখিতাম নিঃশব্দ স্তব্ধ রাজধানীর নিশীথ গৃহবাতায়নের ছিদ্রপথ হইতে ক্ষীণ আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হইতেছে, তখন আমার বক্ষের মধ্যে কেমন একটা নূতন বেদনা জাগিয়া উঠিত।

পৌর্ণমাসী নিশীথের কৌমুদী-ধৌত ধবল স্নিগ্ধ রজনীতেও আমার অন্তরে কি একটা অব্যক্ত নিগূঢ় ব্যথা যেন সাগরের মত ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিত। আমার মনে হইত—আমি যেন নিতান্ত একা! এই বিশাল রাজপুরী, এই ব্যস্ত জনস্রোত, এই বিপুল নগরী, পিতা মাতা আত্মীয় বন্ধু দাস দাসী সখী সাথী—আমার মানস-পট হইতে সব নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

ক্রমশ আমার দেহের আরও পরিবর্ত্তন ঘটিল। সর্ব্বাঙ্গ জুড়িয়া যৌবন ছড়াইয়া গড়াইয়া পড়িল। যৌবনেরও ভার আছে—সে ভারে পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা লতার মত আমি যেন অবনমিত হইয়া পড়িলাম। সতত মনে হইত, সুপক্ক কাবুলী দাড়িম্বের মত রস-প্রাচুর্য্যে এই বুঝি ফাটিয়া পড়িলাম।

আমি নবাবকন্যা; আমার এ রূপ দুর্লভ, আমার অনুগ্রহ কোনও মহাভাগ্যবানের লভ্য—এ অহঙ্কার জীবন-বল্লভের চরণতলে এই নারীজীবনের যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া ধন্য হইবার কামনা মানসচক্রবালের দিগন্তসীমায় অল্প অল্প করিয়া ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতে-ছিল।

এমন সময়ে হিন্দুস্থানের সেই অদ্বিতীয় সঙ্গীতাচার্য্য মেহের খাঁর নাম শুনিলাম। মেহের খাঁর মত সে সময় ভারতবর্ষে আর কেহই ছিল না। মেহের খাঁ, মেহের খাঁ—নাম শোন নাই? হাঁ হাঁ—দিল্লীর সেই স্বনামধন্য মেহের খাঁ!

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই বৃদ্ধা কেমন যেন অধীর হইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ নিশ্চল হইয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া থাকিয়া, সজোরে মুখ হইতে হাত সরাইয়া লইয়া আবার যখন তাহার কাহিনী আরম্ভ করিল—তখন তাহার কণ্ঠস্বর ভগ্ন, আর্দ্র এবং গম্ভীর। নবাবপুত্রী কহিতে লাগিল—

হাঁ, যাহা বলিতেছিলাম। সঙ্গীতে আমার পিতার অত্যন্ত আনুরক্তি ছিল। তিনি নিজে যে একজন খুব কলাবিৎ ছিলেন তাহা নহে, তবে তিনি আর সকল নবাব বাদশাহদের মত সঙ্গীতকে সখ্যের উপকরণ মনে করি-তেন না। তিনি এ বিদ্যাকে রাজ-সভায় আদরে আসন দিয়া অভ্যর্থনা করিতেন, শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিয়া পূজা করিতেন, এবং ইহার চর্চ্চাতে মুগ্ধ অভিভূত ও আত্মহারা হইতেন।

পিতা মেহের খাঁকে আনাইলেন; তাহার গানে নগরে এক নব উদ্দীপনা ছুটিল। সরকার হইতে উচ্চ বেতন দিয়া পিতা তাহাকে সঙ্গীতের অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন। প্রত্যহ সন্ধ্যায় নবাবকে মেহের গান শুনাইবে এবং রাজধানীর সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে সঙ্গীত-শিক্ষা দিবে—এই তাহার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইল।

মেহের খাঁর আগমনের দুই তিন মাস পরেই আমার

অত্যন্ত বিষণ্ণ বলিয়া মেহেরকে প্রাতেও আসিয়া গান শুনাইতে হইত।

আমি প্রত্যহ ছাদে উঠিয়া সেই স্বরঝঙ্কার শুনিতাম। নিত্যই মুগ্ধ হইতাম, একদিনের জন্যও শ্রান্তি বা বিরক্তি অনুভব করি নাই।

মনে মনে মেহের খাঁর আকৃতি আমি কল্পনা করিতে চেষ্টা করিতাম। যার গানে সন্ধ্যায় কামিনীর কুঁড়ি ফুটিয়া উঠে, যার এস্রাজে সুরের ফুলঝুরি খেলে, না জানি সে দেখিতে কেমন!

সখীদের সঙ্গে এ বিষয়ের প্রায়ই আলোচনা চলিত। একদিন এক সুরসিকা সখী বলিয়াছিল —"নবাবপুত্রী, আমি শুনিয়াছি, মেহের খাঁ দেখিতে ভারি কালো।"

আমি বলিলাম—"দূর!—তাও কি সম্ভব। যার অমন কণ্ঠস্বর, সে কি কখনও কুরূপ হইতে পারে?" সখী কহিল—"সুর্ম্মা কালো কিন্তু স্নিগ্ধ; সে নিজের কালিমা দিয়া মানবের চক্ষুকে সমধিক রমণীয় ও সুশ্রী করে। মেহের খাঁ কুৎসিত হইলেও, অন্তরের রূপবিকাশে সে যে অন্তরের সুর্ম্মা!"

আমি বলিলাম—"তোর উপমা রাখিয়া দে। মেহের খাঁ কালো, কোথায় শুনিলি তুই?"

অবশেষে সে স্বীকার করিল, ও কথা সে শুনে নাই —রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছিল মাত্র।—আমাকে রাগাইবার জন্য, আমার মন বুঝিবার জন্য, সে যে ও কথা বলিয়াছিল তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম।

ইহার অল্পদিন পরেই,মেহের খাঁর কাছে আমার গীত এবং এস্রাজ শিক্ষার প্রস্তাব করিয়া পিতা আমার মত চাহিয়া পাঠাইলেন। আশ্চর্য্যের কথা এই,যাহাকে দেখিবার জন্য অন্তরের অন্তস্তলে ব্যাকুল হইয়া ছিলাম,তাহার দর্শন সম্ভাবনায় অতিমাত্র বিব্রত হইয়া উঠিলাম। যেন মহামুস্কিলে পড়িয়া গেলাম। ভাবিতে লাগিলাম, কি জানি, যদি সেই সখীর কথাই সত্য হয়—সে যদি কালো কুৎসিতই হয়? তবে ত বড় দুঃখের কথা হইবে! তার

অবশেষে মত দিলাম বটে—কিন্তু মনটা বড় খারাপ রহিল!—এ কি করিলাম? তার গানের মত,তার সুরের মত যদি সে সুন্দর না হয়? তাহা হইলে কি করিব? সে দুঃখ কোথায় রাখিব?

আবার ভাবিলাম—সে রূপবানই হউক আর কুৎসিতই হউক, তাহাতে আমার কি? পিতা উহাকে দাম দিবেন—ও বিক্রেতা, ও সওদা দিবে—ব্যস্! এই তো ওর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ!! ওর রূপে আমার প্রয়োজন কি?—মনে মনে এইরূপ নানাবিধ তোলপাড় করিলেও—খট্‌কাটা কিছুতেই গেল না! আহা, মেহের খাঁ যদি সুন্দর ও সুপুরুষ হয়!

মেহেরকে দেখিবার জন্য আমার এত কেন উদ্বেগ —ইহার উত্তর কিছু খুঁজিয়া পাইতাম না! নিজের দেহের গোলকধাঁধাঁয় আমি নিজেই ঘুরিয়া ফিরিতেছিলম—নিষ্ক্রমণের পথ তখনও নয়নগোচর হয় নাই— বোধ হয় এই কারণ!

অবশেষে, মেহের একদিন আমার সম্মুখীন হইল। —তাহাকে দেখিলাম—দেখিয়া বাঁচিলাম। না না—সে কুৎসিত নয়, কালো নয়—সে সুন্দর ও যুবাপুরুষ।— কেবল, তাহাকে বড় লাজুক বলিয়া মনে হইল। পিতার আদেশক্রমে প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় মেহের আমায় গান ও এস্রাজ শিখাইতে লাগিল।

কাছাকাছি সাম্‌না-সাম্‌নি আমাদের দু'জনের বসিবার আসন ছিল। আমার শিক্ষার প্রথম অবস্থায় পিতাও নিয়মিত উপস্থিত থাকিতেন। লজ্জায় এবং সঙ্কোচে আমি সহজ ভাবে ওস্তাদজীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিতাম না—পিতা মধ্যস্থ হইয়া তাহার চমক ভাঙাইয়া কহিয়া দিতেন। ওস্তাদ আপনার ভাবে আপনিই সর্ব্বদা মশ্‌গুল থাকিত।

ছয় মাস কাটিল! রূপবান পুরুষ ত পৃথিবীতে অনেকই আছে, কিন্তু মেহেরের রূপের মধ্যে অতি মধুর, অতি সুন্দর, অতি করুণ একটা জ্যোতি দেখিতে

রূপ করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার আদব কায়দা, একটু এলোমেলো হইলেও তাহা উপভোগ্য। তাহার চরিত্র —নির্ম্মল, সরল ও সুকোমল। তাহার ব্যবহারে মার্জ্জিতরুচির ও ভাবপ্রবণতার পরিচয় পাওয়া যাইত। মেহের অদ্ভুত! সে বাস্তবিক সুন্দর!! সে নিজেই হাসে, নিজেই কাঁদে, কোনও দিকে তার খেয়াল থাকে না! শিখাইতে শিখাইতে নিজের সুরে নিজের বাজ্‌নাতেই সে উন্মত্ত হইয়া উঠে। আমি তাহা ধরিতে পারিতেছি কি না সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। সময় সময় আমার রাগ হইত, বিরক্তি হইত; ভাবিতাম, লোকটা ক্ষেপিয়া গেল নাকি?

শিক্ষকের এই ভাবোন্মাদনায় প্রথমে কৌতুক, শেষে একটা অব্যক্ত বেদনা অনুভব করিতে লাগিলাম। তাহার ভাবোন্মাদ অবশেষে আমার চিত্ত-দুয়ারে এক নূতন বাণী শুনাইল। মেহেরের গানের সুরে সে বাণী কেবলি আমার অন্তরমাঝে গুঞ্জরিয়া ফিরিত—

"আব' আগ' লাগি গ'য়ো
তেরা নজরিয়া!"

মেহেরকে আমার ভাল লাগিতে লাগিল। তাহার গুণে আমি মুগ্ধ এবং আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম।

আমার শিক্ষাও খুব দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিল। একদিনেই এক একটা রাগ রাগিণী আমি আদায় করিতে লাগিলাম। এস্রাজে হাত পূর্ব্বেই খুলিয়া গিয়াছিল। আমার শিক্ষাসাফল্যে আমার চেয়েও যেন আমার গুরুরই আনন্দ বেশী হইত! কতকগুলি গতে এবং কতকগুলি গীতে আমি গুরুকে এমনি অনুকরণ করিয়াছিলাম যে হঠাৎ কেহ ঠাওইতেই পারিত না—এ গুরু কি শিষ্য!

সঙ্গীতের একটা মাদকতা আছে। ইহার নেশা শিরাজীর চেয়েও বেশী। মেহের খাঁ সর্ব্বদাই সেই নেশায় চুর হইয়া থাকিত! ক্রমশ এ নেশা আমাকেও পাইয়া বসিল। মেহের চলিয়া যাইত, হয়ত ছড়ি্‌বা টপীটা নয় আর কিছু পড়িয়া থাকিত,—সে মাতালের জ্ঞানহারা মেহের কতদিন নবাব-নন্দিনীকে যে বিদায়-কুর্ণিশ না করিয়াই চলিয়া গিয়াছে—তাহারই কি কোন লেখাজোখা আছে? আমার নেশা যে—সে মাফ্‌ না চাহিতেই তাহার বেয়াদবী অত্যন্ত প্রফুল্লচিত্তে আমি মাফ্‌ করিতাম!

কতদিন শেখা বন্ধ রাখিয়া ওস্তাদের জীবনকাহিনী শুনিতাম! সে বলিতে চাহিত না—কিন্তু হুকুমে বলিত!

মেহের কথা খুব কম কহিত। যে কথা না বলিলে নয়—তাহাও শীঘ্র বলিতে চাহিত না। ঘাড় মাথা নাড়িলে যাহা চলিত, তাহা মেহের কথায় বলিত না।

তার কথা সে এমন কিছুই নয়! খুব সাধারণ রকমের সাদাসিধে কথা! বাল্যকালেই তার পিতা-মাতার মৃত্যু হয়। একজন ফকীর তাহাকে প্রতিপালন করেন। আজ কোনও মসজিদে, কাল কোনও সরাইয়ে, তার পরদিন কোনও তরুতলে কাটাইয়াই সে মানুষ হইয়াছিল! ফকীর বেশ ভাল গাহিতে পারিত। সেই মেহেরের প্রথম গুরু। মেহেরের বয়স যখন ১৫ কি ১৬ বৎসর, তখন সে ফকীরের পরলোক ঘটে। তাহার পর মেহের দিল্লীতে এক বড় ওস্তাদের বাড়ীতে ভৃত্যরূপে রহিল। সেই ওস্তাদ পুত্রনির্ব্বিশেষে মেহেরকে পালন করে, এবং গীত ও এস্রাজ প্রভৃতি রীতিমত শিক্ষা দেয়। পনের বৎসর একাদিক্রমে শিক্ষালাভ করিয়া মেহের শিক্ষা শেষ করিল। তাহার না ছিল বাড়ীঘর, না ছিল আত্মীয় স্বজন, না ছিল পুত্রপরিবার। সে বিবাহও করে নাই।

এই সহরেই তুমি তার অনেক কীর্ত্তিকথা শুনিতে পাইবে। মাসান্তে যেদিন মেহের বেতন পাইত, সেদিন তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া হাসি ও পুলক গড়াইয়া পড়িত। প্রথম প্রথম ইহা লক্ষ্য করিয়া অনেকে চাপা হাসিতে পরস্পর বিদ্রূপ বিনিময় করিত; কিন্তু পরে মেহেরের আনন্দের আসল কারণ যখন প্রকাশ পাইল, তখন সেই বিদ্রূপকারীরাই অবনত মস্তকে মেহেরকে

যেদিন বেতন পাইত, সেই দিন মেহের ছুটি লইত। মাসে একটি দিন মাত্র—নহিলে অসুস্থ হইলেও কখনও কামাই করিত না। সেদিন মেহেরের উৎসব—পর-মোৎসব। শেষ কপর্দ্দকটি পর্য্যন্ত ব্যয় করিয়া সহরের যত নিরন্ন গরীব দুঃখীদিগকে লইয়া সেদিন সে ভোজন-সমারোহ করিত।

সরকার হইতে কতবার তাহাকে ভাল ভাল পোষাক করাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহার সেই শতছিদ্র পুরাতন পোষাকটি আর ঘুচে নাই। রাজ-দত্ত নূতন পোষাক ঘর খুঁজিয়াও পাওয়া যাইত না। জিজ্ঞাসা করিলে সে কোনও উত্তর দিত না; বেশী পীড়াপীড়ি করিলে মুখখানি নত করিয়া থাকিত।

বৎসর দেড়েক কাটিল। মেহের যতই চুপ করিয়া থাকে, আমি তাহার সঙ্গে ততই প্রাগল্‌ভতা করি। আর তাহার কাছে আমার কোন সঙ্কোচই ছিল না। সে যে একজন অনাত্মীয় পুরুষ, আমি প্রাপ্ত-বয়স্কা যুবতী; সে যে একজন বেতনভোগী, আমি নবাব নন্দিনী—এ সকল বাধা আর রহিল না। সে নিতান্ত চুপ করিয়া থাকিত বলিয়া কখন-কখনও তাহার সঙ্গে হাসিতামাসা পর্য্যন্ত করিতে আমি আর কুণ্ঠা বোধ করিতাম না।

ইহা ভাল করিয়াছিলাম কি মন্দ করিয়াছিলাম—তাহা বলিতে পারি না, তবে যাহা ঘটিয়াছিল তাহাই তোমায় বলিব।

নিজের মনকে যে ঠিক করিয়া পরখ করিতে পারে না—সে অপরের মন বুঝিবে কি করিয়া? মেহের যে কি ভাবিত, আমার মুখে বুভুক্ষিত দৃষ্টির জাল ফেলিয়া সে যে কি পদার্থ তুলিত, এস্রাজ শিখাইবার সময় অকারণে আমার কর স্পর্শ করিয়া সে যে কি লাভ করিত—তাহা তখন ভালই বুঝিতাম এবং তাহাতে বিশেষ কৌতুকই অনুভব করিতাম। একে আমার বংশমর্য্যাদা, উচ্ছলিত যৌবন, লীলাচঞ্চল রূপরাশি আমার শিরা-উপশিরাগুলিতে পর্য্যন্ত আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছিল, তাহার উপর মেহেরের নীরব পূজার মধুর পঞ্জীটিও যখন আমারই ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন পুলকদর্পে আমি আত্মবিভোর হইয়া উঠিলাম। নবাব-কুমারীর যৌবন-সমারোহে তাহার এ যেন দেয় রাজস্ব; রাজার পদপ্রান্তে প্রজার এ যেন নজরানা! এ যেন দাসের কর্ত্তব্য; ভক্তের পূজা।

মেহেরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দানকে হতভাগিনী আমি এমন করিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম। যে আমার গুরু, যে আমাকে পৃথিবীর সব চেয়ে রমণীয় মনে করিত, যে আমার জন্য জগতের কঠিনতম পরীক্ষা দিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই—তাহাকে আমি যে ঘৃণা ও উপহাস করিয়াছি, তাহার কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে? ষাট বছরের অশ্রুতে তাহা ধৌত হয় নাই, এত পরিতাপেও তাহা দগ্ধ হয় নাই, এত অনুশোচনাতেও তাহার দাগ মুছে নাই!

ভাস্কর ও চিত্রকর তাহাদের ধ্যানের দেবতাকে রূপ দিয়া মূর্ত্ত করিতে পারে, কিন্তু গায়ক ও কবি তাহা পারে না বলিয়া কেবল বেদনাই নিবেদন করে। আমি তাহা তখন জানি নাই! আমি পাষাণী, আমার অন্তরে তাহার বেদনা বিদ্রূপেরই সৃষ্টি করিয়াছিল; তাহার পূজা আমার কাছে তোষামোদ বলিয়া মনে হইত। হায় নবাবজাদী, আজ কোথায় তোমার সেই রূপযৌবনের উন্মাদনা! কোথা বংশমর্য্যাদার অহঙ্কার!

যাক্ ওসব কথা—যাহা বলিতেছিলাম তাহা বলি। একদিন মেহের হঠাৎ অত্যন্ত বাচাল হইয়া উঠিল। সেদিন প্রথমটা তাহার ব্যবহারে আমি বিস্মিত হইয়া-ছিলাম। তাহার আনন্দ সেদিন গুলাব ফোয়ারার মত শতধারে ছুটিয়াছিল। সে যে কি বলিয়াছিল তাহা আজ ভাল স্মরণ নাই। কিন্তু সে কথা আর কখনও কাহারও কাছে তার পূর্ব্বে শুনি নাই।

সে এক নূতন কথা! সে দ্রাক্ষারস, সে তীব্র বিষ! সে কথা—বেদনার মত জ্বালাময়, অথচ চন্দনের মত সুখস্পর্শ। সে যে কি বলিয়াছিল আজ

তাহা কল্পনা করিতে পারি মাত্র, কিন্তু প্রকাশ করিতে পারি না।

মেহেরের পক্ষে এ কার্য্য খুবই বোধ হয় সহজ ছিল। সে স্বাভাবিক ভাবেই বলিয়াছিল। প্রকাশেই প্রতিভার আনন্দ! মেহের কি কম প্রতিভান্বিত? এই দেখ—আমি যে রূপগর্ব্বিতা নবাবপুত্রী, আমার মধ্যে এত দীনতা, এত নীচতা ছিল, তাহা কি কোনও নবাবপুত্র বা বাদশাহপুত্র আসিয়া দেখাইয়া দিতে পারিত? মেহের কতবড় প্রতিভাশালী! সে ষাঠ বছর ধরিয়া কেবল আমাকেই গড়িতেছে। আমার এস্রাজেই পর্দ্দা ঠিক করিতেছে, আমার কণ্ঠেই সুর যোজনা করিতেছে!

ক্রমে নবাব সাহেবের কর্ণগোচর হইল যে মেহের খাঁ নবাবদুহিতার পাণিপ্রার্থী। গৃহহীন ভিক্ষুকের স্পর্দ্ধা দেখিয়া নবাবের উষ্ণ রক্ত উষ্ণতর হইয়া উঠিল! নবাবজাদীও বাতুলের এই প্রলাপোক্তি শুনিয়া হাসিয়া অস্থির হইল। আমার পাণিপীড়ন করা কত কত আমীর ওমরাহের দুরাশা, নবাবপুত্রের স্বপ্ন, বাদশাজাদার আকাঙ্ক্ষা! আমাকে বাঞ্ছা করিয়া বসিল কি না—এক পথের ভিখারী! এ যে হাস্য*র ব্যাপার—অসম্ভব! বাতুলতা ব্যতীত আর কি?

আমার মেহেদী রঙীন চরণ নখরে কত কন্দর্পদর্প-হারী নবাবপুত্র আসিয়া নত নয়নে আত্মসমর্পণ করিবে—তা নয়, ছিন্নবসন জন্মদরিদ্র মেহের খাঁ!

মেহের খাঁকে পিতা খুবই ভালবাসিতেন। তাই, তাহার গোস্তাকীর অত্যন্ত লঘু দণ্ডই হইল। হুকুম হইল, তিনদিনের মধ্যে তাহাকে নগর পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাহার প্রাসাদ-প্রবেশ বন্ধ হইল।

দণ্ডের কথা প্রথম যখন শুনিলাম—ভাবিলাম এ শাস্তি শাস্তিই হয় নাই। এত বড় অপরাধের এই মাত্র শাস্তি?

কিন্তু মেহের চলিয়া যাওয়ার পর আমার মনের মধ্যে অকস্মাৎ একটা ব্যথার মেঘ ঘনাইয়া উঠিল। মনে হইল, নির্ব্বাসন যেন আমারই হইয়াছে! মেহেরের স্মৃতি যতই প্রফুল্ল হইতে চাই—মনটা ততই ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। পৃথিবীর সমস্ত সুখ বিস্বাদ হইয়া গেল—এ রূপ যৌবন জঞ্জাল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল! যেখানে ব্যথা, হাত সেইখানেই ফিরিতে লাগিল! কতবার মনে করি—আমি নবাবপুত্রী,—কে মেহের খাঁ? তার জন্য আমার কিসের ব্যথা? কিন্তু জোর করিলে সে যে আরও জোরে ধরিতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। পশ্চিম গগনে সারাদিনের দাহজ্বালা যখন পুঞ্জীভূত কেন্দ্রীভূত হইয়া প্রগাঢ় রক্তিম-আভায় তাহাকে রঞ্জিত করিয়া তুলিল, তখন মেহেরখাঁর স্মৃতিগুলি তপ্ত লৌহের মত আমার অন্তরে বিঁধিতে লাগিল। অনাকাঙ্ক্ষিত উপেক্ষিত মেহেরকে বড় আপনার, বড় মধুর, বড় প্রিয় মনে হইতে লাগিল। কিন্তু কোথায় মেহের?

চতুর্দ্দশী রজনীর অগাধ জ্যোৎস্না সমস্ত আকাশখানাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল। পৃথিবীটা একটা প্রকাণ্ড তপ্ত পাথরের মত মনে হইল! গুবাক্-তালী-খর্জ্জু-বীথির মাঝে পূর্ণচন্দ্রকে জীর্ণ চীরাম্বরালে শূন্য ভিক্ষার থালা বই আর কিছু ভাবিতে পারিতেছিলাম না—এমন সময় পিতা পিছন্ হইতে ডাকিলেন—আমিন্!

যতদূর সম্ভব আত্মগোপন করিয়া তাঁহার সঙ্গে গোলাপবনের পাশে পাশে, বকুল তরুর তলে তলে ঘুরিয়া বেড়াইলাম! সাদী হাফেজের কত কাব্য আলোচনা করিলাম; ইমন্ কল্যাণের মাধুর্য্য বিশ্লেষণ করিলাম—কিন্তু মনের কাঁটা ঘুচিল না!

রাত্রে ভাল ঘুম হইল না। হঠাৎ একটা স্বপ্ন দেখিয়া, ভয় পাইয়া জাগিয়া উঠিলাম! স্বপ্নটা অদ্ভুত। আমি যেন কোথায় গিয়াছি; কে যেন আমাকে কুর্ণিশ করে নাই বলিয়া আমার আজ্ঞায় তাহার শিরচ্ছেদ হইয়াছে। নরহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া রাজদরবারে যখন নীত হইলাম—তখন দেখি যে সে এক নূতন দেশ! সেখানে গানেই সব কায হয়। গানেই তাহারা কথাবার্ত্তা কহে! মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখি—বিচারক

মেহের—বাদ্‌শাহ! হুকুম দিল, "নির্ব্বোধ নারী, ছাড়িয়া দাও।"

আমি বিচারে মুগ্ধ হইয়া বলিলাম—"আমি শাস্তি চাই!" কিন্তু বাদ্‌শা আবার হুকুম দিল—"শাস্তি দিবার মালিক মানুষ নয়, পরমেশ্বর।"

ঘুম ভাঙ্গিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘাম ঝরিতেছিল। চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখি যে দেওয়ালের গায়ে এস্রাজ দু'টি জালায়নপথগত উষার বাতাসে মৃদু মৃদু দুলিতেছে। আর সেই কম্পনে তারে তারে গুঞ্জন উঠিতেছে!

রাত্রির অন্ধকারে চিন্তাগুলি মশকের মত সর্ব্বাঙ্গে দংশন করে, কিন্তু দিনে তাহারা অনেকটা অদৃশ্য হয়। তাই দিনটা কোনও মতে কাটিল।

আবার সন্ধ্যা আসিল। অন্তঃপুরোদ্যানের যেখানে আমি প্রতিদিন বসি, সেদিনও সেইখানে বসিয়া আছি! ফাল্গুনের পার্ব্বণবিধু পূর্ব্বাকাশের সুখস্বপ্নের মত বিপুল পুলকে হাসিয়া উঠিয়াছে—আমি অলস হইয়া বসিয়া আছি। হঠাৎ দেখি, মেহের আসিয়া উপস্থিত! এ কি?

আমার অন্তরলোকের পরীবালিকারা চকিত সুপ্তোত্থিতের মত রোমাঞ্চের বেদীতে দাঁড়াইয়া, অবহেলিত অপমানিত মেহেরকে সাদরে অভিবন্দনা করিয়া উঠিল। মন প্রাণ তাহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিল! তাহাকে দেখিয়াই আমার সকল গর্ব্ব পুলকাশ্রুতে গলিয়া পড়িল। তাহার পানে চাহিয়া শুধু বলিলাম—"প্রিয়তম।"

মেহের—সেই বিহ্বল ভাবোন্মত্ত মেহের! দুঃখ নাই, লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই! একেবারে স্বচ্ছন্দে আসিয়াই আমার পদপ্রান্তে তৃণের উপর বসিয়া পড়িল। আমি যে তাহাকে কি বলিব, কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না! হঠাৎ যেন আমার বাক্যরোধ হইয়া গেল।

পিতার আসিবার সম্ভাবনা। তিনি আসিয়া যদি এই দৃশ্য দেখেন, তবে হয়ত আমাদের উভয়েরই এখনি জীবলীলা শেষ হইয়া যাইবে। নিজের প্রাণের ও মানের উপর অত্যন্ত মমতা জন্মিল। ভয়ে আমার হাত পা কাঁপিতেছিল। আমি যেন কেমন হইয়া গেলাম্। মাথা ঘুরিতে লাগিল। মুখ দিয়া আর কোন কথা সরিল না—সমস্ত কণ্ঠনালী শুকাইয়া যেন মরুভূমি হইয়া গিয়াছে!

দুইদিন যাহার অদর্শনে আমি দুঃসহ যাতনা সহ্য করিয়াছি, তাহাকে বক্ষের অতি নিকটে পাইয়াও যে সমাদর করিতে পারিতেছি না, এটা যেমন সূচির মত আমায় বিঁধিতেছিল। সেই সঙ্গে মনে হইতেছিল, যেন শত শত গুপ্ত প্রহরী আকাশে বাতাসে ঘাসে লুকাইয়া আছে,—আমার বাকস্ফুরণ হইবামাত্র পিতাকে আনিয়া সে কথা তাহারা শুনাইয়া দিবে। আর তাহার ফল—জল্লাদের হস্তে অপমৃত্যু! চক্ষু তাই মেহেরের পানে না চাহিয়া, লুকানো চরের সন্ধানেই ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

মেহের কিন্তু সহজ সরল অবিকম্পিত কণ্ঠে সসম্মানে কুর্ণিস করিয়া কহিল—"শাহজাদী, আজ রাত্রেই তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের আমার শেষ রাত্রি! তাই যাইবার আগে তোমার কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি—"

—"লুকাও, লুকাও, শীঘ্র লুকাও—ঐ জালার মধ্যে—ঐ জালার মধ্যে—জালায়।"—বলিয়াই আমি তাহার কথা অসমাপ্ত রাখিয়া দিলাম।

অদূরে পিতা। আমার মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করিয়া উঠিল। মেহের তবু জিজ্ঞাসা করিল—"কেন? কি হইয়াছে কি?"

ভয়কম্পিত কণ্ঠে আদেশ করিলাম—"নবাব আসিতেছেন। আমায় যদি ভালবাস, আমায় কলঙ্ক হইতে রক্ষা কর। শীঘ্র তুমি ঐ জালার মধ্যে প্রবেশ কর। শব্দ করিও না।"

মেহের আর দ্বিরুক্তি করিল না। হুকুম তামিল করিতে তৎক্ষণাৎ জালার মধ্যে প্রবেশ করিল।

প্রকাণ্ড মানুষ সমান উঁচু তামার একটা জালা

অগ্নিহীন চুল্লীর উপরে রক্ষিত। উদ্যানমধ্যস্থ মাটির পথে ঘাস গজানো নিবারণ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তাহাতে জল গরম করিয়া ছিটান হইত। মেহের যেমন তাহাতে প্রবেশ করিল, অমনি নবাব আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তাঁহার মুখখানা বজ্রগর্ভ বর্ষণোন্মুখ মেঘরাশির মত। মালীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "জালায় জল আছে?"

"আছে, প্রভু।"

"এখনি চুল্লীতে অগ্নি জ্বালিয়া দে। গরম জল করিয়া উত্তর দিকের পথে ঢালিয়া দে।"

অকস্মাৎ কে যেন আমার বক্ষপঞ্জরে ছুরিকাঘাত করিল।

নবাবের হুকুম। তখনি জালার নিম্নে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। আমি দুই তিনবার ডাকিলাম—বাবা—বাবা—বাবা—

বাবা নিরুত্তর, গম্ভীর। লজ্জা যদি এড়াইলাম, তো ভয় আসিয়া গলা চাপিয়া ধরিল। কতবার মনে করিলাম, প্রকাশ যখন হইয়াই গিয়াছে, তখন বলিয়া ফেলি—মেহের রক্ষা পাউক।

কিন্তু বলা হইল না। টগ্‌ বগ্‌, শোঁ শোঁ শোঁ করিয়া—জালার মধ্যে জল ফুটিতে লাগিল। কৈ? মেহেরের তো কোন আর্ত্তনাদও শোনা গেল না!

তারপর, আর জানিনা। কে যেন আমার নাক টিপিয়া ধরিল—আমার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া গেল; আমি মাটিতে পড়িয়া গেলাম।

যখন চক্ষু খুলিলাম, দেখি হকিম বৈদ্য চিকিৎসকে আমায় ঘিরিয়া বসিয়া আছে, অমি আমার মহলে, পালঙ্কে শায়িত।

মূর্চ্ছার ঘোরেও শুনিয়াছি, জাগিয়াও শুনিতে লাগিলাম, মেহের যেন তাহার সেই প্রিয় গানটি গাহিতেছে—

আশ্‌কাঁ কুশ্‌ত্‌গাঁ মাশুক্ আন্দ্‌।
বড়্‌ নেয়ায়েদ্ যে কুশ্‌ত্‌গাঁ আওয়াজ॥

মনে আছে, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"ও গান গায় কেন?"

সকলেই বলিল—"কৈ, গান তো কেহ গায় নাই।"

কালস্রোতে সব ভাসিয়া গিয়াছে। নবাব, নবাব-বাড়ী, নবাবজাদী সব গিয়াছে! আছি শুধু আমি—নরহত্যার আসামী, নির্ব্বোধ নারী! পরমেশ্বর শাস্তি দিবেন!

এই সেই উদ্যান। যেখানে জালা ছিল, যেখানে মেহের আমার অনুরোধ বর্ণে বর্ণে পালন করিয়াছে, জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়াছে তবু শব্দটি করে নাই—সেই-খানে—ঠিক সেইখানে মৃত্তিকা নিম্নে দগ্ধাবশিষ্ট আমার জীবন মরণের গুরু, ইহ পরকালের পথপ্রদর্শক যথাসর্ব্বস্ব মেহের খাঁ অনন্ত নিদ্রায় শায়িত।

ওই শোন সে গাহিতেছে—

আশ্‌কাঁ কুশ্‌ত্‌গাঁ মাশুক্ আন্দ্‌।
বড়্‌ নেয়ায়েদ্ যে কুশ্‌তগাঁ আওয়াজ॥

তুমি শুনিতে পাইতেছ না বাবু?

* * * *

নিদ্রাভঙ্গে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া, এই আশ্চর্য্য স্বপ্নের কথা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম। নবাবজাদী নহে, একজন বাদশাহজাদী সম্বন্ধে এইরূপই একটি কাহিনী মোগল ইতিহাসের একখানি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে বটে। কিন্তু যে গ্রন্থে ইহা উল্লিখিত আছে, তাহাকে বর্ত্তমানকালের ঐতিহাসিকগণ আর প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করেন না—এবং এই কাহিনীও তাঁহারা অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

কিন্তু, কি অদ্ভুত স্বপ্ন!

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

নাসিক-পঞ্চবটী

যখন জি-আই-পি রেলওয়ের "নাসিক" ষ্টেশন ভবিষ্যতের তিমিরগর্ভে প্রচ্ছন্ন ছিল, ভারতবর্ষের কোথায় দণ্ডকারণ্য বা পঞ্চবটী অবস্থিত যখন সাধারণের নির্ণয় করিবার সহজ উপায় ছিল না, তখন রামায়ণের পাঠক পাঠিকাগণ ঐ নাম শুনিয়া মধ্যভারতে গোদাবরী নদীর উত্তরে বা দক্ষিণে কোন একটা স্থান কল্পনা করিয়া লইতেন। কালের বিচিত্র গতি, এখন রেল বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডকারণ্য দর্শন সুসাধ্য হইয়াছে।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের জব্বলপুর ষ্টেশন হইতে জি-আই-পি রেলওয়ের আরম্ভ এবং এই ষ্টেশন হইতে পাঁচ শত মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বোম্বাই যাইবার পথে "নাসিক" ষ্টেশন; পঞ্চবটীর যাত্রীদিগকে এই ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়। ষ্টেশন হইতে তিন ক্রোশ সোজা পথ অতিক্রম করিলেই "নাসিক" সহরে উপনীত হওয়া যায়। সহরে যাইবার জন্ত ষ্টেশনে টাঙা গাড়ী এবং এবং ঘোড়ার ট্রামগাড়ী পাওয়া যায়। এখানকার প্রত্যেক টাঙাতে দুইটী অশ্ব পাশাপাশি যোজিত; অশ্বগুলি হৃষ্টপুষ্ট ও দ্রুতগামী। টাঙা ভাড়া সচরাচর এক টাকার উর্দ্ধ নহে, তবে সময়ে সময়ে দেড় টাকাও হইয়া থাকে। ট্রামগাড়ীর ভাড়া দুই আনা মাত্র, কিন্তু কোন কোন সাময়িক মেলা উপলক্ষে যখন লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তখন চারি আনা ভাড়াও নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এখানকার অধিকাংশ যাত্রীই দক্ষিণ দেশবাসী, বাঙ্গালী যাত্রী শতকরা একজনের অধিক নহে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সহর হইতে একক্রোশ দূরে মহারাষ্ট্র-কেশরী শিবাজীর দীক্ষাগুরু রামদাসের আশ্রম ছিল, যাত্রীদিগের মধ্যে অনেকেই ঐ স্থান দর্শন করিতে যান।

ষ্টেশন হইতে দুই ক্রোশ দূরে Poll Tax আফিস। সহরে প্রবেশ করিবার সময় সেখানে প্রতি যাত্রীর হয় এবং একখানি রসিদ দেওয়া হয়। ষ্টেশনে প্রত্যাগমন-কালীন যাত্রীদিগকে আর কোন ট্যাক্স দিতে হয় না।

রেলগাড়ী নাসিক ষ্টেশনে পৌছিবার নির্দ্দিষ্ট সময়ে পাণ্ডাগণ ষ্টেশন হইতে সহর পর্য্যন্ত পথের স্থানে স্থানে অপেক্ষা করে এবং যাত্রীদিগের নাম, ধাম, জাতি প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। সকল তীর্থস্থানেই যাত্রীগণ এইরূপ প্রশ্নদ্বারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকে।

সহরে প্রবেশ করিবামাত্র পুণ্যসলিলা ক্ষীণকায়া গোদাবরী নদীর দর্শনলাভ হয়; সেই মূহূর্ত্তেই পঞ্চবটী দর্শনপ্রয়াসী যাত্রীদিগের মনে কতপ্রকার ভাবের উদয় হয় কে বলিতে পারে? এই কি সেই মহান্ পুণ্য-তীর্থ, যেখানে এক সময়ে দাশরথিদ্বয় বৈদেহী সমভিব্যাহারে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন? এই কি সেই মহামুনি বাল্মীকির অমর তুলিকায় চিত্রিত পবিত্র রামলীলাভূমি? এই সেই খরদূষণের রাজ্য, যেখানে একদিন জনকনন্দিনীর অসামান্ত রূপলাবণ্য অগ্নিশিখার ন্যায় প্রজ্জ্বলিত ছিল? এই স্থানেই কি রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্র রাজপুত্র হইয়াও পিতৃআজ্ঞা পালনার্থ জটা-বল্কলধারী হইয়া বনজাত ফলমূল ভক্ষণকরিয়া দিনযাপন করিয়াছিলেন? এবং এই স্থানেই কি দুরাত্মা দশানন কৌশলজাল বিস্তার করিয়া সেই নিরীহ সুবর্ণ-প্রতিমাকে হরণ করিয়াছিল?

বর্ষা ভিন্ন অপর কয়টী ঋতুতে গোদাবরী নদীর কোনও স্থান প্রস্থে ৫০ হাতের উর্দ্ধ নহে। জলের গভীরতা সকল স্থানে সমান নহে, কোন স্থানে দুই ফুট বা কিছু বেশী কিন্তু কোন স্থানেই পাঁচ ফুটের অধিক নহে। বলা বাহুল্য বর্ষাকালে জলবৃদ্ধি হইলে নদী কলেবর বিলক্ষণ স্ফীত হয় এবং স্রোতের প্রাখর্য্যও যথেষ্ট দেখা যায়।

নদীর উচ্চতম তটে (অর্থাৎ বর্ষাঋতুতেও যেখানে

নদীবক্ষ জুড়িয়া পাকা মঞ্চ আছে, যাত্রীগণ তাহার উপর দিয়া পদব্রজে একতট হইতে তটান্তরে যাইতে পারে। হিন্দুদিগের পক্ষে পাদুকা পরিধান করিয়া যাওয়া আসা নিষেধ, জুতা যোড়াটী হস্তে ধারণ করিয়া নগ্নপদে পার হইতে হয়। যাঁহারা নিষেধ তাচ্ছিল্য করিয়া বিনামাযুক্ত পদে যাওয়া আসা করেন, স্থানীয় লোক তাঁহাদিগকে অহিন্দু বা নাস্তিক বলিয়া ঘৃণা করে।

সহরের ভিতরে রাস্তাগুলি অপরিসর এবং অপরিস্কার। সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পরেই দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গৃহস্থ যুবতীগণ পরিধেয় বস্ত্রের বোঝা মস্তকে লইয়া নদীর উভয় তটে সমবেত হয় এবং এক এক খানি বস্ত্র প্রস্তরের পাটার উপর অছড়াইতে আরম্ভ করে। সন্ধ্যা সমাগমে তাহারা স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। বোধ হয় রজকের ব্যয়-সংক্ষেপ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য।

নাসিক ঘাটের নদীবক্ষ শিলাবন্ধন দ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত; এক অংশের নাম রামকুণ্ড, দ্বিতীয়টী লক্ষ্মণকুণ্ড এবং তৃতীয়টী সীতাকুণ্ড। স্থানীয় পাণ্ডাগণ কহিয়া থাকেন, রামকুণ্ডের মাহাত্ম্য এই যে, মানুষের মৃতদেহ ভস্মীভূত হইয়া গেলে যে সকল অস্থি নির্ব্বাপিত চিতার উপর অবশিষ্ট থাকে, মৃতের আত্মীয়েরা সেই সকল অস্থি ঐ স্থানে নিক্ষেপ করে, এবং এক প্রহর পরে উহা দ্রব হইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়, তাহাদের চিহ্নমাত্রও দৃষ্ট হয় না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা দেখিলাম রাশি রাশি অস্থি নদীর নির্দ্দিষ্ট স্থানে পতিত রহিয়াছে। পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে সে সমুদয় অস্থি মাত্র এক ঘণ্টা পূর্ব্বে নিক্ষেপ করা হইয়াছে।

রামকুণ্ড ঘাটের একস্থানে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত গোমুখ আছে, তাহার অভ্যন্তর হইতে অবিশ্রান্ত বারিধারা নদীগর্ভে পতিত হইতেছে। সে প্রবাহের উৎপত্তি সে প্রবাহ মৃত্তিকা-গর্ভে প্রচ্ছন্ন। এই ঘাটের সমস্তটাই প্রস্তরগ্রথিত। গোমুখের সন্নিকটে একখানি প্রস্তরের পাটার উপর শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীর যুগলমূর্ত্তি খোদিত আছে,—কিম্বদন্তী এই যে, ঐ স্থানে তাঁহারা একত্রে অবগাহন করিয়াছিলেন।

গোদাবরীর বামতটে নাসিক সহর এবং দক্ষিণ তটে পঞ্চবটী ও তপোবন। নদীতট হইতে অনূন অর্দ্ধ মাইল দূরে তপোবন যাইবার পথে "পঞ্চবটী।" সীতা-গুহার প্রাঙ্গণে পাঁচটী বটবৃক্ষ সারিসারি দণ্ডায়মান, বৃক্ষগুলি অধিক পুরাতন বলিয়া বোধ হয় না; তথাকার লোকে বলে, পুরাতন বটবৃক্ষের মূল হইতে এই পাঁচটী বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে।

সীতাগুহা ভূমধ্যস্থ একটী বহুপ্রাচীন কুটীর। প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিলেই একটী আচ্ছাদন বিশিষ্ট মণ্ডপে উপনীত হওয়া যায়; ঐ মণ্ডপের মধ্যস্থলে দেওয়ালের গায়ে নিবিড় তমসাচ্ছন্ন একটী অপ্রসর সুড়ঙ্গ পথ। এত অপ্রসর যে সে পথে এককালীন দুই ব্যক্তি যাওয়া আসা করিতে পারে না। দ্বারটী তিন ফুটের অধিক উচ্চ নহে, সুতরাং একটী বালককেও তাহার দেহটি সঙ্কুচিত করিয়া যাওয়া আসা করিতে হয়। প্রদীপের সাহায্য ব্যতীত অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। সুড়ঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেই চারিটী বৃহৎ সোপান দৃষ্টিগোচর হয়, ঐ সোপান চতুষ্টয়ের সাহায্যে নিম্নদেশে অবতরণ করিলে একটী ষোল ফুট লম্বা বারো ফুট চৌড়া প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হওয়া যায়। প্রকোষ্ঠটী গবাক্ষশূন্য—সুতরাং বায়ু ও আলোকশূন্য। দেখিলাম, সেখানে একটী দ্বাদশবর্ষীয়া পাণ্ডাকন্যা বসিয়া আছে। একটী মাত্র মৃৎপ্রদীপের সাহায্যে সেই ঘন নিবিড় অন্ধকার যথা সম্ভব বিদূরিত হইয়াছে; একদিকে একটী ৬ ফুট উচ্চ মঞ্চের উপর শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও জানকীর প্রস্তরমূর্ত্তি। এই প্রকোষ্ঠটী সীতাদেবীর নিজস্ব ছিল বলিয়া প্রবাদ।

পঞ্চবটী হইতে আরম্ভ হইয়া তিন মাইল ব্যাপিয়া

পরিবেষ্টিত এই ভীষণ অরণ্যে তিনজনেরই পৃথক আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। সীতাদেবী ভূমধ্যস্থ কুটীরে বাস করিতেন। যে স্থানে শ্রীরামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণের কুটীর ছিল, সে স্থান "রামস্থান" এবং "লক্ষ্মণস্থান" নামে অভিহিত। উভয় স্থানেই এক একটী মন্দির এবং তন্মধ্যে এক একটী শিবলিঙ্গ আছেন, নিত্য ষোড়শোপচারে তাঁহাদের পূজা হইয়া থাকে।

লক্ষ্মণস্থান হইতে আনুমানিক অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে গোদাবরী এবং কপিলগঙ্গার সঙ্গমস্থল। উভয় নদীর কূলে অনুচ্চ পাহাড় শ্রেণিবদ্ধ। এরূপ হৃদয়বিনোদন স্বভাবের শোভা বুঝি কোথাও নাই। নদী-সঙ্গমের নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের একটী প্রস্তরফলকে সূর্প-নখার নাসিকাবিহীন একটা মূর্ত্তি খোদিত আছে, উহা উচ্চে দুই হস্ত পরিমাণ। দেখিলেই বোধ হয় মূর্ত্তিটি বহু-কালের; তাহার কারণ, কিয়দংশ ঘর্ষিত হইয়া গিয়াছে। নিকটে সমতলভূমির উপর একটী প্রস্তরগ্রথিত মঞ্চে লক্ষণের এবং সূর্পনখার প্রস্তরমূর্ত্তি;—লক্ষণ রোষ-কষায়িত লোচনে অসি হস্তে নিশাচরীর নাসিকা ছেদন করিতে উদ্যত। এই স্থানে একজন পাণ্ডা আছেন, নিরীহ যাত্রীদিগের নিকট পয়সা আদায় করা তাঁহার একমাত্র কার্য্য।

নদী দুইটীর সঙ্গমস্থলের সান্নিধ্যে অন্যূন ৫০ ফুট উচ্চ একটী সুবৃহৎ মৃত্তিকাস্তূপ আছে; সেই স্তূপদেহে, ভূমি হইতে ৪০ ফুট উচ্চ সাতটি গুহা আছে, কিন্তু তন্মধ্যে প্রবেশ করিবার কোন প্রকার পথ বা সোপান নাই। বর্ষাকালে যখন নদীবক্ষ বিস্ফারিত হয়, তখন ঐ সকল গুহামধ্যে জল প্রবেশ করে, সেই জন্ম বর্ষা ভিন্ন, অপর সকল ঋতুতে সাধুগণ সেখানে আসিয়া এক একটী গুহা অধিকার করিয়া তপস্যায় নিমগ্ন হয়েন; কিন্তু তাঁহারা কিরূপে তন্মধ্যে প্রবেশলাভ করেন তাহা বোধগম্য হইল না। যে স্থানটীকে "সপ্ত-কোঠরী" কহে।

লক্ষ্মণের গণ্ডী—প্রায় ২০ হাত পরিমাণ গভীর,

তপোবন প্রান্ত বেষ্টিত। উহাকে লক্ষ্মণের গণ্ডী বলে। মারীচের মায়াক্রন্দনে যখন সীতাদেবীর মন বিচলিত হইল এবং যখন তাঁহার আদেশে লক্ষ্মণ তাঁহাকে একাকিনী রাখিয়া অগ্রজের সন্ধানে গমন করিলেন, তখন তিনি তাঁহার ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা একটী গণ্ডী রেখাঙ্কিত করিয়া সীতাদেবীকে তাহার সীমা অতিক্রম করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ঐ গণ্ডীর সীমা হইতে অন্যূন একরশি পথ উত্তরে একটি মন্দির এবং তথা হইতে এক রশি পথ পূর্ব্বে লতাপল্লব মণ্ডিত আর একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন মন্দির বর্ত্তমান। প্রথমটির মধ্যে হনুমানের প্রস্তরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, অপরটির মধ্যে রাবণের এবং জানকী দেবীর মূর্ত্তি আছে। জনশ্রুতি এই যে, ঐ দুইটি স্থানের মধ্যে একটি স্থানে দুষ্ট রাবণ সীতাদেবীকে হরণ করিয়াছিল।

পঞ্চবটী হইতে তপোবনের পথে একজন সাধুর দর্শন পাইয়াছিলাম। তিনি যুবাপুরুষ, বয়স ত্রিংশৎ বৎসরের অধিক বলিয়া বোধ হইল না। একটি সম্পূর্ণ অনাচ্ছা-দিত পুষ্পোদ্যানে তিনি নিজ 'আস্থান' করিয়াছেন। সম্মুখে শুষ্ক কাষ্ঠের "ধূনি" প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে। তিনি মৌনী বলিয়া বোধ হইল, কারণ উপস্থিত কোন ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপ করিলেন না। শুনিলাম শীত, বর্ষা প্রভৃতি সকল ঋতুতেই তিনি সেই স্থানে সমভাবে উপবিষ্ট থাকেন। সেখানে কোন আহারীয় সামগ্রীর চিহ্নমাত্রও দৃষ্টিগোচর হইল না, কেহ কিছু শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দিলে আহার করেন নচেৎ অভুক্ত থাকেন। নাসিকের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই নরসিং (নরসিংহ) নামে একজন সাধুকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করে, তিনিও মৌনী। দেখিলাম তাঁহার গঞ্জিকা বা চরসের কলিকা শীতল হইবার অবসর পায় না।

নাসিক হইতে তিন ক্রোশ দূরে "পাণ্ডাগুহা" নামক পরম রমণীয় একটি স্থান। পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে স্থাপত্যবিদ্যা এবং তৎসম্পর্কীয় শিল্পকার্য্যাদি কিরূপ উৎ-কর্ষলাভ করিয়াছিল এই "পাণ্ড-গুহা" তাহার নিদর্শন।

তন্মধ্যে মানুষের বাসোপযোগী গৃহাদি নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল, এই পাণ্ডগুহা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। গুহামধ্যে মহাকায় বলিষ্ঠ পাণ্ডবদিগের এবং সাধ্বী পাঞ্চালীর প্রস্তরমূর্ত্তি সকল কি সুন্দররূপে গঠিত এবং তাঁহাদিগের অবয়বগুলি কিরূপ স্বাভাবিকভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে, চক্ষে না দেখিলে বোধগম্য হইতে পারে না। পাণ্ডুপুত্রগণ অক্ষক্রীড়ায় দ্বিতীয়বার পরাজিত হইয়া প্রভাসতীর্থে যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে কাম্যবনের যে স্থানে বাস করিতেন, সম্ভবতঃ ইহা সেই স্থান।

সহর হইতে ৮৷৷ ক্রোশ দূরে পর্ব্বতচূড়ায় ত্র্যম্বকেশ্বর মহাদেবের মর্ম্মরনির্ম্মিত পবিত্র মন্দির; সমতলভূমি হইতে মন্দিরে আরোহণ করিবার নিমিত্ত সোপানশ্রেণী আছে। এখানেও যাত্রীর সংখ্যা অল্প নহে। এই স্থান হইতেই গোদাবরী নদীর উৎপত্তি।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী রায়।

শ্রুতি-স্মৃতি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমি যে গাড়ীতে প্রয়াগে যাইতেছিলাম উহা ডাকগাড়ী নহে, সুতরাং প্রতি ষ্টেশনে থামিতে থামিতে ধীরমন্থর গতিতে ট্রেণখানি চলিতে লাগিল। আমি তন্দ্রা স্বপ্ন ও জাগরণের মধ্যে কখনও শুইয়া কখনও সিগারেটের ধূমপান করিয়া বাকী রাত্রিটুকু কাটাইয়া দিলাম।

প্রভাতে যে ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল, দেখিলাম সেটি একটি জংসন ষ্টেশন। প্রশ্ন করিয়া জানিলাম, শাখা লাইনের গাড়ী যাত্রীসহ না আসিলে আমাদের গাড়ী ছাড়িবে না। সাধারণতঃ সে গাড়ী আগেই আসিয়া থাকে, সেদিন পথে এঞ্জিন ঘটিত দুর্ঘটনা হওয়ায় যথাসময়ে আসিতে পারিবে না। এখনও তাহার আগমনের বহু বিলম্ব এবং সে না আসিলে আমাদের গাড়ীও ছাড়িবে না, কারণ আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে গাড়ীতে আমি প্রয়াগ যাত্রা করিয়াছিলাম উহা ডাকগাড়ী নহে। "ডাকগাড়ী" ভিন্ন অপর গাড়ীতে দূরের পথ অতিবাহন করিবার উদ্যম যে কি কর্ম্মভোগ, তাহা ভুক্তভোগীর অবিদিত নাই। আমারও সে জ্ঞান ছিল, কিন্তু "কালভৈরব" অথবা ভৈরব "কাল" আমাকে যেমন করিয়া কাশীছাড়া করিল, সে বৃত্তান্ত আমার পাঠক পাঠিকাগণ জানেন। সুতরাং "ডাকগাড়ী" বা ডাকেতর গাড়ীর সুবিধা অসুবিধা দেখিয়া শুনিয়া বিচার বিবেচনা করিয়া যাত্রা করিবার মত আমার মনের অবস্থা ছিল না। দেনা পাওনা মিটাইয়া প্রথমেই প্রয়াগের পথে যে গাড়ী পাইলাম তাহাতেই চড়িয়া বসিলাম। টাইম টেব্‌ল্ দেখিয়া জানিলাম, সে গাড়ী দশটা বেলায় এলাহাবাদে পঁহুছিবে। সুতরাং উহাতে যাইবার কোন বাধা আছে ইহা মনে করিতে পারি নাই। আমার অদৃষ্টগুণে শাখা লাইনের এঞ্জিন যে ইতরের ন্যায় আচরণ করিবে, তাহা কি আগে জানি?

যখন জানিতে পারিলাম যে গাড়ী ছাড়িবার অন্ততঃ পক্ষে ঘণ্টাদুই বিলম্ব হইতে পারে, তখন অনর্থক বসিয়া সময় অতিবাহিত না করিয়া, মনে করিলাম, গাড়ী যতক্ষণ নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে সেই সময়ের মধ্যে স্নানাদি শেষ করিয়া সমস্ত দিনের মত প্রস্তুত হইয়া লই।

গাড়ীতে স্নান করিবার ঘর একটি, আমরা যাত্রী সেই গাড়ীতে তিনজন। ভাবিলাম অপরের অসুবিধা না ঘটাইয়া, আমি ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে গিয়া আমার আবশ্যকীয় কর্ম্মগুলি শেষ করিয়া লইব, এবং সেই মতলব করিয়া একটি বেতের ঝুড়ির মধ্যে সাবান,

স্পঞ্জ, টুথ পাউডার প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্য এবং অপর একটি হাত-ব্যাগে স্নানান্তে পরিবর্ত্তনের বস্ত্রাদি লইয়া আমি গাড়ী হইতে নামিয়া ওয়েটিং রুমে দিকে চলিলাম, এবং আমার চির-সহচর নবীনচন্দ্রকে একটি নরসুন্দরের অনুসন্ধানে প্ল্যাটফর্ম্মের এদিক ওদিক ঘুরিয়া দেখিতে বলিলাম।

নরসুন্দর যে সাবেক কালের মোক্তার বাবুদের মত ধুতির উপর চাপকান পরিয়া এবং শুভ্র পাগড়ী বাঁধিয়া, গরমজলের ক্ষুদ্র টিনপাত্র হাতে 'বালবর' 'বালবর' রবে প্ল্যাটফর্ম্মময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ইহা নবীনচন্দ্রের ধারণায় আইসে নাই। 'বালবর' অর্থে নরসুন্দর বুঝিতে হইবে তাহাও সে ইতিপূর্ব্বে কখনও জানিত না। আমি ষ্টেশনের ক্ষুদ্র ওয়েটিং রুমে কোন প্রকারে পানিপাঁড়ে ও ভিস্তির সাহায্যে মুখাদি প্রক্ষালন সমাধা করিয়া অপেক্ষা করিতেছি, কিন্তু নবীনচন্দ্রের সাক্ষাৎ নাই। বিরক্ত হইয়া ওয়েটিং রুমের দরজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলাম—ইচ্ছা নবীনকে নিকটে পাইলে বিলম্বের জন্য তিরস্কার করিব। আসিয়া দেখিলাম, নবীনচন্দ্র হতাশাব্যঞ্জক মুখশ্রী লইয়া দশদিক আকুলভাবে নিরীক্ষণ করিতেছে এবং 'বালবর' প্রবর তাহারই আশেপাশে 'বালবর' 'বালবর' রবে বারংবার গতায়াত করিতেছে সে দিকে নবীনের ভ্রুক্ষেপ-মাত্র নাই। আমি হাতের ইঙ্গিতে তাহাকে নিকটে ডাকিবামাত্র সে বলিয়া উঠিল—"এখানে নাপিত কোথায় পাইব? অনেককে জিজ্ঞাসা করিলাম, নরসুন্দর হায়? কেহই কোন উত্তর দেয় না। এখানে নাপিত পাওয়া যইবে না।" আমি কহিলাম, "তোর সম্মুখ দিয়া যে নাপিত বারবার ডাকিয়া যাইতেছে।" সে কহিল, "কই না।" আমি সেই ধুতি চাপকান পরিহিত শিরস্ত্রাণ-বিশিষ্ট পঞ্চাশৎবর্ষ বয়স্ক প্রবীণ লোকটিকে ডাকিয়া দেখাইয়া দিলাম, "এই ত নাপিত।" নবীন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ নীরব রহিল। তাহার পরে আমার পানে ফিরিয়া বলিল, "উমরুদ্দিন মুন্সী মোক্তারের মত জামা জোড়া পরিয়া নাপিত বেড়াইতেছে ইহা আমি কি করিয়া বুঝিব বলুন? আর আপনিই বা কেমন করিয়া বুঝিলেন?" আমি কহিলাম, "সে যে ডাকিয়া যাইতেছে, তোর নিকট দিয়াই ত কতবার হাকিল, 'বালবর বালবর।" নবীন কহিল, "ঐ শব্দের অর্থ নাপিত ইহা আমার চৌদ্দপুরুষেও জানে না। এ খোট্টার দেশে সবই অদ্ভুত দেখি!"

আমাদের এই কথোপকথন এবং নবীনের খোট্টার দেশ সম্বন্ধে মন্তব্যের প্রতি নিরতিশয় তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া অনতিবিলম্বে বালবর প্রবর আমাকে আক্রমণ করিল। এই নরসুন্দরটির ক্ষৌরাস্ত্র ক্ষুরধার নহে এবং সে এ ব্যবসায়েও বিশেষ পরিপক্ক বলিয়া মনে হইল না। তবে সে দিনে আমার মুখে শ্মশ্রুর আধিক্য মোটেই ছিল না, সুতরাং বিশেষ কষ্ট না দিয়াই সে আমাকে শীঘ্রই অব্যাহতি দিল। আমি তাহাকে তাহার পারিশ্রমিক চারি আনা দিলে সে বেশ খুসীই হইল দেখিলাম। চারি আনার পয়সা বিশেষ কিছুই নহে। তবে বোধ হইল যে প্রায় শ্মশ্রুহীন বালকের মুখে একবার ক্ষুর বুলাইয়া দুই মিনিটের মধ্যে চারি আনা পাওয়ায় সে তাহার শ্রম সফল জ্ঞান করিয়াছে। আজ যদি সে আমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইত, তাহা হইলে চারি আনার স্থলে চারি টাকাতেও রাজি হইত কি না সন্দেহ করি, কারণ আমাকে ক্ষৌর করিবার পরে তাহার সমস্তগুলি অস্ত্রেরই পুনঃসংস্কার প্রয়োজন হইত।

যাহা হউক ভিস্তির মসক-নিসৃত পবিত্র জলে কৃতস্নান হইয়া, বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করতঃ আমার গাড়ীতে যখন ফিরিয়া গেলাম, তখনও ট্রেণ ছাড়িবার বিলম্ব আছে। তখনও সেই ব্র্যাঞ্চ-লাইনের গাড়ীখানি আসিয়া পঁহুছে নাই। স্নান করিলেই ক্ষুধার সঞ্চার হয় ইহা সকলেরই বিদিত, তাহাতে আমি পূর্ব্বদিবস হইতেই নিরম্বু উপবাসী। নবীনচন্দ্রের সহায়তায় আমার সঙ্গের "চা" প্রস্তুতের সরঞ্জামগুলি বাহির করিয়া, স্পিরিট ষ্টোভে প্ল্যাটফর্ম্মের উপরেই জল গরম আরম্ভ করিয়া দিলাম এবং দুগ্ধের সন্ধানে নবীনকে ষ্টেশনের চারি পার্শ্বে খোঁজ লইতে বলিলাম। আমার

আদেশ পাইয়া নবীন ঈষৎ হাসিল। সে হাসির অর্থ এই যে, একবার নাপিতের সন্ধান করিয়া যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছি, এবারে দুগ্ধের ব্যাপারে না জানি কি হয়! সে আদিষ্টকার্য্যে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "দুধকে এখানে দুধই ত বলে, না আর নাম আছে?" আমি কহিলাম, "সাধুভাষায় 'দুগ্ধ' না বলিয়া দুধ বলিও, তাহা হইলেই কার্য্যসিদ্ধি হওয়া সহজ হইবে।" সে আবার মৃদু হাসিয়া তাহার কাযে চলিল।

জল গরম হইতেছে। আমি চা ভিজাইবার পাত্র পিয়ালা পিরিচ সমস্ত যথাস্থানে সজ্জিত করিয়া, গাড়ীর পাশে পাশে প্ল্যাটফরমের উপরে পায়চারী করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম এবং আমার কামরাস্থিত ইউরোপীয় যুগলের 'চা' পান তৃষ্ণার লক্ষণ দেখিয়া দেখিয়া কিছু আমোদও অনুভব করিতেছিলাম তাহাও এখানে স্বীকার করাই ভাল। আমোদের হেতু এই যে, সে ষ্টেশনে 'চা' পাইবার কোন উপায় নাই। সেখানে Refreshment Room ছিল না, এবং সেই অতীতের দিনে Refreshment car এর কথা কাহারও কল্পনাতেও ছিল কি না সন্দেহ। কিন্তু তাহাদের উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথন হইতেছিল তাহায় তাৎপর্য্য এই—"এ লোকটা কি নির্ব্বোধ। ষ্টেশনে চা পাইবার সুযোগ থাকিতেও কেন নিজে 'চা' প্রস্তুতের হাঙ্গামা বাধাইয়া গলদঘর্ম্ম হইতেছে?" তাহাদের জানা ছিল না যে ষ্টেশনে চা পাইবার কোন উপায় নাই। Boy বলিয়া উচ্চ কণ্ঠে ডাকিলেও হুজুর বলিয়া জবাব দিবার জন্য কেহ উৎকণ্ঠিত হইয়া সেখানে বসিয়া নাই। যখন চা পান তৃষ্ণার দুঃসহ সন্তাপ নিবারণার্থ Boy বা-খানসামা বলিয়া ডাকিয়া জবাব পাইবে না, তখন এই অল্পবয়স্ক বাঙ্গালী যুবকের দূরদর্শিতা মূর্খতা নহে ইহা ত বুঝিতেই হইবে! তাহার উপর, তৃষ্ণার দায়ে আমার আতিথ্যও স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে পারে, এই ভাবিয়া আমার আমোদ বোধ হইতেছিল।

নবীনচন্দ্র এবারও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। আসিয়া ছাড়িয়া যাইবার কথা, সেখানে আহার পানের কোন অনুষ্ঠানই থাকিবার কথা নহে। তবে নিতান্ত নাচার হিন্দু যাত্রীগণের জন্য যদি কোন গোয়ালা নিজের লাভ এবং পুণ্যসঞ্চয় মানসে দুগ্ধ বেচিতে আইসে, সেই ভরসায় নবীনকে পাঠাইয়াছিলাম। তাহার বিষণ্ণ বদনে প্রত্যাবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া বুঝিলাম ব্যাপার কি, এবং তাহাকে কোন প্রশ্ন না করিয়াই ভাবিতে লাগিলাম কি করা যায়। বিশুদ্ধ 'চা' চিনি সংযোগে পান করা অসম্ভব নহে, তবে সেটা কেমন যেন 'ঔষধ পাচন' বলিয়া মনে হয়। গোয়ালিনী মার্কা গাঢ় দুগ্ধ 'ব্যবহারে আনিবার' ক্ষমতা সেদিনে আমার জন্মে নাই। তখনও তরল Condensed Milk এর এদেশে তেমন আমদানী হয় নাই, সুতরাং ঔষধ বা পাচন যাহাই হউক কেবলমাত্র শর্করা সংযোগেই উষ্ণ 'চা' নির্য্যাস পান করিব এইরূপ মনঃস্থির করিতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম, ষ্টেশন মাষ্টারের কোয়াটারের দিকে গোয়ালা হাঁড়ি ভরিয়া দুধ লইয়া যাইতেছে। দেখিয়াই মনে হইল, যে পুণ্যশ্লোকা প্রাতঃস্মরণীয়া রাণীভবানীর নাম প্রাতঃসমুত্থান সময়ে উচ্চারণ করিয়া আজও অর্দ্ধবঙ্গের নরনারীবর্গের অন্নসংস্থানে বাধা হইতেছে না, নিতান্ত দীনদরিদ্রের ঘরে দীনা জননীর অঙ্কে জন্মিয়াও যাঁহার পুণ্যগৃহের এক কোণে স্থান পাইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে, সেই আমি পূর্ব্বদিনের উপবাসের পরে চা'য়ের পাচন খাইয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিব, আর 'মা ভবানী' স্বর্গে বসিয়া তাঁহার অকৃতি সন্তানের দুর্দ্দশা দেখিবেন,—এমনটা হইতেই পারে না; এবং সেই জন্যই এই মাহেন্দ্র মুহূর্ত্তে সদুগ্ধ গোয়ালার আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে। এই ভাবিয়া মনে বল পাইলাম এবং নবীনকে চা-দানীতে জল ভরিয়া 'চা' ভিজাইবার কথা বলিয়া, নিজেই গোয়ালার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিলাম। ভাগ্যক্রমে যখন ষ্টেশন মাষ্টারের বাসার দরজার কাছটায় পঁহুছিয়াছি, তখন দেখি 'মাষ্টার' বাবু তাঁহার কালো চাপকান্ ও মার্কা-মারা টুপী পরিয়া বাড়ীর বাহির হইতেছেন। আমি

প্রার্থনা জানাইলাম। কহিলাম, "দাম আমিই দিব। অনুমতি চাহিতেছি, কেননা আপনার বিনানুমতিতে গোয়ালা আমার নিকট দুধ বেচিতে না চাহিতেও পারে; সমস্তটা দুধই হয়তো সে আপনার জন্যই আনিয়াছে, তাহা হইতে আমাকে বেচিলে আপনার রোজের দুধ কম হইবার সম্ভাবনা।" আমার প্রার্থনা শুনিয়া মাষ্টার বাবু কিছুকাল নিষ্পন্দনেত্রে আমার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সে দৃষ্টিতে কিছুমাত্র কঠোরতা ছিল না দেখিয়া ভাবিলাম ফল হইবে, এবং ফল হইলও। কিসে ফল হইল জানি না—আমার ক্ষুৎপিপাসাপীড়িত মুখচ্ছবি, কিংবা আমার চলনসই ভদ্র উর্দ্দু জবান, কিংবা আমার তরুণ বয়স, তাহা বলিতে পারি না। ষ্টেশন মাষ্টার বাবু অর্দ্ধবয়স্ক, প্রায় পঞ্চাশৎ বর্ষ তাঁহার বয়স হইয়াছিল। অনুত্তীর্ণ বিংশবর্ষ বয়স্ক বালকের ক্ষুধাতুর মুখের প্রতি চাহিয়া তাঁহার দয়া হওয়াও অস্বাভাবিক নহে। ফলতঃ আমার কার্য্যসিদ্ধি হইল, আমি দুই আনা দিয়া অর্দ্ধসের দুগ্ধ ক্রয় করিয়া আনিয়া নবীনের হস্তে সমর্পণ করিলাম। সে কহিল, "এ খোট্টার দেশে গরুর দুধ ত পাওয়া যায় না, আর যে ঘন (গাঢ়) দেখিতেছি ইহা নিশ্চয়ই মহিষের দুধ।" আমি ভাবিলাম এ দুঃসময়ে সারমেয়ী বা মার্জ্জারীর দুগ্ধ পাইলেও আমি "না", বলিতাম না, মহিষ ত সোণার জানোয়ার। মনের ভাব মনেই রাখিলাম, নবীনকে সে কথা কহিলাম না, কারণ কহিলে হয় ত সে মনে ভাবিত আমি চা খাইবার লোভে জানিয়া শুনিয়া মার্জ্জারী বা কুক্কুরীর দুগ্ধই আনিয়াছি।

দুগ্ধ আহরণ অধ্যায় শেষ করিয়া, স্বহস্তে বড় এক পেয়ালা 'চা' প্রস্তুত করিয়া যখন সস্নেহে চামচের দ্বারা তাহাকে বারম্বার আবর্ত্তিত করিতেছি, তখন দেখিলাম আমার সহযাত্রী ইয়ুরোপীয়দ্বয়ের দুই যোড়া চক্ষু আমার পেয়ালা ও চামচের প্রতি দৃঢ় নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আমি সে দিকে না চাহিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া প্ল্যাটফর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়া লোক-চলাচল দেখিতে একান্ত মনঃসংযোগ করিলাম।

আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"Is there no refreshment room?"

আমি কহিলাম, "I am afraid there is none here."

সে কহিল, "Bother! Then where did you get your tea from?"

আমি।—I made it myself and you are welcome to it.

সে কহিল, "It will be depriving you."

আমি।—Not at all. I have got a pound of tea, a small bag of sugar and about half a seer of milk with me. As regards hot water, there is absolutely no difficulty at all.

সে ধন্যবাদ দিবার জন্য কি একটা কহিল আমি শুনিতে পাইলাম না। নবীনের দিকে ফিরিয়া পুনরায় জল গরম করিবার আদেশ তাহাকে দিলাম। আমার সহিত সহযাত্রীটীর এই উপরের লিখিত আলাপ, কৌশলে 'চা' চাহিবার গৌরচন্দ্রিকা মাত্র ইহা বুঝিতে আমার বেশী বিলম্ব হয় নাই; তথাপি কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও শর্করা মিশ্রিত একটুখানি চা-এর নির্য্যাস দিতে কৃপণতা কেহই করে না। আমি জানি ক্ষুধার জ্বালায় আমার এই 'চা' খাইবার চেষ্টা; কিন্তু ইংরাজের চায়ের মৌতাত এতই প্রবল যে, তাহারা এক পেয়ালা চায়ের সহিত তাহাদের অতি মূল্যবান বা অমূল্য নিধিও অকাতরে বিনিময় করিতে পারে। সেই জন্য একরূপ উপযাচক হইয়াই আমি আমার এই আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য তাহাদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলাম; এবং তাহারাও একরূপ বিনা বাক্যব্যয়ে আমার এই শিষ্ট ব্যবহারকে সাদরে সার্থক করিয়া দিয়াছিল।

চা পান অধ্যায় শেষ হইল। আমার অতিথিদ্বয় এক এক জনে দুই তিন পেয়ালা করিয়া চা-

লাগিলেন যে, এমন সুন্দর সদ্গন্ধযুক্ত উষ্ণ চায়ের সহিত অৰ্দ্ধপক্ক নিষিদ্ধ-পক্ষীর ডিম্ব সহযোগে রুটি টোষ্টের অসদ্ভাব রহিয়াই গেল! বুঝি তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, যে যুবক ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া চা চিনি পেয়ালা পিরীচ সমস্তই সঙ্গে লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, এবং যে অস্থানে অসময়ে টাট্‌কা দুগ্ধ পৰ্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারে, তাহার পক্ষে হয়তো ইন্দ্রজালের প্রভাবে তাহার ঝুলি ঝাড়িয়া প্রয়োজনের সময়ে পক্ষিডিম্ব বাহির করা 'ক্যা বড়ি বাত।' ভারতীয় ঐন্দ্রজালিকদিগের অলৌকিক ক্ষমতায় ডিম্ব বাহির করা সচরাচরই দেখা যায়, এই কথা লইয়া আমাদের তিনজনের মধ্যে অনেক রহস্য চলিয়াছিল। আমি কহিলাম, "ডিম্ব বাহির করা তেমন কঠিন না হইতেও পারে, কিন্তু সে ইন্দ্রজালোৎপন্ন ডিম্ব শস্যহীন হইয়া থাকে এবং তাহায় মধ্যে রুটিকে স্বাদু করিবার উপযোগী হরিদ্রাভ পদার্থের একান্ত অসদ্ভাব সৰ্ব্বদাই ঘটে।"

এই সকল ঠাট্টা তামাসা যখন চলিতেছে সেই সময়ে শাখা লাইনের ট্রেণখানি আসিল। যাত্রীর হুড়াহুড়ি দৌড়াদৌড়ি পড়িয়া গেল। আমরা চা পানান্তে সিগারেট জ্বালাইয়া সুস্থচিত্তে নিজ নিজ স্থানে বসিয়া শাখা লাইনের বিলম্বিত গাড়ীখানির উদ্দেশ্যে প্রায় সমস্বরেই বলিয়া উঠিলাম, "Better late than never." যাত্রীগণ যে যাহার স্থানে বসিলে, সবুজ নিশান দেখাইয়া গার্ড সাহেব গাড়ী ছাড়িয়া দিলেন। থার্ড ক্লাসের গাড়ীগুলির মধ্য হইতে হিন্দুস্থানী বহুলোকের সম্মিলিত বিচিত্র কণ্ঠে "জয় বেণীমাধবকী জয়" রবে আকাশ বাতাস পূরিয়া উঠিল। সহযাত্রী সাহেবদ্বয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?" আমি কহিলাম, "তীর্থযাত্রীর সম্মিলিত কণ্ঠে তীর্থদেবতার জয়োচ্চারণ।" তাঁহারা ঈষৎ হাসিলেন —কেন জানি না, বোধ করি যাত্রীলোকের অসভ্যতা দেখিয়া। আমি নীরব হইয়া রহিলাম, কারণ ভক্তমুখোচ্চারিত দেবতার জয়োচ্চারণধ্বনির মধ্যে কি মোহ এবং কি মধু আছে, তাহা ইঁহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা নিতান্তই

গাড়ী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। ষ্টেশনের পর ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া আমরা তীর্থরাজ প্রয়াগের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম। অনেক ষ্টেশনে যাত্রী উঠা-নামা করিল, আবার অনেক ষ্টেশনে যাত্রী ছিল না, নিয়মানুসারে গাড়ী অৰ্দ্ধমিনিটকাল দাঁড়াইয়া পুনরায় গার্ডসাহেবের সঙ্কেতমত অগ্রগামী হইতে লাগিল। বিন্ধ্য এবং সাতপুরা পৰ্ব্বতমালার মধ্য দিয়া আমরা চলিতেছিলাম। চুণারের পৰ্ব্বতশীর্ষস্থ পরিত্যক্ত দুর্গ এবং সেনানিবাসের সৈন্যহীন আবাসগৃহগুলি দূর হইতে সুন্দর দেখাইতেছিল। বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির-চূড়ায় উড্ডীয়মান লোহিত পতাকা বায়ুতরঙ্গের সহিত মৃদু মৃদু আন্দোলিত হইতেছিল—সেই দৃশ্যে আর একবার যাত্রীর কণ্ঠ হইতে বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর জয়োচ্চারণধ্বনি সমুত্থিত হইল। আমার সহযাত্রীগণ বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিলেন, "They seem to be a rowdy lot." আমি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া নীল পৰ্ব্বত-গাত্রে শ্বেতমন্দিরের শোভা দেখিতে লাগিলাম এবং কত অগণিত নরনারীর হৃদয়ের একাগ্র ভক্তি ঐ মন্দিরের প্রতি প্রস্তরসন্নিবেশের সহিত সম্মিলিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাই একান্তমনে ভাবিতে লাগিলাম।

এইভাবে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। প্রাতে যে চা পান করিয়াছিলাম তাহার কোন চিহ্নই খুঁজিয়া পাইবার উপায় ছিল না। আমার সহযাত্রীদ্বয় ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া একরূপ ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন। ইংরাজ জাতির ক্ষুধা সহ্য করিবার অভ্যাসের একান্ত অভাব আমি সেইদিন প্রথম ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম। আমি নিশ্চিন্ত মনে এবং হাস্যমুখে ক্ষুধা সহ্য করিতেছিলাম এমন কথা বলিতেছি না। টাইম্ টেব্‌ল্ বারম্বার দেখিয়া, কোন সময়ে গাড়ী এলাহাবাদে যাইবে তাহা ত পূৰ্ব্বেই নিশ্চিতরূপ জানিয়াছি; এবং সেই নিশ্চিত জ্ঞানকে সুনিশ্চিত করিবার জন্য যখন যে ষ্টেশনে গাড়ী থামিতেছে, সম্মুখে যাহাকে পাইতেছি তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি, "এলাহাবাদ নজ্‌দিক্ আয়া ক্যা?"

জিজ্ঞাসার ত্রুটি ছিল না। এক একবার মনে হইতেছিল, নিতান্তই শিশুর ন্যায় ব্যবহার হইতেছে,—এত অধৈর্য্য দেখানো ভাল হইতেছে না। কিন্তু ক্ষুধা কোন হিত-কথাই শুনিতে চাহে না। পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে মনঃস্থির করিয়াছি যে আর কাহাকেও কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিব না, কিন্তু গাড়ী ষ্টেশনে থামিবামাত্র সে মন কোথায় যায়। দৌড়িয়া জানালার নিকটে গিয়া যাহাকে সম্মুখে পাই তাহাকেই প্রশ্ন করি, "এলাহাবাদ পঁহুছনেক্যা আওর কেত্‌না দেরী হ্যায়?" হায়, সেই তরুণবয়সের ক্ষুধার কিয়দংশ আজ এই পরিণত বয়সে পাইলে অনেক কাজ দেখিত; এবং আজিকার মন্দাগ্নি সেই প্রয়াগযাত্রার দিবসে থাকিলে কষ্টের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইত। কিন্তু বিধির বিধান এমনি বিচিত্র যে, যখন যে পদার্থের প্রয়োজন তাহা আমাদের আয়ত্তের বাহিরে থাকিবে—ব্যাকুল হইয়া যতই হস্ত প্রসারণ করি না কেন, একান্ত প্রার্থিত সামগ্রী সুদূরেই রহিয়া যাইবে। সমস্ত দুঃখেরই অবসান আছে; পুত্রশোকাতুরের দিনও অতিবাহিত হয়, একান্ত প্রিয় একমাত্র জনের সঙ্গ ও সান্নিধ্য বিচ্যুত হইয়াও মানুষের দিন এক-রকম করিয়া কাটে, কেবল আমারই সেদিনের ক্ষুধার ঘণ্টাকয়টী অনন্তকালস্থায়ী হইবে এমন কি লেখাপড়া আছে?

সকাল হইতে বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আমাকে নানা প্রকারে জ্বালাতন করিয়া ট্রেণখানি বেলা ১২টা—৫ মিনিটের সময় এলাহাবাদ ষ্টেশনের বৃহৎ প্ল্যাটফর্ম্মে প্রবেশ করিল। সেই অল্প বয়সে যতটুকু দেশভ্রমণ করিয়াছিলাম, তাহাতে রেল ষ্টীমারের ষ্টেশনঘর এবং ডাকবাংলা ও সার্কিট বাংলা অনেকগুলি দেখিয়াছিলাম। কিন্তু সেদিনের সেই ট্রেণ প্রবেশকালে এলাহাবাদের প্ল্যাটফর্ম্ম যত দীর্ঘ ও যেমন সুসজ্জিত বোধ হইয়াছিল এবং মনের মধ্যে যে ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বে অন্য কোন ষ্টেশন দেখিয়াই তেমন হয় নাই। মনে হইল যেন প্ল্যাটফর্ম্ম ফুরায় না;—গাড়ী মন্দ গতিতে চলিয়াছে কিন্তু প্ল্যাটফর্ম্মের অন্ত পাইতেছে না।

আর ষ্টেশন ঘরের ভিত্তিগাত্রে বিজ্ঞাপনের সে কি ধুম! ফলশ্রুতির সহিত বিচামের পিল, কাট্‌নাউয়ের পাউডার, ইনোর ফ্রুট সল্ট, মাঝে আঙ্গুরগুচ্ছ কেলনারের সরাপ, সীতাকুণ্ডের সোডা,—নানা বিচিত্রবর্ণের বিজ্ঞাপন পটে অঙ্কিত হইয়া ভিত্তিগাত্রে বিচিত্রভাবে বিরাজ করিতেছিল। গোয়ালিনী মার্কা গাঢ় দুগ্ধের কলস কক্ষে সুইস্ গোপীর সে কি অপরূপ মূর্ত্তি, দেখিলে বোধ করি দ্বাপরের নন্দলাল পর্য্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিতেন। আমার তরুণ মন হরণ করিয়াছিল ঐ মিশর-মরুবাসিনীর ঈষৎরক্তিম মুখচ্ছবি-সমন্বিত চুরুট বিড়ি সিগারেটের নানা প্রকারের প্রতিচ্ছায়া। মনে হইল, সিগারেট অভ্যাস করিয়া নিতান্ত মন্দ কার্য্য করি নাই—কিছু না হউক, পরম্পরা-সম্বন্ধেও মরুবাসিনী সুন্দরীর সহিত একটু সংস্রব আছে। শুনিয়াছিলাম, এই সকল সুন্দরী রমণীর পদ্মহস্তেই সিগারেট নির্ম্মিত হয় এবং কাগজের শেষাংশ ইহাঁদেরই অধরামৃত সহযোগে তামাক চূর্ণকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দেয়। কথাটা শুনিয়া এবং তাহার পরে ষ্টেশন-ঘরের ভিত্তিসংলগ্ন তরুণী মরুবাসিনীর নিদাঘ-পরিচ্ছদ-পরিহিত প্রতিমূর্ত্তিগুলি দেখিয়া সেদিনে কি ভাবিয়াছিলাম, তাহা আজ এই পরিণত বয়সে পাঠক-পাঠিকাদিগকে শুনাইবার মত সাহস সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না, ক্ষমা করিবেন।

ট্রেণখানি প্ল্যাটফর্ম্মময় দৌড়িয়া দৌড়িয়া এক সময়ে থামিল। আমরা যে গাড়ীখানিতে ছিলাম সেখানি এঞ্জিনের কাছাকাছি থাকায়, আমাদিগকে ষ্টেশনের এক প্রান্তস্থিত একটি কামরার সম্মুখে দাঁড়াইতে হইয়াছিল। পড়িয়া দেখিলাম সেটি টেলিগ্রাফের ঘর—বড় বড় অক্ষরে লিখিত আছে—"প্রবেশ নিষেধ।" থার্ড ক্লাস গাড়ীতে যেখানে নবীনচন্দ্র ছিল, সে স্থানটি আমাদের গাড়ী হইতে বহুদূরে। তাহার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া তাহাকে ডাকিতে যাইব কি না ভাবিতেছি, এমন সময়ে বহুলোকের নামা ওঠা দৌড়াদৌড়ি ও ডাক হাঁক শুনিয়া নবীন নিজেই মনে মনে বুঝিয়া লইয়াছে যে এলাহাবাদ এবং সেইখানেই নামিতে হইবে। ...

নামিয়া আমার গাড়ীর দিকেই আসিতেছিল, দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া আমি হাত উঠাইয়া ইঙ্গিতে আমার নিকট আসিতে বলিলাম। প্লাটফর্ম্মে গাড়ী প্রবেশের মুহূর্ত্ত হইতে যে সকল নীলকুর্ত্তি কুলী গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া আসিতেছিল, তাহাদের প্রশ্নের তুফানে আমি হাবুডুবু খাইতেছিলাম। তাহাদের জিনিষ নামাইবার ব্যগ্রতা নিবারণ করিতে আমার কণ্ঠস্বরকে সপ্তমে তুলিতে হইয়াছিল এবং ভাষা যাহা প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল, তাহাকে সমাজসঙ্গত এবং ভদ্ররুচি-সঙ্গত কোনমতেই বলা যায় না, সেই জন্য সে সকল কথোপকথনের যথাযথ বর্ণনে বিরত রহিলাম। বড় বড় ষ্টেশনে কুলীহাঙ্গামা বড় কম ব্যাপার নহে তাহা সকলেই জানেন। তাহার উপরে আর এক উৎপাত, হোটেলওয়ালার পেয়াদা। তাহারা পেয়াদাই বটে! অপরিচিতস্থানে বাসস্থান স্থির করিয়া লওয়া সর্ব্বপ্রথম কাজ বটে, কিন্তু এই সকল হোটেলের পেয়াদাগণের নিজ নিজ হোটেল সম্বন্ধে অজস্র প্রশংসাবাদ এরূপ অসঙ্গত কৈতববাদ বলিয়া মনে হয় যে, বর্ণনা শুনিয়াই তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য প্রাণ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে। মনে হয় গাছতলায় থাকিব তথাপি এই পেয়াদার নিকট ধরা কোন মতেই দিব না। Laurie's Hotel-এর তক্‌মাধারীকে মিষ্টকথায় বিদায় করিলাম। তাহার পরে আসিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হোটেলের বৃহৎ বাক্য-বাগীশ পেয়াদার দল। তাহাদের বাক্‌চাতুর্য্য, চক্ষু-কর্ণ-নাসিকার নানাপ্রকার হস্তোদ্দীপক ভঙ্গিমা, পরস্পরের প্রতি অবাধ অশ্রাব্য কথায় অজস্র গালি বর্ষণ—সে এক মহা প্রহসন। ইহাদের মধ্যে কেহ হিন্দু কেহ বা মুসলমান এবং কেহ বা কোন্ জাতি তাহা নির্দ্ধারণ করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। ইহাদিগের সহিত নানাপ্রকার বাগ্‌-বিতণ্ডা করিয়া রাগ করিয়া যখন বিদায় করিলাম এবং আমার জিনিষপত্রগুলি কুলীর সাহায্যে প্লাটফর্ম্মে নামাইয়া যখন ভাবিতেছি "এখন যাই কোথায়", তখন স্মিতমুখে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক আসিয়া আমাকে ইলেন, যেন তিনি আমার কতকালের পরিচিত নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং আমার প্রয়াগ আগমনে তিনি যে আন্তরিক আনন্দলাভ করিয়াছেন তাহা বচনাতীত। প্রথমটা কিছুই বুঝিতে পারি নাই তথাপি দূরদেশে স্বদেশীর সাক্ষাৎ লাভটা নিতান্ত অপ্রীতিকর বলিয়া মনে হয় নাই। কথায় বার্ত্তায় বুঝিলাম, ইঁহারা বহুকাল এই সহরে বাস করিতেছেন। ষ্টেশনের নিকটেই কতকগুলি বাড়ী ইহাঁদের হাতে আছে, সদ্য আগত বাঙ্গালী দেখিলে তাহার আবাসস্থান এবং তীর্থপুরোহিত স্থির করিয়া দিয়া আপ্যায়িত করেন। বাড়ী-ভাড়া, জিনিষপত্রের মূল্য এবং আর পাঁচ রকমে আগন্তুক যে অর্থব্যয় করেন, তাহার চৌথ বা কোন একটা ভগ্নাংশ ইহাঁদের প্রাপ্য—সেই অর্থেই ইহাঁদের দিনগুজরান্ হইয়া থাকে। ব্যবসায়টা খুব উঁচু রকমের মনে করিতে পারিলাম না, তথাপি হোটেলের পেয়াদা অপেক্ষা এই লোকটিকে একটু শান্ত বলিয়া মনে হইল এবং স্বদেশ-বাসী বলিয়া ইহাঁর আদর আমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, যে বাড়ীটিতে আমাকে স্থান দিবেন সেটি ষ্টেশন হইতে কতদূরে। উত্তরে তিনি বলিলেন, "আজ্ঞা আপনার মত লোককে কি আমি কোন প্রকার অসুবিধায় ফেলিতে পারি? যে বাড়ী আপনাকে দিব উহা ষ্টেশন হইতে দুই কদম্ মাত্র এবং দেখিবেন সে কি আরামের বাড়ী! দো-মাঝলা কুঠী বাড়ী—আমীর-পছন্দ বালাখানা বলিলেও সে বাড়ীর অপমান করা হয়, মহাশয় জান্‌লেন।" স্থানে স্থানে বক্তৃতা অনেক শুনিয়াছি। এই এলাহাবাদে পঁহুছিবামাত্র হোটেলের পেয়াদার অনর্গল বাক্যবিন্যাস শুনিয়া শুনিয়া কাণ এবং প্রাণ ঝালাপালা হইয়া গিয়াছিল। এ ব্যক্তির বক্তৃতা সুরু হইল দেখিয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইলাম, তথাপি বলিলাম, "চলুন, তবে যাওয়া যাক্।", তিনি কহিলেন, "যে আজ্ঞা, একটু অপেক্ষা করুন, আমি একটা 'ঠেলা' আনিয়া আপনার সামান্‌গুলি বোঝাই করিয়া দিই, তার পর আপনাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছি।" আমার

ভূর্ত্ত হইয়া নাড়ীগুলি পর্য্যন্ত পরিপাক আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। তৃষ্ণার প্রাবল্য এত অধিক যে মহামুনি অগস্ত্যের গল্পটা নিতান্ত গল্প বলিয়া উপেক্ষা করিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত অবসন্ন দেহটাকে কোন রকমে টানিয়া লইয়া অদূরস্থিত একখানি কাঠের সুদীর্ঘ বেঞ্চের উপরে বসিয়া পড়িলাম এবং জিনিষপত্রের দিকে লক্ষ্য রাখিবার জন্য নবীনচন্দ্রকে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিয়া,যে ছোট ব্যাগটির মধ্যে 'পথের সম্বল' ছিল সেটিকে নিজের নিকটেই রাখিলাম। অনতিবিলম্বে 'ঠেলা' লইয়া আমার বন্ধু ফিরিলেন। যখন তিনি 'ঠেলার' উপরে আমার বিছানা বাক্স তোরঙ্গগুলি উঠাইতেছেন, ঠিক সেই সময়ে প্রায় ষষ্টিবর্ষ বয়স্ক একটি স্থূলকায় বাঙ্গালী বাবু সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমার পূর্ব্বপরিচিত যুবক বন্ধুটি বলিয়া উঠিলেন—"কাকা বাবু, নন্দকিশোরের বৈঠকখানা বাড়ীটি ঠিক আছে ত?" প্রশ্ন শুনিয়া প্রবীণ প্রবাসী বঙ্গসন্তানটি যেরূপ অঙ্গভঙ্গী এবং মুখ বিকৃতির সহিত বলিলেন, "না হে, সেটা ফেঁসে গ্যাচে", তাহা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারে এমন গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ কেহ জগতে আছে কি না সন্দেহ। আমি বহু কষ্টে উচ্চহাস্য সম্বরণ করিয়া, রুমালখানি মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া তাহারই আড়ালে হাসিয়া লইলাম। প্রথমটা "ফেঁসে গ্যাচের" অর্থ আমার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। ভাবিলাম, কোঠাবাড়ী ফাঁসিয়া যাইবে কেমন করিয়া? কাপড় 'ফাঁসে' এবং হাঁড়ীর তলা 'ফাঁসে' ইহা বরাবর শুনিয়াছি—বাড়ী 'ফাঁসা' এই প্রথম শুনিলাম। শব্দের অর্থটা বুঝিবার জন্য আমার যুবক বন্ধুকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ফেঁসে গ্যাচে কি মশায়?" তিনি যেন নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছেন এইরূপ ভাবটা দেখাইয়া বলিলেন, "মহাশয় খুব ভাল বাড়ী একটা আপনারই জন্য স্থির একরূপ ছিলই, পাকা করিবার জন্য কাকা বাবুকে বলিয়াছিলাম, এখন শুনছি সেটা ফেঁসে গ্যাচে। কি উপায় করি, তাই ভাবছি। যাক্, আরও বাড়ী আমার হাতে আছে, মশায়ের একটা হিল্লে হবে'খন।" আবার সেই ফেঁসে গ্যাচে শুনিলাম। কথাটার প্রত্যয়গত অর্থ কি তাহা এ পর্য্যন্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। তবে তাৎপর্য্যার্থ বুঝিলাম যে সেটি অন্যের হস্তগত হইয়াছে, আমার পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। সেজন্য বিশেষ দুঃখ আমার হইল না, কারণ যে বালাখানা দেখি নাই, যাহার মধ্যে বাস করিবার সুখ দুঃখ কিছুই উপলব্ধি করি নাই, ইন্দ্রভবন হইলেও তাহা "ফাঁসিয়া যাওয়ায়" আমার বিশেষ কষ্ট হইবার কথা নহে। আমি কহিলাম, "যাক্ না ফেঁসে মশায়, আপনি থাক্‌বার মত গুটিদুই কামরাওয়ালা একটা বাড়ী দেখে দিন্, আমার তাইতেই চলে যাবে।" তিনি কহিলেন, "সে কি কথা মশায়! আপনার মত লোকের উপযুক্ত বাসাই যদি ঠিক্ করে না দিতে পারি, তবে এতদিন এলাহাবাদে করলুম কি?" আমি যে কি লোক, আমার উপযুক্ত বাসা যে কি রকম হওয়া উচিত, তাহা ইনি কিসে বুঝিলেন তাহা ভগবানই জানেন। কিন্তু প্রথমে বাঙ্গালী দেখিয়া তাঁহার প্রতি আমার মন যেমন প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার এই বচনাধিক্যে, অজ্ঞাতকুলশীল আমার প্রতি তাঁহার এই অহৈতুকী ভক্তির প্রাবল্যে এবং প্রবীণ 'কাকা বাবুর' সাভিনয় বাড়ী 'ফাঁসার' সংবাদে আমার পূর্ব্ব প্রসন্নতা ক্রমে মলিন হইয়া আসিতে লাগিল।

যাহা হউক, আমার চিত্তের সেই প্রতিকূল ভাব গোপন করিয়া, প্রবাসী বাঙ্গালী বাবুদ্বয়ের সঙ্গে আমাকে বাহির হইতে হইল। হোটেলের পেয়াদাগুলিকে বিদায় দিয়া বাঙ্গালী বাবুর শরণ লইয়াছিলাম, এখন তাঁহাকে ত্যাগ করিলে যাই কোথা? মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, বান্ধবহীন এই সুদূর দেশে বাচাল বঙ্গনন্দনের হস্তে না জানি আমার কি দুর্গতিই অদৃষ্টে লেখা আছে! কিন্তু তথাপি বাহ্যিক এমন কোন লক্ষণ দেখাইলাম না যাহাতে তাঁহারা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারেন যে আমি তাঁহাদিগকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছি। কিন্তু নবীনচন্দ্রের মুখভাব দেখিয়াই বুঝিলাম, সে ইহাদিগকে বিষনয়নে দেখিতেছে; একবার অন্যের অলক্ষ্যে আমার মুখের

দিকে নিমেষের জন্য চাহিয়া চক্ষু দ্বারা নবীনচন্দ্র এমন একটা ইঙ্গিত করিল, যাহার অর্থ, "কাজ নাই ইহাদের সঙ্গে যাইয়া, এ ফক্কড় জুয়াচোর কোথায় লইয়া গিয়া কি আপদে ফেলিবে!" আমি ইঙ্গিতে তাহাকে নিরস্ত হইতে বলিলাম এবং নিজে তাহাদের অনুসরণ করিয়া প্রকাশ্যে নবীনকে আমার পশ্চাতে আসিতে কহিলাম। অগ্রে অগ্রে চলিলেন প্রয়াগ-প্রবাসী দুই বঙ্গ-বাচাল, মধ্যে আমি, এবং পশ্চাতে ঠেলার উপরে স্তূপীকৃত বাক্স তোরঙ্গসহ আমার প্রবাস-সহচর নবীনচন্দ্র। এই ক্ষুদ্র শোভাযাত্রাটি যখন প্লাটফর্ম্মের উপর দিয়া বাহিরে যাইবার ফটকের সন্নিহিত হইতেছিল, তখন এলাহাবাদ ষ্টেশনের রেলের লোকের সকৌতুক দৃষ্টি ইহার উপর নিপতিত হয় নাই এমন কথা বলিতে পারি না।

ফটকের নিকটে আসিয়া রিটার্ণ টিকিটের আধখানি ছিঁড়িয়া টিকিট কালেক্টারের হাতে দিয়া, অপরার্দ্ধ ব্যাগে ফেলিয়া যেমন বাহিরে আসিলাম, চতুর্দ্দিক হইতে ভাড়াগাড়ীর গাড়োয়ানের দল সপ্তরথীর ন্যায় আমাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। কতদুর যাইতে হইবে, গাড়ী করিতে হইবে কিনা, আমার জানা ছিল না। আমি নীরবে আমার সঙ্গী বাবুদ্বয়ের দিকে চাহিতেই, তাঁহারা উভয়ে তারস্বরে "নাহি নাহি, গাড়ীক্যা জরুরৎ নাহি" রবে দিগন্ত সংক্ষুব্ধ করিয়া তুলিলেন এবং আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "না মশায়, দুকদম যেতে হবে, নাহক কেন গাড়ী করে' ব্যাটাদের পয়সা দেওয়া?"

চৈত্রের দ্বিপ্রহরে প্রয়াগের প্রচণ্ড সূর্য্যকর মাথায় করিয়া 'ঠেলা' সহ রাজপথে ভ্রমণ আমার নিকট বিশেষ প্রলোভনের সামগ্রী বলিয়া বোধ হয় নাই। তথাপি, যাঁহাদের কবলগত হইয়াছি, তাঁহাদের কথা-মতই কার্য্য করা সে ক্ষেত্রে শ্রেয় বলিয়া মনে হইল। প্রকাশ্যে কহিলাম, "চলুন, আপনাদের 'কদম' গুলি ছোট না বড় দেখা যাউক। আশঙ্কা করি উড়িষ্যার ডালভাঙ্গা ক্রোশের মত আপনাদের এলাহাবাদী কদম হাড়ভাঙ্গা হইবে না।"

বাবুদ্বয় কহিলেন "আজ্ঞা না মশায়, ওই যে সামনে শাদা বাড়ীটে দেখ্‌ছেন ঐটেতেই আপাততঃ আপনাকে রেখে দিচ্ছি। তার পরে বিকেল নাগাদ—একটা বাড়ীর সবটাই করে' দেব'খন"।

আমি অগ্রসর হইয়া সভয়ে দেখিলাম, উহা একটী যাত্রীনিবাস। নানাদেশের নানাশ্রেণীর নর-নারী একত্র হইয়া তাহাদের সম্মিলিত কণ্ঠস্বরে পাণ্ডা প্রভুদের সহিত বচসা করিতেছে এবং সেই বাড়ীটির চতুষ্পার্শ্বস্থ জল স্থল আকাশ নানা প্রকার সম্ভব অসম্ভব উপায়ে কলুষিত ও বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। নবীনচন্দ্র আর একবার আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, আমিও তাহার দিকে চাহিলাম। তাহার দৃষ্টিতে ভর্ৎসনা পাঠ করিতে আমার বিলম্ব হয় নাই,—আমার চক্ষে সে দোষ-স্বীকার ও ক্ষমাপ্রার্থনা পড়িতে পারিল কিনা জানি না! সে সময়ে বেলা প্রায় দুইটা বাজে, পূর্ব্বদিনের উপবাস, সে পর্য্যন্ত এক পেয়ালা চা ভিন্ন অন্য কিছু উদরস্থ হয় নাই। তেমন সময়ে আহার এবং ঐটুকু আশ্রয় ত্যাগ করিয়া বাড়ীর অন্বেষণে বহির্গত হওয়া সঙ্গত হইবে না মনে করিয়া, আমি ঐ গৃহেরই দরজার নিকটস্থ একটা কামরা বাছিয়া লইয়া, সেইখানে জিনিষপত্র উঠাইতে বলিলাম। বাবুদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আহারের কি ব্যবস্থা হবে মশায়?" উত্তর পাইলাম, "সব প্রস্তুত মশায়। এখানে এনে দেব, কি আমাদের রসুই ঘরটায় যাবেন?" সে স্থানের বর্ণনা ইতিপূর্ব্বেই করিয়াছি। সুতরাং বলিলাম, "মশায় রসুইঘর যদি এর চেয়ে পরিষ্কার হয়, তবে সেইখানেই না হয় গেলাম।"

"সেই ভাল"—বলিয়া বাবুদ্বয় অন্তর্হিত হইলেন।

আর বহুক্ষণ তাঁহাদের সাক্ষাৎ নাই। ক্ষুৎ-পিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া আমি আহার্য্যের পথ চাহিয়া রহিয়াছি,—যাঁহারা আশ্বাস দিয়া গেলেন তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ নাই। এমতাবস্থায় মনোভাব কিরূপ হয় তাহা আমি বর্ণনা করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম, আমার সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ অনুমানে বুঝিবার চেষ্টা করিবেন। শেষটা এমন দাঁড়াইল যে, মনের এবং জঠরের হুতাশন বাক্যে বহির্গত হইয়া পড়ে—কোন-

মতেই তাহাকে আর চাপিয়া রাখা যায় না। আমি যদি বা কোনমতে ধৈর্য্য ধারণ করিতেছি (নিজদোষে যাহা ঘটাইয়াছি, ধৈর্য্য ছাড়া তাহার আর কি ঔষধ আছে?) কিন্তু নবীনচন্দ্র এবং আমার পাচকঠাকুর ঈশানচন্দ্রের মুখ দেখিয়া, অগ্ন্যুৎপাতের পূর্ব্বে অগ্নিগর্ভ গিরির অবস্থা কিরূপ হয় তাহা বুঝিতে আমার বিলম্ব হইল না। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, আমাদের সঙ্গে ভগবতীচরণ ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্যক্তি ছিলেন, হিসাব পত্র লেখা হাট বাজার করা প্রভৃতি কার্য্যভার তাঁহার উপরে ছিল; এবং সেতার এস্রাজ বাজাইতে জানিতেন বলিয়া তাঁহাকেই প্রবাসের উপযুক্ত সহচর ভাবিয়া সঙ্গে আনিয়াছিলাম। তিনি যশোর জেলার লোক ছিলেন, হিন্দুস্থানী বা উর্দ্দু ভাষায় তাঁহার বিশেষ পটুতা ছিল না, সেইজন্য তিনি প্রায়শঃ মৌনই থাকিতেন। কিন্তু এ দুর্দ্দিনে সে মুনিও মৌনী হইয়া থাকিতে পারিলেন না। পাচক ঈশানচন্দ্র, নবীন ও ভগবতী তিন জনে বিষ্ণুপুর, নাটোর ও যশোহরের প্রাদেশিক ভাষায় এলাহাবাদ-প্রবাসী বঙ্গবাবুদ্বয়ের পিতৃপুরুষের যেরূপ দান-সাগর ও সপিণ্ডীকরণ আরম্ভ করিয়াছিল তাহা অবাচ্য, সুতরাং লেখ্যও নহে। সৌভাগ্য যে, বাবুরা সে সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। থাকিলে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের মর্য্যাদা রক্ষা কঠিন হইত। যখন সকলেই প্রায় 'মারমুখী' হইয়াছে সেই সময়ে আমার প্রথম পরিচিত যুবক বাবুটি হাস্যমুখে আসিয়া জানাইলেন, "আহার প্রস্তুত, আসুন। মাংসটা হ'তে একটু দেরী হয়েছে, মাপ কোর্‌বেন্ মশায়।"

মাংসের নামে আমার অন্তরের বহ্নি প্রশমিত হইয়া জঠরের দিকে ধাবিত হইল। আমি বিলম্বের জন্য সমস্ত অপরাধ অন্তরের সহিত ক্ষমা করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। বাড়ীর বাহির হইয়া অপর একটা ফটক দিয়া প্রবেশ করিলাম বটে, কিন্তু বুঝিলাম ইহা ঐ এক বাড়ীরই প্রকোষ্ঠান্তর মাত্র; এবং সেখানে গৃহস্থালীর সাজসরঞ্জাম দেখিয়া বুঝিতে বাকী রহিল না যে উহা সেই বাবুদ্বয়েরই বসতবাটী—রন্ধনশালা হইতে আভরণ-শিঞ্জিতও শোনা যাইতে লাগিল। ভগবতীকে জিনিষের পাহারায় রাখিয়া ঈশান ও নবীনচন্দ্র আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল, উদ্দেশ্য—উপবাসের পরে তাহাদের মুনিবের ভাগ্যে বিধাতা কি "মাপিয়াছেন" তাহা একবার দেখিয়া যায়। আমাকে সঙ্গে করিয়া বাবুটি আহারের স্থানে লইয়া গেলেন। সেখানে দেখিলাম, বসিবার জন্য এক টুক্‌রা ছেঁড়া সতরঞ্চ বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহার সম্মুখে পশ্চিম প্রদেশে প্রচলিত পিত্তলের একখানি থালা। তাহার উপর একস্তূপ পশ্চিমা 'চাপাটী' এবং অল্প পরিমাণ তরকারী—যাহাকে সে দেশে 'শাক' বলিয়া থাকে। থালার এক পার্শ্বে ভাত যাহা দেখিলাম তাহার বর্ণ রক্ত এবং স্পর্শ হিম। যে মাংসের আশ্বাস দিয়া আমার ক্রোধোপশম করিয়াছিলেন, তাহার অস্তিত্ব কোথাও দেখিতে পাইলাম না।

বারম্বার অনুরুদ্ধ হইয়া আমাকে বসিতেই হইল। নবীন ও ঈশানচন্দ্র মুখ বাঁকাইয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল। শাক এবং 'চাপাটীর' যথাসম্ভবই সদ্ব্যবহার করিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে বাবুটি একটি পিত্তলের গেলাস এবং একটি বাটী লইয়া আসিয়া আমার সম্মুখে রাখিয়া দিল। দেখিলাম, গেলাসের মধ্যে ডা'ল এবং বাটীতে সেই বড় আশার মাংস। স্কুল কলেজে পড়িবার সময়ে 'মেসের' ঠাকুর কলাপাতায় এবং থালায় বহুবার ডা'ল ঢালিয়া দিয়া গিয়াছে, তাহাতে কোন আপত্তি করি নাই; কিন্তু গেলাসে করিয়া ডা'ল পরিবেষণ করিবার প্রথা এই প্রথম দেখিলাম। দেখিয়া আমার সমস্ত শরীর ও মনের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল তাহা কেবল আমিই জানি। গেলাসস্থ ডা'লের কিয়দংশ থালায় ঢালিয়া লইলাম বটে, কিন্তু তাহার বর্ণ এবং গন্ধেই স্বাদগ্রহণ করিবার স্পৃহা একেবারেই অন্তর্হিত হইয়া গেল।

তাহার পরে মাংসের পালা। বিদ্যার্থিরূপে যখন বিদেশে থাকিতাম, তখন স্নেহময়ী আত্মীয়াগণের স্বহস্তপ্রস্তুত ব্যঞ্জনাদির কথা স্মরণ করিয়া অনেক আক্ষেপ করিয়াছি এবং সমবয়স্ক

ও সতীর্থ বালকগণের সহিত একত্র হইয়া মেসের মাছের ঝোলের অনেক প্রকার নিন্দাবাদ করিয়া ঝি এবং বামুন ঠাকুরকে অনেক জ্বালাতন করিয়াছি। 'মেসে'র মাছের ঝোলকে বিদ্রূপ করিবার জন্য যে সকল বর্ণনা আমরা মুখে মুখে আবৃত্তি করিতাম তাহার একটা নমুনা এখানে দিতেছি—"ঈষৎ হরিদ্রাক্ত তরল পদার্থ যাহা অর্দ্ধ বাটী বেষ্টন করিয়া থাকে এবং যাহার মধ্যে গামছা পরিয়া নামিলে কদাচিৎ কখনও এক-আধখণ্ড আলু পাওয়া যায় তাহাকে মেসের মাছের ঝোল বলে।" স্কুল কলেজ ছাড়িবার পরে এই সুদূর প্রয়াগের পান্থনিবাসে যে মাংসের ঝোল দেখিলাম, তাহার সম্বন্ধে উপরের লিখিত বর্ণনাও স্তুতিবাদ হইবে, কারণ যে তরল পদার্থ অর্দ্ধবাটী বেষ্টন করিয়া ছিল তাহা হরিদ্রাভ নহে এবং তাহার মধ্যে গামছা পরিয়া নামিলে দুই একখণ্ড জীববিশেষের (কোন্ জীব তাহা বলিতে পারি না) অস্থি ব্যতীত, মাংস মেদ বসা চর্ম্ম আলু পটোল কচু আদা—কিছুই পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। আরব সমুদ্র বা অতলান্ত মহাসাগরের অতলস্পর্শ জলরাশির মধ্য হইতে মুক্তা আহরণ করিবার শ্রম অপেক্ষা অধিক শ্রম জীবন ভরিয়া করিলেও 'বাটনা'র জল ছাড়া বাটী হইতে আর কিছুই উদ্ধার করিবার সাধ্য কাহারই হইত না —দেবাসুরে একত্র হইয়া মন্দার সাহায্যে ঐই বাটী-স্থিত তরল পদার্থ মন্থিত করিলেও না—আমি ত তুচ্ছ মনুষ্য মাত্র!

আহারের অধ্যায় যখন শেষ হইল, তখন বেলা প্রায় চারি ঘটিকা। আহার যাহা হইল তাহা সে দিনে আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলাম, আজ আমার পাঠক-পাঠিকাগণ তাহার কথঞ্চিৎ নমুনা পাইলেন। ইহার পরে এই স্বদেশবাসিগণের সঙ্গ ত্যাগ করিবার জন্য মন প্রস্তুত করিতে আমার অধিক বিলম্ব হয় নাই; বিশেষতঃ ভোজ্যের দাম চুকাইয়া দিবার সময় যখন শুনিলাম যে আমার একার জন্যই ছয় টাকা দিতে হইবে, তখন আতঙ্কে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল।

নবীন ঈশান ভগবতী কেহই সেখানে আহারে রাজি হইল না। তাহারা দোকান হইতে খাবার কিনিয়া তখনকার মত ক্ষুধা নিবারণ করিয়া লইল। আমি তাহাদিগকে জিনিষপত্রের পাহারায় রাখিয়া, অন্যত্র বাসস্থান স্থির করিবার উদ্দেশ্যে পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। এলাহাবাদ অপরিচিত স্থান, আমি তৎপূর্ব্বে আর কখনও সেখানে আসি নাই, কাহাকেও চিনি না। আমার এক নিকট সম্পর্কীয়া মাসিমা সেখানে স্বামিপুত্র লইয়া বাস করেন তাহা জানিতাম। একবার মনে করিলাম সেখানেই যাইব। আবার ভাবিলাম, পাচক ভৃত্য আমলা প্রভৃতি লইয়া আমরা ছয়-সাতজন লোক—এত লোকের স্থান সেখানে হইবে কি না জানি না,—সেখানে না যাওয়াই স্থির করিলাম। এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ ডাক্তার শিবপ্রসাদ রায় (Dr. S. P. Roy, L.R.C.P., M.R.C.S.) আমার মেসো মহাশয়, অবশ্য আমাদের এই কয়েকটি লোককে দুটি অন্ন দিতে তিনি কাতর হইতেনই না; স্থানাভাবে পাছে তাঁহাদিগকে বিপন্ন করি সেইজন্য সেখানে না গিয়া অন্যত্র বাসা করিবার উদ্দেশ্যে বাড়ীর সন্ধানে বাহির হইলাম।

কলিকাতার মত "To Let" লেখা বাড়ী সেখানে রাস্তা হইতে দেখা যায় কি না তাহা আমার জানা ছিল না। পাণ্ডাগণের কবলগত হইবার ইচ্ছাও আমার ছিল না। যাহা হউক একটা উপায় করিতে পারিবই, এরূপ মনে মনে ভাবিয়া পথ বাহিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম। অল্পদূর অগ্রসর হইতেই একটী ভদ্র-পরিচ্ছদধারী হিন্দুস্থানী লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি হিন্দু কি মুসলমান, তাহা তাঁহার চেহারা কিম্বা পরিচ্ছদ দেখিয়া বুঝিতে পারি নাই। তবে মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইল লোকটি ভদ্র। তাঁহার নিকটস্থ হইয়া ভদ্রভাষায় বিনীতভাবে ভাড়ার বাড়ী পাইবার সন্ধান বলিয়া দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ জানাইলাম। তিনি কিয়ৎক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অধিকতর

ভদ্রভাষায় এবং সুমিষ্ট স্বরে আমাকে কহিলেন, "আপনাকে বাঙ্গালী দেখিতেছি এবং আপনি এখানে নূতনই আসিয়াছেন, এখানকার লোকের 'হালচাল' আপনার না জানা থাকাই সম্ভব। আপনি গুড্‌ম্যান কোম্পানির বড়বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যদি তাঁহার সহায়তায় বাসস্থান এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় সামগ্রীর সন্ধান জানিয়া লন, তাহা হইলে আপনাকে কোন উদ্বেগই সহ্য করিতে হইবে না; এবং আমি জানি, গুড্‌ম্যান কোম্পানির বাবুরা অতিশয় সজ্জন, তাঁহারা আপনার কোন অসুবিধাই ঘটিতে দিবেন না। যে সকল বাঙ্গালী এখানে আসেন, তাঁহারা সকলেই গুড্‌ম্যানের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং ইঁহারাও সানন্দে সাহায্য দান করেন।"

ভিন্নজাতীয় লোকের মুখে এই স্বদেশবাসী গুড্‌ম্যান কোম্পানির প্রশংসাবাণী শুনিয়া আমার মনে তাঁহাদের সততা সম্বন্ধে আর কোন সংশয়ই রহিল না। আমি গুড্‌ম্যানের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করায় একখানি ভাড়াগাড়ী ডাকাইয়া তাহার কোচ-ম্যানকে আমাকে যথাস্থানে লইয়া যাইবার জন্য যথোচিত উপদেশ দিয়া, সসম্ভ্রমে ভদ্রলোক আমাকে অভিবাদন জানাইয়া বিদায় লইলেন। আমিও তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিয়া এবং আমার জন্য কষ্ট স্বীকার করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম।

হিন্দুস্থানী ভদ্র সন্তানটির মুখে গুড্‌ম্যান কোম্পানির বাবুদিগের যে প্রশংসাবাদ শুনিয়াছিলাম, যাহা দেখিলাম ততোধিক। বৃদ্ধপ্রায় বড়বাবু প্রশান্ত হাস্যের সহিত আমাকে আদর করিয়া ঘরে বসাইলেন। আগমনের হেতু জিজ্ঞাসার পরে আমার অবস্থা সম্যক্ আমি নিবে-দন করিলাম। ভদ্রলোক মহাব্যস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিবার জন্য তাঁহার জনৈক যুবক আত্মীয়ের উপরে ভার দিলেন। তাঁহাদেরই আবাস-গৃহের নিকট একটি ভাল বাড়ী আমার জ[illegible] স্থির হইল। সে রাত্রের ভোজ্য পদার্থ তাঁহারা আনাইয়া র[illegible]দ করিয়া রাখিবেন এই ব্যবস্থা তাঁহারাই করিলেন। আমি নিতান্ত আপত্তি উত্থাপন করিলে অনেক কষ্টে মূল্যগ্রহণ স্বীকার করিলেন—তাহাও তীর্থস্থানের দোহাই দিয়া স্বীকার করাইতে হইয়াছিল।

যখন উঠিবার সময় হইল, ষ্টেশনের নিকট হইতে জিনিষপত্র ও সঙ্গীয় লোকজনকে নূতন বাড়ীতে আনি-বার প্রয়োজন জ্ঞাপন করিলাম, তখন বৃদ্ধ দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিবার সময় আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি একটুখানি ফাঁপরে পড়িলাম। এমন উপকারী বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধুর নিকট তীর্থস্থানে মিথ্যা পরিচয় আমার মুখে আসিল না। আমি আমার বাড়ী রাজসাহী জেলায়, সে কথা জানাইলাম। নাম বলিবার সময়ে, আমার অন্নপ্রাশনের সময়ে জনক-দত্ত "ব্রজনাথ" নামই বলিলাম। পরিচয়টা সত্য হইল কিনা তাহা জানি না। হয়ত নীতিশাস্ত্রবিদ্‌গণ ইহাকে সম্পূর্ণ সত্য পরিচয় বলিবেন না। কিন্তু আমি মিথ্যা পরিচয় দিলাম এ কথা আমার সেদিনেও মনে হয় নাই, আজিও নহে—বরং সাধারণ ভদ্রসন্তানরূপে পরিচিত হইয়া সেই সকল ভদ্রলোকের নিকট হইতে যেরূপ আত্মীয়ভাবের আদর অভ্যর্থনা ও যত্ন পাইয়াছিলাম, রাজপরিচয়ে সে নৈকট্যের হানি করিবার ইচ্ছা আমার হয় নাই। আজিও প্রয়োজন হইলে আমি ঐরূপ পরিচয়ই লোককে দিব, তাহাতে নীতিশাস্ত্র আমার উপর রক্তকটাক্ষ বর্ষণ করিলে আমি নাচার।

প্রয়াগে পৌঁছিবার পর হইতেই কালিদাস-বর্ণিত গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম দেখিবার জন্য মন উৎকণ্ঠিতই ছিল। গুড্‌ম্যানের নিকট হইতে ষ্টেশনের সন্নিহিত বঙ্গ-বাচালের যাত্রীনিকেতনে আসিবার পথে, গাড়োয়ানকে বেণীঘাটের দিকে একবার যাইবার জন্য অনুরোধ করিলাম। একটু দূর বলিয়া প্রথমে স্বীকৃত হয় নাই; বেশী ভাড়ার লোভে আমাকে লইয়া গেল। আমি গাড়ী হইতে নামিয়া বালুকাময় তটভূমি অতিক্রম করিলাম এবং যে স্থানটিতে দাঁড়াইলে গঙ্গা-যমুনার যুক্তবেণী ভাল করিয়া দেখা যায়, সেইখানে দূরবিস্তৃত

জলরাশির দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলাম।

তখন চৈত্রমাস। গ্রীষ্মের পূর্ব্বাভাস বেশ অনুভব করা যায়। সেই দিনান্তরম্য নিদাঘের সূর্য্যকর-সমুজ্জ্বল সন্ধ্যায়, তীর্থবাহিনী স্রোতস্বিনীদ্বয়ের নৃত্যলীলার যে অনুপম শ্রী দেখিয়াছিলাম, তাহা আজও আমার মানসপটে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। অনতিকালপূর্ব্বেই কলেজ ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়াছিলাম, তখনও মহাকবির মধুনিঃস্যন্দী শ্লোকগুলি মুখস্থই ছিল। অস্তগমনোন্মুখ রবিরশ্মি সমুদ্ভাসিত বেণীবদ্ধা গঙ্গাযমুনার জলতরঙ্গের দিকে চাহিতে চাহিতে আমার অজ্ঞাতসারে মুখ দিয়া বাহির হইতে লাগিল—

ক্বচিৎ প্রভালেপিভিরিন্দ্রনীলৈ-
মুর্ক্তাময়ী যষ্টিরিবানুবিদ্ধা।
অন্যত্র মালা সিতপঙ্কজানা-
মিন্দীবরৈরুৎখচিতান্তরেব॥

ক্বচিৎ খগানাং প্রিয়মানসানাং
কাদম্বসংসর্গবতীব পঙ্‌ক্তিঃ।
অন্যত্র কালাগুরুদত্তপত্রা
ভক্তির্ভুবশ্চন্দনকল্পিতেব॥

ক্বচিৎ প্রভা চান্দ্রমসী তমোভি-
শ্ছায়াবিলীনৈঃ শবলীকৃতেব।
অন্যত্র শুভ্রা শরদভ্রলেখা
রন্ধ্রেষ্বিবালক্ষ্যনভঃপ্রদেশা॥

ক্বচিচ্চ কৃষ্ণোরগভূষণেব
ভস্মাঙ্গরাগা তনুরীশ্বরস্য।
পশ্যানবদ্যাঙ্গি বিভাতি গঙ্গা
ভিন্নপ্রবাহা যমুনাতরঙ্গৈঃ॥

কিন্তু এইখানে করযোড়ে একটি কথা আমার পাঠক-পাঠিকাদের নিকট সবিনয়ে নিবেদন করিয়া রাখি যে সে দিনে কোনও অনবদ্যাঙ্গী আমার সঙ্গে ছিলেন না; এবং থাকিবার কোনও সম্ভাবনাও ছিল না।

ক্রমশঃ

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

সিন্দূর-কৌটা

(উপন্যাস)

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

খুকী-চরিত।

প্রায় দশ মিনিট পরে খুকীকে কোলে করিয়া বকুরাণী ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, বিজয় অর্দ্ধশয়ান-অবস্থায় সোফায় পড়িয়া আছে, তাহার চক্ষু নিমীলিত। খুকীর চুলগুলি এইমাত্র আঁচড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, চোখে নূতন কাজল, ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে টিপ কাটা; আসল কথা, ক্ষিপ্রহস্তে এই প্রসাধনগুলি সম্পন্ন করার জন্যই তাহার মাতার আসিতে বিলম্ব হইয়াছে।

মাসাধিক অদর্শনের পরে সহসা খুকী পিতাকে দেখিতে পাইয়া, তাহার সেই কচি হাত দু'খানি আন্দোলিত করিয়া অদম্য উল্লাসে "বা—ব্বা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বিজয় সেই শব্দে চক্ষু খুলিয়া উঠিয়া বসিতেই, "আমি—বা-ব্বা—কোয়ে"—বলিয়া খুকী মাতৃ-ক্রোড়খানি বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। বিজয় তাহাকে বুকে

লইয়া, চুমো খাইয়া আদর করিতেই সে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া, কল-কাকলী সহকারে তাহার নিজস্ব "কথ্যভাষা"য় কি যে কহিতে লাগিল, বিজয় তাহার একবর্ণও বুঝিতে পারিল না।—কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পিতাপুত্রীর কথোপকথনে কিছুমাত্র বিঘ্ন হইল না।

বকুরাণী নীরবে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল। একবার তাহার মুখে হাসির রেখা ফুটে,—আবার কি মনে হইয়া, চক্ষু দুটি যেন ছলছল করিয়া উঠে।

খুকী কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে, বিজয় স্ত্রীর পানে চাহিয়া বলিল—"দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোস না।"

বকুরাণী সোফায় বসিয়া খুকীকে লইবার জন্য হাত বাড়াইল। খুকী পিতাকে জাপটিয়া ধরিয়া রহিল; কোনও মতে মা'র কোলে যাইবে না। বকুরাণী বলিল—"হ্যাঁ রে নেমোখারাম!—এখন আর আমি বুঝি তোর কেউ নই?"

বিজয় খুকীকে নিজ জানুর উপর বসাইয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"এই মাস-খানেকের মধ্যেই একটু বড় হয়েছে।"

বকুরাণী বলিল—"হ্যাঁঃ—তোমার যেমন কথা!—বড় আবার কোনখান্‌টা দেখলে? তেমনিই ত আছে।"

বিজয় বলিল—"না, একটু বড় হয়েছে বেশ বোঝা যাচ্ছে। তোমরা রোজ দেখ তাই লক্ষ্য করতে পার না। একটু বড় হয়েছে বৈ কি!"

অতঃপর প্রাধানতঃ খুকীর প্রসঙ্গই উভয়ের মধ্যে আলোচ্য হইয়া উঠিল। বিজয় যে রাত্রে পশ্চিম যাত্রা করে, তাহার পরদিন প্রাতে খুকী জাগিয়া উঠিয়া পিতাকে দেখিতে না পাইয়া, স্নানকক্ষের আবদ্ধ দ্বারের পানে কি বলিতে বলিতে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছিল, পরে ঝি আসিয়া সে দ্বার খুলিলে যখন খুকী দেখিল তাহা শূন্য, তখনই বা মা'র মুখপানে কিরূপ হতাশভাবে দৃষ্টি করিয়াছিল,—বেলা দশটার পর পিতৃ অন্বেষণে আহারের স্থানে গিয়া কিরূপ সপ্রতীক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়া-শব্দ পাইবামাত্র, পিতা কাছারী হইতে ফিরিয়াছেন মনে করিয়া সে কিরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল—ইত্যাদি সমস্ত কথা বকুরাণী ইতিপূর্ব্বে পত্রেই স্বামীকে সংক্ষেপে লিখিয়াছিল—এখন তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া অবশেষে বলিল—"মেয়েটা এত মায়াবীও হয়েছে!"

খুকী ক্রমে পিতার কোল হইতে নামিয়া মা'র কোল পুনরায় দখল করিল। বিজয় আজ যেন একটু গম্ভীর, স্ত্রী-বর্ণিত কাহিনী শুনিতে শুনিতে মাঝে মাঝে একটু আধটু হাসে, এক আধটা কথা কহে—কিন্তু তাহার পূর্ব্বের সে স্ফূর্ত্তি নাই। বকুরাণী আঁচল দিয়া খুকীর ঠোঁট দুটি মুছাইয়া দিতে দিতে, স্বামীর পানে চাহিয়া বলিল—"গাড়ীতে রাত্রে তোমার ভাল ঘুম হয়নি, না? তোমায় ভারি ক্লান্ত দেখাচ্ছে।"

বিজয় বলিল—"গাড়ীতে কোন কালেই ত রাত্রে আমার ঘুম হয় না। মাঝে মাঝে তন্দ্রা আসে; আবার জেগে জেগে উঠি।"

"কখন সেখানে উঠেছিলে?"

"পর্শু সোহাগপুর ছেড়েছিলাম বেলা একটার সময়—সেই থেকে চলেইছি চলেইছি—দু'রাত গাড়ীতে কেটেছে।"

বকু বলিল—"দু'রাত একদিন, এ কি কম কষ্ট। গাড়ীর ধূলো আর দোলানী! খাওয়া দাওয়ারও কষ্ট হয়েছে!"

"যা করে কেল্‌নার।"

"কোথা কোথা খেলে?"

কোন্ কোন্ ষ্টেশনে আহারাদি হইয়াছিল তাহা বিজয় সংক্ষেপেই জানাইয়া নীরব হইল।

বকুরাণী ভাবিতে লাগিল, গাড়ীর কথা যখন উঠিয়াছে, তখন স্বামী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সুশীর প্রসঙ্গও উত্থাপন করিবেন—তাহার ও কথাটা জিজ্ঞাসা করা ভাল দেখায় না। হয়ত তিনি মনে করিতে পারেন,—এতদিন পরে দু'জনে দেখা, সব কথা চাপা দিয়া সুশীর কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছে কেন? আমাকে কি সন্দেহ হয় নাকি?—

জানে, জিজ্ঞাসা করুক না, জিজ্ঞাসা করিলেই বলিব। আপনা হইতে বলাটা ভাল দেখায় না,—হয়ত ও মনে করিবে, সুশীর কথা বলিবার জন্য ইঁহার এত আকুলতা কেন?—সুতরাং কোনও পক্ষ হইতে সুশীর নাম উচ্চারিত হইল না!

উভয়েই নীরব। একজন বড় ঔপন্যাসিক লিখিয়াছেন,—স্বামী স্ত্রী, পৃথিবীতে যাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম সম্বন্ধ—তাহারা নিভৃতে একত্র বসিয়া আছে অথচ উভয়েই নীরব—এটি ভাল লক্ষণ নয়।

এই নীরবতা যখন বিজয়ের অসহ্য হইল, তখন সে আবার খুকীর কথাই পাড়িল।—এই একমাস মধ্যে কবে খুকী খেলা করিতে করিতে পড়িয়া গিয়াছিল, কবে সে দুগ্ধপানে অসম্ভব অনুরাগ দেখাইয়া বাটীর সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিল, কবে বেড়াইতে গিয়া তাহার জুতা হারাইয়া যায়, কবে তাহার গা গরম হইয়াছিল—এই সকল কথা একে একে বকুরাণী স্বামীকে জ্ঞাত করিল। এইরূপে প্রায় ঘণ্টাখানেক কোনও মতে কাটিল।

দাসী আসিয়া জানাইল, বেহারা বলিতেছে স্নানের জল তৈয়ারি আছে। বকুরাণী ঘড়ি দেখিল, প্রায় প্রায় তখন দশটা। বলিল—"যাও দেরী কোরো না, স্নান করে খেয়ে একটু বিশ্রাম কর। তোমার মুখখানি শুকিয়ে আধখানি হয়ে গেছে।"

"হাঁ যাই"—বলিয়া বিজয় উঠিয়া গেল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ঘরে।

আহারের পর বিজয় তাহার বেহারাকে নিম্নতলে পোষাক কামরায় শয্যা রচনা করিতে আদেশ দিল। চারিদিকের দ্বার ও জানালা বন্ধ করিয়া, অন্ধকার ঘরে খোলা পাখার নীচে শয়ন করিয়া বিজয় ভাবিতে লাগিল —"বকুরাণী আজ আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করিতেছে কেন? সুশী-ঘটিত প্রায় সব কথাই সে জানে। সুশীকে তাহার সম্বন্ধে একটি কথাও আমাকে জিজ্ঞাসা করিল না ইহার কারণ কি? সন্দেহ? অভিমান?"

বিজয়ের তখন মনে পড়িল,—"সুশীকে কলিকাতায় আনিতেছি এ কথা ত বকুরাণীকে লিখি নাই। শেষ চিঠি যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহাতে এই মাত্র জানাইয়াছি যে বর্ম্মা ভিন্ন অন্য কোথাও সুশীর কোন আত্মীয় স্বজন নাই—অথচ সে বর্ম্মাতেও যাইতে চাহিতেছে না— কলিকাতায় যাইতে চায়। কোথাও জেননা মিশনে তাহার জন্য কোনও কাযকর্ম্ম যদি যোগাড় করিতে পারি সেই চেষ্টা করিতেছি লিখিয়াছি। তথাপি বকুরাণী জিজ্ঞাসা করিল না সুশী কোথায় গেল, তাহার কি হইল। তাহার কলিকাতায় আসার কথা কি লছমনের কাছে শুনে নাই? আমি আসিলাম না, লছমন আসিয়া পৌছিল, আমি কোথায় গেলাম কি করিতে গেলাম, ইহা কি আর লছমন প্রকাশ করে নাই? বকুরাণীর কাণে যায় নাই?—কিন্তু লছমনও যে আবার অতিরিক্ত হুঁসিয়ার।"—সোহাগপুরের ডাকবাঙ্গলায় পৌছিয়া, তথাকার খানসামা প্রভৃতির কাছে লছমন যে কাল্পনিক কাহিনীটি প্রচার করিয়াছিল, তাহা বিজয় নেকলেশ উদ্ধার করিয়া জব্বলপুর হইতে ফিরিয়া সুশীর নিকট শুনিয়াছিল—তাই তাহার মনে হইল, লছমন যদি কথাটা চাপিয়াই গিয়া থাকে! ইহা এমন একটা ব্যাপার যে লছমনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসাও করা যায় না। —বকুরাণীর মনের ভাব কি হইয়াছে, সেই বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে, দুই দিনের পথশ্রম ও রাত্রিজাগরণ ক্লেশে বিজয় ঘুমাইয়া পড়িল।

বেলা চারিটার পর ঘুম ভাঙ্গিলে, মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া দর্পণের সম্মুখে বসিয়া বিজয় স্বহস্তে নিজ ক্ষৌরকার্য্য সম্পন্ন করিল। আত্মক্ষৌরকার্য্য শেষ হইলে, মুখাদি ধৌত করিয়া বেহারার সাহায্যে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতেছিল, এমন সময় অন্তঃপুর হইতে তাহার তলব হইল। ইংরাজী বেশে সুসজ্জিত হইয়া, দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া লইয়া, একটা

অভিমুখে অগ্রসর হইল। সিঁড়ির নিকটে দাঁড়াইয়াই বেহারাকে হুকুম করিল—"মোটর বাবুকে বল্, বড় গাড়ী খানা আনুক।"

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, নিজ শয়নকক্ষের দ্বারের নিকট পত্নীকে দেখিতে পাইল। বকুরাণী স্বামীর বেশ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বেরুচ্চ নাকি?"

"হ্যাঁ। তুমি আমায় ডেকেছিলে?"

"ভিতরে এস"—বলিয়া বকুরাণী শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। বিজয় তাহার পশ্চাৎ প্রবেশ করিয়া, দ্বারের পর্দ্দা টানিয়া দিয়া, কক্ষের মধ্যস্থলে গিয়া দাঁড়াইয়া স্ত্রীর মুখপানে প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিল।

"এখনি কোথায় বেরুচ্চ? বোস, কথা আছে।"—বলিতে বলিতে বকুরাণী গিয়া পাখার স্বুইচ্ টানিয়া দিল। পাখা ঘুরিতে আরম্ভ করিল।

বিজয় একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এই জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ডেকেছ?"

বকুরাণী বলিল—"হ্যাঁ।"—তাহার কণ্ঠস্বর বেশ স্বাভাবিক শুনাইল না।

বিজয় কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া স্ত্রীর অতি নিকটে গিয়া বলিল—"আমি বেরুচ্চি তোমায় কে বল্লে?"

বকুরাণী কয়েক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"আমি খবর পাচ্ছিনে? খাওয়ার পর নীচের ঘরে গিয়ে তুমি কখন্ শুলে তাও আমি জানি, কখন্ উঠলে তাও আমি জানি। কামালে, ইংরেজি কাপড় পরছ—তাও শুনলাম। এখনি বেরুবে তাও শুন্‌লাম।"

বিজয় চেষ্টাকৃত পরিহাসের সুরে বলিল—"এ যে রীতিমত সি-আই-ডি'র ব্যাপার! এত খোঁজখবর কেন? ব্যাপারটা কি?"

বকুরাণী বলিল—"ব্যাপার আর কি! তুমি কি খেলে, কোথায় শুলে, এসব খোঁজ আমি নেব না? দু'রাত একদিন গাড়ীতে কেটেছে, কত কষ্ট হয়েছে তোমার, শরীর খারাপ, খেতে বসলে কিছুই খেতে পারলে না—তুমি কেমন আছ কি করছ আমার জানতে ইচ্ছে করে না?—খোঁজখবর কি আজ নতুন নিচ্ছি? বস না, কথা আছে।"

স্ত্রীর কথাবার্ত্তার এইপ্রকার ভাবভঙ্গি বিজয়ের ভাল লাগিল না। সোফায় সে বসিবামাত্র বকুরাণী তাহার পার্শ্বে আসিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"সাত তাড়াতাড়ি কোথা যাওয়া হচ্ছে শুনি?"

বিজয় ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল—"সব খবরই ত রাখ—এ খবরটি রাখ না?"

বকুরাণী বলিল—"রাখি। তুমি সুশীর কাছে যাচ্ছ।"—তাহার চক্ষু দুইটি অস্বাভাবিকরূপে উজ্জ্বল দেখা যাইতে লাগিল।

বিজয় বলিল—"তা যাই-ই যদি, তাতে দোষটা হয়েছে কি?"

"না দোষ হয়নি। কিন্তু তুমি আমার কাছে লুকো-চুরি করছ কেন বল দেখি?"

বিজয়ও অল্প একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল—"কি লুকোচুরি করলাম তোমার কাছে?"

"তুমি তাকে কলকাতায় নিয়ে এলে, ভগবান জানেন কোথায় রেখেও এলে,—এ সব কোনও কথা তুমি আমায় বলেছ? তোমার সুশীকে কি আমি কেড়ে নিতাম?"—বলিয়াই বকুরাণী অপরদিকে সোফার হাতলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া চাপাস্বরে কান্না আরম্ভ করিয়া দিল।

বিজয় এই আকস্মিক বিপ্লবে বুদ্ধি হারাইয়া মূঢ়ের মত হইয়া পড়িল। কি করিবে কি বলিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল—"কি বিপদ!—এমন মুস্কিলেও মানুষ পড়ে!"—আর কিছু ভাবিয়া না পাইয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে বকুরাণীর বাহু ধরিয়া বলিল—"ও কি!—ও কি!—ও কি করছ তুমি? কাঁদছ কেন? কি হয়েছে? তুমি কি পাগল হয়ে গেলে না কি?—না হিষ্টীরিয়া? না কি? চুপ কর।"

স্বামীর এই সকল কথা শুনিয়া বকুরাণীর কান্না ত থামিলই না বরং বাড়িয়া গেল।

দুই হাত রাখিয়া, তাহার মধ্যে মুখখানি নিমজ্জিত করিয়া *সে ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিল।*

অর্দ্ধমিনিটকাল নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বিজয়ের মাথায় এক বুদ্ধি যোগাইল। সে বলিল—"চুপ কর—চুপ কর—শান্ত হও—এক্ষুণি তোমার ফিট হবে। চুপ কর—নৈলে আমি এই চল্লাম, সতুকে বউদিদিকে ডেকে আনি—তোমার ফিট হলে একলা কি করব আমি?"—বলিয়া বিজয় দ্বারের দিতে সশব্দে কয়েকপদ অগ্রসর হইল।

বিজয়ের প্রত্যাশিত সুফল ফলিল। বকুরাণী মুখ তুলিয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিল—"তা বৈ কি!—তাদের ডেকে আনবে বৈ কি!—যাও না, শুধু দুজনকে কেন, বাড়ী সুদ্দ সবাইকে ডেকে আন—ডেকে সবাইকে দেখিয়ে দাও তোমার স্ত্রীর কত আদর!"

বিজয় ফিরিয়া বকুরাণীর কাছে আসিয়া বসিয়া বলিল—"এমন ছেলেমানুষ তুমি? ছি ছি ছি! কি হয়েছে যার জন্যে তুমি এত কাণ্ড বাধিয়ে বস্‌লে?"

বকুরাণী নীরবে মেঝের দিকে চাহিয়া রহিল। বিজয় আরও দুই তিনবার এই প্রশ্ন করার পর সে অবশেষে ক্ষীণস্বরে ধীরে ধীরে বলিল—"হবে আর কি?"

"তবে কাঁদছিলে কেন?"

বকুরাণী কোন কথাও কহে না, স্বামীর পানে মুখ তুলিয়া চাহেও না। বিজয় পীড়াপীড়ি করিতে শেষে সে বলিল—"তা একটু কাঁদলামই বা? মেয়েমানুষ অমন কেঁদে থাকে।"

"অমনি অমনি? শুধু শুধু? কোনও কারণ না থাকলেও?"

বকুরাণী কোনও উত্তর করিল না। বিজয় পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া তাহার চক্ষু ও গণ্ডদেশ হইতে অশ্রুজল মুছাইয়া দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিল—"এ সব বুদ্ধি তোমায় আজ কে দিলে বল ত?"

"বুদ্ধি আর কে দিতে যাবে?—আমার নিজের বুদ্ধি নেই? বুদ্ধি খুব আছে—কিন্তু থাকলে কি হবে? সময় সময় তা লোপ পেয়ে যায়।"

এই কথার ভাবটা বিজয় ঠিক বুঝতে না পারিয়া, *কৌতূহলী হইয়া স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।* বকুরাণী অন্যদিকে চাহিয়া বলিল—"তা, কোথায় যাচ্ছিলে, দেরী করছ কেন?"

ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া বিজয় কোমল স্বরে বলিল—"তুমি আমার একটি কথা শুন্‌বে?"

বকুরাণী তাহার সেই অশ্রুঝরা চক্ষুযুগল স্বামীর পানে ফিরাইল। বিজয় আবার বলিল—"আমার একটি কথা শুন্‌বে তুমি?"

বকু তাহার আরক্তিম ওষ্ঠাধর ঈষৎ স্ফীত করিয়া বলিল—"কবে আবার তোমার কথা আমি না শুনেছি? কি কথা বল না।"

"তুমি চট্ করে কাপড় বদলে নাও, আমার সঙ্গে তোমার একজায়গায় যেতে হবে।"

"কোথা?"

"যেখানেই হোক্ না কেন! স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীলোক যেখানে খুসী যেতে পারে। সীতা, রামের সঙ্গে দণ্ডকারণ্যে পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন। তৈরী হয়ে নাও—চল তুমি আমার সঙ্গে।"

বকু মুখ তুলিয়া স্বামীর মুখপানে প্রায় অর্দ্ধ মিনিট চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"আমায় সূর্পনখা দেখাবে?"—বলিয়া সে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

বিজয় আজ গৃহে ফিরিবার পর, সারাদিনে বকুরাণীর মুখে এই প্রথম হাসি। সে হাসি দেখিয়া বিজয় সাহস পাইল। বলিল—"না, ঠাট্টা নয়, সত্যি তোমায় যেতে হবে। কাপড় বদ্‌লে জুতো মোজা পরে নাও—চল, আমার সঙ্গে গ্রেট ঈষ্টার্ণ হোটেলে। সুশীর আর কোনও উপায় ত করতে পারি নি—সে কলকাতাতেই এসেছে, গ্রেট ঈষ্টার্ণে আছে। এখানে জোড়াগির্জ্জের কাছে মিষ্টার চৌধুরী বলে একজন আছেন, মা মরার পর সুশী কিছুদিন তাঁদের বাড়ীতে খরচা দিয়ে থাকত। সেইখানে আবার তার থাকবার বন্দোবস্ত করতে হবে। সুশী নিজে পারবে না। সে বলে, আমি কোন্ মুখ নিয়ে তাঁদের কাছে গিয়ে বলব আমার স্বামী আমাকে ফেলে

পালিয়ে গেছে। সুতরাং সে কায আমাকেই করতে হবে—অন্য উপায় নেই। আজ সকালে গাড়ী থেকে নেমে সুশীকে গ্রেট ঈষ্টার্ণে রেখে এসেছি—পাঁচটার সময় সেখানে গিয়ে ও সম্বন্ধে পরামর্শ করে, চৌধুরী সাহেবের কাছে যাবার কথা আছে। হোটেলে ত বেশী দিন তার থাকা চলবে না, রোজ ১০।১২৲ টাকা খরচ—কোথা পাবে সে? আমার সঙ্গে চল তুমি।"

বকু বলিল—"তুমি অবাক কল্লে যে! আমি যাব হোটেলে? হিঁদু ঘরের বউ হয়ে শেষকালে গ্রেট ঈষ্টার্ণ হোটেলে! ও সব অনাচার আমার দ্বারা হবে টবে না। সে আমি পারব না।"

বিজয় বলিল—"কি মুস্কিল! হোটেলে গিয়ে কেউ কি তোমায় ছুরি কাঁটা ধরে খানা খেতে বলছে?"

বকু আবার একটু মৃদু হাসিয়া বলিল—"সে চেষ্টাও করতে বড় কসুর করেছ কিনা! যাও যাও —আমি হোটেলে ফোটেলে যেতে পারব না। —বিশেষ—এ বয়সে। এখন কোথায় পূজো আহ্নিক করবার বয়স হয়ে এল, এখন কিনা বলেন হোটেলে চল।"—বলিয়া বকুরাণী উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্বামীর পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

স্ত্রীর এই আকস্মিক ভাবপরিবর্ত্তনে মনে মনে অত্যন্ত আরাম পাইয়া বিজয় বলিল—"হোটেল থেকে ফিরে, কাপড় ছেড়ে, মাথায় গঙ্গাজলের ছিটে দিয়ে, পূজো আহ্নিক কোরো এখন।"

বকুরাণী বলিল—"না, আমার এখন ঢের কায আছে। চায়ের জল বোধ হয় এতক্ষণ তৈরী। চা না খেয়েই যাবে? দশ মিনিট যদি দেরী করতে পার ত তোমায় আমি চা খাইয়ে দিই।"

বিজয় বলিল—"আচ্ছা—তা চা খেয়েই যাচ্ছি। সত্যি তুমি আমার সঙ্গে যাবে না?"

"পাগল! (স্বর নামাইয়া) কাপড় বদলে জুতো মোজা পরতে পেলেই এখনি বাড়ীশুদ্ধ সবাই ছুটে আসবে—জিজ্ঞাসা করবে কোথায় যাচ্ছ, কি বৃত্তান্ত! সুশী ত এখন রইল, আর একদিন না হয় গিয়ে

দেখে আসবো এখন। তুমি বস আমি চট্ করে তোমার চা নিয়ে আসি।"—বলিয়া বকুরাণী দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। দ্বারের নিকট হঠাৎ থামিয়া, ফিরিয়া গোসলখানায় প্রবেশ করিল। ভিজা তোয়ালে দিয়া চক্ষু ও গাল হইতে অশ্রুচিহ্ন মুছিয়া ফেলিয়া, গোসলখানা বাহির হইল। মুহূর্ত্তমাত্র স্বামীর পানে চাহিয়া একটু বক্র হাসি হাসিয়া, ক্ষিপ্রপদে কক্ষ হইতে অপসৃত হইল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বাহিরে।

বিজয়ের মোটরগাড়ী যখন গ্রেট ঈষ্টার্ণ হোটেলের সম্মুখে পৌছিল, তখন প্রায় পৌনে ছয়টা। দ্বিতলে ১৯নং কক্ষ সুশীর জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা বিজয় জানিত—তড়্তড়্ করিয়া সিঁড়ি উঠিয়া ১৯নং কক্ষের সম্মুখে গিয়া আবদ্ধ দ্বারে করাঘাত করিল। কাহারও সাড়া শব্দ নাই। আরও দুই তিনবার নিষ্ফল করাঘাত করিয়া, হোটেলের কোনও ভৃত্যের অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই, বারান্দার দূরপ্রান্তে বিজয় সুশীকে আসিতে দেখিল।

তখন সে অগ্রসর হইয়া সুশীর নিকট পৌছিয়া বলিল —"তোমার ঘরে নক্ করে, কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে আমার ত ভাবনাই হয়েছিল তুমি গেলে কোথা!"

সুশী মুখখানি গম্ভীর করিয়া বলিল—"আমি আর কোথায় যাব? যেখানে আমায় রেখে গেছ, সেইখানেই আছি। বলেছিলে ৫টার সময় আসবে—আমি ভেবেছিলাম সত্যিই বা!"—বলিয়া সুশী অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

বিজয় দেখিল, তাহার ওষ্ঠযুগল ঈষৎ কম্পিত হইতেছে। বলিল—"একটু দেরী হয়ে গেছে,—তাই বুঝি রাগ হয়েছে তোমার?"

সুশী বলিল—"রাগ আবার কে করছে! বলেছিলে পাঁচটার সময় আসবে, এখানে চা খাবে—তাই পাঁচটার

বাজলো—স-পাঁচটা বাজলো—আমি ডাইনিং সেলুনের ব্যাল্‌কনিতে গিয়ে পথের দিকে চেয়ে চেয়ে, একবার এধার একবার ওধার ঘুরে বেড়াচ্ছি—কোন্ দিক দিয়ে তুমি আসবে তা ত জানিনে! কুক্ কেল্‌ভির ফটকের ঘড়িতে যখন দেখলাম সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে—তখন ভাবলাম, আজ আর তুমি আস্‌বে না; অনেক দিন পরে বান্ধী এসেছ—বকুরাণীর সঙ্গে কত গল্পগুজব হচ্ছে—এখানে আসবার কথা বোধ হয় ভুলেই গেছ!"

বিজয় বলিল—"বকুই ত দেরী করে দিলে। চা না খাইয়ে ছেড়ে দিলে না, নৈলে আমি ত ঠিক সময়েই এসে পৌঁছতাম।"

সুশী বলিল—"চা-ও খেয়ে এসেছ? বেশ!"—বলিয়া সে অন্যদিকে চাহিয়া রহিল।

বিজয় সুশীর এই অভিমানসূচক কথায় মনে মনে কৌতুক অনুভব করিল। "তুমি ত এখনও চা খাও নি। চল চা খাবে চল।"—বলিয়া সুশীর হস্তধারণ করিল।

সুশী বলিল—"থাক্—চা আমার না খেলেও চলে। না-ই খেলাম!"

বিজয় একটু হাসিয়া বলিল—"চা খেয়ে এসেছি বলে এত রাগ!—চল চল, আমি আবার খাব এখন।—চল, দুজনে চা খেয়ে, গঙ্গার ধারের রাস্তায়, ময়দানে মোটরে একটু বেড়ান যাবে। এস।"

এতক্ষণে সুশী তাহার চক্ষুযুগলের সম্পূর্ণ দৃষ্টি বিজয়ের উপর স্থাপিত করিয়া, একটু হাসিল। বলিল—"বাড়ীতেও খাবে আবার বাইরেও খাবে!—তুমি ভারি লোভী ত!"

"লোভী না হলে আর আমার এমন দশা হবে কেন?—এখন এস।"—বলিয়া বিজয় সুশীকে সঙ্গে লইয়া বারান্দা অতিবাহন করিয়া, ডাইনিং সেলুনের দিকে চলিল।

যাইতে যাইতে সুশী জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি যখন কার থেকে নামলে, আমায় দেখতে পেয়েছিলে?"

"না।"

"কিন্তু তুমি উপর দিকে চাইলে যে! আমি ভাবলাম আমায় দেখতে পেয়েছ—তুমি সেখানেই আসবে মনে করে তাই ব্যালকনিতেই দাঁড়িয়ে একটু অপেক্ষা করলাম। তুমি এলে না দেখে আমি তোমায় খুঁজতে আসছিলাম।"

উভয়ে সেই সুবিস্তীর্ণ ডাইনিং সেলুনে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সেখান তখন প্রায় জনশূন্য, সকলেই চা পানাদি শেষ করিয়া ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। কেবল এখানে ওখানে দুই একজন শ্বেতকায় পুরুষ বা স্ত্রীলোক বসিয়া চা পান করিতেছে। নিরিবিলিতে একটি ক্ষুদ্র টেবিল অধিকার করিয়া দুইজনে বসিয়া চা পান আরম্ভ করিল।

বকুরাণীর কথা, মেয়ের কথা, বাড়ীর অন্যান্য সকলের কথা সুশী খুঁটিয়া খুঁটিয়া বিজয়কে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—"আমার বিষয়ে বকুরাণীর সঙ্গে কোনও কথা হল না কি?"

বিজয় বলিল—"তা হল বৈকি।"

"সে কি বল্লে?"

বিজয় আংশিক সত্য কথা প্রকাশ করিয়া বলিল—"তাকেও যে সঙ্গে আনতে চেয়েছিলাম এখন। হোটেলের নাম শুনে সে কিছুতেই রাজি হল না। বল্লে হিঁদু-ঘরের বউ হয়ে কি হোটেলে যেতে পারি! সেই সব তর্ক বিতর্কেই ত আমার বেরুতে দেরী হয়ে গেল। বকু শেষে বল্লে সুশী ত এখন আছে, আর একদিন গিয়ে তাকে দেখে আসব।"

সুশী কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। শেষে বলিল—"আমারও তাকে ভারি দেখতে ইচ্ছে করে। আচ্ছা বিজয়, বকুরাণী দেখতে কেমন?"

বিজয় উদাসীনভাবে বলিল—"মন্দ কি!"

সুশী বিজয়ের পানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল—"এই বুঝি তুমি প্রেমিক! স্ত্রীর রূপের বর্ণনায় কোথায় তোমার মুখে কবিত্বের ফোয়ারা ছুটবে—তা নয়,

বেগারঠেলামত বল্লে 'মন্দ কি !'—না, সত্যি বল না ; বকুরাণী খুব সুন্দর ?"

বিজয় বলিল—"কি কি হলে খুব সুন্দর বলা যায় সেইটে আগে আমায় বুঝিয়ে দাও।"

সুশী বলিল—"যাও, উকিলী চালাকি কোরো না। যখনই তোমায় জিজ্ঞাসা করেছি—তখনই তুমি এই কথাই বলেছ—মন্দ কি ! না বল নেই বল্লে ! এখন ত আমরা আর জব্বলপুরে ডাকবাঙলায় নেই ; যখন খুশী নিজে গিয়ে আমি বকুরাণীকে দেখে আসব।"

এ কথা শুনিয়া বিজয়ের মনটি খুব যে উৎসাহিত হইয়া উঠিল, এমন লক্ষণ দেখা গেল না। সে চায়ের পেয়ালায় মনঃসংযোগ করিয়া নীরব হইয়া রহিল।

হঠাৎ সুশী বলিয়া উঠিল—"আচ্ছা বিজয়"—বলিয়া সে থামিয়া গেল।

বিজয় মুখ তুলিয়া দেখিল, সুশী তাহার পানে চাহিয়া দুষ্টামির হাসি হাসিতেছে। জিজ্ঞাসা করিল—"কি ?"

সুশী মিষ্ট অনুনয়ের স্বরে বলিল—"আমার একটি কথা রাখবে ?"

"কি কথা ?"

"যদি রাখ ত বলি"—বলিয়া সুশী মৃদু মৃদু হাসিয়া মস্তকটি আন্দোলিত করিতে লাগিল।

বিজয় কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি কথা আগে শুনি ত !"

"আচ্ছা, আজ বেড়ানোর পর, তুমি আমায় বাড়ী নিয়ে চল না, বকুরাণীকে আমি দেখে আসি। যাবে ? লক্ষ্মীটি !—ভারি মজা হয় কিন্তু তা হলে।"

এ প্রস্তাবে বিজয়ের মুখখানি গম্ভীর ও চিন্তাযুক্ত হইয়া উঠিল। কি ভাবিয়া, সে বলিল—"আজই ?"

"হ্যাঁ—আজই। কেতাবে পড়নি, আজ যাহা করিতে পার, কাল তাহা করিব বলিয়া ফেলিয়া রাখিও না।—চল, দুজনে খানিক বেড়িয়ে, তার পর হঠাৎ গিয়ে সেখানে উপস্থিত হই।"

উভয়ের চা পান শেষ হইয়া গিয়াছিল। বিজয় বলিল—"চল, এখন বেড়াতে ত যাওয়া যাক—পথে এ বিষয়ে পরামর্শ হবে এখন। তুমি প্রস্তুত ?"

"হ্যাঁ—প্রস্তুত বৈ কি। একমিনিট তুমি বোস। আমার আয়াটাকে একটা কথা বলে আসি।"

সুশী ফিরিয়া আসিলে, বিজয় তাহাকে মোটরে লইয়া সান্ধ্যবায়ু সেবনার্থ বহির্গত হইল।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থ-সমালোচনা

সত্যালোকম্—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রণীত। কলিকাতা ৮।২নং কাশীঘোষের লেন, "বিদ্যোদয়" যন্ত্রে মুদ্রিত ও শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য লেখা নাই।

ইহা একখানি ক্ষুদ্র সংস্কৃত কবিতা পুস্তক, টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ পজ্ঝটিকা ছন্দে রচিত। জগদ্গুরু শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য প্রণীত প্রসিদ্ধ "মোহমুদ্গর" গ্রন্থের ভাব শব্দ ও ছন্দ অবলম্বন ও অনুকরণ করিয়া ২০টি শ্লোকে পুস্তিকা খানি রচিত হইয়াছে। উভয় গ্রন্থ নিবদ্ধ শ্লোকগুলি পর পর মিলাইয়া পাঠ করিলে সমালোচ্য গ্রন্থখানি শঙ্করাচার্য্যকৃত "মোহমুদ্গরে"র প্রতিবাদ বলিয়াই মনে হয়। কেন না শঙ্করাচার্য্য যে বিষয় ও বস্তুগুলিকে ব্রহ্ম বা ব্রহ্মত্বলাভের অন্তরায় স্বরূপ প্রতিপন্ন করিয়া তাহাদের মিথ্যাত্ব খ্যাপন করিয়াছেন, বক্ষ্যমান গ্রন্থকার সেগুলিকে তাহার উপায়স্বরূপ প্রতিপন্ন করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে উপদেশ করিতেছেন। তাহা হইলেও, এরূপ উপদেশ করার মূলে গ্রন্থকারের যে সদুদ্দেশ্য আছে তাহা বলিতে পারা যায়। তিনি বলিতেছেন,"সর্ব্বত্র সত্য দর্শন ও সত্য প্রতিষ্ঠা কর", "চিন্ময় পরমাত্মার বিলাসস্বরূপ এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে জড় বলিও

না," ইহাকে "সত্যরূপে অবগত হও," "যাহা কিছু আছে, সমস্তই সত্য এইরূপ ধারণা কর," "জগতের কোথাও মিথ্যা বা ভ্রান্তি নাই, মায়া এবং কামিনী কাঞ্চনকেও সত্য বলিয়া ধারণা করিবে" ইত্যাদি। বর্ত্তমান সময়ে গ্রন্থকারের এবম্বিধ উপদেশ ঠিক সময়োপযোগীই হইয়াছে, কেননা, এই ভোগবিলাস ও আসক্তির যুগে নিরবচ্ছিন্ন ত্যাগের উপদেশ যে কতদূর ফলপ্রসূ তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। সুতরাং সংসারের কাঁটা দিয়াই এই সংসারের কাঁটা বাহির করিতে হইবে।

গ্রন্থখানি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে লেখকের চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা ইহা পাঠ করিয়া সুখী ও উপকৃত হইয়াছি, আশা করি ইহা সকলের কাছেই আদরলাভ করিবে। গ্রন্থের ভাষা ও রচনা বেশ সরল, সুমিষ্ট ও প্রাঞ্জল হইয়াছে। ইহা স্কুলপাঠ্য হইবার উপযোগী। গ্রন্থের দুইটি শ্লোক আমরা পাঠকগণকে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম ,—

"বালাস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তা-
স্তরুণাস্তাবত্তরুণীরক্তাঃ।
বৃদ্ধাস্তাবচ্চিন্তামগ্নাঃ
পরমে ব্রহ্মণি সর্ব্বে লগ্নাঃ।" ১৯শ শ্লোক।
"কাঞ্চনকান্তে ভাবয় সত্যে
নাস্তি ভয়ং ত্বয়ি মাতুঃ পুত্রে।
মাতৃস্নেহাদপি তব ভীতি-
র্হাহন্তৈবা বিকলা রীতিঃ।" ১৫শ শ্লোক।

শঙ্করাচার্য্য কৃত মোহমুদ্গার গ্রন্থের যথাক্রমে ১৩ ও ১৪ শ্লোকদ্বয় পাঠক ইহার সহিত মিলাইয়া পাঠ করিয়া দেখিবেন। বাহুল্য ভয়ে আমরা আর অধিক উদ্ধৃত করিলাম না।

অর্ঘ্য—শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায় প্রণীত। কলিকাতা "গুপ্তপ্রেসে" মুদ্রিত এবং তথা হইতে শ্রীহিমাংশুশেখর গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ১১১ পৃষ্ঠা, মূল্য ৸০

এখানি কবিতাপুস্তক। বর্ত্তমান সময়ে কাব্যক্ষেত্রে কবিতা লেখার যেরূপ বাড়াবাড়ি ও ছড়াছড়ি হইয়াছে তাহাতে কোন কবিতাগ্রন্থ পাঠ বা সমালোচনার্থ আমাদের হাতে আসিলে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয়। কেন না আজকাল দেখিতে পাই, যখন যার যা খেয়ালে উদয় হয়, তাই কবিতাকারে ছাপাইয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার অধিকাংশেরই না আছে মাথা না আছে মুণ্ড না আছে আর কিছু। কোন কায না থাকিলে যেমন "খুড়োর গঙ্গাযাত্রা" করার ব্যবস্থা আছে, আজকাল কবিতা লেখাও তদ্রূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থখানিও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বলিতে কি, আমরা এরূপ ছন্দোহীন ভাবসৌন্দর্য্য-বর্জ্জিত কবিতাগ্রন্থ অধিক পাঠ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ইহার ভাষা ও ভাব এতই নীরস এবং প্রাণহীন যে হাজার নিঙড়াইয়াও আমরা ইহা হইতে এক ফোঁটা রস লাভ করিতে পারিলাম না।

লেখক তাঁহার কতকগুলি কবিতার শীর্ষে এবং কতকগুলির নিম্নভাগে একটি করিয়া ভূমিকা এবং কতকগুলি কবিতার কোন কোন চরণের একটি, কোন চরণের বা দুইটি করিয়া "পাঠান্তর" সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই "পাঠান্তর"গুলি উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "কোন্‌টি ভাল পাঠান্তর তাহা সুধীগণ বিবুধগণ বিচার্য্য", "বেদপারগ দৃষ্টি করিবেন" ইত্যাদি। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা বিবুধাদি পদবাচ্য এবং "বেদপারগ" না হইলেও নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, উক্ত ভূমিকা এবং "পাঠান্তর" প্রদানে কবি "নতুন কিছু" করিয়াছেন বটে। ভূমিকা ও "পাঠান্তর"গুলি পাঠ করিলে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠে। বিস্তার ভয়ে আমরা পাঠকগণকে ইচ্ছানুরূপ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারিলাম না, সংক্ষেপে কিছু কিছু নমুনা দিলাম—

গ্রন্থের প্রথম কবিতা "শঙ্খধ্বনি"। কবি শঙ্খধ্বনিকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন,—

"সাগর প্রভব নিধি হেন শঙ্খধ্বনি,
মধ্যাহ্নে মার্গের ধারে যাইবার কালে,
পরাজিয়া শকটের ঘর্ঘর নিঃস্বন,
অশ্বপদ, নগরের নানা কোলাহল,
সবেগে শব্দিত হয়ে পশিয়া শ্রবণে,
হৃদয়গহ্বরে গিয়া পশিল মরমে,
তুলি গভীর ঝঙ্কার। আসি বারে বার
সে স্বরলহরী ধ্বনি প্রতিধ্বনি হৃদে,
তুলিল আবেগপূর্ণ করি চিত মোর,
ক্ষণকাল স্বরলয়ে হলাম প্রলয়।"

এমন না হইলে কি কবি! পাঠক দেখিবেন কবির ভাব, ভাষা ও রচনা কেমন অদ্ভুত। তাঁর শঙ্খের "ঝঙ্কার" প্রথমে স্বরলহরী এবং তৎপরেই "বজ্রের নির্ঘোষ গভীর গর্জ্জন।" তার পর সেই প্রচণ্ড "মধ্যাহ্নে" সেই স্বরলয়ে কবির "ক্ষণকাল প্রলয়" হইয়া যাওয়া আরও অদ্ভুত নহে কি? শঙ্খধ্বনি সময়-বিশেষে ভাল লাগিতে পারে, কিন্তু কবি সেই ধ্বনি বর্ণনা করিতে যে মধুর কবিতাধ্বনি করিয়াছেন তাহা নিতান্তই অসহ্য।

তার পর, "শুভ্রশির" আর একটি তথৈবচ কবিতা। ইহার একস্থলে কবি বলিতেছেন—

"ধবল মস্তকে রহে মহার্ঘ সামগ্রী,
ভূপতির কোষাগার হোতে সমীচীন।"

"ধবল মস্তকে" "মহার্ঘ সামগ্রী" থাকিতে পারে, কিন্তু "ভূপতির কোষাগার হোতে সমীচীন"—ইহা যে কতদূর সমীচীন, তাহা আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগম্য।

তার পর উক্ত কবিতারই আর একস্থলে—

"উদ্ধত যৌবনতপ্ত যুবক হৃদয়,
এরূপ সারাংশ কথা কদাচিত সরে,
পরীক্ষা উত্তীর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় সভ্য,
হয়ত এরূপ নীতি নারিবে বলিতে।"

আমাদের মনে হয় ইহা

"দেখ পাড়ের কি বাহার,
জানিতে পারিবে করিলে ব্যবহার"

এই কাপুড়ে কবিতার চেয়ে কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে।

অন্য একটি কবিতায় কবি গ্রাম্যদৃশ্য দেখিয়া বলিতেছেন,—

"বিচিত্র বিশেষ হেরি কুজিত শুনিয়া,
প্রকৃতির দৃশ্যে শব্দে চ্ছাসিল অন্তর।
অশ্রান্ত উত্থিত হোয়ে বিহগ বিরুত,
বারম্বার স্ফারিল প্রেরণা মধুর।
অগ্রসর হোতে হোতে, চলিতে চলিতে,
প্রতি প্রেরণায় হোয়ে দ্বিগুণিত রয়।" (১২ ও ১৩ পৃ)

ইহা কি কবিতা? পাঠক, ভাব ভাষা ও কবিত্বের কষ্টি-পাথরে কষিয়া ইহার মূল্য নির্দ্ধারণ করুন।

"বিলাপ" একটি ৩০ পৃষ্ঠা ব্যাপী সুদীর্ঘ কবিতা। ৩০ পৃষ্ঠা ব্যাপী এত বড় একটা নীরস, অর্থহীন, ব্যর্থ কবিতা পাঠ করিতে কাহারই ধৈর্য্য থাকে না। পাঠক একটু নমুনা দেখুন—

"অপ্রাপ্তি উত্তাপে কত মৃদু আশালতা,
দিনে, পক্ষে, মাসে যায় বিশুষ্ক হইয়া,
ভুগিয়া প্রত্যাশা শেষে দাঁড়ায় হইয়া,
পরিণত হোয়ে হৃদে স্থিতি সহিষ্ণুতা।"

কবির এ হেঁয়ালী "পণ্ডিতে বুঝিতে নারে, মূর্খে বুঝবে কি তা।"

"বসন্তগৌরী" লেখকের আর একটি কবিতা। বসন্তগৌরী নাকি এক জাতীয় পক্ষী বিশেষ, কবি নিজেই এই নামকরণ করিয়াছেন। তিনি এই পক্ষী সম্বন্ধে কবিতা লিখিতে আগাগোড়া বেদ বেদান্তের তত্ত্বকথার অবতারণা করিয়াছেন! লেখকের জানা উচিত, এই জাতীয় অপকার্য্যকেই "ধান ভানতে শিবের

বহিখানিতে কতকগুলি অদ্ভুত রকমের দুর্ব্বোধ অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার আছে দেখিলাম, যথা—"অবসাথ", "সঞ্চারয়মানা", "মনোপটে", "অনোপকারী", "আগতকরণপ্রাপ্ত," "অন্যোন্তবিরুদ্ধ", "শারীরী", "লোচকে আবৃতপ্রায় লোচন দুইটি", "ধরিত্রী প্রয়োজনদা," "পুষ্টবস্তুপোত," "লোকাসনে", "উলুপের পালি হতে ধরিয়া যতনে কখন বা হিমলব সঞ্চয় করিয়া" ইত্যাদি। ইহা ছাড়া বর্ণাশুদ্ধি ও ব্যাকরণ দুষ্ট শব্দ ত ঝুড়ি ঝুড়ি।

পুষ্পাঞ্জলি—শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায় প্রণীত। কলিকাতা গুপ্তপ্রেসে মুদ্রিত এবং গুপ্তপ্রেস ম্যানেজার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ১০৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ৸০

এখানিও কবিতাপুস্তক। গ্রন্থকারে অর্ঘ্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি "পুষ্পাঞ্জলি" সম্বন্ধেও তাই বলি। পুষ্পাঞ্জলির কোন পুষ্পেই আমরা সৌরভ ও সৌন্দর্য্য পাইলাম না। তবে "বন্দনা" কবিতাটি মন্দ হয় নাই।

মায়া—(গীতিকাব্য) শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন প্রণীত। কলিকাতা "বঙ্গবাসী" প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি ৪২ পৃষ্ঠা, মূল্য ৷৷০

ইহা একখানি ক্ষুদ্র গীতিকাব্য, ছোট বড় ৪০টী কবিতায় সমাপ্ত। লেখক পুস্তিকায় "উন্মেষিকায়" বলিয়াছেন, তিনি নূতন পথের পথিক, প্রেমের কবিতার বিরাট বাজারে, প্রেম-কাহিনী বিরহিত বৈদান্তিকের 'মায়া' লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, "স্থান" পাইবেন কি না জানেন না। আমরাও কিন্তু তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিলাম না। তিনি গ্রন্থের "উন্মেষিকা"য় যেরূপ 'গর্জ্জন' করিয়া বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে আমরা খুবই আশান্বিত হইয়াছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর কবিতা-গুলিতে আমরা সেরূপ 'বর্ষণ' দেখিলাম না। পাঠকগণের অবগতির জন্য লেখক মহাশয়ের বক্তব্যের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব—যথা—"মায়া (অর্থাৎ এই গ্রন্থ) সংসারের হিংসা দ্বেষ কলুষিত সংক্ষুব্ধ কোলা-হলের অন্তরালে, বিকসিত যৌবনা প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য্যের অন্তরালে, জ্যোৎস্নার কোমলালিঙ্গনবদ্ধ দিগন্তবিস্তৃত মহাসমুদ্রের ঘুমন্ত নীলিমার অন্তরালে অবস্থিত, বিশ্ব-বিশেষণ-বিশেষিত এক মহা বিশেষ্যের ক্ষীণ প্রতিচ্ছবি পাঠকের নেত্র সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে প্রয়াসী। মায়া দেখাতে চায়, পাঠককে উপলব্ধি করাতে চায়,—এ আপাত প্রতীয়মান বিশ্ব মায়া, অবিদ্যা illusion." ইত্যাদি ইত্যাদি। লেখক মহাশয়ের সে উদ্দেশ্য থাকিলেও

নাই। কবিতা রচনায় তাঁহার কিছু শক্তি আছে, ভাবুকও তিনি কতকটা বটেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার চেষ্টা সফলতা লাভ করে নাই, আমাদের বিবেচনায়, একমাত্র অনুকরণ দোষে। রচনায় রচয়িতার নিজস্ব কিছু থাকা উচিত, কিন্তু মায়ার "ক্ষুদ্র দীন কবি" সে পরিচয় দিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহার অধিকাংশ কবিতাই রবীন্দ্রনাথ ও স্বর্গীয় কান্ত কবির কোন না কোন কবিতার সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহার "নির্ব্বাসিত", "হৃদয়রাজ" "বিস্ময়," "এস" এবং "সুন্দর তুমি" প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। সকলগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেখানো সম্ভবপর নয়। লেখকের অনুকরণপ্রিয়তা এত বেশী যে, মনে হয় একমাত্র অনুকরণের বলেই তিনি কবি নামে অভিহিত হইতে চাহেন। এই অনুকরণ ব্যাধির জন্যই তাঁহার কবিতাগুলি জীবন্ত ও সরস হইতে পায় নাই। তাঁহার "বালিকা" একটী নিতান্তই ব্যর্থ কবিতা। বাকী কতকগুলি একেবারেই উদ্দেশ্যহীন, অর্থশূন্য এবং অত্যন্ত দুর্ব্বোধ। "নবনুর' একটি অনুপ্রাসবহুল পদ্য, ইহাতে অনুপ্রাস ভিন্ন আর কিছুই নাই। "হৃদয়রাজ" কবিতাটি রবীন্দ্রবাবুর একটী কবিতার হুবহু অনুকরণ, এবং অনুকরণ ফলে কবিতাটি অত্যন্ত নীরস ও লেখায় বিকট হইয়াছে। লেখক মহাশয় স্থানে স্থানে ছন্দের উপরেও লক্ষ্য রাখিয়া চলেন নাই, এজন্য পাঠ অবাধগতি হয় নাই। "কেমনে তাঁহার পাইব অবধি যতি ছলাকলাভাবে", "একি ফেনিল ক্ষুব্ধ কল্লোল হাঁসি উঠিছে সিন্ধু-নগনে", "কীর্ত্তকণ্ঠ হৃদয়ের মাঝে তোমার স্মৃতি লইয়া", "আবেগ কারার রুদ্ধ দুয়ার"—ইত্যাদি বাক্যগুলির ভাব ও অর্থ পরিগ্রহ হইল না।

লেখক মহাশয়ের প্রতি নিবেদন—তাঁহার কিছু শক্তি আছে, কিন্তু তাহা স্ফুরণের জন্য সাধনা আবশ্যক। সংযম এবং সাধনাই মানুষকে সকল বিষয়ে সাফল্য দান করে। আমাদের বিবেচনায় তাঁহার এত শীঘ্র গ্রন্থকাররূপে আত্মপ্রকাশ করা সমীচীন হয় নাই। তাঁহার গ্রন্থখানির প্রশংসা করিতে না পারায় আমরা দুঃখিত।

প্রদীপ ও চেরাগ—(গল্পগ্রন্থ) মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লা প্রণীত। কলিকাতা ৪ নং এলিয়ট লেন, নিউ এজ্‌ প্রেসে মুদ্রিত এবং ঐ ঠিকানায় মুসলমান বুক এজেন্সি হইতে আব্‌ রহমান কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কাপড়ে বাঁধা, মূল্য ১৲

ইহা একখানি গল্প-পুস্তক। তিনটি গল্পে পুস্তকখানি সমাপ্ত। গল্প তিনটি ছোট এবং সংখ্যায় কম হইলেও আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। "প্রদীপ ও চেরাগ"—গল্পটিই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে। লেখকের চিন্তাশীলতা এবং গল্প গুলির ঘটনা-সমাবেশ সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। ভাষা ও ভাবের বিশুদ্ধতায় গল্পগুলি মনোরম হইয়াছে। পাঠ করিতে করিতে কেমন একটা গম্ভীর শান্তভাব হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। গল্প কয়টির একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে আজকালকার মত কতকগুলা চরিত্রের ছড়াছড়ি বা বাড়াবাড়ি নাই। দুই চারিটি চরিত্রের ভিতর দিয়াই লেখক তাঁহার গল্পের উদ্দেশ্য ও সৌন্দর্য্য বেশ বজায় রাখিয়াছেন। পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন গল্পগুলি সত্য সত্যই কোন বাস্তব ঘটনা অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে, কোনখানে অস্বাভাবিকতা ও কাল্পনিকতার গন্ধমাত্রও নাই। পুস্তকখানির ভাষাও বেশ প্রাঞ্জল, অনাড়ম্বর অথচ ওজস্বী। লেখক মহাশয় গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন, "পাশাপাশি সামাজিক জীবনের আচার ব্যাবহারে চোখের উপর দিয়া নিয়ত যাহা ঘটিয়া যাইতেছে, তাহা সকলের লক্ষ্যীভূত হয় না বলিয়া, সেই জাজ্জ্বল্যমান বাস্তবগুলিকে যথাসম্ভব কল্পনার আলোচনায় ফুটাইতে পারিলে হয়ত কতকটা লক্ষ্য ও বিবেক আকর্ষণ করা যাইবে, লেখকের এইরূপ ধারণা।" ইহা ঠিক কথা। দুঃখের বিষয় আজকাল হিন্দু ও মুসলমান ভ্রাতাদিগের মধ্যে দিন দিন যেরূপ অসদ্ভাব ও বিদ্বেষ বাড়িতেছে, তাহাতে মনে হয় এ সময়ে সাম্প্রদায়িক সাম্যরক্ষা কল্পে এই শ্রেণীর পুস্তক যত অধিক প্রকাশিত হয় ততই মঙ্গল। আশা করি বঙ্গসাহিত্য-সেবক "প্রদীপ ও চেরাগ"-রচয়িতা এইরূপ আরও অনেক গ্রন্থ লিখিয়া আমাদিগকে সুখী ও উপকৃত করিবেন।

পুস্তকখানির গুণের কথাই উল্লেখ করিলাম, দোষের কথাও বলিবার আছে। এইরূপ পুস্তকের ছাপা নির্ভুল হওয়াই উচিত কিন্তু দুঃখ ও লজ্জার বিষয়, প্রুফ সংশোধনের দোষেই হউক অথবা যে কারণেই হউক ইহাতে অনেকগুলি বর্ণাশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে। গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় গল্প দুটি আরও একটু বিস্তৃত হইলে ভাল হইত।

"কমলাকান্ত।"

হৃদয়-রাণী

এ মৃদু মলয়
বহিয়া আনিছে
যাহার সুরভি শ্বাস,
এ কনক চাঁপা
যাহার বরণ
প্রাণপণে করে আশ,
পিকের কাকলি
আনে কাণে আজ
যাহার মধুর বাণী,
সে আমার প্রিয়,
প্রাণাধিক ধন,
আমারি হৃদয়-রাণী।

যাহার নয়ন
সুনীল গগনে
গলিয়া বহিয়া যায়,
যাহার নূপুর-
শিঞ্জন রব
অলিগুঞ্জনে গায়,
চাঁদের কিরণে
লুণ্ঠিত ওই
যাহার বসন খানি,
সে আমার প্রিয়,
প্রাণাধিক ধন,
আমারি হৃদয়-রাণী।

যাহার চরণ
পরশে রাঙিয়া
উঠে অশোকের বুক,
বাসের লাগিয়া
বকুল যাহার
চেয়ে থাকে চাঁদমুখ,
কপোতী যাহার
প্রেমের প্রলাপ
দেয় গো স্মরণে আনি,
সে আমার প্রিয়,
প্রাণাধিক ধন,
আমারি হৃদয়-রাণী।

আমার নিখিল
ছেয়ে আছে যার
বরণে পরশে বাসে,
এ জীবন-ভার
আজো বহি যায়
কণা-করুণার আশে,
যারে পেলে আজি
ধূলার ধরণী
নন্দন বলে' মানি,
সে আমার প্রিয়,—
প্রাণাধিক ধন,
আমারি হৃদয়-রাণী।

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

কলিকাতা

১৪এ, রামতনু বসুর লেন, "মানসী প্রেস" হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রিয়বিরহিতা

মানসী
ও
মর্ম্মবাণী

১০ম বর্ষ ১ম খণ্ড | বৈশাখ ১৩২৫ সাল | ১ম খণ্ড ৩য় সংখ্যা

সমাজের স্থিতি ও উন্নতি

অমরা দেখাইয়াছি যে সমাজের স্থিতি ও উন্নতি-বিধান করিতে হইলে এই কয়েকটী বিষয় আবশ্যক।

(ক) কর্ম্মবিভাগ।

(খ) একতা।

(৩) অতিরিক্ত ধনলোভ ও বিলাস, এতদুভয়ের বর্জ্জন।

(৪) বিবাহ-ক্ষেত্রের বিস্তৃতি। বিবাহ-বিষয়ে অযোগ্যের বর্জ্জন।

(৫) কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতিসাধন। আহারের সদ্ভাব। দৈহিক ও মানসিক সবলতা। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও বেষ্টনীর অনুকূলতা।

(৬) আনন্দ। সামাজিক উৎসব, পর্ব্বাদি উপলক্ষে এবং অন্য সময়েও নির্দ্দোষ আনন্দ উপভোগ। *

এই সকল বিষয় যথাসম্ভব সংক্ষেপে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু সমাজের স্থিতি ও উন্নতি বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে আরও কয়েকটী কথা বিবেচনা করা অত্যাবশ্যক বোধ হয়। তাহার মধ্যে প্রথম কথা ব্যক্তি; এবং দ্বিতীয় কথা সমাজধ্বংসের প্রতিকূলতা। ইহা সহজেই বুঝা যায় যে ব্যক্তি লইয়াই সমাজ। সুতরাং ব্যক্তি কিরূপ হইলে সমাজের স্থিতি ও উন্নতি হইতে পারে, ইহা না বুঝাইলে প্রথম কথাই বলা হইল না। তার পর, বুঝিতে হইবে যে সকল সমাজেই কতিপয় ধ্বংসের কারণ নিয়ত স্ব স্ব কর্ম্ম করিতেছে। ইহাদিগের প্রতিকূলতা করিতে না পারিলে সমাজ রক্ষা করা অসাধ্য হইয়া উঠে। সুতরাং ব্যক্তি এবং ধ্বংসের কারণ—এই দুইটী বিষয় আলোচনা করা অত্যাবশ্যক।

ব্যক্তি

ব্যক্তি কিরূপ হইলে সমাজ সুরক্ষিত এবং উন্নত হয়? মহাত্মা ডারুইন বলেন, "নীতিমান ব্যক্তিগণ সামাজিক উন্নতির প্রধান কারণ; সুনীতির প্রাধান্য এবং "well-

উন্নত হয়। * কিন্তু "well endowed" কথাটীর অর্থ কি? ডারুইন স্বয়ংই তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, যে সমাজের ব্যক্তিগণ দেশ-হিতৈষী, বিশ্বাসী, পরস্পরের অনুগত ও বাধ্য, সাহসী, পরস্পরের প্রতি মমতাপূর্ণ, এবং পরস্পরের উপকার ও সহায়তা করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত, সেই সমাজই ধরাতলে উন্নত ও জয়যুক্ত হয়। † "Well endowed" কথাটী দেশ-ভেদে এবং অবস্থাভেদে নানারূপ অর্থবোধ করে। কিন্তু সর্ব্বত্রই এবং সর্ব্বকালেই (জীব বিবর্ত্তনের নিয়মানুসারে) অর্থবোধ করিবেই যে, পারিপার্শ্বিক বেষ্টনীর উপর জয়ী হইবার উপযুক্ত দৈহিক ও মানসিক অবস্থা সমাজস্থ জনগণের থাকিলেই তাঁহাদিগকে well endowed বলা যায়। ঐ একমাত্র কথায় ডারুইন যত অর্থ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা আমার বুঝাইবার সাধ্য নাই; সাধ্য থাকিলেও বুঝাইবার সাহস নাই। পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থার উপর জয়ী হইতে না পারিলে কোন জীবই, কোন সমাজই ‡ রক্ষিত হইতে পারে না; উন্নতি তো পরের কথা। সুতরাং যে প্রকার নৈতিক অবস্থা এবং মানসিক বৃত্তি পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল বেষ্টনীর উপর জয়ী হইবার উপযুক্ত, তাহা সমাজস্থিত ব্যক্তিগণের থাকা অত্যাবশ্যক। সে সকল বৃত্তি সহজেই অনুমেয়।

দৈহিক অবস্থা বলিতে নীরোগ, কর্ম্মঠ, সহিষ্ণু, ঈষৎ চঞ্চল দেহ বুঝায়। আর বুঝায়, উত্তম পরবংশ গঠনের শক্তি। মানসিক বৃত্তি বলিতে সৎসাহস, সরলতা, $ আত্মত্যাগ, এবং ডারুইন বর্ণিত পূর্ব্বোল্লিখিত বৃত্তি সকলকে বুঝায়। ঈদৃশ দৈহিক ও মানসিক অবস্থাপন্ন ব্যক্তি সমাজের স্থিতি ও উন্নতি পক্ষে অত্যাবশ্যক। যে সমাজে এইরূপ ব্যক্তি অধিক, সে সমাজ সমৃদ্ধ হইবেই। এক ডাক্তার দিল্লীর বাদশাহের নিকট নিজের নিমিত্ত কিছুই না চাহিয়া, স্বজাতির অবাধ বানিজ্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সেই মহাজনের স্বার্থত্যাগের ফলে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য। কিন্তু তাঁহার দেশস্থ ব্যক্তিগণ সহানুভূতিতেও উন্নত ছিলেন। তাঁহারা তাঁহার ক্ষতি প্রচুর পরিমাণে পূর্ণ করিয়াছিলেন। ঈদৃশ গুণ না থাকিলে কোন জাতিই উন্নত হইতে পারে না; উন্নতি দূরে থাকুক, পৃথিবীতে টিকিতেই পারে না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, সমাজ স্থিতি ও উন্নতির যে সকল কারণ পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার উপর **ব্যক্তিত্ব** নামক একটী কারণও উল্লেখ করা আবশ্যক। কিন্তু একথা স্মরণ রাখা উচিত যে সমাজপ্রীতি না থাকিলে কোন ব্যক্তিদ্বারাই সমাজ উপকৃত হইতে পারে না। যেমন মাতালের দ্বারা সুরাপান নিবারিণী সভা পরিচালিত হওয়া সম্ভব নহে, তেমনই সমাজ-প্রীতিশূন্য ব্যক্তিদ্বারা কোন সমাজের উন্নতি হওয়া সম্ভব নহে।

একটা দৃষ্টান্ত দিব। বঙ্গদেশে এক বৃদ্ধ চীরজীবনের চেষ্টায় রাজনীতিক্ষেত্রে নিদ্রিত সমাজকে জাগরিত করিয়াছেন। এ গৌরব তাঁহারই। তিনি স্বদেশীদ্রব্য ব্যবহার করিবার নিমিত্ত দেশস্থ জনসাধারণকে উত্তে-জিত করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং বিদেশী আহার্য্যবস্তু ব্যবহার করিতেন। এরূপ ব্যক্তি-দ্বারা চালিত হইয়া স্বদেশীদ্রব্য ব্যবহার বিধি অচিরেই উপেক্ষিত হইয়া গেল।

দেশ না থাকিলেও চলে; যেমন ইহুদিগণের দেশ নাই বলিলেই হয়। সুতরাং দেশপ্রীতি অত্যাবশ্যক নহে। সমাজ লইয়াই কথা। সমাজের উন্নতি করিতে হইবে। যিনি সমাজকে ঘৃণা করেন, যিনি সমাজকে

---

* Morality is one important element in their success, the standard of morality and the number of well-endowed men will everywhere tend to rise and increase.

Descent of Man. (1906) p. 203-4.

† Ibid p. 203.

‡ মানবেতর জীবের সমাজ।

$ কুটিলতাও সমাজরক্ষার পক্ষে আবশ্যক। কিন্তু উহা নিজে ব্যবহার করিবার নিমিত্ত নহে; অন্যের কুটিলতা বুঝিয়া

এক্ষণে সমাজের ধ্বংস নিবৃত্তি সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব। প্রত্যেক সমাজেই কতকগুলি ধ্বংসের কারণ বর্ত্তমান থাকে। সে সকলকে প্রতিরোধ করা আবশ্যক। সে সকলের বিস্তৃত আলোচনা করিবার মত সাহস আমার নাই। এ দেশে বর্ত্তমান অবস্থায় বৈজ্ঞানিক আলোচনাও নিরাপদ নহে। কৌতূহলী পাঠক, জীব-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় জগদ্বিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় গ্রন্থকারগণের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে পারেন। কিন্তু সমাজ-ধ্বংসের কতিপয় কারণ উল্লেখ করিবার স্বাধীনতা আমার আছে। সে সকলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এই কয়েকটী—

ধ্বংসনিবৃত্তি

(১) বিভিন্ন জাতি (tribe or race) মধ্যে প্রতিযোগিতায় পরাজয়।

(২) প্রজনন ক্ষমতার হ্রাস।

(৩) ধর্ম্মহানি।

প্রথমটী সম্বন্ধে ডারুইন বলেন, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন জাতি মধ্যে প্রতিযোগিতাই সামাজিক অবনতির এবং পরিণামে ধ্বংসের প্রধান কারণ। * অর্থাৎ ঐরূপ প্রতিযোগিতায় পড়িয়া যে সমাজ আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হয়, সে সমাজ ক্রমে অবনত এবং শেষে ধ্বংস হইয়া যায়। যদি ইহাই সত্য হয়, তবে প্রতিযোগী সম্প্রদায় অথবা জাতির উপর জয়ী হইতেই হইবে। নচেৎ ধ্বংস নিবারণের কোন উপায় নাই। স্বজাতি মধ্যে প্রতিযোগিতা করা আপনা-আপনি বলক্ষয় করা মাত্র। সুতরাং সমাজপতিগণের কর্ত্তব্য যে, স্বসমাজ ও স্বজাতি মধ্যে প্রতিযোগিতা যথাসম্ভব হ্রাস করা। এইরূপে স্ব-সমাজ বলী হইতে পারে এবং অপর সমাজের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হইলে জয়যুক্ত হইতে পারে। অধ্যাপক কার্ল পিয়ার্সন সমাজপতিগণ সম্বন্ধে বলেন যে, "Their duty is to lessen, if not to suspend the internal struggle that the nation may be strong externally." * প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা অপর সমাজের সঙ্গে; স্ব-সমাজ মধ্যে নহে। অপর সমাজ যদ্যপি নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া তোমার সমাজকে অবসন্ন করিতে সমর্থ হয়, তবেই তোমার বিপদ। এ বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতেই হইবে।

সমাজ-ধ্বংসের দ্বিতীয় কারণ, চিরাগত আচার ব্যবহারের ও প্রণালীর সম্যক্ পরিবর্ত্তন। মহাত্মা ডারুইন অসভ্য ও সভ্য সমাজ—উভয়ের সম্বন্ধেই এ বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। নিউজীলাণ্ড দেশের আদিম নিবাসিদিগের অধঃপতন দেখিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, "ইউরোপীয়গণের অনুকরণ করিবার অত্যধিক প্রবৃত্তিবশতঃ তাহারা স্বীয় পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিল; সুরাপান করিতে শিখিল। এ সকল হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে মানবেতর জন্তুগণের ন্যায় ইহাদিগেরও এই সকল কারণে জনন-ক্ষমতা হ্রাস হইয়া গিয়াছিল। × × × চিরাগত আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন, আপাততঃ অনিষ্টজনক বোধ না হইলেও স্বাস্থ্য ভঙ্গ করে; বিশেষতঃ বালকবালিকাগণের স্বাস্থ্যের অত্যন্ত অনিষ্ট করে।"† নিউজীলাণ্ডবাসিগণ অর্দ্ধসভ্য, অথবা অসভ্য। সভ্যগণের মধ্যেও কখন কখন ঈদৃশ পরিবর্ত্তন হইতে ঈদৃশ পরিণাম দেখা যায়। ডারুইন সভ্যজাতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, "Civilized races can certainly bear changes of all kinds far better than savages; and in this respect they resemble domesticated animals. For though the latter sometimes suffer in health (for instance European dogs in India), yet they are rarely rendered sterile, *though a few such instances have been recorded.*"‡ এই মহাবাক্য, "Few such in-

* Extinction follows chiefly from the competition of tribe with tribe and race with race.
Descent of Man (1906) p. 282.

* National Life, Second Edition. p. 56.

† Descent of man (1906) pp. 290, 291.

‡ Ibid p. 295.

stances have been recorded" অর্থাৎ সভ্যজাতিগণ গৃহপালিত জন্তুর ন্যায়, ইহাদিগের মধ্যেও চিরাগত আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তনে কখন কখন জননশক্তিহীনতা উৎপন্ন হইয়া থাকে ; এই মহাবাক্য সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত। কোনও প্রসিদ্ধ ও সুপণ্ডিত বিলাত ফেরতের সহিত একদিন এই সাহেবিয়ানা সম্বন্ধে আমার আলাপ হয়। তিনি উপরের উক্তি স্বীকার করেন না। কিন্তু এখন দেখিতেছি, তাঁহার পিতার যেরূপ দীর্ঘায়ুঃ ও বহুসন্তান-জনন-ক্ষমতা ছিল, তাঁহার সেরূপ ছিল না। তাঁহার অপত্যগণ প্রায় সকলেই অল্প বয়সে মারা যান। এরূপ দৃষ্টান্ত এতদ্দেশে এবং আমেরিকায় আরও আছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে চিরাগত ব্যবহারের পরিবর্ত্তনে জননশক্তিহীনতা উৎপন্ন হয় ইহাই মনীষিগণের মত। যতদিন জননক্ষমতা থাকে এবং মৃত্যুর হার হইতে জন্মের হার অধিক থাকে, ততদিন কোন জাতিই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। যে সমাজে ও যে দেশে শিশুমরণের হার শতকরা ২৫, এবং জনসাধারণের মৃত্যুর হার অত্যন্ত অধিক, সে দেশে চিরাগত আচার ব্যবহার, বেশভূষা, আহার ইত্যাদির পরিবর্ত্তন অত্যন্ত মারাত্মক।

এক্ষণে আমরা নির্দ্দিষ্ট উপায়ের তৃতীয় কথা উত্থাপন করিতে পারি। উহা ধর্ম্ম সম্বন্ধে। ডারুইন বলেন, "ভবিষ্যৎ বংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সামাজিকবৃত্তির অবনতির কোন কারণ দেখি না। আমাদিগের বিবেচনা হয় যে ধর্ম্মসম্মত আচরণ ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে ; বংশানুক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। ইহাতে বংশানুক্রমবশতঃ সদ্বৃত্তি এবং অসদ্বৃত্তি মধ্যে সংগ্রাম ক্রমশঃই কমিয়া আসিবে ; এবং পরিণামে ধর্ম্মই জয়যুক্ত হইবে।" *

আমরাও বলি, "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।" ধর্ম্মই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে। ধর্ম্মো ধরাধারকঃ।

* "Virtue will be triumphant."
Ibid p. 192.

সুতরাং সমাজস্থিতির মূল ও শেষ কথা ধর্ম্ম। যে জাতির অস্থিমজ্জা মধ্যে ধর্ম্মভাব, সে জাতি কালজয়ী। হিন্দুজাতি তাহাই। ধর্ম্ম যাহাদিগের পোষাক মাত্র, তাহারা অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান সময়ে দুর্লভ নহে। প্রাচীন কালেও দুর্লভ ছিল না। হিন্দুজাতির যদি কোন কর্ত্তব্য থাকে, তবে তাহা পৃথিবীকে এই মহাতথ্য শিক্ষা দেওয়া। বুঝিবা এই নিমিত্তই এ জাতি দীর্ঘকাল এত নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও জীবিত আছে। চিন্তাশীল মনীষী অনরেবল সার জন্ উড্রফ্ বলেন, "ভারত মরে নাই। পুরাকালীয় সমস্ত দেশই মরিয়াছে, চীন ও ভারত মরে নাই। মিশর, পারস্য, ব্যাবিলন, গ্রীস ও রোম ইহারা যে পরিমাণে পরবর্ত্তিগণের উপর সভ্যতা বিস্তার করিয়াছে, সেই পরিমাণে জীবিত আছে বলিলেও বলা যায়। নচেৎ ইহারা মৃত। ভারত এখনও জীবিত, যদিও সম্পূর্ণ জাগরিত নহে। * * * * ভারতের সভ্যতার এক বিশেষত্ব আছে। প্রাচ্যের অথবা প্রতীচ্যের সহিত এত বিভিন্ন হইয়াও ভারত মরিল না কেন? সে মরে নাই, কারণ জগতে তাহার আবশ্যকতা আছে ; সে জগৎকে যে ধন দিবে, তাহা পাইলে জগৎ লাভবান হইবে। এইজন্যই সে আজিও জীবিত। ভারতের যুবকবৃন্দ এই ধনের রক্ষক। এই ধনের রক্ষক বলিয়া তাহারা গর্ব্ব করিতে পারে ; তাই, তাহাদিগের অন্যের নিকট লজ্জিত হইবার কিছুই নাই। তাহারা আলস্য ও ভয় ত্যাগ করুক।"*

পূর্ব্বে ব্যক্তিত্বের কথা বলিয়াছি ; এই ধর্ম্মমূলক ব্যক্তিত্বই প্রকৃত ব্যক্তিত্ব ; ধর্ম্মমূলক জাতীয়তাই প্রকৃত জাতীয়তা। ইহাই ব্যক্তির ও জাতির নিজস্ব, ইহাই ব্যক্তির ও জাতির বিশেষত্ব। ইহা গেলে, জাতি অচিরে ধ্বংসমুখে পতিত হয়। ভারতের যুবকবৃন্দকে সার জন উড্রফ্ সত্যই বুঝাইতেছেন যে "Cultural conquest" অর্থাৎ মানসিক পরাজয়, শিক্ষাদীক্ষায়

* Cf. Bharat-Sakti by Sir John Woodroffe, p. 1-2. Lecture delivered by Sir John Woodroffe on the 30th May, 1916.

পরাজয়, অতি ভয়ঙ্কর। এক জাতি অন্য জাতি হইতে পারে না। আমি বাঙ্গালী হিন্দু। কিন্তু যদি আমার আহার, পরিচ্ছদ, গৃহ, গৃহসজ্জা, ভাষা, আচার ব্যবহার, ক্রীড়া-কৌতুক, হর্ষ বিষাদ,—অবশেষে ধর্ম্মমতও অন্যের অনুকরণে নিয়মিত হইল, তবে কেবল সেই চর্ম্মের বর্ণ ভিন্ন আর আমি বাঙ্গালী হিন্দুর কি পরিচয় রাখিলাম? আমার মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও আত্মা সকলই যেন অন্যের, আমার নহে। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া মহাত্মা সার জন উড্রফ বলিতেছেন, "You have lost your Indian soul." ঈদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে জাতীয়তার সহিত জাতিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। স্বধর্ম্ম, স্বীয় বিশেষত্বই ব্যক্তিকে এবং জাতিকে রক্ষা করে। ইহাই সামাজিক স্থিতি ও উন্নতির ধর্ম্মমূলক প্রধান কথা।

শ্রীশশধর রায়।

ভাল মন্দ

(গল্প)

সংসারের নিকট হইতে কিছু দিনের জন্য ছুটি লইয়া একবার বাহির হইয়া পড়িলাম। এমনি ভাবে একবার বাহির হইয়া পড়িবার ইচ্ছা, যখন স্কুলে পড়িতাম, তখন হইতেই ছিল, কিন্তু তাহা পূর্ণ হয় নাই। অভাব ও অনটনপূর্ণ বাঙালীর সংসার হইতে ছুটি মঞ্জুর করা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। আমার যখন ঘটিল তখন দুইকাল গিয়া প্রায় তিন কালে আসিয়া ঠেকিয়াছি। কিন্তু তবু বাহির হইয়া পড়িলাম।

দুই বৎসর ধরিয়া অনেক স্থান ঘুরিয়া শেষে এলাহাবাদে আসিয়া পৌছিলাম। তখন বাড়ীর পথে চলিয়াছি। বাড়ীর ছোটবড় হাজার জিনিষ তখন চুম্বকের মত দুর্জ্জয় আকর্ষণে আমাকে টানিতেছে। দূরে থাকে কার সাধ্য?

এলাহাবাদ ত্যাগের পূর্ব্বদিন বিকালবেলা অমনি পথে একটু বেড়াইতেছি; হঠাৎ কাহার কণ্ঠে আমার নাম শুনিলাম। বিস্মিত হইয়া সেই দিকে চাহিয়া দেখিলাম, পথের পার্শ্বে ছোট একটি বাগানে দাঁড়াইয়া আমার বাল্যকালের এক বন্ধু আমাকে ডাকিতেছে। দেখিয়াই তাহাকে চিনিলাম, কিন্তু প্রথমে তাহার নামটা মনে হইল না—সে যে কতকালের কথা যেন স্বপ্নের মত মনে জাগিয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তেই তাহার নামটা মনে আসিল। অগ্রসর হইয়া কহিলাম, "এ কি! নরেন! তুমি এখানে আছ?"

সে আমাকে হাতে ধরিয়া নিয়া তাহার বসিবার ঘরে বসাইল। নিমেষের মধ্যে আমাদের বাল্যকালের সহস্র কথা মনে উদয় হইল। সে আজ বোধ হয় ত্রিশ বৎসরের বেশী হইবে, যখন আমি আর নরেন একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়িতাম। নরেন ছিল ক্লাসের সর্দ্দার। তাহারই ইচ্ছামত সকলে চলিত। তাহার যুক্তির কাছে সকলে হার মানিত। বড় হইয়া সংসারে সে একটা কিছু করিবে এ বিশ্বাস আমাদের সকলেরই ছিল। আমাদের সকলের উপর তাহার প্রভাব খুব বেশী ছিল। আমি সর্ব্বদা তাহার মত, তাহার যুক্তি সমস্ত অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতাম। তার পর নরেন এক কলেজে গেল, আমি অন্য এক কলেজে ভর্ত্তি হইলাম। তবু কিছুদিন মাঝে মাঝে তাহার সহিত দেখা হইত। তার পর সংসারে প্রবেশ করিয়া কবে তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছিলা। সে কথা মনে নাই।

নরেনের সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হইল। সে বলিল,

আজ পঁচিশ বছরেরও বেশী সে এখানে আছে; ইহার ভিতর একবার মাত্র সে দেশে গিয়াছে।

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "পঁচিশ বছরের ভিতর মোটে একবার দেশে গেছ? এই বিদেশে কি করে থাক? দেশে যেতে ইচ্ছা হয় না তোমার? আমি আজ একবৎসর হল বেরিয়েছি, এরই ভিতর বাড়ীর জন্যে প্রাণ আকুল হয়ে উঠেছে।"

নরেন বলিল, "তা তো হবেই। তোমাদের সব যে দেশে আছে। আমার ত দেশে কিছুই নেই। জীবনের যা কিছু সুখ শান্তি তা সব আমার এখানে।"

বুঝিলাম, তাহার স্ত্রী-পুত্রের কথা সে বলিতেছে। আমি একটু হাসিয়া বলিলাম, "সুখশান্তিদের সঙ্গে নিয়েও ত বাড়ী যাওয়া যায়। বাড়ীটা দেখতেও কি ইচ্ছে করে না?"

সে বলিল, "তা করে, কিন্তু নানা অবস্থায় পড়ে', যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি, তাই বাড়ীঘর ভুলে আছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "নানা অবস্থা কি আবার?"

সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তার পর বলিল, "সেগুলি কি তা জানতে হলে অনেক কথা শুনতে হবে —আমার প্রবাসের ইতিহাস। হয়ত সেগুলি শুনে তুমি দুঃখিত হবে এবং আমার প্রতি তোমার যা ভাব আছে তা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে না।"

আমি উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কথাটা কি বল দেখি শুনি। এমন কি ব্যাপার যার জন্যে তুমি সারাটা জীবন এমন করে প্রবাসে কাটিয়ে দেবে?"

নরেন বলিল, "আমার বাল্যজীবনের কোনো কথাই তোমার অজানা নেই; এ কথাটাও তোমাকে বলে রাখি। এ পর্য্যন্ত কাউকে আমার জীবনের এই কাহিনীটা বলা হয়নি। আজ স্বদেশের বাল্য-বন্ধু তোমাকে পেয়ে, কেন জানি না, বলতে ইচ্ছা হচ্ছে।"

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। ভৃত্য টেবিলের উপর একটা আলো রাখিয়া গেল। নরেন একটা ভাঁজ করা সংবাদপত্র দ্বারা আলোটার একপাশ ঢাকিয়া দিয়া নিজের দিক অন্ধকার করিয়া দিল। তারপর চেয়ারে হেলান দিয়া বলিতে আরম্ভ করিল—

আমি তখন বি-এল পরীক্ষা দিয়া বাড়ী গিয়াছি। আশ্বিন মাস। পূজার তখনও কয়েকদিন বাকী আছে। একদিন বিকালবেলা আমি ও দিদি বারান্দায় দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছিলাম, এমন সময় একটি তরুণী আসিয়া দিদিকে প্রণাম করিল। দিদি জিজ্ঞাসা করিল, "মণি তুই কখন এলি?" "এই দুপুরে এসেছি"—বলিতে বলিতে সে আমারও পা ছুঁইয়া প্রণাম করিল। আমি কেন যেন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না, এমন কি তাহার মুখের দিকেও ভাল করিয়া চাহিতে পারিতেছিলাম না। সে কিন্তু দিব্য সপ্রতিভ ভাবে আমার ও দিদির সহিত কথা বলিয়া যাইতেছিল।

মণি বিধবা। ছয় বৎসর পূর্ব্বে সে বিধবা হইয়া-ছিল; তখন তাহার বয়স দশ। সে আমাদের গ্রামের মেয়ে। গ্রামসম্পর্কে সে দিদিকে দিদি ও আমাকে দাদা বলিত। অনেক দিন তাহাকে দেখি নাই, তাই আজ প্রথম তাহার মুকুলিত যৌবনশ্রীর সম্মুখে দাঁড়া-ইয়া সঙ্কোচহীন স্বচ্ছন্দতার সহিত কথা বলিতে পারিতে-ছিলাম না।

মণি প্রায় প্রত্যহই বিকালে আমাদের বাড়ীতে আসিতে লাগিল। ধীরে ধীরে আমার সহিতও তাহার আলাপ জমিয়া উঠিল। আলাপের সময়ও ক্রমে বাড়িয়া যাইতে লাগিল। কোন সময় দিদি কাছে থাকিতেন, কখনও বা থাকিতেন না। গল্প করিতে করিতে, নিজের সঙ্কোচ ঢাকিবার জন্য, আমার টেবিলের বই গুছাইয়া দেওয়া তাহার প্রাত্যহিক কর্ম্ম ছিল। কি রকম যে একটা মোহ আসিয়া আমাকে অধিকার করিল

পাশের কিছুরই যেন অস্তিত্ব নাই বলিয়া মনে হইতে লাগিল—সব যেন ধোঁয়াটে। প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিয়াই মনে হইত, কখন বিকাল হইবে! যেদিন সে আসিত না, মনে হইত আজ দিনটা বৃথা গেল। সারাদিন মন আমার দেহ ছাড়িয়া সহস্র কল্পনায় তাহাদের বাড়ীর আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইত।

বিস্মিত হইয়া ভাবিতাম, এ কি এক অভূতপূর্ব্ব উন্মাদনা আমার দেহমনের প্রত্যেক অণু পরমাণুকে এমন করিয়া বিদ্রোহী করিয়া তুলিতেছে!

শীঘ্রই জানিলাম,আমাদের এই ঘনিষ্ঠতা লইয়া গ্রামে কথা উঠিয়াছে। মণিও আমাদের বাড়ীতে আসা কমাইতে লাগিল।

ক্রমে বোধ হয় কথা আরও নানা আকারে রটিতে লাগিল। দেখিলাম দিদিও চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছেন। একদিন আমাকে এ সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিতও করিলেন।

মণিও আমাদের বাড়ী আসা একবারে বন্ধ করিয়া দিল। আমি অস্থির হইয়া উঠিলাম। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। আমার উদ্বেগও ক্রমেই বাড়িতে লাগিল।

সেদিন রাত্রে খাওয়ার পর উঠানে বেড়াইতেছিলাম। দিব্য ফুট্‌ফুটে জোৎস্নায় মাঠ ঘাট ভাসিয়া গিয়াছে—সারা বিশ্ব স্তব্ধ মৌন। আমার একটা দুর্ব্বলতা আছে—এ রকম জ্যোৎস্নায় আমি নিজেকে হারাইয়া ফেলি। সমস্ত পৃথিবীর অস্তিত্ব আমার কাছে লুপ্ত হইয়া যায়। চলিতে চলিতে কখন যে বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িয়াছি, কখন যে মণিদের বাড়ীর সম্মুখে পুকুরের ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি,—সে জ্ঞান আমার ছিল না।

হঠাৎ কাহার গম্ভীর আওয়াজ শুনিলাম, "কে?"

পরিষ্কার জ্যোৎস্না। চাহিয়া দেখি মণিদেরই একজন প্রতিবেশী।

পরদিন প্রাতে ঘুম হইতে উঠিয়াই কেমন একটা পরিবর্ত্তন আমার চারিপাশে উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। পৃথিবীর বাতাস যেন ভারী হইয়া গিয়াছে, বাড়ীর কেহ আমার দিকে চাহিতে চায় না। সকলেই গম্ভীর চুপচাপ। কি রকম একটা কুণ্ঠা আসিয়া আমাকেও আড়ষ্ট করিয়া দিল; বাড়ীতে থাকিয়াও মনে হইতে লাগিল, আমি একা—কেহই আমার নাই—নিতান্ত একা।

দুপুর বেলা খাইতে বসিলাম। এই সময়টা অন্যদিন হাসি গল্পে কাটিত; আজ কেহ কথা কহিতে আসিল না। পুঁতুলের মত বসিয়া বসিয়া খাইয়া উঠিলাম। বাহিরে মুখ ধুইতে আসিয়াছি, এমন সময় মণিদের বাড়ীর দিকে অত্যন্ত গণ্ডগোল ও কান্নাকাটি শুনিতে পাইলাম। সকলে সেই বাড়ীর দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য আমিও সেইদিকে চাহিলাম। দেখিলাম, তাহাদের বাড়ীর ছাদের উপর অনেক লোক জড় হইয়াছে, আর কেরোসিনের কতকটা কালো ধোঁয়া ধীরে ধীরে কুণ্ডলি পাকাইয়া উঠিয়া আকাশের সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে।

আমার হাত হইতে জলের ঘটীটা পড়িয়া গেল। আর ফিরিয়া সেই দিকে চাহিতে প্রবৃত্তি হইল না।

সেই দিন দেশ ছাড়িলাম।

উদ্দেশ্যবিহীনভাবে কিছুদিন ঘুরিলাম। মনটা দুঃখেবিপদে জর্জ্জরিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু যে প্রবল মোহ আমাকে একদিন পাগল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার কণামাত্রও আজ আর মনের কোনও কোণে অবশিষ্ট ছিল না। আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। কি একটা সর্ব্বনেশে মেঘ আসিয়া আমার নির্ম্মল আকাশ ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। আজ তাহা কাটিয়া গিয়া আবার সেই নীলাকাশ দেখা দিল। একটা কথা সেদিন বড় পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম—জীবনে তাহা ভুলিব না। বাহিরের মানুষ এই ক্ষণিকের মেঘটাকে এত বড় করিয়া দেখে কেন, তারা কেন ভুলিয়া যায় যে এ কিছু নয়—এক কাণাকড়ি এর মূল্য নয়? যতই কেন কলো মেঘ আকাশে উঠুক না, আকাশের সঙ্গে এ কিছুতেই মিশিতে পারিবে না। এরা শুধু ক্ষণিকের যাত্রী, ভাসিয়া আসে, আবার পরমুহূর্ত্তেই ভাসিয়া চলিয়া যায়—নীল আকাশে এক বিন্দু দাগ রাখিয়া যাইবার মত

ক্ষমতা ইহাদের নাই। কিন্তু এই চিরন্তন সত্যবস্তু যে নীল আকাশ—ইহা সমাজের চোখে পড়ে না। সে দেখে শুধু একবিন্দু কালো মেঘ, আর অমনি তাহার সংহিতা ও নীতিশাস্ত্রের ধুলা উড়াইয়া উহাকে আরও কালো করিয়া তোলে।

দেশে যাইবার ইচ্ছা আর ছিল না। কিন্তু এমন করিয়া সন্ন্যাসীর মত বিনা কাযে ঘুরিয়া বেড়াইবার মত মানুষ আমি নই। কাশী আসিয়া একটা মাষ্টারী লইলাম—ইচ্ছা, কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া এদিকেই কোথাও ওকালতী আরম্ভ করিব।

কাশীতে আমার আবার নূতন জীবন আরম্ভ হইল; এবং মানুষের বাহিরের দাগী, পোড়া আবরণের ভিতর যে খাঁটি সত্য চিরসুন্দর অন্তঃকরণ বিরাজ করে তাহা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলাম।

মনে আমার শান্তি ছিল না। সাধারণতঃ আহারের পর রাত্রিতে বাহিরে একটু বেড়ান আমার অভ্যাস, নতুবা ভাল ঘুম হইত না। প্রায়ই আমি বেড়াইতে বাহির হইতাম। ফিরিতে ফিরিতে রাত বারোটা একটা হইয়া যাইত।

একদিন এই প্রকার বেড়াইতে বাহির হইয়া দশাশ্বমেধ ঘাটের এক পাশে চুপ করিয়া বসিয়া আছি। আকাশে চাঁদ ছিল, কিন্তু পাতলা মেঘ সমস্ত আকাশখানা ছাইয়া ফেলাতে চারিদিক ম্লান ও ঘোলাটে দেখাইতেছিল। অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছে, একে একে সকলেই চলিয়া গিয়াছে। একজন সন্ন্যাসী এতক্ষণ গুন্‌গুন্‌ করিয়া কি গাহিতেছিল, দেখিলাম সেও চলিয়া গিয়াছে। আমিও ফিরিব ভাবিতেছি, এমন সময় দেখিলাম, একটি রমণীমূর্ত্তি কোনও দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া সোজাসুজি জলের কাছে নামিয়া গেল। সেখানে কয়েক মিনিট নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, হঠাৎ ঝুপ করিয়া জলে লাফাইয়া পড়িল।

আমি চমকিয়া উঠিলাম—নিশ্চয় এ আত্মহত্যা করিতে যাইতেছে।

পরমুহূর্ত্তেই ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জল হইতে উপরে উঠাইলাম। সে সংজ্ঞাহীন হয় নাই। কিন্তু তাহার উদরে অনেক জল প্রবেশ করাতে মোহাবিষ্টের মত পড়িয়া রহিল। প্রচলিত উপায়ে তাহার পেটের জল বাহির করিয়া ফেলিবার পর সে অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল।

এতক্ষণ তাহাকে ভাল করিয়া দেখিবার অবসর হয় নাই; কিন্তু এইবার ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় যাহা দেখিলাম তাহাতে বিস্মিত হইলাম। রমণী তরুণী ও সুন্দরী, পরিধানে সাধারণ শাড়ী, হাতে দু'গাছি সোণার চুড়ি; কিন্তু এই সামান্য বসনেও তাহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য একটুও ম্লান হয় নাই। দেখিয়াই বুঝা গেল, ভদ্রবংশের মেয়ে।

পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে, তাহাকে আপনি বলিব কি তুমি বলিব, একটু দ্বিধায় পড়িয়া গেলাম। বয়স অল্প—সতের কি আঠারো—বড় দুঃখিনী—বড় অসহায়া—তাহাকে আপনি বলিতে ইচ্ছা হইল না। তুমি সম্বোধনেই তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু কোনও পরিচয় সে দিল না। জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন তা হলে কোথায় যাবে?"

সে বলিল, "কোথাও যাব না। আপনি কেন আমাকে তুল্লেন?"—তাহার স্থির অচঞ্চল নয়ন হইতে অশ্রুবিন্দু ঝরিতেছিল।

আমি বলিলাম, "তোমাকে এ অবস্থায় এখানে রেখে যেতে পারি না। তুমি চল, সঙ্গে করে তোমার বাসায় রেখে আসি।"

সে কোনও উত্তর দিল না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "বাসায় যাবই না। আজকের রাত্রির মত কোথাও যদি রাখতে পারেন।"

কাশীতে আমার পরিচিত এমন কোনও ভদ্র-পরিবার ছিল না যেখানে মেয়েটির স্থান হইতে পারে। অগত্যা তাহাকে আমার বাসাতেই লইয়া আসিলাম।

পরদিন প্রাতে আবার তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম এবং তাহাকে নিজের বাসায় রাখিয়া আসিতে

চাহিলাম। সে কিছু পরিচয় দিল না। বলিল, তাহার বাপ-মা কেউ নাই, কলিকাতার কাছে তাহাদের বাড়ী ছিল; এখানে এক আত্মীয়ের বাসায় থাকিত, সেখানে আর কিছুতেই ফিরিয়া যাইবে না। বাবা তাহার গরীব ছিলেন, কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। যে আত্মীয় তাহার ভার লইয়াছিল, এত বয়স পর্য্যন্তও তাহার বিবাহের কোনো চেষ্টা সে করে নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই বয়সে কি তোমার এমন দুঃখ যে জীবন বিসর্জ্জন দিতে যাচ্ছিলে?"

সে কোনও উত্তর দিল না। তাহার চোখ বহিয়া নীরবে জল ঝরিতে লাগিল।

আমি আর সেকথা তুলিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন তা হলে কি করবে?"

সে বলিল, "যখন বাঁচিয়েছেন তখন যা'তে খেয়ে থাকতে পারি তার একটা উপায় করে দিন। কোনো ভদ্র গৃহস্থ বাড়ীতে কায করে খাব, তাই একটা জুটিয়ে দিন।"

আমি মুস্কিলে পড়িলাম। এ তাহার জীবন-ইতিহাস কিছু বলিবে না, তাহার আত্মীয়ের কাছেও ফিরিয়া যাইবে না। কোথাও দাসীবৃত্তি ছাড়া এ অবস্থায় জীবিকা অর্জ্জনের আর কোন উপায়ও নাই। কিন্তু এমন ভাবে তাহার জীবনটাকে অনিশ্চিতের স্রোতে ভাসাইয়া দিতে আমার মন সরিতেছিল না। কি করিব আমি কিছু ঠিক করিতে পারিলাম না। অগত্যা সে আমার বাসাতেই রহিয়া গেল।

কাশী বলিয়াই ইহা সম্ভব হইল। আমি তখন ২৫।২৬ বৎসরের যুবাপুরুষ; বাসায় অন্য কোনও স্ত্রীলোক নাই। এ অবস্থায়, এক বাসায় উভয়ের অবস্থান, কাশী ভিন্ন অন্য কোথাও হইলে রক্ষা থাকিত না। বাড়ীতে যাহারা আসিত, ঝি, গোয়ালিনী, ধোবা —তাহারা কি মনে করিত তাহারাই জানে। আমিও জানিতাম। কিন্তু আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী। কে কি মনে করিবে, ইহাই আমার কার্য্যকলাপের নিয়ামক নহে। নিজে আমি খাঁটি থাকিলেই যথেষ্ট—বাজে লোকের চাপা হাসি ও অর্থপূর্ণ চাহনি নিতান্তই উপেক্ষার চক্ষে দেখিতাম এবং আজও দেখিয়া থাকি।

দুই দিনেই তাহার সেবা যত্ন দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। সব বিষয়ে এমন সূক্ষ্মদৃষ্টি! কিসে আমার একটু সুখ সুবিধা হইবে, না বলিলেও যেন সে বুঝিতে পারিত। প্রত্যেক কাযের ভিতর যেন তাহার হৃদয় ফুটিয়া প্রকাশ পাইত। কিন্তু সর্ব্বদাই কি রকম একটা বিষাদ, একটা কুণ্ঠা তাহার সুন্দর মুখখানিকে করুণ করিয়া রাখিত। তাহার মুখের দিকে চাহিলেই মনে হইত, অতীতের কি একটা স্মৃতি তাহার হৃদয়ে অনুতাপের শলাকা হানিতেছে।

তাহার এই সেবা যত্ন ও বিষাদের অন্তরালে যে কি ভাবপ্রবণ সরস একটি হৃদয় বিরাজ করিতেছে তাহা আমার বুঝিতে বাকি রহিল না।

এতকাল মনে মনে যে একটি প্রেমপ্রবণ সেবাশীলা নারীর মানসী প্রতিমা গড়িয়া রাখিয়াছিলাম, বোধ হইল আজ যেন তাহা চোখের সম্মুখে দেখিতেছি। কবি যে নারীকে সেবাশীলা দেবীরূপে চিত্রিত করিয়াছেন, বুঝিলাম সে শুধু কবির কল্পনা নয়, ইহাই নারীর শাশ্বত রূপ। তাহার প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধায় আমার মন ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

এমনি করিয়া কিছুদিন গেল। একদিন বিকালে জলখাবার দিবার সময় সে বলিল, "দেখুন, লেখাপড়া যা জানি তা এতই সামান্য যে তা কোনো কাযেই আসবে না; আমার ইচ্ছে একটু ভাল করে' লেখাপড়া শিখি যাতে করে ভবিষ্যতে খেয়ে পরে থাকবার একটা উপায় হতে পারে।"

আমি আগ্রহের সহিত সম্মতি দিলাম এবং পরদিনই কতকগুলি ইংরেজি ও বাঙ্‌লা বহি আনিয়া তাহাকে পড়াইতে আরম্ভ করিলাম। লেখাপড়াতেও তাঁহার অসাধারণ শক্তি দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম।

এই পড়াশুনার উপলক্ষে তাহার সহিত আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিল। তাহার জীবনের কাহিনী সমস্ত আমি শুনিলাম—একটি বিষয় ছাড়া। কাশীতে

তাহার আত্মীয় বাড়ীর কথা উঠিলেই সে গম্ভীর হইয়া যাইত, তাহার মস্তক নত হইয়া আসিত এবং উজ্জল চোখ দুটি অন্তর-বেদনায় ম্লান জ্যোতিহীন হইয়া পড়িত। তারপর সেই দিনকার রাত্রির প্রসঙ্গ উঠিলে সে আর নিজেকে ধারণ করিতে পারিত না; চোখের জল মুছিবার জন্য ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইত। কাযেই আমিও আর সে কথা তুলিতাম না। সেই রাত্রির ঘটনা লইয়া যে একটা কুণ্ঠা তাহার অন্তরে চাপিয়া বসিয়া আছে, আমি সর্ব্বদা চেষ্টা করিতাম তাহা দূর করিয়া দিয়া তাহার মনটাকে সহজ সরল করিয়া দিতে। কিন্তু বুঝিতাম, আমার শত চেষ্টাতেও কিছু হইতেছে না—সে নিজেকে যেন কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিতেছে না।

কথায় কথায় ক্রমে আমার জীবনের সকল কথাই তাহার জানা হইয়া গেল। আমার অন্তরের ভাব ভাবনা ভালমন্দ যাহা কিছু, সমস্ত তাহার কাছে খুলিয়া বলিতে আমার একবিন্দুও সঙ্কোচ হইল না। জানিতাম সে আমাকে ভুল বুঝিবে না; তাই নিজের দুর্ব্বলতা-গুলিও তাহার কাছে লুকাইবার প্রবৃত্তি আমার হয় নাই। আমার দেশত্যাগের কাহিনী তাহাকে বলিলাম এবং সে জন্য আমি যে কি গভীর অনুতাপ ভোগ করিতেছি তাহা সে হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিল। মানুষ যতক্ষণ ভণ্ডামির মন্দিরের ভিতর থাকিয়া নিজেকে দেবতা বলিয়া প্রকাশ করিয়া অপর হইতে উর্দ্ধে থাকিতে চায়, ততক্ষণ সে কিছুতেই পূর্ণ প্রীতি বা সহানুভূতি মানুষের নিকট হইতে আশা করিতে পারে না। এ দুটি জিনিষ স্বর্গ হইতে মানুষের অন্তরে নামিয়া আসিয়া হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করে; তাই দুজনের হৃদয়তন্ত্রী একই সুরে বাঁধা না থাকিলে বেসুরো তো বাজিবেই।

আমার সেই একটিবারের দুর্ব্বলতার কথা শুনিয়া আমার উপর তাহার ঘৃণা তো হইলই না, বরং আমি যেন তাহার আরও বেশী করিয়া আত্মীয় হইয়া উঠিলাম। এত কাছে সে যেন আমাকে ইহার পূর্ব্বে কোনও দিন অনুভব করে নাই।

ইহার কয়েকদিন পর আমার জ্বর হইল। এমন অক্লান্তভাবে সারা দেহমন দিয়া মানুষ সেবা করিতে পারে, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। নিষ্ঠুরের মত ইচ্ছা হইত, অসুখ যেন শীঘ্র না সারে—আরও কিছু দিন এমনি করিয়া তাহার সেবাযত্ন ভোগ করিয়া লই। এরূপ অবস্থায় রোগী এবং সেবিকা কাহারও নিকট বাহিরের পৃথিবীর কোলাহল ঘেঁষিতে পারে না; সমস্ত ছাপিয়া খাঁটি অন্তরটি নিজের রূপ প্রকাশ করিবার অবসর পায়—বিশেষতঃ সেবিকার। এ সময়ে একটু ব্যথিত চাহনি, একটি চিন্তার রেখা বা সহানুভূতিপূর্ণ একটু স্পর্শে হৃদয়ের যত কথা ব্যক্ত হয়, বৎসর ধরিয়া অনর্গল বকিয়া গেলেও তাহার শতাংশও বলা হয় না। এই অসুখের ভিতর দিয়া বিশেষভাবে বুঝিতে পারিলাম, আমাদের উভয়কে উভয়ের কতখানি প্রয়োজন, কেমন অবিচ্ছিন্নভাবে আমাদের দুজনের জীবন জড়াইয়া উঠিয়াছে।

অসুখের পর একদিন সন্ধ্যায় ছাদে বসিয়া আছি। পাশেই একটু দূরে সেও বসিয়া আছে। ঠাণ্ডা বাতাস দিতেছিল। দুজনেই অনেকক্ষণ চুপ করিয়া আছি। তাহার মনে কি হইতেছিল জানি না। কিন্তু একরাশ কথা আজ বারবার আমার ওষ্ঠের কাছে আসিয়া আসিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল। মনে মনে কথাগুলি যেভাবে সাজাইতেছিলাম, সে ভাবে কিছুই বলা হইল না। তবু ভাঙিয়া চুরিয়া একরকম করিয়া তাহাকে বলিলাম।

শুনিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, "কিন্তু আমি যে আপনার অযোগ্য।—আমার সব কথা আপনাকে বলা হয়নি—সব চেয়ে বড় দুঃখ যা' আমার জীবনে তা তো এখনো আপনাকে বলতে পারিনি। আমার বেঁচে থাকবার অধিকার আছে বলেই মনে হয় না—তাইতো সেদিন মরতে গিয়েছিলাম।"

আমি বলিলাম, "তোমার যোগ্যতা বা অযোগ্যতা বিচারের ভার তোমার নয়—সে দেখব আমি। তুমি

কি মনে কর আমরা দুজনে দুজনকে এখনো চিনতে পারিনি ?"

সে বলিল, "আমরা আসলে যা', তা আমাদের জানতে বাকী নেই। কিন্তু আমার গতজীবন,—সে কথা আপনার কাছে আমি লুকাব কি করে ?"

আমি বলিলাম, "কিন্তু এর ভিতর কিছু নেই। যা গত হয়ে গেছে সে কাহিনী আমি শুনতে চাই নে। আমি বিচার করব এখন তুমি যা আছ তাই নিয়ে। অতীতের জীবনকাহিনী বৃথা মাথায় করে দিন কাটানোতে কোনো লাভ নেই—কেউ তা করে না। যদি তাই করত, তবে কয়টা লোকেরই বা মানুষ বলে পরিচয় দেবার অধিকার থাকত ?"

সে অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল, "আপনি জানেন না কি অপরাধে আমি অপরাধী। সমস্ত ভুলে গিয়ে নিজেকে ক্ষমা করবার মত মনের বল এখনও আমার আয়ত্ত হয় নাই। প্রতিনিয়ত আমি এর খোঁচা খাচ্ছি। আপনি যখন সেদিন আপনার দুর্ব্বলতা-গুলি স্বীকার করলেন, আমি নিজের কথা কিছু বলতে পারলাম না। আপনি হয় তো ভাবলেন আমি নিষ্কলঙ্ক, সমস্ত রকম দুর্ব্বলতার বাইরে। কিন্তু তা নয়। একদিন নিজকে ক্ষমা করতে পারিনি, তাই মরতে গিয়েছিলাম।"

আমি বলিলাম, "জানি না তোমার কি অপরাধ। কিন্তু অপরাধকে তুমি যখন অপরাধ বলে বুঝতে পেরে অনুতাপ করতে শিখেছ, তখন বুঝতে হবে তোমার মন থেকে অপরাধের কালি মুছে গেছে, ভবিষ্যতে আর ভয় নেই।"

তারপর কাঁদিতে কাঁদিতে সে যাহা বলিল তাহা সংক্ষেপে এই।—কাশীতে যে আত্মীয়ের বাড়ী সে থাকিত, অনেকদিন ধরিয়া সে তাহাকে প্রলুব্ধ করিবার আয়োজন করিতেছিল। কিন্তু মেয়েটি তাহাকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিত। এই ভাবে বহুদিন গেল। কিন্তু অবশেষে একদিন মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মনে দুর্ব্বলতা আসিল।—সেই দিনই সে অনুতাপে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে গিয়াছিল।

সে প্রকৃতিস্থ হইলে বলিলাম, "সব তো শুনলাম; আমার যা বলবার তা পূর্ব্বেই বলেছি। এখন আমার কথায় সম্মতি দাও।"

"সব শুনেও ?"

"হাঁ, সব শুনেও। কেন না আমি জানি, মানুষ কি দিয়ে তৈরী। মানুষ যেমন প্রলুব্ধ হবে, তেমনি প্রলোভন জয় করবার ক্ষমতাও তার আছে। মলিনতা মানুষের আসবেই, কিন্তু তাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠতে পারাতেই মনুষ্যত্ব। প্রলোভনের প্রভাবের বাইরে আছে বলে যে ধার্ম্মিক, তার ধার্ম্মিকতার মূল্য এক কাণা কড়িও নয়। যে অপরাধী, অপরাধ বুঝতে পেরে অনুতাপ করে থাকে, অপরাধকে জয় সেই করতে পারে। তোমাকে আমার জীবনপথের সঙ্গিনী করতে আমার একবিন্দুও দ্বিধা নেই।"

সে আমার পা' ছুঁইয়া প্রণাম করিল। বলিল, "কিন্তু আমার স্থান হবে কোথায় ?—সমাজের ভিতর থাকবার কি আমার অধিকার আছে ?"

আমি বলিলাম, "কোনো জাতিবিশেষের সমাজ তার সংহিতা ও নীতিশাস্ত্র তোমার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে তোমার অপরাধের মুহূর্ত্তটাকে অনন্ত করে রাখতে পারে, যাতে করে তোমার সারাটা জীবন ঐ একটি মুহূর্ত্তের জন্য ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। কেন না তথা-কথিত সমাজের এইটেই হচ্ছে সকলের চেয়ে বড় মূর্খতা যে সে মানুষের নিকট থেকে নিরেট দেবত্ব প্রত্যাশা করে। মানুষ যে মানুষ, সে যে পরস্পর বিরোধী ভাব ও বৃত্তিসমূহ দিয়ে, ভালমন্দ দিয়ে তৈরী, এই কথাটা সে ভুলে যায়।…কিন্তু বিশ্বজুড়ে মানব-আত্মার যে সতিকার সমাজ আছে, সেখানে তোমার স্থান আছেই আছে।"

কিছুদিন পর তাহাকে বিবাহ করিয়া এইখানে আসিয়া বসিলাম। সে আজ পঁচিশ বছরের কথা। বুঝিতেই পার, তখন নানা, কারণে দেশে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। তারপর আর ঐ দেশের সমাজের কৃত্রিমতা

ও ক্ষুদ্রতার ভিতর ফিরিয়া যাইতে, নানা প্রশ্নের জবাব দিতে আমার আর তেমন আগ্রহ হয় নাই। তাই আর যাওয়া হইয়া ওঠে নাই। এখানেই সংসার পাতিয়া সুখে শান্তিতে আছি।

নরেন তাহার কথা শেষ করিল। আমি এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিয়া যাইতেছিলাম; আর নিজকে তাহার কাছে কত ক্ষুদ্র মনে হইতেছিল। কি প্রশান্ত উদার তাহার দৃষ্টি—সামাজিক ক্ষুদ্র খুঁটিনাটি সংস্কারের কত ঊর্দ্ধে তাহার স্থান! এমনি করিয়া সে যদি এই মহিলাটিকে গ্রহণ না করিত, তবে আজ তাঁহার স্থান হইত কোথায়?

নরেন ও তাহার পত্নীর আদর যত্নের মায়া কাটাইয়া আসিতে কিছুদিন দেরী হইয়া গেল। বহুস্থানের বহু-স্মৃতি লইয়া দেশে ফিরিলাম। কিন্তু সকল স্মৃতি ছাপিয়া রহিল—নরেনের ইতিহাস। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, সত্যসত্যই মানুষের কতরকম ভণ্ডামির কাছে কত জীবন মুসড়িয়া পড়িয়াছে—এক মুহূর্ত্তের অকিঞ্চিৎ-কর মন্দের জন্য তাহাদের সারা জীবনের পর্ব্বতপরিমাণ ভাল ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছে,—ভাল'র দাবী হইতে তাহারা বঞ্চিত,—অথচ এই মস্ত বিচারকটা নিজে দাঁড়াইয়া আছে একটা বিপুল ভণ্ডামির উপর।

শ্রীহেমচন্দ্র বক্সী।

রবীন্দ্রীয় কথাসাহিত্যে অলোকপন্থা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"দুরাশা।"

"ক্ষুধিত পাষাণ"কে যদি একটি ছবি বলিয়া ভাবা যায় তবে তাহার ফ্রেমটিকে বলিতে হইবে বস্তুপন্থী, কারণ একজন তুলার মাশুল কালেক্টর রেলগাড়ীতে আরোহীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা প্রসঙ্গে এই গল্প ফাঁদিয়া বসিয়াছিলেন। এই বস্তুপন্থী ফ্রেমের মধ্যে আরব্য উপন্যাসের কল্পপন্থী ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডের উপর যে ব্যাপারটি চিত্রিত হইয়াছে, তাহা হইয়াছে অলোকপন্থী। কিন্তু "দুরাশা"র ফ্রেমটি হইয়াছে অলোকপন্থী। কুহেলিকা-চ্ছন্ন দার্জ্জিলিঙের রাস্তায় একটি আধুনিক বাবুর সহিত, কোথাকার কোন্ বদ্রাওন মুল্লুকের কবেকার সে নবাব গোলাম কাদের খাঁর পুত্রীর সঙ্গে মিলনের মধ্যে লেখক অলোকরস ফুটাইয়াছেন, কিন্তু ভিতরকার মূল ছবিটি কল্পপন্থী রীতিতেই অঙ্কিত।

"ক্ষুধিত পাষাণে"র যে কল্পপন্থা তাহা আরব্য উপ-ন্যাস হইতে আমদানী; "দালিয়া"র* ন্যায় "দুরাশা"র কল্পপন্থা জোগাইয়াছে মুসলমান ভারতবর্ষের ইতিহাস,—দুইটিই অতীতের টুক্‌রা। "ক্ষুধিত পাষাণে" অতীত ও বর্ত্তমানের রাসায়নিক সংযোগে হইয়াছে, কারণ আধুনিক জগতের তুলার-মাশুল-কালেক্টরই হইয়াছে সেই গল্পের নায়ক। এই সংযোগই ত অলোকপন্থী-রসের সৃষ্টির মূলে। "দুরাশার" মূল গল্পে এই সংযোগ নাই, ক্যালকাটা রোডের আধুনিক বাবুর সঙ্গে গল্পের কোন সম্বন্ধই নাই—কাযেই তাহাতে অলোকরস ফুটি-বারও কথা নয়।

আচারনিষ্ঠ হিন্দুসেনাপতি কেশরলালের প্রতি নবাবপুত্রীর অনুরাগের ভিত্তিতেই এই গল্পের পত্তন হইয়াছে। মুসলান প্রণয়িণী ও হিন্দু প্রণয়ীর প্রেম-

* "দালিয়া"র সমালোচনা "প্রতিভা" পত্রিকায় "রবীন্দ্রীয় কথাসাহিত্যে কল্পপন্থা" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।—লেখক।

ব্যাপারেই একটু কাব্যাতিরিক্ততা আছে; তারপর অতীতের কালাপাহাড়-কাহিনীর কাঠামো অবলম্বনেই এই গল্পের সুন্দর কল্পপন্থী রঙটি পরিস্ফুট হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমানের অসির ঝলক এবং বিদ্বেষ-বহ্নির উদ্দাম রক্তোৎসবের তলে তলে এই যে পুষ্প-পেলব হৃদয়-বন্ধনের কাহিনী, তাহা বর্ত্তমান যুগের কল্পনাকে অত্যন্ত মুগ্ধ করে। লেখক তাঁহার মুগ্ধচিত্তের একটি ছবি এই গল্পে পাঠককে উপহার দিয়াছেন।

নবাবপুত্রীর ভালবাসার মধ্যে একটা প্রবল ভক্তির আকর্ষণও দেখা যায়। কেশরলাল তাঁহার কাছে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রমূর্ত্ত ছবি, শুধু তাঁহার ভালবাসার পাত্র নহে, তাঁহার জীবনের আদর্শ। হিন্দুরক্তের একটি ধারা তাঁহার ধমনীতে বহিতেছে, এই বংশানুক্রমিক প্রভাবই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অসামান্য ভক্তিকে স্বাভাবিকতা দিয়াছে।

আদর্শের প্রতি এই যে প্রবল অনুরাগ, নবাবপুত্রীর পক্ষে তাহা আরামের ছিল না। ইহা তাঁহাকে দুর্গম পথে বাহির করিয়া দিয়াছে, একে একে ত্রিশটি বৎসরের জন্য কেশরলালের সন্ধানে তাঁহাকে নানাদেশে ঘুরাইয়াছে। সেই পুষ্পিত যৌবন আজ শুকাইয়া শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু হৃদয়ে ভালবাসা আজও ফুলের মত ফুটিয়া আছে; দেহের উত্তাপ নাই, নয়নের দীপ্তি নিবিয়া গিয়াছে—বক্ষপঞ্জরের ভিতরে কিন্তু দয়িতের দ্যুতিটি তেমনি উজ্জ্বলভাবে আজও জ্বলিতেছে।

হৃদয়তলে অসহ আলোক লইয়া এই যে সুদীর্ঘ যাত্রা—আজ তাহার শেষ। তরুণ সূর্য্যের মত সুন্দর ও তেজস্বী, বেদমন্ত্রের মত শান্ত ও গম্ভীর, গায়ত্রীর মত উজ্জ্বল ও অনাবিল, হিমালয়ের মত উন্নত ও একক, গঙ্গার মত পূত ও প্রবল, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি, দেশ-হিতকামী সেই যে ব্রাহ্মণকুমার—ত্রিশবৎসরের পর আজ তাহার দেখা পাওয়া গিয়াছে। দেখা পাওয়া গিয়াছে অনার্য্যপল্লীতে—তাহার অনার্য্য স্ত্রীপুত্র-পরিবার-সমাবৃত হইয়া মলিন বসনে সে ভুট্টা ভাঙ্গিতেছে! যে সুদূর জ্যোতিষ্কের পশ্চাতে এতদিন নবাবপুত্রী ফিরিতেছিলেন, আজ সহসা দেখা গেল, তাহা ঘরের কোণের প্রদীপের মধ্যে একটু আলোর সহিত প্রচুর ধূম উদ্গিরণ করিতেছে; ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের যে ঔজ্জ্বল্য মূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহাকে দিকে দিকে আকর্ষণ করিতেছিল, তাহা আলেয়ার আলো ছাড়া কিছুই নহে, শুষ্ক আচারের স্তূপ ও যুগান্ত-সঞ্চিত পঙ্কিল আবর্জ্জনার উপর তাহাকে ফেলিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে!

এ জগতে আদর্শপথযাত্রীকে এমনি হঠাৎ একদিন আসিয়া হোঁচট খাইতে হয়, হঠাৎ একদিন বাস্তবের চোরা গর্ত্তে পা পড়িয়া যায়, বস্তু বিপদের গোপন দ্বীপে নিপুণতম নাবিকের তরণীটিও আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়ে! তখন দেখা যায়, চিত্তের মোহ কুহেলিবাষ্পের মত দিকে দিকে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, "Charm by charm unwinds from our idols"—আমাদের দেবতার গায়ের মায়ালোকী রঙ কোথায় মিলিয়া গিয়াছে;—যাহা পড়িয়া আছে তাহা শুধু মাটী ও খড়ের নগ্ন কদর্য্যতা!

গল্পের শেষে সমগ্র মানব জীবনের এই সত্যটি যেখানে প্রকাশ পাইয়াছে, সেখানে বিগ্রহপন্থার (symbolsim) আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। ব্যক্তি-জীবন দিয়া আরম্ভ করিয়া গল্পটিকে সমগ্র মানব জীবনের রাজ্যে আনিয়া তুলিয়া ধরা হইয়াছে, ব্যক্তি-হৃদয়ের সুখদুঃখের ভিতর দিয়া চিরন্তন সত্যের আভাস প্রকটিত করা হইয়াছে, সত্যের আলোক যাহা একটি মাত্র জীবনের পাত্রে কুলাইয়া উঠে নাই, তাহা মানব সমাজে উপছিয়া পড়িয়াছে। শরীরী জীবের এই যে দেহ-বিচ্ছুরিত জ্যোতি, তাহা সত্যেরই জ্যোতি—এই খানেই বিগ্রহপন্থার বিকাশ। গল্পের ভিতরকার চিত্রব্যাপার কল্পপন্থী রীতিতে আঁকা হইলেও তাই চিত্র হইতে এই যে দেহাতিরিক্ত আলোক ঠিকরিয়া পড়িতেছে, তাহাকে বিগ্রহপন্থারই দ্যুতি বলিতে হইবে।

"কঙ্কাল।"

"কঙ্কালে"র মূল গল্পটি বস্তুপন্থী, তাহাকে অলোক-

পঞ্জার ফ্রেমে আঁটা হইয়াছে। যিনি গল্প বলিতেছেন বাল্যকালে তিনি একটি কঙ্কালের সাহায্যে অস্থিবিদ্যা শিখিতেন। সে কঙ্কালটি যে ঘরে টাঙানো থাকিত, তাহার পাশের ঘরেই তিনি বহুদিন পর সেদিন শয়নের আয়োজন করিয়াছেন—কিন্তু ঘুম কিছুতেই আসিতেছে না। বহুক্ষণ বিনিদ্র থাকিলে মস্তিষ্কজাত নানা রকম ভৌতিক উৎপাত অনেকেরই ঘটিয়া থাকে, গল্পকথকেরও বোধ হয় তাহাই ঘটিয়াছিল। তিনি স্পষ্ট অনুভব করিলেন, কে যেন অন্ধকার হাতড়াইয়া তাঁহার মশারির কাছে আসিয়া বসিল এবং ক্রমে উপন্যাসোচিত একটি সুন্দর গল্প জমাইয়া বসিল।

যে বসিয়াছিল সে এক রমণীর ছায়ামূর্ত্তি, তাহারই কঙ্কালের সাহায্যে গল্পনায়ক সঙ্গীগণসহ অস্থিবিদ্যা শিখিতেন। এই "নির্লজ্জ, নিরাবরণ, নিরাভরণ, চিরবৃদ্ধ" কঙ্কাল তাহার রূপ সম্বন্ধে অস্থিবিদ্যার্থীর কাছে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে, তাই নাকি রমণী আজ তাহার যৌবনপুষ্পিত দেহলতাটিকে তাঁহার চোখে উজ্জ্বল করিয়া ধরিবার জন্যই স্বীয় জীবনের এই কাহিনীর অবতারণা করিয়াছে।

কিন্তু এ কথা সত্য নহে। কঙ্কালের অধিকারী পুরুষ অথবা নারী ছিল, বাল্যকালে গল্পকথক বৈজ্ঞানিকভাবে সে কথা আবিষ্কার করিয়াছিলেন কি না তাহা আমাদের জানা নাই। তাহা না জানিলেও, তাহাকে নারী বলিয়া কল্পনা করাই স্বাভাবিক ছিল। বুকের ভিতর কাঠি চালাইয়া অস্থির নাম মুখস্থ করিবার সময় তাঁহার একথা নিশ্চয়ই মনে হইয়াছিল যে, এই জায়গায় একদিন যৌবনের পাপড়িগুলি একে একে বিকশিত হইয়া উঠিত, যৌবনের সুখদুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা এইখানেই মুঞ্জরিত হইত। এই মনে করার মধ্যেই গল্পের ভিত্তিটি—গল্প সৃষ্টির ইতিহাসটি—লুকানো আছে। জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্যসুষমা এবং তাহাদের ভিতরকার লোকচক্ষুর অগোচর সযত্ন লুক্কায়িত কুৎসিৎ কঙ্কালটার মধ্যে যে একটা বীভৎস বিরোধ, একটা বিরূপ বৈপরীত্যের ভাব রহিয়াছে, সে কথাটা তখনই তাঁহার মনে ছায়াপাত করিয়াছিল নিশ্চয়; আজ তাহাই মনের মগ্ন চৈতন্যের অতল হইতে দিবালোকের কড়া পাহাড়া এড়াইয়া এই আধজাগা আধঘুমের অবসরে মাথা তুলিয়াছে।

কঙ্কালের প্রাক্তন অধিকারিণীকে একটি যৌবন-ভারাবনতা রূপবিহ্বলা ষোড়শী নারীরূপে কল্পনা করিয়াই এই বৈপরীত্যের ভাবটা লেখক পাঠকদের চক্ষে একেবারে উদগ্র করিয়া ধরিয়াছেন। এই সখের রোগিণীটির সেই ঈষৎ ক্লিষ্ট কুসুমপেলব মুখ, অসংযমিত চূর্ণ কুন্তল, লজ্জায় আনমিত বড় বড় চোখের পল্লব, সেই অসংলগ্নভাবে কম্পিত অঙ্গুলিতে ডাক্তারের নাড়ী দেখা, ডাক্তারের বিবাহের রাত্রে সেই ফুটফুটে জ্যোৎস্না, দক্ষিণে বাতাস, বাগানের জুঁই ও বেলফুলের গন্ধ, সমস্ত মিলিয়া এই নায়িকার ছবিটির উপর তাহাদের সৌন্দর্য্যের আলোক ফেলিয়াছে, তাহাদের লাবণ্যের লীলারশ্মিকে সংহত করিয়া সেই ছবিটিকে আমাদের হৃদয়ের কাছে এমন অন্তরঙ্গ ও কল্পনানেত্রে এমন আশ্চর্য্যরূপে উজ্জ্বল, করিয়া তুলিয়াছে। এই গল্পের বস্তুরসে লেখকের যথেষ্ট কৃতিত্ব আছে। ইহার নায়িকাটি লেখকের একটি উৎকৃষ্ট বাস্তব চরিত্রসৃষ্টি। কিন্তু এই যে বস্তু-রস, তাহা শুধু নায়িকার যৌবনবসন্তের সমস্ত বর্ণ-বিলাস, তাহার চিত্তের সমস্ত লীলামাধুরীকে আমাদের হৃদয়ে ঘনাইয়া আনিবার জন্যই, তাহার মোহটি দিয়া আমাদের মনকে এমন নিবিড়ভাবে ছাইয়া দিবার জন্যই—পাছে কঙ্কালের সঙ্গে তাহার বীভৎস বৈপরীত্যটা আমাদের চক্ষু এড়াইয়া যায়।

এই সুন্দরী যুবতীটি যখন ষোল বছর বয়সেই তাহার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষার অবসান করিয়া বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিল, তখনই এই পেলব প্রেমকাহিনীর ভিতর হইতে সেই কুৎসিৎ কঙ্কালটা তার দাঁত কয়টি বাহির করিয়া দিয়াছে! এম্‌নি ভাবে মৃত্যু তাহার কঙ্কাল-সার হাতটি বুলাইয়া নদীকে শুকাইয়া আনে, পাতাকে ঝরাইয়া দেয়, সৌন্দর্য্যের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া তাহার ভিতরকার উলঙ্গ কদর্য্যতা বাহিরে টানিয়া তুলে!

এই ব্যাপারের মধ্যে একটা বীভৎস হাস্য, একটা

অদ্ভুত কৌতুকরস রহিয়াছে। এই বিরোধের প্রতি আমরা চক্ষু বুজিয়া চলি বলিয়াই তার হাস্যজনকতাটাও আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। অবশ্য তাহা যায় বলিয়াই অনেক সময় রক্ষা, তাহা যায় বলিয়াই অনেক সময় সমস্ত জাগতিক ব্যাপারে আমাদের একাগ্র অভিনিবেশ, সৌন্দর্য্যের অভিযানে আমাদের একনিবিষ্টতা সম্ভব এবং এই সৌন্দর্য্যাভিনিবেশই কবির কাব্যে, ভাস্করের মূর্ত্তিতে, চিত্রকরের চিত্রে রূপ পরিগ্রহ করিয়া উঠে। বিরোধের বীভৎসতা সম্বন্ধে সজাগ থাকিলে তাহার তীব্র অট্টহাসিটা যে অনেক কবি ও চিত্রকরের সৌন্দর্য্যানুভূতির নিবিড়তাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিত তাহা অনেকটা ঠিক। কিন্তু সৌন্দর্য্যানুভূতি হইয়াছে নীলকণ্ঠ, সে কুৎসিতের বিষকেও দিব্য হজম করিতে পারে, সে অট্টহাসির বুষটার উপরও আপন আসন রচনা করিয়া লয়; সে কঙ্কালের বক্ষ পঞ্জরের উপরও যৌবন-পুষ্পের দলগুলি মেলিয়া দিতে পারে,—আবার লাবণ্য-পুঞ্জের ভিতর হইতে লুকানো পঞ্জরাস্থি খুলিয়া আনিতেও তার কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই। য়ুরোপীয় ভাস্কর-শিল্প সুন্দরী যুবতীর পায়ের তলায় 'মড়ার মাথা' গড়িয়া অনায়াসে এই grim humour ফুটাইয়া তুলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের "কঙ্কালে"ও এই বীভৎস হাস্যরসটী পরম উপভোগের জিনিষ হইয়াছে, এবং ইহাই এই গল্পের সৌন্দর্য্য।

"মণি-হারা।"

"ক্ষুধিত পাষাণে"র মত "মণিহারা"তে ও একটি পোড়োবাড়ী অবলম্বন করিয়াই ভূতের কাহিনীর উৎপত্তি হইয়াছে। "জানালা-ভাঙ্গা, বারান্দা-ঝুলিয়া-পড়া জরাগ্রস্ত বৃহৎ অট্টালিকা" ও তাহার সম্মুখে "অশ্বত্থ মূলবিদারিত ঘাটে"র ছবিটির সঙ্গে লোক-কল্পনা অলৌকিকতা জুড়িয়া দিয়াছে। স্থানীয় একটি স্কুল-মাষ্টার একটি বিদেশাগত ভদ্রলোকের নিকট সেই ঘাটের উপর বসিয়া, কেমন করিয়া এই বাড়ীর অধিকারী ভার্য্যানুরক্ত ফণিভূষণ সাহার অলঙ্কারসর্ব্বস্ব সুন্দরী স্ত্রী মণিমালিকা স্বামীর এক বিশেষ প্রয়োজনের সময় অলঙ্কার-গুলি বাঁচাইবার জন্য, সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার আঁটিয়া নৌকা-যোগে পিত্রালয়ে পালাইতেছিল, আর মণিহারা ফণিভূষণ তাহার সম্বন্ধে বহুদিন পর্য্যন্ত কোথাও কোনও খোঁজ না পাইয়া কেমন করিয়া ভয়ঙ্কর মানসিক উদ্বেগে একাকী এই সুবৃহৎ প্রাসাদে দিন কাটাইতেছিল, কেমন করিয়া অলঙ্কার-আঁটা মণির কঙ্কাল ফণিভূষণের কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহারই অনুসরণ করিয়া ফণিভূষণ প্রাণ হারাইয়াছিল—সেই কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিলেন। গল্পের শেষ হইলে জানা গেল, এই ভদ্রলোকটিই বাড়ীর অধিকারী ফণিভূষণ সাহা, এবং তাঁহার স্ত্রীর নাম মণিমালিকা নহে, নৃত্যকালী। ফণিভূষণকে এক আজগুবি গল্পের নায়ক বানাইয়া তারই সাম্নে সেই গল্প ফাঁদিয়া বসার মধ্যে একটা কৌতুক আছে। এই বাস্তব হাস্যরসের ফ্রেমটির মধ্যে এই করুণ ছবিটি অঙ্কিত হইয়াছে।

"মণিহারা"র মূল গল্পটিতে বস্তুপন্থা ও অলোকপন্থার একটা সুন্দর মিশ্রণ আছে—ইহাই এই গল্পের বিশেষত্ব। "ক্ষুধিত পাষাণে"র মূল গল্পে বস্তুরস নাই, "দুরাশা"র মূল গল্পটি কল্পপন্থী, "কঙ্কালের" মূল গল্পে বাস্তবতা থাকিলেও তাহার মধ্যে অলোক রসের সন্ধান করিতে যাওয়া বৃথা।

"মণিহারা"র সব চেয়ে পরিস্ফুট এবং অভিনব চরিত্র বক্তা স্বয়ং। গল্প বলিতে বলিতেই এই স্কুলমাষ্টারটি নিজের চরিত্র নিজেই সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন দেখিতে পাই। স্বল্পাহারশীর্ণ মুখ, যে সময়ে জলযোগ করা উচিত ছিল, তখন শুধু হাওয়া খাইবার জন্য নদীর পারে সান্ধ্য ভ্রমণ, কোল্‌রিজের প্রাচীন নাবিকের চক্ষুর মত উজ্জ্বল কোটরগত চক্ষু, প্রবাসী হৃদয়ে সঞ্চিত দাম্পত্য সম্বন্ধ বিষয়ে সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণশক্তির সূচক অভিনব মন্তব্যগুলি, দারিদ্র্য ও অনশনে অপরাজিত একটা কৌতুককর ভঙ্গী, এই সমস্ত লইয়া এই ইস্কুল মাষ্টারটি আমাদের কাছে অত্যন্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আর এই ভূতের গল্পটি এই প্র্যাক্‌টিক্যাল

সমালোচকের মুখ দিয়া বাহির করায় সমগ্র ব্যাপারটি অধিকতর কৌতুকাবহ হইয়াছে।

ফণিভূষণ ও মণিমালিকার চরিত্র দুটিও, নাটকীয় ভাবে নয়, এই স্কুল মাষ্টারের বর্ণনার ভিতর দিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সূক্ষ্ম সুকুমার বোধশক্তি, স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ, স্ত্রীজাতির প্রতি সাম্যভাব, ইংরাজী শিক্ষা এবং সর্ব্বপ্রকার আধুনিকতা দিয়া স্কুল মাষ্টার তাঁহার "নব্য-বঙ্গ"টিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই স্কুলমাষ্টাররূপ বিপরীতধর্ম্মী জমির উপর আঁকা বলিয়াই ফণি-ভূষণের ছবিটি বেশ একটু উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়, নচেৎ এই গল্পে সে হয়ত এমন করিয়া ফুটিবার অবকাশ পাইত না। স্বামীর প্রতি উদাসীন, অলঙ্কারপ্রিয় মণিমালাও স্কুলমাষ্টারের নিপুণ বর্ণনার ভঙ্গীর ভিতর দিয়া চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গল্পের বহুদূর পর্য্যন্ত এই ইস্কুলমাষ্টার এবং তাহার মনের বিশেষরূপ ভঙ্গীটাই আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু ক্রমে মণিমালিকার পলায়নের পর গল্পটি যেখানে ফণি-ভূষণের চিত্তছবিকে কেন্দ্র করিয়া করুণায় নিবিড় হইয়া আসিল, সেখানে দেখিতে পাই, স্কুলমাষ্টারের ব্যক্তিত্বের দাগ নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে, তাহার ব্যঙ্গের ধারাটি অন্তর বাহিরের সেই দুর্য্যোগ শ্রাবণ-রাত্রির মধ্যে একেবারে অদৃশ্য হইয়া পড়িয়াছে;—সেইখানেই গল্পের নাটকীয় বিকাশ।

কাচের আলমারীতে মণির সযত্নসঞ্চিত জিনিষ-গুলি যেমন সাজানো ছিল, তেমনি রহিয়াছে—সমস্ত ঘরটি যেন মণির স্পর্শে সজীব হইয়া আছে—কিন্তু মণি নাই। সেই ঘরে ফণিভূষণের মর্ম্মভেদী নিশীথ-প্রতীক্ষা চলিতেছে। এক দুর্য্যোগ রাত্রে একটা শব্দ ঘাটের সোপান শ্রেণী অবলম্বন করিয়া দেউড়ির বন্ধ দরজায় আসিয়া থামিল। পররাত্রে দেউড়ির দরজা খোলা রহিল, দরোয়ানের থাকা নিষিদ্ধ হইল। সেই পায়ের শব্দ সে রাত্রে ঘরের চৌকাঠ পর্য্যন্ত আসিয়া থামিল। আমরা ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া গেলাম যে এ ফণিভূষণের মনের বিকার। মনে হইল মণিমালিকা তার জলতলশয়ন ছাড়িয়া মর্ত্ত্যদেহে তার স্বামীর কাছে অনু-তপ্ত মর্ম্মের প্রেমনিবেদন করিতে আসিয়াছে, কিন্তু কেবল সঙ্কোচবশতঃই ফণিভূষণকে আসিয়া দেখা দিতে পারিতেছে না। তৃতীয় রাত্রে শব্দ কাচের আলমারীর কাছে আসিয়া থামিল, ফণিভূষণের শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইল। ফণিভূষণ চাহিয়া দেখে, "সম্মুখে একটি কঙ্কাল দাঁড়াইয়া। সেই কঙ্কালের আটটি অঙ্গুলিতে অঙ্গু-রীয়, করতলে রতনচক্র, প্রকোষ্ঠে বালা, বাহুতে বাজু-বন্ধ, গলায় কণ্ঠি, মাথায় সিঁথি,—তাহার আপাদমস্তকে অস্থিতে অস্থিতে এক একটি আভরণ সোণায় হীরায় ঝক্-ঝক্ করিতেছে! অলঙ্কারগুলি ঢিলা ঢল্ ঢল্ করিতেছে, কিন্তু অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িতেছে না। সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর, তাহার অস্থিময় মুখে চক্ষু যুগল ছিল সজীব;—সেই কালো তারা, সেই ঘনদীর্ঘ পক্ষ্ম, সেই সজল উজ্জ্বলতা, সেই অবিচলিত দৃঢ় শান্ত দৃষ্টি।" কঙ্কাল অঙ্গুলি সঙ্কেতে ফণিভূষণকে ডাকিল, ফণিভূষণ মূঢ়ের মত অনুসরণ করিল। কঙ্কাল নদীতে নামিল, ফণি-ভূষণও জলে পা দিল। তাহার তন্দ্রা তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গেল—কিন্তু সে "স্বপ্নের মধ্য হইতে কেবল মুহূর্ত্তমাত্র জাগরণের প্রান্তে আসিয়া, পরক্ষণে অতলস্পর্শ সুপ্তির মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেল।"

"নিশীথে।"

"নিশীথে" গল্পের মধ্যেও বস্তুরস ও অলোকরসকে সুন্দর ভাবে মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

দক্ষিণাচরণের প্রথমা পত্নীর ছবিটি স্বল্পপরিসরে দুই চারিটি রেখাপাতে বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তাহার পাতিব্রত্য, সেবাপরায়ণতা ও পরসেবা-অসহিষ্ণুতা আমাদের মনে আঁকা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার বিশেষত্ব মিতভাষণে এবং নির্ব্বাক হাসিতে; তাহা আমাদের মন হইতে কিছুতেই মুছিবার নহে। পুরুষের বিপুল প্রতিজ্ঞা ও স্বল্প প্রতিপালন, প্রথমার নিকট আজ প্রেমনিবেদন, আবার বৎসর না ঘুরিতেই তাহার স্মৃতি ধুইয়া মুছিয়া দ্বিতীয়ার পাণিগ্রহণের মধ্যে যে একটা

বিরোধের হাস্যজনকতা আছে, স্বামী চরিত্রাভিজ্ঞা এই স্বল্পভাষিণী নারিটির নীরব হাস্যে তাহাই মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিয়াছে। পত্নীর মৃত্যুর পর সমস্ত নৈশপ্রকৃতির বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া, আকাশ প্রান্তর ধ্বনিত করিয়া এক অপরূপ হাহা রব দক্ষিণাচরণের ভূতগ্রস্ত মনে আসিয়া ভীতি সঞ্চার করিতেছে দেখিতে পাই। সেইজন্য সমস্ত গল্পের মধ্যে এই হাসিটি আমাদের নিকট এতটা প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। যে হাসি বাঁচিয়া থাকিতে দক্ষিণাচরণের সমস্ত আদরের কথাগুলিকে উড়াইয়া দিয়াছে, এবং মরিয়া ভূত হইয়াও তাঁহাকে কিছুমাত্র রেহাই দেয় নাই, যে হাসি স্বামীর হৃদয়ের উচ্ছ্বাসকে একমুহূর্ত্তে সঙ্কোচে ম্রিয়মাণ করিয়া তুলিয়াছে, এবং আকাশ বাতাসের অসীম অনির্দ্দেশ্যতায় ছাড়া পাইয়াও পাখীর ডানা ঝাপটের উপলক্ষ্য করিয়া দিগ্বিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহা বিশেষ করিয়াই আমাদের চোখে পড়ে এবং মনে গিয়া বসিয়া যায়।

এই প্রথমা পত্নীটীর (লেখক কোথাও তাঁহার নাম করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না) তুলনায় দ্বিতীয় পত্নী মনোরমা একেবারেই ফুটে নাই, ফুটিবার অবসরও পায় নাই। যুবতীর হৃদয় ও চরিত্র ফুটাইয়া তুলে তার প্রেমে। মনোরমার হৃদয়-বিকাশের পক্ষে একটি মৃতার তুষারশীতল স্মৃতি যে বহুদিন বাধার মত কায করিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ। তারপর মনোরমা, যখন তাহার হৃদয়ের দলগুলি ধীরে ধীরে মেলিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র, জনহীন বিস্তৃত নদীসৈকতের নির্জ্জনতায় তাহার জ্যোৎস্নাহসিত মুখখানি দক্ষিণাচরণের দিকে তুলিয়া ধরিয়াছে, তাহাদের জীবনের প্রথম মিলন-চুম্বনটি লাভ করিয়াছে মাত্র, তখন হইতেই বিশ্বচিত্রকর তাহাদের জীবনপট অন্য তুলিতে আঁকিতে সুরু করিলেন। তখনই কাল তাহাদের দুইটি হৃদয়ের মধ্যে একটি কালো পর্দা ফেলিয়া দিল, তাহার আড়ালে মনোরমা সম্পূর্ণ হারাইয়া গিয়া, কাব্যের উপেক্ষিতা হইয়া পড়িল। তাহার সম্বন্ধে পাঠকের হৃদয় সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিতে পারে কিন্তু তা নিষ্ফল; তাহার সম্বন্ধে একটা বেদনাময় কৌতূহল থাকিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার নিবৃত্তির কোনও উপায় নাই।

এই নায়ক ও লেখকের উপেক্ষিতা দুইটিকে আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না সত্য, কিন্তু এই গল্পের তৃতীয় এবং সর্ব্বপ্রধান যে চরিত্র, তাহাকে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্যই যে তাহাদের অস্তিত্ব সে কথা অস্বীকার করিবার যো নাই। সেই তৃতীয় সর্ব্বপ্রধান চরিত্রটি দক্ষিণাচরণ—তাঁহার ভূতগ্রস্ত মন।

বরানগরের বাগানে, বকুলতলায় বাঁধানো বেদীতে বসিয়া, কোনও এক নিশীথে হঠাৎ উচ্ছ্বাসের মুখে দক্ষিণাচরণ প্রথমাকে বলিয়াছিলেন—"তোমার ভালবাসা আমি কোনোকালে ভুলিব না।" এই অত্যুক্তি তখন তাঁহার নিজেরই কাণেও বাজিয়াছিল। প্রথমা তাহাতে হাসিয়া উঠিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে অন্য এক নিশীথে ঠিক সেই স্থানে বসিয়া আজ নায়ক দ্বিতীয়ার হাতটি ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন —"মনোরমা, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না, কিন্তু তোমাকে আমি কোন কালে ভুলিতে পারিব না।" কথাটা বলিয়াই তিনি চমকিয়া উঠিলেন। "সেই মুহূর্ত্তেই বকুল গাছের মাথার উপর দিয়া ঝাউগাছের মাথায় উপর দিয়া কৃষ্ণপক্ষের পীতবর্ণ ভাঙ্গা চাঁদের নীচে দিয়া গঙ্গার পূর্ব্বপার হইতে গঙ্গার সুদূর পশ্চিম পার পর্য্যন্ত হাহা—হাহা—হাহা করিয়া অতিদ্রুতবেগে একটি হাসি বহিয়া গেল! সেটা মর্ম্মভেদী হাসি, কি অভ্রভেদী হাহাকার" বুঝা গেল না। দক্ষিণাবাবু তদ্দণ্ডেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।—এই ভাবেই সুরু হইল।

পীড়িতা প্রথমাকে সেবা করিতে করিতে যখন দক্ষিণাবাবুর ক্লান্তি আসিয়াছে তখন মনোরমাকে প্রথম দেখিয়া রোগিণী তাঁর শীর্ণ অঙ্গুলি তুলিয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"ও কে ও কে ও কে গো?" দক্ষিণাবাবুর তখন কি দুর্ব্বুদ্ধি ধরিয়াছিল, হঠাৎ বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "চিনি না।" সেই মিথ্যা তাঁহার মনে গাঁথা হইয়া আছে। আজ জ্যোৎস্নাস্নাত বালুচরে

ভ্রমণ করিতে করিতে দক্ষিণাবাবু উদ্বেলিত হৃদয়ে যখন মনোরমার মুখে চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিলেন, ঠিক সেই সময় সেই জনহীন মরুভূমিতে কে গম্ভীর স্বরে তিনবার বলিয়া উঠিল—"ও কে ? ও কে ? ও কে ?" বোটে যখন ঘুম হইতেছিল না, তখন কে মশারির কাছে দাঁড়াইয়া সুপ্ত মনোরমার দিকে অস্থিসার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া চুপি চুপি কাণে কাণে বলিতে লাগিল—ও কে ? ও কে ? ও কে গো ? বাতি জ্বালাইতেই মশারি কাঁপাইয়া বোট দুলাইয়া একটা হাসি হাহা হাহা হাহা করিয়া বহিয়া গেল। "পদ্মা পার হইল, পদ্মার চর পার হইল, তাহার পরবর্ত্তী সমস্ত সুপ্ত দেশ, গ্রাম, নগর পার হইয়া গেল—যেন তাহা চিরকাল ধরিয়া দেশদেশান্তর লোকলোকান্তর পার হইয়া ক্রমশ ক্ষীণ, ক্ষীণতর হইয়া অসীম সুদূরে চলিয়া যাইতেছে, ক্রমে যেন তাহা জন্মমৃত্যুর দেশ ছাড়াইয়া গেল—ক্রমে তাহা যেন সূচির অগ্রভাগের ন্যায় ক্ষীণতম হইয়া আসিল।" এত ক্ষীণ শব্দ কেহ কখন শুনে নাই, কল্পনা করে নাই—তাঁহার মাথার মধ্যে যেন অনন্ত আকাশ রহিয়াছে এবং সেই শব্দ যতই দূরে যাইতেছে, কিছুতেই তাঁহার মস্তিষ্কের সীমা ছাড়াইতে পারিতেছে না। আলো নিবাইয়া দেওয়া হইল—মশারির চালে আবার সেই অবরুদ্ধ স্বর—"ও কে ও কে ও কে গো !" ঘড়িটাও যেন সজীব হইয়া ঘণ্টার কাঁটা মনোরমার দিকে প্রসারিত করিয়া বলিতে লাগিল—"ও কে ? ও কে ? ও কে গো ?"—তখন হইতে প্রতি রাত্রেই এইরূপ চলিতে লাগিল, বিনিদ্র দক্ষিণাবাবুর এই সব নিশীথ উৎপাতের জন্য প্রতি রাত্রেই ডাক্তারের দ্বারে আঘাতও পড়িতে লাগিল।

প্রথমা স্ত্রীকে তিনি বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহার অকলঙ্ক পাতিব্রত্য ও অপরিসীম স্নেহের তিনি কিছুমাত্র মর্য্যাদা রক্ষা করেন নাই, দক্ষিণাবাবুর এই বোধই তাঁহার এই সমস্ত মনোবিকারের কারণ। অন্যায়কারী দ্বিতীয়-পত্নীগ্রাহীর মনস্তত্ত্বচিত্রণে রবীন্দ্রনাথ এই গল্পে অতুলনীয় ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।

এই গল্পের সমস্ত অহেতুক অনির্দ্দেশ্য ভয়, তাহার অগাধ রহস্য ও অস্পষ্টতা তাহার ম্লান আলোক ও অনন্তপ্রসারিত মেঘরাজ্য, পাঠকের মনে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করে। ইহার ভয়টা ভৌতিক বটে, কিন্তু তাহা 'ভূতের ভয়' নহে। কোনও কিছুতে তাহা সীমাবদ্ধ হয় নাই, অনন্ত নিশীথ-প্রকৃতির সীমাহীনতায় তাহা ছাইয়া রহিয়াছে। এই গল্পের এমনি বাস্তবাতিরিক্ত কবিত্ব ও সৌন্দর্য্য আছে যাহা মনকে অভিভূত না করিয়া পারে না। "বেতালের বৈঠকে" ইহার আসন না পড়িলেও, ইহাকে রবীন্দ্রনাথের একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলিয়া মানিতেই হইবে।

"জীবিত ও মৃত।"

"জীবিত ও মৃত" গল্পটির মধ্যেও এই বস্তু ও অলোকপন্থার সুন্দর মিশ্রণ রহিয়াছে। এই গল্পের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য এবং বিশেষত্ব ইহার অভিনব সম্বন্ধাবস্থানটি (Situation)। মৃত মনে করিয়া যাহাকে পোড়াইতে পাঠানো হইয়াছে, মৃতকল্প অবস্থা হইতে তাহার জাগিয়া উঠিবার পর তাহার মনস্তত্ত্ব এবং লৌকিক পৃথিবীর সঙ্গে তাহার ব্যবহারকে ভিত্তি করিয়াই এই গল্পের পত্তন। সারদাশঙ্করের বিধবা পুত্রহীনা ভ্রাতৃবধূ কাদম্বিনীর হৃদয়স্পন্দন হঠাৎ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। শ্রাবণরাত্রের দুর্য্যোগের মধ্যে দূর শ্মশানে যে কয়জন লোক মৃতদেহকে পোড়াইতে লইয়া গিয়াছিল, তাহাদের অনুপস্থিতি কালে যখন মৃত দেহ খাড়া হইয়া দাঁড়াইল, তখন সে নিজেকে আর কিছুতেই জীবজগতের অধিবাসী বলিয়া মনে করিতে পারিল না। কাযেই তাঁহার আর গৃহে ফেরা হইল না। ভাবিল সে নিজের প্রেতাত্মা—রাত্রির অন্ধকার শ্মশান ঝোপ জঙ্গল ও খালবিলই তাহার নূতন গৃহ। সারারাত্রি ঘুরিয়া কাপড়ে কাদা মাখিয়া, রাত্রিজাগরণশীর্ণ অদ্ভুত আকৃতি লইয়া ভোরের আলোকে এবং লোকালয়ের দৃশ্যে এইজন্যই সে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল, মানুষ দেখিয়া তার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। সেই যোগমায়া ও তাহার স্বামী

শ্রীপতির সংস্পর্শে আনিয়া লেখক কাদম্বিনীর মনস্তত্ত্বটাই পাঠকের কাছে পরিস্ফুট করিয়া ধরিয়াছেন। সেখানে দেখিতে পাই, কাদম্বিনী তাহার সইয়ের বাড়ীতে থাকিলেও সেখানকার কিছুরই সহিত কোনরকম যোগ অনুভব করিতে পারিতেছে না; সেখানকার হাসিঠাট্টা পরিহাস, সেখানকার সুখদুঃখ এবং সংসারের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ সমস্ত যেন তাহার কাছে ছায়ার মত হইয়া গিয়াছে, একটা অস্পষ্ট প্রতিবিম্বের মত অন্য লোক হইতে তাহার কাছে ভাসিয়া আসিতেছে। সে যেন অতি কাছে অথচ অতি দূরে, লোকালয়ের ও তাহার মধ্যে যেন একটা পর্দ্দা রহিয়াছে যাহাকে কিছুতেই সে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিতেছে না। রাত্রিতে গোপনে সে যখন সারদাশঙ্করের অন্তঃপুরে ফিরিয়া আসিয়া, তাহার পৃথিবীর একমাত্র বন্ধন সারদাশঙ্করের পীড়িত ছেলেটিকে কোলে লইয়া তাহার স্নেহকণ্ঠের "কাকী মা" ডাকটুকু শুনিয়াছিল, তখন শুধু মুহূর্ত্তের জন্য চারিদিকের সংসারটি সেই স্নেহসূত্রকে ঘিরিয়া তাহার কাছে আবার পরিস্ফুট ও সত্য হইয়া উঠিয়াছিল। শুধু মুহূর্ত্তের জন্য, কারণ সেখানে যাহারা কাদম্বিনীকে সশরীরে উপস্থিত দেখিল, তাহারা জানিত কাদম্বিনী মরিয়াছে এবং তাহার রীতিমত দাহকার্য্যও সমাধা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহারা যখন কেহ কেহ যখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল এবং কেহ বা এই স্নেহবন্ধন এড়াইয়া খোকাকে নিষ্কৃতি দিবার অনুরোধ কাদম্বিনীকে জানাইতে লাগিল, তখন কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই। সে মরে নাই, ইহা প্রমাণ করিবার তাহার অন্য কি উপায় ছিল?

প্রেতলোক ও মনুষ্যলোকের সীমান্ত-প্রদেশে দাঁড় করাইয়া কোনও জীবকে দেখা সম্ভব হইলে তাহাকে ঠিক কাদম্বিনীর মতই দেখাইবে;—সে আপনার কাছে, নিকটতম আত্মীয়ের কাছেও দুর্ব্বোধ ও ভয়ের জিনিষ হইয়া উঠিবে। এই সীমানায় দাঁড়ানোটা কাদম্বিনীর বেলায়, এবং কাহারও বেলায়, বাস্তব নহে অথবা হইতে পারে না—তাহা মনেরই বিকারমাত্র, এবং ঐ দুরতিক্রম্য অন্তরালটিও মনেরই সৃষ্টি। এই সূক্ষ্ম রহস্যময় মনস্তত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়াছেন। এই ঘটনা না হইলে এই মনস্তত্ত্বের চিত্র দেখানো সম্ভব হইত না। এই গল্পে লেখক সূক্ষ্ম কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

এই গল্পে হয়ত আমেরিকার কবি ও গল্পকার Poe র কিছু কিছু প্রভাব পড়িয়াছে। "Burial"টা "premature" হয় কি না তার খোঁজ রাখা হয়ত কোন কোন জায়গায় সম্ভব; কি Burning এর বেলায় তাহা একেবারেই সম্ভব নয়, নচেৎ এই গল্পের নাম হয়ত Premature Burning রাখা যাইত। তলাইয়া দেখিলে পার্থক্যটা ধরা পড়িবে। মৃত্যুর পরও—অর্থাৎ আমরা যাকে মৃত্যু বলিয়া ধরিয়া লই, তাহার পরও যে মনের ক্রিয়া অতি অস্পষ্টভাবে চলিতে থাকে, আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়যন্ত্রে ধরা পড়ে না এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চৈতন্যের একটা ক্ষীণরেখা অন্ততঃ কিছুক্ষণ পর্য্যন্তও যে রহিয়া যায়, Poe কয়েকটি রচনায় সেই Sentience after death, সেই অপূর্ব্ব রহস্যময় মনস্তত্ত্বকে, বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, পূর্ণ চৈতন্যে জাগিয়া উঠিয়া লৌকিক জগতের সঙ্গে সেই মৃতের ব্যবহারের মধ্যে অপূর্ব্ব রহস্যময়তার সৃষ্টি করিয়াছেন। নিছক গল্পের হিসাবে জীবিত ও মৃতের শ্রেষ্ঠতা মানিয়া লইলেও, Poeকেই মানব মনের সীমান্তদেশের এই সব তত্ত্ববিশ্লেষণের আদি লেখক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, এবং এই বিষয়ে পরবর্ত্তী লেখকদের Poe দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবান্বিত না হইয়া উপায় নাই।

"মহামায়া" গল্পের ঘটনাসংস্থান কতকটা এই গল্পেরই অনুরূপ, কারণ মহামায়া অর্দ্ধদগ্ধাবস্থায় চিতা হইতে উঠিয়া আসিয়াই রাজীবলোচনের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল। তাহার অবগুণ্ঠনটিও কাদম্বিনীর কাল্পনিক অন্তরালেরই একটি বাস্তবীভূত সংস্করণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারিত, এবং রবীন্দ্রনাথ সেই উপলক্ষে মহামায়াকে রাজীবলোচনের কাছে একটা ভীতিসঙ্কুল দুর্ব্বোধ্য রহস্য করিয়া তুলিতে পারিতেন। কিন্তু সে

অবকাশ পাওয়া সত্ত্বেও তিনি 'মহামায়া' গল্পে অলোক-রসের অবতারণা করেন নাই।

"স্বর্ণমৃগ", "গুপ্তধন" ও "সম্পত্তি সমর্পণ।"

রবীন্দ্রনাথের এই তিনটি গল্প, মানুষের মনের দৈবধনলাভের চিরন্তন দুর্ব্বলতা ও স্পৃহাকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। দৈবধনের রক্ষকরূপে দেশ-বিদেশের মানব-মন চিরকাল যক্ষের কল্পনা করিয়া আসিয়াছে। পরিত্যক্ত জীর্ণ প্রাসাদে, লোকালয় হইতে বহুদূরে অবস্থিত ভাঙ্গা মন্দিরের গভীর গুহায়, অথবা গোরস্থানেই গুপ্তধন প্রোথিত থাকে দেখিতে পাই। আরব্য উপন্যাসের 'সিসেমি—দ্বার খোল'র গল্প এবং তাহারই অনুকৃতি জর্ম্মান লোক-সাহিত্যের Castle Dumburgএর কাহিনীর দিন হইতে বিজ্ঞানালোকিত বর্ত্তমান পর্য্যন্ত, এই গুপ্ত-ধনের সঙ্গে ভুতের কথা অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশিয়া রহিয়াছে। আমাদের দেশেও মাটীর নীচে গুপ্ত সুড়ঙ্গপথে সর্প অথবা যক্ষ কর্ত্তৃক রক্ষিত চলন্ত ঘড়া কলসী অথবা সিন্দুকের শত শত লোককথা প্রচলিত আছে। গোরস্থানে মণিমাণিক্য রক্ষার কথা সিন্ধুরাজের কাহিনীতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য সাহিত্যেও Grave-diggerদের ভয়সঙ্কুল নিশীথ-অভিযানের কাহিনীর অভাব নাই। গুপ্তধনের ব্যাপারের সঙ্গে এই অলৌকিকতার কল্পনাও মানব-মনে একেবারে সনাতন বলিলে কোনও অত্যুক্তি হয় না। গুপ্তধন এমন সব স্থানে পাওয়া যায় যেগুলি ভুতের আবির্ভাবের পক্ষে খুবই অনুকূল—এই জন্যই তাহার সঙ্গে এই অলৌকিকতাটা এমন ভাবে জড়াইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে কুবেরের কথাও তার সঙ্গে জুড়িয়া গিয়া থাকিবে। এই গুপ্তধনান্বেষী জীবগুলি য়ুরোপের মধ্যাব্দীয় যুগের স্পর্শমণি ও চিরযৌবনরস অন্বেষীদেরই সাধারণ সংস্করণ। তাহাদের চেহারায় এবং কার্য্যকলাপে এমন একটা বিশিষ্টতা দাঁড়াইয়া যায়, যাহাকে লৌকিক এবং বিধিসঙ্গত বাস্তবতার বন্ধনের মধ্যে কিছুতেই ধরা যায় না। তাদের চোখের দৃষ্টি সুদূরের মরীচিকার পাছে পাছেই ফিরে, তাদের মন হাওয়ায় সুবর্ণ-প্রাসাদ নির্ম্মাণেই নিযুক্ত থাকে। তাদের অন্তর-বাহির একটা সোণালি গোধূলির অপরূপ মোহাবেষ্টনের মধ্যেই একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়।—এদিকে তাহাদের গাত্র-বস্ত্রে যে শতছিদ্র দেখা দিয়াছে, ঘরের চাল যে ধীরে ধীরে খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে, খাদ্যভাণ্ডার যে একেবারে শূন্য, সে খবর রাখার তাহাদের মোটেই দরকার হয় না। Balzacএর Quest of the Absoluteএর নায়কের মত Hawthorne এর Peter Goldthwaite, The Great Carbuncleএর সন্ধানকারীরা, Poeর William Legrand, রবিবাবুর বৈদ্যনাথ, মৃত্যুঞ্জয় ও যজ্ঞেশ্বর কুণ্ড, ইহাদের সকলেরই কিছু না কিছু অদ্ভুতত্ব আছে।

কিন্তু রবিবাবুর গল্পগুলিতে The Greal Carbuncleএর সুন্দর বিগ্রহপন্থা নাই। "গুপ্তধনে"র শেষাংশে বিগ্রহপন্থার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তাহা বিশেষ করিয়া শিশুদের জন্যই রচিত। Hawthorne ও Balzacএর গল্পের আদর্শের প্রতি সর্ব্বজয়ী আকর্ষণের ছবি, Poeর The Golden Bugএর রহস্যময়ী বিশ্লেষণী কলা রবিবাবুর এই গল্পগুলিতে নাই। আর তাদের মধ্যে অলোকরসটিকেও ফুটাইয়া তুলা হয় নাই। বিষয় নির্ব্বাচনের মধ্যে অনেকটা অলোকরস রহিয়াছে বলিয়াই এই গল্পগুলিকে আমরা এই শ্রেণীতে ফেলিলাম।

অবশ্য এগুলিতে অলোকরস ফুটাইয়া তুলিতে লেখকের বিশেষ কোনও ইচ্ছা ও অবসর ছিল না তাহা স্বীকার্য্য। বৈদ্যনাথ ও যজ্ঞেশ্বরকে বাস্তব ছবি হিসাবেই আমাদের ভাল লাগে। বৈদ্যনাথের শিশুপ্রীতি, শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য তাহার অলস পল্লী-জীবনের বিচিত্র নিপুণ শিল্পকর্ম্ম, এইগুলিই আমাদের কাছে বেশী উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাহার গৃহত্যাগ, অনাত্মীয় ও নিকটতম আত্মীয় কর্ত্তৃক তার অবহেলিত জীবনের করুণাই আমাদের হৃদয়কে

বেশী স্পর্শ করে। এই ছবিটী Addisonএর Will Wimble চরিত্রটিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। আর "সম্পত্তি সমর্পণে"র কৃপণ অথচ পৌত্রবৎসল যজ্ঞেশ্বরের চিত্রটিও আমরা ভুলিতে পারি না। গল্প দুইটির এই বাস্তব-রসই আমাদিগকে মুগ্ধ করে, তাহাদের অলোক-রস নহে।

শ্রীসুখরঞ্জন রায়।

বিশ্বেশ্বর

বিটপী-বল্লী পল্লবে নভে তুমি শ্যাম,
নয়নানন্দ অভিরাম ;
সিন্ধু-জীমূত-মন্দ্রে বজ্রে ঝঞ্ঝায়
ভৈরব তুমি উদ্দাম !
ফলে আর ফুলে চির-বিকশিত অনাদি-মধ্য-শেষ,
ধান্যশীর্ষে অন্নে শস্যে অন্নপূর্ণাবেশ,
স্তন্য পীযূষে মাতা যশোমতী, গোপী তুমি ফুলসাজে,
শ্মশানবিলাসী শঙ্কর তুমি মৃত্যু-চিতার মাঝে ;
জ্যোৎস্না-গৌর অম্বরে
তুমি যে গৌরী শিব-সুন্দরী বাঁধিয়া রেখেছ শঙ্করে !

বরষায়, শ্যাম, ঝুলন তোমার নীপহারে,
সজল-জলদ সমারোহে,
ললাট-লোচন জলে ধ্বক্‌ধ্বক্, ত্র্যম্বক,
নিদাঘ-দিনের দাহ-দ্রোহে !
অশোকে রঙনে শিমুলে তোমার ফাগ্ খেলা ফাল্গুনে,
মানবের মনে মাধবের চির-মিলনের জাল বুনে' !
শিশিরে যখন অন্নের থালা ঘরে ঘরে ভরা রয়,
তখন তোমার রাস-বিলাসের অভিলাস উপজয় !
নির্ম্মল করি দশদিক্,
শরতে তোমার অভয়া মূর্ত্তি, স্নেহ সকরুণ অনিমিখ !

নর-নারী মন-গোপন-বংশী-রন্ধ্রে
ডাকে বাঁশী তব—আয়, আয় !
আকুল দরদে প্রিয়বন্ধনে ছুটে সব
কম-কামনার যমুনায় !

সকল শব্দ সঙ্গীতে তব বাজে বীণা বীণাপাণি,
বিষ্ণু যে তুমি, এ জীব-জগতে পালিতেছ আয়ু দানি !
করুণা দয়ায় জাহ্নবী তুমি বহিতেছ অনুখন—
অগণিত তব সৃষ্টির মাঝে তুমিও যে অগণন !
বিশ্ব তোমারি পরিচয়,—
তুমিই বিশ্ব !—নহিলে যে এই বিশ্ব-রচনা মিছে হয় !

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ।

নেপালে পশুপতিনাথ দর্শন

যাত্রা ।

নেপালে পশুপতিনাথ দর্শন করিতে একবার আমি লক্ষ্ণৌ হইতে যাত্রা করি। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমেই তীর্থগমনের জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমার সহৃদয় আশ্রয়-দাতার বাটীর দুইটী বালক বন্ধু এবং আর একজন মঙ্গলা-কাঙ্ক্ষী অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে লক্ষ্ণৌ সিটি ষ্টেশনে তুলিয়া দিতে গিয়াছিলেন। চারিজন একার ধাক্কা খাইয়া ষ্টেশনে পৌছিয়া দেখি বেজায় ভীড়।

একে ছোট লাইনের গাড়ী, তাহাতে আমার থার্ড ক্লাস টিকিট, অতি কষ্টেই গাড়ীতে স্থান সংগ্রহ করিতে হইল। বালক দুইটি—তন্মধ্যে দশমবর্ষীয় ছোট সুন্দর ছেলেটি আমার ডান হাত খানি তাহার দুই হাতের মধ্যে লইয়া, আমার যাত্রা সফল হউক এই প্রার্থনা করিয়া অতি আদরের সহিত স্নেহমাখা স্বরে প্রশ্ন করিতে লাগিল আবার কবে আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইব ইত্যাদি। তাহার বড়টী আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিল যে,হাতের কাছে পোষ্টআফিস পাইলে যেন তাহাকে সমুদয় বৃত্তান্ত সহ পত্র লিখিতে বিস্মৃত না হই। ভ্রাতৃস্নেহের অপার্থিব আনন্দে আমাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। সরলমতি প্রিয়দর্শন বালকদ্বয় আমাকে স্নেহের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতে চায়, কিন্তু জানে না যে আমার অদৃষ্টে বিধাতার বিধান অন্য-রূপ। তারপর অন্যতম বন্ধু গি—বাবু স্বভাবসিদ্ধ সরল পবিত্রতামাখা প্রেমে ভক্তিপূর্ণ ভাবে কত কথা বলিলেন এবং আবার আসিয়া তাঁহার সহিত আনন্দ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সস্নেহ দৃষ্টি, অকপট ভালবাসা, ও আকুল আগ্রহ দর্শনে আমার প্রাণের ভিতর কি একটা অভিনব ভাবের স্রোত প্রবাহিত হইল। হায় ভালবাসা ! এ শুষ্ক হৃদয়ে তোমার স্থান কোথায় ? কক্ষচ্যুত গ্রহের ন্যায় এইরূপ উদ্দেশ্যহীনভাবে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া কতটুকু শান্তি পাইয়াছি তাহা বলিতে পারিব না। কত বিপদ ঝঞ্ঝাবাত মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে—কিন্তু যাক্ সে কথা।

ক্রমে যাত্রীদলে গাড়ীখানি পূর্ণ হইয়া গেল। গি—বাবু ও বালকদ্বয় আমার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া সাশ্রুনয়নে বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমার অসংযত হৃদয় সে করুণ বিরহে কিয়ৎকালের নিমিত্ত ম্রিয়মাণ হইল। কতদিন হইল তাহাদিগকে ছাড়িয়া আসিয়াছি, কিন্তু সে অকপট প্রেম, সে বিমল সখ্য, সে মধুর স্নেহ এ জীবনে হয়ত ভুলিতে পারিব না। পবিত্র প্রেমের কি মোহময় আকর্ষণ ! মহামায়ার এই পরমা-

নন্দময় সৌহার্দ্দ্যসূত্র ছিন্ন করতঃ মন্থরগমনে ষ্টেশন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলাম।

মাঘমাসের প্রস্ফুট দিবালোকে প্রান্তরের মধ্য দিয়া বাষ্পযান উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে। সুনীল গগনে বসিয়া মার্ত্তণ্ড-দেব কিরণ বর্ষণ করিতেছেন। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের উন্মত্ত শীতবায়ু গাড়ীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া যাত্রী-গণের বসনাদি লইয়া কত রঙ্গ করিতেছে। গাড়ীখানি হিন্দুস্থানী আরোহিবর্গে পরিপূর্ণ—মাত্র আমি একজন বাঙ্গালী। তাহাদের কত গল্পগুজব, হাস্য কৌতুক, রঙ্গতামাসা চলিয়াছে, আর আমি একান্তে বসিয়া কোন্ অজানা অচেনা দেশের চিন্তায় বিভোর হইয়া আছি।

সমস্ত দিন রেলগাড়ীতেই অতিবাহিত হইল। বহু ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া রাত্রি ৯টার সময়ে গোরখপুর জংশনে গাড়ী বদল করিলাম। পুনরায় অন্য গাড়ীতে উঠিয়া একটু নিদ্রার আয়োজন করা গেল। ইতিমধ্যে কত যাত্রী উঠিল নামিল। লারকাটিয়াগঞ্জ ষ্টেশনে নিদ্রা-ভঙ্গে উঠিয়া দেখি, আমার সম্মুখে একটী প্রিয়দর্শন যুবক উপবিষ্ট রহিয়াছে।

যুবকটি জাতিতে মুসলমান—এলাহাবাদে ইণ্টার-মিডেট পড়িতেছে। জগদ্বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহার উপর প্রগাঢ় ভক্তি। বারে-বারে হাত তুলিয়া প্রণাম করতঃ স্বামীজির পবিত্র গুণানুবাদ কীর্ত্তন করিতে লাগিল। বড়ই আনন্দে তাহার সহিত দুইঘণ্টা অতিবাহিত করিলাম। উর্দ্দু ভাষা আমার আয়ত্ত না থাকায় কোনরূপে হিন্দী ও ইংরা-জীর খিচুড়ী পাকাইয়া কথাবার্ত্তা চালাইলাম। যুবকের প্রকৃতি অতি সুন্দর—স্বামীজির কৃপালাভ করিয়াছে বলিয়া সে গর্ব্ব অনুভব করে। তাহার গন্তব্য ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছিলে, বিনয়নম্রবচনে কত কথা বলিতে বলিতে বিদায় গ্রহণ করিল।

বেঙ্গল এণ্ড নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের এই শাখা গোরখপুর হইতে দ্বারভাঙ্গা সমস্তিপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে। তাহারই মধ্যে রক্সোল নামক একটি ক্ষুদ্র ষ্টেশনে অব-তরণ করিলাম। পশুপতিনাথ-দর্শনার্থী বহু যাত্রী এখানে নামিল।

ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া একজন পাঞ্জাবী সাধুর সহিত আলাপ হইল; তিনিও নেপাল যাইবেন। আমার সহিত যাইতে পারিবেন বলিয়া বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আমিও তাঁহার ন্যায় মিষ্টভাষী শিক্ষিত সাধুসঙ্গ পাইয়া বিশেষ আন-ন্দিত হইলাম। সাধুজীর বর্ত্তমান আশ্রমের নাম বিরজা-নন্দ ব্রহ্মচারী। পাঞ্জাবী শরীর—বয়স চল্লিশের উর্দ্ধ নহে। প্রিয়দর্শন মূর্ত্তি—প্রশস্ত ললাট—সৌষ্ঠবময় শ্মশ্রু-শোভিত মুখমণ্ডল, হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ দেহ, মস্তকে দীর্ঘ কৃষ্ণ কেশকলাপ, উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় নয়ন, সুমধুর বাণী, সরল হাস্য। তাঁহার সঙ্গে জিনিষপত্রের মধ্যে লোটা, কম্বল, পর্ব্বত ভ্রমণোপযোগী দীর্ঘ যষ্টি এবং এক-খানি শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা। পরস্পরের মোটামুটি আলাপ পরিচয়াদি হইবার পরে বিশ্রামাদির জন্য একটু নিভৃত স্থানের অনুসন্ধানে উভয়ে বহির্গত হইলাম।

ক্ষুদ্র বাজারটী যাত্রীদলে পরিপূর্ণ। আর একটু অগ্রসর হইয়া একটী ছোট নদীর ধারে উপস্থিত হইলাম। নদীর উপরে লৌহ নির্ম্মিত পুল, বামদিকে বৃটিশরাজের সৈন্যাবাস, অপর পারে নেপালের সীমা। নিকটে নেপালরাজের ধান-মাড়াই কল। পুল পার হইয়া স্বাধীন রাজ্যে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া দেখি, বড় বড় গাছের তলায় বিস্তর যাত্রী নেপাল গমনের প্রতীক্ষায় পড়িয়া আছে। তন্মধ্যে অধিকাংশই সাধু। দুই দিন পরে নেপাল দরবার হইতে আদেশ আসিলে যাত্রীবর্গ যাইতে পারিবে। ছাড়পত্র ব্যতীত কেহ নেপালে প্রবেশ করিতে পারিবে না। সুতরাং বাধ্য হইয়া এই দুইদিন এখানেই অপেক্ষা করিতে হইবে। নেপাল রাজের দুইজন প্রহরী পথরোধ করিয়া সকলকে এই কথা শুনাইতেছে।

উভয়ে স্নানাদি করিতে নদীর ধারে গেলাম। ব্রহ্ম-চারীজি কম্বলাদি রাখিয়া নদীতে অবতরণ করি-লেন। আমি কিয়ৎক্ষণ সেখানে একাই বসিয়া

রহিলাম। স্থানটি অতি মনোহর এবং নিভৃত। বহু দূর বিস্তৃত ঘন দূর্ব্বাদল সবুজ কার্পেটের বিছানার ন্যায় শোভা পাইতেছে। মধ্যে মধ্যে দুই একটী আম্র এবং অন্যান্য বৃক্ষ। মস্তকোপরি সুনীল অম্বরে খণ্ড খণ্ড মেঘগুলি ভাসিয়া যাইতেছে। দূরে—অতি দূরে পাহাড়গুলি ঘোর মসীবর্ণ মেঘের ন্যায় বোধ হইতেছে। উদাস পবন মৃদুমন্দ সঞ্চারে দিকে দিকে প্রবাহিত হইতেছে। সম্মুখে স্বল্পসলিলা নদী পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া কোথায় কোন্ দেশে চলিয়া যাইতেছে। উত্তাল তরঙ্গ নাই, আছে কেবল মৃদুমন্থর গতি, আর আছে নির্ম্মল জলের সুমিষ্ট আস্বাদ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সেখানে তেমন রমণীয় না হইলেও, সেই প্রস্ফুট দিবালোকে নিস্তব্ধ নিভৃতস্থলে বড়ই আনন্দবোধ হইতেছিল।

কিয়ৎকালের মধ্যে উভয়ের স্নানাদি কার্য্য সমাধা হইয়া গেলে আশ্রয়ানুসন্ধানে বাজারের দিকে অগ্রসর হইলাম। রক্সোল বাজারের এক প্রান্তে এক বৃদ্ধ দোকানী সপরিবারে বাস করে। তাহারই দোকান-সংলগ্ন চালাতে খড় বিছাইয়া জায়গা করা হইল।

আহারাদির আয়োজন হইতেছে, এমন সময়ে এক-জন বাঙ্গালী সাধু আসিলেন। তাঁহার পরিধানে কৌপীন, গায়ে সামান্য একখানি চাদর, আর হাতে একটী ছোট লোটা। কম্বল অথবা শীত নিবারণোপযোগী বস্ত্র কিছুই নাই। এই অবস্থায় 'চার ধাম' করিয়া আসিয়াছেন; ভিক্ষা ও সদাব্রতের উপর নির্ভর করিয়া এই কঠিন পাহাড়ে তীর্থদর্শনে চলিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করায় তিনি স্বীকৃত হইলেন। তিনজনে যথা-সম্ভব আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।

অপরাহ্নে বাজারটী একবার পরিভ্রমণ করিয়া আসা গেল। সন্ধ্যার গাড়ীতে অসংখ্য যাত্রী আসিয়া বাজার ভর্ত্তি হইয়া গেল। জনকোলাহলে দিগন্ত মুখরিত হইয়া উঠিল। খড়ের চালাতে, বৃক্ষতলে, উন্মুক্ত প্রান্তরে যাত্রীদল ছাইয়া রহিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই ভগ্ন কুটীরে বসিয়া সঙ্গী সাধুদ্বয়ের সহিত নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে লাগিলাম।

আমার সহযাত্রী ব্রহ্মচারীজি লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজে এফ-এ অবধি পড়িয়াছিলেন। পরে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া নেপালের অন্তর্গত দুল্লু নামক পাহাড়ের রাজ-বাটীতে একটি স্কুল স্থাপনা করিয়াছেন। সাধারণ মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আবশ্যকতা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার জন্য যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতেছেন। ঐ সমস্ত পাহাড়ে বিদ্যাচর্চ্চা একেবারে নাই বলিলেই হয়। অসভ্য অধিবাসিগণ কোনরূপে গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিয়া দিন কর্ত্তন ব্যতীত মনুষ্যত্ব রক্ষার আর কোন উপায় অবগত নহে। ব্রহ্মচারীজি তাহাদের ভিতরে বিদ্যাপ্রচারের চেষ্টা করিতেছেন। "বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়" কার্য্য করাই তাঁহার জীবনের ব্রত।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত এই সমস্ত কথাবার্ত্তা কহিয়া নিদ্রার আয়োজন করা গেল। সেই ভগ্নকুটীরে খড়ের চালাতে কোনরূপে রাত্রি প্রভাত হইল। পরদিনও ঐ ভাবে অতিবাহিত করিলাম। তৎপরদিবস মধ্যাহ্নকালে আমরা তিনজন পশুপতিনাথের জয়ধ্বনি উচ্চারণ পূর্ব্বক নেপালের পথে অগ্রসর হইলাম।

ছোট পান্‌সীর মত একরকম যান দেখিলাম। স্থলপথে মনুষ্যের স্কন্ধে নৌকা চলে, দেখিতে অদ্ভুত বটে। তাহার ছাদ কাষ্ঠনির্ম্মিত, চতুর্দ্দিকে ঝালর দেওয়া। ইহার নাম কার্পেট অথবা দোলা।

এক মাইল দূরবর্ত্তী বীরগঞ্জ নামক একটী ক্ষুদ্র সহরে প্রবেশ করা গেল। একটী মাত্র রাস্তার দুই ধারে নানাবিধ দোকান। বীরগঞ্জ ছাড়িয়া বিশাল প্রান্তরের মধ্য দিয়া সোজা সড়ক পথে ৪।৫ মাইল চলিয়া, চাপাডিয়া নামক স্থানে এক বৃক্ষতলে রাত্রি যাপনের জন্য বহুতর যাত্রীর সহিত অবস্থান করা হইল। রাত্রিতে উপবাসের ব্যবস্থাই হইতেছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এক দোকানে কেরোসিন গন্ধযুক্ত মুড়ী ও চানা পাওয়া গেল, তাহাই যৎকিঞ্চিৎ চর্ব্বণ করিয়া রাত্রি কাটান হইল।

পরদিন প্রত্যুষে কিয়দ্দূর চলিয়া এক জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিলাম। শুনিলাম ৮ মাইল রাস্তা এইরূপ জঙ্গলের ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। জঙ্গলের মুখে একটা চটী আছে—নাম সিমিরাবাসা। প্রভাতকালীন শীতবায়ুতে একেবারে আড়ষ্ট করিয়া দিয়াছে। চটীতে পৌছিয়া একটা দোকানের জলন্ত চুল্লীর ধারে বসিয়া শরীরটাকে কথঞ্চিৎ গরম করা গেল। আরণ্যপথের ধারে একক্রোশ অন্তর জলের কল আছে। নেপালের ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী মহারাজ দেব সামসের বাহাদুর কর্ত্তৃক তদীয় সাধ্বী পত্নী দেবী-কর্ম্ম কুমারীর পুণ্যময় স্মৃতিরক্ষার্থে এই সকল জলধারা নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রত্যেক জলধারাতে সেই স্বর্গীয়া দেবীর নাম খোদিত রহিয়াছে। পথশ্রান্ত পিপাসার্ত্ত পথিক দুই হস্তে স্বাদু শীতল জলপানে পরিতৃপ্ত হইয়া সেই সাধ্বী দেবীকে শত সহস্র আশীর্ব্বাদ করে। জগতে কীর্ত্তিই স্থায়ী।

জনমানবহীন শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যের ভিতরে খণ্ড খণ্ড প্রস্তরের উপর দিয়া সোজা চলিতে লাগিলাম। ঘন সন্নিবিষ্ট দীর্ঘদেহ বৃক্ষরাজিতে সে ভীষণ অরণ্য পূর্ণ রহিয়াছে। যতদূর দৃষ্টি চলে কেবলই অরণ্য। নানাবিধ পশু-পক্ষী এবং ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি এ অরণ্যে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বীরগঞ্জ হইতে টেলিগ্রাফের তার এই জঙ্গলের মধ্য দিয়া রাস্তার ধারে ধারে কাটমণ্ডু গিয়াছে।

এই গভীর অরণ্যে কয়েক মাইল চলিয়া বেলা প্রায় ১১টার সময়ে ভিসাখুরা চটীতে উপস্থিত হইলাম। এখানে ৩।৪ খানি দোকান ও রাজার একটী দোতালা বাড়ী আছে। রাজকর্ম্মচারী অথবা সম্ভ্রান্ত পথিকগণ এই প্রাসাদে আশ্রয় পাইয়া থাকেন। দোকানে মোটা চাউল ও মোটা চিঁড়া ভিন্ন আর কিছু পাইলাম না, তাহা দ্বারাই কোনরূপে উদরপূর্ত্তি করা গেল।

বিশ্রামান্তে পুনরায় যাত্রীবর্গের সহিত চলিতে লাগিলাম। এইবার রাস্তা বড়ই খারাপ আরম্ভ হইল। ভিসাখুরা হইতে এক পার্ব্বত্য নদীর মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলাম। নদীতে জল নাই,কেবল বালুকা ও নুড়ী, তাহারই মাঝে কোথাও বা ঝির্‌ঝির্‌ করিয়া জল আসিতেছে। বড়ই দুর্গম পথ। দুই পার্শ্বে জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়, মধ্যে এই বন্ধুর পথ বহিয়া আমরা তিনটী প্রাণী অতিকষ্টে ৬ মাইল অতিক্রম করিয়া,সন্ধ্যার প্রাকালে চুরীয়া চটীতে উপস্থিত হইলাম।

আমাদের পূর্ব্বেই বিস্তর যাত্রী আসিয়া সমস্ত স্থান অধিকার করিয়াছে। দুইখানি মাত্র দোকান ও একটি সরকারী ছোট ঘর। কোথাও আশ্রয় মিলিল না, অগত্যা নদীর মধ্যেই একস্থানে আসন লাগাইতে হইল। চতুর্দ্দিকের আবর্জ্জনা যথাসাধ্য পরিষ্কার করিয়া, নুড়ী পাথরগুলি কথঞ্চিৎ সমান করিয়া লইয়া, কম্বল বিছান গেল। দ্বারভাঙ্গা জেলার তিনজন যাত্রী আমাদের সঙ্গে ছিল, তাহারা এবং ব্রহ্মচারীজি অনতিদূরস্থ জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিয়া ধুনী জ্বালাইয়া দিলেন। একে শীতকাল, তাহাতে পাহাড়, আগুনই একমাত্র ভরসা। আগুনের চতুর্দ্দিকে সকলে বসিয়া সৎপ্রসঙ্গ আলোচনা হইতে লাগিল। স্থানটি বড়ই সুন্দর। দুই পার্শ্বে অনতি-উচ্চ জঙ্গলাবৃত পাহাড়। চতুর্দ্দিকে নিস্তব্ধ গম্ভীর ভাব। ঝিল্লিকাগণ অনবরত ঝিঁঝিঁ শব্দ করিতেছে। শান্ত সুন্দর ভাবময়ী প্রকৃতি। অন্ধকারময়ী রজনী। মস্তকোপরি মেঘশূন্য গগনে অসংখ্য নক্ষত্ররাজি আপন আপন হ্রস্বদীপ্তি লইয়া জগতের অন্ধকার দূর করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। স্তব্ধ নিশীথিনীর অঙ্গ কাঁপাইয়া অন্তরীক্ষবাহী সমীরণ বৃক্ষপত্রের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সেই ভীষণে সুন্দরে মিশ্রিত প্রশান্ত পার্ব্বতীয় ভাব দর্শন করিয়া আমার হৃদয় উল্লসিত হইয়া উঠিল। সম্পূর্ণ উপবাস করিয়া উন্মুক্ত নীলাম্বরতলে রাত্রি প্রভাত হইল।

পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে শুনিলাম বেলা ৮টার সময়ে যে Passport (ছাড় পত্র) পাওয়া যাইবে, তাহা না লইয়া গেলে নেপালে কেহ প্রবেশ করিতে পারিবে না। কাযেই

বাধ্য হইয়া অপেক্ষা করিতে হইল। বেলা ৯টার সময়ে নেপালী ভাষায় নম্বর লিখিত অর্দ্ধইঞ্চি পরিমিত এক টুকরা চিরকুট পাওয়া গেল। তাহাই লইয়া যাত্রা করিলাম।

প্রথমে একটি ছোট খাট চড়াই-উৎরাই,পরে অপেক্ষাকৃত ভাল রাস্তায় চলিতে লাগিলাম। চতুর্দ্দিকে গভীর জঙ্গলাবৃত পাহাড়। পথপার্শ্বে কোথাও দীর্ঘদেহ বৃক্ষরাজি মস্তকোত্তলন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, কোথাও বৃক্ষশূন্য সমতলভূমি, কোথাও নিবিড় অরণ্যানী, কোথাও অনতি-উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ—এই সকল বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে দেখিতে দিবা দ্বিপ্রহরে এক পার্ব্বত্য নদীর তীরে আসিয়া পৌছিলাম। কোন্ অজ্ঞাত পর্ব্বতের অদৃশ্য অভ্যন্তর হইতে নির্গত হইয়া, ভীম গর্জ্জনে বনস্থলী কম্পিত করিয়া এই গিরিনদী উন্মাদিনীর ন্যায় নৃত্য করিতে করিতে চলিয়াছে। জল অতি শীতল নির্ম্মল ও সুস্বাদু। স্নানাদি কার্য্য সমাপনান্তে পুনরায় তিনজনে যাত্রা করিলাম।

সহসা যাত্রীবর্গের মধ্য হইতে "চোর চোর" শব্দ উত্থিত হইল। কৌতূহলবশে অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, একটি লোককে ধরিয়া আর কতকগুলি লোকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতেছে। অত্যধিক প্রহারে লোকটীর মস্তক হইতে দরদর ধারায় রক্তপাত হইতেছে। কোনও যাত্রীর পুটুলী চুরী করিয়া তাহার এই শাস্তি। ইহাতেও শেষ হইল না—পাপের আরও কঠিন শাস্তি ভোগ করিবার জন্য তাহাকে নেপালী পুলিশের হস্তে সমর্পণ করা হইল। যাত্রীবর্গের জিনিষপত্র লইয়া এই পথে বিশেষ সাবধানে চলা উচিত।

আমরা ক্ষণমাত্র বিশ্রাম না করিয়া দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে কঙ্করময় পথে চলিতে লাগিলাম। পথে কেবল ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃক্ষ-সমন্বিত জঙ্গল, আর চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা। মধ্যে মধ্যে দুই এক ঘর বসতি দেখা গেল। বহুসংখ্যক নেপালী কুলী ও বাহকগণ চলিয়াছে। তাহাদের গায়ের দুর্গন্ধে মুখ ফিরাইতে হয়।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের কত সাধু ও গৃহস্থের সঙ্গে একত্র চলিয়াছি। ইহাদের মধ্যে ভদ্রগৃহস্থ একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! আধুনিক কালে ভদ্রনামধারী ব্যক্তিবর্গের ভিতরে ধর্ম্মকর্ম্ম অতি বিরল হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ নিষ্ঠাবান পরম হিন্দু ছিলেন, তাঁহারা, সেই হিন্দু সন্তান, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া ঘোর স্লেচ্ছাচারী হইয়া পড়িয়াছেন। দু'পাতা ইংরাজী পড়িয়া ধর্ম্মের নামে নাসিকা কুঞ্চিত করেন। ধর্ম্মশূন্য তাই এদেশের দারিদ্র্যের প্রধান কারণ। যে জাতি জ্ঞানে বিদ্যায় জগতের শীর্ষস্থানীয় ছিল, সেই জাতি— সেই আদিম সুসভ্য স্বাধীন হিন্দুজাতি আজ স্বীয় জ্ঞান বুদ্ধি বিদ্যা গৌরব সকলই অতলজলে বিসর্জ্জন দিয়াছে। আরও আক্ষেপের বিষয়, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। ইহা কাহার দোষ—কালের না বিধাতার? হায় ভারত! একদিন তোমার বক্ষে শত সহস্র ঋষিকণ্ঠ-নিনাদিত অপূর্ব্ব বেদগান কীর্ত্তিত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সকলেই আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম যথানিয়মে সম্পাদন করতঃ সুখে ও শান্তিতে জীবনযাত্রা অতিবাহিত করিত, আর আজ কোথায় সেই ঋষি-শাসন, কোথায় সেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম? কি এক ঐন্দ্রজালিকের কুহকদণ্ডের স্পর্শে সব উড়িয়া গিয়াছে।

মধ্যাহ্নকাল অতীত হইলে আমরা চেখোরা চটীতে উপস্থিত হইয়া আহারাদির ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। জোর হাওয়া চলিতেছে বলিয়া দোকানদার তাহার ঘরে স্থান দিল না। অগত্যা দগ্ধোদর পূরণার্থে জিনিষপত্র ও "থালী বর্‌তন" লইয়া নদীর ধারে কোনরূপে অর্দ্ধসিদ্ধ খিচুড়ী ভক্ষণ করা গেল।

সামান্য বিশ্রামান্তে পুনরায় যাত্রা আরম্ভ। পথ কেবলই জঙ্গলময় এবং বন্ধুর। সূর্য্যদেব মধ্যগগনে বসিয়া প্রখর কিরণ বর্ষণ করিতেছেন; পদব্রজে গমনে পরিশ্রান্ত হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে রাস্তার ধারে একটী বৃক্ষতলে আসন লাগান হইল। আরও বিস্তর যাত্রী এখানে আশ্রয় লইয়াছে। সম্মুখে জঙ্গলাবৃত পর্ব্বত, মাথার উপর অনন্ত আকাশ, বহুনিম্নে একটি নদী কুলুকুলু

রবে প্রবাহিতা। সন্ধ্যার অন্ধকারে সম্মুখবর্ত্তী অরণ্যময় পর্ব্বত সকল ভীষণাকার দৈত্যের ন্যায় বোধ হইতেছে। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, কেবল ঝিঁঝিঁ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শ্রুতিগোচর হইতেছে না। অন্ধকার আকাশে দুই একটী নক্ষত্র ক্ষীণ আলোকরশ্মি বিকীর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সন্ধ্যার ম্লান পাংশু আচ্ছাদনে দিগন্ত আচ্ছাদিত। নিকটবর্ত্তী অরণ্য হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিয়া বৃহৎ ধুনী জ্বালান হইল। নানারূপ গল্পগুজবে সেই শীতের রাত্রি উন্মুক্ত আকাশের নীচে রাস্তার উপরেই কাটিয়া গেল। আহার—সেই পার্ব্বত্য নদী হইতে অতিকষ্টে আনীত স্বাদু শীতল জল এক লোটা।

পরদিন অতি প্রত্যূষে লোটা কম্বল লইয়া রওনা হওয়া গেল। জঙ্গল রাস্তায় কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই সম্মুখে একটী চটী পাইলাম। তাহার প্রথমেই সরাবের দোকান। বাজারের উপযুক্ত দোকান বটে! প্রত্যেক চটীতেই এইরূপ দোকান দেখিয়াছি। এ দেশের নীচ-শ্রেণীর লোকগুলি অতিরিক্ত সরাব পান করে।

চটী পরিত্যাগ করিয়া আর কিছুদূর যাইতেই ভীমকেদী নামক একটী সুন্দর স্থানে উপস্থিত হইলাম। ইহা একটী ক্ষুদ্র সহর। প্রথমে প্রবেশদ্বারে রক্ষিগণ-বেষ্টিত জনৈক রাজকর্ম্মচারী পূর্ব্বপ্রদত্ত ছাড় পত্রের উপর ইংরাজী P অক্ষরের ন্যায় কি লিখিয়া দিলেন। জানি না নেপালী ভাষায় ইহাকে কোন্ বর্ণ বলে। বাজারের ভিতরে একটী দোকান মনোনীত করিয়া আমরা বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। ভুট্টার মোটা রুটী ও কলাইয়ের দাইল প্রস্তুত হইল। এক মাইল দূরবর্ত্তী কলের জলে স্নান করিয়া আসিয়া আহারাদি শেষে দেহখানি লম্বা করা গেল।

চটী একেবারে জনাকীর্ণ, এক ত খাদ্য দ্রব্য ভাল পাওয়াই যায় না তাহাতে যাত্রীর অত্যন্ত ভীড়ের জন্য দ্রব্যাদি অগ্নিমূল্যে বিক্রীত হইতেছে। আমাদের সম্মুখে একটী কাষ্ঠের বিচিত্র কারুকার্য্য-শোভিত সুন্দর দোতালা বাড়ী। নেপালী শিল্পী কাষ্ঠের উপরে নানাবিধ কারুকার্য্য করিয়াছে, দেখিতে বড়ই সুন্দর। দোকানগুলি সবই প্রায় দোতালা। নীচে দোকান, উপরে দোকানী সপরিবারে বাস করে। হাঁসপাতাল, পান্থনিবাস প্রভৃতি আধুনিক ফ্যাসানের ভাল বাড়ীও দুই তিনটী দেখিলাম। দোকান এখানে অনেকগুলি আছে, কিন্তু সব দোকানে একরকম জিনিষ। সেই মোটা চাউল, চিঁড়ে, বিশ্রী কালো রঙ্গের গুড়, "নমক্ ঔর মিরচা।" অধিকন্তু একখানি মিঠাইয়ের দোকান। মহিষের দুগ্ধ চেষ্টা করিলে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত একটী বৃহৎ ধর্ম্মশালা এখানে আছে, তাহার উপরে নীচে যাত্রীদলে পরিপূর্ণ। এ পথে আহারের ক্লেশ যথেষ্ট। সঙ্গতিপন্ন যাত্রীবর্গ সঙ্গে আহারের সংস্থান করিয়া আসিলে কষ্টের কারণ নাই।

ভীমকেদী সহরটী বড় সুন্দর স্থানে অবস্থিত। চতুর্দ্দিকে উন্নত গিরিশ্রেণী পরিবেষ্টিত এই উপত্যকাটীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি মনোরম। দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় চতুর্দ্দিকে সমুন্নত পর্ব্বতমালা। অযত্নবর্দ্ধিত কত বৃক্ষলতা ঐ সকল পর্ব্বতে অরণ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। শাখায় শাখায় নানাবিধ বিহঙ্গের বিচিত্র কলরব। কত নির্ঝরিণী পর্ব্বতগাত্র বহিয়া নিম্নে পতিত হইতেছে। মেঘনির্ম্মুক্ত সুনীল আকাশে বসিয়া সূর্য্যদেব প্রখর কিরণ বর্ষণ করিতেছেন। সে উজ্জ্বল কিরণে নির্ঝরিণী সকল রজতধারা বলিয়া ভ্রম হইতেছে। এই পর্ব্বতীয় সৌন্দর্য্য স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিলে প্রাণ বিস্ময় ও পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠে। ধন্য বিধাতা, ধন্য তোমার রচনা!

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এই প্রাকৃতিসৌন্দর্য্য প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিয়া, দোকানদারের পাওনা গণ্ডা চুকাইয়া দিয়া, তিনজনে কম্বল গুটাইয়া যাত্রা করিলাম। কিয়দ্দূর একরূপ ভাল রাস্তাতে চলিয়া সম্মুখে "শিশাগড়ী কা কঠিন চড়াই" আরম্ভ হইল।

সে যে কি ভয়ানক পথ তাহা কাহাকেও বুঝান যায় না। ক্রমাগত সোজা হইয়া উঁচুতে উঠিতেছি—যেন আকাশে উঠিতেছি। উভয়পার্শ্বে জঙ্গল, কেবলই ঘুরিয়া ফিরিয়া পাহাড়ের ক্রমোচ্চ গাত্র বাহিয়া উপরে উঠিতেছি। দু'পা উঠি আর বিশ্রাম করি—কখনও বা

হস্তস্থিত কমণ্ডলু হইতে জলপান করিয়া পিপাসা নিবারণ করি। আরও ভয়ঙ্কর যে, প্রতিপদবিক্ষেপে পদতল হইতে ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড গড়াইয়া পড়িতেছে। সময়ে সময়ে দু' এক পা পশ্চাতে হটিয়া আসিতেছি। ক্ষণে ক্ষণে পতনের আশঙ্কা। এ কি ভয়ঙ্কর রাস্তা! বাহকগণ অতি কষ্টে আরোহী লইয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম অবস্থায় উপরে উঠিতেছে। তাহাদের সহিত কথা বলা দূরে থাক্—সেদিকে চাহিতেও ভয় হয়। কত দেশের কত রকম যাত্রী। আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রাণপণ শক্তিতে "পশুপতিনাথ কী জয়" রবে হাঁফাইতে হাঁফাইতে চড়াই করিতেছে—প্রাণের আকুল আকাঙ্ক্ষা একবার পশুপতিনাথ দর্শন করিয়া জন্ম সফল করিবে। তবেই এত কষ্ট, এত পরিশ্রম সার্থক হইবে।

এই হিমালয়, দেবতার আবাসস্থান বলিয়া মানুষের অগম্য। সুকঠিন পর্ব্বতাভ্যন্তরে এত মনোরম স্থান লুক্কায়িত আছে যাহা আজ পর্য্যন্ত মানবে আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয় নাই। বোধ হয় তাহা চিরকাল অনাবিষ্কৃতই থাকিয়া যাইবে। যাহা হউক, বড় কষ্ট করিয়াই সকলের সহিত আমরা পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিলাম। অমনি এক স্বর্গীয় দৃশ্য নয়ন সমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। উত্তরে চিরতুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতশিখর, যেন বিভূতিভূষিত কলেবর ধ্যানমগ্ন যোগীর ন্যায় সমাধিস্থ। সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গগুলি আকাশের গায়ে মিশিয়া গিয়াছে। প্রখর সূর্য্যোত্তাপে সেই তুষার দ্রবীভূত হইয়া রজতধারাকারে নিম্নে পতিত হইতেছে। ঠিক যেন মহাদেবের কর্পূরধবল দেহে ভুজঙ্গহার শোভা পাইতেছে। সে দৃশ্য দেখিয়া নয়ন ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না।

যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবল তুষারময় উন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গ সকল সূর্য্যকিরণে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বশিল্পীর অনন্ত শিল্পচাতুর্য্যের ইহা এক অপূর্ব্ব পরিচয়। আর নিম্ন দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ভীমকেদী সহরটি একখানি সুন্দর ছবির ন্যায় বোধ হয়। অতি সুন্দর দৃশ্য। বিস্তীর্ণ শ্যামল উপত্যকায় ঘন সন্নিবিষ্ট করোগেটেড্ বাড়ীগুলি অতিশয় ক্ষুদ্র দেখাইতেছে। প্রকৃতির শ্যামলতাই বিশেষ নয়নানন্দদায়ক। অন্যদিকে অরণ্যময় ধূসর পর্ব্বতশ্রেণী ভীমকায় দৈত্যের ন্যায় সগর্ব্বে দণ্ডায়মান। যে দিকেই চাই—অতৃপ্ত নয়নের যেন আশ মিটে না। শিখরস্থিত একখণ্ড প্রস্তরোপরি বসিয়া আমরা প্রকৃতির অতি বিচিত্র এই অতুলনীয় রূপরাশি মুগ্ধচিত্তে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম।

অপরাহ্নকালে যে উন্নত পর্ব্বতশিখরে আমরা বসিয়া আছি, তাহার নাম শিশাপাণি গড়ী। সাধারণে ইহাকে শিশাগড়ী বলিয়া থাকে। স্থানটী সমুদ্রতল হইতে ২৩০০ ফুট উচ্চে। বিদেশী শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ জন্য নেপালরাজ এখানে গড় ও সৈন্যাদি রাখিবার সমুদয় ব্যবস্থা করিয়াছেন। উদ্ধতপ্রকৃতি গুর্খা সৈন্যগণ বন্দুক ঘাড়ে করিয়া গর্ব্বভরে ইতস্তত ভ্রমণ করিতেছে। সকলেরই কোমরে "কুক্‌রী" নামক বক্র ছোরা সংলগ্ন। কোন বিদেশী শত্রু কোনদিন এই পথে নেপালরাজ্য আক্রমণ করিয়াছে কি না তাহা আমার জানা নাই। অতি দুর্ভেদ্য গিরিপ্রাচীরে বিধাতা এই রাজ্যকে বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাই ইহা আজও স্বাধীন বলিয়া গর্ব্ব করিতেছে।

সূর্য্যদেবকে অস্তাচলগমনোন্মত দেখিয়া আমরা আর সেখানে বিলম্ব করিলাম না। পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় যাত্রীদল প্রাণপণ শক্তিতে 'জয় পশুপতিনাথ' শব্দে হুঙ্কার করিতে করিতে এই প্রাণসঙ্কট পথে ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিতেছে। তাহাদের সহিত পুনরায় চলিতে লাগিলাম। গড়ে প্রবেশদ্বারে সেই ছাড়পত্রটুকু বদলাইয়া আর একটু কাগজের টুকরা পাওয়া গেল। রাস্তার এক পার্শ্বে খাদের দিকে ইউক্যালিপ্‌টাসের চারাগাছ লাগান হইয়াছে। মাঝে মাঝে একরূপ লাল ফুলের গাছ—দেখিতে বড়ই শোভাময়। পাহাড়ীরা দলে দলে সেই ফুল তুলিয়া মাথায় পরিতেছে। ইহারা ফুলের গহনা খুব ভালবাসে। আরও কত রকম গাছ,

লতা, ফুল, ফল ইত্যাদি দেখিতে দেখিতে আমরা উৎরাই পথে অবরোহণ করিতে লাগিলাম।

যেমন কঠিন চড়াই, উৎরাইও তদ্রূপ। অরণ্যময় অপ্রশস্ত পথে অনেকদূর নামিয়া, সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে আমরা কুলিথানীর ধর্ম্মশালাতে উপস্থিত হইলাম। বাজার ছাড়িয়া একটি সামান্য পুলের উপর দিয়া নদী পার হইলাম। পরে অনেকগুলি প্রস্তর সোপান অতিক্রম পূর্ব্বক ধর্ম্মশালার দ্বারদেশে হাজির হওয়া গেল। ভিতরে বাহিরে লোকারণ্য। কোথাও স্থান মিলিল না—একটা প্রাচীরের নীচে রাস্তার ধারে আসন লাগান হইল। ধর্ম্মশালাতে অসংখ্য যাত্রী, তাহাদের মধ্যে কোথাও গীতবাদ্য, কোথাও স্তোত্রপাঠ, কোথাও শাস্ত্রালোচনা, কোথাও গল্পগুজব হাসি তামাসা, কোথাও আহারের উদ্যোগ, কোথাও শয়নের ব্যবস্থা ইত্যাদি হইতেছে। রাজকীয় কর্ম্মচারী ও প্রহরিগণ অদ্ভুত পোষাক পরিধান করিয়া সগর্ব্বে এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দরিদ্র নিঃসম্বল তীর্থযাত্রীর জন্য নেপাল-রাজপ্রদত্ত সদাব্রতের ব্যবস্থা আছে। যাহার আবশ্যক হইবে সে ঐ কালো রঙ্গের মোটা চাউল, কিছু কলাইয়ের দাইল ও সামান্য লবণ সংযুক্ত একটি মালসা পাইতে পারে।

চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া কোথাও ঘরের ভিতর আশ্রয় না পাওয়ায়, বাধ্য হইয়া রাস্তার উপরে খোলা জায়গায় রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করিতে হইল। অধিক মূল্য দিয়া সামান্য কাষ্ঠ ক্রয় করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করিলাম। সঙ্গী বাঙ্গালী সাধুটির নিকটে আমার কম্বল ছিল—শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন সে আমাদের সঙ্গে চলিতে পারে নাই,—ধীরে ধীরে আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইবে। কম্বল না হইলে এই পাহাড়ের শীতে প্রাণান্ত হইবে ভাবিয়া সাধুকে খুঁজিতে বাহির হইলাম। নীচে বহুদূর অবধি তাহাকে খুঁজিয়া না পাওয়ায় ফিরিয়া আসিলাম। শরীরও সেদিন বড় পরিশ্রান্ত—পা দুখানি চলিতে একেবারে নারাজ। ভাল খাদ্যের অভাব, তার উপর রাস্তাও অতি দুর্গম।

পরিপূর্ণ মাত্রায় উপবাস করিয়া, উন্মুক্ত আকাশতলে অত্যধিক শীতের মধ্যে বসিয়া উভয়ের রাত্রি কাটিল। কি দুঃসহ কষ্টে সে রাত্রি অতিবাহিত হইল তাহা এক মাত্র অন্তর্যামীই জানেন।

পরদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়াই যাত্রা করিলাম। তখনও পূর্ব্বাকাশ পরিষ্কৃত হয় নাই, আকাশে দুই একটা তারা তখনও মিটিমিটি জ্বলিতেছে। বিহঙ্গকুল তখনও প্রভাতী গাহিয়া নীড় পরিত্যাগ করে নাই। ঊষার আলোকে তখনও দিগন্ত উদ্ভাসিত হয় নাই, সঙ্করণশীল শীতবায়ু তখনও সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত করিতেছে। যাত্রীবর্গ তখনও নিদ্রামগ্ন। এমনি সময়ে শীতাধিক্য-প্রযুক্ত বসিয়া থাকিতে অক্ষম হওয়ায়, আমরা অগ্রসর হওয়াই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলাম। রাস্তায় যদিও প্রবল বায়ুতে অস্থির করিয়া তুলিবে, তথাপিও পথ চলার পরিশ্রমে শরীর অনেকটা গরম হইতে পারে।

ধীরে ধীরে সোপানশ্রেণী অতিক্রম পূর্ব্বক নদীর মধ্য দিয়া কঙ্করপথে চলিতে লাগিলাম। দেহখানি শীতে একেবারে আড়ষ্ট। পর্ব্বতগুলি নানাবিধ বৃক্ষলতায় আপনার পাষাণদেহ পূর্ণ করিয়া কত জীবজন্তুর আশ্রয়স্বরূপ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। জগতের সাক্ষীস্বরূপ এই বিরাট মহীধর কত যুগ-যুগান্তর হইতে এইভাবে অটল রহিয়াছে তাহা কে বলিবে? কত উত্থান পতন, কত উৎপত্তি বিনাশ নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমিও কতবার কতরূপে এ পৃথিবীতে আসিয়া চলিয়া গিয়াছি। এখনও আশার পশ্চাতে ছুটিতেছি। জানি না কতদিনে আমার এ ঘোরাফেরা শেষ হইবে! কত দিন মাস বৎসর যুগ জন্ম কাটিয়া গিয়াছে—পাপতাপ-পূর্ণ পৃথিবীর কঠিন কঙ্করময় পথে চরণদ্বয় ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, অপরিসীম যন্ত্রণায়, বিফল নৈরাশ্যে, শোক-দুঃখ-মোহ জ্বালায় জর্জ্জরীভূত হৃদয় লইয়া কর্ম্মসূত্রের আবর্ত্তন চক্রে আর কত ঘুরিব? কবে যাত্রা করিয়াছি, আর

জানি না। কোথায় দয়াময়, এ পথভ্রান্ত পথিককে আশার আলোক দেখাইয়া সুপথে লইয়া চল।

ভীষণ শীতবায়ুতে অস্থির হইয়া কিয়দ্দূর চলিতেই সম্মুখে একটী চড়াই পাওয়া গেল। চড়াইয়ের পরিশ্রমে শরীরটা বেশ গরম হইয়া উঠিল। সঙ্গী বিরজানন্দ নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে করিতে চলিয়াছেন। উপরে উঠিয়া একস্থানে উভয়ে বিশ্রাম করিতে বসিলাম। তখন পর্য্যন্ত সেই বাঙ্গালী সাধুটীর দেখা নাই। তাহার জন্যই অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে পর্ব্বতের মধ্য হইতে তরুণ তপন সুবর্ণ কিরীট পরিধান করিয়া ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইলেন। সে এক অপূর্ব্ব শোভা। পাহাড়ের গায়ে চিক, দেবদারু, ঝাউ প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষ। সর্ব্বনিম্নে বিস্তৃত শ্যামল শস্যক্ষেত্র। প্রফুল্ল সূর্য্য-কিরণে ক্ষেত্র, বৃক্ষ ও পাহাড়গুলি যেন হাস্য করিতেছে। নীচে ছোট ছোট পাহাড়গুলি যেন সমান বোধ হইতেছে। বড় সুন্দর দৃশ্য। অনেকক্ষণ বসিয়া আমরা সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য উপভোগ করিলাম। উঠিবার সময়ে দেখি, সেই সাধুজি ইতস্তত চাহিতে চাহিতে অগ্রসর হইতেছেন।

বাঁচা গেল বাপু! এই পাহাড়ের শীতে কম্বলখানি বেহাত হইলে কি চলে? গত রাত্রিতে কম্বল না থাকায় যে বিষম কষ্ট সহ্য করিয়াছি তাহা আজীবন মনে থাকিবে। যাহা হউক, পুনরায় তিনজনে চলিতে লাগিলাম। চারিদিকে হাস্যময়ী প্রকৃতি। শ্বেত বলাকা-শ্রেণী নীলাকাশে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। দূরে—অতি দূরে বিরাট কলেবর পর্ব্বতশ্রেণী সূর্য্যরশ্মিপ্লাবিত হইয়া আরও গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সম্মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়গুলিও পুলকিত। নিম্নে শ্যামল শস্যক্ষেত্রগুলি প্রফুল্ল সূর্য্যকিরণ গায়ে মাখিয়া হাস্য করিতেছে। পাখীরা বৃক্ষশাখায় বসিয়া মধুর স্বরে পুলকিত প্রাণে ডাকাডাকি করিতেছে। বিমল হাসিতে দিগ্‌দিগন্ত পুলকময়। এমনি সুন্দর সময়ে আমারাও উৎফুল্ল

নানাদেশীয় বহু নরনারী চলিয়াছে। রাস্তা মন্দ নহে—প্রায় সমতল। সম্মুখে ভীষণ অরণ্যময় পর্ব্বত দেখা যাইতেছে—ঐ পর্ব্বত অতিক্রম করিতে পারিলেই কাঠমণ্ডু সহরে পেঁাছান যায়।

এক স্থানে জলের সুবিধা দেখিয়া আমরা স্নানাদি করিলাম। চর্ব্বণ—যৎকিঞ্চিৎ চানা।

পুনরায় দুই মাইল চলিয়া একটী চটিতে আহারাদির উদ্যোগ করা হইল। তখন মধ্যাহ্নকাল। চটীতে তিন খানি মাত্র দোকান। তাহারই একখানিতে কোনরূপে খিচুড়ী রন্ধন করা হইল এবং উদরস্থ করিয়াই চটী পরিত্যাগ করিলাম। স্থানটি বড়ই অপরিষ্কার বলিয়া বিশ্রাম আর হইল না। দলে দলে যাত্রী চলিয়াছে। আমরাও চলিতে লাগিলাম। এক মাইল পরে আর একটী চটী। এখানে একটি পুরাতন মন্দির ও ধর্ম্মশালা আছে। সেখান হইতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই জঙ্গলের রাস্তায় ভীষণ চড়াই আরম্ভ হইল।

মধ্যাহ্নকালের প্রখর সূর্য্যোত্তাপ এবং চড়াইয়ের পরিশ্রমে নিতান্ত অস্থির হইয়া উলিাম। তদুপরি জলের একান্ত অভাব, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইতেছে, কিন্তু সহস্র চেষ্টাতেও এক বিন্দু জল পাইবার উপায় নাই। কি কঠিন পর্ব্বত! প্রাণান্তের উপক্রম আর কি!

অতি কষ্টে শিখরদেশে আরোহণ করিয়া হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। জলও সেখানে পাওয়া গেল। কি আশ্চর্য্য! এত উচ্চ পর্ব্বতের উপরেও বিধাতা জলের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন! ধন্য তাঁহার করুণা! যখনই চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখনই তাঁহার করুণাধারা প্রাণে অমৃতসিঞ্চন করে। জগৎ-রহস্য বড় চমৎকার। এ রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন কে করিবে? এক বিন্দু বালুকা কণার শক্তি তাৎপর্য্য কে বুঝিতে সক্ষম হয়? মানুষ কয়দিনের জন্য, কতটুকুই বা তাহার শক্তি? এ জগতের বিরাট রহস্য উদ্ভেদ করা মানবের বুদ্ধির অতীত। কিসের দর্প—কিসের অভিমান? এতটুকু চিন্তা করিলে সকল দর্প, সকল অভিমান চূর্ণ হইয়া যায়। ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য-

যে উচ্চ পর্ব্বত চূড়ায় আমরা অপরাহ্নকালে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি, সেখান হইতে নীচের দৃশ্য বড়ই চমৎকার। অতি নিভৃত স্থান। অনন্ত নীলাম্বরতলে নিবিড় বনরাজি-পরিবেষ্টিত সুউচ্চ পর্ব্বতের প্রাকৃতিক শোভা অতুলনীয়। জনতার কোলাহল, শোক দুঃখের হাহাকার কত নীচে। আকাশের নীল বর্ণে, সূর্য্যের উদয়াস্তে, অচল ভূধরে, উপলভেদী নির্ঝরে, স্বচ্ছতোয়া নদীতে, বন্যকুসুমপরিমলবাহী সমীরণে, সুশ্যাম বনরাজিতে, তরুলতায়, ফলেফুলে, জলে স্থলে, অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্র কি আনন্দের বিকাশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে! যাঁহার রচনা এত সুন্দর, না জানি তিনি কতই সুন্দর! এই সমস্ত আনন্দময় ভাব সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া মনপ্রাণ পুলকিত হইল। বেলা যায় দেখিয়া আমরা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম।

এখান হইতে উৎরাই আরম্ভ হইল। প্রথমে গড়ানে রাস্তায় নামিতে লাগিলাম। পা দাঁড়ায় না, প্রতিপদে পতনের আশঙ্কা। তারপর ক্রমাগত সিঁড়ি ভাঙ্গিতে লাগিলাম। সে কি সহজ নামা? ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেবলই নামিতেছি। পা দুখানি অসাড় হইয়া যাইতেছে —দেহ অবসন্ন।

বদরিকাশ্রমের রাস্তায় কত উৎরাই করিয়াছি, কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর উৎরাই ত কখনও দেখি নাই! বাহকগণ বোঝা স্কন্ধে করিয়া দ্রুতপদে নামিতেছে—তাহাদের বিশেষ কোন ভয় নাই—ভয় হইতেছে আরোহীর। প্রতিপদে বাহকদিগকে তাহারা সাবধান করিতেছে। কয়েকজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত দেখা হইল। তাঁহারাও উৎরাইয়ের পরিশ্রমে নিতান্ত কাতর হইয়াছেন। এ কয়েকদিন বাঙ্গালীর সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। আজ এই কঠিন পথে স্বদেশবাসীর দেখা পাইয়া নিতান্ত কষ্টের মধ্যেও আনন্দের সঞ্চার হইল।

কিছুক্ষণ একস্থানে বিশ্রাম করিয়া আলাপ পরিচয়াদি করিবার পরে পুনরায় সকলে গল্প করিতে করিতে অবনেপালের রাস্তায় এই দুইটাই কঠিন—শিশাগড়িকা চড়াই এবং চন্দ্রাগড়িকা উৎরাই।

অবসন্নদেহভার লইয়া যখন আমরা থানকোট নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম, তখন সন্ধ্যার প্রাক্‌কাল। সূর্য্যদেব কখন কোন্ পর্ব্বতের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়াছেন, তাঁহার রক্তিম আভা তখনও পর্ব্বতের শ্যাম অঙ্গ হইতে অদৃশ্য হয় নাই। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া পক্ষিকুল নীড়াভিমুখে ছুটিয়া আসিতেছে। যাত্রীবর্গের অনাবশ্যক কোলাহলে চটি পরিপূর্ণ।

কোথাও তিলধারণের স্থান মাত্র নাই। দোকানে বৃক্ষতলে লোকারণ্য। বহু অন্বেষণ করিয়া কোথাও স্থান সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। জনৈক চৌকীদারের পরামর্শমত এক দরিদ্র নেবারের বাটীতে ছয়টী ঢেবুয়া (মুদ্রাবিশেষ) দিয়া তিনজনে বারান্দায় স্থান পাইলাম। অন্ধকারে বসিয়া তিন জনে নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে লাগিলাম। দূরে কাটমণ্ডু সহরের বৈদ্যুতিক আলোকমালা দেখা যাইতেছে। এখান হইতে আরও তিন ক্রোশ গেলে তবে সহর পাওয়া যাইবে। চিপীটক চর্ব্বণ করিয়া শয়নের উদ্যোগ করা গেল। শীতাধিক্য প্রযুক্ত রাত্রিতে মোটেই নিদ্রা হইল না।

রজনীর অন্ধকার বিদূরিত করিয়া যখন উষাদেবী অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিলেন, সেই শুভমুহূর্ত্তে আমরা সহরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। ক্রমেই সহর নিকটবর্ত্তী হইতেছে। কাষ্ঠ নির্ম্মিত গৃহ রাস্তার দুই পার্শ্বে অনেক দেখা যাইতে লাগিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই সম্মুখে দুইটি রাস্তা পাওয়া গেল। সঙ্গী পাঞ্জাবী সাধুটী দক্ষিণের রাস্তায় তাঁহার কোন পরিচিতের বাটীতে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় আমার হাত দুটি জড়াইয়া ধরিয়া কত কথাই বলিলেন। সেই সর্ব্বত্যাগী সাধুর নয়ন কোণে একবিন্দু অশ্রু দেখা দিল। কয়েকদিন একসঙ্গে ছিলাম—কত অন্যায় অপরাধ করিয়াছেন, তজ্জন্য পুনঃপুনঃ ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া তিনি সজল

পরে আমরা অনেকক্ষণ সেখানে বসিয়া তাঁহার মধুর প্রকৃতির বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলাম।

সাধুজীর প্রকৃতি বড়ই সুন্দর। তিনি একদিকে যেমন পরম ত্যাগী, শাস্ত্রপারদর্শী সাধু, অপরদিকে তদ্রূপ সদালাপে, সাহিত্য এবং সঙ্গীত আলোচনাতেও সিদ্ধ। কথাগুলি এত মধুর যে সহজেই আকৃষ্ট হইতে হয়। অতি অল্পদিনের পরিচয়েই তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। তিনি প্রকৃতই আমাকে ভালবাসিতেন। সেই রক্সোল ষ্টেশন হইতে এ পর্য্যন্ত তিনি আমার জন্য যথেষ্ট করিয়াছেন। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি আমাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন যে, রাস্তায় যে খরচপত্র হইবে তাহা সম্পূর্ণ তিনিই বহন করিবেন। আমার সহস্র আপত্তিতেও ইহার অন্যথা হয় নাই। আমি গোপনে কোথাও মিষ্টান্ন প্রভৃতি কিনিয়া আনিয়াছি, তাহার জন্য কত অনুযোগ করিয়াছেন। অপর কাহারও রন্ধিত খাদ্য তিনি গ্রহণ করিতেন না। পরিশ্রান্ত হইয়া কোন চটিতে উপস্থিত হইলে তিনিই সমস্ত সংগ্রহ করিয়া, নিজের ঝুলী হইতে নানারূপ মশলা প্রভৃতি বাহির করিয়া যথাসম্ভব ভাল খাদ্য প্রস্তুত করিতেন। আমরা তৃপ্ত হইলেই তিনি আনন্দিত হইতেন। বিশ্রামকালে কত শাস্ত্রকথা, কত ইতিহাস, কত শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত প্রত্নতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব দর্শন বিজ্ঞান জ্যোতিষ ইত্যাদি প্রসঙ্গ শুনাইয়া আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিতেন। তাঁহার কথা বলিবার অপূর্ব্ব ভঙ্গী ছিল। কি অদ্ভুত চরিত্রই তাঁহার দেখিয়াছি! আজ কতদিন হইল তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিয়াছি, কিন্তু তাঁহার কথা যখনই মনে হয়, প্রাণটা অস্থির হইয়া উঠে। তাঁহার অপূর্ব্ব চরিত্রচিত্র অঙ্কন করি এমন সাধ্য আমার নাই। ভগবানের কৃপায় তাঁহার সাধনা সিদ্ধ হউক ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

ক্রমশঃ

ব্রহ্মচারী হেমচন্দ্র।

অশ্রু

পূর্ণিমা রাত, ঘুমিয়ে ছিলাম ঘাসের বিছানায় ;
পাহাড়-কোলে শালের ছায়ায় ছিল না আর কেউ,
মনের কাণে কাঁপ্‌তেছিল বিস্মৃত পর্দ্দায়
হাজার-বছর-আগে-বাজা বাঁশীর সুরের ঢেউ ;—
বঁধুর সনে মিল্‌ত গলা মধুর বেদনায়
হাজার বছর আগেকার এক বসন্ত-সন্ধ্যায়।

চুকিয়ে খেলা আকাশ-পথে একটি পথিক তারা
মর্ত্তাবালার রূপের শ্রীতে জাগিয়ে দিল মোরে,
পাণির তলে লুকায় পাণি, আঁখি পলক-হারা,
কি দেখিলাম স্বপ্ন-ছবি জাগন্ত ঘুম-ঘোরে!

বনের বীণা বাজিয়ে বহে যৌবনেরি হাওয়া ;—
সে যে আমার থির বিজুরি, যায় না চোখে চাওয়া।

তারারা সব পালিয়ে গেল দিগ্‌বলয়ের পারে
সাঁঝ-সাগরের ফেনায় ভেসে বুদ্‌বুদেরি প্রায় ;
আপ্‌না ভুলে যতই ভাল বাস্‌নু আমি তারে,
ততই সে মোর মন ভুলাল ফুলের পশরায়!
বসুন্ধরা তাকিয়ে আছে আজ্‌কে তাহার তরে,
অশ্রু তাহার শিশির ফোঁটা তৃণের চোখে ঝরে।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

গার্হস্থ্য চিত্র—২

চিত্রকর—শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন

বৈবাহিক যুগল

মেয়ের বাপ

বে— কি চশমখোর !

ছেলের বাপ

শা— কি জোচ্চোর !
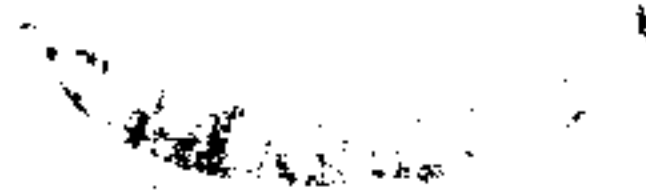
হেমচন্দ্র

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হিন্দু কলেজে উচ্চশিক্ষালাভ।

হিন্দু কলেজে প্রবেশ।—১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে হেমচন্দ্র হিন্দু কলেজে 'সিনিয়র' স্কুল বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। কলেজের তদানীন্তনকালের কার্য্যবিবরণী হইতে কলেজের শিক্ষকগণের নাম নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

হিন্দু-কলেজ

কলেজ বিভাগ

প্রিন্সিপ্যাল	জে, সাট্‌ক্লিফ্‌	বেতন	৬০০৲
ইংরাজী সাহিত্যের সহঃ অধ্যাপক,	আর্‌ হ্যাণ্ড্‌	"	৩০০৲
'সার্ভেয়িং'-শিক্ষক	জে, রো	"	১০৬॥৵১০
ব্যবস্থাশাস্ত্রের অধ্যাপক	ডব্লিউ, থিওবোল্ড্‌	"	৩০০৲
সাহিত্যের অধ্যাপক	ডব্লিউ, গ্রেপেল	"	২৫০৲

'সিনিয়র' স্কুল বিভাগ

প্রধান শিক্ষক	আর্‌, জোন্স্‌	বেতন	৫০০৲
দ্বিতীয় শিক্ষক	সি, টি, ডন্‌	"	২০০৲
ইংরাজীর শিক্ষক	জে, বি, গ্রিসেনথোয়েট্‌	"	২০০৲
বাঙ্গালাসাহিত্যের শিক্ষক	রামচন্দ্র মিত্র	"	২০০৲
প্রথম পণ্ডিত	পীতাম্বর শর্ম্মা	"	৩৫৲
দ্বিতীয় পণ্ডিত	গৌরীচরণ শর্ম্মা	"	২০৲

হেমচন্দ্র বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় স্বভাবগুণে সহপাঠিগণের বিশেষ প্রিয়পাত্র এবং পাঠে মনোযোগিতার জন্য শিক্ষকগণের স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। সকল বিষয়েই হেমচন্দ্র পারদর্শিতা দেখাইতেন। সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় হেমচন্দ্র প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হন। হিন্দুকলেজের কার্য্যবিবরণীতে লিখিত আছে:—

The Examiners * consider the following boys deserving of certificates of honor:—

Second class.

1. Gopal Chandra Banerjea—Mathematics.
2. Hem Chandra Banerjea—Literature.
3. Rooplal Mitter†—Vernacular.

সতীর্থ শ্রীযুক্ত নীলমণি কুমার ও শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়।—স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে

---

* মিঃ সাটক্লিফ (গণিত), মিঃ জোন্স (ইংরাজী ব্যাকরণ), মিঃ হ্যাণ্ড্‌ (ইংরাজী সাহিত্য), মিঃ গ্রিসেন্‌থোয়েট (ইতিহাস) মিঃ ডন্‌ (জ্যামিতি), মিঃ রজার্স (ভূগোল) ও রামচন্দ্র মিত্র (বাঙ্গলা সাহিত্য) পরীক্ষক ছিলেন।

† রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের দৌহিত্র।

পাঠ কালে হেমচন্দ্র যে কয়েকজন সহপাঠীকে বন্ধুরূপে লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত তাঁহার মধুর প্রীতি-সম্বন্ধ চিরদিন অক্ষুণ্ণ ছিল। ইঁহাদের মধ্যে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নীলমণি কুমার ও শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা উভয়েই এখনও জীবিত আছেন এবং ইঁহাদের স্মৃতি-কথা হইতে আমরা হেমচন্দ্রের ছাত্রজীবনের বিবরণ সঙ্কলনে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি।

শ্রীযুক্ত নীলমণি কুমার ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ১৩ই জুন দিবসে জন্মগ্রহণ করেন। হেয়ার স্কুল, হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ ও হিন্দু কলেজে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ইনি ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সৈন্যসংক্রান্ত হিসাববিভাগে প্রবেশ করেন এবং সুদীর্ঘকাল সুখ্যাতির সহিত রাজকার্য্য সম্পাদন করিয়া ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার ন্যায় পরোপকারী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, মধুরভাষী ও অমায়িক স্বভাব ব্যক্তি প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। দেশহিতকর সকল অনুষ্ঠানে ইঁহার সহানুভূতি আছে। ইনি এককালে হরিশ্চন্দ্রের 'হিন্দু পেট্রিয়ট,' কিশোরীচাঁদ মিত্রের 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ডে' ও গিরিশচন্দ্রের 'বেঙ্গলী'তে প্রস্তাবাদি লিখিতেন এবং কিছুদিন Oudh Gazette সম্পাদন করিয়াছিলেন। দেশে বিজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানের বিস্তারের জন্য ইঁহার বিশেষ আগ্রহ আছে। ইনি বহুকাল হইতে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানসভায় অবৈতনিক সহকারী সম্পাদকরূপে নিযুক্ত আছেন এবং সরকার মহাশয় কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত Journal of Medicine নামক পত্রের সহিত বহুদিন একজন নিয়মিত লেখকরূপে সংসৃষ্ট ছিলেন। এক্ষণে ইনি অন্ধ হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা জুন দিবসে হুগলী জিলার অন্তর্গত গরলগাছা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বেগের গাঙ্গুলী, হরিরাম গাঙ্গুলীর সন্তান। শৈশবে রুগ্ন থাকায় পাঠশালায় অতি অল্প শিক্ষা হয়। গ্রামের এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে একজন শিক্ষক যে সামান্য স্কুল চালাইতেন, তাহাতে শ্যামাচরণ বাবু পরে সামান্য ইংরাজী শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি উত্তরপাড়া গবর্ণমেণ্ট স্কুলে প্রবিষ্ট হন এবং এই সময় হইতে রীতিমত বিদ্যাশিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। উত্তরপাড়া স্কুলের তাৎকালীন প্রধান শিক্ষক প্রাতঃস্মরণীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের উপদেশে তিনি বিশেষ
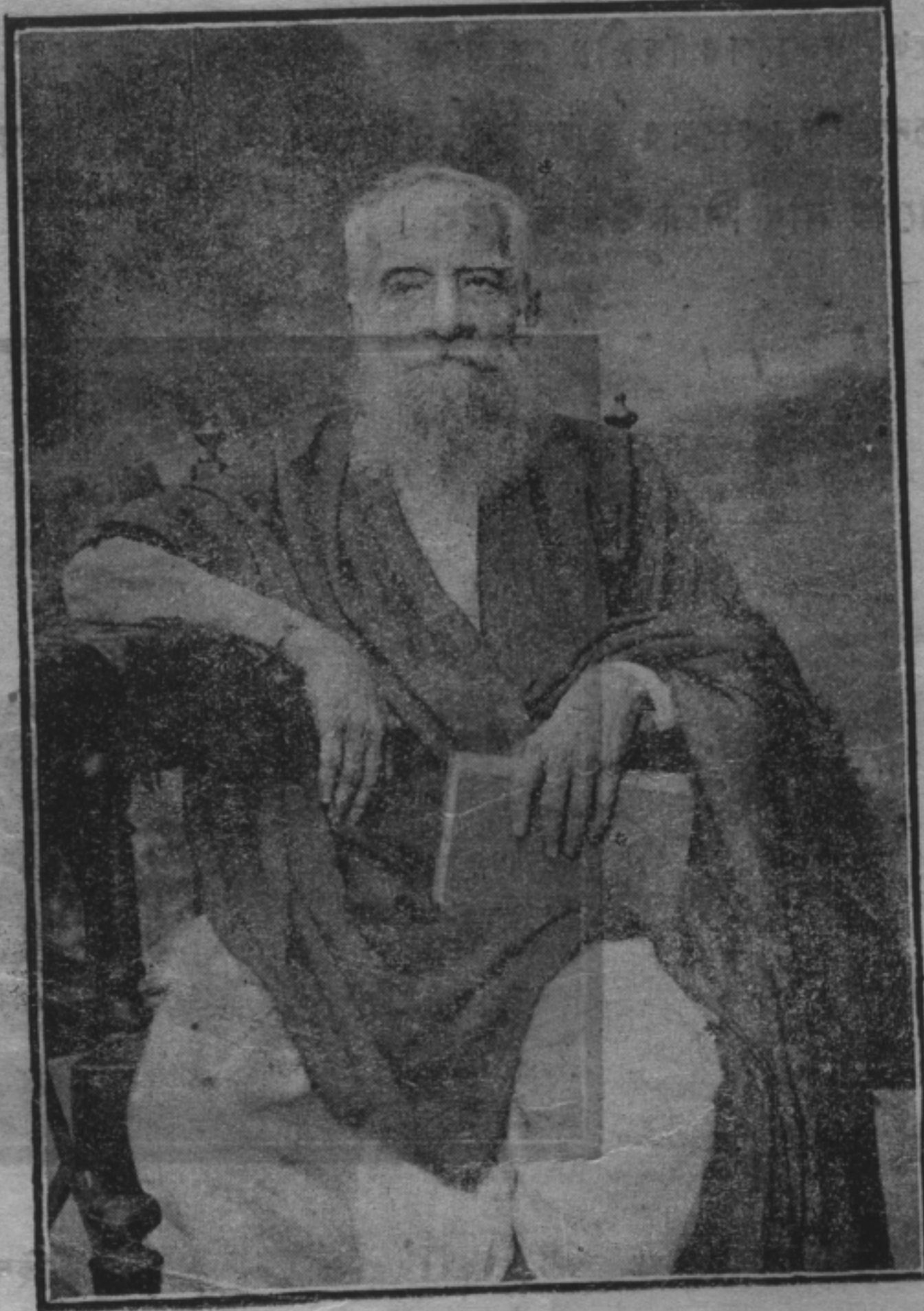
শ্রীযুক্ত নীলমণি কুমার

উপকৃত হন। পরে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি হিন্দু কলেজের স্কুল বিভাগের প্রথম শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। শ্যামাচরণ বাবু হিন্দু ও প্রেসিডেন্সী কলেজের এক উজ্জ্বল রত্ন। কলেজের সমস্ত পরীক্ষায়, জুনিয়র ও সিনিয়র পরীক্ষায় শ্যামাচরণ বাবু প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতেন। শরীর অসুস্থ হওয়ায় কলেজের চতুর্থ বার্ষিকী শ্রেণীতে পড়িতে পড়িতে ইনি কলেজ পরিত্যাগ করেন এবং সতীর্থ নীলমণিবাবু ও হেমচন্দ্রের ন্যায় সৈন্য-সংক্রান্ত হিসাব বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইনি বি-এ উপাধি পরীক্ষা দেন এবং প্রথম

বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। বি-এ উপাধি-লাভের পর ইনি প্রথমে জনাই স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক এবং পরে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাধানগরস্থিত ইঙ্গ-সংস্কৃত
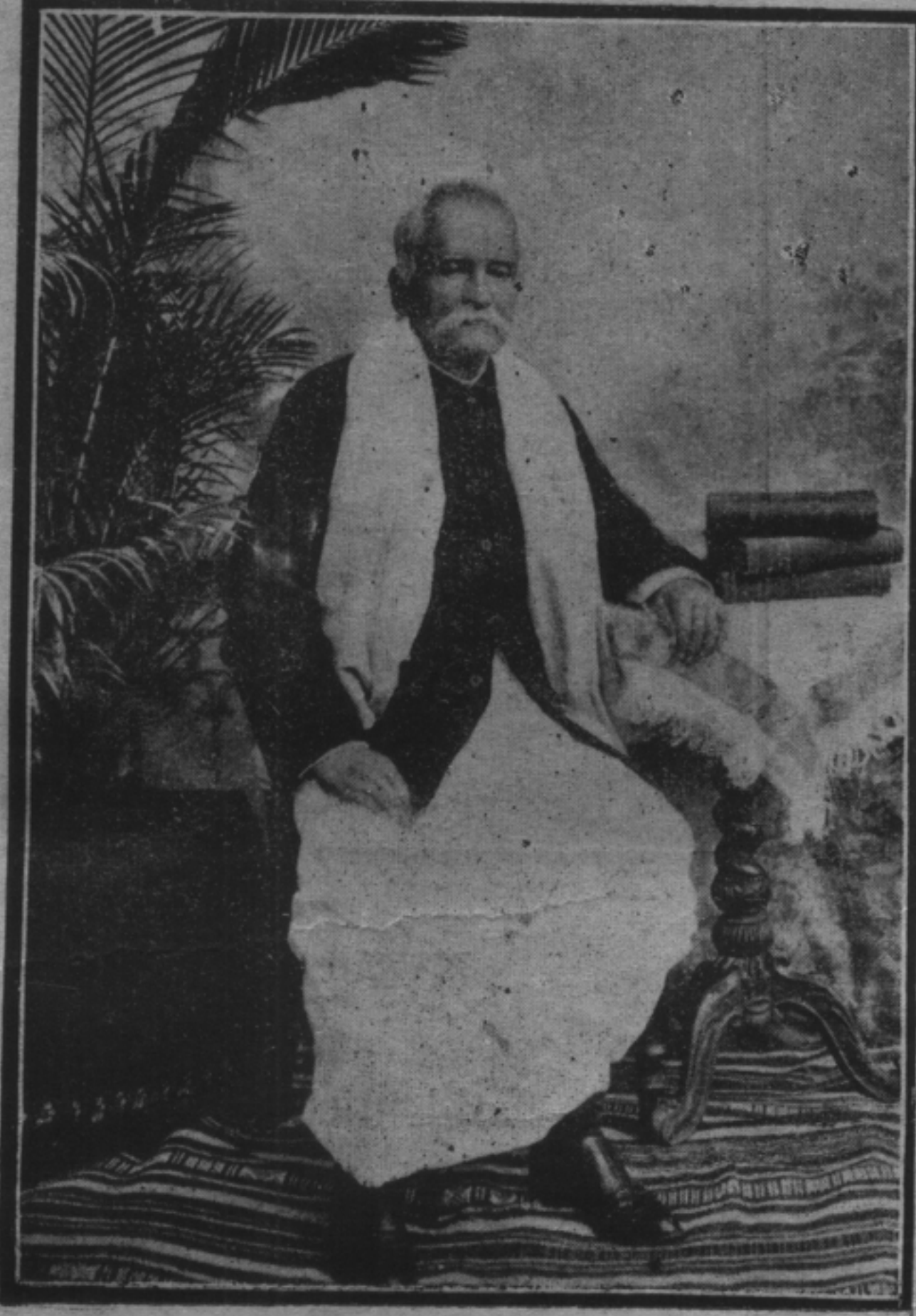
শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরূপে নিযুক্ত থাকেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ইনি মালদহ স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। মালদহের পর ক্রমান্বয়ে আরা জিলা স্কুলের ও ছাপরা জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইংরাজী বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং নয় বৎসরকাল যোগ্যতার সহিত উক্ত কার্য্য করেন। অতঃপর তিনি উত্তরপাড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। ঐ স্কুল ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে কলেজে পরিণত হইলে শ্যামাচরণবাবু উহার অধ্যক্ষ এবং পরিচালন-সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হন। ৩৪ বৎসর সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম করিয়া ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ইনি রাজকর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। যাঁহাদের অধীনে শ্যামাচরণবাবু শিক্ষা বিভাগে কর্ম্ম করিয়াছেন তাঁহারা সকলে একবাক্যে ইঁহার প্রশংসা করিয়াছেন এবং বাঙ্গালার শিক্ষাবিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর স্যর আলফ্রেড্ ক্রফ্ট্ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ২৯শে জানুয়ারি তারিখের একখানি পত্রে ইঁহার "Long and valuable services to the state"এর সমুচিত সুখ্যাতি করিয়াছেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে শ্যামাচরণবাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং পরে Member of the Board of Studies in Mental and Moral Science নিযুক্ত হন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ইনি 'অনারারী ফেলো' নিযুক্ত হইয়াছেন। 'কলিকাতা রিবিউ' নামক ত্রৈ-মাসিকে এবং 'মডার্ণ রিবিউ' ইংরাজী মাসিক-পত্রে ইনি অনেকগুলি সুচিন্তিত,সারগর্ভ ও গবেষণাপূর্ণ

তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সন্দর্ভ লিখিয়াছেন। শ্যামাচরণবাবু ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিলে হেমচন্দ্রের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। শ্যামাচরণবাবু অতি লাজুক ও 'মুখচোরা' ছিলেন এবং কাহারও সহিত মিশিতে ভাল-

বাসিতেন না। বিশেষতঃ বাল্যকাল হইতে তাঁহার শরীর অসুস্থ থাকায় তিনি সর্ব্বদাই বিষণ্ণভাবে থাকিতেন। হেমচন্দ্র উদ্যোগী হইয়া তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করেন। অনেকদিন পরে, কবিতা লিখিবার পর, হেমচন্দ্র শ্যামাচরণবাবুকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার "লজ্জাবতী লতা"র idea তিনি শ্যামাচরণ বাবুর প্রকৃতি হইতে পাইয়াছিলেন। বাস্তবিক যাঁহারা শ্যামাচরণবাবুর সহিত একদিনও আলাপ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই হেমচন্দ্রের রচিত নিম্নোদ্ধৃত পদগুলির যথার্থ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন :—

"হায় এই ভূমণ্ডলে, কত শত জন,
দণ্ডে দণ্ডে ফুটে উঠে অবনী মণ্ডল লুটে,
শুনায় কতই রূপ যশের কীর্ত্তন।
কিন্তু হেন ম্রিয়মাণ, সদা সঙ্কুচিত প্রাণ,
রমণী, পুরুষগণে কে করে যতন ?
স্বভাব মৃদুল ধীর, প্রকৃতিটী সুগম্ভীর,
বিরলে মধুরভাষী মানসরঞ্জন ,
কে জিজ্ঞাসি তাহাদের করে সম্ভাষণ ?
সমাজের প্রান্তভাগে, তাপিত অন্তরে জাগে,
মেঘে ঢাকা আভাহীন নক্ষত্র যেমন !"

শ্যামাচরণবাবু বলেন বাল্যকালে হেমচন্দ্রের সহিত তাঁহার এত ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল যে, অনেক শনিবারই হেমচন্দ্র তাঁহাকে তাঁহাদের খিদিরপুরের বাড়ীতে লইয়া যাইতেন। রবিবার সেখানে কাটাইয়া সোমবার পুনরায় একত্র বিদ্যালয়ে আসিতেন। হেমচন্দ্রের জননী শ্যামাচরণ বাবুকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। কবির 'প্রিয় জলাশয়' পদ্মপুকুরে উভয়ে একত্র সাঁতার দিতেন।

'জুনিয়র স্কলার্শিপ' পরীক্ষা।—১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্র 'জুনিয়র স্কলার্শিপ' পরীক্ষা দেন। উহা আজিকালিকার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা অপেক্ষা কঠিন ছিল। পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই হয়ত এই পরীক্ষা কিরূপ ছিল তাহা জানেন না। তাঁহাদের অবগতির জন্য এই পরীক্ষার পাঠ্য বিষয় ও পুস্তকাদির নাম নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

রামচন্দ্র মিত্র

ইংরাজী সাহিত্য—Goldsmith's Essays, Goldsmith's Traveller and Deserted Village.

" ব্যাকরণ—Crombie's Etymology and Syntax.

" দর্শন—Watts on the Improvement of the Mind.

ইতিহাস— Tytler's Elements of General History, from the commencement of the History of Greece to the effects of the discoveries of the Portuguese on the Commerce of Europe, in the 15th Century.

গণিত— Euclid, Books I to IV, Arithmetic and Algebra, as far as Simple Equations.

লওয়া হইত না। সুতরাং হেমচন্দ্রের বৃত্তি তাঁহাদের দরিদ্র সংসারে অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান করিয়াছিল।

তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। জুনিয়র স্কলার্শিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হেমচন্দ্র কলেজবিভাগে প্রবেশ করিলেন। এই সময় হিন্দু কলেজ 'প্রেসিডেন্সী কলেজে' পরিবর্ত্তিত হয়।

কলেজের প্রথমবার্ষিকী শ্রেণীতে পাঠকালে হেমচন্দ্র আর একজন "জীবনের বন্ধু" লাভ করেন। ইঁহার নাম তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। যখন "বাঙ্গালার আর্ণল্ড্" প্যারীচরণ সরকার বারাসত স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, তারাপ্রসাদ সেই সময় তাঁহার নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন এবং জুনিয়র স্কলার্শিপ লাভ করিয়া ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। তারাপ্রসাদ

কেশবচন্দ্র সেন

প্রাণীতত্ত্ব— Patterson's Zoology for Schools, Part I.

বাঙ্গালা— Sama Churn's Grammar.
Extracts from the Native Press of Calcutta, published by the Vernacular Literature Committee.

এই জুনিয়র স্কলার্শিপ পরীক্ষায় শ্যামাচরণবাবু প্রথম ও হেমচন্দ্র দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এবং উভয়েই দুই বৎসরের জন্য মাসিক দশ টাকা বৃত্তি পান। তখন বৃত্তিধারী ছাত্রগণের নিকট হইতে স্কুলের বেতন
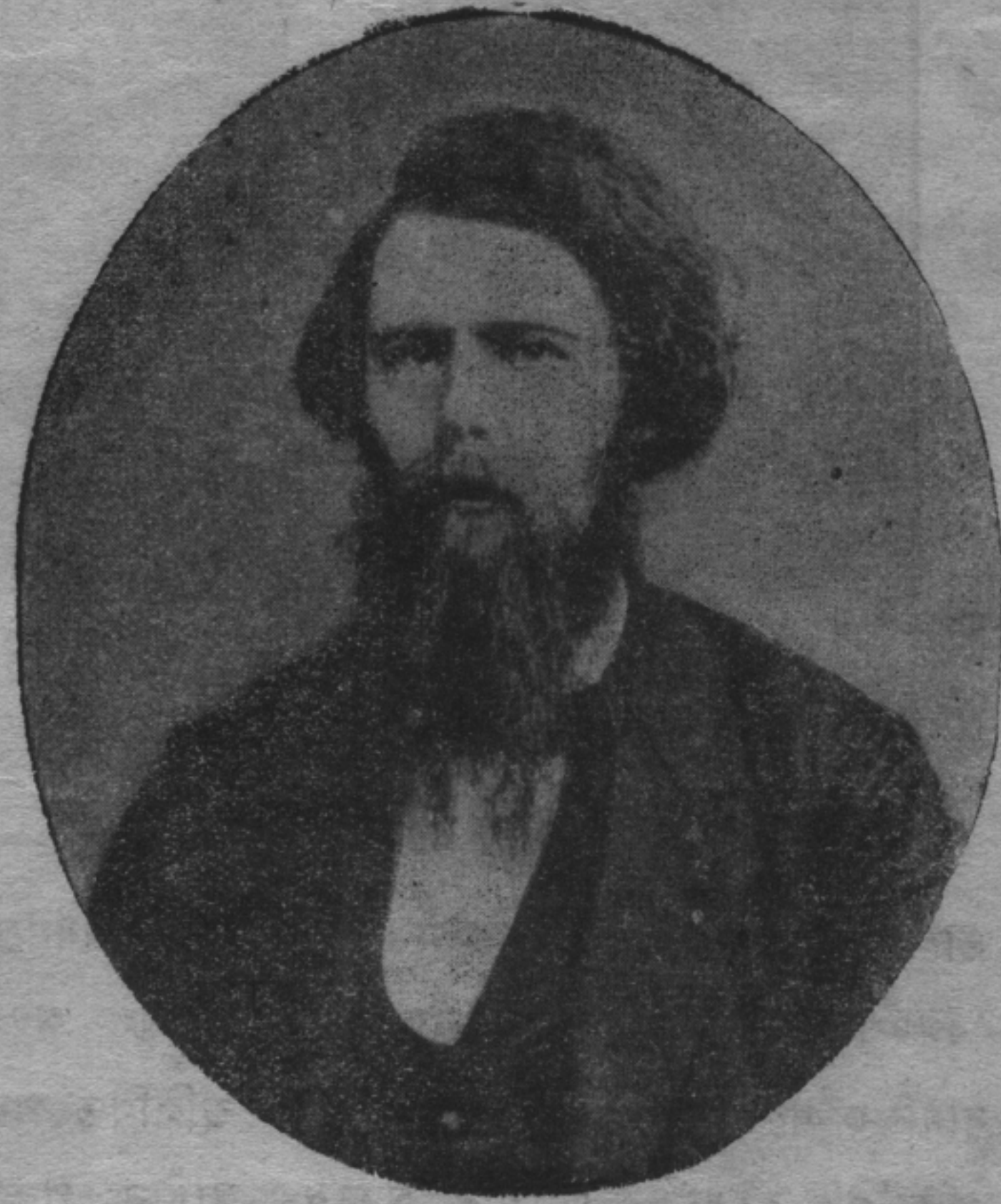
অধ্যাপক ই, বি, কাউয়েল

প্রেসিডেন্সী কলেজের এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার পরীক্ষায় ইনিই সর্ব্বপ্রথমে উত্তীর্ণ হন। বাঙ্গালা, ইংরাজী ও সংস্কৃত ব্যতীত ফ্রেঞ্চ, লাটিন ও গ্রীক্‌ প্রভৃতি অনেক ভাষায় ইঁহার অধিকার ছিল। ইনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন এব ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় সুলেখক বলিয়া অধিকতর খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বেথুন সোসাইটীতে ইনি 'চৈতন্যদেব' সম্বন্ধে যে ইংরাজী প্রবন্ধ পাঠ করেন, উক্ত সভায় সাহিত্যশাখার সভাপতি অধ্যাপক কাউয়েল উচ্চকণ্ঠে

হেমচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী কামিনী দেবী
(ক্রোড়ে কনিষ্ঠা কন্যা)

তাহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। পুরাতন পর্য্যায়ের 'বঙ্গদর্শনে,' অক্ষয়চন্দ্রের 'নবজীবনে' এবং অন্যান্য সাময়িক পত্রে ইহাঁর বহু সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইনি অত্যন্ত স্বাধীন প্রকৃতি ও নির্ভীকচেতা ছিলেন। স্যর জর্জ্জ ক্যাম্বেল প্রভৃতি সিবিলিয়ানগণ ইহাঁকে শ্রদ্ধা করিতেন। ইনি ঋষিকল্প ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। অল্প বয়সে তারাপ্রসাদের মৃত্যু হয়। হেমচন্দ্র, তারাপ্রসাদ ও শ্যামাচরণ বাবুর মধ্যে বিদ্যালয়ে প্রতিযোগিতা ছিল। কিন্তু তিন জনের পরস্পরের প্রতি বন্ধুপ্রীতিও অসাধারণ ছিল। তারাপ্রসাদের মৃত্যুর পর শ্যামাচরণ বাবু হেমচন্দ্রকে একটি শোক-গীতি (Elegy) লিখিতে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধের ফলে হেমচন্দ্র যে শোক-গীতি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধারযোগ্য—

জীবনের বন্ধু মম আর একজন
কালরূপ মহাসিন্ধু সলিলে ডুবিল!
এতকাল ছিলে সখে ভূতল-রতন—
এখন এ ভবে তব কি চিহ্ন রহিল?

হায়! না দেখিব আর সে প্রিয় মুরতি!
সে ভোলা পাগল মন আপনা বিস্মৃত,
সে পাণ্ডিত্য, একাগ্রতা, সে প্রগাঢ় স্মৃতি,
অনন্ত কালের মত হয়েছে নিভৃত!

প্রকৃতি, সখা হে, তব কি মধুর (ই) ছিল,
যখনি হেরিত হিয়া হরষে ভাসিত,
জানিতে না জীবনের প্রথা কি জটিল,
অবিরত জ্ঞানসুধা পানে বিমোহিত।

লভিলে কতই রত্ন বিদ্যার ভাণ্ডারে!
সে জ্ঞান-পিপাসা, হায় আছে ক'জনার?
আজীবন পর্য্যটন বাণীর বিহারে,
ভক্তচূড়ামণি, সখা ছিলে সারদার।

হৃদয়ে বড়ই ব্যথা রহিল আমার—
দু'জনে হ'লনা দেখা শেষের সে দিন,
ছড়াইতে তব নেত্রে নিবিড় আঁধার,
যেদিন শমন করে এ বিশ্ব মলিন।

আঁধার এ ভবরাজ্য তোমার নয়নে,
চিরদিন তরে রবি শশী লুকাইল!
ভবের কি কিছু তবে ভেবেছিলে মনে?
অথবা সে তমোজাল মানস (ও) ঢাকিল?

* * * *

মনে কি পড়িল সখা সেদিনের কথা,
বিদ্যার সমরক্ষেত্রে যৌবনে প্রথম,
যুঝেছি কজনে যবে সহপাঠী প্রথা?
লভিতে বিজয় কেতু কত বা উদ্যম?

মনে কি পড়িয়াছিল পূর্ব্বের সে সব?
দরিদ্র-বাসনা যত হৃদে হ'ত লীন?
আশার আশ্বাসপূর্ণ বাঁশরীর রব?
সুদূরে মধুর কিবা আকাঙ্ক্ষার বীণ?

মনে কি পড়িল, হায় সংসার সোপানে
উঠিতে কতই ক্লেশ হরিষে বিষাদ,
হাসি কান্না সেকালের বসিয়ে নির্জ্জনে,
রহস্য কৌতুক কত অমৃত আস্বাদ।

দরবিগলিত অশ্রু নয়নে আমার।
সেই সব ভাব আজি হৃদয়ে উঠিছে;
বিভাবরী কোলে যেন শত তারকার
মৃদুরশ্মি ধীরে ধীরে আঁধারে ছুটিছে!

কোথায় গিয়াছ ভাই কিছুই জানি না,
অজ্ঞাত সে দেশ নরে জানে না কেহই,
প্রবেশিয়া কেহ তায় কভু ত ফেরে না,
প্রবেশ করিছে পান্থ অজস্র কতই।

যেখানেই থাক, সখে, থাক যেই ভাবে,
তমের আঁধার কিবা দিবার কিরণে,
আমাদের চিত্তমাঝে নিত্য বিরাজিবে,
আছিলে ধরণী পরে যেরূপ ধরণে।

সাঙ্গ না হইল হায় জীবনের ব্রত,
ডুবিল দেহের তরী ফুরাল সকলি!
ভাসিতে সাগর-নীরে তরঙ্গ-তাড়িত,
সমপাঠী এবে দুটি * রহিনু কেবলি!

অন্ধ এ জগৎ, সখা, ধরণীভূষণ
মানব যাহারা, তারা দুলক্ষ্য মহীর!
যশের কিরণ করে মুকুটে ধারণ
চক্রী, চাটুকার ভণ্ড কত অবনীর!

অন্ধ এ জগৎ তোমা চিনিবে কি? হায়,
চিনি ত আমরা—ছিলে ভবের ভূষণ!
আমরা সখা হে, সবে পূজিব তোমায়,
হৃদয় মন্দিরে করি প্রতিমা স্থাপন।

প্রাণের বিগ্রহ হেন রাখিব যতনে,
জ্বালি স্মৃতিরূপ দীপ করিব অর্চ্চন,
প্রণয়ের ভক্তি সহ বিহ্বলিত মনে
দিব অর্ঘ্য প্রেম পুষ্প সজল নয়ন!—
মধুর পবিত্রভাব—বন্ধুর স্মরণ!

সিনিয়র স্কলার্শিপ পরীক্ষা। কলেজে। দুই বৎসর পড়িলে সেকালের ছাত্রগণ সিনিয়র স্কলার্শিপ পরীক্ষা দিবার অধিকার পাইতেন। এই পরীক্ষা আজি কালিকার I. A. ও I. Sc. পরীক্ষার অনুরূপ ছিল—বোধ হয় কিছু কঠিন ছিল, কারণ, ছাত্রগণকে অনেকগুলি বিষয় পড়িতে হইত। এই পরীক্ষায় যাঁহারা উচ্চ স্থান অধিকার করিতেন তাঁহারা দুইবৎসরকাল মাসিক ২৫৲ বৃত্তি পাইতেন এবং কলেজে বিনাবেতনে শিক্ষা সমাপ্ত করিতে পারিতেন। হেমচন্দ্র এই বৃত্তি লাভের জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিলেন, কারণ এই বৃত্তির উপর তাঁহাদের সাংসারিক উন্নতি নির্ভর করিতেছিল। তাঁহার পিতা ইংরাজী জানিতেন না, মাতাও শিক্ষিতা রমণী ছিলেন না, কিন্তু তাঁহারা জানিতেন পুত্রকে সুশিক্ষিত করিতে পারিলেই তাঁহাদের সকল কষ্ট দূর হইবে এবং তাঁহারা স্নেহ ও আগ্রহপূর্ণ নয়নে অধ্যয়ন-রত পুত্রের মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিতেন এবং নীরবে মঙ্গলময়ের নিকট সন্তানের কল্যাণকামনা করিতেন। এই বিষয়ে হেমচন্দ্রের মধ্যম জামাতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, হেমচন্দ্রের জননীর নিকট শ্রুত এই গল্পটি আমাদিগকে জানাইয়াছেন:—"কৈলাসচন্দ্র ইংরাজী কিছুই জানিতেন না। পুত্রেরা ইংরাজী পড়িত, কি পড়িত তাহা তিনি কিছুই বুঝিতেন না; তথাপি, রাত্রিতে তাঁহারা যতক্ষণ পর্য্যন্ত পড়িতেন ততক্ষণ পিতা মাতা উভয়েই

* হেমচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়।

পুত্রদের দুই পার্শ্বে বসিয়া কখনও তাহাদের গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেন, কখনও বা মশা তাড়াইয়া দিতেন, আর কখনও বা পাখার বাতাস করিতেন। পিতা মাতা আহার নিদ্রা ভুলিয়া পুত্রদের পাশে বসিয়া থাকিতেন। এই ভাবে কতদিন যে রাত্রি ১টা ২টা বাজিয়া যাইত তাহার সংখ্যা ছিল না।”

অবশেষে হেমচন্দ্রের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের পুরস্কার মিলিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিনিয়র স্কলার্শিপ পরীক্ষায় হেমচন্দ্র চতুর্থ স্থান অধিকার করিলেন এবং দুই বৎসরের জন্য ২৫৲ মাসিক বৃত্তিলাভ করিলেন। গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্ট হইতে এই পরীক্ষায় সিনিয়র স্কলার্শিপপ্রাপ্ত ছাত্রগণের নামের তালিকা উদ্ধৃত হইল—

নাম	কলেজ	বৃত্তিলাভের তারিখ	বৃত্তির মূল্য	কতদিনের জন্য	মন্তব্য
১। তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	প্রেসিডেন্সী	এপ্রিল ১৮৫৭	২৫৲	২ বৎসর	ইতিহাস ও ভূগোলে বিশেষ ব্যুৎপত্তি এবং অন্যান্য বিষয়ে পারদর্শিতা।
২। শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী	”	”	”	”	সকল বিষয়ে ব্যুৎপত্তি।
৩। ললিতবল্লভ শীল	”	”	”	”	বিজ্ঞানে পারদর্শিতা এবং সকল বিষয়ে ব্যুৎপত্তি।
৪। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	”	”	”	”	সকল বিষয়ে পারদর্শিতা।
৫। যাদবচন্দ্র দে	”	”	”	”	”
৬। গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	”	”	”	”	”
৭। কালীমোহন গুপ্ত	”	”	”	”	”
৮। লালগোপাল দত্ত	”	”	”	১ বৎসর	”
৯। বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়	”	”	”	”	”
১০। নীলমণি কুমার	”	”	”	”	”

উপরি উদ্ধৃত তালিকা প্রদত্ত নামগুলির মধ্যে তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নীলমণি কুমার মহাশয়গণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। হেমচন্দ্রের অন্যান্য সহপাঠিগণের বিষয়ে দুই একটি কথা এই স্থানে উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

হেমচন্দ্রের অন্যান্য সহপাঠিগণ। ললিতবল্লভ শীল ইংরাজীতে “ললিতবল্লভ শীল” এই নামে স্বাক্ষর করিতেন। ইনি সহপাঠীদিগের মধ্যে গণিত ও বিজ্ঞানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। কলেজের চতুর্থ বার্ষিকী শ্রেণীতে পাঠকালে ইঁহার অকাল মৃত্যু হয়। সপ্তাহে একদিন ছাত্রগণকে জরীপ-বিদ্যা-শিক্ষক প্রফেসর রো’র নিকট ড্রয়িং শিখিতে হইত। ললিতবল্লভ চমৎকার অঙ্কনবিদ্যা শিখিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অঙ্কিত চিত্রের নিম্নে N. B. Seal স্বাক্ষর করিতেন বলিয়া রো সাহেব তাঁহাকে Nota Bene Seal বলিয়া ডাকিতেন। তিনি যখন তখন বাঙ্গালা ছড়া রচনা করিতে পারিতেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্র একদিন হিন্দুছাত্রগণের গোমাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে লিখিত মিষ্টার উইল্‌সনকৃত একটি কবিতার আবৃত্তি করিতেছিলেন—

O Ye Hindus, have ye heard
What hath recently occurred ?
The Hindu eateth beef,
  The Hindu eateth beef.

ললিতবল্লভ তৎক্ষণাৎ তাহার তর্জ্জমা করিয়া শুনাইলেন—

শুনরে ভাই হিন্দুগণ
কি হয়েছে কীর্ত্তন,
গোরু খেয়েছে হিঁদু
গোরু খেয়েছে হিঁদু।

রামচন্দ্র মিত্রকে ছাত্রগণ বড় মানিত না। ইংরাজ অধ্যাপকগণের নিকট রামচন্দ্র * একজন পরম পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু ছাত্রগণ তাঁহার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করিত। রামচন্দ্র মধ্যে মধ্যে ছাত্রগণকে কবিতা রচনা শিখাইবার জন্ত একটি দ্বিপদীর প্রথম চরণ উচ্চারণ করিয়া দ্বিতীয় চরণ পূরণ করিতে বলিতেন। একদিন তিনি প্রথম চরণ আবৃত্তি করিলে, ললিতবল্লভ তাঁহার দিকে তর্জ্জনী ঈষদ্‌ভাবে হেলাইয়া এমন ভঙ্গীতে দ্বিতীয়পাদ পূরণ করিয়া বলিলেন যে,

"পরম পণ্ডিত তুমি ভারত ভিতর—"

যে সহপাঠিগণের পক্ষে হাস্যসম্বরণ করা অসাধ্য হইয়াছিল।

যাদবচন্দ্র দে পরে সবজজ্ হইয়াছিলেন। গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বোর্ডের ওপিয়ম ডিপার্টমেণ্টের হেড্ আসিষ্টাণ্ট হইয়াছিলেন। কালীমোহন দাসগুপ্ত হেমচন্দ্রের ন্যায় হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল হইয়াছিলেন এবং বাগ্মী বলিয়াও খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। অল্প বয়সে ইহাঁর মৃত্যু হয়। লালগোপাল দত্ত হাটখোলার বিখ্যাত দত্তবংশসম্ভূত এবং ভবানীচরণ দত্তের ভ্রাতা ছিলেন। বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় হাইকোর্টের চীফ্ ইণ্টারপ্রেটার হইয়াছিলেন।

হেমচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই সদালাপী ও বন্ধুবৎসল ছিলেন। সকল সহপাঠীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। শিক্ষকগণের প্রতি হেমচন্দ্র শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন এবং ছাত্রজীবনে কখনও কোন অন্যায় আচরণ করেন নাই। কেবল একবার মাত্র ইহার কিছু ব্যতিক্রম হইয়াছিল। সে ঘটনাটী হেমচন্দ্রের সতীর্থগণের নিকট যেরূপ শুনিয়াছি সেইভাবে নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

একটি অন্যায় আচরণ। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রামচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পাণ্ডিত্য এবং অধ্যাপনাপ্রণালী সম্বন্ধে ছাত্রগণের উচ্চ ধারণা ছিল না। হেমচন্দ্রের একজন সহপাঠী ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য * একদিন রামচন্দ্রের অযোগ্যতার প্রমাণসমর্থক দৃষ্টান্তাদির উল্লেখ করিয়া একটি আবেদনপত্র প্রস্তুত করিলেন এবং উহাতে সকল সহপাঠীর স্বাক্ষর সংযুক্ত করিয়া কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ সাটক্লিফ সাহেবের নিকট প্রেরণ করিলেন। হেমচন্দ্রও সকলের সহিত উহাতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। আবেদনপত্র পাইয়া সাটক্লিফ সাহেব মহাক্রোধান্বিত হইলেন। হেমচন্দ্র সম্বন্ধে সাটক্লিফ সাহেবের খুব ভাল ধারণা ছিল এবং হেমচন্দ্র বৃত্তি পাইবার পূর্ব্বে সাটক্লিফ স্বয়ং তাঁহার স্কুলের বেতন পর্য্যন্ত দিতেন। শ্যামাচরণ বাবু বলেন যে, সাটক্লিফ্‌কে ক্রুদ্ধ দেখিয়া হেমচন্দ্র অতিশয় ভীত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক সাটক্লিফ সাহেব এত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি আবেদনকারী ছাত্রগণকে কলেজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। ছাত্রগণ উপায়ান্তর না দেখিয়া ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের শরণাপন্ন হন। ভূদেব বাবু রামচন্দ্র মিত্রকে ছাত্রগণের অপরাধ ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিলে, রামচন্দ্র ছাত্রগণকে মার্জ্জনা করেন এবং তাহাদিগকে শাস্তিপ্রদান না করিতে সাটক্লিফকে অনুরোধ করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বৎসর প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষা গৃহীত হইলে হেমচন্দ্র পরীক্ষা প্রদান করেন এবং সসম্মানে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

---

* শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তৎপ্রণীত "আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস" নামক মনোরম গ্রন্থে রামচন্দ্র মিত্রসম্বন্ধে অনেকগুলি কৌতুকাবহ গল্প লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।—লেখক।

* ইনি পরে ইঞ্জিনিয়ার হইয়াছিলেন।

তর্কসভা। "শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিত।"—হেমচন্দ্র কলেজে যে শ্রেণীতে পড়িতেন, (রায় বাহাদুর) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,কেশবচন্দ্র সেন ও (স্যর) চন্দ্রমাধব ঘোষ তাহার অব্যবহিত উচ্চশ্রেণীতে এবং (স্যর) রমেশ-চন্দ্র মিত্র, (রায় বাহাদুর) কালিকাদাস দত্ত ও (রাজা) প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় তাহার অব্যবহিত নিম্নশ্রেণীতে পড়িতেন। হেমচন্দ্র যে বৎসর জুনিয়র স্কলার্শিপ পরীক্ষা দেন, সেই বৎসর কেশবচন্দ্র কলেজের বার্ষিক পরীক্ষার সময় অপর এক ছাত্রের উত্তরপত্র নকল করিতেছিলেন বলিয়া পরিদর্শক কর্ত্তৃক ধৃত ও অপমানিত হন।* কেশবচন্দ্রকে কলেজ হইতে চিরবহিস্কৃত করিয়া দিবার প্রস্তাব হয়, কিন্তু কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সুপারিষে তাঁহাকে অতিরিক্ত ছাত্ররূপে কলেজে পাঠ করিবার অনুমতি প্রদান করা হয়। এই ঘটনার পর কেশবচন্দ্র আর কখনও কোন পরীক্ষা প্রদান করেন নাই—কিন্তু অতিরিক্ত ছাত্ররূপে কলেজে উচ্চতম শিক্ষা লাভ করেন। দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং দর্শনের অধ্যাপক কেশবচন্দ্রকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। শ্রীযুক্ত নীলমণি কুমার মহাশয় বলেন যে,যখন তিনি ও হেমচন্দ্র কলেজের তৃতীয় বার্ষিকী শ্রেণীতে পড়েন তখন কেশবচন্দ্র তাঁহাদিগের সহিত দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। কেশবচন্দ্রকে সহপাঠিগণ সকলেই ভালবাসিতেন। এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র কলেজে একটি তর্কসভার প্রতিষ্ঠা করেন। কেশবচন্দ্র এই সভার সম্পাদক ছিলেন। কলেজের অধ্যাপকগণ, রেভারেণ্ড জেমস্ লঙ্, এবং কলিকাতার তদানীন্তন লর্ড বিশপ কটনের Domestic Chaplain মিষ্টার বার্ণ এই সভার কার্য্যে বিশেষভাবে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। কেশবচন্দ্র, তারাপ্রসাদ, নীলমণি বাবু ও শ্যামাচরণ বাবু প্রভৃতি এই সভায় মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধাদি পাঠ করিতেন। হেমচন্দ্রও এই সভায় "শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিত" বিষয়ক একটি ইংরাজী প্রস্তাব পাঠ করিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি এত সুন্দর হইয়াছিল যে রেভারেণ্ড লঙ্ উহা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। 'বেঙ্গল হরকরা'র তাৎকালীন সম্পাদক মিষ্টার ফর্ব্‌স্ উচ্চকণ্ঠে এই প্রবন্ধের প্রশংসা করেন এবং খ্রীষ্ট ও কৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশের সৌসাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়া একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন।

শিক্ষকগণের প্রভাব। হেমচন্দ্রের চরিত্র-গঠনে যে সকল শিক্ষক মঙ্গলময় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অধ্যাপক কাউয়েল ও অধ্যক্ষ ক্লিণ্টের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অধ্যাপক কাউয়েল ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এতদ্দেশে আগমন করেন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে ইতিহাস ও অর্থনীতির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ, ত্যাগ করিলে কাউয়েল পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের উপর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ইংরাজী ভাষায় অধ্যাপক কাউয়েলের একটি সুলিখিত জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। ম্যাক্সমুলর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাঁহার পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার বিষয় বিশেষভাবে বলা নিষ্প্রয়োজন। হেমচন্দ্র কাউয়েলের একজন প্রিয় ছাত্র ছিলেন এবং তাঁহার উপদেশে যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিলেন।

অধ্যক্ষ সাটক্লিফ্ অবসর গ্রহণ করিলে মিষ্টার এল্, ক্লিণ্ট তাঁহার পদে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন। ইনি অতি সাধু ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছাত্রগণের চরিত্রের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতেন এবং তাহাদের চরিত্রগঠনে সহায়তা করিতেন। হেমচন্দ্রের একজন সহপাঠী বলেন হেমচন্দ্র বলিতেন যে তিনি ভবিষ্যতে হাইকোর্টের উকীল হইয়া কখনও অর্থলাভের জন্য যে অসাধু উপায় অবলম্বন করেন

* শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে এবং প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কেশবচন্দ্র সেনের ইংরাজী জীবন চরিতে এই ঘটনার ইঙ্গিত আছে।—লেখক।

নাই—তাহা ক্লিণ্ট-প্রদত্ত শিক্ষার ফল। সকল ছাত্রই ক্লিণ্টকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং ক্লিণ্ট কঠোর শাসননীতির পক্ষপাতী হইলেও নিরন্তর তাহাদিগের মঙ্গল চেষ্টা করিতেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ।— পাঠ্যাবস্থায় বাঙ্গালা কাব্যাদি পাঠে হেমচন্দ্রের বিশেষ অনুরাগ ছিল। শ্রীযুক্ত নীলমণি কুমার মহাশয় বলেন যে হেমচন্দ্র প্রায়ই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ-প্রভাকর' পাঠ করিতেন এবং বোধ হয় 'প্রভাকরে'র জন্য দুই একটি কবিতাও লিখিয়া থাকিবেন। হেমচন্দ্র ভারতচন্দ্রের একজন অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে একবার হেমচন্দ্রের খিদিরপুরস্থ ভবনে লইয়া গিয়া হেমচন্দ্রই তাঁহাকে প্রথম ভারতচন্দ্রের কাব্য পড়াইয়াছিলেন। উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা কাব্যাদি পাইলে হেমচন্দ্র তাহা সাগ্রহে বারম্বার পাঠ করিতেন। নীলমণি বাবু বলেন, একবার তিনি হেমচন্দ্রকে রামেশ্বরের শিবসঙ্কীর্ত্তন পাঠ করিতে দেন। হেমচন্দ্র উহা পাঠ করিয়া বলেন, "রামেশ্বর is a genuine poet" এবং এত আনন্দিত হন যে নীলমণি বাবুকে বলেন, তিনি যেন ঐ পুস্তক ফেরত পাইবার আশা না করেন। কাশীরাম ও কৃত্তিবাস হেমচন্দ্র বহুবার পাঠ করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র কাশীরামের নিকট তাঁহার অশেষ ঋণের কথা, শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বন্ধুগণের নিকট পরে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন।

শ্যামাচরণ বাবু চিরদিনই চলিতভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী। হেমচন্দ্র রচনায় সাধুভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। বিদ্যালয়ে পাঠকালে একদা শ্যামাচরণ বাবু হেমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন, "সাধুভাষায় বাদুড়কে কি বলিবে?" রহস্যপ্রিয় হেমচন্দ্র হাসিতে হাসিতে তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, "কেন—বদ্ধড় !"

ভাষা সম্বন্ধে শ্যামাচরণ বাবুর সহিত হেমবাবুর মধ্যে মধ্যে তর্ক হইত। কলেজ পরিত্যাগের পর শ্যামাচরণ বাবু হিন্দী ও হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা করিয়া হেমচন্দ্র ও আর দুই চারিজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সহিত ভারতবর্ষময় হিন্দীর প্রচার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহেন। শ্যামাচরণ বাবুর মত ছিল যে হিন্দীভাষা ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষা হওয়া উচিত। বাঙ্গালা ভাষায় অনুরাগী হেমচন্দ্র হিন্দীর একাধিপত্য স্থাপনের বিরোধী হইয়াছিলেন। তর্ক করিতে করিতে একবার শ্যামাচরণ বাবুর প্রস্তাবে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, সুবিধা দেখিতে গেলে হিন্দী না হইয়া ইংরাজীই ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা হওয়া উচিত।

কেরাণীগিরি। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কলেজের চতুর্থ বার্ষিকী শ্রেণীতে পাঠ সমাপ্ত করিয়া হেমচন্দ্র কলেজ পরিত্যাগ করেন। কলেজের ২৫৲ ছাত্রবৃত্তি দুই বৎসরের জন্য দেওয়া হইয়াছিল, তাহা বন্ধ হওয়ায় তাঁহাকে চাকুরীর চেষ্টা করিতে হইল। সতীর্থ নীলমণি কুমার তৃতীয় বার্ষিকী শ্রেণীতে পড়িতে পড়িতে কলেজ পরিত্যাগ করিয়া সৈন্যসংক্রান্ত হিসাব বিভাগে (Military Auditor General's Office) প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেকালে এই সকল আফিসে বাঙ্গালী কেরাণীরা বেশী বেতন পাইতেন না। হিন্দু পেট্রিয়টের স্বনামধন্য সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও গিরিশচন্দ্র ঘোষই সর্ব্বপ্রথমে এই বিভাগে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া উচ্চপদ অধিকৃত করেন এবং বাঙ্গালী কেরাণীর পক্ষে সেই সকল পদপ্রাপ্তি সম্ভব করিয়া দেন। নীলমণি বাবু আফিসের রেজিষ্ট্রার রবার্ট হলিংবেরীর সহকারী ও প্রিয়পাত্র ছিলেন। এই সময়ে, অর্থাৎ সিপাহীযুদ্ধের অবসানের অব্যবহিত পরেই, এই বিভাগে অনেক কর্ম্মচারীর আবশ্যকতাও ছিল। সুতরাং নীলমণি বাবুর সাহায্যে উচ্চশিক্ষিত হেমচন্দ্র অনায়াসেই এই বিভাগে ৩৫৲ বেতনের একটি কেরাণীর পদ লাভ করিতে সমর্থ হইলেন। হেমচন্দ্র, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহকারী রূপে নিযুক্ত হইলেন। এই পদপ্রাপ্তিতে হেমচন্দ্রের পরিবারের অর্থকষ্ট কিছু ঘুচিল। কিছুদিন পরে সহপাঠী শ্যামাচরণ বাবুও এই আফিসে প্রবেশ করেন।

বি-এ উপাধিলাভ। সংসারের দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য অল্পবয়সেই হেমচন্দ্রকে চাকুরী গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু বিদ্যালয় পরিত্যাগের সহিত হেমচন্দ্রের জ্ঞানানুরাগ কিছুমাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। হেমচন্দ্র আজীবন বিদ্যালয়ের ছাত্রের মত বিদ্যানুশীলন করিতেন। সকল সময়েই তাঁহার হস্তে কোন না কোন পুস্তক থাকিত। এমন কি, প্রৌঢ় বয়সে আহারের সময়েও তিনি অনেক সময় পুস্তক খুলিয়া পড়িতে পড়িতে আহার করিতেন। এজন্য আহার করিতে তাঁহার বিলম্ব হইত। মিলিটারী অডিটর জেনারেলের অফিসে যখন হেমচন্দ্র কেরাণীর কায করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার ধনী প্রতিবেশী ও বাল্যবন্ধু শ্রীশচন্দ্র এবং সতীর্থ তারাপ্রসাদ নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিবিদ্যালয়ের বি-এ উপাধি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। হেমচন্দ্র পূর্ব্বেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন এবং তৎকাল-প্রচলিত নিয়মানুসারে তিনি বি-এ পরীক্ষা প্রদানের অধিকারী ছিলেন। তিনি অবিচলিত উৎসাহ ও অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে অবসর কালে বি-এ পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তকাদি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের বি-এ পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল, দশজন ছাত্র সেই বৎসর বি-এ উপাধিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ তিনজন ছাত্রের মধ্যে তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রথম, হেমচন্দ্র দ্বিতীয় ও ভোলানাথ পাল তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। শ্রীশচন্দ্র দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। শ্যামাচরণ বাবু অসুস্থতাবশতঃ এই বৎসর পরীক্ষা দিতে পারেন নাই। ইহার পূর্ব্বে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আর একবার মাত্র বি-এ পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল এবং সে বৎসর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু এই দুইজন মাত্র ছাত্র দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, কেহই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। হেমচন্দ্রের সময়ে বি-এ পরীক্ষায় অনেকগুলি বিষয় পাঠ করিতে হইত। কৌতূহলী পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা এই বৎসরের বি-এ পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তকাদির ও পরীক্ষকগণের নাম নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

ইংরাজী সাহিত্য— (পরীক্ষক জি. স্মিথ এবং ই. বি. কাউয়েল)	Milton's Paradise Lost, Books I to VI. Pope's Essay on Criticism. Gray (as in Richardson's Selections) Defœ's History of the Plague. Macaulay's Essays—War of Succession in Spain, William Pitt, The Earl of Chatham.
বাঙ্গালা— (পরীক্ষক রামচন্দ্র মিত্র)	প্রবোধ-চন্দ্রিকা। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ১ম, ২য় ও ৩য় কাণ্ড।
ইতিহাস— (পরীক্ষক জি. গ্রেভ্‌স্ এবং মেজর ডব্লিউ. এস্. শারউইল)	Principles of Historic Evidence as in Isaac Taylor's two works on the subject and other similar works. History of England, including that of British India, to the end of 1815. Elphinstone's History of India Ancient History, with special reference to the History of Greece, to the death of Alexander; the History of Rome, to the death of Augustus and the History of the Jews. (Historical questions will include the Geography of the countries to which they refer).

গণিত— (পরীক্ষক ডব্লিউ. এস্. এটকিন্সন্)	Arithmetic and Algebra. Geometry Books I-VI & XI. Plane Trigonometry. Mechanics. Hydrostatics. Hydraulics and Pneumatics. Optics. Astronomy.
বিজ্ঞান— (পরীক্ষক ডাক্তার ডব্লিউ. ক্রোজিয়ার)	Chemistry. Animal Physiology. Physical Geography.
দর্শন— (পরীক্ষক আর্. এল্. মার্টিন)	Logic (Whately) Moral Philosophy (as in Wayland, Abercrombie or similar works) Mental Philosophy (as in Abercrombie, Dr. Payne or similar works).

হিসাব-বিভাগের কেরাণীর 'হাড়ভাঙ্গা খাটুনী'র উপর এইরূপ দুরূহ পরীক্ষা প্রদান করিয়া প্রথম বিভাগে উচ্চস্থান অধিকার করা হেমচন্দ্রের অবিচলিত অধ্যবসায় ও অপূর্ব্ব কৃতিত্বের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

বিবাহ। তৎকালপ্রচলিত প্রথানুসারে কৈশোরে ছাত্রাবস্থাতেই হেমচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল। শ্যামাচরণবাবু বলেন যখন কলেজের প্রথমবার্ষিকী শ্রেণীতে তিনি পড়িতেন (১৮৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দ) এবং হেমচন্দ্রের সহিত প্রায় প্রতি সপ্তাহে তাঁহার খিদিরপুরস্থ ভবনে বেড়াইতে যাইতেন, তখনই হেমচন্দ্র বিবাহিত। হেমচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী কামিনী দেবী ভবানীপুর নিবাসী কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়ের অন্যতমা দুহিতা। তিনি শিক্ষাহীনা ও অল্পবুদ্ধি হইলেও, অতিশয় সুন্দরী, সরলা, ধর্ম্মপরায়ণা ও পতিব্রতা রমণী ছিলেন। বিদ্যাবুদ্ধিতে প্রতিভাশালী হেমচন্দ্রের উপযুক্ত না হইলেও, হৃদয়ের গুণে তিনি তাঁহার উদার-হৃদয় স্বামীর সম্পূর্ণ যোগ্যা ছিলেন। বলা বাহুল্য, হেমচন্দ্র এই 'কামিনী'-কুসুমের মর্য্যাদা বুঝিতেন,

> "কোথা হেন শতদল,
> হৃদে পূরি পরিমল,
> থাকে প্রিয়মুখ চেয়ে মধুমাখা সরমে ?"—

এবং জীবনের মধুর উষায় এই জীবন-সঙ্গিনীর হস্তধারণ করিয়াই অনেক আকাঙ্ক্ষা ও সুখস্বপ্ন লইয়া হেমচন্দ্র সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলেন :—

> "প্রবেশি সংসারে যবে, কি সুখের কাল !
> প্রকৃতির বুকে যেন সুবর্ণের জাল
> যতনে জড়ান ছিল—জড়ান তাহাতে
> কত মোহকর চিত্র নয়ন জুড়াতে !
> কিবা নিদ্রা, কি স্বপন, কিবা সে জাগিয়া
> সকলি নিরখি বুক উঠিত নাচিয়া ;
> ছুটিয়া বেড়াত প্রাণ আশার খেলায়,
> ভাবিয়া মানসে এই তরুণী-লতায় !"

ক্রমশঃ

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

আড়াই চাল

(উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ছেলেবেলা হইতে তীক্ষ্ণবুদ্ধিমত্তার খ্যাতি-প্রশংসার 'আওতায়' বাড়িয়া, অমলের বুদ্ধির ধারটা, বাস্তবিকই কিছু অনন্যসাধারণ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাতে চেহারাটি ছিল পিতৃমাতৃদত্ত নামের সম্পূর্ণ উপযুক্ত, সুতরাং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শান্ত গম্ভীর স্বভাব পিতার অগোচরে এবং স্বভাবতঃ নিরীহ ভালমানুষ মাতার অসংযত প্রশ্রয়ে সে অল্পে অল্পে সৌখীন বিলাসচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিল। তবে প্রশংসাহানির ভয়ে সে পড়াশুনায় কখনও অবহেলা করিত না। এবং সেই একমাত্র সর্ব্বদোষহর সুনামের আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া, পরম স্ফূর্ত্তির সহিত দিন কাটাইয়া সে যখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইল, তখন অজস্র আদর ও যথেচ্ছ আবদারে সুবিধাদাত্রী মাতার নিকট হইতে নিজের দৃষ্টিপীড়ার বাহানায় সোনার চশমা এবং সময়ের সদ্ব্যবহারের প্রবল আবশ্যকতার অজুহাতে সৌখীন রিষ্ট ওয়াচ কিনিবার টাকা আদায় করিয়া লইল। অবশ্য ভবিষ্যৎকালে দেখা গিয়াছিল যে জিনিস দুইটির মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনে তাহার যত মনোযোগ না থাক, কিন্তু জিনিষ দুইটির পূর্ণমাত্রায় সদ্ব্যবহারে তাহার এমন অখণ্ড মনোযোগ ছিল যে, একমাত্র স্নানের সময় ছাড়া সে চশমাযোড়াটি চক্ষুচ্যুত বা রিষ্টওয়াচটি হস্তচ্যুত করিত না। ঘুমাইবার সময়ও না!

তার পর আঠারো বৎসর বয়সে এফ-এ পাশ করিয়া সে যখন কলিকাতায় বি-এ পড়িতে আসিল, তখন নিঃসংশয়ে আপনাকে ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণের সমীপস্থ একজন বলিয়া গণ্য করিয়া লইল। আত্মীয় স্বজনের 'আহা', বন্ধুবর্গের 'বাহা' এবং পাড়াপ্রতিবেশীর সম্ভ্রম-মুগ্ধ দৃষ্টির 'মরি মরি' ভাবব্যঞ্জক বিস্ময় দেখিয়া তাহার মস্তিষ্কযন্ত্রে অস্বাভাবিক বিপ্লব বাধিয়া গেল। আত্মশ্লাঘায় ও বিলাসচর্চ্চায় সে নিজের ইচ্ছাতৃপ্তিবিষয়ে পুরামাত্রায় খাতিরনদারৎ হইয়া পড়িল। স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন পিতা, বিদেশবাসী পুত্রকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ দিতেন; তাহার উপর মাতৃদেবীরও অনুগ্রহ ছিল। দ্বাপরের দাতাকর্ণের সহিত জননীর পিতৃকুলের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল কি না ইতিহাসে তাহার প্রমাণ অবশ্য পাওয়া যায় নাই বটে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার দানমাহাত্ম্য দেখিলে সাধারণের পক্ষে আশ্চর্য্য না হইয়া থাকিবার যো ছিল না। সৌখীন ছেলের যথেচ্ছ সখের খরচ যোগাড় করিতে তিনি জলে ডুবিতে আগুনে পুড়িতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না, সুতরাং এহেন সুযোগ-সমবায়ে সৌখীনতাপুষ্ট অমলচন্দ্রের বিলাসচর্চ্চার মাত্রা যে কতদূর পর্য্যন্ত উঠিতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। অমলের বেশভূষার অযথা ব্যয়বাহুল্য দেখিয়া, আত্মীয়কুটুম্বগণ গোপনে তাহাকে ক্ষুদ্র নবাব বলিয়া ডাকিতেন, এমন কি তাহার অতি সৌখীন বন্ধুগণও তাহার চালচলনের অসহ্য বাড়াবাড়ি দেখিয়া সময় সময় উপহাস করিতে ছাড়িত না। কিন্তু সংসার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বে-পরোয়া ও বে-দরদী অমলচন্দ্রের তাহাতে বিশেষ কিছু আসিত যাইত না। চশমার ভিতর হইতে নিঃশব্দ অবজ্ঞার মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণ কটাক্ষ হানিয়া উপহাসকারিগণের হৃন্মর্ম্ম বিদীর্ণ করিয়া অমলচন্দ্র দ্বিগুণ উদ্যমে বেশ পারিপাট্যের উন্নতি ও সংস্কার সাধনে মনোযোগ করিত। বন্ধুরা অন্তরালে চোখ টেপাটেপি করিয়া হাসিত।

অমলের পিতৃকুলের নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয়গণের মধ্যে সাধারণতঃ নিরেট মূর্খ নামে অভিহিত হইবার যোগ্য কেহ ছিল না। কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধিমান অমলচন্দ্র জানিত, লেখাপড়া শিখিলেও তাঁহারা প্রায় অশিক্ষিত ও সেই মাত্রায় অপদার্থ! অমলের পিতাও

বি-এ গ্র্যাজুয়েট। হোসেঙ্গাবাদে জজকোর্টে সুখ্যাতির সহিত ট্র্যান্স্লেটারের কায করিয়া মাথার চুল পাকাইয়া আজিও তিনি অনেকগুলি টাকা গৃহে আনিতেছেন, এবং তাহারই কিয়দংশ হইতে অমলচন্দ্রের অবাধ বাবুয়ানার খরচ জুটিতেছে। সুতরাং পিতার শিক্ষা ও জ্ঞান সম্বন্ধে স্পষ্টাক্ষরে কোন কথা বলিবার সাহস না থাকিলেও, অমল কথাচ্ছন্দে অনেক সময় পূর্ব্বকালের অসম্পূর্ণ শিক্ষার সহিত আধুনিক কালের অত্যদ্ভুত উচ্চ শিক্ষার তুলনায় সমালোচনা করিতে ছাড়িত না। অধিক কি, সে কলিকাতা গিয়া বি-এ পড়িতে আরম্ভ করিবার বছর চার পূর্ব্বে তাহার জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র সতীশ বাবু ওরফে 'মেজদা' সংজ্ঞাধারী যে নিতান্ত সাধারণ চালের ভদ্রলোকটি বিনাড়ম্বরে সোজাসুজি পড়িয়া শুনিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম শ্রেণীর এম-এ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, এবং এখন কলিকাতারই কোন সুবিখ্যাত কলেজে উপযুক্ত বেতনে প্রোফেসারী করিয়া স্বচ্ছন্দে পরিবার প্রতিপালন করিতেছেন, তাঁহারও বুদ্ধিবিদ্যা সম্বন্ধে অমলের মনে ঘোরতর সন্দেহ ও প্রবল অবজ্ঞা ছিল। অমলের নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, সে ইচ্ছা করিলে উক্ত মেজদাকে এখনও দুই-দশ বছর শিক্ষা দিয়া প্রোফেসারীর উপযুক্ত অভিজ্ঞতায় পরিপক করিয়া তুলিতে পারে! সেই জন্য পিতার আদেশ ও মেজদার সাদর অনুরোধে বাধ্য হইয়া নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত মেজদার কলিকাতার বাসায় থাকিয়া পড়াশুনা করিতে রাজী হইলেও—মেজদা যে কলেজে প্রোফেসারী করেন, সে কলেজে পড়িতে কোন মতেই সম্মত হইল না। অনেক তর্ক দ্বন্দ্বের পর মেজদারই শরণাগত হইয়া তাঁহারই অকাট্য যুক্তিসাহায্যে পিতার আপত্তি খণ্ডন করিয়া অন্য কলেজে স্থান লইয়াছিল। সদা কর্ম্মব্যস্ত মেজদার কলেজের কায ছাড়া সকাল সন্ধ্যায় দুই জায়গায় ছেলে পড়াইবার জন্য ছুটাছুটি করিতে হইত, তাহার উপর বাড়ীতে আর দুইটি ভাইয়ের ও অন্য কতকগুলি দরিদ্র কুটুম্বসন্তানের পড়াশুনার তত্ত্বাবধান করিতে হইত। খুল্লতাত-পুত্র অমলচন্দ্রের উপর তিনি সর্ব্বক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে পারিতেন না, তবে সময় বিশেষে তাহার পড়াশুনার খোঁজ খবর লইতেন। মেজদার এই অনধিকার চর্চ্চার স্পর্দ্ধায় অমল মনে মনে অত্যন্ত চটিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কয়মাস কলিকাতা-বাসের পর বড়দিনের ছুটির সময় হোসেঙ্গাবাদ ফিরিয়া গিয়া অমল শুনিল, উক্ত মেজদার লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী উকীল শ্বশুরের কনিষ্ঠা কন্যার সহিত তাহার বিবাহ-সম্বন্ধ হইতেছে। মেয়েটি নাকি পরমা সুন্দরী। এ বিষয়ে ঘটক স্বয়ং মেজদা, এবং কথাবার্ত্তা চলিতেছে উভয় পক্ষের কর্ত্তায় কর্ত্তায়।

বলা বাহুল্য, প্রস্তাব শুনিয়া অমলের হাড় জুড়াইয়া গেল! মেজদার অন্তঃপুরচারিণী অবগুণ্ঠনকুণ্ঠিতা লজ্জাশীলা গৃহলক্ষ্মীর কথা স্মরণ করিয়া অমলের মন আরও বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিল—'ক্যাডাভারাস্' বলিয়া সে বিকৃত মুখ ফিরাইল। ইচ্ছা হইল, কলিকাতার সুবিখ্যাত রঙ্গমঞ্চে অল্পদিন পূর্ব্বে দেখা, "জনা" অভিনয়ের মহাবীর প্রবীরের মত ক্ষুব্ধ পরিতাপে বীরদম্ভে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠে—

চলে যাই লোকালয় ত্যজি!—

লোকালয় ত্যাগ করিয়া যাইবার মত পছন্দসই স্থান তখন চোখের সামনে তেমন কিছু না থাকায় অগত্যা বাধ্য হইয়া অমলচন্দ্র লোকালয়েই রহিয়া গেল। কিন্তু বাঙ্গালী সন্তান বলিয়া যে অম্লান বদনে অপমান সহ্য করিয়া, পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিবে,—গ্র্যাজুয়েট-গৌরবলাভ-চেষ্টিত অমলচন্দ্রের পক্ষে তাহা অসম্ভব। সাধারণ বাঙ্গালী-গৃহের ভোঁতাবুদ্ধি নারীকে পত্নীত্বে বরণ করিয়া, মেজদার মত সুস্থ স্বচ্ছন্দমনে, নির্ব্বিবাদে দাম্পত্যধর্ম্ম পালন করা তাহার দ্বারা হইবে না, হইবে না, হইবে না!····· না হউন মেজদার স্ত্রী কালো কুৎসিত, না পরুন তিনি নথ ও মল, এবং না বলুন তিনি গ্রাম্য বুলি,—কিন্তু তবু তিনি উচ্চশিক্ষিত অমলের

মত ব্যক্তিবৃন্দের রুচিনির্দ্দিষ্ট আদর্শ রমণী নামের অযোগ্যা, সম্পূর্ণ অযোগ্যা! ঘোমটা টানিয়া রাত্রিদিন সাংসারিক কাযকর্ম্মে ব্যাপৃতা থাকিয়া পরিবারস্থ সকলের মন যোগাইয়া চলার ক্ষমতাটুকু তাঁহার যতই আশ্চর্য্য রকম থাক, এবং বাটীতে কাহারও অসুখ হইলে তাহার পা-টেপা হইতে ঔষধ খাওয়ান ও পথ্য প্রস্তুত বিষয়ে তাঁহার যতই দক্ষতা ও প্রশংসনীয় ধৈর্য্য থাক,—তথাপি, হায় রে, উচ্চশিক্ষিত স্বামীর হৃদয়-মনের ক্ষুধা-বিনাশিনী বিশেষত্ব তাঁহার মধ্যে কোথায়? মেজদার ন্যায় মানুষগুলির পত্নী-দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া একেই ত সে মনে মনে মর্ম্মাহত ও অনুতপ্ত হইয়া আছে, তাহার উপর আজ কি না সেই মেজদারই স্ত্রীর ছোট বোনটিকে তাহার স্কন্ধে চাপাইবার উদ্যোগ! কি নৃশংস ষড়যন্ত্র, কি ভয়ানক শত্রুতা!—রাগে অমলের চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল। দেশের রাজা তেমন কোন আইন করেন নাই, তাই নিরুপায়, নচেৎ অমল বোধ হয় তদ্দণ্ডেই একটা সঙ্গীন ফৌজদারী মামলা আনিয়া হুলুস্থুল বাধাইয়া বসিত!

যাহাই হউক, ক্রোধোৎক্ষিপ্ত চিত্তে, সজোরে গোঁফে তা দিয়া এবং প্রাণপণে মাথা খাটাইয়া অবশেষে এই দুর্দ্দৈব প্রতীকারের চরমপন্থা অমল আবিষ্কার করিয়া ফেলিল, এবং দ্রুতপাদক্ষেপে সটান জননীর কাছে আসিয়া গম্ভীর মুখে বলিল, "মা, তুমি বাবাকে বোলো, হয় তিনি বিয়ে দেন, নয় আমি বি-এ দিই!—"

মা প্রথমটা অবাক হইয়া ছেলের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। পরে অনেক কষ্টে সেই দুর্ব্বোধ্য হেঁয়ালির মর্ম্মার্থ উদ্ঘাটিত হইলে শঙ্কিতা জননী বুঝিলেন, কামিনী-কাঞ্চনের সংশ্রবে আসিলে তাঁহার সুদুশ্চর-তপস্যাপরায়ণ সৌখীন পরমহংস পুত্রের পক্ষে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিকট হইতে সাক্ষান্মোক্ষলাভ অসম্ভব হইবে, অতএব অমলের পিতা যদি—

যথাসময়ে অমলের পিতা সমস্ত শুনিলেন। বিলাসী পুত্রের সৌখীনতা-চর্চ্চার প্রবল আতিশয্য দেখিয়া, ইতিপূর্ব্বে তিনিও বুঝিয়া লইয়াছিলেন যে পুত্রবধূ গৃহে আসিলে, পুত্র সেই সজীব মানুষটিকেও সম্ভবতঃ তাহার সখ-পরিতৃপ্তির একটি সচেতন আসবাব বলিয়া ঠাহর করিয়া বসিবে, এবং সেই উপলক্ষে শুধু যে ছেলের কলেজের পড়াশুনা মাটী হইবে তাহা নহে—গৃহের মধ্যেও হয়ত পারিবারিক শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইবে। এবং তাহাতে যে শুধু বাড়ীর কর্ত্তা গৃহিণীকেই জ্বালাতন হইতে হইবে, এমন নহে, পুত্রবধূস্থানীয়া সেই নিরপরাধ পরের মেয়েটিকেও হয়ত অনেক দুঃখ-লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইবে। ঘরে ঘরে ইহার নজীরের অভাব নাই। বেশী দূর নহে—ঐ অমলেরই কলিকাতা অঞ্চল-বাসী জনৈক মাসতুত ভাই নবকান্তও ঐরূপে একযোগে বিদ্যা ও বিলাসের আরাধনা করিতে করিতে, কোন গতিকে এণ্ট্রান্সের গণ্ডী ডিঙ্গাইয়া যেমন কলেজে ঢুকিয়াছে, অমনি পিতার অনুগ্রহে গৃহমধ্যে বধূর আবির্ভাব হওয়ায় ত্র্যহস্পর্শ যোগে ছেলেটির মাথা বিগড়াইয়া গেল, কাযেই মা সরস্বতী লজ্জায় অন্তর্হিতা হইলেন। ছেলেটি উৎকট উচ্ছৃঙ্খলতায় মাতিয়া এখন এমন অপদার্থ হইয়া পড়িয়াছে যে সেই বিলাসজীর্ণ দেহ মন লইয়া সংসারের কোনও কায করিবার শক্তিও তাহার আছে কি না সন্দেহ!

দেখিয়া-শেখা অভিজ্ঞতাকে অবহেলা করিয়া, ঠেকিয়া শিখিবার কৌতূহল প্রকাশ করিয়া নূতন কেলেঙ্কারী সৃষ্টি করিতে অমলের পিতার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। তিনি মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, অমল উপার্জ্জনশীল না হইলে তাহার বিবাহ দিবেন না। কিন্তু সম্প্রতি ভদ্রলোক কুটুম্বগণের প্রস্তাবে, উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র সতীশচন্দ্র কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি চক্ষুলজ্জার খাতিরে মত ফিরাইয়াছিলেন, এখন মাঝখান হইতে অঙ্কুশাহত মত্ত হস্তীর মত ক্রোভোত্তেজিত পুত্রের ক্রোধহুঙ্কার শুনিয়া তিনি পরম নিশ্চিন্ত হইলেন। ঈষৎ হাসিয়া গৃহিণীকে বলিলেন, "অমলকে বোলো, তার অমতে আমি বিয়ে দেব না।"

অমল ঠাণ্ডা হইয়া কলিকাতায় ফিরিল। মনে মনে ভাবিল যে মেজদা এবার নিশ্চয়ই পিতাকে ছাড়িয়া, তাহার তোষামোদ আরম্ভ করিবেন, এবং মেজ-বৌদিও তাঁহার বোনটীর সগদতিবিধানের জন্য অমলের প্রচুর স্তবস্তুতি করিতে থাকিবেন, কিন্তু বীরাগ্রগণ্য অমলচন্দ্র অটল অচল হৃদয়ে পরম গাম্ভীর্য্যের সহিত, 'কোরা' 'কোরা' বাৎ শুনাইয়া তাঁহাদের আশায় বজ্রাঘাত করিয়া বিজয়গর্ব্বে বুক ফুলাইয়া দিন কাটাইবে। চাই কি, এই সুযোগে কোন ছল করিয়া অমল মেজদার বাসা ছাড়িয়া মেসে গিয়া স্বাধীন আনন্দে ও দিন কাটাইতে পারিবে, এবং পিতার কাছেও বেশ যুক্তিযুক্ত কৈফিয়ত দিয়া নিজের দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ চরিত্রের মহিমা বিঘোষিত করিতে পারিবে!

কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া হতাশ হইয়া অমল দেখিল—চারিদিকেই নিঝুমের পালা!—অনুমানে বুঝিল, ঘটক মেজদাকে পিতা খোলাখুলি জবাব দিয়াছেন, সেই জন্য মেজদা তাহাকে কোন কথা বলিতে সাহস করিতেছেন না। আত্মগৌরবে অমলের বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল, কিন্তু মেজদার বাসা ছাড়িবার সুযোগ না হওয়ায় মনে বড় দুঃখ হইল। অগত্যা সেখান হইতেই কলেজে আবার যাতায়াত সুরু করিল, এবং ইদানীং পূর্ব্বাপেক্ষা সতর্কতার সহিত অন্তঃপুরে মেজ বৌদির ছায়া এড়াইয়া চলিতে লাগিল। তাহার কেবলই মনে হইত যে সমস্ত বিশ্ব সংসারটা বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে হাঁ করিয়া অহর্নিশি শুধু তাহার আশ্চার্য্য সুন্দর চেহারা নিরীক্ষণ ও মনোহর গুণগরিমা মনে মনে আলোচনা করিতেছে! কাযেই বাধ্য হইয়া অমল এখন উঠিতে, হাঁটিতে, চলিতে, ফিরিতে সর্ব্বদাই অতিমাত্র সজাগ থাকিত। তাহার বিংশবর্ষীয় জীবনের অভ্যস্ত হাঁচি কাসি গুলাও এখন প্রত্যহ নব নব রূপে তাহার নিজেরই কাণে অলৌকিক ভাবব্যঞ্জনায় আশ্চর্য্য বলিয়া ঠেকিতে লাগিল। মোট কথা নিজেকে লইয়া অমল অষ্টপ্রহর এমন ব্যস্ত বিব্রত হইয়া পড়িল যে, পড়াশুনায় নিয়মিত মনোযোগ রক্ষা করায় বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গ্রীষ্মের ছুটির পূর্ব্বে, অমলদের কলেজের ছেলেরা 'হরিরাজ' নাটক অভিনয়ের বন্দোবস্ত করিল। অমল মহা উৎসাহে এই উৎসবে কায়মনপ্রাণ ঢালিয়া দিল, স্বয়ং হরিরাজের পাঠ অভিনয় করিবার ভার লইল। প্রতিজ্ঞা করিল, ঐ ভূমিকা সে 'জ্বালাইয়া' দিবে!

মেজদার বাসার ঘরে যথেচ্ছ ভঙ্গিতে হাত পা নাড়িয়া চীৎকার করিয়া আক্ষেপোন্মত্ত হরিরাজের প্রচণ্ড হৃদয়োচ্ছ্বাসের উদ্দীপনা অভ্যাস করা চলে না। অমল গোপনে খুঁজিয়া পাতিয়া, সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে একটা অখ্যাত নামা মেসের ত্রিতলস্থ ক্ষুদ্র কক্ষটি এক মাসের জন্য ভাড়া লইল। আহারাদির ব্যবস্থাও সেইখানে স্থির করিয়া ফেলিল।

মেজদাকে অমল বলিল, তাহার মাথার অসুখ হইবার উপক্রম হইয়াছে, সেইজন্য সে আজ তাহার বিশ্বস্ত বন্ধু অনিলের অনুরোধে, অনিলের পিসতুত ভাইয়ের খুড়তুত ভগিনীপতি, শ্রীযুক্ত...এম-ডি মহাশয়ের নিকট গিয়া বিনা ভিজিটে ব্যবস্থা লইয়া আসিয়াছে যে, পড়াশুনার ভিড় কমাইয়া দিনকতক নির্জ্জন স্থানে বাস করিয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা তাহার পক্ষে সদ্য আবশ্যক, এবং উক্ত অনিলের সাগ্রহ অনুনয়ে বাধ্য হইয়া সেও মত দিয়া ফেলিয়াছে যে, অনিলদের শালিখার বাগানবাটীতে সে একমাস গিয়া বাস করিবে। অবশ্য অনিলও তাহার সঙ্গে থাকিবে এবং তাহার কষ্ট হইতে দিবে না। অতএব, তাহাকে যাইতে হইবে।

মেজদা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, এবং উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া তখনই তাহাকে সঙ্গে লইয়া অন্যান্য নাম-জাদা ডাক্তার কবিরাজের মতামত জানিতে যাইবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু অমল নিষ্ফল পরিশ্রম বলিয়া অনেক তর্কযুক্তি দেখাইয়া সে বিষয়ে তাহাকে নিরস্ত করিল। তার পর প্রফুল্ল মনে অভীপ্সিত কার্য্যে বাহির

হইয়া পড়িল। যাইবার সময় বিদেশবাসী পিতামাতার প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি-ভালবাসা হেতু মেজদাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া গেল যে মেজদা যেন অমলের শিরঃপীড়া ও বিশুদ্ধ বায়ুসেবনের সংবাদটা তাঁহাদের না জানান। কারণ তাঁহারা দুশ্চিন্তায় পড়িবেন। মেজদা স্বীকৃত হইলেন।

দিন পনেরো কাটিয়া গেল। অমল সেই মেসের নির্জ্জন ত্রিতলের কক্ষে খিল আঁটিয়া, দেওয়ালের গায়ে টাঙ্গান দাঁড়া আয়নার সম্মুখে, খোলা জানলার পাশে দাঁড়াইয়া মনের সাধে লম্ফ ঝাড়িয়া, যোগ্যাযোগ্য ভাব-ভঙ্গিমা বিন্যাসে, অভিনয় কৌশল অভ্যাস করিতে লাগিল। ষ্টেজ ম্যানেজার অনিলবাবু পাকা ওস্তাদ, তিনি মাঝে মাঝে আসিয়া তালিম দিয়া যাইতেন। কি ছিনু কি হনু—ভাবিয়া অমলের স্ফূর্ত্তির সীমা রহিল না। থিয়েটার উপলক্ষে কলেজে হপ্তায় যে কয়দিন ছুটি ধার্য্য হইয়াছিল, অমল তাহার উপর আরও দুইদিন বাড়াইয়া লইল।

মেসে যে কয়জন ভদ্রলোক বাস করিতেন, তাঁহারা সকলেই আফিস কাছারির বাবু। দশটা পাঁচটা পর্য্যন্ত তাঁহারা মেস ছাড়া থাকিতেন, অমল সেই সময়টা যতটা পারিত ততটা চীৎকার করিয়া লইত, তারপর তাহাকে কণ্ঠস্বর সংযত করিতে হইত। মেসের বাবুরা জানিতেন অমল বি-এ এগ্‌জামিনের পড়া তৈরী করিবার জন্য ত্রিতলের নির্জ্জন কক্ষ ভাড়া লইয়াছে, সুতরাং তাঁহারা কেহ বড় একটা তাহার দিক ঘেঁসিতেন না। কচিৎ কেহ কৌতূহল-বশবর্ত্তী হইয়া, আলাপ করিতে অগ্রসর হইলে অমল তৎক্ষণাৎ নিরীহ ভদ্রলোক সাজিয়া, নিতান্ত উদাসীনভাবে 'আসুন' 'বসুন' বলিয়াই—একান্ত মনোযোগের সহিত ওয়ার্ডসওয়ার্থ খুলিয়া বসিত। আলাপ-উৎসুক ব্যক্তি অগত্যা রণে ভঙ্গ দিতেন, এবং অমলও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, অকস্মাদ্দৃষ্ট পিতৃ-প্রেতাত্মা অপ্রত্যাশিতভাবে মাতার কলঙ্ক কাহিনী ব্যক্ত করিয়া তিরোহিত হইলে হরিরাজের হৃদয়ের ভীষণ অবস্থা স্মরণ করিয়া, মুষ্টিবদ্ধ হস্তদ্বয় বুকের কাছে উঠাইয়া রুদ্ধ বেদনাতঙ্ক-বিস্ফারিত নয়নে বক্তৃতা সুরু করিত,—

ধীরে বহ, শোণিত প্রবাহ…

ইত্যাদি।

সেদিন দুপুর বেলা আহারাদির পর পাণ চিবাইতে চিবাইতে অমল নিশ্চিন্ত আরামে ইচ্ছামত ভাবে নাটকের স্থানে স্থানে আবৃত্তি করিতেছিল। ক্রমশঃ রোখ চড়িল, কণ্ঠস্বর উচ্চে উঠিল, হস্ত পদও বিবিধ কৌশলে আস্ফালিত হইতে লাগিল। তারপর উত্তেজনায় রক্তমুখে অমল ওরফে হরিরাজ আরম্ভ করিল,—

মাতা,—নিষ্ঠুরতা অধিক কাহার ?
নহে তঃ আমার, ভাব একবার
নিজ ব্যবহার, আমার পিতার প্রতি—

ফুস্‌ফুসের সমস্ত শক্তি কণ্ঠস্বরে চড়াইয়া, উৎকট আবেগভরে—"পিতার প্রতি" কথাটা বলিতে বলিতে কাল্পনিক হরিরাজ, সজোরে ঊর্দ্ধে হস্তোৎক্ষেপ করিয়া যেমন স্বর্গীয় পিতার আবাসস্থল নির্দ্দেশ করিতে যাইবে, অমনি সহসা রাস্তার ও পাশের বাড়ীর খোলা জানলার উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল,—মুহূর্ত্তেই সে হতভম্ব হইয়া গেল! দেখিল, বিছানা-ঝাড়া ঝাড়নের রঙীন বাঁট ক্ষুদ্র সুন্দর হস্তে মুঠাইয়া ধরিয়া, তাহার উপর চিবুক রাখিয়া, আগ্রীবচুম্বিত কুঞ্চিতালকবিশিষ্ট একখানি অতি চমৎকার কচি-কোমল মুখ, স্নিগ্ধ কৌতুক হাস্য-মণ্ডিত অধরে জানলার পাশ হইতে উঁকি মারিয়া কৌতূহল ব্যগ্র নয়নে তাহার অভিনয় লীলা দেখিতেছে!

অমলের স্তম্ভিত দৃষ্টি বিদ্যুৎ চমকে ধাঁধিয়া ক্ষণ-মধ্যে সেই সুন্দর মুখখানি অন্তরালে অন্তহিত হইল। পরক্ষণেই উৎসাহ-আবেগ-প্রমত্ত অমলচন্দ্রের হৃদয়-মনেও—শোচনীয় অবস্থান্তর ঘটিল!

বলা বাহুল্য, তারপর সারাদিনটা অমলের না-হইল পড়াশুনা, না হইল অভিনয় অভ্যাস,—না হইল আর কিছু। সে 'চমকিত মন চকিত শ্রবণ তৃষিত-আকুল আঁখি'তে সেই জানলার উপর সতর্কভাবে প্রহরা দিয়া

সমস্ত সময়টি কাটাইল, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় অভিলষিত বস্তুর দর্শন আর মিলিল না!—হতাশ ব্যাকুলতায় অমলের হৃদয় আলোড়িত হইয়া ক্রমাগত সঙ্গীতচ্ছন্দে সকরুণ বেদনা বিলাপ ধ্বনিয়া উঠিতে লাগিল—

"আর তঃ আসিল না, আর তঃ হাসিল না,
আর তঃ দিলনা সে ফিরিয়া দেখা গো!"

ক্রমশঃ

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

মহিলা-কবি তরুদত্ত

কবি গাহিয়াছিলেন ;—

"না জাগিলে সব ভারত ললনা,
এ ভারত আর জাগেনা জাগে না॥"

একথা যে অতি সত্য তাহা এখন বঙ্গসমাজ ধীরে ধীরে উপলব্ধি করিতেছে। যখন শ্রীরামপুরের মিশনারী Ward সাহেব স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য ঘোর আন্দোলন করিতে লাগিলেন, যখন ১৮২১ সালে তিনি লিভারপুল হইতে Miss Cookeকে (পরে Mrs. Wilson) আমাদের নারীজাতির শিক্ষাবিধানের জন্য আনাইলেন, এবং এতদুদ্দেশ্যে একটী সমিতি গঠন করিলেন, তখনও আমাদের চেতনা হয় নাই। ক্রমে কলিকাতায় মেয়েদের শিক্ষার জন্য নন্দবাগানে "জুবেনাইল পাঠশালা" স্থাপিত হইল। দেখিতে দেখিতে ১৮৪২ সালের মধ্যে প্রায় ৫০টী বিদ্যালয় বসিয়া গেল, তাহাতে সর্ব্বসমেত ৮০৯টী বালিকা শিক্ষা পাইত।

কিন্তু এ সকল বালিকাবিদ্যালয়ে ছাত্রীর সংখ্যা অধিক হইত না, কারণ সমাজে একটী শঙ্কা প্রবেশ করিয়াছিল যে, এ সকল বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলেই মিশনারীরা ছাত্রীদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া লইবেন। এই অমূলক আশঙ্কার বশীভূত হইয়া বহু ভদ্র পরিবার মিশনারী বিদ্যালয়ে কন্যা পাঠাইতেন না। কিন্তু পরে যখন বজ্রনির্ঘোষে বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের সুপ্তসমাজকে জাগাইতে চেষ্টা করিলেন, তখন যেন আমাদের একটু চেতনা হইল। দেখিতে দেখিতে ভুবনমালা, কুন্দমালা বেথুন স্কুলে প্রথম ছাত্রীরূপে প্রবেশ করিয়া সমাজে দৃষ্টান্তস্বরূপ হইলেন।

ঠিক এই সময়ে, ১৮৫৬ সালে, বঙ্গমাতার ক্রোড় আলোকিত করিলেন এক নবশিশু, যাঁহার নাম শুধু স্বদেশে নয়, সেই সুদূর সাগর-পারে—ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনিই প্রথম বিলাত যাত্রী বঙ্গরমণী, তরু দত্ত বা তরুলতা দত্ত। তিনি এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী অরু তৎকালে যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহা আজিকার দিনেও অনেকের অদৃষ্টে ঘটে না। তাঁহারা অতি অল্প বয়সেই ইংরজীতে সুশিক্ষিতা হইলেন, সমগ্র "প্যারাডাইস্ লষ্ট" তাঁহাদের কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁহাদের এ শিক্ষার এ উন্নতির মূলে তাঁহাদের পিতা গোবিন্দবাবু। তিনি উদার মত পোষণ করিতেন, তিনি জানিতেন—জাতীয় উন্নতির জন্য পুত্রের ন্যায় কন্যাও শিক্ষণীয়া। আবার আর একটী কারণ উপস্থিত হইল—তাঁহার একমাত্র পুত্রের অকালমৃত্যু।

গোবিন্দবাবু দেখিলেন, দুই কন্যাই এখন তাঁহার অবলম্বন। তাহাদিগকে উচ্চ শিক্ষা দেওয়াই এখন তাঁহার জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা হইয়া দাঁড়াইল! অর্থের অভাব ছিল না, কন্যাদিগকে তিনি ইউরোপে শিক্ষার জন্য লইয়া গেলেন।

এই বিদেশ ভ্রমণ হইতেই তরুর কবিজীবনের আরম্ভ। কেহ কেহ বলেন—তরু দত্ত ইংরাজী ও ফরাসী সাহিত্যের সেবা করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি বাঙ্গালা

পাঠকদিগের নিকট সমাদর প্রাপ্ত হইতে পারেন না। কিন্তু আমরা বলি—যেহেতু তিনি বঙ্গরমণী হইয়া বিদেশী ইংরাজী ও ফরাসী সাহিত্যে (যে সাহিত্যে রীতিমত অভিজ্ঞতা বাঙ্গালী পুরুষের মধ্যেও এই বিংশ-শতাব্দীতেও বড়ই কম) অসামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন এবং অনায়াসে কাব্য উপন্যাসাদি লিখিয়াছিলেন—একমাত্র সেই কারণেই তাঁহার প্রতিভার পূজা করা আমাদের কর্ত্তব্য। তিনি, বিদেশী ভাষায় কবিতা লিখিলেও, তদীয় রচনা বাঙ্গালিত্ববর্জ্জিত নহে। আর তিনি যে ভাষাতেই কবিতাদি লিখুন না কেন, তাহার সুরটী বিদেশী নয়, খাঁটি স্বদেশী—সে সুরও বিশ্বসাহিত্যে বাঙ্গালাভাষার গর্ব্ব খর্ব্ব করে নাই, পরন্তু জগৎকে দেখাইয়াছে, বাঙ্গালীর প্রতিভা কিরূপ সর্ব্বত্র-গামী।

প্রথমে তাঁহারা ফরাসীদেশে যান। কিছু কাল পরে ইংলণ্ডে আসিলেও তাঁহাদের চিত্ত ফ্রান্সের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও গৌরবকথায় পূর্ণ ছিল। এই সময় দুই ভগিনী ফরাসীভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এই ভাষায় এতদূর ব্যুৎপত্তিলাভ করেন যে বহু ফরাসী লেখকও তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।

১৮৭৩ সালে তাঁহারা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। তরু কিন্তু সেই সুমধুর ফরাসীভাষা ভুলিতে পারিলেন না, এখানেও সেই ভাষার চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। পিতা গোবিন্দ বাবু তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষাও শিখাইতে লাগিলেন। তিনি নিয়তই কন্যাদিগকে কবিতা লিখিতে উৎসাহিত করিতেন। উভয় ভগিনীই কবিতা লিখিতেন, কিন্তু অরু চিত্রবিদ্যা অধিক ভালবাসিতেন। তাঁহাদের আজন্মপোষিত ইচ্ছা ছিল যে, উভয়ে একখানি উপন্যাস প্রকাশ করিবেন, তরু উহা রচনা করিবেন আর অরু তাহাতে চিত্রযোজনা করিয়া দিবেন। কিন্তু হায়, অরুর জিবীতাবস্থায় এ আশা ফলবতী হয় নাই!

একবার এক ইংরাজ তাঁহাদিগের সহিত কলিকাতায় সাক্ষাৎ করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন্ বিষয়ের বই আপনারা ভালবাসেন?"

তরু উত্তর করিলেন—"কেন, উপন্যাস আমরা ভালবাসি।"

ভদ্রলোকটী কহিলেন—"উপন্যাস? এ কথায় আমি দুঃখিত, কারণ ইতিহাসই আপনাদের উপযুক্ত।"

অমনি উত্তর হইল—"না না, ইতিহাস মিথ্যা, উপন্যাসই সত্য।"

তাঁহার প্রথম লেখা বাহির হয়—Bengal Magazine নামক মাসিকপত্রে। ইহা তাঁহার পরিচিত এক ফরাসী কবির রচনাবলীর সমালোচনা। ইহার পর মূল ফরাসী ভাষা হইতে অনূদিত কতকগুলি কবিতা বাহির হয়। সকলগুলিতে তরু দত্তের স্বাক্ষর ছিল; কিন্তু সেযুগে কেহ ভাবিতে পারেন নাই যে সেই অনবদ্য কবিতাগুলি বঙ্গরমণীর লেখনীপ্রসূত! বহু লোকেই ভাবিতেন, উহা বাস্তবিকই কোন ইংরাজের রচনা, 'তরু দত্ত' সেই লেখকের ছদ্মনাম মাত্র।

একবৎসর অতীত হইতে না হইতে, ১৮৭৪ সালে যক্ষ্মা রোগে অরু ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। উত্তরকালে প্রিয়ভগিনীর কথা স্মরণ করিয়া তরু এই বলিয়া শোকাশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলেন:—

She died in earliest womanhood ;
  Thus dies, and leaves behind no trace,
A bird's song in a leafy wood ;
  Thus melts a sweet smile from the face.

ইহার দুই বৎসর পরে তাঁহার প্রথম কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাহার নাম "A Sheaf gleaned in French Fields" এবং ভবানীপুরে 'সাপ্তাহিক সম্বাদ প্রেসে' মুদ্রিত হয়। সুখের বিষয়, ইহার কুশ্রী মুদ্রাঙ্কন সত্ত্বেও কাব্যরসিকেরা ইহার যথোচিত সমাদর করিয়াছিলেন। ফরাসী কবি ও ঔপন্যাসিক M. Andre Theuriot এবং ইংরাজ সমালোচক Edmund Gosse ইহার প্রশংসাবাদ

করেন। এ সম্বন্ধে উক্ত ইংরাজসমালোচক কবি তরু দত্তের অপর এক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন —"অধ্যাপক Minto যখন Examiner পত্রের সম্পাদক ছিলেন, সেই সময় আগষ্ট মাসে যখন পুস্তকের বাজার বড়ই মন্দা, একদিন আমি ঐ পত্রের আফিসে উপস্থিত ছিলাম, এবং সমস্ত পুস্তক-প্রকাশকদিগকে গালি দিতেছিলাম যে কেন তাহারা একখানিও পাঠযোগ্য গ্রন্থ সমালোচনার জন্য পাঠায় নাই। এমন সময় ডাক পিয়ন ভারতের বিচিত্র টিকিটযুক্ত একটী সরু প্যাকেট লইয়া আসিল। খুলিয়া দেখিলাম তাহার মধ্যে একটী কদর্য্য আকৃতির কবিতাপুস্তক। পুস্তকখানি ভবানীপুরে মুদ্রিত, তাহার নাম— A Sheaf gleaned in French Fields. সেই ২০০ পাতার বইখানির না ছিল ভূমিকা না কিছু, ভাবিলাম এখানি বাক্সে কাগজের মধ্যে স্থান পাইবে। আমার বেশ মনে আছে, অধ্যাপক মিণ্টো সেই বইখানি আমার হস্তে গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন—'দেখুন, ইহার মধ্যে কিছু খোরাক মিলে কি না?' আমি ভাবিলাম সেই সাপ্তাহিক সংবাদ প্রেসের বিচিত্র অক্ষরে মুদ্রিত পুস্তকে আমার আশা পুরিবে না। কিন্তু পরিশেষে যখন বইখানি খুলিয়া এরূপ কবিতা দেখিলাম:—

"Still barred thy doors. The far East glows,
The morning wind blows fresh and free;
Should not the hour that wakes the rose,
Awaken also thee?

All look for thee, Love, Light and Song;
Light in the sky, deep red above,
Song in the lark of pinions strong,
And in my heart, true love.

তখন আমার কতটা বিস্ময় ও আনন্দ হইল তাহা বলিবার নয়।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী কবিদিগের রচনা তরু অনুবাদ করেন। তন্মধ্যে Victor Hugoকে তিনি বেশী পছন্দ করিতেন, এমন কি তিনি Hugoকে Lamartineএর অপেক্ষা উচ্চে স্থান দিতেন।

এ পুস্তক প্রকাশের পরই তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল। অমনি পিতার স্নেহময় হৃদয়ে আশঙ্কা দেখা দিল—অরুর কথা মনে হইল, চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি ব্যস্ত হইয়া তরুর সংস্কৃত-শিক্ষা বন্ধ করিয়া দিলেন, ভাবিলেন বিশ্রামে সুস্থ হইবেন! কিন্তু বিধি বাম, শীঘ্র দেখা গেল অরুর যে ভীষণ রোগ হইয়াছিল—তরুর দেহেও তাহারই আবির্ভাব হইয়াছে! চিন্তায় পিতার মস্তিষ্ক চঞ্চল হইয়া উঠিল।

কিন্তু, রোগীর যে এখনও লেখনীর বিরাম নাই। যতই বুঝিতেছেন দিন ফুরাইয়া আসিতেছে, ততই উৎসাহ বাড়িতেছে। এই সময় নূতন এক-খানি বই তাঁহার চক্ষে পড়িল—LA Femme dans l'Inde Ancienne. তিনি এখানি ইংরাজীতে অনুবাদ করিতে উৎসুক হইলেন; অনুমতি চাহিবা-মাত্রই পাইয়াছিলেন। কিন্তু হায়, বিধিলিপি কে খণ্ডন করিবে? অসুস্থ দেহ তাঁহার সাধ পূরণের বিঘ্ন হইল।

তরুর দিন ফুরাইয়া আসিল। আবার আর একটী পবিত্র পুষ্প বৃন্তচ্যুত হইল। তাঁহার মৃত্যু—সেও এক পরম পবিত্র দৃশ্য, একেবারে চন্দ্রের কিরণের মত স্নিগ্ধ ও নির্ম্মল! শেষদশায় খ্রীষ্টে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, অত শারীরিক যন্ত্রণাতেও সে বিশ্বাস অচল, অটল! ডাক্তারকে তিনি বলিয়াছিলেন—"শারীরিক ব্যথাই আমায় কাতর করিয়াছে, নচেৎ আমার আত্মা পূর্ণ শান্তিতে আছে। কারণ যাঁতে আমি বিশ্বাস করি, তাঁকে যে আমার ভাল করে' জানা আছে!" ১৮৭৭ সালে ৩০শে আগষ্ট তাঁহার পুণ্যাত্মা স্বর্গধামে গমন করে।

এই শেষ সন্তানের মৃত্যুতে গোবিন্দবাবু নিতান্ত কাতর ও মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। তরুর গ্রন্থ আলো-চনাই শেষ জীবনের শান্তিরূপে অবলম্বন করিলেন।

তিনি কন্যার প্রথম গ্রন্থের একটী নবসংস্করণ বাহির করিলেন। আর ভারতীয় গীতিগুলি সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন—তাহার নাম হইল—"Ballads and Legends of Hindusthan." তাঁহার লেখার মধ্যে একখানি উপন্যাস পাওয়া গেল—যাহা দুই ভগিনীর আজন্মপোষিত আশা ছিল। সেখানির নাম 'Journal de Mdlle. D'Arvers'—নাম হইতেই বোধ হইতেছে ইহা ফরাসী ভাষায় রচিত। এই দুইখানিই তরু দত্তের শেষ দান। উপন্যাসটির বিষয় আগামী বারে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বসু।

সত্যদাস

পণ্ডিতের পদ লভি' যেদিন বসিনু বেদগ্রামে,
সেইদিন প্রাতঃকালে ছাত্র এক সত্যদাস নামে
বিদ্যা অধ্যয়ন তরে মোর কাছে দাঁড়াইল আসি ;—
এতটুকু শিশু একা ! চেয়ে দেখি, দূরে আছে দাসী !

সযত্নে বসায়ে পাশে শিষ্ট বাক্যে ভুলাইয়া তারে
শুনিনু অনেক কথা—সুমিষ্ট আত্মীয় ব্যবহারে ;
পিতৃহীন, নিরুপায়, দরিদ্র সে—ঐ তার ঘর ;
দাসী ভেবেছিনু যারে—মা তাহার, নহেক অপর !

ত্বরিতে আসন ছাড়ি' সসম্ভ্রমে নোয়াইয়া শির—
মনে মনে পাদপদ্ম পরশিয়া মৌন জননীর,
কহিয়া আশ্বাসবাণী, বালকের লয়ে শিক্ষাভার,
নিশ্চিন্ত করিয়া তাঁরে ফিরাইনু স্বগৃহে তাঁহার।

পাঁচবৎসরের শিশু—সরল সুন্দর সুকুমার—
এহেন শৈশবকালে কোন্ প্রাণে জননী তাহার
পাঠাইল পাঠশালে—যদিও তা' আঁখির সম্মুখে ;
বুঝিনু কিসের আশে—কি গভীর দারিদ্র্যের দুখে !

মাথায় বুলায়ে হাত, প্রাণে মনে আশীর্ব্বাদ করি'
বিবিধ কথায় গল্পে সকল সঙ্কোচ শঙ্কা হরি'—
"বাড়ীতে ক'জন থাক ?"—শুধাইনু শিশুরে যখন,
উত্তরিল মৃদুকণ্ঠে—"বাড়ীতে আমরা পাঁচজন।"

"এই না বলিলে আগে—ভাই বোন আর কেহ নাই—
তুমি মার এক ছেলে ! আরও ত সে তিনজন চাই !"
তেমনি মধুর কণ্ঠে কহিল সে—"মোরা পাঁচজন—
মা ও আমি, ভোলা আর রাধারাণী আর নারায়ণ।"

"বাকী তিনজন কে কে ?"—শুধাইনু পরম বিস্ময়ে ;
গণনায় ভুল ভেবে বালক রহিল চেয়ে ভয়ে !
"রাধারাণী কে আবার—অন্য কেহ বাড়ীতে ত নাই ?"
সে কহিল—"আছেই ত ; রাধারাণী সে মোদের গাই।"

"ভোলা—সে কাহার নাম ?"—হাসিয়া শুধানু তার কাছে।
"জানেন না ? ভারি দুষ্ট—সে এক কুকুর ভোলা আছে।"
"নারায়ণ কে আবার ?"—নাম শুনি' প্রণমি চকিতে
কহিল—"ঠাকুর তিনি—মা বলেন, বাস তুলসীতে !

"প্রণাম করেন নিত্য—দিনরাত ডাকেন যে তাঁরে—
পাঁচজন হলনা ক—কত আর বলি বারে বারে ?"
"এই পাঁচজন বুঝি ?"—হাসিলাম পণ্ডিতের ভানে,
অন্তরে বুঝিনু ঠিক—সত্য বার্ত্তা শিশুতেই জানে !

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

স্পর্শমণি

(উপন্যাস)

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

উমা শুনিবে না।

বৃষ্টির বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল। দালানের দেওয়ালে টাঙ্গান একটা ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দ্বিপ্রহর ঘোষিত হইল। সেই সঙ্গে উমার রুদ্ধদ্বার কক্ষের বাহিরে মৃদু মৃদু করাঘাতের সঙ্গে শুনিতে পাওয়া গেল, "দোরটা একবার খোল।"

এ স্বর উমার অপরিচিত নয়। কতদিন এই স্বরে-রই মৃদু আঘাতে তাহার সুরবাঁধা হৃদয়বীণার তার তাহার অজ্ঞাতে বাজিয়া উঠিয়াছে, বায়ুতাড়িত বেতস-পত্রের মত সারাদেহ ঐ সুরের স্পর্শে সুখাবেশে কাঁপিয়া উঠিয়াছে,, অকারণে অভিমানের জলে চোখ ভরিয়া উঠিয়াছে। সে সুর, সে পরিচিত সুর বাহিরের ঝড় জল বা মেঘ গর্জ্জনেও উমার শুনিবার পক্ষে বাধা জন্মাইল না। তথাপি সে নড়িল না, কোন সাড়া দিল না।

"আমি সতীনাথ, একবার শোন। এখনি আমি ফিরে যাব—"

আহ্বানকারীর কণ্ঠস্বরে মিনতি ও আবেদন ধ্বনিত হইল, তবুও উমা উঠিল না, এতটুকু নড়িলও না। শ্বাস রুদ্ধ করিয়া, যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল সেইখানেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কেন সে শুনিবে? কেনই বা দ্বার খুলিয়া দিবে? হইলেনই বা উনি সতীনাথ, তাঁহার সহিত উমার কিসের প্রয়োজন? না, শুনিবে না। সকল কথাই তাহার শুনা হইয়া গিয়াছে। যদি আরও কিছু শুনিবার বাকী থাকে, ওগো দয়া করিয়া তোমরা আর তাহা শুনাইও না; সে আর সহ্য করিতে পারে না। তাহাকে মুক্তি দাও—এইবার সে ক্লান্ত হইয়াছে।

বাহিরে করাঘাত ও কণ্ঠস্বর আগন্তুকের অসহি-ষ্ণুতা প্রকাশ করিয়া ক্রমেই উচ্চে উঠিতেছিল। কোন উত্তর অথবা ভিতরে জাগন্ত মানুষের অস্তিত্বের কোনও আভাস না পাইয়া, আহ্বান আপনিই থামিয়া গেল।

পদশব্দে উমা বুঝিতে পারিল, তিনি চলিয়া গেলেন। কি বলিতে আসিয়াছিলেন, না বলিয়াই, ব্যর্থক্ষোভে চলিয়া গেলেন। তিনি যে আসিয়াছিলেন, আর ফিরিয়া গেলেন, এটা তবে স্বপ্ন নয়—সত্যই তিনি আসিয়াছিলেন। পাষাণী উমার রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিয়া ফিরিয়া গেলেন। আর কখনও আসিবেন না। আর "শোন" বলিয়া অনুনয়ে দ্বার খুলিতে বলিবেন না। উমা তাহাকে বিদায় দিয়াছে—চিরজীবনের জন্যই বিদায় দিয়াছে।

এইবার মাটীতে বসিয়া পড়িয়া, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে ছেলেমানুষের মত গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া মনের বেদনা যখন হাল্কা হইয়া আসিল, তখন সে বুঝিল, শুধু মানুষের কাছে নয়, মনের কাছেও সে প্রতারিত হইয়াছে। নিজের অজ্ঞাতে সে তাহার স্বামীকে মন প্রাণ সব দিয়াই ভাল বাসিয়াছে। শুধু ভালবাসিয়াছে নয়, এত ভাল বাসিয়াছে যে সে ভালবাসার পরিমাণ অনুভব করিতেও সে যেন ভীত হইল। তিনি যাই হউন, যেমন ব্যবহারই করুন, তবু সে তাঁহার সান্নিধ্য তাহার দর্শনসুখ ত্যাগ করিয়া স্বর্গবাসও যে কামনা করে না! হায়, ভাগ্যের উপর বিদ্রোহ করিতেও সে আজ অক্ষম—এমনই সে কৃপার্হ। এখন সত্যই যদি উঁহারা তাহাকে তাড়াইয়া দেন, কেমন করিয়া দূরে গিয়া সে বাঁচিয়া থাকিবে?

অন্ধকারে তাহার মানসচক্ষে একখানা রঙ্গিন ছবি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল। উমার মনে হইল, সে যেন এ গৃহের কাছে চির বিদায় লইয়া,

দুঃখিনী মায়ের কোলে চলিয়া গিয়াছে। তাহার পরিত্যক্ত গৃহিণী-পদে আর একজন আসিয়া স্থান পূরণ করিয়াছে। স্বামীর বামপার্শ্বে সুসজ্জিতা সুন্দরী ষোড়শী কল্যাণী—দুই জনের মুখেই সুখের ভাব। অনুরাগে অধরে মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে, স্বামী তাহার কর্ণে কত আদরে কত সোহাগে প্রণয়ের মধুরালাপ বর্ষণ করিতেছেন। বিধাতা এইবার যোগ্যের সহিত মিলন করিয়া দিয়া পূর্ব্বত্রুটি সংশোধন করিয়াছেন। উমার অজ্ঞাতে তাহার দুই চোখ ছাপাইয়া জলের ধারা গণ্ড বহিয়া পড়িতেছিল। সে দুই হাত যোড় করিয়া মনে মনে কহিল, "তাই কোর ঠাকুর, আমি যেন মরে যাই, ওঁরা দুজনে সুখী হোন—খুব সুখী হোন।"

সহসা বাহিরে শব্দ উত্থিত হইল, "বল হরি হরিবোল।"

কতদিন বিনিদ্র নিশীথে রাস্তা দিয়া মৃতদেহ লইয়া যাইতে সে শুনিয়াছে। মানবের সেই চিরন্তন পরিণামের সংবাদ ঘোষণায় নিঃসঙ্গ রাত্রিতে তাহাকে মহা ভয়ে ভীত করিয়া তুলিয়াছে। সে যেন কতদিন অবলম্বন খুঁজিয়া বিছানার চাদরখানাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া সভয়ে দেবদেবীর নাম স্মরণ করিয়াছে। আজ তাহার মনে হইল,—"আহা কে চলিয়া গেল, না জানি তাহার আপন জনের কত ক্ষতিই করিয়া গেল! আমি যদি তাহার সহিত আজ অবস্থার বিনিময় করিতে পারিতাম, তবেই জীবনের সকল সমস্যা মিটিয়া যাইত!"—মায়ের মুখ আজ তাহার চিন্তার গতি পরিবর্ত্তিত করিতে পারিল না। দুর্ভাগিনী স্বামী পরিত্যক্তা কন্যা বাঁচিয়া থাকার চেয়ে মরিয়া যাওয়াই যে তাহার ছিল ভাল!

উমা উঠিয়া ঘরের একটা জানালা খুলিয়া দিল। বৃষ্টি কমিয়া বাতাসের বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। জলের বাতাস তাহাকে শীতার্ত্ত না করিয়া যেন শীতল স্নেহকরস্পর্শ বুলাইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিল। বাহিরের ঘন অন্ধকার তরল হইয়া উষাগমের আভাস প্রকাশ করিতেছিল। উমার মনে পড়িল, এমন সময় রোজ সে জেঠামহাশয়কে দেখিতে যায়, নিজে হাতে ঔষধ খাওয়াইয়া আসে। রাত্রি জাগরণ-ক্লান্ত সেবকের দল তখন ঘুমে ঢুলিতে থাকে, সতীনাথ বা মুরারি সেই সময় কেহই থাকে না। জেঠামশায়ের উৎকণ্ঠিত চক্ষু তাহারই প্রতীক্ষায় দরজার দিকে চাহিয়া থাকে। হয়ত এখনও তিনি তেমনি করিয়া চাহিয়া আছেন, আর স্বার্থপর উমা নিজের লাভক্ষতির হিসাব লইয়াই ব্যস্ত! কাল সেই বৈকাল হইতে তাহাকে একবার দেখিতেও যায় নাই! না না, উমার অদৃষ্ট তাহাকে যেখানেই লইয়া যাক্, এখনও তাহার কর্ত্তব্য যে বাকী রহিয়াছে! জেঠামহাশয়কে ছাড়িয়া, এমন অবস্থায় তাঁহাকে ফেলিয়া সে কোথায় যাইবে? তিনি যে অসহায় শিশুর মত, এখন কেবল তাহারই মুখ চাহিয়া অসহ্য রোগের যন্ত্রণা হাসিমুখে সহিতেছেন। উমার যদি সব যায়, স্বামী যদি এখন তাহাকে তাড়াইয়াও দেন, তবুও সে যাইবে না—যাইতে পারিবে না। কিন্তু না যাইয়াই বা সে করিবে কি? তিনি যে এখন তাহাকে আর স্থান দিতেও অনিচ্ছুক, এইবার সে তাহা বেশ বুঝিয়াছে। এই জন্যই সেদিন উপযাচক হইয়া তাহাকে হুগলী পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন—মূর্খ সে, তাই সেকথার প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া গোপন দুরাশার মোহে মুগ্ধ হইয়া নিজেকে প্রতারিত করিতে চাহিয়াছিল! ভালমন্দের বিচারে সত্য মিথ্যার রূপ চিনিতে সে অনভিজ্ঞা, হিতকামী মুরারির হিতবাণীও একদিনও কানে তুলে নাই। স্বামীর প্রকৃত রূপ তিনি ত কত দিনই দেখাইতে চাহিয়াছেন, অহঙ্কারে সেকথায় সে কর্ণপাতও করে নাই। বরং তাঁহাকে পরশ্রী-কাতর মনে করিয়া, স্বামীকে দেবতার-আসনে বসাইয়া মনে মনে পূজাই করিয়াছে। বিশ্বের করুণা কুড়াইয়া যাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তাহার বাঁচিয়া থাকা যে মরণের চেয়েও কষ্টকর! উমার আর বাঁচিবার সাধ নাই। এখন ওগো মৃত্যু, ওগো পাপী তাপী অনাথের বন্ধু, তুমিও কি অভাগিনী উমার কথা ভুলিয়া থাকিবে? সে যে আর পারে না, এইবার তাহার সকল জ্বালার

শেষ করিয়া দিয়া, সকলের সুখের পথ মুক্ত করিয়া, তাহাকেও মুক্তি দাও! তিনি ভুল করিয়াছিলেন, এই-বার সে ভুল শুধরাইবার চেষ্টা করিতেছেন;—কেনই বা তা না করিবেন? উমা তাঁহার কে যে তাহার কথা মনে করিবেন?

বাহিরের ঘড়িতে চারিটা বাজিয়া গেল। বৃষ্টি প্রায় থামিয়া আসিয়াছে। খোলা জানালা দিয়া শীতের বাতাস জলের ছাট তাহার দেহে শৈত্যানুভব করাইয়া জানালা বন্ধ করিবার প্রয়োজনীয়তাও স্মরণ করাইয়া দিলেও সে তাহা বন্ধ করিল না। উঠিয়া নিঃশব্দে দরজা খুলিল, এইবার একবার চুপি চুপি পা টিপিয়া চোরের মত লুকাইয়া জেঠামহাশয়ের সংবাদ জানিয়া আসিবে। ভিতরে যাইবে না, বাহির হইতেই ফিরিয়া আসিবে। দিবালোকে সে কাহাকেও মুখ দেখাইবে না।

দ্বার খুলিয়া চৌকাঠের বাহিরে পা দিয়াই উমা সহসা বিস্ময়ে দুই হাত পিছাইয়া আসিল। একটা অস্ফুট চীৎকারও অতর্কিতে তাহার মুখ দিয়া বুঝি সেই সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

মুখ ফুটিল।

ঘরের বাহিরে ঘেরা দালান—তাহার সব কয়টা দরজা জানালা বন্ধ করিয়া বিদ্যুতালোক জ্বালিয়া আসনাভাবে সতীনাথ একটা ষ্টীল ট্রাঙ্কের উপর চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। উমা দ্বার খুলিতেই সে কাছে আসিয়াই মৃদুস্বরে কহিল, "আমায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রেখেছ উমা।"

স্বামীর মুখে উমা আজ প্রথম তাহার নিজের নাম উচ্চারিত হইতে শুনিল। শুনিল, সে তাঁহাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করাইয়া রাখিয়াছে। তাহার প্রয়োজনীয়তাই বা কি? গোড়া কাটিয়া আগায় আর এ জলসেচন কেন? মরুভূমিতে আলেয়ার আলো জ্বালিয়া তৃষিতকে দিগ্‌ভ্রান্ত করিবার এ বুঝি কোনও নূতন আয়োজন? না না, বুঝি তা ছাড়া আরও কিছু আছে—বোধ হয় সেই সন্ধ্যার ঘটনা। প্রায়ান্ধকার কক্ষে কেন তিনি মুরারির কাছে উমাকে দেখিয়াছিলেন, সে কৈফিয়ৎ পাওয়া যে এখনও তাঁহার বাকী আছে। আজ উমা অপরাধিনী, আর উনি বিচারক। অন্তরে যে প্রবল বিদ্রোহের ঝড় বহিতেছিল, উমা বাহিরে তাহার কোনও আভাস জানাইল না। সে স্থির হইয়া বদ্ধদৃষ্টিতে মাটীর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সতীনাথ ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। দ্বারে পিঠ রাখিয়া দাঁড়াইয়া, অতি কোমল কণ্ঠে নত-বদনা উমার পানে দৃষ্টি স্থির করিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "আমায় কিছু বলবে কি?"

উমা মুখ তুলিয়া স্বামীর রাত্রিজাগরণে ম্লান চিন্তা-শুষ্ক মুখের উপর আপনার অচপল দৃষ্টি স্থির করিয়া কহিল, "না।"

"কিছুই না? কোন কথাই কি বলবার নেই?"

মেঘে মেঘে ঘর্ষণে বিদ্যুদগ্নির উদ্ভব হয়, সে অগ্নিতে শুধু দাহিকাশক্তি থাকে না, অন্ধকারের গাঢ়ত্বও বাড়ায়। আবার তেমনি দৃঢ় তেমনি অচপল স্বরে উত্তর হইল, "না।"

শীতে বা যে কারণেই হউক, সতীনাথের দীর্ঘ দেহ ঈষৎ কম্পিত হইল। মুখের মৃদু হাসিটুকু মিলাইয়া না গেলেও তাহার রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, কণ্ঠস্বরও একটুখানি যেন কাঁপিয়া গেল—"আমাদের নির্জ্জন সাক্ষাৎ এই প্রথম,আর—আর—হয়ত—উমা আমায় কি কিছুই তোমার বলবার নেই? শোনবার কোন কথা—"

স্বামীর নির্লজ্জ ধৃষ্টতায় আজ উমা অন্তরের বেদনার উপর শুধু আঘাত পাইল না, সেই সঙ্গে নিজেকে সে অপমানিতও মনে করিল। যে কথা উনি শুনাইতে চাহিতেছেন, সে কথা সে শুনিয়াছে। ওগো দয়ালু, তোমার অনেক দয়া, দয়া করিয়া আর কিছু বলিও না।

তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া সতীনাথ যেন আশান্বিত ভাবে কহিল—"বল—"

কি বলিবে? ওগো তোমরা বলিয়া দাও, উমা কি•

বলিবে। বলিবে কি, আমায় মুক্তি দিয়া তোমরা মুক্ত হও। তবে তাই হোক। এই পথই যে উমার ভাগ্যবিধাতা তাহার নিজের হাত দিয়াই তাহাকে করাইয়া লইতে চাহিতেছেন, সে অদৃশ্য অঙ্গুলি-হেলনের অসীম শক্তি সে কেমন করিয়া নিজের দুর্ব্বল শক্তিতে প্রতিরোধ করিবে? একান্ত নির্ভরপরায়ণ জীবন্মৃত জেঠামহাশয়, ভ্রাতৃপ্রতিম প্রিয়তম সুধীর,—এ মুক্তির মূল্যে তাঁহাদেরও বিসর্জ্জন দিতে হইবে। কিন্তু সে কি করিবে, এই যে তাহার বিধিলিপি! এখানকার দান এখানেই ফিরাইয়া দিয়া, শোণিতাপ্লুত ক্ষত হৃদয়ে আবার সে দুঃখিনী মায়ের স্নেহাঞ্চলের তলে ফিরিয়া যাইবে, সেখানে তাহার স্থানের অভাব হইবে না। মরণকালে চোখের জলে বিদায় দিবার লোকাভাবও ঘটিবে না। সমুদ্রে যে শয্যা বিছাইয়াছে, শিশিরবিন্দুতে তাহার আর ভয় কেন? স্বামীকে সে তাঁহার কাঙ্ক্ষিত মুক্তি দিয়াই গৃহিণীহীন গৃহে নূতন অভ্যাগতের স্থান ছাড়িয়া দিয়া যাইবে। চিরবিদায়ের দিনেও সে তাহার অন্তরের দৈন্য প্রকাশ করিয়া যাইবে না। লোকে কি বলিবে—তা যা ইচ্ছা বলুক। তবু সে ত জানিবে, পরিত্যক্তা হইলেও, ত্যাগের মন্ত্র স্বেচ্ছায় নিজের মুখেই সে উচ্চারণ করিয়াছে; জোর করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিতে হয় নাই।

উমা মুখ তুলিতেই সতীনাথের উদ্বেগ-ব্যাকুল জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলিল। সে কহিল, "আমায় হুগলী পাঠিয়ে দিন।"

সতীনাথ বিস্মিত হইল। সেদিন পিত্রালয় গমনে উমা অনিচ্ছার যে কারণ দর্শাইয়াছিল, মনের কাছে সে কারণ যতই তুচ্ছ হউক, বাহিরে এখনও ত তাহা খণ্ডিত হইবার কোন যুক্তি পাওয়া যায় নাই। তবে? কহিল—"হুগলী যাবে কেন? জেঠামশায়কে এখন এরকম অবস্থায় রেখে থাকতে পারবে সেখানে?" —কণ্ঠস্বরেও বিস্ময় ধ্বনিত হইল।

আহত স্থানেই আঘাত লাগে, কিন্তু আঘাতকারী যদি জানিয়া সে আঘাত করে তবে আঘাতের বেদনা বুঝি নিরুপায় ক্রোধে যন্ত্রণা জানাইতে পারে না। উমা এ শরাঘাত গায়ে পাতিল না। কহিল—"আমি—আমি সব পারি।"

"তা পার—কিন্তু সেখানে কি বলবে? তাঁরা যদি বলেন, এখন হঠাৎ কেন এলে?"

উমার মুখের সবটুকু রক্ত নিমেষে সরিয়া গিয়া মুখখানা বিবর্ণ হইয়া, তখনই আবার ঘোর লোহিত রাগে রাঙা হইয়া উঠিল। লোকের কাছে কৈফিয়ৎ দিবার এদিকটা সে এতক্ষণ তলাইয়া দেখে নাই, এ কথা হয়ত তুচ্ছ বলিয়া মনেও পড়ে নাই। কিন্তু তুচ্ছ বলিয়া সংসার কোন জিনিষকেই বাদ দিবে না। তা সে জন্য উহার শিরঃপীড়ার প্রয়োজন কি? তবে কি সত্যপ্রকাশে উনি অনিচ্ছুক? নিজের অপরাধেই উমা স্বামিগৃহ-বিচ্যুতা হইল, এইটুকুই কি তবে প্রকাশ করিতে চান? মুরারির আচরণই তবে তাঁহার যুদ্ধজয়ের ব্রহ্মাস্ত্র! এই সুযোগই চাহিতেছিলেন! ক্রোধে ক্ষোভে অপমানে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, তবু সে জোর করিয়া কহিল—"সে চিন্তা আমার।"

সতীনাথ নতমুখে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, এক সময় মুখ তুলিয়া কহিল—"তা সত্যি, কিন্তু এর উত্তর আমিও কি চাইতে পারিনা? যত মন্দই হই, স্বামী বলে' আমায় অস্বীকার করতে পারবে না ত!"

সতীনাথের ওষ্ঠে তাহার অভ্যস্ত বিদ্রূপের মৃদুহাসি ফুটিতেই, অপমানের ব্যথায় উমার মুখখানা আবার বিবর্ণ হইয়া আসিল। সত্যই উনি স্বামী! বিধাতার এত বড় বিড়ম্বনা আর কোথাও না ঘটিলেও, এক্ষেত্রে অস্বীকার করিবার উপায় ত নাই। উনি যাহাই করুন, তবু স্বামী। তাই ছুতা পাইয়া আজ নিজের স্বত্ব প্রমাণ করিতে আসিয়াছেন। এ সতর্কতা এতদিন কোথায় ছিল? যে স্বামী অবহেলায় স্ত্রীকে পথের লোকেরও দুই কথা বলিয়া যাইবার সুযোগ দেন, তিনি আবার কোন মুখে নিজের সম্বন্ধ স্মরণ করাইয়া দিতে আসেন? উমার চিরসহিষ্ণু চিত্ত আজ অতর্কিত আঘাতে তাহার সহিষ্ণুতা হারাইয়া ফেলিল। সে

আর সহ্য করিবে না, করিতে পারিবেও না। সে মুখ ফিরাইয়া সতীনাথের প্রশ্নের উত্তরে কহিল—"আমি ক্লান্ত হয়েচি, আমি চলে যাব।"

সতীনাথের মুখখানা লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। উমা মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল তাই দেখিতে পাইল না। সতীনাথ বলিতে গেল, আজ এতদিনের পর ক্লান্ত হইলে কেন? ওগো পাষাণী এতদিনের পর সত্যই কি তবে তোবার আসন টলিয়াছে, তবে তুমিও ক্লান্ত হও? মনের কথা সে কিন্তু কিছুই বলিতে পারিল না। শুধু মৃদুস্বরে কহিল—"কেবল তাই—"

স্বামীর কথার অর্থ না বুঝিয়া, সহসা বারুদস্তূপে অগ্নি দিলে যেমন করিয়া ফাটিয়া পড়ে, তেমনি করিয়া জ্বলিয়া সে মুখ ফিরাইল। উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টিতে তীব্র ঘৃণা হানিয়া কহিল—"মুরারি ঠাকুরপোর কথা বলচেন?"

অত্যন্ত অপ্রতিভস্বরে লজ্জাকুণ্ঠিত ভাবে সতীনাথ বাধা দিল—"না না, তার কথা আমি কিছুই বলিনি, বলবও না। যার নিজের অপরাধ পাহাড়ের চেয়ে ভারী, পরের ছিদ্র খোঁজবার স্পর্দ্ধা সে কিসে নেবে? এত নীচ আমায় মনে কোর না উমা!"

দৃঢ় নিশ্চিত বিশ্বাস যদি অতর্কিতরূপে মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তবে প্রমাণকারীর উপর যেমন করিয়া সংশয়ে বিস্ময়ে লোকে চাহিয়া দেখে, তেমন করিয়া উমার রোষদৃপ্ত আঁখিতারা বিস্ময়ে ভরিয়া সতীনাথের লজ্জিত মুখে নিবদ্ধ হইয়া, কখন শান্ত হইয়া গেল সে বুঝিতেও পারিল না। কিছুক্ষণের জন্য আত্মবিস্মৃতের মত সে যেন নিজের অবস্থা ভুলিয়া অভিভূত ভাবে চাহিয়া রহিল। সতীনাথ যে সেই অবসরে তাহার কতখানি কাছে আসিয়া দাড়াইয়াছে, তাহাও সে বুঝিতে পারে নাই।

তাহার মনের ভাব না বুঝিয়া তাহাকে বাপের বাড়ী যাইতে বাধা দেওয়ায় দুঃখিত মনে করিয়া তাড়াতাড়ি সতীনাথ নিজের ভুল শুধরাইয়া লইল। কহিল—"বেশ, হুগলীই যেও। কালই কি যাবে? এই দুর্য্যোগে শীতে—তা হোক—দুপুর বেলা গেলেও আমি তোমায় পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসতে পারব।"

উমা বাধা দিয়া কহিল, "আপনি যাবেন? না না তা করবেন না, কাকেও দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন।"

"কেন উমা?"

স্বামীর কণ্ঠে এমন ব্যথা-কাতর স্বর সে তাহার অভিজ্ঞতায় আর কখনও শোনে নাই। তাহার স্বাভাবিক করুণ চিত্ত আজ এ আঘাতে বিচলিত হইলেও দমিল না। সে কহিল—"তাঁরা গরীব, সে কুঁড়ে ঘরে—দরকারও ত নেই যাবার—"

সতীনাথ হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "সেখান থেকেই বোধ হয় আমি তোমায় এনেছিলুম—আবার আমার স্ত্রীকে সেইখানেই রাখতে যাব।"

নিদাঘের তীব্র তাপদাহ জুড়াইয়া অকাল বর্ষণে এ কি শীতলতা আনিয়া দিল রে! সকল বিদ্রোহ সব অপমান চিরদিনের অবহেলার ব্যথা ভুলিয়া মন যে ঐ চরণতলেই লুটাইতে চায়! মরণপথের যাত্রীকে আর এ জীবনের আলোর লোভ দেখান কেন? আজ এতকালের পর চিরবিদায়ের দিনে তবে স্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিলে? এই কি বিদায়ের পাথেয়? উমা আর্ত্তভাবে কহিল, "সেখানে তাঁদের কাছে কি বলবেন? তাঁরা যদি বলেন, কেন ওকে নিয়ে গেছলে, কেনই বা ফিরে দিলে?"

"ফিরে দিলুম উমা?—"

সে ব্যথিত ভর্ৎসনার সুরে উমা ব্যথা পাইলেও, কথা কহিল না। কিছুক্ষণ নত মুখে চুপ করিয়া থাকিয়া সতীনাথ কহিল, "তুমি তবে তাই চাইচ—আমায় চিরকালের জন্যে ত্যাগ করে, এখানকার সব সম্বন্ধ কাটিয়ে যেতে চাইচ বল? বল, তাই চাইচ?"

সতীনাথের মুখ শ্বেতপাথরের মত সাদা হইয়া গিয়াছিল; কণ্ঠস্বরও বেদনায় কাঁপিতেছিল। উমা স্বামীর মুখের দিকে চাহিতে না পারিয়া নতমুখে মৌন হইয়া রহিল। সতীনাথ দরজা ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া

কহিল, "তাই হোক, এই তোমার দোর খোলা হয়ে গেল উমা। কিন্তু তবু আমি তোমার সঙ্গে যাব। কেন যাব তাও শোন। যে কথা এতদিন তোমার কাছে বলতে পারি নি, এখন তা বল্‌ব! জীবনের কোন অপরাধ—যদি তা অপরাধই হয়, তাও আমি গোপন করব না। দাদামশায়ের কাছে যা বল্‌ব, তুমিও তা শোন। প্রথম যৌবনে একজনকে আমি ভালবেসেছিলুম। শুধু চোখের নেশা নয়, প্রাণ দিয়েই ভালবেসেছিলুম। একটা প্রকাণ্ড ভুলের বশে তার উপরে তোমার উপরে যে অন্যায় আমি করেছি, তাও অস্বীকার করব না। কিন্তু সে ভুল জেনে, নিজেকেও আমি মাপ করিনি। নিজেকে বিবাহিত জেনে, তার চিন্তা পর্য্যন্ত প্রাণপণে ভুলতে চেয়েচি। স্বার্থ বা লোভের জন্যে আমার চির-কালের বিশ্বাস আমি বদল করতে চাইনি। নিজের দুঃখ দুর্ভাগ্যে তখন তোমার কথা আমার মনে হয় নি। ভেবেছিলুম, কখনও তোমায় ভালবাসতে পারব না, তোমার কাছে তা চাইবও না। কিন্তু যখন থেকে তোমায় চিনেছি, তখন থেকেই তোমায় ভালবেসেছি! নিজেকে অপরাধী জেনে কখনও সে কথা সাহস করে বল্‌তে পারিনি। তবু বিশ্বাস কোর, তুমি আমায় ছেড়ে চলে গেলে আমার বেঁচে থাকা ভার হবে—হয়ত আমি বাঁচবও না।"

শেষের কথাগুলি অত্যন্ত আবেগের সহিত বলিয়া, সতীনাথ তাড়াতাড়ি জানালার ধারে গিয়া বাহিরে মুখ করিয়া দাঁড়াইল। তাহার কম্পিত পা দু'খানার পানে চাহিলেই তখনকার মানসিক আবেগ স্পষ্ট বোঝা যাইত।

বাহিরের ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গিয়া একটা প্রশান্ত নির্ম্মলতা প্রকাশ পাইতেছিল। ভোরের আলোয় বৃষ্টিধৌত গাছপালার কোমল শ্যামলিমা সুস্পষ্ট হইয়া হইয়া উঠিয়াছে। অতি বর্ষণে মেঘহীন আকাশ ভার-মুক্ত অন্তরের মত প্রশান্ত ও উজ্জ্বল। পূর্ব্বাকাশে উষার অস্পষ্ট আলো সবেমাত্র জাগিয়া উঠিতেছে। আকাশের এক প্রান্ত রক্তিমরাগে রঞ্জিত করিয়া ধীরে ধীরে উজ্জ্বল অগ্নি গোলকটি ক্রমে ক্রমে আত্ম প্রকাশ করিল। দেখিতে দেখিতে সেটি একখানি সুবর্ণের থালার আকার ধারণ করিল। যেন কোন অদৃশ্য দেবতার চরণোদ্দেশে আরতি করিবার জন্য নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে —অতি ঊর্দ্ধে উঠিতেছিল।

পায়ের কাছে কোমল শীতল করস্পর্শে চমকিত হইয়া সতীনাথ মুখ ফিরাইল, তখনও তাহার চোখের কোলে, শুভ্র গণ্ডে জলের চিহ্ন—হয়ত সে বৃষ্টির ছাট। উমা তাহার পায়ের তলায় মাথা রাখিয়া প্রণাম করিয়া মুখ তুলিতেই, স্ত্রীকে স্পর্শ না করিয়া মৃদুস্বরে সে কহিল, "আমায় মাপ করতে পারবে কি?"

উমা স্বামীর পদস্পর্শ করিয়া, পায়ের ধূলা মাথায় দিয়া গাঢ়স্বরে কহিল, "আপনি আমায় মাপ করুন!"

সতীনাথ এইবার মনে মনে ভক্তিপূর্ণ চিত্তে, অনন্ত-শক্তিমান সেই অদৃশ্য মিলনকর্ত্তাকে প্রণাম করিল। যাঁহাকে সন্দেহ করিয়া, যাঁহার সর্ব্বব্যাপক স্নেহে বিশ্বাস হারাইয়া, একদিন মনের কাছেও যাঁহাকে সে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছিল, আজ অকুণ্ঠিত চিত্তে তাঁহার অসীম করুণা মনেপ্রাণে পূর্ণরূপে অনুভব করিয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিল। স্ত্রীর কম্পিত হাতখানা নিজের হাতের ভিতর রাখিয়া কহিল, "উমা তুমি শুধু আমার স্ত্রী নও, যথার্থই সহধর্ম্মিণী। তোমার বিশ্বাসে, তোমার শ্রদ্ধায়, তোমার ধৈর্য্যে, আজ আমার অপহৃত বিশ্বাস ফিরে পেয়েছি।"

নবজীবনের আনন্দদাতার উদ্দেশে এবার তাহারা দুজনে এক সঙ্গে মাটিতে মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীচরিত্র।

রুদ্রকান্তকে দেখিতে আসিয়া একদিন বিদ্যানাথ উমার কাছে কল্যাণীর কথা বলিয়া গেলেন। কল্যাণীর পরিচয় অন্নপূর্ণার পত্রে উমা অবশ্য সবিশেষ জ্ঞাত আছে

এই ধারণায় সকল কথা খুলিয়া বলার কোন প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করিলেন না। আত্মসংযমে চির অভ্যস্থা উমা প্রশ্ন করিয়া তাঁহাকে শুনাইতে যে বাধ্য করিবে না তাহাও বিশ্বনাথের জানা ছিল।

বিশ্বনাথ চলিয়া গেলে উমা বিছানায় পড়িয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। যে উমা মুরারির মুখে স্বামীর অন্যাসক্তির পরিচয় পাইয়া নিজের মৃত্যুকামনায় অধীর হইয়াছিল, সেই উমা স্বামীর মুখে প্রকৃত ঘটনা শুনিয়া সমবেদনায় কল্যাণীর জন্য লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কতবার ইচ্ছা হইয়াছে স্বামীর পায়ে ধরিয়া বলে যে, অযোগ্যা উমা যদি তাঁহার চরণে স্থান পাইল, তবে কল্যাণীই বা সে সুখে বঞ্চিত হইবে কেন? তিনি কল্যাণীকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনুন, উমা নিজে বরণ করিয়া, তাহাকে ঘরে তুলিবে, খুসী হইয়া তাহার সকল অধিকার সপত্নীকে ছাড়িয়া দিবে। মনের মধ্যে বিদ্রোহ চলিলেও সে সাহস করিয়া মুখে বলিতে পারিত না। কল্যাণীর মর্ম্মবেদনা আত্মহৃদয়ে অনুভব করিয়া, স্বামিপ্রেমের অংশীদার গ্রহণে আজ স্বেচ্ছায় সে সম্মত। দুর্জ্জেয় স্ত্রীচরিত্র যখন দেবতাদেরও অবোধ্য, তখন উমা-চরিত্রই বা সে নীতির ব্যতিক্রম করিবে কেন? সতীনাথের ভালবাসা যতই সে মনে প্রাণে অনুভব করিতেছিল, মনটা তাহার কল্যাণীর জন্য ততই হায় হায় করিয়া উঠিতেছিল। এমন হৃদয়ের একাধিপত্য পাইয়াও যে দুর্ভাগিনী তাহা রাখিতে পারিল না, তাহার জন্য সান্ত্বনা বুঝি কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কল্যাণীর চিরকৌমার্য্যের সংকল্প উমার মনে প্রথমে একটা প্রহেলিকার সৃষ্টি করিয়াছিল। সে ভাবিত, এ আবার কি বাপু! হিঁদুর মেয়ের মেম সাহেবের মত নিজের আবার বিয়ের মতামত কি?" এখন সে কার্য্যও উমার চোখে আর নিন্দনীয় নহে। এখন সে ভাবে, "এঁকে যে কখনও ভালবেসেছে, স্বামী মনে করেছে, সে কি কখন আর ভুলতে পারে?" কুমারী কন্যার স্বেচ্ছানির্ব্বাচিত স্বামিগ্রহণে একমাত্র পুরাণোক্তা সাবিত্রীদেবী ছাড়া উমা এ পর্য্যন্ত মনে মনে কোন নারীকেই প্রশংসা করিতে পারে নাই। আজ কল্যাণীর অবস্থা ভাবিয়া কল্যাণীর কার্য্য তাহার চক্ষে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় হইয়া উঠিতেছিল। অবিবাহিত থাকা ছাড়া তাহার যে আর কোন পথ নাই, উমা এখন তাহা বেশ বুঝিতে পারে।

মাথার চুলে মৃদু করস্পর্শে সচকিত হইয়া উমা মুখ তুলিল। সতীনাথ পাশে বসিয়া গভীর স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিল, "এমন সময় শুয়ে যে, কোন অসুখ করে নি ত? এ কি, কাঁদচ উমা?"

উমার চক্ষের জল এ কথায় বন্যার বেগে বাহির হইয়া পড়িল। সতীনাথ বিপন্নভাবে চুপ করিয়া বসিয়া; কি হইল জিজ্ঞাসা করিতেও সাহসে কুলাইল না। দাদামহাশয় আসিয়াছিলেন, তার পর উমার সন্ধান না পাইয়া সে তাহাকে খুঁজিতে আসিয়াছিল, ইতিমধ্যে কি এমন ব্যাপার ঘটিয়া গেল! কিছুক্ষণ বিনা বাধায় কাঁদিতে পাইয়া উমার মনের বেদনাটা অনেকখানি কমিয়া আসিল; তারপর স্বামীর উদ্বেগব্যাকুল মুখের পানে চাহিয়াই মনে হইল,এমন ছেলেমানুষের মত কান্না তাহার ভাল হয় নাই। সে এইবার চোখ মুছিয়া শান্ত হইয়া বিছনার উপর উঠিয়া বসিল। তারপর ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, "দাদামশাই আমাদের হুগলী যেতে বলে গেলেন—কবে যাবে?"

সতীনাথ একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "এই জন্যে কান্না—এমন ভয় পেয়েছিলুম!" পত্নীর শিশিরাশ্রু-মণ্ডিত পরিম্লান পদ্মের মত মুখের পানে চাহিয়া পরিহাসের ইচ্ছা যেটা মনে জাগিয়াছিল, সেটা তখন আর মুখে ফুটিল না। এ গৃহ ছাড়িয়া গেলে পুনঃপ্রবেশের ভয় এবার তবে সে নিঃসংশয়েই ছাড়িয়াছে। উমার রোদনারক্ত মুখের পানে চাহিয়া ব্যথায় তাহার চিত্তও ভরিয়া উঠিতেছিল। বালিকাকে বিনা কারণে দীর্ঘদিন আত্মীয়বিচ্ছেদ-যাতনা সহ্য করাইয়া অকারণে তাহাকে কতই না মর্ম্মপীড়িত করিয়াছে। এমন কান্না হয়ত গোপনে সে আরও কতদিন কাঁদিয়াছে, সে তাহার

খবরই লয় নাই। একটুখানি আবেগের সহিত সতীনাথ উমাকে কাছে টানিয়া কহিল, "কবে যাবে বল, সেই দিনই পাঠিয়ে দেব।" একটুখানি হাসিয়া রহস্যের সুরে পুনরায় কহিল, "এখন বোধ হয় বিশ্বাস করতে পার, বাড়ী ছেড়ে যেখানেই যাও, বাড়ীর সব দোরই চিরকাল তোমার পথ চেয়ে খোলা থাকবে।"

উমা স্বামীর বাহু বন্ধনে ধরা দিয়া রুদ্ধস্বরে কহিল, "কেন বন্ধ কল্লে না, এর চেয়ে সেও যে ঢের ভাল ছিল।"

সতীনাথ স্ত্রীকে আলিঙ্গন পাশ হইতে মুক্তি দিয়া সংশয়পূর্ণকণ্ঠে কহিল, "কিসের চেয়ে উমা? আমার ভালবাসার চেয়ে? এ যদি তোমায় ব্যথা দেয়, খুলে বল, তুমি যাতে সুখী হবে আমি তাই করব। আমার কাছ থেকে দূরে থেকে যদি সুখী হও—"

"ওগো না গো না, কেন তুমি আমার জন্যে এত সইলে? আমি ত তাঁর পায়ের ধুলোরও যোগ্য নই—"

সতীনাথ এবার সংশয়ে বিস্ময়ে ব্যাকুল নেত্রে চাহিয়া রহিল, প্রশ্ন করিল না। কথাটা খুলিয়া বলা উমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন, কেমন করিয়াই বা বলিবে? অথচ না বলিলেও যে নয়। হয়ত তাঁহার জীবন-দীপ কখন এতটুকু ঝড়ের বাতাস না উঠিতেই নিবিয়া যাইবে। আর ত কখনও দেখা হইবে না। সতীনাথের চরিত্র উমার অজ্ঞাত নয়। স্বামী যে কোন প্রশ্ন করিবেন এমন সম্ভাবনাও নাই। সে সতীনাথের দক্ষিণ হস্ত নিজের হাতের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়া চেষ্টা করিয়া, মনের দ্বিধা কাটাইয়া কহিল, "কল্যাণী দিদির খুব অসুখ, তিনি আমাদের দেখতে চেয়েছেন।"

ধৃত হাতখানার মৃদু কম্পনে ও অত্যধিক শীতলতা অনুভব করিয়া বুদ্ধিমতী উমা তাঁহার মনের দ্বিধা বুঝিয়া আবার কহিল, "যাবে ত? কেন যাবে না? সত্যি বল্‌চি ক'দিন আমি রাত দিন তাঁর কথাই ভেবেচি। তোমরা কুলীন, অনেক বিয়ে তোমাদের ত—"

ভর্ৎসনাপূর্ণ চোখে স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া সতীনাথ নিজের হাত ছাড়াইয়া লইল। সে দৃষ্টি যেন বলিতেছিল, আর যে যাহা বলুক, তোমার মুখে এ কথা সাজে না। আমার মনের সব কথাই ত আমি তোমায় বলিয়াছি, তবে এ পরীক্ষা আর কেন?

কিন্তু চুপ করিয়া থাকিবার দিনও যে কাটিয়া গিয়াছে। প্রতীকারের সময় যদি আর নাই পাওয়া যায়, যে তাঁহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া তাঁহারই ঐশ্বর্য্যে ধনী হইয়া বসিয়াছে, ভিক্ষুকের মত তাহারি কাছে আবেদন জানাইয়াও তবে কি তিনি এতটুকুও পাইবেন না। দাদামহাশয় বলিয়াছেন, কল্যাণী উমাকে ভালবাসেন। এতবড় শত্রুকেও যিনি ভালবাসিতে পারেন, উমা তাঁহার জন্য কিছুই করিতে পারিল না? এইটুকু, এই মরণ-পথের শেষ স্মৃতি সুখটুকু, এটুকুও কি উমা তাঁহাকে তবে দিতে পারিবে না? স্বামীর ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টির সম্মুখ হইতে সে মুখ ফিরাইয়া লইল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "তিনি দেখতে চাইলেন, তবু যাবে না? বল্‌বে না, যে শুধু ভুলের জন্যে তাঁকে এত কষ্ট দিলে, নিজেও পেলে? বল্‌বে না যে তুমিও তাঁর মতনই তাঁকে ভালবাস্‌তে? ক্ষমা চাইবে না? এ সময়েও তাঁকে খুসী কর।"

প্রবল অশ্রুধারায় উমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। খাটের ডাণ্ডার উপর পা রাখিয়া সতীনাথ এবার করতল দিয়া মুখ ঢাকিল। অনাবৃত প্রশস্ত বক্ষের শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্রুত উত্থান পতনে মানসিক উচ্ছ্বাস দমনের অদম্য প্রয়াস উমার অলক্ষিত রহিল না। সহানুভূতিতে মন তাহার দ্রব হইয়া স্বামীর মর্ম্মব্যথার পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতেছিল। তবু সে ব্যথার মধ্যেও একটা অস্ফুট সান্ত্বনার আনন্দের ক্ষীণ আভাসও বুঝি গোপনে ছিল। এমন হৃদয় এমন করিয়া যাহার জন্য কাঁদে, কে বলে সে দুর্ভাগিনী? কে জানে উমার কপালে এমন শুভদিন কখনও আসিবে কি না, এত সৌভাগ্য তাহার আছে কি না।

অনেকক্ষণের পর চোখ মুছিয়া শান্ত হইয়া সে স্বামীর মুখে আচ্ছাদিত হাত দুইখানা সরাইয়া মৃদু-

স্বরে কহিল—"চল আমরা দুজনে তাঁর কাছে মাপ চেয়ে আসি।—মাপ তিনি আমাদের করেইচেন, সেবার পুণ্যে কেন বঞ্চিত হব?"

"আজই যাবে কি—জ্যেঠামশায়কে বলে' তা হলে ঠিক করে আসি।"

মানুষের ইচ্ছা ও বিধাতার কার্য্য পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কখনও চলে না, উমার ইচ্ছাও পূর্ণ হইল না। রুদ্রকান্তের পীড়া সহসা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠায়, মনের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা মনের ভিতর বদ্ধ রাখিয়াই সতীনাথ ও উমা জেঠামহাশয়ের রোগ শয্যার দুইদিকে নিজেদের অচল আসন পাতিয়া লইল। এমন অবস্থায় কেমন করিয়া তাহারা চলিয়া যাইবে? বিশেষতঃ সতীনাথের যাওয়া যে একেবারেই অসম্ভব। রোগ ত সাধারণ নিয়মে আবদ্ধ নয়, কখন কি হয়, কিছুই বলা যায় না। ডাক্তারেরা বলিয়াছেন, রোগের আবির্ভাব যেমন অতর্কিত ঘটিয়াছে, মৃত্যুও তেমনি আকস্মিক হইতে পারে। রোগীর মনের শক্তিও ক্রমে যেন স্তব্ধ হইয়া আসিতেছিল। কথা কহিতেও ক্লান্তি বোধ হয়, এমনি দুর্ব্বলতা। আহারেও রুচি নাই, কেবল উমার হাতে তাহারই অনুরোধরক্ষার্থ যেটুকু আহার করেন—অন্যের দ্বারা সেটুকুও সম্ভব নয়। চক্ষের দৃষ্টি দিনের দিন হ্রাস হইয়া আসিতেছিল।

মুরারি মার অসুখের অছিলা করিয়া সেই যে সেদিন কাহাকেও না বলিয়া চলিয়া গিয়াছে, তারপর প্রায় মাসাবধি হইয়া গেল সে আর ফিরিয়া আসিল না। সতীনাথ উমার অনুরোধ জানাইয়া তাহাকে আসিবার জন্য পত্র দিয়া আজ উত্তর পাইয়াছে। মুরারি বৌরাণীর অসীম দয়ার জন্য চিরকৃতজ্ঞতা জানাইয়া শেষে লিখিয়াছে, "কলিকাতার বাস আমি চিরজন্মের মতই উঠাইয়াছি। তিনি যেন নিজগুণে তাঁহার অকৃতজ্ঞ দেবরকে ক্ষমা করেন। পিতৃ-পিতামহের স্মৃতিতীর্থ পল্লীভবন আর পল্লীজীবনই আমার পক্ষে নিরাপদ স্থান।"

চিঠি পড়িয়া উমার চোখ দিয়া দুই ফোঁটা অশ্রুজল গড়াইয়া পড়িল। একটা দুর্ব্বোধ্য চিন্তার বিশ্লেষণে অসমর্থ হইয়া সতীনাথও একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। আবাল্যের সাথী, খেলার সঙ্গী, যৌবনের বান্ধব মুরারি আজ তাহাদের চিরদিনের জন্য ছাড়িয়া চলিয়া গেল। রুদ্রকান্তকে সতীনাথ একথা জানাইল না; মার অসুখ তাই সে দেশে গিয়াছে এই কথাই প্রচার করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

অবসান।

মাঘ গিয়া ফাল্গুন আসিল। নব বসন্তের আগমনে আমের গাছে মউল ধরিয়া, সজিনার ফুল ফুটিয়া মধুগন্ধে দিক ভরাইয়া দিল। পুষ্পিত তনু ফুলভারে নমিতা মাধবীলতা বসন্তলক্ষ্মীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিল। বিশ্বনাথের ছোট বাগানটীও নব বসন্তের অভ্যুদয়ে ফুলে পাতায় ভরিয়া উঠিতেছে। শীতাগমে যে সব গাছের পাতা ঝরিয়া গিয়াছিল, ফুলধন্বার শরনির্ম্মাণের জন্যই যেন সে সব গাছে নব পত্রাবলী উদ্গত হইতেছে।

শীতাগমে ধরণীর শুষ্কবক্ষে নবজীবনের পুলকচাঞ্চল্য জাগাইয়া তুলিলেও, কল্যাণীর তৈলহীন অনুজ্জ্বল জীবন-প্রদীপ আর উজ্জ্বল করিতে পারিল না। প্রকৃতির বক্ষে যে সুন্দর ফুলটি মৃদু সৌরভ ছড়াইয়া ফুটিয়াছিল, ধীরে ধীরে তাহার লাবণ্যের সতেজ দলগুলি ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। অনিন্দ্য মুখে মৃত্যুর ছায়া অতি দ্রুতগতিতে আপন শক্তির চিহ্ন আঁকিয়া তুলিতেছিল। বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা রাজলক্ষ্মী অনাথের অক্লান্ত স্নেহ যত্ন সেবাতেও রোগের গতি এতটুকুও ফিরিল না। তারাসুন্দরী যেন যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার মত সেবা করেন, বাকী সময়টুকু চুপ করিয়া মেয়ের কাছে বসিয়া থাকেন।

মায়ের মুখের পানে চাহিয়া কল্যাণীর মনের আনন্দও যেন কমিয়া আসিতেছিল। সে চলিয়া গেলে কেমন করিয়া তাহার মা বাঁচিয়া থাকিবেন, এত বড়

শোকের আঘাত যদি সহিতে না পারেন—এ মৃত্যু ত প্রার্থিত মৃত্যু নয়। এত বড় অগ্নিপরীক্ষা কেমন করিয়াই বা তিনি সহিবেন? অন্ধকারে কল্যাণীর চোখ দিয়া জলের ধারা গড়াইয়া পড়ে। সে মনে মনে বলে, "ঠাকুর, মা আমার তোমাকেই সার করেচেন। আমি তাঁর সন্তান আসিনি, শত্রু এসেছিলুম। মাকে আমার তোমার পায়েই রেখে যাব ঠাকুর, তুমিই তাঁকে দেখো।"

* * *

"দিদি রাত কি শেষ হ'ল ভাই?"

অন্নপূর্ণা কল্যাণীর মাথার কাছে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছিল। পাখা রাখিয়া উঠিয়া একটা জানালা অল্প একটুখানি খুলিয়া দিল। জানালায় কাচের সার্শি নাই, কাঠের দরজা; বেশী খুলিলে ঠাণ্ডা লাগিবে তাই সে একটুখানি খুলিয়া কহিল—"উমা আর একটু পরেই আস্‌বে, ভোরের গাড়ীতে বেরুবে 'তার' করেচে।"

কল্যাণীর বারবার নিশাবসান প্রতীক্ষার উৎকণ্ঠিত প্রশ্নে অন্নপূর্ণা বুঝিয়াছিল, তাহার ব্যাকুল চিত্ত কাহার দর্শনাশায় অধীর হইয়া উঠিয়াছে। ভীতচিত্তে সে ভাবিতেছিল, দীর্ঘ দিনের সংযম-সাধনার পর আজ কেন তাহার এ অশান্ত ব্যাকুলতা? তবে কি কল্যাণী আজ মুক্তির পরোয়ানা পাইয়াছে?—রাত্রে মৃদুস্বরে সে যেন একবার বলিয়াছিল—"দিদি, দেখা কি তবে হ'ল না ভাই?" উমাকে সে অনেকবারই আশীর্ব্বাদ করিয়াছে; জ্বরের ঘোরে আর একজনের কাছেও মাপ চাহিয়াছিল। প্রলাপবাণী বুঝি তা নয়, সত্যই কল্যাণী এখানকার দেনা মিটাইয়া ফেলিতেছে। কিন্তু তাও কি সম্ভব? ভগবান, এও কি তবে সহিতে হইবে? এতবড় রোগের যন্ত্রণা, এতখানি মনের যন্ত্রণা যে হাসিমুখে চিরদিন সহিয়া আসিল, সে কেন আজ এই অধৈর্য্যে বারবার বিছানায় এ পাশ ও পাশ করিতেছে, সতৃষ্ণ চক্ষু দ্বারের পানেই ফিরিতেছে?

সে রাত্রে বিশ্বনাথ ও অনাথ একবারও শয্যা গ্রহণ করেন নাই। বিশ্বনাথের চির প্রসন্ন মুখে বিষাদের ম্লান ছায়া স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া আছে। কেন এমন হইল? দীর্ঘরাত্রি জাগরণের পর তারাসুন্দরী অন্নপূর্ণা ও কল্যাণীর অনুনয়ে সবেমাত্র তাহারই শয্যাপ্রান্তে একটুখানি গড়াইয়া লইতেছিলেন। চোখ বুজিতে সাহস সাহস হয় না, কি জানি এইটুকু অসর্কতার অবসরে জীর্ণ পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া ক্ষুদ্র বিহঙ্গটি যদি মুক্ত আকাশে বাহির হইয়া পড়ে! তাই নিদ্রাহীন জ্বালাময় অপলক চক্ষু অন্ধকারেও চাহিয়া থাকে, বন্ধ হইতে পারে না।

অন্নপূর্ণা ফিরিয়া আসিয়া কল্যাণীর বিছানায় বসিয়া ঠাণ্ডা হাতখানা তাহার কপালে রাখিল। কল্যাণী তাহার হাতখানা টানিয়া মুদিত চোখের উপর বুলাইয়া লইয়া, মৃদুস্বরকে মায়ের কাণ এড়াইবার ইচ্ছায় মৃদুতর করিয়া কহিল, "কি ঠাণ্ডা হাত তোমার দিদি! তোমায় ছুঁয়ে থাক্‌লে আমার সব কষ্ট কমে যায়। আবার সেখানে যখন আমাদের দেখা হবে—"

"কলী অত নিষ্ঠুর হোস্‌নে ভাই, এমন করে আমায় বিঁধিসনে—"

অন্নপূর্ণার রোদনরুদ্ধ স্বরে সচকিত হইয়া তারাসুন্দরী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন। কল্যাণীর পীড়া বর্দ্ধিত হওয়ায় বিশ্বনাথ নিজের বাড়ীতে তাহাকে আনিয়াছিলেন। দাদামহাশয়ের প্রার্থিত সঙ্গলাভে কল্যাণীরও আর কোন দুঃখ ছিল না। বিশ্বনাথকে ঘরে আসিতে দেখিয়া কল্যাণী মৃদু হাসিয়া কহিল—"দিদি ভেবেচে কেঁদে জিত্‌বে—তা পারবে না দাদমশাই।"

বিশ্বনাথ তাহার পাশে বসিয়া শান্তস্বরে কহিলেন—"এখন কেমন আছ দিদি, বুকের বেদনাটা কমেচে কি?"

কল্যাণী হাসিমুখে কহিল, "বেশ আছি দাদামশাই। আজ যেন মনে হচ্চে আমার সব যন্ত্রণা ফুরিয়ে গ্যাছে।" অনাথকে নতশিরে ম্লানমুখে পাশে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে মৃদু হাসিয়া কহিল, "অনাথদাদা, আজ আপনার ছাত্রেরা স্তব পাঠ কল্লেন না যে?"

কল্যাণীর নাড়ীর অবস্থা দেখিয়া বিশ্বনাথ আশা ছাড়িয়া দিয়াছেন। গৃহে মৃত্যু তাহার আগমনের

ছায়া বিস্তার করিতেছিল। গৃহবাসী সকলেই গভীর শোকাচ্ছন্ন; ছাত্রেরাও ব্যথিত হৃদয়ে নির্ব্বাক হইয়া আছে। সকলেই যেন গভীর বিষাদের সহিত কোন একটা অতর্কিত বিপদের সম্ভাবনা প্রতীক্ষা করিতেছে, চেষ্টা করিয়াও সে অনীপ্সিত চিন্তা ছাড়াইতে পারিতেছে না। বিদ্যানাথ অনাথের পানে পূর্ণনেত্রে চাহিতে অনাথ নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

বাহিরে একত্রগ্রথিত মৃদু গম্ভীর স্বরে অনাথ ও তাহার ছাত্রমণ্ডলীর উচ্চারিত স্তবগীতি ভোরের বাতাসকে শব্দিত করিয়া তুলিল। অন্ধকার অপসারিত করিয়া উষার আলো জগতের বক্ষে ছড়াইয়া পড়িল। বাহিরে খাঁচায় টাঙ্গান টিয়া পাখীটাও বিদ্যানাথের কণ্ঠস্বরের অনুকরণে "তারা ব্রহ্মময়ী" বলিতেছিল।

কল্যাণী চোখ মুদিয়া শান্তভাবে সেই চিরশ্রুত স্তবগাথায় আজ এক অভিনব আনন্দময় ভাবের স্পন্দন অনুভব করিতেছিল। হৃদয়তন্ত্রী সেই সুরের ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছিল। বিদ্যানাথ শুনিলেন, তাহার ঈষদুদ্ভিন্ন ওষ্ঠাধরের ভিতর দিয়া ক্ষীণ স্বরে সেই শব্দের প্রতিধ্বনি বাহির হইতেছিল,—

"ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়॥

ক্রমে কল্যাণীর কম্পিত ওষ্ঠ স্থির হইয়া গেল। সকলেই উৎকণ্ঠিত ও ব্যাকুল হইয়া তাহারই হৃৎস্পন্দনের মৃদু শ্বাস শুনিবার জন্য কাণ পাতিয়া রহিয়াছে। বিদ্যানাথ তাহার শ্লথ হস্ত নিজের হাতে তুলিয়া লইতেই সে চোখ চাহিয়া মৃদু হাসিল,—"দাদামশাই, ঐ যে আনন্দময়ের আনন্দমূর্ত্তি আমি দেখতে পাচ্চি। কি সুন্দর আলো!"

কণ্ঠস্বরের অত্যধিক ক্ষীণতায় বাকী কথা আর শোনা গেল না। অন্নপূর্ণার উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল দৃষ্টি ঘন ঘন মুক্তদ্বারের বাহিরে ছুটিয়া যাইতেছিল, মনের উদ্বেগ বাহিরেও প্রকাশ পাইল।

"সতীর ট্রেণের সময় হল বুঝি, ট্রেণ একটা দাঁড়াল না?"

কল্যাণী চোখ চাহিতেই, সহসা নিবাত নিষ্কম্প দীপের মত স্থিরমূর্ত্তি মায়ের পানে চোখ পড়িতেই, তাহার আনন্দোৎফুল্ল মুখখানা ম্লান হইয়া আসিল। অস্বাভাবিক দীপ্তিপূর্ণ চোখে জলের রেখা প্রকাশ পাইল। মার হাতখানা মৃদু আকর্ষণ করিতেই, তারা-সুন্দরী তাহার শ্রম বাঁচাইয়া ঈষৎ নত হইলে হাত-খানি সে নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। গভীর মিনতি ভরা চোখে বিদ্যানাথের দিকে চাহিয়া কহিল, "মা আমার আপনাকেই আশ্রয় করেচেন দাদামশাই।"

বিদ্যানাথ তাহার বক্তব্য বুঝিয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "মা যে আমারও মা দিদি, বিশ্বনাথ ওঁকে শান্তি দেবেন।"

তারাসুন্দরীর অন্তরের যে ব্যাকুল ক্রন্দন ব্যথিত বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইবার বৃথা প্রয়াসে ঝটিকাক্ষুব্ধ সমুদ্রোচ্ছ্বাসের মত গর্জ্জন করিতেছিল, বদ্ধ ওষ্ঠের বাহিরে তাহার একটুকু ক্ষীণ প্রতিধ্বনিও বাহির হইল না। অন্নপূর্ণা ও রাজলক্ষ্মীর অশ্রুমলিন মুখে আশঙ্কা ঘনায়িত হইয়া আসিল। রাস্তায় গাড়ী চলিয়া যায়, আর ঘরের সব কয়টী চোখ ব্যাকুলভাবে চাহিয়া দেখে। অন্নপূর্ণা মনের উদ্বেগ আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিলেন না, তবে কি সে আসিল না! বিদায় মুহূর্ত্তে চোখের দেখা অনির্দ্দেশ্য পথের শেষ সম্বল, এটুকুও কি সে ফেলিয়া যাইবে? ওগো নিষ্ঠুর, ওগো পাষাণ, একবার এসো। শুধু চোখের দেখা—এটুকু দিলে তোমার রাজভাণ্ডার খালি হইয়া যাইবে না; ওরে পাষাণী উমা, সর্ব্বস্ব লইয়া এতটুকুর লোভও ছাড়িতে পারিলি না!

কতকগুলি ফুটন্ত বেলফুল আনিয়া অনাথ কল্যাণীর বিছানায় রাখিলে বিদ্যানাথ মৃদুস্বরে কহিলেন, "ষ্টেশনে গেলে হত না, সে ত এখানকার পথঘাট কিছু জানে না।"

কল্যাণীর দুর্ব্বল হাতখানা বিদ্যানাথের পায়ের

ধূলা লইবার জন্যই যেন তাঁহার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল। ওষ্ঠাধরের মৃদু স্পন্দনে উচ্চারিত হইল "বিশ্বনাথ।" বাহিরে ছাত্রমণ্ডলী তখনও স্তবপাঠ করিতেছিল—

তদেকং স্মরামস্তদেকং জপামঃ
তদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
যদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥

শুনিতে শুনিতে বিশ্বনাথের দুই চোখ দিয়া দুইটি জলের ধারা গড়াইয়া পড়িল। শুনিতে শুনিতে কল্যাণী গভীর ঘুমে ঘুমাইয়া পড়িল। বিশ্বনাথ নাড়ী পরীক্ষা করিয়া হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন "দুর্গে।"

রাজলক্ষ্মী ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিতেই অন্নপূর্ণা কল্যাণীর বুকের উপর লুটাইয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"কল্যাণী দিদি আমার!" তারাসুন্দরী আস্তে আস্তে তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, "চুপ কর অন্নপূর্ণা, এখনি কল্যাণীর ঘুম ভেঙ্গে যাবে।" অন্নপূর্ণা উর্দ্ধস্বরে কাঁদিয়া আবার লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, "কলী যে আমাদের চলে গেল কাকীমা!"

তারাসুন্দরী পলকহীন স্থির নেত্রে কন্যার সুপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কল্যাণী কোথায় চলিয়া যাইবে, মার কোল ছাড়া তাহার ত জগতে আর কোথাও স্থান হয় নাই! সে-যে মাকে ছাড়িয়া কখনও কোথাও যাইবে না বলিয়াছিল, তবে সে কোথায় যাইবে? সে মুখে এতটুকু বিকৃতি নাই, ঠোঁটের মৃদু মধুর হাসিটুকু তেমনি উজ্জ্বল রেখায় আঁকা। এমুখ কি চিরনিদ্রার? তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ওগো না গো না, ও আমার ঘুমিয়ে পড়েচে। তোমরা সব চুপ করে থাক, বাছার আমার এখনি ঘুম ভেঙ্গে যাবে।"

বিশ্বনাথ ভীত হইয়া, তাঁহার মোহাবিষ্ট জ্ঞানকে সজাগ করিবার জন্য অশ্রুবদ্ধ গাঢ়স্বরে কহিলেন, "তুমিই ওকে ডাক মা। তোমার ডাক শুনে যদি ওর ঘুম ভাঙ্গে! আর কেউ ত এ ঘুম ভাঙ্গাতে পারবে না।"

রাস্তায় একখানা গাড়ী আসিয়া থামিল। সে শব্দ অন্য কাহারও কাণে না গেলেও বিশ্বনাথের গিয়াছিল। তিনি বাহিরে আসিতেই উমা তাঁহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া রাস্তার ধূলার উপরেই লুটাইয়া প্রণাম করিল। ভিতরের ক্রন্দন কোলাহল তাহাদের অব্যক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতেছিল; মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিবার আর কিছু প্রয়োজন ছিল না।

উমা রোদনরুদ্ধস্বরে ডাকিল, "দাদামশাই।"

"দিদি, বড় দেরী করে এলি ভাই, নিরঞ্জন হয়ে গ্যাছে।" উমার পশ্চাতে স্তম্ভিত অভিভূত প্রায় সতীনাথকে দেখিয়া, তাহার গায়ে স্নেহের হাত বুলাইয়া বুকে টানিয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "দাদাভাই, ব্রিজয়াকৃত্য তোমাকেই উপস্থিত থেকে করতে হবে। লৌকিক বিবাহ নাই হোক্, সেই তোমার প্রথমা স্ত্রী। তার সাধনার সিদ্ধি এখানকার সংকীর্ণ পরিচ্ছিন্ন জীবনের নয়, অনন্ত জীবনের। মৃত্যুজয়ী প্রেমের মৃত্যু নেই, শুধু রূপভেদ। উমা, তোর জন্মায়তি দিদিকে সিঁদুর আলতায় সাজিয়ে, পায়ের ধূলো নিয়ে নিজেকে ধন্য করে নে ভাই! তোদের আশীর্ব্বাদ করে সতী সতীলোকে চলে গ্যাছেন—**শিবম্ শম্ভো।**"

সমাপ্ত।

শ্রীইন্দিরা দেবী।

ব্রজ-কাহিনী

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

যুগলকিশোর জী ।

প্রথম যুগলকিশোর। বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত ওঁড়ছা বা উর্চ্চা গ্রামে হরিরাম ব্যাস নামে একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীমাধব নামক একজন সন্ন্যাসীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। একদিন বিবাহ উপলক্ষে তাঁহাদের বাটীতে ভোজের মহা আয়োজন হইলে হরিরাম ঐ সমস্ত সুখাদ্য পকান্ন ও মিষ্টান্নাদি লইয়া ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবাদির সেবা নির্ব্বাহ করেন। ইহাতে তাঁহার ভ্রাতৃগণের সহিত মনোমালিন্য ঘটে। ইহার কিছুদিন পরে একদিন কতকগুলি হাড়ি কোন মহোৎসব স্থান হইতে অন্ন লইয়া যাইতেছিল। ব্যাসজী জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে মহোৎসব হইয়াছিল। হরিরাম হাড়িগণের হাত হইতে একমুষ্টি বৈষ্ণবগণের উচ্ছিষ্ট অন্ন তুলিয়া লইয়া নিজে খাইলেন। এই সকল কারণে তাঁহার ভ্রাতা ও জ্ঞাতি সকলে মিলিয়া তাঁহাকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দিল। হরিরাম পত্নীকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করিলেন। একদিন বৃন্দাবনে অবস্থানকালে তিনি রাসলীলা যাত্রা শুনিতেছিলেন, এমন সময়ে নাচিতে নাচিতে শ্রীরাধাবেশে সজ্জিত বালকের চরণ হইতে নূপুর ছিঁড়িয়া পড়িল। হরিরাম অবিলম্বে নিজ যজ্ঞোপবীত ছিঁড়িয়া নূপুর গাঁথিয়া যথা স্থানে বাঁধিয়া দিলেন। সকলে ইহাঁর ভক্তি দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। ইহাঁর তিনটি পুত্র হইয়াছিল। তিনি তাঁহাদিগকে বিষয় ভাগ করিয়া দিয়া পত্নীকে গৃহে যাইয়া বাস করিতে বারবার অনুরোধ করিলেন। পতিব্রতা ব্যাসপত্নী তাহা শুনিলেন না। তিনি পতি-পার্শ্বে বনে পড়িয়া রহিলেন। ইহার কিছুদিন পরে ব্যাসজীর সহিত কতকগুলি বৈষ্ণব একত্র ভোজন করিতে বসিয়াছিল, ইহাঁর পত্নী পরিবেষণ করিতেছিলেন। দৈবাৎ দুগ্ধের সরখানা ব্যাসজীর পাতে পড়িয়া গেল। ইহাতে ব্যাসজী মহাকুপিত হইয়া পত্নীকে ভৎর্সনা করিয়া তাড়াইয়া দিতে চাহিলেন। পত্নী কিছু না বলিয়া, নিজ অঙ্গ হইতে দশ হাজার টাকার অলঙ্কার খুলিয়া তাহা বিক্রয় করিয়া যুগলকিশোর নামে ঠাকুর এবং তাঁহার মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। উভয়ের মধ্যে বিবাদ মিটিয়া গেল। যুগলকিশোরের সেই মন্দিরটী অতি পুরাতন। এই মন্দিরের উপরিভাগ গোলাকার গম্বুজের মত ইটে গাঁথা, সম্মুখের জগমোহন নাটমন্দির প্রভৃতি লাল পাথরে গাঁথা, সমস্তই ভগ্নদশায় পতিত রহিয়াছে। সম্মুখে একটি বাটিতে এখন ঠাকুরজিকে রাখা হইয়াছে। ইহাদের কিশোরবন বা ব্যাসজীকা ঘের নামে একটি উদ্যানও আছে। সেখানে হরিরাম ও তৎপত্নীর সমাধি আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে আকবর বাদশাহ ইহাঁর ভক্তি দেখিয়া বৃন্দাবনে বহুবিস্তৃত ভূমি দান করিয়াছিলেন। এখন সেগুলির অধিকাংশ হস্তান্তরিত হইয়াছে।

ব্যাসজী ও তাঁহার পত্নীর বিরচিত অনেকগুলি বাণী বা পদগ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে 'স্বধর্ম্মপদ্ধতি' নামক গ্রন্থ সমধিক প্রচলিত। মতান্তরে হরিরাম, যুগলকিশোর ঠাকুরটিকে কিশোরবনের মধ্য ইন্দারার (কূপ) ভিতর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় যুগলকিশোরজী—কেশীঘাটের পার্শ্বে একটি টীলা বা উচ্চস্থানের উপর বালা পান্না রাজাদিগের প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরটি আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দিরের গঠন মদনমোহনজীর মন্দিরের মত। কেবল মন্দিরসংলগ্ন লাল পাথরের ফলগুলির উপর তত কারুকার্য্য নাই। সেকালে যমুনার উপর নৌকা হইতে, উত্তরদিকে এই মন্দির ও দক্ষিণদিকে মদনমোহনজীর মন্দির

এই দুইটিকে বৃন্দাবনের দুইটি উচ্চশীর্ষ জয়স্তম্ভের (Tower) মত দেখাইত। এখন মন্দিরে ঠাকুর নাই। মন্দিরের ভিতরটা পূর্ব্বে গোশালারূপে ব্যবহৃত হইত; মিউনিসিপ্যালিটীর ব্যয়ে এখন সংস্কৃত হইয়াছে। মূল মন্দির ও 'জগমোহন' এখন দেখিতে পাওয়া যায়। ফটক ও নাটমন্দির প্রভৃতি অন্তর্হিত, তাহাদের চিহ্ন সকল আজিও পার্শ্ববর্ত্তী গৃহের ভিত্তি গাত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। জগমোহনের দ্বারের উপর একটি কারুকার্য্য-খচিত পরম সুন্দর গো-গোপ-গোপীপরিবৃত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি—বামকরে গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, রায় সিংহের জ্যেষ্ঠভ্রাতা নোন্‌করণ সিংহ ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছিলেন।

জগমোহনের দ্বারের পার্শ্বে একটি 'লেখ' আছে। তাহা হইতে আমরা কেবল "সংবৎ ১৬৮৪ বর্ষে শ্রাবণ বদি দশমী" পড়িতে পারিলাম। অবশিষ্ট অক্ষরগুলি এত অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে কিছুই বুঝা গেল না। এই মন্দিরের পার্শ্বে একটি একতলা গৃহে নূতন যুগল-কিশোর নামে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি এবং একখানি কালো এক হাত লম্বা পাথরের গায়ে শিশু-কৃষ্ণ একটি ঘোড়ার কেশ আকর্ষণ করিতেছেন অঙ্কিত আছে। এ ঠাকুরটির নাম কেশীমর্দ্দন। তৎসঙ্গে একটি বৃহৎ শালগ্রামও আছেন। সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে পূর্ব্বোক্ত মন্দিরের ভগ্ন খণ্ডসকল পড়িয়া আছে। আরঙ্গজেবের উপদ্রবে আদি যুগলকিশোর ঠাকুরটি ঝালা পান্না রাজ্যে প্রেরিত হইয়াছেন।

তৃতীয় যুগলবিহারী—ইহাঁর মন্দিরটিও দেখিতে প্রায় মদনমোহনের মন্দিরের সদৃশ এবং তাহা-রই নিকটস্থ; কিন্তু উচ্চতায় তাহার অর্দ্ধেকও হইবে না। জয়পুরের অন্তর্গত নিমকা থানা গ্রামনিবাসী তোমর রাজপুত হরিদাস ও গোবিন্দদাস নামক দুই ভ্রাতা এই মন্দিরটি আকবরের রাজত্বের সময়ে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। নির্ম্মাতা দুই জনের ঠাকুর উপাধি ছিল। লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়, এই স্থানটিকে নির্জ্জন দেখিয়া, মীরাবাই বৃন্দাবনে আসিয়া এই মন্দিরেই পূজা করিতেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সূরদাস।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দী কবিগণের এই প্রশংসা পদটী প্রচলিত আছে—

সূর সূরজ তুলসী শশী, উরগণ কেশব দাস।
অবকে কব্‌ সব খদ্যোতসম্‌ যাঁহা তাঁহা করত প্রকাশ॥

ইহার অর্থ—"সূর (সূরদাস) সূর্য্যের ন্যায়, তুলসী দাস চন্দ্রের ন্যায়, কেশব দাস তারাগণের ন্যায় মনোহর। আধুনিক কবিরা জোনাকি পোকার মত যথায় তথায় প্রকাশিত।" কিন্তু একই সময়ে সূরদাস নামে দুই জন কবি বৃন্দাবনে আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং উভয়েই গায়ক, সাধক ও মদনমোহনজীর ভক্ত ছিলেন। ভক্তমাল গ্রন্থেও দুই জনের নাম সূরদাস বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে একজন অন্ধ ছিলেন বলিয়া 'অন্ধ সূরদাস', অপরের নাম সূরদাস মদনমোহন। বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের মুখে শুনিলাম যে উপরি-উক্ত কবিতাটী অন্ধ সূরদাসকে লক্ষ্য করি-য়াই বিরচিত হইয়াছিল। ইঁহার জীবনী অনেকেই জানেন না। ভক্তমালেও ইনি কেবল পরম রসিক কৃষ্ণনিষ্ঠ দৃঢ়ব্রত সাধু বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইনি—

অষ্টাদশ সিদ্ধি যেহ উপেক্ষা করিল।
চারি মুক্তি আদি চতুর্ব্বর্গ তেয়াগিল॥

এইটুকু মাত্র পরিচয় পাই। পরে আমরা "সঙ্গীত-সুধাসিন্ধু" নামক গ্রন্থ হইতে ইঁহার যেরূপ জীবনী পাইয়াছি তাহাই দিতেছি।

ব্রহ্মরাও নামক, যতি সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকের বংশে "পৃথ্বিরাজা রাসো"-রচয়িতা বিখ্যাত চাঁদ কবি জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ পৃথ্বিরাজ ১১৯০ খৃষ্টাব্দে কবিকে জুয়ালা নামে একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। চাঁদ কবির চারিটী পুত্র ছিল। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের নাম গুণচন্দ্র। গুণ-

চন্দ্রের পুত্র শীলচন্দ্র, তৎপুত্র বীরচন্দ্র—রামথাম্ভারের মহারাজ হামীরের সভাসদ হইয়াছিলেন। ইনি পাশাখেলার বড় সুনিপুণ ছিলেন। আলাউদ্দিন খিলজীর সহিত যুদ্ধে মহারাজ হামীর নিহত হইলে বীরচন্দ্রের পুত্র হরিচন্দ্র আগরায় বাস করিলেন। হরিচন্দ্রের পুত্র রামচন্দ্র সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া বাবারাম নামে খ্যাত হন। বাবারাম প্রথমে ইস্লাম সাহার এবং পরে আকবরের অভিভাবক বায়রাম খাঁর সভায় গায়ক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি কিছুদিন লক্ষ্ণৌ ও কিছুদিন গোপচাল গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। ইঁহার সঙ্গীতবিদ্যায় পাণ্ডিত্য দেখিয়া গুণ-গ্রাহী আকবর শাহ ইঁহাকে নিজ সঙ্গীতসভার রত্ন করিয়া লইয়াছিলেন। বাবারামের কৃষ্ণচাঁদ, উদয়চাঁদ, রূপ-চাঁদ, বুদ্ধিচাঁদ, দেবচাঁদ, সপ্রীতচাঁদ ও সুরজ নামে ৭টী পুত্র হইয়াছিল। প্রথম ছয় জন পুত্র মোগল সেনা মধ্যে নিযুক্ত থাকিয়া অতি অল্পবয়সে যুদ্ধে নিহত হন। কনিষ্ঠ সুরজচাঁদ অন্ধ ছিলেন বলিয়া বাল্যকাল হইতে পিতার নিকট সঙ্গীত বিদ্যা শিখিয়াছিলেন। এই সুরজচাঁদই শ্রীকৃষ্ণের বরে 'সুর স্বামী' নামে খ্যাতিলাভ করেন। কিন্তু বিনয়বশত সকল গানেই নিজনাম 'সুরদাস' বলিয়া ভনিতা দিয়াছেন। কবি আপন বংশাবলীর উপরিউক্ত পরিচয় 'ধৃষ্টকুট' নামক গ্রন্থে দিয়া গিয়াছেন।

আগরা হইতে মথুরা যাইবার পথে নয়ক্রোশ দূরে গয়ঘাট নামক গ্রামে ইনি বাস করিতেন। তখন সুর স্বামী নাম দিয়া নল-দময়ন্তীর আখ্যান লইয়া একখানি হিন্দী কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। পরে বৃন্দাবনে আসিয়া বল্লভাচার্য্যের পুত্র বিট্‌ঠল্ দাসের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক অনেকগুলি হিন্দী পদ রচনা করেন। তুলসী-দাস যেমন রামায়ণ হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন, সুরদাসও তেমনি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। ইঁহার রচিত সুর-সাগর নামক গ্রন্থে ৬০ সাট হাজার কবিতা আছে। জনরবে শুনিতে পাওয়া যায় যে ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম এবং ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে গোকুলে ইহার দেহান্ত হয়।

সুরদাস অন্ধ ছিলেন বলিয়া স্বয়ং লিখিতে পারিতেন না। একজন লেখক নিকটে বসিয়া তাঁহার মুখো-চ্চারিত কবিতাগুলি লিখিয়া যাইত। একদিন লেখক কোথায় গিয়াছিল, সুরদাস কবিতা বলিয়া যাইতে-ছিলেন। কবির ভক্তিডোরে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ লেখকের বেশে স্বয়ং আসিয়া তাঁহার কবিতাগুলি লিখিয়া দিতেছিলেন। কবি দেখিলেন, মনোভাব প্রকাশের পূর্ব্বেই ২১ টা কবিতা লিখিত হইতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি লেখকের হাত ধরিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। সুরদাস বুঝিলেন, তাঁহার অভীষ্টদেব। নিমেষে শ্রীহস্ত অন্তর্হিত হইল। অন্ধও মনোদুঃখে গাহিলেন।—

"কর ছটকাই যাতে হায়
  দুর্ব্বলা জানি মোহি।
হৃদয়সে যাও যাহাগি
  মর্দা বাখানি তোহি॥"

অর্থ—আমাকে দুর্ব্বল জানিয়া হাত ছাড়াইয়া পলাইয়া গেলে, কিন্তু আমার মন হইতে পালাও দেখি কেমন তুমি বীর!

সুরদাস বৃন্দাবনে বংশীবটের পার্শ্বে একটী ছোট ঠাকুরবাটীতে মদনমোহন নামে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেটী আজিও বিদ্যমান আছে। সময়ে ইঁহার মন্দিরটী অনেক পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহাতে কোনরূপ দর্শনীয় কারুকার্য্য নাই বলিয়া অধিক যাত্রী দেখিতে আইসে না।

দ্বিতীয়—সুরদাস মদনমোহন— ইনি কোন্ দেশে বা কোন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা জানিতে পারা যায় নাই। তবে ইনি আকবরের অধীনে শাণ্ডিলে বা সারলা পরগণার আমীন ছিলেন। ইনি সনাতন-প্রতিষ্ঠিত মদনমোহনজীর একান্ত ভক্ত ছিলেন। একবার তিনি মদনমোহনের সেবার জন্য 'অতি

চমৎকার গুড়, মিছ্রির প্রায়' বাজারে বিক্রয় হইতে আসিয়াছে দেখিয়া, সমস্তই খরিদ করিয়া মদনমোহনের সেবার মালপুয়া প্রভৃতি জন্য কিনিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পরে এক সময় শাণ্ডিলার রাজস্ব ১৩ লক্ষ টাকা রাজসরকারে না পাঠাইয়া সমস্তই মদনমোহনের ভোজ ও বৈষ্ণবগণের সেবার জন্য খরচ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। অবশেষে দিল্লীতে টাকা পাঠাইতে না পারিয়া, সিন্দুকের ভিতর শিলাখণ্ড সকল ভরিয়া রাজসরকারে প্রেরণ করেন। পরে তাঁহার অপরাধ প্রকাশিত হইলে তিনি কারারুদ্ধও হইয়াছিলেন। অবশেষে তিনি মদনমোহনের কৃপায় কারামুক্ত ও কর্ম্মচ্যুত হইয়া সন্ন্যাসীবেশে আসিয়া সনাতন গোস্বামীর নিকট মদনমোহনজীর মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ইনি মদনমোহনের মন্দিরের নীচেকার ঘরে থাকিতেন এবং গীত রচনা করিয়া ও ভজন গাহিয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ভক্তমাল-গ্রন্থে লিখিত আছে যে ইঁহার আসল নাম 'কমললোচন', সঙ্গীতে নৈপুণ্য জন্য ইনি সুরদাস উপাধি পাইয়াছিলেন। ইনি মদনমোহনের ভক্ত ছিলেন বলিয়া নিজ রচিত সকল গানেই 'সুরদাস মদনমোহন' বলিয়া ভণিতা দিয়াছেন। ইঁহার একটি গানে 'ভক্ত জনক পাদুকা মৈ শির ধরোঁ' বলিয়া রচনা করিয়াছিলেন। দূরদেশ হইতে কয়েকজন যাত্রী আসিয়া মদনমোহনের মন্দিরের উপরে যাইবার জন্য জুতা খুলিয়া একজন অপরকে বলিতেছিল, 'ওহে এখানে বানরের বড় উৎপাত, আমাদের জুতা আগলাবে কে?' দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, 'কেন? সুরদাস মদনমোহন ত এইখানেই থাকেন; তিনি ত নিজ গানে ভক্তগণের জুতা রক্ষার ভার লইয়াছেন।' তাহারা জুতা খুলিয়া উপরে ঠাকুর দেখিতে গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে বাস্তবিক সুরদাস মদনমোহন তাঁহাদের জুতাগুলি হইতে ধুলা কাদা ঝাড়িয়া মাথায় করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার এই দৈন্য ও বিনয় দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল। তদবধি সুরদাস এ কর্ম্মটীকে নিজ কর্ত্তব্য মনে করিয়া শেষ দিন পর্য্যন্ত পালন করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত কোন গ্রন্থ আছে কিনা জানিতে পরি নাই, তবে ইঁহার রচিত অনেকগুলি গীত গায়কগণের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। মদনমোহনজীর পুরাতন মন্দিরের নীচে এবং নূতন মন্দিরে যাইবার পথের পার্শ্বে ইঁহার সমাধি আজিও বিদ্যমান আছে।

স্থানেশ্বরী জগন্নাথ। মদনমোহনজীর পশ্চাৎ দিকে একটী লাল পাথর নির্ম্মিত বৃহৎ মন্দিরে ভগ্ন খণ্ড স্তম্ভ, খীলান, ব্রাকেট প্রভৃতি পড়িয়া আছে। শুনিলাম রূপ, সনাতন, প্রভৃতি গোস্বামিগণের সমকালে স্থানেশ্বরী জগন্নাথ নামক কোন একজন পশ্চিম দেশীয় ভক্ত বহু ব্যয় করিয়া এই মন্দিরটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। পরে যবন-দৌরাত্ম্যে বা অর্থাভাবে এখন সেটীর পূর্ব্বোক্তরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। এই মন্দিরের অধিষ্ঠাতা রাধামনোমোহন নামক ঠাকুরটী আজি কালি মন্দির সংলগ্ন একটী ছোট কুঠারীর ভিতর একজন বৃদ্ধা ব্রজবাসিনীর তত্ত্বাবধানে রহিয়াছেন। এখানকার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য পাঠনা নিবাসী কোন ভক্ত মাসিক ২৲ টাকা মাত্র পাঠাইয়া থাকেন। পণ্ডিতবর বনমালী গোস্বামীর মুখে শুনিলাম যে স্থানেশ্বরী জগন্নাথ, রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য বা বন্ধু ছিলেন। সেই জন্য রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর মতেই এই মন্দিরের পূজা পদ্ধতি হইত। স্থানেশ্বরী জগন্নাথের নাম কোন গ্রন্থে পাই নাই। তবে এক সময়ে যে এই মন্দিরটী শোভা সৌন্দর্য্যে সমুন্নত ছিল, তাহা ইহার কারুকার্য্যখচিত ভগ্ন অঙ্গপ্রতঙ্গগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

ক্রমশঃ

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত।

কেশীঘাটে যুগলকিশোরজীর মন্দির (সম্মুখে ভাগবত পাঠ হইতেছে)
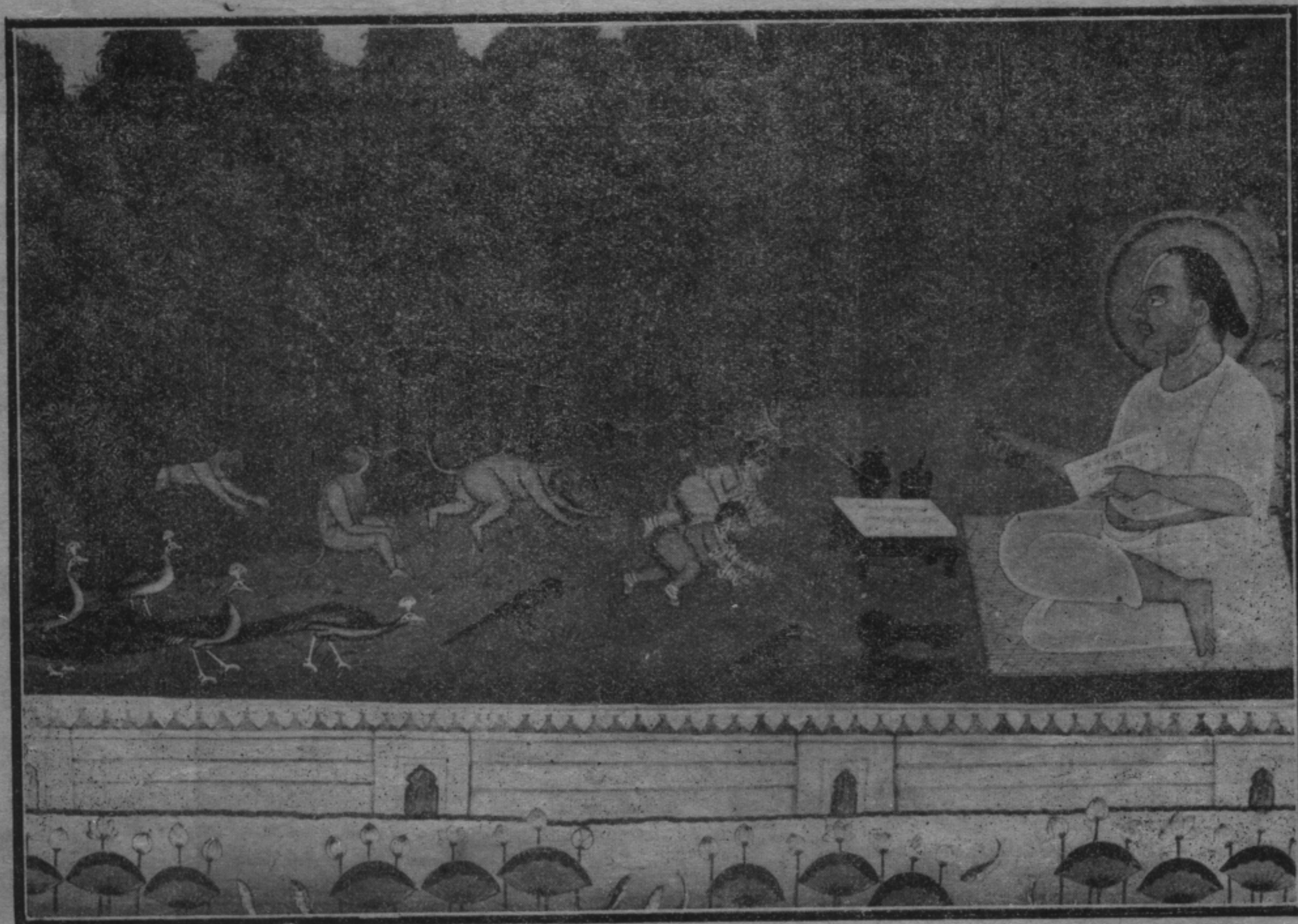
চৈতন্যদেবের প্রতিদ্বন্দ্বী বল্লভাচার্য্য বা বল্লভভট্ট। প্রবাদ, আকবর শাহের চিত্রকর মূল চিত্রখানি অঙ্কিত করিয়াছিলেন।

চিতোর-অবরোধ

"Deeds which should not pass away;
And names that must not wither."
—*Tod.*

যে দুর্জ্জয় দিগ্বিজয়-বুভুক্ষা নবীন বয়সে আক্‌বরের হৃদিস্থলে অনির্ব্বাণ-বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিল, শত শত নৃশংস নরহত্যায় রাজ্যের পর রাজ্য কবলিত করিয়াও প্রবীণ পক্ককেশ সম্রাট্ তাহাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারেন নাই। গড়-কটঙ্গ-বিজয় সে আগুনে ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়াছিল মাত্র। কোন কোন ঐতিহাসিক (যথা Von Noer ও Malleson) বলেন যে আক্‌বরের রাজ্যবিস্তার-কল্পনার মূলে জনকল্যাণকামনা নিহিত ছিল, কিন্তু এরূপ স্তাবকের সংখ্যা অতি অল্প। রাণী দুর্গাবতীর সুশাসিত রাজ্যাধিকার সম্যক্‌রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে, তাহার পশ্চাতে রাজ্যলিপ্সা ও প্রভুত্ব পিপাসার করাল লেলিহান রসনা-বিস্তার ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না।

হিন্দুবেশে সম্রাট্ আক্‌বর

চিতোর-দুর্গ

চিতোর-জয়ের বাসনা প্রবলতর হইয়াছে। সম্রাট্ মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, চিতোর অধিকার করিয়া তাঁহার শৌর্য্য, বীর্য্য, অদ্বিতীয় রণকৌশল-প্রদর্শনে সমগ্র ভারতকে স্তম্ভিত ও বিস্ময়বিমুগ্ধ করিয়া দিবেন। আক্‌বর জানিতেন, রাজপুত জাতি শ্রেষ্ঠ বীর। যুদ্ধ ইহাদের ক্রীড়া, রণে মৃত্যু উৎসব। ছলে, বলে, কৌশলে যেরূপে হউক, এই দুর্ব্বার জাতিকে পরাভূত করিতে না পারিলে উত্তর-ভারতে মোগল-প্রতিষ্ঠাও নিরাপদ নহে। আজ্‌মীর ও অম্বর বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে—মাড়বার বা যোধপুরের দুর্জ্জেয়

জোহরব্রত

দিল্লীর সিংহাসন হইতে সম্রাটের দূরপ্রসারিণী দৃষ্টি চিতোর-দুর্গে বারবার ব্যাহত হইতে লাগিল। রাজবারার প্রায় সকল রাজাই কেহ সখ্যতা, কেহ বা প্রিয়তর সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইয়া মোগলের উচ্চ সিংহাসন সমক্ষে নতমস্তক—কেবল এই উন্নতশির দুর্গ তীক্ষ্ণ কণ্টকবৎ আক্‌বরের চক্ষুকে পীড়াদান করিতেছে—এ দর্পিত কণ্টকের উচ্ছেদ করিতে হইবে। ইতঃপূর্ব্বে আলা-উদ্দীন্, বহাদুর শাহ্ প্রভৃতি বহু দিগ্বিজয়ী বীর রাজপুত-প্রতিষ্ঠার কেন্দ্র-স্থল এই গিরিদুর্গে নিজ নিজ ভুজবল পরীক্ষা করিয়াছেন; ভারতে এই অদ্বিতীয় বীর-জাতির বর্দ্ধমান গৌরব-খ্যাতির সহিত শত্রুহৃদয়ে

চিতোর-অবরোধ
(পাট্‌না খুদাবকৃশ লাইব্রেরীর চিত্র হইতে গৃহীত)

মৈরতা দুর্গ হস্তগত; কেবল চিতোরের মহারাণা তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া মোগল-সংস্পর্শ হইতে দূরে অবস্থান করিতেছেন! এ দম্ভিত-স্পর্দ্ধায় আক্‌বরের অন্তরে ঈর্ষা ক্রোধ দুই-ই জ্বলিয়া উঠিল; তাঁহার নিশ্চিত ধারণা হইল, ইহা প্রকৃতপক্ষে মুসলমান-বিদ্বেষ—রাণা-বংশের শোণিত-ধর্ম্ম। এইজন্যই সংগ্রাম সিংহ বাবরের প্রতিকূলতা করিয়াছিলেন। বিধর্ম্মীর বিরুদ্ধে সমরাভিযান মুসলমানের পুণ্য-কার্য্য; সম্রাটের ধ্রুবধারণা হইল যে হিন্দুর সহিত রণ তাঁহার মুসলমান-প্রজাগণ ধর্ম্ম-যুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিবে। তাহার উপর বর্ত্তমান রাণা সম্রাটের পূর্ব্বশত্রু বাজ্ বহাদুরকে আশ্রয়দান করিয়া তাঁহাকে অপমানিত করিয়াছেন। বিপুল আয়োজনসহ মোগল-বাহিনী 'দিন্ দিন্' রবে দিক্ কম্পিত করিয়া শতমুখী নদীর ন্যায় নানাপথ বহিয়া চিতোর অভিমুখে ছুটিল। স্বয়ং বাদশাহ্ এ অভিযানের অধিনায়ক!
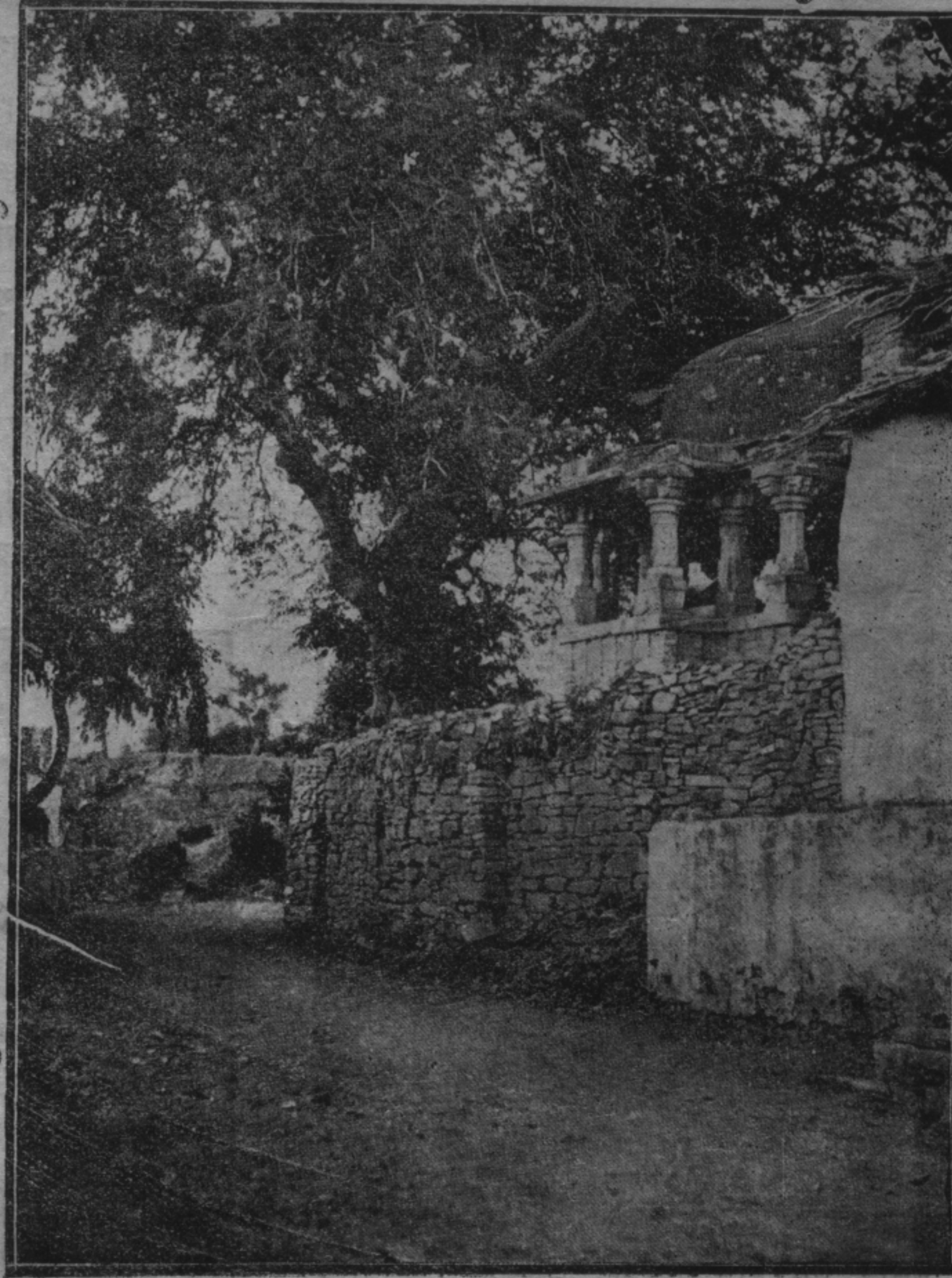
চিতোর

সমগ্র উত্তর-ভারতে সে সময় যে সকল দুর্গ ছিল, চিতোর সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় ও দুর্গম। আরাবল্লী পর্ব্বতের অনতিদূরে এক খণ্ডশৈলের উপরে এই জগদ্বিখ্যাত দুর্গ ও নগর অবস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় দেড় ক্রোশ এবং মধ্যভাগের প্রসার অন্যূন চতুর্ব্বিংশতিশত হস্ত। মূলে এই গিরির পরিধি প্রায় চারিক্রোশ এবং উচ্চতা ত্রিশত হস্তের ন্যূন নহে। বহু কীর্ত্তিস্তম্ভ, রাজপ্রাসাদ, অট্টালিকা ও বিপনি-সমন্বিত এই পৌরুষশ্রীসম্পন্ন দুর্গ আক্‌বরের রাজত্বসময়ে অতি সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল। সমগ্র ভারতে রাজপুতানা যেমন গৌরবশালিনী, সমস্ত রাজপুতানার মধ্যে চিতোর তেমনই চিরমহিমময়! সাধারণ পার্ব্বত্য-প্রদেশ সকল মেঘ, বৃষ্টি ও শীতাধিক্য-প্রপীড়িত; কিন্তু খণ্ডশৈলের উপর স্থাপিত করিয়া বিধাতা সে সকল নৈসর্গিক উৎপাত হইতে এই পার্ব্বত্য-নগরকে মুক্তিদান করিয়াছেন। চিরবসন্ত বিরাজমান বলিয়া এই নাতিশীতোষ্ণস্থান স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও স্ফূর্ত্তির আকরস্বরূপ ছিল। কীর্ত্তিগৌরবসঞ্চিত, এই বীর-বাঞ্ছিত পুরী অরাতিদম্ভ উপেক্ষা করিয়া, রাজবারার মরু-সাগরে শ্যামকান্তি দ্বীপের ন্যায় শোভা পাইত। এই স্বাধীন ভূমির নির্ঝর-নীর পান করিয়া স্বদেশভক্ত বীরগণ জন্মভূমির জন্য তাঁহাদের বক্ষরক্ত ঐ প্রস্রবণের মতই অকাতরে দান করিয়াছিলেন। 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' এই ভূমির প্রতি ধূলিকণা একদিন স্বদেশ-প্রেমিকের হৃদয়রক্তে রঞ্জিত হইয়া জন্মভূমি-প্রেমে অনুপ্রাণিত এবং ইহার

আকবর-কা-দেওয়া

সম্রাট্‌ মোগলকুলতিলক আক্‌বরের কীর্ত্তি! কিন্তু শাহান্‌শাহ্‌ এই কীর্ত্তিশালিনী নগরীর সকলই ধ্বংস করিয়াছেন, কেবল ইহার পুণ্যস্মৃতি লোপ করিতে পারেন নাই!

মিবারের প্রাতঃস্মরণীয় মহারাণাগণ এই দুর্ভেদ্য দুর্গের অধীশ্বর ছিলেন। ইঁহাদের বংশ যেমন প্রাচীন, মর্য্যাদায় তেমনই শ্রেষ্ঠ। মাঝে মাঝে নগণ্য অবচ্ছেদ ছাড়িয়া দিলে, খ্রীষ্টীয় অষ্ট শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত, দ্বাদশ শতাব্দী মহারাণার বংশ মিবার-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে যে সকল জাতি মধ্য-এসিয়া হইতে হিন্দুস্থানে অভিযান করিয়াছিল, মহারাণা-দিগের দূর-পূর্ব্বপুরুষ গুহিল বা গুহদত্ত তাহারই এক শাখা-সম্ভূত।* যে সকল কীর্ত্তিমান্‌ বীরপুরুষ এই গুহিলোট্‌ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়াছেন, আক্‌বর শাহ্‌র সমসাময়িক রাণা উদয় সিংহ তাঁহাদের সহিত একাসনে বসিবার যোগ্য নহেন। ইনি বীরকুলে কাপুরুষ— রাণাবংশের কলঙ্ক। যে সকল গুণ থাকিলে সুচতুর, সুকৌশলী, অক্লান্ত-কর্ম্মী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যুদ্ধবীর আক্‌বরের প্রতি-দ্বন্দ্বীরূপে দণ্ডায়মান হওয়া যায়, উদয়ের সে সকল কিছুই ছিল না। আক্‌বর ইহা চরম সুযোগ বলিয়া গণ্য করিলেন।

প্রতি বায়ুস্তর আত্মোৎসর্গের জয়গানে মুখরিত হইয়াছিল। স্বাধীনতার এই পবিত্রমঞ্চে একদিন যে অলৌকিক আত্মত্যাগ, অমানুষী বীরত্ব ও অসামান্য দেশভক্তির অভিনয় হইয়াছিল, পুণ্যস্মৃতিমণ্ডিত ইহার ভগ্নস্তূপ-সকল আজিও তাহার মূক সাক্ষী। আজি যে এই জনহীন গিরিদুর্গের নির্ঝর সকল মৃদুমর্ম্মর নাদে কৌতু-হলাবিষ্ট পথিকের শ্রবণে অতীতের উচ্ছ্বসিত করুণ-কাহিনী ঢালিতেছে;—শত শত নিরীহ নরনারীর আর্ত্তনাদ ও অন্তিমশ্বাসে আজি যে ইহার বাতাস ভারা-ক্রান্ত—আকাশ সতীর চিতাধূমে সমাচ্ছন্ন, ইহার পুণ্য-মন্দির-সকল দেবমূর্ত্তি-বিরহিত, তাহা ভারতের অদ্বিতীয়

* এক শতাব্দী পূর্ব্বে টড্‌ সাহেব অনুমান করিয়া গিয়াছেন যে, রাজপুতেরা শকজাতীয় বিদেশী। তাহার পর অদ্যাবধি আবিষ্কৃত নূতন ঐতিহাসিক উপাদানসমূহ হইতে প্রমাণিত হয় যে, রাজপুতগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বংশ (অর্থাৎ চিতোর-মহা-রাণাগণ) রামচন্দ্রের বংশধর বা সূর্য্যবংশীয় নহেন;—পারস্য বা অন্য কোন বিদেশ হইতে ভারতে আগত জাতির সন্ততি। রাজপুতজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে যাঁহারা বিস্তৃত আলোচনা পাঠ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিবেনঃ—

দুর্গ-আক্রমণের সংবাদ-শ্রবণে চিতোর-বাসিগণ দীর্ঘ অবরোধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। নির্ঝরবহুল দেশে জলকষ্টের সম্ভাবনা নাই, কেবল প্রচুর আহার্য্য সংগৃহীত হইতে লাগিল। দুর্গের বহির্গ্রাম-সমূহে লোকবাস উঠিয়া গেল। বীণাকরে চারণগণ বীরগাথায় মিবার প্লাবিত করিতে লাগিলেন। রাজপুতরক্তে খরপ্রবাহ বহিল! তখন আসন্ন রণোৎসাহে সসৈন্য সামন্তরাজগণ বীরপদভরে মেদিনী কম্পিত করিয়া স্বাধীনতার পবিত্র তীর্থ চিতোর-রক্ষার্থ দলে দলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বেদ্নোরের প্রবীণ রাঠোরবীর জয়মল্, জগায়ৎকুলপ্রদীপ যুবক পুত্ত প্রভৃতি দুর্ব্বার যোদ্ধৃবর্গ আসিয়া দুর্গরক্ষার জন্য প্রাণাহুতি দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। রণোৎসবের উল্লাসে চিতোর টল্‌মল্ করিতে লাগিল!
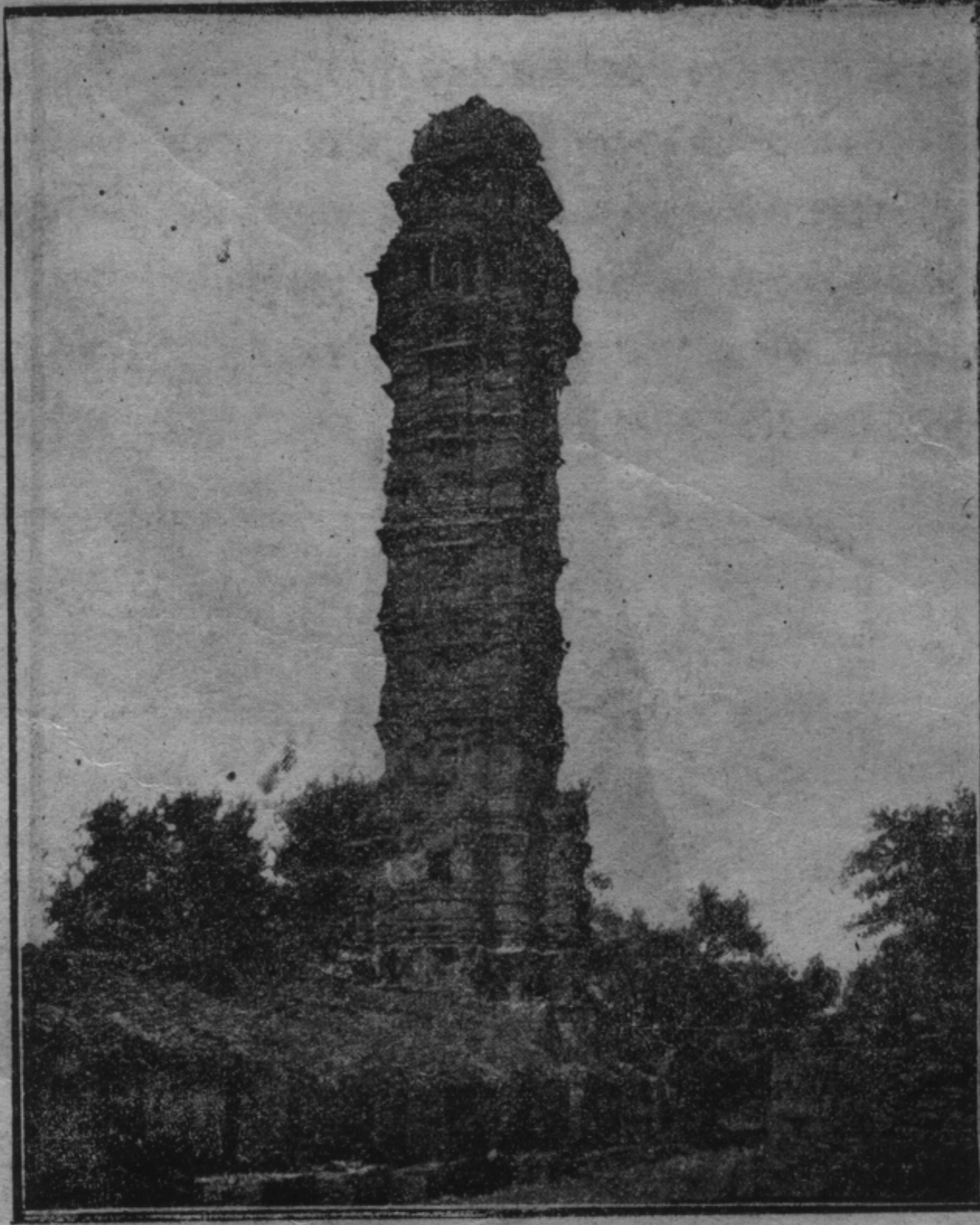
জয়স্তম্ভ—চিতোর

১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ অক্টোবর তারিখে সম্রাট্ চিতোরের তোরণদ্বারে উপস্থিত হইলেন। পঞ্চক্রোশব্যাপী পরিধি জুড়িয়া মোগলবাহিনী চিতোর অবরোধ করিল। পূর্ত্তবিভাগ জরিপকার্য্য সমাধা করিলে সম্রাট্ স্বয়ং অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। তাঁহার আদেশমত স্থানে স্থানে কামান ও সৈন্য-সমাবেশ করা হইল। বহুদূর হইতে বাদশাহ্-শিবির চিহ্নিত করিবার নিমিত্ত সম্রাট্ ছাউনীস্থানে প্রস্তর-নির্ম্মিত এক সমুচ্চ মঞ্চ প্রস্তুত করাইলেন; ইহা এখনও 'আক্‌বর-কা-দেওয়া' নামে সুপরিচিত। চিতোর-ধ্বংসের বিপুল আয়োজন শেষ হইতে একমাস সময় অতিবাহিত হইল।

এই সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই উদয় সিংহ দুর্গ ত্যাগ করিয়া গেলেন। মহারাণার অনুপস্থিতিতে সমস্ত দুর্গের অধিনায়কতা জয়মলের উপর ন্যস্ত হইল। বাদশাহ্ চারিদিকে সৈন্য পাঠাইলেন। তাহারা মিবার রাজ্য ছারখার করিতে লাগিল। হুসেন কুলী খাঁ রাণার সন্ধানে পশ্চিমদিকে গিয়াছিলেন। উদয় তখন আরাবল্লী পর্ব্বতে। এই স্থানে পূর্ব্বে তিনি 'উদয় সাগর' নামে এক দীর্ঘিকা খনন এবং 'নচৌকী' নামে এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। চিতোর ধ্বংসের পর ক্রমে ইহাই মিবারের রাজধানী হইয়াছিল।

এদিকে মোগল-সৈন্যের সহিত রাজপুতগণের খণ্ড-

Indian Antiquary, 1911, pp. 1—28; J. A. S. Bengal, June, 1909, pp. 167-87; Ibid, 1912, pp. 63-99; Indian Empire, ii, 307-18; V. A. Smith's Early History of India, 3rd ed. 407-20; Bombay Gazetteer (1896), Vol. i, pt. I, 464. 2-5, 164; Tod, i, Ch. VI; এবং অধ্যাপক শ্রীযদুনাথ সরকার, এম্-এ-লিখিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র-প্রণীত "প্রতাপ সিংহ" গ্রন্থের ভূমিকা।

যুদ্ধ চলিতে লাগিল। রণবীর মোগল বারবার দুর্গ আক্রমণ করিয়া কেহ রক্তাক্তকলেবর লইয়া ফিরিতে লাগিল, কেহ ফিরিল না। মোগলের আগ্নেয়াস্ত্রসকল রাজপুতগণের কামান বন্দুক হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও উচ্চ দুর্গপ্রাকার লঙ্ঘন করিয়া চিতোরবাসিগণের বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারিতেছিল না; কিন্তু প্রাচীর গবাক্ষ হইতে রাজপুত-প্রেরিত প্রহরণ সকল মোগল-বাহিনী বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। তথাপি চিতোর-ধ্বংসে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সম্রাটের সঙ্কল্পচ্যুতি হইল না। সীক্‌রীর যুদ্ধে মোগলের উন্নত আগ্নেয়াস্ত্রসকল রাজপুতের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে, আক্‌বর এবারও সেই অব্যর্থ উপায় অবলম্বন করিলেন।

চিতোর দুর্গ পঞ্চক্রোশব্যাপী দৃঢ় প্রাচীরে বেষ্টিত এবং তাহার চারিদিকে চারিটি তোরণ ছিল। সম্রাট্ তিনটি প্রধান দ্বারের সম্মুখে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কামানগুলি স্থাপিত করিলেন এবং সেনানায়কগণকেও তিনভাগে বিভক্ত করিয়া এক এক তোরণের ভার দিলেন। উত্তরভাগে 'লক্ষ্য তোরণ'-সম্মুখে বাদশাহী কামানসহ হসন্ খাঁ, রায় পত্তর দাস, কাজী আলী, ইখ্‌তিয়ার ও কবীর খাঁ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পূর্ব্বে 'সূর্য্য তোরণে' আব্‌দুল্ মজীদ্ আসফ্ খাঁ ও উজীর খাঁ এবং পশ্চিমে 'সদর তোরণে' শুজাত খাঁ কাসিম খাঁ এবং রাজা টোডর্ মল্ রহিলেন। রাজা ভগবান্ দাস, খাঁ জহান্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ওমরাহ্‌গণসহ স্বয়ং আক্‌বর শাহ্ প্রধানতঃ এই পশ্চিম তোরণে থাকিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার শ্যেনদৃষ্টি সর্ব্বত্রই সমভাবে ন্যস্ত ছিল। রাজপুতপক্ষে জয়মল্ এই দ্বার রক্ষা করিতেন।

উদয়পুর—প্রাসাদ হইতে

কিন্তু দুর্গপ্রাচীর আক্‌বরের সকল প্রযত্ন, সর্ব্বপ্রকার বিধান ব্যর্থ করিল। অবশেষে যুক্তি হইল যে, প্রাচীর-মূলে খাদ খনন করিয়া বারুদ পূরিয়া অগ্নিসংযোগে প্রাচীর ভগ্ন করিতে হইবে। এইরূপ বারুদপূর্ণ খাদকে কুল্যা (mine) বলা হইত।

উত্তরদিকে খাদ-খনন অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য বলিয়া সর্ব্বপ্রথমে সেইদিকে কার্য্য আরম্ভ হইল; কিন্তু

পূর্ব্ব ও পশ্চিমবিভাগে রাজপুতগণ তীর গুলি বর্ষণ করিয়া মোগলদিগকে অগ্রসর হইতে দিতেছিল না। ইহার জন্য সম্রাট্ এক অভাবনীয় উপায় উদ্ভাবিত করিলেন। যাহাতে প্রয়োজনীয় বারুদ প্রভৃতি নিরাপদে দুর্গপ্রাচীরের তলদেশে লইয়া যাওয়া যায়, তন্নিমিত্ত রাজপুত-অস্ত্রসমূহের লক্ষ্যস্থল অতিক্রম করিয়া রাজা টোডর্ মল্ ও কাসিম খাঁর তত্ত্বাবধানে দুর্গের দুইদিকে দুই সুড়ঙ্গ (সাবাৎ) প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইল। এই সুড়ঙ্গ-পথ তির্য্যগভাবে নির্ম্মিত হইতে লাগিল এবং যাহাতে উহা সুরক্ষিত হয়, বাদশাহ্ তাহারও বন্দোবস্ত করিলেন। মৃত্তিকা ও প্রস্তরে দুইদিকে উচ্চ প্রাচীর গাঁথাইলেন। পরে প্রাচীরের উপর তক্তা বসাইয়া সুড়ঙ্গপথ ছাইয়া তাহার উপর যথেষ্ট পরিমাণে স্থূল চর্ম্ম আচ্ছাদন দিয়া তাহাকে গোলাগুলির অভেদ্য করা হইল। এই পথ প্রস্তুত করিবার জন্য আক্‌বর পঞ্চসহস্র কারিকর নিযুক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও নিত্য অন্ততঃ দুইশত মিস্ত্রী নিহত হইত। তাহাদিগের শবদেহ সুড়ঙ্গ-প্রাচীরে সমাহিত করিয়া সম্রাট মৃৎপ্রস্তরাদির সাশ্রয় করিতেন, এবং পাছে কর্ম্মিগণ নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে, এজন্য জলের মত অর্থবৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে প্রসন্ন রাখিতেন। এইরূপ অশেষ আয়াস ও অর্থব্যয়ে একটি সুড়ঙ্গ পশ্চিম তোরণ স্পর্শ করিল।

উদয়পুর

যুদ্ধের সরঞ্জাম সংগ্রহ করিতে সম্রাট্ অণুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার শিবির অস্ত্রাগারে পরিণত হইল। বৃহৎ কারখানা বসিল, তাহাতে স্তূপাকার গুলিগোলা বারুদ প্রস্তুত হইতে লাগিল। অর্দ্ধমণ গোলা নিক্ষেপ করিতে পারে, বাদশাহ্ নিজ তত্ত্বাবধানে এইরূপ এক বিরাট্ কামান ঢালাই করাইলেন।

উত্তরে 'লক্ষ্য তোরণ'-সন্নিকটে কবীর খাঁ দুইটী কুল্যা খনন করাইয়া একটীতে ১২০ এবং অন্যটীতে ৮০ মণ বারুদ পূর্ণ করিলেন। যাহাতে উভয় কুল্যাই সমসময়ে বিদীর্ণ হয়, সেইজন্য এক পলিতা দ্বারা দুইটীকে সংযোগ করা হইল। দুর্গপ্রাচীর ভগ্ন হইলেই ছিদ্রপথে প্রবিষ্ট হইবার জন্য সুসজ্জিত মোগল-সৈন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল। ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে আক্‌বর পলিতায় আগুন দিবার আদেশ দিলেন। বজ্রনাদে প্রাচীর ভগ্ন হইয়া মোগলের পথ করিয়া দিল। বাঁধমুক্ত প্রবাহের মত উচ্ছ্বসিতবেগে মোগল-সৈন্য শত্রুর উপর পড়িল; কিন্তু রাজপুতকে টলাইতে পারিল না। তখন অঙ্গুলি-পরিমাণ ভূমি-অধিকারের জন্য

মোগল-রাজপুত মেশামেশি রণে বদ্ধ। কেহ তলে, কেহ প্রাচীর-শিখরে উঠিয়া প্রাণপণে যুঝিতেছে। সেই সময় দ্বিতীয়বার বজ্রনাদ হইল। উভয় পক্ষ স্তম্ভিত হইয়া দেখিল, ভগ্ন প্রাচীরসহ নরদেহসকল ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে। দুইটী কুল্যা আশানুযায়ী একই সময়ে বিদীর্ণ হয় নাই!

হতাহতে উভয়পক্ষের সৈন্যদল নিয়ত: হ্রাস হইতেছে। নূতন সৈন্য-সমাগমে সম্রাটের ক্ষতিপূরণ হইতে লাগিল; কিন্তু অবরুদ্ধ-চিতোরবাসীর সে ভরসা নাই। নিত্য লোকক্ষয়ে চিতোর জনশূন্য হইতেছে, তথাপি তাহাদের অমানুষী বীর্য্য, অলৌকিক বিক্রম, অদম্য হৃদয়, মুহূর্ত্তের জন্য অবসন্ন না হইয়া বরং উত্তরোত্তর দুঃসহ তেজসম্পন্ন হইতে লাগিল। 'সূর্য্য তোরণ'-রক্ষক সহিদাস রণশায়ী হইলেন; কিন্তু যুবক পুত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্থান অধিকার করিয়া অসম্ভব বীরত্ব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। পুত্রের পশ্চাতে অবিলম্বে তাঁহার মাতা, ভগিনী ও সহধর্ম্মিণী বর্ম্মাবৃত দেহে অশ্বপৃষ্ঠে রণস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে শত শত রাজপুতললনা রণরঙ্গিণীরূপে রণস্থল অধিকার করিলেন এবং এই বীরাঙ্গনাগণের গুলিবর্ষণে পূর্ব্বদিকের গিরিসঙ্কট দেখিতে দেখিতে শত্রুশবে স্তূপাকার হইয়া গেল। সম্রাট্ বুঝিলেন, কি দুর্ব্বার জাতির সহিত দুষ্কর সমরে তিনি প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ক্রমে পুত্রের বৃদ্ধা মাতা, বালিকা-বধূ, একে একে সমরশায়িনী হইলেন। সংসারের সকল মমতা বিচ্ছিন্ন হইয়া মরণসঙ্কল্প পুত্র তখন প্রলয়কালীন রুদ্রের ন্যায় সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। রাজপুত-হৃদয়ে আগুন জ্বলিয়া উঠিল!

পশ্চিম দিকে 'সদর তোরণে'র প্রধান সেনাপতি জয়মল্‌ই এখন সমগ্র, চিতোরবাসীর ভরসা। দুর্গম রণসঙ্কটে যেথানে সৈন্যদল হতাশ্বাস, শত্রুর মুহুর্মুহু আক্রমণে যেথানে রাজপুত নিরুৎসাহ, জয়মল্ যেন শত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সর্ব্বত্র সমসময়ে বিরাজমান। তাঁহার উগ্র উত্তেজনাপূর্ণ মূর্ত্তি-দর্শনে মুমূর্ষু বাহু-স্খলিত তরবারি আঁটিয়া ধরে, মৃতহৃদয় সঞ্জীবিত হয়;—তাঁহার উদ্দীপনাপূর্ণ কথায় বিষণ্ণ-অবসন্নতা, নিরাশার মেঘ, সূর্য্যোদয়ে তিমিরবৎ অন্তর্হিত হইয়া যায়। এই রণপ্রবীণ বীর দুর্গমধ্যে যেন শতমুখে উৎসাহপ্রদান, শতহস্তে তরবারি চালনা করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। দৃঢ়পণ শত্রু পুনঃ পুনঃ দুর্গপ্রাচীর ভগ্ন করিতেছে, নিমেষে তাহার সংস্কার হইতেছে; কোথাও বা সেই ছিদ্রমুখে কামান স্থাপিত হইয়া শত্রুকে নিজ কৃত কার্য্যের প্রতিফল প্রদান করিতেছে! সকলই জয়মলের কৃতিত্বে—রণনেতৃত্বে। এইরূপ অদ্ভুত যুদ্ধে দুইমাস কাটিয়া গেল। নিত্য সৈন্যক্ষয়ে রাজপুত দুর্ব্বল, তবু দমিল না। মোগল-বাহিনী ক্রমে নিস্তেজ, তথাপি সম্রাট্ চিতোর-ধ্বংসের সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না। দাবানল আপনার তেজে আপনই নিঃশেষ হয়, ঝঞ্ঝা আপনবেগে আপনই অবসন্ন হইয়া পড়ে; আক্‌বর মনকে প্রবোধ দিলেন যে, রাজপুতও একদিন নিশ্চয় নিস্তেজ হইয়া পড়িবে। সহিষ্ণু সম্রাট্ ধৈর্য্যে বুক বাঁধিয়া দিন গণিতে লাগিলেন।

সুড়ঙ্গের উপরিভাগে একটী প্রচ্ছন্ন মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া সম্রাট্ ঐ স্থান হইতে যুদ্ধ পরিদর্শন করিতেন। দুর্গপ্রাচীর একস্থানে ভগ্ন হইয়াছে, জয়মল্ স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিয়া তাহা সংস্কার করাইতেছিলেন। আক্‌বর তাঁহাকে চিনিতেন না; কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে আগ্নেয়াস্ত্রের দীপ্তিতে তাঁহার পরিচ্ছদ দেখিয়া বুঝিলেন, ইনি একজন বিশিষ্ট সেনাপতি। পার্শ্বে 'সংগ্রাম' ছিল, এবং সম্রাটের লক্ষ্যও ছিল অব্যর্থ। মরণাহত হইয়া জয়মল্ অবিলম্বে ধরাচুম্বন করিলেন (২৩এ ফেব্রুয়ারী, ১৫৬৮)। সঙ্গে সঙ্গে চিতোরবাসীর শেষ আশাও ধূলিসাৎ হইয়া গেল!

তখন চারিদিকে মৃত্যুবেষ্টিত সেই বিপন্ন দুর্গমধ্যে এক অদ্ভুত দৃশ্যকাব্যের অভিনয় হইল। অবশিষ্ট অষ্ট সহস্র বীর হাস্যমুখে বরবেশ ধারণ করিলেন। গৃহে গৃহে চিতানল জ্বলিয়া উঠিল। বাসন্তীবাস-পরিহিত বীরগণ স্ত্রী-কন্যা, জননী-ভগিনীদিগকে শেষ বিদায়

দিয়া, সকলে মিলিত হইয়া শেষ তাম্বুল গ্রহণ করিলেন। বালিকা, বৃদ্ধা, যুবতী, শিশুক্রোড়ে-মাতা, অম্লানমুখে চিতায় প্রাণ দিল। ভারতপতির নশ্বর প্রতাপকে উপহাস করিয়া, অনল হাসিতে লাগিল! এদিকে অষ্টসহস্র বীর শত্রুশবোপরে শেষ-শয্যা পাতিবার নিমিত্ত অধীর হৃদয়ে অগ্রসর হইলেন।

আক্‌বর বিস্মিতনেত্রে সেই বিরাট্ বহ্ন্যুৎসব দেখিতেছিলেন। রাজা ভগবান্ দাস বলিলেন, ইহাই রাজপুত-কুলব্রত—জোহর;—শাহান্‌শাহ্‌র যুদ্ধজয় হইয়াছে!

রাত্রিশেষে উল্লাসে-অধীর মোগলবাহিনী চারিদিক্ হইতে দুর্গ আক্রমণ করিল। রুদ্রমূর্ত্তি রাজপুতগণ শত্রুর নিকট উচ্চপণ গ্রহণ করিয়া প্রাণবিনিময় করিলেন।

পরদিন প্রভাতে মোগলের বিজয়-কোলাহলে, আহতের আর্ত্তনাদে, চিতোর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সম্রাট্ স্বয়ং উপস্থিত। তাঁহার সুশিক্ষিত রণহস্তি-সকল আহত-সৈনিকগণকে পদদলিত করিতে লাগিল। রণশায়ী পুত্তের অচেতন দেহও সেই পাশবিক নির্যাতন হইতে রক্ষা পাইল না।

রাজপুতগণের অপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গের পর চিতোর-রঙ্গস্থলে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড অভিনীত হইয়াছিল, তাহার করুণ-দৃশ্য—নিবিড় কলঙ্ক-কালিমা অঙ্কিত। চিতোর-দুর্গের বহির্ভাগে পাহাড়ের তলদেশে প্রায় চল্লিশ সহস্র কৃষকাদি নানা শ্রেণীর লোক বাস করিত; অবরোধের সময় তাহারা দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল। সম্রাট্ বুঝিলেন যে, এই সকল স্পর্দ্ধিত ব্যক্তির প্রাণপণ সহায়তায় অষ্ট সহস্র অবরুদ্ধ-সেনা তাঁহার বিশ্ববিজয়িনী বাহিনী ও প্রহরণ-গৌরব প্রতিহত করিয়াছে। দারুণ ক্রোধে তাঁহার হৃদয়ে পৈশাচিক জিঘাংসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; আক্‌বর নির্ব্বিচার নরহত্যার আদেশ প্রচার করিলেন—নিরপরাধ হতভাগ্য প্রজাগণের করুণ প্রাণভিক্ষায় কর্ণপাতমাত্র করিলেন না। চিতোরের গিরিবর্ত্মসকল নররক্তে প্লাবিত হইয়া গেল;—স্বাধীনতার পবিত্র ভূমি, আশ্রিতরক্ষণ-ধর্ম্মের পুণ্যমন্দির, নরহত্যায় কলুষিত হইল। কেবল কাল্‌পী হইতে আগত এক সহস্র বন্দুকধারী মোগলের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া তাহাদিগের পরিবারবর্গকে বন্দীস্বরূপ বন্ধন করিয়া পলাইয়াছিল! আক্‌বর বিশেষ অন্বেষণ করিয়া কোথাও তাহাদের সন্ধান পাইলেন না। ত্রিশ সহস্র নিরীহ নরনারীর উষ্ণ শোণিতধারায় সম্রাটের দীপ্ত ক্রোধানল নির্ব্বাপিত হইল।

গলিত-শব-বিক্ষিপ্ত পূতিগন্ধময় মহাশ্মশানে সিংহাসন স্থাপন করিয়া, আসফ্ খাঁকে প্রতিনিধি রাখিয়া, ভারতপতি আজ্‌মীরে সাধু মুঈন্-উদ্দীন্ চিশ্‌তীর আশ্রমে তীর্থযাত্রা করিলেন। পানিপথ-ক্ষেত্রে মুমূর্ষু হীমুর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিতে যে মহাপ্রাণ সঙ্কুচিত হইয়াছিল, তাহার কি শোচনীয় পরিবর্ত্তন!

সুদীর্ঘকাল পরে, ইস্‌লাম্‌ত্যাগী সম্রাট্ যখন হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি পক্ষপাতপরায়ণ, আমাদের মনে হয় সেই সময়েই, তিনি পুত্ত ও জয়মলের মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া আগ্রাদুর্গের দ্বারদেশে স্থাপন করায়, রাজপুত-জাতির হৃদয় ক্ষত কতক পরিমাণে সুস্থ হইয়াছিল; কিন্তু চিতোর আর ফিরিল না। বীরবাঞ্ছিত চিতোর চিরশ্মশানে পরিণত হইল,—রহিল কেবল তাহার অক্ষয় কীর্ত্তি—স্মৃতি! *

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

* ঢাকা বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের ইতিহাস-শাখায় পঠিত।

সিন্দূর-কৌটা

(উপন্যাস)

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সময় কাটে না।

বিজয় বাহির হইয়া গেলে বকুরাণী তাহার খুকীর সন্ধানে গেল। কক্ষান্তরে ঝি খুকীকে কোলে করিয়া একটি ছোট রূপার গেলাসে দুধ লইয়া তাহাকে পান করাইবার জন্য সাধ্যসাধনা করিতেছে, কিন্তু খুকী কিছুতেই পান করিতেছে না। ঝির নিকট হইতে খুকীকে লইয়া, নানা ছলে কৌশলে তাহাকে দুগ্ধটুকু পান করাইয়া বকুরাণী তাহার বেশ-বিন্যাসে নিযুক্ত হইল। অন্যদিন খুকী এতক্ষণ পোষাকপরা শেষ করিয়া, ভৃত্য যোগীনের হেফাজতে ঠেলাগাড়ীতে চড়িয়া 'হাওয়া খাইতে' বাহির হয়—আজ বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। খুকীর গা হাত মুখ সাফ্ করিয়া, চুল আঁচড়াইয়া দিয়া, পোষাক টুপী জুতা মোজা পরাইয়া বকুরাণী ঝিকে বলিল—"যোগীনকে বলে দিস্ আজ দেরী হয়ে গেছে, আজ যেন বেশী দূর নিয়ে না যায়—অন্ধকার হবার আগেই যেন ফিরিয়ে আনে।"

খুকীকে বেড়াইতে পাঠাইয়া, একখানি বাঙ্গলা বহি হাতে করিয়া বকুরাণী ছাদে গেল। আলিসার নিকট দাঁড়াইয়া ফটকের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিল। ক্ষণপরেই দেখিতে পাইল, কামিজ গায়ে যোগীন ভৃত্য খুকীর গাড়ী ঠেলিয়া ফটকের বাহির হইয়া যাইতেছে। বকুরাণী তখন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেখান হইতে সরিয়া আসিল।

ছাদের একধারে হাত ও পিঠওয়ালা একখানা কাঠের বেঞ্চি বারোমাস পড়িয়া থাকিত—রৌদ্রে পুড়িয়া জলে ভিজিয়া তাহার দেহখানি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে। বকুরাণী সেই বেঞ্চিখানির একটা কোণে ফুঁ দিয়া ধূলা উড়াইয়া, বসিয়া পড়িল। পুস্তকখানি খুলিয়া পাঠ আরম্ভ করিল।

দিবালোক তখন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। বাড়ীর পশ্চাতে সেই বাগান অথবা জঙ্গলটিতে পাখীরা খুব কিচিমিচি সুরু করিয়া দিয়াছে। অধিকক্ষণ অতীত না হইতেই বকুরাণীর মন পুস্তকের অবরোধ ভাঙ্গিয়া চৌরঙ্গির দিকে উধাও হইল। আকাশের দিকে চাহিয়া সে কল্পনা করিতে লাগিল, তিনি এতক্ষণ সেই হোটেলে পৌঁছিয়াছেন, দুইজনে বসিয়া কথাবার্ত্তা হইতেছে। সুশী দেখিতে কেমন, তাহার আকার প্রকার বসন ভূষণ—সমস্তই বকুরাণী কল্পনায় স্থির করিয়া লইল। টেবিলের কাছে দুইখানি চেয়ারে দুইজনে উপবিষ্ট—সে ঘরে আর কেহ নাই। তাহার কোনও কথা সুশীকে তিনি বলিতেছেন কি? অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে বকুরাণীর অদ্ভুত আচরণের কথাটি তিনি তাহাকে বলিতেছেন কি?—না, বোধ হয় তাহা বলিবেন না। তাহা কখনও বলিতে পারেন? ছি!—সে যে লজ্জার কথা! নিশ্চয় তিনি তাহা প্রকাশ করিবেন না। কথায় বলে, দিন যায় ত ক্ষণ যায় না—সারাটা দিন গিয়া কি একটা অশুভক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, সহসা তাহার বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল। কেমন করিয়া স্বামীকে ও কথা সে বলিল! ছি ছি—ভারি লজ্জা ভারি লজ্জা! এমন লজ্জায় বকুরাণী জীবনে কখনও পড়ে নাই!

এই প্রকার চিন্তায় কিছুক্ষণ কাটিলে, পশ্চাৎ হইতে কে তাহার দুই চক্ষু চাপিয়া ধরিল। বহিখানি কোল হইতে পড়িয়া গেল। চক্ষু আচ্ছাদনকারিণীর বলয়াদিশূন্য হস্ত দুইখানি স্পর্শ করিয়া বকুরাণী বলিল—"ঠাকুরঝি।"

নাম বলিতে পারিলেই এঁ কৌতুকের শেষ—কিন্তু যে চোখ ঢাকিয়াছিল, সে চোখ ছাড়িল না। বকুরাণী বলিল—"আহা, তুমি ঠাকুরঝি নও? চোখ ছাড়।"

চক্ষু তথাপি মুক্ত না হওয়াতে বকুরাণী আবার

বলিল—"স্বপ্ন দেখে বাঁচিনে! তুমি সদু না হও ত আমার কাণ কেটে দিও। তুমি সদু—সৌদামিনী দাসী।"

সৌদামিনী চক্ষু ছাড়িয়া, ঘুরিয়া আসিয়া বকুরাণীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"আমি সদু, সৌদামিনী, 'দাসী' আবার কি? আমি কারু দাসী টাসী নই। আমি কারু ঠাকুরঝিও নই। তোর চেয়ে দু বছরের বড় বলেই তুই আমায় ঠাকুরঝি বলবি?"

বকুরাণী বলিল—"ভাল ভাল!—'মা, বউ কেন আমায় ঠাকুরঝি বলে না, আমায় কেন নাম করে ডাকে?'—বলে' একদিন কেঁদেছিল কে? সেদিন ভুলে গেলে?"

সেদিনের—সেই সুখের দিনের—কথা মনে পড়িয়া সৌদামিনীর মুখখানি ঈষৎ ম্লান হইল। কিন্তু সে ভাব বলপূর্ব্বক মন হইতে তাড়াইয়া, ভূপতিত বহিখানি তুলিয়া বকুরাণীর হস্তে দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল —"এই ভরা সাঁঝে, এখানে একলাটি বসে বসে হচ্ছে কি?"

পুস্তকের প্রতি চাহিয়া বকুরাণী বলিল—"এই বই-খানা পড়ছিলাম।"

"বই পড়ছিলি কেমন! ঊর্দ্ধমুখী হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবা হচ্ছিল কি?"—বলিতে বলিতে বকুরাণীর পাশে বেঞ্চিখানিতে সৌদামিনী বসিল।

ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া, বকুরাণীকে নিরুত্তর দেখিয়া সৌদামিনী মৃদুভাবে তাহার হস্ত স্পর্শ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"দাদা কোথা গেছেন ভাই?"

বকুরাণী বলিল—"সেই, যেখানে সে আছে।"

"কোথা আছে?"

স্বামীর নিকট সুশী সম্বন্ধে বকুরাণী যাহা যাহা শুনিয়াছিল, সমস্তই বর্ণনা করিয়া শেষে বলিল—"আমা-কেও নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, আমি গেলাম না।"

সৌদামিনী সকল কথা শুনিয়া কি ভাবিতে লাগিল। সেই ভাবনার মধ্যেই ধীরে ধীরে বলিল—"গেলিনে কেন, বোকা, যেতে হয়।"

বকু বলিল—"গিয়ে আমি কি করব?"

"দেখে ত আসতিস্ কুন্দনন্দিনীকে।"

"তাকে দেখে কি আমি চতুর্ভুজ হব?—যাও ভাই, তুমি আর ঐ সব কুন্দনন্দিনী সূর্য্যমুখী বোলো না। তুমিই ত কাল রাত্রে ঐ সব বলে আমার মাথা বিগড়ে দিয়েছিলে। বুদ্ধিশুদ্ধি আমার কি রকম লোপ হয়ে গিয়েছিল। বিকেলে তাঁকে হঠাৎ একটা কথা বলে ফেলে, শেষে এমন লজ্জায় পড়ে গেলাম—ছি ছি!"

"কেন? কি কথা বলে ফেলেছিস, কি হয়েছে?"

বকুরাণী তখন অল্পে অল্পে, আজ বিকালে তাহার অদ্ভুত আচরণের বর্ণনা করিল। শুনিয়া সৌদামিনী গম্ভীর হইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বকুরাণী বলিল—"ছি ছি, তিনি কি মনে করলেন! ভারি অন্যায় হয়েছে, না ভাই?"

সৌদামিনী বলিল—"অন্যায় হয়েছে তা বলতে পারিনে। মনে বিছে পুষে রাখার চেয়ে তা বের করে ফেলাই ভাল। আমার মনে হয়, দাদার সঙ্গে তুই যদি যেতিস্ ত ভাল হত।"

বকুরাণী আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া দেখিল, তাহা প্রায় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে, দিনের আলো একেবারে ফুরাইয়া গিয়াছে। কিছু পূর্ব্বে যে সকল পাখীরা দল বাঁধিয়া উড়িয়া গৃহে যাইতেছিল, তাহারাও এখন অদৃশ্য। আকাশে গুটি-দুই: নক্ষত্র দেখা দিয়াছে। বকুরাণী বলিয়া উঠিল—"খুকী কি ফিরেছে? অন্ধকার হয়ে গেল যে।"—বলিতে বলিতে উঠিয়া ছাদের আলিসার নিকট গিয়া দাঁড়াইল।

"আচ্ছা তুই থাক্, আমি খোঁজ নিচ্ছি"—বলিয়া সৌদামিনী নামিয়া গেল। ক্ষণপরে খুকী আসার সংবাদ পাইয়া বকুরাণীও নামিয়া গেল।

খুকীর পরিচর্য্যা করিয়া, তাহাকে শয়ন করাইয়া দিয়া, গৃহকর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া, বকুরাণী নিজ শয়ন-কক্ষে আসিয়া দেখিল তখনও আটটা বাজে নাই। ভাবিতে লাগিল, সেই সাড়ে পাঁচটার সময় তিনি

বাহির হইয়াছেন, আড়াই ঘণ্টা হইতে চলিল, এখনও ফিরিলেন না কেন? এত বিলম্ব কেন হইতেছে?

কিয়ৎক্ষণ জানালার নিকট দাঁড়াইয়া বাহিরে চাহিয়া থাকিয়া শ্রান্তিবোধ হইলে, পাখা খুলিয়া দিয়া, বকুরাণী পুনরায় সেই বহিখানি কোলে লইয়া আলোকের নিকট বসিল। পড়া কিন্তু তেমন অগ্রসর হয় না। দুই লাইন পড়ে, আবার নানা চিন্তা, নানা দুর্ভাবনা আসিয়া তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করে। ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখে, কাঁটাগুলা আজ বড়ই মন্থর গতি। সময় আর কাটিতে চাহে না!

ইতিমধ্যে সৌদামিনী কখন আসিয়া বকুরাণীর অনতিদূরে দাঁড়াইয়াছে তাহা সে জানিতে পারে নাই। হঠাৎ চোখ তুলিয়া দেখিল সে মুখ টিপিয়া হাসিতেছে। বকুরাণীর সহিত চোখে চোখ মিলিতেই সে বলিল—"ছেলেবেলায় বাপের বাড়ীতে এত বই কেতাব পড়েছিস্, অঙ্ক কি মোটেই শিখিস নি?"

বকুরাণী চমকিয়া বলিল—"কেন?"

সৌদামিনী উপরে চাহিয়া বলিল—"এই ত ক'খানাই বা কড়িকাঠ, আমি ত এক মুহূর্ত্তে গুণে ফেলতে পারি। আমি পাঁচমিনিট এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি, এতক্ষণেও তুই গুণে শেষ করতে পারলি নে?"—বলিয়া বকুরাণীর পানে চাহিয়া সে হাসিতে লাগিল।

বকুরাণী বলিল—"অঙ্ক ত জানি, হিসেবে যে গরমিল হয়ে যায়।"

"আয় ছাদে আয়। বন্ধ ঘরে বসে থাকতে হবে না"—বলিয়া বকুরাণীর হাত ধরিয়া সৌদামিনী টানিল। উভয়ে ছাদে গিয়া বেড়াইতে লাগিল। রাত্রি তখন সাড়ে আটটা। সন্ধ্যাবেলায় খুব গরম ছিল, এখন ফুর্‌ফুর্ করিয়া দক্ষিণা বাতাস বহিতেছে।

উভয়ে সেই বেঞ্চিতে উপবেশন করিলে সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিল—"তোর মনটা আজ ভার ভার কেন বল দেখি?"

বকুরাণী প্রায় চুপে চুপে বলিল—"হাঁ ভাই, তিনি কি সত্যি তাকে ভালবেসেছেন?"

সৌদামিনী বলিল—"তোর মত পাগল ত আর দুটি নেই! কেন, তাকে ভালবাসতে যাবেন কেন?

"তবে, তার জন্যে এত তাঁর আকুলি ব্যাকুলি কেন? তাঁর ফিরতে এই দেরী দেখে আমার ভাবনা হচ্ছে ভাই।"

সৌদামিনী প্রায় অর্দ্ধমিনিটকাল চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে বলিল—"একটা মানুষ বিপদে পড়েছে—অসহায় স্ত্রীলোক—তাকে একটু সাহায্য করছেন তাতে কি দোষ হয়েছে?"

বকুরাণী নীরবে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। সৌদামিনী বলিল—"আয়, আয় উঠে আর একটু বেড়ান যাক্। খাসা অন্ধকারটি।"

উভয়ে কথা কহিতে কহিতে ছাদে বেড়াইতে লাগিল। এইরূপে কিছুক্ষণ কাটিলে রাজপথে পরিচিত স্বরে মোটর হর্ণ বাজিয়া উঠিল। সে শব্দ শুনিয়া উভয়ে আলিসার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। নিম্নে ভৃত্যবর্গের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল; বিজয়ের গাড়ী অঙ্গনে প্রবেশ করিল।

সৌদামিনী বলিল—"খুব সাবধান। আর যেন দাদার সঙ্গে বাঁদরামি করিস্ নে। সুশীর কোন কথা যদি ওঠে, বেশ স্বাভাবিকভাবে সে কথায় যোগ দিবি—রাগ বা অভিমান দেখাস্ নে যেন।"

"নাঃ—আবার!"—বলিয়া বকুরাণী সৌদামিনীর হাত ধরিয়া ছাদ হইতে নামিয়া গেল।

দশ মিনিট পরে, স্বামী স্ত্রীর সাক্ষাৎ হইল। বকুরাণী জিজ্ঞাসা করিল—"কি হল?"

বিজয় বলিল—"আজ সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল বলে, জোড়াগির্জ্জায় যাওয়া হয়নি।"

"তবে এত দেরী হল?"

বিজয় বলিল—"দেরী কৈ? এইত ন'টা বেজেছে। মাঠে, গঙ্গার ধারে একটু বেড়াচ্ছিলাম।"

বকুরাণীর মনে একটা প্রশ্ন জাগিয়া উঠিল—একা, না স-সুশী?—কিন্তু মুখে সে প্রশ্ন উচ্চারিত হইল না।

স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া বিজয় তাহার মনোভাব

বুঝিতে পারিল কি না বলা যায় না। সে বলিল—"তোমায় বল্লাম এত করে' চল আমার সঙ্গে, তুমি গেলে না। আর সুশী, তোমাকে দেখবার জন্যে পাগল। আমার সঙ্গেই এখন আসতে চেয়েছিল, অনেক কষ্টে তাকে থামিয়ে রেখে এলাম।"

বকুরাণী বলিল—"নিয়ে এলেই হত। আন্‌লে না কেন?"

"তোমার হুকুম না পেলে কি আনতে পারি?"—বলিয়া বিজয় হাস্য করিল।

বকুরাণী বলিল—"আমার হুকুমেই তুমি সব কায কর কি না! কবে থেকে?"

"কবে থেকে নয়?—যাও আমার খাবার দিতে বল।"

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিজনকুমারী।

এক সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে, এখনও বিজয় জোড়া গির্জ্জায় চৌধুরী সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সুশীর একটা বন্দোবস্ত করে নাই—কারণ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, গৃহস্বামী কলিকাতায় উপস্থিত নাই। তবে, শীঘ্রই তিনি ফিরিবেন।

সুশী ছেলে মানুষ, একা অতবড় হোটেলে সে কিরূপে থাকিবে, তাই প্রত্যহ বৈকালে বিজয়কে তাহার তত্ত্বাবধানে যাইতে হয়। তবে ফিরিতে কোনও দিন তাহার বিলম্ব হয় না, রাত্রি নয়টার সময় গৃহে ফিরিয়া আহারাদি করে। এখন আর বাহির হইবার সময় স্ত্রীকে সে বলিয়া যায় না—'অমুক স্থানে চলিলাম'—অধিকাংশ দিন বাহির হইবার পূর্ব্বে বকুরাণীর সহিত তাহার সাক্ষাৎও হয় না। রাত্রে সাক্ষাৎ হইলে বকুরাণীও তাহাকে জিজ্ঞাসা করে না, কোথায় গিয়াছিলে। তাহার মনের এই গূঢ় অভিমান বিজয় বুঝিতে পারে না এমন নহে। বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নীর প্রতি সে যে ঠিক ন্যায় আচরণ করিতেছে না, তাহাও সে উপলব্ধি করে। কিন্তু—এই কয়টা দিন বৈ ত নয়। কেবল চৌধুরী সাহেবের ফিরিবার অপেক্ষা—সুশীর একটা বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিতে পারিলেই সে আর তাহার ছায়াও মাড়াইবে না, এই সংকল্প এখন বিজয়ের মনে স্থির আছে।

আজ শনিবার। দ্বিপ্রহরের ডাকে সৌদামিনী একখানি চিঠি পাইল। ভবানীপুর হইতে তাহার মেঝ যা' বিজনকুমারী লিখিয়াছে—"দিদি, দেশ হইতে আমার ছোট বোন কমলা আসিয়াছে,তাহাকে লইয়া আজ সন্ধ্যার পর 'কল্পতরু' থিয়েটরে যাইব বন্দোবস্ত করিয়াছি। আমার বিশেষ ইচ্ছা বকুরাণী, বউদিদি এবং তুমি আমাদের সঙ্গিনী হও। আজ 'উর্ব্বশী-মিলন' অভিনয় হইবে—সকলেই বলিতেছে, খুব ভাল প্লে। সন্ধ্যার পরেই আমি ও কমলা তোমাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইব। বিজয় বাবুর মত সংগ্রহ করিয়া, আহারাদি করিয়া, তোমরা প্রস্তুত হইয়া থাকিবে। তোমরা না যদি যাও তবে আমি ভারি দুঃখিত হইব জানিবে।"

সৌদামিনী এই চিঠি বকুরাণীকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"যাবি ভাই?"

বকুরাণী বলিল—"দিদিকে জিজ্ঞাসা কর, বাড়ীর কর্ত্তার মত সংগ্রহ কর, তার পর যা হয় হবে।"

সৌদামিনী বলিল—"বৌদিদিকে আমি জিজ্ঞাসা করব এখন, তুই দাদার মতটা সংগ্রহ কর।"

বকুরাণী মাথা নাড়িয়া দৃঢ়ভাবে বলিল—"আমি জিজ্ঞাসা করব না।"

এই সময়ে বিজয়ের বিধবা ভ্রাতৃজায়া সেখানে আসিয়া বলিলেন—"কিসের তর্ক হচ্ছে তোদের?"

সৌদামিনী তাঁহাকে সেই পত্র দেখাইল। পড়িয়া তিনি বলিলেন—"হ্যাঁ, 'উর্ব্বশী-মিলন' খুব ভাল হয়েছে শুনেছি।"

সৌদামিনী আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"যাবে বউদিদি?"

বউদিদি বলিলেন—"তোরা যাবি—যা। আমি শুদ্ধ গেলে সংসার দেখে কে? খুকীকে রাখে কে?"

সৌদামিনী বলিল—"কেন, খুকীকেও নিয়ে যাব। খুকীর ঝিও যাবে, খুকী তার কাছে থাক্‌বে।"

"সর্ব্বনাশ!—খুকীকে সেই ভীড়ের মধ্যে, সেই গরমে! বাছা কেঁদে অস্থির হবে। অত ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে কি থিয়েটরে যেতে আছে!"

"কেন, সবাই ত যায়।"

"যায়, যারা নির্ব্বোধ তারাই যায়। ছেলে পিলের কান্নায় চেঁচামেচিতে থিয়েটরে মেয়েদের বসবার জায়গাটি কি রকম মেছোহাটা হয়ে দাঁড়ায় দেখেছিস্ ত। মায়েরা লোকের গালাগালি খেয়ে মরেন। নীচে থেকে পুরুষরা কত ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে, কখনও কখনও অপমানের কথাও বলে। যদি যেতেই হয়, খুকীকে রেখে যাস্, আমার কাছে সে থাক্‌বে।"

সৌদামিনী বলিল—"খুকীর মার মত কি?"

"আমি কিছু জানিনে"—বলিয়া বকুরাণী সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

বউদিদি বলিলেন—"বউয়ের ত তেমন চাড় দেখছিনে। ও হয়ত যাবে না।"

সৌদামিনী বলিল—"ওর মন ভাল নেই বলেই ত ওকে নিয়ে যেতে চাচ্ছি—নইলে আমার নিজের থিয়েটর দেখবার তত সখ্ নেই। মুখে হাসিটি নেই, মন গুমিয়ে থাকে, থিয়েটরে গেলে তবু দু'দণ্ড একটু আমোদ পাবে, মনটা হাল্কা হবে।"

বউদিদি বলিলেন—"আচ্ছা, তা নিয়ে যাস্। দাদাকে জিজ্ঞাসা কর্।"

সৌদামিনী বলিল—"দাদা যখন চা খেতে আস্‌বেন সেই সময় তাঁকে জিজ্ঞাসা করব।"

বিকালে বাড়ীতে কয়েকজন বন্ধুসমাগম হওয়ায় বিজয় চা-পানের জন্য অন্তঃপুরে আসিল না। সন্ধ্যার পর লছমন আসিয়া সংবাদ দিল, বাবু খানা-পোষাক পরিয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন, বাড়ীতে খাইবেন না, ফিরিতে রাত্রি হইবে।

সৌদামিনী আসিয়া বলিল—"তাই ত, কি হবে ভাই? দাদাকে যে জিজ্ঞাসা করা হল না!"

বকুরাণী বলিল—"কি আর হবে, যাওয়া হবে না।"

"মেঝ বউ অত করে লিখেছে!"—বলিয়া সৌদামিনী মুখখানি ম্লান করিয়া রহিল।

আধঘণ্টার মধ্যে ভবানীপুর হইতে ভগিনী ও ঝি সহ বিজনকুমারী আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াই বলিল—"যা ভেবেছিলাম তাই, তোমরা এখনও তৈরী হও নি! এতক্ষণ করছিলে কি শুনি।"

সৌদামিনী বলিল—"আমরা ত যাব বলেই ঠিক করেছিলাম। দুপুরবেলা তোমার চিঠি পেলাম—বিকেলে দাদাকে জিজ্ঞাসা করব পরামর্শ হয়েছিল—কিন্তু দাদা হঠাৎ বেরিয়ে গেলেন।"

মেজ বউ বকুরাণীর পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—"সারাদিনে একবার জিজ্ঞাসা করবার ফুরসুৎ হল না? কর্ত্তাটি এখন বাইরেই থাকেন না কি?"

এমন সময় হর্ণ বাজাইয়া বিজয়ের মোটর গাড়ী বাড়ী ফিরিল। সৌদামিনী বলিয়া উঠিল—"ঐ দাদা ফিরেছেন। ডেকে পাঠাই। ঝি, যা ত, বাবুকে ডেকে আন্—বল্ বউদিদি ডাকছেন।"

বকুরাণী রাগিয়া বলিয়া উঠিল—"না না—আমি ডাকিনি, আমার নাম করিস্ নে।"

ঝি চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"বাবু ত ফেরেন নি, গাড়ী ফিরে এসেছে। সুন্দর সিং বল্লে বাবু বলেছেন আমার ফিরতে রাত হবে, তুমি যাও, আমি ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে যাব।"

বিজনকুমারী ইহাদের লইয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। বুঝাইল, জিজ্ঞাসা করা হয় নাই বলিয়াই মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইবে না, বিজয় বাবু সে প্রকৃতির লোকই নহেন। ইহাঁরা না গেলে বিজনকুমারীও যাইবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল। অবশেষে বউদিদি আসিয়া বলিলেন—"তোমরা যাও—ঠাকুরপো তার জন্যে কিছু বিরক্ত হবেন না। বিরক্ত হন, আমার দোষ দিও—বোলো,—আমার মত নিয়েই তোমরা গেছ—সমস্ত ঝুঁকি আমার রইল।"

সৌদামিনী তখন বকুরাণীকে ঠেলিয়া ঠুলিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ আহার করাইয়া, নিজে জলযোগ করিয়া অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যে প্রস্তুত হইল। চারিজনে বিজনকুমারীদের গাড়ীতে আরোহণ করিয়া থিয়েটর যাত্রা করিল। তাহাদের বাড়ীর সরকার কোচবাক্সে বসিয়া ছিল, সেই টিকিট প্রভৃতি কিনিয়া ইহাঁদের বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। বিজনকুমারীদের ঝি গাড়ীর পশ্চাতে গিয়া বসিল।

থিয়েটরে যখন গাড়ী পৌছিল তখন রাত্রি পৌনে নয়টা—সাড়ে নয়টার সময় অভিনয় আরম্ভ হইবে। এই "উর্ব্বশী-মিলন" নাটক বিগত ৩।৪ মাস ধরিয়া প্রতি শনিবারে অভিনীত হইতেছে, সেই জন্য ভীড় তেমন বেশী হয় নাই। বিজনকুমারীর দল উপরে গিয়া, সম্মুখের সারিতে একেবারে চিকের নিকটেই বসিবার স্থান দখল করিতে সমর্থ হইল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

উর্ব্বশী-মিলন।

রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় অভিনয় আরম্ভ হইল।

প্রথম অঙ্কের দুইটি দৃশ্য যখন হইয়া গিয়াছে, তখন থিয়েটরের আপিস কক্ষে টেলিফোনের ঘণ্টা ঠং-ঠং-ঠং করিয়া বাজিয়া উঠিল। কর্ম্মচারী কলটি তুলিয়া কাণে লাগাইয়া বলিল—"হেল্লো।"

কলের মধ্যে শব্দ আসিল—"হু ইউ?"

"কল্পতরু থিয়েটর।"

"বক্স খালি আছে?"

"আছে—একটা খালি আছে।"

"আমার জন্য রিজার্ভ করুন।"

"আপনি কোথা থেকে কথা বলছেন?"

"গ্রেট্ ঈষ্টার্ণ হোটেল।"

"কি নামে রিজার্ভ হবে?"

"মিষ্টার বি কে বোস্।"

"কখন আসবেন?"

"এখনি রওনা হচ্ছি।"

"অল্ রাইট। রিজার্ভ করিলাম"—বলিয়া কর্ম্মচারী কলটি যথাস্থানে স্থাপন করিল।

কুড়ি মিনিট পরে, বিজয়ের ট্যাক্সি গাড়ী আসিয়া থিয়েটরের সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার অঙ্গে ইংরাজি সান্ধ্যবেশ, মুখে সিগারেট। গাড়ী হইতে নামিয়া সুশীর হাতখানি ধরিয়া তাহাকেও নামাইল। ট্যাক্সি-ওয়ালা বলিল—"ঠাহরেঁ হুজুর?"

"ঠাহরো"—বলিয়া সুশীর সহিত বিজয় থিয়েটরের ভেষ্টিব্যুলে প্রবেশ করিয়া বক্স সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেই একজন কর্ম্মচারী আসিয়া "দিস্ ওয়ে স্যর"—বলিয়া সিঁড়ি উঠিতে লাগিল। কত লোক সেই সিঁড়িতে তখন উঠিতেছে, নামিতেছে—প্রায় সকলেই একদৃষ্টে সুশীর মুখপানে চাহিতে লাগিল; কেহ কেহ বা গোপনে মৃদু হাস্য করিল।

নির্দ্দিষ্ট বক্সে উপস্থিত হইয়া বিজয় দেখিল ড্রপ্-সীন পড়িয়া রহিয়াছে, কনসার্ট বাজিতেছে। কর্ম্মচারীর হস্তে টিকিটের টাকা দিয়া, প্রোগ্রামখানির পানে চাহিয়া বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"ক'টা অঙ্ক হয়ে গেছে?"

"একটা হয়ে গেছে। এইবার দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হবে।"—বলিয়া কর্ম্মচারী প্রস্থান করিল।

সুশী বসিয়া বলিল—"এই বাঙ্গলা থিয়েটরের বক্স! কি বিশ্রী চেয়ার! কার্টেনগুলো জন্মে অবধি বোধ হয় ধোবার মুখ দেখেনি—ছি ছি!"

বিজয় বলিল—"সেইকালেই ত তোমাকে বলেছিলাম যে চল এম্পায়ারে যাই—তুমি যে ধরে বস্‌লে, না আমি বাঙ্গলা থিয়েটর দেখব।"

সুশী বলিল—"বাঙ্গলা থিয়েটর কখনও দেখিনি তাই বলেছিলাম। তা হোক্, চেয়ার টেবিল পর্দ্দা দেখতে ত আসিনি—যা দেখতে এসেছি তা কেমন হয় দেখি। আচ্ছা, এ উর্ব্বশী-মিলন নাটক কার লেখা?"

বিজয় বলিল—"কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশী নাটক থেকে তর্জ্জমা করেছে।"

"তুমি পড়েছ?"

"পড়েছি।"

"গল্পটা কি, আমায় বলে দাও না।—ওগো দেখ দেখ, ওই বক্সে কারা এল।"

বিজয় দেখিল, জরির কায-করা মখমলের টুপী মাথায় এক মাড়োয়ারী বাবু রয়েল বক্সে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে বেনারশী শাড়ী ও জরি-জহরৎ মোড়া এক সুন্দরী তরুণী। স্ত্রীলোকটিকে 'রয়েল' সীটে বসাইয়া মাড়োয়ারী বাবু পার্শ্ববর্ত্তী চেয়ারখানি অধিকার করিলেন। পশ্চাতের দুইখানি চেয়ারে অপর দুইজন মাড়োয়ারী বাবু—'বড়বাবু'র বন্ধু অথবা মোসাহেব—আসিয়া বসিলেন।

সুশী বলিল—"ওরা কারা বিজয়? রাজা টাজা?"

বিজয় ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"বড়বাজারের মাড়োয়ারী বাবু।"

"মাড়োয়ারী!—তা, ওরা পর্দ্দা মানে না?"

"খুব মানে।"

সুশী সেই জরি-জহরৎ-মোড়া স্ত্রীলোকটির পানে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিল। স্ত্রীলোকটি ইতিমধ্যে মাড়োয়ারী বাবুর সহিত হাসি গল্প জুড়িয়া দিয়াছিল। তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া সুশী মুখ ফিরাইয়া লইল; বিজয়কে আর তাহার সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করিল না। নিম্নে জনবহুল দর্শক-স্থানের প্রতি কিছুক্ষণ সকৌতুকে দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া, সহসা উপরের দিকে চাহিয়া সুশী বলিল—"দেখ দেখ—ঐ খানে সব চিক টাঙ্গানো রয়েছে। কত মেয়েরা সব বসে রয়েছে ওখানে। ঐ বুঝি পর্দ্দা-মেয়েদের বসবার জায়গা, নয়?"

"হ্যাঁ।"

চিকের আড়ালে, শাড়ীগুলির লাল নীল গোলাপী আভা এবং স্বর্ণালঙ্কারের ঝলক দেখা যাইতেছে—মানুষ দেখা যাইতেছে না। সুশী বলিল—"আচ্ছা বিজয়, তুমি বকুরাণীকে কখনও থিয়েটরে এনেছ? এনেছ নিশ্চয়। আমাকে যেমন বক্সে এনেছ, এই রকম এনেছ—না উপরে ঐ গোয়ালে পাঠিয়ে দিয়েছ?"

বিজয় হাসিয়া বলিল—"ঐ গোয়ালেই পাঠিয়ে দিয়েছি।"

"আচ্ছা, আমি যদি পর্দ্দা মেয়ে হতাম, আমাকেও ঐখানে পাঠিয়ে দিতে? সে কিন্তু ভারি বিশ্রী হত, নয় বিজয়? তুমি রইলে এক জায়গায়, আমি রইলাম এক জায়গায়, সে থিয়েটর দেখে কোনই সুখ হত না। দুজনে একসঙ্গে আছি—এই বেশ, না?"

এই সময় কনসার্ট বাজিতে আরম্ভ হইল। বিজয় বলিল—"এইবার দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হবে।"

সুশী বলিল—"প্রথম অঙ্কটা দেখতে পেলাম না যে! তুমি গল্পটা আমায় বল না।"

বিজয় বলিল—"গল্পটা সংক্ষেপে এই।—উর্ব্বশী আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলেন,—উর্ব্বশী কে জান ত? ইন্দ্রের সভার একজন অপ্সরী—তিনি আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় এক অসুর এসে, তাঁর চুলের মুঠি ধরে তাঁকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যেতে লাগল—তাঁর সখীরা, অন্যান্য অপ্সরীরা, কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিলেন। পুরূরবা রাজা রথে চড়ে সেইখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, এই ব্যাপার দেখে, সেই অসুরের পিছু পিছু রথ ছুটিয়ে দিয়ে, তাকে ধরে, বধ করে ফেল্লেন। উর্ব্বশী তখন মূর্চ্ছিত, সেই অবস্থায় তাঁকে রথে তুলে তাঁর সখীরা যেখানে কাঁদাকাটা করছিলেন সেখানে নিয়ে এসে তাঁদের হস্তে সমর্পণ করলেন। উর্ব্বশী সুস্থ হয়ে, রাজার পানে দুই একবার চেয়ে দেখে, স্বর্গে ফিরে গেলেন। কিন্তু ঐ যে চেয়ে দেখ্‌লেন, তাইতেই মুস্কিল হয়ে গেল আর কি!"

সুশী বালিকা-সুলভ বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—"কেন, মুস্কিল কি?"

"দুজনাই দুজনাকে ভালবেসে ফেল্লেন।"

সুশী কুন্দদন্তে নিজ অধর দংশন করিয়া, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কি ভাবিল। শেষে বলিল—"রাজার কোনও রাণী টাণী ছিল না কি?"

"ছিল বৈ কি!"

সুশী গম্ভীরভাবে বলিল—"হুঁ—বুঝেছি। তা হলে মুস্কিল বটে। তার পর ?"

এমন সময় কনসার্ট থামিয়া গেল, ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিল, ড্রপ্সীন উঠিয়া দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হইল। মহারাণী ঔশীনরী, রাজার উদাসভাব দেখিয়া, তাঁহার উৎকণ্ঠার কারণ জানিয়া আসিবার জন্য নিজ দাসী নিপুণিকাকে রাজবন্ধু বিদূষকের নিকট পাঠাইয়াছেন, নিপুণিকা নিপুণ কৌশলে ব্যাপারটি বিদূষকের নিকট হইতে জানিয়া লইল ;—দেখিয়া সুশী হাসিতে লাগিল। তাহার পর, উপবনে বিরহখিন্ন রাজা ও বিদূষকের কথোপকথন হইতে লাগিল। আকাশযানে উর্ব্বশী ও চিত্রলেখা প্রবেশ করিয়া, নিজেরা অদৃশ্য থাকিয়া, রাজার প্রণয়োৎকণ্ঠা দেখিতে লাগিলেন। সুশী বলিল—"রাজা ওদের দেখ্তে পাচ্ছেন না ?"

"না। ওঁরা তিরস্করিণী বিদ্যা জানেন, সেই বিদ্যার বলে, মানুষের চোখে ওঁরা অদৃশ্য থাকতে পারেন, অথচ ওঁরা সব দেখতে পান।"

সুশী হাসিয়া, উপরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—"ঐ যেমন চিকের আড়ালে লালপরী সবুজপরীরা সব বসে রয়েছেন—আমরা ওঁদের দেখতে পাচ্চিনে, ওঁরা আমাদের দেখতে পাচ্চেন, সেই রকম, নয় ?"

বিজয় হাসিয়া বলিল—"হ্যাঁ, সেই রকম।"

রাজার খেদোক্তি শুনিয়া অদৃশ্যা উর্ব্বশী কর্ত্তৃক পত্রনিক্ষেপ, রাজার সেই পত্র পাঠ ও বিদূষকের নিকট তাহা রাখিতে দেওয়া, উর্ব্বশীর আবির্ভাব ও রাজার সহিত কথোপকথন, বিদূষক কর্ত্তৃক পত্র হারাইয়া ফেলা, রাজার অন্বেষণে আসিয়া রাণী ঔশীনরী কর্ত্তৃক সেই পত্র কুড়াইয়া পাওয়া, পরে রাজার প্রতি তাঁহার অভিমানবাক্য—এ সমস্ত অতি নিবিষ্টচিত্তে সুশী দেখিতে লাগিল। এইরূপে দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত হইল ; ড্রপ সীন পড়িল, রঙ্গমঞ্চের আলোক নির্ব্বাপিত ও দর্শক-স্থানের আলোক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন লাগছে ?"

সুশী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আচ্ছা বিজয়, উর্ব্বশীর না হয় কেউ নেই, রাজাকে ও ভালবেসে ফেলেছে—কিন্তু রাজা বিবাহিত, ওঁর স্ত্রী রয়েছে—উনি কেন উর্ব্বশীকে এত ভালবাসলেন ?"

বিজয় বলিল—"তার আগে তুমি আমার কথার উত্তর দাও। উর্ব্বশী কেন রাজাকে ভালবাসলেন ? উনি থাকেন স্বর্গে, সেখানে ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ কত বড় বড় দেবতা ওঁর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী,—মর্ত্তের মানুষের প্রতি ওঁর মন গেল কেন ?"

সুশী বলিল—"কে কখন্ কাকে কি চোখে দেখে তা কি বলা যায় !"

বিজয় বলিল—"নিজেই তুমি নিজের প্রশ্নেরও উত্তর দিলে।"

সুশী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"তা বটে ! তবে আমি বল্‌ছিলাম কি, উর্ব্বশী প্রথমে রাজাকে একটু ভালবেসেছিল, কিন্তু সে যদি দেখতে পেত, রাজা তাকে ভালবাসছেন না, তা হলে উর্ব্বশীর ভালবাসা হয়ত ক্রমে নিবে যেত। কিন্তু রাজার এত ভালবাসা দেখে উর্ব্বশীর ভালবাসাও দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। রাজার রাণী রয়েছেন, রাজার কি উচিত উর্ব্বশীর জন্যে ঐ রকম পাগল হওয়া ?"

বিজয় বলিল—"ঐ ত জীবনের ট্র্যাজেডি !—যার যা করা উচিত নয়, সে তাই করে।"

"আচ্ছা, কি হবে বিজয় ? দুজনের মিলন হবে ?—তা হবেই ত—নাটকের নামই যে উর্ব্বশী মিলন। কিন্তু রাণীর তা হলে কি হবে ?"

বিজয় বলিল—"চল, বাইরে খোলা বারান্দায় হাওয়ায় একটু বেড়ান যাক্, বড় গরম এখানে।"—বলিয়া সুশীর বাহুধারণ করিয়া বিজয় বক্স হইতে চলিয়া গেল।

ইহারা প্রস্থান করিবার মিনিট খানেক পরে, উপরে চিকের আড়ালে মেয়েদের মধ্যে ভারি গণ্ডগোল উঠিল। থিয়েটর শুদ্ধ লোক হইয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া রহিল। উপর হইতে "জল আন", "পাখা আন", "সরো সরো—সরে যাও—রাস্তা দাও," "ঝি ও ঝি—ঝি আবার এই সময়ে কোথায় গেল" প্রভৃতি বামাকণ্ঠোচ্চা-

রিত শব্দে দর্শকগণের কৌতূহল আরও বাড়াইয়া তুলিল। যাহাদের স্ত্রী কন্যা ভগিনী উপরে আছে, তাহারা ভয়-বিহ্বলচিত্তে বাহির হইয়া মেয়েদের উঠিবার সিঁড়ির দিকে ছুটিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সংবাদ পাওয়া গেল, একজন স্ত্রীলোকের ফিট হইয়াছিল। লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, "শরীরই যদি খারাপ তবে থিয়েটারে আসা কেন বাপু! মাগীদের যেমন সব কাণ্ড!"

সুশীকে লইয়া বিজয় যখন বক্সে ফিরিয়া আসিল তখন গোলমাল থামিয়া গিয়াছে—কনসার্ট আবার বাজিতে আরম্ভ করিয়াছে। বসিয়া সুশী বলিল—"এখনও ড্রপ ওঠেনি?—আমি ভেবেছিলাম সুরু হয়ে গেছে বুঝি।"

তৃতীয় অঙ্কে রাজমহিষী স্বামিপূজা পূর্ব্বক "প্রিয়-প্রসাদন" ব্রত সম্পন্ন করিলেন। রাণী রাজাকে প্রণাম করিরা কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন—"আমি রোহিণী ও মৃগলাঞ্জন এই দেবতামিথুনকে সাক্ষী করে' মহারাজকে প্রসাদিত করছি, আজ অবধি আর্য্যপুত্র যে স্ত্রীকে কামনা করবেন এবং যে রমণী আর্য্যপুত্রের সমাগম-প্রণয়িনী, তাঁর প্রতি কোনও প্রতিবন্ধকতা করব না।"

সুশী ইহা শুনিয়া বলিল—"আচ্ছা বিজয়, বল দেখি, রাজাকে কে বেশী ভালবাসে, রাণী না উর্ব্বশী?"

বিজয় মনে মনে হাসিয়া বলিল—"রাণী ত রাজাকে ছেড়েই দিচ্ছেন—যে যাকে ভালবাসে সে কি তাকে অমন সত্বত্যাগ করে ছাড়তে পারে?"

সুশী হাসিতে হাসিতে মাথাটি নাড়িতে লাগিল। বলিল—"না বিজয়, তা নয়। যে যথার্থ ভালবাসে, এত বড় ত্যাগও সেই করতে পারে। রাণী কি কম মনের দুঃখে এ কথাটি বল্লেন!"—অঙ্কের শেষভাগে উর্ব্বশীর সহিত রাজার মিলন হইল।

চতুর্থ অঙ্কের প্রারম্ভে জানা গেল, রাজা আমত্যগণের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া, উর্ব্বশীকে লইয়া কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিয়াছেন এবং তথায় মন্দাকিনী তীরে ক্রীড়ানিরতা বিদ্যাধরদুহিতা উদকবতীর প্রতি রাজার সপ্রেম ভাব দেখিয়া, রোষভরে উর্ব্বশী কুমার বনে প্রবেশ করিয়া, অভিশাপবশে লতারূপে পরিণত হইয়াছেন। প্রিয়াবিরহে রাজার উন্মাদ বিলাপোক্তি শুনিয়া সুশীর চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল। বিজয় দুই একটা প্রশ্ন করিয়া কোনও উত্তর পাইল না।

অঙ্কের শেষভাগে শৈলসুতার চরণ-রক্তিমা হইতে উৎপন্ন সঙ্গমমণি লতায় স্পর্শ করাইয়া রাজা উর্ব্বশীকে পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। উভয়ের মিলনানন্দের উপর পটক্ষেপ হইল।

বিজয় বাহুস্পর্শে সুশীর ভাবাবেশ ভঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন লাগছে।"

সুশী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"বেশ।"

বিজয় ঘড়ি দেখিয়া বলিল—"রাত বারোটা। শেষ হতে এখনও ঘণ্টা খানেক দেরী আছে। শেষ পর্য্যন্ত থাকবে কি? রাত জেগে তোমার কষ্ট হবে কিন্তু। চল, ফেরা যাক্।"

হোটেলে পৌঁছিয়া, দ্বিতলে উঠিয়া বিজয় বলিল—"তোমাকে ভারি শ্রান্ত দেখাচ্ছে—শুতে যাবার আগে কিছু খাবে? দুই একটা স্যাণ্ডুয়িচ্, এক পেয়ালা চা, কি কফি, কি আর কিছু?"

সুশী জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি খাবে?"

"খাব। এস"—বলিয়া বিজয় তাহাকে লইয়া ডাইনিং সেলুনে প্রবেশ করিল। সে স্থান তখন জন-শূন্য, কেবল এক খানসামা মেঝের উপর বসিয়া ঝিমাইতেছে। বিজয় তাহাকে উঠাইয়া, দুইখানি চেয়ার ও একটি ছোট টেবিল খোলা বারান্দায় বাহির করাইয়া লইল। খানসামা বারান্দার বাতির সুইচ্ টিপিতে যাইতেছিল, বিজয় তাহাকে নিষেধ করিল—বেশ জ্যোৎস্না ছিল। সুশীকে জিজ্ঞাসা করিল—"কি আনবে?"

সুশী বলিল—"চা আর স্যাণ্ডুয়িচ আসুক।"

বিজয় বলিল—"চা? তার চেয়ে Let's have a vermouth—'twill pick you up."—আদেশ অনুসারে ট্রে ভরিয়া খাদ্য পানীয় আনিয়া দিয়া, খানসামা বিল সহি করাইয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

কিয়ৎক্ষণ নীরবে খাদ্য ও পানীয়ের সদ্ব্যবহার করিয়া, বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"বাঙ্গালা থিয়েটার কেমন লাগল বল।"

সুশী ক্ষীণস্বরে বলিল—"বেশ।"

"তুমি ভারি শ্রান্ত হয়েছ, না?"

"উঃ যে গরম থিয়েটারে! নিজেকে ভারি দুর্ব্বল মনে হচ্ছে।"

"আর একটু ভর্ম্মুথ নাও"—বলিয়া বিজয় সুশীর গ্লাস পূর্ণ করিয়া দিল।

এক একবার মেঘ আসিয়া জ্যোৎস্নাকে ম্লান করিয়া দেয়, আবার তাহা অপসৃত হইলে চাঁদ হাসিয়া উঠে। রাস্তার ও-পারে বড়লাটের বাগানে মাঝে মাঝে কোকিল ডাকিয়া উঠিতেছে। সুশীকে নীরব দেখিয়া বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"কি ভাবছ?"

সুশী কোনও উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"শরীর একটু ভাল বোধ হচ্ছেকি? শুতে যাবে এখন?"

সুশী বলিল—"তাড়াতাড়ি কি? তোমার বোধ হয়—দেরী হয়ে যাচ্ছে?"

বিজয় বলিল—"না, আমার দেরী হয়নি। তুমি কি ভাবছ?"

সুশী বলিল—"পুরূরবা-উর্ব্বশীর কথাই ভাবছি।"

"আচ্ছা কোন খান্‌টা তোমার সব চেয়ে ভাল লাগলো?"

"রাজার বিরহ। সেই যখন উর্ব্বশী লতা হয়ে গেছেন, রাজা তাঁকে দেখতে না পেয়ে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছেন—উঃ, উর্ব্বশীকে রাজা কি ভালই বেসে-ছিলেন! সেইখানটার কথা ভাবছি।"

"কি ভাবছ?"

"ভাবছি—আমায় যদি কেউ ও রকম ভালবাসে, তা হলে, আমি কি করি?"

বিজয় সহসা বলিয়া ফেলিল—"হয়ত কেউ বাসে। তুমি বাসো কিনা তাই বল।"

সুশী কোনও উত্তর করিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে লাট সাহেবের কুঠি হইতে ঢং করিয়া একটা-বাজার শব্দ আসিল।

বিজয় বলিল—"আর দেরী কোরো না। শোবে চল।"

ডাইনিং সেলুন অতিক্রম করিয়া, ভিতরের লম্বা বারান্দা দিয়া বিজয় সুশীকে তাহার শয়নকক্ষ অভিমুখে লইয়া চলিল। কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া, সুশীর করধারণ করিয়া বিজয় বলিল—"এখন তবে যাই?"

সুশী বলিল—"যাই কি বলতে আছে?"

বিজয় রুদ্ধস্বরে বলিল—"তবে আসি?"

"এস।"

"গুড্‌ নাইট্‌"—বলিয়া সুশীর হাতখানি তুলিয়া নিজ ওষ্ঠে স্পর্শ করিয়া সে বিদায় লইল।

সুশী শয়নকক্ষে গিয়া বিছানায় পড়িয়া, বালিসে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

জাগরণ

বীজের অন্তরতম অন্তর প্রদেশে
নিভৃত গুহায়,
ক্ষুদ্র স্নিগ্ধ তরুশিশু পাতি শয্যা তার
নীরবে ঘুমায়।
রবিরেখা বলে—জাগ, আলোকের স্রোতে
আজি অবগাহ।

বৃষ্টিবিন্দু স্নিগ্ধোজ্জল ধীরে ডাকি কহে—
আঁখি মেলি চাহ।
ডাক শুনি, বাহিরের অপূর্ব্ব জগৎ
দেখিবে ভাবিয়া,
ধীরে ধীরে শয্যা ত্যজি তরুণ মুকুল
এল বাহিরিয়া।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

শ্রুতি-স্মৃতি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

'গুড্ম্যান'-এর সৌজন্যে বাসা সংগ্রহ করিয়া, ষ্টেশন-সংলগ্ন যাত্রীনিবাসের যে কক্ষে আমার জিনিষপত্র এবং সঙ্গীয় লোকদিগকে রাখিয়া গিয়াছিলাম, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ইচ্ছা, পূর্ব্বপরিচিত বঙ্গ-বাচালের প্রাপ্য ঘরভাড়া এবং তাহার অন্যত্রদুর্লভ অনুপম মাংসের ঝোলের পুরা দাম কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া, সেখানকার বাস উঠাইয়া নূতন বাসায় চলিয়া যাইব। আমার অনুপস্থিতি-কালে সঙ্গীয় লোকজনের সহিত কৌশলে কথাবার্ত্তা কহিয়াই হউক কিংবা তাহার স্বাভাবিক বুদ্ধিবলেই হউক, বঙ্গবাচাল বুঝিয়া লইয়াছিল যে আমি সেখানে পারতপক্ষে থাকিব না—তাহার সুনির্ম্মল মাংসের ঝোলের প্রলোভনেও নহে। আমি ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, বাড়ীর সম্মুখের পথে বঙ্গ-বাচাল উৎকণ্ঠিত মনে আমারই প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া পাদচারণ করিতেছে। আমি গাড়ী হইতে নামিয়া কোন কথা কহিবার পূর্ব্বেই সে তারস্বরে এবং নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী সহকারে বলিয়া উঠিল—"হাঁ মহাশয়—পেয়েছি পেয়েছি। আমি পাব না ত এই এলাহাবাদ সহরে পাবে কে? আপনি যেমন রাজা বাবু, আপনার থাকবার উপযুক্ত বালাখানা পেয়েছি। একবার দেখ্বেন আসুন, খাস নবাব সাহেবের বাস করবার তিনতলা রংমহল মশায়, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। নীচতলায় রান্না, দোতলায় চাকরদের থাকবার বেশ হবে, আর তেতলায়, যেখানে নবাবের খাস মহল ছিল, সেখানে আপনি থাক্বেন। আমি সব বন্দোবস্ত ঠিক করেছি, কেবল একটিবার আপনার দেখে 'হাঁ' বলার অপেক্ষা। আর সে বাড়ী দেখ্লে আপনাকে 'হাঁ' বলতেই হবে; চলুন চলুন আর দেরী নয়।"

আমি এই নির্ল্লজ্জ বাক্যবাগীশের বচনবন্যার প্রবল তোড়ের মুখে নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কোন্ ঘোরী, খিল্জী বা তোগ্লক লোদী, কিংবা কোন্ তৈমুর, চেঙ্গিস্ বা আব্বাস নাদিরের সমুচ্চবংশোদ্ভব এই নব্বাব, কোন্ মাক্রাণার স্ফটিকস্বচ্ছ মর্ম্মরনির্ম্মিত সুন্দর এই রংমহল, কবে কোন যুগে সহস্র উৎসমুখে কোন্ ইরানের মন্দারগন্ধী গুলাব-প্রপাতে এই মহেন্দ্রপুরীর হর্ম্ম্যতল নিয়ত ধ্বনিত হইত, কোন্ তুরাণী ও ইরাণী বা 'জর্জ্জিয়ানী'র রূপবর্ত্তিকা এই শাহী সৌধের কক্ষে কক্ষে তীব্র মধুর আলোকরশ্মি কবে বিচ্ছুরিত করিত কিনা তাহা জানি না, কিন্তু এই বাচালের বচন তরঙ্গের অবাধ অভিঘাতে আমি মূকের ন্যায় বহুক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিলাম। ইহার বাক্য-পারিপাট্য এমনই যে, সমস্ত দিন ধরিয়া এই লোকটির মিথ্যাভাষণের বহু প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও ইহার বর্ণিত এই সৌধ যেন রূপ ধরিয়া আমার নয়ন সম্মুখে তাহার অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিল। ভিনিসীয় কাচনির্ম্মিত সহস্র দীপাধারে সুগন্ধী বর্ত্তিকার স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোকমালা যেন আমার চক্ষুর সম্মুখে তাহাদের শান্ত রশ্মি বিকীরণ করিতে লাগিল। সারিঙ্গীর সুমিষ্ট সুরের সহিত নর্ত্তকীর অপ্সরকণ্ঠে গজল্ গীতি এবং যৌবনবিহ্বলা নৃত্যপরা নারীর নূপুর-নিক্কণের সহিত আভরণ-শিঞ্জিতের মধুর ধ্বনি যেন সত্য সত্যই আমার কাণের কাছে সজীব হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের জন্য আমি মনে করিলাম, বুঝিবা সে কোনও বাসোপযোগী সুন্দর গৃহের সন্ধান পাইয়াছে।

আমাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া তাহার উৎসাহ ও উদ্যম আরও বাড়িয়া গেল। অনর্গল নানা কথা বলিয়া তাহার বর্ণিত 'বালাখানা' দেখিতে যাইবার জন্য উদ্‌ব্যস্ত করিয়া তুলিল। তাহার বর্ণনা-চাতুর্য্যে যদিই বা আমি মুহূর্ত্তের জন্য তাহার বালাখানার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়াই থাকি, তথাপি সেখানে যাওয়া হইবে না ইহা আমার মনে স্থিরই ছিল; তাহার প্রধান কারণ এই যে তৎপূর্ব্বে গুড্ম্যানের সাহায্যে বাসা স্থির করিয়াই আসিয়াছিলাম। ক্ষণেকের জন্য আমাকে নীরব থাকিতে

দেখিয়া আমার সঙ্গীয় ভগবতীচরণ ও নবীনচন্দ্র যে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা তাহাদের মুখ দেখিয়াই আমি তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলাম। তাহাদের মৌন মুখশ্রীতে যেন স্পষ্ট লেখা ছিল—"কাজ নাই আমাদের বালাখানায়। চলুন, আপনি যে বাসা নিজে স্থির করিয়া আসিয়াছেন সেইখানেই যাওয়া যাক্।"

প্রাচীন নবাববংশের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিলাস-বিভ্রমের মাধুর্য্যময় স্মৃতি-সমন্বিত এই মর্ম্মর সৌধের প্রলোভন যখন একান্তই আমাকে প্রলুব্ধ করিতে পারিল না, তখন বঙ্গ-বাচাল একেবারে হাল ছাড়িয়া দিল; এবং আমার সমাভিব্যাহারীদিগের মুখশ্রীও সেই সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। আমি এই বাক্য-বিশারদ প্রবাসী বঙ্গসন্তানের সহিত একটু রঙ্গ করিবার লোভ ত্যাগ করিতে পারিলাম না। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মশায়, বাড়ীটা ত অনেকক্ষণ পূর্ব্বে দেখেছেন, ইতিমধ্যে সেটা আর 'ফেঁসে' যায় নি ত?"

সে ছেলে অপ্রতিভ হইবার নহে। অম্লানবদনে কহিল—"বুঝেছি মশায়, ঐ 'ফেঁসে' কথাটাই আমাদের কপাল ফাঁসিয়েছে। যাক্ সে কথা। কিন্তু বাড়ীটা একবার দেখ্‌লে আপনার সেখান থেকে যেতে মন সরতো না, একথা বুক ঠুকে বলতে পারি।"

আমি কহিলাম—"তবে না দেখাই ভাল। কারণ যেতে যখন হবেই, তখন আপনার বালাখানা দেখে তার মোহে পড়বার আগে যাওয়াই ভাল।"—সে সময় বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যগুরু কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথের "ক্ষুধিত পাষাণ" বাহির হয় নাই; হইলে, পাগলা মেহের আলি কিংবা বরীচের তুলার মাসুল কলেক্টরের দুর্দ্দশার কথাটা ভদ্রলোককে শুনাইতে পারিতাম।

যাক্—বহু কষ্টে এই প্রবাসী স্বদেশীর হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া লোকজন ও জিনিষপত্র সহ আমি নূতন বাসায় গেলাম। এক সন্ধ্যার আহার ও যাত্রীনিবাসের ঘর ভাড়া বাবদ যে পরিমাণ অর্থ তাঁহাকে গণিয়া দিতে হইল, তাহার দ্বারা যে কোন সহরে অতি দুর্ভিক্ষের দিনেও পরম সুখে দশদিন বাস করা যাইতে পারিত। আসিবার সময়ে সেই লোকটির সহিত আমাদের ভগবতীচরণের যেরূপ ভাষায় কথাবার্ত্তা হইল, সাহিত্যের দরবারে কোন প্রকারেই তাহাকে দাঁড় করানো যায় না, সুতরাং সে চেষ্টা হইতে বিরত রহিলাম।

নূতন বাসায় গেলাম। বাসাটি বড় না হইলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ভদ্রপল্লীর মধ্যে, অল্পদিনের জন্য সেখানে বাস করিতে কোন অসুবিধা হইবার কথা নহে। সে রাত্রির জন্য আহার্য্য যাহা ছিল তাহাই অমৃতোপম মনে হইতে লাগিল, কারণ দুই প্রহরের মাংসের ঝোলের যে বর্ণনা ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি, তাহাতেই আমার পাঠকপাঠিকাগণ বুঝিতে পারিয়াছেন, মূল্যের অনুপাতে অতি অল্পই আহার্য্য গলাধঃকরণ করিতে পারিয়াছিলাম। আমার এই জীবনব্যাপী দেশ-ভ্রমণের মধ্যে মূল্য দিয়া অনাহার বহুবার ঘটিয়াছে, কিন্তু নিঃসম্পর্কীয় অপরিচিত ক্ষুধার্ত্ত যুবকের সহিত এতটা রহস্য করিতে পারা যায়, এ ধারণা তৎপূর্ব্বে আমার ছিল না। যাহা হউক, আহারান্তে সমস্ত দিবসের পরিশ্রম এবং বচসার পরে শ্রান্ত দেহ বিছানায় ঢালিয়া দিবামাত্র চক্ষু ভরিয়া কোথা হইতে নিদ্রা আসিল কে জানে!

অতি সুনিদ্রার পরে প্রভাতে যখন চক্ষুরুন্মীলন করিলাম, তখন দেখিলাম, মধুর প্রভাতের প্রফুল্ল সূর্য্য-করসম্পাতে আমার ক্ষুদ্র বাসাখানি ঝল্‌মল্ করিতেছে। এ স্থানটি যদিও তীর্থস্থান, এবং সে তীর্থও ছোটখাট তীর্থ নহে, কিন্তু কি জানি কেন পাণ্ডা-প্রভুদের করুণা আমার উপর তেমন সজোরে বর্ষিত হইল না। দুই একজন উঁকিঝুঁকি মারিয়া খবর লইলেন বটে, কিন্তু যখন জানিলেন আমি গুডম্যানের আশ্রিত, হয়ত তাঁহাদের পাণ্ডাই আমার পাণ্ডা হইবে এই ভাবিয়া বিশেষ কোনও গোলযোগ না করিয়াই ইঁহারা আমাকে অব্যাহতি দিলেন।

জানি যুক্তবেণীর জলস্রোতে অবগাহনই এখানকার সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান তীর্থকৃত্য, সেই জন্যই স্নানো-

পযোগী বস্ত্রাদি লইয়া ক্ষণপরে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমতীর্থের উদ্দেশে রওয়ানা হইলাম।

যেখানে গাড়ী থামিল, সেখান হইতে হাঁটিয়া কিছু দূরে গেলে তবে নদীতটে পঁহুছান যায়। মধুমধ্যাহ্ন তখনও সমাগত হয় নাই। বেলা অনুমান তখন দশটা হইবে। সূর্য্যকরোত্তপ্ত সিকতাভূমি এই সময়ের মধ্যেই দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল। কাহার সাধ্য নগ্নপদে তাহার উপর দিয়া চলে! বালিতে জুতা নষ্ট হইবার ভয়ে জুতা ছাড়িয়াই গাড়ী হইতে নামিয়াছিলাম। দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়াই সে দুঃসাধ্য চেষ্টা হইতে বিরত হইলাম। জুতা অপেক্ষা পায়ের মমতা অধিক তাহা বুঝিতে আমার দুই মিনিটের বেশী বিলম্ব হয় নাই।

আমাকে গাড়ী হইতে নামিতে দেখিয়া দুইচারিজন পাণ্ডা দ্রুত আসিয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিল। আমি বাগ্‌বিতণ্ডা ঝগড়াঝাঁটি যাহাতে একেবারে না হইতে পারে, সেই জন্য সর্ব্বপ্রথমে যে আসিয়াছিল, তাহাকেই আমার গুরুপদে বিনা বাক্যব্যয়ে বরণ করিয়া লইলাম। সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কর্ম্ম এইরূপে সহজে নিষ্পন্ন হইয়া গেল।

দ্বিতীয় অধ্যায়—নাপিত। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, কাশী হইতে প্রয়াগ আসিবার পথে আমার ভৃত্য এবং নিত্যসহচর নবীনচন্দ্র 'নরসুন্দর' খুঁজিয়া পায় নাই; কিন্তু এখানে সে পদার্থের সমধিক প্রাচুর্য্য দেখিয়া শুধু নবীন কেন, তাহার মনিব পর্য্যন্ত বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল। দূর হইতে দেখিলাম একদল লোক—সংখ্যায় শতাধিক হইবে—বৃহৎ কাঁচি এবং লোহার বাঁটের স্বদেশী ক্ষুর 'উঁচাইয়া' আমার দিকে সদর্প পাদক্ষেপে চলিয়া আসিতেছে। প্রয়াগে মস্তক-মুণ্ডনের বিধান আছে ইহা হিন্দুসন্তান মাত্রেই জানে। না জানা থাকিলে, নিজের মস্তক লক্ষ্য করিয়া উদ্যতাস্ত্র এতগুলি লোককে দ্রুত আসিতে দেখিয়া নেপোলিয়ন, জুলিয়স্ সীজর কিংবা আলেক্‌জণ্ডার প্রমুখ জগতের বীরাগ্রগণ্য যোদ্ধ্‌গণও রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতেন সন্দেহ নাই। আমি জানিতাম ব্যাপার কি, তাই নির্ভয়ে ধীরপদে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

মুহূর্ত্তে অসুন্দর 'নরসুন্দরে'র দল আমাকে অভিমন্যুর মত ঘেরিয়া ফেলিল। প্রয়াগে তীর্থকৃত্যের জন্য যে কেহই আসে, সর্ব্বমুণ্ডন করিয়া তীর্থের সমস্ত পুণ্যটুকু সে আহরণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। স্মরণাতীত কাল হইতে এইরূপই চলিয়া আসিতেছে। এই সকল ক্ষৌরব্যবসায়ী নরসুন্দরের দলও ইহাই দেখিয়া আসিতেছে। কেহ যে গঙ্গাযমুনার সঙ্গমতীর্থের তীর-তটে আসিয়া মাথার চুল বাঁচাইয়া ঘরে ফিরিবার কল্পনা পর্য্যন্ত মনে আনিতে পারে, তাহা ইহাদের কল্পনায় আসিবার মত কথা নহে। সেই জন্য যখন আমি রুক্ষস্বরে কহিলাম—"নাপিতের দরকার নাই, আমি মাথা মুড়াইব না"—তখন এই বিশাল নরসুন্দরসঙ্ঘ বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিয়া দাঁড়াইল; এবং আমার পাণ্ডা মহারাজের মুখ চক্ষুর ভাব দেখিয়া আমি বুঝিলাম যে, আমার হিন্দুত্ব সম্বন্ধে তাঁহারও সমধিক সন্দেহ জন্মিয়াছে। গাড়ী হইতে যখন বালুচরে নামিয়া পদব্রজে নদীতীরের দিকে অগ্রসর হই, তখন গায়ের জামা খুলিয়া গাড়ীতে রাখিয়া, একখানি বড় তোয়ালে দ্বারা অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া যাইতে-ছিলাম। দেখিলাম, আমার পাণ্ডাটি তোয়ালের ফাঁক দিয়া আমার যজ্ঞোপবীত দেখিবার জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছে। বুঝিলাম, আমার ব্রাহ্মণত্ব এবং হিন্দুত্ব উভয় বিষয়েই এই তীর্থবাসী ব্রাহ্মণের দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। আমি গাত্রাবরণ তোয়ালিয়াখানি কৌশলে একবার উন্মোচন করিয়া, পুনরায় মাথা হইতে ভাল করিয়া সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিলাম—যেন সূর্য্যতাপ হইতে নিজকে ভালমতে রক্ষা করাই আমার উদ্দেশ্য। এই সুযোগে পাণ্ডা আমার বকশুভ্র উপবীত দেখিয়া যখন জানিল যে আমি ব্রাহ্মণসন্তান, তখন আমার এই মুণ্ডনে অনাসক্তি তাহাকে আরও বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া দিল। সে ভাবিতে পারিল না যে, তীর্থরাজ প্রয়াগের প্রান্তবাহিনী গঙ্গা-

যমুনার তীরতটে দাঁড়াইয়া কোনও ব্রাহ্মণসন্তান অমুণ্ডিত-মস্তক রহিবার কল্পনাও করিতে পারে। এ যে দিনের কথা, সেদিনে আমার বয়স বিংশতি বর্ষেরও ন্যূন। এই কৈশোরের সীমান্তে দাঁড়াইয়া যৌবন-নেপথ্যের রঙ্গীন প্রারম্ভ যখন অল্প অল্প দৃষ্টি-গোচর হইতে থাকে, সেই দুর্ল্লভ বয়ঃসন্ধির সময়ে নরনারী কোন পুণ্যলোভেই নিজকে অসুন্দর করিবার উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইতে পারে কি না জানি না, —আমি কিন্তু পারি নাই। যে দিনে মানুষ তাহার ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদামকে নানা সম্ভব অসম্ভব প্রসাধনে প্রসাধিত করিবার চেষ্টা পায়, সুগন্ধি তৈল-নিষেকে শিরস্থ প্রত্যেক কেশটিকে ইচ্ছামত স্থানে নিয়ত স্থির রাখিবার জন্য নিরলস চেষ্টায় তাহার হস্তকে সতত ব্যাপৃত রাখে, কবিবর্ণিত কাব্যের নায়কের ন্যায় "ব্যূঢ়োরস্কবৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ" হইবার নিষ্ফল উদ্যমে অনেক প্রকারের কঠিন ব্যায়ামের দুশ্চেষ্টায় সময়াতিপাত করে, প্রতিদিন প্রাতঃকালে দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাহু বক্ষ এবং কটিতটের দৈনন্দিন পরিপুষ্টির পরিমাপ গ্রহণ করিতে ব্যস্ত থাকে—ফলতঃ যে বয়সে শারীরিক সৌন্দর্য্যে অপরকে মুগ্ধ করিবার অশেষ চেষ্টার আনন্দের মধ্যে দিনগুলি অতিবাহিত হইতে থাকে, সে দিনে বহুকালের সযত্নপ্রসাধিত এলবার্ট ফেসানের টেরি কাটা ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাশিকে একনিমেষে সমূলে নির্ম্মূল করিবার মানসিক শক্তি আর যাহার থাকে থাকুক, আমার ছিল না। আমি সেই জন্য এই নাপিত-রেজিমেণ্ট এবং তাহাদের ব্রাহ্মণ সেনাপতি পাণ্ডা মহারাজের সহিত একাকী যুদ্ধ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া সদর্পে দাঁড়াইলাম। বাল্যের নানা-রোগক্লিষ্ট শীর্ণ দেহখানি সবেমাত্র সেই সময়ে মাংস এবং পেশীর সমাবেশে মানবদেহের আকার ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, প্লীহাস্ফীত শিরাসমন্বিত ডাগর উদর কেবল কৃশ হইতে সুরু করিয়াছে, কলেজের মল্লগুরু তারক বাবু এবং আমাদের পল্লীর দ্রোণাচার্য্য লছমন্ পাঞ্জাবীর প্রসাদে কলেজের ছাত্র-মণ্ডলীর মধ্যে অল্পদিন পূর্ব্বেই বলিষ্ঠ বীর আখ্যা লাভ করিয়াছি এবং পরমায়ুও তখন বিশ পর্য্যন্ত পহুঁছায় নাই, এমন দিনে কেশের সংস্কার কার্য্যে কি পরিমাণ মনঃসংযোগ করিতাম তাহা বলা বাহুল্য। সেদিনে যদিও "কুন্তলীন", "জবাকুসুম", "বেগম বাহার" প্রভৃতি জন্মে নাই, "ঢোল কোম্পানী"র গোলাপী নারিকেল তৈলের নাম সুদূর পল্লীবাসীর কর্ণে পহুঁছিয়াছে কি না সন্দেহ, তথাপি সকালে বিকালে রাত্রি দুপুরে সময়ে অসময়ে পদ্মা এবং পুষ্করিণীর জলে মাথা ভিজাইয়া, বিলাতী তারের বুরুষের সাহায্যে চুলের যতটা হেফাজত করা যাইতে পারে তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। এবং অধ্যবসায়ের গুণে ফল নিতান্তই পাই নাই এমন কথা কি করিয়া ভদ্রসমাজে বলি? আমার এহেন সাধনার সামগ্রী কুণ্ডলায়িত ঈষৎ দীর্ঘ ঘনকৃষ্ণ কেশরাজি, মেড়ুয়া নাপিতে মুড়াইয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিবে এবং পুণ্যলোভে আমি তাহা সস্মিত বদনে সহ্য করিব, ইহা হইতে পারে না। সুতরাং ঠাণ্ডা মেজাজে পাণ্ডাজীর দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলাম—"ঠাকুর, আমার অবয়ব চালচলন বয়স এবং চুলের অবস্থা দেখিয়া তোমার কি মনে হয় যে আমি মাথা মুড়াইবার জন্য এখানে আসিয়াছি?"

সে গম্ভীর হইয়া উত্তর করিল—"হাঁ, ইয়া উমরমে ভক্তি বহুৎ কম আদমীকা হোতা হায়, পরন্তু তীরথমে ইয়ে অনুষ্ঠান বরাবরসে চলা আতা হায়, ইস্ লিয়ে হাজামৎ হোনাই চাহিয়ে বাবুজী।"

আমি কহিলাম—"তোমার বেণীঘাটে স্নান করিতে হইলে ক্ষৌরকার্য্য যদি একান্তই বিধেয় হয়, তবে আমার দাড়ি কামাইয়া দাও।"

সে আমার মুখের দিকে চাহিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। আমার ওষ্ঠে চিবুকে গণ্ডে যাহা ছিল তাহা ক্ষুরাস্ত্রের বিষয়ীভূত হইবার উপযুক্ত নহে—সেই জন্য সে হাসিয়া কহিল—"আচ্ছা বাবুজী, আপকা শিরকা বাল দো একঠো কাঁইচিসে কাটোয়ায় লিজিয়ে,
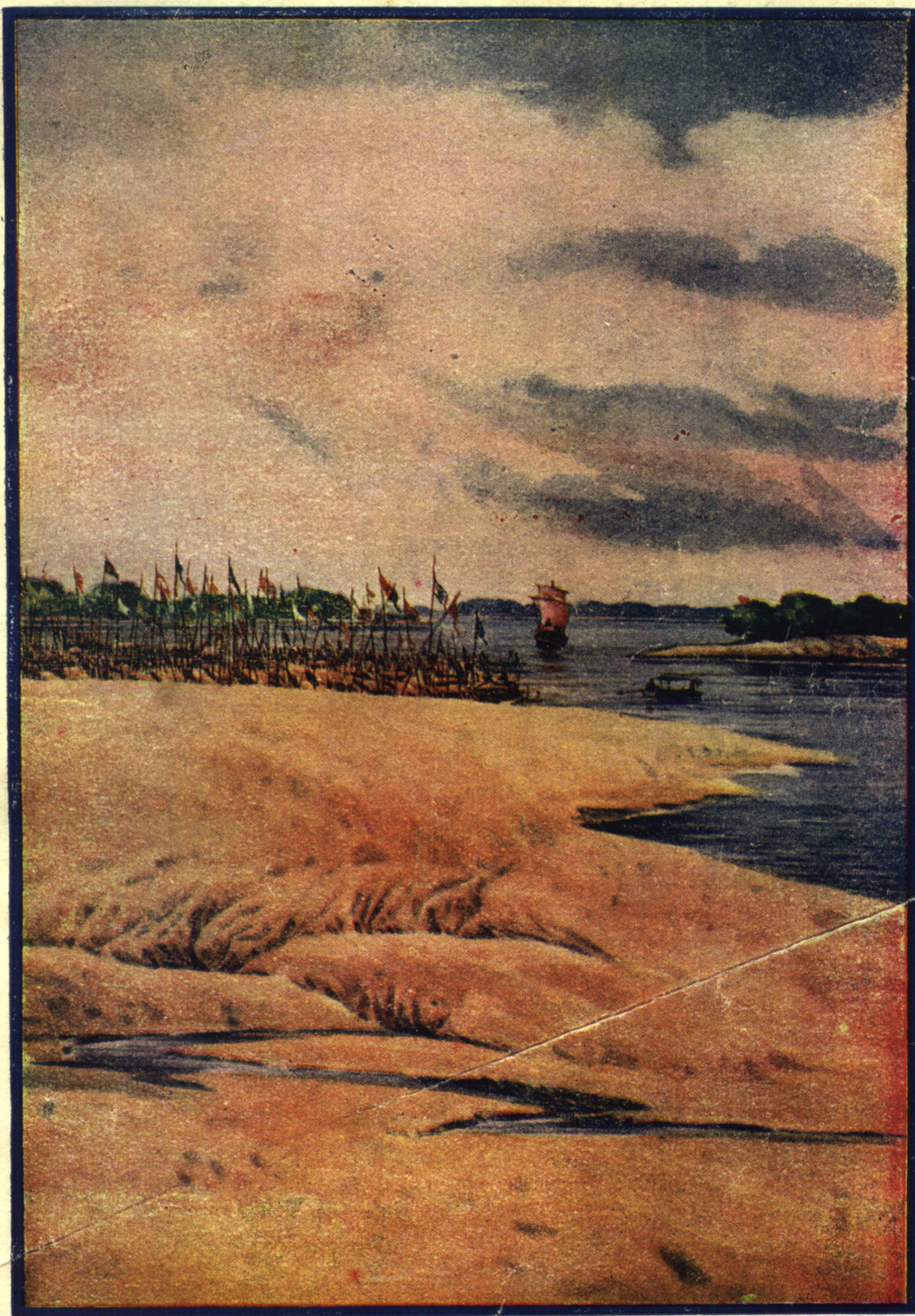
গঙ্গাযমুনা সঙ্গমে

চিত্রকর—শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন

MANASI PRESS.
CALCUTTA.

ইসমে শাস্ত্র বচনভি রক্‌খা হুয়া, আপকাভি মৎলব পূরা হো গেয়া।"

আমি দেখিলাম, যুক্তি মন্দ নহে। হিন্দুর বিধানে অনুকল্পের অভাব নাই, বিধান অমান্য করিবার জন্য পাপ আমাকে স্পর্শ করিবে না অথচ আমার সযত্ন কুণ্ডলায়িত কেশও বাঁচিয়া যাইবে। আমি তাহাতেই সম্মত হইলাম।

নিজের কেশের প্রতি সেদিনে যে মমতা দেখাইয়াছিলাম, Samsonও সেরূপ মমতা দেখাইতে পারে নাই। যাহা হউক, বিশেষ গোলমাল না করিয়াই কেশ-সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল। কিন্তু দেখিলাম, নাপিত ভায়ার মুখ প্রসন্ন হইল না। পরে কথায় বার্ত্তায় জানিলাম, সর্ব্বমুণ্ডন করিলে তাহাকে যে দক্ষিণা দিতাম, শুধু দুই গাছি মাথার চুল কাটিয়া দেওয়ায় সে-তাহা পাইবে না এই ভাবিয়া বেচারা ম্রিয়মাণ হইতেছিল। আমি তাহার সে সন্দেহ দূর করিবার জন্য কহিলাম—"ভয় নাই, পূরা আজুরাই দিব।" সে মহানন্দে সেলাম করিয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘাটের দিকে চলিতে লাগিল।

চৈত্রমাসে নদীর জল সরিয়া গিয়া বিদীর্ণ বক্ষুর বালুতট বাহির হইয়া পড়িয়াছে। গঙ্গা যমুনার দুইটি পৃথক ধারা যেখানে এখন স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, সে স্থানও একটু দূরে, নৌকা করিয়া না গেলে সেখানে যাওয়া যায় না এবং সেই সঙ্গমস্থলে অবগাহন করাই শাস্ত্রবিধি। সুতরাং তীর হইতেই গঙ্গাপূজার ফুলচন্দন দুগ্ধ শর্করা তণ্ডুল কদলী প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া লইয়া নৌকারোহণে যাইতে হইবে।

আমি আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য পাণ্ডাকে আদেশ দিয়া অদূরবর্ত্তী এক বৃক্ষতলে বিশ্রামার্থ বসিলাম। সেখানে আরও কয়েকটি নিম্ব শিরীষ এবং বটবৃক্ষ ছিল, তাহাদেরই ছায়ার আশ্রয়ে অনেকগুলি সাধু সন্ন্যাসীকে দেখিলাম। কেহ উর্দ্ধবাহু, বামহস্ত শূন্যে তুলিয়া কত কাল রহিয়াছে কে জানে? সঞ্চালনহীন সেই অঙ্গটি শীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। কাহাকেও দেখিলাম, আপাদ-মস্তক মোটা লোহার শিকলে জড়াইয়া, 'শঙ্কলী বাবা' সাজিয়া বটবৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া রহিয়াছে। অপর একজনকে দেখিলাম, প্রায় ছয় ফুট আন্দাজ একখানি কাঠের তক্তায় অসংখ্য পেরেক পুঁতিয়া, সেই সূচ্যগ্র পেরেকের উপরে নির্ব্বিবাদে শয়ন করিয়া ভজন গান করিতেছে। দেশেও অনেক সাধু সন্ন্যাসী সময়ে সময়ে পশ্চিমাঞ্চল হইতে আসিয়া থাকে, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে আমি লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ কিংবা 'পেরেকশায়ী' সাধুর সন্দর্শন কখনই পাই নাই। এইখানে একটি কথা বলিয়া রাখি—পূর্ব্বদিবস সায়ংকালে যখন গঙ্গাযমুনার সঙ্গম দেখিবার জন্য নদীতীরে গিয়াছিলাম, তখন এই সকল সাধুর দর্শনলাভ আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই। আজ দেখিলাম, ইহাঁদের আবির্ভাবে নদীতীরে তিল রাখিবার স্থান নাই এবং যাচ্ঞার তোড়ে স্নানার্থী পুণ্যলোভাতুর তীর্থযাত্রীদেরও শান্তি নাই। পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এই সকল সাধুদিগের সহরে বা সহরতলীতে একটি করিয়া 'শান্তিময়' পুণ্যাশ্রম আছে, সেই স্থানেই ইহাঁদের স্থায়ী আসন, কেবল প্রাতে স্নানার্থী যাত্রীদলের নিকট হইতে দান গ্রহণ করতঃ তাহাদিগকে কৃতার্থ করিবার মানসেই একবার করিয়া তটতরুর ছায়াতলে নিজ নিজ পুণ্য মহিমা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই সকল সাধুদিগের ক্রোধাদি রিপুজয়ের একটি গল্প এইখানে শুনাইতেছি। যে দিনের কথা আজ বলিতে বসিয়াছি, তাহার অল্প কয়েক বৎসর পরে আমি, আমার বন্ধু হাইকোর্টের উকীল বাবু রমাকান্ত ভট্টাচার্য্য এবং ইন্দুশেখর চক্রবর্ত্তী নামক আমার অপর একটি ডাক্তার বন্ধু, অযোধ্যা লক্ষ্ণৌ ডেরাডুন মশুরি প্রভৃতি স্থান বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিবার পথে এলাহাবাদে নামিয়াছিলাম। আমার বন্ধু ডাক্তার ইন্দুশেখর তৎপূর্ব্বে এলাহাবাদে আর যান নাই। গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমধারার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিবার লোভ তাঁহার যথেষ্টই ছিল, সুতরাং একদিন প্রাতে আমরা তিনবন্ধু বেণীঘাটে স্নানার্থ চলিলাম। নদীতীরের ছায়াতরুতলে সেই চিরন্তন 'পেরেকী' সাধুর সন্দর্শনলাভ

ঘটিল। আমি আমার বন্ধু ইন্দুশেখরকে সম্বোধন করিয়া মৃদুস্বরে এই সকল ভণ্ড সাধুর কীর্ত্তি কলাপের আলোচনা করিতেছিলাম। কাহাকেও শুনাইব এমন ইচ্ছা ছিল না এবং সাধু মহাশয় না শুনিতে পান সে বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতাই অবলম্বন করিয়াছিলাম। জানি না কেমন করিয়া আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ "ভণ্ড" ইত্যাদি দুই একটি কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইয়া থাকিবে। তিনি তাঁহার পেরেক-সমাকীর্ণ সুখশয়ন পরিত্যাগ করিয়া একলম্ফে সিংহবিক্রমে উঠিয়া বসিলেন এবং তাঁহার গঞ্জিকারঞ্জিত রক্তচক্ষু কপালে তুলিয়া আমার প্রতি যে সকল সাধূক্তি এবং আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিলেন, না তাহা সাধুজনরসনার উপযুক্ত, না তাহা ভদ্রসন্তানের উদ্দেশে প্রয়োগযোগ্য। আমি ঈষৎ হাসিয়া কহিলাম—"সাধু বাবা ত ঈশ্বরের ধ্যানে নিযুক্ত আছেন; পাপী বিষয়ী লোকে কি আলোচনা করিতেছে তাহা তাঁহার কর্ণগোচর হইল কি প্রকারে?" এই কথা বলিবামাত্র সাধু যেরূপ উগ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ করতঃ আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন, তাহাতে মনে হইল, দুর্ব্বাসা বিশ্বামিত্র প্রভৃতি পৌরাণিক ঋষিবর্গ আজ থাকিলে ইহাঁর নিকটে হার মানিয়া যাইতেন এবং জামদগ্নিনন্দন ক্ষত্রিয়ান্তক পরশুরামও সংহার শক্তিতে ইহাঁর সমকক্ষ হইতে পারিতেন কি না বিশেষ সন্দেহের কথা। সাত্বিক সাধুকে তমোগুণের আশ্রয় লইতে দেখিয়া, লজ্জার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, আমিও ধৈর্য্যরক্ষা করিতে পারি নাই; এবং সেদিনে বন্ধু রমাকান্ত এবং ইন্দুশেখর মধ্যে পড়িয়া বাধা না জন্মাইলে, পবিত্র প্রয়াগতীর্থে গঙ্গাযমুনার সৈকতভূমির উপর দাঁড়াইয়া, সাধু এবং সংসারী উভয়েরই পক্ষে নিতান্ত অশোভন যাহা, তাহা ঘটিয়া যাইত। আমার সেদিনের ধৈর্য্যচ্যুতির কৈফিয়তে এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমি তখন বিশ বৎসরের বালক না হইলেও, প্রৌঢ়ত্বের ধারে কাছেও যাই নাই, এমন কি যৌবনের মাঝামাঝিও আসিতে তখন বহুবিলম্ব ছিল।

যাহা হউক, আমার প্রথম প্রয়াগ-দর্শনের বারে এরূপ কোনও দুর্ঘটনা ঘটে নাই। পাণ্ডা যখন গঙ্গাযমুনার পুণ্যপ্রবাহের পূজার্থ আয়োজন-সম্ভার সংগ্রহ করিতেছিল, আমি তখন এই সাধু-সঙ্ঘের বিচিত্র বেশভূষা—ফোঁটা তিলক দণ্ড ত্রিশূল শিকল পেরেক ইত্যাদি সমস্তই নিবিষ্টচিত্তে নিরীক্ষণ করিতেছিলাম, এবং মনে মনে ভাবিতেছিলাম, ধর্ম্ম এবং ধার্ম্মিকের প্রতি ভারতবর্ষের আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধা একদিন এমনি একান্তভাবে আকর্ষিত হইয়াছিল যে, আজ তাহার একটুমাত্র বাহ্যচিহ্ন দেখিয়াও এ দেশের অসংখ্য নর-নারীর ভক্তিনম্র শির ভণ্ডের পদতলে লুটাইয়া পড়ে।

পূজার সামগ্রী সমস্ত সংগৃহীত হইলে পাণ্ডা আসিয়া আমাকে জানাইল। আমি সঙ্গমস্থলে যাইবার জন্য যখন নৌকায় উঠিতে যাইতেছি, তখন আর একদল ব্রাহ্মণ পিত্তলনির্ম্মিত কয়টি দেবী-বিগ্রহ নৌকায় করিয়া আনিয়া আমার সম্মুখে খাড়া করিল এবং কহিল যে, এই সকল পুত্তলিকাই গঙ্গা-যমুনার মূর্ত্ত অধিষ্ঠাত্রী দেবী, উহাদের পূজা হওয়া প্রয়োজন। আমি পূর্ব্বে আর কখনও তীর্থস্থানের অর্থোপার্জ্জনের নানাবিধ ফন্দি ফিকির দেখি নাই, তথাপি এই সকল তীর্থবাসী অর্থ-লোলুপদিগের কৌশল বুঝিতে আমার অধিক বিলম্ব হয় নাই। উভয় পক্ষে পূজার মূল্য লইয়া মহাযুদ্ধ বাধিয়া গেল। শেষ যখন আমি নিতান্তই উচ্চমূল্য দিতে অস্বীকৃত হইয়া নৌকায় উঠিয়া নৌকা খুলিয়া দিবার উপক্রম করিতেছি, তখন গঙ্গার অধিষ্ঠাত্রী-দেবী-মূর্ত্তির অভিভাবক ব্রাহ্মণ জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল এবং দুই হস্ত প্রসারণ করিয়া, যাহা দিব তাহাই সানন্দে গ্রহণ করিবে এই বলিয়া বারম্বার চীৎকার করিতে লাগিল। কি দিয়াছিলাম তাহা আজ আমার মনে নাই;—এরূপ ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু দিয়াছি তাহা বোধ হয় না। গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে পৌছিতে যে সময়টুকু লাগিল, আমি কেবলই ভাবিতে লাগিলাম, হায়, এই সকল তীর্থাশ্রিত অর্থলোলুপ ব্যক্তির হাতে পড়িয়া হিন্দুর ধ্যেয় ধন ধর্ম্ম আজ কি লাঞ্ছনাই সহ্য করিতেছে!

পুণ্যজলস্রোতে স্নানকার্য্য শেষ হইল। পাণ্ডাকে

দক্ষিণা দিয়া, আকবরের নির্ম্মিত কেল্লার দুর্ভেদ্য অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে অক্ষয় বট দর্শন ও স্পর্শনজনিত পুণ্যলাভ করিয়া বাড়ী ফিরিলাম। ক্ষুধা বিলক্ষণ রূপে অনুভব করিতেছিলাম। সে দিন আহার যে পরিমাণ করিয়াছিলাম, তাহা এই মন্দাগ্নির দিনে মনে হইলে দুঃখ হয়।

অপরাহ্ণ আসিবার পূর্ব্বেই বেড়াইতে বাহির হইলাম। গাইড্ কেহ সঙ্গে ছিল না; যে গাড়োয়ানের গাড়ী দিন-ভাড়ায় বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলাম সেই ছিল আমার গাইড। সর্ব্ব প্রথমে সে খশ্রুবাগ দেখাইতে লইয়া গেল। আমাদের বাসা হইতে খশ্রুবাগের দুরত্ব কতখানি আজ তাহা ঠিক মত বলিতে পারিব না, তবে অনেকক্ষণ গাড়ীতে যাইতে হইয়াছিল ইহা মনে আছে। গাড়ী গিয়া সদর ফটকে দাঁড়াইল। সেখানেই গাড়ী হইতে নামিয়া, যাঁহার নামে বাগের নামকরণ হইয়াছে, হতভাগ্য রাজকুমার খশ্রুর কবরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। জগজ্জয়ী জাহাঙ্গীর বাদশাহের জ্যেষ্ঠপুত্র খশ্রুর জীবনের করুণ ইতিহাস বোধ করি আমার পাঠক-পাঠিকা সকলেরই জানা আছে। বিশ্ববিশ্রুত বাদশাহ আকবর শাহের পৌত্র, অম্বরাধিপতি বীরাগ্রগণ্য মানসিংহের ভাগিনেয়, মোগল সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারীর যে ভাবে দূর দাক্ষিণাত্যে ঘাতকের হস্তে মৃত্যু হইয়াছিল, সে দুঃখের ইতিহাস পড়িতে পড়িতে আজও অশ্রুসম্বরণ করা যায় না। ভাগ্যকর্ত্তৃক চিরবঞ্চিত এই রাজকুমার এবং তাঁহার শোকাতুরা জননী অম্বররাজ-মানসিংহের ভগিনীর কবরের নিকট বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, অদৃষ্ট দেবতার লীলাখেলার কথা কত কি যে ভাবিয়াছিলাম! সে সকল পুরাতন চিন্তাসূত্র একত্র করিয়া আমার পাঠক পাঠিকাকে সে দিনের মনের কথা বুঝাইয়া বলিবার শক্তি আজ আমার নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, চক্ষুর সম্মুখে কঠিন প্রস্তরাক্ষরে লিখিত রাজাধিরাজের প্রিয় পুত্রের দুর্দ্দশার ইতিহাস পড়িতে পড়িতে, ভাগ্যলক্ষ্মীর চঞ্চল কৃপা-কটাক্ষের প্রতি সেই বয়সেই আমি আস্থাহীন হইয়া পড়িয়াছিলাম, এবং বুঝিয়াছিলাম, কুটীরবাসী দীনদুঃখীর প্রিয়জনের সহিত নিশ্চিন্ত নিভৃত জীবনযাত্রা, ঐশ্বর্য্যের ভাবী উত্তরাধিকারীদিগের বিপদসঙ্কুল জীবনযাত্রা অপেক্ষা লক্ষগুণে নিরাপদ এবং নিরাময়।

ক্রমশঃ

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

মসলিম্

(১)

হলো দেবতা পুতুল যবে প্রাণপ্রতিষ্ঠা-হীন,
পাপ উঠলো স্ফীত হয়ে, পুণ্য হল ক্ষীণ,
ধর্ম্ম হল অন্তঃশূন্য উপরে জম্‌জম্,
লুপ্ত শুদ্ধি নিষ্ঠাবুদ্ধি বিশ্বাস সংযম,
বদ্ধ গাঢ় অন্ধকারে যাপছে যবে দিন
আরব মরুর নানা জাতি—কোরীশ, বেদুইন;
এলে ভণ্ডে দণ্ড দিতে তুমি হে মসলিম্—
খোদাতাল্লার সৈন্য, তোমায় করি হে তস্‌লিম্।

(২)

আনলে শক্তি রক্তারক্তি মুস্কিলে আসান্,
করলে ধরার জড়ত্বকে 'অর্দ্ধচন্দ্র' দান।
তুমি যখন এলে ছুটে ফুকারি 'দিন্ দিন্',
ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল কপট, হেয়, হীন;
উঠলো যেমন ঝক্‌মকিয়ে তোমার তলোয়ার,
অমনি রণে ভঙ্গ দিল পাপ ও অনাচার।
এলে ভণ্ডে দণ্ড দিতে তুমি হে মসলিম্—
খোদাতাল্লার সৈন্য, তোমায় করি হে তস্‌লিম্।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

বিংশ শতাব্দীর মহাভারত

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

(আদিপর্ব্ব)

জানকী যখন প্রথম কলিকাতায় আসিয়াছিল, তখন তাহার বয়স আঠার বৎসর। পূর্ব্ববঙ্গের কোন প্রসিদ্ধ জেলার একখানি গ্রামে তাহার জন্ম। ঐ গ্রামের দুই ক্রোশ দূরে স্থিত স্কুলে পড়িয়া ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলে তাহার পিতা তাহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ আশান্বিত হইয়া তাহাকে কলিকাতায় পাঠান, তাই আঠার বছর বয়সে আসিয়া সে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হইয়া, আর তিন জন ছাত্রের সহিত হিন্দু হষ্টেলের ওল্ড ব্লকের দ্বিতলের একটি কক্ষ অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। জানকীর পিতা অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন।

অন্য তিনজন ছাত্র একেবারে খাস পশ্চিমবঙ্গের মফস্বল হইতে সমাগত। কাজেই প্রথম প্রথম তাহাদের ঠাট্টা বিদ্রূপে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেও জানকীর চট্‌পট্ উন্নতি হইতে লাগিল। কারণ শাণে ঘসিলে যেমন ময়লা কাটিয়া ছুরি তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে, তেমনি বন্ধু তিনটির অনবরত বাক্যাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া জানকীর পাড়াগেঁয়ে ভাব অতি শীঘ্রই তিরোহিত হইল। সভ্যোচিত সকল কায়দা (মায় চস্‌মা ধারণ ও সিগারেট্ সেবন অবধি) তাহার অচিরেই আয়ত্ত হইয়া পড়িল।

জানকীর মহা বিপদ এই হইয়াছিল যে পিতা তাহাকে মাসিক যে অর্থ পাঠাইতেন, তাহাতে সভ্য ছাত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে তাহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইত। টিফিনের সময় সহরবাসী ছাত্রেরা বনমালী খাবারওয়ালাকে লুচি ও মাংস ফরমাস্ দিত। জানকীও তদনুকরণে একদিন আধ ছটাক মাংসের ফরমাস দিয়া, মৃদুহাস্যের সহিত বনমালীর একটি মন্তব্য ও সহপাঠিদের উচ্চহাস্যে যেরূপ অপ্রস্তুত হইয়াছিল তাহা অনেককাল তাহার মনে থাকিবে।

আর একটি ঠাট্টার প্রধান উপকরণ ছিল, জানকীর পুস্তকাধার। প্রথম কলিকাতায় আসিয়া চেয়ার টেবিলের সন্ধানে একবার বৌবাজার অঞ্চলে কয়েকটি দোকানে সে ঘুরিতেছিল। এক দোকানে একটি ছোট কাঁচের আলমারী দেখিয়া তাহার বড়ই পছন্দ হইয়া যায়। বই রাখিবে সংকল্প করিয়া সেইটি কিনিয়া মুটের মাথায় চাপাইয়া সে হষ্টেলে প্রত্যাগমন করিলে, ছাত্রগণের মধ্যে যে উচ্ছ্বাস দেখা দিল তাহা অবর্ণনীয়। কত রকম মন্তব্যের সহিত জানকী বেচারার পত্নীর (যদিও তখন কেহ হয় নাই) পুতুল রাখার কথাটা পর্য্যন্ত তারস্বরে ঘোষিত হইয়া গেল, এবং জানকী নিজ পত্নীর অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেও, সে যে পত্নীর জন্যই বই রাখার অছিলায় আলমারীটি কিনিয়াছে এ বিশ্বাস কাহারও মন হইতে দূর করিতে পারিল না। খামে ভরা চিঠি আসিলেই অনেকগুলি উৎসুক চক্ষু তাহার কাঁধের উপর উঁকিঝুঁকি মারিত—চিঠি পড়িতে দিয়াও সে নিস্তার পাইত না। সময়ে অসময়ে প্রশ্নজাল তাহার উপর বর্ষিত হইত—"আজ পোষ্টাফিসে যাবে না?" "পিয়নকে কত বক্‌সিস্ দিলে?"

থিয়েটার দেখা লইয়া আর এক বিপদ্। দরোয়ানকে তুষ্ট করিয়া দ্বার উলঙ্ঘন ব্যাপারটা বিশেষ কঠিন নহে—যদি রজতখণ্ড হাতে থাকে, কিন্তু জানকীর তাহারই অভাব। কাজেই সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট, আত্মীয়ের বাসায় নিমন্ত্রণ প্রভৃতি অজুহাত সৃষ্টি করা ছাড়া তাহার আর উপায়ান্তর ছিল না। কিন্তু সে ওজর ত আর রোজ রোজ করা চলে না। কাজেই ঈর্ষাপূর্ণ নয়নে নিশীথে নিঃশব্দে সঞ্চরণশীল সহচরগণের থিয়েটার অভিমুখে যাত্রা অবলোকন করা ও ফিরিয়া আসিলে

অসীম কৌতূহলের সহিত তাহাদের অভিনয়ের সমালোচনা শোনা ছাড়া তাহার আর গত্যন্তর ছিল না। পিতার উপর তাই রাগ হইত—"আছে পাড়াগাঁয়ে বসে। এখানে এত খরচ কেন দরকার তা বুঝবে কি ?"

যাহা হউক, সুখে দুঃখে দিন কাটিতে লাগিল। ক্রমে জানকী 'লায়েক' হইয়া উঠিল। যেদিন ফুটবলের ম্যাচ দেখিতে গিয়া মারামারির মধ্যে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও রীতিমত প্রহার খাইয়া হষ্টেলে ফিরিয়া আসিল ও সদম্ভে বর্ণনা করিল, "একা সে ছয়জন ফিরিঙ্গীকে হটাইয়া দিয়া আসিয়াছে, তবে সে একা আর তাহারা ছ' ছ' জন, একটু আধটু আঘাত তাহাকে ত লাগিবেই" —সেদিন তাহার বীরত্বের খ্যাতিতে হষ্টেল পূর্ণ হইয়া গেল। তাহার পর হইতে কোন সাহসের কাজ করিতে হইলেই ছাত্রেরা বলিত "জানকীকে ডাক। ওর 'স্পিরিট' আছে।"

হষ্টেলের মধ্যে নিষিদ্ধ দ্রব্য আনয়ন, ওল্ড ব্লকের তেতালার সিঁড়ির ঘরের সম্মুখে বসিয়া তামাক খাওয়া, আহারের সময় পাচকগণের উপর হুঙ্কার প্রভৃতি 'স্পিরিটে'র কাজগুলি জানকী একচেটিয়া করিয়া লইল। পড়াশুনা তেমন হইত না। কিন্তু একটু আধটু পড়াশুনাতে, স্বভাবজাত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আজকালকার পরীক্ষকদের কৃপায় সে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গেল।

তাহার পর দেশ হইতে আসিবার সময় সে শাসাইয়া আসিল, এবার আর টাকা পাঠাইতে কার্পণ্য করিলে চলিবে না ; অনেক বই কিনিতে হইবে, মাষ্টার রাখিতে হইবে—ইত্যাদি। ফলে তাহার পিতা তাহাকে বেশী করিয়াই অর্থ পাঠাইতে লাগিলেন। কিন্তু জানকী আর বি-এ পাস করিতে পারিল না। দুইবার ফেল হওয়ার পর তৃতীয়বার সংকল্প করিয়া যখন সে কলিকাতায় আসিবে, তখন তাহার পিতার মৃত্যু হইল।

শ্রাদ্ধাদি হইয়া গেলে, 'পড়াশুনাটা ছাড়া ভাল নয়' বলিয়া সে কলিকাতায় চলিয়া আসিল। এখন আর তাহার অর্থাভাব নাই। পিতা প্রায় কুড়ি হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ রাখিয়া গিয়াছিলেন।

গ্রামের লোকেরা বলিল, "সোণার চাঁদ ছেলে। মনে করেছিলাম টাকা হাতে পেয়ে বয়ে যাবে, তা নয় কলকাতায় লেখাপড়া করতে গেল। বাপের পুণ্যের জোর বলতে হবে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(বনপর্ব্ব)

বিদ্যুদালোক-উদ্ভাসিত ইডেন গার্ডেনে একজন ফিরিঙ্গি যুবক এক ফিরিঙ্গি যুবতীর হাত ধরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে মৃদুস্বরে কথোপকথন করিতেছিল। যুবক বলিতেছিল, "লিজি, আর কতদিন অপেক্ষা করব ?"—যুবতীর নাম এলিজাবেথ।

যুবতী আরক্তিম গণ্ডে বলিল, "আর বেশী দিন নয় হ্যারি, অন্ততঃ গোটা দুই সপ্তাহ ধৈর্য্য ধরে থাক। এর মধ্যেই একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

"তুমি ত কেবল ধৈর্য্য ধরে থাকতেই বল। কোন উপায় করতে পেরেছ কি ? তোমার বাপ ত প্রতিজ্ঞা করেছেন যে দশহাজার টাকা 'ডাওরি' না দিতে পারলে আমি যেন বিবাহের প্রস্তাব না করি। আমি পাই মোটে একশতটি টাকা মাহিনা। তা খেতেই আর পোষাক কিনতেই ফুরিয়ে যায়, দশহাজার টাকা পাব কোথা ?"

হাসিয়া যুবতী বলিল, "বাবার ঐ রকম। তোমার ভয় নাই হ্যারি, আমি উপায় করব।"

"তোমার ভরসাতেই ত এতদিন আছি। তুমি বলেছিলে তোমার বাবা তোমায় ভালবাসেন, তুমি তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করবে। কিন্তু ছ' মাস কেটে গেল, তার ত কিছু করতে পারলে না। কাল তোমার বাবা আমায় দেখে হেসে বল্লেন 'কি ? কত টাকা জমালে ?' "

যুবতী বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা। তুমি সবুর কর।"

"শুধু মুখের কথায় আর হয় না লিজি। চল আমরা পালিয়ে যাই। জামালপুরে আমার খুড়া আছেন। সেখানে 'ওয়ার্ক শপে' কাজ করবার জন্যে আমায় কতদিন বলেছেন। দেড়শ' টাকা মাহিনা হবে। পাছে তোমায় ছেড়ে যেতে হয়, তাই আমি বেশী মাহিনা গ্রাহ্য করিনি। চল, দুজনে গিয়ে বিয়ে করে সেখানে বেশ থাক্‌ব।"

"আচ্ছা, আর দুটো হপ্তা আমায় সময় দাও হ্যারি। আমি ভেবে চিন্তে দেখি। যদি এর মধ্যে কোন উপায় করতে না পারি, তা' হলে তুমি যা বল্‌ছ তাই কর্‌ব।"

হ্যারি বুঝিল, বাপ-মাকে ছাড়িয়া গুপ্তভাবে পলায়ন করিতে এলিজাবেথের ইচ্ছা নাই। সে একটু ক্ষোভের স্বরে বলিল, "তুমি আমায় ভালবাসনা লিজি। তাই কেবল আমায় আশায় ঘোরাচ্ছ।"

এলিজাবেথ হ্যারির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি রাগ করলে হ্যারি? আমি ত স্বীকার করলাম, দুই সপ্তাহের মধ্যে যদি কোন উপায় করতে না পারি, তা হ'লে যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাব।"

"আচ্ছা। কিন্তু কথা যেন ঠিক থাকে লিজি। আমি খুড়া মহাশয়কে লিখছি তিনি যেন চাকরিটা ঠিক করে রাখেন। দু' হপ্তা পরেই আমরা যাচ্ছি। ওকি—যাও কোথা?"

এলিজাবেথ ব্যস্তভাবে বলিল, "হাত ছাড় হ্যারি। ফ্যানি আসছে।"

হ্যারি হাত না ছাড়িয়া বলিল, "এলই বা? তাতে কি এসে গেল?"

এলিজাবেথ নিজ হাত টানিয়া লইয়া বলিল, "না—আমি এখন আসি। পরে তোমায় বুঝিয়ে বল্‌ব। পরশু এইখানে সন্ধ্যার সময় এস। গুড্ বাই।"

এই বলিয়া স্মিতনয়নে হ্যারির দিকে একবার চাহিয়া, এলিজাবেথ দ্রুতপদে চলিয়া গেল। হ্যারি বা হেন্‌রি কিছুক্ষণ বিস্মিতভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তাহার অনুসরণ না করিয়া, বাগানের বাহিরে গিয়া বাই-সিক্লে চড়িয়া নিজের বাসার দিকে চলিয়া গেল।

এলিজাবেথ অগ্রসর হইতে হইতে দুই-তিনবার পিছন ফিরিয়া দেখিল হ্যারি তাহার পিছনে আসিতেছে কি না। যখন দেখিল হ্যারি বাগানের বাহির হইয়া গেল, তখন সে ঝিলের ধারের পথ দিয়া চলিল। প্যাগোডার নিকট ঈভ্‌নিং ড্রেসে সজ্জিত একজন যুবক দাঁড়াইয়া ছিল। এলিজাবেথ তাহাকে সঙ্কেত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

ঝিলের ধারে একজায়গায় বাঁশঝাড়। তাহার পাশ দিয়া একটা ঝোপের গোটা দুই গাছ দুই হাতে ঠেলিয়া এলিজাবেথ তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। যুবকও একবার চারিদিকে চাহিয়া, কেহ নাই দেখিয়া ঝোপের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। ঝোপের মধ্যে এক-খানি বেঞ্চ ছিল। উভয়ে সেই বেঞ্চে গিয়া বসিল।

ঝোপের ভিতর অন্ধকার। ইডেন গার্ডেনে একটু বেলা থাকিতেই বিদ্যুতের আলোক প্রজ্জলিত হয় বটে, কিন্তু তখন বেলা ছিল না। বাহিরে সন্ধ্যা আসন্ন; ঝোপের ভিতর ত কথাই নাই।

যুবক আমাদের জানকী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(উদ্‌যোগ পর্ব্ব)

পিতার মৃত্যুর পর হাতে নগদ টাকা পাইয়া, জানকীর খেয়াল হইল সে সাহেব হইবে। কলিকাতায় ফিরিয়া, নিজ অভিলাষ পূরণে সে বিলম্ব করিল না। সাহেবিয়ানার শিক্ষানবিশী অবস্থায় তাহার বিড়ম্বনা কম হয় নাই—কিন্তু সে সকল ইতিহাসে প্রয়োজন নাই।

যাহা হউক, জানকী এখন পুরা দস্তুর সাহেব। ভাবে ভঙ্গীতে, হাসিতে কাসিতে, এখন একেবারে ভোল ফিরাইয়া ফেলিয়াছে। বাপের ব্যাঙ্কে সঞ্চিত কোম্পানীর কাগজ দুই-একখানা ভাঙ্গান হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু জানকী তাহাতে কিছুমাত্র মনঃক্ষুণ্ণ নহে।

তাহার জীবনের উচ্চাভিলাষ এবার পূর্ণ হইতে চলিল। ফিরিঙ্গিরমণী তাহার প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

ইডেন গার্ডেনে ঝোপের ভিতর বসিয়া জানকী ও এলিজাবেথের কথাবার্ত্তা হইতেছিল। এলিজাবেথ বলিল, "আর দেরী করলে হবে না জন্ (জানকী সেন নিজেকে জনকিন্‌সনে পরিণত করিয়াছিল)। হ্যারি আবার আজ এসেছিল। অনেক কষ্টে দুই সপ্তাহের জন্য তাহাকে নিরস্ত করেছি। ইতিমধ্যেই আমাদের পালাতে হবে।"

জানকী বলিল, "আমি ত বাড়ী ঠিক্ করেছি। কবে তুমি যাবে বল্লেই সব যোগাড় করে ফেলি।"

"রবিবারে বাবা, মা সব গির্জ্জায় যাবেন। আমি একলা থাকৃব। তুমি আমাদের বাড়ী যেও। একখানা গাড়ী নিয়ে যেও। সকালবেলা ১০টার সময়। আমি তোমার সঙ্গে চলে যাব।"

জানকী একটু আপত্তির ভাব দেখাইয়া বলিল, "আমি তোমাদের বাড়ী যাব? কেউ দেখতে পায় যদি?"

এলিজাবেথ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "তবে কি আমি একা তোমার বাসায় যাব নাকি? কি ভীরু তুমি!"

জানকী তাড়াতাড়ি বলিল, "না—না—সেজন্য বলি নি। যদি তোমার কিছু নিন্দে হয়, তাই বলছিলাম। আমার ভয় কি? তা হ'লে—তা হ'লে আমি রবিবারেই যাব।"

এলিজাবেথ বলিল, "হাঁ। দেরী করা কিছু নয়। বাবা ত হ্যারির সঙ্গেই বিয়ে দেওয়া ঠিক করেছেন। ওর আছে কি? একশ' টাকায় ওর নিজের খরচই চলে না, আমায় খাওয়াবে কোথা থেকে? আমি ওর কথায় ভুলে বাবাকে পর্য্যন্ত বুঝিয়েছিলাম যে টাকার দরকার নেই। তা না হ'লে বাবা ত ওকে তাড়িয়েই দিয়েছিলেন। দশহাজার টাকা না জমাতে পারলে বিয়ে হবে না, এ কথা ওকে স্পষ্টই বলে দিয়েছিলেন, আমিই বাবার মত ফিরিয়েছি। হয়ত এতদিন আমার বিয়ে হয়ে যেত। ভাগ্যে তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল—তা নইলে আমার কি যে হ'ত—"

জানকী একটু ঈর্ষার সুরে বলিল, "না হলে বোধ হয় ভালই হ'ত, নয় লিজি?"

এলিজাবেথ জানকীর গা ঘেঁসিয়া অভিমানের সহিত বলিল, "তুমি বুঝি তাই ভাব? আমি বুঝি তোমার ঘাড়ে পড়েছি?"

জানকী এলিজাবেথকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "হ্যাঁ তা বৈ কি! এই যে।"

এলিজাবেথ জানকীর বাহুবন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "রাত হয়ে যাচ্ছে। যাই। বাবা হয়ত খুঁজছেন।"

জানকী বলিল, "তবে রবিবার সকাল বেলায়। কথা ঠিক রইল?"

"ঠিক।"

জানকী আর একবার এলিজাবেথকে আলিঙ্গন করিয়া তাহাকে চুম্বন করিল। তার পর এলিজাবেথ তাড়াতাড়ি ঝোপ হইতে বাহির হইয়া গেল।

জানকীও ইডেন গার্ডেন হইতে বাহির হইল। পরের দিন সে চন্দননগরে গেল। সেখানে একখানি বাড়ী ঠিক করিয়াছিল। খানসামা, আয়া, বাবুর্চ্চিও ঠিক করিয়াছিল। সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক আছে দেখিয়া আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল।

শনিবার রাত্রে জানকীর ঘুম হইল না। এত দিনে তাহার মনের বাসনা পূর্ণ হইতে চলিল, সে একেবারে মেম বিবাহ করিতেছে। নাই হইল খাঁটি মেম, রংটা ত নিতান্ত মন্দ নহে। একেবারে ফ্যাকাসে সাদার চেয়ে জানকীর এই রংই ভাল লাগে। আর তার নিজের রংইবা কি এমন? সে কালো নয় বটে, তবু খাস বিলাতী মেমের পাশে দাঁড়ায় কি বলিয়া? তার চেয়ে এ বরং মন্দ হইতেছে না। তবে একটা গোলমাল এখনও আছে। সে নিজেকে খৃষ্টান বলিয়া এলিজাবেথের নিকট পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক এখনও সে খৃষ্টান হয় নাই। সে ভাবিতে লাগিল, "আগে ত

এলিজাবেথকে নিয়ে সরে পড়ি, তার পর তাকে বলে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়ে বিবাহ করব। এলিজাবেথ শুনে একটু গোলমাল করবে। তার আর কি হবে? এক বার আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লে তাকে রাজী হ'তেই হবে।" এইরূপ নানাপ্রকার ভাবিতে ভাবিতে, বার-বার ট্রাঙ্ক সাজাইতে গুছাইতে, পোষাক ঝাড়িতে ঝাড়িতে, কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিতে করিতে, মাঝে মাঝে শয্যার উপর চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া থাকিতে থাকিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(মুষল-পর্ব্ব)

বেলা দশটার সময় 'কুক' কোম্পানীর একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী করিয়া জন্‌কিন্‌সন সাহেব এলিজা-বেথের বাসার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ভারী লগেজ আগেই ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। একটি মাত্র ব্যাগ সঙ্গে ছিল।

দ্বারে আঘাত করিতেই একজন খানসামা আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। জানকী বাঁকা বুলিতে এলিজাবেথের কথা জিজ্ঞাসা করিতেই খানসামা একেবারে তাহাকে সিঁড়ি বহিয়া দ্বিতলের একখানি ঘরে লইয়া গেল। এলিজাবেথ খানসামাকে বোধ হয় আগে হইতেই বলিয়া রাখিয়াছিল।

ঘরে পৌছাইয়া দিয়াই খানসামা চলিয়া গেল। ঘর খানি কারপেটে মোড়া। গোটাদুই টেবিল, খানকতক চেয়ার, কৌচ ও একটা সত্তাদরের পুরাতন পিয়ানো রহিয়াছে। কক্ষপ্রাচীরে খানকতক ছবি টাঙ্গান। জানালাগুলিতে বাহারী পর্দ্দা ঝুলান।

জানকীকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। ভিতর দিকের একটা কবাট খুলিয়া তাড়াতাড়ি এলি-জাবেথ প্রবেশ করিল। তাহার পা কাঁপিতেছে। মুখ আরক্তিম।

জানকী তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহাকে চুম্বন করিল। বলিল, "একি? তুমি এখনও পোষাক পর নি? আমি গাড়ী এনেছি।"

"আমি মনে করছিলাম, তুমি বুঝি আর আসবে না।"

"বেশ যা হোক্। নাও চট্ করে পোষাক বদলে এস। জিনিসপত্র কি আছে গাড়ীতে তুলে দিতে ব'ল। আর দেরী করে লাভ কি?"

"চা খাবে? চা আন্‌তে বলব।"

"না, ধন্যবাদ। তুমি আমার উদ্বেগ বুঝিতে পাচ্ছ না লিজি। যদি তোমার বাবা এসে পড়েন বা আর কেউ এসে পড়ে, তা হ'লে কি বিভ্রাটই হবে! চল শীঘ্র এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি।"

"বাড়ী ছেড়ে যেতে আমার পা উঠ্‌ছে না। আমার বড় ভয় কর্‌ছে।"

"ভয় কিসের? চন্দননগরে যে বাড়ী নিয়েছি তা এ বাড়ীর চেয়ে কত সুন্দর। তুমি কেনারি পাখী ভালবাস, তাই খাঁচা ভরা কেনারি পাখী কিনেছি। তুমি এখানে যে সব ফুলের গাছ সাজিয়ে রেখেছ, সেখানেও ঐরকম সব ফুলই টবে করে সাজিয়েছি। আমার সঙ্গে যাবে তাতে আর ভয় কি লিজি?"

"কেবল তোমার—তোমার জন্যই আমি তা পারব"— এই বলিয়া এলিজাবেথ দুই হাতে জানকীর গলা জড়াইয়া ধরিল।

জানকীও এলিজাবেথকে বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া তাহার মুখচুম্বন করিল।

সেই মুহূর্ত্তেই এলিজাবেথ উচ্চ চীৎকার করিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ একসঙ্গে সেই কক্ষের দুইটি দ্বার খুলিয়া ভিতর দিক হইতে এলিজাবেথের পিতা ও সম্মুখ দিক হইতে হ্যারি সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। বিস্মিত জানকী এলিজাবেথকে ছাড়িয়া দিতে না দিতেই এক লম্ফে হ্যারি জানকীর উপর পড়িয়া মুষ্ট্যাঘাতে তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া ফেলিল। দরজার পার্শ্ব হইতে খান-সামার হাস্য ও কৌতুকোজ্জ্বল চক্ষু দুটি উঁকি দিতেছিল।

এলিজাবেথের পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি লিজি?"

লিজি কাঁদ-কাঁদ সুরে বলিল—"এই নেটিভটা তোমার সঙ্গে দেখা করিতে চায়। আমি ওকে বস্‌তে বলে চলে যাচ্ছিলাম—তখন আমাকে অপমান করেছে।"

হ্যারি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া জানকীকে এক পদাঘাত করিল। বলিল, "ড্যাম্ দি র‍্যাস্কাল!"

জানকী নাসিকা হইতে প্রবহমান রক্ত রুমালে মুছিয়া আপনদোষ ক্ষালনার্থ কি বলিতে গেল। কিন্তু এলিজাবেথের পিতা তাহার গলা টিপিয়া বলিলেন, "চুপ কর্। কথাটি কইলে একেবারে মেরে ফেল্‌ব। লিজি, তুমি যাও।"

লিজি, হ্যারির দিকে একবার চাহিয়া চলিয়া গেল।

জানকী একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া হ্যারি ও এলিজাবেথের পিতার কথোপকথন শুনিতে লাগিল।

হ্যারি বলিল, "বদ্‌মাইসটাকে পুলিসে দেওয়া যাক্। জেল না খাট্‌লে ওর শিক্ষা হবে না।"

শুনিয়া জানকীর মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। সর্ব্বশরীর ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কম্পিতস্বরে সে উভয়কে অনেক কাকুতি মিনতি আরম্ভ করিল। তাহার চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

তাহার ক্রন্দন দেখিয়াই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, এলিজাবেথের পিতা হ্যারিকে একটু তফাতে লইয়া গিয়া মৃদুস্বরে কি পরামর্শ করিলেন। পরে জানকীকে বলিলেন, "দেখ,জেলে দেওয়াই তোমার উপযুক্ত শাস্তি। কিন্তু তাতে আমাদেরও একটা কেলেঙ্কারি হইবে। একটা বদ্‌নাম রটিতে কতক্ষণ? হ্যারি এলিজাবেথকে বিবাহ কর্‌তে রাজী। তার 'ডাওরি'টা তোমায় দিতে হইবে।"

জানকীর মাথা ঘুরিয়া গেল। তোত্‌লার মত বলিল—"এঁ্যা? ক-কত টা-টাকা?"

"দশহাজার টাকা।"

"অত টাকা কোথায় পাব? তা আমি দিতে পার্‌ব না।"

"তবে জেলে যাও। হ্যারি, মিঃ ষ্টিভন্‌সনের ঘরে টেলিফোন্ আছে, থানায় খবর দাও। লোক এসে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাক্।"

হ্যারি ঘরের বাহিরে যাইতে লাগিল। যখন সে চৌকাঠে পা দিয়াছে, তখন জানকী বলিল, "দাঁড়াও। আমায় একটু ভাব্‌তে দাও। আমি পরে বল্‌ব। আমায় দু'দিনের—অন্ততঃ একদিনের সময় দাও।"

"আমাদের কি কচি ছেলে পেলে নাকি? এখনই স্বীকার করে টাকা চুকিয়ে দিতে হবে। তা নইলে তোমায় ছাড়ছি না।"

জানকী অনেকক্ষণ ছট্‌ফট্ করিয়া, শেষে মরিয়া হইয়া বলিল,"আচ্ছা, তাই দিব। শুধু দশহাজার টাকা কেন? আমি চন্দননগরে লিজির জন্য যে বাড়ী ভাড়া করেছি, লিজি যা ভালবাসে, সেই ফুল পাতা দিয়ে সাজিয়েছি, সেই বাড়ীখানাও 'হানিমুন' যাপনের জন্য ছেড়ে দেব।"

জানকী মনে করিয়াছিল, এলিজাবেথের পিতা ও হ্যারি একথা শুনিয়া এলিজাবেথের প্রকৃত চরিত্র ও জানকীর নির্দ্দোষিতা বুঝিতে পারিবে। কিন্তু তাহার মুখ দিয়া ঐ কথা বাহির হইবামাত্র এলিজাবেথের পিতা ও হ্যারি দুইজনে জানকীর দুইখানা হাত ধরিয়া ঝাঁকি দিতে দিতে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। পাশের ঘর হইতে এলিজাবেথও হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিতে লাগিল, "Oh! How good of you!"

সমস্ত ব্যাপারটা তখন দিনের আলোর মত জানকীর কাছে পরিষ্কার হইয়া গেল।

* * * *

বালাপোষ মুড়ি দিয়া মুণ্ডিত মস্তক জানকী যখন গ্রামে পৌছিল তখন প্রতিবেশিবর্গ উৎসুক হইয়া তাহাকে দেখিতে সমবেত হইল। জানকী বেশী কিছু বলিল না। বলিল, "গয়ায় বাবার একটা পিণ্ড দিয়ে এলাম।"

গ্রামের মাতব্বর লোকেরা মাথা নাড়িয়া বলিল, "আহা জানকী হ'তে পিতৃপুরুষের নাম বজায় থাকবে।"

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

গান

(ললিত)

কে তুমি সুন্দর—অতি সুন্দর—অতি সুন্দর !
কভু নবীন ভানুভালে,
কভু ভূষিত নীরদমালে,
কভু বিহগ-কূজিত-কণ্ঠে
গাহিছ অতি সুন্দর !
কভু নির্ম্মল নীল প্রাতে
কনক কিরীট মাথে
অভ্রভেদী অচলাসনে
রাজিছ অতি সুন্দর !
কভু পুষ্পিত নভ কুঞ্জে
তব নৈশ বংশী গুঞ্জে ;
কভু পীত জ্যোৎস্না বসন
শ্যাম মুরতি অতি সুন্দর !

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন ।

গ্রন্থ-সমালোচনা

অভিমানিনী (উপন্যাস)—শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল এম-এ, বি-এল, সরস্বতী প্রণীত। কলিকাতা, "মানসী" প্রেসে মুদ্রিত ও অন্নদা বুক ষ্টল হইতে প্রকাশিত। ডবলক্রাউন ১৬ পেজি ২৩৪ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা, মূল্য ১॥০

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল ছোট গল্প লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। "অভিমানিনী" তাঁহার প্রথম উপন্যাস। ছোট গল্পের স্বল্প পরিসরে যাঁহারা একটা চিত্র বেশ নিপুণতা সহকারে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, কিম্বা মানবের বিচিত্র মনোরাজ্যের একাংশমাত্র উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইতে পারেন, তাঁহারা যে সকলেই উপন্যাসের জটিল ঘটনা-সমাবেশে, নানা বিভিন্ন চরিত্রের সৃজনে এবং অবস্থা সংঘাতে মানব মনের ক্রিয়াপ্রদর্শনে সমান সফলতা লাভ করিবেন এরূপ আশা করা যায় না। কিন্তু শরৎবাবুর "অভিমানিনী" তাঁহার কোন কোন ছোট গল্পের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও, তাঁহাকে উচ্চশ্রেণীর উপন্যাস রচনায় অধিকারী বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে।

উপন্যাসখানি তিন খণ্ডে বিভক্ত ; এবং ইহা ঠিক বিয়োগান্ত না হইলেও, গ্রন্থের নায়ক-নায়িকা নানা দুঃখকষ্টময় অবস্থার মধ্যে নিক্ষিপ্ত বলিয়া লেখক এই তিন খণ্ডের যথাক্রমে ছায়া, মেঘ ও ঝড় এইরূপ নামকরণ করিয়াছেন। ছায়া খণ্ডে ট্র্যাজেডির সূত্রপাত, দ্বিতীয় খণ্ডে তাহা ঘনায়িত এবং নায়ক নায়িকার পুনর্ম্মিলনে উপন্যাসের উপসংহার হইয়াছে।

গ্রন্থের নায়িকা 'অভিমানিনী' মালতী চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা ; দুই বৎসর মাত্র তাহার বিবাহ হইয়াছে। পিতার মৃত্যুর রাত্রে তাহার অলঙ্কারগুলি অপহৃত হয়। এই অপরাধে তাহার শ্বশুর হৃদয়হীন হৃদয়নাথ তাহাকে তাহার পিতৃগৃহের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে বাধ্য করিলেন। একদিন একজন লোক আসিয়া সংবাদ দিল যে তাহার মাতা মৃত্যুশয্যায়। তাহার শ্বশুর তাহাকে পিত্রালয়ে যাইতে অনুমতি দিলেন না। তখন সে নিরুপায় হইয়া ব্যাকুলভাবে স্বামীর শরণাপন্ন হইল। স্বামী শচীন্দ্র শিক্ষিত কিন্তু তরলমতি যুবক। আর, পিতার অবাধ্য হওয়াও তাহার সাধ্যায়ত্ত নহে। সে পত্নীর আকুল মনোবেদনা উপেক্ষা করিয়া কলেজের থিয়েটারে অভিনয় করিতে চলিয়া গেল। তখন প্রবল ক্রোধে ও দুর্দ্দমনীয় অভিমানে মালতীর হৃদয় ভরিয়া গেল। সে গভীর রজনীতে দাসীকে মাত্র সঙ্গে লইয়া সেই লোকটির সহিত পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। তাহার সেখানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মাতার মৃত্যু হইয়াছিল। যখন আবার সে শ্বশুরালয়ে ফিরিল তখন হৃদয়বাবু তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন। এই খানেই প্রথম খণ্ড শেষ হইল।

উপন্যাসের অবশিষ্টাংশের সহিত নায়িকা মালতীর সম্বন্ধ অতি ক্ষীণ। যে লোকটি তাহাকে পিতৃগৃহে লইয়া গিয়াছিল, তাহারই গৃহে বিতাড়িত বালিকাকে রাখিয়া গ্রন্থকার অন্যান্য নানা কঠিন ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন, এবং সে সব ঘটনার

মধ্যে আমরা মালতীকে প্রায় দেখিতে পাই না। কিন্তু এই অংশে আমরা আর একটি তরুণীর সাক্ষাৎ লাভ করি, যাহার সুন্দর চরিত্র আমাদিগকে মুগ্ধ করে। এই অষ্টাদশ-বর্ষীয়া সুন্দরী, সুশিক্ষিতা ব্রাহ্মপালিতা নীহারকে অবলম্বন করিয়া লেখক যে প্রেমকাহিনী বিবৃত করিয়াছেন, তাহা যেমন মধুর তেমনই করুণ। উপন্যাসে আর যে কয়টি উল্লেখযোগ্য স্ত্রী-চরিত্র আছে, লেখক সেগুলির প্রতি তেমন মনোযোগ দিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। এই 'কাব্যের উপেক্ষিতা' নায়িকার জ্যেষ্ঠা ভগিনী সুশীলাসুন্দরীর চরিত্র ভাল ফোটে নাই। আর যে মাধুরীকে লইয়া গল্পের আরম্ভ, তাহাকে লেখক পরে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। পুরুষ চরিত্রগুলি প্রায় সমস্তই বেশ জীবন্ত এবং সুচিত্রিত।

ঘটনা সর্ব্বত্র স্বাভাবিক না হইলেও উপন্যাসখানি খুব চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। ভাষাটি সুন্দর এবং সর্ব্বত্রই লেখকের আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। বর্ণনা কোথাও সংযমের বাঁধ অতিক্রম করে নাই, এবং আভাসে ইঙ্গিতেও লেখক কোথাও কুরুচির অবতারণা করেন নাই।

নারীর প্রতি গভীর সহানুভূতিতে লেখকের হৃদয় পূর্ণ। মালতী মাতাকে শেষ দেখা দেখিতে যাইবার অনুমতি যখন পাইল না, তখন বড় দুঃখে সে স্বামীকে বলিয়াছিল, "আমি কি তোমার কেউ নয়? আমার কি সুখ দুঃখ নেই? তোমরা যা ভাল বুঝবে যা ভাল বল্‌বে তাই কি আমাকেও ভাল বল্‌তে হবে?" সত্যই ত। বঙ্গনারী পাশ্চাত্য নারীদের ন্যায় পুরুষদের সহিত সমান অধিকার চাহে না, চাহে শুধু দুঃখে তাহাদের সহানুভূতি। জ্ঞান বুদ্ধিতেও যে সে পুরুষের সমকক্ষ এমন স্পর্দ্ধাও সে কখন করে না, কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহাকে সকল বিষয়েই পুরুষদের একান্ত মুখাপেক্ষিণী হইয়া থাকিতে হইবে? এই সহানুভূতির অভাব, এই অবজ্ঞা কত 'অভিমানিনী' বঙ্গবালাকে মালতীর অপেক্ষা ভীষণ হঠকারিতায় প্ররোচিত করিতেছে, কে তাহার সংবাদ রাখে? শরৎবাবুকে ধন্যবাদ যে তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রচারক না হইয়াও এই সামাজিক অন্যায়টার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

"শ্যামচাঁদ।"

"সুখময়ের সুখস্বপ্ন।" দ্বিতীয় সংস্করণ—শ্রীমণিমোহন বসু প্রণীত। কলিকাতা ২০৫ নং ওল্ড চিনাবাজার ষ্ট্রীট, ডাইনা প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত এবং ৫১।৩ নং মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট হইতে এম, বসু এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, মূল্য ।৵০

এখানি গদ্য কাব্য। গ্রন্থকার ইহাতে জনৈক নিরাশ-প্রেমিক সংসার-বিরাগীর কতিপয় ভাবোচ্ছ্বাসময় আত্মকথা বেশ সরলভাবে ও সুললিত ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। পুস্তকখানি "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম" গ্রন্থের ভাব ও ভাষানুসরণে লিখিত হইলেও ইহাতে গ্রন্থকারের নিজস্ব অনেক কথা আছে। ইহা হুবহু অনুকরণ নহে। উচ্ছ্বাসোক্তিগুলিও অনেক পরিমাণে স্বাভাবিক ও সংযত ভাববিশিষ্ট। গ্রন্থের নায়ক সুখময় চক্রবর্ত্তী সমাজের নির্ম্মম ব্যবহারে মর্ম্মপীড়িত হইয়া দুঃখভার লাঘব করিবার জন্য কোন মানুষের কাছে না গিয়া, প্রকৃতির দ্বারে যে কাতর বিলাপ-গীতি গাহিয়াছেন, তাহা আমাদের ভাল লাগিয়াছে। এবং এই প্রসঙ্গে হিন্দু সমাজকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহাতে গ্রন্থকারের স্বদেশপ্রেম এবং স্বধর্ম্মানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। সুখময়ের "সুখস্বপ্ন" সুখময় বটে। আমরা ইহা পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। পুস্তকখানির কাগজ ও ছাপা খুব সুন্দর, মূল্যও কম।

নূরনবী।—মোহাম্মদ এয়াকুব আলি চৌধুরী প্রণীত। কলিকাতা ১৪এ রামতনু বোসের লেন, "মানসী" প্রেসে মুদ্রিত এবং ১২।১ নং সারেঙ্গ লেন, নূর লাইব্রেরী হইতে মযিনুদ্দিন হুসয়ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, মূল্য ১।০

ইহা একখানি জীবনচরিত। গ্রন্থকার ইহাতে মহাপুরুষ হজরৎ মোহম্মদের জীবন কাহিনী যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ভাবে বিবৃত করিয়াছেন। গ্রন্থখানি যে প্রধানতঃ বালকদিগের পাঠোপযোগী করিবার উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছে, গ্রন্থকারের ভাষা ও রচনা প্রণালী দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারা যায়। আমরা গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া অতিশয় তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। ইহার ভাষা আমাদের দেশের প্রাচীন কালের রূপকথার ভাষার মত সরস, ও প্রাণস্পর্শী এবং বেশ সজীব। ভাবে ও ভাষায় কোনখানে কৃত্রিমতা নাই—কষ্টকল্পনাও নাই। রচয়িতার রচনা কৌশল প্রশংসনীয়। মধ্যে মধ্যে স্থান বিশেষে ব্যবহৃত অনুপ্রাসগুলি বেশ সঙ্গত ও মাধুর্য্যবিশিষ্ট। পাঠ করিতে বেশ আনন্দ হয়। গ্রন্থখানি সকল রকমেই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। বালকদিগের জন্য মোহম্মদের জীবন কাহিনী এরূপ সরস, মধুর এবং সরল ভাষায় ইতঃপূর্ব্বে আর রচিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। বালকদিগের জন্য রচিত হইলেও গ্রন্থখানি সকলেরই পাঠোপযোগী হইয়াছে। আজকাল আমাদের মোসলমান ভ্রাতারা বঙ্গসাহিত্য-সেবায় বিশেষ ভাবে আগ্রহান্বিত হইয়াছেন, ইহাতে আমরা সুখী। ইহা উভয় পক্ষেরই

গৌরবের কথা বলিয়া মনে করি। গ্রন্থখানির কাগজ, ছাপা এবং বাঁধাই অতি সুন্দর।

"কমলাকান্ত।"

নিরেট গুরুর কাহিনী—শ্রীমতী সীতা দেবী বি-এ প্রণীত। কলিকাতা ১০০ নং গড়পাড় রোড, ইউ রায় এণ্ড সন্স কর্তৃক মুদ্রিত ও ২১০।৩।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, "প্রবাসী" কার্য্যালয় হইতে শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। ডবল ফুলস্কাপ ১৬ পেজী ৬৫ পৃষ্ঠা, ৺উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী কর্তৃক অঙ্কিত ৮ খানি চিত্র সম্বলিত, সচিত্র বোর্ডে বাঁধা, মূল্য ।৶০

ইংরাজীতে The Adventures of Gooroo Noodle নামক একখানি হাস্যরসোদ্দীপক গল্পের বহি আছে, এখানি তাহারই অনুবাদ। লেখিকা মহাশয়া নামটীর অনুবাদ করিয়াছেন 'নিরেট'—ঠিকই হইয়াছে। এই নিরেট মহাশয়ের শিষ্যগণের নামের বাহারটা একবার দেখুন—"ইহাঁর পাঁচজন শিষ্য, তাহাদের নাম আকাট, হাবা, হাঁদা, বোকা এবং আহাম্মক।"

এই পঞ্চশিষ্য-সমন্বিত 'নিরেট' গুরুমহাশয়ের অত্যদ্ভুত বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নানা কার্য্যকলাপ এই গল্প-গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়। অনুবাদটী বেশ সলীল ভঙ্গিতে চলিয়াছে, কোথাও কটমট হয় নাই। বইখানি খুব সহজ ভাষায় লিখিত, ইহাকে অল্পবয়স্কগণের পঠনীয় করাই বোধ হয় লেখিকার উদ্দেশ্য। তাঁহার সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। ইহার হাস্যরসটুকু বালকবালিকাগণের পক্ষে অত্যন্ত লোভনীয় পদার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পুরাণের গল্প (১ম খণ্ড)—শ্রীকুলদারঞ্জন রায় প্রণীত। কলিকাতা ১০০ নং গড়পার রোড হইতে ইউ রায় এণ্ড সন্স কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ১২১পৃষ্ঠা, ৯ খানি পূর্ণপৃষ্ঠা চিত্রযুক্ত (তন্মধ্যে একখানি ত্রিবর্ণ), সচিত্র কাগজের মলাট, মূল্য ॥০

কুলদাবাবু একে একে অনেকগুলি শিশুপাঠ্য সচিত্র পুস্তিকা লিখিয়া ফেলিলেন। তাঁহার "রবিন হুড," 'ছেলেদের বেতাল পঞ্চবিংশতি", "ছেলেদের বত্রিশ সিংহাসন" প্রভৃতি বহি শিশুসমাজে সমাদৃত হইয়াছে। এই প্রথম খণ্ড "পুরাণের গল্প" পুস্তকও শিশুগণের মনোহরণ করিতে সমর্থ হইবে। গল্পগুলি নানা পুরাণ হইতে সংগৃহীত। বালক বালিকাগণের সুরুচি ও সৎশিক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া গল্পগুলি নির্ব্বাচিত হইয়াছে—কার্য্যটি খুব সহজ নহে, কিন্তু কুলদা বাবু তাহা উত্তমরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার এ উদ্যম প্রশংসনীয়।

সাহিত্য-সমাচার

শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের "হিমালয়" গ্রন্থের ৬ষ্ঠ সংস্করণ এবং "অভাগী" উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণ যন্ত্রস্থ। শেষোক্ত বহিখানি মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের ॥০ সংস্করণ গ্রন্থমালাভুক্ত।

"আলোচনা" সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নূতন (সচিত্র) গল্প-গ্রন্থ "পঞ্চরত্ন" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ১॥০

"সোণাবিবি", "আলেখ্য" প্রভৃতি উপন্যাস-লেখক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বিশ্বাস প্রণীত "বঙ্গরাণী" নামক নাটক যন্ত্রস্থ। বৈশাখ-মাসে বাহির হইবে। গ্রন্থকার উহা বেঙ্গল ব্যাটালিয়নকে উৎসর্গ করিয়াছেন।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত "স্পর্শমণি" উপন্যাস পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল, মূল্য ২৲

বিগত ৩০শে চৈত্র ও ১লা বৈশাখ তারিখে ঢাকা নগরীতে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের একাদশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। "নারায়ণ" সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ও স্বনামধন্য দার্শনিক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় সাধারণ সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। চট্টগ্রামের শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন মহাশয় সাহিত্য-শাখার, শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয় ইতিহাস শাখার, শ্রীযুক্ত ডি, এন মল্লিক, মহাশয় বিজ্ঞান শাখার এবং শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় দর্শন শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন। ঢাকার পূর্ব্বতন সেক্রেটেরিয়েট প্রাসাদের এক সুবিস্তৃত প্রকোষ্ঠে সভার অধিবেশন হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের ছাত্রাবাসে প্রতিনিধিগণের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল।

কলিকাতা
১৪ এ, রামতনু বসুর লেন, "মানসী প্রেস" হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা-প্রবাহিনী ?"

প্রয়াগ

চিত্রকর—শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন

MANASI PRESS,
CALCUTTA.

মানসী
ও
মর্ম্মবাণী

১০ম বর্ষ
১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ সাল

১ম খণ্ড
৪র্থ সংখ্যা

ফাঁকি

বিনুর বয়স তেইশ তখন, রোগে ধরল তারে।
ওষুধে ডাক্তারে
ব্যাধির চেয়ে আধি হল বড়;
নানা ছাপের জম্‌ল শিশি, নানা মাপের কৌটো হল জড়।
বছর দেড়েক চিকিৎসাতে করলে যখন অস্থি জরজর
তখন বল্লে, "হাওয়া বদল কর!"
এই সুযোগে বিনু এবার চাপ্‌ল প্রথম রেলের গাড়ি,
বিয়ের পরে ছাড়ল প্রথম শ্বশুর বাড়ি।
নিবিড় ঘন পরিবারের আড়ালে আব্‌ডালে
মোদের হত দেখাশুনো ভাঙা লয়ের তালে;
মিলন ছিল ছাড়া ছাড়া
চাপা হাসি টুক্‌রো কথার নানান্‌ জোড়াতাড়া।
আজ্‌কে হঠাৎ ধরিত্রী তার আকাশভরা সকল আলো ধরে
বর-বধূরে নিলে বরণ করে'।

রোগা মুখের মস্ত বড় দুটি চোখে
বিনুর যেন নতুন করে শুভদৃষ্টি হল নতুন লোকে।
রেল-লাইনের ওপার থেকে
কাঙাল যখন ফেরে ভিক্ষা হেঁকে,
বিনু আপন বাক্স খুলে
টাকা শিকে যা হাতে পায় তুলে
কাগজ দিয়ে মুড়ে
দেয় তাহাদের ছুঁড়ে।
সবার দুঃখ দূর না হলে পরে
আনন্দ তার আপ্‌নারি ভার বইবে কেমন করে'?
সংসারের ঐ ভাঙা ঘাটের বাঁধন হ'তে
আজ আমাদের ভাসান যেন চিরপ্রেমের স্রোতে,—
তাই যেন আজ দানে ধ্যানে
ভরতে হবে সে যাত্রাটি বিশ্বের কল্যাণে।
বিনুর মনে জাগ্‌চে বারেবার
নিখিলে আজ একলা শুধু আমিই কেবল তার;
কেউ কোথা নেই আর
শ্বশুর ভাসুর সাম্‌নে পিছে ডাইনে বাঁয়ে;
সেই কথাটা মনে করে পুলক দিল গায়ে।

বিলাসপুরের ইষ্টেশনে বদল হবে গাড়ী;
তাড়াতাড়ি
নাম্‌তে হল, ছ ঘণ্টা কাল থাম্‌তে হবে যাত্রিশালায়
মনে হল এ এক বিষম বালাই!
বিনু বল্লে, "কেন, এই ত বেশ!"
তার মনে আজ নেই যে খুসির শেষ!
পথের বাঁশি পায়ে পায়ে তারে যে আজ করেছে চঞ্চলা,—
আনন্দে তাই এক হল তার পৌঁছনো আর চলা।
যাত্রিশালার দুয়ার খুলে আমায় বলে,—
"দেখ, দেখ, একাগাড়ি কেমন চলে!
আর দেখেচ বাছুরটি ঐ, আ মরে যাই, চিকন নধর দেহ,
মায়ের চোখে কি সুগভীর স্নেহ!

ঐ যেখানে দিঘির উঁচু পাড়ি,—
সিসুগাছের তলাটিতে, পাঁচিলঘেরা ছোট্ট বাড়ি
ঐ যে রেলের কাছে,—
ইষ্টেশনের বাবু থাকে ?—আহা ওরা কেমন সুখে আছে !”

যাত্রিঘরে বিছানাটা দিলেম পেতে,
বলে দিলেম, “বিনু, এবার চুপ্‌টি করে ঘুমোও আরামেতে !”
প্ল্যাট্‌ফরমে চেয়ার টেনে
পড়তে সুরু করে দিলেম ইংরেজি এক নভেল কিনে এনে।
গেল কত মালের গাড়ি, গেল প্যাসেঞ্জার,
ঘণ্টা তিনেক হয়ে গেল পার।
এমন সময় যাত্রিঘরের দ্বারের কাছে
বাহির হয়ে বল্লে বিনু,—“কথা একটা আছে !”
ঘরে ঢুকে দেখি কে এক হিন্দুস্থানী মেয়ে
আমার মুখে চেয়ে
সেলাম করে বাহির হয়ে রইল ধরে বারান্দাটার থাম।
বিনু বল্লে, “রুক্‌মিনী ওর নাম।
ঐ যে হোথায় কুয়োর ধারে সার-বাঁধা ঘরগুলি
ঐখানে ওর বাসা আছে, স্বামী রেলের কুলি।
তেরোশো কোন্ সনে
দেশে ওদের আকাল হল,—স্বামীস্ত্রী দুইজনে
পালিয়ে এল জমিদারের অত্যাচারে।
সাত বিঘে ওর জমি ছিল কোন্-এক গাঁয়ে কি-এক নদীর ধারে—”
বাধা দিয়ে আমি বল্লেম হেসে,
“রুক্‌মিনীর এই জীবনচরিত শেষ না হতেই গাড়ি পড়বে এসে।
আমার মতে, একটু যদি সংক্ষেপেতে সারো
অধিক ক্ষতি হবেনা তায় কারো।”
বাঁকিয়ে ভুরু, পাকিয়ে চক্ষু বিনু বল্লে ক্ষেপে—
“কখ্‌খনো না, বল্‌ব না সংক্ষেপে !
আপিস যাবার তাড়া ত নেই, ভাবনা কিসের তবে ?
আগাগোড়া সবটা শুনতে হবে।”

নভেল-পড়া নেশাটুকু কোথায় গেল মিশে !
রেলের কুলীর লম্বা কাহিনী সে
বিস্তারিত শুনে গেলেম আমি।
আসল কথা শেষে ছিল, সেইটে কিছু দামী।
কুলীর মেয়ের বিয়ে হবে, তাই
পৈঁচে তাবিজ বাজুবন্ধ গড়ানো চাই ;
অনেক টেনেটুনে তবু পঁচিশ টাকা খরচ হবে তারি ;
সে ভাব্‌নাটা ভারী
রুক্‌মিনীরে করেছে বিব্রত।
তাই এবারের মত
আমার পরে ভার
কুলী নারীর ভাব্‌না ঘোচাবার।
আজ্‌কে গাড়ি-চড়ার আগে একেবারে থোকে
পঁচিশ টাকা দিতেই হবে ওকে !

অবাক্ কাণ্ড এ কি !
এমন কথা মানুষ শুনেচে কি !
জাতে হয়ত মেথর হবে, কিম্বা নেহাৎ ওঁচা,
যাত্রিঘরের করে ঝাড়ামোছা,
পঁচিশটাকা দিতেই হবে তাকে !
এমন হলে দেউলে হতে ক'দিন বাকি থাকে ?
"আচ্ছা, আচ্ছা, হবে, হবে ! আমি দেখ্‌চি মোট
একশো টাকার আছে একটা নোট,
সেটা আবার ভাঙানো নেই !"
বিনু বল্লে, "এই
ইষ্টিশনেই ভাঙিয়ে নিলেই হবে।"
"আচ্ছা, দেব তবে"
এই বলে সেই মেয়েটাকে আড়ালেতে নিয়ে গেলেম ডেকে,—
আচ্ছা করেই দিলেম তারে হেঁকে,—
"কেমন তোমার নোক্‌রি থাকে দেখ্‌ব আমি !
প্যাসেঞ্জারকে ঠকিয়ে বেড়াও ! ঘোচাব নষ্টামি !"

কেঁদে যখন পড়ল পায়ে ধরে
দু টাকা তার হাতে দিয়ে দিলেম বিদায় করে।

*　　　*　　　*　　　*

জীবন-দেউল আঁধার করে নিবল হঠাৎ আলো।
ফিরে এলেম দু মাস যেই ফুরালো।
বিলাসপুরে এবার যখন এলেম নামি,
একলা আমি।
শেষ নিমেষে নিয়ে আমার পায়ের ধূলি
বিনু আমায় বলেছিল, "এ জীবনে আর যা-কিছু ভুলি
শেষ দুটি মাস অনন্তকাল মাথায় র'বে মম
বৈকুণ্ঠেতে নারায়ণীর সিঁথের পরে নিত্য সিঁদুর সম।
এই দুটি মাস সুধায় দিলে ভরে'
বিদায় নিলেম সেই কথাটি স্মরণ করে'।"
ওগো অন্তর্যামী,
বিনুরে আজ জানাতে চাই আমি
সেই দু' মাসের অর্ঘ্যে আমার বিষম বাকী,
পঁচিশ টাকার ফাঁকি।
দিই যদি আজ রুক্‌মিনীরে লক্ষ টাকা
তবুও ত ভরবে না সেই ফাঁকা!
বিনু যে সেই দু মাসটিরে নিয়ে গেছে আপন সাথে,
জানল না ত ফাঁকিসুদ্ধ দিলেম তারি হাতে।

বিলাসপুরে নেমে আমি শুধাই সবার কাছে
"রুক্‌মিনী সে কোথায় আছে?"
প্রশ্ন শুনে অবাক্ মানে,—
রুক্‌মিনী কে তাই বা ক' জন জানে!
অনেক ভেবে "ঝাম্‌রু কুলীর বউ" বল্লেম যেই
বল্লে সবে, "এখন তারা এখানে কেউ নেই।"
শুধাই আমি, "কোথায় পাব তাকে?"
ইষ্টেশনের বড়বাবু রেগে বলেন, "সে খবর কে রাখে?"
টিকিটবাবু বল্লে হেসে, "তারা মাসেক আগে
গেছে চলে দার্জ্জিলিঙে কিম্বা খস্‌রুবাগে,

কিম্বা আরাকানে।"
শুধাই যত, "ঠিকানা তার কেউ কি জানে?"—
তারা কেবল বিরক্ত হয়,—তার ঠিকানায় কার আছে কোন্ কাজ!
কেমন করে বোঝাই আমি—ওগো আমার আজ
সবার চেয়ে তুচ্ছ তারে সবার চেয়ে পরম প্রয়োজন;
ফাঁকির বোঝা নামাতে মোর আছে সেই একজন।
"এই দুটি মাস সুধায় দিলে ভরে"
বিনুর মুখের শেষ কথা সেই বইব কেমন করে?
রয়ে গেলেম দায়ী
মিথ্যা আমার হল চিরস্থায়ী।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নেপালে পশুপতিনাথ দর্শন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কিছুক্ষণ পরে অন্যান্য যাত্রীবর্গের সহিত আমরা সহরের রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। একটী স্বল্প-সলিলা নদীর উপরস্থিত লৌহনির্ম্মিত পুল পার হইয়া কাঠ-মণ্ডু সহরের বাজারে প্রবেশ করা গেল। সহস্র সহস্র নেপালী, ভুটীয়া ও তিব্বতীর গাত্র দুর্গন্ধে প্রাণ অস্থির আর কি! চারিদিকে নানারূপ কারুকার্য্য-বিশিষ্ট কাষ্ঠনির্ম্মিত "প্যাগোডা" ধরণের ঘর। ক্রমশঃ বাজার পার হইয়া আমরা একটী মাঠের সন্নিকটে উপস্থিত হইলাম। ইহার নাম টুনিখেল্ বা শান্তিখেল্। এখানে সৈন্যগণের কুচ-কাওয়াজ হইয়া থাকে। রাস্তায় মাঝে মাঝে বৈদ্যুতিক আলোক স্তম্ভ ও দুই একখানি বাইসিকেল দেখা গেল। সৈন্যগণ নীলবর্ণের কোট প্যাণ্ট ও যাত্রার সখীর মত টুপী পরিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। যাত্রীবর্গ দলে দলে পশুপতিনাথ মন্দিরের দিকে চলিয়াছে।

সহর হইতে অনূন দুই মাইল দূরে মন্দিরের নিকটবর্ত্তী স্থানে উপস্থিত হইলাম। নানা দেশের অসংখ্য লোকের বিপুল জনতা ভেদ করিয়া যখন মন্দির দ্বারে উপনীত হইলাম তখন বেলা অনুমান ১০টা। প্রথমতঃ বাগমতী নদীর ধারে একস্থানে লোটা কম্বল রাখিয়া, এক হাঁটু জলে স্নান করিলাম। সঙ্গী বাঙ্গালী সাধুটীকে রাখিয়া আমি দেবদর্শনার্থ মন্দিরে চলিলাম। ঘুরিয়া ফিরিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া দেখি কি বিষম ভীড়! সমারোহ ব্যাপার। সাধ্য কি যে মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেবতা দর্শন করি! চতুর্দ্দিকে অনুমান দশ হাজার লোকের ভীড় লাগিয়া আছে। "পশুপতি নাথ কি জয়" রবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া জোর জবরদস্তি সহকারে দেবতার সম্মুখীন হইলাম। অতি কষ্টে দর্শন করিলাম। কৃষ্ণ-প্রস্তর নির্ম্মিত বৃহদাকার শিবলিঙ্গের পঞ্চমুখ। উপরে সুবর্ণ ছত্র এবং অন্যান্য বহুমূল্য দ্রব্যাদি। মন্দিরের

অভ্যন্তর প্রদেশ ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না। অত্যধিক ভীড়ের জন্য তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিতে হইল। কয়েকদিন এখানে থাকিয়া সমস্ত ভাল করিয়া দেখিব ভাবিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম এবং কোথায় আশ্রয় স্থান মিলিবে ভাবিতে লাগিলাম।

চিন্তা অপেক্ষা চেষ্টা করা ভাল বিবেচনা করতঃ, পুল পার হইয়া অপর পারে বহু সোপান শ্রেণী অতিক্রম পূর্ব্বক নাগা সন্ন্যাসীদের আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। ভাগ্যক্রমে সেখানে একজন বাঙ্গালী সাধুর দর্শন পাওয়া গেল। তাঁহার সহিত বাক্যালাপ হইতেছে এমন সময় আর একজন বাঙ্গালী ব্রহ্মচারী কোথা হইতে আসিলেন। নবাগত ব্রহ্মচারীজি যেথানে থাকেন সেইখানে আমাকে লইয়া গেলেন। সেটী শঙ্করাচার্য্য মঠ। মঠের মোহান্ত স্বামীজির সহিত দেখা হইল। তিনি দয়া করিয়া আমাকে আশ্রয় দিলেন। অনেক দিন পরে একটু ভালরকম আহারাদি করিয়া, ব্রহ্মচারীর সহিত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া দেখিতে লাগিলাম। মঠে আরও অনেক সাধু রহিয়াছেন, তন্মধ্যে আমরাই মাত্র দুজন বাঙ্গালী।

পশুপতিনাথের ইতিবৃত্ত।

নেপালে পশুপতিনাথ হিন্দুদিগের একটী প্রধান তীর্থ। এই মন্দির সম্বন্ধে বড় অদ্ভুত ইতিহাস পাওয়া যায়। জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যের নেপাল গমনের পর হইতে ইহা হিন্দু মন্দির হইয়াছে, তৎপূর্ব্বে বৌদ্ধমঠ ছিল। নেপালের আদিম অধিবাসিগণ অধিকাংশই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল। শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের পর হইতেই এখানে হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে এখানে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অস্তিত্ব নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতের বিখ্যাত বহুতীর্থ এবং মন্দির এক সময়ে বৌদ্ধগণ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সম্রাট্ অশোক ৮৪০০০ বৌদ্ধ স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। তাহার অধিকাংশ স্তূপই এখন হিন্দুর দেবমন্দিরে পরিণত হইয়াছে, ইহাই অনেকের ধারণা। পশুপতিনাথও এই শ্রেণীর মন্দির। বৌদ্ধদিগের মধ্যে হিন্দুর শৈবাচার এবং তন্ত্র মত মিশ্রিত হইয়া এক অপূর্ব্ব ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহারা অনেকে শৈবধর্ম্ম ও তন্ত্রোক্ত মতে উপাসনাও করিয়া থাকে। অতি প্রাচীন কাল হইতে নেপালে নানাবিধ সম্প্রদায়ের লোক নিজ নিজ ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া আসিতেছে। তাহার ফলে নানা ধর্ম্ম সম্প্রদায় এবং বিবিধ আচার ব্যবহার এদেশে প্রচারিত হইয়াছে। তথাপিও বর্ত্তমানে হিন্দুর দেবতা পশুপতিনাথকে সকল সম্প্রদায়ের লোকেই অর্চ্চনা করিয়া থাকে।

নেপালের ইতিহাসে পশুপতিনাথের উৎপত্তি-কথা অতি অদ্ভুত ভাবে বর্ণিত আছে। পুরাকালে এইস্থানে একটী বিশাল হ্রদ ছিল। সত্যযুগে বিপাশ্ব বুদ্ধ এই হ্রদে একটী পদ্মফুল রোপণ করেন। কালে সেই পদ্ম বিকশিত হইলে তন্মধ্যে স্বয়ম্ভু ভগবান প্রকাশিত হইলেন। তৎপরে ত্রেতা যুগে বিশ্বভূ এবং মঞ্জুশ্রী বুদ্ধ চীনদেশ হইতে আসিয়া দিব্য-জ্যোতি দর্শন করেন। আদি প্রজ্ঞাদেবী গুহ্যেশ্বরীও এই সময়ে প্রকাশিত হন। মঞ্জুশ্রী বুদ্ধ তরবারির আঘাতে হ্রদের জল বহির্গত করিয়া দিয়া তথায় ভিক্ষু-দিগের জন্য বিহার ও গৃহস্থদিগের জন্য মঞ্জুপাটন নামক নগর প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপরে ক্রকুচ্ছন্দ নামক চতুর্থ মানব অনুচরগণ সহ তীর্থদর্শনে এখানে আসিয়া স্থানের শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বাস করিতে ইচ্ছুক হন। অনুচরদিগের অভিষেকের জন্য জলান্বেষণ করিয়া কোথাও জল না পাওয়ায় ক্রকুচ্ছন্দ দেবশক্তির আরাধনা করতঃ পর্ব্বত গাত্রে বৃদ্ধাঙ্গুল স্পর্শ করিবা মাত্র একটী জলধারা নির্গত হইল। সেই জলধারাই বারিমতী বা বাগমতী নামে খ্যাত। পরে তদীয় অনুচরবর্গ এবং ব্রাহ্মণজাতীয় অনেক ব্যক্তিকে উক্ত পবিত্র জলে অভিষিক্ত করেন। মুণ্ডিত মস্তক নব বৌদ্ধদিগের স্তূপাকার কেশরাশি প্রস্তরী-ভূত হইয়া যায়। ইহাই বর্ত্তমান বৌদ্ধতীর্থ কেশচৈত্য। ঐ কেশরাশির কিয়দংশ বায়ুকর্ত্তৃক অন্যত্র প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় ঐরূপে কেশমতী বা বিষ্ণুমতী নদীর উদ্ভব

হইল। রুদ্রমতী নামক বাগমতীর এক উপনদী আছে। তাহার তীরে দেবপাটন এবং হরি গাঁ নামে দুইটী সুন্দর গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বাপর যুগে কনকমুনি বুদ্ধ স্বয়ম্ভু জ্যোতি ও গুহ্যে-শ্বরীর অর্চ্চনা করেন। তৎপরে গৌড়ের রাজা প্রচণ্ড দেব কাশ্যপ বুদ্ধের আদেশ অনুসারে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিয়া স্বয়ম্ভু জ্যোতির পূজা করেন। রাজা প্রচণ্ড দেবের নাম শান্তশ্রীনাথ হয় এবং তিনি কলিযুগ নিকট-বর্ত্তী জানিয়া স্বয়ম্ভু জ্যোতিকে আচ্ছাদন করতঃ তদুপরি সুদৃঢ় মন্দির নির্ম্মাণ করেন। কালে তাহা বিলুপ্ত হইলে, এক গাভী মৃত্তিকা প্রোথিত স্বয়ম্ভু জ্যোতির স্থলে নিত্য দুগ্ধধারা সেচন করিতে থাকে। গাভী-পালক একদা গোপনে সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হয় এবং কৌতূহলপরায়ণ হইয়া সেই স্থান খনন করিতে আরম্ভ করিলে সহসা স্বয়ম্ভু জ্যোতি প্রকাশিত হইয়া তাহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলেন। নীমুনি নামক জনৈক মুনি উক্ত গোরক্ষকের পুত্রকে রাজপদে বরণ করেন এবং তাঁহারই রাজত্বকালে পশুপতিনাথের প্রতিষ্ঠা হয়। আদি স্বয়ম্ভুনাথের প্রসিদ্ধ মন্দির সহরের অদূরে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই বৌদ্ধ-দিগের একমাত্র উপাসনা-মন্দির। কালের বিচিত্র গতিতে পুরাকালীন স্বয়ম্ভুনাথের বৌদ্ধমন্দির হিন্দুর পশুপতিনাথ মন্দিরে পরিণত হইয়াছে। সকলই অদ্ভুত!

নেপালে যত দেবমন্দির আছে তন্মধ্যে পশুপতি-নাথের মন্দিরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বর্ত্তমান কালে নেপালে প্রায় ২৭৩৩টী মন্দির আছে। কাঠমণ্ডু সহরের দেড়-ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে বাগমতী নদীর তীরে বর্ত্তমান মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের পাদদেশ বিধোত করিয়া পবিত্রসলিলা বাগমতী কুলুকুলু রবে প্রবাহিত হই-তেছেন। এই নদীর জলেই পশুপতিনাথের পূজা হইয়া থাকে। সুন্দর কারুকার্য্য বিশিষ্ট, স্বর্ণ রৌপ্য-মণ্ডিত ও কাষ্ঠ প্রস্তর নির্ম্মিত বর্ত্তমান এই মন্দিরটী কোন্ কালে কাহার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। তবে নেপালের সমস্ত রাজা এবং মন্ত্রিবর্গ মন্দিরের কিছু না কিছু সংস্কার করিয়াছেন। মন্দিরটী বড়ই সুন্দর। চারিদিকে চারিটী বৃহদা-কার রৌপ্যনির্ম্মিত দ্বার—উর্দ্ধদেশ স্বর্ণমণ্ডিত। রাজা সদাশিব দেবের ইহা এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। সুদৃশ্য কারু-কার্য্যময় চতুর্দ্দিকের কার্নিশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য স্বর্ণঘণ্টা দোদুল্যমান রহিয়াছে। একটু বাতাস লাগি-লেই তাহা মধুর শব্দে বাজিতে থাকে। স্বর্ণ রৌপ্যের ছড়াছড়ি—শুনিলাম এই মন্দিরে ৪০ মণ স্বর্ণ নানারূপে ঢালিয়া দেওয়া আছে। মানবের পদধূলিতে মন্দির-তল অপরিস্কৃত হইলেও নিম্নস্থ গোলাকার রৌপ্যখণ্ড-গুলি অধিকতর উজ্জ্বল দেখাইতেছে। প্রাঙ্গণে একটী বৃহৎকায় স্বর্ণমণ্ডিত বৃষ হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আছে। এত বড় যে দাঁড়াইলে বোধ হয় দোতালা সমান উচ্চ হইবে। সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্রী ভীমসেন থাপা কর্ত্তৃক ইহা স্থাপিত। একস্থানে গোলাকার ভাবে ১০৮ শিবলিঙ্গ সমান আকারে স্থাপিত। ইহা ব্যতীত কত যে স্বর্ণময় ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃষ ও শিবলিঙ্গ আছে তাহার সংখ্যা করা কঠিন। একটী বৃহদাকার স্বর্ণমণ্ডিত ত্রিশূল এবং ছোট ছোট অনেক ত্রিশূল আছে। বস্তুতঃ এমন সুদৃশ্য মন্দির আর এত স্বর্ণ রৌপ্যের প্রাচুর্য্য ভারতবর্ষের আর কোন তীর্থে আছে কি না সন্দেহ। ভারতের প্রধান প্রধান কয়েকটী মন্দির মুসলমানগণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছে কিন্তু নেপালে মুসলমান দিগ্বিজয়ীগণ আসেন নাই। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া পশুপতিনাথের বিপুল ঐশ্বর্য্য সঞ্চিত হইতেছে। প্রতি বৎসর শিব-রাত্রিতে ভারতের নানাদেশ হইতে যাত্রীগণ আসিয়া নানাবিধ স্বর্ণ রৌপ্যের আভরণ অলঙ্কার ভেট দিয়া থাকে—তাহা কেবল পুঞ্জীকৃতই হইতেছে, কেহ কোনও দিন লুণ্ঠন করে নাই। প্রকৃতই এত অধিক ধনরত্ন ভারতবর্ষের অন্য কোন মন্দিরে নাই। স্বাধীন রাজ্যের ইহা গৌরবের কথা। নেপালের প্রত্যেক রাজাই পশুপতিনাথকে অতি ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকেন। যিনি যতটুকু পারিয়াছেন, মন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন।

পশুপতিনাথের মন্দির অতি রমণীয় স্থানে প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য মন্দির আছে।

পশুপতিনাথের মন্দিরের অদূরে বাগমতী নদীর অপর পারে গুহ্যেশ্বরী দেবীর মন্দির স্থাপিত। একটী উৎসের মুখ স্বর্ণময় আবরণে আবৃত। সেই উৎসের জল স্পর্শ করাই এখানকার তীর্থকৃত্য। পূজা অর্চ্চনা, শাস্ত্রপাঠ, ভজন, ঘণ্টাধ্বনি প্রদক্ষিণ দিবারাত্রি লাগিয়াই আছে। বিশেষতঃ শিবরাত্রির সময়ে আরও লোকারণ্য। জনতা ভেদ করিয়া উৎসের জল স্পর্শ করা কঠিন ব্যাপার।

অনতিদূরে একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপরে মৃগস্থলী নামক এক রমণীয় অরণ্য আছে। অসংখ্য বানর সেখানে আশ্রয় লইয়াছে। প্রতিবৎসর শিবরাত্রির সময়ে পশুপতিনাথের মন্দিরে ভারতের নানাস্থান হইতে ১৫।২০ হাজার যাত্রী দেবদর্শনার্থে আসিয়া থাকে। কি বিষম পথকষ্ট স্বীকার করিয়া তাহারা আসে তাহা ভুক্ত-ভোগী ভিন্ন অন্যে কল্পনাও করিতে পারে না। এই সময়ে মাত্র কয়েক দিনের জন্য নেপাল রাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত থাকে।

নেপালের প্রাকৃতিক বিবরণ ও অধিবাসিবৃন্দ।

নেপাল হিমালয়ের পাদমূলে ভারতবর্ষের একটী স্বাধীন রাজ্য। ইহার উত্তর সীমায় তিব্বত রাজ্য, দক্ষিণে হিন্দুস্থান, পূর্ব্বে ইংরাজ-করদ সিকিম রাজ্য ও পশ্চিমে ইংরাজাধিকৃত কুমায়ুন ও রোহিলখণ্ড প্রদেশ।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে নেপাল রাজ্য পশ্চিমে শতদ্রু নদীর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু ইংরাজ-দিগের সহিত যুদ্ধের পর সিগাটলী সন্ধির দ্বারা ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ঐ সকল স্থান ইংরাজাধিকারভুক্ত হইয়াছে। সিমলা, মুশৌরী, নাইনিতাল, আলমোড়া প্রভৃতি স্থান পূর্ব্বে নেপাল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এই রাজ্যে পূর্ব্ব পশ্চিমে ২৫৬ ক্রোশ দীর্ঘ এবং উত্তর দক্ষিণে স্থান বিশেষে ৩৫ হইতে ৭৫ ক্রোশ বিস্তৃত। নেপাল রাজ্য স্বভাবতঃ পূর্ব্ব পশ্চিম ও মধ্য এই তিন উপত্যকায় বিভক্ত। ইহার উত্তরে চিরতুষারাবৃত পর্ব্বতমালা। চারিটী অত্যুচ্চ পর্ব্বত শিখর এই রাজ্যে অবস্থিত। নন্দাদেবী, ধবলগিরি বা দুধগঙ্গা, গোঁসাই থান ও এভারেষ্ট বা গৌরীশঙ্কর। নন্দাদেবী হইতে একশত ক্রোশ পূর্ব্বে ধবলগিরি শিখর, ইহার দেশীয় নাম দুধগঙ্গা। ধবলগিরি হইতে ৯০ ক্রোশ পূর্ব্বে গোঁসাই থান শিখর অবস্থিত। গোসাই থান হইতে ৫৬ ক্রোশ পূর্ব্বে এভারেষ্ট বা গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গ। গোরক্ষপুর সহর ধবলগিরি শিখরের ঠিক দক্ষিণে। নন্দাদেবী ও ধবল-গিরি শিখরের মধ্যে পশ্চিম উপত্যকা অবস্থিত। ধবল-গিরি ও গোঁসাই থান পর্ব্বতের মধ্যে মধ্যে উপত্যকা অবস্থিত এবং ইংরেজ করদ সিকিম রাজ্যে অবস্থিত কাঞ্চনজঙ্ঘা-শিখরই নেপালের পূর্ব্ব উপত্যকার পূর্ব্ব-সীমা। এই সকল পর্ব্বত শৃঙ্গ ১৬০০০ ফিট হইতে ২৮০০০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ হইবে। নেপাল রাজ্যের জনসংখ্যা প্রায় চারিলক্ষ এবং ভূমির পরিমাণ ৫৪০০০ বর্গ মাইল।

কয়েকটী প্রসিদ্ধ নদী এই নেপাল রাজ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ঘর্ঘরা, গণ্ডকী, কুশী, রাপ্তী ও কালী বা সরযূ।

১। ঘর্ঘরা—ইহার অপর নাম কর্ণালী। মানস সরোবরের নিকট হইতে বহির্গত হইয়া নেপাল রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তথা হইতে অযোধ্যা প্রদেশের পূর্ব্বপ্রান্ত দিয়া সরযূ এবং কুশীর সহিত মিলিত হইয়া দানাপুরের সন্নিকটে পদ্মাতে পতিত হইয়াছে।

২। গণ্ডকী—নেপালের মধ্যপ্রদেশ দিয়া প্রবা-হিত হইয়া পদ্মাতে পতিত হইয়াছে। ইহার তীরে নেপালের অন্যতম প্রসিদ্ধ তীর্থ মুক্তিনাথ অবস্থিত। এই নদীতে শালগ্রাম শিলা প্রাপ্ত হওয়া যায়। মুক্তি-নাথ তীর্থ বড়ই কঠিন। চিরহিমানী-মণ্ডিত অত্যুচ্চ পর্ব্বতের মধ্যস্থলে এই তীর্থ। প্রাণান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া অতি অল্প যাত্রীই এই তীর্থে আসিয়া থাকে।

৩। কুশী—

৪। রাপ্তি—ধবলগিরি হইতে বহির্গত হইয়া অযোধ্যা প্রদেশের উত্তর পূর্ব্বাংশ এবং গোরক্ষপুর জিলার মধ্য দিয়া গিয়া ঘর্ঘরার সহিত মিলিত হইয়াছে।

৫। কালী বা সরযূ—নন্দাদেবী শিখরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী একত্র মিলিত হইয়া কালী নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। নেপাল হইতে বহির্গত হইয়া অযোধ্যা প্রদেশের মধ্য দিয়া ঘর্ঘরাতে পতিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত তাম্রকুশী, মিচি, বাগবতী, কেশমতী প্রভৃতি অনেক ক্ষুদ্র নদী আছে। এক কুশী নদীরই সাতটী উপনদী আছে। বাগমতী নদী কাঠমণ্ডু হইতে বহির্গত হইয়া মুঙ্গেরের নিকট পদ্মাতে পতিত হইয়াছে। গণ্ডকী ও কুশী নদীর মধ্যে নেপাল উপত্যকা এবং এই উপত্যকাতেই কাঠমণ্ডু নগর অবস্থিত।

ত্রিশূল গঙ্গা—মধ্য উপত্যকা প্রদেশে প্রবাহিত। গোঁসাই থান পর্ব্বতের নিম্নে একটী বৃহৎ হ্রদে ইহার জন্ম। এই নদীর উৎপত্তি স্থলে নীলকণ্ঠ কুণ্ড নামে একটি বৃহৎ হ্রদ আছে। হ্রদমধ্যস্থ নীলবর্ণ ডিম্বাকৃতি পর্ব্বতমণ্ডল নীলকণ্ঠ মহাদেবের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ পূজিত হন। কাঠমণ্ডু হইতে অতি অল্প লোকে বর্ষাকালে এখানে তীর্থ করিতে আসিয়া থাকে। এই পথ যেমন দুর্গম তেমনি ভয়াবহ। এই কুণ্ডের উত্তর দিকে জিবজিবিয়া নামক পর্ব্বতমালা বিরাজিত। তাহার শিখরস্থ তিনটি খাদ হইতে তিনটি নির্ঝরিণী পতিত হইয়াছে। এই নির্ঝরিণীর নাম ত্রিশূল ধারা বা ত্রিশূল গঙ্গা। কথিত আছে সমুদ্রমন্থন কালে মহাদেব বিষপানে অস্থির হইয়া হিমালয়ে পরিভ্রমণ করিতে করিতে এই তুষারক্ষেত্রে জল অন্বেষণ করিতে আগমন করেন। কোথাও জল না পাইয়া ত্রিশূলাঘাত করিবামাত্র তিনটী নির্ঝরিণীর উৎপত্তি হইল। তখন মহাদেব সেই স্থানে শয়ন করিয়া এই ত্রিধারার জলপানে বিষের যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হন। মহাদেব যে স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন তথায় নীলকণ্ঠ হ্রদের উৎপত্তি হইয়াছে। নীলকণ্ঠ-মহাদেবরূপী ডিম্বাকৃতি নীলবর্ণ প্রস্তরখণ্ড দূর হইতে দর্শন করিলে বোধ হয় যেন সর্পশয্যায় মহাদেব শায়িত আছেন। দৃশ্য বড়ই সুন্দর, কিন্তু যাত্রা বড়ই কঠিন। তীর্থযাত্রীগণ বড় কষ্ট করিয়া এখানে আসিয়া থাকে। শীতও যেমন দুরন্ত, তেমনি রাস্তায় কোন আশ্রয় নাই অথবা খাদ্য দ্রব্যও কিছু মিলে না। সেই ভয়ঙ্কর শীতে বাহিরে রাত্রি যাপন করিতে হয় তাহাতে অনেকের প্রাণবিয়োগ পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। পথে চন্দনবাড়ী নামক স্থানে "পৌড়ী গণেশ" আছেন এবং দেবীঘাট নামক স্থানে দেবী ভৈরবীর মন্দির আছে। এইরূপ এই পর্ব্বতে বহু তীর্থ প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। মনুষ্যের অগম্য স্থানে আরও কত কি আছে কে বলিবে?

গিরিপথ।

নেপাল হইতে হিমালয়ের অঙ্গভেদ করিয়া তিব্বতে যাইবার অনেকগুলি পার্ব্বত্য পথ আছে। অধিকাংশ সময় এই পথগুলি বরফে আচ্ছন্ন থাকে। এই সকল পথ এত উচ্চে অবস্থিত যে সর্ব্বনিম্নে যে পথটী আছে সেখানকার উচ্চতা ইউরোপের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত অপেক্ষাও অধিক। এই সকল সুকঠিন পার্ব্বত্য পথে কেবল তিব্বতীয় লোকেরাই যাতায়াত করিয়া থাকে। বাণিজ্য-ব্যপদেশে দলে দলে তিব্বতীয়গণ এই সকল পথে কাঠমণ্ডু আসিয়া থাকে। তিব্বত হইতে বহুমূল্য শাল, পশম নির্ম্মিত মোটা কাপড়, লবণ, সোহাগা, মৃগনাভি চামর, হরিতাল, পারদ, স্বর্ণরেণু, সুর্ম্মা, মঞ্জিষ্ঠা, চরশ, নানা প্রকার ঔষধি প্রভৃতি নেপালে ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষে আমদানি হইয়া থাকে। আর নেপাল হইতে তাম্র, পিত্তল, লৌহ ও কাংস নির্ম্মিত তৈজস, বিলাতী কাপড়, ভারতবর্ষজাত কার্পাস বস্ত্রাদি, নানাবিধ সুগন্ধি মশলা, তামাক, পাণ, গুপারি, নানা ধাতু এবং মূল্যবান প্রস্তরাদি তিব্বতে রপ্তানী হইয়া থাকে। নেপালী এবং কাশ্মীরী ব্যবসায়িগণ তিব্বতে গমনাগমন করে। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটী পথ দিয়াই লোকে যাতায়াত করিয়া থাকে।—

১। থক্‌লাঘর পাশ বা ঘরি পথ। এই পথ নন্দাদেবী

ও ধবলগিরির মধ্যস্থানে অবস্থিত। যে স্থানে ঘর্ঘরা নদী কর্ণালী নাম ধারণ করিয়া তিব্বত সীমায় প্রবেশ করিয়াছে, সেই স্থানে থক্ নামে একটী গ্রাম আছে। এই গ্রামের নামানুসারেই পথের নামকরণ হইয়াছে। এখানে লবণের ব্যবসায় আছে।

২। মস্তং পথ। ধবলগিরি হইতে ২০ ক্রোশ পূর্ব্বে এই পথ। ধবলগিরির পাদদেশে ঐ নামে একটি প্রদেশ আছে। তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী উচ্চস্থানে মস্তং উপত্যকা অবস্থিত। ইহার রাজা নেপালকে কর দিয়া থাকেন। এই গিরিপথের উত্তর ভাগে প্রধান রাস্তার উপর মুক্তিনাথ তীর্থ। এখানেও তিব্বতীয় লবণের ব্যবসায় আছে।

৩। কেরাং পথ। গোঁসাই থান পর্ব্বতের পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

৪। কুটী পথ। গোঁসাই থান পর্ব্বতের পূর্ব্বে। কাঠমণ্ডু সহরের নিকটবর্ত্তী বলিয়া এই পথ এবং কেরাং পথ দিয়া তিব্বতীয় লোক নেপালে গমনাগমন করিয়া থাকে। নেপাল রাজধানী কাঠমণ্ডু হইতে তিব্বতের রাজধানী লাসা যাইবার এই তুইটীই অপেক্ষাকৃত সোজা পথ। কুটী পথের পশ্চিমস্থিত বরফাচ্ছাদিত ভূখণ্ডকে খুর্দ্দিভূমি বলে। উহার পূর্ব্ব দিকস্থ উপনদী তাম্রকুশী। কুশী নদীর অন্যতম উপনদী তাম্রকুশী এই পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়াছে। এই পথে গো, অশ্ব, ছাগল প্রভৃতির পৃষ্ঠে পণ্যদ্রব্য বোঝাই দিয়া তিব্বতীয়েরা দলে দলে নেপালে যাতায়াত করে।

৫। হাতীয়া পথ। কুটী পথের ২০।২৫ ক্রোশ পূর্ব্বে। এই পথ দিয়া কুশী নদীর আর একটী উপনদী নেপালে আসিয়াছে।

৬। বল্লং বা বল্লঙ্কন পথ।

৭। ওয়ানাং পথ। এই সকল পথ দিয়া তিব্বতীয়গণ শীতকালে নেপালে গমনাগমন করে। পার্ব্বত্য পথগুলি অতিশয় কঠিন—অন্যের পক্ষে একরূপ দুর্গম বলিলেই হয়। অদ্ভুত দৈহিক শক্তি সম্পন্ন পাহাড়ীগণ ২।৩ মণ বোঝা লইয়া এই সমস্ত পথে অনায়াসে চলিয়া থাকে। বিধাতা এই পার্ব্বত্য জাতিকে পর্ব্বতের মতই কঠিন করিয়াছেন।

নেপালের প্রাদেশিক বৃত্তান্ত।

নেপাল রাজ্য কয়েকটী প্রদেশে বিভক্ত। পশ্চিম উপত্যকায় ঘর্ঘরা অববাহিকা প্রদেশে দ্বাবিংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য আছে। এই প্রদেশকে বাইশীরাজ্য বলে। প্রত্যেক রাজ্যে একজন করিয়া রাজা আছেন তন্মধ্যে জুমলা রাজ সর্ব্বপ্রধান। অপর ২১ টী রাজ্য তাঁহারই করদ। আবার জুমলা রাজ নেপালের অধীন সামন্ত রাজা।

মধ্য উপত্যকায় গণ্ডকী অববাহিকা প্রদেশে ২৪ জন জমিদার বা রাজা আছেন। ইঁহারাও জুমলা রাজের অধীন ছিলেন কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে নেপালরাজ স্বয়ং ইঁহাদের উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকেন। সকলেরই অস্ত্রধারী সৈনিক রাখিবার অধিকার আছে। এই প্রদেশেই গোর্খাদিগের বাসভূমি। বর্ত্তমান গোর্খাদিগের পূর্ব্বপুরুষ রাজপুতগণ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমানদিগের অত্যাচারে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া এই প্রদেশে আশ্রয়লাভ করে। গোর্খালী নামক স্থানে বাস করে বলিয়া তাহাদের নাম গোর্খা হইয়াছে। এই প্রদেশে পাল্পা নামক স্থানের ৫ মাইল দূরে তালসেন নগরে নেপালরাজের একটী প্রধান সৈন্যাবাস, একটি দরবার ও টাকশাল আছে। কেবল তাম্রমুদ্রা এই টাক্শালে প্রস্তুত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত পালপা নামক স্থানই এই প্রদেশের প্রধান স্থান। ইহা কাঠমণ্ডু হইতে ৬৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

পালপার সন্নিকটে পোখরা নামক অন্য একটী উপত্যকা আছে। এখানে অনেকগুলি পোখরা (পুকুর) আছে বলিয়া স্থানের নাম পোখরা হইয়াছে।

পোখরা নামক সহরে তাম্রপাত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় লোক সংখ্যা এখানে অধিক।

এই উপত্যকা কাঠমণ্ডু অপেক্ষাও বৃহৎ এবং প্রতি

বৎসর এখানে একটী মেলা বসে; তাহাতে ঐ প্রদেশের কৃষিজাত এবং অন্যান্য দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে। এই প্রদেশের স্থানে স্থানে ভীষণ জঙ্গল আছে। ঐ সকল জঙ্গলে নানাবিধ হিংস্র জন্তু এবং ভীষণাকৃতি গণ্ডার দেখিতে পাওয়া যায়।

কুশী নামক অন্য একটী প্রদেশ নেপাল রাজ্যে আছে। কুশী ও তাহার সপ্ত উপনদী সকলের তীরবর্ত্তী স্থানকে কুশী প্রদেশ বলে। ইহা গৌরী-শঙ্কর পর্ব্বতমালার দক্ষিণে অবস্থিত। এই প্রদেশের উত্তর সীমায় হাতীয়া, কুটী ও ওয়ানাং পথ আছে। মিচি নদী এবং সিমুলালিয়া পর্ব্বতমালা কুশী প্রদেশকে সিকিম হইতে বিভক্ত করিয়াছে। দারজিলিং এবং সিকিম হইতে লোক এই প্রদেশের ভিতর দিয়াই নেপালে যাতায়াত করে।

নেপাল নামটী সমগ্র দেশের নহে। যে উপত্যকায় কাঠমণ্ডু সহর অবস্থিত ঐ উপত্যকার নাম নেপাল। ইহা হইতেই সমগ্র রাজ্যের নামকরণ হইয়াছে। কাঠমণ্ডু উপত্যকা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৫০০ ফিট উর্দ্ধে অবস্থিত।

উৎপন্ন দ্রব্যাদি।

পার্ব্বত্য প্রদেশ হইলেও নেপাল রাজ্যে নানাবিধ ফলশস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। উপত্যকা ভূমিতে এবং ক্রমনিম্ন প্রদেশে অনেক প্রকার সুমিষ্ট ফল ও শাক সবজী প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ধান্য, গম, ভুট্টা, আলু, মুলা, লশুন প্রভৃতি নানাজাতীয় শস্যাদির চাষ হয়। রায়া নামক এক প্রকার বৃহদাকার শাক প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতেই দেখিতে পাওয়া যায়।

আখরোট, পীচ, গৌরী ফল, ন্যাসপাতি, তুতফল, প্রভৃতি সুমিষ্ট ফল বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রয় হয়। সহরের উপরে রেসিডেণ্ট সাহেবের কমলা লেবুর বাগান আছে। সুন্দরী, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠ, এলাচী বৃক্ষের সংখ্যাই এদেশে অধিক। এতদ্ব্যতীত নানাপ্রকার ফল, ওষধি, লতা, ছোট গাছ গাছড়া এবং বৃক্ষাদির নির্য্যাস হইতে নানাবিধ রং প্রস্তুত হইয়া থাকে। নেবার নামধেয় জাতিই এদেশের আদিম অধিবাসী। তাহারা সকলেই কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণেরাও আপনাদের ক্ষেত্রকর্ম্ম করে। এখানকার প্রায় লোকেরই ঘরে সুখ আছে অর্থাৎ ক্ষেতের ফসল, গাছের ফল, ঘরের দুগ্ধ অধিকাংশের ঘরেই আছে। শীত এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশেরই ফল শস্য নেপালে জন্মিয়া থাকে। তরাই প্রদেশের অরণ্য সমূহে শাল, শ্বেতশাল, পিয়াশাল, কৃষ্ণ কাষ্ঠ, খদির, শিশু বৃক্ষ, বট প্রভৃতি বৃক্ষ যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। পর্ব্বতের উপরে যে সমস্ত অরণ্য আছে তাহাতে দেবদারু, ঝাউ, শিরীশ, মান্দার, তালীশ পত্র প্রভৃতি বৃক্ষ আছে। ইহা ছাড়াও খোবানী, পেয়ারা, চা প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে। নেপালী চরস বিখ্যাত। জীয়া নামক এক প্রকার বৃক্ষপত্রের রস হইতে প্রস্তুত হয় এবং উক্ত বৃক্ষ হইতেই নেবারগণ সূত্র প্রস্তুত করিয়া এক প্রকার বস্ত্র বয়ন করে। ভূমি কর্ষণের জন্য লাঙ্গলের চলন এদেশে কম। একরূপ সরু লাঙ্গল আছে, তদ্ভিন্ন কৃষকগণ কায়িক পরিশ্রমেই ক্ষেত্রকে শস্য-বপনোপযোগী করিয়া লয়। পরিশ্রমে ইহারা অত্যন্ত পটু। নেবারী স্ত্রীলোকগণও ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিয়া থাকে।

পরিচ্ছদ।

পরিধানোপযোগী বস্ত্র নেবারীরা স্বহস্তেই প্রস্তুত করিয়া থাকে। নেবারী স্ত্রীলোক কার্পাস বস্ত্র বয়নে বিশেষ পটু। রাজ পরিবার এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকে যে সমস্ত বস্ত্রাদি ব্যবহার করেন তাহা চীন, ইউরোপ ও ভারতবর্ষ হইতে আনীত হয়। স্বদেশজাত মোটা পশমী ও সূত্র বস্ত্রের উপর তাঁহাদের বিশেষ শ্রদ্ধা নাই। বর্ত্তমান কালে নেপালীরা সূক্ষ্ম বিলাতী বস্ত্র ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। নেপালীদের মধ্যে গোর্খা জাতিই সুদৃশ্য বেশভূষা পরিধান করিয়া থাকে। পাজামা, চাপ্‌কান, কোমরে লম্বা কাপড়ের বেষ্টনী ও তৎ সঙ্গে চর্ম্মকোষবদ্ধ কুকরী নামক নেপাল দেশীয় বক্র ছোরা,

সংলগ্ন থাকে। মস্তকে মড়ার খুলীর মত টুপি, তদুপরি পাগড়ী। স্ত্রীলোকেরা পশ্চিমী ঘাঘরা পড়ে—অঙ্গবস্ত্র সকলেরই আছে কিন্তু মস্তক আবরণহীন। স্ত্রীলোকদের কেশের পরিপাট্য চমৎকার। মস্তকের পশ্চাদ্দেশে চীনাদের মত বেণী লম্বমান ও কতকাংশে চূড়ার মত খোঁপা—কিন্তু সম্মুখে ছোট করিয়া চুল ছাঁটা। ইহারা সম্মুখে না কাটিয়া পশ্চাতে সিঁতি কাটে। সাধারণ স্ত্রীলোকদের হাতে কাচের চুড়ী, গলায় পুতির মালা, কেহ বা অদ্ভুত গঠনের রৌপ্যালঙ্কার পরিধান করে। উচ্চ পরিবারের রমণীগণ মণিমুক্তাপ্রবলাদি জড়িত স্বর্ণালঙ্কার, মূল্যবান পাথরের মালা, পাজামা, জ্যাকেট, ওড়না, জুতা, মোজা প্রভৃতি সর্ব্বদা ব্যবহার করেন। নেপালে এ দেশের মত অবরোধপ্রথা নাই। ধনী দরিদ্র সকল স্ত্রীলোকেই অদ্ভুত বেশবিন্যাস করিয়া রাজপথে বাহির হয়। ইহারা ফুল বড়ই পসন্দ করে। বিবিধ বর্ণের নানাবিধ ফুলের অলঙ্কার প্রস্তুত করতঃ বক্ষে মস্তকে পরিয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশ বলিয়া এদেশে বস্ত্রের পরিপাট্য অধিক। এমন কি দরিদ্র ভিক্ষুকেরা পর্য্যন্ত শতছিন্ন ধূলি ধূসরিত বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত রাখে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এখানে স্নান কিম্বা বস্ত্র পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা কেহ বোধ করে না।

আচার ব্যবহার।

নেপাল রাজ্যে বর্ণাশ্রম বিভাগ আজিও চলিয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র জাতিবিভাগ থাকিলেও আহারাদি বিষয়ে তেমন পার্থক্য দেখা যায় না। ব্রাহ্মণেরা অনেকটা হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণদের অনুরূপ। 'শকড়ি'র বিচার নাই, রন্ধনশালায় বসিয়া আহার করিতে হইবে। এখানে সকল জাতিই অত্যন্ত মাংসাহার প্রিয়। দরিদ্র ব্যক্তিগণ শুষ্ক মৎস্য, পচা মূলা প্রভৃতি দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্য অতি আদরের সহিত ভক্ষণ করে।

নেপালে বহুবিবাহ এবং পত্যন্তর গ্রহণের নিয়ম প্রচলিত আছে। ধনী ব্যক্তিগণ একাধিক পত্নী রাখা সম্মানজনক বিবেচনা করেন। নেবার কন্যা ইচ্ছামত পত্যন্তর গ্রহণ করিয়া থাকে। বিধবাদের সম্বন্ধেও ঐ কথা। পাতিব্রত্য ধর্ম্ম এদেশে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এমন কি এক মাতার গর্ভজাত সন্তানদের ভিন্ন ভিন্ন পিতা দেখিতে পাওয়া যায়। নেবারদিগের অপেক্ষা গোর্খাদিগের বিবাহ বন্ধন কিম্বা সামাজিক রীতি দৃঢ়তর বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বে এদেশে সতীদাহ হইত। বিখ্যাত রাজমন্ত্রী মহারাজ জঙ্গ বাহাদুর এই প্রথা রহিত করেন।

ব্যভিচার দোষও রাজ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। তজ্জন্য কঠিন দণ্ডের ব্যবস্থা আছে। ব্রাহ্মণগণ অন্যান্য জাতিদিগের প্রণম্য এবং ভক্তির পাত্র। পিতা মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি গুরুজনদিগের পদস্পর্শ করিয়া রীতিমত প্রণাম করিতে হয়। গুরুতর অপরাধ করিলেও ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড হইবে না। অল্পকাল পূর্ব্বেও এদেশে বিলাসিতা ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমান কালে এই রাজ্যে ক্রমে ক্রমে সৌখীনতা ও বিলাসিতা প্রবেশ করিতেছে। বিদেশ হইতে আনীত সৌখীন দ্রব্যের উপর অধিক মাত্রায় শুল্ক নির্দ্ধারিত থাকিলেও দেশবাসী ক্রমে ক্রমে "সভ্য" হইতেছে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ব্রহ্মচারী হেমচন্দ্র।

স্ত্রীর পত্র

শ্রীচরণেষু

এই কি তোমার চিঠি লেখার ছিরি,
এই কি চিঠির ঢঙ্ ?
ভাব্‌চি কেবল দিই এ তোমায় ফিরি
এই বেগারের সঙ !
যাবার বেলা কত রকম করে
কয়েছিলাম হাত দুখানি ধরে'
নয়ন জলে ভিজিয়ে তোমার চাদর
"ওগো আমার প্রিয়
পত্র যেন বড় বড় দিয়ো।"

তিনটি পাতায় যাহার কথা শেষ,
তাহার ভালবাসা
বুঝতে বাকী নেইক' আমার লেশ—
মিথ্যে শুধু আশা !
বোঝা গেছে আমায় তোমার টান,
সোহাগ আদর সবই তোমার ভাণ !
দুখ-ভুলানো বুক-জুড়ানো মুখে
কপটতা আছে—
বুকের ভিতর এ যে আরো বাজে !

সত্যি বলি—ভেবে মরে যাই,
শঙ্কা আমার বড়,
নেইক আমার রূপ কি গুণ, তাই
হয়ত এমন কর'।
মুখে যখন গরব আমি করি,
বুকটা ওঠে ভয় ভাবনায় ভরি !
ঠিক যেন সে দড়ি-বাজীর খেলা
একটু অসাবধানে
পড়ে যেতে হবে মাটি পানে।

তবু যে গো দাবীর অন্ত নাই !
তুমি যেটুক্ দাও
আমি দি' তার অনেক বেশী, তাই
তুমি ফাঁকি দাও !
জান না কি—তোমার চিঠি পেলে
লজ্জা ও ভয় যায় আমারে ফেলে,
বাধেনাক' করতে প্রবঞ্চনা
গুরুজনের সাথে,
মিছে কথায় শতেক ছলনাতে !

খেতে বসে খাওয়াই নাহি হয় ;
থাকে বাড়ীর কায,
মাথা ধরার করে' অভিনয়
ঢুকি ঘরের মাঝ।
এত যে সব লুকোচুরি করি,
যাহার তরে অধর্ম্মে না ডরি'—
তিনটি পাতায় হয় তা' যদি শেষ,
কায কি চিঠি আসা ?
জাতই যাবে ঘুচবে না পিপাসা !

বড় বলে' বড়াই কোরো না—
বড় কোথায় বলো ?
পাঁচ মিনিটের ভরও সয়না যা'
বড় কি তাই হলো ?
দিনে রেতে পড়ে' হাজার বার
সময় তবু কাটেই নাক' আর—
আখরগুলি আঁখির আগে মোর
ইন্দ্রধনুর মত—
মিলায় দ্রুত জলকণায় শত !

বানান্ তোমায় ভাব্‌তে নাহি হয়,
সময়ও ঢের পাও,
গঞ্জনা বা ঠাট্টারও নাই ভয়,
তবু দুঃখ দাও !
কয়তে হয়না লোকের অন্বেষণ—

ডাকে দেবার আছেও নানা জন!
আসল কথা—নেইক কেবল মন!
তুমি আমায় তত
বাসনা ভাল, আমি বাসি যত।

তোমার তো আর আমার মত হেন
লুকোচুরি নাই—
তবু চিঠি হয় না বড় কেন?
জান্‌তে সেটা চাই!
আমি যদি হতাম তোমার মত,
দেখ্‌তে তোমায় লিখ্‌তাম চিঠি কত—
বড় বড়, দুতিন খানা করে,
সারা দিনেও যা'
পড়ে' তুমি উঠ্‌তে পার্‌তে না।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বেদনা

(গল্প)

(১)

চারিদিকে ভদ্রলোকের বাড়ী, মাঝখানে একটা খোলা মাঠ। পাড়ার যত ছেলে বিকালবেলা সেই মাঠে খেলা করে। যারা বড় তারা খেলে ফুটবল; তাদের চেয়ে ছোটরা খেলে ঘোড়াঘোড়া, চোরচোর; আবার তাদের চেয়ে যারা ছোট তাদের কোন নির্দ্দিষ্ট খেলা নাই। তারা কখনো লাফায়, কখনো ছোটে, কখনো হাসে, কখনো ঘাসের উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়ে। দ্বিতীয় শ্রেণীর খেলোয়াড়দের মধ্যে একটি ছেলেকে মাঝে মাঝে দেখা যায়। তার বয়স ছয় কি সাত হইবে। গায়ের রংটা ঠিক ফরসা বলা যায় না। মাথায় একমাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কোঁকড়ান চুল; চোখের তারা দুটো মিশমিশে কালো।

ছেলেটির প্রকৃতি এই বয়সেই কেমন একটু গম্ভীর। সচরাচর তাহাকে হাসিতে দেখা যায় না। সঙ্গীদের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া মেশে না। আবার এক একদিন হঠাৎ প্রফুল্ল হইয়া উঠে, অজস্র হাসিতে থাকে, খেলোয়াড়দের সঙ্গে গলাগলি মিলিয়া যায়। কোন কোন দিন এই আকস্মিক প্রফুল্লতার মাঝখানেই হঠাৎ খেলায় ভঙ্গ দিয়া গম্ভীর মুখে মাঠের একধারে বসিয়া পড়ে, সঙ্গীরা অনেক চেষ্টাতেও তাহাকে আর দলে টানিতে পারে না। দেখিলে মনে হয় ছেলেটির মনে কি একটা ভাবনা আছে এবং সে ভাবনায় বিষাদের অংশই বেশী।

একটি সমবয়স্কা মেয়ের সঙ্গে কখন কখন তাহাকে দেখা যায়। তার নাম ছায়া। দুজনে একস্থানে বসিয়া কথা কয়, কিন্তু এই বালিকার সঙ্গে খেলায় যোগ দিতে তার বড় আপত্তি।

একদিন ছায়া বলিল—"শঙ্কর, তুমি আমার সঙ্গে খেল্‌বে না কেন ভাই?"

শঙ্কর বলিল—"মেয়েমানুষের সঙ্গে আবার খেলা কি? পুরুষমানুষ পুরুষমানুষের সঙ্গে খেলবে; মেয়েমানুষ মেয়েমানুষের সঙ্গে খেলবে।"

ছায়া। আচ্ছা তোমার মা কবে ফিরে আসবে ভাই? এতদিন ত ফিরে আসবার কথা।

শঙ্কর। কি জানি? হয়তো আর ফিরে আসবেনা। বাবা বলে, হাঁসপাতালের সাহেবরা আরো তিন মাস

রাখতে চেয়েছে। আচ্ছা, তোর মা ত মরে গেছে, কিন্তু তুই ত কাঁদিস না।

ছায়া। কেঁদে আর কি হবে ভাই! পিসিমা বলে আমার মা ভুত হয়েছে, কাঁদলে নাকি আবার দিষ্টি পড়ে।

শঙ্কর। দূর দূর! আমাদের পণ্ডিত মশাই বলেন ভূত-টুত সব মিছে কথা। যারা সব ভীতু লোক, তারাই ভূতের নামে কেঁপে মরে। তুই ওকথা কখনো বিশ্বাস করিসনি।

ছায়া। আমি পিসিমাকে বলি না, কিন্তু আমার মায়ের জন্যে মন কেমন করে খুব। তোমার মা ফিরে এলে আমি তাকে খুব ভাল বাসবো কিন্তু। কিন্তু তোমার খুব মন কেমন করে মায়ের জন্যে?

শঙ্কর। আমার?—আমার কিচ্ছুই মন কেমন করে না। তুই মেয়েমানুষ, তুই কাঁদিস না; আর আমি পুরুষ মানুষ, কাঁদবো? আমার মা যদি মরে যায় তবুও কাঁদবো না।

ছায়া। কিন্তু আমার মা যখন মরে গেল, তখন সবাই বল্লে আমার মাকে হাঁসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে। আমি কিন্তু তেমন মেয়ে নই, আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, মরে গেলে কোথায় যায় ভাই?

সহসা শঙ্করের মুখ অন্ধকার হইয়া আসিল, কহিল—"সত্যি বলছিস তুই! তোর মা যখন মরে গেল, তখন সবাই—তাহ'লে আমার মাকেও হয়তো হাঁসপাতালের নাম করে—"

বলিতে বলিতে শঙ্কর কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া উঠিয়া বাড়ীর দিকে চলিল। ছায়া সেইখানে বসিয়া দেখিতে লাগিল শঙ্করের কোঁকড়ান চুলের গোছা তাহার ঘাড়ের কাছে দুলিতেছে।

(২)

ইহার পর কয়েকদিন খেলার মাঠে শঙ্করকে আর দেখা গেল না। ছায়াদের বাড়ীতেও তাহার যাতায়াত বন্ধ হইয়া গেল। ছায়া শঙ্করদের বাড়ী তাহাকে খুঁজিতে যায়, দেখা পায় না। যদি বা পায়, শঙ্কর তাহার সঙ্গে বেশী কথা কয় না। হতাশ হইয়া বালিকা ফিরিয়া আসে।

মাঠের চারিদিকে ঘিরিয়া যে সব বাড়ী দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের মধ্যে একখানা বাড়ী বেশ একটু ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। এই বাড়ীর অধিকারী মধুবাবু একজন উকীল। দোতালায় একটা জানালার ধারে মধুবাবুর পত্নী সরযূ রোজ বিকালে আসিয়া বসেন। তাঁহার হাতে কোন দিন এক খানা বই, কোন দিন কার্পেট দেখা যায়। কিন্তু ছেলেদের খেলা দেখার দিকেই যে তাঁর মন পড়িয়া আছে সেটা স্পষ্টই বোঝা যায়। তাঁর বয়স বোধ হয় পঁচিশ হইবে। মুখে একটা কোমল ভাব—দেখিলেই মনে হয় বড় স্নেহময়ী।

আজ কয়দিন ধরিয়া তিনি যেন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। আগেকার মত তেমন স্থির ভাবে জানালায় বসিয়া থাকেন না। মধ্যে মধ্যে হঠাৎ জানালার কাছে আসিয়া উৎসুক নেত্রে সমস্ত মাঠটা একবার খুঁজিয়া লন, তারপর হতাশ ভাবে গৃহে চলিয়া যান। যেন এই জানালায় আসিতে তাঁহার ভাল লাগে না, তবুও বারবার আসিতে হয়।

কত ছেলে মাঠে খেলা করিতেছে। এদের সকলের মুখেই হাসি। কিন্তু এদের হাসি কলরব সরযূর হৃদয়কে টানিয়া রাখিতে পারিতেছে না। হয়তো এই উৎকণ্ঠিতা রমণীর সমস্ত চিন্তা খেলার মাঠে অনুপস্থিত সেই হতভাগা ছেলেটার প্রতি একমুখী হইয়া পড়িয়া আছে—কেন সে আসে না? তার কি কোন অসুখ হ'ল? হয়'তো সেই বিষণ্ণ ছেলেটার বিষাদের মাত্রা আরো বেড়ে গেছে।

হঠাৎ একদিন সরযূ দেখিলেন, শঙ্কর মাঠে আসিয়াছে। তাহার চুলগুলো আগেকার চেয়ে উস্কোখুস্কো, মুখে কালি পড়িয়াছে। পরিচ্ছদের মধ্যে একখানি মাত্র মলিন ধুতি, তাহাও আবার ছিন্ন। সঙ্গীরা তাহাকে খেলিতে ডাকিতেছে, সে কিছুতেই খেলিবে না।

সরযূর ঝি আসিয়া ডাকিল—"ও খোকা, আমাদের বাড়ীতে এস না। মা তোমাকে ডাকছেন।"

শঙ্কর চমকিয়া উঠিল—"কোথায় মা ?"

ঝি আঙ্গুল বাড়াইয়া সরযূর জানালার দিকে দেখাইয়া দিল। সেখানে একখানি হাসিমাখা মুখ এবং দুটি স্নেহ কোমল চোখ নীরবে আহ্বান করিতেছে।

শঙ্কর গম্ভীর ভাবে কহিল—"আমি যাব না।"—এই বলিয়া সত্বর পদে বাড়ী চলিয়া গেল।

(৩)

একদিন সকালবেলা হইতে ঘনঘটা করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল। দুপুর বেলায় কাছাকাছি মাঠের চারিদিকে একহাঁটু জল দাঁড়াইয়া মাঝখানে একটা দ্বীপের সৃষ্টি করিল। ছেলেরা কেহই আজ ঘর হইতে বাহির হয় নাই। শঙ্কর কিন্তু বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মেঘলা দিনের কি এক অজানা আনন্দ আজ তাহাকে ঘরে থাকিতে দেয় নাই। প্রকাণ্ড এক ছাতা মাথায় দিয়া ছপ্ ছপ্ শব্দে একহাঁটু জল ভাঙ্গিয়া তাহার সঙ্গীদের সাড়া লইয়া বেড়াইতেছে—এই হারু! ঐ সুশী! ওরে রাখালে!

সঙ্গীদের প্রবল ইচ্ছা তাহারাও একটা ছাতা ঘাড়ে বাহির হইয়া পড়ে। কিন্তু হায়, তাহাদের মা বাপ যে বড়ই কঠিন।

কেহই বাহির হইল না দেখিয়া শঙ্কর ছায়াদের বাড়ী যাইবার যোগাড় করিতেছে, এমন সময় সরযূ জানালায় আসিয়া ডাক দিলেন—"ও খোকা, ও খোকা, শুনে যাও, একবারটি শুনে যাও, লক্ষীটি।"

কে জানে কেন, আজ শঙ্কর এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। সরযূ নীচে নামিয়া তাহাকে কোলে লইয়া দোতলায় উঠিয়া গেলেন। শঙ্কর কান্না-কাটি করিবার ছেলে নয়। সে কোন কথা না কহিয়া সরযূর স্নেহের স্রোতে আপনাকে ছাড়িয়া দিল।

দোতলায় লইয়া গিয়া সরযূ আঁচলে তাহার ভিজা চুল মুছাইয়া দিতে দিতে কহিলেন—"এমন করে বৃষ্টিতে ভিজলে কেন বাবা ?"

শঙ্কর কহিল—"তোমার কাপড়ে আমার গায়ের কাদা লেগেছে।"

সরযূ। তা লাগুক। চল তোমার পা ধুইয়ে দিই গে।

সরযূ তাহার হাত পা ধুয়াইয়া মুছাইয়া, ছোট একখানি কোঁচান কাপড় পরাইয়া দিলেন। এক রেকাব জল খাবার আনিয়া খাওয়াইলেন। আজ শঙ্কর কোন আপত্তি করিল না।

সরযূ। তুমি বৃষ্টিতে ভিজ্‌লে তোমাকে কেউ বকে না ?

শঙ্কর মাথা নাড়িয়া কহিল—"না।"

সরযূ। কেন ? তোমার মা ?

শঙ্কর। আমার মা কোথায় তারই ঠিক নেই। আগে আগে বাবা বলতো মা হাঁসপাতালে। সেদিন রাত্তিরে আকাশে একটা তারা দেখিয়ে বল্লে, মা ঐ তারায় গেছে। তারাগুলো খুব বড়, আমরা অনেক দূরে আছি কিনা তাই ছোট মনে হয়। আমি যদি তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে যাই, তুমি আমায় ছোট্ট মনে করবে। বাবা বলে, আমরাও তারায় যাবো, মাকে দেখতে।

সরযূ। তোমার বাবার কথা শুনো না। তোমার মা এখানেই আছেন। তোমার মার জন্যে খুব মন কেমন করে, না ?

শঙ্কর। ছায়া মেয়েমানুষ,—সে ঐ বোসেদের বাড়ীর মেয়ে,—তার মা নেই, তবু মন কেমন করে না। আমি পুরুষ মানুষ, আমার মন কেমন কর্ব্বে ? আমার কিছুই মন কেমন করে না। কিন্তু মা এখানেই আছে ? সত্যি বলছ তুমি ? একবার তা হলে দেখি। অনেক দিন দেখিনি কি না, তাই একবার দেখতে ইচ্ছে করে বড্ড, আর কিছু না। তারপরে আবার যদি অনেকদিন দেখতে না পাই, তা হলেও কোন কষ্ট হবে না।

সরযূ। তুমি কি এক্ষুণি তোমার মাকে দেখতে চাও ?

শঙ্কর। না, এক্ষুণি নয়। কিন্তু আজকেই। এই সন্ধ্যে হবার, অন্ধকার হবার আগেই, যদি দিনের

আলো থাক্‌তে থাক্‌তে,—কেননা অন্ধকারে ত মায়ের মুখ ভাল করে দেখা যাবে না। আবার যদি আকাশে মেঘ করে আসে, তা হলে বিকেলবেলা হবার আগেই। সত্যি কথা বল্‌ছ ? এক্ষুণি দেখাবে আমার মাকে তুমি ? তা হ'লে বিষ্টিতে কক্‌খনো ভিজব না, তোমার কাছে সমস্তদিন চুপটি করে' বসে' থাকবো, তোমাদের বাড়ীতে যদি ছোট ছেলে মেয়ে থাকে, তাদের কোলে করে' বেড়িয়ে আসবো—সেই দীঘির ধারে, গঙ্গার ধারে, আর তুমি যেখানে বল্‌বে সেখানে।

সরযূ আর থাকিতে পারিলেন না। দুই হাতে তাহাকে বুকে চাপিয়া সজল চক্ষে কহিলেন—"এই যে, বাবা, আমিই তোমার মা। তুমি আমাকে চিনতে পার নি ?"

শঙ্কর ক্ষণকাল সরযূর মুখপানে তাকাইয়া কহিল—"তুমি যদি আমার মা, তবে আমাদের বাড়ী থাক না কেন ?"

সরযূ এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না। কহিলেন—"আমি নাই বা গেলুম, তুমি রোজ আমার কাছে এস। কেমন, আসবে ত ?"

সন্দিগ্ধ শঙ্কর কোন উত্তর দিল না।

তখন সরযূ বাক্স হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া শঙ্করের হাতে দিলেন এবং তাহার পূর্ব্ব পরিহিত ভিজা কাপড় খানি উত্তমরূপে নিঙড়াইয়া দিয়া কহিলেন—"তবে আজ বাড়ী যাও বাবা। কিন্তু কাল সকালেই আবার আসা চাই। মনে থাকবে ত ?"

শঙ্কর কোন উত্তর না দিয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

(৪)

পরদিন সকালেই শঙ্কর আসিল। কহিল—"মিথ্যে কথা, তোমার সব মিথ্যে কথা।"

এই বলিয়া টাকাটি এবং সরযূর প্রদত্ত কাপড় খানি খাটের উপর রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

সরযূ নির্ব্বাক হইয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর ধীরে ধীরে খাটের উপর শুইয়া পড়িলেন।

কিছুক্ষণ পরে ডাকিলেন—"দুলি, দুলি !"

সরযূর ঝি দুর্ল্লভী আসিয়া কহিল—"কেন মা !"

সরযূ। ঐ টাকাটা আর কাপড়খানা নিয়ে যা। রাস্তায় প্রথম যে ভিকিরী দেখতে পাবি, তাকেই দিবি।

দুর্ল্লভী। মা কি কোন বর্ত্ত টর্ত্ত করেছেন ?

সরযূ বিরক্ত হইয়া কহিলেন—"বেশী কথা ক'স কেন দুলি ! যা বলি তাই কর।"

দুর্ল্লভী চলিয়া গেল।

ফিরিয়া আসিয়া দুর্ল্লভী বলিতে লাগিল—"মাগো, কাণা ভিকিরী মুখপোড়া চোখের মাথা একেবারেই খেয়েছে ! আমি বিধবা মানুষ, আমায় বলে কি না ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক। আমি বলি—না রে মিন্সে আমায় আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে হবে না। আমার মা ঠাকুরুণকে আশীর্ব্বাদ কর,যেন শীগ্‌গির তাঁর কোলে একটি সোণার পুঁতুল খোকা হয়।"

শ্রীক্ষেত্রমোহন সেন।

সু-সঙ্গ

(সাদী হইতে)

হামাম হইতে মোর বন্ধু একজন
দিলেন মৃত্তিকা আনি—গন্ধ অতুলন।
জিজ্ঞাসিনু—"তুমি কিগো আতর কস্তুরী ?
সুবাসে লয়েছ মোর মন-প্রাণ হরি !"

বিনয়ে মৃত্তিকা মোরে করিল উত্তর—
"সামান্য মৃত্তিকা ;—নহি কস্তুরী, আতর ;
বহুকাল রহিয়াছি কুসুমের সঙ্গে,
সুসঙ্গ-সৌরভ তাই লেগে আছে অঙ্গে।"

শ্রীনলিনীকুমার চক্রবর্ত্তী।

নচিকেতা

প্রথম অধ্যায়

প্রথম বল্লী।

কঠোপনিষদে গোতম-বংশীয় বাজশ্রবস নামে এক মুনির কথা আছে। তাঁহার আর এক নাম ঔদ্দালকি আরুণি। ইঁহার পুত্রের নাম নচিকেতা। বাজশ্রবস মুনি দেবলোক-প্রাপ্তিকর একটি কাম্য যজ্ঞ করিয়া ঋত্বিকগণকে তাঁহার সর্ব্বস্ব দক্ষিণা প্রদান করেন। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বস্ব ছিল—কতকগুলি গরু। গরুগুলিও এত বৃদ্ধ হইয়াছিল যে তাহাদের আর বৎস-সম্ভাবনা ছিলনা। তাহাদের দুগ্ধ দিবারও শক্তি ছিলনা। তৃণভক্ষণ জলপান করাও তাহাদের শেষ হইয়াছিল। ঋত্বিকদিগের সহিত গৃহে গমন কালেই সম্ভবতঃ তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

এইরূপ গাভী-দান করিতে দেখিয়া, কুমার নচিকেতা শ্রদ্ধাবিষ্ট চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন যে এরূপ দক্ষিণা-দানকারী আনন্দহীন লোকে গমন করেন। ইহা ভাবিয়া তাঁহার মনে পিতার জন্য অত্যন্ত কষ্ট হইল। তিনি পিতার যুবক পুত্র; তাঁহাকে যদি পিতা কাহাকেও দান করেন, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা গ্রহীতার অনেক প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে। কিন্তু গাভীদিগের দ্বারা গ্রহীতার কোন উপকার হইবে না। ইহাও বোধ হয় তাঁহার মনে হইল যে, তাঁহাকে দান না করিলে পিতার সর্ব্বস্বদানও প্রকৃত-রূপে সিদ্ধ হইবে না।

এইরূপ চিন্তা করিয়া নচিকেতা পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমায় কাহাকে দিবেন?" উত্তর না পাইয়া দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু তখনও কোনও উত্তর না পাওয়ায় তৃতীয়বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন বাজশ্রবস মুনি ক্রোধযুক্ত হইয়া উত্তর দিলেন, "তোমায় যমকে প্রদান করিব।" এই উত্তর শ্রবণ করিয়া নচিকেতা বুঝিতে পারিলেন যে পিতা তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু সত্যবাদী মুনির মুখ হইতে যে বাক্য বাহির হইয়াছে, তাহার কখনই অন্যথা হইবে না। পিতার মুখ হইতে এইরূপ অপ্রত্যাশিত বাণী শ্রবণ করিয়া নচিকেতা প্রথম মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু অত্যন্ত ধীরবুদ্ধি বলিয়া মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁহার মনে এইরূপ ভাব উদয় হইল যে, "আমিই কেবল একা মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছি না; আমার পূর্ব্বে বহুলোক মরিয়াছে এবং পরেও বহুলোক মরিবে। অতএব আমি ইহাদের মধ্যেবর্ত্তী হইতেছি মাত্র। যমলোকে যাইয়া আমাকে যমের পরিচর্য্যা করিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার কিরূপ প্রয়োজনীয় কার্য্য আছে তাহা ত জানি না।"

ইহার পর যখন তাঁহাকে অগ্নি প্রবেশ করিয়া যমালয়ে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল, তখন তিনি আপনাকে সংযত করিবার জন্য এইরূপে প্রবোধ দিলেন—"দেখ, শস্যকে অগ্নি যেমন পাক করেন, সেইরূপ মর্ত্ত্য মনুষ্যকেও পাক করেন। পুনরায় শস্যের মতই মনুষ্য উদ্ভূত হয়; ইহাই পূর্ব্বাপর হইয়া আসিতেছে।"

পূর্ব্বকালে দেবতাদিগকে কেহ কোন দ্রব্য প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে সেই দ্রব্য অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে হইত। অগ্নি সেই দ্রব্য উদ্দিষ্ট দেবতার নিকট বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। বাজশ্রবস্ মুনিও যমকে নিজ পুত্র প্রদান করিবার জন্য অগ্নির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈশ্বানর অগ্নি নচিকেতাকে লইয়া যমগৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "হে বৈবস্বত! জল আনয়ন করিয়া গৃহপ্রবিষ্ট অতিথি ব্রাহ্মণকে শান্তি প্রদান কর।"

যে সময়ে নচিকেতা যমভবনে উপনীত হইলেন, যম তখন গৃহে ছিলেন না। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে তাঁহার তিন রাত্রি কাটিয়া গেল। নচিকেতা সেই তিন রাত্রি কিছুই ভক্ষণ করিলেন না; কারণ যমের অনুমতি বিনা কিরূপে আহার করিতে পারেন? গৃহে আসিয়া

যম তাঁহাকে তিন দিন উপবাসী দেখিলেন। তাহাতে তিনি বড় লজ্জিত ও ভীত হইলেন। কারণ ব্রাহ্মণ যাঁহার গৃহে উপবাসী থাকেন, তাঁহার আশা, ভরসা, সত্য, যজ্ঞ ও পরোপকার জনিত ফল, পুত্র, পশু প্রভৃতি নষ্ট হয়। তখন বৈবস্বত তাঁহার নিমিত্ত জল আনয়ন করিয়া তাঁহাকে শান্তি প্রদান করিলেন।

তৎপরে যম এই বলিয়া তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করিতে চেষ্টা করিলেন—"হে ব্রাহ্মণ! আপনাকে নমস্কার; আমার যেন মঙ্গল হয়। আপনি আমার গৃহে তিন রাত্রি নমস্য অতিথি হইয়াও অনশনে বাস করিয়াছেন। সেই জন্য আমার নিকট তিনটি বর প্রার্থনা করুন।"

নচিকেতা যমের শাস্ত্রসম্মত বাক্যে বর গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন। তিনি তিনটি বরের মধ্যে প্রথম বরে এইরূপ প্রার্থনা করিলেন—"হে মৃত্যো, আমায় এই বর দিন, যাহাতে পিতা গৌতম শান্ত ও সুমনা এবং আমার প্রতি ক্রোধশূন্য হন। আপনার দ্বারা প্রেরিত হইলে আমার সহিত যেন প্রীত হইয়া কথাবার্ত্তা কহেন।"

যম বলিলেন, "আপনি আমার দ্বারা প্রেরিত হইলে, ঔদ্দালকি আরুণি পূর্ব্বে যেরূপ আপনার প্রতি প্রীতিযুক্ত ছিলেন, সেই রূপই প্রীতিযুক্ত হইবেন। তিনি রাত্রে সুখে শায়িত হইলে আপনি যখন মৃত্যুমুখ হইতে প্রমুক্ত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিবেন, তখন তিনি আপনাকে বীতক্রোধ হইয়া দর্শন করিবেন।"

বৈদিক যুগে যমলোককে পিতৃলোক বলা হইত। যাহারা যজ্ঞাদি সুকার্য্য করিতেন তাঁহারাই মৃত্যুর পর যমলোকে গমন করিয়া দেবতাদিগের মত সুখভোগ করিতেন। ঋগ্বেদে যমলোকের সুখভোগের মধ্যে সোম (অর্থাৎ অমৃত) পান এবং বংশীধ্বনিযুক্ত গীতি সম্ভোগ বর্ণিত হইয়াছে। (১) কিন্তু যে সকল লোক যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিত না, যাহারা পাপ কার্য্য করিত, তাহারা মৃত্যুর পর মৃত্তিকার নিম্নে—অন্ধকারময় গর্ত্তে নির্ঋতি নামক দেবতার অধীন হইত। আকাশের নক্ষত্রলোকই যমলোক; অতএব যাঁহারা যমলোকে গমন করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাত্রে পৃথিবী-লোকে আগমন করত আপনার জনে স্বপ্নে দেখা দেন এইরূপ বিশ্বাস ছিল। সেই জন্য নচিকেতা রাত্রে নিদ্রিত পিতাকে যমের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া স্বপ্নে দেখা দিতে পারিবেন, এই বর গ্রহণ করিলেন।

ইহার পর নচিকেতা দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিলে যে, "স্বর্গলোকে কোন রূপ ভয় নাই; সেখানে আপনি (অর্থাৎ মৃত্যু) নাই; তথায় কেহ বার্দ্ধক্য দ্বারা ভীত হয় না। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা উভয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া এবং শোক অতিক্রম করিয়া স্বর্গবাসিগণ স্বর্গলোকে আনন্দ করেন। হে মৃত্যো!—আপনিই স্বর্গপ্রাপ্তিকর অগ্নিকে জানেন; শ্রদ্ধাযুক্ত আমাকে

(১) যস্মিন্। বৃক্ষে। সুপলাশে। দেবৈঃ। সংপিবতে। যমঃ। অত্র। নঃ। বিশ্‌পতিঃ। পিতা। পুরাণান্। অনু। বেনতি॥ ১০।১৩৫।১

অর্থঃ—যম দেবতাদিগের সহিত যে সুপর্ণ-যুক্ত বৃক্ষতলে (সোম) পান করেন, এই স্থানে পূর্ব্বপুরুষদিগের পশ্চাৎ (যাইবার জন্য) আমাদিগের পালক ও বিশ্‌পতি (অর্থাৎ রাজা) কামনা করিতেছেন।

ইদং। যমস্য। সদনং। দেবমানং। যৎ। উচ্যতে।
ইয়ং। অস্য। ধম্যতে। নাড়ীঃ। অয়ং। গীর্ভিঃ। পরিস্কৃতঃ।
১০।১৩৫।৭

অর্থ:—এই যমের আলয় যাহাকে দেবলোক বলা হয়। এই তাঁর বংশী বাজিতেছে; ইনি গীত সকলের দ্বারা সেবিত হন।

মন্তব্য:—রমেশ বাবুর মতে অর্থ:—"এই দেখিতেছি যমের বাটী; লোকে কহে; ইহা দেবতাদিগের কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হই-য়াছে। এই দেখিতেছি, ইহার সর্ব্বাঙ্গে শিরা নির্গত হইয়া আছে; এই দেখিতেছি লোকে ইঁহাকে স্তব করিতেছে।" ইহা সায়ন-সম্মত অর্থ নহে। মূলে নাড়ীঃ শব্দ একবচনান্ত এবং উহার অর্থ নালী বা নল; ধম্যতে অর্থ নলে ফুঁ দেওয়া। অতএব অর্থ হয়, নলে ফুঁ দিয়া বাজান। রমেশ বাবুর মতে "যমের সর্ব্বাঙ্গে শিরা নির্গত হইয়া আছে" ইহার পরেই রহিয়াছে যে যম গানের দ্বারা সেবিত হন। বোধ করি রমেশ বাবু পৌরাণিক যুগের ভীষণ যমমূর্ত্তি বৈদিক যুগের ধারণা মনে করিয়াছিলেন। ইহা কিন্তু যথার্থ নহে।

তাহা বলুন। স্বর্গলোক সকল অমৃতত্ব ভোগ করে।" যম বলিলেন, "হে নচিকেত! যে অগ্নির কথা আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন তাহা আমি জানি। এই স্বর্গ-বিধায়ক অগ্নির কথা আপনাকে বলিতেছি, মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করুন; ইঁহাকে অনন্ত লোক ও প্রতিষ্ঠা প্রদানকারী, এবং গোপনীয় স্থানে অবস্থিত বলিয়া জানিবেন।"

যম নচিকেতাকে সেই শ্রেষ্ঠ অগ্নির বিষয় বলিলেন এবং যেরূপ ইষ্টক, যত সংখ্যক ও যেরূপে রচনা করিয়া তাহার বেদী নির্ম্মাণ করিতে হয় সে সমস্তই বলিলেন। নচিকেতাও তাঁহার সকল কথাই যথাযথ ভাবে পুনর্ব্বার বলিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাকে শ্রুতিধর দেখিয়া মহাত্মা যম প্রীত ও তুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার বলিলেন— "অদ্যই আমি আপনাকে আরও বর দিতেছি। এই অগ্নি আপনারই নাম দ্বারা প্রসিদ্ধ হইবেন। অনেক রূপবিশিষ্টা এই তরণি (১) গ্রহণ করুন। ইহার দ্বারা কিরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিতেছি। নাচিকেত অগ্নি তিন প্রকার। এই তিনের দ্বারা যোগপ্রাপ্ত হইলে তিন প্রকার কর্ম্মী জন্ম ও মৃত্যু তরিয়া যান। ব্রহ্ম হইতে এই অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছেন। সেই স্তবার্হ দেবকে জানিয়া ও দেখিয়া আপনি সম্পূর্ণরূপে শান্তি প্রাপ্ত হউন। ত্রি নাচিকেত অগ্নি তিন প্রকার। ইহা জানিয়া যে জ্ঞানী নাচিকেত অগ্নিকে এইরূপে চয়ন করেন, তিনি মৃত্যুপাশ সকল কাটিয়া, শোকশূন্য হইয়া, স্বর্গলোকে আনন্দে বাস করেন।"

বৈদিক যুগে তিন প্রকার অগ্নির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (২) সেকালে ঋষিগণ মনে করিতেন, এক-এর মনে কামনার উদয়ে সৃষ্টি আরম্ভ হয়। জল প্রথম উৎপন্ন হইয়া যজ্ঞ পুরুষকে ধারণ করেন।

ত্রিঃ। অস্য। তা। পরমা। সন্তি। সত্যা।
স্পার্হা। দেবস্য। জনিমানি। অগ্নেঃ।
অনন্তে। অন্তঃ। পরিবীতঃ। আ। অগাৎ।
শুচিঃ। শুক্রঃ। অর্যঃ। রোরুচানঃ॥ ৪।১।৭
(ঋগ্বেদ)

এই অগ্নিদেবের পরম, সত্য, স্পৃহনীয় তিন জন্ম আছে। অনন্তের মধ্যে বেষ্টিত, শুচি (অর্থাৎ পাবক), শুক্র (অর্থাৎ উজ্জ্বল) দীপ্যমান হইয়া স্বামী আসুন।

ত্বং। বিশ্বে। অমৃত। জায়মানম্।
শিশুং। ন। দেবাঃ। অভি। সং। নবন্তে।
তব। ক্রতুভিঃ। অমৃতত্বং। আয়ন্
বৈশ্বানর। যৎ। পিত্রোঃ। অদীদে॥ ৬।৭।৪
(ঋগ্বেদ)

হে অমৃত! বিশ্বদেবগণ শিশুর মত জায়মান তোমার অভিমুখে স্তব করেন। হে বৈশ্বানর! তোমার যজ্ঞকর্ম্ম সকল দ্বারা অমৃতত্ব পাইয়া যখন (তাঁহারা) পিতৃলোকদ্বয়ে দীপ্যমান হইয়াছেন।

[সায়ন পিত্রোঃ অর্থে 'পালয়িত্রো র্দ্যাবাপৃথিব্যোর্মধ্যে' করিয়াছেন। কিন্তু দ্যাবা পৃথিবী মাতৃলোক। পিত্রোঃ অর্থে দুইটী পিতৃলোকের। তিনটী দৈবলোককে বৈদিক যুগে তিন পিতৃ-লোক বলা হইত। তাহাদের নাম যমলোক, স্বর্লোক ও নাক-লোক (বা ত্রিনাক)। পিতৃগণ মৃত্যুর পর যমলোকে গমন করিতেন। বিশ্বদেবগণ স্বর্লোকে থাকেন।]

বিদ্ম। তে। অগ্নে। ত্রেধা। ত্রয়াণি। বিদ্ম। তে
ধাম। বিভৃতা। পুরুত্রা।
তে। নাম। পরমং। গুহা। যৎ। বিদ্ম। তং
উৎসং। যতঃ। আজগন্থ॥ ১০।৪৫।২
(ঋগ্বেদ)

হে অগ্নে! তোমার তিন প্রকারে বিভক্ত তিন (মূর্ত্তি) আমরা জানি; তোমার ধাম বহুস্থানে রহিয়াছে আমরা জানি। আমরা তোমার শ্রেষ্ঠ নাম যাহা গোপনীয় তাহা জানি। যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছ সেই উৎসকে আমরা জানি।

সমুদ্রে। ত্বা। নৃমনাঃ। অপ্সু। অন্তঃ
নৃচক্ষাঃ। ঈধে। দিবঃ। অগ্নে। ঊধন্।
তৃতীয়ে। ত্বা। রজসি। তস্থিবাংসম্
অপাং। উপস্থে। মহিষাঃ। অবর্দ্ধন॥ ১০।৪৫।৩

(১) মূলে শৃঙ্কা শব্দ আছে। শঙ্কর ভাষ্যে ইহার অর্থ শব্দবতীমালা। কিন্তু বেদে অগ্নিকে তরণি বলা হইয়াছে।

(২) অগ্নি। ধিয়া। সঃ। চেততি। কেতুঃ। যজ্ঞস্য। পূর্ব্যঃ।
অর্থং। হি। অস্য। তরণি॥ ৩।১১।৩
(ঋগ্বেদ)

অগ্নি যজ্ঞের প্রথম কেতু; তিনি ধী দ্বারা অর্থ অবগত হন ও ইহার (অর্থাৎ যজ্ঞের তরণি।

তাঁহার মন হইতে যে অগ্নি উৎপন্ন তাহাই চন্দ্রমণ্ডল ; এবং তাঁহার দৃষ্টি হইতে সূর্য্যস্থ বৈশ্বানর অগ্নি উৎপন্ন। চন্দ্রমণ্ডলস্থিত সোমই যজ্ঞপুরুষ ; তিনিই ব্রহ্মা। ব্রহ্মের মন হইতে যে অগ্নি উৎপন্ন হন, তিনিই আদি অগ্নি ; (১) তাঁহাকে আমরা ব্রহ্মাগ্নি বলিতে পারি। এই অগ্নি চন্দ্রের মণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে, বৈদিক ঋষিগণ এইরূপ কল্পনা করিতেন। সূর্য্যে যে অগ্নি বর্ত্তমান তাহা বৈশ্বানর অগ্নি। ইঁহাকে আদিত্যাগ্নি বা ক্ষত্রাগ্নি বলিতে পারা যায়। বিদ্যুৎ তৃতীয় অগ্নি। ইঁহাকে আমরা রুদ্রাগ্নি বা বৈশ্যাগ্নি বলিতে পারি। রুদ্রপুত্র মরুৎগণ দেবতাদিগের মধ্যে বৈশ্যরূপে কল্পিত হইতেন। আদিত্যগণ ক্ষত্র বলিয়া অভিহিত হইতেন। আর নক্ষত্রগণই দেব বা ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইতেন ; কারণ তাঁহারা ন ক্ষত্র অর্থাৎ ক্ষত্র নহেন। ব্রহ্মাগ্নির বিশেষত্ব এই যে উহা উগ্র নহে ; তীব্রতেজশূন্য বলিয়া অত্যন্ত সুখকর। চন্দ্র ও নক্ষত্রদিগের জ্যোতিই এইরূপ। ক্ষত্রাগ্নি কিন্তু উগ্র ; যেমন সূর্য্যের জ্যোতি। বিদ্যুৎ-অগ্নি তীব্র, চক্ষু ঝলসিয়া দেয় ; কিন্তু উহা ক্ষণস্থায়ী।

নচিকেতাকে স্বর্গপ্রাপ্তিকর অগ্নির বিষয় শিক্ষা দিয়া যম তাঁহাকে তৃতীয় বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তখন নচিকেতা বলিলেন—"মনুষ্য প্রেত হইলে, কেহ কেহ বলেন সে থাকে, কেহ কেহ বলেন সে থাকেনা। এই সংশয় যাহাতে আমার দূর হয় এরূপ জ্ঞান আমি আপনার দ্বারা উপদিষ্ট হইতে ইচ্ছা করি। ইহাই আমার তৃতীয় বর।"

নচিকেতার প্রশ্ন হইতে বুঝা যাইতেছে যে সেকালে দুইটি মত প্রচলিত ছিল। এক মতে, পরলোকে (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠলোকে) গমন করিলে জীবের আমিত্ব লোপ পায় ; অপর মতে, তাহার আমিত্ব বর্ত্তমান থাকে। এই দুই মতের মধ্যে কোনটি সত্য তাহাই নচিকেতা জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথায় বলিতে গেলে, নুনের পুতুল সমুদ্রের জল মাপতে গেলে জলে গলে' যায়, সে থাকে না—অর্থাৎ তাহার ব্যক্তিত্ব থাকে না। এখানে প্রেত শব্দের অর্থ মৃত হইয়া যমলোকে গমন নহে—পরম লোকে গমন বুঝাইতেছে। পরে ঋষি তাহা উল্লেখ করিয়াছেন দেখান যাইবে।

যম বলিলেন—"দেবগণও এই বিষয়ে সংশয়যুক্ত হইয়াছিলেন। এই বিষয়টি সুজ্ঞেয় নহে ; এই ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম। হে নচিকেত! অন্য বর প্রার্থনা করুন। আমাকে উপরোধ করিবেন না। আমাকে এই বর-দান হইতে মুক্ত করুন!" ইহার উত্তরে নচিকেতা বলিলেন—"পূর্ব্বে-দেবগণও এই বিষয়ে সংশয়যুক্ত

হে অগ্নে! তোমাকে জল সকলের মধ্যে সমুদ্রে নেতার মন প্রদীপ্ত করিয়াছেন ; নেতার দৃষ্টি দিব্যলোকের ঊধে (অর্থাৎ স্তনে) প্রদীপ্ত করিয়াছেন। তৃতীয় রজলোকে অবস্থিত তোমাকে অপ্‌ সকলের ক্রোড়ে পূজ্য দেবগণ বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

[নৃমনাঃ অর্থে সায়ন নৃষু মনুষ্যেষু অনুগ্রাহকতয়া সক্তচিত্তো বরুণঃ করিয়াছেন। বহুস্থলে সায়ন নৃ অর্থে নেতা করিয়াছেন। অতএব নৃমনাঃ অর্থে নেতার মন বা যাহাতে নেতার মন আছে তাহাকে নৃমনাঃ বলি। পুরুষ সূক্তে দেখিতে পাই চন্দ্রমা পুরুষের মন হইতে উৎপন্ন। যথা—

চন্দ্রমাঃ। মনসঃ। জাতঃ। ১০।৯০।১৩

অতএব চন্দ্রে যে অগ্নি আছেন তাহা পুরুষের মন হইতে উৎপন্ন। নৃচক্ষাঃ অর্থে সায়ন নৃনাং প্রত্যক্ষেণ দৃষ্ট আদিত্যঃ করিয়াছেন। পুরুষ সূক্তে আছে—

চক্ষোঃ। সূর্য্যঃ। অজায়ত।১০।৯০।১৩

বেদের অন্য স্থলে পরমপুরুষ সূর্য্যকে রথন্তর ছন্দে দর্শন করিয়াছিলেন, দেখিতে পাই।

রথমৃতরে। সূর্য্যং। পরি। অপশ্যৎ। ১।১৬৪।২৫

(পুরুষ) রথমৃতর ছন্দে সূর্য্যকে সম্যক্ দর্শন করিয়াছিলেন।

অতএব পুরুষের দৃষ্টি হইতে সূর্য্য প্রদীপ্ত হইয়াছেন বা চক্ষু হইতে সূর্য্য জন্মিয়াছেন এই বিশ্বাস ছিল। তৃতীয় রজলোকে অর্থাৎ মেঘলোকে অগ্নি বিদ্যুৎ রূপে আছেন, তাঁহাকে পূজ্য দেবগণ (বা মরুৎগণ) বর্দ্ধিত করিতেছেন।

(১) সঃ। দোয়মানঃ। পরমে। ব্যোমনি
ব্রতানি। অগ্নিঃ। ব্রতপাঃ। অরক্ষত। ৬।৮।২
ঋগ্বেদ।

সেই ব্রতপালক অগ্নি পরম ব্যোমে জন্মাইতে জন্মাইতে ব্রত সকল রক্ষা করিয়াছেন।

ছিলেন; এবং হে মৃত্যো! আপনিও যখন ইহাকে সুজ্ঞেয় নহে বলিতেছেন, এবং আপনার তুল্য এই বিষয়ের কোন বক্তাও লাভ করা যায় না; অতএব ইহার সমান অন্য কোন বর নাই।"

যখন যম দেখিলেন নচিকেতা এই শ্রেষ্ঠতত্ত্ব জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন, তখন তিনি তাঁহাকে এই তত্ত্ব লাভের জন্য উপযুক্ত কি না তাহাই পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। মনে ভোগস্পৃহা থাকিলে এই শ্রেষ্ঠ তত্ত্বের জ্ঞান জন্মে না। অতএব নচিকেতার মনে ভোগস্পৃহা আছে কি না জানিবার জন্য তাঁহাকে ভোগের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্তু প্রদান করিবার জন্য প্রস্তাব করিতেছেন।

যম বলিলেন—"হে নচিকেত! শতবর্ষ ব্যাপী আয়ুযুক্ত পুত্র, পৌত্র সকল লাভ করিবার বর আপনি প্রার্থনা করুন। বহু পশু, হস্তী, সুবর্ণ, অশ্ব প্রার্থনা করুন; বহু বিস্তীর্ণ ভূমি প্রার্থনা করুন,; যতকাল ইচ্ছা ততকাল আপন জীবন প্রার্থনা করুন। যদ্যপি ইহাদের তুল্য মনে করেন, তবে বিত্ত ও চিরকালব্যাপী জীবন প্রার্থনা করুন। হে নচিকেত! আপনি মহাভূমিতে রাজত্ব পাইতে পারেন। আমি আপনাকে কামনার সম্ভোগকারী করিয়া দিব। মর্ত্তলোকে যে সকল কামনা দুর্লভ, সে সকল কামনাকেই স্বচ্ছন্দে প্রার্থনা করুন। রথারূঢ়া ও বাদ্যে সুনিপুণা এই সকল রমণী মনুষ্যদিগের অপ্রাপ্য। হে নচিকেত! আমার দ্বারা প্রদত্ত হইয়া ইহাদিগের দ্বারা আপনি সেবিত হউন; আমাকে মরণের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন না।"

নচিকেতা বলিলেন, "হে অন্তক! কল্য কি হইবে এই ভাবনা মর্ত্ত্যের ইন্দ্রিয়তেজ নষ্ট করে; জীবনকাল যতই হউক তাহা অল্প বলিয়া মনে হয়। অতএব এই সকল বাহন, নৃত্য, গীত আপনারই থাকুক।" মনুষ্য বিত্ত দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। যেহেতু মর্ত্ত্যগণ যখনই আপনার দর্শনলাভ করে তখনই তাহাদের শ্রেষ্ঠ বিত্ত লাভ হয়; কারণ, লোকে যমলোক পাইবার নিমিত্তই যত সুকৃতি করে। কিন্তু ইহাও কালে নষ্ট হয়। কারণ আপনি যত দিন আদেশ করেন তত দিন আমরা যমলোকে জীবিত থাকি; পরে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে পতিত হই। এই জন্য সেই বরই আমার বরণীয়। এই বর প্রার্থনা করিবার আমার আর একটি কারণ এই যে, অজর অমরদিগের নিকট আগমন করিয়া পার্থিব জরাগ্রস্ত কোন্ মর্ত্ত্য শারীর সুখ, বিলাস প্রভৃতি মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করিয়া অতি দীর্ঘ জীবনে সুখ প্রাপ্ত হয়? অতএব হে মৃত্যো! যে বিষয়ে সংশয় রহিয়াছে সেই মহৎ পরলোক বিষয় আমাকে বলুন। এই গুপ্ত বিষয়ে প্রবেশলাভ করাই আমার প্রার্থিত বর; ইহা ব্যতীত অন্য বর নচিকেতা প্রর্থনা করে না।"

এখানে দেখা গেল 'মহৎ পরলোক' বিষয়েই নচিকেতার প্রশ্ন হইয়াছে। অতএব 'প্রেত' অর্থে 'মহৎ পরলোক'। তথায় গমনের পর জীবাত্মা 'থাকে, কি না থাকে' ইহাই নচেকিতা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। নচেকিতাকে এখানে প্রকৃত জ্ঞানপিপাসু রূপে দেখান হইল। কারণ তিনি এই শ্রেষ্ঠ বিষয় জানিবার জন্য সকল ভোগ সুখ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত।

ক্রমশঃ

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

অনুতপ্তা

যাচনা-কাতর ভিখারীর বেশে,
ওগো অন্তরতম,
দেখা দিয়েছিলে কোন্ সে প্রভাতে
অন্তর দ্বারে মম!

চির অধিকারে যবে চেয়েছিলে
আমার প্রাণের দান,
অমি না চিনিয়া দিছিনু ফিরায়ে
করি কত অপমান।

গোধূলি আলোকে মলিন নয়নে
যখন চাহিল ধরা,
বিরহ-ব্যথিত করুণ চাহনি
পরাণ-আকুল করা,
নয়ন তুলিয়া চেয়ে দেখি, কোথা
এতটুকু আলো নাই,
নিবিড় আঁধার শত বেদনায়
ভরিয়া উঠেছে তাই ;
সাঁঝের উদাসী বাতাসের বুকে
হাহাকার ওঠে কাঁপি ;

গৃহকোণটিতে বসিনু তখন
নয়নে বসন চাপি।
সব অভিমান ধূলায় লুটায়ে
পরেছি দীনের সাজ,
ভিখারী দেবতা, কাঙ্গাল হৃদয়ে
আসিবে কি তুমি আজ?
লাজ-কুণ্ঠিত আঁখি দুটি নত,
অনুতাপ ভরা হিয়া,
বরণ করিয়া নেবে কি দেবতা
তোমার করুণা দিয়া?

শ্রীঅমিয়া দেবী।

আড়াই চাল

(উপন্যাস)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

একদিন, দুইদিন, তিনদিন কাটিয়া গেল। অমল প্রত্যহ সকালে বিকালে দ্বিপ্রহরে, সযত্নে বেশবিন্যাস করিয়া, মাথার চুলগুলা নানাধাঁচে উল্টাইয়া টেড়ি ফিরাইয়া, মুখের উপর বারবার সযত্নে তোয়ালে ঘষিয়া, চোখের চশমা যোড়া যথাসাধ্য জোরে রুমালে মাজিয়া, পঁচিশ বার চক্ষু হইতে খোলা-পরা করিয়া উন্মনা চিন্তাকুল বদনে কক্ষমধ্যে পদচারণা করিয়া বেড়াইল। কখনও বা প্রাণপণে ধৈর্য্য ধরিয়া সযত্নে গলা শানাইয়া নেপথ্যান্তরালবর্ত্তিনীর মনোযোগ আকর্ষণের অভিপ্রায়ে গুরুগম্ভীর নিনাদে "হরিরাজে"র হৃদয়দ্রাবী বাছা বাছা অংশগুলা 'এক্ট' করিল, এবং প্রতিমুহূর্ত্তে পরম ঔদাস্যের ভানে সতর্ক বক্র-কটাক্ষে জানালার পানে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, কিন্তু হায়রে দুরাশা!—'কেহ নাই, কিছু নাই গো!' নিদারুণ পরিতাপের নিশ্বাস ছাড়িয়া ঊর্দ্ধে নীলাকাশের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া অধীর বেদনায় 'হরিরাজ' ওরফে অমল শেষে ক্ষুব্ধ আক্ষেপ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়া দিল :—

"বিশ্বাস? কাহাকে বিশ্বাস?
মানব হৃদয়?—
বিশ্বাসের উপযুক্ত স্থান সে ত নয়—"

কিন্তু অমলের উৎসাহিত কণ্ঠস্বর নৈরাশ্য দুঃখ পীড়নে শীঘ্রই ক্ষীণ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে এবং বিয়োগান্ত নাটকের অগ্নিগর্ভ বক্তৃতারাশি—হাস্যোদ্দীপক প্রহসনের ব্যঙ্গবর্ষী সুরে প্রতিধ্বনিত হইয়া যথার্থই করুণ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং আভ্যন্তরিক দৌর্ব্বল্য-বিকলতায় প্রণয়-ব্যাধি-আক্রান্ত প্রেমিক-জনোচিত নির্জ্জীবতা অনুভব করিয়া অমলচন্দ্র অচিরাৎ শয্যাশ্রয় গ্রহণ ও নিদ্রাকর্ষণে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে, এবং কিছুক্ষণের জন্য বাসার ঠাকুর ও চাকরগুলির কাণ জুড়াইয়াছে।

কিন্তু দৈবের মুখাপেক্ষায় বাতায়নের আশায় বসিয়া থাকায় লাভ নাই দেখিয়া উদ্যোগী পুরুষসিংহ অমলচন্দ্র অবশেষে লক্ষ্মীলাভের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। সন্ধান লইয়া জানিল—উক্ত ত্রিতলবাড়ী খানির মালিক কলিকাতার কোন সুবিখ্যাত ব্যবসাদার ব্যক্তি; এবং সম্প্রতি উহা ভাড়া লইয়াছেন, কোন বিদেশাগত বাঙ্গালী ভদ্রলোক। অমল দুই চারিজনের কাছে চেষ্টা করিল, কিন্তু ভদ্রলোকটির নাম জানিতে পারিল না। অগত্যা কি সুযোগে উক্ত অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির পরিবারস্থ সেই ব্যক্তি-বিশেষের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করিল।

অমলের ঘরের অন্য দিকের জানালা দিয়া ঐ বাড়ীখানার দ্বারসম্মুখস্থ ফুটপাথের কিয়দংশ দেখা যাইত, অমল প্রথম প্রথম সেইখান হইতে নজর রাখিল, কিন্তু চাকর বাকরদের গমনাগমন ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইল না।

পরদিন অমল বাসার ঘর ছাড়িয়া, সেই ফুটপাথের উপর দিয়া পায়চারি করিয়া প্রাতর্ভ্রমণ সমাধা করিল। তারপরে নানা অছিলায় বারবার বাড়ীখানার এ পাশে ও পাশে ঘুরিল। দ্বিপ্রহের সময় দেখিল বাড়ী হইতে বাহির হইয়া জনৈক গৌরবর্ণ বৃদ্ধ ভদ্রলোক ভাড়াটিয়া গাড়ীতে চড়িয়া কোথায় প্রস্থান করিলেন। তৃতীয় প্রহরে দেখিল আশপাশের বাড়ীর উড়িয়া চাকর ও বামুনগুলি সেই বাড়ীর সদরের ঘরে সম্মিলিত হইয়া নিশ্চিন্ত আরামে পাণ দোক্তা চিবাইয়া 'ড়' বহুল জাতীয় ভাষায় খোসগল্প করিতে করিতে সুস্থ স্বচ্ছন্দ মনে অবসর উপভোগ করিতেছে। অমল তৃতীয় প্রহরের রৌদ্রে পথে পথে চক্র দিয়া চতুর্থ প্রহরের অবসানে, শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে বাসায় ফিরিল।

নিষ্ফল পথপর্য্যটন-ক্লান্তিতে দেহের সহিত মনটাও কেমন নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছিল। কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। অমল চা খাইয়া সন্ধ্যার প্রদীপ নিবাইয়া অন্ধকার কক্ষে, খোলা জানালার কাছে মাদুর বিছাইয়া সামনের বাড়ীর সেই জানালার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। সে জানালাটা তখন বন্ধ ছিল, তবে খড়খড়ির ফাঁক দিয়া গৃহমধ্যস্থ ক্ষীণ আলোকরশ্মি বেশ দেখা যাইতেছিল।

অমল ভাবিতে লাগিল, সে দিনের সেই অভিনয় দক্ষতাটুকু অপরিচিতার দৃষ্টিতে কতখানি বিস্ময় ও কি পরিমাণ মুগ্ধতা জাগাইয়া তুলিয়াছিল, তাহার সঠিক সংবাদটুকু কাহার কাছে জানিতে পারা যায়? আহা, সেদিন যদি ত্রিশ সেকেণ্ড আগে সে জানিতে পারিত যে তাহার রিহার্শেল-নৈপুণ্য আর একজন গোপনে থাকিয়া চুরি করিয়া দেখিয়া লইতেছে, তাহা হইলে অমলের পক্ষে কি চমৎকার সুযোগই ঘটিত। নিজের দিব্য-দৃষ্টি-হীনতার জন্য অমল ভাগ্য-দেবতাকে গালি দিয়া সশব্দে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িল!

সহসা ত্রিতলের সেই সম্মুখের জানালাটা কে খুলিয়া দিয়া গেল। চিন্তামগ্ন অমল চমকিয়া চাহিল, কিন্তু প্রস্থিত ব্যক্তিকে আর দেখিতে পাইল না। দেখিল শুধু সেই কক্ষভিত্তিগাত্রে উজ্জ্বল আলোকজ্যোতিঃ প্রতিভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

ক্ষণেক পরে কক্ষমধ্য হইতে সুমিষ্ট কণ্ঠের সঙ্গীত আরম্ভ হইল। অমল লাফাইয়া উঠিয়া নিজের অন্ধকার জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া, রুদ্ধ উত্তেজনায় দ্রুত-স্পন্দিত বক্ষে কাণ পাতিয়া আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শুনিল ঠাকুর-কবির সুবিখ্যাত 'সোনার তরী' কবিতায় সুর বসাইয়া, হার্ম্মোনিয়মের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া অতি মনোরম সুললিত তানে গান গাহিতেছে—

গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা,
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা!

সঙ্গীতের ছন্দে ছন্দে তালে তালে, অমলের হৃদয় মন সদ্য এক অস্বাভাবিক মাতলামির নেশায় মাতিয়া শূন্য হইতে শূন্য স্তরে, দিগন্তে—দূরে, অনির্দ্দিষ্ট রাজ্যে উধাও হইয়া গেল! সে সমস্ত মনস্তত্ত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাব-বিশ্লেষণের ধৃষ্টতা প্রকাশে আমাদের সাহস নাই, তবে মোটের মাথায় ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে প্রস্তুত আছি যে, গানের উপসংহারে যখন শুনিতে পাওয়া গেল—

"শ্রাবণ গগন ঘিরে ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি,
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।—"

তখন অমল সত্য সত্যই বদ্ধ পাগল হইয়া পড়িয়াছে।

বিহ্বল ভাবে সে জানালার নীচে বসিয়া পড়িল। কতক্ষণ সেখানে সেই অবস্থায় ছিল স্মরণ নাই, অনেক রাত্রে সংজ্ঞা হইলে চাহিয়া দেখিল,—সঙ্গীত-মুখরিত কক্ষ নীরব হইয়াছে, বাতায়ন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ঈষদুন্মুক্ত খড়খড়ির ফাঁক হইতে দেখা যাইতেছে—গৃহমধ্যস্থ আলোকটা বাতায়ন প্রান্তে সরাইয়া আনিয়া, কে একজন হেঁট হইয়া বসিয়া বই পড়িতেছে। তাহার মুখ ভাল দেখা যাইতেছে না, শুধু কপাল হইতে চক্ষুর নিম্নার্দ্ধ পর্য্যন্ত কিয়দংশ স্থান দেখা যাইতেছে। বিহ্বল বিস্ফারিত কটাক্ষে চাহিয়া অমল চিনিল, সেদিনের সেই বিদ্যুচ্চমক-তুল্য ক্ষণিকদৃষ্টা,—সেই, সে!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রভাতের আলো এবং হাওয়ায় মগজ ও মন অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা হইলে, অমল বুদ্ধি শানাইয়া একটা প্ল্যান্ ঠিক করিতে বসিল। সকল কাযেই তাহার জেদের জোরটা চিরদিন বেশীরকমে প্রকাশ পায়,—এ ক্ষেত্রেও তাহার ত্রুটি হইল না। যে সকল্লে অন্যকে প্রবৃদ্ধ দেখিলে নৈতিক নিষ্ঠাচারী অমলচন্দ্র সমাজহিতের দোহাই দিয়া নিজের পায়ের জুতা খুলিয়া তাহার পিঠে বসাইতে দ্বিধা করিত না, সেই কাযে, নিজের গরজে আজ স্বচ্ছন্দে লোকলজ্জার মাথা খাইয়া, নিজেই অগ্রসর হইল!

গতকল্য বাসার উড়িয়া চাকরটাকে, ঐ বাড়ীর চাকরদের কাছে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। সুতরাং তাহাকে নিজের ঘরে ডাকিয়া সুকৌশলে গাম্ভীর্য্য বাঁচাইয়া নানারূপ সওয়াল জবাবে জানিয়া লইল যে, পুরুষ মানুষের মধ্যে উক্ত বাসায় একজন বুড়াবাবু ছাড়া আর কেহ নাই, এবং বাবুটীও গতকল্য কোথায় গিয়াছেন। চাকরদের নিকট সে শুনিয়াছে—বাবুর ফিরিয়া আসিতে দু' পাঁচদিন বিলম্ব হইবে। অন্দরের খবর সে বলিতে পারিল না।

সুযোগ জিনিষটা একবার অবহেলায় হারাইলে সমস্ত জীবনটাই তাহার জন্য অনুতাপ করিতে হয়.—অভিজ্ঞগণের এই উক্তিটি প্রবলভাবে অমলের মনে পড়িল, সুতরাং এই সুযোগকে সযত্নে বরণ করিয়া লইবার জন্য সে তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইল।

অমল অনেকক্ষণ ধরিয়া বেশ ভাল করিয়া ভাবিয়া লইল। অভীপ্সিত সঙ্কল্পের প্রতিকূল তর্ক ও অনুকূল যুক্তিগুলা খুব মাজিয়া ঘষিয়া, বাঞ্ছাসিদ্ধির সুনিশ্চিত সম্ভাবনাটুকু যখন মনের মধ্যে প্রখর ঔজ্জ্বল্যে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল, তখন নিজের সাইকেলটা বাহির করিয়া একছুটে বাজার হইতে একখানি বই কিনিয়া আনিল। বইখানি জনৈক আধুনিক কবি লিখিত কবিতার বই,—নাম "হৃদয়োচ্ছ্বাস।"

দোয়াতের কালি ও কলমের নিব বদ্‌লাইয়া অমল বইখানির পাতা খুলিয়া কভারের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সযত্নে নিজের নামটী লিখিল। তারপর অন্য একটুকরা কাগজ লইয়া লাল কালিতে লিখিল,

প্রিয় বিদ্যুৎ

আমার হৃদয়োচ্ছ্বাস পাঠাইতেছি। পড়িয়া কেমন লাগে জানাইও। আর কি কি বই পড়িবে লিখিও পরে পাঠাইব। ইতি—

তোমার
অমল

পত্রের উপসংহারে দুঃসাহসী অমলের হাত কাঁপিয়া উঠিল। পাছে এক মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় এই কয় ঘণ্টার পরিশ্রমলব্ধ প্ল্যান্‌টা মাটী হইয়া যায়; তাই তাড়াতাড়ি চোখকাণ বুজিয়া আত্মদমন করিয়া কাগজখানা বইয়ের ভিতর রাখিয়া অমল তারস্বরে ভৃত্যকে ডাক দিয়া, নিজে Psychologyর নোটের খাতা খুলিয়া বসিল। ভৃত্য আসিল। নোট লিখনোদ্যত অমলচন্দ্র ষ্টাইলো পেনের মাথায় চিবুক ঠেকাইয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া বসিয়া, একাগ্র

মানাযোগে নোটের খাতা দেখিতে দেখিতে, বাম হস্তে 'হৃদয়োচ্ছ্বাস' খানা সরাইয়া দিয়া বলিল, "সামনে ঐ তেতালাবাড়ীতে বইখানা দিয়ে আয়।"

ভৃত্য সম্মুখস্থ জানালার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "ঈ, বাড়ী? সে—কোন বাবুমানে দিব?"

মুস্কিলে পড়িয়া অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত ক্ষিপ্রহস্তে নোট টুকিতে সুরু করিয়া, অমল আধ-কাসির ধমকে থামিয়া থামিয়া বলিল—"তিনি বাড়ীর ভেতর আছেন, তুই দিয়ে আয় না—"

দোক্তাখোর উড়িয়া পুঙ্গব, অমলের কৌশলী বুদ্ধিকে 'থ' বানাইয়া, নিজের হুঁসিয়ারী বুদ্ধিটা সাধারণ ব্যবহারিক জ্ঞানে শানাইয়া পুনশ্চ বলিল, "সে—বিহারা যদি বলে, বাবুমানে বাড়ী নাই,—তা হলি ফিরাই কিড়ি আনিব?"

অত্যন্ত বিরক্তির সহিত ধমক দিয়া অমল বলিল, "না না, ফিরাই কিড়ি আনিতে হবে না। তুই বাড়ীর ভেতর পৌছে দিয়ে আসবি, তার পর তিনি যখন হোক পাবেন-ই।"

ভৃত্য দ্বিতীয় প্রশ্ন না করিয়া, ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

অমল সাইকলজির নোট ফেলিয়া, জানলার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া, তীব্র উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে উৎকণ্ঠিত নয়নে ও-বাড়ীর জানালার দিকে চাহিয়া রহিল। জানালায় দেখিবার মত কিছু তখন ছিল না। অল্পক্ষণ পরে অমল দেখিল, ভৃত্য ও বাড়ী হইতে রিক্তহস্তে বাহির হইয়া আসিল। অমল বুঝিল বইখানা যথাস্থানে পৌছিয়াছে।

ভৃত্যের প্রতীক্ষায় অমল শশব্যস্ত হইয়া আবার নোট টুকিতে বসিল। কিন্তু অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, ভৃত্য তাহার কাছে আসিল না। অন্য দিকের জানালায় আসিয়া অমল উঁকি মারিয়া দেখিল ভৃত্য আসিয়া তাহাদের কলতলায় বসিয়া বাসন মাজিতেছে।

তৎক্ষণাৎ অমল সাবান তোয়ালে লইয়া দুড়্‌দুড়্‌ শব্দে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া কলতলায় আসিয়া হাজির হইল। যদিও অনতিকাল পূর্ব্বে তাহার স্নানাহার সমাপ্ত হইয়াছে, তথাপি বেলা ২টার সময় আবার আজ তাহাকে স্নান করিতে হইবে।

কলতলায় আসিয়া চকিতনেত্রে এদিক ওদিক চাহিয়া অমল নিম্নস্বরে বলিল—"কি রে, বই দিয়ে এলি? কাকে দিলি?"

ভৃত্য বলিল, "সে—বেহারা ভাত খাঁইবারে বসিথিলা, উপর হইতে ছোট দিদিমণি তেকারে চিঠি ফেলিতে দিবাকে আইথিলা, বহি ঠ-তেনাকে দিইলা।"

তীক্ষ্ণ কটাক্ষে চাহিয়া অমল ত্রস্তভাবে বলিল, "কোন দিদিমণি? কত বড় বল দেখি?"

ভৃত্য মনে করিল কোন অপোগণ্ড ছোট বালিকার হাতে বই খানা দিয়া আসার জন্য প্রভু বুঝি তাঁহার পুস্তকখানির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হইয়াছেন—সুতরাং তৎক্ষণাৎ নিজের কাণ্ডজ্ঞানের প্রমাণ দাখিল করিল। একমুখ হাসিয়া পরম আশ্বাসের স্বরে বলিল, "ছোট নহে, অনেকো বড়!—মোর ছাতিপর হইমূ পারা" —ছাই মাথা হাতখানা নিজের বুকের কাছে উচুঁ করিয়া ধরিয়া, ভৃত্য উক্ত 'অনেকো বড়' দিদিমণির দৈর্ঘ্যের জরিপী নিদর্শন দেখাইল।

অমল নিঃসন্দেহ হইল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হাঁ করিয়া ভৃত্যের পানে চাহিয়া রহিল। বলাবাহুল্য সেই মুহূর্ত্তে ভৃত্যের ভাগ্যের সহিত নিজের ভাগ্যটা বদল করিয়া লইতে পারিলে, সে নিজের জীবন ধন্য জ্ঞান করিত।

ইচ্ছাসত্ত্বেও ভৃত্যকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে অমলের সাহস হইল না। ভৃত্য নিজের কায করিয়া কলতলা হইতে সরিয়া গেল, অমলও অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে স্নান সমাপ্ত করিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

পাশের বাড়ীর সেই জানালার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই এবার অমলের মন উল্লাসে নৃত্য করিয়া উঠিল। দেখিল, জানালার খড়খড়ি ঈষৎ ফাঁক করিয়া, অতি সন্তর্পণে,

আপনাকে অন্তরালে প্রচ্ছন্ন করিয়া, কে একজন সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে কি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে!—মুহূর্ত্তে অমলের লেশমাত্র দ্বিধা রহিল না যে দর্শনীয় বস্তুটি সে নিজে, এবং পর্য্যবেক্ষণকারিণী সেই—সে!

অমল জামার অস্তিনের বোতাম বারবার খুলিতে পরিতে মনোযোগী হইয়া জানালার দিকে আড়চোখে মাঝে মাঝে চাহিতে চাহিতে, খুব গম্ভীর চালে কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিল। কিন্তু দেখা গেল, অল্পক্ষণ পরেই খড়খড়ির ফাঁক নিঃশব্দে বুজিয়া গেল। কক্ষমধ্যে জনপ্রাণীর সাড়া পাওয়া গেল না।

সমস্ত দিন অধীর প্রতীক্ষায় কাটিয়া গেল। কিন্তু 'প্রিয় বিদ্যুৎ' সম্বোধিত মনুষ্যটির তরফ হইতে কেহ আসিয়া—অমলের প্রেরিত 'হৃদয়োচ্ছ্বাসের' ভাল লাগা মন্দ লাগার সম্বন্ধে কোন সংবাদ জানাইল না বা সরল ভদ্রতার সহিত অমলের ভৃত্যের ভ্রমসংশোধন করিয়া বই ফেরত দিয়া গেল না।

পরদিন দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অমল অপেক্ষা করিল। কিন্তু তথাপি কাহারও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। অগত্যা পূর্ব্ব-স্থিরীকৃত কার্য্যপ্রণালীতে নূতন চাল চালিয়া ভৃত্যকে নিজের ঘরে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চিন্তামণি, কাল কোন বাড়ীতে বই দিয়ে এসেছিলি?"

ভৃত্য জানালার ভিতর দিয়া সম্মুখের বাড়ীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ বাড়ী, যিহানে আপনি বলি থিলা—"

ভালমানুষ অমল অত্যন্ত বিস্ময়ের ভানে চমকিয়া বলিল, "অ্যাঁ—ও বাড়ীতে কিরে?—আমি কি ও বাড়ীতে দিতে বলেছি?"

ভৃত্য আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "হাঁ বাবু তাইত।"

অমল সজোরে টেবিলের উপর মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিল—"কখন নয়!"

ভৃত্য হতভম্ব হইয়া বলিল—"তবে?—সে আপনি ত ঐ বাড়ী বরাবর আঙ্গুলো দেখাই থিলা, না?"

অমল আশ্চর্য্য ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "দূর ব্যাটা উজবুক! আমায় বলে 'মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল'—সাইকলজির নোট্ নিয়ে আমি তখন ব্রহ্মাণ্ড আঁধার দেখছি, সে সময় কোনদিকে আঙ্গুল দেখিয়েছি না-দেখিয়েছি, অত কি আমার খেয়াল ছিল? তোর হুঁস-পবন জ্ঞান নেই, ও বাড়ীতে আমি কাউকে চিনি যে তাকে বই পাঠাব?—ওটা কার বাড়ী?"

ভৃত্য মুখ কাঁচু মাচু করিয়া বলিল—"সে—পশ্চিম থে একো বঙ্গাড়ি বাবু আইকিড়ি, কন্যায়ো বিয়া দিবাকে ভাড়া—"

বাধা দিয়া অমল বলিল—"কন্যার বিয়ে দিতে বাড়ী ভাড়া নিয়েছেন? ওঁরা কি জাত? বামুন বৈদ্য না কায়স্থ?"

ভৃত্য কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—"সে—না জানে,—"

মুখ বিকৃত করিয়া অমল বলিল, "ইউ আর এ ডাঙ্কি!—যা ব্যাটা যা হবার হয়েছে, এখন বইখানা চেয়ে নিয়ে আয় দেখি,—ছ্যা ছ্যা তোদের জন্য ভদ্রলোকের কাছে মান সম্ভ্রম থাকবে না। দাঁড়া, ভদ্রতা করে ক্ষমা চেয়ে একখানা চিঠি লিখে দিই।"

একখানা চিঠির কাগজ লইয়া অমল লিখিল—

বিনয় সম্ভাষণ মেতৎ—

বন্ধুর উদ্দেশে প্রেরিত একখানি বই আমার ভৃত্য ভুলক্রমে আপনাদের বাড়ীতে দিয়া আসিয়াছে, তাহার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য আমি লজ্জিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। কিছু মনে করিবেন না, অপরিচিতের অনিচ্ছাকৃত ক্রটি মার্জ্জনা করিয়া বইখানি ফেরৎ দিবেন। ইতি—

বিনীত,

শ্রীঅমলচন্দ্র বসু।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

চিঠি লইয়া ভৃত্য চলিয়া গেল, এবং অল্পক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া অমলের হাতে একখানি বহি দিল। বহিখানির চেহারা ও নাম দেখিয়া অমল এবার সত্য

সত্যই আশ্চর্য্য হইল ! দেখিল সেখানি আধুনিক কবির লেখা "হৃদয়োচ্ছ্বাস" নহে, সেখানি বহু প্রাচীন কালের, সংহিতাকার প্রণীত বিখ্যাত অনুশাসন তন্ত্র—বর্ত্তমানে বঙ্গবাসী অফিস হইতে প্রকাশিত "কল্লুকভট্ট কৃত টীকয়া, বঙ্গানুবাদেন চ সমেতা"—মনুসংহিতা।

ভৃত্যকে প্রশ্ন করিয়া জানিল যে, সে বেহারার মারফৎ চিঠিখানি বাড়ীর মধ্যে পাঠাইয়া দিয়াছিল, বেহারা ফিরিয়া আসিয়া ঐ বহিখানি তাহার হাতে দিয়া বলে, "দিদিমণি দিয়াছেন।"

অতঃপর কি করা উচিত মন দিয়া ভাবিয়া লইবার জন্য অমল তাড়াতাড়ি ভৃত্যকে বিদায় দিয়া, ক্যাম্বিশের চেয়ারের উপর আড় হইয়া পড়িয়া, গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনার প্রত্যুত্তরে এই যে অদ্ভুত আশ্চর্য্য উত্তরটি আসিয়া পৌঁছিল,—ইহার অর্থ কি ? ইহাও কি সত্য সত্য ভ্রমবশতঃ অনবধানতা ? না পরিহাস মাত্র ?

দিদিমণি নামধারিণী যিনি ইহা পাঠাইয়াছেন, অনুমানে তাঁহার পরিচয়টা ত বেশই বুঝিতে পারা যাইতেছে। তিনি সুন্দর গাহিতে বাজাইতে জানেন, এবং সেদিন রাত্রে বই লইয়া, আলোর সম্মুখে তাঁহাকে পড়িতেও দেখা গিয়াছে। অতএব আধুনিক কবির হৃদয়োচ্ছ্বাস ও প্রাচীন শাস্ত্রকারের সংহিতার পার্থক্য যে তিনি বোঝেন না,—ইহা কিরূপে সম্ভবপর হয় !

হঠাৎ অমলের মনে হইল, ইহাও একটা চাল !—অমল যেমন চাতুরি খেলিয়া, ইচ্ছাপূর্ব্বক ভ্রম করিয়া পরে ক্ষমা চাহিবার সুযোগ্য করিয়া লইয়াছে, প্রতিপক্ষও হয়ত তেমনি কোন প্ল্যান খাটাইয়া বুদ্ধির নৈপুণ্য প্রকাশের একটা অবসর যোগাড় করিবার উদ্দেশ্যে, এই মনুসংহিতা খানা পাঠাইয়াছেন।

অমল উৎসাহিত চিত্তে বই খুলিয়া, পাতা উল্টাইতে লাগিল। দেখিল—কভারের তৃতীয় পৃষ্ঠায় সুন্দর মেয়েলি অক্ষরে লেখা রহিয়াছে "কল্যাণীয়াসু, কুমারী ক্ষণপ্রভা মিত্রের করকমলে,—স্নেহ-উপহার।—ইতি দিদি।"

আবেগস্পন্দিত হৃদয়ে দ্রুত কম্পিত হস্তে অমল পুস্তকের প্রথম হইতে শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত খস্ খস্ করিয়া উল্টাইয়া দেখিল—যদি কোথাও আর কাহারও কোন হস্তাক্ষর বা মন্তব্য থাকে। কিন্তু না,—আর কোনখানেই কিছু নাই।

অমল একবার ভাবিল পুনর্ব্বার ক্ষমা চাহিয়াই বইখানা ফেরত দেয়। আবার ভাবিল, 'না থাক, দেখা যাক কতদূর কি হয়।'

দুই দিন কলেজ খোলা ছিল, অমল কামাই করিয়াছে, আজও কলেজ খোলা আছে, আজ একবার যাইতে হইবেই। অমল চিন্তা-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সাইকেল লইয়া বাহির হইল।

কোন রকমে কলেজের সময়টা কাটাইয়া, ছুটির পর কলেজের বাহিরে আসিয়া অমল সিরিঞ্জ খুলিয়া সাইকেল টায়ারে পম্প করিয়া লইতেছে, এমন সময় এক-গাড়ী করিয়া মেজদা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গাড়ীর ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া, স্বভাব-সিদ্ধ স্নিগ্ধগম্ভীর কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "অমু, তোকে ধরবার জন্যে আমি তাড়াতাড়ি আস্‌ছি। কাল পরশু এসে ফিরে গেছি। পরশু সন্ধ্যাবেলায় অনিলবাবুদের শাল্‌খের বাগানে কত খোঁজ করে গিয়ে, তোর সন্ধান নিলুম, মালী বল্লে এখানে কেউ নেই—"

শঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিয়া, প্রাণপণে আত্মদমন করিয়া অমল বলিল, "পরশু সন্ধ্যায় ?—ওঃ, তা সে সময় ত আমরা কেউ ছিলুম না, লজিকের প্রফেসারের সঙ্গে দেখা করতে গেছলুম, তিনি আমাদের থিয়েটারের—"

মেজদা বলিলেন, "বাজে কথা থাক, এখন আমার কথাটা শোন। আমার শ্বশুর সপরিবারে লক্ষ্ণৌ থেকে এসেছেন, আজ কদিন হল। তিনি কোন কাযের জন্যে হোসেঙ্গাবাদের ঐ দিকে গেছেন, সম্ভবতঃ কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করেও আস্‌বেন। এ দিকে আমার সম্বন্ধী প্রমথবাবু—ঢাকা কলেজে প্রফেসারী করেন, নাম শুনে

থাকবি বোধ হয়—তিনিও আজ সস্ত্রীক এখানে এসেছেন। এইমাত্র কলেজে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। বল্লেন, অমলবাবু বিয়ে করুন না-করুন, সে তাঁর নিজের ইচ্ছা,—কিন্তু একবার যদি অনুগ্রহ করে আমার বোনটিকে নিজের চক্ষে দেখেন, তাহলে—বড় ভাল হয়—"

অমলের মগজের মধ্যে তখন মনু সংহিতা ও হৃদযোচ্ছ্বাসের বিনিময় বিভ্রাটের কারণ নির্ণয়ে, সুন্দ উপসুন্দের লড়াই চলিতেছিল। মেজদার শ্যালকের ভগিনীদর্শনের প্রস্তাব তাহার মাঝে যেন লৌহ মুদ্গরাঘাতের মত বাজিল। অধীর আক্ষেপে অমলের মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, সজোরে উত্তর দিল, "না না, আমি আবার নিজের চোখে দেখতে যাব কি? এখন আমার ওসব সময় নেই। এগ্জামিনের দিন ঘুনিয়ে আসছে, আমার রাত্রে ঘুম হয় না। এখন বিয়ে ফিয়ের কথা তোমরা তুলো না মেজ দা, আমার মাথা গুলিয়ে যায়।"

গাড়ী হইতে নামিয়া সহাস্য মুখে তাহার কাঁধ চাপড়াইয়া মেজদা বলিলেন, "আহা শোন না, তুই বারণ করিস, এখন আমরা বিবাহটা স্থগিত রাখছি, কিন্তু মেয়ে যদি পছন্দ হয়, তা হলে কথাবার্ত্তা পাকাপাকি করে রাখতে দোষ কি?"

প্রত্যেক শব্দ পিছু তিন-তিন বার ঘাড় নাড়া দিয়া অত্যন্ত উষ্ণ-অসহিষ্ণু ভাবে অমল বলিল, "না না না, ওসব হ্যাঙ্গাম এখন আমার পড়াশুনোর সময় পোষাবে না পোষাবে না—"

গম্ভীর মুখে মেজদা বলিলেন, "সে ত ঠিক কথা। তোমার পড়াশুনোর সময় ও সব হাঙ্গাম পোষান'ই অনুচিত। তবে কি না তাঁদের মেয়েটি বড় হয়েছে, দেশাচার মতে, অরক্ষণীয়া অবস্থা বল্লেই হয়, কাযেই তাঁরা—"

রাগে লাল হইয়া অমল বলিল, "তাঁরা অন্য ব্যবস্থা করতে পারেন। অরক্ষণীয়াকে রক্ষা করবার জন্যে দেশে যোগ্য প্রহরীর অভাব নেই। টাকা ফেলুন,—লাঠি ঘাড়ে নিয়ে ঢের লোক তাঁর বোনকে পাহারা দিতে রাজি হবে, আমায় ধর্পাকড় করা কেন? আমার অত সময়ও নেই সখও নেই,—বলে দিও তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে আমার ভরসা ছেড়ে দেন—"

পাছে মেজদার দ্বিতীয় বাক্য শুনিতে হয় তাই অমল তিন লম্ফে হপিং করিয়া সাইকেলে চড়িয়া, প্রাণপণ শক্তিতে প্যাডেল ঘুরাইয়া, বোঁ বোঁ শব্দে অন্তর্হিত হইল। মেজদার মুখভাবটা কিরূপ হইল তাহাও সে চাহিয়া দেখিল না।

ক্রমশঃ

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

গান

(পিলু বারোঁয়া)

ওগো আমার নবীন পাখী, ছিলে তুমি কোন গগনে?
আমার সকল হিয়া মুঞ্জরিছে তোমার ঐ করুণ গানে!
জগতের গহন বনে
ছিনু আমি সংগোপনে,
না জানি কি লয়ে মনে
এলে উড়ে আমার পানে।
লয়ে তোমার মোহন বরণ,
মোর শুষ্ক ডালে রাখলে চরণ;
আজ আমার জীবন মরণ
কোথা আছে কেবা জানে!
ঝরে গেছে সকল আশা,
ফোটেনা আর ভালবাসা,—
আজ তুমি বাঁধলে বাসা
কিসের আশে আমার প্রাণে?

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন।

দাশু রায়ের "কলঙ্ক-ভঞ্জন"

বাঙ্গালা-সাহিত্যে এখন যে যুগ চলিতেছে, দাশরথি রায় ঠিক ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে পরলোক গমন করেন। ১২৬৭ সালে, নূতন ছন্দে, নূতন তানে, বজ্র-গম্ভীর নিনাদে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলনী-পতাকা উড়াইয়া মধুসূদন এই নবযুগের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। ইহারই ঠিক তিন বৎসর পূর্ব্বে দাশরথির মৃত্যু হয়। সুতরাং তিনিই খাঁটি বাঙ্গালীর শেষ কবি। ৺রসিকচন্দ্র রায় দাশরথির কতকটা সমসাময়িক এবং তৎপরেও বহুদিন জীবিত ছিলেন, সত্য। কিন্তু তিনি, নিজে প্রভূত-কবিত্বসম্পন্ন হইয়াও, পাঁচালী-প্রণয়নে আজীবন দাশরথিরই অনুকরণ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তিনিও খাঁটি বাঙ্গালীর একজন শেষ কবি হইলেও, তাঁহাতে আমরা দাশরথিরই ছায়া, এমন কি, কায়া পর্য্যন্ত দেখিতে পাই। পরবর্ত্তী অন্যান্য পাঁচালী-কারদেরও ঐ দশা। সকলেই দাশরথির মতে, দাশরথিরই পথে চলিয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহই দাশরথিকে ছাড়াইয়া উঠা দূরে থাকুক, এ বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষও হইতে পারেন নাই। তাই বলিতেছি, দাশরথিই খাঁটি বাঙ্গালীর শেষ কবি।

পূর্ব্বযুগের এই শেষ কবি, যিনি তাঁহার অনতিদীর্ঘ জীবনের কয়েক বৎসর মাত্র লোকশিক্ষায় তাঁহার কবিত্ব-শক্তির প্রয়োগ করিয়া, এই বাঙ্গালা দেশের এক-প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়া গিয়াছেন, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী হইতে আরম্ভ করিয়া নিরক্ষর জনরাশি পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ লোক মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া যাঁহার মুখে পাঁচালী শুনিয়া "ধন্য ধন্য" করিত, সুদূর পল্লীতে পর্য্যন্ত এখনও যাঁহার নাম ও গান শুনিতে পাওয়া যায়, গায়ক-ভিক্ষুকেরা এখনও যাঁহার রচিত গান গাইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারতের মত এখনও যাঁহার প্রকাণ্ড পাঁচালী-গ্রন্থ দোকানে-দোকানে, হাটে-বাজারে, মেলায়-মেলায় অসংখ্য পরিমাণে বিক্রীত হইতেছে, তিনি বাঙ্গলা-সাহিত্যে কি দিয়া গিয়াছেন, কি গুণে তাঁহার এমন প্রতিষ্ঠা, এত সমাদর, নিরপেক্ষ ভাবে, সহৃদয় ভাবে সমালোচনা করিয়া তাহা একবার দেখা উচিত।

দাশরথি লোক-শিক্ষার কবি। এখন আমরা চাষার ছেলেকে "পৃথিবী গোলাকার,দেখিতে কমলালেবুর মত"; "গোরুর চারিটি পা,দুইটি সিং ও একটি লেজ থাকে;"—ইত্যাকার শিক্ষাকে "লোক-শিক্ষা" ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু সেকালে লোক-শিক্ষার ধারা ছিল অন্য-রূপ। অবশ্য,ব্যক্তিগত কিছু লেখাপড়া শিক্ষা, তাহা গ্রাম্য পাঠশালায় হইতে পরিত এবং জাতিগত ব্যবসায়-শিক্ষা, তাহা নিজ বাড়ীতে অথবা সমব্যবসায়ীর কাছে হইত। জীবিকা-উপার্জ্জনের উপযোগী যাহার যতটুকু আবশ্যক, সে তাহাই ততটুকু শিখিত, অন্ততঃ ইচ্ছা করিলে শিখিতে পারিত। এই ব্যক্তিগত বা জাতিগত শিক্ষাতেই আমাদের দেশে লোকশিক্ষা পর্য্যবসিত হয় নাই। সে কালের সমাজ-নেতৃগণ ধর্ম্ম-শিক্ষাকেই প্রকৃত লোক-শিক্ষার লক্ষ্যস্বরূপ জ্ঞান করিতেন। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে, লোক-সমাজে অশান্তি নিবারণ ও মঙ্গল-স্থাপন করিতে, ধর্ম্ম-শিক্ষার তুল্য আর কিছুই নাই। এই উদ্দেশ্যেই পুরাণাদির সৃষ্টি। এইরূপ লোক-শিক্ষার জন্যই পুরাণে নানা ছাঁদে, লৌকিক ও অলৌকিকের সংমিশ্রণে লোকমনোহর নানা কাহিনী দ্বারা ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের উদ্দেশ্যে নানাবিধ ধর্ম্মকথা বিবৃত হইয়াছে। লোকমধ্যে ঐ সকল কাহিনীর প্রচারই আমাদের দেশে প্রকৃত লোক শিক্ষার উপায় বলিয়া পরিগণিত ছিল। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতাদির পঠন-পাঠনে বহুকাল হইতে বাঙ্গালায় ঐ লোক-শিক্ষার ধারা চলিয়া আসিতেছে। বাঙ্গালা-সাহিত্যও প্রথম হইতেই এই ব্রতে ব্রতী এবং বাঙ্গালী কবির যত কিছু কাব্য-শ্রী, তাহা ধর্ম্ম-বৃক্ষ অবলম্বন করিয়াই ফুটিয়া

উঠিয়াছিল। এই নবযুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালা-সাহিত্যকে নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্ম-সাহিত্যই বলিতে হয়। কোনও কবি পুরাণ অবলম্বন করিয়া,কেহ বা পৌরাণিক আদর্শে আখ্যান সৃষ্টি করিয়া, কবিত্বের সাহায্যে ধর্ম্মের মর্ম্মকথা লোকপ্রিয় করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বযুগ পর্য্যন্ত ইহাই বঙ্গ-সাহিত্যের ধারা। কিন্তু পড়িবার লোক কয়জন? আবার, পড়িবার লোকের মধ্যে পড়িতে প্রবৃত্তিই বা কয়জনের? এইজন্য লোক-সমাজে ধর্ম্ম-কথা সরস করিয়া শুনাইবার অনুষ্ঠানও আমাদের দেশে ছিল এবং এখনও কিছু কিছু বর্ত্তমান আছে। যাত্রা, গান, কথকতা ইত্যাদি নানা উপায়ে ধর্ম্ম-কথার দিকে লোকের মন আকৃষ্ট করা হইত। এই উদ্দেশ্যেই পূর্ব্বযুগের শেষভাগে "পাঁচালী"র উদ্ভব এবং দাশরথিই ইহার প্রবর্ত্তক। "পাঁচালী" শব্দটী দাশরথির পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল। উহা গেয় কাব্যের নামান্তর রূপে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু লোকে ঐরূপ কাব্যকে গানই বলিত—চণ্ডীর গান, রামায়ণ গান ইত্যাদি। দাশরথির সময় হইতেই কবিতাবদ্ধ, গান-সম্বলিত খণ্ড-কাব্যগুলিই "পাঁচালী" নামে বিশেষিত হইয়াছে এবং ঐরূপ এক-এক খানি খণ্ড-কাব্য এক-একটী "পালা" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

দাশরথি অধিককাল জীবিত ছিলেন না। মৃত্যু-কালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৫২ বৎসর মাত্র। আর, তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে ইহাই অনুমান করিতে হয় যে, অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সেই তিনি পাঁচালী-রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। এই অল্প কালের মধ্যে তিনি বিস্তর পালা রচনা করিয়া, নিজেই বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র প্রায় সকল বঙ্গবাসীকেই শুনাইয়া গিয়াছেন। তাই এখনও—৬০ বৎসর পরেও,—সুদূর পল্লী পর্য্যন্ত "দাশু রায়" সুপরিচিত। ঐ সকল পালার মধ্যে ৬০টী পালা মুদ্রিত হইয়াছে। অনেকে বলেন, আরও কতক-গুলি পালা ছিল। কিন্তু এখন আর সে গুলির উদ্ধারের উপায় নাই। এই ৬০টী পালার মধ্যে ১০টী বাজে পালা বাদে, বাকী ৫০টী পালা ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ অবলম্বনে রচিত। প্রত্যেক পালা এক একখানি খণ্ড-কাব্য। মূলগ্রন্থ হইতে সর্ব্বজনপ্রিয় কোন-এক বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া, তাহার সহিত তদুপযোগী ঘটনা-পরম্পরার সমাবেশে তাহাকে পরিপুষ্ট করিয়া, এক-একটী পালা রচিত।

পুরাণাদির উর্ব্বর ক্ষেত্রেই দাশরথির পাঁচালীর উদ্যান-ভূমি। উহার পালাগুলি নানা জাতীয় সরস ও সুমিষ্ট ফলের বৃক্ষ স্বরূপ। ধর্ম্ম তাহাদের মূল, ভক্তি স্কন্ধ এবং নানাবিধ আখ্যান-সমাবেশ তাহাদের শাখা-প্রশাখা। মনোহর ও সুকোমল ভাষায় উহারা পল্লবিত এবং কবিত্বরসে সর্ব্বত্র অনুপ্রাণিত ও পরিপুষ্ট। আনন্দ উহাদের পুষ্পরাজি এবং লোক-শিক্ষা, আকাঙ্ক্ষিত ফল। এই উদ্যানের সকল বৃক্ষগুলির পৃথক করিয়া পরিচয় দেওয়া এ প্রবন্ধে সম্ভব নয়। আমি উহাদের একটীর একটু বিশেষ করিয়া পরিচয় দিতেছি।

শ্রীরাধিকার কলঙ্ক-ভঞ্জন. দাশরথির উৎকৃষ্ট পালা-গুলির অন্যতম। শ্রীকৃষ্ণলীলা অবলম্বনে এই পালাটী রচিত।

"একদিন বৃন্দাবনে. শ্যামকে পেয়ে সঙ্গোপনে
কাতরে কহেন ব্রজেশ্বরী।
অন্তরে এক বেদন আছে, করি নিবেদন,
নি-বেদন কর যদি, হরি॥
ভজিয়ে তোমার পদ, ব্রহ্মা পান ব্রহ্মপদ,
বিপদের বিপদ পদদ্বয়।
ঐ পদ ভেবে, গোবিন্দ, সদানন্দ সদানন্দ,
নিরানন্দ সদা করি জয়॥
ধরেন শক্তি অসম্ভব, করেন মৃত্যু পরাভব,
ঐ পদ ভব-বৈভব, শুনি, হে ভগবান্।
ভজিয়ে পদারবিন্দ, দেবরাজ্য পান ইন্দ্র,
ইন্দু পান শিব-শিরে স্থান॥
শুন, চিন্তামণি, বলি ঐ পদ চিন্তিল বলি'
বন্দী তাঁর চিরকাল দ্বারে।
মজে, নাথ, তব পায়, কি সম্পদ ধ্রুব পায়!
স্থান দিয়েছ গোলোকের পরে॥

প্রহ্লাদ ঐ পদ-বলে, অনল-পর্ব্বত-জলে,
হস্তী-তলে নাস্তি মৃত্যু জানি।
ওহে নাথ, নন্দকুমার, সেই পদ ভেবে আমার
গোকুলে নাম "রাধা কলঙ্কিনী"।

কৃষ্ণ ভজনা করিয়া "কলঙ্কিনী"—এ যে বিপরীত কাণ্ড!—

"(যেমন) অমৃত খাইয়া রোগ, ব্রহ্ম-বস্তুর প্রাণ-বিয়োগ,
ভেবে কিছু করতে নারি ধার্য্য।
সখা যার গরুড়ের সঙ্গে, তার বক্ষ খায় ভুজঙ্গে?
ওহে মোক্ষদাতা, কিমাশ্চর্য্য!
গ্রহ-যাগের এই কি গুণ! দ্বিগুণ হয় গ্রহ বিগুণ!
জ্বেলে আগুন, দ্বিগুণ কম্প শীতে।
বাসকে বাড়িল কাস! দয়া করে' ধর্ম্ম নাশ!
গয়া করে' কি নরকে যায় পিতে?
ভক্তি করে' ভাব চটে! দান করে' দুর্গতি ঘটে!
মিছ্‌রি পানা পান করে ক্ষিপ্ত!
কোন্ শাস্ত্রে, শ্রীনিবাস, ফাঁসিতে মলে' স্বর্গবাস?
কাশীতে মরে' ভূত-যোনি প্রাপ্ত?
জগন্নাথ দেখে রথে, নর কি যায় নরকেতে?
গণেশ ভজিয়ে কর্ম্মে বাধা!
মাণিক রাখিয়ে ঘরে, (যেমন) দৃষ্ট হয় না অন্ধকারে,
(তেমনি) কৃষ্ণ ভজে কলঙ্কিনী রাধা!"

রাধিকা তাঁহার মনোবেদন বেশ করিয়াই "নিবেদন" করিলেন, বলিতে হইবে। অথবা আজকালকার চলিত ভাষায় বলিতে হইলে, রাধিকা তাঁহার Caseটী ভাল করিয়াই put করিলেন।

কৃষ্ণ অনেক প্রবোধ-বাক্যে রাধিকাকে সান্ত্বনা দিয়া অবশেষে বলিলেন—

"যা হৌক, সত্য করিলাম, আজি 'কলঙ্কিনী' নাম
ঘুচাব তোমার, রাজবালা।
প্রবৃত্তি আমাতে হবে, সাবিত্রী সকলে ক'বে,
নিবৃত্তি হইবে লোক-জ্বালা॥"

পরে, কৃষ্ণ অকালে গোষ্ঠ হইতে কপট রোগী সাজিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন। তখন কবি যশোদার সে চিত্রটী দিয়াছেন, তাহা বড়ই স্বাভাবিক ও মর্ম্মান্তিক!

"অচেতন দেখে গোপালে, করাঘাত করি কপালে,
ডাকে রাণী হয়ে উন্মাদিনী।
রোহিণী দিদি, কোথায়, রহিলি গো, দেখ্‌সে আয়,
সঙ্কটে পড়েছে নীলমণি॥"

* * * *

"দেখে যা, রোহিণী দিদি, এ কেমন!
কি জানি, কি লিখন।
অঞ্চল ধরে এখনি, "মা" বলে চেয়ে নবনী,
নীলমণি কেন হলো অচেতন!
দিলে ক্ষীর অধরে আর খায় না!
আমার মাখন-চোর "মা" বলে সুধায় না!
কি হলো কপালে, দিদি রোহিণি!
কাছে কাছে নেচে গোপাল এখনি—
"মা! মোর কি হলো" বলি, ধুলায় ফেলে মুরলী,
নয়ন-পুতলি মুদিল নয়ন!"

নন্দরাণীর গৃহ লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল—

"যাতায়াতে ভাঙ্গে কপাট, অন্তঃপুরে যেন হাট,
পুরুষ হ'তে নারীর ভাগ ষোল।"

কেহ ভুতুড়ে ডাকিতে বলিতেছেন, কেহ জল-পড়ার পরামর্শ দিতেছেন, কেহ বা ছেলের রূপগুণ বর্ণন করিয়া না মরিতেই মরা-কান্নার সুর ধরিয়াছেন—

"দাঁড়ালে পীতবসন'পরি, ঠিক যেন গোলোকের হরি,
অমন ছেলে কি গোয়ালার ঘরে বাঁচে?"

কেবল কৃষ্ণদ্বেষিণী জটিলার আনন্দ—

জটিলা বলে, শুন, সই, একটী ধর্ম্ম-কথা কই,
যশোদা মাগীর দেখেছিস্ প্রতাপ!
ছেলে আবার নাই লো কার, ও অভাগীর কি অহঙ্কার!
মনের গুণেতে মনস্তাপ॥
'আমার পুত্র, আমার ধন, নব লক্ষ মোর গোধন,'
অমনধারা গরব করে' কেউ কয় না!
স্বামী পুত্র কেবা কার, চক্ষু বুঁজলে অন্ধকার,
এক দণ্ডের কথা বলা যায় না॥
ও ছেলেটী গোকুলের পাপ, ঘুচ্‌য়ে দিলে, বাপ্ বাপ্!
পাপ গেল, তার তাপ কি লো, দিদি?
গোকুলে কে থাকৃত সতী, সমূলেন বিনশ্যতি,
কর্‌তো—বাঁচ্‌তো বছর দুই আর যদি॥

ঘরে ঘরে মাখন চুরি, কত কাঙ্গালের গলায় ছুরি,
নিত্য দিত, এমনি দয়াহীন !
দানী হ'য়ে পোড়াতো বাটে, মেয়ে হ'য়ে জ্বালাতো ঘাটে,
মেয়ে হ'লে কুল রাখ্‌তো কতদিন ?
কবে কি হ'তো কার কপালে, কালি দিতে কামিনীর কুলে,
কাল-স্বরূপ গোকুলে হয়েছিল।
কালে কালে বাড়্‌তো জ্বালা, অকালে কাল হয়েছিল কালা,
এ আমাদের শুভ কাল হ'ল ॥
কালা কালা সর্ব্বদা করে', কাল-সর্প ল'য়ে ঘরে,
কত কাল কে কাল কাট্‌তে পারে ?
এতদিনে জুড়াল হাড়, কাৎ হয়েছে কালাপাহাড়,
গিয়াছে আজ কালের মন্দিরে ॥"

বাথানে নন্দ এই বিপদের কথা শুনিয়া ত্বরায় বাড়ী ফিরিতেছেন আর ভাবিতেছেন, নিশ্চয় যশোদা মাখন-চুরির জন্য মাখন-চোরকে প্রহার করিয়াছেন ; তাই বাছা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে।

নব লক্ষ ধেনুপাল সবে মাত্র এক গোপাল
সাগর সোসর ক্ষীর সর।
পাপিনী আমার দামোদরে, খেতে দেয় না সমাদরে,
নির্দ্দয়া দেখেছি নিরন্তর।
(যত) বাছা করে "সর সর", পাপিনী বলে, "সর্‌ সর্‌"
অবসর হয় না সর দিতে।
"সর সর" করে' ত্রিভঙ্গ, হয় বাছার স্বরভঙ্গ,
বাক্যশর হানে আবার তাতে ॥"
"অতিশয় দোর্দণ্ড, হস্তেতে করিয়া দণ্ড,
উদ্দণ্ড বধিতে রাণীরে।
দেখি মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর, যশোদা করি যোড় কর,
কহেন ভাসিয়া চক্ষু নীরে ॥
কেন বাক্য অপলাপ, দণ্ড করে' হবে কি লাভ ?—
যেই দণ্ডে গোপাল ভূতলে।
সেই দণ্ডে মরেছি, কান্ত, আর দণ্ড অধিকন্ত,
অধিনীর প্রতি ভ্রমে ভুলে ॥"

এ দিকে, গোকুলে অচেতনে কৃষ্ণের লীলারঙ্গ দেখিবার জন্য স্বর্গ হইতে নারদ আসিতেছেন আর ভাবিতেছেন—

"মন, কর ভাই মনোযোগ, মনের কথা বলি।
সংসারের সুখ সজ্জা, মিথ্যারে সকলি ॥
(যেমন) স্বপনের রাজ্যপদ, মিথ্যা জেনো ভাই।
বালকের ধুলার ঘর, এ ঘর জেনো তাই ॥
ব্যবসাদারের সত্য কথা, মিথ্যা তাকে ধরো।
সতীনে সতীনে পীরিত, মিথ্যা জ্ঞান করো ॥
বাজীকরের ভেল্কী যেমন মিথ্যা জানা আছে।
দৈবজ্ঞের গণনা যেমন স্ত্রীলোকের কাছে ॥
দস্তখৎ বিনা যেমন মিথ্যা খত-পাটা।
দুর্ব্বলের দাঁতখামুটি, মিথ্যা জেনো সেটা ॥
মৃত্যুকালে সবলা নাড়ী, মিথ্যা তাকে ধরি।
চোরের যেমন ভক্তি প্রকাশ, মিথ্যা জ্ঞান করি ॥
ছোট লোকের বুজ্‌রুগি জেনো মিথ্যা নিরন্তর।
(যেন) গাজুনে সন্ন্যাসীর প্রতি ধর্ম্মরাজের ভর ॥
মিথ্যা যেমন জ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত।
স্ত্রীর কাছে আত্মশ্লাঘা—সেটা জেনো মিথ্যা ॥
(যেমন) শতরঞ্চের হাতী ঘোড়া মন্ত্রী ল'য়ে খেলি।
দারা-সুত-ধন-জন—তাই জেনো সকলি ॥"

নারদ আরও ভাবিতেছেন—নিত্য-চৈতন্যরূপী ভগবানের অচৈতন্য-রূপ দেখিতে কেনই বা বৃন্দাবনে যাওয়া ?—ভক্তি থাকিলে আমার মনই ত বৃন্দাবন !

"যদি বল বৃন্দাবন গোলোকের স্বরূপ।
(তথা) গোলোকের ঐশ্বর্য্য ল'য়ে আছেন বিশ্বরূপ ॥
ওহে করুণ হৃদয়, ভক্ত-হৃদয়-মধ্যে তা কি নাই ?
যদি এস, কেশব, হৃদয়ে সব তোমারে দেখাই ॥
সেই যশোদা, দেখাই সদা, সেই রাধা, সেই দূতী।
তুল্য বিধু, গোপের বধূ, সেই মধু-মালতী ॥
সেই নন্দ, সেই সানন্দ, দেখে আনন্দে র'বে।
সেই মধুবন, জুড়াবে জীবন সেই কোকিলের রবে ॥
সেই সব ধন, সেই যে গোধন, সেই গোবর্দ্ধন গিরি।
(এসে) হৃদয়ে আমার, নন্দকুমার, দেখ করুণা করি ॥"

* * *

হৃদি-বৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি।
ওহে ভক্তপ্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধা সতী ॥
মুক্তি-কামনা আমারি, হবে বৃন্দে গোপ-নারী,
(এই) দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী ॥
ধর ধর, জনার্দ্দন, (আমার) পাপ-ভার—গোবর্দ্ধন,
কামাদি ছয় কংস চরে, ধ্বংস কর সম্প্রতি।
বাজায়ে কৃপা-বাঁশরী, মন-ধেনুকে বশ করি.
তিষ্ঠি হৃদি-গোষ্ঠে, পূরাও ইষ্টে, এই মিনতি ॥

(আমার) প্রেমরূপ যমুনা-কূলে, আশা-বংশী-বট-মূলে
সদয় ভাবে স্বদাস ভেবে সতত কর বসতি।
যদি বল রাখাল প্রেমে, (আমি) বন্দী আছি ব্রজধামে
জ্ঞানহীন রাখাল তোমার দাস হবে এই দাশরথি॥"

এই যে সমুজ্জ্বল ভক্তির শান্ত ও স্নিগ্ধ-উচ্ছ্বাস, ভাব ও ভাষা বিজড়িত এই যে ভক্তির সুমনোহর কাব্য-চিত্র, ইহার তুলনা নাই। কৃষ্ণ-প্রাণ নারদের মুখেই ইহা শোভা পায়। লোককে ভক্তিরসে ভিজাইবার জন্যই এই প্রসঙ্গে নারদের অবতারণা এবং কবিত্ব-গুণে তাহা সার্থক হইয়াছে। ইহাতে নিতান্ত পাষণ্ডের মনও ভক্তি-রসে বিগলিত হইয়া পড়ে।

এদিকে স্বয়ং কৃষ্ণই মায়াবলে দ্বিতীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বৈদ্য-বেশে নন্দালয়ে মূর্চ্ছাগত কৃষ্ণকে দেখিতে যাইতেছেন। কত দিগ্বিজয়ী বৈদ্য সেখানে সমাগত! কৃষ্ণও বৈদ্য-বেশে চলিলেন। পথে বৃন্দার সঙ্গে দেখা। কৃষ্ণমূর্ত্তি বালককে বৈদ্যবেশে দেখিয়া বৃন্দা রসাভাবে যাহা বলিলেন এবং "নবীন বৈদ্য" যাহা উত্তর দিলেন—বৃন্দা ও বৈদ্যের সেই উক্তি-প্রত্যুক্তি রস-রচনায় উজ্জ্বল রত্নস্বরূপ :

"বৃন্দা কন করি গদ্য, কোথা যাও, নবীন বৈদ্য?—
দেখ্‌চি নাই বিদ্যা সাধ্য লভ্য।
পাণ্ডিত্য থাকিলে পরে, ত্রিকচ্ছ বসন পরে;—
সে এক চলন সভ্য ভব্য॥
বিশেষ-গণ্য বৈদ্য হ'লে, নরস্কন্ধে প্রায় চলে;
কেউ বা যায় গজ-আরোহণে।
দেখে তোমার হাব-ভাব, হাতুড়ে বৈদ্যের ভাব,
আমার যেন জ্ঞান হচ্চে মনে॥
হাতুড়ে বৈদ্যের জানি রীত, তারা এক ঔষধে দীক্ষিত,
হলাহল, গোদন্তী আর পারা।
ধর্ম্ম-ভয় নাই চিত্তে, ব্যাধের মত জীব-হত্যে
করতে সদা ফেরেন পাড়া-পাড়া॥
খুন করে পড়েন না ধরা, সেই সাহসে ব্যবসা করা,
কি পদ দিয়েছেন জগৎপতি!
কিবা অনুমানের লেখা, কিবা সূক্ষ্ম ধাতু দেখা,
যে নাড়ীতে বায়ু-বৃদ্ধি অতি॥
হাতুড়ে বলেন ধরি হাত, এ ত ঘোর সন্নিপাত!
দধির মাত্‌ শীঘ্র আন্‌তে হয়।
আগে লয়ে দক্ষিণার কড়ি, ঘর্ষণ করিয়া বড়ি,
দর্শন করান যমালয়॥
যে ঔষধ আমবাতে, তাই দেন সন্নিপাতে,
তাই দেন পৃষ্ঠাঘাতে, যকৃৎ, প্লীহা, পাতে।
ঔষধের দোষে ভুগি, আয়ু থাক্‌তে মরে রোগী,
অপমৃত্যু হাতুড়ের হাতে॥
ওহে বৈদ্য, শুন ভাই, সেই লক্ষণ সমুদাই,
দেখ্‌তে পাই আমি তোমার ভাবে।
(তুমি) না জান বচন প্রমাণ, অনায়াসে হারাবে মান,
মিছে নন্দের রাজ-সভাতে যাবে॥
নন্দ গোকুলের শ্রেষ্ঠ পীড়িত তাঁর প্রাণকৃষ্ণ,
দিগ্বিজয়ী বৈদ্য কত এল!
ধন্য গণ্য কবিরাজ, দিবোদাস, কাশীরাজ,
ভোগ দেখে শঙ্কিত সবে হ'ল॥
অশ্বিনী-সুত নকুল, না বুঝে ব্যাধির মূল,
নকুল আকুল রাজ-সভাতে।
কহিছেন ধন্বন্তরি, (আমি) কিরূপে অকূলে তরি!
ভাঙ্গা তরী ভাসাবে তুমি তা'তে!"

(তখন) হেসে কন নন্দকুমার, কি ভঙ্গি দেখে আমার,
ব্যঙ্গ কর, ওহে গোপ-নারি?
বিদ্যা নাই মোর শরীরে, জান্‌লে কি বিদ্যার জোরে'
ভেঙ্গে বল, তবে বুঝ্‌তে পারি॥
তুমি যে পণ্ডিতের ভার্য্যে, চিনি আমি সেই ভট্টাচার্য্যে,
গোরুর বাথানে তাঁর তিনখানা টোল আছে।
(তিনি) পণ্ডিতের শিরোমণি, তুমি হ'চ্ছ তাঁর রমণী,
'স্বামীর টীকা' পড়েছো স্বামীর কাছে॥"

তখন বৃন্দার কাছে বৈদ্য নিজের পরিচয় দিতেছেন—

"অসভ্য দেখিয়ে অঙ্গ, মূর্খ ভেবে কর ব্যঙ্গ,
মোর কাছে অবাক্ বাঘাদিনী।
ডাক্‌তে মাত্র ব্যাধি হরি, সেই মোর নাম 'বৈদ্য হরি'
জিহ্বাগ্রে মোর আয়ুর্ব্বেদ খানি॥"

এই সূত্রে বৈদ্যরাজ তাঁহার কবিরাজী-বিদ্যার যে সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন, তাহা শুনিয়া, (বৃন্দার কেন?) আমাদেরও হরি বৈদ্যের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মে।

"সামান্ত তরুণ জ্বরে, কজ্জলীতে কার্য্য করে,
ত্রিদোষ-কালে হলাহল বিধি।
গেলে জ্বর পুরাতনে, লৌহ খাবে সযতনে,
জ্বরান্তক, জয়মঙ্গলাদি ॥
* * * প্লীহায় গুড়-পিপ্পলী,
শোথে অধিকার দুগ্ধ বটি।
গৃহিণীর ঘোচে গৌরব, যদি হয় নৃপ-বল্লভ,
বালা ধাতে স্বর্ণ-পর্পটি ॥
কাসে বাকসের যশ, * *
ধূর্জ্জটি করেন সব ধার্য্য।
শূলে নারিকেল-খণ্ড, উদরীতে মান-মণ্ড,
রক্তপিত্তে কুষ্মাণ্ড, গলগণ্ড অনিবার্য্য॥
গোমূত্রাদি পঞ্চ-তিক্ত, ভোজনে যায় বাত-রক্ত,
গুগ্‌গুলেতে বাতের বিরাম।
প্রাচীন বৈদ্যগণ ভাষে, সাধ্য রোগ ঔষধে নাশে,
অসাধ্য রোগেতে দুর্গানাম ॥"

ইহার পরে গোটাকতক মুষ্টিযোগের কথাও বাদ যায় নাই। তখন বৃন্দা জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কোন্ শাস্ত্রমতে চিকিৎসা কর ?

"শুনিয়া কহেন হরি, নিদান ব্যবসা করি,
কেউ নাই ইহাতে আমার বড়।"

নিদান, আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসা-পদ্ধতির একতম, রোগের মূলানুসন্ধান করিয়া চিকিৎসা। আবার সাধারণ অর্থ, অন্তিম, অবসান কালও বুঝিতে হইবে। "হরি বৈদ্য" বৃন্দার কাছে যে আত্মপরিচয় দিতেছেন, তাহা কাব্য-গুণে কেবল ঈশ্বরী পাটুনীর কাছে ঈশ্বরীর পরিচয়ের সহিতই তুলনীয় হইতে পারে।

"ধনি! আমি কেবল নিদানে।
বিদ্যা যে প্রকার, বৈদ্যনাথ আমার,
বিশেষ গুণ সে জানে॥
ওহে ব্রজাঙ্গনা, কর কি কৌতুক,
আমারই সৃষ্টি করা 'চতুর্ম্মুখ,'
হরি বৈদ্য আমি, হরিবারে দুখ,
ভ্রমণ করি ভুবনে॥
চারি যুগে মম আয়োজন হয়,
একত্রেতে চূর্ণ কারি সমুদয়,
'গঙ্গাধর চূর্ণ' আমারি আলয়,
কেবা তুল্য মম গুণে!
সংসার-কুপথ্য ত্যজে যে বৈরাগ্য,
জনমের মত করি তায় আরোগ্য,
বাসনা-বাতিক, প্রবৃত্তি-পৈত্তিক,
ঘুচাই তার যতনে॥
আমি এ ব্রহ্মাণ্ডে আনি 'চণ্ডেশ্বর,'
আমারই জেন 'সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর,'
'জয়-মঙ্গলাদি' কোথা পায় নর?—
কেবলই আমার স্থানে।
দৃষ্টিমাত্র দেহে রাখি না বিকার,
তাইতে নাম আমি ধরি নির্ব্বিকার,
মরণের তার কি থাকে অধিকার?—
আমায় ডাকে যে জনে॥"

বলা বাহুল্য, চতুর্ম্মুখ, গঙ্গাধরচূর্ণ, চণ্ডেশ্বর, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর, জয়মঙ্গলাদি দ্ব্যর্থভাবে বুঝিতে হইবে। এগুলি আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধাদির নাম—এবং ইহাদের প্রচলিত সাধারণ অর্থও আছে। তখন বৃন্দা একটু রঙ্গরস করিয়া নিজেদের একটা অদ্ভুত রোগের কথা বৈদ্যকে জানাইলেন—

"যে দিকে ফিরাই আঁখি, কালো কালো সর্ব্বদা দেখি,
কি কাল-পীড়া কপালে ঘটেছে।
ওহে নীলাম্বুজ-রুচি, ঘরে থাকতে হয় না রুচি,
বনে গেলে জীবন যেন বাঁচে॥"
* * * *
"ঘরে রৈতে নারি শ্যামের বাঁশরীতে,
মজিয়ে হরিতে;—
কুল-লাজ পরিহরি, যাই বনে হেরিতে হরি;—
হরি-দেখা রোগ পার কি হরিতে?"

বৈদ্যও রঙ্গরসে, যেমন রোগ, তেমনই ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন;—

"কহেন চিন্তামণি বৈদ্য, এ বাতিক যাবে সদ্য,
একবার একবার করো কৃষ্ণধ্বনি।
কালো জলেতে করো স্নান, কৃষ্ণপক্ষে করো দান,
বিষ্ণুতৈল গায় মেখো লো, ধনি॥" ইত্যাদি

বৃন্দার সহিত এইরূপ নির্ম্মল রসালাপ করিয়া বৈদ্য

নন্দপুরীতে উপস্থিত। বৈদ্যের রূপ দেখিয়াই যশোদা মৃতদেহে যেন প্রাণ পাইলেন, ভাবিলেন—এ যে কৃষ্ণই; কেবল বৈদ্য-বেশে আসিয়াছে মাত্র। তখন,

"কৃষ্ণ ভাবেন, এ কি দায়, প্রবোধিয়ে কন যশোদায়,
কেঁদো না, মা, হয়েছে শুভযোগ।
আমি নই, মা, তোর হরি, হরি-বৈদ্য নাম ধরি,
হরিব হরির মূর্চ্ছা রোগ ॥"

সরল বিশ্বাসে সরলা যশোদারাণী তখন বৈদ্যের কাছে মূর্চ্ছাগত কৃষ্ণের আরোগ্যার্থে কতই না ব্যাকুলতা জানাইলেন!

"তখন প্রভু চিন্তামণি, মন্ত্রণার শিরোমণি
আনি এক মৃত্তিকার ঘট।
নহে স্থুল, নহে ক্ষুদ্র, সহস্র করিয়ে ছিদ্র,
কহিছেন বচন দুর্ঘট ॥
(ব্রজে) যদি থাকে কেউ সতী নারী
এই কলসে আন বারি;
অসতীর কক্ষে না আসিবে।
দেখ্‌বে কেমন বৈদ্য বটি,
সেই জলে বাঁটিয়ে বটি,
দিলে গোপাল চৈতন্য পাবে ॥"

বৃন্দাবনে ছিলেন রাধিকার শাশুড়ী "জটিলা" আর ননদী "কুটিলা"—দুজনেই প্রবল সতীত্বাভিমানিনী। কুটিলাই প্রথমে নিঃশঙ্কহৃদয়ে বৈদ্যের আহ্বান স্বীকার করিয়া, ছিদ্র-কলসী কক্ষে দ্রুতপদে জল আনিতে অগ্রসর হইলেন।

"লোককে বলি' জায় বেজায় ঘট ল'য়ে কুটিলে যায়;
ডুবায়ে কুম্ভ যমুনার জলে।
যত বার কক্ষে তোলা রক্ষে হয় না এক তোলা,
দুঃখে বক্ষে ধারা ব'য়ে চলে।"

তাই দেখিয়া কুটিলার মা জটিলা ত আগুন!—

"কি করলি, ছি লো, ছি লো, গর্ভে মরণ ভাল ছিল,
জান্‌লে মার্‌তাম স্থতিকা-ঘরে টিপে।
দিলি নির্ম্মল কুলে টীকে, টিক্‌টিক্ কর্‌বে লোকে,
টি'কতে পার্‌বো না কোনরূপে ॥
আমি জানি, মোর লক্ষ্মী মেয়ে! অভাগীর সঙ্গ পেয়ে,
খেয়ে বুঝি ফেলেছিস্ মোর মাথা!
আমাদের সে এক কাল ছিল,— এখনকার অভাগীগুলো,
লজ্জা নাই—সজ্জা নিয়েই কথা ॥" ইত্যাদি

এখানে এই প্রসঙ্গে কবি তখনকার বিলাসিনী-দিগের বিলাসের উপরে বেশ একটু তীব্র কটাক্ষ করিতে ভুলেন নাই। কবি তাঁহার সব পালাতেই অবসর পাইলেই এইরূপ এবং অন্যান্য তৎসাময়িক কুনীতি, কুরীতির উপরে বিলক্ষণ বিদ্রূপ প্রয়োগ করিয়াছেন।

লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে এইরূপ বিদ্রূপের যথেষ্ট সার্থকতাও আছে। সমসাময়িক কবি ঈশ্বর গুপ্তের মত দাশরথিরও সরস বিদ্রূপ করিবার শক্তি অসাধারণ ছিল।

"জটিলে নানা ছলে বলে', বলে—চল্‌লাম আমি জলে,
ঘট দেও, হে বৈদ্য গুণ-সিন্ধু!
বলে' গিয়ে মহাতুলে, জলে ডুব্‌য়ে দেখে তুলে,
ঘটে জল থাক্‌লো না একবিন্দু ॥"

তখন "সতী হ'য়ে অসতী" হইতে হইল দেখিয়া জটিলা বৈদ্যের প্রতি ঝাল ঝাড়িতে লাগিলেন—

"হতভাগার ভোগায় ভুলে, ভাঙ্গা ঘটে জল তুলে,
ঘটে কলঙ্ক মিছে—কই কারে?
যাউন বৈদ্য যমের বাড়ী, ছিদ্র যাতে চৌদ্দ বুড়ি,
তাতে কেউ কি জল আন্‌তে পারে?
আঁজ্‌লা পেতে রৌদ্র ধরা, পাষাণের সত্ত্ব বা'র করা,
বসনেতে আগুন বেঁধে আনা!
কাণ দিয়ে বাজায় শিঙ্গে, ডেঙ্গায় চালায় ডিঙ্গে
সাধ্য হেন করে কোন্ জনা?
কার্ সাধ্য কোন্ কালে, জল দিয়ে প্রদীপ জ্বালে,
জলে আগুন কে দেয় কোন্ দেশে?
হতভাগার কথা শুনে, মায়ে ঝিয়ে মনাগুনে,
জ্বলে ম'লাম জল আন্‌তে এসে!"

এখন যশোদার মনোভাব ভাবিয়া দেখুন। তাঁহার প্রাণকৃষ্ণ মূর্চ্ছাগত; বৈদ্যও উপস্থিত; কিন্তু কত কত সতীত্বাভিমানিনীরাও যেমন কুম্ভ লইয়া গিয়াছেন, তেমনই শূন্য-কুম্ভ-কক্ষে ফিরিলেন—কেহই জল আনিতে পারিলেন না।

"(তখন) যশোদা সঙ্কট ভাবে, ছেলে পাই না জলাভাবে !
উন্মাদিনী হ'য়ে রাণী বলে।
ওরে বৈদ্য বাছা, বল সকলে হ'ল দুর্ব্বল
বল্ তবে রে আমি যাই জলে ॥"

এইবার হরি বৈদ্য উভয়-সঙ্কটে পড়িলেন। প্রকৃত কথা অন্তরে জানিয়াও লোক-মধ্যে যে আদর্শ সতীত্বের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তিনি বৃন্দাবনে সর্ব্বজন সমক্ষে অলৌকিক পরীক্ষা-ফাঁদ পাতিয়া বসিয়াছেন, সেই কায়মনোবাক্যের সতীত্ব-পরীক্ষায় যশোদাও উত্তীর্ণা হইতে পারিবেন না, ইহা তিনি মনে মনে বেশ জানেন। সচরাচর যাহাকে "সতী" বলে, জটিলা-কুটিলা তাহা হইয়াও সেই আদর্শ-সতীত্বের পরীক্ষায় ফেল্ করিল, ইহা তিনি লোককে দেখাইলেন। জল আনিতে গেলে যশোদারও সেই দশা ঘটিবে, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু পুত্র হইয়া মা-কে এরূপে সর্ব্বজন-সমক্ষে নিদারুণ অবমানিত করা কোনমতেই চলে না। তাহা হইলে, রাধিকার কলঙ্ক-ভঞ্জন, তথা আদর্শ সতীত্বের প্রতিষ্ঠা হইল কৈ ?—

"(তখন) মনে মনে করে কৃষ্ণ আপন হৃদয়।
যদি বারি আন্‌তে মা-যশোদা আপনি যায় ॥
অপমান করিতে নারিব আমি তবে।
প্যারীর কলঙ্ক তবে কিরূপেতে যাবে ?"

এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া সুকৌশলী হরি বৈদ্য কৌশলে যশোদাকে নিবৃত্তা করিলেন।

"বৈদ্য কন, আন্‌তে নীর উচিত হয় না জননীর,
মাতৃহস্তে ঔষধ বারণ।
বিষ-বড়ি মায় দিলে করে, সুধাতুল্য গুণ করে,
হয় না তায় ব্যাধির দমন ॥"

এইরূপে মাতাকে নিবৃত্ত করিয়া বৈদ্য জ্যোতিষ-বলে সতী-গণনায় বসিলেন। তিনি যেমন কবিরাজীতে ও মুষ্টিযোগে, তেমনই জ্যোতিষেও সুপণ্ডিত। খড়ি পাতিয়া পঞ্চাশ ঘরে পঞ্চাশ অক্ষর লিখিয়া —

"কন বৈদ্য গুণমণি, এসো অনেক রমণী,
হস্ত দেও, বাসনা যে ঘরে।
শুনে এক ধনী ত্রস্ত, "র"এর ঘরে দিল হস্ত,
বৈদ্য কন—সতী আছে নগরে ॥"

কিন্তু র-অক্ষরে রমণীও সেখানে বহু ছিল। সকলকে ডাকা হইল—

"রাসমণি, রাজমণি, রামমণি, রঙ্গিনী।
রাজকুমারী, রাজেশ্বরী, রঙ্কে, রতনমণি ॥
রামা, রসিকে, রসদায়িকে, রসমঞ্জরী, রতি।"

—ইত্যাদি অনেকে আসিল। চতুর বৈদ্যরাজ তাহাদিগকে দেখিয়াই বলিলেন—

"এ সব গোপিকা, কেবল ব্যাপিকা,
সতী নহে একজন।
কেবল এক সতী, ভূত ভবিষ্যতি—
তত্ত্ব কথা হৃদে জানে।
আছে সে রমণী, নারীর শিরোমণি
(এখন) চিন্তামণি-পদ-ধ্যানে ॥

* * * *

"এক সতী বসতি করে এই ব্রজ-মণ্ডলে।
চিন্‌তে নারে তারে গোকুলে, ডাকে সকলে রাধা বলে।
গতিবিহীনগণ-গতি, দুর্গতি-বিনাশিনী,
গোবিন্দপ্রিয়া গুণময়ী, গোলোক বাসিনী ;
সে ধনী গোপের কন্যা—গোপনে গোকুলে ॥" ইত্যাদি

তখন রাধিকার ডাক পড়িল। রাধিকা স্তম্ভিতা হইলেন—যে কার্য্যে জটিলা-কুটিলা দম্ভে, নির্ভয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেই কার্য্যে রাধিকা, যিনি জীবনে কৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও মনে স্থান দেন নাই, সেই কৃষ্ণৈক-প্রাণা রাধিকা ভীতা, স্তম্ভিতা হইলেন ; ভাবিলেন, ভগবানের একি অদ্ভুত লীলা, কি ভীষণ পরীক্ষা ! কিন্তু ভগবানের আহ্বান, অবহেলার সাধ্য নাই।—

"ল'য়ে ছিদ্র-ঘট কক্ষে, ঘন ঘন ধারা চক্ষে"
রাধিকা কৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে চলিলেন।

"এত বলি' হ'য়ে কাতরা, যমুনায় গিয়ে ত্বরা,
জলে কুম্ভ দিতে কাঁপে অঙ্গ।
(যেমন) ভুজঙ্গ-গহ্বরে কর, দিতে অতি দুষ্কর,
(বলে) পাছে ধরে ভুজে ভুজঙ্গ ॥"

পাঠক, মনে করিয়া দেখুন, ঐ ছিদ্র-কুম্ভ জলে ডুবাইতে জটিলা কুটিলার মনে কোন দ্বিধাই হয় নাই। ইহাকেই বলে—Fools rush in where angels fear to tread। কি জানি, যদি মনেরও অজ্ঞাত-

সারে বা স্বপ্নেও যদি কখন মনে পাপ-চিন্তার উদয় হইয়া থাকে ! ইহাই রাধিকার ভয়ের কারণ।

"তাপেতে তনু বিবর্ণ, ঘন ঘন ঘন-বর্ণ
স্মরণ করিয়ে কন প্যারী।
লজ্জা ভয়ে অঙ্গ দহে, কি বিবন্ধ, গোবিন্দ হে,
ঘটালে ঘটেতে ছিদ্র করি॥
ধরিয়ে কলঙ্ক-ডালি, তুলে দিলে দাসীর শিরে।
বুঝিলাম, হে দীননাথ, ডুবালে দুঃখিনীরে দুঃখ-নীরে॥
ফেল নাই, হে হরি, তুমি অদ্য যশোদায় দায়।
কেবল রাধার শত্রু হাসাবে তুমি পায় পায়॥
একান্ত তোমার পদে, সঁপে হে শ্রীমতী মতি।
তোমাকে ভজিয়ে আমার এই হ'ল সঙ্গতি-গতি॥
একে ত ব্রজের মাঝে নামটী কলঙ্কিনী কিনি।
(আমার) কালী জানেন মনের কালি কালভয়-ভঞ্জিনী যিনি॥
এইরূপে শ্রীমতী কত মিনতি যুগ্ম-করে করে।
দয়া কর, হে দয়াময়, দাসী তবে সত্বরে তরে॥
তবে হয় প্রত্যয় জানিব বাঁচালে অপরাধে রাধে।
জল মধ্যে দেখা দিয়ে স্থান দাও বিপদে পদে।"

ত্রেতাযুগে একদিন লঙ্কার সমুদ্র-তীরে অগণ্য লোক-রাশির সমক্ষে রামৈকপ্রাণা সীতার ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষা হইয়াছিল। আজ বৃন্দাবনে গোপ-নরনারীর সমক্ষে রাধিকার পরীক্ষা তেমনই অদ্ভুত, অলৌকিক ও লোমহর্ষণ! ভগবৎ-কৃপায়, সীতার ন্যায়, রাধিকাও অলৌকিক সতীত্ব-গুণের প্রতিষ্ঠা প্রতিপাদন করিলেন। তখন,

"লয়ে বারি রাজকুমারী যান রাধা রঙ্গিনী।
'জয় রাধা জয় রাধা' রব করে যত সঙ্গিনী॥"

কিন্তু যাঁহার দেহ-মন-প্রাণ সকলই কৃষ্ণ-চরণে নিবেদিত, তিনি এ প্রশংসা-বাদ স্বীকার করিবেন কেন?—

"শুনে ধ্বনি প্যারী ধনী কহেন সহচরীকে।
সই গো, নয় রাধার জয়, জয় দেও মোর হরিকে॥

* * * *

ছিদ্র ঘটে জল ল'য়ে যাই আমি যে নন্দ-ভবনে।
এ আমার শ্যামের কীর্ত্তি, শুন, গো, সখি শ্রবণে॥
যার কীর্ত্তি তারই জয় বল্‌তে হয় সখনে।
'রাধা জয় জয়' বল সখি তোমরা রাধার কি গুণে॥"

তখন সেই সতীর জল অঙ্গে সিঞ্চন মাত্র কৃষ্ণের মূর্চ্ছাপনোদন হইল। চৌদ্দ বৎসরের পরে রামকে পাইয়া কৌশল্যার যেমন আনন্দ হইয়াছিল, আজ যশোদা তেমনই আনন্দে কৃষ্ণকে কোলে করিলেন। কিন্তু ইহাতেও কবির মনস্তৃপ্তি হইল না। চিত্র যেন অসম্পূর্ণ দেখাইতে লাগিল। তাই তিনি এক রমণীকে দিয়া বলাইলেন—

"এক রমণী প্রতিবাসিনী, নারী এসে কহিছে রাণী,
বল দেখি, গো নন্দরাণি, তোর কি দয়া নাই?
জীবন আন্‌লে রাজার মেয়ে,
(তোর) জীবন উঠলো জীবন পেয়ে,
নৈলে ত জীবন যেয়ে শোকানলে মরুতে॥
চন্দ্রমুখী শ্রীরাধিকে, বাঁচালে তোমার প্রাণাধিকে,
আগে চন্দ্রবদনীকে, হয় কোলে করতে॥
রাণী বলে, মরি মরি, আয় কোলে, মা রাজকুমারি,
তোর গুণে পেলাম, গো প্যারি, প্রাণের কৃষ্ণধনে।
তো হ'তে সুখ জন্মায় অতি, হ'য়ে থাক জন্মায়তি,
তুমি, মা, সাবিত্রী সতী, এই বৃন্দাবনে॥
(তখন) দক্ষিণ কোলেতে হরি, বামে ল'য়ে রাইকিশোরী,
রাণী যেন রাজরাজেশ্বরী, দাঁড়ালেন উল্লাসে।
আ মরি, কি পুণ্য-ফল, যশোদার জন্ম সফল,
সোনার গাছে হীরের ফল ফল্‌লো দুই পাশে॥

* * * *

বামভাগেতে শ্যামমোহিনী শ্যামচাঁদ শোভিছে দক্ষে।
কি শোভা যুগল-রূপ, যশোদার যুগল কক্ষে॥
ব্যাকুলা হ'য়ে নন্দনারী, বলে কিছু বুঝিতে নারি,
রাই হেরি কি শ্যাম হেরি, কোন্ রূপের করি ব্যাখ্যে॥
(কিবা) বর্ণ রাধা-কমলিনী, স্বর্ণ-সরোজিনী জিনি;
নীলমণি নির্ম্মল আমার নীলকান্তাপেক্ষে;—
দাশরথি কহে বিশিষ্ট, পাপ-নয়নে নহে দৃষ্ট,
এক-অঙ্গ রাধা-কৃষ্ণ, (একবার) দেখ জননি, জ্ঞানচক্ষে॥"

এখন চিত্র সম্পূর্ণ হইল। পাঠক একবার "জ্ঞান-চক্ষে" দেখিয়া নয়ন-মন সফল করুন।

এই ক্ষুদ্র খণ্ড-কাব্যখানি ভগবদ্ভক্তির কি চমৎকার চিত্র। রাধিকা ইহাতে মূর্ত্তিমতী প্রেম-ভক্তি, নারদে শান্ত-রসের কবিত্বপূর্ণ ব্যঞ্জনা, যশোদায় বাৎসল্য-রস উচ্ছলিত, এবং বৃন্দা ও হরি-বৈদ্যের রসালাপে নির্ম্মল হাস্যরস মুখরিত। কায়-সতীত্ব অপেক্ষাও উচ্চতর

সতীত্বের আদর্শ-প্রতিষ্ঠাই লোকশিক্ষায় এই কাব্যের উদ্দেশ্য। তাই, জটিলা-কুটিলার কায়-সতীত্বকে নিষ্প্রভ ও প্রতিহত করিয়া, রাধিকার কায়মনোবাক্যের সতীত্বকেই সমুজ্জ্বল করিয়া দেখান হইয়াছে। তবু যদি কোন সমালোচক ইহাতে কাব্য-সৌন্দর্য্য না দেখিতে পান, তবে সমালোচকেরই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। দেশের লোক-সমাজ, এমন কি, কাব্যরসজ্ঞ পণ্ডিত-সমাজও ইহার যথেষ্ট সমাদর করিয়াছেন এবং যতদিন লোকের মনে ভক্তিরসের বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, ততদিন এরূপ রস-সৌন্দর্য্যোজ্জ্বল কাব্যের অনাদর হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই।

শ্রীদীননাথ সান্যাল।

বসুন্ধরা

এই যে বিরাট বিপুল বসুধা—এ যেন গো এক রত্নশালা,
শত মুকুতার দীপ্তি লভিয়া চারিদিক্ তার হয়েছে আলা ;
গৃহখানি এর করিয়া উজল
বসে আছে সব অপ্সরী দল,
হস্তে তাদের লীলা শতদল, কণ্ঠে শোভিছে মোতির মালা।

মানসলোকের ক্ষুধা মিটাইতে জ্ঞান-মদিরায় পাত্র ভরি—
বসে আছে বাণী বিশ্বের রাণী কিরণোজ্জ্বল কমলোপরি ;
ওই কমলের সুরভি আহরি
শতকোটি পিক্ উঠে গুঞ্জরি,
বিশ্ব-হৃদয় নন্দিত করি সঙ্গীত যেন পড়িছে ঝরি।

মিটাইতে ক্ষুধা সব আছে হেথা, তবু যেন নাই প্রাণের সাড়া,
প্রীতির মাণিক নাই হেথা নাই, ঝরেনা তাহার রশ্মি ধারা;
মলিন করিয়া এ শোভন পুরী
সে মহা রতন কে করিল চুরি,
কোন্ দেবতার অভিশাপে হায় ধরণী হয়েছে জীবন হারা !

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

মধ্য এসিয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম

নৈরঞ্জার নদীতীরস্থিত বোধিদ্রুমমূলে ধ্যাননিমগ্নাবস্থায় শাক্যসিংহ গৌতম প্রথম সম্বুদ্ধত্ব লাভ করেন। তাহার পর বারাণসীতে আসিয়া প্রথমে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া তিনি যে নূতন তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছেন তাহাই প্রচার করেন। যে "মধ্যম পথের" বিষয়ে তিনি তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা "ধম্মচক পবত্তন সুত্ত" পাঠে অবগত হওয়া যায়। নির্ব্বাণ লাভের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচারের বিরাম ছিল না। প্রতিদিন অক্লান্তভাবে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া সুমধুরস্বরে তৎপ্রবর্ত্তিত চতুরার্য্যসত্য, পঞ্চশীল, অষ্টাঙ্গমার্গ, সপ্তবোধ্যঙ্গ, প্রভৃতি নির্ব্বাণপথের সোপান সমূহ নির্দ্দেশ করিয়া বহু ভাগ্যবানকে অর্হত্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপায় বলিয়া দিতেন। কখন বা শ্রাবস্তীতে তাঁহার প্রিয় উপাসক অনাথ পিণ্ডিকের জেতবনারামে, কখনও বা রাজগৃহে বেণুবনারামে, কখনও বা শিশুমার পর্ব্বত সন্নিহিত ভেষকলাকুঞ্জে, কখনও বা কৌশাম্বীস্থিত ঘোষিতারামে তাঁহাকে ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে দেখিতে পাই। আনন্দ, কশ্যপ, সারিপুত্র, মৌদ্‌গলায়ন প্রভৃতি তাঁহার প্রিয় শিষ্যগণ তীর্থিকগণের ভ্রান্ত ধর্ম্মপন্থার অসারতা প্রতিপাদন করিয়া সদ্ধর্ম্মের প্রচার পরিকল্পে বহুযত্ন করিয়াছিলেন, অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। সমগ্র মগধরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের ভূয়িষ্ট প্রসার হইয়াছিল বটে, কিন্তু তবুও তাহা অন্যান্য ধর্ম্মের একেবারে উচ্ছেদ সাধন করিতে পারে নাই; কেবলমাত্র মগধেই সম্প্রদায়-বিশেষের ধর্ম্ম হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির পর হইতে রাজা অশোকের সিংহাসনারোহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম বৈদিক, জৈন প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মসমূহের সহিত পাশাপাশি অবস্থিত ছিল। গিরিলিপি সমূহ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে সম্রাট্ অশোক বৌদ্ধধর্ম্মের বৃদ্ধি, প্রসার ও সমুত্থান দর্শনে অভিলাষী হইলেও অন্যান্য "পাসংডে"র (ধর্ম্মসম্প্রদায়ের) অবমাননা তো করিতেন না-ই, বরং তাহাদের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিতেন। কিন্তু উত্তরকালে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃতির জন্য একমাত্র সম্রাট্ অশোকের উদ্যমকেই (ব্যুত্থান) মুখ্য কারণ বলিয়া ধরিতে হইবে। যদি অশোকের আবির্ভাব না হইত, যদি তিনি বৌদ্ধধর্ম্মকে সাম্রাজ্য-ধর্ম্মের (State Religion) সুবর্ণপীঠে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া তাহার বৃদ্ধির জন্য সম্যক্ উদ্যম না করিতেন, তাহা হইলে কি আজ বৌদ্ধধর্ম্ম সমগ্র পৃথিবীর তৃতীয়াংশ পরিব্যাপ্ত করিয়া অসংখ্য নরনারীর সেব্য, পূজ্য, আরাধ্য হইত? বৌদ্ধধর্ম্ম তাহা হইলে আসমুদ্র ভারতবর্ষ কেন, মগধের সীমাও লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইত কিনা সন্দেহ—বোধ হয় আজ সম্প্রদায় বিশেষের গণ্ডীর ভিতর নিবদ্ধ থাকিয়া ভারতের বহু অখ্যাত অজ্ঞাত ধর্ম্মসমূহের অন্যতম হইয়া রহিত। যে বোধিদ্রুমমূলে শাক্য গৌতম তাঁহার প্রথম উদ্বোধন লাভ করিয়াছিলেন, তাহার শাখা ভগ্ন করিয়া যদি সঙ্ঘমিত্রা ভারত হইতে নীলাম্বুবেষ্টিত তাম্রপর্ণী দ্বীপে উপস্থিত হইয়া অনুরাধাপুরে তাহা প্রোথিত না করিতেন, যদি সিংহলরাজদুহিতাগ্র রাজকুল-যোষিদ্বর্গকে উপসম্পদা না দিতেন. যদি কাষায়ধারী মহেন্দ্র সুদূর মগধ হইতে আসিয়া সিংহলরাজ দেবানাম্ পিয়তিস্‌সকে বৌদ্ধমন্ত্রে দীক্ষিত না করিতেন, তাহা হইলে কি আজ অনর্ঘবিহার গাত্রে শিল্পকলার চরমোৎকর্ষ জাতকচিত্র সমূহের বিকাশ হইত? না মহাবিহার, রুবনবেলি, ডাগব প্রভৃতি অপূর্ব্ব পৌর্ত্ত ও ভাস্কর্য্যশিল্পের স্ফূর্ত্তি হইত?

কলিঙ্গবিজয়ের অব্যবহিত পরেই অশোক উপাসকাবস্থা অতিক্রম পূর্ব্বক উপসম্পদা গ্রহণের পর সঙ্ঘের মধ্যে প্রবিষ্ট হন। যেমন তিনি সাম্রাজ্যের কর্ত্তা ছিলেন, সেই রূপই সঙ্ঘেরও কর্ত্তা থাকিয়া তাহার সংরক্ষণের জন্য যথাসাধ্য ব্যবসিত হইলেন। সাঁচি ও সারনাথ লিপি পাঠে জানিতে পারি যে "সঙ্ঘের" সমগ্রতা রক্ষণের জন্য তিনি কিরূপ যত্নপর ছিলেন, এবং

সঙ্ঘের মধ্যে যাহারা বিবাদ বিচ্ছেদ জন্মাইয়া উহাকে হীনশক্তি করিবার প্রয়াস পাইত,—কাষায়ধারণের অনুপযুক্ত সেই বিরোধজনয়িতা ব্যক্তিগণকে সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া কিরূপে শুভ্রবসন পরিধান করাইয়া তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিতেন। এইরূপ নানাবিধ উপায়ে প্রতিকূল বিঘ্ন সমূহকে নাশ করিয়া ধর্ম্মের প্রসারের নিমিত্ত পশ্চিমে যবনরাজ্যসীমা-স্পৃষ্ট এসিয়া মাইনর হইতে পূর্ব্বে সুবর্ণভূমি পর্য্যন্ত, উত্তরে হিমানীমণ্ডিত "হিমবন্ত" প্রদেশ হইতে দূর দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভূমিভাগে তাঁহার বিরাট রাজশক্তির চালনা করিতেন। যবনরাজ এণ্ডিয়োক্রথিয়স, ইপাইরসের গ্রীকরাজ, মিশরের রাজা ফিলাডেলফস ও রাজভ্রাতার সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ ছিল এবং তাঁহার প্রভাবে তত্তদ্দেশ সমূহে তৎপ্রতিষ্ঠিত সদনুষ্ঠান সকলের আচরণও হইত। ইহাতেই পরবর্ত্তিকালে বৌদ্ধধর্ম্মের পক্ষে প্রসারতা লাভের পন্থা সুগম হইয়াছিল। অবশ্য অশোকের অনেক পরে মধ্য-এসিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। তিব্বত, চীন, কোরিয়া, জাপানও ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করে। সিংহলদেশে প্রচলিত কিম্বদন্তীতে বৌদ্ধধর্ম্ম যাচকদের একটা তালিকা পাওয়া যায়। কিম্বদন্তী বলিয়া একেবারে তাহা ভিত্তিহীন নহে—ঐতিহাসিক সত্যেরও তাহাতে নিদর্শন আছে। * ঐ তালিকা হইতে জানা যায়, সম্রাট্ অশোক ধর্ম্মপ্রচারের নিমিত্ত কিরূপ উদ্যোগ করিয়াছিলেন। আমার মনে হয় তাঁহার উদ্যোগ ব্যতিরেকে বৌদ্ধধর্ম্ম "জগতের ধর্ম্ম" (World-Religion) হইতে পারিত না। আর তাহা হইলে ফা-হিয়ান, সন-ইয়ুঙ, উয়ান-চোয়াঙ, ইৎসিন প্রভৃতি চীন পরিব্রাজকগণ দুর্গমপথের প্রভূত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, অশেষ দুঃখকষ্টকে তুচ্ছ করিয়া তাহাদের "জুলের" জন্মভূমি তীর্থস্বরূপ ভারতে আসিতেন না ; প্রধান প্রধান শিক্ষার পীঠস্থানে চারি-পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত অবস্থান পূর্ব্বক যত্নের সহিত সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া বিনয়াদি ধর্ম্মপুস্তক সমূহের অধ্যয়নও করিতেন না। এই সব ধর্ম্মপ্রাণ পরিব্রাজকগণ শুধু এখানে থাকিয়া পড়াশুনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। যাহাতে নিজদেশে গিয়া অবসরক্রমে সংস্কৃতে লিখিত পুঁথিগুলি নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িতে পারেন তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের সাহায্যে উয়ান-চোয়াঙ এত পুথি সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন যে তাহা বহিতে কুড়িটা সবলকায় অশ্বের আবশ্যক হইয়াছিল। অশোক না জন্মিলে কি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের এই বিস্তৃতি ঘটিত ?

যে সমস্ত চীন পরিব্রাজকগণ চীন হইতে ভারতবর্ষে যাতায়াত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের রাস্তা ছিল মধ্য এসিয়ার ভিতর দিয়া। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যের সময় বসুবন্ধু প্রমুখ যে-সমস্ত ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতে গিয়াছিলেন, এবং ভারত হইতে যে সমস্ত দূতের গমনাগমন হইয়াছিল, তাহাও সেই মধ্য এসিয়ার পথেই। হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে এবং তাঁহার মৃত্যুর পর কান্যকুব্জের বিপ্লবের সময়ে যে চীন সেনাধ্যক্ষ হর্ষবর্দ্ধনের প্রকৃত উত্তরাধিকারীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকেও সেই মধ্য এসিয়ার উপর দিয়াই আসিতে হইয়াছিল। বাস্তবিক স্থলপথে ভারতের সহিত বহির্ভারতের যে আদান প্রদান হইয়াছিল তাহার সঙ্গমক্ষেত্র এই মধ্যএসিয়া। তাই মধ্য এসিয়া প্রাচ্য জগতের যেন একটা মহীয়ান তীর্থস্বরূপ। কেন না, এই পুণ্যপ্রণালীতে জগতের সভ্যতার নানা ধারা আসিয়া মিশিয়াছে। ভারত, চীন, তিব্বত, গ্রীস্ ও রোমের অদ্ভুত সম্মিলন এই পুণ্যক্ষেত্রেই সংসাধিত হইয়াছে।

এক সময় এই মধ্য এসিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্মের কতটা প্রসার হইয়াছিল, তাহা দিক্‌চক্রবালাবলম্বী ভীষণ বালুকা সমাধি হইতে উদ্ধৃত জ্ঞাত 'অজ্ঞাত' বিবিধ ভাষায় লিখিত পুঁথি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার বিস্তৃত পরিচয় এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয়। সার

* কিম্বদন্তীতে উল্লিখিত বৌদ্ধ যাজকগণের দুই একজনের নাম সাঁচিস্তূপ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

অরেল ষ্টাইন তাঁহার Ancient Khotan, Sand-buried plains of Khotan, এবং Ruins of Desert Cathay নামক পুস্তকগুলিতে ইহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শেষোক্ত পুস্তকখানি হইতে আমি কেবলমাত্র দুই চারিটির স্থানের বিবরণ উদ্ধৃত করিব।

চীন পরিব্রাজক উয়ান-চুয়াঙ স্বীয় মাতৃ-ভূমিতে ফিরিবার সময়ে যে-পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন, আশ্চর্য্যের বিষয় ষ্টাইন সাহেবও সেই পথেরই অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। শতদ্রু ও সিন্ধু নদের তীর হইতে যাত্রা করিয়া সোয়াট, ভির ও চিত্রলের মধ্য দিয়া তিনি অক্সস্ নদীর উৎপত্তি স্থান পর্য্যন্ত আসেন। তাহার পর কাশঘর, ইয়ারখণ্ড, কারয়ালিক, খোটান, খাদালিক, নিয়া, এনডিয়ার, চারচান, চার্কলিক, লপ-মরু, লপ-নর, তারিম অববাহিকা, মিরণ, টুন হোয়াঙ্গ, আন-সি ও "অসংখ্য বুদ্ধের" উপত্যকার ভিতর দিয়া পশ্চিম চীনে উপস্থিত হন। কত বাধা বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল তাহা পড়িতে পড়িতে দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠে। কিন্তু প্রত্যেক স্থলেই আশাতীত রত্নলাভ করিয়া, তিনি দুঃখ কষ্টকে গণনার মধ্যেই আনেন নাই। এই সমগ্র প্রদেশ একসময় সংখ্যাতীত বৌদ্ধস্তূপ ও মন্দিরে পরিকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, এখন কেবল তাহার অস্থি ও কঙ্কাল অবশিষ্ট থাকিয়া সতের আঠার শতাব্দীর পূর্ব্বে যে সভ্যতা বর্ত্তমান ছিল, যে বিশিষ্ট শিল্প কলার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে।

খাদালিকে ধ্বংসপ্রাপ্ত এক বৌদ্ধ বিহারের অভ্যন্তরে কাগজে লিখিত কতকগুলি পুথি পাওয়া গিয়াছে। অক্ষরগুলি বড় বড়,—'গুপ্ত' অক্ষর,—ভারতীয় অক্ষরেরই মধ্য-এসিয়া সংস্করণ। সুসংরক্ষিত অবস্থায় বৌদ্ধ সংস্কৃতে লিখিত পুথির তিন খানি পাতাও পাওয়া গিয়াছে। অন্যান্য কতকগুলি পুথির অক্ষর ভারতীয় ব্রাহ্মী অক্ষর বলিয়া বিবেচিত হয়।

৩৬ ইঞ্চি লম্বা ১০ ইঞ্চি চওড়া কতকগুলি কাগজের এক পৃষ্ঠে, সুন্দর চীন অক্ষরে চীন-বৌদ্ধ পদ ও তাহারই অপর পৃষ্ঠে ব্রাহ্মী-অক্ষরে সেই-পদই লিখিত হইয়াছে। অতি নিপুণতার সহিত চিত্রিত শত শত কাষ্ঠ-খণ্ড বৌদ্ধ অর্হৎবৃন্দের প্রতিকৃতির পরিণাম দর্শাইতেছিল। বিহার গাত্র হইতে যে পলস্তর খসিয়া পড়িয়াছিল তাহাতে অনবদ্য চিত্রাঙ্কনের প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়া বোধিসত্ত্ব অথবা গন্ধর্ব্বগণ সেখানে লুটাইতেছিল। আর একটা বৌদ্ধ বিহার গাত্র অসংখ্য বুদ্ধমূর্ত্তি দ্বারা পরিমণ্ডিত হইয়াছে। নানা ভঙ্গীতে বুদ্ধদেব চিত্রিত হইয়াছেন—কোথাও তিনি ধর্ম্মোপদেষ্টা, কোথাও উপবাসক্লিষ্ট আর কোথাও বা অনুচরগণ কর্ত্তৃক পূজিত। ভূর্জ্জবৃক্ষের বন্ধলের উপর লিখিত বৌদ্ধ সংস্কৃত ভাষার বহু ধর্ম্ম—সংক্রান্ত পুথি খৃষ্টীয় চতুর্থ অথবা পঞ্চম শতাব্দীর সামগ্রী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। পুথির প্রচ্ছদ পট রূপে ব্যবহৃত কাষ্ট-ফলকগুলিও ব্রাহ্মী অক্ষরের দৌরাত্ম্য এড়াইতে পারে নাই।

তাহার পর 'নিয়া' দৃশ্যের কথা বলিব। এই স্থলে গ্রীক-বৌদ্ধ অর্থাৎ গন্ধার style এর সুন্দর কাযকরা কাঠের চেয়ারের টুকরা, তাঁত বুনিবার উপযোগী যন্ত্রপাতি, বুট তৈয়ারি করিবার লাশ, এবং একটা ইঁদুর ধরিবার কল, বহুকাল বিস্মৃত কোন এক প্রচীন যুগের এক ক্ষুদ্র গৃহস্থালীর নীরব পরিচয় দিতেছে। খরোষ্টি অক্ষরে লিখিত কাষ্ঠখণ্ড, চিঠি-পত্র, হিসাব, চিঠির খসড়া "মেমো" প্রভৃতি দ্রব্য সমূহ দূর অতীতের দৈনিক গার্হস্থ্য জীবনের এক পৃষ্ঠা চোখের সম্মুখে আনিয়া ধরিয়াছে। নিকটেই একটী জায়গা খুঁজিতে একটী ঘরে অসংখ্য "সরকারী" কাগজ-পত্র পাওয়া গিয়াছে। প্রত্যেকটী দু-খানি কাষ্ঠ ফলকে দৃঢ় রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ ও গ্রন্থিস্থলের উপরভাগ Pallas Promachos, সিংহচর্ম্ম পরিহিত দণ্ডধারী Hercules অথবা Zeus মূর্ত্তির মৃন্ময় "শীল" দ্বারা চিহ্নিত। সেগুলি দলিল অথবা আবশ্যকীয় সরকারী কাগজ। শীল না ভাঙ্গিয়া বা রজ্জু না ছিন্ন করিয়া অভ্যন্তরস্থ পত্রের বিষয় অবগত হওয়া অসম্ভব। যাহাতে প্রকৃত অধিকারী ভিন্ন অন্য কেহ উহার বিষয় অবগত হইতে

না পারে সেই উদ্দেশ্যেই এই সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছিল। ষ্টাইন সাহেব এবম্বিধ দু-খানি চিঠি খুলিয়া দেখিলেন যে—"দেবতা ও মানবের চক্ষে সৌম্য দর্শন" মাননীয় শ্রীযুক্ত কোজভো সোজাকার নামে ঐ পত্র দুইটী লিখিত। অধ্যাপক র‍্যাপসন এই কাষ্ঠফলকা-চ্ছাদিত খরোষ্টী অক্ষরে লিখিত কতকগুলি পত্র পরীক্ষা করিয়া, সেগুলি যে সরকারী কাগজ ছিল তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। পত্রের প্রথমেই লেখা আছে—"মহানুঅব মহারায়া লিহতি" অর্থাৎ মহানুভব মহারাজা লিখতি—"মহারাজা আদেশ করিতেছেন।" খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে যে এই প্রদেশের শাসনকার্য্য পরিচালনের জন্য ভারতের ভাষা ও বর্ণ ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহার প্রচুর প্রমাণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে, কি করিয়া এমনটী সম্ভবপর হইল? তাহার উত্তরে উয়ান চুয়াঙ (হোয়েন সাঙ) বলিয়াছেন যে ভারতের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত পালি-জাতক ও অন্যান্য বহুগ্রন্থে উল্লিখিত বিশ্রুত বিশ্ববিদ্যালয় তক্ষশিলার কল্যাণে সেই ভূমিভাগ বিদ্যা ও জ্ঞানের ছটায় বিচ্ছুরিত হইয়াছিল। অতি প্রাচীন কালে এইস্থান হইতেই এক উপনিবেশ খোটানে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তক্ষশিলা সমদ্ভূত হইয়া উঠে। এই প্রশ্নের সমাধান আরও এক উপায়ে হইতে পারে। ভারতের ভাষা এবং বর্ণ—প্রাকৃতভাষা এবং ব্রাহ্মী ও খরোষ্টী অক্ষর—ভারতীয় শকরাজগণ চীনদেশের পশ্চিম ভাগে অবস্থিত লপনর দেশে লইয়া গিয়াছিলেন।

মিরণে বালুকা-সমাধি-মগ্ন বহু স্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তথাকার চিত্রে, ভাস্কর্য্যে ও পৌর্ত্তশিল্পে গ্রীক বৌদ্ধ অথবা গন্ধার Style এর প্রভাব বর্ত্তমান। আসনে উপবিষ্ট প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্ত্তির ছড়াছড়ি। কোথাও বুদ্ধদেব "ধ্যানমুদ্রায়" উপবিষ্ট, কোথাও বা অভয় মুদ্রায় দণ্ডায়মান অবস্থায় অঙ্কিত। এবম্বিধ একটী মূর্ত্তির পাদদেশে সংস্কৃত ভাষায় ও "গুপ্ত ব্রহ্মী" অক্ষরে লিখিত পুথি পরীক্ষা করিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে যে উহা বৌদ্ধ অধ্যাত্ম-তত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ,—খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতেই লিখিত হইয়াছিল। মন্দিরাভ্যন্তরে দেওয়ালের গায়ে অতি মনোরম বিবিধ মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়—কোথাও গন্ধর্ব্বগণ উড্ডীয়মান, কোথাও বুদ্ধদেব ধর্ম্ম বিষয়ে অববাদ করিতেছেন, আর রাজা সমাহিত পুটাঞ্জলি হইয়া তাহাই শ্রবণ করিতেছেন, কোথাও বুদ্ধদেব অভয় মুদ্রায় অঙ্কিত, চতুষ্পার্শ্বে অর্হৎগণ তাঁহার বন্দনা করিতেছেন, আর কোথাও জাতকবর্ণিত রাজপুত্র বেস্‌সান্তর কমণ্ডলু হস্তে দণ্ডায়মান,তাঁহার প্রিয় হস্তী চারিজন ব্রাহ্মণকে দান করিতেছেন।

তারপর টুন-হুয়াঙ। এখানকার লোক সকলেই বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ছিল কিন্তু এই বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটুকু বিশেষত্ব আছে। চীনদেশের লৌকিক ধর্ম্মের সহিত ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের যে সংমিশ্রণ হইয়াছিল সেই অদ্ভুত যৌগিক ধর্ম্মই উহাদের ধর্ম্ম।

এই স্থানে আসিয়া ষ্টাইন সাহেব "সহস্র বুদ্ধের" গুহা মন্দিরে নিহিত অপূর্ব্ব রত্নের সন্ধান পান। তাঁহার অভিযানের দুই বৎসর পূর্ব্বে এখানে একজন 'তাও' ধর্ম্মাবলম্বী ভিক্ষু একটী জীর্ণ পুরাতন মন্দির সংস্কার করিতে করিতে এই গুপ্ত রত্ন আবিষ্কার করিয়াছিল। তাহার পর যক্ষের মত সেই ধন আগলাইয়া বসিয়া ছিল। কত যত্নে কত কৌশলে, কত 'ডিপ্লোমাসি'র সাহায্যে যে সেই রত্নের পুনরুদ্ধার সম্ভবপর হইয়াছে, তাহা পড়িলে বিস্মিত হইতে হয়।

যখন ষ্টাইন সাহেব সেই 'তাও' ভিক্ষুকে তাহার নব-সংস্কৃত মন্দির দেখাইতে বলিলেন, তখন তাহার আর উৎসাহের সীমা রহিল না। মন্দিরের ভিতরটী সুদৃঢ় কাষ্ঠাবরণে মণ্ডিত এবং সমস্তটা চিত্রিত। মন্দিরের ভিতর দক্ষিণ দিকে পলাস্তর-বিহীন ইষ্টক নির্ম্মিত আচ্ছাদনের পশ্চাতে একটী গুপ্ত গুম্ফা। সেই অ কার গৃহ পঞ্জরে বহু শতাব্দের ক্ষয় ও ধ্বংস উপেক্ষা করিয়া অমূল্য গ্রন্থরাজি রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। প্রায় ৪৬ বর্গ-ফিট পরিমিত মন্দিরের মধ্যে একটা উচ্চ বেদীর উপর কতকগুলি নূতন মৃণ্ময় মূর্ত্তি আছে। সে-গুলির সৌন্দর্য্য ত নাই, বরং তাহাদিগকে কুরূপ, কদা-

কার বলা চলে। বেদীর মধ্যস্থলে একটী প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্ত্তি এবং তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া তাঁহার শিষ্যগণ, অর্হৎবৃন্দ ও দিক্‌পালগণ দাঁড়াইয়া আছেন। ভাস্কর্য্যের অবনতি এই মূর্ত্তিগুলি দ্বারা যতই সূচিত হউক না কেন, সেই নিঃস্ব, নির্দ্ধন, ধর্ম্মগত প্রাণ, তাও-ভিক্ষু যে তাহার সুদূর জন্মভূমি শান-শি প্রদেশ হইতে আসিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া সমস্ত ধন মন্দিরসংস্কারে নিয়োজিত করিয়াছিল, তাহা ভাবিলে, তাহার আকুল ধর্ম্মপ্রাণতার কথা স্মরণ করিলে, ভাস্কর্য্যের নিকৃষ্টতা ভুলিয়া যাইতে ইচ্ছা করে!

ষ্টাইন সাহেবকে সেই পুথিগুলি উদ্ধার করিতে অনেক কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। তিনিও যে বৌদ্ধধর্ম্মের গৌরব-বর্দ্ধনের প্রয়াসী তাহাই প্রথমতঃ ভিক্ষুকে বুঝাইলেন। পরিব্রাজকশ্রেষ্ঠ উয়ান-চুয়াঙ্ (হোয়েন্‌থ্ সাঙ)-এর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তির কথা তিনি নানা প্রকারে জানাইলেন। বলিলেন, সেই পরিব্রাজক-প্রবরেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তিনি ভারত হইতে দশ হাজার 'লি' বন্ধুর দুর্গম গিরি কন্দরের ভিতর দিয়া, শুষ্ক ভীতিপ্রদ মরুবালুকা রাশির উপর দিয়া, শত কষ্ট শত বাধা উপেক্ষা করিয়া তাঁহারই এক কালের আশ্রয় স্বরূপ এই দুরধিগম্য মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

মন্দিরাভ্যন্তরে বহু চিত্রের মধ্যে বিশেষভাবে একটী চিত্র তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। হোয়েন্‌থ্ সাঙ এক খরস্রোতা নদীর উপকূলে দণ্ডায়মান, পার্শ্বে সুখ-দুঃখভাগী তাঁহার প্রিয় অশ্বটি হস্তলিখিত ধর্ম্মপুস্তকের অমূল্য ভার বহন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এমন সময় তাঁহাকে নদীর অপর পারে পৌছাইয়া দিবার জন্য সেই সংক্ষুব্ধ উর্ম্মিমালার উপর দিয়া একটী সুবৃহৎ কচ্ছপকে নদীতটে আসিতে দেখা গেল। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ষ্টাইন সাহেব তাও-ভিক্ষুককে বুঝাইলেন যে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসূতি ভারত হইতে এ সব পুথি আসিয়াছিল। যদি ভিক্ষু সাহেবকে ভারতের জিনিষ ভারতেই ফিরাইয়া লইয়া যাইতে দেয়, তাহা হইলে বুদ্ধদেবের এবং ধর্ম্মগ্রন্থগুলির প্রকৃত মর্যাদা রক্ষিত হইবে এবং সেও অক্ষয় পারমার্থিক পুণ্য সঞ্চয় করিবে। এখানে থাকিয়া তো পুথিগুলি কেবলমাত্র নষ্ট হইতেছে, উহার মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিবার লোক এখানে কোথায়? প্রতীচ্যে যে অদ্ভুত বিদ্যামন্দির (British Museum) আছে সেখানে উহারই সংরক্ষণ হইবে, এবং বহু বিদ্বান্ মনীষিগণ তাহা হইতে কত নব নব তত্ত্ব আবিষ্কার করিবেন। এইপ্রকার স্তুতি ও আশ্বাস বাক্যের দ্বারা এবং মন্দিরটির জন্য প্রভূত ধনসাহায্য করিবার অঙ্গীকার করিয়া ষ্টাইন্ সাহেব আবশ্যকীয় পুথিগুলি সেখান হইতে লইয়া আসেন।

সেই তমোময় কূপ হইতে যে বাণ্ডিলগুলি প্রথম বাহির করা হইল, তাহা বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ সমূহের চীন ভাষায় অনুবাদ। কোনওটী কিঞ্চিন্মাত্রও নষ্ট হয় নাই। কাগজ ও অনুষঙ্গিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে তাহা যে বহু পুরাতন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহরই অবকাশ থাকে না। আরও বেশ বুঝা যায় যে, সেগুলি রীতিমত পঠিত হইয়াছিল। চীন ভাষায় লিখিত এই গুটানো (Rolled) কাগজগুলির সঙ্গে তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত আরও অনেক গুটানো কাগজ পাওয়া গেল। সেগুলি যে তিব্বতের প্রসিদ্ধ "তাঞ্জুর" ও "কাঞ্জুর" নামক ধর্ম্মপুস্তক তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। এই চীনা কাগজগুলির উল্টা পিঠে ভারতীয় ব্রাহ্মী অক্ষরে (Indian Brahmi Script) লিখিত পংক্তি মাঝে মাঝে দেখা যায়। কোনও তর্ক ও বিসম্বাদের অপেক্ষা না রাখিয়া নিঃসঙ্কোচভাবে বলা যায় যে, যে দূর অতীতে মধ্য এসিয়াতে বৌদ্ধধর্ম্মের চর্চ্চায় সংস্কৃত ভাষা ও ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থের অনুশীলন হইত, এইগুলি সেই কালেরই পুস্তক। তারিম অববাহিকায় স্থিত মঠগুলি বৌদ্ধপণ্ডিতদিগের বিদ্যাচর্চ্চার প্রকৃষ্ট নিকেতন ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

কাগজগুলি কোন্ সময়ের তাহাও নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। উহারই সঙ্গে মিশানো সরকারী কাগজপত্রে

এবং কতকগুলি ধর্ম্মপুস্তকের ভিতর তারিখের উল্লেখ আছে। ৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে "ব্লক" মুদ্রাঙ্কনের প্রচলন ছিল। কতকগুলি পুস্তক উড্ এন্‌গ্রেভিং-এ ছাপাও হইয়াছিল দেখা যায়।

স্বর্ণ আস্তরণে আবৃত কতকগুলি চিত্র ষ্টাইন সাহেব আবিষ্কার করিয়াছেন। অতি সূক্ষ্ম গজ্ (Gauge) সিল্ক ও লিনেনের উপর চিত্রগুলি লিখিত। সেইগুলি যে মন্দিরচূড়ালগ্ন ধ্বজা ছিল তাহা তাহাদের ত্রিকোণাকৃতি ও বেণুপেশিকায় আবদ্ধ রজ্জু দেখিয়া বুঝা যায়। যে পতকাগুলি গুটানো ছিল, সেগুলি বিছান হইলে, অতি নিপুণভাবে চিত্রিত, ভারতীয় কলা-বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের অথবা অন্য কোনও বৌদ্ধ বিষয়ের চিত্র দেখা গেল। সেই চিত্রপটগুলি এত সূক্ষ্ম রেশম দিয়া নির্ম্মিত যে, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

মধ্য এশিয়ার ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত অনেকগুলি সংস্কৃত পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। উহারই মধ্যে কতকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ২০ ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা প্রায় সত্তরখানি তালপত্রের উপর লিখিত একখানি সংস্কৃত পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। অক্ষরগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিন্তু বড় সুন্দর; আক্ষরিক বিশিষ্টতা দেখিয়া, উহা যে খৃষ্টীয় তৃতীয় অথবা চতুর্থ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান হয়। কোন পরিব্রাজকের দ্বারা এই দূর মঠে এগুলি নীত হইয়াছিল কে জানে!

আর একটা সুবৃহৎ পুথি গুটানো অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। উহা "গুপ্ত" অক্ষরে লিখিত। বহির্ভাগে বিকশিত কমলদলের উপর দুইটী সুচিত্রিত মরাল অঙ্কিত। অপভ্রংশ উদীচ্য বৌদ্ধ সংস্কৃতের কতকগুলি বন্দনার সহিত কোন এক "অজ্ঞাত" ভাষায় লিখিত অনেকগুলি পংক্তি রহিয়াছে। আচার্য্য হর্ণলি অনেক কষ্টে আবিষ্কার করিয়াছেন যে, এই দুইখানি সুরক্ষিত পুস্তক সংস্কৃত 'বজ্রচ্ছেদিকা' ও 'অপরিমিতায়ু' নামক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থদ্বয়ের আক্ষরিক অনুবাদ। এই পুস্তকগুলির ঐতিহাসিক মূল্য এই যে, উহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, টুন হুয়াঙে যে সমস্ত মঠ ছিল, তাহাদের সহিত তিব্বত, চীন ও তারিম প্রদেশের ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

আফগানিস্থানের ভিতর দিয়া যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাচীন মগদিয়ানা প্রদেশে (আধুনিক সামারকান্দ ও বোখারা) প্রবেশ করিয়া আরব বিজয়ের (খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দী) পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল তাহা চীনগ্রন্থ এবং অন্যান্য প্রাচীন প্রমাণ হইতে সূচিত হয়। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুলর সাহেব (F. W. K Muller) ও অধ্যাপক গ্রুণ্‌ওয়েডেল্ (Grunwedel) তুর্ফানে প্রাপ্ত পুথি হইতে স্থির করিয়াছেন যে বৌদ্ধ ও মণিকীয় ধর্ম্মাবলম্বী সগদিয়ানগণ Chinese Turkestan উত্তর পর্য্যন্ত বসবাস করিয়াছিল ও তথায় সগদিয়ান ভাষায় অনূদিত (ও লিখিত) নিজ নিজ ধর্ম্মগ্রন্থ ব্যবহার করিত। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে পূর্ব্ব তুর্কীস্থানের উপর চীনের আধিপত্য ক্ষীণ হইয়া ক্রমে নির্ব্বাপিত হয় এবং অর্দ্ধ শতাব্দী পরে এই তারিম প্রদেশে তিব্বতের প্রভাবও লুপ্ত হয়। তখন হইতে উইগুর প্রভাবের বিস্তার আরম্ভ হয় এবং দুই শতাব্দী ধরিয়া এই তুর্ফানই উইগুর প্রভাবের পীঠস্থান থাকে। তুর্কী ও মধ্য পারসিক (Middle Persian) ভাষায় লিখিত যে সব পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে অধ্যাপক মুলর স্থির করিয়াছেন যে বুদ্ধের ও মণির ধর্ম্ম পাশাপাশি নির্বিরোধে অবস্থিত ছিল।

বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ যে পুরাতন তুর্কী ভাষায় অনূদিত ও উইগুর অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। এইরূপ অনেকগুলি পুথিই সুসংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। অধ্যাপক Denison Ross ইহার মধ্যে দুইখানি গ্রন্থ চিনিতে পারিয়াছেন। 'অভিধর্ম্মকোষ' নামক অধ্যাত্ম-তত্ত্ববিষয়ক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থের ভাষ্য ঐ দুইখানি পুথির মধ্যে আছে। চীন পরিব্রাজক উয়ান্ চুয়াঙ উক্ত ধর্ম্মগ্রন্থখানিকে মূল সংস্কৃত হইতে ভাষান্তরিত করেন। পরে উহার ভাষ্য লিখিত হইয়াছিল।

শ্রীকালীপদ মিত্র।

সূক্ষ্ম দেহ

আমরা যে স্থুল দেহ লইয়া সংসারে বিচরণ করিয়া থাকি, তাহার ভিতর অনুরূপ আর একটী দেহ আছে, তাহা আমরা সচরাচর দেখিতে পাই না। ইহাকে সূক্ষ্ম দেহ বলে। ইহার আর একটী নাম লিঙ্গ শরীর।

দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, ত্বগিন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়; প্রাণ, অপান, সমান,উদান ও ব্যান এই পঞ্চ প্রাণ; এবং মন ও বুদ্ধি,—সর্ব্বসমেত এই সপ্তদশ পদার্থে উক্ত লিঙ্গশরীর গঠিত হইয়াছে। আমাদের জীবাত্মা উক্ত সূক্ষ্ম শরীরে বাস করিতেছেন।

জীবাত্মার—

(১) অতীন্দ্রিয় দর্শন শক্তি (Clairvoyance)

(২) অতীন্দ্রিয় শ্রবণ শক্তি (Clair audience)

(৩) ভাব শক্তি (Thought power)

(৪) নিজের মনের ভাব অন্যের মনে চালনা করিবার শক্তি (Telepathy)

(৫) অন্যের মনের ভাব নিজের মনে জানিবার শক্তি (Thought reading)

(৬) ইচ্ছা শক্তি (Will-force)

প্রভৃতি নানা প্রকার শক্তি আছে।

স্থুল শরীর হইতে এই সূক্ষ্ম শরীর এককালে বিচ্ছিন্ন না হইলে এই সমস্ত শক্তির সম্যক্ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। মৃত্যুর পর আমাদের জীবাত্মা এই সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করতঃ পরলোক যাইয়া বাস করিয়া থাকে। জীবিত কালেও জীবাত্মা কখন কখন এই স্থুল শরীর পরিত্যাগ করতঃ সূক্ষ্ম শরীরে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া আবার এই স্থুল শরীরে প্রবেশ করে। ইংরাজি পুস্তকাদি হইতে এ সম্বন্ধে কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

"উত্তর-পশ্চিম দিকে চালাও।"

সন ১৮২৮ খৃঃ অব্দে একখানি জাহাজ পণ্যদ্রব্য লইয়া লিভারপুল হইতে সেণ্ট জন যাইতেছিল। একদিন কাপ্তেন সাহেবের পথ ভুল হওয়ায় জাহাজখানি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া সমুদ্রবক্ষে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। কাপ্তেন এবং তাঁহার মেট, রবার্ট ব্রুস্ উভয়ে দিঙ্‌নির্ণয় করিবার জন্য আপনাপন ক্যাবিন ঘরে প্রবেশ করিলেন।

মেটের ঘরের সম্মুখেই কাপ্তেন সাহেবের ঘর। মেট অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে গণনা করতঃ দিঙ্‌নির্ণয় এবং গন্তব্য পথ স্থির করিল। তাহার পর চক্ষু তুলিয়া দেখে, কাপ্তেন সাহেবের ঘরে কে একজন তাহার ঘরের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া,এবং টেবিলের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কি লিখিতেছে। মেট তাহাকে কাপ্তেন ভাবিয়া ডাকিল এবং তাঁহার গণনা শেষ হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিল,—কিন্তু কোন উত্তর পাইল না।

কাপ্তেনের দিঙ্‌নির্ণয় করা শেষ হয় নাই ভাবিয়া মেট তখন ধীরে ধীরে তাহার ঘরে যাইয়া দেখে, একজন অপরিচিত পুরুষ টেবিলের উপর উপুড় হইয়া শ্লেটে কি লিখিতেছে; মেটকে দেখিয়া, তাহার প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আগন্তুক ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ব্রুস্ নিতান্ত ধীর প্রকৃতির লোক ছিল না। জাহাজে যাহারা যাত্রী ছিল, তাহাদের সকলকেই সে জানিত ও চিনিত। সমুদ্র বক্ষে কাপ্তেনের নিভৃত কক্ষমধ্যে এই অপরিচিত পুরুষ কে, কোথা হইতে আসিল, ভাবিয়া তাহার মনে দারুণ ভয়ের সঞ্চার হইল এবং তাহার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। মেট আর তথায় অপেক্ষা না করিয়া দ্রুত পাদবিক্ষেপে কাপ্তেনের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার ঘরে একজন আগন্তুককে দেখিতে পাইলাম, তিনি কে?"

মেটের কথা শুনিয়া এবং তাহার ভাব ভঙ্গী দেখিয়া কাপ্তেন অতি বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "আমার ঘরে আগন্তুক! সে কি কথা?"

মেট্। আমি আমার ঘর হইতে দেখিলাম, আপনার

ঘরে কে একজন টেবিলের উপর উপুড় হইয়া কি লিখিতেছে—আমি আপনাকে ভাবিয়া ডাকিলাম কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া ঘরে যাইয়া দেখি একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তি—

কাপ্তেন। ইহাও কি সম্ভব? আমরা ছয় মাস এই জাহাজে বাস করিতেছি; আজ দিগ্‌ভ্রম হওয়ায় সমুদ্রের উপর ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। আমার ঘরে অপরিচিত লোক কোথা হইতে আসিবে?

কাপ্তেনের মনে হইল মেট স্বপ্ন দেখিয়াছে অথবা তাহার দৃষ্টিবিভ্রম হইয়াছে। তিনি বলিলেন, "তুমি সেই অপরিচিত পুরুষকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে?"

মেট উত্তর করিল—"তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে আমার সাহস হইল না; আমার এত ভয় হইয়াছিল যে এখনও আমার বুকের ভিতর কাঁপিতেছে; আমি একা আপনার ঘরে যাইব, সে সাহসও আমার নাই।"

কাপ্তেন মেটকে সঙ্গে লইয়া আপন ঘরে প্রবেশ করিলেন; ঘরে জন মানব নাই, টেবিলের উপর একখানি স্লেট্ পড়িয়া আছে। তাহাতে লেখা আছে—

"Steer to the North-west."

—"উত্তর পশ্চিম দিকে চালাও"।

কাপ্তেন বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "ব্রুস্ তুমি কি আমার সঙ্গে তামাসা করিতেছ?"

মেট্। আপনার সহিত কি আমি কখন তামাসা করিয়াছি? না আপনার সহিত আমার সেই সম্বন্ধ? আপনাকে আমি এক বর্ণও মিথ্যা বলি নাই; স্লেটে কি লেখা আছে তাহাও আমি দেখি নাই।

স্লেটে যে কথা কয়টী লেখা ছিল, তাহা অন্য একখানি স্লেটে লিখিবার জন্য কাপ্তেন মেটের প্রতি আদেশ করিলেন। মেট লিখিল, কিন্তু তাহার লেখার সহিত স্লেটের লেখা মিল হইল না।

জাহাজে যাঁহারা লেখাপড়া জানিতেন, কাপ্তেন তাঁহাদের সকলকেই একে একে ডাকিয়া সেই কথা কয়টী লিখিতে বলিলেন, কিন্তু কাহারও লেখার সহিত স্লেটের লেখার সাদৃশ্য দেখা গেল না।

জাহাজের মধ্যে যদি কেহ কোন আরোহীর সহিত যোগসাজসে গোপনে লুকাইত ভাবে বাস করিয়া থাকে এবং অন্যের অলক্ষিতে স্লেটে এই কথা কয়টী লিখিয়া গিয়া থাকে, এই ভাবিয়া কাপ্তেন সাহেব নিজে জাহাজের উপরে নীচে সকল স্থানে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন অপরিচিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল না।

স্লেটে কে লিখিয়া গেল কাপ্তেন সাহেব তাহা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া উত্তর-পশ্চিম দিকেই জাহাজ চালাইয়া দিলেন।

বেলা প্রায় অবসান হইয়াছে, এই সময় কাপ্তেন সাহেব দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিতে পাইলেন, বহুদূরে একখানি জাহাজ আটক হইয়া আছে এবং উহাতে বিপদের নিশান উড়িতেছে।

কাপ্তেন এই বিপন্ন জাহাজ খানিকে লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে আপন জাহাজ চালাইয়া তাহার নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলে জানিতে পারিলেন, প্রায় একমাস কাল এই জাহাজখানি এই স্থানে আটক হইয়া আছে; তাহাদের আহারীয় সামগ্রী এবং পানীয় জল যাহা ছিল, তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে; এই সুদীর্ঘ কাল মধ্যে কোন একখানি জাহাজও এই পথ দিয়া যাতায়াত করিতে না দেখিয়া আরোহিগণ সকলেই জীবনের আশা এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছে।

কাপ্তেন সাহেব তখন এই শেষোক্ত জাহাজের আরোহিগণকে আপন জাহাজে উঠাইয়া লইতে আরম্ভ করিলেন। আরোহীরা যখন একে একে উঠিয়া আসে, সেই সময় ব্রুস্ যেন ভয়ে কাতর হইয়া তাড়াতাড়ি কাপ্তেনের হাত ধরিয়া একজন আরোহীকে লক্ষ্য করতঃ বলিল—"দেখুন—দেখুন, আপনার ঘরে যাহার সহিত আজ সকালে আমার দেখা হইয়াছিল, ঐ সেই লোক।"

কাপ্তেন মেটের কথায় তখন কর্ণপাত না করিয়া, আরোহীরা সকলে উঠিয়া আসিলে শেষোক্ত জাহাজের কাপ্তেনকে নিজের ঘরে লইয়া যাইয়া অন্যান্য আলাপ পরিচয়ের পর বলিলেন, "আমার জাহাজে আজ প্রাতে বড় একটী আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। আজ প্রাতে আমার মেটের নিকট সংবাদ পাইলাম, আমার এই ঘরে তাহার সহিত একজন অপরিচিত পুরুষের সাক্ষাৎ হইয়াছে এবং সে এই স্লেটে এই কয়টী কথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে।"

এই বলিয়া প্রথম কাপ্তেন দ্বিতীয় কাপ্তেনকে সেই স্লেট খানি দেখাইলেন। দ্বিতীয় কাপ্তেন স্লেট পড়িয়া এবং তাহার ভাব কিছুই বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে ইহা পড়িতে দিলেন কেন?"

১ম কা। কাহার লেখা চিনিতে পারেন কি?

২য় কা। এ রকম লেখা যেন পূর্ব্বে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়, কিন্তু কাহার লেখা ঠিক বলিতে পারিব না।

১ম কা। আমার জাহাজের কাহারও লেখা নয় এবং কাহার লেখা তাহা আমার জাহাজের কেহই বলিতে পারে না; তবে এই লেখা অনুসারে আমি উত্তর পশ্চিম দিকে জাহাজ চালাইয়া আপনাদের সাক্ষাৎ পাইয়াছি।

উভয় কাপ্তেন পরস্পরের মুখের দিকে ক্ষণেক চাহিয়া থাকার পর, প্রথম কাপ্তেন আবার বলিলেন, "আপনার জাহাজের আরোহিগণকে আমার জাহাজে উঠাইয়া লওয়ার সময় একজন আরোহীকে লক্ষ্য করিয়া আমার মেট্ প্রকাশ করিয়াছে যে এই ঘরে তাহারই সহিত আমার মেটের আজ প্রাতে দেখা হইয়াছে।"

দ্বিতীয় কাপ্তেন নীরবে প্রথম কাপ্তেনের কথা শুনিতেছিলেন। তাঁহার কথা শেষ হইলে বলিলেন, "আমিও তবে আমার জাহাজের একটী আশ্চর্য্য ঘটনার কথা বলি; আপনি এই বিষয় উত্থাপন না করিলে আমি হয়ত আমার কথা বলা আবশ্যক মনে করিতাম না; আমার জাহাজের আরোহিগণের মধ্যে একজন ভদ্রলোক সর্ব্বদাই হাস্য কৌতুক করিয়া বেড়াইত, কিন্তু জাহাজ আটক হওয়ার পর গত ১৫ দিনের মধ্যে তাহার মুখে আমি একটী কথা শুনি নাই; ভয়ে এবং ভাবনায় সে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিল এবং আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছিল। আজ প্রাতে সে একটী বাক্স হেলান দিয়া ঘুমাইয়া পড়িল, এমন গাঢ় নিদ্রা গেল যে অপর এক ব্যক্তি দৈবাৎ তাহার উপর পড়িয়া যায় কিন্তু তথাপি তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই। দুই তিন ঘণ্টা নিদ্রা যাওয়ার পর সে জাগরিত হইয়া প্রকাশ করে যে আজ দিনমানের মধ্যে একখানি জাহাজ আসিয়া আমাদের উদ্ধার করিবে। নিদ্রাভঙ্গের পর তাহার সে বিষণ্ণ ভাব ঘুচিয়া গেল, তাহার মুখে যেন আনন্দ ফুটিয়া পড়িতে লাগিল; সে অপর আরোহিগণকে সাহস দিয়া এবং আপনার জাহাজ কি রকম তাহা বর্ণনা করিয়া বেড়াইতেছিল, এমন সময় দূরে আপনাদের জাহাজ দেখা গেল। লোকটীর মুখে আপনার জাহাজে যে রকম বর্ণনা শুনিতেছিলাম, দূরে সেই রকম জাহাজ আসিতে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম।"

দুই কাপ্তেনের মধ্যে যখন এই সকল কথা হইতেছিল, সে সময় উক্ত আরোহী জাহাজের নানাস্থানে পরিচিতের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল এবং পূর্ব্বে কোন সময় যেন সে এই জাহাজে চড়িয়াছে ইহাই চিন্তা করিতেছিল। ইতিমধ্যে কাপ্তেন তাহাকে এবং ক্রুসকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

আরোহী তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া, প্রথম কাপ্তেনের হাত ধরিয়া অভিবাদন করতঃ সকলের জীবন রক্ষা জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিল, "আমি ইতিপূর্ব্বে আর কখন আপনার জাহাজে না উঠিলেও জাহাজের সমস্তই যেন আমার পূর্ব্ব পরিচিত বলিয়া মনে হইতেছে এবং আপনার এই মেট ইহাকেও যেন পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু কোথায় দেখিয়াছি তাহা স্মরণ হয় না।"

দ্বিতীয় কাপ্তেন ক্রসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ইহাকে কোথাও দেখিয়াছ মনে হয় কি ?"

আরোহীকে দেখিয়া তাহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, সে কোন উত্তর করিতে পারিল না ; এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিল। তখন প্রথম কাপ্তেন এই আরোহীর হাতে একখানি স্লেট দিয়া Steer to the North-west এই কথা কয়টী লিখিবার জন্য অনুরোধ করিলে, সে তাহা লিখিয়া দিল।

অন্য যে স্লেটে এই কথা কয়টী লেখা ছিল, সেখানি এবং এখানি দুখানি স্লেট টেবিলের উপর পাশাপাশি করা হইল—দুই লেখা একই হাতের, একই অক্ষর, ছাঁদ এক, টান এক ; কোন লেখা সকালের এবং কোন এখনকার তাহা, অপরের কথায় কায নাই, লেখকেরও নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন হইল।

উপস্থিত সকলেই অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং আরোহীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, প্রাতে স্বপ্নে এক জাহাজ আসিতে দেখা ভিন্ন আর কিছুই তাহার স্মরণ হয় না। *

ছায়াময়ী।

ভলমার (Volmar) হইতে এক মাইল দূরে একটী লব্ধপ্রতিষ্ঠ বালিকাবিদ্যালয় ছিল ; অনেক পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত লোকের মেয়েরা এই বিদ্যালয়ে পড়িতে আসিত।

এই বিদ্যালয়ের কোন একজন শিক্ষয়িত্রী পীড়িত হইয়া কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলে এমিলি সাগিয়ে (Emilie Sagee) নামে ফরাসী দেশীয় একটী মেয়ে উক্ত পদে নিযুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করে। এমিলির চরিত্র ও বিদ্যা বুদ্ধি সম্বন্ধে তাহার যে সকল প্রশংসাপত্র ছিল, তাহা দেখিয়া বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাকেই উক্ত পদে নিযুক্ত করেন।

এমিলি তাহার নম্রতা ও শীলতার জন্য অল্পদিনের মধ্যেই বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিল এবং ছাত্রীদের সহিত তাহার আত্মীয়তা ও ভালবাসা জন্মিল ; তাহার কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া বিদ্যালয়ের সম্পাদক ও অধ্যক্ষগণও তাহার উপর সন্তুষ্ট হইলেন।

কিন্তু এমিলির দুর্ভাগ্য এই যে, তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার জড়দেহ হইতে সূক্ষ্মদেহটি বাহির হইয়া আসিত ! এমিলি একদিন ক্লাসে বোর্ড সম্মুখে দাঁড়াইয়া অঙ্ক কষিতেছে, হঠাৎ দেখা গেল তাহার পার্শ্বে ছায়াময়ী মূর্ত্তি ধরিয়া আর এক এমিলি দাঁড়াইয়া আছে। এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিয়া ছাত্রীরা ভয়ে জড়সড় হইয়া গেল ; কিছুক্ষণ পরে ছায়ামূর্ত্তি এমিলির শরীরে প্রবেশ করিল এবং সে জীবন্ত ভাব ধারণ করত আবার অঙ্ক কষিতে লাগিল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে এমিলির একটী ছাত্রী একখানি বড় আয়না সম্মুখে দাঁড়াইয়া পোষাক পরিতেছিল ; পোষাকের পশ্চাৎ দিকের হুক আঁটিতে তাহার বিশেষ অসুবিধা হইতেছিল দেখিয়া এমিলি আসিয়া হুক আঁটিতে দাঁড়াইয়াছিল।

ছাত্রী আয়না সম্মুখে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, পশ্চাৎদিকে এমিলি অতি যত্ন সহকারে হুক্ আঁটিয়া দিতেছিল। ছাত্রী হঠাৎ মুখ তুলিয়া আয়নায় দৃষ্টিপাত করিবামাত্র দেখিতে পাইল, তাহার পশ্চাতে দুইজন এমিলি হুক আঁটিয়া দিতেছে। ছাত্রী তদ্দণ্ডে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল।

কয়েক মাস ধরিয়া বিদ্যালয়ের নানা স্থানে নানা সময়ে এই প্রকার নানা রকম ঘটনা ঘটিতে লাগিল। এমিলি ক্লাসের মধ্যে চেয়ারে বসিয়া আছে, ছায়া মূর্ত্তি ধরিয়া আর এক এমিলি তাহার পশ্চাৎ ভাগে দাঁড়াইয়া আছে, কখন তাহার অঙ্গ ভঙ্গীর অনুকরণ করিতেছে, কখন বা এমিলি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে ছায়ামূর্ত্তি তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিতেছে ; আহারের সময় ছায়ামূর্ত্তি যেন তাহার পার্শ্বে বসিয়া মুখে হাত তুলিতেছে হাত নামাইতেছে ; প্রভেদের মধ্যে ছায়াময়ীর হাতে কখন কাঁটা চামচা দেখা যাইত না।

এক সময়ে এমিলির জ্বর হইলে একজন ছাত্রী তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া বই পড়িতেছিল এবং এমিলি একাগ্র-

---

* Shadows Around Us, p. 25.

চিত্তে তাহার পড়া শুনিতেছিল ; হঠাৎ এমিলির চক্ষু দুইটী ঘোর ও মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। ছাত্রী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন এমন করিতেছেন, শরীর কি অসুখ করিতেছে?"

অতিকষ্টে অতি ক্ষীণ স্বরে এমিলি উত্তর করিল, "না—না।" তাহার মুখ হইতে এই কথা বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন তাহার শরীর স্পন্দহীন হইল এবং অন্য এক এমিলি ঘরের মধ্যে ধীরে ধীরে পদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ছাত্রী সাহসে ভর করিয়া বসিয়া আছে ; অল্পক্ষণ পরেই শিক্ষয়িত্রীর চৈতন্য হইল এবং ভৌতিক দেহে যে ঘরের মধ্যে বিচরণ করিতেছিল, সেও অদৃশ্য হইয়া গেল।

উক্ত বিদ্যালয়ে এক প্রকাণ্ড হল ঘর ছিল। হলের সম্মুখে একটী ফুলের বাগান ছিল—হলে বসিয়া সে বাগান দেখা যাইত। এমিলি অনেক সময় এই বাগানে বেড়াইয়া বেড়াইত। এক দিন বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ এই হলে বসিয়া শিল্পকার্য্য শিক্ষা করিতেছে, একজনমাত্র শিক্ষয়িত্রী উপস্থিত আছেন এবং তিনি শিক্ষা দিতেছেন—এই সময় এমিলিকে উক্ত ফুল বাগানে ভ্রমণ করিতে দেখা গেল।

বিশেষ কোন কার্য্য উপলক্ষে শিক্ষয়িত্রী হল পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গিয়াছেন দেখিয়া মেয়েরা শিল্পকার্য্য ছাড়িয়া গল্প করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং সেজন্য হলের মধ্যে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এমিলি একবার মাত্র হলের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। পরক্ষণেই দেখা গেল হলের মধ্যে এক এমিলি শিক্ষয়িত্রীর আসন অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, অন্য এমিলি কাষ্ঠ পুত্তলিকার মত ফুল বাগানে দাঁড়াইয়া আছে।

এই ভৌতিক ব্যাপার দর্শন করিয়া ছাত্রীরা সকলে ভয়ে চীৎকার করিয়া হল হইতে বাহির হইয়া গেল। শিক্ষয়িত্রী এই সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তাঁহার শরীরও ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

শিক্ষয়িত্রী আসিয়া উপস্থিত হইবা মাত্র ভৌতিক এমিলি অদৃশ্য হইয়া গেল এবং বাগানে সেই জড়দেহ বিশিষ্ট এমিলি পূর্ব্বের মত ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল।

এই ঘটনার পর এমিলির ভয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস হইয়া গেল দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাকে কর্ম্ম হইতে বিদায় দেন।

বিদায় গ্রহণ করার কালে অতি দুঃখের সহিত এমিলি প্রকাশ করে যে, ইতিপূর্ব্বে সে ১৮টি বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক বিদ্যালয়ে অতি সুখ্যাতির সহিত কাযও করিয়াছিল, কিন্তু এই একই কারণে সকল বিদ্যালয় হইতেই তাহাকে কর্ম্মচ্যুত হইতে হইয়াছে—সংসারে বাস করিয়া তাহার সুখ বা শান্তি নাই।*

নিদ্রাযোগে মাতৃদর্শন।

রেভারেণ্ড জোসেফ উইল্‌কিন্স সাহেবের বয়স যখন ২৩ বৎসর, সেই সময় এক দিন রাত্রে স্বপ্ন দেখেন যেন তিনি লণ্ডন যাত্রা করিয়াছেন। স্বপ্নেই তাঁহার মনে হইল, বাড়ী হইয়া পিতামাতার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া লণ্ডন যাইবেন। বাড়ী আসিয়া দেখেন, সদর দরজা বন্ধ। তারপর খিড়কির দুয়ার খুলিয়া যেন বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং পরিবারবর্গের মধ্যে সকলকেই নিদ্রিত দেখিয়া, সিঁড়ি দিয়া উপর তালায় উঠিলেন। যে ঘরে তাঁহার পিতা-মাতা শয়ন করিয়াছিলেন সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। পিতা তখন নিদ্রিত কিন্তু মা জাগিয়া আছেন দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"মা, অনেক দূর পথে যাইতেছি, তাই তোমার নিকট বিদায় লইতে আসিলাম।"

এই কথা শুনিয়া মার মনে হইল, তাঁর ছেলের বুঝি মৃত্যু হইয়াছে। মা ভীত হইয়া উত্তর করিলেন, "তবে কি বাছা তুই নাই?"

* Shadows Around Us, p. 104

উইল্‌কিন্সের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে, তিনি স্বপ্নে মার সহিত কথা কহিয়াছেন ভাবিয়া আর এ সম্বন্ধে কোন চিন্তা করিলেন না।

কয়েক দিন পরে উইলকিন্স তাঁহার পিতার নিকট হইতে নিম্নলিখিত মর্ম্মে একখানি পত্র পাইলেনঃ—

"অমুক দিন রাত্রে আমি ও তোমার মা এক ঘরে শয়ন করিয়া ছিলাম; আমি নিদ্রা গিয়াছি কিন্তু তোমার মা জাগিয়া ছিলেন; এমন সময় তিনি শুনিতে পাইলেন, কে যেন সদর দরজা খুলিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সে দরজা বন্ধ ছিল দেখিয়া খিড়কির দুয়ার দিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিয়া তোমার মার বোধ হইল, যেন তুমি আসিয়াছ; তারপর তুমি যেন তোমার মার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলে, 'মা, আমি অনেক দূর পথ যাইতেছি, তাই তোমার নিকট বিদায় লইতে আসিলাম।' তোমার মুখে এই কথা শুনিয়া তোমার মার মনে হইল এ সংসারে তুমি আর নাই। তিনি উত্তর করিলেন, 'তবে কি বাছা তুই নাই?' তোমার মা এই কথা বলার পর আর কিছুই শুনিতে পাইলেন না এবং কাহাকেও দেখিতেও পাইলেন না।"

বলা বাহুল্য, এই ঘটনার পর পিতামাতা উভয়েই পুত্রের কুশলবার্ত্তা পাইবার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া এই পত্র লিখিয়াছিলেন। নিদ্রাবস্থায় সূক্ষ্মদেহ স্থূলদেহ ছাড়িয়া অভিলষিত স্থানে গমনের ইহা একটি সুন্দর উদাহরণ। *

মা ও ছেলে।

সন ১৮৪৩ খৃঃ অব্দের নভেম্বর মাসে একজন অবিবাহিতা যুবতী তাঁহার একজন আত্মীয়ের বাড়ী আসিয়া অতিথি হন। বাড়ীর গৃহিণী হঠাৎ অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন এবং চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে লণ্ডনে লইয়া যাওয়া প্রয়োজন হয়। বাড়ীতে আড়াই মাসের ও তদপেক্ষা বড় দুইটী শিশু সন্তান ছিল। তাহাদিগকে এই যুবতীর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া স্ত্রীকে লইয়া গৃহস্বামী লণ্ডন যাত্রা করিলেন।

লণ্ডনে যাইয়া স্ত্রীর ব্যারাম উপশম না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এদিকে বাড়ীতে তাঁহাদের ছোট ছেলেটী সামান্য কয়েক দিনের ব্যারামে হঠাৎ মারা গেল।

লণ্ডনে যখন এই সংবাদ পৌঁছিল, তখন তাঁহার স্ত্রী মৃত্যুশয্যায় শায়িত, এজন্য তাঁহার নিকট এ কথা প্রকাশ না করিয়া বাধ্য হইয়া গৃহস্বামীকে বাড়ী আসিতে হইল।

সোমবারে সন্তানটীর মৃত্যু হইয়াছিল। মঙ্গলবারে তিনি বাড়ী আসিলেন এবং পুত্রের কবরাদি দেওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া বুধবারে আবার লণ্ডনে ফিরিয়া গেলেন; (তখনও মৃত পুত্রকে সমাধিস্থ করা হয় নাই।)

বৃহস্পতিবারে উক্ত যুবতী লণ্ডন হইতে একখানি পত্র পাইলেন যে গৃহস্বামী বাড়ী যাইয়া ভুলক্রমে তাঁহার কতকগুলি প্রয়োজনীয় কাগজ তাহার বৈঠকখানা ঘরে ডেস্কের ভিতর ফেলিয়া আসিয়াছেন, ফেরত ডাকে এই কাগজগুলি যেন তাহার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

এই বৈঠকখানা ঘরেই কাফিনের ভিতর শিশু সন্তানটীর মৃতদেহ রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বেলা চারিটার সময় যুবতী উক্ত বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করতঃ ডেস্ক হইতে কাগজগুলি লইয়া যখন ফিরিয়া আসিতেছেন, সেই সময় হঠাৎ দেখিতে পাইলেন যেন কাফিনের নিকট একখানি সোফার উপর মৃত পুত্রের মা বসিয়া একদৃষ্টে কাফিনের দিকে চাহিয়া আছেন।

যুবতী দাঁড়াইয়া এই ব্যাপার দর্শন করিতেছেন, কাহারও মুখে কথা নাই, এমন সময় মা একবার তাঁহার মৃত পুত্রের কাফিনের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন এবং ঊর্দ্ধে হাত উঠাইয়া, অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

* Intellectual Powers by Abercrombie p. 215-216

পরদিন যুবতী পত্র পাইলেন, পূর্ব্বদিন বৃহস্পতি-বার বেলা ৪।০ টার সময় মৃত বালকের মা মারা গিয়াছেন।

কয়েক দিন পরে গৃহস্বামী ফিরিয়া আসিলে যুবতী তাঁহার মুখে শুনিতে পাইলেন যে মৃত্যুর আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে স্ত্রী অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিছুক্ষণ পরে তাঁহার জ্ঞান হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহার প্রাণাধিক শিশু সন্তানটী যে এজগতে নাই, সে কথা তাহাকে বলা হয় নাই কেন? স্বামী তথনও এবিষয় তাঁহার নিকট গোপন করিবার চেষ্টা করিলে তিনি বলেন, "আর কেন বৃথা আমার নিকট গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছ? এই মাত্র আমি বাড়ী গিয়াছিলাম, ছোট একটী কাফিনের ভিতর আমার ছেলে শয়ন করিয়া আছে আমি দেখিয়া আসিয়াছি। সে জন্য আমার আর দুঃখ নাই, সে যেখানে গিয়াছে, আমিও সেইখানে যাইতেছি। আমি এখনই যাইয়া তাহাকে কোলে করিব। কিন্তু আমার দুঃখ হইতেছে তোমার জন্য; তোমাকে ফেলিয়া চলিলাম—"

এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল। *

পাদ্রী সাহেবের মৃত্যু।

মৃত্যুর পর জীবাত্মা নিজ শরীরে আত্মীয় স্বজনের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন।

ডিউক অব্ ওয়েলিংটন যখন ভারতবর্ষে, সেই সময় তাঁহার অধীনে উইল্‌সন নামে একজন কর্ণেল কায করিতেন। কর্ণেল সাহেব ঘোর নাস্তিক ছিলেন; তিনি আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না এবং পরলোক আছে ইহাও বিশ্বাস করিতেন না।

টেলিচারিতে ডুবোয়া নামে একজন পাদ্রীর সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহৃদ্য হয়। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহাদের পরস্পরের মত সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইলেও, তাঁহারা অনেক সময় একত্র থাকিতেন এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক ও আন্দোলন ও আলোচনা করিতেন। পাদ্রী বলিতেন, যদি তাঁহার অগ্রে মৃত্যু হয় তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই কর্ণেলের সহিত দেখা করিয়া পরলোকে তাঁহার বিশ্বাস জন্মাইয়া দিবেন।

১৮১১ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে হঠাৎ পাদ্রী সাহেবের ব্যারাম হইল এবং সেই সময় ভেলোরে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় কর্ণেলকে তথায় বদ্‌লি হইয়া যাইতে হইল।

একদিন রাত্রে কর্ণেল উইল্‌সন তাঁহার তাঁবুর মধ্যে শয়ন করিয়া আছেন। গ্রীষ্মাতিশয্য বশতঃ নিদ্রা হইতেছে না। হঠাৎ তিনি দেখিতে পাইলেন, তাঁবুর পর্দ্দা উঠাইয়া পাদ্রী ডুবোয়া সাহেব একদৃষ্টে তাঁহার প্রতি চাহিয়া আছেন। কর্ণেল তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিলেন, কোন উত্তর নাই। পর্দ্দা পড়িয়া গেল এবং পাদ্রী-মূর্ত্তিও অদৃশ্য হইল।

কর্ণেল তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করিয়া তাঁবুর বাহিরে আসিয়া দেখেন, পাদ্রী সাহেব মাঠের দিকে চলিয়া যাইতেছেন। কর্ণেল তাঁহার অনুসরণ করিলেন, কিন্তু ধরিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ পরে পাদ্রীর মূর্ত্তি বাতাসের সহিত মিলাইয়া গেল।

পরে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছিল, ডুবোয়া সাহেব যে সময় তাঁহার বন্ধু কর্ণেল সাহেবের সহিত দেখা করিতে আসেন, ঠিক্ সেই সময় তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। *

অন্তিম বিদায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জনৈক লর্ডকে বিশেষ কোন কার্য্যোপলক্ষে তাঁহার বাড়ী লণ্ডন হইতে বহুদূর দেশে যাইতে হইয়াছিল। বাড়ী হইতে যখন তিনি যাত্রা করেন, তখন তাঁহার স্ত্রীর শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ, কোন প্রকার ব্যারাম ছিল না। যে দিন তিনি তাঁহার

* Footfalls on the boundaries of another World, p. 249.

* Footfalls on the boundaries of another World, p. 268.

গন্তব্যস্থানে আসিয়া পৌছিলেন, সেই রাত্রে হঠাৎ তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে তিনি দেখিলেন, তাঁহার শয়ন কক্ষ আলোকে পরিপূর্ণ হইয়াছে এবং তাঁহার স্ত্রী দাঁড়াইয়া আছেন।

এই দূর পথে স্ত্রীকে অকস্মাৎ উপস্থিত হইতে দেখিয়া লর্ডের কেমন চমক লাগিল; তিনি তাঁহার ভৃত্যকে নাম ধরিয়া ডাকিলেন। ভৃত্য ঘরের মধ্যে আসিয়া এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিল। ভয়ে তাহার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

লর্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখিতেছ?"

ভৃত্য উত্তর করিল, "আজ্ঞে, আমার প্রভুপত্নী।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই আলোক নিবিয়া গেল এবং সেই ছায়ামূর্ত্তিও অন্তর্দ্ধান করিল। পরে জানা গেল, সেই রাত্রে লণ্ডনে লর্ড পত্নীর হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছিল।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন তৃতীয় জর্জ্জ ইংলণ্ডের রাজা; লর্ডের এই প্রেতমূর্ত্তি দর্শন করার কথা লইয়া ইংলণ্ডে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। রাজা এই কথা শুনিয়া লর্ডকে ডাকাইয়া তাহাকে এই বিষয়ের একটী লিখিত বর্ণনা পত্র দাখিল করিতে বলেন। ভৃত্যের স্বাক্ষরিত লর্ডের দাখিলী বর্ণনা পত্র ইংলণ্ডের রাজকীয় দপ্তরখানায় রক্ষিত হইয়াছিল।

এই ঘটনার এক বৎসর পরে লর্ডের ৫ বৎসরের একটী মেয়ে একদিন দৌড়াইয়া আসিয়া প্রকাশ করে যে সিঁড়ির উপর তার মাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছে—মা তাকে ডাকিতেছেন। সেই রাত্রে মেয়েটী ব্যারাম হইয়া মারা গিয়াছিল। *

সূক্ষ্ম শরীরে জীবাত্মার সহিত আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার কথা অনেকেই বিশ্বাস করেন না; তাঁহারা বলেন রজ্জুতে যেমন সর্প ভ্রম হয়, সেই প্রকার সূক্ষ্ম শরীর দর্শন করাটা দৃষ্টিবিভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নয়। রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয় সত্য, কিন্তু একই সময়ে রজ্জু দেখিয়া একাধিক ব্যক্তির সর্প ভ্রম হয় ইহা কখন শুনা যায় না। কিন্তু একাধিক ব্যক্তি একই সময়ে একই সূক্ষ্ম শরীর দেখিতে পায় ইহা কি আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে? উপরিউক্ত ঘটনাতে প্রভু ও ভৃত্য উভয়েই কি রজ্জুতে সর্পভ্রম করিল? এরূপ আরও উদাহরণ আছে।

দৃষ্টিবিভ্রম নহে।

১৭৮৫ খৃঃ অব্দের ১৫ই অক্টোবর তারিখে স্যর জন সেরব্রোক ও জেনারেল উইনিয়ার্ড নামক দুইজন উচ্চপদস্থ সৈনিক পুরুষ কেপ্ ব্রিটন্ দ্বীপের অন্তর্গত সিড্নি নগরে উইনিয়ার্ডের ঘরে বসিয়া সন্ধ্যার সময় কাফি পান করিতেছিলেন। এমন সময় সেরব্রোক মুখ ফিরাইয়া দেখেন, একজন অপরিচিত অতি ক্ষীণকায় যুবাপুরুষ ম্লান মুখে একদৃষ্টে তাঁদের দিকে চাহিয়া দুয়ারের নিকট দাঁড়াইয়া আছে। সেরব্রোক উইনিয়ার্ডকে এই ব্যাপার দেখাইবা মাত্র তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল এবং "একি—এ যে আমার ভাই" এই কথা কয়টী বলিয়া তাঁহার চৈতন্য লোপ হইল। সেই অপরিচিত পুরুষ তখন ধীরে ধীরে পার্শ্বস্থ একটী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

সেরব্রোক উইনিয়ার্ডের ভাব-গতিক দেখিয়া আগন্তুকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন; সে ঘর হইতে বাহিরে আসিতে হইলে সেই একটী ভিন্ন দ্বিতীয় দ্বার ছিল না। সেরব্রোক ঘরের মধ্যে যাইয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। এই সময় আর একজন সৈনিক পুরুষ আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া তিনিও সেরব্রোককে সঙ্গে করিয়া আগন্তুকের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান পাইলেন না।

কোথাও এই আগন্তুকের সন্ধান না পাইয়া সেরব্রোক বলিলেন, হয় আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম হইয়া থাকিবে, না হয় রেজিমেণ্টের কোন কর্ম্মচারী আমোদ করিবার জন্য ঘরে প্রবেশ করিয়া থাকিবে।

* Footfalls on the boundaries of another World, p. 274

কিন্তু সে কথায় উইনিয়ার্ডের মন প্রবোধ মানিল না; তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, তাঁহার ভাই আর এ জগতে নাই।

সেরব্রোক তাঁহার সেদিনের ডাইরিতে এই ঘটনা লিখিয়া রাখিলেন এবং ইংলণ্ড হইতে ডাক আসার প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিলেন। উইনিয়ার্ডের ভ্রাতা প্রেতশরীরে তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছেন এই কথা রেজিমেন্টের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল এবং ডাকে কি সংবাদ আসে জানিবার জন্য সকলেই ব্যগ্র হইয়া থাকিল।

যথা সময়ে ডাকের জাহাজ আসিয়া উপস্থিত হইল। উইনিয়ার্ডের নামে কোন পত্র ছিল না। সেরব্রোকের নামে পত্র ছিল যে, যে সময়ে তিনি সেই আগন্তুককে ঘরের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন, ঠিক সেই দিন সেই সময় উইনিয়ার্ডের ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছিল।

সেরব্রোক উইনিয়ার্ডের ভ্রাতাকে কখনও দেখেন নাই। উপরিউক্ত ঘটনার অনেকদিন পরে সেরব্রোক ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসেন এবং একদিন বেড়াইতে যাইতেছেন, এমন সময় পথের ধারে সেই প্রেত-মূর্ত্তির ন্যায় এক ব্যক্তিকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহার পরিচয় লইয়া জানিতে পারেন, তিনি উইনিয়ার্ডের ভ্রাতা। যাঁহার প্রেতমূর্ত্তির সহিত সেরব্রোকের দেখা হইয়াছিল তিনি এবং এই ব্যক্তি দুই যমজ ভাই ছিলেন।

দৃষ্টিবিভ্রম প্রযুক্ত কোন বিভীষিকা দেখিয়া থাকিবেন বলিয়া সেরব্রোকের মনে যে সন্দেহ জন্মিয়াছিল, তাহা এই যমজ ভ্রাতাকে দেখিয়া দূর হইয়া গেল। *

তারিখের ভুল সংশোধন।

১৮৫৭ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে একজন কাপ্তেন স্ত্রীর নিকট বিদায় লইয়া বিলাত হইতে ভারতবর্ষ যাত্রা করেন।

১৪ই নভেম্বর তারিখে স্ত্রী স্বপ্ন দেখিলেন, তাঁহার স্বামী ফিরিয়া আসিয়াছেন। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখেন, শয্যাপার্শ্বে প্রকৃতই তাঁহার স্বামী সৈনিক বেশে দাঁড়াইয়া আছেন। স্বামীর চুল আলুথালু, মুখ মলিন, হাত দুখানি দিয়া বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরিয়া রহিয়াছেন এবং সম্মুখ দিকে হেলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। মুখে যেন কঠোর যন্ত্রণার ভাব প্রকাশ পাইতেছে—তাঁহার মুখ নড়িতেছে, যেন কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কোন কথাই বলিতে পারিতেছেন না।

কাপ্তেন সাহেব স্ত্রীর প্রতি কিছুক্ষণ এইরূপ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া অদৃশ্য হইলেন। স্ত্রী মনে করিলেন বুঝি তখনও স্বপ্ন দেখিতেছেন। তিনি চোখ রগড়াইলেন, পার্শ্বে একটী শিশু সন্তান নিদ্রা যাইতেছিল তাহার নিশ্বাস পড়িতেছে শুনিতে পাইলেন; শিশুর শরীরে হাত দিয়া বুঝিতে পারিলেন, তিনি নিদ্রিত নহেন—তাঁহার সম্পূর্ণ জাগ্রৎ অবস্থা। সে রাত্রে আর তাঁহার নিদ্রা হইল না।

কাপ্তেন-পত্নী প্রভাতে উঠিয়া এই সকল বিষয় তাঁহার মাকে জানাইলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, তাহার স্বামী হয় মারা গিয়াছেন, না হয় তিনি গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই ঘটনার পর কাপ্তেন-পত্নী আর বাড়ীর বাহির হন নাই, কোন প্রকার আমোদ প্রমোদেও যোগ দেন নাই। কোনও দিন তাঁহার কোন আত্মীয় কোন উৎসবে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলে তিনি প্রকাশ করেন, ১৪ই নভেম্বরের পর কোনও তারিখের তাহার স্বামীর হস্তাক্ষরিত পত্র না পাওয়া পর্য্যন্ত তিনি কোথাও নিমন্ত্রণে যাইবেন না।

ডিসেম্বর মাসে এক দিন তারের সংবাদে জানা গেল, ১৫ই নভেম্বর তারিখে লক্ষ্ণৌতে কাপ্তেন সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে।

* Footfalls on the boundaries of another World, p. 274

কাপ্তেন সাহেবের সলিসিটার এই সংবাদ পাইয়া বিধবার সহিত দেখা করিতে আসিলে, তিনি প্রকাশ করেন "স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পূর্ব্বেই পাইয়াছি ; তারের সংবাদে ১৫ই নভেম্বর তারিখে মৃত্যু হওয়ার কথা যাহা প্রকাশ হইয়াছে তাহা সম্ভবতঃ ভুল, ১৪ই নভেম্বর তারিখে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে এবং সেই দিনই রাত্রে তাঁহার সহিত আমার দেখা হইয়াছে।"

স্বামী ভারতবর্ষে মারা গিয়াছেন, স্ত্রী তখন বিলাতে, মৃত্যুর দিন তাঁহাদের পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল একথা শুনিয়া সলিসিটার অবাক্ হইয়া বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া থাকিলেন। স্ত্রী তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, ১৪ই নভেম্বর রাত্রে যে পরিচ্ছদে এবং যে অবস্থায় স্বামীকে দেখিয়াছিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণনা করিলেন।

সলিসিটার যুদ্ধ সম্বন্ধীয় আফিসে অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, ১৫ই নভেম্বর তারিখেই কাপ্তেন সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে।

উপরিউক্ত ঘটনার অনেক দিন পরে অন্য একজন কাপ্তেন, মৃত কাপ্তেনের বিধবাকে পত্র লেখেন, লক্ষ্ণৌতে তাঁহার স্বামীর যখন মৃত্যু হয়, তখন তিনি তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। ১৪ই নভেম্বর অপরাহ্ণে একটী গোলা আসিয়া তাঁহার বক্ষে লাগায় তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়। দিলখুসাতে তাঁহার সমাধি দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার সমাধির উপর ১৪ই নভেম্বর তারিখে মৃত্যু হওয়ার তারিখ লেখা আছে। যুদ্ধ আফিসে তাঁহার মৃত্যুর তারিখ ১৫ই নভেম্বর লিখিত হইয়া থাকিলে তাহা ভুল।

অতঃপর যুদ্ধ আফিসে কাপ্তেন সাহেবের মৃত্যুর তারিখ সংশোধন করতঃ ১৪ই নভেম্বর লিখিয়া রাখা হয়। *

পাদ্রী সাহেবকেও বিশ্বাস করিতে হইল।

ওয়েস্‌লিয়ন্ ধর্ম্মযাজক মিল্‌স সাহেব যখন ইংলণ্ডে ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত, সেই সময় যে পল্লীতে তিনি ধর্ম্মপ্রচার করিতেন, সেই পল্লিস্থিত জেম্‌স নামে কোন নিরীহ ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার সৌহৃদ্য হয়। মিল্‌স সাহেব ধর্ম্মপ্রচার করিতে যাইয়া অনেক সময় জেম্‌স সাহেবের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার বাড়ীতে বাস করিতেন।

বিশেষ কোন কার্য্যোপলক্ষে মিল্‌স সাহেবকে একবার আমেরিকা যাত্রা করিতে হয়। কয়েক মাস পরে তিনি ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন, যে পল্লীতে তিনি ধর্ম্মপ্রচার করিতেন সেই পল্লিস্থিত অনেকেই এপিডেমিক্ রোগে মারা গিয়াছে। জেম্‌স ও তাহার পত্নীও মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছেন ; তাঁহাদের অতি অল্প বয়স্ক সন্তানগুলি সেই বাড়ীতেই বাস করিতেছে। মিল্‌স সাহেব জেম্‌সের মৃত্যুসংবাদ প্রথম যাঁহার নিকট পান, তিনি আরও প্রকাশ করেন যে, জেম্‌স এবং তাঁহার পত্নী পরলোক গমন করিয়া থাকিলেও তাঁহারা সেই বাড়ীতেই আছেন এবং মধ্যে মধ্যে অনেককেই দেখা দিয়া থাকেন। মিল্‌স সাহেব কিন্তু সে কথা বিশ্বাস করিলেন না।

এই সংবাদ পাওয়ার কয়েক দিন পরে মিল্‌স সাহেব জেম্‌সের বাড়ী গেলেন এবং তাঁহার সন্তানসন্ততিগুলিকে অনেক সান্ত্বনা করিলেন। পিতৃমাতৃহীন বালক বালিকারা অনেক দিন পরে পিতৃসখা মিল্‌সকে পাইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল না ; সেদিন তাঁহাকে সেইখানেই থাকিতে হইল।

জেম্‌স সাহেবের জীবিতকালে মিল্‌স যে ঘরে শয়ন করিতেন, রাত্রি হইলে তিনি সেই ঘরেই যাইয়া শয়ন করিলেন। পার্শ্বের ঘরে জেম্‌স এবং তাঁহার পত্নী পূর্ব্বে বাস করিতেন—তাঁহাদের মৃত্যুর পর হইতে এই শেষোক্ত ঘরটী বন্ধ ছিল।

মিল্‌স সাহেব শয়ন করিলেন, কিন্তু তাঁহার নিদ্রা আসিল না। জাগিয়া আছেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন যেন সেই পার্শ্বের ঘরে কে অস্ফুট স্বরে ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা বলিতেছে।

* Footfalls on the boundaries of another World.

মিল্‌স সাহেব শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং আলো লইয়া পার্শ্বের ঘরে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না; তখন তাঁহার ভুল হইয়া থাকিবে ভাবিয়া আবার শয্যায় যাইয়া শয়ন করিলেন।

জেম্‌স এবং তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হইলেও তাঁহারা সেই বাড়ীতেই আছেন এই যে জনরব তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন, এবার সেই কথাটা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল—অনেক চেষ্টা করিয়াও তিনি আর ঘুমাইতে পারিলেন না। সেই জনরবের কথা লইয়া তাঁহার মনে একটা ঘোর আন্দোলন ও আলোচনা চলিতে লাগিল, এমন সময় তিনি আবার পার্শ্বের ঘরে সেই ফিস্ ফিস্ রবে যেন কাহাকে কথা বলিতে শুনিলেন।

মিল্‌স সাহেবের মনে এবার ভয় হইল। তিনি ভয়ে ভয়ে উঠিয়া আবার সেই ঘরে গেলেন কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন। আরও একবার সেই একই রকম শব্দ শুনিয়া এবং সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, অবশেষে ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। সে রাত্রে আর তাঁহার নিদ্রার কোন ব্যাঘাত হয় নাই।

জেম্‌স সাহেবের বাড়ীর অনতিদূরে নানি নামে একজন অতি দরিদ্রা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বাস করিত। ঈশ্বরে তাহার ভক্তি এবং ধর্ম্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকার জন্য মিল্‌স সাহেব অনেক সময় তাহার বাড়ী যাইতেন এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহার সহিত কথা কহিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন।

পরদিন মিল্‌স সাহেব নানির সহিত দেখা করিতে গেলেন। বৃদ্ধা তাঁহাকে অতি সমাদর পূর্ব্বক বসিতে আসন দিলেন এবং অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর, সে দিন মধ্যাহ্নে তাহার বাড়ীতে আহার করিবার জন্য অনুরোধ করিল।

বৃদ্ধার ঘরে সামান্য যে কিছু আহারীয় সামগ্রী ছিল তাহাই অতি যত্ন পূর্ব্বক রন্ধনাদি করিয়া মিল্‌সকে সে খাইতে দিলে ও ভোজন শেষ হইলে নানি অতি বিনীত ভাবে বলিল, "পুরোহিত মহাশয় আপনার নিকট আমার একটী প্রার্থনা আছে। আমি অতি গরিব—এ গরিবের প্রার্থনা কি আপনি শুনিবেন?"

মিল্‌স উত্তর করিলেন, "নানি তোমাকে আমি বড় ভালবাসি তা বোধ হয় তুমি জান—তোমার যে প্রার্থনা থাকে বল।"

নানি। আগামী রবিবার যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রেতাত্মার মঙ্গলের জন্য উপাসনা করেন, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইব।

মিল্‌স। তুমি জীবিত থাকিতে তোমার প্রেতাত্মার মঙ্গল কামনার উপাসনা করিতে বলিতেছ কেন?

নানি। আমি তখন আর জীবিত থাকিব না; এই শুক্রবার বেলা তিনটার সময় আমি এই দেহ ত্যাগ করিয়া যাইব।

মিল্‌স। নানি, তুমি কি বলিতেছে আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

নানি। আমি নিশ্চয় জানিয়াছি, আগামী শুক্রবার আমাকে ইহলোক হইতে বিদায় হইতে হইবে। এজন্য আপনাকে আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি যেখানেই থাকুন, দূরে থাকিলেও, রবিবার আসিয়া আমার জন্য আপনাকে উপাসনা করিতে হইবে।

মিল্‌স বলিলেন, "তোমার নিকট প্রতিশ্রুত হওয়ার পূর্ব্বে, আমাকে বল দেখি, আজি মঙ্গলবার, আগামী শুক্রবার যে তুমি মরিয়া যাইবে, ইহা কি করিয়া জানিতে পারিলে?"

নানি উত্তর করিল, "তবে শুনুন। আপনি বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন, জেম্‌স এবং তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যুর পর, অনেকের সহিত অনেক স্থানেই তাঁহাদের দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে—"

মিল্‌স। হাঁ, আমি শুনিয়াছি। কিন্তু আমার বোধ হয় একথা অমূলক, একটা জনরব ভিন্ন আর কিছুই নয়।

নানি। কিন্তু আমার সহিত তাঁহাদের দেখা হইয়াছে।

মিল্‌স বিস্মিত হইয়া উত্তর করিলেন, "বল কি—তুমি তাহাদের দেখিয়াছ?"

নানি। হাঁ—আমি তাহাদের দেখিয়াছি।

মিলস্। কবে, কি রকমে দেখিলে?

নানি। আজ প্রাতে আমি যখন উঠান ঝাঁট দেই, সেই সময় দেখি, জেম্স ও তাহার স্ত্রীর মত দুইজন লোক পথ দিয়া চলিয়া আসিতেছে। আমি উঠান ঝাঁট দেওয়া বন্ধ রাখিয়া একদৃষ্টে তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকিলাম। তাহারা বরাবর আমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। আমি তখন স্পষ্ট চিনিলাম তাঁহারা জেম্স এবং তাহার স্ত্রী।

মিলস্। তাঁহাদের দেখিয়া তোমার ভয় হইল না?

নানি। ভয়? কিসের ভয়? না, আমার কোন ভয় হয় নাই। তাঁহারা জীবিত থাকিতে কত ভাল লোক ছিলেন, তাহাদের শরীরে কত দয়া ছিল, তাঁহারা দু'জনেই পরের কত উপকার করিতেন; ইহলোক হইতে বিদায় হইয়া তাঁহাদের সে উদার প্রকৃতি কেন পরিবর্ত্তিত হইবে? তাঁহারা যেমন ছিলেন নিশ্চয়ই তাহাই আছেন ভাবিয়া আমার কোন ভয় হয় নাই।

মিলস্। তারপর কি হইল?

নানি। তাঁহারা আমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি মিঃ জেম্স?" তিনি উত্তর করিলেন, "হাঁ নানি, আমি সেই জেম্স, আর আমার সঙ্গে ইনি আমার স্ত্রী।" আমি বলিলাম, "আপনি কেমন আছেন—বেশ সুখে আছেন তো?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমি এবং আমার স্ত্রী আমরা দুজনেই বেশ আছি, বড় সুখে আছি, বড় সুখে আছি; আমরা এখানে আসিয়া যে কি সুখ ভোগ করিতেছি তাহা পৃথিবীতে থাকিতে কল্পনাতেও কখন মনে ধারণা করিতে পারি নাই।" এই কথা শুনিয়া অমি বলিলাম, "যদি সেখানে যাইয়া এত সুখ ভোগ করিতেছেন, তবে আবার ফিরিয়া আসিলেন কেন?" এই কথা শুনিয়া জেম্স উত্তর করিলেন, "আত্মীয় স্বজনকে ফেলিয়া এখানে চলিয়া আসিলেও তাহাদের সহিত যে একটা বন্ধন ছিল, তাহা একবারে ছিন্ন হইয়া যায় নাই। তুমি বোধ হয় জান, আমি এবং আমার স্ত্রী, আমাদের দুজনেরই হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। এজন্য লোকে ভাবিতেছে আমি কোন উইল করিতে পারি নাই। কিন্তু আমি উইল করিয়াছি। সে উইল পাওয়া না গেলে আমার ত্যক্ত সম্পত্তি লইয়া আমার সন্তানগণকে বড় কষ্ট পাইতে হইবে। এই কারণ উইলের বিষয় কাহাকেও জানাইয়া দেওয়ার জন্য আমাদের ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। কাল আমরা বাড়ী গিয়াছিলাম, মনে করিয়াছিলাম মিলসকে আমার উইলের বিষয় বলিব, কিন্তু তিনি আমাদের সাড়া পাইয়া অত্যন্ত ভয় পাইলেন দেখিয়া আর তাঁহাকে কোন কথা বলা হয় নাই। তুমি আমাদের দেখিয়া ভয় পাইবে না বুঝিতে পারিয়া তোমার নিকট আসিয়াছি।" তারপর জেম্স যেস্থানে তাহার উইল রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "আজ মধ্যাহ্নে মিলস তোমার বাড়ীতে আহার করিবেন, তাঁহাকে আমার নাম করিয়া এই অনুরোধ করিও, তিনি যেন আমার বাড়ী যাইয়া অমুক স্থান হইতে উইল বাহির করিয়া, আমার সন্তানগণের হিতার্থে আমার ত্যক্ত সম্পত্তির সদ্ব্যবস্থা করেন।" এই কথার পর জেম্স বলিলেন, "নানি, তোমাকে আর একটী বিষয় জানাইতেছি, আগামী শুক্রবার ঠিক্ বেলা ৩টার সময় তোমার মৃত্যু হইবে এবং আমাদের সহিত পরলোকে আসিয়া তুমি মিলিত হইবে; এখন হইতে প্রস্তুত হও।" এই কথা বলার পর জেম্স ও তাঁহার স্ত্রী উভয়েই অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

মিলস সাহেব জেমেসের বাড়ী যাইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থান অনুসন্ধান করা মাত্র উইল খানি পাইলেন।

সেই শুক্রবারে নানির মৃত্যু হইয়াছিল এবং পর রবিবারে মিলস তাহার মঙ্গল কামনায় উপাসনাদি করিয়াছিলেন।*

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

* Life's Borderland and Beyond p. 155.

গৃহশিক্ষক

(গল্প)

বেশ ছিলাম—ত্রিশ টাকা বেতনে মহেশপুর ইংরাজী স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক। আমার বাড়ী নিশিগঞ্জ, মহেশপুর হইতে ৭ মাইল। শনিবারে দুইটার সময় স্কুল বন্ধ হইলে বাড়ী যাইতাম, আবার সোমবার বাড়ী হইতেই আহারাদি করিয়া একেবারে স্কুলে হাজির হইতাম; বাকী কয়টা দিন স্কুলের বোর্ডিংয়ে কাটাইয়া দিতাম। দরকার পড়িলে সপ্তাহের যে মধ্যে যে কোন দিনও বাড়ী যাইতাম।

বেতন ত্রিশ টাকা ছিল—'উপরি' প্রাপ্তিও কিছু ছিল। একটী অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকের ছেলে আমাদের স্কুলে পড়িত এবং বোর্ডিংয়েই থাকিত। আমি তাহার পড়া বলিয়া দিতাম, তাহার তত্ত্বাবধান করিতাম—ছেলেটীর পিতা আমাকে মাসে দশটী টাকা দিতেন। একরকম বাড়ীতে থাকিয়াই মাসে চল্লিশ টাকা উপার্জ্জন—এল্-এ ফেল ভদ্রলোকের পক্ষে যথেষ্ট; তাহার অধিক আশা করিতে গেলে মুরুব্বীর জোর চাই। আমার তাহা ছিল না,—নিজের কুলে ত নয়ই, শ্বশুর-কুলে বা মাতামহ-কুলেও তেমন কেহ ছিলেন না,—সকলেই আমারই মত গরিব;—আমারই মত কেহ বা স্কুলের মাষ্টার, কেহ বা পণ্ডিত, কেহ বা সামান্য কেরাণী।

আমার সংসারও বড় ছিল না;—আমার মা, আমার স্ত্রী, আর আমি, এই তিনজন মাত্র। তারপর স্বর্গীয় পিতাঠাকুর যে সামান্য কয়েক বিঘা জমি রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে নিতান্ত অজন্মা হইলেও, সংবৎসরের চা'ল ডালের ভাবনা করিতে হইত না। সুজন্মার বৎসরে যে ধান পাইতাম, সংসার খরচ বাদে তাহা হইতে যাহা বাঁচিত, তাহা গোলায় তুলিয়া রাখিতাম,—বাবার নিষেধ ছিল, কখন যেন ধান বিক্রয় না করি। এখন, আপনারা দশজনে বলুন ত, এই অবস্থায় আমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত ছিল কি না? এক, বলিতে পারেন, ভবিষ্যতে ত সংসারে লোক বাড়িতে পারে—পুত্র কন্যা হইতে পারে। আমার সে আশা নাই;—আমার বয়স বত্রিশ, আমার স্ত্রীর বয়স ছাব্বিশ! এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে যখন আমরা সন্তানের মুখ দেখিতে পাইলাম না, তখন এ বংশ রক্ষার আর সম্ভাবনা নাই—আমি শ্রীঅশ্বিনীকুমার বসুই এ বংশের শেষ প্রদীপ;—এই প্রদীপ নিবিয়া গেলেই নিশিগঞ্জের স্বর্গীয় পিতৃদেব রামধন বসুর বংশলোপ। ভবিষ্যতে স্কুল-মাষ্টারী করিবার জন্য এবংশে আর কেহই থাকিবে না। কি দুর্ভাগ্য!

কথাটা আবার জিজ্ঞাসা করি, মোটামুটি কিছুরই অভাব ছিল না, ভবিষ্যতে পরিবার বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা ছিল না, হঠাৎ কোন বিপদ আপদ কি ব্যাধিপীড়া হইলে যাহা ব্যয় হইতে পারে, সে জন্য মাষ্টারীর এই বেতন হইতেও, যখনকার কথা বলিতেছি, তখন ছয় শত টাকা ডাকঘরে সেবিংস্ ব্যাঙ্কে জমা ছিল এবং মাসে মাসে পাঁচ সাত টাকা জমা হইতেছে,—এ অবস্থাতেও কেন আমার অধিক উপার্জ্জনের লোভ হইল? মনস্তত্ত্বের এই কথাটা কেহ আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারেন?

এই যে আকাঙ্ক্ষা, এই যে অতৃপ্তি, এই যে কি জানি কি—অর্থাৎ এই যে সয়তান, এই মানুষকে সুখে থাকিতে দেয় না, শান্তিতে বাস করিতে দেয় না। তাহার ফলে মানুষের যে কি দুর্গতি হয়, কি বিপদ হয়, কি সর্ব্বনাশ হয়, অথবা যাহার অদৃষ্টের জোর আছে, তাহার সর্ব্বনাশের সূচনা মাত্র হইয়াই কিরূপে তাহার চৈতন্যোদয় হয়,—সেই কঠোর অভিজ্ঞতার কথাই আজ লিপিবদ্ধ করিব। এই হতভাগ্যের জীবনে সেই অতৃপ্ত সয়তানের খেলা দেখিতে পাইবেন।

মহেশপুর স্কুলের যিনি সেক্রেটারী তাঁহার নাম

শ্রীযুক্ত হরিহর চট্টোপাধ্যায় ; বড় জমিদার, আয় লাখ টাকার উপর। পাড়াগাঁয়ে লাখ টাকা আয়ের জমিদার রাজার হালে থাকে। হরিহর বাবুর খুব নামডাক ; প্রতাপও কম নয়—তবে এখন এই সুশাসিত ইংরেজের মুল্লুকে তাঁহার প্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায় না ;—জমিদারদের আর সে দিন নাই—পিনাল কোড সব সমান করিয়া দিয়াছে। তবে টাকার কল্যাণে জমিদার মহাশয়েরা এখনও পল্লীগ্রামে একটু আদটুকু বাদসাগিরি করিয়া থাকেন ; আমাদের স্কুলের সেক্রেটারী মহাশয়ও করেন,—তাঁহার কর্ম্মচারীরাও কিঞ্চিৎ মেজাজ দেখাইয়া থাকেন ; তাহাতেই গরিব প্রজাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আমাদের হেডমাষ্টার ও হেডপণ্ডিত মহাশয়েরা হরিহর বাবুর যথেষ্ট মন যোগাইয়া চলেন,—প্রতিদিন জমিদার মহাশয়ের খাস দরবারে হাজিরা দেন, একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষোত্তীর্ণ আর একজন কাব্য, দর্শন ও বেদান্ত এই ত্রি-তীর্থ ; তাঁহারা যে জমিদার বাবুর মোসাহেবী করেন, এমন কথা থার্ড মাষ্টার হইয়া কেমন করিয়া বলিব ? আমি কিন্তু ঐটি পারিতাম না—কোন প্রয়োজনও বোধ করিতাম না—মহেশপুর স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের বেতন ত্রিশ টাকার একপয়সাও বেশী হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তবে আর কেন হাজিরা দিয়া মরি ?

হরিহর বাবুর বয়স প্রায় পঞ্চাশ—অনুগত ব্যক্তিরা বলেন চল্লিশ কি বিয়াল্লিস। এত কম যাঁহার বয়স, এবং লাখ টাকা যাঁহার জমিদারীর আয়, তাঁহার প্রথমা পত্নীর ৺গঙ্গালাভ হইলে এই বছর দুই পূর্ব্বে যে তিনি একটী ষোড়শীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে নিন্দার কথা মোটেই নাই,—তা থাকুক না প্রথম পক্ষের একটী পুত্র, হউক না তাহার বয়স এগার বৎসর। তবে গত কয়েক বৎসর হইতে তাঁহার শরীর একেবারে 'ব্যাধি-মন্দিরম্' হইয়াছিল—এই যা কথা ; আর তাঁহার চেহারাটাও তেমন ভাল ছিল না। কিন্তু তাহাতে কি বড়মানুষের বিবাহ বন্ধ থাকে ? এই বিষম কন্যাদায়ের দিনে, হরিহর বাবুর মত রোগে জীর্ণ, পঞ্চাশ বৎসর বয়সের বড়মানুষের হাতে সুন্দরী, ষোড়শী কন্যাকে বলি দিবার লোক বাঙ্গালা দেশে যথেষ্ট, বহুৎ আছে। তুমি নবীন যুবক 'হরিবোল' (horrible) বলিলে চলিবে কেন ?

সে কথা থাকুক। একদিন স্কুল হইতে আসিয়া বোর্ডিংয়ে বসিয়া আছি, এমন সময় শুনিলাম হরিহর বাবুর পুত্র অনিলকুমারের যিনি গৃহশিক্ষক ছিলেন, তাঁহার সেই দিনই চাকুরী গিয়াছে এবং সেই দিনই তাঁহাকে মহেশপুর ত্যাগ করিয়া যাওয়ার আদেশ প্রচারিত হওয়ায় ভদ্রলোক কাহারও সহিত দেখা করিয়াও যাইতে পারেন নাই, এবং এমন অকস্মাৎ, কি অপরাধে তাঁহার পাঁচ বৎসরের চাকুরীটি গেল, তাহাও বলিয়া যাইতে পারেন নাই। এ অবস্থায় যাহা হয়, তাহাই হইল,—নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল ; সে সকল জনরব আর বলিয়া কাজ নাই। বড়মানুষের ঘরের কথা, আমরা সামান্য লোক কেমন করিয়া জানিব ; এবং যে সমস্ত জনরব প্রচারিত হইল, তাহার সত্য মিথ্যাই বা কেমন করিয়া নির্ণয় করিব।

তাহার পরই বোর্ডিংয়ের কোন কোন ছাত্র আসিয়া বলিল যে, এইবার হেডমাষ্টার মহাশয়ের অদৃষ্ট খুলিল, তিনিই না কি ১২৫৲ টাকা বেতনে অনিলকুমারের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইবেন। আর একজন সে কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিল যে, অন্য ব্যবস্থা হইবে ; হেড-মাষ্টার সকালে ও রাত্রে পড়াইয়া আসিবেন ; তাহার জন্য ৫০৲ টাকা পাইবেন, আর পণ্ডিত মহাশয় বিকালে পড়াইবেন, ৩০৲ টাকা পাইবেন ; বাড়ীতে আর মাষ্টার রাখা হইবে না। এই রকম কত কথাই যে শুনিতে লাগিলাম, তাহা আর কি বলিব।

সন্ধ্যার পর জমিদার বাড়ী হইতে একজন ভৃত্য আসিয়া আমাকে সংবাদ দিল যে, হুজুর আমাকে তলব করিয়াছেন ; এখনই যাইতে হইবে। এই অসময়ে আমার তলব কেন ? হয়ত ভৃত্য ভুল করিয়াছে, এই মনে করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল, "না, আপনাকেই এখনই ডাকিয়া লইয়া যাইবার হুকুম

হইয়াছে।” আমি ত অবাক্। আমার তলব! এত দিনের মাষ্টারীটা খসিবে না কি? কি জানি, অদৃষ্টে কি আছে! দরবারে আর কে কে আছেন জিজ্ঞাসা করায় ভৃত্য বলিল, “হুজুর দরবার ঘরে বসেন নাই; তিনি শয়ন ঘরে আছেন। শরীর ভাল নাই, তাই যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়া দিয়াছেন। একেলাই আছেন।” আমি আরও বিস্মিত হইলাম! একেবারে শয়নগৃহে আমার তলব! অসুস্থ শরীরে আর কাহারও সহিত দেখা করেন নাই; বাছিয়া বাছিয়া লোক পাইলেন এই অশ্বিনীকুমার বসু!

দুর্গানাম স্মরণ করিয়া যাত্রা করিলাম। জমিদার বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, ভৃত্যটী আমাকে একটা ঘরে বসাইয়া হরিহর বাবুকে সংবাদ দিতে গেল; এবং একটু পরেই আসিয়া আমাকে তাহার অনুবর্ত্তী হইতে বলিল। হরিহর বাবুর বৈঠকখানায় মাঝে মাঝে আসিতে হইয়াছে; কিন্তু আজ আমাকে যে দিকে যাইতে হইল, সে দিকে কোন দিন যাই নাই; সেটী অন্দর মহল কি বাহির মহল, তাহাও জানি না। দুই তিনটী ঘর পার হইয়া আমরা একটী ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। সে ঘরের দ্বার বন্ধ ছিল না, সম্মুখে একটা পর্দ্দা ছিল। পর্দ্দার বাহির হইতেই ভৃত্য বলিল, “হুজুর, মাষ্টার বাবু এসেছেন।” গম্ভীর স্বরে উত্তর হইল, “ভিতরে আস্‌তে বল।” সেটী শয়নঘর কি বসিবার ঘর, বুঝিতে না পারিয়া আমি আমার ছিন্ন পাদুকা বাহিরে রাখিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, একখানি পালঙ্কের উপর হরিহর বাবু শয়ন করিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন, “এস অশ্বিনী, ভাল আছ ত?” আমি পালঙ্কের নিকট যাইয়া তাঁহার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিয়া বলিলাম, “আজ্ঞে ভাল আছি। আপনার শরীর কি অসুস্থ হইয়াছে?” হরিহর বাবু বলিলেন, “হ্যাঁ, আজ শরীরটা তেমন ভাল নেই। তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এই চেয়ারখানা টেনে নিয়ে এই দিকে এসে বোসো।” আমি বিনীতভাবে বলিলাম, “আমি নীচেই বসি।” তিনি বলিলেন, “না, না, আমার শিয়রের কাছে চেয়ার টেনে বোসো। তোমার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে।” আমার সঙ্গে বিশেষ কথা! ব্যাপার কি?

আমি তখন একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া হরিহর বাবুর শিয়রের নিকট বসিলাম। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, “দেখ অশ্বিনী, আমি খোকার মাষ্টারকে বিদায় করে দিয়েছি। লোকটা লেখাপড়ায় বেশ ছিল; কিন্তু এদানিক তার যেন স্বভাবটা কেমন বোধ হচ্ছিল। বল্‌তে গেলে এক রকম অন্দরেই থাক্‌তে হয়, আর ছেলের মাষ্টার, তার উপর কোন রকম সন্দেহ হ'লে তাকে কি আর রাখা যায়। কি বল?”

আমি ধীরভাবে বলিলাম, “সে ত ঠিক কথাই।”

হরিহরবাবু বলিলেন, “তেমন কিছু নয়। এই আমার শ্বশুরবাড়ীর গাঁ থেকে যে ঝিটাকে এনেছি, মাষ্টারটা তার সঙ্গে হাসি তামাসা করত। আমার স্ত্রী তাই দেখে কা'ল আমাকে বল্‌লেন এবং মাষ্টারকে বিদায় করে দিতে বল্‌লেন। ঠিক কথাই ত! কি বল অশ্বিনী!”

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তাহার পর হরিহর বাবু বলিলেন, “দেখ, তুমি যদিও সর্ব্বদা আমার এখানে এস না, তবুও তোমার উপর আমার দৃষ্টি বরাবরই আছে। তোমার ঐ হেড্‌মাষ্টারই বল, আর সেকেন মাষ্টারই বল, আর পণ্ডিত মশাই-ই বল, সব খোসামুদের দল। তাই যদি না বুঝব, তা হ'লে এত বড় জমিদারীটি চালাই কি করে? কি বল অশ্বিনী! তা দেখ, বি-এ এম-এ-ই হোক, আর বিদ্যাভূষণ তর্কালঙ্কারই হোক—একই স্বভাব। আর —আর লেখা-পড়া—বিদ্যার কথা যদি বল, তা হ'লে তোমাকে বল্‌ছি, ওসব পাস-ফাস কর্‌লেই যে বেশী বিদ্যা হয়, তা আমি মানিনে। এই ধর না তুমি; তুমি এল-এ ফেল বটে, কিন্তু অনেক বি একে পড়িয়ে দিতে পার। কি বল?”

আমি আর কি বলিব; আমি শুধু ভাবিতে লাগিলাম, এ সূচনার উদ্দেশ্য কি? এত লোক থাকিতে তবে কি আমাকেই ছেলের মাষ্টার করা

হইবে? সত্য কথা বলিতে কি, এ কথাটা ভাবিয়াও মনে আনন্দ হইল।

হরিহর বাবু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তা দেখ অশ্বিনী, আমি ভেবে দেখলাম, কোথা থেকে কোন অজানা অচেনা লোক স্বধু মার্কা দেখে আনব, তার চাইতে জানা চেনা লোককেই মাষ্টারীটা দিই। তাই তোমাকে ডেকেছি। ছেলের মায়েরও তাই ইচ্ছা। তোমায় বলব কি অশ্বিনী, আমার স্ত্রীর একেবারে ঐ ছেলে তাঁর প্রাণ, কারো বলবার যো নেই যে ওঁর গর্ভজাত ছেলে নয়। যাক্ সে কথা। দেখ, তোমাকেই এ ভার নিতে হচ্চে; স্কুলে আর একজন মাষ্টার দেখে নেওয়া যাবে। তুমি ত স্কুলে ৩০৲টাকা মাইনে পাচ্ছ; আমরা তোমাকে একেবারে তার ডবল ৬০৲ টাকা দেব। তা ছাড়া খাওয়া দাওয়া, ধোবা নাপিত, সময় সময় কাপড় চোপড়—সব আমাদের জিম্মা। কি বল অশ্বিনী?"

আমি বলিলাম, "আমি স্কুলে ৩০৲টাকা পাই আর একটা ছেলে পড়িয়ে দশটাকা পাই। তারপর—"

আমার কথায় বাধা দিয়া হরিহর বাবু বলিলেন, "মোটে কুড়িটাকা বাড়ছে বলে' তোমার আপত্তি ত। যাক্ সে মাষ্টারকে যে ৭৫৲টাকা দিতাম, তোমাকেও তাই দেব। তারপর ছেলেটাকে যদি মানুষ করতে পার, চিরদিন এ সংসারেই কেটে যাবে। কি বল?"

আমি বলিলাম, "আমার বাড়ীতে কেউ নেই; আমাকে প্রতি শনিবারে যেতে হয়, আর সোমবারে আস্‌তে হয়।"

হরিহর বাবু বলিলেন, "সে একটা কথা বটে। তা তুমি একটু বোস অশ্বিনী, আমি অন্দর থেকে আস্‌ছি, এখনই আসব।" এই বলিয়া হরিহর বাবু পালঙ্ক হইতে নামিয়া অন্দরে চলিয়া গেলেন।

৭৫৲টাকা বেতন। কোন খরচপত্র নাই—৭৫৲টী টাকাই ঘরে যাইবে! এ কি কম প্রলোভন! হিসাব করিলে যে, অন্যস্থানের একশত টাকা বেতনের সমান! এ কি কম প্রলোভন। আমি এল্‌-এ ফেল—মহেশপুর স্কুলের থার্ড মাষ্টার—ত্রিশটাকা পাই, আর যে দশটাকা আছে, সে আজ আছে কাল নাই। কোথায় ত্রিশটাকা, আর কোথায় নিখরচা ৭৫৲টাকা। ইহার আর বিবেচনার কিছুই নাই—কিছু না! কত বি-এ এম-এ এই চাকরীর খোঁজ পাইলে এক রাশি সার্টিফিকেট আনিয়া ধরণা দিয়া পড়িত; আর আমাকে ডাকিয়া আনিয়া চাকুরী—ইহারই নাম অদৃষ্ট! আমি নিজেকে মহা ভাগ্যবান মনে করিলাম। হায় প্রলোভন, হায় শয়তান, এমনই করিয়াই মানুষ বিপন্ন হয়! ভগবান, আমাদের মত অমানুষকে যদি একটু ভবিষ্যৎ দৃষ্টি দিতে প্রভু! তাহা হইলে আর কিছু না হউক অনেক লাঞ্ছনার হাত হইতে আমরা মুক্তি পাইতাম!

প্রায় দশ মিনিট পরে হরিহর বাবু ফিরিয়া আসিলেন; তিনি বলিলেন, "দেখ অশ্বিনী তোমাকে যখন এক রকম ঘরের ছেলের মতই থাক্‌তে হবে, তখন এ সব বিষয়ে গৃহিনীর পরামর্শ নেওয়াই দরকার। বিশেষ তাঁর বয়স কম হ'লেও খুব বুদ্ধিমতী। তুমি শুন্‌লে আশ্চর্য্য হবে অশ্বিনী, তিনি যে পরামর্শ দেন, তেমন পরামর্শ খুব পাকা লোকেও দিতে পারে না। তা দেখ, উনি বল্‌লেন যে, তোমার যখন বাড়ীতে কেউ নেই, আর জমাজমিটাও আছে, তখন তুমি শনিবারে শেষ বেলায় বাড়ী যেও; কিন্তু সোমবারে খুব ভোরে চ'লে এস, যেন সোমবারের সকালের পড়াটা কামাই না হয়; কোনও বার বা রবিবার বিকেলেই এলে। কেমন, এতে সম্মত ত? হেড্‌ মাষ্টারের কথাও ভেবেছিলাম; কিন্তু উনি বল্‌লেন, ওসব লোক দিয়ে ছেলে পড়ান হয় না, ওরা স্কুলেই পড়াতে পারে। তুমি জানাশুনো লোক, বাড়ীতে একেবারে ছেলের মত থাক্‌বে; যখন যা অসুবিধা বোধ হবে, অন্দরে বলে পাঠালেই তখনই তা ঠিক হয়ে যাবে। কি বল?"

আমি বলিলাম, "আপনি পিতার তুল্য; আপনি যখন আদেশ কর্‌ছেন, তখন আমার আর আপত্তি

কি! তবে বাড়ীতে মাকে কথাটা জিজ্ঞাসা করা দরকার।"

হরিহর বাবু বলিলেন, "তা বেশ ত; কা'ল সকাল সকাল স্কুল থেকে বেরিয়ে বাড়ী যেও, আবার পরশু দিন এসেই একেবারে এখানে কাজে হাজির হবে।"

আমি বলিলাম, "মায়ের এতে আপত্তি হবে না; তবুও কোন কাজ করতে গেলে তাঁকে জানাতে হয়, তাঁর আশীর্ব্বাদ নিয়ে আসতে হয়।"

হরিহর বাবু বলিলেন, "তা বটেই ত! আজ কাল-কার দিনে এমন কথা কোন ছেলে বড় একটা বলে না। তোমার কথায় আমি বড় সন্তুষ্ট হ'লাম অশ্বিনী! আর পাশের ঘর থেকে আমার স্ত্রীও সব কথা শুন্‌ছেন; তিনিও নিশ্চয়ই খুব খুসী হয়েছেন। তা তুমি এখন এস, অনেক রাত হয়ে গেল। ওরে তিনু একটা লণ্ঠন নিয়ে মাষ্টার বাবুকে বোর্ডিংয়ে রেখে আয় গে ত! আমি তা হ'লে ভিতরে যাই।"—বলিয়া হরিহর বাবু পাশের ঘরে গেলেন এবং তখনই বাহির হইয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "যেও না অশ্বিনী, একটু বোসো। এই দেখত, তুমি ভদ্রলোকের ছেলে এত-ক্ষণ বসে থাকলে, এখন গিয়ে হয় ত ঠাণ্ডা ভাত খাবে। তাই উনি বল্‌লেন যে, তোমাকে একটু জল খাইয়ে দিতে। দেখেছ অশ্বিনী, ও'র কেমন বুদ্ধি বিবেচনা! কথাটা আমার মোটেই মনে হয় নি।"—বলিয়া তিনি যেন খুব আত্মপ্রসাদ অনুভব করিলেন।

আমি বলিলাম, "জল খাওয়ার দরকার হবে না। আপনাদেরই ত খাচ্চি; এর পরে ত দিন রাত্রিই আছি। রাতও বেশী হয় নি, বোধ হয় ন'টা; আমাদের ন'টার পরই খাওয়া হয়।"

হরিহর বাবু বলিলেন, "আরে তা কি হয়! দেরী হবে না। উনি পূর্ব্বেই সব ঠিক করে রেখেছিলেন; আমারই মাথায় কথাটা আসে নি, হাঃ হাঃ হাঃ।"

কি করি, জল খাইতে হইল। পাশের ঘর হইতে গৃহিণী যে দেখিতেছেন, তাহা অলঙ্কারের ধ্বনিতেই বুঝিতে পারিলাম। বোর্ডিংয়ে চলিয়া আসিলাম। অতি-ভক্তি যে চোরের লক্ষণ, ৭৫৲টাকার প্রলোভনে তখন সে কথা ভুলিয়া গেলাম। পথে আসিতে আসিতে নিজের সৌভাগ্যে গর্ব্ব অনুভব করিতে লাগিলাম; আর মনে হইতে লাগিল, হরিহর বাবুর কথা;—বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা যে কি, তাহাই ভাবিয়া বেশ আনন্দ অনুভব করিলাম। কিন্তু আমার দিক হইতেও যে কথাটা ভাবা দরকার, তাহা ঐ ৭৫৲টাকা আমাকে ভুলাইয়া দিল।

যথা সময়ে নূতন চাকুরীতে উপস্থিত হইলাম। অনিল ছেলে ভাল, তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম, কারণ সে আমাদের স্কুলে পড়ে, এবার তাহার পঞ্চম-শ্রেণী; পড়াশুনায় খুব মনোযোগ; বড়মানুষের ছেলে-দের যে সব দোষ থাকে; অনিলের তাহা কিছুই নাই। সুতরাং তাহার পড়াশুনার জন্য আমাকে কোন বেগই পাইতে হইল না। আমাকে শিক্ষক রূপে পাইয়া সে খুবই আনন্দিত হইল। আমিও নিশ্চিন্ত হইলাম।

পাঁচ সাত দিন বেশ কাটিয়া গেল। তাহার পর একদিন যখন অনিল স্কুলে গিয়াছে, আমি কি এক খানি বই পড়িতেছি, সেই সময় একটী দাসী একখানি কাগজে জড়ান কি হাতে করিয়া আমার ঘরে প্রবেশ করিল। এ কয়দিন কিন্তু কোন ঝি দাসী আমাদের দিকে আসে নাই। অনিলের পড়া ও আমার থাকিবার জন্য যে কয়েকটি ঘর নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা অন্দরের সংলগ্ন হইলেও, অন্দরের দাসীরা কেহ আমাদের দিকে আসিত না, আসিবার প্রয়োজনও ছিল না; দাসীকে দেখিয়া আমি বলিলাম, "এখানে কি চাই?"

দাসী একটু মুচকি হাসিয়া বলিল, "মা আপনার জন্য এই কাপড় পাঠিয়ে দিলেন।"

আমি বলিলাম, "আমার ত কাপড় আছে; যখন অভাব হবে, তখন আমিই কিনে নেব। তুমি কাপড় ফিরিয়ে নিয়ে যাও, আমার দরকার নেই।"

দাসী বলিল, "মা বলেছেন, আপনি যে কাপড় জামা ব্যবহার করেন, তাতে খোকা বাবুর মাষ্টারের মানায় না; কাপড় চোপড় একটু ভাল চাই। তাই

তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনি না নিলে তিনি বড়ই দুঃখিত হবেন।"

গৃহিণীই যে আমার প্রকৃত মনিব তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম; সুতরাং তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না; বলিলাম, "তা হলে ঐ টেবিলের উপর রেখে যাও। কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে বোলো, আমার এ সব কিছুরই দরকার নেই।"

দাসী হাসিয়া বলিল, "আপনার দরকার কি তা তিনি আপনার চাইতে বেশী বোঝেন। আপনার যাতে কোন রকম অসুবিধা না হয়, তার জন্য সকলকে সাবধান করে দিয়েছেন।"—বলিয়া দাসী চলিয়া গেল।

দাসীর কথা কয়টিও আমার ভাল লাগিল না। কাপড় দেওয়াও আমি ঠিক মনে করিলাম না। আমি ছেলের মাষ্টার, মাষ্টারী করিব; সরকারের যে রকম ব্যবস্থা আছে তাহাই আমার উপর প্রযুক্ত হইবে। আমার অসুবিধার জন্য এত বড় জমিদারের গৃহিণীর এ প্রকার আগ্রহের ত কোনই প্রয়োজন অনুভব করিলাম না। তবে পূর্ব্বের মাষ্টারের হঠাৎ বিদায় দানে সম্বন্ধে বাহিরের কু-লোকে যে কটাক্ষ করিয়াছিল, তাহার কি কিছু ভিত্তি আছে? ছিঃ, অমন কথা মনেও করিতে নাই। কর্ত্রী ঠাকুরাণী গরিবের ঘরের মেয়ে, গরিবের দুঃখ খুব বোঝেন; আমাকে দরিদ্র মনে করিয়া দয়া পরবশ হইয়াই তিনি আমার সুবিধা অসুবিধার খোঁজ লইয়াছেন এবং কাপড় পাঠাইয়াছেন। সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলা সম্বন্ধে এমন অন্যায় কথা, এমন পাপের কথা মনে করিলেও অধর্ম্ম হয়। মনকে তাহাই বুঝাইতে লাগিলাম; কিন্তু—!

পরদিন দ্বিপ্রহরে আবার সেই দাসী আসিয়া উপস্থিত। সে বলিল, "মাষ্টার মশাই, মা জান্‌তে পাঠালেন; আপনার ত কোন অসুবিধা হচ্চে না?"

আমি বলিলাম, "কিছু না। তাঁকে বোলো আমি গরিব মানুষ, এখানে রাজার হালে আছি; আমার কোন অসুবিধাই নেই।"

ঝি হাসিয়া বলিল, "আমিও ত সেই কথাই বলি। তিনি কি তা শোনেন! তিনি সারা দুপুর সুধুই বলেন 'যা দেখে আয় মাষ্টার কি করছেন', 'যা শুনে আয় তার ত অসুবিধা হচ্চে না'; আমি কি আর সব বার আসি? এদিক ওদিক ঘুরে গিয়ে যা হয় একটা বলি। তা, যা বলুন মাষ্টার মশাই, আপনার অদেষ্ট ভাল, মায়ের নজরে যখন পড়েছেন, তখন বুঝে চল্‌তে পারলে আপনাকে পায় কে? কর্ত্তা ত মায়ের হাতের মধ্যে। আর বুড়ো-মানুষের কি চোক আছে? মা তাঁকে যে দিক ফেরাবেন, তিনি সেই দিকেই ফিরবেন। যাই, তিনি হয়ত ঐ জানালার ধারেই বসে আছেন।"

ঝি চলিয়া গেল। আমার মাথায় যেন বজ্রপাত হইল! তাহা হইলে যাহা কা'ল ভাবিয়াছি, তাহা ত মিথ্যা নহে। এখন উপায়! হায় আমার দুর্ভাগ্য! ৭৫ টাকার লোভে এ কি করিলাম! যে দিন হরিহর বাবু আমাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই দিনের সব কথা আমার মনে হইল। সেই দিনই ত এ সকল কথা আমার বোঝা উচিত ছিল! কিন্তু তখন উন্নতির আসায় আমি অন্ধ হইয়াছিলাম; সম্ভ্রান্ত গৃহের মহিলা-সম্বন্ধে কোন অন্যায় কথা ত তখন আমার মনেই আসে নাই। এই বত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যে এমন কথা ত কখন শুনি নাই। বইয়ে পড়িয়াছি বটে, কিন্তু তাহা কল্পনা বলিয়াই মনে করিয়াছি। সত্য সত্যই যে ভদ্র মহিলা এমন হইতে পারে, তাহা আমি কোন দিনই ভাবি নাই। ছিঃ, এ সব কথা মনে করিলেও যে মন কলুষিত হয়! কিন্তু এখন উপায় কি?

আমি আর স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলাম না, আমার মনের ভিতর তখন আগুন জ্বলিতেছিল। আমি উঠিয়া ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। হঠাৎ আমার দৃষ্টি অন্দরের দিকে পড়িল। দেখিলাম অন্দরের দিকে একটা জানালার সম্মুখে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার দৃষ্টি তখন অন্য দিকে নিবদ্ধ ছিল। কি অনুপম রূপ, কি মোহিনী প্রতিমা! মানুষের যে এমন রূপ থাকে, সে রূপে যে এত মাধুর্য্য থাকে,

তাহা ত আমি কোন দিন দেখি নাই। হাঁ, রূপ বটে! দেখিবার বস্তু বটে!

আমি তখন আত্মবিস্মৃত হইলাম; যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলাম, সেখান হইতে নড়িতে পারিলাম না। সেই স্থানে দাঁড়াইয়া সেই অতুলনীয় রূপরাশি দেখিতে লাগিলাম। হঠাৎ তিনি মুখ ফিরাইলেন,—চারিচক্ষু সম্মিলিত হইল। তাহার পরই একটু হাসিয়া, তিনি জানালার অন্তরালে গেলেন। আমার তখন সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল।

আমি আর সেখানে দাঁড়াইলাম না। সরিয়া আসিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। চক্ষের সম্মুখে আমার সেই রূপই খেলাইয়া বেড়াইতে লাগিল,—হৃদয়ের মধ্যে সেই হাসিই দীপ্তি পাইতে লাগিল। আমি যেন কেমন হইয়া গেলাম! তাহার পর কত কথা ভাবিতে লাগিলাম, কত সুখের কথা—কত ভোগের কথা—কত মাথামুণ্ড! সে কথা আর প্রকাশ করিয়া কাজ নাই! এখন সে কথা বলিতেও যে আমার প্রাণ কেমন করে!

সে রাত্রিতে আর খোকাকে পড়াইতে পারিলাম না—শরীর অসুস্থ হইয়াছে বলিয়া অনাহারেই শয়ন করিলাম। খোকা বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল।

আমার আর নিদ্রা নাই। কত কি ভাবিতে লাগিলাম, তাহা এত দিন পরে বলিতে পারিতেছি না।

রাত্রি যখন প্রায় দশটা, তখন সেই দাসী চোরের মত ধীরে ধীরে আমার শয়ন ঘরে প্রবেশ করিল এবং আমার বিছানার পার্শ্বে আসিয়া অনুচ্চ স্বরে বলিল, "মাষ্টার বাবু কি ঘুমুচ্ছেন?"

আমি মাথা তুলিয়া বলিলাম, "না, ঘুম হচ্ছে না। তুমি এত রাত্রে কেন?"

দাসী বলিল, "আর এত রাত্রে! এখন বলুন, কি করবেন? কা'ল সকালেই আমাকে খবর দিতে হবে।"

আমি বলিলাম, "কি করব?"

দাসী হাসিয়া বলিল, "কি আর করবেন! নিমন্ত্রণ নিলেন ত?"

আমি বলিলাম; "কৈ, কেউ ত আমাকে নিমন্ত্রণ করে নি!"

দাসী রহস্য করিয়া বলিল, "চোক দুটো তখন কোথায় ছিল?"

আমি বলিলাম, "পত্রের দ্বারায় নিমন্ত্রণ না করলে, আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করব না—এই কথা বোলো।"

দাসী বলিল, "বেশ তাই হবে। কাল নিমন্ত্রণ পত্র পাবেন।"

তখন কিন্তু নরকের পথে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই নিমন্ত্রণ পত্র চাহিয়াছিলাম—রূপের মোহে তখন আমি আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু ঐ নিমন্ত্রণ পত্রই আমাকে বাঁচাইয়াছিল—আমার রক্ষাকবচ-স্বরূপ হইয়াছিল।

ভাল মন্দের দ্বন্দ্বেই সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। কেহই পরাজয় স্বীকার করিল না, তবে সত্য বলিতে কি, মন্দের, প্রলোভনের, রূপের জয়ই অনিবার্য্য বলিয়া বোধ হইল।

পরদিন খোকা যখন স্নান আহারের জন্য অন্তঃপুরে গিয়াছে, সেই অবকাশে দাসী আসিয়া 'নিমন্ত্রণ পত্র' দিয়া গেল।

রঙীন সুদৃশ্য খামখানি হাতে পড়িতেই একটা সুবাস অনুভব করিলাম। পত্রখানি নাসিকার নিকট লইয়া আসিলাম, গন্ধে ভুরভুর করিতেছে। এসেন্স-মিশানো কালীতে লেখা।

পত্র খুলিলাম। অক্ষরগুলি সুছাঁদ—বানান ভুলও বেশী নাই। পাঠ করিতে লাগিলাম,—কথাগুলি যেন অদেহিনী সুরা। আমার মস্তিস্কে প্রবেশ করিয়া আমায় পাগল করিয়া, মাতাল করিয়া তুলিল—সুখের আবেশে আমি বিভোর হইয়া পড়িলাম।

পত্রখানির শেষাংশে পৌছিয়া, স্বাক্ষর নামটির দৃষ্টি পড়িবামাত্র আমার সে সুখের নেশা তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া, আমার সমস্ত দেহমন অসীম লজ্জা ও প্রচণ্ড ধিক্কারে ভরিয়া উঠিল। পূর্ব্বে এই শয়তানীর নাম আমি জানিতাম না। দেখিলাম, সে নাম—যে নাম ইহজগতে

আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান, আমার চিরজীবনের সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তি শ্রদ্ধা ও পূজার জিনিষ,—আমার মার নাম।

পত্রের প্রতি শব্দ যেন তখন আমাকে প্রবলভাবে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল।

কর্ত্তব্য স্থির করিতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না। কে যেন আমার হৃদয়ে অমিত বলসঞ্চার করিল—কে যেন আমাকে আমার গন্তব্য পথ স্থির করিয়া দিল।

আমি তৎক্ষণাৎ জামা চাদর লইয়া একেবারে হরিহর বাবুর নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি তখন কার্য্যান্তরে ব্যস্ত ছিলেন, আমার আর অপেক্ষা সহিল না। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আপনাকে একটু উঠে আস্তে হচ্চে; একটা বিশেষ কথা আছে।"

আমার মুখের জোর দেখিয়া এবং আমার কথা শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে লইয়া পাশের ঘরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি অশ্বিনী, ব্যাপার কি?"

আমি অতি নম্রস্বরে বলিলাম, "আমি বাড়ী চল্লাম; চাকরি করব না, আর—মহেশপুরে আসব না।"

হরিহর বাবু বলিলেন, "কেন, কেন, হয়েছে কি?"

আমি বলিলাম, "মাতৃ-আজ্ঞা।"

হরিহর বাবু বলিলেন, "এমন হঠাৎ! কারণ কি হল শুন্‌তে পাইনে?"

"আজ্ঞে না"—বলিয়া আমি সেই পাপপুরী পরিত্যাগ করিলাম। নির্জ্জন পথে, পত্রখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া, পার্শ্বস্থিত একটা পচা ডোবায় ফেলিয়া দিলাম।

তাহার পর,—তাহার পর সেই জমীদার বাড়ীতে কি হইয়াছিল, সে কথা হিন্দুর ছেলের বলিতে নাই।

শ্রীজলধর সেন।

দেশের লোক

ঝরঝরে ঘরখানি উলুখড়ে কোন মতে ছাওয়া,
মাটীর দেয়ালে ক'টা ফাঁক দেওয়া—আসে আলো হাওয়া;
বাঁশের খুঁটিতে আঁটা পাশে ছুটি দাওয়া পরিপাটি—
নিকান' গোবরজলে, ধারে ভাঙা দরমার টাটি।

আরো ছুটি ঘর আছে—একখানি প্রাচীরের পাশে
বাহিরের একচালা—লোকজন যদি কেউ আসে;
ভিতরের গায়ে তারি পাকের চালাটি সবে-তোলা,
কূপটি তাহারি ধারে, কাছে এক শস্যহীন গোলা।

গরুর চালাটি আছে আঙিনার এককোণ ঘেঁসে,
তারি ধারে সদরের আগলটি দেয়ালের শেষে;
আঙিনার মাঝখানে গোটাকত গাঁদা ও দোপাটি,
পুঁই ও পালঙ্ শাক—তারি পাশে লাউএর মাচাটি।

গাছপালা বেশী নাই; এককোণে ডালিমের গাছে
ছেঁড়া ন্যাকড়ায় বাঁধা ফল ক'টা—কাকে খায় পাছে;
তারি কাছে ঝাড় কত' দু-বছরে' করবীর চারা—
থোকা-থোকা রাঙাফুলে এই শীতে সাজিয়াছে তা'রা।

তুলসীর মঞ্চটি—তাই শুধু ইঁট দিয়ে গাঁথা,
তক্‌তকে বেদীখানি—পায়না পড়িতে ঝরা পাতা;
ঘরের গৃহিণী দিনে দশবার বেদীটি নিকায়—
মূর্ত্তিমান্ নারায়ণ—সাঁঝে নিজে দীপটি দেখায়।

নিয়ত প্রণাম করে কাজ বা অকাজ সব ফেলে,'
তাই পাশে দাগ-ধরা সিঁথার সিঁদুরে আর তেলে;
ছেলেটি তাহারি কাছে খেলা করে কাদামাটি নিয়ে,
যতবার ধূলা মাখে ততবার ফেলে ঝাঁট দিয়ে।

রোজ আনে রোজ খায়—ঘরদ্বার কিবা হবে আর,
খেটে এনে দিয়ে-থুয়ে বড় বেশী বাঁচে না যে তার!
ধর্ম্ম বল' কর্ম্ম বল' যাহা কিছু এই শুধু আছে—
ব্যথা পেলে বাহু তুলে' জানায় তা' আকাশের কাছে!

অবিচার অত্যাচার ভাবে নিজ করমের ফল,
নয়নের জল ছাড়া তাই কিছু থাকেনা সম্বল;
এই দেশ—এই লোক—হাসিওলা শিক্ষা-অভিমানী,
ধর্ম্ম জানে তার কাছে সত্য মূল্য কা'র কতখানি!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

ব্রজ-কাহিনী

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

তুলসীদাস

শিবলিঙ্গ, সূর্য্যমন্দির ও শক্তি পীঠ।

হিন্দী রামায়ণ রচয়িতা তুলসীদাসের নাম বাঙ্গালীরা প্রায় সকলেই জানেন। প্রয়াগের সন্নিহিত যমুনা তীরস্থ রাজাপুর গ্রামে সংবৎ ১৬০০ সালে (খৃঃ অঃ ১৫৪৪) সরযূপারী ব্রাহ্মণকুলে ইঁহার জন্ম, পিতা ভানুদত্ত দুবে, জননী হুল্লাসী। ১৬৩১ সম্বতে ইনি হিন্দী রামায়ণ রচনা করেন। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়া নৃসিংহদাস বাবাজী নামক একজন সন্ন্যাসীর নিকট প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। রামায়ণ ভিন্ন ইঁহার বিনয়পত্রিকা প্রভৃতি দোহা ও গান প্রচলিত আছে। নবীন বয়সে পরমা সুন্দরী যুবতী ভার্য্যা রত্নাবলীর প্রেমে এতদূর মুগ্ধ ছিলেন যে ক্ষণকালের জন্য তাঁহাকে নয়নের অন্তরাল করিতে পারিতেন না। একবার শ্বশুরের নিতান্ত অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া পত্নীকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে বাধ্য হন এবং নিজেও ডুলীর সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিলেন। ইহাতে ইঁহার বনিতা বিরক্ত ও লজ্জিত হইয়া ইঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, "আমি সমাস্থা রমণী, আমার আঁচল ধরিয়া বেড়াইতে তোমার লজ্জা হয় না? লোকে তোমায় উপহাস করিয়া ছি ছি বলিয়া ধিক্কার দেয় তাহা কি তুমি শুনিতে পাওনা? তোমার এতটা অনুরাগ যদি ভগবানের পদে থাকিত তাহা হইলে তুমি মুক্ত হইয়া যাইতে পারিতে। ছি ছি ফিরে যাও।" সেই দিন হইতে তুলসীর মন ফিরিয়া গেল। তিনি পত্নীর অনুসরণ ত্যাগ করিয়া ভগবানের চরণ অন্বেষণে অগ্রসর হইলেন। অবশিষ্ট জীবন ভজন সাধন ও রামায়ণ রচনায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি কাশীধামে গঙ্গাতীরে শ্রীরামচন্দ্রের একটী মঠ স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন। কাশীতে অবস্থানকালে একটী সহমরোণাদ্যতা রমণীকে পতির চিতারোহণ হইতে নিবৃত্ত করিয়া, তাঁহার মৃত বা মৃতকল্প স্বামীকে দৈবশক্তি প্রভাবে পুনর্জ্জীবিত করিয়া দিয়াছিলেন। এতদ্ সম্প্রদায়ের লোকের বিশ্বাস যে, তুলসীদাস হনুমানের কৃপায় চর্ম্মচক্ষে ইষ্টদেবতা রামসীতার দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। ভক্তমাল গ্রন্থে লিখিত আছে, আকবর বাদশাহ তুলসীদাসের অলৌকিক শক্তির সংবাদ শুনিয়া তাঁহাকে নিজ রাজধানীতে লইয়া গিয়া 'জহুরা' দেখাইতে বলেন। তুলসী দাস বলিলেন তিনি 'জহুরা' জানেন না। ইহাতে বাদশাহ রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কারাগারে দেন। পরে সহরে হনুমানের উপদ্রব হইতেছে দেখিয়া ভীতচিত্তে তাঁহাকে সসম্মানে বিদায় করিয়া দিলেন।

বৃন্দাবনে যে তুলসীদাসের কিছু কীর্ত্তি আছে তাহা অনেকেই জানেন না। এখানে যমুনা পুলিনের দক্ষিণ দিকে তুলসীদাসের মঠ বলিয়া একটী কুঞ্জ বা ঠাকুর বাটী আছে, মন্দিরে রামসীতার বিগ্রহ, সম্মুখে পিত্তলনির্ম্মিত তুলসীদাসের মূর্ত্তি স্থাপিত। এই মঠ প্রতিষ্ঠিত হইবার কারণ এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। একদিন শারদিয়া পূর্ণিমা রজনীতে তুলসীদাস বৃন্দাবনে যমুনা পুলিনে ভ্রমণ করিতে করিতে রাধাকৃষ্ণের দর্শন পাইলেন। রামসেবক তুলসীদাস শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—

কাঁহা কহুঁ ছঁব আজ্ কী ভলে বনেহ নাথ।
তুলসী মস্তক যব নবে ধনুস্ বাণ লেও হাত॥

শ্রীকৃষ্ণরাধাও ভক্তের কাতর প্রার্থনা শুনিয়া তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য মুরলী লুকাইয়া ধনুর্ব্বাণ বাহির করিয়া রামসীতা মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হইলেন। তুলসীদাসও সঙ্গে সঙ্গে ধরাবলুণ্ঠিত হইয়া ভক্তি গদ্গদ্ স্বরে বলিয়া উঠিলেন—

কিত্ মুরলী, কিত্ চন্দ্রিকা, কিত্ গোপীন্ কো সাথ।
আপনে জানকে কারণে নাথ ভয়ে রঘুনাথ॥

এই ঘটনাটী স্মরণ করাইবার জন্য হৃদয়রাম বাবাজী

নামক তুলসীদাসের একজন ধনী ভক্ত এই মঠটী তৈয়ার করিয়া দিয়াছিলেন। এ কুঞ্জ এত বড় যে ৭টা মহল ও ৫টা কূপ আছে। সংস্কারাভাবে অনেক গৃহ পড়িয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। অধুনা এ মঠ রামানন্দী সম্প্রদায়ের আখড়া রূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

তুলসীদাসের মৃত্যু দিন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত হিন্দী পদটী প্রচলিত আছে—

সম্বৎ ষোড়হশ আশী অসি গঙ্গকে তীর
শ্রাবণ শুক্লা সপ্তমী তুলসী তাজো শরীর ॥

সুতরাং ১৬৮০ সম্বতে (১৬২৪ খৃঃ অব্দে) শ্রাবণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে অসি-গঙ্গা-সঙ্গমে কাশীধামে তুলসীদাসের স্বর্গলাভ হইয়াছিল তাহা বুঝা যাইতেছে।

শিবলিঙ্গ, সূর্য্যমন্দির ও শক্তি দেবীর পীঠ।

বৃন্দাবনধামে যে কয়েকটী শিবলিঙ্গ আছেন তাহার মধ্যে গোপীশ্বর ও বনখণ্ডী মহাদেব বিশেষ বিখ্যাত। গোপীশ্বর শিবলিঙ্গের এইরূপ বিবরণ ব্রজপরিক্রমা গ্রন্থে আছে—

কি অপূর্ব্ব শোভা এই বনের ভিতর।
গুণাতীত লিঙ্গরূপ নাম গোপীশ্বর ॥
এই সদাশিব বৃন্দা বিপিন পালয়।
ইঁহাকে পূজিলে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয় ॥
গোপীগণ সদা কৃষ্ণ সঙ্গের লাগিয়া।
নিরন্তর পূজে যত্নে নানা দ্রব্য দিয়া ॥
কহিতে কি পারি যে মহিমা গুরুতর।
গোপিকা পূজিত তেঁই নাম গোপীশ্বর ॥

ব্রজবাসীরা কিন্তু বলেন যে মহাদেব রাসলীলা দর্শনা-কাঙ্ক্ষী হইয়া রাসমণ্ডলে গোপিকা বেশে সমুপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তদবধি লিঙ্গ মূর্ত্তিতে বৃন্দাবন ধামে অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বজ্রনাভ মথুরা মণ্ডলে যে চারিটী লিঙ্গমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন ইনি তাহার অন্যতম। মূর্ত্তিটি ক্ষুদ্র এবং মন্দিরেরও তাদৃশ শোভা সম্পদ নাই। ইঁহার মন্দির বংশীবটের নিকট অবস্থিত।

বনখণ্ডী মহাদেব—এটীও প্রাচীন শিবলিঙ্গ তবে রূপ সনাতনের সময়ের কিনা তাহা বলিতে পারিলাম না; কেন না প্রাচীন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ পাই নাই। পুরাতন সহরে যাইবার পথে যৎসামান্য কারুকার্য্য বিশিষ্ট ইহার নূতন মন্দিরটী দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রজবাসীরা বলেন, সনাতন গোস্বামী বৃদ্ধ বয়সে গোপীশ্বর পর্য্যন্ত শিবপূজা করিতে যাইতে অক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া মহাদেব কৃপা করিয়া এই স্থানে তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন।

সূর্য্য মন্দির—শ্রীকৃষ্ণ কালীয়দমন করিয়া যমুনা-লহরী হইতে উত্থিত হইলে তাঁহার অতিশয় শীতবোধ হইয়াছিল। সে সময়ে দ্বাদশ আদিত্য (সূর্য্য) কিরণ বর্ষণ করিয়া ইঁহার শীত নিবারণ করিলে শ্রীকৃষ্ণের দেহ হইতে ঘর্ম্ম নিসৃত হয়। তদবধি এস্থানের নাম প্রস্কন্দন হইয়াছে। ইহাকে লোকে দ্বাদশ আদিত্য টীলাও বলে। এই টীলার উপর মদনমোহনজীর পুরাতন মন্দির। তাহার পার্শ্বেই সূর্য্যদেবের একটী মন্দির আছে। এ মন্দিরটী তত পুরাতন নহে। সূর্য্য মন্দিরের পার্শ্বেই আবার শীতলা দেবীর একটী মন্দিরও স্থাপিত হইয়াছে। ব্রজপরিক্রমা গ্রন্থে কেবল প্রস্কন্দন তীর্থের উল্লেখ আছে। মন্দিরের কথা নাই। চৈতন্যদেব মধ্যে মধ্যে আদিত্যটীলার উপর হইতে বন ও যমুনার শোভা দেখিতেন, সে জন্য তাঁহার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একটী ক্ষুদ্র মন্দিরের ভিতর শ্বেতপ্রস্তরে তাঁহার চরণচিহ্ন স্থাপিত আছে। আমরা মনে করি, অতি প্রাচীন কাল হইতেই ব্রজ মণ্ডলে শৈব ও সৌরগণের নিবাস ছিল, উপরি উক্ত শিব ও সূর্য্য মন্দিরগুলি তাহারই সাক্ষী। কেশীঘাটের নিকট একটী নবনির্ম্মিত মন্দিরে দক্ষ-তনয়া মৃতা সতীর কেশপতন হইয়াছিল বলিয়া পাণ্ডারা দেখাইয়া থাকে। পঞ্জিকাতে ও বৃন্দাবনে কেশিনী দেবীর নামোল্লেখ আছে। কিন্তু ভৈরব ভূতেশ্বরের মন্দির মথুরায়। সেখানেও পাতাল দেবী নামে একটী মূর্ত্তি আছে। সুতরাং সতীর কেশ, বৃন্দাবন অথবা মথুরায়, কোথায় পড়িয়াছিল ঠিক বলা যায় না। বৃন্দাবনে

এই একটিমাত্র সতীপীঠ আছে। এখানে কোন মূর্ত্তি নাই। ইহার সম্মুখবর্ত্তী গৃহে কৃষ্ণ-কালী মূর্ত্তি অতি অল্পদিন হইল স্থাপিত হইয়াছে। প্রাচীন কোন গ্রন্থে বৃন্দাবনে শক্তিপীঠের কোন উল্লেখ পাই নাই।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বিল্বমঙ্গলের কুঞ্জ

জয়দেব মন্দির ও সাক্ষীগোপাল।

ভরতের দক্ষিণ দেশে কৃষ্ণবেণ্বা নদীতীরবর্ত্তী গ্রাম-নিবাসী যে ব্রাহ্মণ সন্তান বিল্বমঙ্গল ঠাকুর নবীন যৌবনে বারাঙ্গনা-রূপ-মোহে মুগ্ধ হইয়া পিতৃশ্রাদ্ধ মৃতা তিথি দিনে অর্দ্ধরাত্রে ঘোর বৃষ্টি ঝঞ্ঝাবাত উপেক্ষা করিয়া শবদেহ ভেলায় নদী পার হইয়াছিলেন; যিনি সুপ্তা চিন্তামণির গৃহদ্বার অর্গলিত দেখিয়া প্রাচীর বিলম্বিত কাল সর্পকেও রজ্জুভ্রমে আকর্ষণ করিয়া প্রাঙ্গণে লম্ফ দিয়া পড়িয়াছিলেন; যিনি বেশ্যার সদুপদেশগর্ভ ভৎর্সনায় চৈতন্য লাভ করিয়া সোমগিরি নামক গুরুর নিকট কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়া বৈরাগ্য পথের পথিক হইয়া বৃন্দাবনোদ্দেশে যাত্রা করিয়াছিলেন; যিনি তথায় যাইবার পথে সরোবর তীরে তরুণী বণিক সীমন্তিনীর সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া উন্মত্তবৎ তাঁহার পতির নিকট আতিথ্য ছলে বনিতা-বিলাস কামনা করিয়াছিলেন; পরে অকস্মাৎ জ্ঞানোদয় হইলে অনুতাপভরে সেই প্রার্থিতা সুন্দরীর নিকট হইতে সূচী লইয়া নিজ নয়ন-দ্বয়কে বিদ্ধ করিয়া নিজ হস্তে অন্ধ হইয়াছিলেন; যিনি বৃন্দাবনে ব্রহ্মাকুণ্ডতীরে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণের করস্পর্শে ও তাঁহার কৃপাবলে নিজ নয়ন পুনরায় লাভ করিয়াছিলেন, সেই মহাত্মা বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের কথা নাট্যকার গিরিশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের অনুপম নাটকের প্রসাদে বাঙ্গালার সকলেই অবগত আছেন। অধুনা কেহ কেহ তাঁহাকে বীরভূম জেলার লোক বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। চরিত্রামৃতে দেখিতে পাই, চৈতন্যদেব দক্ষিণ দেশে ভ্রমণ করিতে যাইয়া কবি কর্ণপুর বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' নামক গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। বিল্বমঙ্গল বাঙ্গালী হইলে তাঁহার গ্রন্থ এদেশেই পাওয়া যাইত। যাক সে কথা। ইঁহার পিতার নাম, বংশপরিচয় এবং তিনি কোন সময়ের লোক তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। যদি তিনি বৃন্দাবনে যাইয়া থাকেন তবে সেটা ভারতে মুসলমান অধিবাসের পূর্ব্বেই হইয়াছিল বলিতে হইবে। তাঁহার বৃন্দাবনে অবস্থান কথা চরিতামৃত বা ভক্তি-রত্নাকর প্রভৃতি কোন প্রাচীন গ্রন্থে নাই।

ভক্তমাল গ্রন্থে কেবল তাঁহার আখ্যানটুকুই দেখিতে পাই। বৃন্দাবনে :গোপীনাথ বাজারে প্রবেশ পথে বিল্বমঙ্গলের কুঞ্জ নামে একটী বাটী আছে। ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে সে বাটীটী ভগ্নপ্রায় অবস্থায় দেখিয়াছিলাম। আজি কালি সেটী নূতন ধরণে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার প্রাঙ্গণ পার্শ্বে বারান্দার নীচে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের সমাধি বলিয়া নূতন পাথরে গাঁথা একটী ছোট মন্দিরাকৃতি মঞ্চ রহিয়াছে এইমাত্র। অবশিষ্ট স্থানে লোকজনেরা বাস করে। অনুস ানে জানিলাম, চিন্তামণির নামেও একটী কুঞ্জবাটী ছিল। এখন তাহা বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ২।১ জন বিজ্ঞলোকের মুখে শুনিলাম যে বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণির স্মৃতিরক্ষা বা নিজকুঞ্জের গৌরব বৃদ্ধির জন্য এইরূপ নামকরণ করা হইয়াছিল, নতুবা ঐ সকল স্থানে কোন কালে বিল্বমঙ্গল বা চিন্তামণি কুঞ্জ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া কিছুই প্রমাণ নাই। ভক্তমালগ্রন্থেও কুঞ্জের কোন কথাই নাই।

জয়দেব প্রতিষ্ঠিত রাধামাধবজী।

বাঙ্গালী কবি জয়দেব গোস্বামী বিরচিত গীতগোবিন্দ নামক গ্রন্থ হইতে আমরা কেবলমাত্র জানিতে পারি যে তাঁহার পিতার নাম ভোজদেব, মাতা রামাদেবী, পত্নী পদ্মাবতী এবং পরাশর নামে তাঁহার একজন প্রিয় বন্ধু ছিলেন। কেন্দুবিল্ব নামক গ্রামে তাঁহার জন্ম। ইঁহার সমকালবর্ত্তী উমাপতিধর, শরণ, গোবর্দ্ধনাচার্য্য এবং ধোয়ী নামক কবিগণের নামও এ গ্রন্থে আছে।

আধুনিক ঐতিহাসিকগণ বলিতেছেন যে তিনি দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বল্লাল সেনের পুত্র মহারাজ লক্ষণ সেনের সভাসদ ছিলেন। ইহঁার জীবনী সম্বন্ধে যে সকল কিংবদন্তী আছে তাহা বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেই জানেন।* গীতগোবিন্দের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে 'রাধামাধব' নামে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অভীষ্টদেবের নামও আছে। তিনি এই বিগ্রহটীকে কিরূপে বৃন্দাবনে লইয়া গিয়াছিলেন তাহা ভক্তমালগ্রন্থে এইরূপ বিবৃত আছে—

শ্রীজয়দেব ঠাকুরের বৃন্দাবন যাইতে।
অন্তরে আবেশ হইল ঠাকুর সহিতে॥
ঠাকুর কিশোর রূপ স্থূল অঙ্গ ভারি।
কেমনে লইয়া যাইব উপায় কি করি॥
এতেক ভাবিতে রাধামাধব কহিল।
চিন্তা কি আমারে লয়্যা বৃন্দাবনে চল॥
ঝুলিল ভিতর করি লইয়া যাইবে।
ছোটরূপ হব কিছু ভার না লাগিবে॥
ঠাকুরের আদেশ পাইয়া কবিরাজ।
বৃন্দাবনে গেলেন ঠাকুর ঝুলি মাঝ॥
বৃন্দাবন ধাম দেখি পুলক হইলা।
কেশীঘাট সন্নিধামে আনন্দে রহিলা॥
কোন মহাজন রাধামাধবে হেরিয়া।
আর্দ্র হইয়া দিল মন্দির বানাইয়া॥
কবিরাজ অপ্রকটে বহুকাল পরে।
ঠাকুর লইয়া রাজা গেল জয়পুরে॥
অদ্যাবধি তথা ঘাটিলাম রাজ্যস্থানে।
বিরাজ করয়ে চাঁদ ঝলকের বদনে॥

বৃন্দাবনে ভ্রমর ঘাটের উপর জয়দেব গোস্বামীর নামে একটি প্রাচীন মন্দির আজিও বিদ্যমান আছে। পণ্ডিতবর মধুসূদন সার্ব্বভৌম মহাশয় বলেন যে জয়দেব গোস্বামী ভারতে মুসলমান আগমনের পূর্ব্বেই আসিয়া থাকিবেন, এবং মন্দিরাদি যদি কিছু তিনি নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, সে সমস্তই মামুদ গিজ্‌নী ধ্বংস করিয়া সমভূমি করিয়া দিয়াছিল। পরবর্ত্তী ভরতপুরের রাজাদিগের আমলে একজন মহারাষ্ট্র ভক্ত, ভ্রমর ঘাটের নিকট জয়দেবের কুটীর ছিল এইরূপ প্রবাদ শুনিয়া, বর্ত্তমান মন্দির ও রাধামধব বিগ্রহ স্থাপনা করিয়া দিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের উপদ্রব কালে বৃন্দাবনের অপরাপর প্রধান বিগ্রহের ন্যায় সেই রাধামাধব মূর্ত্তিটিকে জয়পুরে ঘাট নামক স্থানে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। †

---

* জয়দেব গোস্বামীর এই সকল প্রবাদ ভক্তমাল প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থে পাওয়া যায়—১ম। জয়দেব যখন সন্ন্যাসীবেশে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছিলেন তখন এক ব্রাহ্মণ পদ্মাবতী নাম্নী তাঁহার সুন্দরী যুবতী কন্যাকে লইয়া আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন,তাঁহার সন্তানাদি হয় নাই বলিয়া জগন্নাথের নিকট পূর্ব্বে তিনি মানত করিয়াছিলেন যে প্রথমজাত সন্তানকে জগন্নাথের সেবায় নিযুক্ত করিবেন। তদনুসারে এই প্রথমজাত কন্যাকে দেবতার নিকট সমর্পণ করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহার প্রতি স্বপ্নাদেশ হইয়াছে যে জয়দেব নামক ভক্তের করে ইহাকে দান কর। জয়দেব প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলেন, পরে দেবাদেশ অবহেলা করিতে না পারিয়া পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি কেন্দুবিল্বে আসিয়া সংসারী হন। এইস্থানে অবস্থান কালে তিনি গীতগোবিন্দ কাব্য রচনা করিতেন। একদা তিনি গ্রন্থ রচনা করিতে করিতে স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং পর্য্যন্ত লিখিয়া, দেহি পদপল্লবমুদারং পদটুক লিখিতে সংকোচ বোধ করিয়া পুথিলেখা রাখিয়া, অপর স্থানে চলিয়া যান। সেই অবকাশে ভক্ত বৎসল শ্রীকৃষ্ণ জয়দেবের বেশে তাঁহার গৃহে আসিয়া সেই পদটুকু লিখিয়া দিয়া যান। ২য়। দেবসেবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া গৃহে ফিরিবার পথে দস্যুরা তাঁহার অর্থহরণ করিয়া তাঁহার হস্তপদাদি ছেদন করিয়া তাহাকে কূপমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া পলায়ন করে। ৩য়। জয়দেবের প্রার্থনায় গঙ্গাদেবী অজয় নদ বহিয়া আসিয়া কেন্দুবিল্ব গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

দুঃখের বিষয় এই যে জয়দেব কি সূত্রে লক্ষণসেনের সভাসদ পদে বৃত হইয়াছিলেন বা কোন ঘটনায় রাধামাধব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন তাহার ইতিহাস পাওয়া যায় না। ঌ

† জয়দেব গোস্বামী খ্রীষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগের লোক। বৃন্দাবনে তাঁহার কোনরূপ কীর্ত্তি বা দেবমূর্ত্তি থাকিলে চরিতামৃতে, ভক্তিরত্নাকরে বা ব্রজপরিক্রমা গ্রন্থে তাহার কিছু না কিছু

পূর্ব্বে এই মন্দিরের সেবার ব্যয় জন্য মাসিক পাঁচ শত টাকা ভরতপুরের রাজকোষ হইতে পাওয়া যাইত। এখন তাহা ক্রমে কমিয়া গিয়া মাসিক দুই টাকায় দাঁড়াইয়াছে! কাযেই মন্দিরের মেরামত এবং পূজা ব্যয় সঙ্কুলন হয় না বলিয়া রাধারমণজীর সেবাইতেরা ইহার তত্ত্বাবধান ছাড়িয়া দিয়াছেন। এ মন্দিরটি যমুনাপার্শ্বে অল্প স্থানের উপর নির্ম্মিত। কয়েক ধাপ সিড়ি দিয়া উঠিয়া ছোট প্রাঙ্গণে যাওয়া যায়। মন্দিরটি ইটে গাঁথা, সেকালের ধরণের চতুষ্কোণ চূড়াও আছে। তবে দেখিবার উপযোগী কোন কারুকার্য্য নাই। একটি বাঙ্গালী স্ত্রীলোক মাত্র আছেন, তিনি যাত্রিগণের নিকট হইতে যাহা পান তাহা দিয়া প্রতিনিধি ঠাকুর-গুলির সেবা করেন ও আপনি খান। তিনি বলিলেন যে এই মন্দিরের গায়ে একখানি প্রস্তর ফলক সংলগ্ন ছিল, তাহাতে মন্দিরের স্থাপয়িতৃদিগের পরিচয় খোদিত ছিল। আজ কয়েক বৎসর হইল ভরতপুরের রাজা-দিগের কোন ঘরাও বিসম্বাদের মীমাংসার জন্য সে পাথরখানা লইয়া গিয়াছে। এই মন্দিরের পার্শ্বেই একটি সুবৃহৎ পীলু ফলের গাছ আছে।

সাক্ষীগোপাল।

বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর খেয়ার উত্তর দিকে উচ্চ-ভূমির উপর একটী অতি পুরাতন শূন্য মন্দির পড়িয়া আছে। ব্রজবাসীরা সেটীকে সাক্ষীগোপালের মন্দির বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। চৈতন্যচরিতামৃতে সাক্ষীগোপালের এইরূপ আখ্যান দেওয়া আছে। উড়ি-ষ্যার দক্ষিণ অঞ্চলে বিদ্যানগর নিবাসী একজন বৃদ্ধ (বড় বিপ্র) ও একজন যুবা (ছোট বিপ্র) উভয়ে মিলিয়া গয়া, কাশী, প্রয়াগ দর্শন করিয়া অবশেষে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন।

> বৃন্দাবনে গোবিন্দ স্থানে মহাদেবালয়।
> সে মন্দিরে গোপালের মহাসেবা হয়॥
> কেশী তীর্থে কালীয় হ্রদাদিতে করি স্নান।
> শ্রীগোপাল দেখি তাহা করিল বিশ্রাম॥
>
> চৈঃ চঃ ম-লী ৫ম পঃ।

এই গোপাল মন্দিরে তাঁহারা ২।৪ দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে বড় বিপ্র ছোট বিপ্রের সেবা ও পরিচর্য্যায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজ কন্যা দান করিবেন বলিয়া গোপালদেবের সম্মুখে প্রতিশ্রুত হন। পরে উভয়ে দেশে ফিরিয়া আসিলে বড় বিপ্র, স্ত্রী পুত্র ও জ্ঞাতিগণের প্ররোচনায় ছোট বিপ্রকে হীনকুল ও দরিদ্র বলিয়া কন্যাদানে অস্বীকার করিলেন। ছোট বিপ্র ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া বৃন্দাবনে যাইয়া গোপালজীর নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। গোপালজী তাঁহার স্তব স্তুতিতে পরিতুষ্ট হইয়া বৃন্দাবন হইতে পদব্রজে তাঁহার সহিত বিদ্যানগরে সাক্ষী দিতে আসিয়াছিলেন। গোপালের মূর্ত্তি দেখিয়া বড় বিপ্র ও জ্ঞাতি কুটুম্ব ছোট বিপ্রের বাসনা পূর্ণ করিল। তদবধি ঠাকুরের নাম সাক্ষীগোপাল হইল। ইহার বহুদিন পরে উৎকলের রাজা পুরুষোত্তম দেব বিদ্যানগরপতিকে জয় করিয়া সাক্ষীগোপালটীকে নিজ রাজধানী কটকে নগরে লইয়া আইসেন। আজি কালি সে মূর্ত্তিটী পুরী যাইবার পথে সত্যবাদীপুরে অবস্থান করিতেছেন। চৈতন্য দেবের সময় তিনি কটকে ছিলেন। ব্রজবাসীরা বৃন্দাবনের যে শূন্য মন্দিরকে ক্রমশঃ সাক্ষীগোপালের মন্দির বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, সেটী কোন কালে বাস্তবিক ইহার মন্দির ছিল কি না তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। কেবল চরিতামৃতে 'গোবিন্দস্থানে'

উল্লেখ থাকিত। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে আকবরের রাজত্বের পরে ও আরংজেবের শাসনের পূর্ব্বে এই মন্দিরটী স্থাপিত হইয়া-ছিল। ভক্তমালের উক্তিটুকু জনপ্রবাদমূলক। এমন কি বীরভূমে কেন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেব প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যে রাধামাধব বিগ্রহ আছেন, তাহারও উল্লেখ কোন প্রাচীন প্রমা-ণিক গ্রন্থে পাই নাই। আমাদের বিশ্বাস, শ্রীনিবাস আচার্য্যের পরে ইহা স্থাপিত হইয়া থাকিবে। বীরভূমের বিবরণ নামক পুস্তকে দেখিলাম যে সে মূর্ত্তিটির নাম রাধামাধব নহে, তাঁহার নাম রাধা বিনোদ, পরবর্ত্তিকালে কোন ভূম্যধিকারী জয়দেবের জন্ম-ভূমিতে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য মন্দির ও রাধাবিনোদ বিগ্রহ স্থাপিত করিয়াছিলেন।

শব্দ লিখিত আছে বলিয়া তাঁহারা এইরূপ অনুমান করিয়া থাকেন, নতুবা ভক্তিরত্নাকর, ব্রজপরিক্রমা প্রভৃতি কোন গ্রন্থেই ইহার উল্লেখ পাই না। বৃন্দাবন হইতে কখন যে কোন মূর্ত্তি উড়িষ্যায় গিয়াছিল চৈতন্যচরিতামৃতের প্রবাদমূলক উক্তিটুকু ছাড়া তাহার অন্য কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি পাই নাই। যদি সত্যই এ ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তবে তাহা ভারতে মুসলমান আগমনের বহু পূর্ব্বেই হইয়া থাকিবে বলিয়া অনুমান হয়। সে যাহা হউক, এই ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দিরটী বুদ্ধগয়ার মন্দিরের প্রণালীতে গঠিত। তবে উচ্চতায় অনেক ছোট। কেবল ২০।২৫ ফিট উচ্চ হইবে। এখন ইহার পার্শ্বস্থ রন্ধনশালাদি গৃহগুলি নানা স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কেবল মূল মন্দির ও জগমোহন জীর্ণশীর্ণ হইলেও দণ্ডায়মান আছে। ২।১ জন কৃতবিদ্য শিক্ষিত লোকের মত এই যে, চরিতামৃতে রঘুনাথ ভট্টের শিষ্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত গোবিন্দদেবের যে মন্দিরের কথা লিখিত আছে এটী সেই মন্দির। ইহার পর মানসিংহ লাল প্রস্তর নির্ম্মিত নূতন মন্দিরটী করিয়া দিলে তথায় গোবিন্দজীকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। রূপগোস্বামী বিরচিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু নামক গ্রন্থের ৮৭ শ্লোকে আছে "গোবিন্দাখ্যং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে"—ইহা ইহতে অনুমান হয় যে প্রথম আবিষ্কারের পর গোবিন্দজীকে হয়ত কিছুদিন কেশীঘাটের নিকট স্থাপিত করা হইয়াছিল।

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত।

নিরুদ্দেশ যাত্রা

তখন নিশা নীলাঞ্চলের অন্তরালে,
ঢেকেছে এই বিশ্বখানি তিমির জালে;
অন্ধকারের ঘোম্‌টা টেনে,—কনক পারা
লুকিয়েছে চাঁদবদনগুলি দিগ্‌বালারা;
কোলাহলে পূর্ণ ধরা মৌনগত,
কোন্ অজানা দেবের পায়ে ধেয়ানরত!

সেই তামসী নীলাম্বরীর সঙ্গে বোনা
কতই চুনি, পান্না কত, যায়না গোণা!
জলের স্রোতে ঝিলিক্ মারে তারার ভাতি,
একলা আমি যাচ্ছি ভেসে,—নেইকো সাথী;
নৈশ পবন বাঁধ্‌ছে মোরে আলিঙ্গনে,
রোমাঞ্চিছে অঙ্গ সে যে কি চুম্বনে!
ডিঙার গায়ে ঢেউগুলি সব কইছে কথা,
কানের কাছে উদাস হাওয়া জানায় ব্যথা,
বক্ষোমাঝে বদ্ধ ব্যথা চাপ্‌ছে রাতি,
ঝোপের আড়ে খদ্যোতিকা দিচ্ছে ভাতি,
নদীর ধারে, গাছের সারে, বেতস দলে,
সন্ সন্ সন্,—নৈশ বায়ু কিই যে বলে!
একলা আমি যাচ্ছি ভেসে,—নেইকো সাথী,—
বিস্ময়ে চোখ বিস্ফারিছে স্তব্ধ রাতি,
তীক্ষ্ণ, উজল অক্ষি মেলি' তারার দলে
নির্নিমেষে দেখ্‌ছে আমায় কৌতূহলে।
—সবাই যখন সুপ্তিমগন ভুলে' ব্যথা,
একলা আমিই জাগ্‌ছি কেন, কে বল্‌বে তা'?

হে অচেনা বাঞ্ছিত ধন, হে মোর প্রিয়,
নিরুদ্দেশ এ যাত্রা শেষে বার্ত্তা নিয়ো।
পথের শেষে, তোমার দেশে ক্লান্ত কায়ে
বস্‌ব যখন, বন্ধু, তোমার পায়ের ছায়ে,
করুণ কোমল স্পর্শে তোমার দুঃখনাশা,
ভুলিয়ে দিও সকল ব্যথা, সব নিরাশা।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

"পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে।"

চিত্রকর—শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন।
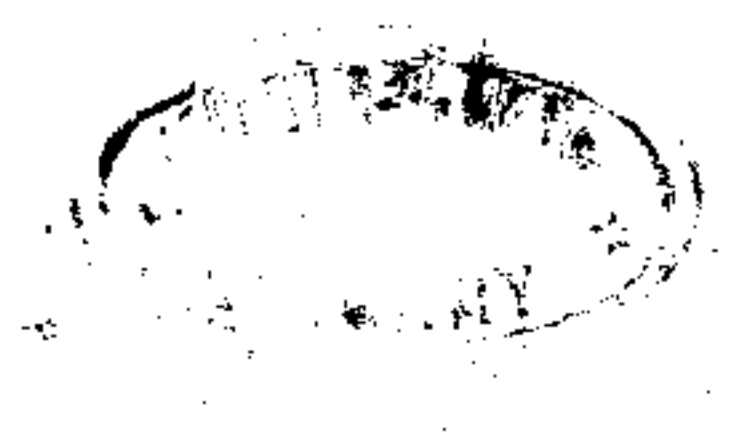
বৃহত্তম

বৃহতের একটা প্রবল মোহ আছে—তা সে বড় মানুষই হউক, আর দেবতা অথবা মানবসৃষ্ট কোনও বস্তুই হউক। পৃথিবীর কয়েকটি বৃহত্তম বস্তুর কিঞ্চিৎ পরিচয় আমরা এই প্রবন্ধে সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

চীনরাজ্যের মহাপ্রাচীর—পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্যের অন্যতম। একবিংশ শতাব্দী যাবৎ কত ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়াও এখনও দণ্ডায়মান থাকিয়া চীনের কীর্ত্তি জগতে ঘোষণা করিতেছে। কত সংখ্যক মানব যে বংশানুক্রমে এই প্রাচীর নির্ম্মাণে জীবনাতিপাত করিয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া থাকিতে হয়। খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ২১৪ অব্দে বীরাগ্রগণ্য 'চি-হোয়াং-টাই'র রাজত্ব কালে এই প্রাচীরের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয় এবং খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে উহা সমাপ্ত হয়। এই প্রাচীর ১৫০০ শত মাইল ব্যাপিয়া বিস্তৃত; ইহা ব্যতীত ইহার শাখা প্রশাখার বিস্তার প্রায় হাজার মাইল। এই প্রাচীরের উপরে স্থানে স্থানে পূর্ব্বে প্রায় ২৫০০০ হাজার প্রহরীমঞ্চ (watch tower) ছিল।
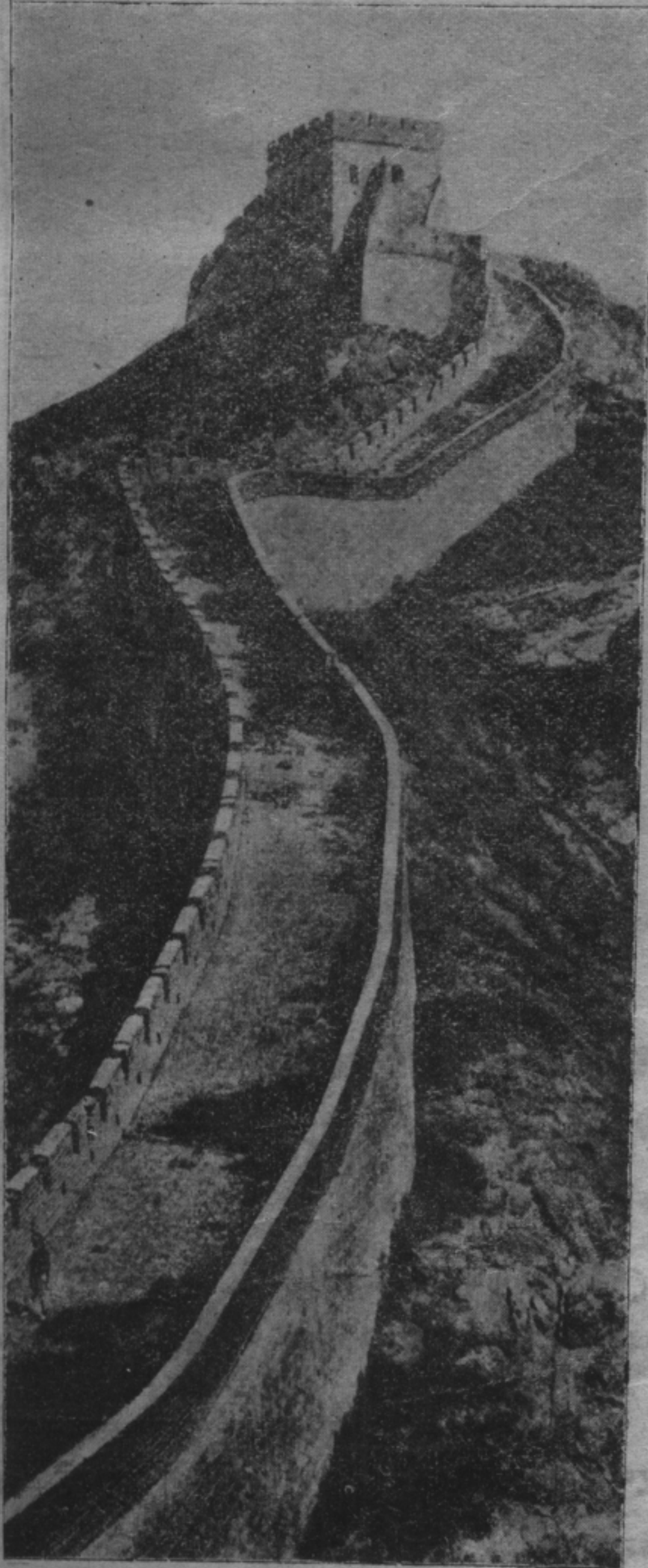
চীনরাজ্যের মহাপ্রাচীর।

সীনের যুবরাজ ইন্-চেং বাল্যাবস্থায়ই সিংহাসনারোহণ করেন। ইতিহাসে তিনি চি-হোয়াং-টাই নামে প্রসিদ্ধ। রাজ্যপ্রাপ্তির পরই তিনি দেশ সুদৃঢ় করিতে মনঃসংযোগ করেন। তাঁহারই চেষ্টার ফলে এই জগদ্বিখ্যাত প্রাচীরের সৃষ্টি। রাজ্য সংস্কারের পরই দেশশত্রু তাতারদিগের উচ্ছেদার্থে উত্তর দিকে সসৈন্যে গমন করেন। তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াই গৃহশত্রুদিগকে পরাস্ত করেন। পুনর্ব্বার শত্রু কর্ত্তৃক উভয়দিক হইতে আক্রান্ত হইবার ভয়েই তিনি ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই প্রাচীরের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এইরূপ বৃহত্তম প্রাচীর নির্ম্মাণের দায়ীত্ব, নির্ম্মাতৃগণের জীবননাশ ও ইহার নির্ম্মাণের জন্য অর্থনাশ—তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই তিনি এই কার্য্য সমাধা করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন এবং কার্য্যে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নানাস্থান হইতে স্থপতি আনয়ন পূর্ব্বক তাহাদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। চীনগণের মধ্যে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, 'এক পুরুষের (generation) বিনাশ পরিবর্ত্তিগণের মুক্তির কারণ'।

যতই পশ্চিমদিকে যাওয়া যায় ততই এই প্রাচীরের উচ্চতা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। শেষদিকেই ইহার নির্ম্মাণ-নৈপুণ্যের পরিচয় বিশেষ

ভাবে পাওয়া যায়। প্রাচীরটি সান্-হাই-কোয়াল্ হইতে আরম্ভ হইয়া পশ্চিমদিকস্থ পর্ব্বতমালা ভেদ করিয়া 'কাল-গানে'র মধ্য দিয়া তৎপার্শ্বস্থ উপত্যকা ভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে, পরে হোয়ার্ হো নদীর পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী ও পিয়েন্ কোয়াল্ নদীর উপর দিয়া সু-চাউয়ের অপর-পার্শ্বস্থ কাইয়ু-কোয়ালে্ পৌছিয়া শেষ হইয়াছে।

খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; কিন্তু চীনের বৃহত্তম প্রাচীর সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। এই প্রাচীর নির্ম্মাণে কত লোকের প্রয়োজন হইয়াছিল তাহা সূর্য্যালোকে, চন্দ্রালোকে এমন কি নক্ষত্রালোকে দেখিলেও স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লোকের কার্য্য অনায়াসেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে পাওয়া যায়।"
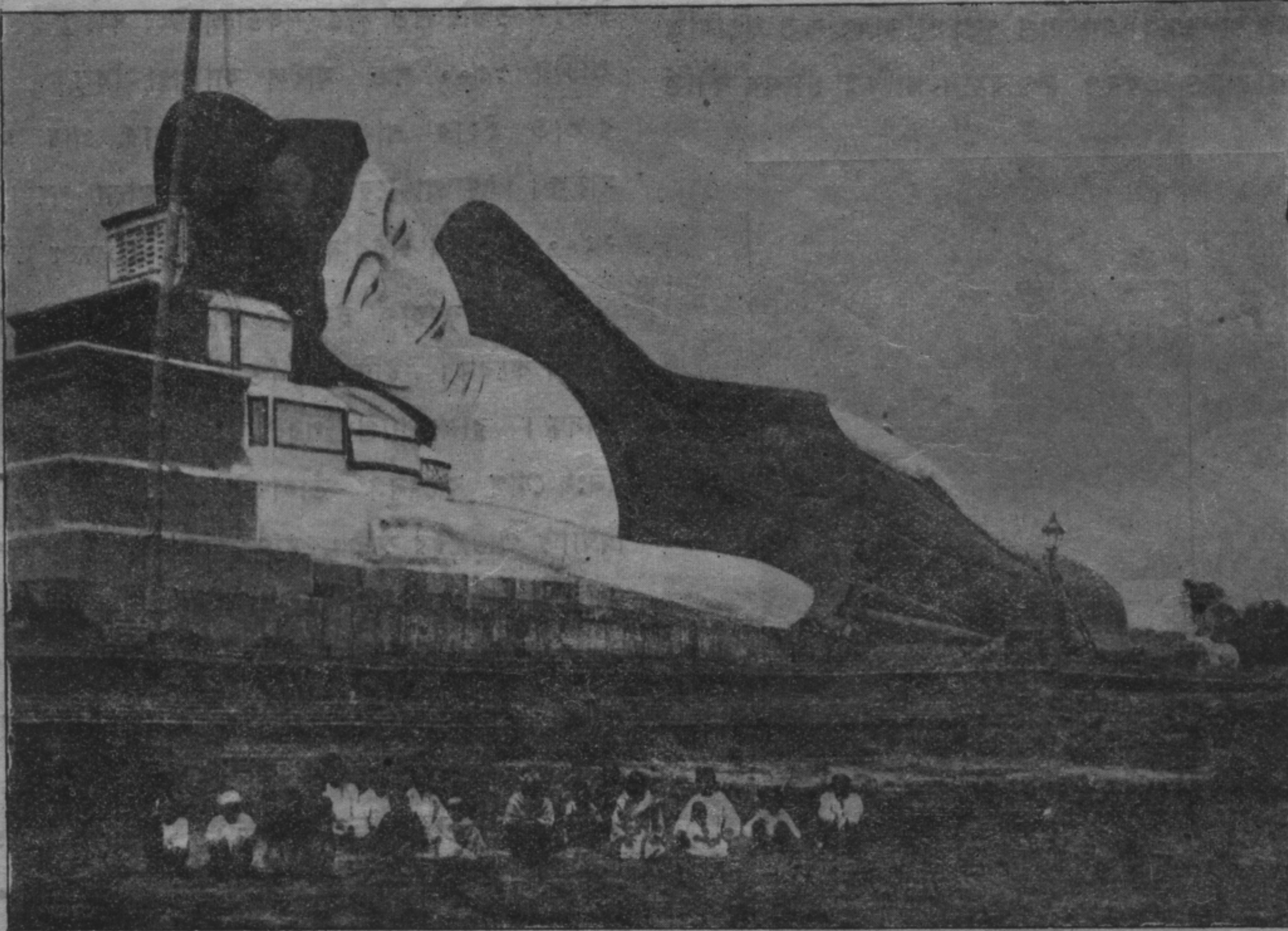
পেগুর বুদ্ধমূর্ত্তি

আধুনিক পরিদর্শকগণ বলেন যে কুয়েল ওয়েইর নিকটবর্ত্তী স্থানে এই বৃহত্তম প্রাচীরটি দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে এক ভাগ গোলাকার ভাবে রাজ-ধানীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ উপত্যকাভূমি বেষ্টন করিয়া আছে। এই দুই গোলাকার অংশ বাদ দিলেও কলিকাতা হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত বিস্তৃত 'গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড' অপেক্ষাও এই বিশ্ববিশ্রুত প্রাচীরটী দীর্ঘতর।

মিষ্টার জিল বলেন, "লোক মুখে যে সকল জিনিষের অতিরিক্ত প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়, স্বচক্ষে দেখিলে অধিকাংশ সময়ে তাহার অতিরিক্ত প্রশংসাবাদের হেতু

এই প্রাচীর সম্পূর্ণ করিতে কত সময়, কত অর্থ, কত লোকের জীবন নাশ হইয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া থাকিতে হয়।

পেগুর বুদ্ধমূর্ত্তি—পৃথিবীতে যে সমস্ত নরমূর্ত্তি বা দেবমূর্ত্তি অদ্যাবধি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে পেগুর বুদ্ধমূর্ত্তিটীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই মূর্ত্তিটি দৈবক্রমে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সেই বিবরণটি দেওয়া প্রয়োজন।

পূর্ব্বে রেঙ্গুন হইতে মন্দালয় (Mandalay) পর্য্যন্ত রেল লাইন ছিল। রেঙ্গুন হইতে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে
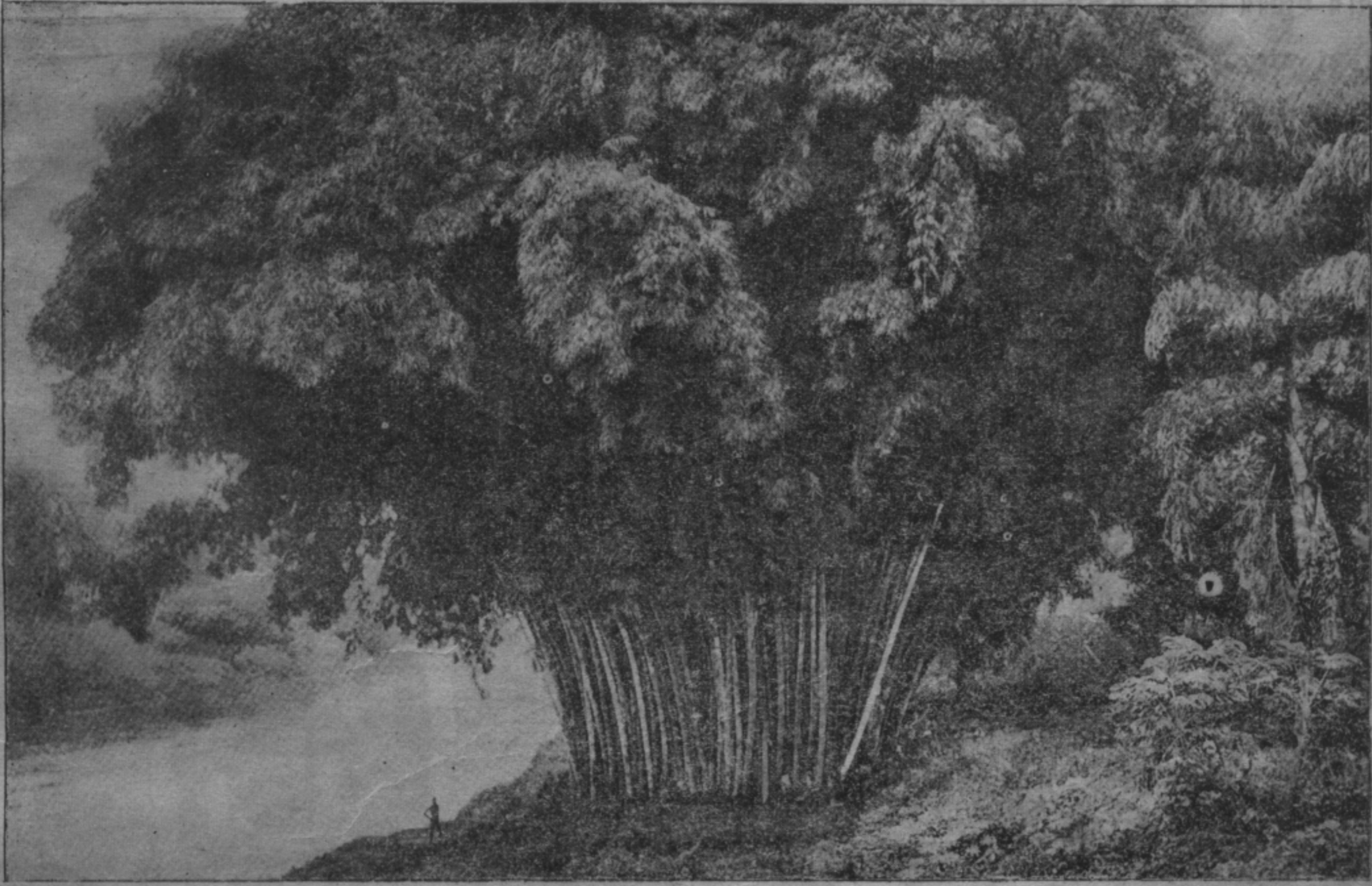
পৃথিবীর বৃহত্তম বাঁশঝাড়

পেগু অবস্থিত। রেল কোম্পানীর ইচ্ছানুসারে যখন রেঙ্গুন হইতে পেগু পর্য্যন্ত রেল লাইন পাতা আরম্ভ হয় সেই সময়ে হঠাৎ এই বৃহদায়তন মূর্ত্তিটি আবিষ্কৃত হয়। নব নির্ম্মিত রেল লাইনটিকে সাময়িক বন্যা হইতে স্থায়ী-ভাবে রক্ষা করিবার জন্য কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় লাইনের উভয়পার্শ্বে প্রস্তর সন্নিবিষ্ট করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। পথের উভয়পার্শ্ব বনসঙ্কুল ও মধ্যে মধ্যে প্রস্তরস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল স্থান হইতে প্রস্তর সংগ্রহ

পৃথিবীর বৃহত্তম বৃক্ষ

করিবার ইচ্ছায় তিনি বনের কিয়দংশ কাটাইয়া ফেলেন এবং পরে সেই স্থান খনন করাইতে থাকেন। দুই তিন গজ খনন করিয়াই সকলে বুঝিতে পারে যে তাহারা কোনও স্তূপের উপর খনন করিতেছে। ইহাতে অধ্যক্ষ মহাশয় সেই স্তূপ পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারেন যে, উহা একটি পোড়া ইঁটের পাঁজা। ইহাতে তিনি অত্যন্ত কৌতুহলী হইয়া উঠেন ও সেই স্থান খনন করিয়া এই বৃহদাকার বুদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কার করেন।

শায়িত মূর্ত্তির চিত্রটি দেখিয়া বোধ হয় সকলেই ইহার পরিমাণের একটা ধারণা করিতে পারিবেন। মূর্ত্তিটি লম্বায় ১৮০ ফিট এবং প্রস্থে এক স্কন্ধ হইতে অপর স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৪৭ ফিট। বর্ম্মাবাসিগণ এখন মূর্ত্তিটিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে। অনেকেই মূর্ত্তিটি রক্ষা করিবার জন্য প্রভূত অর্থ দান করিয়াছেন।

ভারতের বৃহত্তম বটবৃক্ষ

এই মূর্ত্তিটির প্রকৃত ইতিহাস এখনও কেহই জানেন না। মূর্ত্তিটি দেখিয়া বোধ হয় যে অনুমান পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মহাবংশ—কোন রাজরাজড়ার বংশ পরিচয় দিতে বসি নাই—পৃথিবীর বৃহত্তম বাঁশঝাড়ের কথা বলিতেছি। বাঁশগাছের কথা বলিলে অনেকেই হয় ত ভাবিবেন যে লেখক পাগল হইয়াছে। তাহা ভাবিবারই কথা, কারণ পল্লীবাসী মাত্রেই আবাল্য বাঁশগাছ দেখিতেছেন—এমন কি অনেকেই বাঁশের 'কোঁড়' খাইয়াও থাকিবেন। যাঁহারা কখনও পল্লীগ্রামে গমন করেন নাই, তাঁহারা বোধ হয় আমার কথায় হাস্য সংবরণ করিতে পারিবেন না।

বাঁশঝাড় অনেকেই দেখিয়াছেন, তবে এতবড় বাঁশঝাড় কেহই দেখেন নাই। লঙ্কাদ্বীপে এই বাঁশঝাড়টি দেখিতে পাওয়া যায়। এই বাঁশ ঝাড়ের পরিধি একশত ফিট এবং বাঁশগুলি একশত ফিট উচ্চ হইয়া উঠিবার পর ইহাদের পত্রোদ্গম হইয়াছে। লঙ্কাদ্বীপের অন্তর্গত ক্যাণ্ডির নিকটবর্ত্তী পেরোদেনিয়া নগরে গভর্ণমেণ্টের বটানিকাল গার্ডেনে এই বাঁশ ঝাড়টি সযত্নে রক্ষা করা হইয়াছে।

পৃথিবীর বৃহত্তম বৃক্ষ—মেক্সিকোর অন্তর্গত ওয়াক্সাকা রাজ্যের অন্তর্গত টুলে নগরীতে একটি 'সাইপ্রেস' বৃক্ষ আছে। এরূপ বৃহৎ বৃক্ষ পৃথিবীর মধ্যে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ইহার কাণ্ডের পরিধি ১৫৪
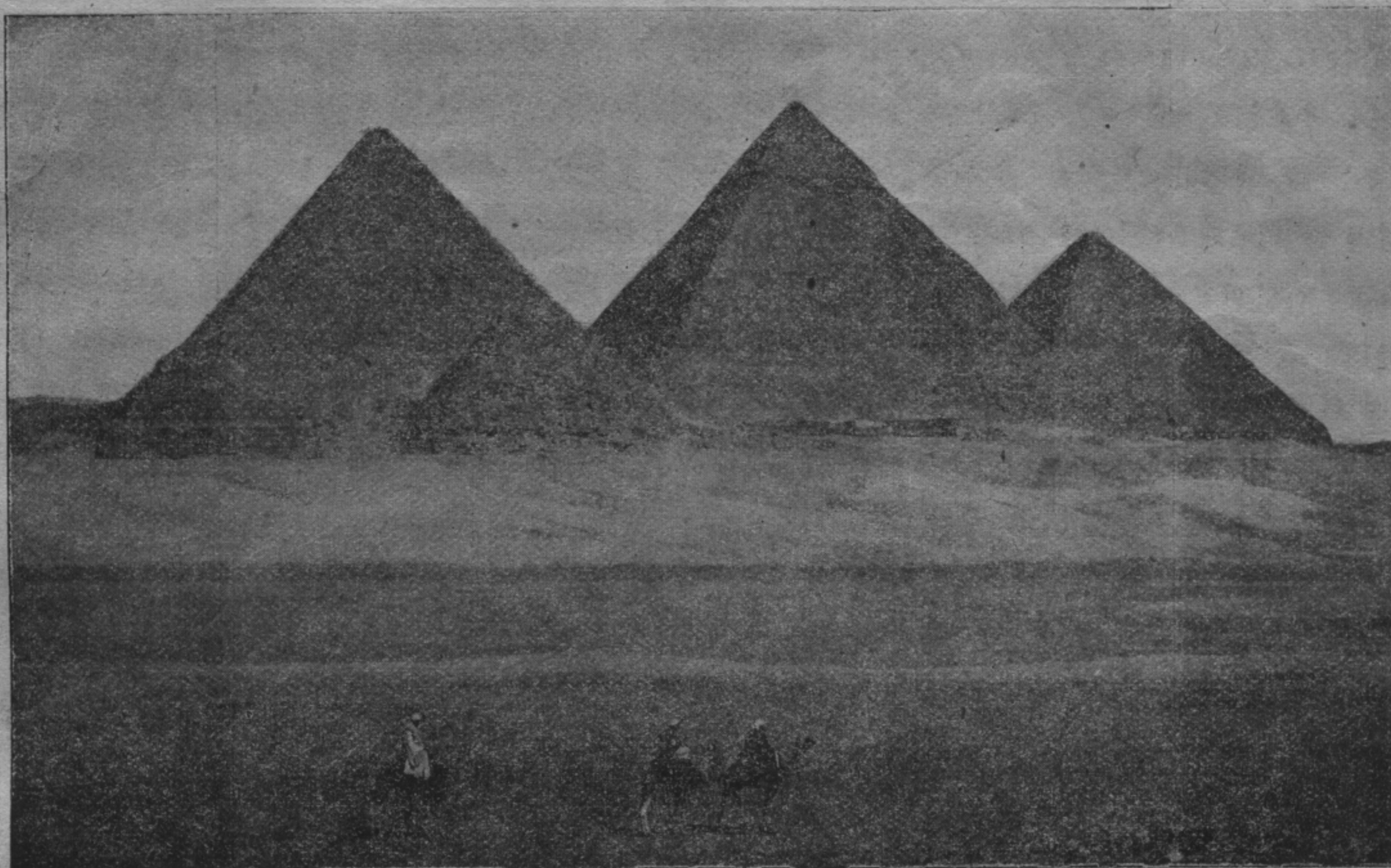
ঈজিপ্টের পিরামিড

এভারেষ্ট গিরিশৃঙ্গ

কাঞ্চনজঙ্ঘা

ফিট। ৩০ জন মানুষ হাতে যোগ করিলে তবে এই গাছের গুঁড়িটি আঁকড়াইয়া ধরিতে পারিবে। ইহা যে কতদিনের বৃক্ষ, তাহা কেহ এযাবৎ নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই।

মহাবট—শিবপুর বটানিকাল গার্ডেনে যে বট-বৃক্ষটি অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে, তদপেক্ষা বৃহত্তর বটবৃক্ষ অন্য কোনও স্থানে দৃষ্ট হয় না। এই বটবৃক্ষটি যে একটি বৃক্ষ হইতেই সমুৎপন্ন তাহার কোনও সংশয় নাই। এই বৃক্ষটির শাখা প্রশাখা হইতে শিকড় নামিলেই তাহা বাঁশ দিয়া ঘিরিয়া অতি সযত্নে রক্ষা করা হয়।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়া গমন করিলে অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় যে বটবৃক্ষের নূতন শিকড়গুলি গো ছাগ ও মহিষাদি দ্বারা ভক্ষিত হইয়াছে। বটবৃক্ষ কি পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে তাহা কলিকাতার উক্ত বটবৃক্ষ হইতে সকলেই অনায়াসে অনুমান করিতে পারেন। সময়ে সময়ে ইহাও দৃষ্ট হইয়াছে যে, বৃক্ষের আদি মূল ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে তথাপি নব মূলের

সাহায্যে বৃক্ষ ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। যাহা হউক কলিকাতার এই বটগাছটি ভারতের যাবতীয় বৃক্ষ অপেক্ষা বৃহত্তর। বৰ্ত্তমানে বৃক্ষটি আড়াই একর ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, যদি ইহাকে যত্নের সহিত রক্ষা করা হয় তাহা হইলে আর পঞ্চাশ বছরে ইহার বিস্তৃতি ১৫।২০ একর পৰ্য্যন্ত হইতে পারে।

এই মহাবটের আদি মূলটি এখন আকারহীন স্তূপে পরিণত হইয়াছে এবং ইহার সাহায্যে বৃক্ষটি অতি অল্প পরিমাণ রসই মাটী হইতে গ্রহণ করিতে পারে বলিয়া বোধ হয়।

পিরামিড—মিশরের পিরামিড পৃথিবীর সপ্তা-শ্চর্য্যের মধ্যে একতম। গ্রীক পরিব্রাজক ও ঐতিহাসিক হিরোডোটাস এসিয়া মাইনরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বহুকাল মিশরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সেই সময়ে অনুমান খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৪৬০ অব্দে তিনি এই সকল পিরামিড আবিষ্কার করিয়া জগৎ সমক্ষে এগুলির অস্তিত্ব প্রচার করেন।

মিশর সম্বন্ধে যাঁহাদিগের জ্ঞান অল্প তাঁহারা ভাবেন যে, আলেকজান্দ্রিয়া হইতে থারটুম পর্য্যন্ত সমগ্র মিশর ব্যাপিয়া এই সমস্ত পিরামিড দেখিতে পাওয়া যায় এবং পিরামিডই মিশরবাসীদিগের একটি বিশেষত্ব। কিন্তু বস্তুতঃ পিরামিডগুলি কাই-রোর নিকটবৰ্ত্তী নাইল নদীর তীরেই দেখিতে পাওয়া যায়। পিরামিডগুলি মিশর দেশের সম্রাটগণের সমাধি-স্থান। অতি প্রাচীন পিরামিড অনুমান ৬৮০০ শত বৎসরের পূর্ব্বে নির্ম্মিত হয় নাই। এবং মিশরের সভ্যতার আরম্ভকাল ইহার ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে।

লেপসিয়ান বলেন যে যে রাজা যত অধিককাল রাজত্ব করিতেন তাঁহার পিরামিড তত বৃহদাকার হইত। ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, সম্রাটগণের রাজত্বকালের উপর পিরামিডের আয়তন নির্ভর করিত। মৃত্যুর পর রাজদেহ পিরামিডের স্থাপন করিয়া পিরামিড বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত।

"কোন অদ্রি হিমাদ্রি সমান ?" পর্ব্বত শ্রেষ্ঠ হিমালয় আমাদিগের এই শস্যশ্যামল ভারতবর্ষের সুদৃঢ় প্রাচীর স্বরূপ থাকিয়া বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে। ইহারই উচ্চতম শৃঙ্গের নাম এভারেষ্ট। অপরাপর দেশের ন্যায় তিব্বত-দেশে যাইবার যদি সহজ পথ থাকিত, তাহা হইলে বহু পূর্ব্বেই এই সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ লোকজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইত। কেবল মাত্র তিব্বত ব্যতীত আর কোনও স্থান হইতে এই চূড়াটি সম্পূর্ণ ভাবে দেখা যায় না। তিব্বতের পথ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য—অতএব এভারেষ্ট দর্শনেচ্ছুগণকে অনায়াসগম্য দার্জ্জিলিং হইতে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী 'টাইগার হিলে' যাইতে হয় এবং সেই সময়ে আকাশ পরিষ্কার থাকিলে, একশত কুড়ি মাইল দূরবর্ত্তী হিমালয়ের এই উচ্চতম শিখরটির কিয়দংশ মাত্র তাঁহারা দেখিতে পান। ইহার কারণ এই যে, ৪৫ মাইল দূরবর্ত্তী তুষারধবল কাঞ্চনজঙ্ঘা উচ্চতায় ২৮১৫৬ ফিট—আর এভারেষ্ট ২৯০০২ শত ফিট। অতএব ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, 'টাইগার' পর্ব্বত হইতেও এভারেষ্টে সমস্ত অংশ দেখিতে পাওয়া অসম্ভব। কেবল মাত্র ৬২ বৎসর পূর্ব্বে হিমরাজের এই চূড়াটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার ইতিবৃত্ত কিঞ্চিৎ দেওয়া আবশ্যক।

ভারতীয় সার্ভে বিভাগের কর্ম্মচারীরা নানা পর্ব্ব-তের উচ্চতা মাপিবার জন্য নিযুক্ত হন। তাঁহারা প্রথমে কতকগুলি জানা স্থান মনোনীত করিয়া লন এবং তথা হইতে অপরগুলির উচ্চতা মাপিতে থাকেন। তাহার পর অবসর মত কার্য্য চলিতে থাকে। যেদিন তাঁহারা এই শৃঙ্গের উচ্চতা অঙ্ক কষিয়া বাহির করিলেন, সে দিন তাঁহাদের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। এত উচ্চ গিরিশৃঙ্গ ত পৃথিবীর কুত্রাপি দেখা যায় নাই। তাৎকালীন ভারতের Surveyor General মহাশয়ের নাম ছিল মিষ্টার

এভারেষ্ট। তাঁহাকে সম্মানিত করিবার জন্য এই নবাবিষ্কৃত গিরিশৃঙ্গটির তাঁহার নামেই নামকরণ করা হইয়াছিল এবং অদ্যাবধি জনসমাজে 'এভারেষ্ট' বলিয়াই পরিচিত। মানীয় Surveyor General মহাশয়ের নামেই নামকরণ হইয়াছে বলিয়া অনেকে ঈর্ষাপরায়ণ হইয়াছিলেন। নেপালীরা উক্ত চূড়ার কোনও নামকরণ করিয়াছে কি না তাহা জানিবার জন্য তাঁহারা ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন উডকে কাটমুণ্ডুতে প্রেরণ করেন। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও উড সাহেব ইহার অন্য কোনও নাম সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই।

কাঞ্চনজঙ্ঘা—কাঞ্চনজঙ্ঘা হিমালয়ের অন্য শৃঙ্গ। ইহা বৃহত্তম না হইলেও, জগতের গিরিশৃঙ্গগুলির মধ্যে তৃতীয় স্থানীয়। তাহা হউক, কিন্তু ইহার শোভা অপর সকল গিরিশৃঙ্গ হইতে সমধিক। যদিও ইহার বর্ণনা নূতন করিয়া লেখা যায় না তথাপি ইহা সকলের নিকটই চিরনূতন। চিরসুন্দর পৃথিবীর যে সমস্ত সুন্দর দৃশ্য আছে, কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্যের নিকট সেগুলি পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। তুষারকিরীটী হিমালয় দক্ষিণে ও বামে অন্তহীন ভাবে অবস্থান করিতেছে এবং বহু সংখ্যক তুষারাবৃত ছোট ছোট পর্ব্বতশৃঙ্গ উভয় দিকেই মাথা উঁচু করিয়া রহিয়াছে। এই অপূর্ব্ব দৃশ্যপটের মধ্যস্থলে কাঞ্চনজঙ্ঘা অতুলনীয় শোভায় বিরাজমান। পর্ব্বতমধ্যস্থ উপত্যকায় ধাপে ধাপে শস্যক্ষেত্রগুলি, পুতুলঘরের সিঁড়ির মত দেখায়। তাহার পরে সারি সারি পাষাণস্তূপ নির্ব্বাক নিস্পন্দের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। নিম্ন প্রদেশ হইতে প্রায় বিশমাইল উপর পর্য্যন্ত ধূসরবর্ণের প্রস্তরস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহার উপর বৃহৎ বৃহৎ তুষার খণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কাঞ্চনজঙ্ঘা তুষারাবৃত হইয়া শুভ্রভাব ধারণ করে—সূর্য্যালোকে স্বর্ণবর্ণ ও সন্ধ্যায় অস্তাচলগামী সূর্য্যের ছটায় অপূর্ব্ব গৈরিক শ্রী ধারণ করিয়া মানব মন আনন্দে অভিভূত করিয়া দেয়। কবি প্রমথনাথ গাহিয়াছেন—

"কাঞ্চনের তুঙ্গ শৃঙ্গ ধূম্রশৈলে ভাতে অকস্মাৎ
একি স্বর্গখণ্ড, না এ সুকৃতির আলোক-সম্পাত?
উর্দ্ধে যে তরল নীল তরঙ্গিছে হারাইয়া দিক্,
খেয়া দেয় সে পাথারে বুঝি কোন পারের নাবিক!
তব অভ্রভেদী শিরে ঠেকেছিল কবে তরী সাথে,
রাঙ্গা পা দুখানি তার সোণা হয়ে গেছ শিলা, তাতে!
হেম, না ও প্রেম-ছবি? আনন্দের সুপ্ত পারাবার,
কল্লোলিয়া উঠে বক্ষে, নরে হয় দেবত্ব সঞ্চার।
শোভা, না এ মরীচিকা? লুকাইল পলকে কোথায়,
কাঁদে বক্ষে রূপতৃষা,—ভাল করে দেখিনু না হায়!"

শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত।

---

(১)

পূর্ণ বাবু। ওহে তোমার দাড়ি গোঁফ কাঁচা আছে, কিন্তু মাথার চুল এত পেকে গেল কেন?

চন্দ্র বাবু। পাকবে না? মাথার চুল যে দাড়ি গোঁফের চেয়ে বিশ বৎসরের বড়, মশায়!

(২)

কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষক। আম সম্বন্ধে তোমাদের অনেক কথা বলিলাম। এখন বল দেখি নরেন, কোন সময়ে গাছ হইতে আম পাড়িতে হয়?

নরেন। আজ্ঞে, যখন কোথাও কেউ না থাকে।

শ্রীঅমিয়ভূষণ বসু।

সমুদ্র সপ্তক

নিগূঢ় রহস্য ভরা হে মহা অর্ণব !
হে চঞ্চল গাঢ় নীল জল !
বিরাট প্রাণের মাঝে অনন্ত উৎসব
আনন্দে জাগিছে অবিরল।
সারাদিন সারাবেলা,
একি গান ! এ কি খেলা !
একি লীলা নিত্য কাল ধরে' ?
হে মায়াবী ! কত ছলে চিত্ত দাও ভরে !

নিতান্ত অশান্ত তুমি ওহে পারাবার,
প্রকৃতির দুরন্ত সন্তান !
প্রচণ্ড উল্লাস ভরে নাচি বারম্বার
মহানন্দে কর কলতান।
তুলি ঘোর হট্টগোল,
অশান্ত উন্মাদ রোল,
নাহি জানি কি আনন্দ পাও !
অস্ফুট প্রলাপ গানে আকাশ ভাসাও !

হে গম্ভীর ! হে ভয়াল। হে চির অদ্ভুত !
আস্ফালিছ কেন অকারণে ?
হে প্রগল্ভ ! তুমি কিগো মরণেরি দূত
বার্ত্তা তার প্রচার ভুবনে ?
ফেনিল কুসুমে ফুটি
বেলাবুকে পড় লুটি,
তাহারে কি দিতে চাহ প্রাণ ?
নিরজনে কাণে তার কি শোনাও গান ?

তোমার অসীম গেহে ওহে রত্নাকর,
কত কি যে রয়েছে গোপন !
কুক্ষিতলে বিরাজিছে কত অগোচর
তুমি ছাড়া জানে কোনজন ?
মানুষ করেনি ত্রুটি
সারাটা সাগর ঘুটি'
পেয়েছে যা নিদর্শন কণা,
সে সব তোমার কাছে তুচ্ছ আবর্জ্জনা !

উজ্জ্বল-জাজ্জ্বল সদা ওহে নীলাম্বুধি,
তুমি কর মেঘের সৃজন।
প্রসারি সুনীল মায়া নীলাকাশ তলে
ঘটায়েছ অপূর্ব্ব মিলন !
হাজার যোজন ধরি
হে বিজন ! আছ পড়ি,
দৃষ্টি নাহি খুঁজে পায় কূল !
হে দুর্জ্জেয় ! হে বিচিত্র ! হে সিন্ধু অকূল !

তরঙ্গ-মুকুটশীর্ষ হে রাজা প্রবল,
অঙ্গ তব প্রবাল চর্চ্চিত !
বালুকার জরি-পাড় নীলাঞ্চল খানি
সমুজ্জ্বল মুকুতা খচিত।
তোমার মাথার 'পর
ছত্ররূপী নীলাম্বর ;
গ্রহগণ আলো দিয়ে যায়,
অযুত নদীর ধারা রাজস্ব যোগায়।

আনন্দ মুরতি তুমি সদানন্দ কবি,
গাহ গাহ, মিলনের গান।
ধন্য হোক বসুন্ধরা সে বারতা লভি,
ঘুচে যাক বিভেদ-বিধান।
ঘুচে যাক্ ভেদাভেদ
বিচ্ছেদের মহা খেদ,
মিলনের ধারা যাক্ বয়ে ;
জাগুক বিশ্বের লোক একপ্রাণ হ'য়ে।

শ্রীবিমানবিহারী মুখোপাধ্যায়।

প্রতারিত

(গল্প)

(১)

দুই দুই বার এফ-এ ফেল করার পর হইতেই পড়াশুনার উপর মনটা নিতান্ত শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। পরীক্ষার নাম করিলেই বিফলতার কথাটাই আগে মনে হইত। শেষে হঠাৎ একদিন যখন আমার কনিষ্ঠা সহোদরা নির্ম্মলা জন্মের মত চোখ বুজিল, তখন হইতেই একেবারে উদাসী হইয়া পড়িলাম। সংসারের সাধ, সৌভাগ্য, আশা, জ্ঞান—সবই মনে হইতে লাগিল নলিনীদলগত জলমিবতরলং; ইহার জন্যও মানুষ এত খাটে!

বাবা নীহারপুরের প্রভাবশালী জমিদার। গতবৎসর গভর্ণমেণ্টের সহৃদয়তায় "রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। গভর্ণমেণ্টের যেরূপ সুনজরে তিনি পড়িয়াছেন তাহাতে তাঁহার খুবই বিশ্বাস ছিল যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকখানি জয়পত্র পাইলেই তিনি আমাকে ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট করিয়া দিতে পারিবেন। অনেক বারই তাঁহার নিজমুখে শুনিয়াছি যে যদি অন্ততঃ বি-এ পাসও করিতে পারি তাহা হইলেও ম্যাজিষ্টেট সাহেব নাকি গভর্ণমেণ্টের এই অনুগ্রহে:সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন।

সহোদরার মৃত্যুর পর হইতেই আমি বড় উদাসীন হইয়া পড়িলাম। পিতাও কিছু দমিয়াছিলেন কিন্তু তিনি হাল ছাড়েন নাই। তিনি আমাকে অনেক বুঝাইয়া কলিকাতা পাঠাইলেন। আমিও তাঁহার আদেশ অবহেলা করিতে পারিলাম না; আর একবার ঐ বিশ্ববিদ্যালয়কে কিছু ঘুষ দিতে হইবে ভাবিয়া আমার পটলডাঙ্গার পুরাতন মেসে উপস্থিত হইলাম।

(২)

মাসখানেক একরূপ ভাল ভাবেই কাটিয়া গেল। আমিও কৃতসঙ্কল্প হইলাম যে এবার পাস করা চাই-ই কিন্তু এই প্রতিজ্ঞানুযায়ী কার্য্য অধিকদিন চলিল কৈ? দেড়মাসের মধ্যেই আমার সেই পূর্ব্ববৎ পাঠে অবহেলা আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে এক উদাসীনতা আসিয়া আমার হৃদয়ে জাগিল। প্রিয়তমা কনিষ্ঠা সহোদরা নির্ম্মলা যে দিন চলিয়া গিয়াছে, সে দিন হইতে আর রজনীতে আমার নিদ্রা নাই। কত শত চিন্তা আমার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিত। কখনও বা চিন্তার আতিশয্যে গৃহত্যাগ করাই ঠিক করিতাম, কিন্তু পরক্ষণেই এই অনুষ্ঠানের বিঘ্নসমূহ আমার মনে জাগরিত হইয়া সেই সংকল্প হইতে আমাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরে সরাইয়া দিত।

মানুষের নিকট স্বভাবতঃ যে কার্য্য প্রথমে দুরূহ ও কষ্টসাধ্য বলিয়া বোধ হয়, যাহার অনুষ্ঠানে কত প্রকার ভয়ের কল্পনায় মন ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহে, সেই কার্য্যই অনেক চিন্তার পর ক্রমে ক্রমে সহজসাধ্য হইয়া উঠে, ভয় ও ব্যাকুলতা বিলুপ্ত হইয়া যায়। আমার কাছেও তাহাই হইল। প্রথমে যে গৃহত্যাগের কল্পনাটা মনে আসিলেই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতাম, সেই কল্পনাই ক্রমে ক্রমে আমার আশ্রয়স্থল হইয়া দাঁড়াইল। তখন ভাবিতাম, গৃহত্যাগে আর আমার ভয় কি?

এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে আমার কলিকাতা আগমনের মাসান্তেই, পাঠে শিথিলতার সঙ্গে সঙ্গে বেলুড় গমনাকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রতি শনি ও রবিবার আমি বেলুড়ে যাইয়া গঙ্গাতীরে বসিয়া গাহিতাম—

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হ'তে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব-হারাদের মাঝে।

পূজার ছুটির আর বেশী দেরী নাই। গতবৎসর এমন দিনে আহ্লাদে আত্মহারা হইয়াছিলাম, বাড়ী যাইয়া কবে নির্ম্মলার মুখ দেখিব এই নিমিত্ত কত আগ্রহ সহকারে ছুটীর বাকী দিনগুলি গণিতাম। কিন্তু আজ সেই গৃহগমনাকাঙ্ক্ষা কোথায়? নির্ম্মলা বোন্‌টির সঙ্গে সঙ্গে সবই চলিয়া গিয়াছে। ঠিক করিলাম এবার আর বাড়ী যাইব না, এখানেই ছুটিটা অতিবাহিত করিব। পিতাকে চিঠি লিখিলাম "এবার পড়াশুনার বড় চাপ। বাড়ী যাইলে কিছুই হইবে না। তাই এখানে থাকিয়াই ছুটিটার সদ্ব্যবহার করিব।" বলা বাহুল্য পিতা আমার এই প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দিলেন।

সমস্ত ছুটিটা ভরিয়া একবারও বই খুলিয়াছিলাম কিনা মনে নাই, তবে রোজ যে একবার বেলুড় তীর্থে যাইতাম সেটা বেশ স্মরণ আছে। দেখিতাম কত সাধু, কত সন্ন্যাসী, সংসারের দুশ্ছেদ্য মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া এখানে আসিয়া পরোপকারব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন। তাঁহারাও কি আমার মত সংসারের দুঃখ-তাপে জর্জ্জরিত হইয়া শেষে এই পথ অবলম্বন করিয়াছেন? তাঁহারাও কি শত বাধাবিঘ্ন পায়ে ঠেলিয়া দিয়া এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছেন?

(৩)

পূজার ছুটি কাটিয়া গেল। বন্ধুরা সদলে আসিয়া কলিকাতানগরী পূর্ণ করিল। কিন্তু সেই পূর্ণতার মধ্যে আমার অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল।

সেদিন রবিবার। বেলুড়ে যাইয়া সমস্ত দিনটা কাটাইব ভাবিয়া অতি সত্বর আহার সমাপন করিলাম। সেখানে পৌছিতে দুইটা বাজিয়া গেল। আমি বসিয়া একমনে কত কি ভাবিতে লাগিলাম। যখন উঠিয়া দাড়াইলাম তখন চতুর্দ্দিক অন্ধকার, অনুমান হইল রাত্রি ৮টা হইবে। চারিদিকে মানুষের কোন সাড়া শব্দ নাই। পথ দৃষ্টির অগোচর। ভয়ে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলাম। ভগবানের নাম লইয়া এক পথ দিয়া ষ্টেশনের দিকে হাঁটিতে লাগিলাম। ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে আপন মনে গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছি—কিন্তু ওকি! আমি থমকিয়া দাড়াইলাম। ভয়ে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল।

দেখিলাম, আমার সম্মুখেই জটাজূটধারী এক অস্পষ্ট মূর্ত্তি স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এ কে? আমার কাছে কি চায়? আমাকে দেখিয়াই বা দাঁড়াইল কেন?—এ সব প্রশ্ন আমার মনে উঠিতেছিল, কিন্তু আমি মুখ ফুটিয়া একটি কথাও উচ্চারণ করিতে পারিলাম না। পুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে সেই মূর্ত্তি বজ্র-গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিল—"তুই পথ হারিয়েছিস্, আমার সঙ্গে আয়, আমি তোকে পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।"

আমার আর কিছু বলিতে সাহস হইল না, ছায়ার মত তাঁহার অনুসরণ করিলাম।

হাঁটিতে হাঁটিতে পথে তিনি আমায় বলিলেন, "সংসারে তোর মন লাগ্‌ছে না। সংসার তোর জন্যে নয়, তোর স্থান স্বর্গে। যে বোনের মৃত্যুতে তুই আজ উদাসী হয়ে বেড়াচ্ছিস, স্বর্গে সে বিচ্ছেদ নেই; সেখানে অনন্ত সুখ।"

কে এ সন্ন্যাসী? কেমন করিয়াই বা তিনি আমার সহোদরার মৃত্যু সংবাদ অবগত হইলেন? কি প্রকারেই বা আমার অন্তরস্থ উদাসীনতার পরিচয় পাইলেন? তবে কি ইনি ভূতভবিষ্যৎ-বেত্তা? ভক্তিরসে মন আপ্লুত হইল, কিন্তু কোন কথা বলিতে সাহস পাইলাম না। তাঁহার পশ্চাতে চলিতে লাগিলাম।

তিনি আবার বলিলেন—"ত্যাখ দ্বিজেন, তোকে আমি সেই স্বর্গের দ্বার দেখিয়ে দেব। তুই আমার অনুবর্ত্তী হ'।"

আমি তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিলাম, "গুরুদেব! আমি আপনার চরণ সেবায় দিন অতি-বাহিত করবো। আমায় আশ্রয় দিন।"

তিনি আমায় হাত ধরিয়া উঠাইয়া লইলেন। পথে

আর কিছু কথা হইল না, শুধু তিনি এইটুকু মাত্র বলিলেন যে পরের রবিবার যেন আবার বেলুড়ে আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করি। আমি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতিজ্ঞাপন করিলাম। কিছুক্ষণ পরে তিনি আমায় ষ্টেশনে পৌছাইয়া দিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

পরের রবিবারের প্রত্যাশায় দিনগুলি অসহনীয় হইয়া উঠিল। বই খুলিতাম, কিন্তু এক লাইনও পড়িতে পারিতাম না। কেবল মনে জাগিত, রবিবারে তিনি কি বলিবেন। আমার অমনোযোগিতা, আমার উদাসীনতা যে দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছিল, বন্ধুগণ সকলেই তাহা লক্ষ্য করিত। আমিও তাহাদের মধ্যে অনেককেই বলিয়াছিলাম যে সংসারে আমার মন নাই, এক অভিনব আকাঙ্ক্ষা আমার হৃদয়ে উদিত হইয়াছে। সন্ন্যাসীর বাক্য আমার সর্ব্বদাই মনে জাগিত, তিনি আমায় স্বর্গের দ্বার দেখাইয়া দিবেন;—সেখানে দুঃখ বা বিচ্ছেদের করাল ছায়া নাই, আছে কেবল অনন্ত সুখ।

রবিবার আসিল। অতি সত্বর আহার সমাপনান্তে আমি বেলুড়ের দিকে ছুটিলাম। যেখানে প্রথম সেই সন্ন্যাসীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহারই অনতিদূরে দেখিলাম তিনি বসিয়া রহিয়াছেন। নত হইয়া শ্রীচরণে প্রণাম জানাইলাম। তিনি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া আমাকে প্রশ্ন করিবেন—"সাহস আছে? পারবো?"

আমি বলিলাম, "কি করতে হবে প্রভু?"

"গৃহত্যাগী হ'য়ে আমার সহগামী হ'তে হবে।"

আমি বলিলাম—"গুরুদেব, আশীর্ব্বাদ করুন, ঠিক পারবো।"

"ঠিক থাকে যেন। আগামী বুধবার এইখানে আবার আসবে। তোমার যে যে জিনিস ভাল আছে, তা সব এইখানে আনবে। সেগুলি দরিদ্রের উপভোগ্য হবে। আর এই বস্ত্রই তোমার ভবিষ্যতের পরিধেয়।"—এই বলিয়া তিনি একখানা গৈরিক বস্ত্র আমায় দেখাইলেন।

কিছুকাল আমরা উভয়েই মৌন হইয়া রহিলাম। পরে তিনি আবার বলিলেন,"আজ বাড়ী যাও,কিন্তু ঠিক থাকে যেন যে আগামী বুধবার গৃহের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এইখানে এসে তোমার সমুদয় প্রিয় জিনিস আমার চরণে উপহার দিবে।"

আমি প্রণামান্তে ফিরিয়া আসিলাম।

(৪)

আজ মঙ্গলবার। আগামী কল্য আমাকে সব ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে। আমার আর রাত্রে ঘুম হইল না। সমস্ত রাত্রিটা ভাবিয়া, আত্মীয়স্বজনের নিকট চিঠি লিখিলাম। বাবা ও মা ছাড়া আমার পরিচিত কেহই বড় বাদ পড়ে নাই। সকল চিঠিতেই এককথা ভরিয়া দিলাম যে "সংসার আমার অসহনীয় হইয়াছে। তাই তাহার বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্ত বিহঙ্গের মত বাহির হইয়া পড়িলাম। আশা করি আমার এই আকাঙ্ক্ষার পথে কেন যেন বিঘ্ন হইয়া না দাঁড়ায়।" চোখের জলে লেখা অনেকস্থানেরই অস্পষ্ট হইয়া গেল।

ভোরের প্রারম্ভেই বিছানায় গিয়া শুইলাম। চোখে ঘুম অসম্ভব, শুধু তীব্র এক চিন্তার জ্বালায় কেবল এপাশ ওপাশ করিতেছিলাম। কোথায় এক অজানা অচেনা সন্ন্যাসীর সঙ্গে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছি! কে জানে সে কে?—অত তাড়াতাড়ি, না ভাবিয়া তাহার কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়া ভাল করি নাই। যদি না যাই, তবে সে আমার কি করিবে? পরক্ষণেই ভাবিলাম যে নাঃ,যখন প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি, শত বাধা বিপদ মাথায় করিয়াও তাহার সহিত যাইবই। কে জানে যে এই পথে আমার অক্ষয় সুখ হইবে না? বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনীষিগণ যে পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে পথ কখনও বর্জ্জনীয় হইতে পারে না।

আহারান্তে উত্তমরূপে আপনাকে সজ্জিত করিলাম। সেদিন তের টাকা দিয়া হেল্‌থের বাড়ীর এক যোড়া জুতা কিনিয়াছিলাম, সে যোড়া পরিলাম। গত বৎসর বাইশ টাকায় একটি বনাতের কালো ওপেন্‌ব্রেষ্ট-কোট করিয়াছিলাম, সেইটি

গায়ে দিয়া, তাহার উপর ষাট টাকা দামের শাল খানি জড়াইয়া লইলাম। বাক্সে পঞ্চাশটি টাকা ছিল, বাবা পাঠাইয়াছিলেন, তাহাও পকেটে রাখিলাম, কারণ সন্ন্যাসী বলিয়া দিয়াছেন যে আমার ভাল যা কিছু আছে তাহা দরিদ্রকেই দিতে হইবে। টাকা পাইলেই দরিদ্রেরা সর্ব্বাপেক্ষা তুষ্ট হইবে এই ভাবিয়া টাকা কয়টিও লইলাম।

বন্ধুদের নিকট যে চিঠিগুলি লিখিয়াছিলাম তাহা চিঠির বাক্সে ফেলিয়া রাখিয়া, মেস হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। মনকে দৃঢ় করিলাম, তুচ্ছ মায়ার বন্ধন আমাকে এক নিমেষের নিমিত্তও বিচলিত করিতে পারিল না।

বেলুড়ে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। সন্ন্যাসী আমার দর্শনে অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন। অনেক কথাবার্ত্তা হইল। তিনি প্রকারান্তরে আমায় আশ্বাস দিলেন যে কালে এ সংসারে আমার নাম প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আমিও মনে মনে নিতান্ত গর্ব্ব অনুভব করিলাম। কথোপকথনের পর ঠিক হইল, রাত্রি ৯টার ট্রেণে আমরা কাশী রওয়ানা হইব।

সন্ধ্যার পর আহারে বসিয়া, আমার সঙ্গে কি কি জিনিষ আনিয়াছি তাহা বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমিও সেগুলির যাথাযথ বিবরণ দিলাম। সর্ব্বশেষে আমার সঙ্গে নগদ পঞ্চাশটি টাকা আছে তাহাও তাঁহাকে জানাইলাম। সে কথা শুনিয়া তিনি মৃদুহাস্যে আমায় বলিলেন, "গরীবের প্রতি তোমার যে এত দয়া, এটা তোমার মহত্ত্বেরই পরিচয়।"

আহারান্তে যাত্রার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলাম। সন্ন্যাসীর আজ্ঞায় আমার গায়ের জামা কাপড়গুলি সব ছাড়িয়া ফেলিয়া গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করিলাম। পরিত্যক্ত জামা জুতা প্রভৃতি পথে কোনও দরিদ্রকে দিয়া যাইব, তাঁহার নিকট এই অভিলাষ ব্যক্ত করিলাম। তিনি বলিলেন, "এখানকার ভিক্ষার্থী দেখেই তোমার প্রাণ কাতর হয়েছে, কাশীর কাঙ্গাল দেখলে তুমি না জানি কি করবে! এগুলি সম্প্রতি রেখে দেওয়া যাক, কাশী গিয়ে ব্যবস্থা করা যাবে।"—এই বলিয়া সমস্ত জিনিষগুলি তিনি তাঁহার ট্রাঙ্কের ভিতরে ভরিয়া লইলেন। আমিও কোন আপত্তি করিলাম না।

যথাসময়ে উভয় আসিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। দুইজনেই তৃতীয়শ্রেণীর দুইখানি কাশীর টিকিট করিলাম। টিকেটের নিমিত্ত আমায় যাইতে হয় নাই, জুতা জামার সঙ্গে টাকা কয়টিও তাঁহার কাছেই দিয়াছিলাম।

(৫)

আমরা গাড়ীতে গিয়া উঠিবার কিছুক্ষণ পরে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। মন নিতান্ত খারাপ। বিগত জীবনের ইতিহাস আমার মানস নয়নে জাগিতে লাগিল। মাতা পিতার স্নেহ, ভ্রাতৃভগিনীদের ভালবাসা, বন্ধুগণের প্রীতি এ সব ছাড়িয়া প্রবাসে চলিয়াছি।

গাড়ীতে বসিয়া আমি বড় বেশী কথা বলি নাই। শরতের শীতল বাতাসে আমার রিক্ত গাত্র কাঁপিতে লাগিল। আমাকে জড়সড় হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "তোমার বড় শীত করছে, না? এই সন্দেশটি খাও, বেশ গরম বোধ হবে।" আমি আমি নিঃসঙ্কোচে তাহা খাইয়া ফেলিলাম। জানিনা তাহাতে কোনরূপ রাসায়নিক পদার্থ ছিল কিনা, তবে তাহা খাইয়া আমি অনেকটা আরাম অনুভব করিলাম। সমস্ত শরীর জামাবর্জ্জিত হইলেও আমার বেশ গরম বোধ হইতে লাগিল।

সন্ন্যাসী আমায় ঘুমাইবার জন্য অনেকবার অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ঘুম কোথায়? তাঁহাকে বলিলাম যে সে রাত্রে আমার ঘুমাইবার কোন সম্ভাবনা নাই; কারণ আমার মন বড় উদ্বিগ্ন। তিনি তাঁহার থলিয়া হইতে পূর্ব্ববৎ একটি সন্দেশ আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "বাছা! এইটি খাও, কোন চিন্তায় তোমাকে কাতর করিতে পারিবে না।" পূর্ব্বে সন্দেশ খাইয়া তাহার গুণ প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছি, এবারও ইহাকে অনিবার্য্য চিন্তাবিষঘ্ন মনে করিয়া অতি আগ্রহ সহ-

কারে খাইয়া ফেলিলাম। অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ নিদ্রার আকাঙ্ক্ষা হইল। আমি শুইয়া পড়িলাম।

যখন উঠিলাম, তখন শেষরাত্রি। পূর্ব্বগগনে ঈষৎ রক্তিমাভা প্রকাশ পাইয়াছে। সকলেই নিদ্রাবশে মূর্চ্ছিত। সন্ন্যাসীর বেঞ্চির দিকে নজর পড়িলে দেখিলাম, সেখানা খালি।

বুক সন্দেহে দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ভাল করিয়া চারিদিক দেখিলাম, হয়ত অন্য কোন বেঞ্চিতে গিয়াও তিনি ঘুমাইতে পারেন। কিন্তু খুঁজিয়া আর কি হইবে? তাঁহার থলিয়া প্রভৃতি কিছুই নাই।

এখন কি করি? আমি সম্প্রতি কপর্দ্দকহীন। চেকার যদি টিকিট চায় তাহাও তো আমার নাই। সবই তাহার কাছে। রাগে ও ক্ষোভে বসিয়া পড়িলাম। নিজের নির্ব্বুদ্ধিতাকে শত শত ধিক্কার দিতে লাগিলাম।

এদিকে পূর্ব্বগগনে অরুণদেবের উদয়ে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হইল। মোগলসরাইতে গাড়ী পৌছিবার পূর্ব্বে হঠাৎ আমার পায়ের দিকে নজর পড়াতে দেখিলাম, একটা কাগজের পোটলা পড়িয়া রহিয়াছে। উঠাইয়া দেখি, সেখানা ঐ সন্ন্যাসীর চিঠি, টিকিটখানাও ইহার ভিতরে পাইলাম।

প্রতারক লিখিতেছে—

দ্বিজেন,

আজ দু'মাসের উপর হইল তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমি ঘুরিতেছি। তোমার উদাসীনতার কারণ বন্ধুদের নিকট হইতেই জানিয়াছি। তারপর তোমাকে প্রতারণা করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। আমার কি সাধ্য যে তোমার ভগিনী বিয়োগের কথা আমি যোগবলে জানিব? ছলবলেই তাহা জানিয়াছিলাম। তোমার অবশ্য বিশেষ দুঃখ করিবার কারণ নাই, যেহেতু তোমার ন্যায় অনেকেই আমাদের হাতে পড়িয়া প্রতারিত হইয়া থাকে। ইতি।

সন্দেহের আর লেশমাত্র রহিল না; বুঝিলাম আমি প্রতারিত। কিন্তু এখন কোথায় যাই? একবার ভাবিলাম যে নাঃ, যে গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, সে গৃহে আর ফিরিব না। আবার ভাবিলাম—ভুল করিয়া যে কার্য্য করিয়া বসিয়াছি, তাহা সংশোধন করাই কর্ত্তব্য; গৃহে থাকিয়া পরের সেবা করিতে আর আপত্তি কি?

কিন্তু গৃহেই বা ফিরি কেমন করিয়া? টিকিট কিনিবার পয়সা কৈ? গৃহে ফিরিব কি ফিরিব না কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, কাশীতে গিয়া পৌছিলাম।

কাশী পৌছিতে বেলা ১১টা বাজিয়া গেল। হাঁটিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের দিকে চলিলাম। ঠিক করিলাম, কিছু দিন ঐখানে থাকিয়া পরে আমার ভবিষ্যৎজীবনের পথ অবলম্বন করিব। সেখানে পৌছিয়াই সেক্রেটরীর সঙ্গে দেখা করিলাম। তিনি বলিলেন, "দ্বিজেনবাবু আপনার এ কুমতি কেন? যৌবনাবস্থায় পাঠই একমাত্র কর্ত্তব্য। জ্ঞানের পথ প্রশস্ত করিয়া রাখাই প্রধান ধর্ম্ম। সমস্ত জীবন তো পড়িয়া রহিয়াছে, পড়াশুনার পর যে পথে ইচ্ছা সেই পথেই যাইতে পারিবেন।"

তাঁহার মুখে আমার নামোচ্চারিত হওয়ায় আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। তিনি আমাকে স্নানাহার করিয়া বিশ্রাম করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার অনুমতি ভিন্ন আমি বাড়ী হইতে যেন এক পাও না বাহির হই এ কথাও বলিয়া দিলেন।

দ্বিতীয় দিন প্রাতে আমি বারান্দায় পায়চারী করিতেছি এমন সময়ে একখানা গাড়ী আসিয়া আমাদের দরজার কাছে থামিল। গাড়ীর দরজা উন্মুক্ত হইলে দেখিলাম যে উহার ভিতর হইতে পিতা আস্তে আস্তে বাহির হইতেছেন। গাড়ী হইতে নামিয়াই বাড়ীতে ঢুকিতেই আমিই সামনাসামনি পড়িয়া গেলাম। কোন কথা না বলিয়া শ্রীচরণে নত হইয়া প্রণাম করিলাম, তিনিও আমায় আশীর্ব্বাদ করিলেন। যখন তাঁহার দিকে দৃষ্টি করিলাম, তখন দেখিলাম তাঁহার চোখের কোণে অশ্রুধারা বহিয়া আসিয়াছে। কত আশা করিয়া তিনি আমায় কলিকাতা পাঠাইয়াছিলেন, সে

আশার ফল কি? গেরুয়া পরিহিত পুত্রকে লইয়া সেইদিনই তিনি কলিকাতা রওয়ানা হইলেন।

(৬)

তারপর অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে। আর কোন পরীক্ষায় ফেল হই নাই। চার বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া এম-এ তে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলাম। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া ডেপুটিগিরি যোগাড় করিয়া দিলেন।

আজ আমার এজলাসে এক অদ্ভুত মোকদ্দমার বিচার হইবে। ঠিক আমারই মত কোন যুবক এক সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া তাহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। পুলিশের অনুসন্ধানে আসামী ধৃত হইয়াছে। যুবকটিও ইহাকেই প্রতারক বলিয়া সেনাক্ত করিয়াছে।

এজলাসে বসিয়া আমি সন্ন্যাসীর দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল, দেখিলাম এই তো সেই মুখ!

একদিনের জন্য মোকর্দ্দমা মুলতুবি করিয়া সন্ন্যাসীকে হাজতে পাঠাইয়া দিলাম।

পরদিন প্রাতে জেলে গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। বলিলাম, "কি হে, চিন্‌তে পার?"

সন্ন্যাসী আসামী বলিল, "পারি হুজুর। কিন্তু একটা নিবেদন আছে।"

"কি নিবেদন?"

"আমি এখন অপরাধী, আপনি বিচারক। কিন্তু আপনার এ পদ, এ ক্ষমতা কার প্রসাদে? আমি যদি সেদিন আপনাকে প্রতারণা না করতাম, আপনিও আমারই মত সন্ন্যাসী হতেন, এই রকম গাঁজা গুলি খেয়ে জুচ্চুরি বদমায়েসী করে বেড়াতেন। আমি কি আপনার উপকার করিনি? ভেবে দেখুন।"

আমি বলিলাম, "ঠিক কথা।"

জেল হইতে ফিরিয়া আসিলাম। কাছারি গিয়া, প্রথমেই সেই মোকর্দ্দমাটি ডাক করাইয়া, উহা অন্য হাকিমের এজলাসে ট্রান্‌স্ফার করিয়া দিবার জন্য ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট কাগজপত্র পাঠাইয়া দিলাম।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ গুহ।

ডাক্তার ভিনিসের পরলোক-গমনে

প্রাচ্য-বিদ্যাবিশারদগণের মণিচূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। ভারতবাসী শ্রেষ্ঠ ইংরাজ প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত আজ আমাদিগকে ছাড়িয়া পরলোক গমন করিলেন। বিগত ১৪ই এপ্রেল নৈনিতালে অধ্যাপক ডাক্তার ভিনিস্ * হঠাৎ স্ক্রফুলা রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। আজ ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিৎ-সমাজ গুরুশূন্য হইল, পৃথিবীর সুধিসমাজ আজ একজন পণ্ডিতাগ্রগণ্যকে হারাইলেন। কাশীর গভর্ণমেণ্ট কলেজ—কুইন্স কলেজের সংস্কৃতজ্ঞ প্রিন্‌সিপ্যালের তালিকায় এই দেহাবসানে একেবারে শেষ যবনিকা পতন হইয়া গেল! আর এত বড় পণ্ডিত দূরে থাকুক, সংস্কৃতজ্ঞ ইংরাজও ঐ কলেজে প্রিন্‌সিপাল হইয়া আসিবেন না! যে কলেজে ব্যালেণ্টাইন, গার্ফ্, মুয়র, গ্রিফিথ্, থিব প্রভৃতি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ ভারত ও ইউরোপে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া কলেজের মুখ উজ্জ্বল

* Prof. Dr. Arthur Venis M. A., Litt. D., C. I. E, Retired Principal, Queen's College, Benares, University Professor of Post-vedic culture, Allahabad.

করিয়া গিয়াছেন, সেই কলেজে ডাক্তার ভিনিস সারা জীবন সরস্বতীর উপাসনা করিয়া কলেজকে সরস্বতীর সাক্ষাৎ পীঠস্থান করিয়া তুলিয়াছিলেন। আজ কুইন্স কলেজের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল!

এবার কাহার নিকট প্রত্নতত্ত্বের জিজ্ঞাসাবাদ চলিবে? কাহার নিকট প্রত্নতত্ত্ব বিচারের শেষ মীমাংসার জন্য যাওয়া যাইবে? সর্ব্বদা দেখিতাম, স্যার মার্সাল, ডাঃ স্পুনার, দয়ারাম সাহনী, মিঃ উল্‌নার, পণ্ডিত হীরানন্দ শাস্ত্রী, ভিন্‌সেন্ট স্মিথ্, রাখাল বন্দ্যোপাধ্যায় পত্রাদির দ্বারা জিজ্ঞাসাবাদ, পরামর্শ চাহিতেন। পত্রের উত্তর দিতেই তাঁহার দিন চলিয়া যাইত। নিজে নামের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন না! এই সকল প্রত্নতত্ত্ব-পণ্ডিতগণ তাঁহাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন। হায়! এইবার সমস্ত শেষ হইয়া গেল। কে আর মুদ্রা-লিপির পাঠোদ্ধার করিবে? নানা দুরূহ বিষয়ের ব্যাখ্যা করিবে? সেই সুপ্রাচীন, নিয়ত পরিশ্রমী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আর যে ইহলোকে নাই! আমি আজ বিয়োগকাতর হৃদয়ে কি লিখিব, তাহাই ভাবিতেছি—তাঁহার বিষয়ে এত লিখিবার আছে যে প্রকাণ্ড এক 'ভলুম' হইয়া যায়। আমার প্রাচ্যবিদ্যা সম্বন্ধে যাহা কিছু শিক্ষা, তাঁহারই নিকট। অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ এম-এ এবং এই অধম, বলিতে গেলে তাঁহার শেষ ছাত্র। আমরা দীর্ঘ ৮।৯ বৎসর তাঁহার নিকট উপদেশ পাইয়াছি ও কায করিয়াছি। গোপীনাথ বাবু শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট ছিলেন। আমরা তাঁহার যত সম্পর্কে আসিয়াছিলাম, এত আর কেহই আসেন নাই, তাই আমাদিগকে আজ গুরুর শোকে মুহ্যমান করিয়াছে।

এক বৎসর হইল তাঁহার একমাত্র পুত্র ইউরোপের কাল-সমরে নিহত হন। ইহাতে স্বয়ং সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী, অধ্যাপক ভিনিসকে দীর্ঘ টেলিগ্রাম প্রভৃতি করিয়াছিলেন। সেই অবধি বৃদ্ধের অন্তস্থল ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাহার পরেও যথেষ্ট কায করিতেন, কিন্তু এক-একটা দীর্ঘ নিশ্বাসে, এক একটা সামান্য উক্তিতে তাঁহার হৃদয়ক্ষত প্রকাশ হইয়া পড়িত। পিতৃদেব পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়কে একদিন ভিনিস সাহেব কয়েকটী গৃহের পোষা পাখী প্রভৃতি দেখাইতে দেখাইতে বলিয়া উঠিলেন, "এই সব আমার ছেলে, ইহাদিগকে আমি ছাড়ি না।" তখন আমাদের অশ্রুরোধ করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। সমস্ত ছাত্রসমাজকে তিনি পুত্র বলিয়া জানিতেন, তাই পুত্রের বিয়োগে তিনি ছাত্রবর্গকে লইয়া কতকটা সান্ত্বনা লাভ করিতেন। কিন্তু জীবনের উপর মায়া চলিয়া গিয়াছিল, দেহের উপর উদাসীনতা আসিয়াছিল। তাই আজ এই রোগে তিনি দেহরক্ষার বল পরিত্যাগ করিয়া, ছাত্রসমাজকে অনাথ করিয়া, পিতৃহীন করিয়া চিরদিনের জন্য পরপারে চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে আর ভূপৃষ্ঠে দেখিতে পাইব না, ইহা মনে করিতে গেলে বুক ভাঙ্গিয়া পড়ে, হৃদয় ছাপিয়া রাখা যায় না।

তাঁহার প্রিয় লীলানিকেতন কুইন্স কলেজ পড়িয়া থাকিল, তাঁহার সেই "সাজান বাগান"—পুস্তকরাশি পূর্ণ প্রাচ্যবিদ্যার শ্রেষ্ঠ পুস্তকালয় "সরস্বতী ভবন"—পড়িয়া থাকিল, সেই প্রিয় পক্ষিসমূহও পড়িয়া থাকিল—সেগুলি না জানি, কাতর কণ্ঠে কতই ডাকিতেছে! কিন্তু সকলের চালক প্রাণশক্তি আজ অন্তর্হিত হইয়াছে! অনেক পণ্ডিতের সম্পর্কে আসিয়াছি, কিন্তু বিদ্যার গভীরতায় ও বিস্তৃতিতে এরূপ ইংরেজ পণ্ডিত আর দেখি নাই। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ইউরোপীয় অধ্যাপক, এমন কি স্যার জেমস্ মেষ্টন পর্য্যন্ত তাঁহাকে গুরুর ন্যায় লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। তাঁহার ছাত্রের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ গঙ্গানাথ ঝা, কে, পি, জয়সয়াল, ডাঃ গণেশপ্রসাদ প্রভৃতি বহু বহু পণ্ডিত জগতে বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অধ্যাপকতা সকলেই জীবনে অনুভব করিয়াছেন। এমন স্পষ্ট লেকচার, দুরূহ বিষয়কে 'জল করিয়া' দেওয়া আর কোন প্রোফেসরের মুখে শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সৌভাগ্যবশতঃ ইংরাজী, ইতিহাস, মনস্তত্ত্ব ও ভারতীয় দর্শন কিছু কিছু তাঁহার নিকট পড়িবার সুবিধা হইয়া-

ছিল। তাঁহার বিশিষ্ট প্রণালী, সকল বিষয়ের তত্ত্ব বাহির করিবার ক্ষমতা, বিশ্লেষণ ও উদাহরণ দিবার অপূর্ব্ব শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম। এ বিষয়ে বহু কথা লিখিবার আছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সম্ভবপর নহে।

ভারতীয় দর্শন বিষয়ে তিনি অসাধারণ অধ্যবসায় লইয়া কায করিয়াছেন। বুলার সম্পাদিত Encyclopaedia of Indo-Aryan Research এ তাঁহার "ন্যায় বৈশেষিক" সম্বন্ধে পুস্তক লিখিবার কথা বিজ্ঞাপিত ছিল। কিন্তু পরের কায করা, নিজের লেখায় অসন্তোষ ও নামের অনাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি নানা কারণে এই জগদ্বিখ্যাত কাযটী তিনি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারিলেন না। সম্প্রতি তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের Post-Vedic culture নামক চেয়ারের অধ্যাপক ছিলেন। সেই বক্তৃতার সম্পর্কে তাঁহার পূর্ব্ব রচিত "ন্যায় বৈশেষিক" পুস্তকের নোট বই হইতে কিছু কিছু ছাপিয়াছেন। আর কিছু দিন বাঁচিলে, তাঁহার উপকরণ যেরূপ সংগৃহীত ও সজ্জিত ছিল, তাহাতে তাঁহাকে ধরিয়া এ কাযটী আমরা করাইয়া লইতে পারিতাম। কিন্তু কালের আদেশ আকস্মিক ভাবেই আসিল, সে আদেশে আর বিলম্ব সহিল না, তাঁহাকে যবনিকার অন্তরালে এবারকার মত চিরবিদায় লইতেই হইল! ইতিপূর্ব্বে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে যে কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছেন তাহা এই :—টিপ্পনী সমেত বেদান্ত পরিভাষা, বেদান্ত সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী, পঞ্চদশী, পঞ্চপাদিকা ও সিদ্ধান্ত কেশের ইংরাজী অনুবাদ। অনুবাদে তিনি দর্শনের প্রত্যেকটী পারিভাষিক শব্দকে অত্যন্ত সাবধানে ওজন করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। হঠকারী অনুবাদের তিনি বড় বিপক্ষে ছিলেন। এই সাবধানতায় এবং অত্যুচ্চ আদর্শের বশবর্ত্তী হওয়ায় তিনি ঝুড়ি ঝুড়ি পুস্তক লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। ইয়ুরোপীয়গণের মধ্যে তিনিই একমাত্র দুরূহ নব্য-ন্যায় পর্য্যন্ত পরিশ্রমপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। নব্য-ন্যায়ে তিনি এরূপ কয়েকটী "শঙ্কা" তুলিয়াছিলেন যে আজ পর্য্যন্ত কেন নৈয়ায়িক তাহার সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই। পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছি যে তিনি ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নকে পর্য্যন্ত নৈয়ায়িক বিচারের উত্তরে সংশয়ী করিয়া তুলিতেন। ফলতঃ সংস্কৃতের সকল শাস্ত্রে এরূপ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য আর কোন ইংরাজে দেখা যায় নাই।

অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় প্রত্নতত্ত্ববিদ্যায়ও তিনি পুস্তকাদি লিখিতে পারেন নাই। কিন্তু বিগত ৪০ বৎসরের মধ্যে নানা পত্রিকায় যে সকল সারগর্ভ প্রবন্ধাদি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে প্রত্নতাত্ত্বিক সমাজ চিরদিন তাঁহার নিকট ঋণী থাকিবে।

শিক্ষাবিভাগে তাঁহার যথেষ্ট কর্ত্তৃত্ব ছিল। আজ লর্ড রোনাল্ডশের কথায় আমরা-মুগ্ধ, কিন্তু ভিনিস বহুদিন হইতেই এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ পরীক্ষার দর্শনের সহিত ভারতীয় দর্শন পড়িবারও ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। সিমলা কন্‌ফারেন্‌সে তাঁহার অভিমত সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। দিল্লীর রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউটে তাঁহাকেই অধ্যক্ষপদ দিবার কথা হইতেছিল। তাঁহারই উদ্যোগে "যুক্ত প্রদেশের ঐতিহাসিক সভা" স্থাপিত হইয়াছে। তিনি উহার সভাপতি ছিলেন। সভার পত্রিকা বাহির হইয়াছে; "সঙ্কাশ্য" নামক বৌদ্ধস্থান, সভার টাকায় খনন করা হইতেছিল। এইবার সবই বুঝি নষ্ট হইয়া যায়।

ডাঃ ভিনিস বহুদিন যোগ্যতার সহিত ইম্পিরিয়াল সার্ব্বিসে কাশী কলেজের অধ্যক্ষতা করিয়াছেন। যুক্ত প্রদেশের ডিরেক্টর হইয়াছিলেন ও শেষ অবস্থায় এলাহাবাদের Post-Vedic চেয়ারের অধ্যাপক ছিলেন। C. I. E. উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার দেহাবসানে গভর্ণমেণ্ট ক্ষতিগ্রস্থ হইল, প্রত্নতত্ত্ব সমাজ উপদেষ্টা-রহিত হইল, ছাত্রসমাজ গুরু-শূন্য হইল,—আর বর্ত্তমান লেখকের যাহা ক্ষতি হইল, তাহা সে সারা জীবন দুঃখের সহিত অনুভব করিবে। সর্ব্বাপেক্ষা এই দুঃখই রহিল যে, আর কিছুদিন পরে আমার সামান্য পুস্তক "সারনাথের ইতিহাস" বাহির হইবে, অথচ যিনি এই সংবাদ শুনিয়া হৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহাকে একবারের জন্যও তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষার কিছুমাত্র ফলও দেখাইতে পারিলাম না!

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

চণ্ডীদাস ও রামী

পাঁচশত বৎসরের আগে—আরও আগে—
দিব্যচক্ষে দেখিতেছি আমি,
ওই 'দেওতার' * পাড়ে নব অনুরাগে
চেয়েছিলে তুমি আর রামী।

দোঁহে হলে 'একঘরে', হারাইলে জাতি ;
বুকে পেলে প্রেম মহিমায়,
চকোর চকোরী ভোর ছিলে সারারাতি
বৃন্দাবন-চন্দ্র অমিয়ায়।

পাঁচশত বৎসরের পরে—আরও পরে—
দিব্যচক্ষে দেখিতেছি আমি,
ওই 'দেওতার' পাড়ে আজি কার তরে
জেগে আছ তুমি আর রামী।

সর্ব্বনাশা কালস্রোতে সব একাকার,—
জাগিতেছে দ্বীপ একখানি,
প্রেমের সে মরকত-বেদীর মাঝার
তোমরা দুজনে রাজা রাণী।

জাতি খোয়াইয়া, ত্যজি লাজ মান ছল,
প্রেমময়ে নিয়েছিলে বরি'।
তাই ত পাষাণ-ভাঙা মরণের জল
রেখে গেছে 'একঘরে' করি।

প্রলয়ের মহাসিন্ধু শত ফণা লয়ে
চুমে ও চরণ দিবা-যামি,
অনন্তের বুকে আছ নারায়ণ হয়ে,—
পাদপদ্ম সেবিতেছে রামী।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

* 'দেওতা'—এই পুকুরে বসিয়া চণ্ডীদাস মৎস্য ধরিতেন এবং রামী কাপড় কাচিতেন।

সিন্দূর-কৌটা

(উপন্যাস)

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মহা মুস্কিল।

রাত্রি একটার সময় বাড়ী পৌঁছিয়া, লছমন বেহারার সাহায্যে ইংরাজি সান্ধ্যবেশ হইতে নিজেকে মুক্তিদান করিয়া, সূক্ষ্ম ধুতি ও পিরাণে বিজয় বেশ্ আরাম অনুভব করিল। লছমনকে বলিল—"এত রাত্রে আর উপরে যাইব না, নীচে এইখানেই বিছানা করিয়া দে।"

লছমন এ আদেশ শুনিয়া একটু যেন ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। অন্য কাযের ভাণে এটা নাড়িয়া ওটা সরাইয়া শেষে বলিল—"হুজুর, মা-জীর আজ তবিয়ৎ খারাপ হইয়াছিল।"

বিজয় চক্ষু তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি হইয়াছিল?"

"ফিট্ হইয়াছিল।"

"ফিট্ হইয়াছিল? এখন কেমন আছেন জানিস?"

লছমন বলিল—"ভাল আছেন। এক ঘণ্টা হইল খবর পাইয়াছি, ঘুমাইতেছেন।"

কখন কোথায় কি অবস্থায় ফিট্ হইয়াছিল, বিজয়ও কিছু জিজ্ঞাসা করিল না লছমনও বলিল না। বিজয়

ভাবিল—তবে ত উপরে যাওয়া আমার আরও অনুচিত—এখনই ঘুমটি ভাঙ্গিয়া যাইবে।

লছমন সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিল—"বিছানা কি —এইখানেই—লাগাইব হুজুর ?"

বিজয় একটু বিরক্ত হইয়া বলিল—"হাঁ হাঁ—এই-খানেই লাগা। কতবার বলিতে হইবে ?"

লছমন শয্যারচনা করিয়া, আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি —সিগারেট, দেশলাই, অ্যাশট্রে প্রভৃতি—পালঙ্কের নিকট গুছাইয়া রাখিয়া, নীরবে বাহির হইয়া নিঃশব্দে দ্বারটি ভেজাইয়া প্রস্থান করিল।

মিনিট দশ পরেই বিজয় আলো নিবাইয়া শয্যায় প্রবেশ করিল। পাঁচ মিনিট—দশ মিনিট—পনেরো মিনিট—নিদ্রা ত আসে না! মাথার মধ্যে কেবল নানা চিন্তা আসে। প্রথমে বকুরাণীর কথা। বিজয় ভাবিতে লাগিল—এতদিন পরে হঠাৎ আবার বকুরাণীর ফিট্ হইল কেন ? পূর্ব্বে মাঝে মাঝে হইত বটে, কিন্তু খুকী জন্মিয়া অবধি এ দেড় বৎসর ত ও বালাই আর ছিল না। বকুরাণীর শরীর ভারি দুর্ব্বল হইয়াছে—দেহে রক্ত ভারি কম, মুখ চোখ কেমন ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে,ইহাও বিজয় লক্ষ্য করিয়াছে। কিছুদিন কোথাও লইয়া গিয়া হাওয়া বদ্‌লাইয়া আনিলে মন্দ হয় না। সুশীর একটা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, বকুরাণীকে লইয়া মাস দুই দার্জ্জিলিঙ বা সিমলা পাহাড়ে যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক। জোড়া গির্জ্জার চৌধুরী সাহেব কবেই যে ফিরিয়া আসিবে—মহা মুস্কিল !

এই "মহা মুস্কিল" কথাটি বিজয়ের মনে উদিত হইবামাত্র, কথাটির একটি প্রতিধ্বনি যেন সে শুনিতে পাইল। তাহার মস্তিষ্কের ভিতর যেন বীণা বাজিয়া উঠিল। অভিনয় দর্শন কালে, উর্ব্বশী-প্রণয়ী রাজার একটি পুরাতন রাণী আছে শুনিয়া সুশী বলিয়াছিল—মহা মুস্কিল! কথাটি যখন বলিয়াছিল, তখন কি মনোহর তাহার নয়নভঙ্গি; কি সুন্দর তাহার মুখ-ভাব! কথাটি ত সুখের কথা নহে, সুস্বাদু কথা নহে—তথাপি ঐ 'মহা মুস্কিলের' মধ্যে হইতে এত মধু ঝরিয়া-ছিল কেমন করিয়া ?

ইহার পর বিজয় ভাবিল—"কিন্তু এটা অন্যায়। একজন বিবাহিত ব্যক্তির পক্ষে, অন্য মেয়ের কথা অমন মিষ্ট লাগা ভারি অন্যায়।—তাহার উপর, আজ আবার আরও অন্যায় হইয়া গিয়াছে। আজ ত এক রকম বলিয়াই ফেলিয়াছি—'আমি তোমায় ভালবাসি।' কাযটি ভাল হয় নাই। আবার আশ্চর্য্য ঘটনাসূত্র দেখ!—এত নাটক থাকিতে, কল্পতরু থিয়েটরে আজ কিনা উর্ব্বশী মিলন! একজন বিবাহিত ব্যক্তির, অন্য মেয়ের সঙ্গে প্রণয় ও মিলন! ইহা দেখিয়া সুশীর ত ধারণা হইতে পারে, একজন বিবাহিত ব্যক্তি অন্য মেয়েকে ভালবাসিয়া যদি তাহাকে বিবাহ করে, তবে তাহা এমনই কি দোষের ? কে জানিত কল্পতরু থিয়েটরে আজ উর্ব্বশী মিলন অভিনয় হইবে—জানিলে কি সুশীকে সেখানে লইয়া যাই!"

ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া দুইটা বাজিল। বিজয় ভাবিল, অনেক রাত্রি হইয়াছে, এইবার ঘুমান যাউক। মন হইতে চিন্তাকে তাড়াইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে করিতে বিজয় চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিল, কিন্তু নিদ্রাদেবী কৃপা করেন না। বড় গরম বোধ হইতে লাগিল। বিজয় উঠিয়া বিদ্যুৎ পাখার বেগ একটু বাড়াইয়া দিয়া শয্যায় ফিরিয়া আসিল।

চক্ষু মুদিয়া আবার চিন্তার হস্তে সে আত্মসমর্পণ করিল। ভাবিতে লাগিল—"দুই আর দুই—যোগ দিলেই চার হয়। সুশীকে থিয়েটরে কি দেখাইলাম ? না—রাজা স্ত্রী থাকিতেও আর একজনকে ভালবাসিয়া বিবাহ করি-তেছেন। হোটেলে ফিরিয়া সুশী যখন বলিল—আমায় যদি কেউ অত ভালবাসে,তা হলে আমি কি করি—তখন আমি বলিলাম, হয়ত কেউ বাসে। সুশী কি ভাবিল কে জানে! হিন্দুতে ক্রিশ্চানে বিবাহে বাধা নাই বটে, একপক্ষ ক্রিশ্চান হইলেই ক্রিশ্চান-ম্যারেজ হইতে পারে তাহা ঠিক, কিন্তু সুশী অন্ততঃ এটুকু বোধ হয় জানে যে এক স্ত্রী থাকিতে আর এক বিবাহ, ক্রিশ্চান-

বিবাহ-আইনে হইতেই পারে না। আর, যদিই বা হইতে পারিত, আমি কি বিবাহ করিতাম? বকুরাণীকে ভাসাইয়া দিয়া? তাহাও কি সম্ভব? সে কি কথা!"

ইহার পর বিজয় মনে মনে বলিতে লাগিল—"বিবাহ কে করিতেছে! সে কথা নয়। তর্কের হিসাবেই বলিতেছি, আমরা এখন ইংরাজি পড়িয়া দুই বিবাহকে যতদূর অপকার্য্য বলিয়া মনে করি বাস্তবিকই ইহা তাই? এক স্ত্রীর জীবিতকালে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিলে সত্যই কি প্রথমার প্রতি ভয়ানক অবিচার করা হয়? সত্যই কি তাহার মনে নিরতিশয় ক্লেশ দেওয়া হয়? তাই যদি হয়, তবে মানব-মনস্তত্ত্বে সূক্ষ্মদর্শী মহা মহা কবিগণ—কালিদাস প্রভৃতি—এইরূপ বিবাহ লইয়াই এতগুলি নাটক লিখিলেন কেন? এ সম্বন্ধে তাঁহারা কি এতই অন্ধ এতই বিবেচনা শূন্য ছিলেন? শকুন্তলা, যাহা জগতের শীর্ষস্থানীয় নাটক বলিয়া গণ্য, তাহার নায়ক দুষ্মন্ত রাজাটি ত কুমার ছিলেন না। মালবিকাগ্নিমিত্র তাই, রত্নাবলী তাই—অনেক সংস্কৃত নাটকেই ত তাই। ভোজরাজের মত অমন পরম ধার্ম্মিক রাজা আর কে ছিলেন? প্রচণ্ড রৌদ্রে মৃগয়া হইতে অশ্বপৃষ্ঠে ফিরিতেছিলেন, পথে তৃষ্ণায় বড়ই কাতর হইয়া, তক্র-বিক্রেত্রী এক সুন্দরী গোপকন্যার কাছে তক্র চাহিলেন। গোপবালা জানিত ইনি স্বয়ং ভোজরাজ এবং অত্যন্ত কাব্যানুরাগী; সে বলিল—

> হিম-কুন্দ-শশিপ্রভ-শঙ্খনিভং
> পরিপক্ব-কপিত্থ-সুগন্ধ-রসম্।
> যুবতী-করপল্লব-নির্ম্মথিতং
> পিব হে নৃপরাজ রুজাপহরম্॥

এই শ্লোক বলিয়া রাজাকে ঘোল পান করাইল। গাছপাকা কদ্‌-বেলের সুগন্ধি রসে মিশানো, বরফের মত শাদা ঘোল—বাঃ, কি চমৎকার উপাদেয় জিনিষ! এক গেলাস এখন পাইলে মন্দ হইত না—উঃ, কি গরম! গোপকন্যা ঘোলকে রুজাপহরং বলিয়া বর্ণনা করিল—ঘোল যে সকল রোগ বিনাশ করে, সেটা তাহারা জানিত:দেখিতেছি—সাহেবরাই আবিষ্কার করেন নাই। সে কথা যাক্। ঘোল পান করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইয়া রাজা মূল্য দিতে চাহিলে, গোপকন্যা লজ্জায় রাঙা হইয়া মুখখানি নত করিয়া বলিল, 'আমি অন্য মূল্য চাহি না, আমায় বিবাহ করুন।'—বাঃ—মেয়েটি খুব সপ্রতিভ বলিতে হইবে! রাজা, প্রথমা মহিষী লীলাদেবীর অনুমতি লইয়া গোপকন্যাকে বিবাহ করিলেন। স্বামী আবার বিবাহ করিতে চাহেন শুনিয়া রাজমহিষী ত কৈ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন না!"—বিজয় মনে মনে হাসিয়া বলিল—"বেশ ছিল সেকাল!"

বিজয়ের পিপাসা পাইয়াছিল, তাই সে উঠিয়া আলো জ্বালিয়া, যুবতী-করপল্লব-নির্ম্মথিত সুগন্ধি কপিত্থরস-যুক্ত তক্রের অভাবে, লছমন কর্ত্তৃক পূরিত সোরাই হইতে একগ্লাস কলের জল ঢালিয়া পান করিল।

বিছানায় আসিয়া শয়ন করিয়া আবার সে সুশীর কথাই চিন্তা করিতে লাগিল। চৌধুরী সাহেব ফিরিয়া আসিলে সুশীর যেন আশ্রয় লাভই হইল—তারপর? কোথাও মেয়ে ইস্কুলে একটা চাকরি জুটিতে পারে—কিন্তু তাই লইয়া উহার চিরজীবন কেমন করিয়া কাটিবে? উহার ত কেউ নাই—দেখিবে শুনিবে কে? যদি আবার বিবাহ করে—তবে হয়ত সুখী হইতে পারে। এবার আর পলের মত বাঁদর নহে—একটি বেশ সুশ্রী সচ্চরিত্র সুশিক্ষিত খ্রীষ্টান যুবক। পলের যে পূর্ব্বের এক স্ত্রী বর্ত্তমান আছে, সুশীর সহিত যে বিবাহ হইয়াছিল তাহা বিবাহই নয়—এটা সুশীকে আজিও বলি নাই, কিন্তু বলা উচিত। উহার মনোমত কোনও যুবার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইবে। সুশীকে সে ভালবাসিবে না? নিশ্চয়ই বাসিবে। ক্রমে দুজনে খুব ভালবাসা হইলে, সুশী তাহাকে বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারিবে। কিন্তু পলের কথা যে সত্য, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ ত চাই! বিজয়কেই এজন্য মান্দ্রাজে যাইতে হইবে। সে মনে মনে বলিল—"সুশীর এই উপকারটুকু

আমি করিয়া দিব—নহিলে বেচারীর আর উপায় নাই।"

বিজয় কল্পনা করিতে লাগিল, সুশীর যেন বিবাহ—তাহারও যেন নিমন্ত্রণ আছে, সেও গির্জ্জায় গিয়াছে। সুশী যেন বধূবেশে সজ্জিত হইয়া বরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। বিবাহ হইয়া গেল। তাহার পর সুশী যেন সুখের হাসি হাসিতে হাসিতে আসিয়া, তাহার নব-প্রণয়ীর সহিত বিজয়ের পরিচয় করাইয়া দিল। বিজয় বেশ অনুভব করিল, এই কাল্পনিক খ্রীষ্টান যুবকের প্রতি তাহার বন্ধুপ্রীতি উছলিয়া ত উঠিতেছেই না, উল্টা যেন জাতক্রোধ উপস্থিত হইতেছে।

বড় গরম বোধ হইতে লাগিল। বিজয় উঠিয়া আবার আলো জ্বালিয়া ঘড়ি দেখিল, প্রায় তিনটা। জানালা গুলা সমস্ত খুলিয়া দিল। ফুর্ ফুর্ করিয়া বাতাস আসিতে লাগিল। সেই বাতাসে নিজ অনাবৃত বক্ষ মেলিয়া দিয়া বিজয় অস্ফুট স্বরে বলিল—"আঃ, ভগবানের হাওয়া নইলে কি হাওয়া? বিদ্যুৎপাখার হাওয়াতে এ প্রাণজুড়ানো মিষ্টতাটুকু নেই!"

এইবার বিছানায় আসিয়া বিজয় অল্পক্ষণ মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আসল কথাটা কি?

পরদিন অনেক বেলায় বিজয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিম্নতলের গোলসখানায় স্নানাদি সারিয়া যখন সে উপরে চা পান করিতে গেল, বেলা তখন নয়টা বাজিয়াছে।

বউদিদি তাহার চা প্রভৃতি সজ্জিত করিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। বিজয় টেবিলের সম্মুখে বসিয়াই বলিল—"বউয়ের নাকি কাল ফিট হয়েছিল শুনলাম?"

"হ্যাঁ।"

"কেমন আছে?"

বউদিদি বলিলেন—"এখন ভালই আছে। তবে মাথা এখনও ধরে রয়েছে বল্লে।"

বিজয় চা পান আরম্ভ করিয়া বলিল—"আবার ফিট হল! খুকী হওয়ার পর থেকে ত বন্ধই ছিল; ভেবেছিলাম এবার বোধ হয় সেরেই গেল। আবার হলেই ত বিপদ! আচ্ছা—কি রকম হল প্রথম?"

বউদিদি বলিলেন—"আমি ত দেখিনি। সদুর কাছেই শুনলাম, থিয়েটরে বড্ড ভীড় হয়েছিল—"

বিজয় আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"থিয়েটরে!"

"হ্যাঁ থিয়েটরেই ত!"

"কোন্ থিয়েটরে?"

"কল্পতরু থিয়েটর না কি বলে, কাল ওরা সন্ধেবেলা সেইখানে গেল কি না—"

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"ওরা কারা?"

"ভবানীপুর থেকে বিজনকুমারী এসেছিল তার বোন কমলাকে নিয়ে। বল্লে উর্ব্বশী-মিলন হবে, খুব ভাল নাটক, তোমরা আমাদের সঙ্গে এস। বউয়ের ত যাবার ইচ্ছেই ছিল না, বল্লে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি, কি করে যাই? তা কিছুতেই ছাড়াছাড়ি নেই। শেষে আমিই বল্লাম বিজন অত করে বলছে, আচ্ছা সদু আর তুমি দুজনে যাও, দেখে এস। আমাকে শুদ্ধ ধরে টানাটানি করেছিল, আমি গেলাম না।"

বিজয়ের চা পান বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাহার বুকের ভিতরটা কেমন করিতে লাগিল। বউদিদি থামিলেন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তার পর?"

বউদিদি বলিলেন—"তার পর—ওদের কাছে যা শুনলাম। একে মেয়েদের বসবার জায়গায় পাখা নেই, তাতে বেজায় ভীড়, খুব গরম হতে লাগল। প্রথমটা বেশ ছিল, হাসছিল, গল্প করছিল। দশটার পর থেকে, কি রকম যেন গুম্ হয়ে রইল। রাত যখন এগারোটা, তখন হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে সদুর গায়ে নেতিয়ে পড়ল।"

বিজয় রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল—"কখন বল্লে? রাত ১১টার সময়?"

"হ্যাঁ। বল্লে, এগারোটা তখন বাজে কি বেজেইছে, দ্বিতীয় অঙ্কের ড্রপ পড়বার দুই এক-মিনিট পরেই।"

"দ্বিতীয় অঙ্কের ড্রপ্ পড়বার পরেই ? তার পর ?"

"মহা হৈ চৈ পড়ে গেল। বিজনদের ঝি ভাগ্যিস কাছেই ছিল—এক বালতি জল আনিয়ে মুখে চোখে ঝাপটা দিতে লাগলো, দুদিক দুজনে দাঁড়িয়ে পাখা করতে লাগল। কাদের বাড়ীর একজন মেয়ের কাছে শোঁকার ওষুধ ছিল, এনে দিলে, তাই শোঁকাতে শোঁকাতে, প্রায় দশ মিনিট পরে নাকি চৈতন্য হল।"

বিজয় বলিল—"সর্ব্বনাশ! এত কাণ্ড হয়েছে ?"

বউদিদি বলিতে লাগিলেন—"সর্ব্বনাশ বৈ কি!—আমার বুদ্ধির দোষেই এটি হয়েছে ভাই। বউয়ের শরীর ভাল নয়, ওকে যেতে দেওয়াই আমার মহা বোকামি হয়ে গেছে। সেই সময় যদি আমি বলি, বউয়ের গিয়ে কায নেই, তা হলে আর এ বিপত্তি হয় না। আর, কাল রাত্রে গরমটা কি সামান্য গেছে! প্রথম দিকে ত গাছের পাতাটি নড়ে নি। শেষ রাত্রে বরঞ্চ একটু ঠাণ্ডা হল। কপালে যে কষ্টটুকু লেখা আছে তা কে খণ্ডন করবে বল!"—বলিয়া বউদিদি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

বিজয় ভাবিতেছিল, বউদিদি যাহা বলিতেছেন, শুধু জনতা বাহুল্যে ও গরমেই বকুরাণীর ফিট্ হইয়াছিল—না, অন্য কারণও আছে ? আসল কথাটা কি ? কিন্তু বউদিদির কথায় বার্ত্তায়, আমার সহিত সুশীকে বকুরাণী যে দেখিয়াছিল এমন কথার ত আভাসমাত্র নাই! পাছে আমি লজ্জা পাই, তাই কি বউদিদি এ অংশটুকু গোপন করিতেছেন ? যদি তাই হয়, তবে এই মুহূর্ত্তেই আমার প্রকাশ করা উচিত যে আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। নহিলে ইনি ভাবিবেন—

বিজয় বলিল—"কল্পতরু থিয়েটর বল্লে না ? আমিও ত কাল রাত্রে কল্পতরু থিয়েটরে গিয়েছিলাম।"

বউদিদি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"তুমিও গিয়েছিলে ? ঐ থিয়েটরেই ? কতক্ষণ ছিলে ?"

"আমি যখন পৌছলাম তখন রাত্রি দশটা বেজে গেছে। বারোটা পর্য্যন্ত ছিলাম।"

"আহাহা! তা কি ওরা জানে ? জানলে ওদের কত বল ভরসা হত, তখনি ত তোমার খবর পাঠাতে পারত। কিন্তু যখন মেয়েদের জায়গায় হৈ চৈ হল, তুমি ত জানতে পেরেছিলে ? একবারটি যদি খবর নিতে ভাই, যে কার কি হল!—তা, তোমারই বা দোষ কি ? তুমিই বা কি করে জানবে যে এরাও থিয়েটরে গেছে!"

বিজয় বলিল—"না বউদিদি, আমি কিছুই জানতে পারিনি। দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ হবার দুই এক মিনিট পরেই ফিট্ হল বলছ, আমি ঠিক সেই সময়েই উঠে বাইরে গিয়েছিলাম। প্রায় ১৫ মিনিট পরে, তৃতীয় অঙ্ক আরম্ভ হবার সময় আবার বক্সে ফিরে এলাম।"

"তুমি কখন ফিরলে কাল ?"

"তখন রাত্রি একটা হবে। লছমন আমায় বল্লে ফিট্ হয়েছিল। কোথায়, কখন ফিট্ হয়েছিল তা ত কিছু আমায় বল্লেনা—আমি ভাবলাম বাড়ীতেই হয়েছিল। বল্লে এখন ভাল আছেন, ঘণ্টাখানেক আগে ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাই আরও আমি উপরে এলাম না—ভাবলাম, ঘুমুচ্ছে ঘুমুক, গিয়ে কাঁচা ঘুমটুকু ভাঙ্গিয়ে দেব!"

বউদিদি বলিলেন—"হ্যাঁ, সে ভালই করেছিলে।"

বিজয়ের চা পান শেষ হইয়া গিয়াছিল। সে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, বকুরাণীরা যদি বা আমাকে সুশীকে থিয়েটরে দেখিয়াই থাকে, দেখিয়াছে নিশ্চয়, বউদিদির কাছে সে কথা চাপিয়া গিয়াছে। পাছে আমি অপ্রতিভ হই, লজ্জা পাই, তাই আমার অপরাধ গোপন করার হিসাবেই সে কথা বোধ হয় প্রকাশ করে নাই।

বিজয় বলিল—"আচ্ছা বউদিদি, বউয়ের এ রকম শরীর খারাপ কত দিন থেকে হয়েছে বল দেখি ?"

বউদিদি বলিলেন—"শরীর ত ওর কোনও কালেই বেশ ভাল নয়। তবে খুকী হওয়ার পর দিন কতক একটু যা সেরেছিল। আবার এদিকে মাসখানেক থেকে—"

বিজয় বলিল—"তা হলে এক কায করলে হয় না বউদিদি ? ওকে কোথাও নিয়ে গিয়ে মাস দুই হাওয়া বদল্ করিয়ে আনব ?"

"হ্যাঁ—সে করলে ত ভালই হয়। ওকে হাওয়া বদ্‌লাতে নিয়ে যাওয়ার কথা ক'দিন থেকে আমার মনেও এসেছে। তাই কর ভাই। এখন ত তোমার ছুটি আছে?"

"হ্যাঁ, ছুটি আছে বৈ কি। আমাদের সেই নভেম্বর মাসে কোর্ট খুলবে—এখনও প্রায় দু'মাস। বউ কোথা আছে? শোবার ঘরে?"

"হ্যাঁ।"

বিজয় তখন উঠিয়া ধীরে ধীরে নিজ শয়নকক্ষের অভিমুখে চলিল। চোর যেন হাকিমের এজলাসে প্রবেশ করিতেছে।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

স্পষ্ট কথা।

বিজয় প্রবেশ করিয়া দেখিল, বকুরাণী সোফার কোণে হেলান দিয়া বসিয়া আছে—পাশে একটি ছোট তেপায়ার উপর ফুলদানীতে এক গুচ্ছ পল-নীরো গোলাপ-ফুল। সৌদামিনী কাছে দাঁড়াইয়া তাহাকে কি বলিতেছে। বিজয়কে দেখিয়া সৌদামিনী মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া বলিল—"দাদা, আপনার চা খাওয়া হয়েছে?"

"হ্যাঁ, হয়েছে। সদু, তুমি ঝিকে নীচে পাঠিয়ে আমার সিগারেটের টিনটা আনিয়ে দাও ত। পোষাক কামরায় আছে।"

"যাই দাদা"—বলিয়া সৌদামিনী প্রস্থান করিল। দ্বারে কাছে গিয়া, অগ্রজের অলক্ষিতে, বকুরাণীকে একটি ছোট কিল দেখাইয়া গেল। তাহার অর্থ—"দাদার সঙ্গে যদি ঝগড়াঝাঁটি করিবি—তবে এই কিল তোর পিঠে বসাইব।"—বলা বাহুল্য অর্থটি বকুরাণী জলের মতই বুঝিতে পারিল। মনে মনে সে বলিল—"হে ঠাকুর, আমার মনে বল দাও, যেন কোনও কেলেঙ্কারি না করি।"

সিগারেট না আসা পর্য্যন্ত বিজয় ধীরে ধীরে কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিল। ঝি সিগারেট প্রভৃতি আনিয়া দিলে বিজয় তাহাকে বলিল—"বাইরে থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাও।"

ঝি চলিয়া গেলে বিজয় স্ত্রীর পার্শ্বে বসিয়া বলিল—"বাঃ, বেশ গোলাপগুলি ত! বাগানের?"—বলিয়া ফুলদানীটি তুলিয়া লইয়া নাসিকার নিকট ধরিল।

বকুরাণী বলিল—"হ্যাঁ, মালী পাঠিয়ে দিয়েছে।"

ফুল রাখিয়া বিজয় স্ত্রীর মুখখানির পানে চাহিয়া রহিল। স্বাস্থ্যের জ্যোতি তাহাতে নাই—প্রভাতশশীর মত প্রভাহীন।

বকুরাণী ক্ষীণ হাসির সহিত বলিল—"দেখ্‌ছ কি?"

বিজয় বলিল—"দেখছি নিজের কীর্ত্তি। তোমায় শেষ করে ফেলতে আর কতখানি বাকী রেখেছি তাই দেখছি।"

বকুরাণী কয়েক মুহূর্ত্ত মেঝের কার্পেটের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষু সজল হইয়া আসিল। মুখ তুলিয়া বলিল—"ও কথা বলছ কেন?"

বিজয় বলিল—"সত্যি কথা যা, তাই বলছি।"

বকুরাণী বিষণ্ণ দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত্ত স্বামীর পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"আমার বড় কঠিন প্রাণ গো, আমায় সহজে শেষ করতে পারবে না"—বলিয়া একটু হাসিয়া স্বামীর হাতখানি সে ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে কয়েক বিন্দু অশ্রু তাহার বসনে ঝরিয়া পড়িল।

বিজয় বলিল—"হ্যাঁ—তা কঠিন কেমন! একটু বাতাসের ভর সয় না!—কাল সুশীকে আমার বক্ষে দেখে তুমি কি মনে করলে যে তোমার স্বামীকে সে একেবারে কেড়েই নিয়েছে? আমি জন্মের মত খরচ হয়ে গেছি?"

"হুঁঃ—তা কেন মনে করব!"

"তবে?"

"ভাবলাম, সন্ধ্যার সময় ও তোমায় খাবার নিমন্ত্রণ করেছিল, তারই বদ্‌লা তুমি ওকে থিয়েটরে এনেছ।"

"এই দেখেই তোমার ফিট হল?"

"হুঁঃ—এই দেখেই বুঝি আমার ফিট্‌ হল! মানুষের গরমে আমার ফিট্‌ হল। ঐ দেখে আমার ফিট্‌ হবে

কেন ?"—শেষাংশের কথাগুলি অতি ক্ষীণস্বরে উচ্চারিত হইল। বকুরাণী মুখখানি অন্যদিকে ফিরাইয়া রহিল।

উভয়েই কিয়ৎক্ষণ নীরব। অবশেষে বিজয় স্ত্রীর হস্তধারণ করিয়া বলিল—"বকুরাণী, আমার দিকে চাও।"

বকুরাণী তাহার বিষাদমাখা দৃষ্টি স্বামীর পানে স্থির করিল।

বিজয় বলিল—"তোমার সঙ্গে আমার যা সম্বন্ধ, সে কি লুকোচুরি, ছল চাতুরী করার সম্বন্ধ ?"

বকু নীরবে মাথা নাড়িয়া উত্তর করিল—"না।"

"আমি এবার পশ্চিম যাবার আগে, তোমার আমার মধ্যে কোন দিন কোনও লুকোচুরি ছল চাতুরী ছিল কি ?"

বকুরাণী এবার কথা কহিয়া বলিল—"একদিনের জন্যেও না।"

বিজয় বলিল—"কিন্তু—এখন ? তোমার আমার মধ্যে আগেকার সেই ভাব কি বজায় আছে ?"

বকু আবার মুখখানি নত করিয়া বলিল—"তুমিই জান।"

বিজয় বলিল—"আমি ত জানিই। তুমিও জান। এ দিকে কিছুদিন থেকে, আমি তোমার সঙ্গে আগেকার মত সেই প্রাণখোলা ব্যবহার করিনি, নয় ?"

বকুরাণী বলিল—"সে—আমি কি করে' বলব ?"

বিজয় বলিল—"করিনি। করিনি, কারণ আমি পাপী।"

এই কথা শুনিবামাত্র বকুরাণী মাথা তুলিয়া স্বামীর মুখের পানে উভয় চক্ষুর পূর্ণদৃষ্টি স্থাপন করিল। বিজয় তাহার অনুচ্চারিত প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়া কহিল—"সুশীর সম্বন্ধে নয়—তোমার সম্বন্ধেই পাপ করেছি। নিজের বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি মানুষের যা কর্ত্তব্য, তা থেকে আমি ভ্রষ্ট হয়েছি—সে কথা স্বীকার করছি। এ দিকে, তোমার সঙ্গে আমি মনখোলা ব্যবহার করিনি। আমার মধ্যে পাপ প্রবেশ করেছে, তাই করতে পারিনি। কিন্তু তুমি কেন আমার সঙ্গে এ লুকোচুরি আরম্ভ করেছ ?"

"তুমি পাপী—আর আমি কি ভারি পুণ্যাত্মা ?"—বলিয়া বকুরাণী সোফার পিঠে ঢলিয়া পড়িল।

বিজয় বলিল—"তোমার কি অসুখ করছে ?"

"না।"

"তোমার শরীর এখনও ভারি দুর্ব্বল। এখন তোমার কাছে এসব কথা পেড়ে বোধ হয় আমি অন্যায় করেছি। তুমি আগে একটু সুস্থ হও তারপর আবার কথাবার্ত্তা হবে। আমি এখন যাই, সন্তুকে ডেকে দিই, তার সঙ্গে একটু গল্প কর, কেমন ?"—বলিয়া বিজয় উঠিয়া দাঁড়াইল।

বকুরাণী স্বামীর পিরাণ ধরিয়া বলিল—"যেওনা ; বস। আমার কাছে একটু থাক।"

বিজয় আবার বসিল। সস্নেহে স্ত্রীর একখানি হাত নিজ হাতের মধ্যে লইয়া বলিল—"তুমি আমায় কিছু বলবে বকুরাণী ?"

"না।"

"তোমায় কিছু পড়ে' শোনাব ?"

"না।"

"কি করব বল ? কোথাও একটু বেড়াতে যাবে ?"

"না। তুমি আমার কাছে থাক। আমি ত বেশী দিন বাঁচব না, যে ক'দিন আছি, এক একবার আমার কাছে এসে বোসো।"

বিজয় সহসা স্ত্রীকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"বকুরাণী !"

বকুরাণী স্বামীর স্কন্ধের উপর মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিজয় দুইহাতে তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া আবেগ ভরা কণ্ঠে বলিল—"ওকি কথা বকুরাণী ! তুমি বাঁচবে না বলছ কেন ?"

বকুরাণী কোনও উত্তর দিল না। বিজয় তাহার গলায় হাত জড়াইয়া বলিল—"ও কথা তুলি কেন বলছ

বকুরাণী? বল—বল—উত্তর দাও। তুমি বাঁচবেনা—কেন?"

বকুরাণী বলিল—"কি জানি, আমার কি রকম মনে হচ্ছে যে আমি আর বেশী দিন বাঁচবো না। তুমি মনে কোরোনা যে এ কথা আমি অভিমান করে' বলছি। সত্যি আমার তাই মনে হচ্ছে।"

বিজয় বলিল—"তুমি পাগল!—তোমার মনে দুঃখ হয়েছে—তোমার শরীর দুর্ব্বল হয়েছে—তাই তোমার মাথায় এই সব অস্বাভাবিক কল্পনা উঠছে! শোন বকুরাণী। আজ যখন বউদিদির কাছে বসে আমি চা খাচ্ছিলাম, তোমার সঙ্গে দেখাও হয়নি, তখনই আমি তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেছি যে শীঘ্রই তোমাকে কোথাও হাওয়া বদলাতে নিয়ে যাব। মাসদুই হাওয়া বদলিয়ে এলে তোমার শরীর মন দুই ভাল হবে।"

বকুরাণী জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় নিয়ে যাবে আমায়?"

"কোথায়, তুমিই বল। সিমলা কি দার্জ্জিলিং কি মসুরী পাহাড়—কোথায় যাবে বল।"

"কবে যেতে হবে?"

"দিন কতকের জন্যে আমায় একবার মাদ্রাজে যেতে পারলে ভাল হয়। কিন্তু, তুমি যদি ভাল মনে আমায় যেতে অনুমতি দাও, তবেই যাব, নৈলে যাব না। যদি যাই, যত শীঘ্র পারি সেখানকার কাযটুকু মিটিয়ে এসে, তোমায় নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়ব।"

"তোমায় মাদ্রাজে যেতে হবে? কেন?"

"সে অনেক কথা, পরে তোমায় অবসর মত সব বলব। এখন শুধু এইটুকু বলি, সুশীর একটা বিশেষ দরকারী কাযের জন্যেই যেতে চাচ্ছি। ওর একটা হেস্তনেস্ত করে দিয়ে, ও ল্যাঠা একদম চুকিয়ে—তোমায় নিয়ে বেড়িয়ে পড়ব।"

বকুরাণী মনে মনে বলিল—"হে ভগবান!—এমন সুদিন কি হবে?" প্রকাশ্যে বলিল—"মাদ্রাজে তোমার বেশী দেরী হবে না ত?"

"না, যেতে দুদিন, আসতে দুদিন,—আর দিন দুই তিনে কাযটুকু বোধ হয় সারতে পারব। যেদিন বেরুব, সেদিন থেকে এক হপ্তার মধ্যে এসে পৌছব।"

বকুরাণী একবার স্বামীর মুখের পানে, একবার বন্ধ দরজার পানে চাহিয়া, একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষে বলিল—"তোমার সঙ্গে কোনও রকম লুকোচুরি করতে তুমিই আমায় বারণ করেছ। আমার মনে একটা যে প্রশ্ন উঠেছে, তা কি তোমায় জিজ্ঞাসা করব?"

বিজয় বলিল—"নিশ্চয়। কি তোমার মনের কথা, বল।"

"তুমি রাগ করবে না?"

"না।"

"সুশীও কি তোমার সঙ্গে মাদ্রাজ যাবে?"—বলিয়া বকুরাণী মুখখানি নত করিল।

বিজয় বলিল—"না, সুশী কেন যাবে?"

"সে যদি যেতে চায়?"

"যেতে চাইলেও তাকে নিয়ে যাব না। তোমার যদি সন্দেহ হয়, তুমি আমার সঙ্গে চল।"

বকুরাণী বলিল—"ছি—আমি কি তাই ভাবছি?—সুশীর কাযের জন্যেই যেতে হবে, তাই ভাবলাম, যদি তাকে সঙ্গে নেওয়া তোমার দরকারই হয়, কিম্বা, সে নিজেই যদি যেতে চায়।"

বিজয় বলিল—"না, তাকে সঙ্গে নেওয়ার আমার কোন প্রয়োজনও নেই, সেও যেতে চাইবে না।—যদি তুমি বল, আজই রাত্রের ট্রেণে আমি বেরিয়ে পড়ি। কারণ, মাদ্রাজ যেতে এ দিকে আমার যতদিন দেরী হবে,—তোমাতে আমাতে বেরুতেও ওদিকে ঠিক ততদিন দেরী পড়ে যাবে। কাল মহালয়া হয়ে গেছে কি না?—আজ যদি বেরুই, তবে ধর, আজ হল ১৭ই আশ্বিন, ২৪শে আশ্বিন আমি ফিরে আসতে পারবো।"

বকুরাণী বলিল—"সেদিন অষ্টমী পূজা।"

"অষ্টমী পূজা?—তা হলে, বিজয়া দশমীর দিন

তোমাতে আমাতে বেরিয়ে পড়তে পারব। কি বল? আজই রওয়ানা হব?"

"গাড়ী কখন?"

"রাত্রি দশটায়।"

বকুরাণী বলিল—"তা, যেমন ভাল বোঝ।—কিন্তু, আজকের দিনটে থেকে গেলে হত না? না হয় কালই আসতে যেতে।"

বিজয় হাসিয়া বলিল—"কাল আবার বল্‌বে পরশু? তবেই যাওয়া হয়েছে!"

বকুরাণীও হাসিল। বলিল—"আচ্ছা, যা ভাল হয় তাই কর। মাদ্রাজে কি ভাল জিনিষ পাওয়া যায়?"

"মাদ্রাজী শাড়ী। সুন্দর সুন্দর রেশমের পাড়।'

"আমার জন্যে এনো।"

"আনব বৈকি, নিশ্চয় আনব। দশটা বাজে, তুমি এই বেলা স্নান করে ফেল্লে না কেন?"—বলিয়া বিজয় দাঁড়াইয়া উঠিয়া ফুলদানীটি তুলিয়া আঘ্রাণ লইল।

বকুরাণী বলিল—"যাই। ফুলগুলি তোমার বৈঠকখানায় পাঠিয়ে দেব?"

"না—এই খানেই বেশ আছে"—বলিয়া বিজয় নামিয়া গিয়া তাহার আপিস কামরায় প্রবেশ করিল।

সংবাদপত্র পড়িতে পড়িতে তাহার মনে হইল—"ওবেলা ত সময় পাইব না। এ বেলাই বরঞ্চ সুশীর কাছে গিয়া, মাদ্রাজ যাইবার কথাটা বলিয়া আসি।"

এ কয়দিন প্রত্যহই সে অপরাহ্নকালে সুশীর তত্ত্বাবধানে বাহির হইয়াছে। আজ বেলা একটা না বাজিতেই বিজয়ের মোটর গ্রেট্‌ ঈষ্টার্ণ হোটেলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

আলোচনা

একটি ঐতিহাসিক সন্দেহ।

আদশূর নামে বাস্তবিকই কোন রাজা ছিলেন কিনা ইহার ঐতিহাসিক মীমাংসা এখনও হয় নাই। কিন্তু আর এক বিষয়ে আমার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। আদিশূর পুত্রেষ্টি যজ্ঞের জন্যই হউক আর শান্তিস্বস্ত্যয়নের জন্যই হউক, পাঁচজন ব্রাহ্মণ কোলাঞ্চ প্রদেশ হইতে আনাইয়াছিলেন ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও, পঞ্চ গোত্রের পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনাইতে গেলেন কেন? এই পাঁচজনের মধ্যে দুই জন এক গোত্রের না হইবার কোন কারণ শাস্ত্রে লেখে কি? আর যজ্ঞের জন্য পাঁচ জন ব্রাহ্মণের প্রয়োজন, এমন নির্দ্দেশ কোন শাস্ত্রে পাওয়া যায় কি? আমরা সাধারণতঃ পাঁচজনে মিলিয়া কাজ করি, কখনও বা দশজনে মিলিয়াও কাজ করি, আবার কার্য্যকালে 'পাঁচ কথা' বলি। শাস্ত্রের কথাও কি আমাদের পাঁচজনের কথার ন্যায়, তাই কি যজ্ঞ করিতে পঞ্চগোত্রের পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিল?

আবার পাঁচজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে পঞ্চগোত্রের পাঁচজন কায়স্থ আসিবারই বা কারণ কি? ইহাদের মধ্যে দুইজন এক গোত্রের নাই, সকলেই পৃথক গোত্রের। যজ্ঞকার্য্যে ব্রাহ্মণদের মনোনয়ন করিবার সময় হয়ত কেহ ভাবিয়া থাকিতে পারেন—"যজ্ঞের কাজে নানারূপ পাওনা আছে। একগোত্রের ব্রাহ্মণে কেন পাইবে? পাঁচগোত্রের পাঁচজন ব্রাহ্মণই ঠিক করি।" কিন্তু কায়স্থগণ সহচররূপেই আসুন আর ভৃত্যরূপেই আসুন, তাঁহাদের ত বিভিন্ন গোত্র হইবার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

কেবল আদিশূরের যজ্ঞেই নয়, ৯৯৪শকে বিজয়সেনের যজ্ঞে এবং উত্তরকালে আদিত্যশূরের রাজসভায় এইরূপ পঞ্চগোত্রের পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে পঞ্চগোত্রের পাঁচজন কায়স্থও আসিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" কিম্বা বিশ্বকোষে এইরূপ পড়িয়াছি বলিয়া স্মরণ হয়।

অযুগ্ম সংখ্যার মধ্যে ৩-এর অধিক ৫ ও ৭ শুভকর সংখ্যা বলিয়া সাধারণের ধারণা, তাই পাঁচজন বা সাতজন সধবা স্ত্রীলোকে

বিবাহের বহু অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া থাকে। কিন্তু এসকলই স্ত্রী-আচার। শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে পাঁচজন ব্রাহ্মণে কাজ করিবে এরূপ নির্দ্দেশের কথা জানি না। বিভিন্নগোত্রের হইবে এরূপ নির্দ্দেশ থাকা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। তাই সন্দেহ হয়, আদিশূরের যজ্ঞে পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমন ব্যাপার হয় ত সর্ব্বৈব কাল্পনিক। ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন ও ভবদেব ভট্টের প্রশস্তি এই সন্দেহকে আরও দৃঢ়তর করে। যাঁহারা কুলশাস্ত্রকে ইতিহাসের মর্য্যাদা প্রদান করেন, তাঁহারা ইহার সদুত্তর প্রদান করিলে কৃতজ্ঞ হইব।

শ্রীরাখালরাজ রায়।

লোচন দাসের বাসস্থান।

১৩২৪ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বিশ্বাস লিখিত "প্রাচীন কবি লোচনদাস" শীর্ষক একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ দেখিলাম। শশীবাবু ভক্ত-চিত গ্রন্থসমূহের পরিচয় পাঠকবর্গকে পূর্ব্বেই অনেক দিয়াছেন; এবং ভবিষ্যতে তিনি আরও অনেক দিবেন বলিয়া আশা করি। সুতরাং এক্ষেত্রে আমি তাঁর প্রবন্ধের মূল বিষয়ের আলোচনা করিব না, কেবল ভক্তকবি লোচন দাসের বাসস্থান কো-গ্রাম সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা বলিয়া পাঠকবর্গের নিকট বিদায় লইব।

শশীবাবু লোচনদাসের "দুর্ল্লভসার" নামক গ্রন্থের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার বাসস্থান এবং জাতি প্রভৃতির নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা—

"বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কো-গ্রাম নিবাস।" ইত্যাদি

তার পর (১) পাদটীকায় তিনি "কো-গ্রাম বোধ হয় বীরভূম জেলায়" এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। (৪৬৮পৃঃ) কিন্তু তাঁহার অনুমান যথার্থ নয়। সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে কোগ্রামের অবস্থিতি, বর্ত্তমান অবস্থা এবং প্রাচীন ইতিহাস বিবৃত করা গেল। শশীবাবু অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন যথার্থ কি না।

বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত মঙ্গলকোট থানার কিঞ্চিৎ উত্তরে অজয়তীরে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র এবং বহু প্রাচীন পল্লীর বর্ত্তমান নামই কোগ্রাম। দূর হইতে দেখিলে কো-গ্রামকে একটী বনভূমি বলিয়া বোধ হয়। উত্তরে পল্লীর পাদদেশ বিধৌত করিয়া অখণ্ডপ্রতাপ অজয়নদ আপন আবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। দক্ষিণে ও পূর্ব্বে কুনুর নামে ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী কোগ্রামের সীমানাতেই অজয়ে গিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছে। বর্ষাকালে উভয় নদীর ভীষণ বন্যায় যখন গ্রামের চতুর্দ্দিক বেষ্টিত হয়, তখন মনে হয় যেন একটা বৃহৎ লতা-গুল্ম বন্যার স্রোতে ভাসিয়া আসিয়া এখানে আটক খাইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে অজয় নদ গ্রামটিকে ধীরে ধীরে গ্রাস করিতেছে। দীনহীন গ্রামবাসিগণ স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া, স্থান হইতে স্থানান্তরে কুটীর বাঁধিয়া যাযাবরের ন্যায় বাস করিতেছে। লোকসংখ্যা বোধ হয় ৬০।৬৫ ঘর। কাহারও আর্থিক অবস্থা বা স্বাস্থ্য ভাল নয়। পল্লীর চিরশত্রু ম্যালেরিয়া এখানেও স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। গ্রীষ্মকালে যখন নদনদী শুষ্ক হইয়া যায়,তখন গ্রামে এমন একটি পুষ্করিণী নাই যে লোকের তৃষ্ণানিবারণ হয়। মধ্যে মধ্যে কলেরা, বসন্তেরও প্রকোপ দেখা যায়। সুতরাং পল্লীটি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া ক্রমেই ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। তবে একমাত্র সান্ত্বনার বিষয় এই যে,গ্রামবাসীদের আর্থিক অবস্থা যাই হোক্ না কেন, তাহাদের নৈতিক চরিত্র প্রভু লোচনান্দের কৃপায় বিশেষ সন্তোষজনক। আজ খাইতে কাল নাই বটে, কিন্তু দেবদ্বিজে অবিচলিত ভক্তি, এবং অতিথিসেবায় অদম্য উৎসাহের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। লোচন দাসকে তাঁহারা দেবতার মতই ভক্তি করে। মনোমত নৈবেদ্য না জুটুক, ঘরে গঙ্গাজল ও বিল্বপত্র, আর আছে অবিচলিত ভক্তি ও অখণ্ড বিশ্বাস। তাই লইয়া তাহারা প্রতিদিন সকালে, সাঁঝে তাদের হৃদয়নিহিত সুখদুঃখ সবই তাঁহার রাতুলচরণে সমর্পণ করিয়া যায় ও দুর্ব্বলের বল অশ্রুজলে তুলসীতল সিক্ত করে। পৌষ-সংক্রান্তির দিন লোচন দাসের তিরোভাব উপলক্ষে অজয়তীরে সপ্তাহকালব্যাপী একটি ক্ষুদ্র মেলার অধিষ্ঠান হয়। এই মেলায় গ্রামবাসিগণ তাহাদের সর্ব্বস্ব দিয়া আর কিছু করুক না করুক,হরিপ্রেমরসে সমস্ত পল্লী প্লাবিত করিয়া তুলে।

লোচনদাসের সম্বন্ধে দুটী কথা বলি। তাঁহার শ্রীপাটে পূর্ব্বে উদয় মোহান্ত, অবধুত গোঁসাই প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ সেবাইত ছিলেন। এক্ষণে প্রায় তিন পুরুষ ধরিয়া বাউলপন্থী বৈষ্ণবগণ মোহান্তের কার্য্যে নিযুক্ত। বর্ত্তমান সেবাইতের নাম ঝাড়ুদাস মোহান্ত। আয় মাত্র ভিক্ষা। কোন দেবোত্তর বন্দোবস্ত নাই।

ইহাই গেল বর্ত্তমান অবস্থা। কিন্তু কোগ্রাম চিরকাল এমন দীন ছিল না। এমন এক দিন ছিল যখন ইহা বাণিজ্য ও ধনসম্পদে সমস্ত বঙ্গদেশে বিখ্যাত ছিল। তখন উহার নাম ছিল উজানি। তাহার কিঞ্চিৎ ইতিহাস আগামী সংখ্যায় দিতে বাসনা রহিল। আজ এই পর্য্যন্ত।

শ্রীমতী নলিনীপ্রভা দেবী।

শ্রুতি-স্মৃতি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠপুত্র, আকবরের আনন্দ দুলাল, সিংহসম বিক্রমশালী রাজপুতপতি রাজা মান যাহার মাতুল,চির-সম্পদ-লালিত লক্ষ্মীনন্দন সেই খশ্রু যে অসহায় অবস্থায় অনাথের ন্যায় দূর দাক্ষিণাত্যে ঘাতকের হস্তে নিহত হইল, ইহা কোন্ বিধাতার নির্দ্দয় লীলা, এই কথা বারম্বার মনে আসিতে লাগিল। অসীম ঐশ্বর্য্যময় ভারতের রত্নসিংহাসনে বসিয়া আসমুদ্র হিমাচল বিস্তৃত সাম্রাজ্যের উপরে রাজদণ্ড পরিচালনের জন্য যাহার জন্ম, সে এমন সকরুণ মৃত্যুর মধ্যে দিয়া তাহার জীবনের লীলা শেষ করিল কেন, এই ভাবিয়া আমার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া যাইতে লাগিল। খশ্রুর সমাধির অনতিদূরে চতুর্দ্দিকে পুঞ্জ-পুঞ্জ গোলাপের ফুল ফুটিয়া সমস্ত খশ্রুবাগটি লালে-লাল করিয়া রাখিয়াছে দেখিলাম। খশ্রুর সকরুণ মৃত্যুর ব্যথায় আমার তরুণ মন সেদিনে বড় বেদনাতুর হইয়া উঠিয়াছিল। আমার মনে হইতে লাগিল ওগুলি যেন গোলাপ নহে, রাজনন্দনের অপরিপূর্ণ বাসনারাজি যেন গোলাপরূপে তাহারই সমাধির চারিদিকে রাঙা হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে। জীবনের সকলগুলি আশা আকাঙ্ক্ষা পরিপূরিত হইবার যত-কিছু অনুষ্ঠানের প্রয়োজন, খশ্রুর তাহার কোনটিরই অভাব ছিল না। তথাপি করায়ত্ত সমাগত প্রায় সেই সিদ্ধি অদৃষ্টের অভিসম্পাতে এমন করিয়া ধূলায় ধূসরিত হইতে দেখিয়া, সেই বিধিলিপিকেই অমিত বলশালী বলিয়া সেদিনে বারবার মনে হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, বিদ্যা বুদ্ধি রূপ শক্তি আভিজাত্য সামর্থ্য সহায় সম্পদ কিছুই কিছু নহে, জীবনের সুখ দুঃখ কে কোথায় অলক্ষ্যে বসিয়া কেমন করিয়া ঘটায় তাহা মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য ; ব্যর্থ আশা নিবিড় বেদনাবিধুর হৃদয় লইয়া আমাদের দুঃখময় জীবনের পঙ্গু কয়টি দিনরাত্রি দুই হাতে ঠেলিয়া শেষ করিয়া যাওয়া ছাড়া আমাদের সাধ্যের মধ্যে আর কিছুই নাই। জীবনের সেই শেষ যবনিকাই বা কাহার কেমন করিয়া পড়িবে তাহাই কি জানিবার উপায় আছে? এই খশ্রু দুষ্টলোকের কুপরামর্শে পিতার জীবিতকালেই তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রাজদণ্ড হাতে লইবার দুষ্কর চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল ; সে বিদ্রোহ জাহাঙ্গীর বাদশাহ কেমন করিয়া দমিত করিয়াছিলেন, খশ্রুর সহকারী অনেকেরই কেমন করিয়া প্রাণদণ্ড হইয়াছিল, গীয়াস আসফ্ প্রভৃতি ওমরাহগণের প্রার্থনায় খশ্রু কেবলমাত্র কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াই কেমন করিয়া নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছিল তাহা ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। পূর্ব্বকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পিতার কৃপালাভ করিবার দিন যখন সমাগত প্রায়, নির্দ্দয় নিয়তি তখন আর এক মূর্ত্তিতে খশ্রুকে দর্শন দিলেন। স্বপ্নেও যাহা সে ভাবে নাই তাহাই ঘটিল, সিংহাসনলাভের দুর্দ্দমনীয় লোভে প্রলুব্ধ ভ্রাতার স্নেহময় হস্ত ভ্রাতৃহত্যার জন্য গোপনে শাণিত ছুরিকা ধারণ করিল।

শাহজাদা খুরম দাক্ষিণাত্যে অভিযান সময়ে অগ্রজ খশ্রুকে সঙ্গে লইয়া যান। রাজধানী হইতে বহুদূরে দাক্ষিণাত্যে নির্জ্জন দুর্গে গোপন হত্যার সুযোগ পাইবেন এই মনে করিয়াই যুদ্ধাভিযানের সময়ে জ্যেষ্ঠকে সঙ্গে লইয়া যাইবার একান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং সে ইচ্ছাও কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। ইহার বহুবর্ষ পরে, শাহজাদা খুরম যখন প্রবীণ বাদশাহ শাহজাহান, সেই সময়ে মোগল সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে যে প্রবল ভ্রাতৃবিরোধ, লোকক্ষয়কারী লোমহর্ষণ যুদ্ধ এবং অমানুষিক নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, তাহারই পরিণাম অংশে পিতা শাহজাহানের সহিত পুত্র ঔরঙ্গজীবের কথোপকথনে এবং পত্রে প্রকাশ পায় যে, শাহজাহানের ভ্রাতৃহত্যার দৃষ্টান্ত দেখিয়াই ঔরঙ্গজীব এই কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন।*

* History of Aurangzib by Prof. Jadunath Sarkar

এক পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া, একই গৃহে শৈশব হইতে যৌবনের আরম্ভ পর্য্যন্ত লালিত পালিত হইয়া, অর্থ প্রভুত্ব ঐশ্বর্য্য সাম্রাজ্য প্রভৃতি ক্ষণভঙ্গুর পদার্থের লোভে ভ্রাতার হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করিবার নির্ম্মম এবং পৈশাচিক অভিপ্রায় কেমন করিয়া মনের মধ্যে স্থান পাইতে পারে তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। ভ্রাতার যে স্নেহবাহু পুষ্পমাল্যের ন্যায় ভ্রাতার কণ্ঠাসক্ত হইয়া থাকিবে, সে বাহু ভ্রাতার প্রাণ নাশার্থ কেমন করিয়া উদ্যত হইয়া উঠিতে পারে, চিরদুঃখী খশ্রুর সমাধির পার্শ্বে বসিয়া সে দিনে বারবার কেবল এই কথাই মনে আসিতে লাগিল; এবং সমাধিপার্শ্বস্থ রক্তিম পুষ্পরাজি রাজপুত্রের তপ্ত শোণিতবিন্দু বলিয়া আমার মনে হওয়ায় সে দিকে ভাল করিয়া চাহিতেও পারিতেছিলাম না।

শ্মশান, সমাধিমন্দির প্রভৃতি স্থানে উপস্থিত হইলে মনের মধ্যে কি এক প্রকার বিষাদ ঘনাইয়া আইসে তাহা বলিয়া প্রকাশ করা যায় না। তাহার উপরে শোচনীয় মৃত্যুর মধ্য দিয়া যাহাদিগের জীবলীলার অকাল অবসান হইয়াছে, সেই সকল লোকের শ্মশানে উপস্থিত হইলে কি গম্ভীর বিষণ্ণতা আসিয়া হৃদয় মন ব্যাকুল করিয়া তুলে, তাহা যাহার তুলে সেই জানে। খশ্রুবাগে বহুক্ষণ বসিয়া রহিলাম বটে, কিন্তু সে স্থানের পরিপার্শ্বিক যাবতীয় পদার্থকে অতিক্রম করিয়া আমার বিষণ্ণ মন ষোড়শ শতাব্দীর সম্পদময়ী দিল্লীনগরী, যেখানে মোগলের রত্নখচিত স্বর্ণসিংহাসন পিতা ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্রের তপ্ত শোণিতে কলঙ্কিত ও মানুষের অস্পৃশ্য হইয়াছিল, তাহারই চতুর্দ্দিকে হাহাকার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। আরও ভাবিতে লাগিলাম যে, যে শাহজাহান প্রাণপ্রিয়জনের দুঃসহ বিয়োগ-বেদনার হৃদয়বিদারী হাহাকার ধ্বনিকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য রাজকোষ শূন্য করিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাঁহারই দ্বারা এই নৃশংস ভ্রাতৃহত্যা কেমন করিয়া সম্ভব হইল? ভাবিয়া কিছুই কূল-কিনারা পাইলাল না। মনে হইল, ইহলোকে যাহারা স্নেহ-প্রীতি প্রেম প্রণয় প্রভৃতি হৃদয়ের কোমল বৃত্তিনিচয়কেই বুকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দেয়, যাহারা স্নেহভাজনের জন্য নিজের পরমায়ু এবং ধর্ম্ম স্বর্গ মোক্ষ প্রভৃতিকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে, সিংহাসন লোলুপ সম্রাট্-নন্দনদিগের সহিত তাহাদের পার্থক্য প্রচুর—সুতরাং খুরম ঔরঙ্গজীব প্রভৃতির মনোভাব বুঝিবার সামর্থ্য আমাদের কোথায়? বিষাদভারাক্রান্ত মন লইয়া সেখান হইতে উঠিলাম। খশ্রুবাগের মালী কয়েকটি ভাল গোলাপ লইয়া একটি তোড়া বাঁধিয়া আমার হাতে দিল, গ্রহণ করিয়া তাহাকে কিছু পারিতোষিক দিলাম। গাড়ীতে আসিয়া ফুলগুলি পার্শ্বের রাখিলাম, হাতে করিয়া রাখিতে পারিলাম না; মনে হইল এগুলি ফুল নহে, ব্যর্থকাম রাজনন্দনের রক্তসিক্ত হৃৎপিণ্ড।

সেখান হইতে গাড়ীওয়ালা আমাকে এলাহাবাদ কলেজ দেখাইতে লইয়া গেল। সে সময়ে কলেজ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, ছাত্র বা শিক্ষক কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। ভাবিলাম, কলেজ ঘরটি দেখিবার ইহাই উপযুক্ত সময়। কলেজের দ্বারবান বেহারা সকলেই উপস্থিত ছিল, অনুসন্ধানে জানিলাম তাহারা অষ্টপ্রহরের চাকর এবং কোন দর্শক আসিলে ইহারাই সমস্ত দেখাইয়া থাকে। আমি যাইবামাত্র দ্বারবান দ্বার খুলিয়া আমাকে সুদীর্ঘ সেলামে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। সেলামের বহর দেখিয়া একবার নিজ পকেটে হাত দিলাম, দেখিয়া লইলাম সঙ্গে কি আছে এবং তদ্দ্বারা দীর্ঘ তসলীমের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিব কি না। দ্বারবান এবং Care-taker বেহারার সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলগুলি ঘর এবং বাগান দেখিয়া লইলাম। কলেজের বাগানে খশ্রুবাগের মত গোলাপ দেখিলাম না, কিন্তু বিলাতী সীজ্‌ন্ (মর্ত্ত্তমা) ফুলের বিচিত্র শোভা এবং বর্ণবৈচিত্র্য সেখানে সেদিনে যেমন দেখিয়াছিলাম, এদেশে তেমন আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। যাহার পরে যে রঙের ফুল বসাইলে চিত্রিত গালিচার মত দেখাইতে পারে, বাগানের অধ্যক্ষ এবং মালীর সৌন্দর্য্যানুভূতি ও যত্নে ঠিক তেমনি করিয়াই সেগুলি বসানো হইয়াছে—বস্তুত দূর হইতে পারস্যের মূল্যবান রেশমী গালিচা বলিয়াই

আমার ভ্রম জন্মিতেছিল।

কলেজের নীচতালা উপর তালার ঘরগুলি দেখা সমাধা হইলে "মেয়ো হল" অথবা টাউন হলের উচ্চ চূড়ায় চড়িয়া সমগ্র এলাহাবাদের শোভা সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য কলেজের বেহারা কর্ত্তৃক আহূত হইলাম। ভাবিলাম ক্ষতি কি, টাউন হলের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিলে বহুদূরব্যাপী জল-স্থলের শোভা দেখা যাইবে এবং এরূপ সুযোগ হয়ত শীঘ্র আর না ঘটিতেও পারে। মন স্থির করিলাম, চড়িব। বেহারার সঙ্গে তথায় গিয়া সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইলাম। প্রথম যতগুলি সিঁড়ি দেখা গেল তাহা বেশ প্রশস্ত। সে সিঁড়ি বাহিয়া যত উচ্চেই হউক উঠিতে কোন কষ্ট হইবার বিশেষ সম্ভাবনা বুঝিতে পারিলাম না। আগে আগে বেহারা—তাহার অনুসরণ করিয়া আমি সিঁড়ি উঠিতে লাগিলাম। যত বাঁক ঘুরি, অনন্ত সোপান শ্রেণী আমার চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। সেগুলির কোথাও বিরাম বিরতি নাই—হাঁপাইয়া উঠিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—"আউর কেত্‌না দূর চড়নে হোগা?" অগ্রবর্ত্তী বেহারার সস্মিত উত্তর আসিল, "থোড়াই দূর আউর।" উড়িষ্যা প্রদেশের ডালভাঙ্গা ক্রোশের মত এই এলাহাবাদী "থোড়া দূর" আর ফুরায় না। তখন বিশ বৎসর প্রায় বয়স, ব্যায়াম-জনিত দৃঢ় শরীর কষ্টসহিষ্ণু, এবং যৌবনের সেই প্রথম প্রারম্ভে হৃদয়ে বিশেষ কোনও 'জখম' ছিলনা—অর্থাৎ "heart sound" ছিল। কিন্তু সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়, সিঁড়ির মধ্যে আলোক প্রবেশের পথ তেমন প্রশস্ত ছিল না। আমার চক্ষুর জ্যোতিও তার্ক্ষ্যতুল্য নহে, আরোহণ কালে প্রত্যেক সিঁড়িটি চক্ষুর নিকটে আইসে, কিন্তু অবরোহণ সময়ে তাহা হয় না—প্রতি ধাপ চক্ষু হইতে দূরেই থাকে, সুতরাং নামিবার সময়ে আমার কি দুর্গতি হইবে সে কথা বারবার মনে আসিতে লাগিল। কিন্তু সে সময়ে অর্দ্ধপথ হইতে ফেরাও সহজ নহে, সে ইচ্ছাও হইল না; কারণ তাহা হইলে বেহারার নিকট অপারগতা প্রকাশ হইয়া তজ্জনিত লজ্জা পাইতে হইবে—বিশবৎসর বয়সে সে লজ্জা কেহ কি স্বেচ্ছায় স্বীকার করিতে পারে, না করে? যাহা হউক, ইষ্টক নির্ম্মিত এই প্রকার তিনটি সোপানশ্রেণী, সংখ্যায় কত কে জানে কোন ক্রমে উর্দ্ধশ্বাস হইয়া উঠিলাম। দেখি তখনও শেষ হয় নাই—কাষ্ঠনির্ম্মিত আরও তিনটি সোপানশ্রেণী তাহাদের অপ্রশস্ত বক্ষ বিস্তার করিয়া আমার সবুট চরণপদ্মের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিতেছে। কাষ্ঠনির্ম্মিত সোপান বলিলাম বটে, কিন্তু বস্তুত সেগুলি কলিকাতার ভাড়া-বাড়ীর গোসলখানায় যাইবার জন্য মেথরের 'কাঠের মই' অপেক্ষা কোন অংশে ভাল ত নহেই, বরং মন্দ—কেননা মেথরের সিঁড়িতে পা দিলে সেগুলি তেমন করিয়া কাঁপেও না, পায়ের নীচে দল্‌দলও করে না।

সম্মুখে এই দুরারোহণীয় সোপানশ্রেণী দেখিয়া দাঁড়াইলাম। বেহারা পুনরায় ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, "আইয়ে বাবুজি, বহুৎ মেমলোক মজেছে চড় যাতেঁহে, আপ্ ডরতে কাহে কো?" মনে মনে কহিলাম, ওরে বাপু, "মেমলোক" যেখানে মজেছে চড়িতে পারেন, সেখানে আমাদের চড়িতে হৃৎকম্প ও পদস্খলন হইবে সে আর বিচিত্র কথা কি? প্রকাশ্যে কহিলাম, "মেমলোগোঁকি বাত্ দুসরা।" সে কি বুঝিল জানি না। উত্তর করিল, "হাঁ ইয়ে বাত্ সাচ হ্যা, মগর খালি মেমলোগ নাহি, আপনা হিন্দুস্থানী আওরতোঁভি বহুৎ আসানি সে চড়তেহেঁ। আপ্‌কো ডরনা নাহি চাহিয়ে।"

এ কথার আর উত্তর কি দিব? মনের ভাব মনেই চাপা দিয়া, দুর্গানাম স্মরণ করিয়া বেহারার পশ্চাতে সাবধানে সেই কাষ্ঠনির্ম্মিত সোপানাবলী আরোহণ করিতে লাগিলাম। আমার পথ-প্রদর্শক বেহারাটি গর্ব্বভরে দ্রুত সোপান আরোহণ করিতে লাগিল। তাহার পদভরে কাষ্ঠখণ্ড এমন ভাবে কম্পিত হইতে লাগিল যে আমার ভয় হইল, সেই কম্পনেই বুঝি বা আমি সিঁড়ি হইতে

পড়িয়া যাইব। কাষ্ঠের এই তিন শ্রেণী সোপান যত উর্দ্ধে উঠিয়াছে, ততই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়াছে। সর্ব্বশেষ সোপানগুলি এত ক্ষুদ্র যে, কোন মতে কায়-ক্লেশে একজন লোক তাহার উপর দাঁড়াইতে পারে। দুঃখের উপর দুঃখ এই যে, দুইটি সোপানের মধ্যে যে ফাঁক আছে, তাহা তক্তা দ্বারা বন্ধ করা হয় নাই। সুতরাং সেই ছিদ্রপথে আরোহণকারীর পাতালপুরী দর্শনের কোন ব্যাঘাতই ঘটে না। সমাগত-প্রায় সন্ধ্যার ক্ষীণালোকে হঠাৎ আমার চক্ষু একবার ছিদ্র-পথে পাতাল দর্শন করিয়া লইল। পতন হইলে কোথায় যাইতে হইবে, তাহা দেখিতে পাইয়া আমার সর্ব্বশরীরের মধ্যে যে স্তম্ভ, স্বেদ, বেপথু ও রোমাঞ্চ প্রভৃতির সঞ্চার হইল, তাহা যে সাত্বিকভাব-জনিত নহে, একথা শপথ করিয়াই বলিতে পারি।

যাহা হউক অল্প পথই বাকী ছিল, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে কম্পিত পদে কোনমতে গিয়া সেই মন্দিরচূড়ার শিখর-দেশে পঁহুছিলাম। পঁহুছিবার পরে শ্বাসকষ্ট যে পরিমাণে উপস্থিত হইয়াছিল, লোকের মৃত্যুকালের নাভিশ্বাসও তেমন কষ্টদায়ক কিনা বলিতে পারি না, কারণ আমার সে অভিজ্ঞতা জন্মিবার হেতু আজিও উপস্থিত হয় নাই। ক্রমে সন্ধ্যা ঘোর হইয়া আসিবার উপক্রম হইল; শ্রান্তি-জনিত কষ্টেরও সত্বর নিবৃত্তির সম্ভাবনা বড় দেখিতে পাইলাম না। সন্ধ্যার অন্ধকারে এই একচক্ষু মানবকে ঐ মন্দির চূড়ার শিখরদেশ হইতে মর্ত্তধামে অবরোহণ করিতে হইবে এই ভাবনা বারম্বার মনের মধ্যে আসিয়া, উচ্চস্থান হইতে প্রয়াগের নৈসর্গিক শোভা নিরীক্ষণের স্পৃহা মন হইতে দূরে তাড়াইয়া দিতে লাগিল। বেহারা তাহার দক্ষিণবাহু তুলিয়া এলাহাবাদ সহর, গঙ্গাযমুনার সঙ্গম ক্ষেত্র এবং এলাহাবাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামগুলির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য গর্ব্বভরে দেখাইতে লাগিল, কিন্তু দর্শকের মন তাৎকালীন যে কোথায়, সে তত্ত্ব কেবল অন্তর্যামী যিনি তিনিই জানিয়াছিলেন। আমি কোন প্রকারে তাহার জন্মভূমির সৌন্দর্য্যের সালঙ্কার বাণীগুলির সমর্থন করিয়া, শীঘ্র শীঘ্র তথা হইতে স্থিরা ধরিত্রীর অচঞ্চল বক্ষে নামিয়া আসিবার জন্য ব্যগ্র হইতে লাগিলাম। সে যখন দেখিল তাহার শ্রোতার মনোযোগ অন্যত্র, তখন নিতান্ত হতাশ ভাবে তাহার বর্ণনচাতুর্য্য সে ক্রমে কম করিয়া আনিয়া এক স্থানে শেষ করিবার উপ-ক্রম করিতেই, আমি সিঁড়ির দিকে সত্বর পাদক্ষেপে অগ্রসর হইলাম।

সিঁড়ির নিকটে আসিয়া দেখি, উঠিবার সময়ে যেটুকু আলো ছিল, তখন তাহাও নাই, সমস্ত পথ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার অস্পষ্টালোক সেখানে থাকিলেও, আমার ন্যায় দৃষ্টিক্ষীণ লোকের পক্ষে সে স্থান হইতে অবরোহণ নিতান্ত কষ্টকরই হইত। তাহার উপরে যখন সেই সঙ্কীর্ণ কাষ্ঠ সোপানশ্রেণী গাঢ় অন্ধকারে আবৃত দেখিলাম, তখন যথার্থই আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। প্রয়াগে প্রাণ বহির্গত হইলে শাস্ত্রানু-সারে দেহমুক্ত জীবাত্মা কোন্ লোকে প্রয়াণ করে তাহা আমার জানা ছিলনা, আজও সে বিষয়ে কোন জ্ঞান আমার জন্মে নাই, কিন্তু সে দিনে এবং সেই সান্ধ্যক্ষণে ইহা বুঝিয়াছিলাম যে গঙ্গাযমুনার সঙ্গম স্থলে তাহার নির্ম্মল স্রোতে তনুত্যাগ হইলে যাহাই হউক না কেন, Tower Hallএর অন্ধকার সিঁড়িঘরের মধ্যে পদস্খলন হইয়া মৃত্যু ঘটিলে শাস্ত্রে সেটাকে অপমৃত্যু বলিবেই। সকল সময়ে এবং সকল অবস্থাতে এই দুঃখের ধরণীর ব্যর্থ জীবন হইতে মুক্তিলাভ মানবের পক্ষে বাঞ্ছনীয় বা অবাঞ্ছনীয় সে কথার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়াছে কিনা জানিনা, কিন্তু সেই অপ্রাপ্ত-বিংশতি-বর্ষে সমাসন্ন যৌবনের বিচিত্র বর্ণোজ্জ্বল দিনে মৃত্যু বা অপমৃত্যু কিছুই বাঞ্ছনীয় বলিয়া আমার মনে হয় নাই। সুতরাং নিরাপদে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি অভগ্ন অবস্থায় সঙ্গে লইয়া ধরণী মাতার ক্রোড়ে নামিবার জন্য সেদিনে আমার মনে যে ব্যগ্রতা উপস্থিত হইয়াছিল, জননীক্রোড়ে যাইবার জন্য আপদাত শিশুর মনেও তেমন ব্যগ্রতা হয় কিনা নিশ্চয় করিয়া তাহা বলিতে পারি না।

নিজের বুদ্ধিবিবেচনাকে শত ধিক্কার দিয়া, অবিমৃষ্যকারিতার জন্য নিজকে নির্দ্দয়রূপে

লাঞ্ছিত করিয়া, নামিবার উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার পথপ্রদর্শক লোকটিকে আগে আগে নামিতে বলিলাম, উদ্দেশ্য, যদি পদস্খলন হয় তাহা হইলে ঐ ভোজপুরী জোয়ানের পীঠে হয়তো আটকাইয়া গিয়া প্রাণরক্ষা হইতেও পারে। অকুল সমুদ্রে পড়িয়া তৃণ ধরিয়া প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টার মত এ চেষ্টা যতই হাস্যাস্পদ হউক, তখন এ উপায়টিও মহৎ উপায় বলিয়া আমার মনে হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে কয়েক সিঁড়ি নামিবার পরে আমার কম্পিত দেহের ভারে সিঁড়িটি এমন সজোরে কাঁপিতে লাগিল যে, নিজকে রক্ষা করা তখন অসাধ্য বলিয়াই মনে হইয়াছিল। হাতে একখানি ছড়ি থাকায়, দুই হাতে সিঁড়ি চাপিয়া ধরিব সে উপায় আমার ছিলনা। তখন মনে হইল যে একহাতে ঢাল ও একহাতে তরবারি লইয়া বাঙ্গালী যে 'বেহাত' হইয়া পড়িবার প্রবাদ আছে তাহা নিতান্ত মিথ্যা নহে।

যোড়করে আমার পাঠক পাঠিকাদের নিকট সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি, সে দিনে যেমন করিয়া সেই বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়াছিলাম তাহার যথাযথ বর্ণন এখানে করিব—কেহ যেন তাহা পড়িয়া হাসিবেন না। যখন হাতের ছড়িখানি আমাকে 'বেহাতী' করিতেছে দেখিলাম, তখন সেখানি দুইটী সোপানের মধ্যস্থিত ফাঁক দিয়া নীচে ফেলিয়া দিলাম। পায়ে জুতা থাকায় সিঁড়িতে পদস্খলনের সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া, সেই অন্ধকারে কাঠের সোপানের উপর বসিয়া জুতা খুলিয়া পূর্ব্বোক্ত উপায়ে তাহাও নীচে নিক্ষেপ করিলাম। বাকী উত্তরীয় খানিকেও সেই পথে প্রেরণ করিয়া, পরিধেয় কোঁচানো কাপড়কে 'মালকচ্ছ' করিয়া পরিয়া লইলাম এবং সোপানের উপর আর না দাঁড়াইয়া, বসিয়া বসিয়া, শিশুতে যেমন করিয়া সোপান অবরোহণ করে, অবিকল তদ্রূপ করিয়া, বহুবিলম্বে হস্তপদ এবং অন্যান্য অঙ্গের সাহায্যে ঘর্ম্মাপ্লুত দেহে ধরিত্রীর বক্ষে অবতীর্ণ হইলাম। আমার সঙ্গীয় বেহারা বহুপূর্ব্বে নামিয়া আসিয়া, আমার বিলম্ব দেখিয়া বারম্বার চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল "বাবুজি, আইয়ে।" বাবুজি তখন কি অবস্থায় কেমন করিয়া আসিতেছেন তাহা সে বেচারী জানেনা, মনে হইতে লাগিল সে যেন না দেখে। কিন্তু আমার ইচ্ছাতেই ত আর সমস্ত কার্য্য হইবে না! যখন হস্ত পদ এবং নিতম্বের সাহায্যে এই মালকচ্ছধারী বঙ্গবীর ভূমিস্পর্শ করিয়া বাঁচিল, তখন সম্মুখেই সেই বেহারা দণ্ডায়মান, যে বলিয়াছিল "আউরত্ লোগোঁভি বহুত আসানিসে চড়্ যাতেঁহে, আপ্‌কো ডরনা নাহি চাইয়ে!" যতক্ষণ পদস্খলনজনিত পতন ও তদ্ধেতু মৃত্যুর সম্ভাবনা ছিল, ততক্ষণ লজ্জা মনের ধারে কাছেও ছিল না। বরং মনে হইতেছিল, লজ্জা তো স্ত্রীলোকের মনের ধর্ম্ম এবং তাহাদেরই পক্ষে শোভন, পুরুষের লজ্জা থাকাই উচিত নহে, সুতরাং অন্ধকারে যেখানে প্রাণনাশের সম্ভাবনা আছে সেখানে "হামাগুড়ি" দিয়া নামায় আর লজ্জা কি! এই প্রবল ও সারবান্ যুক্তির বলে, সোপান অবরোহণ কালে হস্ত পদ এবং অন্যান্য অঙ্গের সাহায্য লইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করি নাই, কিন্তু সম্মুখে সেই সস্মিত বেহারাটাকে দেখিয়া মনের মধ্যে কেমন যেন বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু এই স্ত্রীজনোচিত মনোভাবটাকে বড় বেশী আমল দিলাম না। হঠাৎ জুতা চাদর এবং ছড়ির খোঁজে একান্ত মনঃসংযোগ করিয়া সিঁড়ির নীচে সেই সকল জিনিসের অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলাম। ভাবটা এমন দেখাইলাম, যেন কিছুই অস্বাভাবিক হয় নাই, এবং এরূপ অবস্থায় ঐরকম না করিয়া যদি অন্যপ্রকার কিছু করিতাম—অর্থাৎ দাঁড়াইয়া নামিবারই চেষ্টা করিতাম—তাহা হইলে সেইটাই হইত লজ্জাকর এবং নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। আমি যতই কেন 'সাফাই' হইবার চেষ্টায় আমার নির্ব্বাক যুক্তি সকলের অবতারণা করি না, সেই বেহারাটা আমার সহিত যখন জুতা চাদর ও ছড়ির আবিষ্কারে নিযুক্ত ছিল, তখন আমার মনে হইতে লাগিল, যেন সে তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া আমাকে বলিতেছে—"ছিঃ ছিঃ বাবুজি, তোম্ আওরতোঁসে ভি বত্তর্।" মনে মনে কহিতে লাগিলাম, —"ভাব তুমি তোমার যাহা ইচ্ছা; তুমি কি ভাবিবে সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া আমি আমার প্রাণটা এই অস্থানে অকারণে এবং অসময়ে দিব এমন কিছু প্রতিজ্ঞা করিয়া

বাটী হইতে বাহির হই নাই।” আর,করিয়াছিই বা কি? লজ্জা, স্ত্রীলোকের যাহা ভূষণ, পুরুষ আমি সেই পদার্থটাকে কিছু কালের জন্য ত্যাগ করিয়াছিলাম—বাঙ্গালীর জীবনে ইহা একটি নিত্য ও নৈমিত্তিক ঘটনা এবং বহুকাল হইতে ইহা চলিয়া আসিতেছে, আজ নূতন নহে। সেই বেহারাটা কি ভাবিয়াছিল তৎপ্রতি লক্ষ্য সেদিনও করি নাই, আজও করিতেছি না; কিন্তু আমার এই পুরুষোচিত লজ্জাত্যাগের যথাযথ সত্য বর্ণন শুনিয়া আমার পাঠক-পাঠিকাগণ না হাসেন এবং আমাকে অপদার্থ মনে না করেন, ইহাই তাঁহাদিগের নিকট আমার বিনীত মিনতি। আমার নব্য পাঠকদিগের মধ্যে কেহ কেহ আমার সেদিনের লজ্জাত্যাগের কথা পড়িয়া আমার প্রতি অশ্রদ্ধার কটাক্ষপাত যদিই বা করেন, তাঁহাদের নিকট আমার বক্তব্য এই—বালক কালের চাণক্যের বচনে যে পড়িয়াছিলাম “আত্মানং সততং রক্ষেৎ”, তাহা যদি ভুলিবই, তবে হিন্দু হইয়া ভারতবর্ষে জন্মিয়াছিলাম কেন? ভারতীয়গণের সদ্‌গুণরাজির মধ্যে আজ শ্রেষ্ঠগুণ দাঁড়াইয়াছে—পদে পদে শাস্ত্রবচন মানিয়া চলা এবং আত্মাকে সতত রক্ষা করা, তাহা যে উপায়েই হউক; এবং সেজন্য আর যে কেহ মরুক বা বাঁচুক তাহাতে কিছুই আসে যায় না।

যাক্—কোনমতে প্রাণ লইয়া সেই উচ্চ মন্দির চূড়া হইতে সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর অচঞ্চল ক্রোড়ে নামিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। চৈত্রের বসন্ত-বায়ুহিল্লোলে শ্রম এবং ভয়জনিত ঘর্ম্মের অপনোদন করিলাম। বেহারাটার সাহায্যে ছড়ি জুতা চাদর খুঁজিয়া বাহির করিলাম, মালকচ্ছ ঘুচাইয়া আবার বাঙ্গালী বাবুর মত কোঁচা দিয়া কাপড় পরিলাম এবং কথায় বার্ত্তায় এমন ভাবটা দেখাইতে লাগিলাম যে যেন অস্বাভাবিক কিছুই ঘটে নাই, এক্ষেত্রে সকলে যাহা করিত আমিও তাহাই করিয়াছি।

তাহার পরে তথা হইতে বিদায়ের পালা আসিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে; গাড়ীওয়ালাকে বাতি জ্বালাইতে দেখিয়া মনে হইল, tower হইতে অন্ধকারে নামিবার সময়ে যদি মনে হইত যে গাড়োয়ানের গাড়ীতে মোমের বাতি আছে, তাহা হইলে ঐ বেহারাটাকে দিয়া বাতি লইয়া গিয়া তাহারই আলোকে নামিবার উদ্যম করিলে আমার এতটা কষ্ট না হইতে পারিত। অন্ততঃ দাঁড়াইয়াই নামিতে পারিতাম, সিঁড়ি নামিবার সময়ে শিশুর মত ব্যবস্থা করিবার হয়ত প্রয়োজন হইত না। যাক্, যাহা হয় নাই তাহা ভাবিয়া আর ফল কি? কথায় বলে “গতস্য শোচনা নাস্তি মৃতস্য মরণং যথা।”

গাড়ীওয়ালার প্রদীপ জ্বালা হইলে আমি ধীরপদে সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম,Tower Hallএর Caretaker সেই বেহারা আমার গতিরোধ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল এবং লম্বা সেলাম দিয়া তাহার দক্ষিণ করতল পাতিয়া আমার দিকে যেন একটু বাড়াইয়া দিল,—অর্থাৎ নীরবে কহিল, “বাবুজি, আমি যে অনেক আশা করিয়া তোমার সঙ্গে মন্দিরের উচ্চ শিখরদেশে উঠিয়াছি এবং তথা হইতে নামিয়াছি।” আমিও জানিতাম, প্রয়াগের প্রাকৃতিক শোভা নিঃস্বার্থভাবে আমাকে দেখাইবার জন্য সে এতটা ক্লেশ করে নাই,তবে তাহার চাহিবার রকমটা দেখিবার ইচ্ছায় আমি এতক্ষণ বিলম্ব করিতেছিলাম। আমি পকেটে হাত দিয়া তাহার মুখের দিকে আর একবার চাহিয়া দেখিতে চেষ্টা করিলাম যে তাহার মুখে পূর্ব্বের সেই সস্মিত ভাব আছে কিনা। দেখিলাম, সে সকল কিছুই নাই, আছে কেবল তাহার দুইচক্ষু ভরিয়া দরিদ্রের যাচ্ঞা। পকেট হইতে যাহা উঠিল তাহা তাহার হাতে দিলাম। কি দিলাম তাহা ঠিক মনে নাই, তবে গুটিকত টাকার সঙ্গে সিকি আধুলিও দুই চারিটা উঠিয়া পড়িয়াছিল, সে কথাটা আজও মনে আছে। তাহার কারণ, বক্‌শীস দিতে সিকি আধুলি প্রায়ই কেহ দেয় না; আমার এই দানটা কিছু অদ্ভুত রকম হইল বলিয়া আজও তাহা মন হইতে মুছিয়া যায় নাই।

সে দিনের ভ্রমণ শেষে বাসায় গিয়া অহারাদি সমাধা করিয়া নিদ্রার চেষ্টা দেখিলাম। ঘুমাইয়া পড়িতে অনেক বিলম্ব হইল, কেবলি নির্দ্দয়রূপে নিহত থরুর সেই নির্জ্জন সমাধি-সংলগ্ন প্রস্তর ফলক বারবার আমার চক্ষুর সম্মুখে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল,

রাজপুত্র হইলেই সুখসৌভাগ্য আসিয়া আপনিই ধরা দেয় না, তাহাকে পাইতে হইলে আরও কিছু চাই—এবং তাহা কি? অদৃষ্ট না পুরুষকার? খশ্রুর দুর্দ্দশা দেখিলে, সকল বিষয়ে শুভাদৃষ্টের প্রয়োজন বলিয়া জ্ঞান হয়। আবার খুরম বা ঔরঙ্গজীবের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে, পুরুষকারের অসাধ্য কর্ম্ম জগতে অতি বিরল বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। এই দৈব ও পুরুষকারের দ্বন্দ্ব কতক্ষণ চলিল তাহা মনে নাই। বহুক্ষণ ধরিয়া মন ইহা লইয়াই ব্যস্ত ছিল, কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি জানিনা। যখন জাগিলাম, তখন চৈত্রের নীল নির্ম্মল গগনে অরুণ-সারথির আলোক রথ দেখা দিয়াছে এবং বিহঙ্গের কল-কাকলিতে আকাশ বাতাস সমস্ত মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

এলাহাবাদে তিনদিন কাটিয়া গেল। এলাহাবাদের প্রধান দর্শনীয় যে সকল তাহা একরূপ দেখিয়া লইলাম। আর সেখানে মন টিকিতেছিল না; অন্য কোথাও যাই মনে হইতেছিল। কোথায় যাইব ভাবিতে লাগিলাম। যাইবার ত অনেক স্থানই আছে, ভারতবর্ষে দেখিবার সামগ্রীর অভাব নাই। কিন্তু ঐ খশ্রুর সমাধিটা মনের মধ্যে কি একটা ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিল তাহা আজ বিশ্লেষণ করিয়া বলিবার সাধ্য আমার নাই। সেই সূত্র অবলম্বন করিবার ইচ্ছা হইতে লাগিল, মোগল পাঠানের লীলা-নিকেতন আগ্রা দিল্লীটা সর্ব্বাগ্রে দেখিতে লইতে হইবে। মুখ হাত ধুইয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া ষ্টেশনের দিকে চলিলাম। ইচ্ছা, এক খানি টাইম্ টেবল আনিব। কোন ট্রেণে কখন কোথায় গেলে সুবিধা মত সময়ে যাত্রা করা এবং গন্তব্য স্থানে পৌছান যায়, তাহাই দেখিয়া লইব। সঙ্গীয় আমলা ভগবতীচরণ বাজার করিতে যাইবে, সেও আমার সঙ্গে লইল। দুজনে কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে পদব্রজে রওনা হইলাম। কিছুদুর গিয়া শ্রান্তিবোধ হওয়ায় একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে চড়িয়া বসিলাম। ভগবতীচরণের বাজার শেষ হইলে, মাছ তরকারী কফি কড়াইশুটি গাড়ীর ছাদে বোঝাই দিয়া, দুইজনে ষ্টেশনে গিয়া অবতীর্ণ হইলাম।

তখন বেলা প্রায় নয়টা হইবে,—এলাহাবাদে অনেক দিক হইতে অনেক গাড়ী প্রায় রাত্রিদিন ধরিয়াই আসিতেছে যাইতেছে, তাহার বিরাম নাই—ঠিক সেই সময় কোথা হইতে একখানি গাড়ী আসিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইল। নানা প্রকারের যাত্রী—কেহ সেইখানেই নামিল, কেহ বা হস্তমুখ প্রক্ষালনের জন্য ষ্টেশনস্থিত জলের কলের দিকে উর্দ্ধ্বশ্বাসে ছুটিল, কেহ বা খাবারওয়ালার সঙ্গে দরদস্তুর লইয়া মহা বাগ্‌বিতণ্ডা সুরু করিয়া দিল। এই বিপুল জনসঙ্ঘের সম্মিলিত সমোচ্চ সুরের কলকোলাহলে ষ্টেশনঘর সরগরম হইয়া উঠিল। আমরা নিজেরা যখন কোথাও যাই, তখন রেলযাত্রীর দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি ও তারস্বরে গলাবাজির দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষিত হইতে পায় না, কারণ আমরাও সেই হট্টগোলে যোগদান করি। আজ আমার কোথাও যাইবার ছিল না, কেবলমাত্র দর্শকরূপে ষ্টেশনের বড় একটি থামের পার্শ্বে নীরবে দাঁড়াইয়াছিলাম, সুতরাং যাত্রীলোকের এই হাস্যকর হস্তপদবিক্ষেপ এবং বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় উচ্চৈস্বরে চীৎকারের দিকে সম্পূর্ণ মন দিবার অবসর পাইয়াছিলাম। তাই সমস্তই আমার নিকট বড় অদ্ভুত বোধ হইতে লাগিল। দেখিলাম, আমরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত চীৎকার করি। আমাদের ছুটাছুটি দরকারের মাত্রা ছাড়াইয়া বহুদূরে চলিয়া যায়। কুলী মালপত্র লইয়া সঙ্গেই রহিয়াছে, তথাপি নিষ্কারণে তাহাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিয়া তাহার সহিত তুমুল কাণ্ড অনর্থক বাধাইয়া তোলা হয়। সঙ্গীয় নারীগণ পরস্পরের অঞ্চলপ্রান্ত প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া উর্দ্ধশ্বাসে অভিভাবক পুরুষের পশ্চাতে দৌড়িতেছে, তথাপি পুরুষপ্রবর প্রস্তরমূর্ত্তি ধরিয়া বেচারিদিগের উদ্দেশ্যে অজস্র ভর্ৎসনা বর্ষণ করিতেছেন এবং ভবিষ্যতে তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া অন্য কোথাও যদি যান, তাহা হইলে তাঁহার উর্দ্ধতন কয়পুরুষের কি একটা হইবে বলিয়া বারম্বার ভয় দেখাইতেছেন। এ সকলের কিছুই প্রয়োজন নাই, যতটা সোরগোল সেখানে হয় দেখিলাম, তাহার শতভাগের একভাগও দরকার হয় কি না সন্দেহ। কিন্তু পাছে গাড়ী ছাড়িয়া যায়, দ্রব্যজাত কুলীতে চুরি

করে সঙ্গীরা পশ্চাতে পড়িয়া থাকে, টিকিট হারায়, গাঁট কাটায় পকেট কাটে—এই সকল নানা অকারণ ভাবনায় অধীর হইয়া আমরা ষ্টেশন ঘরটিকে ভাঙ্গা রাসের মেলা অপেক্ষাও মুখর করিয়া তুলি। ভগবতীচরণকে বলিলাম, "দেখ হে, নিষ্কারণে লোকে কত গোলযোগ করিতে পারে!" সে মৃদুস্বরে বলিল, "কথা তো ঠিক, তবে সে সময়ে মনে থাকে কই? আর শুধু কি এই সকল লোকেই অকারণে গোলমাল করে? কাথাও যাইবার সময় আপনার বকুনিতেও ত আমাদের প্লীহা চমকাইয়া উঠে।" কথাটা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও কতক পরিমাণে সত্য, সুতরাং এবিষয়ে তাহার সহিত আর কোন বাক্যালাপ করা নিরাপদ মনে করিলাম না। যাহারা এখানেই নামিবার তাহাদের নামা যখন শেষ হইল, এখান হইতে যাহারা উঠিবে তাহারা যখন উঠিয়া লইল, এবং যাহারা ক্ষণকালের জন্য নামিয়াছিল তাহারা যখন নিজ নিজ অধিকৃত স্থান পুনঃপ্রাপ্ত হইল, তখন গোলমাল যেন কতক কমিয়া আসিল।

আমি টাইম টেবল কিনিবার জন্য যাইতে উদ্যত হইয়াছি, তখন দেখি সেই আমার প্রথম দিনের বন্ধু, যিনি আদর করিয়া আমাকে যাত্রীনিবাসে লইয়া গিয়া উচ্চমূল্যে অপথ্য দিয়া বিদায় দিয়াছিলেন, তিনি আর কয়টি লোকের সঙ্গে ষ্টেশন হইতে বাহির হইতেছেন। আমাকে দেখিয়া, কি জানি কি জন্য, একটি নমস্কার করিয়া পাশ কাটাইলেন। ভগবতী ছাড়িবার পাত্র নহে—সে হাঁকিল—"কি মশায় আবার শীকার জুটেছে নাকি?" সে ইহার কোনও উত্তর না দিয়া আমার দিকে এমন ভাবে তাকাইল, যাহার অর্থ আমি বুঝিলাম, "মহাশয়, আপনার লোকটিকে নিষেধ করুন, তিনি যেন গরীবের রুজি মারিবার বন্দোবস্ত না করেন।" আমি ভগবতীকে চক্ষুর ইঙ্গিতে বারণ করায় সে থামিয়া গেল। ভাগ্যক্রমে সেই লোকগুলি বাঙ্গালা বুঝে না, বোধ করি ভাবিল বাঙ্গালী-বাঙ্গালীতে আলাপ-আপ্যায়ন হইতেছে। উহারা চলিয়া গেলে আমি ভগবতীকে বলিলাম, "কেন লোকের রুটী মারিবার পন্থা করিতেছিল?" সে বলিল, "ওরূপ বদমাইসের রুটী মারায় অধর্ম্ম হয় না—ও জুয়াচোর, লোক ঠকাইয়া খায়।" আমি কহিলাম, "একজন একবারই ঠকে, তাহাতে তাহার বিশেষ ক্ষতি হয় না; কিন্তু ও লোকটার দিন গুজরাণ হয়।" ভগবতী কহিল, "মন্দ নহে! তাহা হইলে নিত্য নূতন লোকের ঘরে চুরি করিলে কোম্পানীর আইনে আমার ফাটক হওয়াও উচিত নহে।"—দেখিলাম আমার পক্ষ সমর্থন করা কঠিন হইবে, রণে ভঙ্গ দেওয়াই শ্রেয়ঃ; ভগবতীকে সেইখানে রাখিয়া ষ্টেশন ঘর হইতে টাইম টেবল লইয়া দুইজনে বাসায় ফিরিলাম।

দ্বিপ্রহরের আহারান্তে টাইম টেবেল সাহায্যে স্থির করিলাম, প্রথমে আগ্রায় যাইব, তাহার পরে দিল্লী। সেইদিন বৈকালে আমার উপকারী বন্ধু গুড্‌ম্যান দিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় হইতে গেলাম। ফিরিবার পথে আর একবার অস্তমান রবি-কিরণানুরঞ্জিত গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমতীর্থ চক্ষু ভরিয়া দেখিয়া লইলাম। পরদিবস বাড়ীভাড়া এবং ঠিকা চাকর ইত্যাদির বেতনাদি চুকাইয়া দিয়া, রাত্রের একটা ধীর মন্থর গাড়ীতে আগ্রা যাত্রা করিলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

গ্রন্থ-সমালোচনা

সতুর মা। (গল্পগ্রন্থ)—শ্রীমতী চারুবালা সরস্বতী প্রণীত। কলিকাতা ৭১।১নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১নং ক্লাইভ রো শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ২০৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ১।০

বহিখানি পাঠ করিয়া দেখিলাম, সব গল্পগুলিই মনোহর হইয়াছে। গল্প লেখায় এবং চরিত্রাঙ্কনে লেখিকার বেশ নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পগুলির উদ্দেশ্য ও ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। ভাষায় তাঁহার অধিকার আছে। গ্রন্থসন্নিবিষ্ট গল্পগুলির মধ্যে 'সতুর মা', 'অলক্ষণা', 'মিলন' এবং 'বীণার বিবাহ' সুন্দর হইয়াছে। প্রথম গল্প "সতুর মা" এই গ্রন্থের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গল্প—ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গল্পটি পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। স্থানে স্থানে অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারি নাই। নবদুর্গা বা সতুর মার চরিত্র লেখিকা যে ভাবে ও যে আদর্শে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা দেবী চরিত্র বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সতুর মার চরিত্রে গ্রন্থকর্ত্রী আমাদিগকে অমূল্য শিক্ষালাভের সৌভাগ্য ও সুযোগ দান করিয়াছেন।

গ্রন্থবর্ণিত অপরাপর চরিত্রগুলিও বেশ স্বাভাবিক এবং চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। পুস্তকখানির কাগজ ছাপা ও বাঁধাই পরিপাটী, মূল্যও অধিক নহে।

স্তবক ও কোরক। (কবিতাগ্রন্থ) শ্রীরমণীরঞ্জন বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। কলিকাতা ১৮ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, নিউ ব্রিটেনিয়া প্রেসে মুদ্রিত এবং ১নং বুদ্ধিষ্ট টেম্পল লেন, "গুণালঙ্কার লাইব্রেরী" হইতে প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ১৭২ পৃষ্ঠা, মূল্য ৸০

ইহা একখানি সাধারণ শ্রেণীর কবিতা পুস্তক। দুঃখের বিষয়, পাঠ করিয়া প্রশংসার কিছুই পাইলাম না। অধিকাংশ কবিতাই নীরস, ভাবে গভীরতা ও সরসতা নাই। আদ্যোপান্ত ধৈর্য্য রক্ষা করিয়া পাঠ করা কঠিন হইয়া উঠে। ভাষাও অনেক স্থলে উপযোগী হয় নাই, ছন্দের প্রতিও লক্ষ্য কম।

কবি গ্রন্থের মুখবন্ধে বলিয়াছেন, "কতিপয় বিশিষ্ট কবির ভাবাবলম্বনে 'স্তবক ও কোরকের' কয়েকটি কবিতা রচিত হইয়াছে।" আমরাও দেখিলাম, কেবল সেই কয়টি কবিতাই অপেক্ষাকৃত পাঠযোগ্য হইয়াছে। "প্রার্থনা", "নদীসৈকতে", "অন্বেষণ", "আমার বাসনা", "হল না আমার" এবং "অনাথিনী" শীর্ষক কবিতা কয়টি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। অবশিষ্ট গুলিতে গ্রন্থকারের কাঁচা হাত বড় স্পষ্ট। আমরা কয়েকটী কবিতার কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাই ;—

কবি "জন্মভূমি" শীর্ষক কবিতায় বলিতেছেন,—

> হে মোর স্বদেশ! তোরে কৃতাঞ্জলি পুটে
> নমি বার বার, তুই রে মা! প্রকৃতির
> লীলা নিকেতন, বসন্তের কান্ত হাস্য,
> শরতের প্রফুল্ল জোছনা, অবিরত
> তমোময় নিশাকালে, বিদূরিয়া ধ্বান্ত
> নিজবলে, করে সমধিক কান্তিময়
> তোমার সুঠাম দেহ......

"তুই রে মা," "বিদূরিয়া ধ্বান্ত নিজ বলে" বড়ই নীরস এবং শ্রুতিকটু।

তার পর কবি বলিতেছেন,—

> "যাহার (গঙ্গার) পুলিনে আরামের আশে—.
> বাস করে সদা কত সাধু যোগী গণ।"

সাধু যোগিগণ কি কেবল আরামের আশেই গঙ্গা পুলিনে বাস করেন?

"ভারতের অপূর্ব্ব সৌভাগ্য" কবিতায় রাজা রাণীর ভারতে আগমন উপলক্ষে কবি লিখিতেছেন,—

> "এস পিত! এস দেব! জননীর সনে,
> তোমাদের আর্য্যভূমি ভারত সদনে,
> লও পূজা ভক্তি অর্ঘ্য সেই নিকেতনে,
> দুঃখ দৈন্য নিবারহ, চুম্বিয়ে সঘনে॥"

কি বিড়ম্বনা! এ যে উৎকট ও অদ্ভুত রাজভক্তি!

"আয় অশ্রু আয়" কবিতায়,—

> "তোরে অশ্রুধার করেছি সেতার,
> জীবন সম্বল নব।"

অশ্রুধারার সহিত সেতারের উপমা ইতিপূর্ব্বে শুনা যায় নাই।

তারপর "কবি ও কবিতায়"—

> কল্পনা মধুর ভাণ্ড কবিতা মৌচাক।
> কবিগণ ভেঙ্গে মধু করিছে অবাক।

বর্ত্তমান কবির এ মৌচাকে আমরা কিন্তু বিন্দুমাত্র মধু পাইলাম না,—পাইলাম মধুভাঙ্গা শুধু চাক, সুতরাং বাধ্য হইয়াই আমাদিগকে অবাক হইতে হইয়াছে।

"বিসর্জ্জন"—শারদীয়া পূজার প্রতিমা বিসর্জ্জন উপলক্ষে একটি কবিতা। কবি লিখিতেছেন,—

"মলিনা দশমী উষা পরিত্যজি নিজভূষা,
কাঁদে মুখ লুকায়ে অম্বরে।
কাঁদিতেছে দিক বধূ কাঁদিতেছে কুলবধূ,
কাঁদে আজি সবে সমস্বরে॥"

তারপরেই বলিতেছেন,—

"বিনিদ্র বিহগগণ শোকে বিষাদিত মন,
নাহি ছাড়ে আপনার নীড়ে।
মৌন কৃশ চাষীদল, হইয়ে শোকে বিহ্বল,
কেশ ছিঁড়ে দেয় ধুলা শিরে।"

কবির বিজয়ার এই শোকদৃশ্য বর্ণনা পাঠ করিয়া আমরা কাঁদিব না হাসিব, জানিনা।

"শরতে" কবিতায় মায়ের পূজা উপলক্ষে কবি দৈন্য প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন,—

"জ্ঞানের প্রদীপ মানস মন্দিরে,
জ্বলেনা চিত্ত করিয়া আলা।
বাসনা মেঘেতে আবৃত আকাশ,
প্রেমের রশ্মি নাশেনা কালা॥"

শেষ ছুটি চরণের ভাবার্থ উপলব্ধি হয় না। "কালা" শব্দটি যদি কেবল "আলা"র মিল রক্ষার জন্য খাড়া করা হইয়া থাকে তবে আমরা নাচার।

"সে যে আনন্দেরই ছায়া" কবির আর একটি কবিতা. ইহারও একটু নমুনা দিলাম,—

"ক্রম ঘনিষ্ঠতা মাঝে হেরিনু তাহায়
স্বর্গি বধূ রমারূপে মোহিতে ধরায়।
সুস্মিতার মতিগতি কুমারী সুলভ।
সুপবিত্র চিন্তাশূন্য গার্হস্থ্য অভিনব।"

'স্বর্গি' কি? "গার্হস্থ্য অভিনব" বাক্যের সার্থকতাও বুঝিলাম না। অধিকন্তু ছন্দোভঙ্গ ঘটিয়াছে।

"নির্ভরতা" কবিতায় কবি ভগবানকে বলিতেছেন,—

"লুটায়ে পড়িলে ধুলে লও তুমি কোলে তুলে,
মুছাইয়ে সারা অঙ্গ বল 'বাপধন'।"

আমাদের মতে এইরূপ ভাবহীন কবিতা না লেখাই ভাল।

তারপর "পিকুবধূ" নামক কবিতায় কবি পিকবধূকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

"যাতি যুথী মালতীর অপূর্ব্ব মাধুরী,
তোমার আগমে সখা"—

পিকবধূকে "সখা" সম্বোধন কি ব্যাকরণ সঙ্গত হইয়াছে?

এইবার আমরা কবির "বিজয়ার সমস্যা" এবং "জনৈক ইংরাজী শিক্ষিত যুবকের বন্ধুর নিকট পত্র" শীর্ষক কবিতা দুইটি সম্বন্ধে কিছু বলিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। কবি এই কবিতা দুইটি কমিক্ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তা করুন, কিন্তু কমিক্ বলিয়া সাহিত্যের বাজারে ছাই ভস্ম যা তা চলে না, ইহা লেখকের জানা উচিত। কবিতা দুইটিই উদ্দেশ্যহীন, নীরস এবং নিতান্ত নিরর্থক। বিশেষতঃ শেষোক্ত কবিতাটি আমরা একেবারেই অপাঠ্য বলিয়া মনে করি। অতিশয় কুরুচিপূর্ণ। আমরা বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের কাছে এরূপ অপকৃষ্ট কবিতা আশা করি না।

"সৈম্য তন্ত্রে", "সৈম্য মন্ত্র", "সৌম্য জ্ঞান", "সৌম্য মন্ত্র", "চেয়ে চেয়ে আর্দ্রপানে" এবং "বহুপাত"—এই শব্দগুলির অর্থ বুঝা গেল না।

"কমলাকান্ত।"

সাহিত্য-সমাচার

শোক সংবাদ

৺গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক, "বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী"র স্থাপয়িতা শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আর ইহলোকে নাই। বিগত ১২ই বৈশাখ তাঁহার কলিকাতা যুগল-কিশোর দাস লেনের বাটীতে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। অতি সামান্য অবস্থা হইতে, সততা ও ব্যবসায়-বুদ্ধির অসাধারণ সংমিশ্রণে তিনি লক্ষপতি হইয়াছিলেন। ব্যবসায়—বিশেষ পুস্তক ব্যবসায় ক্ষেত্রে এরূপ সততা ও কার্য্যদক্ষতা, শুধু এ দেশে কেন, যে কোনও দেশে দুর্লভ। নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় একদিন সেকালের প্রসঙ্গে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—

"বহির দোকান ত কতলোকেই করিয়াছিল, কিন্তু গুরুদাস চাটুয্যের এত উন্নতি হইল, অপর সকলের হইল না কেন, শুনিবে ?" আমরা বলিলাম—"বলুন।"—অমৃতবাবু এরূপ বলিলেন—

"গুরুদাস চাটুয্যে বইয়ের দোকান খুলেছেন—আরও ২।৪ জন খুলেছেন,—আলমারিতে বই সাজিয়ে নিজের নিজের দোকানে তাঁরা বসে আছেন। ধরুন আপনি কি আমি, একখানি বই ছাপিয়ে, দোকানে দোকানে কমিশন সেলে রেখে এলাম। গুরুদাস বাবুর দোকানে নয়, অন্য একটি দোকানে, কি হল একবার কল্পনা করুন। একজন খদ্দের এসে, আপনার একখানি কি আমার একখানি বই একটি টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে গেল। খদ্দের চলে যেতেই পুস্তকবিক্রেতা মশায় তাঁর চাকরকে ডেকে, সেই টাকাটি দিয়ে বল্লেন—'ওরে রামা, যা ত, নতুন বাজার থেকে একসের গলদা চিংড়ি আর এক কুড়ি কমলা লেবু কিনে বাড়ীতে দিয়ে আয়।' আপনার কি আমার সেই টাকাটি খরচ করে' তিনি ত উত্তম রূপে আহার করলেন। তার পর, আপনি কি আমি, টাকার দরকার হয়েছে, টাকার চেষ্টায় বেরিয়েছি। সেই দোকানে গিয়ে টাকা চাইতে বাবুটি বল্লেন—'মশাই এখনও হিসেবটা ত হয় নি, আপনি হপ্তা খানেক বাদে একবার আসবেন।' গেলেন আপনি হপ্তা খানেক বাদে। গিয়ে দেখ্‌লেন, তাঁর ছেলে দোকানে বসে আছে, কর্ত্তা বর্দ্ধমানে গেছেন, কবে আসবেন ঠিক নেই। অবশেষে অনেক হাঁটাহাঁটির পর হিসেবটা হয়ত পেলেন, তারপর টাকার জন্যে হাঁটাহাঁটি আরম্ভ হল। ক'জোড়া জুতো ছিঁড়ল বলা যায় না।—আচ্ছা, এবার গুরুদাস চাটুয্যের দোকানে ঘটনাটি কি হল একবার কল্পনা করুন। একজন খদ্দের, আপনার কি আমার, একখানি বই একটাকা দিয়ে কিনে নিয়ে গেল। গুরুদাস অমনি হিসেব করলেন, এই টাকার মধ্যে বারো আনা গ্রন্থকারের। সে বারো আনা পয়সা, পুটুলি বেঁধে দেরাজের মধ্যে তিনি রেখে দিলেন। বাকী থাকে চার আনা—ওঁর কমিশনটা। হিসেব কল্লেন, এর মধ্যে দু আনা দোকান খরচ। সে দু আনা একজায়গায় রেখে দিলেন। বাকী যে দু আনা রইল, তাইতে শাক ভাত যা জুটলো, তাই খেয়ে তিনি কাটালেন। আপনি কি আমি, দোকানে গেছি টাকার জন্যে। যেতেই তিনি অভ্যর্থনা করে বসালেন। তখনই খাতা বের করে, হিসেবটা দেখে, আপনার কি আমার, য' টাকা য' আনা য' পাই পাওনা—নগদ আপনার কি আমার হাতে দিলেন। আপনাতে আমাতে বাড়ী আসতে আসতে বলাবলি করতে লাগলাম—'এবার যা বই ছাপাব, সব বই রাখব ঐ গুরুদাসের দোকানে। আর কোনও শা—র দোকানে বই রাখা হবে না।"—এমনি করে, গুরুদাসের উন্নতি হতে লাগলো—তখন তিনিও গল্‌দা চিংড়ি টিংড়ি, নেবু টেবু খেতে লাগলেন এবং বন্ধুবান্ধবকেও যথেষ্ট খাওয়াতে লাগলেন।"

অমৃত বাবু তাঁহার স্বাভাবিক বাক্‌পটুতা সহকারে ঐ গল্পটি যেমন সরস করিয়া বলিয়াছিলেন, আমরা তেমন করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারিলাম না।

গুরুদাস বাবু শুধু ব্যবসায়ীই ছিলেন না, একজন প্রকৃত সাহিত্য-প্রেমিক এবং সাহিত্যিকের অকপট বন্ধু ছিলেন। তাঁহার পুত্রদ্বয়, শ্রীমান্ হরিদাস ও সুধাংশুশেখর, পিতৃগুণ বহু পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

"বাসি-ফুল" প্রণেতা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত ধর্ম্মমূলক উপন্যাস "গোপালের মা" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ১।।০। উক্ত দেবেন্দ্রবাবুর আর একখানি উপন্যাস "সীমন্তিনী, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক তাঁহাদের ।।০ সংস্করণ গ্রন্থমালার ষড়বিংশ গ্রন্থস্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত দিগ্বিজয় রায়চৌধুরী প্রণীত "গ্রীকদর্শন" যন্ত্রস্থ। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

কলিকাতা
১৪ এ,রামতনু বসুর লেন,"মানসী প্রেস" হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"শরীলে আর পদত্থ নেই"—

"গহনার বাক্স" গল্প (ফাল্গুন সংখ্যা ৯৩ পৃঃ)

চিত্রকর—শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন।

মানসী
ও
মর্ম্মবাণী

১০ম বর্ষ
১ম খণ্ড

আষাঢ় ১৩২৫ সাল

১ম খণ্ড
৫ম সংখ্যা

সাংখ্য-দর্শনের অভিব্যক্তিবাদ

সাংখ্য পরিচয়—মনীষিবর্গ লক্ষ্য করিয়াছেন যে বর্ত্তমান এভোলিউসন থিওরির সঙ্গে সাংখ্য দর্শনের অভিব্যক্তিবাদের এক বিশেষ ও প্রণিধানযোগ্য সাদৃশ্য আছে। নব্য জীবতত্ত্ব ও জড়-বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাতা পুরুষ ডারুইনের সঙ্গে সাংখ্যের প্রাচীন আদিগুরুর এই যে পরস্পর-অজ্ঞাত সহানুভূতি ও সাদৃশ্য ইহার তুল্য দার্শনিক বিস্ময়ের বিষয় অল্পই আছে। কারণ, একজন পরীক্ষার যন্ত্র-সমাকুল কর্ম্মশালার মধ্যে বসিয়া জগতের যে মহাতত্ত্ব অভিধান করিয়াছেন, অন্যজন কেবল সাধারণ বিচার ও আত্মপ্রত্যয়ের উপর নির্ভর করিয়া অবিকল সেই তত্ত্বেই উপনীত হইয়াছেন। বাহ্যতঃ ও লোকদৃষ্টিতে অন্বেষণার ইহা অপেক্ষা অসদৃশ পন্থা আর নাই। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই দুইজনেই অবশেষে একই ভূমির উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

ডারুইনের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয়ের স্পর্দ্ধা আমাদের সকলেরই আছে। কিন্তু সাংখ্য-গুরুর দুর্ভাগ্যবশতঃ কপিল আমাদের পক্ষে একেবারে রুদ্ধ কোঠায় বিরাজমান। হইতে পারে ইহার অন্যতম কারণ এই যে কপিলের যুক্তিবাদ, এক দুরূহ ভাষ্য এবং ততোধিক দুরূহ 'পারিভাষিক' ব্যাখার মধ্য দিয়া আমাদের নিকট আসিয়া পৌছিয়াছে। এবং সেই ভাষা ও ভাষ্যের দুর্ভেদ্য ব্যূহকে ভেদ করিবার শিক্ষা, সাহস ও ধৈর্য্য আমাদের নাই। কিন্তু তা' বলিলে এখন আর চলিতেছে না। ভাষা ও ভাষ্য দেখিয়া ডরাইলে আর হইবে না। দিন-কাল ফিরিতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা আমাদের নিজের ঘরের ধনরত্নের খবর রাখি না বলিয়া ঘরে বাহিরে আমাদের লাঞ্ছনা উপস্থিত হইয়াছে। তজ্জন্য নিজেদের মধ্যে আত্মগ্লানিও পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে। 'নীরস ও কঠিন' বলিয়া স্বদেশী দর্শনের পরিচয় এড়াইবার আর উপায় নাই।

এইখানে একটি বিষম দায়ের কথা উপস্থিত হয়। আমাদের দর্শনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়া দেয় কে? দর্শনরাজ্যের বিদেশী ম্যাক্সমূলার, হ'ল্, ব্যালাণ্টাইন্, গ্রব্, প্রমুখ পণ্ডিতগণের নিকট সে জন্য আমাদের কি

শরণাপন্ন হইতে হইবে, না আমাদের স্বদেশী রত্নবেত্তা —গৌড়পাদ, বিজ্ঞানভিক্ষু, বাচস্পতি মিশ্র, অনিরুদ্ধ ভট্ট, মহাদেব বেদান্তি প্রভৃতির নিকটই প্রথম সাংখ্য পরিচয় লইতে হইবে? ইহা ব্যতিরেকে এক তৃতীয় পন্থাও বিদ্যমান,—তাহা হাল ফ্যাসানের "মৌলিক গবেষণা" ও অভিনব ব্যাখ্যা। ইহা অপেক্ষা পাণ্ডিত্যের সুগম পন্থা আর নাই। কিন্তু 'মৌলিকতা' ভগবান অনেকের ভাগ্যেই লিখিতে প্রায় ভুলিয়া যান।

এই ত্রিপথগামিনী বিচারণার মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া আমরা প্রচলিত প্রাচীন (orthodox) ভাষ্যকেই বরণ করিয়া লইয়াছি। এবং তাহার মধ্য দিয়াই সাংখ্যের অভিব্যক্তিবাদ প্রণিধান করিবার বাসনা করি। ইহাতে কিছু সুবিধাও আছে। পাশ্চাত্য সুধীবর্গের উপর কোনই অসম্মান প্রদর্শিত হইবে না—এবং নবীনতম গবেষণার মর্য্যাদাও অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যাইবে।

এইখানেও আবার কিঞ্চিৎ গোল আছে। আমাদের দেশের ভাষ্যকারদের ব্যাখ্যার মৃদঙ্গে যা' তা' বুলি বাজে না। তাহার একটা নির্দ্দিষ্ট ঘট-পট-ঘটিত বুলি আছে, —যাহার প্রভাবে দেশের দর্শনের টোল সকল অদ্যাপি ঘট-পটের দ্বারাই সরগরম্ হইয়া আছে। কাযেই পুরাতন ব্যাখ্যাকে বুঝিতে হইলে ঘটপটকে বরদাস্ত করিতেই হইবে।

এখন দেখা যাউক ভাষ্যকারগণ কোন্ যুক্তি বলে কপিলের সঙ্গে ডারুইনের মৈত্রীভাব স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন।

কার্য্যকারণ—যদি এক পদার্থ হইতে পদার্থান্তর উৎপন্ন হয়, তবে প্রথম পদার্থকে কারণ-সত্তা, এবং দ্বিতীয় পদার্থকে কার্য্য-সত্তা বলে। ইহার উদাহরণ যেমন,—ঘট কার্য্য, মৃত্তিকা তাহার কারণ। পট কার্য্য, তন্তু তাহার কারণ। এই কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ, স্বরূপ ও স্বভাব নির্ণয় করাই দর্শন সকলের প্রধান বিচার্য্য।

নৈয়ায়িক, কারণত্বকে কার্য্যত্ব হইতে বিশেষ করিয়া বলেন, "অন্যথাসিদ্ধিশূন্যস্য নিয়তা পূর্ব্ববর্ত্তিতা"—অর্থাৎ কারণত্ব হইতেছে অবশ্যভাবি, অন্যথাসিদ্ধিশূন্য, নিয়ত ও পূর্ব্ববর্ত্তী। কারণ যে বাস্তবিক এই লক্ষণাক্রান্ত, ইহা সামান্যতঃ-দৃষ্ট বিষয় (matter of common experience)।

ইহার পরের কথা এই—সামান্যতঃ-দৃষ্ট বিষয়ের সাদৃশ্য (analogy) দ্বারা পরোক্ষ বিষয়েরও অনুমান হয়। নব্য ন্যায় এই অনুমান ও ব্যাপ্তি-সম্বন্ধের উপর যে উত্তুঙ্গ বিচার-দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীর দার্শনিক প্রতিভার এক চিরস্থায়ী কীর্ত্তিস্তম্ভ হইলেও, সেই বিচার-গহনে আমাদের আরোহণের উপস্থিত প্রয়োজন নাই। সামান্যতঃ-দৃষ্ট অনুমান যে কি তাহা আমরা মোটামুটী ভাবেই বুঝিয়া লইব।

জগতে সচরাচর যেরূপ ঘটিয়া থাকে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলে জগৎ-কার্য্যের একটা রীতি, প্রথা ও পরিক্রমা জানিতে পারা যায়। এই প্রথা, রীতি বা পরিক্রমা অনুসারে আমরা দেখিতে পাই, সত্তা মাত্রেরই একটা না একটা কারণ আছে; এবং সেই কারণ নির্দ্দিষ্ট ও অবশ্যম্ভূত কারণ। যাহাকে আমরা জগৎ-সত্তা (Phenomenal world) বলি তাহা যে সমষ্টিতে এক বৃহৎ কার্য্য-সত্তা, ইহা আমরা নিত্যই নানা বিষয়ের মধ্য দিয়া নানা দিক্ হইতে দেখিতেছি। অতএব বলিতে হইবে জগতে আমরা যা কিছু দেখিতেছি ইহার অবশ্যই কোনও দৃষ্ট বা অদৃষ্ট, জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কারণ আছে। ইহা সামান্যতঃ দৃষ্ট অনুমান।

সাংখ্যশাস্ত্র সঙ্গত বিচারমার্গ অবলম্বন করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে চাহেন, এ জগতের দুইটি মূল কারণ আছে। প্রকৃতি বলিয়া একটি তাহার বস্তুগত বা উপাদান কারণ। পুরুষ বলিয়া অন্যটি তাহার 'ব্যক্তিগত' বা নিমিত্ত কারণ। যেমন ঘটের উপাদান-কারণ মৃত্তিকা এবং তাহার নিমিত্ত-কারণ কুম্ভকারের ইচ্ছা প্রভৃতি, তেমনি সৃষ্টির উপাদান কারণ প্রকৃতি, এবং পুরুষের সান্নিধ্যই তাহার নিমিত্ত-কারণ। পুরুষের দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতিই সৃষ্টিকে উৎপন্ন করিতেছেন। ইহাই সাংখ্যের সাধ্য ও প্রতিজ্ঞা।

এই সাধ্যের সাধন বা প্রমাণ কোথায়? "সামান্যতঃ দৃষ্টাৎ উভয়-সিদ্ধিঃ" (সাং দঃ ১।১০৩)—সামান্যতঃ দৃষ্ট অনুমান প্রমাণের দ্বারা পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই সিদ্ধ হয়।

কিন্তু প্রকৃতি বলিয়া যে জগৎ-কারণ উক্ত হয়, তাহা সাধারণ মনুষ্যের কখনই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে। এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে বলিয়া তাহা যে অসৎ বা 'নাই' ইহাও বলা যায় না। "সৌক্ষ্মাতাৎ তৎ-অনুপলব্ধিঃ" (সাং—১।১০৯) অতিশয় সূক্ষ্মতাবশতঃই প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি হয় না। তবে তাহার উপলব্ধি হয় কিসে?—"কার্য্যদর্শনাৎ তদুপলব্ধেঃ" (সাং—১।১১০)—জগৎ-কার্য্য দেখিয়াই জগৎ-কারণ প্রকৃতির উপলব্ধি হয়। অর্থাৎ সাংখ্যদর্শনকার কার্য্য-কারণের উজান ধারা বাহিয়া কার্য্য হইতে কারণকে সিদ্ধ করিতে চাহেন,—ঘট বিচার করিয়া মৃত্তিকাকে নিষ্পন্ন করিতে চাহেন, পটকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া তন্তুকে প্রমাণ করিতে চাহেন। তিনি জগতের দৃষ্ট কার্য্যকে বিচার ও ব্যবচ্ছেদ করিয়া অদৃষ্ট জগৎ-কারণে উপনীত হইতে চাহেন।

এই যে দৃষ্ট বিষয় হইতে অদৃষ্ট বিষয়কে সিদ্ধান্ত করা—ইহাই আস্তিকদর্শনের বিচারের মেরুদণ্ড। ইহার পারিভাষিক নাম—'অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত' (Inference)। সাংখ্য এই অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়াই প্রকৃতি ও পুরুষে উপনীত হইয়াছেন।

এই অভ্যুপগম-বাদ স্বীকার করেন না এমন দর্শনও এদেশে ছিল। নাস্তিকগণ ও শূন্যবাদী বৌদ্ধেরা কার্য্য-কারণের নিত্য সম্বন্ধ মানিতেন না এবং অভ্যুপগম-বাদ অঙ্গীকার করিতেন না। তথাপি আস্তিক বিচার, তাঁহাদের প্রতি অনাস্থা-প্রযুক্ত তাঁহাদের যুক্তিকে উপেক্ষা করেন নাই। আমরাও তাঁহাদের যুক্তি প্রণিধান করিতে বাধ্য।

নাস্তিক দর্শন বলেন—'কার্য্য ও কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ। কার্য্য-সত্তাকে দেখিয়া কারণ-সত্তার কোনই উপলব্ধি হইতে পারে না। ঘট দেখিয়া গঙ্গাগর্ভের মৃত্তিকাকে কেহই অনুমান করিতে পারে না। অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত কোন সিদ্ধান্তই নহে, তাহা কেবল কৃচ্ছ্র-কল্পনা। এ জগতের কোনই অ-দৃষ্ট কারণ নাই।'

নাস্তিকগণের আচার্য্য দেবগুরু বৃহস্পতি বলেন—

অগ্নিরুষ্ণো, জলং শীতং, শীতস্পর্শস্তথানিলঃ।
কেনেদং চিত্রিতং? তস্মাৎ স্বভাবাত্তদ্‌ব্যবস্থিতিঃ॥

"জগতের বৈচিত্র্য বশতঃ অগ্নি উষ্ণ হইয়াছে, জল শীতল হইয়াছে, বায়ু সুখস্পর্শ হইয়াছে। কে এই বৈচিত্র্য বিধান করিয়াছে? কেহই না,—স্বভাব হইতেই এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে।" অর্থাৎ বর্ত্তমান কালের Agnosticএর ন্যায় দেবগুরুও জগৎ-কারণ অনবধার্য্য বলিয়া, স্বভাব (Nature) কল্পনা করিয়া এক গোঁজামিল দিয়াছেন।

বৌদ্ধ কিন্তু সে গোঁজামিলে খুসী হইলেন না। তিনি বলিলেন, স্বভাব আবার কি?

বুদ্ধ্যা বিবিচ্যমানানাং স্বভাবো ন অবধার্য্যতে।*

বুদ্ধি দ্বারা বিবিচ্যমান পদার্থ সকলের কোনই স্বভাব অবধারিত হয় না। অতএব তাঁহার মতে সত্তা বা উৎপত্তির হেতু, স্বভাব বলিয়াও কিছু নহে।—তবে তাহা কি?—তাহা শূন্যতা, অভাব, 'ন—থাকাই'। তাহাই সত্তার কারণ। ঘট-সত্তা পূর্ব্বকালে ছিল না বলিয়াই—উত্তরকালে ঘট-সত্তা সম্ভব হয়। ঘটোৎপত্তির ঘটাভাবই কারণ। তেম্‌নি শূন্যতা, অভাব, 'কিছু-না-থাকাই' জগতের পূর্ব্ব-সিদ্ধ কারণ। তিনি বলেন

ন সতঃ কারণাপেক্ষা ব্যোমাদেরিব যুজ্যতে।
কার্য্যস্য অসম্ভবহেতুঃ খপুষ্পাদেরিবাসতঃ॥ ‡

অর্থাৎ সৎ পদার্থের কোন কারণের অপেক্ষা নাই। পদার্থকে সৎ বলিয়া প্রতীতি হইলেই তাহার যে কারণ থাকিতে হইবে ইহার এমন কোন মানে নাই। আকাশকেও সৎ-পদার্থ বলিয়া প্রতীতি হয়—কিন্তু আকাশ শূন্য। শূন্যের কোনই কারণ হইতে পারে না। কার্য্য-সত্তার পূর্ব্বে-না-হওয়াই হেতু—তাহার অভাব বা শূন্যতাই হেতু। যেমন আকাশ-কুসুমাদি অবাস্তব বিষয়ের কোনই হেতু নাই, তেমনি বাস্তব বিষয়েরও কোন হেতু নাই।

* সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে (মাধবাচার্য্য)-নাস্তিক দর্শন।
‡ ঐ ঐ বৌদ্ধ দর্শন।

সাংখ্যের দর্শনকার যিনিই হউন (উইলিয়ম্ ফিজ্‌-জিরাল্ড হল্ সাহেব প্রথম আবিষ্কার করেন যে ইনি খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মাধবাচার্য্যেরও পরের লোক) তিনি কিন্তু এই বিরুদ্ধবাদী নাস্তিক ও বৌদ্ধদিগের আপত্তিকে তাঁহার বিচারের আমলে আনিয়াছেন। এমন কি শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বতন টীকাকার গৌড়পাদাচার্য্য ও ঈশ্বরকৃষ্ণের প্রাচীন সাংখ্যকারিকার মধ্যেও এই বৌদ্ধবাদ খণ্ডন দেখিতে পাইয়াছেন। * অতএব সাংখ্য কোন্ যুক্তিবলে বাদিগণের এই বিপ্রতিপত্তি নিরস্ত করেন তাহা প্রণিধানযোগ্য।

সাংখ্যদর্শন প্রত্যুত্তরে বলেন—"তথাপি একতরদৃষ্ট্যা অন্যতরসিদ্ধের্নাপলাপঃ" (সাং—১।১১২) জগৎ-কার্য্য দৃষ্টে জগৎ কারণের অনুমান সঙ্গত হউক বা না হউক, তথাপি একতরকে দৃষ্টি করিয়া অন্যতরের সিদ্ধির কোনই অপলাপ হয় না। আমরা প্রত্যহ নির্দ্দোষ ভাবে এইরূপ অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত করিয়া যাইতেছি। অতএব বাদিপক্ষ যে বলেন এইরূপ সিদ্ধান্ত সিদ্ধ নহে, তাহার কোনই সারবত্তা নাই।

সুতরাং এখন তাঁহাদের যুক্তি এই মাত্র অবশেষ থাকে, জগৎকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া সঙ্গত ভাবে জগৎ কারণে উপনীত হওয়া যায় কি না ?

যদি বলি 'তাহা যায়'—তবে সেই সঙ্গে বলিতে হয় কার্য্য কারণের সহিত যদি এক নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ-যুক্ত না হয়, তবে কার্য্য হইতে কারণকে কোনক্রমেই জানা যাইবে না। অতএব সেই নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ যদি থাকে, তবে তাহা কি ?

দর্শন ইহার উত্তরে বলেন, তাহা 'সৎ-কার্য্য সম্বন্ধ'। অর্থাৎ যাহাকে আমরা কার্য্য-সত্তা বলিতেছি তাহা কোন অভিনব, অচিন্তিত, যদৃচ্ছা-জাত আকস্মিক ব্যাপার নহে। তাহা নির্দ্দিষ্ট অঙ্কের নির্দ্দিষ্ট উত্তর—নির্দ্দিষ্ট যোগ বিয়োগ ও গুণের নির্দ্দিষ্ট ফল। এই হিসাবে অঙ্কের গুণফল ও যোগফল অঙ্ক-সমাধানের পূর্ব্বেও যেমন অঙ্ক মধ্যেই উহ্য থাকে, তেমনি আমরা যাহাকে বলি কার্য্য-সত্তা, তাহা কারণ-সকলের ব্যাপারের দ্বারা প্রকটিত হইবার পূর্ব্বেও কারণের মধ্যেই নিহিত থাকে। এই হিসাবে ঘট, উৎপত্তির পূর্ব্বে মৃত্তিকার মধ্যে আছে। অনেকগুলি কারণ ব্যাপ্রিয়মাণ ও ক্রিয়াশীল হইবার পরে ঘটের উৎপত্তি হয় সত্য। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, কুম্ভকার যখন নদীতীরে মৃত্তিকা খনন করিতেছিল তখনও সেই মৃত্তিকার মধ্যে ঘট ছিল। তাহার পর যখন কুমার মহাশয় সেই মাটীকে রসারসি দিয়া বাঁধিয়া গর্দ্দভের পৃষ্ঠে চাপাইয়া গৃহ-যাত্রা করিলেন—বুঝিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে তখনও ঐ ঘট গাধার পৃষ্ঠে চড়িয়া কুমার বাড়ীর পথে যাত্রা করিয়াছিল। তাহার পর কুমার যখন জল ঢালিয়া পা' দিয়া দলিয়া ছানিয়া মাটীকে পিণ্ডাকার করিয়া তাহার চাকে চড়াইয়াছিল, তখনও সেই পিণ্ডমধ্যে ঘট উহ্য ছিল। সমস্ত কারণ-ব্যাপারের পূর্ব্বে কার্য্য-সত্তাকে তাহার কারণের মধ্যে প্রণিধান করাই সাংখ্য দর্শনের সুপ্রথিত 'সৎ-কার্য্য বাদ'।

বোধ হয় জগতের মধ্যে সাংখ্যই সর্ব্বপ্রথম কার্য্য কারণের এই বিচিত্র সম্বন্ধ অবধারণ করিয়াছিলেন। এবং ইহাই যে 'বৈজ্ঞানিক' কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ, তাহা Tyndall প্রমুখ পাশ্চত্য আচার্য্যগণও প্রণিধান করিয়া কার্য্য সত্তা ও কারণ-সত্তাকে এই অভিনব 'বৈজ্ঞানিক' চক্ষে দেখিতে উপদেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"We must radically change our notion of matter and discern in it the promise and and potency of terrestrial life." * এই যে "promise and potency"—তাহাকে ছায়ারাজ্য (vision) হইতে আনিয়া বাস্তব সত্তার উপর দাঁড় করাইলেই মূর্ত্তিমান সৎ-কার্য্য বাদ আমরা দেখিতে পাই।

* নবম কারিকার গৌড়পাদীয় ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

* Tyndall's Fragments of Science p. 323 ও 324. তাঁহার এতৎপ্রসঙ্গে একটি রঙ্গের ভণিতা এই—'Out of the molecular force of a mutton-chop Hamlet and Faust could be deduced by the Physicist of future.'—Life and Letters of Huxley p. 231.

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ইহা দর্শনের বাদ। যে অর্থে আমরা 'বিজ্ঞান' শব্দ ব্যবহার করি তদনুরূপ মতবাদ আমাদের দেশে ছিল না। এখন জড়বাদের বিনিদ্র প্রহরী 'বিজ্ঞানকে' দর্শনের সীমার কাছে পদার্পণ করিতে দেখিলেই খবরদারির হাঁক দিয়া বলেন—"Physics! Beware of Metaphysics." কিন্তু ভারতবর্ষে এমন খবরদারি কখনও আবশ্যক হয় নাই। অন্বেষণার রাজ্যে কৃত্রিম প্রাচীর তুলিয়া তাঁহারা বিচারের গতিরোধ করিতে জানিতেন না। সেই জন্য সাংখ্যের এই 'বৈজ্ঞানিক' সৎকার্য্যবাদ যেদিন হইতে পুরাতন আচার্য্যের কণ্ঠে প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল, সেইদিন হইতে 'দার্শনিকের' টোলে টোলে একটা আপত্তির হট্টগোল উপস্থিত হইল। সেই আপত্তি ও তাহার সমাধানের মধ্য দিয়াই প্রাচ্য অভিব্যক্তি বাদের মর্ম্মবাণী জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল।

ষড়্দর্শনাচার্য্য বাচস্পতিমিশ্র এই সকল আপত্তি ও বিপ্রতিপত্তি সম্বন্ধে বলিতেছেন—"কেচিদাহুরসতো সজ্জায়ত ইতি, একস্য সতো বিবর্ত্তঃ কার্য্যজাতং ন বস্তু সৎ, ইত্যপরে। অন্যে তু সতো অসৎ জায়ত ইতি।" অস্যার্থঃ—"কেহ বলিতেছেন অসৎ হইতেই সতের উৎপত্তি, কেহ বলেন সৎপদার্থ অদ্বৈত ও এক (ব্রহ্ম); যাহাকে কার্য্যজাত বলা যায় তাহা সেই সতের মায়াকল্পিত বিবর্ত্ত মাত্র, তাহা প্রকৃতপক্ষে কোনও বস্তু বা সত্তা নহে। কেহ বলেন কারণ ব্যাপারের পূর্ব্বে কার্য্য সত্তা অসৎ, অতএব সৎ-কারণ হইতেই অসৎ কার্য্য উৎপন্ন হয়।" এই সকল মতবাদে সৎ-কার্য্যবাদ প্রতিষিদ্ধ হয়।

প্রথম পক্ষের মতবাদে অভাবই উৎপত্তির হেতু সুতরাং সেক্ষেত্রে কারণ-লীন কার্য্য বলিয়া কিছুই থাকিতে পারে না। দ্বিতীয় পক্ষের মতে যাহাকে আমরা সৎ বা কার্য্যসত্তা বলি, তাহা সর্ব্বনির্ব্বিশেষেই মায়া, মিথ্যা, রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজতভ্রম,—অতএব এই মিথ্যা তথাকথিত সত্তার কারণগত কোনই সত্য-অস্তিত্ব নাই। তৃতীয় পক্ষ বলেন, কার্য্য এক সম্পূর্ণ নূতন, প্রাক্-অসিদ্ধ ব্যাপার—কারণ ব্যাপার ক্রিয়াশীল হইবার অগ্রে তাহার কোনই অস্তিত্ব ছিল না—অতএব করণ-সত্তার মধ্যে কার্য্যসত্তার কোনই মা-বাপ-নাই-বাদিগণের এই সব যুক্তির সঙ্গে সাংখ্যদর্শনকে রীতিমত লড়াই করিতে হইয়াছে।

প্রথমতঃ ধরুন যাঁহারা বলেন—"অসতো সজ্জায়ত ইতি।" এই মতের বিরুদ্ধে দর্শনকার বলিয়াছেন—ইহা যুক্তিসিদ্ধ তথ্য হইতে পারে না—'ত্রিবিধ বিরোধাপত্তেশ্চ" (সাং ১।১১৩) ইহাতে ত্রিবিধ বিরোধ উপস্থিত হয়। ত্রিবিধ বিরোধ কি তৎসম্বন্ধে বিজ্ঞানভিক্ষু বুঝাইতেছেন—"সর্ব্ববাদী মতেই সমস্ত কার্য্য ত্রিবিধ, অর্থাৎ অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান। যেমন, ঘট যখন উৎপন্ন হয় নাই তখন ঘট অনাগত। ঘট যখন উৎপন্ন হইল ঘট তখন বর্ত্তমান। ঘট যখন আর নাই, ঘট ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, তখন ঘট অতীত। এখন যদি বলি অতীতাদি কালে ঘটের একান্ত অভাব ছিল, তবে ঘট সম্বন্ধে অতীত ও অনাগত ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না, কেন না অসৎ পদার্থের কোনই ধর্ম্ম থাকিতে পারে না।"

এইখানে 'অভাব' বলিয়া যাহাকে বলা যায় তাহা স্বরূপতঃ কি তাহা দেখিতে হয়। নৈয়ায়িক বলেন অভাব চারিপ্রকার। ঘট ছিল না, পরে ঘট উৎপন্ন হইল এখানে ঘটের প্রাক্-অভাব। ঘট ছিল, কিন্তু এখন নাই, ঘট ধ্বংস হইয়া গিয়াছে এখানে ঘটের প্রধ্বংস-অভাব। ঘটে পটত্ব নাই, পটে ঘটত্বের অভাব এই অভাব অন্যোন্য-অভাব। এবং যাহা কদাপি কস্মিন কালে নাই তাহা অত্যন্ত-অভাব। অভাবের তৎভাবই প্রতিযোগি সত্তা, (Correlative antithesis) যেমন ঘটাভাবের ঘটই প্রতিযোগি সত্তা। অর্থাৎ নৈয়ায়িক বলেন অভাব যে নঞ্-ভাব (negation) বুঝায় তাহা কোন সত্তামূলক ভাবের (positive thing)ই নঞ্-ভাব। সেই সত্তাই অভাবের প্রতিযোগি সত্তা (correlative positive antithesis of negation).

সাংখ্যবাদী নৈয়ায়িককে জিজ্ঞাসা করেন—ধ্বংসাদি অভাবে, ধ্বংসাদিকাল ব্যবচ্ছিন্ন যে অভাব তাহা কোন্ অভাব? উত্তরে মুক্তাবলীর গ্রন্থকার বলিয়াছেন—"নব্যাস্তু ধ্বংসাদি কালাবচ্ছেদেন অত্যন্ত অভাবো বর্ত্ততে ইতি প্রাহুঃ" অর্থাৎ নব্য নৈয়ায়িক বলেন ধ্বংসাদি কাল অবচ্ছেদে অত্যন্ত অভাবই ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ সে অভাব কোনও অধিকরণ বা আশ্রয়কে অবলম্বন করিয়া থাকে না। প্রাচীন ন্যায় কিন্তু অভাবের আধিকরণ্য স্বীকার করিয়াছেন।

সাংখ্যগণের মত প্রাচীন ন্যায়েরই মতের পোষক। অধিকন্তু তাঁহারা অভাবকে পৃথক পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন না, পদার্থের অবস্থা বিশেষ বলিয়াই স্বীকার করেন। বিজ্ঞানভিক্ষু একজন চতুষ্কোণী সাংখ্য,—তিনি নব্যন্যায়ের এই অভাব-বাদ সম্বন্ধে বলিতেছেন—"অভাবের প্রতিযোগি হইতেছে সত্তা। প্রতিযোগা অভাব এবং প্রতিযোগি সত্বা যদি উভয়ই 'অভাব' হইয়া যায় তবে অভাবের দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? অভাবের কোনই সামান্য বিশেষ হইতে পারে না। যাহা অভাব তাহা চিরদিনই তৎস্বরূপ অভাব। তাহা কখন-ভাব-কখন-অভাব হইতে পারে না। যদি তাহা হয় তবে বুঝিতে হইবে তাহা অভাব নহে, ভাবেরই ছদ্মবেশ। তাহা প্রকৃতপক্ষে অভাব নহে, তাহা ভাবেরই অতীত ও অনাগত অবস্থা। যাহার অত্যন্ত অভাব তাহার চিরদিনই অত্যন্ত অভাব, কোন কালেই তাহার প্রতিযোগি সত্তা বিদ্যমান নাই। এই জন্য নৈয়ায়িকও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে প্রতিযোগির অতিদেশে অত্যন্ত অভাব সিদ্ধ হয়। অতীত ও অনাগত দুই অবস্থায় প্রত্যক্ষ প্রতিযোগি-সম্বন্ধের অনুপলব্ধি হইতে পারে—এবং সেই সম্বন্ধের অনুপলব্ধিকে সাময়িক অত্যন্ত অভাব বলিয়াও বুঝান যাইতে পারে, কিন্তু তৎকালে সম্পূর্ণ প্রতিযোগি-সত্তার অত্যন্ত অভাব বলিলে যুক্তি দাঁড়াইবার স্থান পায় না। এই জন্য প্রাচীনগণ অভাবকে ভাবেরই অবস্থা বিশেষ বলিয়া পৃথক পদার্থ কল্পনা করেন নাই।

"'ঘট ছিল, এখন নাই'—অথবা 'ঘট পূর্ব্বে ছিল না' বলিলে—এই তিন 'বলায়' এক নিত্য ঘট পদার্থের আকাঙ্ক্ষা হয়। সেই ঘট পদার্থ সে অসৎ বা নাই ইহা বলিলে গুরু-কল্পনা হয়। গুরু কল্পনা ছাড়িয়া লঘু কল্পনাই প্রশস্ত। অতএব সৎ-কার্য্য ঘট ত্রিকাল অর্থাৎ অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান কালের মধ্যে স্বীকার না করিলে ত্রিবিরোধ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।"

বিজ্ঞানভিক্ষুর কথা বা যুক্তির মধ্যে কোনই অস্পষ্টতা নাই।

বিবর্ত্ত-বাদ—মায়াবাদই ইহার নামান্তর। ইহার মুখ্য প্রতিপাদ্য এই,—সত্তা যাহা, তাহা ত্রৈকালীন বাধারহিত, কূটস্থ ও অপরিণামী। তাহার যে অজ্ঞানকল্পিত পরিণাম-বিলক্ষণ অন্যথারূপে উত্তরোত্তর সত্য বলিয়া উপলব্ধি হয়—সেই উপলব্ধি অসৎ ও ঔপচারিক বা মিথ্যা। ইহাই সত্য-বস্তুর মায়িক বিবর্ত্ত, রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজতভ্রম।

অতএব সাংখ্যগণ যাহাকে বলেন কার্য্য-সত্তা তাহা অবিদ্যামূলক মিথ্যা প্রতীতিমাত্র। ব্রহ্মই জগতের একমাত্র বিদ্যা-মূলক কারণ ও কার্য্য। কিন্তু কার্য্য-কারণকে আমরা দেখিতেছি কার্য্য-কারণরূপে,—অভিন্ন-নিমিত্ত-উপাদান ব্রহ্মরূপে নহে। সুতরাং এক মিথ্যার সঙ্গে আর এক মিথ্যাকে যোগ করিয়া বিচার করিলে, তাহা মিথ্যা বিচার ভিন্ন আর কিছুই দাঁড়ায় না।

অনেকের বিশ্বাস যে, এই মায়াবাদ ছাড়া আমাদের দার্শনিক পুঁজি আর নাই। এবং এই জগৎ মিথ্যাবাদ ছাড়া অন্য কোন সম্মান-যোগ্য মতবাদ কদাপি কস্মিন কালে যেন আমাদের দেশের ভদ্রসমাজে গৃহীত হয় নাই। দার্শনিকের পক্ষে অদ্বৈতবাদ অস্বীকার করা ও আত্মহত্যা করা যেন একই কথা। ইহা বিষম ভুল।

শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে মায়াবাদ যে বর্ত্তমান আকারে ও বর্ত্তমান অর্থে কদাপি ভারতবর্ষে গৃহীত হয় নাই ইহা বিবেচনা করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। পদ্মপুরাণকার বলিয়াছেন—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ।
ময়ৈব কথিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণ-রূপিণা॥

—'মায়াবাদ অসৎশাস্ত্র—ইহা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত। হে দেবি! আমিই কলিতে ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া ইহাকে জগতে প্রথম ব্যক্ত করিয়াছি।'

বিজ্ঞানভিক্ষু ইঁহাদিগকে তথাকথিত 'নবীন বেদান্তিবাদি' বলিয়াছেন।

অনাদিকালের শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত আমাদের দেশের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড যে 'জগৎ অসত্য' এই তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাও কেহ বলিতে পারেন না।

সাংখ্য দর্শন স্পষ্টবাক্যে এই মায়াবাদ অস্বীকার করিয়াছেন। "জগৎ সত্যত্বম্—অদুষ্টকারণ-জন্যত্বাৎ, বাধকাভাবাৎ চ" (সাং ৬।৫২) জগতের সত্যত্বই সিদ্ধ-কেন না জগৎ ভ্রম, মায়া, নিদ্রা প্রভৃতি দুষ্ট কারণ-জন্য নহে, এবং জগৎ-জ্ঞানের কোন বাধক নাই। সাংখ্য-কার প্রথম অধ্যায়ে বিস্তীর্ণভাবে মায়াবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। কারিকার কৌমুদীভাষ্যে মহামতি বাচস্পতি মিশ্র বারম্বার বলিয়াছেন—"প্রপঞ্চ প্রত্যয়শ্চ অসতি বাধকে ন শক্যো মিথ্যেতি বক্তুম্"—প্রপঞ্চ প্রত্যয়ের কোন বাধক না থাকায় জগৎ প্রপঞ্চকে মিথ্যা বলা যায় না। ষড়দর্শনকারদের মধ্যে নিশ্চিতভাবে কণাদ, গৌতম, কপিল, জৈমিনি, পাতঞ্জল এবং বোধ হয় বাদরায়ণও জগৎ মিথ্যা বলেন নাই।

সুতরাং শঙ্করের মায়াবাদ ও নব্য ন্যায়ের অভাব-বাদ, বৌদ্ধগণের শূন্যবাদের আবহাওয়ার মধ্যে কতটা যে বর্দ্ধিত হইয়াছিল ও কতটা তাহার দ্বারা পরামৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা দর্শনের পুরাবিৎ নির্দ্ধারণ করিবেন।

সৎকার্য্যবাদ।—অবশেষ ক্রমে কেবল বাকী থাকেন তাঁহারা, যাঁহারা নাকি বলেন যে উৎপত্তি যখন পূর্ব্ব হইতেই প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যমান নাই এবং সেই জন্য অসৎ, তখন উৎপন্ন কার্য্যকে পূর্ব্বভাবে কারণের মধ্যে অনুসন্ধান করা ব্যর্থ প্রযত্ন। সাংখ্য ইহার উত্তরে বলেন—কার্য্যকে যদি কারণগত বলিয়াই স্বীকার না কর, তবে কার্য্যকে কার্য্য বলিয়াও স্বীকার করা চলিবে না। ইহার হেতু—

অসৎ অকরণাৎ, উপাদান-গ্রহণাৎ, সর্ব্বসম্ভব-অভাবাৎ।
শক্তস্য শক্যকরণাৎ, কারণ ভাবাচ্চ সৎকার্য্যম্॥

কারিকা ৯।

অর্থাৎ সৎকার্য্যবাদের সপক্ষে যুক্তি এই:—

১। অসৎ অকরণাৎ। অসৎকে কেহই করিতে পারে না, তাহার 'করণ' নাই। মানুষের শিং একটি অবাস্তব ও অসৎ বিষয়। তাহার করণ বা উৎপত্তি হয় না কেন? মানুষের কপালে শিং উঠিবার কোন্ বাধা? উঠিলে ত উঠিতে পারে?—না তাহা পারে না। এবং পারে না এই জন্য, যে মানুষের উৎপত্তির যে কারণ তাহার মধ্যে শিং নাই। গরুর উৎপত্তি কারণে শিং আছে বলিয়া গরুর মাথায় শিং উঠে, মানুষের কারণে তাহা নাই সেই জন্য মানবজাতি 'শৃঙ্গ-শোভায় বঞ্চিত। সুতরাং উৎপত্তির পূর্ব্বে শিং এই পদার্থটিকে যদি কোন-না-কোন আকারে কারণ মধ্যে স্বীকার করা যায় তবে শৃঙ্গোৎপত্তি অসম্ভব হয়। ইহাই সৎকার্য্যবাদ।

২। উপাদান গ্রহণাৎ। উপাদান-কারণের গ্রহণ দ্বারাও তাহা সিদ্ধ হয়। দধিতে যাহার প্রয়োজন সে দুগ্ধকেই খোঁজে, জলকে খোঁজে না। কেন খোঁজে না?—কারণ, দধ্যার্থী জানে দুগ্ধের মধ্যেই দধি আছে, জলের মধ্যে নাই। কার্য্যের সঙ্গে কারণের এই নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ কোনরূপেই উপপন্ন হইত না, যদি কার্য্যকে কারণের মধ্য দিয়া না দেখা যাইত। ইহাই সৎকার্য্য বাদ।

৩। সর্ব্বসম্ভব-অভাবাৎ। সর্ব্বত্র সকল বিষয় যথেচ্ছা-ক্রমে উৎপন্ন হয় না। তাহার হেতু এই যাহা সম্ভূত হয় তাহা একটা অনবধার্য্য, অচিন্তিত, যথেচ্ছ ও আকস্মিক ব্যাপার নহে। তাহা কারণ সত্তার শক্তি, সামর্থ্য, রূপ, গুণ ও পরিমাণের কেন্দ্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলিয়া, উৎপত্তি, কারণ সত্তার শক্তি সামর্থ্যকে অতি-

ক্রম করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে উৎপন্ন হইতে পারে না। ইহাও সৎকার্য্যের প্রতিপাদক।

৪। শক্তস্য শক্যকরণাৎ—শক্তপদার্থই, শক্য পদার্থকে উৎপন্ন করিতে পারে। কেহ কেহ বলিবেন শক্য কার্য্য শক্তিরই সমষ্টি। বিভিন্ন শক্তির সমাহার হইলেই শক্য পদার্থ উৎপন্ন হয়। ইহা অবশ্যই সত্য। কিন্তু সে শক্তি ত আশ্রয়হীন ভাসমান শক্তি নহে। সৃষ্টির ব্যবস্থায় শক্তি চিরদিন শক্তপদার্থেরই আশ্রিত। বস্তুকে ছাড়িয়া যেমন বেগ (force) নাই, তেমনি শক্তকে ছাড়িয়া কোন শক্তি নাই। অতএব কেবল শক্তির সমাহারে নহে, কিন্তু শক্ত পদার্থের মধ্যেই শক্তির সমাহারে শক্য উৎপন্ন হয়। সুতরাং সেদিক দিয়াও সৎকার্য্য সিদ্ধ হয়।

৫। কারণ ভাবচ্চ—কারণ ভাব ইহাতেও সৎ কার্য্য সিদ্ধ হয়। আমের বীজে আমগাছই জন্মে, জামগাছ জন্মে না। ইহাই কার্য্যকারণের ভাব। শ্রুতিতে মন্ত্র আছে—"সদেব সৌম্য! ইদম্ অগ্রে আসীৎ"—হে সৌম্য! এই সৎই, সৃষ্টির পূর্ব্বে কারণ-রূপে ছিল। ইহার অর্থ এই কারণ পুটের মধ্যে এই অবিকশিত জগৎ, কুঁড়ির মধ্যে অবিকশিত ফুলের ন্যায় ঘুমাইতেছিল। সেখানেও কার্য্য ও কারণ যদি বিভিন্ন হয় তবে তাহা সম্ভব হইতে পারে কি করিয়া?

আচ্ছা, তাহা যেন হইল। কার্য্য যেন কারণের মধ্যেই আছে মানিলাম। ঘট মৃত্তিকার মধ্যেই আছে। কিন্তু মৃত্তিকার মধ্যে যে ঘটটি আছে—তাহা কি কুমার মহাশয়ে প'নে পোড়ান এই লাল ঘটটি! তাহা যদি হয়, তবে বলিতে হইবে যাহা পূর্ব্ব হইতেই উৎপন্ন ছিল তাহারই উৎপত্তি হইল। কিন্তু মৃতের যেমন মরণ অসম্ভব, উৎপন্নেরও তেমনি উৎপত্তি অসম্ভব "নভাবে ভাবযোগশ্চেৎ" (সাং ১।১১৯) ভাব পদার্থের আবার-ভাবযোগ ত হইতে পারে না?

এই আপত্তির উত্তরে দর্শনকার বলেন "ন, অভি-ব্যক্তি-নিবন্ধনৌ ব্যবহার-অব্যবহারৌ" (সাং ১।১২০) না, তাহা নহে। ঘটের যাহাকে উৎপত্তি বলা যায় তাহা কোনও অভিনব ব্যাপার নহে। ঘটের অনভিব্যক্ত বা অপ্রকটরূপের প্রকট হওয়ারই ব্যব-হারিক নাম উৎপত্তি, অভিব্যক্ত না হওয়ার নামই অনুৎপত্তি। যেমন গর্ভস্থ শিশু ভূমিষ্ঠ হইলেই আমরা বলিয়া থাকি শিশু উৎপন্ন হইল, যেমন সর্ষপাভ্যন্তরস্থ তৈল নিষ্পীড়িত হইয়া বাহিরে আসিলেই আমরা বলি তৈলের উৎপত্তি হইল, তেমনি ঘট কারণ ব্যাপার দ্বারা তাহার অপ্রকটরূপ ত্যাগ করিয়া প্রকট রূপ ধারণ করিলেই, অনভিব্যক্ত অবস্থা ছাড়িয়া অভিব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই, উৎপত্তি বলার ব্যবহার। অপ্রকট ও প্রকটরূপের প্রসঙ্গবশতই উৎপত্তি ও অনুৎপত্তির ব্যবহার। ইহা উৎপন্নের উৎপত্তি নহে, ইহা কার্য্য সত্তার গর্ভমোচন, অনভিব্যক্তের ব্যক্ত হওন। এবং অনভিব্যক্তি ও ধ্বংসরূপকে যদি নাশ বলা যায়, তবে সে নাশ শূন্যতা প্রাপ্ত হওয়া নহে—একেবারে 'কিছুই-না' হইয়া যাওয়া নহে, অত্যন্ত-অভাব নহে, সে "নাশঃ কারণলয়ঃ" (সাং ১।১২১)। তাহা কারণ-লয় অবস্থা।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি আচার্য্য টিণ্ডেল প্রমুখ বর্ত্তমানকালের সৎ-কার্য্য-বাদীরা কার্য্য-কারণকে বৈজ্ঞা-নিকের চক্ষে দেখিবার পরামর্শ দিয়াছেন। সাংখ্যদর্শন-অধ্যেতা বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হইয়া দেখিবেন আমাদের পুরাতন আচার্য্যও অন্বেষণার এই অভিনব পথ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। "পারম্পর্য্যতোঽন্বেষণা বীজাঙ্কুরবৎ" (সাং ১।১২২)। বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তিবৎ পারম্পর্য্য-ভাবে অন্বেষণ করিতে হইবে। অর্থাৎ, কিছুই ছিল না, হঠাৎ কিছু হইল—ইহা অন্বেষণার রীতি ও পরিক্রম্য নহে। অভিব্যক্তির অন্বেষণাকে বীজ হইতে অঙ্কুরাদি ক্রমে নিয়মিত করিতে হইবে। সাংখ্যের অভিব্যক্তবাদী দেখিতেছেন—এক রেণু পরিমাণ বটবীজের মধ্যে এক দিগন্তব্যাপি বৃক্ষ-নারায়ণ যোগনিদ্রামগ্ন ও অভি-শায়িত। অঙ্কুরোৎপত্তির উপক্রমের সহিত সেই অনভি-ব্যক্ত বনস্পতির নিদ্রাভঙ্গ হইল। অঙ্কুর হইতে আরম্ভ করিয়া বনস্পতি তাঁহার অনন্ত অভিব্যক্তির পথে যাত্রা করিলেন। যাহা তাহার অনাগত-রূপ ছিল তাহা আগত

হইল—যাহা আগত হইল, তাহা আবার তাহার অতীত রূপের মধ্যে লুকাইয়া গেল। এইরূপে অনন্তকালে তাহার অনন্ত-রূপ পর পর ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু এই সমস্ত রূপই সংহৃত হইয়া সেই আদিম রেণুবৎ বীজ-পুটের মধ্যে অভিশায়িত ছিল।

বর্ত্তমান এভোলিউসন্ থিওরিও কি সেই কথাই বলে না? যদি তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকে আমরা সাক্ষী ডাকিতে প্রস্তুত। এবং আচার্য্য হক্সলির ন্যায় এভোলিউসন-বাদের মর্ম্মজ্ঞ সাক্ষী একান্তই দুর্লভ। এখন পাঠক বিচার করুন ইহা সাংখ্যের বিবৃতি না ডারুইনের বিবৃতি:—"If the fundamental proposition of Evolution is true, namely that the entire world, animate and inanimate, is the result of mutual inter-action according to definite laws of forces possessed by the molecules which made up the primitive nebulousity of nature, then it is no less certain that the present actual world reposed potentially in the cosmic vapour, and that an intelligence if great enough could, from his knowledge of the properties of molecules of that vapour, have predicted the fauna of Great Britain in 1885 with as much certitude, as we may say what will happen of our breath in a cold day in winter"—*Huxley's* Lay Sermons and Lectures.

শ্রীনগেন্দ্রনাথ হালদার।

আড়াই চাল

(উপন্যাস)

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বাসায় আসিয়া সাইকেলটা যথাস্থানে রাখিয়া ঘর্ম্মাক্ত জামার বোতাম খুলিতে খুলিতে হাতের বইগুলা বিছানার উপর ফেলিয়া অমল পাশের বাড়ীর জানালার দিকে চাহিয়া একেবারে ভয়ানক চমকিয়া উঠিল।—দেখিল সেই জানালার গরাদে ডান হাত রাখিয়া, বাম হাতে সদ্যঃ ইস্ত্রীকরা ডবল ব্রেষ্ট কামিজের বুকের বোতাম ঘুরাইতে ঘুরাইতে, ধব্‌ধবে সুন্দর চেহারার একজন যুবক, সোনার ফ্রেমমোড়া চশমার ভিতর হইতে দ্রুতচঞ্চল কটাক্ষে উৎসুকভাবে এদিক ওদিক চাহিতেছে, মাঝে মাঝে অবশ্য অমলের জানালার দিকেও দৃষ্টিদান করিতে ছাড়িতেছে না। তাহার গোঁফ দাড়ি কামানো,—মাথায় ঘনকৃষ্ণ চুলেও—সৌখীন না হোক, মোটামুটি ধরণের একটু টেড়ি ফিরান রহিয়াছে। যুবকটি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এ দিক ওদিক চাহিতেছে, আর—কাহারও মনোযোগ আকর্ষণের জন্য মানুষ যেরূপভাবে গলা খাঁখারি দেয়,—সেইরূপ ভঙ্গিমায় থাকিয়া থাকিয়া মৃদুমন্দ কাসিতেছেন।

কে ঐ ব্যক্তি, কি অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছে—ভাবিতে গিয়া অমলের দুই চক্ষু ঈর্ষায় জ্বলিয়া উঠিল। চাকরের কথা মনে পড়িল, ঐ বাড়ীর বাবু মেয়ের বিবাহ দিবার জন্য এদেশে আসিয়াছেন।—দেশ, কাল, পাত্রের সংস্থান সমাবেশের সহিত কার্য্য-কারণ সম্পর্ক সংযোগ করিয়া প্রখর বুদ্ধিমান অমলচন্দ্র তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিল—ঐ চশমা পরা

লোকই সম্ভঃ ইস্ত্রী করা শার্ট পরিয়া এবাড়ীতে আসিয়াছে—নিশ্চয়ই মেয়ে দেখিতে।—সঙ্গে সঙ্গে অমল সেই সিদ্ধান্তের ভবিষ্যৎ পরিণাম ও মীমাংসা নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিল যে, লোকটা অবশ্যই পাত্রীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া, আজই বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া বিদায় লইবে। ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

অমলের জামা জুতা ছাড়া, হাত মুখ ধোয়া বিশ্রাম করা, সব ঘুলাইয়া গেল। অকারণ ক্ষোভ ও অর্থহীন বিদ্বেষে তাহার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। নিজের জানালার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইয়া ভীষণ ভ্রূভঙ্গিপূর্ণ কটাক্ষে সে ঐ লোকটাকে যতদূর সম্ভব ভাল করিয়া দেখিয়া লইতে চেষ্টা করিল।

কিছুক্ষণ পরে লোকটা সরিয়া গিয়া জানালার সোজাসুজি একটা চেয়ারে বসিয়া গৃহমধ্যস্থ আর এক ব্যক্তির সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল, মাঝে মাঝে হাসিও চলিতে লাগিল। আর থাকিয়া থাকিয়া লোকটা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অমলের গৃহের বাতায়ন নিম্নস্থ বহুদিনের অসংস্কৃত অর্দ্ধভগ্ন কার্ণিশের শোভা দেখিতে লাগিল। অমলের ধৈর্য্যচ্যুতির উপক্রম ঘটিল। হঠাৎ ধড়াস্ করিয়া সে নিজের জানালা বন্ধ করিল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক সেই অবস্থায় কাটিল। তারপর অমল শুনিল,ও বাড়ীর বেহারা চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলিতেছে, "বাবু, গাড়ী আয়া।"

অমল চট করিয়া অন্তদিকের জানালায় সরিয়া আসিয়া দেখিল,—হাঁ রাস্তায় একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু সেখানা মোটরও নহে ল্যাণ্ডোও নহে, ব্রুহাম ফিটন কিছুই নহে, সামান্য একখানা ছ্যাকড়া গাড়ী মাত্র!—অমল মনে মনে কতকটা আশ্বস্ত হইল, যাক্ লোকটার অবস্থার পরিচয় কিছু তবু পাওয়া গেল।

দুই মুহূর্ত্ত ভাবিয়া অমল মনে মনে একটা ফন্দী ঠাহরাইল, এবং তৎক্ষণাৎ একখানা চাদর ও ছাতাটা টানিয়া উর্দ্ধশ্বাসে বাসা হইতে বাহির হইয়া, দ্রুতপদে ঐ বাড়ীর সামনে রাস্তায়, যেখানে গাড়ীখানা দাঁড়াইয়া ছিল, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল তখনও গাড়ীতে সওয়ারী কেহ চাপে নাই, কিন্তু গাড়োয়ানটা গাড়ীর চারিদিকের জানালাগুলা বন্ধ করিয়া দিতেছে। অমল আশ্চর্য্য হইল—মনে মনে বিদ্রূপ করিয়া বলিল "কর্ত্তা অসূর্য্যম্পশ্যা না কি?"

কিন্তু রুদ্ধ বাতায়ন গাড়ীতে আরোহীর আরোহণ ব্যাপার দর্শন প্রতীক্ষায় কৌতূহলী দৃষ্টি মেলিয়া হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা ভদ্রলোকের পক্ষে সমীচীন নহে। অমল ধীরে ধীরে ফুটপাত অতিক্রম করিয়া পাশের গলির মধ্যে ঢুকিল। নিকটেই একটা পাণের দোকান ছিল, দোকান হইতে এক পয়সার সাজাপান কিনিয়া লইয়া অবিলম্বে আবার ফিরিল।

গলি হইতে বাহির হইয়া, অমল দেখিল, এবার বাড়ীর বেহারাটা গাড়ীর পা-দানের কাছে দাঁড়াইয়া গাড়ীর দুয়ার আধ ভেজাইয়া বাড়ীর দ্বারের দিকে চাহিয়া যেন কাহার অপেক্ষা করিতেছে—অমলের বুঝিতে বাকী রহিল না যে গাড়ীতে কেহ চড়িয়াছে, এবং অতঃপর আরও কেহ চড়িবে।

দ্বারের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অমল অন্তদিকের ফুটপাথ ধরিয়া খুব আস্তে আস্তে হাঁটিয়া চলিল। যখন গাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে, তখন দেখিল বাড়ীর ভিতর হইতে দুইজন পুরুষ মানুষ বাহির হইয়া আসিতেছে, অগ্রবর্ত্তী ব্যক্তি সেই লোক।

অমল তীব্র কটাক্ষে তাহার পানে চাহিল, কিন্তু পরক্ষণে তাহার সঙ্গীর দিকে নজর পড়িতেই, অত্যন্ত থতমত খাইয়া,—অমল তাড়াতাড়ি মুখের উপর ছাতা মুড়ি দিয়া হন্ হন্ করিয়া অগ্রসর হইয়া পড়িল। গাড়ীখানার দিকে ফিরিয়া চাহিতেও তাহার সাহস হইল না,—সে ব্যক্তির সঙ্গী আর কেহ নহে, স্বয়ং মেজ দাদা!

উৎকট দুশ্চিন্তায় অধীর হইয়া অমল যখন বাসায় আসিয়া পুনরায় নিজের ঘরের জানালা দিয়া উঁকি মারিল, তখন গাড়ীখানা চলিয়া গিয়াছে।

চেয়ারে বসিয়া, বিছানায় শুইয়া, এবং কক্ষতলে

বারম্বার পরিক্রমণ করিয়া, ঝাড়া তিনঘণ্টা ধরিয়া অমল, অনেক ভাবনা ভাবিল, কিন্তু মেজদা যে কোথা হইতে কেমন করিয়া, কি সম্পর্ক ধরিয়া ঐ লোক-টার সঙ্গী হইয়া এ বাড়ীতে কেন আসিয়াছিলেন, অমল সে রহস্যের কোনই মীমাংসা করিতে পারিল না।

অমল যখন গুরুতর চিন্তায় একান্ত ব্যতিব্যস্ত, তখন তাহার বন্ধু অনিলবাবু আসিয়া সহাস্য মুখে গুড্ ইভ্নিং জানাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "আপনার এ্যাক্ট সব কমপ্লিট-হয়ে গেছে ত? প্রিন্সিপাল মহা চটে গেছেন, বল্লেন থিয়েটারের হুজুকে ছেলেদের ভয়ানক ক্ষতি হচ্ছে,—এ হুজুক শীঘ্র ঠাণ্ডা করা চাই, আসছে রবিবারের পর রবিবার থিয়েটার হবে না, এই রবিবারেই থিয়েটার শেষ করতে হবে, তাই আপনার কাছে ছুটে এলুম, আপনার সব তৈরী হয়ে গেছে ত?—যা বাকী আছে, আজ কালেই তৈরী করে নিন্—"

অমল কষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া সবিনয়ে ক্ষমা চাহিয়া সংক্ষেপে বলিল, কতকগুলি পারিবারিক দুর্ঘট-নায় তাহার মনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে, এ অবস্থায় হরিরাজের অভিনয় দেখাইয়া, লোকের হাততালি ও বাহবা আদায় করিবার মত ধৈর্য্য বা ক্ষমতা তাহার নাই, অতএব থিয়েটার উদ্যোগি-গণ যেন অন্য হরিরাজের সন্ধান করেন ইত্যাদি—

অনিল আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "এঃ, কি একটা কথা?"

অমল দৃঢ়স্বরে বলিল,"এই আমার শেষ কথা মশায়। এখন ঠাট্টা তামাসার সময় আমার নেই,—আমায় এখনি মেজদার বাসায় যেতে হবে, সেখানে আমার জরুরি কাজ আছে—"

অনিল চিন্তিত হইয়া বলিল, "শুনুন অমলবাবু—"

অমল অধীর হইয়া বলিল, "কিছু শোনবার সময় আমার নেই মশায়, বেশী কেন অনর্থক পীড়াপীড়ি করবেন। আমার চোদ্দপুরুষে কেউ কখনও থিয়েটারী হুজুকে মাতে নি, আমি মেতে ঠেকেছি, আর নয়,—অনুগ্রহ করে আমার নামটা আপনাদের লিষ্ট থেকে বাদ দেন,—"

বিনয় সম্ভাষণে বন্ধুকে বিদায় দিয়া অমল ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল তখন রাত্রি ন'টা।—কিন্তু উৎকণ্ঠায় তাহার কণ্ঠ শুকাইয়া উঠিয়াছিল, সে দ্বিধামাত্র না করিয়া সেই রাত্রে সাইকেল লইয়া মেজদার বাসায় ছুটিল।

মেজদার বাসার দ্বারে পৌঁছিয়া দেখিল, বাড়ীর ছেলেরা ও চাকর বাকরগুলি তত রাত্রেও অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে ঘোরাঘুরি করিতেছে, উদ্বিগ্ন হইয়া অমল ভজহরি চাকরকে ডাকিয়া বলিল, "ভজু ব্যাপার কি? বাড়ীর সব ভাল ত?

ভজহরি অমলের মুখপানে চাহিয়া, এমনই আশ্চর্য্য ভাব প্রকাশ করিল, যেন সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের আগমনও সে সময় ইহা অপেক্ষা বেশী স্বাভাবিক ছিল। মাথা চুল-কাইয়া বলিল, "ছোটবাবু এত রাত্রে হঠাৎ যে?—তা আজ্ঞে হ্যাঁ বাড়ীর সব ভাল—"

অমল বলিল, "মেজদাদা কি উপরে রয়েছেন?—মেজ বৌদি কি সেখানে আছেন?—"

অধিকতর কুণ্ঠিত হইয়া ভজহরি বলিল,"আজ্ঞে হ্যাঁ, মেজ বৌমার ভাই, ভাজ, বোন সবাই সেখানে আছেন—"

চমকিয়া অমল বলিল, "এ্যাঁ মেজ বৌদির ভাই বোন?—"

ভজহরি বলিল "আজ্ঞে, আজ এখানে যে তাঁদের নিমন্ত্রণ—"

সাইকেলের মুখ ঘুরাইয়া প্রস্থানোদ্যত অমল বলিল, "ওঃ, তবে থাক। দ্যাখো ভজু, আমি এখন এসেছিলুম একথা যেন কাউকে বোল না—"

সাইকেলে উঠিয়া, অমল ক্ষণমধ্যে অন্তর্হিত হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কোনরকমে রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রাতঃকালে উঠিয়াই অমল জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। ও বাড়ীর মুক্তদ্বার বাতায়নের ভিতর হইতে গৃহাভ্যন্তরে যে দৃশ্য

দেখা গেল, তাহাতে অমলের চক্ষুস্থির হইল। দেখিল, পূর্ব্বদিনের সেই লোকটা জানালার কাছে চেয়ারে বসিয়া চা খাইতে খাইতে, নিশ্চিন্ত আরামে খবরের কাগজ পড়িতেছে!

অমলের হাড় জ্বলিয়া গেল,—কল্পনাবলে সে তৎক্ষণাৎ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিল যে, নিশ্চয়ই পূর্ব্বদিনে বিবাহের কথাবার্ত্তা সব ঠিক হইয়া গিয়াছে, এবং বাড়ীর লোকের অনুরোধে, সম্ভাবিত আত্মীয়তাটা পূর্ব্বাহ্ণেই ঘনিষ্ঠতর করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে, আজ সে প্রাতঃকালেই নির্লজ্জের মত চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছে!—হয়ত অন্যান্য বিষয়ের আরও প্রয়োজন আছে।

কিছুক্ষণ পরে লোকটা উপর হইতে নামিয়া আসিয়া বাড়ীর সম্মুখে ফুটপাথের উপর পায়চারি করিতে লাগিল। এবার তাহার আপাদমস্তকের সাজসজ্জার উপর দৃষ্টিপাত করিয়া অমলের আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না যে ইহা শুধু নুতন জামাইবাবু সাজা ছাড়া আর কিছু নয়! অমল স্থির নয়নে চাহিয়া চাহিয়া, সেই লোকটার পায়ের রেশমি ফুলকাটা মখমলের জুতা, পরণের চুনট করা ফরাশডাঙ্গার জড়িপাড় ধুতি এবং গায়ের আধুনিক প্রচলিত 'গাজের' পাঞ্জাবী ও তাহার সূক্ষ্ম আবরণাভ্যন্তর হইতে স্পষ্ট দৃশ্যমান রঙিণ শিল্কের গেঞ্জি যতই দেখিতে লাগিল, ততই তাহার মন বিলাসিতার প্রতিকুলে ঘৃণায় বিষাক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। দরিদ্র বাঙ্গলাদেশের ভদ্রলোক আখ্যাধারী লোক গুলা সৌখীন সভ্যতার দোহাই দিয়া যে কিরূপ মূঢ়ভাবে, ঐরূপ অসহনীয় বিলাসিতায় অর্থ ও সময়ের অপব্যয় করে, সে সম্বন্ধে অমলের আজ দিব্যদৃষ্টিলাভ হইল। নিজের সাজ সজ্জা সম্বন্ধেও অমলের রুচি ফিরিয়া গেল, এবং ঐ লোকটাকেও এ সম্বন্ধে খুব তুড়িয়া দশকথা শুনাইয়া, ভারতের অর্থকষ্ট সম্বন্ধে তাহার চৈতন্য সম্পাদন করাইবার ইচ্ছা হইল।

অমল দেখিল, লোকটা ফুটপাথের উপর পায়চারি করিতে করিতে বক্র কটাক্ষে ঘন ঘন অমলের অধিকৃত গৃহখানার পানে তাকাইতেছে। অমলের সন্দেহ ক্রমশঃ শঙ্কায় পরিণত হইল। সে ভাবিতে লাগিল, এ লোকটা ত অমলের সেই 'অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির' অন্তরালে সেই 'ইচ্ছাকৃত বাঁদরামি প্রকাশক' গুপ্ত তথ্য,—অর্থাৎ 'হৃদয়োচ্ছ্বাস' উপঢৌকনের সংবাদটা ত ইতিমধ্যে জানিয়া ফেলে নাই?—অমলের মন অধীর হইয়া উঠিল।

অবশেষে অমলের হৃদয়ে স্থির বিশ্বাস বদ্ধমূল হইল যে, আর যাহাই হউক,—কিন্তু লোকটার চাহনি দেখিয়া তাহাকে পুরা শত্রু বলিয়া বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে! —সঙ্গে সঙ্গে অমল ঐ লোকটাকে জব্দ করিবার ফন্দী উদ্ভাবনে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

একবার ভাবিল, সাইকেলটা লইয়া বাহির হইয়া সুকৌশলে ঐ নিশ্চিন্ত ভ্রমণশীল ফুল-বাবুটির ঘাড়ের উপর পড়িয়া উহার একটা হাত কিম্বা পা জখম করিয়া কিছুদিনের মত উহাকে শয্যাশায়ী রাখিবার বন্দোবস্ত করে। আবার ভাবিল, কোনসূত্রে দ্বন্দ কলহ বাঁধাইয়া ঐ লোকটার সহিত ইউরোপীয় প্রথায় 'ডুয়েল' লড়িবার ব্যবস্থা স্থির করিয়া ফেলে, এবং যদিচ অমল কোনদিন স্বহস্তে পিস্তল স্পর্শ করিবার সুযোগ জীবনে পায় নাই, তথাপি—কোন গতিকে একটা ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রপ্রভাবেই হউক অথবা যেরূপে হউক, রাতারাতি লক্ষ্য ভেদে সিদ্ধহস্ত হইয়া অব্যর্থ সন্ধানে পিস্তলের এক গুলিতে লোকটার মাথার খুলি উড়াইয়া দিয়া,—ইহজীবনের মত উহার সুন্দরী বধূলাভের সখ মিটাইয়া দেয়। আরও কত কি উদ্ভট সঙ্কল্প অমলের মাথায় উদয় হইল, কিন্তু সেগুলার একটাও কাজে লাগাইবার উপযুক্ত বোধ হইল না। কাজেই কাজ কিছু হইল না। লোকটা পুনরায় নিরাপদে বাড়ী ঢুকিল।

দেখিতে দেখিতে বেলা দশটা বাজিয়া গেল। হঠাৎ অমলের খেয়াল হইল,—ঐ লোকটার এবং এই বাড়ীর অধিবাসীগুলির সঠিক পরিচয় আজ যেরূপেই হউক মেজদার নিকট হইতে জানিতে হইবে। কাল তাঁহার শালা শালী'র উপদ্রবে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়াছে, আজ জানা চাই-ই।

তখনই সাইকেল লইয়া মেজদার বাসায় পৌঁছিয়া, অমল সটান মেজদার শয়ন কক্ষে উপস্থিত হইল। মেজদা তখন সামনে টেবিলের উপর আয়না রাখিয়া, চেয়ারে বসিয়া স্বহস্তে ক্ষৌর কার্য্য সম্পাদন করিতেছিলেন। মেজবৌদি ছয়মাসের শিশু খোকাটিকে কোলে লইয়া নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন। অমল 'মেজদা' বলিয়া ঘরে ঢুকিয়াই, বিনা ভূমিকায় একেবারে প্রশ্ন করিয়া বসিল, "কাল বৈকালে তুমি পটলডাঙ্গায় কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়েছিলে ?"

মেজ বৌদি ঘোমটা টানিয়া একখানা চেয়ার অমলের দিকে সরাইয়া দিলেন,—'থাক থাক' বলিয়া অমল চেয়ারটায় বসিল। মেজ বৌদি অমলের পিছনে দাঁড়াইয়া, হাস্যরঞ্জিত অধরে, গোপনে মেজদাকে কি ইঙ্গিত করিলেন, মেজদা হাতের ক্ষুর নামাইয়া বলিলেন "হাঁ গেছলুম—"

উৎকণ্ঠিত ভাবে অমল বলিল, "তুমি যখন সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এস, তখন তোমার সঙ্গে একটি বাবু ছিলেন সুন্দর চেহারা,—চোখে চশমা—"

মেজদা চশমা ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা সম্বন্ধে বেশ প্রশংসা ছিল। অমলের চশমা মোড়া চক্ষু দুইটির উদ্বেগ চঞ্চল দৃষ্টির প্রতি স্থির লক্ষ্য স্থাপন করিয়া ঈষৎ হাসিয়া তিনি বলিলেন, "ইউনিভার্সিটির রেজিষ্ট্রি খাতায় যাদের নাম আছে, তাদের শতকরা নিরেনব্বুই জনের চোখ খারাপ, ও ত জানা কথা। হবে—চোখে চশমা ছিল, তারপর…?"

অধীর হইয়া অমল বলিল "খুব 'ফব্' গোছের লোক, গায়ে ডবলব্রেষ্ট শার্ট ছিল, একটা বাড়ী থেকে বেরিয়ে তোমার সঙ্গে ভাড়াটে গাড়ীতে চড়ে—"

মাথা নাড়িয়া মেজদা বলিলেন, "ওঃ বুঝেছি, হ্যাঁ ছিলেন একটি ভদ্রলোক—"

রুদ্ধশ্বাসে অমল বলিল, "তিনি কে ?"

ঘোমটার ভিতর হইতে উৎসুক দৃষ্টিক্ষেপকারিণী মেজবৌদির দিকে চকিত কটাক্ষপাত করিয়া মেজদা গম্ভীর মুখে বলিলেন, "তিনি একজন এম-এ, এখন 'ল' পড়ছেন, আমার ক্লাশফ্রেণ্ড ছিলেন, এবার ভায়রা ভাই হবেন। আমার শালীকে কাল 'কনে' দেখ্‌তে গেছলেন।"

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া অমল বলিল, "তোমার শালীকে ? কনে দেখ্‌তে ? কোথায় ?—"

চামড়ার উপর ক্ষুর শানাইতে শানাইতে পরম ঔদাস্যের সহিত মেজদা বলিলেন "পটলডাঙ্গার সেই বাড়ীখানা আমার শ্বশুর ভাড়া নিয়েছেন, মেয়ে-ছেলেরা ঐখানেই আছে, ঐখান থেকেই বিয়ে হবে কি না।"

অমলের বাক্‌শক্তি যেন লোপ হইয়া গেল!—দুই মুহূর্ত্ত সে কথা কহিতে পারিল না। তারপর ঢোক গিলিয়া বলিল, "ওঁরই সঙ্গে তোমার শালীর বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেল ?"

দাড়ি চাঁচিতে সুরু করিয়া মেজদা বলিলেন, "এক-বাক্যে! মেয়ে দেখে যেমন পছন্দ হোল, অমনি বিয়ের দিন ধার্য্য করে একেবারে উঠলেন্। বেশ জুটে গেছে, মেয়েটার জন্যে আমরা বড়ই ভাবনায় পড়েছিলুম, তা ভগবানের ইচ্ছায়—"

বাধা দিয়া সহসা অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে অমল বলিল, "তোমার শ্বশুর যে ঐ বাড়ী ভাড়া নিয়ে সপরিবারে রয়েছেন, তা ত তুমি আমায় একবারও বল নি!—

মেজদা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "কেন, তাতে কি হয়েছে ?—"

কি হইয়াছে, অমল তাহার কোন উত্তর দিতে পারিল না। অন্তর্নিহিত ক্ষোভের নিষ্ফল পরিতাপে, গোঁজ গোঁজ করিতে করিতে সে মেঝের উপর সজোরে জুতা ঘসিতে ঘসিতে হেঁটমুখে বলিল "আমার আগে বলা উচিত ছিল সকলের আগে—"

বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া মেজদা বলিলেন "অবাক্ করলি অমল! বিয়ের নামে মাথা গুলিয়ে যায় বলে কালও বৈকালে তুই আমাকে ধমক দিয়েছিস্, আবার আজ একি কথা বলছিস্ ? তোকে পায়ে ধরে সাধ্‌তে বাকী রেখেছিলুম—একটিবার কনে দেখার জন্যে—তুই

আমায় মারমুখি হয়ে উঠ্লি! এদ্দিন ধরে তোর জন্যে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করে তবে না কাল শেষ জবাব পেয়ে অন্য জায়গায় ঠিক করলুম! এখন তুই বলিস কি না, তোকে আগে বলা উচিত ছিল!—"

মেজবৌদি যে তাহার চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া আছেন, সে কথা অমলের মনেই ছিল না। ক্ষোভে অনুতাপে তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম হইতেছিল। রুদ্ধস্বরে সে বলিয়া ফেলিল, "আমি কি জানি যে ঐ—তিনি তোমার শালী!—"

ঠোঁট কাম্‌ড়াইয়া উচ্চহাস্য দমন করিয়া মেজদা ব্যগ্র বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "ঐ—তিনি, অর্থাৎ? তা হলে তুই কি আমার শালী ক্ষণপ্রভাকে দেখেছিস?"

অমলের মুখ লাল হইয়া উঠিল, কাসিতে কাসিতে বলিল, "তোমার শালীকে ক্ষণপ্রভাকে—বাঃ, আমি কেমন করে দেখ্‌ব?—তবে ওঁদের বাড়ীর কাছে মেসে আমার একটি ক্লাশ ফ্রেণ্ড থাকেন, তিনি নাকি—তা সে মরুকগে যাক, যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন গতস্য শোচনা নাস্তি—আমার কলেজ যাবার বেলা হ'ল মেজদা, উঠি—"

অমল অত্যন্ত ব্যস্ত চঞ্চল ভাবে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। মেজদা বলিলেন "শোন শোন অমল, একটা কথা আছে—"

মেজদার 'একটা কথা' শুনিয়া, অমলেরও 'একটা কথা' নূতন করিয়া মনে পড়িল। ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, হঠাৎ শ্লেষতীব্র স্বরে ঝাঁজের সহিত অমল বলিল, "আচ্ছা মেজদা, তোমার শশুর বাড়ীর রীতি নীতি সব সাহেবিয়ানা ষ্টাইলের, নয়?"

সকৌতুক হাস্যে মেজদা বলিলেন, "বেজায়! বেজায়!—আমার শশুর শাশুড়ির অবশ্য অপরাধ নেই, তাঁরা সাদাসিধে মানুষ; কিন্তু ছেলে মেয়ে গুলির কথা বলবার নয়,—আমাদের বাড়ীতেই ত নমুনা দেখ্‌ছ,—" তিনি মেজবৌদির দিকে বিদ্রূপপূর্ণ কটাক্ষপাত করিয়া পুনশ্চ ক্ষুর শানাইতে মনোযোগী হইলেন।

মেজবৌদি বিনা আপত্তিতে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। অমল কুণ্ঠিত ভাবে নিম্নস্বরে বলিল, তাই দেখলুম, চব্বিশঘণ্টা পেরোয় নি, বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে, —এরই মধ্যে তোমার সেই ভায়রা ভাই বাড়ীতে ঢুকে চা খাচ্ছেন, গেটের সামনে দরোয়ানের মত পায়চারি করছেন, আরও কত কি—"

অত্যন্ত বিস্ময়ের ভাণে মেজদা বলিলেন, "বটে! তা হবে, কর্ত্তা বাড়ীতে নেই, মা মাসিমার বাড়ীতে ভবানীপুরে গেছেন, আমার সম্বন্ধী 'শূন্য ঘরে হুলো রাজা' হয়ে ভাবী ভগিনীপতিকে নিয়ে ইচ্ছামত আমোদ আহ্লাদ জুড়ে দিয়েছেন!"

উৎকণ্ঠা ব্যাকুল অমল হৃদয় ভাব প্রচ্ছন্ন করিতে না পারিয়া তীক্ষ্ণ স্বরে বলিয়া উঠিল, "তোমার সম্বন্ধীর প্রফেসারি বুদ্ধির খুরে দণ্ডবৎ—হঠাৎ কাল যার সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে—আজ যদি কোন অনিবার্য্য কারণে হঠাৎ তার সঙ্গে বিয়ে না হয়,—

মেজদাদা বলিলেন,"তা হলে, ঐ আমোদ আহ্লাদ পর্য্যন্তই, ইতি!"

অমল বলিল, "তারপর? বোন লক্ষ্মীটিকে আর একজনের ঘাড়ে চাপাতে হবে ত?"

মেজদা কাঁচি লইয়া গোঁফ ছাঁটিতে সুরু করিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়! লক্ষ্মী অবশ্য বাহনশূন্য থাকবেন না—"

মেজ বৌদি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, সুতরাং বাঙ্গলায় বলিতে অমলের সাহস হইল না, ইংরেজিতে বলিল "ইতিমধ্যে লক্ষ্মীর মনোজগতে যদি কোন মারাত্মক বিভ্রাট ঘটে যায়?"

মেজদা উদাসভাবে মস্ত একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তা হলে, লক্ষ্মীর নারায়ণটির পক্ষে বিশেষ দুশ্চিন্তার কথা বটে—"

অমল সজোরে বলিল, "ঠাট্টা নয় মেজদা বাস্তবিকই দুশ্চিন্তার কথা!—"

মেজদা বলিলেন, 'কি করব ভাই, নিজের ছাগল কেউ যদি ল্যাজের দিকে কাটে, তাতে হাত কি? ক্ষণু আমার বোন নয়, আমার সম্বন্ধীর বোন, সুতরাং তার

ভাইয়ের মূর্খতার জন্য, তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুর্ভাবনায় মাথা ঘামানো, তোমার-আমার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা!"

অমল আরও জোর দিয়া বলিল "হোক অনধিকার চর্চ্চা, তা বলে ন্যায্য কথা বলব না? তোমার সম্বন্ধীর কাণ্ডকারখানা, বিলিতি সমাজের বাঁদরামি ভরা কোর্ট শিপের চেয়েও সাংঘাতিক।—"

মেজবৌদির মুখপানে বক্র কটাক্ষপাত করিয়া মেজদা গম্ভীর ভাবে বলিলেন,"নিশ্চয় বাস্তবিক আমাদের স্বদেশী সমাজ তন্ত্রমতে—এই যে একেবারে ছাদ্‌নাতলায় দাঁড় করিয়ে সাতপাকের কড়াক্কড় বাঁধনে বেঁধে শুভ দৃষ্টির ব্যবস্থা—ওটা খুব ভাল, একেবারে নাকে নাতাড় পরিয়ে ঘাড়ে জোয়াল চড়ান আর কি!" ওর পর আর শিং নাড়া দিয়ে ট্যাফোঁ করবার যো' নেই, তা সে 'মর—আর তর'!—ঘাড়ে জোয়াল বইতেই হবে। যেমন আবহমান কাল থেকে আমাদের ঠাকুরদা-দের সময় থেকে আমাদের বেলা পর্য্যন্ত হয়ে এসেছে।" মেজদা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া গুম্ফাগ্রভাগে কুঞ্চিত চক্ষের দৃষ্টি সংযত করিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত গুম্ফপ্রান্ত ছাঁটিতে লাগিলেন।

কথাগুলা অবশ্য অমলের উদ্দেশে বলা হয় নাই, তাহা অমল বেশই বুঝিল, তবু কি জানি কেন,—তাহা যেন অমলের গায়ে একটু বাজিল। অমলের মনে হইল, ঐ আমাদের বেলা পর্য্যন্ত কথার মধ্যে, পর-বর্ত্তিগণের প্রতি একটা গূঢ় শ্লেষের ইঙ্গিত রহিয়াছে। স্তব্ধ হইয়া সে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মেজদার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

কি ভাবিয়া ক্ষণপরে হঠাৎ ঘাড় ফিরাইয়া মেজ-বৌদির পানে চাহিয়া, অমল সত্য সত্যই ভিতরে চমক খাইয়া দমিয়া গেল।—দেখিল স্মিতাননা মেজবৌদি প্রচ্ছন্ন রহস্যব্যঞ্জক দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া নিঃশব্দ কৌতুকে হাসিতেছেন।

মুহূর্ত্তে অমলের মন শঙ্কিত হইয়া উঠিল। মেজ-বৌদির সেই হাসিতে—সহসা 'প্রিয় বিদ্যুৎ' সংক্রান্ত সমস্ত ঘটনার স্মৃতিগুলা মনের মধ্যে বিদ্যুৎবেগে ঝলসিয়া উঠিল। তাহার উপর এইমাত্র মেজবৌদির অগ্রজের কাণ্ডজ্ঞান সম্বন্ধে 'ন্যায্যকথার' ধুয়া ধরিয়া, কঠোর সমালোচনার সুরে এতক্ষণ ধরিয়া যেরূপ ঝাঁজের সহিত নির্লজ্জ আস্ফালন জুড়িয়াছিল, তাহা ভাবিয়া আরও কুণ্ঠা বোধ করিল।

বিপন্ন অমল বিনাবাক্যে চম্পট দিবার জন্য ব্যাকুল হইল। ত্রস্ত চঞ্চল স্বরে বলিল, "এখন তাহলে আসি মেজদা,কলেজ যাবার সময় হয়েছে।"—অমল চৌকাঠের বাহিরে পা বাড়াইল।

মেজবৌদি ব্যস্তভাবে মেজদার নিকট সরিয়া গিয়া মৃদুস্বরে কি বলিলেন। মেজদা ক্ষুর কাঁচি ফেলিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, "ওরে অমু, শোন শোন, আমি জিজ্ঞাসা কর্‌তে ভুলে গেছি, তোর নাওয়া খাওয়া হয় নি? তোর মেজবৌদি বলছে ঠাকুর পোকে খেয়ে যেতে বল—"

অমল ভীতিম্লানমুখে বলিল, "না, আমি নেয়ে খেয়ে এসেছি"—কথাটা সম্পূর্ণ না হইলেও কতকটা মিথ্যা,—স্নান হইয়াছিল বটে, কিন্তু মেজদার সহিত দেখা করিবার জরুরি তাগাদায় মেসের বামুনের ভাত নামাইবার বিলম্বটুকু সহ্য না করিয়াই, সে চলিয়া আসিয়াছে।

মেজদা তাহার মাথার রুক্ষ বিশৃঙ্খল কেশরাশির পানে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "মাথার চুলগুলা উড়্‌ছে যে!"

অমল বি-এ পড়িতে আরম্ভ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া তৈলমাখা ছাড়িয়া দিয়াছিল, প্রতি সপ্তাহে দুইখানা করিয়া ভিনোলিয়া সাবান তাহার ব্যয় হইত, এবং প্রত্যহ তিনবার—অভাব পক্ষে দুইবার সে স্নান করিত। অবশ্য প্রতিবার স্নানের পর টেরির পারি-পাট্য বিধানে, তাহার তিলার্দ্ধও মনোযোগের অভাব ঘটিত না। কিন্তু আজ সেই 'ফুল বাবু'র সৌখীনতার উপর সে এমনই ভয়ানক চটিয়া গিয়াছিল যে তাঁহার উপর প্রতিশোধ তুলিবার জন্য সযত্নে নিজের বেশভূষা

বিন্যাসে আজ যথেষ্ট অযত্ন প্রকাশ করিয়াছিল। স্নানের পর টেড়ি পর্য্যন্ত কাটে নাই। রিষ্টওয়াচের চামড়া টান মারিয়া খুলিয়া শুধু ঘড়িটি বুকপকেটে লুকাইয়া বাহির হইয়াছিল—চোখে শুধু চশমাটি ছিল।

মেজদার কথায় মাথার চুলগুলার উপর হাত বুলাইয়া অমল সঙ্কুচিতভাবে বলিল, "আমি ত মাথায় তেল মাখিনে।"

মেজদা বলিলেন, "ওঃ বটে বটে!—ভুলে গেছি, তুই তেল টেল মাখিস না, কিন্তু দ্যাখ অমু, গায়ে তেল না মাখিস নেই নেই, কিন্তু একটা কথা বলে দিই, মাথায় একটু একটু তেল মাখিস। বড় বড় বিলাতি সাহেব যারা চব্বিশ ঘণ্টা মাথায় হ্যাট পরে ঘোরে, এদেশের ঝাঁঝাঁলো রোদে তাদেরও মাথাঘোরা সুরু হলে, তারাও ম্যাকেসার মাখতে বাধ্য হয়। আর আমরা খাঁটি গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষ, খোলা মাথায় আমাদের রোদে ঘুরতে হয়, আমরা কি—ভাল কথা মনে পড়ল, থার্ড ইয়ারে পড়তে পড়তে কতকগুলি সৌখীন বন্ধুর পাল্লায় পড়ে আমিও গায়ে মাথায় তেল মাখা ছেড়ে দিয়ে, তিন দিন পরে চোখে এম্নি ঘোলা দেখ্‌তে আরম্ভ করেছিলুম, যে চশমার অর্ডার দিই আর কি? ভাগ্যিস মূর্খ বুড়ো ভিলেজম্যান ভজহরি চাকরের পরামর্শ বাংলে দিলে যে বাবু স্নানের সময় আচ্ছা করে সর্ব্বাঙ্গে রগড়ে সর্ষের তেল মাখ চোখের দোষ কেটে যাবে,"—তাই বাঁচোয়া, নইলে চোখের মাথা এদ্দিন খেয়ে বস্‌তুম আর কি!"

অমলের মুখভাব অসহিষ্ণু বিরক্তিপূর্ণ হইয়া উঠিতে-দেখিয়া, মেজদা আর দার্শনিক গবেষণার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিবৃতিকরণে সাহসী হইলেন না, তাড়াতাড়ি কথা উল্টাইয়া লইয়া বলিলেন—"তোর মাথার অসুখটা কেমন আছে?"

অমল নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তেমনি—"

"ওখানে গিয়ে কিছু উপকার বুঝেছিস্ না? তাই ত, পড়াশুনোয় তাহলে সুবিধা হচ্ছে না, বল? কি মুস্কিল, —আর এই ক-মাস পড়ে এগ্‌জামিন, এ সময় কিনা মাথাটা,—"

মেজদার দুর্ভাবনা ব্যঞ্জক আক্ষেপবাণী সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই অমল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উষ্ণভাবে বলিয়া উঠিল, "আমি এবার এগ্‌জামিন্ দেব না, ফার্ষ্ট চান্সে পাশ হওয়ার আশা আমার নেই—"

মেজদা, স্তব্ধ হইয়া অমলের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, 'কেন' 'কি বৃত্তান্ত' কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। কয় মুহূর্ত্ত পরে ঈষৎ ক্ষুব্ধ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ওটি আমার পক্ষে বড়ই দুঃখ, বড়ই লজ্জার বিষয় অমু—তুমি বরাবর যেমন স্কুল কলেজে 'ধারালো' ছেলে বলে নাম কিনে এসেছ,—এখান থেকেও যদি তেমনি গৌরবটি নিয়ে যথা সময়ে বেরুতে পার ভাই, তাহলে তোমার মেজদার মুখ রক্ষা হয়, না হলে আমি কারুর কাছে মুখ দেখাতে পারব না! কাকাবাবু 'বড়মুখ' করে আমার কাছে তোমায় পাঠিয়েছেন, আমি যদি তাঁর বিশ্বাসের মর্য্যাদা না রাখ্‌তে পারি তাহলে"—মেজদা এইখানে চুপ করিয়া, কি যেন ভাবিতে লাগিলেন।

অমলের অন্তরের অলস নিশ্চিন্ত অসাড়তার বুকে হঠাৎ যেন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে একটা তীব্র অনুতাপের কশাঘাত বাজিল!—মুহূর্ত্তে নিজকে, একটা দায়িত্ব শূন্য কাণ্ডজ্ঞানহীন অপদার্থ বলিয়া তাহার ধারণা হইল! নিজের যথেচ্ছ খেয়ালী-কৌতুকে স্বচ্ছন্দে কর্ত্তব্য অবহেলার অপরাধটা অত্যন্ত রূঢ় ভাবে তাহার মনশ্চক্ষের সম্মুখে দীপ্যমান হইয়া উঠিল! অমলের কণ্ঠ কে যেন সজোরে নিষ্ঠুর পেষণে নিষ্পীড়িত করিয়া ধরিল। সে কোন কথা কহিতে পারিল না, মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

নিঃশ্বাস ফেলিয়া মেজদা বলিলেন, "থাক, দুঃখ করে আর কি হবে, চেষ্টার অনুপাতেই সিদ্ধি, ও ত জানা কথা। কিন্তু অমল,তুই যখন প্রথম কলকাতায় এলি রে, তখন তোর মুখপানে চেয়ে আমার বড় আশা হয়েছিল। আমার স্থির বিশ্বাস ছিল, তুই নিজের জোরে কায কিনে নিবি, তোর ওপর নজর রাখবার কোন দরকার

নেই। সেই জন্যে তুই অন্য কলেজে পড়তে চাইলে—আমি তাতেও আপত্তি করি নি, বরং নিজে তার জন্যে কাকাবাবুকে সুপারিস্ করেছি। যাক, সে আমারই নির্ব্বুদ্ধিতা,—তুই ছেলে মানুষ, তোকে দোষ দেব না,—তুই বুঝিস্ নি কিন্তু আমার তখন বোঝা উচিত ছিল।"

কথাগুলা মেজদা যদি বেশ সুস্পষ্ট তিরস্কারের স্বরে বলিতেন, তাহা হইলে অমল বোধ হয় নিজের ঔদ্ধত্য বজায় রাখিতে পারিত, কিন্তু মেজদার কণ্ঠে যে সুরটা ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে অমলের মন একেবারে আর্দ্র বিগলিত হইয়া গেল। আমোদের প্রলোভনে কর্ত্তব্যে অমনোযোগী হইয়া, বাজে কাযে সময়ের অপব্যবহার করিতেছে—সে ক্ষতির খেসারৎ, তাহাকে দিতে হইবে। সে দুঃখ শুধু সে নিজেই ভোগ করিবে, তাহার জন্য কষ্ট নাই, কিন্তু ঐ একান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, স্নেহশীল হৃদয়টি যে তাহার ত্রুটির জন্য ক্ষুব্ধ ব্যথিত হইয়াছে, এ কষ্ট আজ অমলকে মর্ম্মান্তিক মনঃপীড়া দিল। অনুতপ্ত দৃষ্টিতে, অমল অধোবদন হইয়া রহিল।

মেজদা তাহার পিঠের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "সকল ভাল ছেলেই বরাবর ফার্ষ্ট চান্সে পাশ করে চল্‌বে, এমন আশা করা ভুল। তবে প্রাণপণ চেষ্টায় কর্ত্তব্যপালন করে অকৃতকার্য্য হলে, তাতে সান্ত্বনা আছে, কিন্তু অন্য কারণে অকৃতকার্য্য হলে, সে সান্ত্বনা পাওয়া যায় না। তুমি এবছর না পার, আস্‌ছে বছর পাশ করে বেরুবে, তাতে ভুল নেই, কিন্তু এই একটা বছর সময়,—এটা জলের দামে বিক্রি হবার জিনিস নয় ভাই। এক দিনে, এক দণ্ডে, সংসারে কত পরিবর্ত্তন হয়ে যায় ত; এক বছরকে বিশ্বাস!—একটা মোটা কথা ধর, ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যে কাকাবাবুর চাকরীর মাথায় সমস্ত সংসারটার ভার, তোমার পড়ার ভার রয়েছে,—কে বলতে পারে হঠাৎ যদি ছ' মাসের জন্যে তাঁকে রোগে পড়তে হয়,—তাহলেই ত চক্ষুস্থির! ধরলুম না-হয় খরচের জন্যে তোমার পড়ার ব্যাঘাত হতে দিলুম না, কিন্তু অমল, তখন কি আর এমন শান্ত নিশ্চিন্ত ভাবে পড়ার পিছনে মনকে সংযত রাখ্‌তে পারবে? কখনই না।—পারিবারিক দুঃখ দুর্ভাবনার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে, তখন হয়ত আর এক পা'ও এগোতে পারবে না, অথচ এখনকার এই সুযোগ, একে স্বচ্ছন্দে হারিয়ে চলা হচ্ছে, জীবনের কি ভয়ানক অসদ্ব্যয় বল দেখি!"

আগুন-ই আগুনকে জ্বালাইয়া তুলে! মেজদার গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ কণ্ঠস্বরে, সেই কথাগুলি, অমলের অন্তরের সম্মুখে সত্যসত্যই ভবিষ্যতের অনিশ্চিত বিভীষিকা, স্পষ্টরূপে অনুভব করাইয়া দিল, অমলের মন আকুল আর্ত্তনাদে ভরিয়া উঠিল। সমস্ত ত্রুটির ন্যায্য প্রায়শ্চিত্ত, সে আজ হইতে কড়ায় গণ্ডায় হিসাব মিলাইয়া পরিপূর্ণ মাত্রায় পালন করিবে-ই, করিবে! এবার আর খেলা নয়, খেয়াল নয়, শুধু—কায!

ঘড়িতে টং টং করিয়া এগারটা বাজিল। সংক্ষেপে প্রণাম করিয়া অমল বলিল, "কলেজ চল্লুম।"

ক্রমশঃ

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

বিলাতে অনেক বড় বড় রাস্তায় ভিখারিদিগকে পথিকগণের নিকট ভিক্ষা চাহিয়া বিরক্ত করিতে দেওয়া হয় না। উহারা নিজ নিজ দুর্দ্দশার বিবরণ যুক্ত কার্ড গলায় ঝুলাইয়া ফুটপাতের উপর বসিয়া থাকে। কার্ড পড়িয়া যাহার দয়া হয় ভিক্ষা দিয়া যায়।

এক ভদ্রলোক ঐরূপ একটী অন্ধ কার্ডধারী ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া পুনরায় ফিরিয়া দেখেন, ভিক্ষুক চক্ষু মেলিয়া পয়সাটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতেছে।—ভদ্রলোকের বড় রাগ হইল, ফিরিয়া গিয়া তাহাকে এক ধাক্কা দিয়া বলিলেন,—"হতভাগা, পাজি, জোচ্চোর! তুই অন্ধ নস্, তবে অন্ধ বলে লোক ঠকাচ্ছিস্?" ভিক্ষুক বড় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। ধরা পড়িয়া হাত যোড় করিয়া বলিল, "ক্ষমা করুন মহাশয়, ওরা ভুল করে অন্য কার্ড আমার গলায় দিয়েছে। আমি অন্ধ নই।"

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে?"

ভিক্ষুক বলিল—"আজ্ঞে আমি বোবা ও কালা।"

শ্রীরামনাথ সেন।

নেপালে পশুপতিনাথ দর্শন

সৈন্য বিভাগ।

বিখ্যাত গোর্খা সৈন্য একমাত্র নেপাল-রাজের অধীন। ইহারা রাজপুত। মুসলমানদিগের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া নেপালের অন্তর্গত গোরখালী নামক স্থানে স্থায়িভাবে বাস করে বলিয়া ইহাদের নাম গোর্খা হইয়াছে। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে গোর্খা-রাজা পৃথ্বীনারায়ণ নেপাল রাজ্য জয় করেন; সেই সময় হইতেই গোর্খাগণ নেপালে সর্ব্বতোভাবে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। বর্ত্তমান রাজবংশ, প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী, অধিকাংশ সৈনিক ও সৈন্যাধ্যক্ষ এবং দেশের প্রধান ব্যক্তিগণ সকলেই এই গোর্খা বংশসম্ভূত। ইহা ভিন্ন নেপালের আদিম নিবাসী মগর, গুরুম্, লিম্বু ও কিরাতীগণ সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত আছে। ইহারাও খুব সাহসী ও বলিষ্ঠ। রাজ্যরক্ষা এবং রাজ্যশাসনের জন্য নেপাল রাজের ১৬০০০ বেতনভোগী সৈন্য আছে। তদ্ভিন্ন ইউরোপীয় প্রথা অনুসারে রাজ্যের কতক উপযুক্ত লোক যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকে। আবশ্যক হইলে যুদ্ধে যোগদান করিতে হইবে, এই নিয়মে রাজা ইচ্ছা করিলে একদিনে ৭০০০০ সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারেন। অশ্বারোহী, পদাতিক ও কামানবাহী এই তিন প্রকার সৈন্য আছে। ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারেই যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। অস্ত্রাগারে কামান বন্দুক যথেষ্ট পরিমাণে সংগৃহীত আছে। একজন বাঙ্গালী এখানে বহুকাল হইতে অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতেছেন। কাঠমাণ্ডু সহরের টুলিখিল নামক স্থানে সৈন্যদিগের নিত্য নিয়মিত কুচ-কাওয়াজ হইয়া থাকে।

দাসত্ব প্রথা।

নেপালে দাস বিক্রয় প্রথা আছে। সামান্য লোক হইতে ধনী গৃহস্থ পর্য্যন্ত সকলেই দাস দাসী ক্রয় করিয়া থাকে। সাধারণতঃ গৃহকার্য্যের জন্যই সকলে ক্রীতদাস রাখে। নেপালের দাসত্ব প্রথা পূর্ব্বকালে ইউরোপ বা আমেরিকার মত নহে। গৃহস্থের বাড়ীতে আপনার জনের ন্যায় তাহারা প্রতিপালিত হয়। কোনও পুরুষ বা স্ত্রী জাতিগত কোন বিশেষ অপরাধ করিলে রাজাদেশে সে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দাস অপেক্ষা দাসী অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। অনেক পিতা মাতা সন্তান বন্ধক রাখিয়া ঋণ গ্রহণ করে—ঋণ পরিশোধ করিতে পারিলেই সন্তান ফিরিয়া পায়। এইরূপে দিন দিন নেপালের ক্রীতদাস-দাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্ত্তমানে এই রাজ্যে ইহাদের সংখ্যা প্রায় ৩০০০০ হাজার।

দেশ-ভাষা।

নেপালে গোর্খাদিগের ভাষা অন্যান্য পার্ব্বতীয় দুর্ব্বোধ্য ভাষা হইতে অপেক্ষাকৃত সহজ। ইহা সংস্কৃত ভাষারই অপভ্রংশ। অনেকটা দেবনাগরীর মত লিখিত হয়। ভারতবর্ষের যে দেশের লোক হউক না, এই ভাষা আয়ত্ত করিতে তাঁহাদের কঠিন বোধ হয় না। নেবারগণ যে ভাষা ব্যবহার করে তাহা অতি দুর্ব্বোধ্য। অন্যান্য স্থানে তিব্বতীয় ভাষা প্রচলিত আছে। নেপালীদের লিখিত ভাষা অপেক্ষা মৌখিক ভাষাই অধিকতর জটিল। ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও তারতম্য দৃষ্ট হয়। হিন্দুধর্ম্মের সহিত সংমিশ্রণে বিশুদ্ধ বৌদ্ধ নেপালে নাই বলিলেই হয়। বৌদ্ধদিগের ভাষা অতিশয় কঠিন, কিন্তু হিন্দুদিগের ভাষা তদপেক্ষা সহজ। কিরাতী, লিম্বু, মগর প্রভৃতি জাতি সকলের ভাষা বিভিন্ন। ভুটিয়াদের যেমন ভীষণ আকৃতি তেমনি অদ্ভুত ভাষা। বাঙ্গালী মারোয়ারী এবং অন্যান্য বিভিন্ন দেশের লোক যাহারা বাণিজ্য অথবা অন্য কর্ম্মোপলক্ষে কাঠমণ্ডু সহরে বাস করে, তাহারা নেপালী ভাষা বেশ আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে।

নেপালের রাজভাষার নাম গোর্খা ভাষা। গোর্খাদিগের নেপাল জয়ের পর হইতেই ইহার উৎপত্তি। শব্দপ্রাচুর্য্য না থাকায় এই ভাষা সাহিত্যের পক্ষে উপযুক্ত

নহে। পূর্ব্বে এই ভাষায় কোন পুস্তক ছিল না—প্রসিদ্ধ মন্ত্রী জঙ্গ বাহাদুর ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া কয়েক খানি আইনের পুস্তক নেপালী ভাষায় অনুবাদ করেন। তৎপূর্ব্বে লেখা অথবা লেখক কিছুই এ দেশে ছিল না। ভানু ভুক্তাচার্য্য নামক নেপালের আদি কবি সর্ব্ব প্রথমে রামায়ণ সানুপ্রাস শ্লোকে দেশীয় ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। তৎপরে প্রতিভাশালী কবি মতিলাল ভট নেপালী সাহিত্যে গদ্য ও সঙ্গীতের বহুল প্রচার করিয়া অল্পকালেই লোকান্তরিত হন। তাহার পরে নেপালে পাশুপত প্রেস স্থাপিত হইলে কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত হয় এবং কয়েক জন লেখক অল্প বিস্তর সাহিত্য চর্চ্চা করিতে থাকেন। কিন্তু ব্যাকরণ না থাকায় সাহিত্যে যথেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা মস্তকোত্তলন করিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে উহার প্রবেশাধিকার হইল না। বর্ত্তমান কালে দুই খানি ব্যাকরণ নেপালে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম খানি চন্দ্রিকা, শ্রীহেমরাজ পণ্ডিত লিখিত এবং অপর খানি পণ্ডিত বিশ্বমণি প্রণীত গোর্খা ভাষার ব্যকরণ। কাশী হইতে সুন্দরী নামে এক খানি মাসিক পত্রিকা নেপালী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল কিন্তু অল্প দিনেই তাহা লুপ্ত হয়। বোম্বাই সহরে গোর্খা গ্রন্থরত্নাকর কার্য্যালয় হইতে "মাধবী" পত্রিকা বাহির হয়,তাহাও বেশী দিন টিকে নাই। বর্ত্তমানে নেপালী ভাষায় চারিখানি সাময়িক পত্রিকা আছে (১) নেপাল হইতে প্রকাশিত গোর্খা (২) কাশী হইতে "গোরখালী" (৩) ও "গোরখে" (৪) এবং দারজিলিং হইতে "গোর্খাসাহী।" এখন নেপাল রাজ্যে অনেকগুলি ছাপাখানা হওয়ায় অনেক নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমানে রাজমন্ত্রী একটী সাহিত্য-সমিতি গঠিত করিয়া সাহিত্যালোচনার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। কাশীতে একটী নেপালী পুস্তকালয় আছে। ভাষা-সম্পদে নেপাল বড়ই নিঃস্ব।

খাদ্য।

চাউল এদেশ-বাসীর প্রধান খাদ্য। একবেলা ভাত ও একবেলা রুটী খাওয়া এদেশে প্রচলিত আছে। নেপালের লোক প্রায় সকলেই নানাবিধ পশুপক্ষী শিকার করিয়া খায়। নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা মহিষ মাংস খাইয়া থাকে; ইহা ভিন্ন ছাগল, হাঁস, মুরগী, দুম্বা প্রভৃতির মাংস ভক্ষণেও বিশেষ পটু। সঙ্গতিপন্ন লোকে মৃগয়ালব্ধ নানা প্রকার মাংসের আস্বাদ পাইয়া থাকেন কিন্তু দরিদ্র ব্যক্তিগণ অদৃষ্ট ক্রমে মাংসাদির উপভোগ করিতে পারে না সুতরাং নানা প্রকার শাক সবজী, মকাইয়ের রুটী ও সহজলভ্য কন্দফলমূলাদির দ্বারা উদর পূরণ করিতে বাধ্য হয়। শুষ্ক, পচা দুর্গ যুক্ত খাদ্য ইহাদের অতি প্রিয়বস্তু। বাঙ্গালা দেশের মত এ দেশে মিষ্টান্নের ছড়াছড়ি নাই—দধিদুগ্ধও তেমন সহজপ্রাপ্য নহে। কয়েক জন মাড়োয়ারী এখানে খাবারের দোকান করিয়া অসম্ভব মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করিতেছে। প্রবাসী বাঙ্গালীগণই তাহার অধিকাংশের সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র লোকে একবেলা খাইয়াই জীবন ধারণ করে। দুর্ভিক্ষে এ দেশের লোকের মৃত্যু অল্পই ঘটিয়া থাকে।

পূজা-পার্ব্বণ ও উৎসব।

নেপালে পূজা-পার্ব্বণ ও জাতীয় উৎসবের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। বাঙ্গালাদেশে বার মাসে তের পার্ব্বণ, আর এ দেশে বার মাসে যে ছোট বড় কত উৎসব হয় তাহার সংখ্যা নাই। গোর্খা ও নেবার সকলের ভিতরেই এই উৎসব চলিয়া আসিতেছে, হিন্দু গোর্খা ও বৌদ্ধ নেবারগণের উৎসব, সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকলেই করিয়া থাকে, সেই কারণেই এখানে পূজা উৎসবের এত বাহুল্য। বৌদ্ধ মন্দির যেমন হিন্দু মন্দিরে পরিণত হইয়াছে, তেমনি বৌদ্ধদিগের পূজা পার্ব্বণাদিও হিন্দুদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। নেপালের প্রধান প্রধান কয়েকটী উৎসব যথা,—বৈশাখ মাসে নেপালের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মৎস্যেন্দ্রনাথের অভিষেকোৎসব। সর্ব্বসাধারণে অতি আনন্দের সহিত এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকে। বজ্রযোগিনী যাত্রা। ইহা

লেবারগণের উৎসব। জৈষ্ঠ মাসে সিথি যাত্রা—ইহা একটী অদ্ভুত ধরণের উৎসব। বিষ্ণুমতি নদীর উভয় তীরে দাঁড়াইয়া বালকগণ পরস্পর লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে থাকে। এদেশে লোষ্ট্র বলিতেই প্রস্তর খণ্ড। এই উৎসবে দেহ ক্ষতবিক্ষত, এমন কি দুই একটী জীবন নাশও হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সভ্যতার দিনে এই উৎসব অনেকটা সংযত ভাবে করা হয়। শ্রাবণ মাসে ঘাট মঙ্গল, নাগপঞ্চমী, বাঁহরা উৎসব ও রাখীপূর্ণিমা। ভিন্ন ভিন্ন বিধানানুসারে এই সকল উৎসব সমাধা হইয়া থাকে। ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী, গাই যাত্রা, বাঘ যাত্রা ইন্দ্র যাত্রা প্রভৃতি উৎসব। ইহার মধ্যে ইন্দ্র যাত্রা উৎসবই বিশেষ ধুমধামের সহিত হইয়া থাকে এবং ইহা নেপালীদের চিরস্মরণীয়। এই দিনে বৌদ্ধ নাগরিকগণ উৎসবে মত্ত ছিল, সেই অবসরে গোর্খারাজ পৃথ্বিনারায়ণ কয়েক জন মাত্র অনুচর সহ সহরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। চিরাচরিত প্রথানুসারে কুমারীগণ এবং নাগরিক সকলে সহর প্রদক্ষিণ করিয়া রাজবাটীর সম্মুখে যখন শূন্য সিংহাসন স্থাপিত করিল, অমনি কোথা হইতে পৃথ্বীনারায়ণ আসিয়া সেই সিংহাসনে উপবেশন করতঃ আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন,—অতি অল্প আয়াসেই নেপালের রাজসিংহাসন গোর্খারাজ পৃথ্বীনারায়ণের হস্তগত হইল। এই কারণে ইন্দ্রযাত্রা উৎসব নেপালে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসব বা বিজয়া। বঙ্গদেশের মত এখানে এই উৎসবের সমুদয় অনুষ্ঠান হয়। মহারাজ হইতে কুটীরবাসী দরিদ্র পর্য্যন্ত সকল জনসাধারণ পরমানন্দে এই উৎসবে যোগদান করে। রাজ্যের সমুদয় সৈন্য একত্র হইয়া টুনিখিল নামক ময়দানে ব্যূহাকারে সজ্জিত হয় এবং কৃত্রিম যুদ্ধ প্রদর্শন করে। এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ ধনী দরিদ্র সকলের বাটীতে ছাগ মহিষ বলি দেওয়া। সপ্তমী হইতে দশমী পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র ছাগ মহিষ বলি দেওয়া হয় এবং এই কয়েকদিন অধিবাসিগণ মাংসাদির দ্বারা ভূরিভোজনে তৃপ্ত হয়। বঙ্গদেশের ন্যায় এখানেও নববস্ত্র পরিধানের প্রথা প্রচলিত আছে। প্রকৃত পক্ষে ইহাই নেপালের জাতীয় উৎসব এবং সকলে অতি আনন্দে ইহা সম্পাদন করে। কার্ত্তিক মাসে দীপান্বিতা। সকলের গৃহে আলোকমালা দৃষ্ট হয়। পূজা অর্চ্চনা কিছুই নাই, লোকে রাত্রি জাগরণ করিয়া জুয়া খেলে। রাজার হুকুমে নেপালীগণ সর্ব্বত্র জুয়া খেলিয়া বেড়ায়। তারপর ভাই-পূজা। ইহা বঙ্গদেশের ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ন্যায়। ফোঁটা দেওয়া ভিন্ন আর সবই আছে। কুকুর পূজা। এই দিনে সহরের কুকুরের গলায় মালা এবং কপালে টিপ্ দিতে হয়। বৎসরের বাকী ৩৬৪ দিন কুকুরেরা প্রহার খাইয়া থাকে কিন্তু এই একদিন তাহাদের পূজা।

তারপর বানরচতুর্দ্দশী। কুকুরের ন্যায় বানরগণের পূজা। এই সমস্ত উৎসব বৌদ্ধগণের, কিন্তু সকলেই করিয়া থাকে। কার্ত্তিক পূর্ণিমা অথবা তীজব্রত। এই দিনে নেপালের সধবা রমণীগণ পশুপতিনাথ দর্শন করতঃ স্বামিপূজা করেন। তারপর গণেশ চৌথ, বসন্ত শ্রীপঞ্চমীর উৎসব। মাঘী পূর্ণিমা। যাহারা সমুদয় মাঘমাস বাগমতীর জলে অবগাহন স্নান করেন এই দিনে তাঁহাদের প্রতি সম্মান দেখান হয়। ফাল্গুন মাসে বসন্তোৎসব বা হোলী। বাঙ্গলা দেশের মত ফাগ্ খেলা হইয়া থাকে। তবে সাধারণ লোকে খেলে না, রাজবাটীতে ফাগ্ খেলা হয়। সাধারণ লোকে শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া রাজবাটীতে উপস্থিত হইলে সেখানে পরস্পর ফাগ্ খেলা হইয়া থাকে। সর্ব্বশেষে চৈত্রমাসে ঘোড়া যাত্রা। অর্থাৎ টুনিখিলের ময়দানে ঘোড় দৌড় ও নানাবিধ ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষেও জনসাধারণ দুই দিনের জন্য জুয়াখেলার আদেশ পায়। বৎসরের ভিতর দীপান্বিতা ও ঘোড়াযাত্রা উৎসব ব্যতীত অন্য সময়ে জুয়া খেলিলে রাজ দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। মোটামোটী এই কয়েকটী উৎসবের কথাই সাধারণতঃ জানিতে পারা যায়। এতদ্ব্যতীত আরও কত ছোট খাট উৎসব আনন্দ আছে তাহা কে বলিবে।

প্রচলিত মুদ্রা।

নেপালে নানারূপ মুদ্রার প্রচলন আছে। আসরফী, পাটলে, সুকা, সুকী, আনা, দাম ইত্যাদি। এই সমস্ত মুদ্রা স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র এই তিন ধাতুতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়াও এখানে ঢেবুয়া, লোহিয়া পয়সা, পাতলা প্রভৃতি বিভিন্ন তাম্র মুদ্রার চলিত আছে। বৃটীশ মুদ্রা টাকার পরিবর্ত্তে নেপালী পয়সা ১২৫টী পাওয়া যায়।

কাঠমাণ্ডু সহরে বৃটীশ মুদ্রা ও নোটের বেশ প্রচলন।

রাজবংশ ও মন্ত্রিগণ।

নেপালের পূর্ব্বেতিহাস মহামতি ইংরেজ ঐতিহাসিক গণ কর্ত্তৃক অতি যত্নে সংগৃহীত হইয়াছে। এবং তাহা হইতে অনেক লেখক বিভিন্ন ভাষায় ইহা প্রচার করিয়াছেন। আমরা এখানে সে পুরাবৃত্তের বিশেষ কিছুই বর্ণনা করিব না, তবে বর্ত্তমান রাজবংশের কথা বলিতে হইলে যেটুকু না বলিলে নয়, তাহাই এস্থলে বিবৃত করিব। পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে নীমুনি নামক জনৈক মহাপুরুষ গোপবংশীয় একজন বালককে নেপালের রাজা করেন—সেই সময় হইতেই নেপাল রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। পশুপতিনাথ তীর্থের সহিত নেপালের পুরাতন কাহিনী অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত আছে। উক্ত নীমুনির নামানুসারে রাজ্যের নাম নেপাল হইয়াছে।

অপর পক্ষে বর্ত্তমান নেপাল রাজ্যের পূর্ব্বাংশ ও সিকিম প্রদেশ তথাকার আদিম অসভ্য লেপচা প্রভৃতি জাতি কর্ত্তৃক যথেচ্ছা শাসিত হইত। তৎকালে লেপচা, লিম্বু, কিরাতী, ভুটীয়া প্রভৃতি জাতি বসবাস করিত। তাহাদের ভাষায় "নে" শব্দের অর্থ পবিত্র গুহা বা দেবোদ্দেশে রক্ষিত পবিত্র স্থান। তিব্বত ও ব্রহ্ম দেশেও "নে" শব্দ এইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়। তিব্বতী ভাষায় "পাল" শব্দের অর্থ পশম। হিমালয়ের এই অংশে পশম-বহুল ছাগ পাওয়া যায় বলিয়া এই দেশের নাম পালদেশ। পূর্ব্বোক্ত "নে" শব্দ ইহার সহিত যুক্ত হইয়া নেপাল হইয়াছে। অসভ্য জাতিগণের মধ্যে যাহার ক্ষমতা অধিক হইত সেই অন্য সকল জাতির উপর প্রভুত্ব করিত। এইরূপে কিরাতী বংশ বহুকাল নেপালে রাজত্ব করে। পূর্ব্বোক্ত গোপ বংশ বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করিবার পর আহীর বংশ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হয়। আহীর বংশে বীর সিংহ, জয়মতি সিংহ ও ভবানী সিংহ এই তিনজন মাত্র রাজা হইয়াছিলেন। তৎপরে কিরাতী বংশের অভ্যুদয়। কথিত আছে এই বংশের ৪২ জন রাজা ৮০০ বৎসর নেপালে রাজত্ব করিয়াছিল। কিরাতী বংশের রাজত্ব কালেই পাটলীপুত্রের রাজা অশোক নেপালে আগমন করিয়া কাঠমণ্ডুর সন্নিকটে ললিত পাটন নামে এক নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্যাবধি তাঁহার নির্ম্মিত অনেক বৌদ্ধ মন্দির, চৈত্য ও বিহার নেপালে দেখিতে পাওয়া যায়। কিরাতী বংশের পরে সোম বংশ ও সূর্য্য বংশ যথাক্রমে নেপালে রাজত্ব করেন। এই সূর্য্য বংশের রাজত্ব কালে দক্ষিণাত্যে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব হয়। তিনি ভারতবর্ষের সমুদয় বৌদ্ধগণকে পরাজিত করিয়া নেপালে আগমন করেন এবং নেপালস্থিত বৌদ্ধগণকে তর্কযুদ্ধে পরাভব করিয়া অনেকের প্রতি নির্য্যাতন করেন। এমন কি শুনা যায় অনেক বৌদ্ধকে হত্যা পর্য্যন্ত করেন। বহুতর বৌদ্ধ মন্দির, বিহার চৈত্য, প্রভৃতি ধ্বংস করেন। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের বিবাহ দেন। বৌদ্ধদিগকে জীবহিংসা করিতে বাধ্য করেন। জনশ্রুতি এইরূপ যে তিনি নেপালে প্রায় ৮৪০০০ বৌদ্ধ গ্রন্থ পোড়াইয়া ফেলেন। সেই সময় হইতে নেপালে বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে শৈবধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয় এবং মঙ্গোলীয় ও হিন্দুজাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন নেবার জাতির ভিতরে বৌদ্ধ ও শৈব ধর্ম্ম মিশ্রিত ভাবে প্রবেশ করে। প্রবাদ যে ভাটগাঁওয়ের সূর্য্যবিনায়ক নামক গণেশ মূর্ত্তি বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই সময়ে হর্ষবর্দ্ধন বা শিলাদিত্য নেপালে গমন করিয়াছিলেন। সূর্য্য বংশের পর ঠাকুরী বংশ, রাজ-

পুত বংশ, কর্ণাটক বংশ ও মল্লরাজ বংশ যথাক্রমে নেপালে রাজত্ব করে। এই ঠাকুরী বংশের রাজা গুণ-কর্ম্ম দেবের রাজত্ব সময়ে বিষ্ণুমতী ও বাগমতী নদীর সঙ্গমস্থলে কান্তিপুর নামে এক নগরের প্রতিষ্ঠা হয়। ইহাই বর্ত্তমান কালের পরিবর্ত্তিত কাঠমণ্ডু সহর। মল্ল রাজবংশের পূর্ব্বে নেপালে বর্ম্ম রাজবংশ কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বংশের শেষ রাজা জয়দেব। মুসলমানগণ কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া মিথিলাধিপতি হরিসিংহ দেব মল্ল নেপালে আশ্রয় লাভ করেন। ইনি জয়দেবকে পরাজিত করিয়া রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। হরিসিংহের অধস্তন সপ্তম পুরুষ অক্ষমল্ল তদীয় তিনপুত্র ও এক কন্যাকে সমুদয় রাজ্য বিভাগ করিয়া দেন। অক্ষমল্লের তৃতীয় পুত্রের বংশধর প্রতাপ মল্ল নামক একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান রাজা ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে নেপালের সিংহাসনে আরূঢ় হন। ইনি মহাবীরের (হনুমান) এক বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং পশুপতিনাথের মন্দির সংস্কার করিয়া তাঁহার মস্তকে সুবর্ণের ছত্র নির্ম্মাণ করিয়া দেন। আজও তাহা মন্দিরে সুরক্ষিত আছে। তদীয় ধর্ম্মশীলা পত্নীর পুত্র-শোকে সান্ত্বনা প্রদানার্থে রাজধানীতে "রাণী পোখরী" নামে এক জলাশয় খনন করিয়া তন্মধ্যে গৃহ দেবতা প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতবর্ষের নানা তীর্থের জলে ঐ সরোবর পূর্ণ করা হয়। তাহার তীরে হস্তী পৃষ্ঠে রাজা রাণীর মূর্ত্তি অদ্যাপি দণ্ডায়মান আছে।

ইহার কয়েক পুরুষ পরে—অনুমান দুই শত বৎসর পরে গোর্খা রাজ পৃথ্বীনারায়ণ নেপাল রাজ্য অধিকার করেন। বড় আশ্চর্য্য ভাবে রাজসিংহাসন পৃথ্বী-নারায়ণের হস্তগত হয়।

পৃথ্বীনারায়ণ গোর্খাদিগের রাজা। ইঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ মুসলমানদিগের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া স্বদেশ উদয়পুর পরিত্যাগ করতঃ হিমালয়ের দুর্গম প্রদেশে গোরখালী নামক স্থানে রাজ্য স্থাপন করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে এই রাজ্যে পৃথ্বীনারায়ণ নামে জনৈক ক্ষমতাশালী পুরুষ রাজত্ব করেন। অন্যান্য দেশ বাহুবলে জয় করিয়া অবশেষে ইনি কৌশলে নেপাল রাজ্য অধিকার করেন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে সহরের নাগরিকবর্গ ইন্দ্রযাত্রা উৎসবে মত্ত ছিল। এই সময় পৃথ্বীনারায়ণ কতিপয় সৈন্য সমভিব্যাহারে গোপনে ছদ্মবেশে সহরে প্রবেশ করেন। উৎসবের নিয়মানুসারে কুমারীগণ রথে উঠিয়া সমস্ত সহর প্রদক্ষিণ করতঃ যখন রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন তখন সেখানে রাজার গদী বিস্তৃত হইল। রাজার অনুপস্থিতিতে তদুপরি তাঁহার তরবারি রক্ষিত হইয়া থাকে। প্রদক্ষিণান্তে রথের সম্মুখে যেমন রাজার গদী বিস্তৃত হইল, অমনি পৃথ্বীনারায়ণ লম্ফ দিয়া তাহাতে উপবেশন করতঃ বলিলেন—"আমি রাজা, সকলে আমাকে বরণ কর।" তদীয় অনুচরবর্গ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে রাজাধিরাজ বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিল। চতুর্দ্দিকের আনন্দ কোলাহল বিস্ময়ে পরিণত হইল। বাধা দিতে কেহ অগ্রসর হইল না। বিনা যুদ্ধে নেপালের রাজসিংহাসন গোর্খাবীর পৃথ্বীনারায়ণের হস্তগত হইল। অবশ্য তাঁহাকে পাটন, কীর্ত্তিপুর প্রভৃতি কয়েকটী ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করিতে অসিধারণ করিতে হইয়াছিল এবং কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক ব্রাহ্মণের সহায়তা না পাইলে এত সহজে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। কালের বিচিত্র গতি। রাজ্যলক্ষ্মী তাঁহাকেই বরণ করিয়া লইলেন। সেই অবধি নেপালের সিংহাসনে গোর্খারাজগণ রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। পৃথ্বীনারায়ণ নেপাল জয় করিয়া গোর্খা ও নেপাল রাজ্য মিলিত করেন। পরে কিরাতীদিগকে পরাজিত করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত নেপালের সীমা বিস্তৃত করেন। মাত্র চারি বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি লোকান্তরিত হন। পৃথ্বীনারায়ণের মৃত্যুর পরে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহপ্রতাপ রাজা হন। তিনিও পাঁচবৎসর রাজত্ব করিয়া রণবাহাদুর সাহ নামে শিশু পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। সিংহপ্রতাপের পত্নী রাণী রাজেন্দ্রলক্ষ্মী অতিশয় বুদ্ধিমত্তার সহিত রাজ্য শাসন করেন। এই সময় হইতেই মন্ত্রী পদের সৃষ্টি হয়। নেপালের প্রথম মন্ত্রী বাহাদুর সাহ—ইনি শিশু

রাজার পিতৃব্য। রণবাহাদুর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ইঁহাকে হত্যা করেন। তিনি বড়ই নৃশংস ও কঠোর প্রকৃতির রাজা ছিলেন। এই সময় হইতেই নেপালের রাজ-সিংহাসনে শিশুরাজা উপবেশন করিয়া আসিতেছেন এবং প্রধান মন্ত্রী রাজ্যের সমুদয় ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। রণবাহাদুরের উন্মত্ত অবস্থায় মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক কাশী প্রেরিত হইলে তদীয় পুত্র পঞ্চম বর্ষীয় বালক গৃবাণ যুদ্ধবিক্রমকে রাজপদে অভিষিক্ত করা হইল। ইঁহার রাজ্যশাসন সময়ে প্রথম রেসিডেণ্ট Captain Knox ক্যাপটেন নক্স বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নেপালে প্রেরিত হন। তখন রাজসিংহাসন লইয়া মন্ত্রিবর্গ ও অন্যান্য অমাত্যদের মধ্যে ঘোরতর হত্যাকাণ্ড চলিতেছিল। বৃটীশ রেসিডেণ্ট নেপাল রাজের সহিত বাণিজ্য এবং মৈত্রী সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও যখন কৃতকার্য্য হইলেন না, তখন তিনি ফিরিয়া গেলেন।

তার পর ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট পিণ্ডারী দস্যুদল দমনের জন্য নেপাল রাজের সাহায্য প্রার্থনা করেন। দুর্ভেদ্য নেপাল রাজ্যে অনেক দস্যু আশ্রয় লইয়াছিল। নেপাল-রাজ এই দস্যুদল দমনার্থে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের কোনই সহায়তা করিলেন না। এই রূপ নানা কারণে ইংরেজগণ নেপালরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এই যুদ্ধের পর নেপালরাজ ইংরেজের সহিত সন্ধি করেন এবং গাড়োয়াল, কুমায়ূন প্রভৃতি নেপালের পশ্চিমাংশের প্রদেশ ইংরেজ গভর্ণমেণ্টকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে এই সন্ধি হইয়াছিল। তার পর H. E. Gardiner এইচ্, ই, গার্ডিনার নেপালের স্থায়ী বৃটীশ রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন। গৃবাণ যুদ্ধবিক্রম সাহ এক-বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে গতায়ু হন। তদীয় দুই বৎসর বয়স্ক পুত্র রাজেন্দ্র বিক্রমশাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে ভীমসেন থাপা নামক জনৈক দূরদর্শী এবং সর্ব্ববিষয়ে অতি সুযোগ্য মন্ত্রী ছিলেন। ইনি রাজ্যশাসন বিষয়ে কতকগুলি নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়া যান—আজ পর্য্যন্ত মন্ত্রিগণ তাহার অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। ইঁহার সময়ে নেপালের অনেক উন্নতি হইয়াছিল। স্বীয় অদ্ভুত বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার ফলে ইনি রাজ্যের সৈন্য ও ধনবৃদ্ধি যথেষ্ট পরিমাণে করিয়াছিলেন। নেপালের ইতিহাসে ভীমসেন থাপার নাম অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। ইনি যে অশেষ প্রকারে নেপালের কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন, ইতিহাস তাহার সাক্ষী। ইঁহারই এক ভ্রাতার চক্রান্তে ও বিশ্বাস-ঘাতকতায় অস্থির হইয়া ইনি আত্মহত্যা করেন। চক্রান্তকারিগণ নেপালের অতি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত সুযোগ্য প্রধান রাজমন্ত্রীর মৃতদেহ শৃগাল কুক্কুর দিয়া খাওয়াইল। পশুপতিনাথ মন্দিরের স্বর্ণময় বৃহৎ বৃষমূর্ত্তি এবং অন্যান্য অনেক সুকীর্ত্তি তাঁহার অক্ষয়-নামের জয় ঘোষণা করিতেছে। রাজেন্দ্রবিক্রমের পরে সুরেন্দ্র বিক্রমশাহ নেপালের রাজা হন। তাঁহার আমলে জঙ্গ বাহাদুর নামে এক পরাক্রান্ত মন্ত্রী ছিলেন। তিনি অনেক হত্যাকাণ্ড করিয়া মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। রাজেন্দ্র বিক্রমশাহের কনিষ্ঠা পত্নী মহারাণী লক্ষ্মীদেবীর আজ্ঞায় ও জঙ্গ বাহাদুরের সহায়তায় একদিনেই (১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৫০) ৩১ জন প্রধান ব্যক্তির মুণ্ডচ্ছেদ হইয়াছিল। জঙ্গ বাহাদুর অতি চতুর রাজমন্ত্রী ছিলেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি রাজ্যশাসন বিষয়ে অনেক প্রকার নিয়ম করেন। জঙ্গ বাহাদুর কর্ত্তৃক নেপালে সহমরণ প্রথা রহিত হয়। ইনি ইংরাজ গভ-র্ণমেণ্টের সহিত বন্ধুতা রক্ষা করিয়াছিলেন। সৎসাহস, অসাধারণ পরিশ্রম ও উদ্যোগ এবং রাজ্যের নানাবিধ সংস্কার সাধনের জন্য তিনি প্রশংসনীয় ছিলেন। সুরেন্দ্র বিক্রমশাহের মৃত্যুর পরে তদীয় পৌত্র পৃথ্বীবীর বিক্রম-শাহ নেপালের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সময়ে রণদীপ সিংহ রাজমন্ত্রী ছিলেন। পরে তাঁহাকে হত্যা করিয়া বীর সামসের মন্ত্রী হন। তিনি কাঠমণ্ডু সহরের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। সহরে জলের কল, ড্রেণ, বীর হাঁসপাতাল, বীর লাইব্রেরী, প্রভৃতি তাঁহার সুকীর্ত্তির পরিচয় দিতেছে। বীর সাম-সেরের মৃত্যুর পর দেব সামসের রাজমন্ত্রী হইয়াছিলেন,

কিন্তু দুইমাস পরে বর্ত্তমান মন্ত্রী চন্দ্র সামসের প্রমুখ দল চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করতঃ নেপালের রাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। নেপালের মন্ত্রীপদ লইয়া চিরদিন রক্তপাত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু দেব সামসের অক্ষত দেহে দেশ ত্যাগ করেন। দেব সামসেরকে পদচ্যুত করিয়া ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ চন্দ্র সামসের রাজমন্ত্রী হন। বর্ত্তমান সময়ে তিনি অতি যোগ্য পুরুষ। তিনি একবার ইংলণ্ড ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। রাজ্যের সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধনে তিনি যথোচিত যত্ন করিতেছেন। ইহাঁর উপরই রাজ্যের সমুদয় সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে। জঙ্গ বাহাদুরের সময় হইতেই নেপালে রাজার কোনই কর্তৃত্ব নাই। মন্ত্রিই রাজ্যের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। যখন ভারতেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জ ভারতে শুভাগমন করিয়াছিলেন, সেই সময় রাজা পৃথ্বীবীর বিক্রম শাহ পরলোক গমন করেন। তদীয় শিশুপুত্র ত্রিভুবন বিক্রমশাহ এক্ষণে নেপালের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন। বিধাতা এই শিশু নৃপতির সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলবিধান করুন।

নেপালে বৃটীশ রেসিডেণ্ট।

ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট Captain Knoxকে প্রথম রেসিডেণ্ট রূপে নেপালে প্রেরণ করেন। তাহার সহিত নেপাল রাজের মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি অবিলম্বে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। রেসিডেণ্টের সহিত রাজমন্ত্রি গুরুতর বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করেন, কিন্তু আভ্যন্তরীণ অথবা রাজ্য-শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে রেসিডেণ্ট পারেন না। এইরূপ সর্ত্ত থাকায়, ইংরেজ রেসিডেণ্টের সম্মুখে কত হত্যাকাণ্ড হইয়াছে—অনেকে রেসিডেণ্টের আশ্রয়ে থাকিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। কাঠমণ্ডু সহরের এক প্রান্তে রেসিডেণ্ট সাহেবের স্থান।

এই সকল রেসিডেণ্টদিগের মধ্যে সুবিখ্যাত হড্‌সন সাহেব বহু পরিশ্রমে এবং অর্থব্যয়ে নেপালের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন। রেসিডেণ্টগণের সহিত যে সকল ডাক্তার থাকিতেন তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ রাইট (Wright) ডাক্তার ওলড্‌ফিলড্ (Oldfield) ঐতিহাসিক ছিলেন। বহু যত্নে তাঁহারা নানা গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া লণ্ডনে লইয়া গিয়াছেন।

অন্যান্য কথা।

রাজ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য নেপালরজের তেমন যত্ন নাই। কাঠমণ্ডু সহরে দরবার স্কুল নামক একটী স্কুল আছে। এই স্কুলে প্রধানতঃ সংস্কৃত এবং ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এখানে সংস্কৃত চর্চ্চা কিছু আছে। কোনও বালিকা বিদ্যালয় নাই। কয়েকজন বাঙ্গালী এই স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া আরও অনেক বাঙ্গালী এখানে বাস করেন। কেহ ডাক্তার, কেহ রাজকর্ম্মচারী ইত্যাদি। রেসিডেণ্ট সাহবের টেলিগ্রাফ ও পোষ্টাফিস আছে। বর্ত্তমান রাজমন্ত্রী সহরের নানাবিধ উন্নতি সাধন করিতেছেন। সহরের সর্ব্বস্থান বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত। প্রত্যেক আলোক স্তম্ভের উপর "চন্দ্রজ্যোতি" লেখা আছে। একজন বিলাত ফেরত বাঙ্গালী ডাক্তার এখানে আছেন। একটা টাকশাল আছে, তাহাতে রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা প্রস্তুত হয়। রাজ প্রাসাদগুলি কলিকাতার ন্যায় আধুনিক আদর্শে নির্ম্মিত। সহরের মধ্যে থাপাথলী নামক স্থানে অনেক সুদৃশ্য মন্দিরাদি আছে।

নেপালীরা আজকাল অনেকটা সভ্য হইয়াছে। বাজারে বিলাসের উপকরণ যথেষ্ট বিক্রয় হইয়া থাকে। অপরাহ্ন কালে মস্তকে টেড়ী, গায়ে সেক্‌সপিয়র কলার যুক্ত কামিজের বুক পকেটে নিকেলের চেন শোভিত ঘড়ী, মুখে সিগারেট, পায়ে আলবার্ট সু ও হাতে ছড়ী এইরূপে নেপালীদিগকে ভ্রমণ করিতে দেখা যায়। রাজা এবং সম্ভ্রান্ত লোকদিগের গাড়ী ঘোড়া, মোটর, সাইকেল প্রভৃতি আছে। নেপালে শিল্পের উন্নতি নাই, শিক্ষা বিস্তার নাই, জনসাধারণ সম্পূর্ণ অশিক্ষিত, অথচ এ দেশ স্বাধীন! সর্ব্বনিয়ামক কাল এমন স্বাধীন রাজ্যেও আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

প্রত্যাবর্ত্তন।

পশুপতিনাথ মন্দিরের সন্নিকটবর্ত্তী শঙ্করাচার্য্য মঠে কয়েকদিন বাস করিয়া, দেবতা ও অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান দর্শন এবং জ্ঞাতব্য বিষয় যৎকিঞ্চিত সংগ্রহ করতঃ, আমরা একদিন মধ্যাহ্নকালে প্রত্যাবর্ত্তন মানসে কাঠ-মণ্ডু সহর হইতে যাত্রার উদ্যোগ করিলাম।

সেদিন প্রভাত হইতে অত্যন্ত কুয়াসা ছিল, মধ্যাহ্ন-কালে দিনদেব কুজ্ঝটিকা রাশি ভেদ করিয়া পূর্ণতেজে প্রকাশিত হইলেন। উত্তর দিকে পর্ব্বতশিখরের তুহিন-রাশি সূর্য্য-কর-সম্পাতে ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিল। সে দৃশ্য হইতে চক্ষু আর ফেরে না। মঠাধ্যক্ষ স্বামীজি কৃপাপূর্ব্বক এই কয় দিনের জন্য আমাকে মঠে স্থান দান করিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। কাশীর কয়েকজন উদ্ধতপ্রকৃতি দণ্ডী ও একজন যুবক ব্রহ্মচারীও এই মঠে ছিলেন। দণ্ডিগণ প্রায়ই লোকের সহিত কলহ করিতেন কিন্তু যুবক ব্রহ্মচারীর প্রকৃতি বড়ই মধুর। যুবকের সহিত এই কয়দিন বড়ই আনন্দে কাটিয়াছিল।

একজন বাঙ্গালী ব্রহ্মচারী আমার সঙ্গী হই-লেন, অথবা আমি তাঁহার সঙ্গী হইলাম। প্রথমতঃ সহরের একজন বাঙ্গালী ডাক্তারের সহিত কিছুক্ষণ আলাপাদি করিয়া,সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে আমরা থানকোট নামক স্থানে আসিয়া পৌছিলাম। অতিকষ্টে এক গৃহস্থের বারান্দায় নাম মাত্র স্থান সংগ্রহ করিয়া রাত্রি-যাপনের ব্যবস্থা করা গেল। রাত্রিতে যেমন ঝড় বৃষ্টি তেমনি আমার জ্বর। অত্যধিক শীতে আমাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিল। গরম আর কিছুতেই হয় না। কোনরূপে জাগিয়া বসিয়া সেই কষ্টের রাত্রি প্রভাত হইল। যে কষ্টে সেই ভীষণ রাত্রি অতিবাহিত হই-য়াছিল তাহা অন্তর্যামী ভিন্ন আর কে জানিবে?

পরদিন অতি প্রত্যুষে থানকোট হইতে যাত্রা করিলাম। জ্বর লাগিয়াই আছে, সর্ব্বশরীর বেদনা-গ্রস্ত। তদুপরি চরণ-যুগলের অবস্থা অতীব শোচনীয়। সম্মুখে ভীষণ চড়াই। আসিবার কালের "চন্দ্রাগড়িকা উৎরাই" আজ চড়াইয়ে পরিণত হইয়াছে। ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিলাম। পশ্চাতের কত যাত্রী, কত কাণ্ডী ঝাম্‌পান আমাদিগকে ফেলিয়া আগে চলিয়া গেল। যাত্রিবর্গের মধ্যে কেহ কেহ আমাদের অক্ষমতা দেখিয়া বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিতেও ত্রুটি করিল না। আমরা উভয়ে উভয়ের অবলম্বন। দুই পা উঠি আর বিশ্রাম করি। এইরূপ অবস্থায় অতিকষ্টে পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করি-লাম। এতক্ষণে প্রফুল্ল সূর্য্যালোক পাইয়া শরীর-টাকে কথঞ্চিৎ গরম করা হইল। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পরে সঙ্গী ব্রহ্মচারী মহাশয় আহারাদির ব্যবস্থা করিতে নিম্নের চটী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

এবার উৎরাইয়ের পালা। আমিও কিয়ৎক্ষণ পরে যাত্রীদিগের সহিত নামিতে লাগিলাম। চটীতে পৌছিয়া দেখি ব্রহ্মচারীজি নাই। ভাবিলাম এক মাইল আগে যে চটী আছে সেখানে তিনি উদ্যোগ করিতেছেন। সেখানে গিয়াও তাঁহাকে পাইলাম না। এক দোকানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় আগের চটীতে ফিরিয়া আসি-লাম। একে অত্যন্ত শরীর খারাপ লইয়া পর্ব্বতে চড়াই উৎরাই করা হইয়াছে, তার উপর অনাহার, অবস্থা যে বড়ই খারাপ তাহা সহজেই অনুমেয়। রাস্তার ধারে একটা পাথরের উপর রৌদ্রে অনেকক্ষণ পড়িয়া থাকিলাম। ক্রমে সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িলেন।

পাহাড়ে সূর্য্যের উদয়াস্ত দেখিতে বড়ই সুন্দর, কিন্তু আমার তখনকার অবস্থায় কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। সন্ধ্যার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে একজন বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী সাধু পাহাড় হইতে নামিয়া আসিলেন। তাঁহারও শরীর অসুস্থ ও সমস্তদিন খাওয়া হয় নাই। সঙ্গে পয়সাও নাই যে কিনিয়া খাইবেন। আমি তাঁহাকে দুইজনের উপযুক্ত খোরাকীর পয়সা দিলাম। তিনি মোটা চাউল ও কলাই দাইল, আলু, 'ঘিউ মিরচা' কিনিয়া আনিয়া

একটা ভাঙ্গা মন্দিরের পাশে খিচুড়ী চড়াইয়া দিলেন।

সন্ধ্যাকালের প্রবল শীত বায়ুতে শরীর কাঁপিতে লাগিল। চুল্লীর ধারে বসিয়া উভয়ে সেই অর্দ্ধপক্ক খিচুড়ী গলাধঃকরণ করিয়া, এক দোকানীকে বিস্তর খোসামোদ করিয়া তাহার দোকানের বারান্দার এক পাশে দুই হস্ত পরিমিত স্থানে আগুন জ্বালিয়া বসিলাম। কপালের ভোগ! দোকানদার-গৃহিণী যে বিষম প্রখরা তাহা আর কেমন করিয়া জানিব! সে হঠাৎ ঘরের মধ্য হইতে ছুটিয়া আসিয়া গৃহদাহের আশঙ্কায় আমাদের অবোধ্য ভাষায় বকিতে বকিতে আগুনের কাঠগুলি টান মারিয়া দূরে ফেলিয়া দিল। আমরা অবাক্ হইয়া সেই রণচণ্ডীর পানে চাহিয়া জড় সড় ভাবে বসিয়া রহিলাম।

ক্রমে রাত্রি যতই গভীর হইতে লাগিল, ততই শীতের মাত্রা বাড়িতে লাগিল। অনেক কাকুতি মিনতি করিবার পরে দোকানদার অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহার লৌহ সিন্ধুকাকৃতি ঘরের এক কোণে শয়নের অনুমতি দিল। ঘরের একদিকে ছাগল, অপর-দিকে মুরগী, মধ্যস্থলে আমরা দুটী প্রাণী রাত্রি প্রভাতের অপেক্ষায় কম্বল জড়াইয়া বসিয়া রহিলাম।

ঘরের মধ্যে আসায় শীত একটু কম হইল, নতুবা বারান্দাই আমাদের ভাল ছিল; কিন্তু মাঘ মাসের দুর্জ্জয় শীতে ৫০০০ হাজার ফিট উচ্চ পাহাড়ের উপর বাহিরে রাত্রি যাপন করা কাহারও পক্ষে যে সম্ভব নয় তাহা বেশ সহজেই বোঝা যায়। গত রাত্রিতে থানকোটে সেই লেবারের বারান্দায় ঝড় বৃষ্টির মধ্যে যে দুর্দ্দশা, আর আজ এই দোকানে সমস্ত রাত্রি বসিয়া থাকা—এই দুই রাত্রি কি যে বিষম কষ্ট ভোগ করিয়াছি তাহা লিখিয়া বুঝাইবার নহে। একমাত্র অন্তর্যামী তিনিই জানেন। সর্ব্বনিয়ন্তার অখণ্ডনীয় বিধানে, অদৃষ্টের অমোঘ তাড়নায় এবং স্বকৃত কর্ম্মবিপাকে আজ কতদিন হইল এইরূপ পথে পথে ঘুরিতেছি। কত বিপদ, কত দুঃখ কষ্ট মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ সকলেরই মুখে বিদ্রূপের হাসি, কিন্তু হায় তাহাতে আমার কি হইয়াছে? আমার স্বভাবের কতটুকু পরিবর্ত্তন হইল? মনুষ্যজীবনে সর্ব্ববিধ অকল্যাণকর ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াও মুগ্ধ মন তাহা হইতে বিরত হয় না কেন? এ কি সংস্কার, না নিজের কৃত-কার্য্যের ফল? মোক্ষাভিলাষী মহাপুরুষের পদতলে বসিয়া স্বকীয় উদ্দেশ্যে লক্ষ্য স্থির করিতে যত্নবান্ হইতে হইবে। সমস্ত জগৎ হইতে মনকে কুড়াইয়া আনিয়া মুমুক্ষু সাধক নির্জ্জনে সেই পরমপুরুষের ধ্যানে চিত্ত সমাহিত করিবেন, এই ত কর্ত্তব্য। নতুবা জীবন ধারণ বৃথা, শরীরকে কষ্ট দেওয়া বৃথা। "বিধিলিপি কপাল জোড়া" জানিয়াও এদেশে সেদেশে ঘুরিয়া কি ফল লাভ হইবে? এ জগৎ কর্ম্মক্ষেত্র। ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে কর্ম্ম করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। দিন দিন করিয়া পরমায়ু শেষ হইতেছে, কর্ম্মহীনতার জীবনব্যাপী হা হুতাশ লইয়া কবে এ দেহ-পাত হইবে কে বলিতে পারে? এ পৃথিবীতে কেন আসিলাম, কি করিলাম, কর্ত্তব্য কি, কোন্‌টা ত্যাজ্য, কোন্‌টা ভোগ্য, কিছুই উপলব্ধ হইল না। পর্ব্বতের কঠিন প্রস্তরময় পথে পদতল ক্ষতবিক্ষত করিয়া, গ্রীষ্মের প্রখর সূর্য্যকিরণ ও বর্ষার বারিধারা মস্তকে ধারণ করিয়া, শীতে সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট করিয়া এই যে অবিশ্রান্ত ভ্রমণ, ইহার পশ্চাতে যে কি সুখ লুক্কায়িত আছে তাহা আমার অন্তর্যামী দেবতা তুমিই কেবল জান। সংসারে কত রকম লোকই ত নিয়ত ছুটাছুটী করিতেছে, আমিও তাহাদের মধ্যে একজন!

যাহা হউক, দুঃখে কষ্টে রাত্রি অতিবাহিত হইল। সঙ্গী হিন্দুস্থানী সাধুটী কিঞ্চিৎ ঔদরিক-প্রকৃতি। রাত্রিতেই পরামর্শ স্থির করিয়াছিলেন যে "সবেরে উঠ্‌কে দো টিকর ঔর থোড়াসা হালুয়া বানায়েকে খায়ে পিয়ে চল্‌না বহুত আচ্ছা হোগা।" আমাকেও সম্মতি-দান করিতে হইল। ভাবিলাম, শরীরটা বড়ই খারাপ—এ অবস্থায় এই কঠিন পথে একজন সঙ্গী থাকা বড়ই দরকার। কিন্তু তখনও জানিতে পারি নাই যে সঙ্গীবর

আমা অপেক্ষাও নিঃসম্বল এবং তাঁহার চলচ্ছক্তি আমা অপেক্ষাও অল্প। বলা বাহুল্য, আহার্য্য দ্রব্যের মূল্য আমাকে একাই বহন করিতে হইয়াছিল।

পরদিন প্রাতে সাধুজীর কুরন্ধিত টিক্কর অর্থাৎ দেড়-পোয়া আটার একখানা রুটী ও আটার হালুয়া কষ্টে যৎ-কিঞ্চিৎ গলাধঃকরণ করিয়া ধীরে ধীরে সেই অজ্ঞাতনামা চটী হইতে প্রস্থান করিলাম। সাধুজী পশ্চাতে অতি ধীর মন্থর গমনে চলিতে লাগিলেন। ক্রমাগত তাঁহার জন্ম আমাকে রাস্তায় অপেক্ষা করিতে হইল। এইরূপে চলিলে দুই মাসেও এই পাহাড়ের বাহিরে যাইতে পারিব না; অগত্যা সাধুজীর নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া একাই অগ্রসর হইলাম। কিছুদূর গিয়া দুইটী রাস্তা সম্মুখে পড়িল। কোন্ পথে যাইব ইতস্ততঃ করিতেছি, এমন সময়ে একজন পথিককে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, বামদিকের পথটী অপেক্ষাকৃত সোজা। ক্লান্ত শরীরে সহজ পথে চলাই উচিত মনে করিয়া বামদিকের পথে চলিতে লাগিলাম। পথ ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে এক ক্ষুদ্রকায়া নির্ঝরিণীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পিচ্ছিল পর্ব্বতগাত্র বহিয়া নীচে এই নির্ঝরিণীতে নামিতে হইবে, তার পর পার হইয়া পুনরায় ঐরূপ ভাবে উপরে উঠিতে হইবে। এমন ভয়ঙ্কর পথ যে নামা উঠা অতিশয় কঠিন। ইহার নাম পাক্‌দাণ্ডী। বদরিকাশ্রমের রাস্তায় একবার না বুঝিয়া এইরূপ পথে চলিতে গিয়া প্রাণান্তের উপক্রম হইয়াছিল। সে কথা যাক্।

অনেকক্ষণ বসিয়া চিন্তা করিলাম। জনমানবের সাক্ষাৎ নাই। শুধু বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিলেই বা কি হইবে? গোস্বামী তুলসীদাস বলিয়াছেন……ক্যা শোচ্ কর মন মূরখ্ শোচ্ করে কুছ্ হাত না আই… ইত্যাদি মনে পড়িল। হঠাৎ একজন পাহাড়ী কুলী সেই পথের বিপরীত দিক্ হইতে আসিতেছে দেখিলাম, সে আমায় দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "কেঁও মহারাজ, আপ্ ইয়ে পাক্‌দাণ্ডীমে চলা আয়া?" বাক্যালাপ করিতে ইচ্ছা হইল না; কিন্তু নিরুত্তর থাকা কর্ত্তব্য নহে, কাযেই বলিতে হইল "মুঝে ত পহিলে মালুম নেহি থা", বাস্ এই পর্য্যন্ত। কুলীপুঙ্গব নির্দ্দয়ের মত আমাকে এই বিজন বিপিনে ফেলিয়া গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেল। আমিও বীরের মত পাক্‌দাণ্ডী চলিতে লাগিলাম। কিন্তু বীরবরকে অধিকদূর অগ্রসর হইতে হইল না।

ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া প্রাণ ভরিয়া নির্ঝরিণীর শীতল জল পান করতঃ পুনরায় কষ্টেস্থষ্টে উপরে উঠা গেল। কুলিখালি পর্য্যন্ত পৌঁছিতে রাস্তা আর বিশেষ খারাপ পাই নাই। তবে শরীর একেবারেই ভাল নয়—ঠেলা গাড়ীর মত ঠেলিয়া আনিতে হইতেছে। পুনঃ পুনঃ বিশ্রাম করতঃ রাস্তা চলিয়া এবং রাস্তা হইতে শতাধিক সোপানশ্রেণী উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক যখন কুলি-খালীর বৃহৎ ধর্ম্মশালায় পৌঁছিলাম, তখন বেলা অনুমান দুইটা হইবে। মন্দিরের বারান্দায় শয়ন করা গেল। পশুপতিনাথ যাইবার দিনে এই ধর্ম্মশালাতে স্থান সংগ্রহ করিতে না পারিয়া বাহিরে রাস্তার ধারে পড়িয়া ছিলাম; —আজ একেবারে খালি। ধর্ম্মশালার জনৈক রক্ষক সদা-ব্রত এক মাল্‌সা চাউল দাইল আনিয়া উপস্থিত করিল। তাহার চেহারা দেখিবামাত্র আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা দূরে পলায়ন করিল। কি বিশ্রী মোটা চাউল, আর খোসা শুদ্ধ কলাই দাইল, আর একটু লবণ—খাওয়া দূরে থাক, দেখিলেই ভয় হয়।

ভবঘুরে বৃত্তি অবলম্বন করিয়া দেশবিদেশে নানারূপ খাদ্যে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছি—পোড়া রুটি, অর্দ্ধপক্ক খিচুড়ী উদরস্থ করা একরূপ অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে। মাসের মধ্যে পনর দিন উপবাসে কাটিয়া যায়, কিন্তু হায় এরূপ খাদ্যে উদর পুরণ কখনও করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না! সুতরাং যাহা হইবার হইবে, এরূপ খাদ্যে ব্যারামের সৃষ্টি করিতে পারিব না ভাবিয়া অশেষ ধন্যবাদের সহিত সদাব্রতের মালসা ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইলাম। "বাঙ্গালী লোক সুকুমার হ্যায়" হিন্দুস্থানীদের এই বচনটী আমার পক্ষে বেশ খাটিয়া গেল।

বেলা অবসানপ্রায় দেখিয়া ধর্ম্মশালা হইতে গাত্রো-থান করিলাম। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া "শিশাগড়ীকা

কঠিন চড়াই" আরম্ভ হইল। একে অপরাহ্ণের পড়ন্ত সূর্য্যের উত্তাপ, তারপর ক্রমাগত আকাশে উঠিতে উঠিতে চরণদ্বয় একান্ত অবসন্ন—আবার আরও মধুর যে পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক, কিন্তু জলের অভাব। আর পারি না বলিয়া ক্ষণে ক্ষণে হতাশ হইতেছি—উপায় কি? এই ভাবে চলিতেই হইবে। পাহাড়ী নরনারী আনন্দে গান গাহিতে গাহিতে চড়াই উৎরাই করিতেছে, কেহ কাহারও দিকে ফিরিয়া চাহে না। গলদ্‌ঘর্ম্ম অবস্থায় কোনরূপে শিখরদেশে আরোহণ করা গেল। পুনরায় ঐরূপ উৎরাই। শিশাগড়ীতে রাজার চৌকী আছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বিদেশী শত্রুর আক্রমণ রোধ করিবার জন্য এখানে কতকগুলি সৈন্য আছে। যাত্রীদিগের ছাড়পত্র এখানে লওয়া হইতেছে। আমার সে চিরকুটখানি হারাইয়া গিয়াছে। বলিতে দুঃখ হয়, একজন বাঙ্গালী সাধু (?) আমার জামাটী "পরদ্রব্য লোষ্ট্রবৎ" জ্ঞানে হস্তগত করে। সাধুটির আত্মপর ভেদ জ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে, তবে তাহার যে পরমহংস অবস্থা নয় এ কথা নিশ্চিত বলিতে পারি; কেন না আলাপে জানা যায় তিনি হাবড়া জেলার কোন স্থানে মুদীখানা দোকান করিতেন। দোকানের লভ্যাংশ লইয়া ভ্রাতাদিগের সহিত বিবাদ হওয়ায় তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। কিছু টাকা আত্মসাৎ করিয়া সাধুবেশে একেবারে নেপালের পাহাড়ে আসিয়া উপস্থিত! আত্মগোপনের এমন উৎকৃষ্ট পন্থা ত আর নাই। বাঙ্গালী—আমার স্বদেশবাসী—আলাপ আপ্যায়নে সন্তুষ্ট করিয়া স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ আমার জামাটী অজ্ঞাতসারে লইয়া বন্ধুত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। সাধুর কলঙ্ক! বাঙ্গালীর কলঙ্ক!!

যাহা হউক, সেই জামার পকেটে ছাড়পত্র কাগজের টুকরা ছিল, তাহা না দিতে পারায় চৌকীরক্ষক আমাকে যাইতে দিল না। তিরস্কারে আপ্যায়িত করিয়া আমার হস্তধারণপূর্ব্বক এক বৃক্ষতলে বসাইয়া দিল। আমি হতভম্বের ন্যায় বসিয়া রহিলাম। অনুমান দশ মিনিট পরে যাইবার অনুমতি পাওয়া গেল। ভাবিলাম কি অসভ্য ব্যবস্থা! ধরিতে হয় ত আটক করিয়া রাখ, নহিলে এ বিড়ম্বনা কেন? যদিও কাঠমণ্ডু সহরে সভ্যতার ক্ষীণ আলোক প্রবেশ করিয়াছে, তথাপি সহর ছাড়া সর্ব্বত্র "যে তিমিরে সে তিমিরে।" যাহা হউক রেহাই পাওয়া গেল; ধন্যবাদ দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। অনেকখানি উৎরাই করিয়া ভীমফেদীর ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইলাম। যাত্রিদলে সকল স্থান পরিপূর্ণ—কোনরূপে একহাত স্থান দখল করিয়া রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করা গেল। অন্ধকারে চতুর্দ্দিকের পর্ব্বতগুলি ভীষণ মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছে।

পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া যাত্রা করিলাম। রাস্তার ধারে একটা ঝরণাতে স্নানাদি সারিয়া মধ্যাহ্নকালে হেটোরা চটীতে উপস্থিত হইলাম। শারীরিক অবস্থা বড়ই খারাপ, বিশেষতঃ পা দুখানির অবস্থা অতীব শোচনীয়। একেবারে জবাব দিয়া বসিল। আর যাইব না ভাবিয়া এক দোকান মনোনীত করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। যথাসম্ভব পূর্ব্বের ন্যায় আহারাদি করিয়া, দ্বারভাঙ্গা জেলার দুইজন যাত্রীর সহিত কথাবার্ত্তায় রাত্রি কাটান গেল। তৎপর দিন প্রত্যূষে যাত্রা করিয়া ৬ মাইল পরে চিড়িয়া চটীতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি। তথা হইতে পূর্ব্বপরিচিত নদীর মধ্যবর্ত্তী পথে প্রস্তরখণ্ডে পদদ্বয় ক্ষতবিক্ষত করিয়া বেলা বারোটার সময়ে ভিসাখুরা চটীতে উপস্থিত হইলাম। স্নানাদি করিয়া সামান্য বিশ্রামান্তে পুনরায় জঙ্গলের মধ্য দিয়া চলিয়া চলিয়া অপরাহ্ণকালে সিমিরা বাসা চটীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। শরীর নিতান্তই অবসন্ন, অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া রাত্রিতে খিচুড়ী ভক্ষণ করিয়া নিদ্রা দেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করা গেল। সুনিদ্রায় রাত্রি অতিবাহিত হইল।

পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া যাত্রা করিলাম। এখান হইতে বীরগঞ্জ ৫ ক্রোশ। ধীরে ধীরে চলিয়া কোনরূপে দেহটাকে বীরগঞ্জের বাজারে আনিয়া ফেলিলাম। একজন বাঙ্গালী দোকানদার এখানে আছেন জানিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলাম। তিনি একটী নিভৃত ঘরে

আমাকে স্থান দিলেন। তাড়াতাড়ি জল গরম করিয়া আনিলেন। সেই গরমজল পায়ে ঢালিয়া বড়ই আরাম বোধ হইল। বিশ্রামান্তে লুচী তরকারীর দ্বারা উদর-দেবকে তুষ্ট করিলাম। নেপাল হইতে যে ব্রহ্মচারীর সহিত রওনা হইয়াছিলাম—যিনি আমাকে মধ্য পথে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন—এখানে তাঁহার দর্শন পাওয়া গেল। নানা প্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। অনেকদিন পরে এখানে "বঙ্গবাসী" পত্রিকার সাক্ষাৎ পাইলাম। সন্ধ্যার পরে গৃহকর্ত্তা আসিয়া বসিলেন। তাঁহার সহিত সৎপ্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। ভদ্রলোক অতি সজ্জন, দেশে জ্ঞাতিদিগের সহিত বিষয় সম্পর্কিত বিরোধ হওয়ায় সমস্ত পরিত্যাগ করতঃ এই আত্মীয় বন্ধুহীন দেশে ষ্টেশনারী দোকান করিয়া সপরিবারে বহুকাল হইল বাস করিতেছেন।

পশুপতিনাথ যাত্রা সময়ে বহুতর সাধু এই পথে গমনাগমন করেন, ইনি যথাসাধ্য তাঁহাদের সেবা করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন। তাঁহার মধুর চরিত্রে এবং অমায়িক কথাবার্ত্তায় আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। অপরিণত বয়স্ক পুত্রদুইটী আমাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পাতাইয়া লইল। রাত্রিতে ব্রহ্মচারীজি উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করিলেন। বহুকাল পরে মনের সাধে উদর-দেবের অর্চ্চনা করিয়া সুকোমল শয্যায় দেহভার ন্যস্ত করিলাম। দীর্ঘ রজনী কোন্ পথে অন্তর্দ্ধান হইল কিছুই জানিতে পারিলাম না।

পরদিন প্রাতঃকালে গৃহকর্ত্তার নিকট বিদায়ের প্রস্তাব করিলাম। আমার শরীর ভাল নয় দেখিয়া তিনি আর একটা দিন থাকিবার জন্য বিশেষরূপ অনুরোধ করিলেন। রেলওয়ে ষ্টেশনের এত নিকটবর্ত্তী হইয়া আর থাকিতে ইচ্ছা নাই বলিয়া আমরা বীরগঞ্জ হইতে রকসোল ষ্টেশনের দিকে রওনা হইলাম। সম্মুখে নেপাল রাজের দাতব্য ঔষধালয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই ষ্টেশন সন্নিহিত রকসোল বাজারে পূর্ব্ব পরিচিত বৃদ্ধের দোকানে উপস্থিত হইলাম। বৃদ্ধ আমাদিগকে দেখিয়া খুসী হইল। সঙ্গী ব্রহ্মচারীজি আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া সন্ধ্যার গাড়ীতে দ্বারভাঙ্গা চলিয়া গেলেন। শ্রীভগবানের নাম সম্বল করিয়া ভগ্ন কুটীরে একাই রাত্রি যাপন করিলাম। তৎপরে সেখান হইতে সন্ধ্যার গাড়ীতে-প্রস্থান করিব বলিয়া ষ্টেশনে গেলাম। ব্রহ্মাবধূত কুমারানন্দ ব্রহ্মচারীর সহিত ষ্টেশনে আলাপ হইল। অনেকক্ষণ তাঁহার সৎসঙ্গে আনন্দ উপভোগ করিবার পর গাড়ী আসিলে তিনি আমাকে একটা গাড়ীতে যত্নপূর্ব্বক তুলিয়া দিলেন।

যথাসময়ে গোরক্ষপুর পৌছিয়া গোরক্ষনাথ মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। বাবা গম্ভীরানাথজীর চরণ দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম। তাঁহার মূর্ত্তি প্রশান্ত গম্ভীর, কাহারও সহিত বেশী কথা বলেন না—এইজন্য নাম গম্ভীরানাথ। ইনি নাথপন্থী। ইঁহার দুইজন বাঙ্গালী শিষ্য তখন সেখানে ছিলেন, তাঁহাদের নিকট শুনিলাম ইনি সিদ্ধপুরুষ। বেশ আনন্দে দুইদিন কাটাইয়া লক্ষ্ণৌ অভিমুখে প্রস্থান করিলাম। কয়েক ঘণ্টা পরেই বাষ্পীয় শকট আমাকে জনকোলাহলপূর্ণ লক্ষ্ণৌ সহরের ধূলি আবর্জ্জনার মধ্যে আনিয়া ফেলিয়া দিল। কোথায় হিমালয়ের স্তব্ধ গম্ভীর নীরবতা, আর কোথায় এই আবর্জ্জনাময় সহরের নিত্য কোলাহল!

সমাপ্ত।

ব্রহ্মচারী হেমচন্দ্র।

জ্যোৎস্নার উপহার

(গল্প)

(১)

বালিকা জ্যোৎস্নাময়ী, শারদীয়া জ্যোৎস্নার মতই সুন্দরী। তেমনই উজ্জ্বলে মধুর, তেমনই শোভাময়ী, তেমনই নয়নের তৃপ্তিদায়িনী—দেখিলে অন্তর মাধুর্য্যে পরিপ্লুত হইয়া উঠিত। জ্যোৎস্না যখন দরিদ্রের ইষ্টক বাহির করা ভগ্নগৃহে জন্মগ্রহণ করিল, তখন তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়াই মা আদর করিয়া নাম রাখিয়াছিলেন জ্যোৎস্নাময়ী, নহিলে ৫০৲ টাকা মাহিনার কেরাণীর মেয়ের নাম, খুকী পুঁটী এই সব হওয়াই উচিত ছিল।

তা'র পরে সেই জ্যোৎস্না একটু বড় হইল। ডুরে বা বাসন্তীরঙের শাড়ীখানি পরিয়া, নিবিড় মেঘতুল্য সুকৃষ্ণ কেশদাম্ এলাইয়া দিয়া, পথ আলো করিয়া মেয়ে যখন স্কুলে যাইতে লাগিল, তখন তাহার শৈশব সৌন্দর্য্য দেখিয়া পথের পথিক প্রশংসমান নেত্রে তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিত। সেই সৌন্দর্য্য দেখিয়াই পাশের বাড়ীর অতুল ধনশালী অতুলবাবু মাঝে মাঝে বলিতেন—"আমার ছেলে নীলমণির সঙ্গে জ্যোৎস্নার বিবাহ দিব।"

কথাটা অতুলবাবু তত পাকা করিয়া না বলুন, কিন্তু মনে মনে এই সুন্দর ফুট্‌ফুটে মেয়েটীকে বৌ করিবার বাসনা সত্যই তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়াছিল। কিন্তু মেয়ের বাপ দরিদ্র রমেশ বাবু সেই দু এক দিনের মুখের কথাতেই বড় আশা করিয়াছিলেন। বলিতে গেলে জ্যোৎস্নার সম্বন্ধে তিনি একরূপ নিশ্চিন্তই ছিলেন। আবার তাহার উপর নীলমণির মা যখন বলিতেন, "নীলু যদি বাঁচে, আমি জ্যোৎস্নাকে বৌ করবই"—তখন আর ভয় কি? জোৎস্নার মা'র তখন বয়স অল্প, সংসার অনভিজ্ঞা যুবতী মানস পটে কল্পনার বিস্তৃত রাজ্যে দেখিতেন—জ্যোৎস্না বড় হইয়াছে, বিবাহের পরে মণিমুক্তা লেস ক্রেপে সাজিয়া, কৈশোর-যৌবনের সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হইয়া হাসিমাখা মুখে শশুরবাড়ী হইতে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেছে।

জ্যোৎস্না ও নীলমণি এই সকল কথাবার্ত্তা শুনিয়াছিল কিনা, কিম্বা শুনিলেও বুঝিয়াছিল কিনা, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না, তবে ছেলেবেলায় দুজনে বড় ভাব ছিল। জ্যোৎস্না নীলমণিকে দাদা বলিত, দুজনে একত্র খেলা করিত। ক্রমে জ্যোৎস্না যখন ১০।১২ বৎসরের কাছে আসিল, তখন তাহারা সকল কথা শুনিয়াছে এবং বুঝিতেও পারিয়াছে। তখন নীলমণিকে দেখিয়া তাহার বড় লজ্জা হইত। নীলমণিকে দেখিলেই সে ভাবিত—"এই ত আমার বর। লোকের সামনে কথা বলিলে পাড়ার লোকে বলিবে কি? ছিঃ ছিঃ।" নীলমণিও এখন বালক নহে, যৌবন আপন আগমন বার্ত্তা তাহার দেহের অঙ্গে প্রত্যঙ্গে ঘোষণা করিল। ঈষৎ গোঁফের রেখা দিল, হস্তের পেশীগুলি দৃঢ় হইল, বক্ষ যৌবনোচিত বিশালতা লাভ করিল, সুতরাং সে চক্ষে চসমা দিয়া, কোঁকড়ান মিশমিশে কালো চুলগুলিতে একটু বাঁকা টেরি কাটিয়া, পাঞ্জাবীতে পাম-শুতে স্বভাবসুন্দর দেহটিকে আরো সাজাইতে লাগিল। এখন ভাবীপত্নী জ্যোৎস্নার লজ্জা দেখিয়া তাহারও একটু লজ্জা আসিল। আর তেমন করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রতিবেশিনীটির সহিত মিশিতে পারিত না। চাঁদের আলোয় ছাদে বসিয়া বিরহ সঙ্গীত গাহিয়া, পাঠ্য পুস্তকের আড়ালে ২।১টা কবিতা লিখিয়া, ভাবীপত্নীর জন্ম একটা অধীর প্রতীক্ষা লইয়া নীলমণি দিন কাটাইতে লাগিল।

যখন কিশোর কিশোরীর অবস্থা এইরূপ, তখন একদিন বজ্রধ্বনির মত তাহারা শুনিল, এ বিবাহ হইবে না, হইতে পারে না। বিভবশালী অতুলবাবুর বিশাল অট্টালিকায় দরিদ্রের কন্যা প্রবেশাধিকার পাইবে না, বড় বড় ঘরে নীলমণির জন্ম মেয়ে অনুসন্ধান চলিতেছে।

রমেশবাবুর সুখস্বপ্ন বড় নির্দ্দয়রূপে ভাঙ্গিয়া গেল। তিনিও অন্যত্র পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন। বড় বড় ফর্দ্দ দেখিয়া বুঝিলেন, ভালঘরে বিবাহ হওয়া একেবারেই অসম্ভব। হা অভাগিনী! কেন গরীবের ঘরে জন্মিয়াছিলি? অলক্ষ্যে স্নেহময় পিতা দুইবিন্দু অশ্রু মুছিলেন।

একদিন জ্যোৎস্না বসিয়া কুটনা কুটিতেছে, ফুলকপির ফুল কাটিতে গিয়া আঙ্গুল কাটিয়া টস্ টস্ করিয়া রক্ত মাটীতে পড়িতে লাগিল। রমেশবাবু স্ত্রীকে বলিলেন, "ওকে ভাল করে কাযকর্ম্ম শেখাও। আশা ভরসা তো সব ফুরিয়ে গেল, কোন্ গরীবের ঘরে যাবে, খেটে খেটে প্রাণটা বেরিয়ে যাবে।"

স্ত্রী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "এতদিনের আশা ভরসা একেবারে ভেঙ্গে দিলে! ওর যে এমন ভাগ্য তা জান্তাম না।" জ্যোৎস্না ঘরের ভিতর গিয়া অবিরত নয়নাশ্রু মুছিতে লাগিল। মনে হইল, যেন তাহার ঘর-বর কে কাড়িয়া লইতেছে!

(২)

একদিন সন্ধ্যার পরে জ্যোৎস্না আধআলো আধছায়াতে ছাদে বসিয়া আছে, নীলমণি আলিসা টপ্‌কাইয়া আসিয়া তাহার পাশে বসিল। জ্যোৎস্না ভীত সলজ্জ ভাবে বলিল, "তুমি বাড়ী যাও, কে কি মনে করবে।"

নীলমণি বলিল, "তা যাচ্ছি। আর মনে যে যা করুক, সে ভয় আর নেই, আই ডোন কেয়ার। আমি যখন জ্যোৎস্না তোমাকেই পেলাম না,তখন আর সংসারে বাস করবো না, বিবাগী হয়ে চলে যাব। এই একটা জিনিষ তোমায় উপহার দিলাম, এটী যত্ন করে রেখো। সংসার থেকে যখন আমার নাম মুছে যাবে, তুমি আমার নাম করে দু'ফোঁটা চক্ষের জল ফেলো!" স্বর্ণজড়িত গজদন্ত নির্ম্মিত অপূর্ব্ব কারুকার্য্যময় একটি ক্ষুদ্র বাক্স রুমালে জড়াইয়া নীলমণি জ্যোৎস্নার হাতে দিল।

জ্যোৎস্না উপহারটী লইয়া অশ্রুসজল চক্ষে বলিল, "সে কি কথা? বিয়ে করে' ঘর সংসার করো! আমি কে নীলমণি? বাপ মা'র কথা শোনা ছাড়া আমাদের আর উপায় কি আছে?"

নীলমণি অশ্রু মুছিয়া বলিল, "তুমি স্ত্রীলোক, তোমায় অবশ্যই শুনতে হবে। কিন্তু আমি কার অধীন? আমার মুখপানে কে চাইলে?"—বলিয়া নীলমণি দ্রুত প্রস্থান করিল।

জ্যোৎস্না বসিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল।

যখন বড় বড় সম্বন্ধগুলা টাকার জন্য ভাঙ্গিয়া গেল, তখন রমেশবাবু কল্পনার স্বর্গরাজ্য হইতে একেবারে ভূমিতে পড়িতে নারাজ হইলেন। নিতান্ত ১৫৲ টাকার কেরাণীর হাতে স্বর্ণপ্রতিমাকে না দিয়া, দ্বিতীয় পক্ষের একটি পাত্র খুঁজিতে লাগিলেন। মেয়ের বয়স তো প্রায় ষোল হইতে যায়, নিতান্ত খারাপও দেখাইবে না।

এবার কিন্তু শীঘ্রই মিলিল। গোপাল বাবু খুব বড় জমীদার, ৪৫ বৎসর বয়স হইলেই বা দোষ কি? জ্যোৎস্নাও তো আর ছেলেমানুষ নয়। পূর্ব্বের কয়েকটি সন্তান থাকিলেই বা ক্ষতি কি? জ্যোৎস্না কি তেমন মেয়ে? সে আপন গুণে সমস্তই মানাইয়া লইবে। এই সম্বন্ধে পিতামাতা মত করিলেন। বিবাহের দিন স্থির হইল।

(৩)

বিবাহ তো স্থির হইল, কিন্তু যার বিয়ে সে তো আহ্লাদিত হইল না। যে দিন সকালবেলা সানাইয়ের মৃদু মধুর রাগিণী পাড়াটীকে মাতাইয়া তুলিল, নরনারীর কণ্ঠস্বরে ছোট বাড়ীখানি মুখরিত হইয়া উঠিল, সে দিন শঙ্খবলয় চন্দন ও ফুলের মালাপরা বধুবেশিনী জ্যোৎস্না গোপনে বারবার চক্ষের জল মুছিল।

শুভদৃষ্টির সময় বর সতৃষ্ণনেত্রে কনে'র মুখপানে চাহিলেন। কনের সুকৃষ্ণ আয়ত নয়ন দুটী ভূমির দিকেই নত রহিল, পার্শ্ববর্ত্তিনীদের শত অনুরোধেও বরের প্রতি সে চাহিল না।

পুষ্পবাসরে গোপাল বাবু যখন বধুকে একবাক্স

হীরার গহনা দিয়া কথা কহাইবার জন্য প্রলোভিত করিতেছিলেন, তখন জ্যোৎস্নার মনে হইতেছিল, ঐ উজ্জ্বল দীপমালা নিবিয়া এ গন্ধময় পুষ্পহার ছিঁড়িয়া যাউক, প্রগাঢ় অন্ধকারে সে একাকী জাগিয়া থাকুক, আঁধারে তাহার মৌন অভিমান ভরা মুখ লুকাইয়া থাকুক। একবার প্রাণ ভরিয়া তাহাকে কাঁদিতে দাও, এ আদর যত্ন, এ মণিরত্ন কিছুই তাহার প্রয়োজন নাই।

বিবাহের পরেও জ্যোৎস্নার মনস্থির হইল না। বুঝি কুমারী কালের মুক্ত অবস্থা শতগুণে সহনীয় ছিল; তখন আদর যত্নে তাহার ভগ্ন হৃদয়কে কেহ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত না, তখন তাহার বিষণ্ণমুখ, দীর্ঘনিশ্বাসের কৈফিয়ত কেহ সহস্রবার চাহিত না;—এমন ছিল না।

জ্যোৎস্নার পিতামাতা ঠিকই বলিয়াছিলেন; গোপাল বাবুর প্রথম পক্ষের ছেলেমেয়েগুলিকে জ্যোৎস্না আপন হৃদয়ের অবিরল স্নেহধারায় অভিষিক্ত করিয়া তাহাদিগকে আপন করিয়া লইল। গোপাল বাবুর এক বিধবা ভগিনী একটি মাত্র ছোট মেয়ে রাখিয়া পরলোক গমন করেন, সেই পিতৃমাতৃহীনা মেয়েটিকে জ্যোৎস্না বুকে করিয়া মানুষ করিতে লাগিল।

এইরূপে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল।

(৪)

একদিন জ্যোৎস্না বিকালে ছাদে বসিয়া ভাবিতেছিল, "আমি কি পামরী! যে স্বামী আমার জন্য সদা ব্যস্ত, আমি তাঁর প্রেমের কি প্রতিদান দিই? কাহার জন্য ভাবি? না, সে আমার কেহ নয়। দুইদিন পরে বিবাহ করিয়া ঘর সংসার করিয়া আমায় ভুলিয়া যাইবে, বা এতদিনে গিয়াছে। না, আর না, দেবতা সহায় হও।"

রাত্রে স্বামী আহার করিতে বসিলে জ্যোৎস্না বাতাস দিতেছিল। গোপাল বাবু মাঝে মাঝে স্ত্রীর আন্দোলিত বাহুলতার শোভা দেখিতেছিলেন, এবং মনে মনে ভাবিতেছিলেন, ফ্যানের বাতাস, ময়ূরপুচ্ছের পাখার বাতাস, চামরের ব্যজন, মলয় মারুত,—এ সব কিছুই স্ত্রীর হাতের ছোট পাখাখানির বাতাসের মত মিষ্ট নহে। তবে বীজনকারিণীর কষ্টানুভব করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, "থাকুক জ্যোৎস্না! হাতে বেদনা হ'বে।"

স্বামীর মমতা দেখিয়া জ্যোৎস্নার চক্ষে জল আসিল। বলিল, "বিনা মতলবে হাওয়া করিতে আসিনি। আমার দরখাস্ত আছে।"

গোপাল বাবু লুচী ও চিংড়ীমাছের কালিয়া মুখে দিতে দিতে হাস্য করিয়া বলিলেন, "অনুমতি কর।"

জ্যোৎস্না বলিল, "কল্পনার সঙ্গে, আমাদের পাড়ার অতুলবাবুর ছেলে নীলমণিদা'র সম্বন্ধ করবো?"

গোপাল বাবু বলিলেন, "তা করতে পার; কিন্তু তাঁদের অবস্থা ভাল, তাঁরা একমাত্র ছেলের সঙ্গে কি ঐ বাপ-মা-মরা মেয়ের বিয়ে দেবেন?"

জ্যোৎস্না বলিল, "কেন দেবেন না? আমরাই ত কল্পনার বাপ মা! ওর বিয়েতে তোমাকে ৫।৬ হাজার টাকা খরচ করতে হবে। এতদিন বুকে করে মানুষ করলাম, এখন সামান্য দু এক হাজার টাকার জন্যে কি ওর জীবনটার মাটী করবো? আমায় টাকা দিতেই হবে।"

স্বামী হাস্যমুখে উত্তর দিলেন, "তা, বেশ।"

তাহার পর নীলমণি যখন কন্যা দেখিতে আসিল, জ্যোৎস্না অন্তঃপুরের একটী ঘরে তাহাকে বসাইয়া, সজ্জিত মেয়েটীকে লইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল। দেখাশুনা হইয়া গেলে কল্পনা পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

নীলমণি জ্যোৎস্নাকে বলিল, "জ্যোৎস্না! কতকাল তোমায় দেখিনি, তোমায় দেখবো বলেই মেয়ে দেখবার ছল করে এসেছি; নয়তো আমি স্পষ্টই বলেছি, বিয়ে করবো না। কেবল বাবার পীড়াপীড়িতে ২।১ জায়গায় মেয়ে দেখতে যাই মাত্র, কিন্তু পছন্দ নয় বলে সব জায়গাতেই ভাঙ্গিয়ে দিয়েছি।"

জ্যোৎস্না কিয়ৎক্ষণ অবনত মুখে থাকিয়া, নখে নখ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল, "মনে আছে নীলমণিদা,' একদিন তুমি আমায় একটী সুন্দর জিনিষ উপহার দিয়েছিলে? আমি তোমায় কিছু দিতে পারি নি, তাই আজ এই মেয়েটিকে তোমায় উপহার দেব বলে এনেছি। আমি যখন এ বাড়ীতে এলাম, এই পিতৃমাতৃহীনা মেয়েটীকে বুকে করে নিয়েছিলাম। আজ ছ' বৎসর অনেক যত্নে পালন করেছি। নীলমণিদা, আমার এ উপহারটী কি তুমি নেবে না?"

জ্যোৎস্নার কাণের দোদুল্যমান ইয়ারিং দুটী ঝকমক করিতেছিল। নীলমণি তৎপ্রতি চাহিয়া ছিল। বিস্ফারিত নয়নে বলিল, "জ্যোৎস্না! আজ আবার এ কি খেলা?"

জ্যোৎস্নার চোখ সজল হইয়া আসিয়াছিল। বলিল —"তুমি আমার কথা শুন্‌বে না? আমার কথা রাখবে না? আমি যাতে মনে একটু শান্তি পাই তা তুমি করবে না?"—বলিয়া সে ঝরঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

চোখের জলে নীলমণির হৃদয় গলিল। সে সম্মত হইল।

(৫)

নীলমণির বিবাহের দিন, জ্যোৎস্না কল্পনাকে আপন মনের মত করিয়া সাজাইল। ললাটে চন্দন দিয়া নীলমণির নাম লিখিল। রক্ত ওষ্ঠে ব্রুম দিল, কাল কেশের উপর আপন প্রিয় টায়রাটি বসাইয়া দিল, তাহার সুঠাম বাহুতে আপনার চুণী খচিত চুড়ী পরাইল, তাহার বেনারসী জ্যাকেট মণ্ডিত বক্ষে আসল মুক্তার নেক্‌লেস দুলাইয়া দিল।

কল্পনা বলিল, "ও কি মাসিমা! তোমার ভাল ভাল অতগুলো গহনা আমায় কেন দিচ্ছ? এ হার যে তোমার বড় সাধের, এ আমি নেব না।"

জ্যোৎস্না ধমক দিয়া বলিল, "চুপ কর! বিয়ের অত কথা বলে না।"

বাসি বিবাহের পরে বরকন্যা বিদায়ের সময়, যখন সকলে আশীর্ব্বাদ করিতেছিল, জোৎস্না হাসি হাসি মুখে আসিয়া সম্মুখস্থ রজতপাত্র হইতে ধান্যদূর্ব্বা লইয়া বরের মাথায় দিয়া, হাতে একটী মোহর দিল।

নীলমণি একবার জ্যোৎস্নার মুখ প্রতি চাহিল।"

জ্যোৎস্না বলিল, "প্রণাম কর। কল্পনাকে আমিই মানুষ করেছি, সে আমাকে মা বলে। আমি আজ তোমারও মা।"

নিকটস্থ বৃদ্ধারা বলিল, "প্রণাম কর বাবা, শাশুরীকে প্রণাম কর।"

নীলমণি জ্যোৎস্নার চরণস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল।

জ্যোৎস্না তাহার পর ধান্যদূর্ব্বা লইয়া কল্পনার মস্তকের উপর রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিল, এবং তাহার হাতে, বহুকাল পূর্ব্বের নীলমণির উপহার সেই স্বর্ণখচিত হস্তিদন্ত নির্ম্মিত ক্ষুদ্র কৌটাটী সেই রেশমী রুমাল খানি সমেত দিল। বধূবেশী কল্পনাও জ্যোৎস্নার চরণে প্রণাম করিল।

শ্রীহেমনলিনী বসু।

নচিকেতা

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় বল্লী।

নচিকেতাকে ভোগ্যবস্তু বিচলিত করে না দেখিয়া যম তাঁহাকে শ্রেয় ও প্রেয় তত্ত্ব শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করিলেন। কারণ, সে শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে নচিকেতা যে কোন অবস্থায় আপন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হইবেন। মনুষ্য হৃদয়ে দুইটী মতি সদা বর্ত্তমান আছে; উহারাই মানবকে বিভিন্ন কর্ম্মে নিয়োগ করে। যম ইহাদের সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন।

"একটী শ্রেয়, অপর প্রেয়; এই দুইটী নানা দিকে পুরুষকে বন্ধন করে। তাহাদের মধ্যে শ্রেয়-গ্রহণকারীর মঙ্গল হয়; যে প্রেয় বরণ করে সে অর্থ হইতে বিযুক্ত হয়।

"শ্রেয় ও প্রেয় মনুষ্যকে প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে। যিনি ধীর তিনি তাহাদিগকে সম্যক্ জানিয়া পৃথক করেন, এবং প্রেয়কে ত্যাগ করিয়া শ্রেয়কে অভিমুখে বরণ করেন। যিনি নিকৃষ্ট তিনি অপ্রাপ্ত বস্তু প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তু রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রেয়কে বরণ করেন।"

শ্রেয় ও প্রেয় এই দুই শব্দ দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে, যে পথে গমন করিলে কল্যাণ সাধিত হয় তাহাই শ্রেয়, এবং যে পথে গমন করিলে ভোগ্যবস্তু লাভ ও রক্ষা করা যায় তাহাই প্রেয়। কোন্‌টী ভোগ বাসনা এবং কোন্‌টী কল্যাণ কামনা তাহা বিচার দ্বারা নির্ণয় করিতে হয়। যে মনুষ্য এই বিচারে নিপুণ হইয়াছেন তিনিই ধীর। যম নচিকেতাকে শ্রেয় লাভার্থী বলিয়া কিরূপে জানিলেন তাহাই এক্ষণে প্রকাশ করিতেছেন :—

"হে নচিকেত! মনোরম বস্তু সকল ও সুন্দর রূপবিশিষ্ট ভোগ-সাধন সকল বিচার করিয়া আপনি দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন। প্রেয় বিত্তলাভের তরণি; ইহাতে উঠিয়াই বহু মনুষ্য নিমজ্জিত হয়। (১) ইহা আপনি গ্রহণ করেন নাই।

"শ্রেয় ও প্রেয় সম্পূর্ণ বিপরীতমুখীন্—পরস্পর বিরোধী; ইহারাই বিদ্যা ও অবিদ্যা বলিয়া পরিচিত। নচিকেতাকে বিদ্যা লাভার্থী মনে করি; কারণ আপনাকে বহু কাম্য বস্তু প্রলোভিত করে না। যাহারা অবিদ্যাপথে অবস্থিত, তাহারা আপনাদিগকে জ্ঞানী ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে। অন্ধগণ অন্ধদ্বারা নীত হইলে যেরূপ বক্রপথে গমন করে, সেইরূপ অজ্ঞানীগণ কুটিল পথে গমন করে।

"বালক, মত্ত ও বিত্তমোহে আচ্ছন্ন লোকদিগের নিকট পরলোকের অস্তিত্ব প্রকাশিত হয় না। 'পরলোক নাই' এই বুদ্ধিবিশিষ্টগণ পুনঃ পুনঃ আমার অধীনতা প্রাপ্ত হয়।"

যমের কথা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, সেকালে এক সম্প্রদায় ছিল, যাহারা যমলোক হইতে শ্রেষ্ঠ লোকের অস্তিত্ব স্বীকার করিত না। উহারাই বিত্ত মোহে মূঢ় পদবাচ্য। কারণ তাহারা যমলোক (অর্থাৎ দেবলোক) (২) প্রাপ্তি কামনায় যজ্ঞাদি করিত। যম আপন লোক হইতেও শ্রেষ্ঠ যে পরলোক (অর্থাৎ স্বর্গ-

(১) মূলে সৃঙ্কা শব্দ আছে। ১ম বল্লীর ১৬শ শ্লোকেও সৃঙ্কা শব্দ আছে। শঙ্করভাষ্যে সেখানে এই শব্দের অর্থ 'শব্দবতী মালা' প্রাপ্ত হই। এখানে কিন্তু 'ধনপ্রায়া' অর্থ আছে। ইহার অর্থ 'তরণি' করিলে মূলের ভাব সুস্পষ্ট হয়। কারণ লোকে বহু বিত্ত লাভের জন্য তরণি আশ্রয় করিয়া জলপথে গমন করে। প্রেয়কে সেইরূপ নৌকার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ১ম বল্লীর ১৬শ শ্লোকে আদি অগ্নিকেও নৌকার সহিত তুলনা করা হইয়াছে অনুমান করি। এই দুই নৌকার মধ্যে প্রভেদ এই যে একটী ডুবিয়া যায়, অপরটী শ্রেষ্ঠলোকে লইয়া যাইতে সক্ষম হয় ও তাহাতেই অর্থ লাভ হয়।

(২) বৈদিক যুগে যমলোককেই দেব বা পিতৃলোক বলা হইত।

লোক) তাহাতে কিরূপে গমন করা যায় তাহার উপায় নচিকেতাকে দেখাইতেছেন। যমের মতে, পরলোক যাইতে হইলে প্রথম 'পরলোক আছে' এই বিশ্বাস মনে উৎপন্ন হওয়া আবশ্যক। তৎপরে গুরুর নিকট ইহার উপদেশ লাভ করিতে হয়। এই পথের কিরূপ গুরু ও কিরূপ শিষ্য আবশ্যক এক্ষণে যম তাহাই প্রকাশ করিতেছেন।

যম বলিলেন, "শ্রবণ করিয়াও যাহা বহু লোকের দ্বারা লভ্য হয় না, শ্রবণ করিবার সময়েও যাহাকে বহু লোক বুঝিতে পারে না, অতএব ইহার বক্তা অসাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন; ইহাকে যিনি লাভ করেন তিনি নিপুণ। ইহাকে যিনি জানিয়াছেন, তিনিই অসাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন এবং তিনি যাহাকে উপদেশ দান করেন, সেই নিপুণ হয়।

"এই বিষয় নিকৃষ্ট ব্যক্তি দ্বারা ব্যক্ত হইবার নহে। কারণ বহু প্রকারে চিন্তিত হইলে তবে ইহা বুঝিতে পারা যায়। অতএব অসাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা ব্যক্ত না হইলে তাহাতে গমন করা যায় না। অণুপদার্থের অস্তিত্ব তর্ক দ্বারা প্রমাণ করা যায়। কিন্তু অণীয়ান্ তর্কের অতীত।

"হে প্রিয়তম! এই মতি তর্কের দ্বারা পাওয়া যায় না; শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি দ্বারা উক্ত হইলে সুজ্ঞানের কারণ হয়। যে মতি আপনি পাইয়াছেন তাহাতে সত্যধারক হউন। হে নচিকেত! আপনার তুল্য অপর জিজ্ঞাসু শিষ্য যেন আমরা প্রাপ্ত হই।"

বর্ত্তমান কালের পাশ্চাত্য শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণও বুঝিতে পারিয়াছেন, এক unknown ও unknowable আছেন। এই দুই শব্দ দ্বারা কিন্তু তাঁহাকে প্রকাশ করা যায় না। কারণ, যদি বুঝা গেল 'আছেন', তবে কিরূপে তিনি unknown বা unknowable হন? এই উপনিষদের মধ্যেই দেখিব, 'আছেন' কেবল এই বাক্যদ্বারা তাঁহাকে প্রকাশ করা যাইতে পারে বলা হইয়াছে।

পরলোকতত্ত্ব লাভ করিতে হইলে, কিরূপ গুরুর নিকট কিরূপ শিষ্য গমন করিবেন তাহা বুঝাইয়া, যম স্বয়ং কিরূপে উক্ত প্রকার গুরু পদের যোগ্য হইয়াছেন তাহাই প্রকাশ করিতেছেন।

"আমি কর্ম্মফলরূপ নিধিকে অনিত্য জ্ঞান করি; অনিত্য সকলের লাভের জন্য ধ্রুবকে লাভ করা যায় না। এইজন্য আমি অনিত্য সকলের দ্বারা (অর্থাৎ তাহাদিগের আহুতি প্রদান দ্বারা) নাচিকেত অগ্নির আরাধনা করিয়াছিলাম। তাহার ফলে আমি নিত্যকে প্রাপ্ত হইয়াছি।" (১)

যম যাহা দ্বারা নিজে সিদ্ধ হইয়াছেন,সেই ধ্রুবলাভের উপায় যাহা বলিলেন, এবং জানাইলেন নিজের সত্তারও তাহাতে লোপ হয় নাই। অতএব তিনি নচিকেতার গুরুপদে অভিষিক্ত হইবার উপযুক্ত। নাচিকেত অগ্নিতে সকল কামনা আহুতি দিলে তবে ধ্রুবকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। নচিকেতার মনে 'পরলোকে বিশ্বাস' ছিল বলিয়া তিনি নাচিকেত অগ্নির উপাসনা তাঁহাকে প্রদান করিয়াছেন। এই অগ্নির বাহ্য উপাসনা করিতে করিতে শিষ্যের অন্তর শুদ্ধ হয়। তখন তিনি সমস্ত কামনা মনে মনে ঐ শ্রেষ্ঠ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন। ইহার পর শিষ্য পরলোকের জ্ঞান ধারণা করিতে সক্ষম হন।

নচিকেতা একবার মাত্র শ্রেষ্ঠ অগ্নির উপাসনা শুনিয়া ও পুনর্ব্বার যথাযথ বলিয়াই শুদ্ধান্তরাত্মা হইয়াছেন। সেই জন্য যম যে সকল কাম্যবস্তু দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহাদের প্রলোভন তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। ইহাই শ্রেষ্ঠ অগ্নিতে সকল কামনার আহুতি প্রদান। যমও ঠিক এই উপায় অবলম্বন করিয়া ধ্রুবকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। নচিকেতাও যে এই পথে অগ্রসর হইতেছেন, তাহাই যম পরে প্রকাশ করিলেন।

(১) এই শ্লোকের শঙ্কর সম্মত অর্থ :—"সেই হেতু আমার দ্বারা নাচিকেত অগ্নিতে যজ্ঞ সাধিত হইয়া, অনিত্যদ্রব্য সকলের সহিত আপেক্ষিক নিত্য পদঅর্জ্জিত হইয়াছে।" মূলে কিন্তু আপেক্ষিক শব্দ নাই। 'আপেক্ষিক' নিত্য প্রাপ্ত হইয়া যম কিরূপে পরম-নিত্য প্রাপ্তির গুরু হইতে পারেন?

"হে নচিকেত! কামনার পরিসমাপ্তিকে, জগতের আশ্রয়কে, যজ্ঞের (বা কর্ম্মের) অনন্ত্যকে, অভয়ের পরাকাষ্ঠাকে, মহৎ স্তোমের (অর্থাৎ স্তবের) বহুলোক-গীত আশ্রয়কে, দেখিয়া ও ধারণ করিয়া ধীর-আপনি অপর সকলকে (অগ্নিতে) নিক্ষেপ করিয়াছেন।"

যাঁহাকে পাইলে কামনার পরিসমাপ্তি হয়, যিনি জগতের আশ্রয়, যে অনন্তে কর্ম্ম সকল প্রবেশ করে, যিনি শ্রেষ্ঠ অভয়পদ,মহৎ স্তব সকল যাঁহাতে আশ্রয় পায়, এবং যে আশ্রয় বহুলোকে গানের দ্বারা প্রকাশ করে—তাঁহাকে নচিকেতা দেখিয়াছেন ও ধারণ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি কামনা সকল, জগৎ, কর্ম্ম, অপর অভয়পদ, মহৎ স্তোম, বহুলোকের গানের জন্য আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়াছেন।

এক্ষণে যম বলিতেছেন যে কামনা ত্যাগ করিলে অধ্যাত্ম যোগে অধিকার হয়। এই যোগের সাহায্যে ধ্রুবের সন্ধান পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি ধ্রুবকে জানিতে পারিয়াছেন তাঁহাতে কি পরিবর্ত্তন আসে তাহাই প্রকাশ করিতেছেন।

"সেই দুঃখে দর্শনীয়, গোপনীয় বিষয়ে প্রবিষ্ট, গুহাস্থিত, গহ্বরে স্থিত, পুরাতনদেবকে অধ্যাত্মযোগ অধিগম দ্বারা জানিয়া ধীর ব্যক্তি হর্ষ ও শোক ত্যাগ করেন।

"যে মর্ত্ত্য ইহা শ্রবণ করিয়া এই বিশ্বধারণকারী অণুকে পৃথক্ করতঃ সম্যক্‌ভাবে জানিয়া প্রাপ্ত হন, তিনি আনন্দময়কে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হন। নচি-কেতার নিকট পরলোক উন্মুক্ত বলিয়া মনে করি।"

যম এক্ষণে নিজে অধ্যাত্মযোগ যুক্ত হইয়া দেখিতে-ছেন যে নচিকেতার নিকট আনন্দময়ের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। নচিকেতাও প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিবার নিমিত্ত যোগাধিষ্ঠিত গুরুকে বলিতেছেন:—

"ধর্ম্ম হইতে অন্যস্থানে, পাপকার্য্য হইতে অন্যস্থানে, উৎপন্ন হইয়াছে যাহা তাহা হইতে এবং হইবে যাহা তাহা হইতে অন্য স্থানে যাহা দেখিতেছেন তাহা বলুন।"

যম বলিলেন—"বেদ সকল যে পদ কীর্ত্তন করেন, এবং তপস্যা সকল যাঁহার কথা বলেন, যাঁহাকে পাইতে ইচ্ছুকগণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, সেই পদকে তোমায় সংক্ষেপে বলিতেছি—ইহা ওম্। (১)

"ইহাই অক্ষর ব্রহ্ম,ইহাই পরম অক্ষর। এই অক্ষরকে জানিয়াই যিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাঁহার তাহাই হয়।

"এই শ্রেষ্ঠ আশ্রয়, এই পরম আশ্রয়। এই আশ্রয়কে জানিয়া ব্রহ্মলোকে মহান্ হয়।"

---

(১) ওম্ শব্দের অর্থ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ও ছান্দোগ্যোপ-নিষদে আমরা যেরূপ প্রাপ্ত হই তাহা নিম্নে উদ্ধার করিতেছি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এইরূপ প্রাপ্ত হই।

"প্রজাপতি কামনা করিলেন আমি বহু হইয়া প্রজা (অর্থাৎ সন্তান) উৎপাদন করিব। তিনি তপস্যা করিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক সৃষ্টি করিলেন। সেই লোকদিগের অভিমুখে তাপ দিলেন। উত্তপ্ত তিনলোক হইতে তিন জ্যোতি জন্মিল। পৃথিবী হইতে অগ্নি, অন্তরিক্ষ হইতে বায়ু, দ্যুলোক হইতে আদিত্য জন্মিল। সেই জ্যোতি-দিগকে উত্তপ্ত করায় তিন বেদ জন্মিল। অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ ও আদিত্য হইতে সামবেদ জন্মিল। সেই বেদ সকল উত্তপ্ত করিয়া তিনটী শুক্র উৎপন্ন হইল। ঋগ্বেদ হইতে ভু, যজুর্ব্বেদ হইতে ভুব, সামবেদ হইতে স্ব জন্মিল। তিনি সেই শুক্রকে তাপ দিলেন। সেই উত্তপ্ত শুক্র হইতে তিন বর্ণ জন্মিল। অকার, উকার ও মকার এই তিন বর্ণ। তিনি তাহাদিগকে একত্র আহরণ করিলেন। তাহা হইতে ওম্ হইল। এই জন্য ওম্ বলিয়াই প্রণব করে। ঐ স্বর্গলোক ওম্—ঐ যিনি তাপ দেন।" ঐঃ ব্রাঃ, ২৫।৭।৩২

ছান্দোগ্যোপনিষদে এইরূপ দেখিতে পাই:—

দেবগণ মৃত্যু হইতে ভয় পাইয়া ত্রয়ী বিদ্যাতে প্রবেশ করিলেন; তাঁহারা ছন্দ সকলের দ্বারা (আপনাদিগকে) আচ্ছাদিত করিলেন। যখন এই সকলের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়াছিলেন, তাহাতেই ছন্দদিগের ছন্দত্ব। ২।

"মৃত্যু তাঁহাদিগকে ঋক্, সাম ও যজুতে দেখিয়াছিলেন, যেমন মৎস্যকে উদকে দেখা যায়। তাঁহারা জানিতে পারিয়া ঊর্দ্ধে ঋক্, সাম ও যজুর স্বর মধ্যে প্রবেশ করেন। ৩।

"যখন ঋক্‌কে প্রাপ্ত হইলেন ওম্ এই শ্রেষ্ঠ স্বর হইল; সেইরূপ সাম, সেইরূপ যজু; ইহা উ স্বর; যাহা এই অক্ষর, ইহাই অমৃত, অভয়; তাহাতে প্রবেশ করিয়া দেবগণ অমৃত ও অভয় হইয়াছেন। ৪।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের উপদেশানুসারে ওম্ শব্দ উচ্চারণ করিয়া নিম্নলিখিতরূপ অর্থ চিন্তা করিতে হয়। প্রজাপতি হইতেই সকল উৎপন্ন হইয়াছে। প্রথম তিনলোক উৎপন্ন হয় যথা, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দিব্যলোক। পরে তিনি উহাদের মধ্যে তিনটী শ্রেষ্ঠরূপ ধারণ করিয়া বর্ত্তমান আছেন যথা, দিব্যলোকে আদিত্য, অন্তরীক্ষে বায়ু ও পৃথিবীতে অগ্নি। ইহাদের হইতেও যে সূক্ষ্মরূপ ধারণ করিয়াছেন তাহা বাক্য। বাক্যদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঋক্, যজু ও সামে তিনি বর্ত্তমান। ইহাদের মধ্যে তিন শ্রেষ্ঠ জ্ঞান রূপে তিনি আছেন যথা ভূ, ভুব ও স্ব। ইহাদেরও শ্রেষ্ঠ বা অক্ষর অংশ অ, উ ও ওম্। এই তিনের মিলনে ওম্ উৎপন্ন। স্বর্গ লোকই ওম্। এই শব্দের উচ্চারণে উপরি লিখিত জ্ঞান সমষ্টি মনে প্রতিভাত হয়। সেকালের সমগ্র শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের সমষ্টি ইহাতে নিহিত আছে। নিম্নে ধারা ক্রমে দেখান গেল।

প্রজাপতি

পৃথিবী	অন্তরিক্ষ	দ্যুলোক
অগ্নি	বায়ু	আদিত্য
ঋক্‌বেদ	যজুর্বেদ	সামবেদ
ভূ	ভুব	স্ব
অ	উ	ম

ওম্
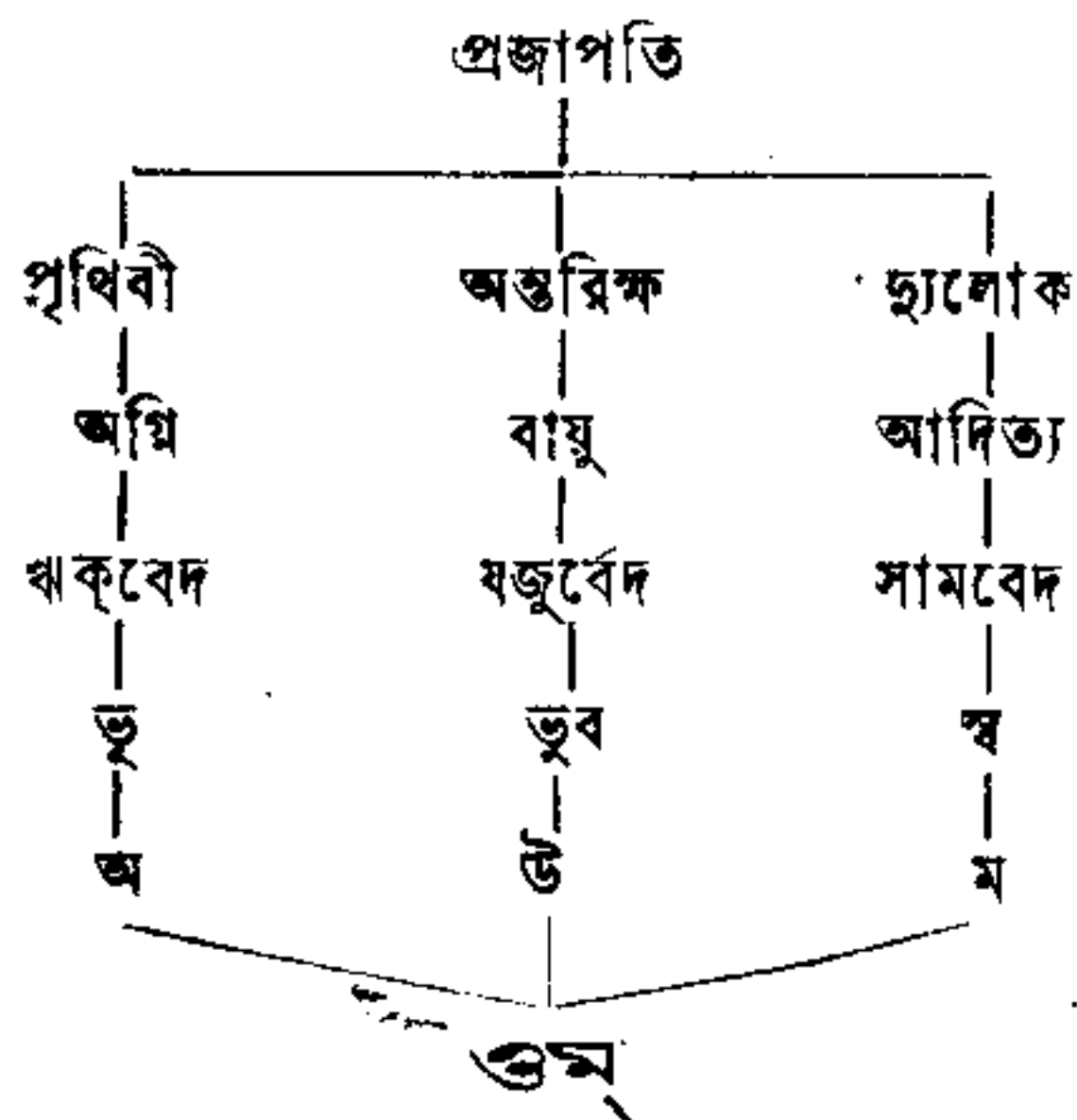
ছান্দোগ্যোপনিষদ হইতে বুঝা যায় যে বিশ্ব ভূতজাতে অক্ষর বর্ত্তমান। প্রথম পৃথিবী তাহাদের মধ্যে রস রূপে অবস্থিত। পৃথিবী মধ্যে জল রস রূপে রহিয়াছে। জল মধ্যে ওষধিগণ রস রূপে অবস্থান করে। ওষধিদিগের মধ্যে মনুষ্য রস রূপে বর্ত্তমান। মনুষ্যের মধ্যে বাক্য রস স্বরূপ। বাক্যদিগের রস ঋক্ বা ছন্দোময় বাক্য। দেবগণ মৃত্যু ভয়ে ভীত হইয়া ত্রয়ীবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন। অর্থাৎ তাঁহারা অমৃতের সন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা প্রথম বাক্যের ছন্দকে অমৃত স্বরূপ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, তখন ছন্দাতীত স্বরকে অমৃত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। সেই জন্য সামবেদ বেদসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সামবেদের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ রস তাহাই উদ্গীথ বা ওম্। এই অক্ষর-ব্রহ্ম রসরূপে বিশ্বভূতে অবস্থান করিতেছেন। এই রসের প্রকার ভেদ ঋষিগণ যেরূপ চিন্তা করিয়া উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার ধারা নিম্নে দেখান যাইতেছে।

ওম্—সাম—ঋক্—বাক্য—পুরুষ—ওষধি—জল—পৃথিবী।

যম এই অক্ষররূপী অমৃতের বিষয় বিশেষ ভাবে বর্ণনা করিতেছেন।

"বিপশ্চিন্ [অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী] জন্মান না বা মরেন না ; ইনি কোথাও হইতে হন নাই বা কেহ হন নাই। ইনি জন্ম রহিত, নিত্য, ক্ষয় রহিত, পুরাতন ; শরীর হন্যমান হইলেও ইনি হত হন না।

"যদি হন্তা (আপনাকে) হননকারী বলিয়া মনে করে, যদি হত আপনাকে হত বলিয়া মনে করে, তবে উভয়েই জানে না যে ইনি হনন করেন না, বা হত হন না।

"অণু হইতেও অণু, মহৎ হইতেও মহৎ আত্মা গমনশীল প্রাণীর গুপ্ত স্থানে নিহিত আছেন ; আত্মনের মহিমাকে বীতশোক ও কর্ম্মত্যাগী ধাতুপ্রসাদ হেতু দেখিতে পান।

"তিনি আসীন হইয়াও দূরে গমন করেন, শয়ান

"যিনি ইহা এরূপ জানিয়া অক্ষরকে স্তব করেন, তিনি এই অমৃত অভয় অক্ষর স্বরে প্রবেশ করেন ; তাহাতে প্রবেশ করিয়া দেবগণ যেরূপ অমৃত হইয়াছেন, সেইরূপ অমৃত হন।" ৫।

ছাঃ উঃ, ১ম অধ্যায়। ৪র্থ খণ্ড।

*এই ভূত সকলের রস পৃথিবী, পৃথিবীর রস জল ; জল সকলের রস ওষধি সকল ; ওষধিদিগের রস পুরুষ ; পুরুষের রস বাক্য ; বাক্যের রস ঋক্ ; ঋকের রস সাম ; সামের রস উদ্গীথ। এই সেই রস সকলের রসতম, পরম, পরার্ধ্য অষ্টম —যাহা উদ্গীথ। ছাঃ উঃ, ১।১।২, ৩।

হইয়াও সর্ব্বস্থলে গমন করেন। সেই মত্ত ও অমত্ত দেবকে আমা হইতে অন্যে কে জানিতে পারে?

"অনিত্য শরীর সকলে অশরীরী, মহান্, বিভু ও আত্মাকে অবস্থিত জানিয়া, ধীর শোক করেন না।"

যম অধ্যাত্মযোগাধিষ্ঠিত হইয়া দেখিতেছেন, আত্মন্ পূর্ণজ্ঞানী এবং জন্ম মৃত্যুর অতীত। বিশ্ব সংসারে যে জীবন সংগ্রাম চলিতেছে, তাহা আত্মন্‌কে স্পর্শ করে না। তিনি প্রাণীদিগের গুপ্তস্থানে অবস্থিত, এইরূপ বর্ণনা হইতে পাছে নচিকেতা আত্মন্‌কে দেশে আবদ্ধ মনে করেন, সেই জন্য তাঁহাকে অণু হইতেও অণু এবং মহৎ হইতেও মহৎ এইরূপ বিরুদ্ধ গুণাবলম্বী করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যম আরও বলিতেছেন যে, তিনি আসীন আছেন বলিলে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে তিনি দেশে ও কালে আবদ্ধ; কারণ তিনি এরূপ যে আসীন হইয়াও দূরে গমন করেন; শয়ান হইয়াও সর্ব্বস্থলে গমন করেন। তিনি এক সময়ে এক স্থানে থাকেন, অন্য সময়ে সেখানে থাকেন না, এরূপ ভাব তাঁহাতে প্রয়োগ করা যায় না। অতএব মনে রাখিতে হইবে যে তাঁহাকে যখন কোন স্থানে বা দেহে আছেন বলি, তাহাতে আমি তাঁহাকে দেশে ও কালে আবদ্ধ মনে করি না। আত্মন্ অশরীরী, অর্থাৎ তাঁহাকে কোন দেশ শরীর দিতে পারে না। কিন্তু তিনি সকল শরীরে অবস্থিত। শরীর আত্মন্ নহে বলিয়া চিরকাল থাকিবে না, নষ্ট হইবেই। আত্মন্ নিত্য, অক্ষর ও অমৃত। ইহা জানিয়া ধীর অনিত্যের জন্য শোক করেন না। আত্মন্‌কে কেবল জ্ঞানী বলিলেও ঠিক হয় না। সেই জন্য তাঁহাকে অমত্ত বলিয়াও মত্ত বলা হইয়াছে।

যম যখন বলিতেছেন যে "আমা হইতে অন্যে কে তাঁহাকে জানিতে পারে?"—ইহাতে যমের অহঙ্কার প্রকাশ পায় না। যম যখন এই বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন তখন তিনি অধ্যাত্মযোগযুক্ত হইয়াছেন। অর্থাৎ আত্মন্ তাঁহাতে আবির্ভূত হইয়া নচিকেতাকে উপদেশ দিতেছেন। কিরূপ লোক আত্মন্ লাভের অধিকারী এক্ষণে যম তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছেন।

"এই আত্মা সুন্দর বাক্য দ্বারা লভ্য নহেন; মেধা দ্বারা লভ্য হন না; বহু শ্রুতি [অর্থাৎ বেদ শ্রবণ] দ্বারাও লভ্য হন না; ইনি যাঁহাকে বরণ করেন তাঁহার দ্বারাই লভ্য হন। আত্মা তাঁহারই নিকট আপন তনু প্রকাশ করেন।

"মন্দকার্য্য হইতে যিনি বিরত নহেন, তিনি ইঁহাকে প্রাপ্ত হন না; অশান্ত, অসমাহিত বা অশান্ত-মানস তাঁহাকে প্রাপ্ত হন না। প্রজ্ঞানের দ্বারা ইঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

আত্মন্ লাভের জন্য কেহ আকাঙ্ক্ষা করিলে তিনি আপনাকে কিরূপে উপযুক্ত করিতে পারেন তাহাই দেখান হইল। কিন্তু উপযুক্ত হইলেই যে আত্মন্ লাভ হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। যাহারা মন্দ কার্য্য করে, যাহাদের ভোগতৃষ্ণা শান্ত হয় নাই, যাহাদের মন একাগ্র হইতে সক্ষম হয় না, যাহাদের মন সদাই অশান্ত, তাহারা আত্মতত্ত্ব লাভের উপযুক্ত পাত্র নহে। যদি কেহ সুন্দর সুন্দর স্তোত্র পাঠ করেন, বহুশাস্ত্র শ্রবণ করেন, কিম্বা যিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিযুক্ত, ইঁহারা উল্লিখিত গুণে আত্মন্ লাভের অধিকারী নহেন।

মন্দকার্য্য হইতে বিরত, শান্ত, সমাহিত, শান্ত মানস হইয়া যিনি প্রকৃষ্ট জ্ঞানী হইবেন, তাঁহাকে আত্মন্ কৃপা করিতে পারেন। কৃপা করিলে আত্মন্ নিজতনু তাঁহার নিকট প্রকাশ করেন। এস্থলে তনু শব্দ ব্যবহার করায় ঋষি এই কথাই বলিতেছেন যে, মানব দেশ ও কালে আবদ্ধজীব; আত্মন্ যখন তাহার নিকট প্রকাশিত হন, সে তাঁহাকে সসীম করিয়াই প্রাপ্ত হয়। তবে সে বুঝিতে পারে যে এই সসীম প্রকাশ সেই মহানের অসীমের, অনন্তের, অক্ষয়ের, অমৃতের—যাঁহাকে ক্ষুদ্র মানব ধরিতে পারে না। নচিকেতাকে আত্মন্ কৃপা করিয়া স্বয়ং বরণ করিলেন। তিনি না ধরা দিলে তাঁহাকে ধরে কাহার সাধ্য? সেইজন্য যম বলিতেছেন,

"ব্রহ্ম ও ক্ষত্র যাঁহার অন্ন হইয়াছে মৃত্যু যাঁহার ব্যঞ্জন, তিনি যথায় তাহা কে জানিবে?"

নচিকেতার নিকট যখনই আনন্দময়ের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, যমের আত্মায় তখনই আনন্দময় আবির্ভূত হইলেন। আনন্দের ধারা গুরু ও শিষ্যের উপর বর্ষিত হইলে দুইজনেই স্বর্গলোকের অনির্ব্বচনীয় অমৃতাস্বাদ প্রাপ্ত হইলেন। এই জন্যই যম বলিয়াছেন "হে নচিকেত! আপনার মত অপর জিজ্ঞাসু শিষ্য যেন আমরা প্রাপ্ত হই।"

ক্রমশঃ

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

বৈদেশিকী

ফরাসীর ভবিষ্যৎ।

"Fortnightly Review" পত্রে প্রকাশিত "The Future of France and of Civilisation" শীর্ষক প্রবন্ধে Politicus ছদ্মনামধারী লেখক ফরাসী জাতি ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে বলিয়া ভীতি প্রকাশ করিয়াছেন। ১৮৭১ সাল হইতে ফ্রান্সে ষষ্ঠীদেবীর কৃপা যেমন ক্রমশঃ কমিতেছে, জার্মানিতে উহা তেমনই বাড়িতেছে। ইহার ফলে জার্মানেরা ফরাসীদিগের টুঁটি টিপিতে সমর্থ হইয়াছে। নিম্নে এই দুই দেশের অধিবাসিসংখ্যা উদ্ধৃত হইল:—

সাল	জার্মানি	ফ্রান্স
১৮৭১	৪০,৯৯৭,০০০	৩৬,১৯০,০০০
১৮৮১	৪৫,৪২১,০০০	৩৭,৫৯০,০০০
১৮৯১	৪৯,৭৬২,০০০	৩৮,৩৫০,০০০
১৯০১	৫৬,৮৭৪,০০০	৩৮,৯৮০,০০০
১৯১১	৬৫,৩৫৯,০০০	৩৯,৬০২,০০০

চল্লিশ বৎসরে জার্মানির লোকসংখ্যা কেন ফ্রান্সের দেড়গুণের অধিক হইল, এ সম্বন্ধে, নানা লোকে নানা মত প্রচার করিয়াছেন। কতকগুলি পণ্ডিতের মতে বিলাস, নাস্তিকতা, সুরাপানের প্রাদুর্ভাব, উদ্বাহ-বন্ধন-ছেদের আধিক্য প্রভৃতি কারণে ফরাসীর জনন-শক্তি লোপ পাইতেছে। লেখকের মতে দারিদ্র্যই ইহার মূলীভূত কারণ। ("The decline of the French birth-rate is due not to the prosperity of the people, which is largely a fiction, but incredible as it may seem, to their poverty.")।

"Wealth of Nations" প্রণেতা Adam Smith বলিয়াছেন যে হাটে যেমন টানের মুখে জিনিসের জোগান হয়, সমাজেও তেমনি প্রয়োজনের হিড়িকে অপত্য-সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হয়। ("The demand for men, like that for any other commodity, necessarily regulates the production of men; quickens it when it goes on too slowly, and stops it when it advances to fast.")। এই মন্তব্যের উপরে লেখক টিপ্পনি করিয়াছেন যে, কমলার সহিত ভারতীয় যেমন সপত্নী-সম্বন্ধ, ষষ্ঠীদেবীর সহিত সেরূপ নহে। ("National fertility depends principally on the natural resources of countries and their exploitation by man.") ম্যাঞ্চেষ্টার, গ্লাসগো, শেফিল্‌ড, পিট্‌সবর্গ, এসেন প্রভৃতি নগরে শত শত কারখানায় সহস্র সহস্র কারিকর ও মজুরের প্রয়োজন হয় বলিয়াই, ঐ সকল স্থলে লোকসংখ্যা অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়াছে। উক্ত কারণে যুনাইটেড ষ্টেটসের লোকসংখ্যা, একশত কুড়ি বৎসরের মধ্যে, ৩,৯২৯,২১৪ হইতে ৯১,৯৭২,২৬৬ তে পরিণত হইয়াছে। ("Rapidly increasing labour-

employing industries require a correspondingly rapid increase of workers.")।

কানাডা, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশে এখনও লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি পড়িয়া আছে। কেবলমাত্র লাঙ্গলের আঁচড় দিলেই তথাকার অধিকাংশ অধিবাসীর সর্ব্ববিধ অভাব মোচন হয়। বর্ত্তমান্ যুগে য়ুরোপে পতিত জমি নাই বলিলেই হয়, এবং আমেরিকার তুলনায় য়ুরোপের প্রতি বিঘায় লোকসংখ্যা এত অধিক যে, শুদ্ধ কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর করিলে, য়ুরোপ এতদিন দুর্ভিক্ষের কবলে লোপ পাইত। য়ুরোপের লক্ষ্মীশ্রীর প্রধান কারণ উহার কল-কারখানা। এসিয়া ও আফ্রিকার কাঁচা মাল ঐ সকল কারখানায় সোণার মোহরে পরিণত হয়—এসিয়া ও আফ্রিকার কালা আদ্‌মিরা ঐ জন্য পাট তুলা ইত্যাদি উৎপন্ন করিয়া তামার ও সামান্য রূপার মুখ দেখিতে পায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকারখানার প্রভাবে ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের লোকসংখ্যা কি অদ্ভুত পরিমাণে বাড়িয়াছে, নিম্নোদ্ধৃত তালিকায় তাহা প্রমাণিত হইবে।

বৎসর	জনসংখ্যা
১৭০০	৬,০৪৫,০০৮
১৮০১	৮,৮৭২,৯৮০
১৮৩১	১৩,৮৯৪,৫৭৪
১৮৬১	২০,০৬০,৯২৫
১৯০১	৩২,৫২৭,৮৪৩
১৯১১	৩৬,০৭০,৪৯২

তেত্রিশ বৎসরের মধ্যে জার্ম্মানির ফসল ও তরিতরকারির পরিমাণ বিস্ময়কররূপ বাড়িয়াছে, যথা :—

সাল	রাই	গম	যই	আলু	চিনি	টন
১৮৮০	৪,৯৫২,৫২৫	২,৩৪৫,২৭৮	৪,২২৮,১২৮	১৯,৪৬৬,২৪২	৪১৫,০০০	„
১৯১৩	১২,২২২,৩৯৪	৪,৬৫৫,৯৫৬	৯,৭১৩,৯৬৫	৫৪,১২১,১৪৬	২,৬৩২,২৮২	„

(১ টন = প্রায় ২৮ মণ)।

জার্ম্মান জাতি বৈজ্ঞানিক উপায়ে আলু, যই, গমের পরিমাণ বাড়াইয়াই ক্ষান্ত হয় তাই; মুর্গি, ভেড়া, ছাগলাদির মাংসের পরিমাণও প্রায় দ্বিগুণ করিয়া তুলিয়াছে। লেখকের মতে কলকারখানার প্রভাবেই ইংলণ্ড ও জার্ম্মানির "ধনেপুতে লক্ষ্মীলাভ" হইয়াছে। ("The gigantic growth of their manufacturing industries has enabled England and Germany to nourish vastly increased numbers and has brought about the remarkable increase in population.")।

জার্ম্মানির সাতচল্লিশটী নগরে লক্ষাধিক লোকের বাস; ফ্রান্সে ঐরূপ নগরের সংখ্যা পনেরটী। এসিয়া ও য়ুরোপের প্রায় সকল দেশেই নগর অপেক্ষা গ্রামে অধিক সংখ্যক লোক বাস করে, কিন্তু জার্ম্মানিতে ইহার উল্টা। ১৯১০ সালের সরকারি বিবরণী হইতে নিম্নলিখিত তথ্য উদ্ধৃত হইল :—

	মোট অধিবাসী
লক্ষাধিক জনসমন্বিত নগরে	—১৩,৮২৩,৩৪৮
২০,০০০ হইতে এক লক্ষ „ „	— ৮,৬৭৭,৯৫৫
৫,০০০ হইতে ২০,০০০ „ „	— ৯,১৭২,৩৩৭
২,০০০ হইতে ৫,০০০ „ „	— ৭,২৯৭,৭৭০
সর্ব্বশুদ্ধ	৩৮,৯৭[illegible],৪০৬

যে সকল গ্রামের জনসংখ্যা দুই সহস্রের কম তাহার লোকসংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ২৫,৯৫৪,৫৮৭

জার্ম্মানির Ruhr প্রদেশের আয়তন ৮০০ বর্গ মাইল, অর্থাৎ ইংলণ্ডের অক্সফোর্ডশায়ার বা নটিংহামশায়ারের সমান। অথচ এই প্রদেশের অধিবাসিসংখ্যা প্রায় ষাট লক্ষ। লেখকের মতে উক্ত প্রদেশে কয়লার প্রাচুর্য্যবশতঃ কলকারখানার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বলিয়াই

জনতা এত বাড়িয়াছে। ("The extraordinary effect of coal and iron and especially of coal upon population may be seen by the example of the Ruhr coal district.")

জার্ম্মানির উন্নতি এবং ফ্রান্সের অবনতির কারণ বুঝাইতে গিয়া, লেখক বলিয়াছেন যে দেশের উন্নতির জন্য দুইটি জিনিষের প্রয়োজন—তাহার অধিবাসীদিগের চরিত্র ও জ্ঞানবল এবং উহার নৈসর্গিক সম্পদ। ("The economic progress of nations is caused partly by the qualities of their inhabitants, partly by Geographical and Geological factors.")। মনীষা ও অধ্যবসায়ে ফরাসী জাতি পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয়, কিন্তু প্রকৃতি দেবী ফ্রান্সকে জার্ম্মানির ন্যায় ভাগ্যবান করেন নাই বলিয়া, ফরাসী হটিয়া গিয়াছে। উত্তর-জার্ম্মানির সমস্তটাই সমতল—রাইন নদীর ধার হইতে বার্লিনে এবং তথা হইতে হাম্বার্গ বা কনিগ্‌সবার্গে যাইতে হইলে একটিও পার্ব্বত্য সুড়ঙ্গ (tunnel) পার হইতে হয় না; ফ্রান্সে এরূপ বিস্তীর্ণ সমতলভূমি নাই; ফ্রান্সের রোণ প্রভৃতি নদীতে নৌকা বা জাহাজ চালাইতে বেগ পাইতে হয়। সুতরাং একস্থান হইতে স্থানান্তরে মাল পাঠাইতে হইলে জার্ম্মানির নৈসর্গিক সুবিধা অধিক এবং খরচ অল্প।

কল-কারখানার ভিত্তি দুইটি জিনিস—কয়লা ও লৌহ। ("Coal is the mother of industry and population.")। নিম্নে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চারিটি ব্যবসাদার জাতির দুইটি প্রধান খনিজ সম্পদের তথ্য উদ্ধৃত হইল। ইহাতে প্রমাণিত হইবে যে, প্রকৃতির কার্পণ্যবশতঃ ফরাসী জার্ম্মানের নিকট পরাজিত হইয়াছে।—

কয়লা

সাল	য়ুনাইটেড ষ্টেট্‌স	জার্ম্মানি	য়ুনাইটেড কিংডম	ফ্রান্স	
১৮৮৫	১১২,১৮০,০০০	৭৩,৬৭০,০০০	১৬১,৯৬০,০০০	১৯,৫১০,০০০	টন
১৯০০	২৪৩,৪১০,০০০	১৪০,৭৯০,০০০	২২৮,৭৭০,০০০	৩৩,৪০০,০০০	"
১৯১৩	৫০৪,৫২০,০০০	২৭৩,৬৫০,০০০	২৮৭,৪১০,০০০	৪০,১৯০,০০০	"

লৌহ

সাল	য়ুনাইটেড ষ্টেট্‌স	জার্ম্মানি	য়ুনাইটেড কিংডম	ফ্রান্স	
১৮৮৫	৪,১১১,০০০	৩,৬৮৭,০০০	৭,৩৬৯,০০০	১,৬৩০,০০০	"
১৯০০	১৪,০১০,০০০	৮,৫২১,০০০	৯,০৫২,০০০	২,৬৯৯,০০০	"
১৯১৩	৩০,৯৬৬,০০০	১৯,২৯২,০০০	১০,২৬০,০০০	৫,৩১১,০০০	"

১৯১০ ও ১৯১৩ সালে যে ভূতত্ত্ববিদের বৈঠক (International Geological Congress) বসিয়াছিল, তাহার মুদ্রিত বিবরণী হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সমগ্র য়ুরোপ মহাদেশের খনিতে যে কয়লা আছে, তাহার শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ জার্ম্মানির, এবং য়ুরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লৌহ-ভাণ্ডার জার্ম্মানির কুক্ষিগত। বিশেষ বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হইল :—

কয়লা

জার্ম্মানি—	৪২৩৩৫৬০	লক্ষ টন।
য়ুনাইটেড কিংডম—	১৮৯৫৩৫০	" "
রুসিয়া—	৬০১০৬০	" "
অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি—	৫৯২৬৯০	" "
ফ্রান্স—	১৭৫৮৩০	" "
বেলজিয়াম—	১১০০০০	" "
স্পেন—	৮৭৬৮০	" "
স্পিট্‌সবার্জেন—	৮৭৫০০	" "
হলাণ্ড—	৪৪০২০	" "
বালকান প্রদেশ—	৯৯৬০	" "
ইটালি—	২৪৩০	" "
সুইডেন, ডেনমার্ক ও পর্টুগাল—	১৮৪০	" "
সর্ব্বশুদ্ধ	৭৮৪১৯২০	লক্ষ টন।

লৌহ

জার্ম্মানি—	১৩৬০০	লক্ষ টন।
ফ্রান্স—	১১৪০০	" "
সুইডেন—	৭৪০০	" "
য়ুনাইটেড কিংডম—	৪৫৫০	" "
রুসিয়া—	৩৮৭২	" "
স্পেন—	৩৪৯০	" "
নরোয়ে—	১২৪০	" "
অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরি—	১০৩৫	" "
গ্রীস—	৪৫০	" "
বেলজিয়াম—	২৫০	" "
ইটালি—	৩৩	" "
সর্ব্বশুদ্ধ	৪৭৩২০	লক্ষ টন।

জার্ম্মানি সম্প্রতি ফ্রান্সের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লৌহ-খনি এবং বেলজিয়াম, পোলাণ্ড ও পশ্চিম রুসিয়ার কয়লা ও লৌহ খনিগুলি হস্তগত করিয়াছে। ইহার ফলে ফ্রান্সের সর্ব্বনাশ ও জার্ম্মানির পৌষ মাস হইয়াছে। লেখক এইজন্য দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, কয়েক বৎসরের মধ্যে হয়ত ফ্রান্সের গৌরব-সূর্য্য চিরকালের জন্য অস্তমিত হইবে। ("In a few decades France would, indeed, cease to be a Great Power; she would become a minor State at the mercy of Germany.")।

শ্রীগৌরহরি সেন।

গান

(নট মল্লার)

যাবনা—যাবনা—যাবনা ঘরে ;
বাহির করেছে পাগল মোরে।

বনের বিজনে মৃদুল বায়
দুলে দুলে ফুল বলে আমায়,
"ঘরের বাহিরে ফুটিবি আয়
পুলকভরে।"

আকাশে দু'তীরে দু'বেলা
আলো কালো করে হোলি খেলা ;
আমারও পরাণে লেগেছে রং
কালোর 'পরে।

নীল-সরে হেম-তরী 'পরে
হাসে নব বিধু লাজভরে ;
'এস বঁধু' বলে ডাকে মোরে
মোহন স্বরে।

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন।

কৃতজ্ঞতা

(গল্প)

গত বৎসর বি-এ পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে শুনিয়া তাড়াতাড়ি এডুকেশন গেজেট আফিসে ছুটিয়া আসিলাম। দেখিলাম ভিড় বেশ জমাট বাঁধিয়াছে। আফিসেরই একজন কর্ম্মচারীর হাতে কলিকাতা গেজেট্‌খানি রহিয়াছে—যেমন এক এক জনের নাম জিজ্ঞাসা করা হইতেছে, অমনি তিনি কাগজখানির উপর চোখ বুলাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়-সমরক্ষেত্রের যোদ্ধৃগণের জয়পরাজয়বার্ত্তা জ্ঞাপন করিতেছেন ; সঙ্গে সঙ্গে বিজেতার মুখমণ্ডল জয়গৌরবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, আর পরাভূতের বক্ষোভেদী দীর্ঘনিশ্বাসে মুখে কালিমার লেপ পড়িতেছে। আমার নিজের সাফল্য-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল না। তথাপি মাঝে মঝে একটা "কিন্তু" আসিয়া বিভীষিকা দেখাইত। স্থির করিলাম সকলে চলিয়া গেলে নিজেই গেজেটখানি খুলিয়া ভাগ্যপরীক্ষা করিব। পনরো মিনিট—আর পনেরো মিনিট ধৈর্য্য ধরিয়া রহিলাম। ক্রমে যখন সকলেই চলিয়া গেল, তখন কর্ম্মচারীর নিকট হইতে গেজেটখানি চাহিয়া লইলাম। S-এর কোঠায় আসিলাম—Sen, সেন তারাপদ, T'র পরই তো U—'উপেন্দ্র' কৈ, উপেন্দ্রনাথ কোথায় ?

অন্ধকার, অন্ধকার, চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম—পায়ের নীচে হইতে যেন মাটী সরিয়া যাইতে লাগিল। আর একবার কাগজ দেখিলাম—নাম দেখিতে পাইলাম না। আর একবার—ব্যর্থপ্রয়াস ! এ কি মর্ম্মপীড়া !

আস্তে আস্তে কাগজখানি টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া কম্পিতপদে আফিস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

* * * *

পরীক্ষায় ফেল হইয়া, কয়েকদিন ধরিয়া একটা গম্ভীর বিষাদের ভার বুকের উপর বোঝা হইয়া রহিল। মনে মনে অনেক তোলাপাড়া করিয়া দেখিলাম যে ফেল্ কিছুতেই হইতে পারি না—তবে যে হইয়াছি ? তাহা নিশ্চয়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক-দিগের পক্ষপাতিত্বে। নিজ অক্ষমতার কথা এক-বারও মনে হইল না। তখনই ঢেরা তালিকার (Cross List) জন্য আবেদন করিলাম। যথা-সময়ে দেখিলাম—বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না—যে ইতিহাসে ফেল্ হইয়াছি। ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে যে গবেষণা মূলক উত্তর দিয়াছি তাহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে না পারিয়া—পরীক্ষক সংখ্যার কোঠায় কিছুই যেন নাই! মার্ক-শীট্ (mark-sheet) আনাইয়া দেখিলাম—২ নম্বরের জন্য ফেল্। ক্ষোভের অন্ত রহিল না—ধিক্ আমার এই গর্ব্বিত ইতিহাস-জ্ঞানকে।

দিনকতক ঘর হইতে বাহির হইলাম না। সান্ত্বনা! সান্ত্বনা! আত্মীয় বন্ধু মুখে চারিদিকে সান্ত্বনারই সুর ঝঙ্কৃত হইতেছে—যেন আমাকে পাগল করিতে চায়। কি হইয়াছে বাপু, আমার? আমি নিজের দুঃখেই ভারাক্রান্ত—আমি সান্ত্বনা চাহিনা—বিদ্রূপময়ী সান্ত্বনার ভার—আমার আর সহ্য হয় না। আমি মুক্তি চাই।

স্থির করিলাম, চারিবৎসর যে ভাগলপুর কলেজে পড়িয়াছি, সেখানে আর এ মুখ দেখাইব না। সেখানে আর বি-এ না পড়িয়া স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে আসিয়া ভর্ত্তি হইলাম। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপর, হেদুয়ার নিকটে —নং বাড়ীতে attached mess এর ত্রিতলে একজনের থাকিবার মত একটী ছোট ঘরে আসিয়া একেলা রহিলাম। কাহারও সঙ্গে বড় একটা মিশিতাম না, মনের সে অবস্থাও ছিল না। খাইবার সময়ে দুটী খাইয়া লইয়া নিজের ঘরটীতে আসিয়া পড়াশুনা করিতাম। এবার আর গবেষণা নয়! পুঁথির বিদ্যাই ভাল। নিয়মিত ভাবে মনোযোগের সহিত পড়িতে লাগিলাম। কেবল-মাত্র একটু ক্ষুদ্র বিঘ্ন ছিল। পাশের গলিতে উড়িয়া বাসন বিক্রেতারা মাঝে মাঝে কাঁশর-ঘণ্টার বিকট আওয়াজ করিয়া আমার পড়ার ব্যাঘাত ঘটাইত। কিন্তু ছোট ছোট ফিরিওয়ালার হাঁকে আমাকে অধীর করিতে পারিত না—আমি সমানে পড়িয়া চলিতাম!

মাস দুই ধরিয়া পড়াশুনার নেশা বেশ রহিল। কিন্তু পূজার পূর্ব্বেই কলেজে নাট্যাভিনয়ের কথা যখন উঠিল তখন সে নেশাটা চট্ করিয়া ছুটিয়া গেল। মনকে বুঝাইলাম—দিন কতক পড়াশুনা তো করা হইয়াছে, এখন দিনকতক না হয় খেলাধুলা করা যাক্। ফেল্ হইবার তীব্র জ্বালা গত তিনমাসে অনেকটা জুড়াইয়া আসিতেছিল।

Macbeth নাটকের অভিনয় হইবে স্থিরীকৃত হইল। আমি স্বয়ং ম্যাক্‌বেথের ভূমিকা গ্রহণ করিলাম। কলেজের সাহেব অধ্যাপক তালিম দেওয়ায় এক মাসের মধ্যে ভূমিকা বেশ তৈয়ারী হইয়া উঠিল। রিহার্সালের সময় যাহারা আমাকে অভিনয় করিতে দেখিল সকলেই আমায় ভূরি প্রশংসাবাদ করিল। শেষ রাত্রির অভিনয়ের সার্থকতা সম্বন্ধে আর কাহারও সংশয় রহিল না।

আর সপ্তাহ পরেই কলেজে অভিনয় হইবে। তাহার পরই ছুটী। ছুটীর দিন বিকালে পূজার জন্য সামান্য বাজার করিয়া লইয়া, চুঁচুড়াতেই আসিব ও সেইখানেই অবকাশটা কাটাইয়া দিব সঙ্কল্প করিলাম।

* * * *

আজ বুধবার—অভিনয়ের দিন। দিনটাও অভি-নয়ের অনুকূল হইয়া উঠিয়াছে। গত রাত্রি হইতে যে জোর বাতাস উঠিয়াছে তাহা যেন বাড়িয়াই চলিয়াছে। ব্যারোমিটারের পারা নীচে পড়িয়াছে,—সকলেই সাই-ক্লোনের আশঙ্কা করিতেছেন। প্রকৃতি রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যেন প্রলয়ের অভিনয় করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছেন। হেদুয়ার অধিকাংশ গাছই পড়িয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে কর্ণপটহ-বিদারী সুতীক্ষ্ণ বংশীধ্বনির ন্যায় বাতাসের শব্দ হইতেছে, আর থাকিয়া থাকিয়া আমার ছোট কুঠারীটি দুলিয়া উঠিতেছে। বৃষ্টির ঝাপ্টা আসিয়া জানালা দরজায় পুনঃ পুনঃ ধাক্কা দিতেছে—

যেন সব ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চায়! কৃষ্ণ ঘনমেঘ চিরিয়া বিজলী চমকিতেছে, ক্ষণেকপরেই সৃষ্টিবিধ্বংসী নিনাদে অশনি পতিত হইতেছে। নাট্যোক্ত ডাইনীদের বুঝি মিলন-সময় আসিয়া উপস্থিত হইল!

In thunder, lightning or in rain,

* * * * * *

Fair is foul, and foul is fair.

এই দুর্যোগে অভিনয় হইতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া কলেজ নাট্য-সমিতির সেক্রেটারীর নিকট লোক পাঠাইলাম। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন—"হলের ভিতর আমাদের নাট্যাভিনয় হইবে, কোন অসুবিধা হইবে না। আমাদের সব ঠিকঠাক, দেরী করিবার কোন প্রয়োজন নাই।"

সন্ধ্যা ৬৷৷০ টার সময় নাট্যাভিনয় হইল। দুর্যোগ-সত্ত্বেও দর্শকগণের সংখ্যা কম হয় নাই। প্রথম অঙ্কের মাঝখান হইতে আমার মনে হইতে লাগিল যেন আমি উপেন্দ্রনাথ সেন নই, যেন আমি ম্যাক্‌বেথ! প্রথম অঙ্কের শেষে দুই একজন বন্ধু আসিয়া করমর্দ্দন করিয়া বলিল—"খাসা হচ্ছে, তুমি যে এমন সুন্দর অভিনয় করতে পার, তাতো আগে জানতাম না;" আমিও সময়োচিত বিনয় দেখাইলাম। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—ডন্‌কান্ খুন হইল। তার পরে কি যেন একটা মাদকতায় বিভোর হইয়া অঙ্কের পর অঙ্ক—দৃশ্যের পর দৃশ্য—অভিনয় করিয়া চলিলাম। শেষে যবনিকা পতন হইতেই সমস্ত বন্ধু বান্ধব ছুটিয়া আসিয়া "Hail to thee, Glamis" বলিয়া সম্বোধন করিল এবং সেই রাত্রির সাফল্যের জন্য আমাকে অজস্র ধন্যবাদ দিল। সকলের পীড়াপীড়িতে আর এক পেয়ালা চা খাইলাম—হিসাব করিয়া দেখিলাম সে পর্য্যন্ত নয় পেয়ালা উদরস্থ হইয়াছে।

বাসায় যখন ফিরিলাম, তখন ১১৷৷০টা। প্রকৃতির মূর্ত্তি আরও প্রলয়ঙ্করী হইয়াছে—বাতাস যেন পাগলের মত হইয়াছে; বৃষ্টির ঝাপটে আরও জোর হইয়াছে। চারিটী খাইয়া শুইয়া পড়িলাম। অত্যধিক চা পানের জন্যই হউক,—আর অভিনয়ের উন্মাদনাতেই হউক, ভাল ঘুম হইল না। মনে হইতে লাগিল—

Sleep no more,

Macbeth doth murder sleep.

মাঝে মাঝে মনে হইতে লাগিল যেন Banquoর প্রেতমূর্ত্তি ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বেড়াইতে বেড়াইতে আসিয়া বসিল না? চমকিত হইয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলাম—লণ্ঠন জ্বালিলাম—কৈ? কোথাও ত কেহ নাই?—দেখিলাম মস্তিষ্ক বড়ই উত্তেজিত হইয়াছে। মাথায় জল দিয়া, আলোটা একটু কম করিয়া আবার শুইলাম। তন্দ্রাবেশে শুনিলাম—ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—

Hear it not, Duncan!

—সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা মোটরকার চলিয়া গেল। এ কি অসম্বদ্ধ ঘটনা সব দেখিতেছি! আবার যেন কাণে কে বলিতেছে—খুন! খুন!—দরজায় কে যেন ধাক্কা দিল না? তাই তো, আবার আমার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে যে। ওই যে—"উপেন, ভাই, একবার দরজাটা খুলে দাও তো।" এ স্বর যে চেনা—কিন্তু স্বরের অধিকারী,—সে যে অনেকদিন গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছে! প্রকৃতিস্থ আছি তো আমি? "এই যে দিই"—বলিয়া উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিলাম।

একটা দমকা বাতাসে কবাট খুলিয়া গেল—একটা ছায়া যেন পাশ দিয়া ঘরে ঢুকিল। ভয়ে দ্বার বন্ধ করিয়া দিলাম। আলোকটা উজ্জ্বল করিয়া দিতে গিয়া সেই স্তিমিত আলোক দেখিলাম—একি, রুক্ষকেশ, রক্তাক্ত মূর্ত্তি এ কি? কে তুমি?—ব্যাঙ্কো?

প্রেতমূর্ত্তি মৃদুহাস্য করিল।

"না, না, তুমি ব্যাঙ্কো নও, করালী তুমি? পরপার হইতে কি আসিতেছ?"—বলিয়া চীৎকার করিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় সেই মূর্ত্তি ওষ্ঠের উপর তর্জ্জনী স্থাপিত করিয়া চুপ করিবার আদেশ দিল। তাহার পর কহিল, "চুপ কর, ভয় নাই। আমি করালীই বটে, প্রকৃতিস্থ হও, সব বল্‌ছি, আমাকে

একটু জল দাও।" জল খাইয়া বলিল—"ভাই, আমাকে একখানা কাপড় আর চাদর দাও তো।"

যন্ত্রচালিতের মত কাপড় আর চাদর দিলাম। রক্তাক্ত কাপড় ও কোট ছাড়িয়া টেবিল হইতে ষ্টেটস্‌ম্যান কাগজখানা লইয়া সেগুলিকে বেশ করিয়া জড়াইল। তাহার পর আমার নিকট হইতে ট্রাঙ্কের চাবি চাহিয়া লইয়া, ট্রাঙ্ক খুলিয়া সেগুলি তাহার ভিতর রাখিয়া দিয়া, আমাকে চাবি ফেরত দিল। আমি নির্ব্বাক্ হইয়া সে সমস্ত দেখিতে লাগিলাম।

তাহার পর করালী বলিল, "বড় আশ্চর্য্য হচ্ছ নয়? আচ্ছা—আমার জীবনের সমস্ত ইতিহাস তোমাকে শোনাচ্ছি।—তিন বচ্ছর আগে ভাগলপুরে boat trip করে ফেরবার সময় সেই ঝড়টার কথা মনে পড়ে কি তোমার? আমাদের কাছের নৌকাটা ডুবে গেল—চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে ছোট ছেলেটা জলে ছিট্‌কে পড়্‌লো, আমি তাকে বাঁচাবার জন্যে জলে লাফিয়ে পড়্‌লাম, মনে পড়ছে কি? খানিক পরে যেন আমার মনে হ'ল—তাকে পেয়েছি—একবার হাত দিয়ে তাকে তুলে ধর্‌লাম—তারপর হাত আমার অবশ হয়ে এল।"

আমি বলিলাম—"সেই ছেলেটাকে আমাদের নৌকায় তুলে নিয়েছিলাম।"

"যাক্—তাপর নৌকায় ওঠ্‌বার চেষ্টা কচ্ছি এমন সময় তলিয়ে গেলাম। যখন জ্ঞান হল তখন কহলগাঁয়ে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাড়ীতে রোগশয্যায় শুয়ে আছি। শুন্‌লাম তিনি আমাকে গঙ্গারতীরে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন—সেই মুমূর্ষু অবস্থা থেকে তিনিই আমাকে বাঁচিয়েছেন। কিছুদিনের ভিতরেই বেশ সেরে উঠ্‌লাম্। এমন সময় তাঁর ছোট ছেলেটীর প্রচণ্ড নিউ-মোনিয়া হল। সুন্দর ফুট্‌ফুটে ছেলেটা, ৬।৭ বছরের হবে—যেন তার চেহারা চোখের উপর এখনও ভাসছে। আমার বড় ন্যাওটা হয়েছিল। দিন রাত তার বিছানায় বসে সেবা করেও তাকে যমের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পাল্লাম না। একদিন ভোর বেলায় ছেলেটী আমাদের ছেড়ে চলে গেল। সেই দৃশ্য কি ভয়ানক! মা আর ছেলেকে ছাড়তে চায় না—মায়ের প্রাণ যে! অনেক করে মায়ের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে আমরা তাকে গঙ্গার তীরে জ্বালাতে নিয়ে গেলাম। মনে হতে লাগল কি অলক্ষুণে আমি—আমি এসে এদের কি দুর্দ্দৈব ঘটালাম্! যখন সুকুমার দেহটা পুড়ে ভস্ম হ'য়ে গেল—তখন সকলে চলে গেল। আমাকে কেউই খুঁজলে না—একলা গঙ্গার ধারে উদাস হ'য়ে অনেকক্ষণ বসে রইলুম। তারপর অন্ধকার হয়ে গেল। ওদের ঘরে আর ফিরলাম না। গঙ্গার কিনারায় কিনারায় অন্ধকারে নিরুদ্দেশ যাত্রা কর্‌লাম। তারপর?—তার-পর ঝটিকাময় জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম কর্ত্তে কর্ত্তে এ তিন বছর কেটে গেছে—সে শুনে আর তোমার কায নেই।" তারপর একটু থামিয়া বলিল—"আজ ৫।৬ দিন হ'ল এখানে এসেছি। চুঁচড়ায় খবর পেলাম যে তুমি এখানে আছ। খোঁজ করে দুদিন তোমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এসেছি—দেখা পাইনি। শুনলাম না কি সন্ধ্যার সময় তোমাদের রিহার্স্যাল হয়—তুমি সেখানে গেছ। তোমার বোধ হয় আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে, আজকে এমন সময় আমি এখানে কেন? কাপড় চোপড়ে রক্ত কেন? সেই কথাই বল্‌ছি।—দু তিন দিন মনটা বড় খারাপ ছিল—ভাবলাম যাই একবার কল্পতরু থিয়েটারে অভিনয় দেখে আসি। থিয়েটার থেকে ১১টার সময় উঠে এলাম। বৃষ্টি পড়ছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে, এই দুর্য্যোগেও রাস্তার ধারে উদাস নয়নে দু একজন গণিকা দাঁড়িয়ে ভিজ্‌ছে—এত রাত্রে। কি হতভাগিনী ওরা! তাড়াতাড়ি চলে আসছি, এমন সময় একটী স্ত্রীলোক করুণ কণ্ঠে বল্লে—'বাবু গো, ও বাবু, বড় বিপদ যে আমার!' বারবনিতার কথায় কর্ণপাত করতে কেমন একটা ঘৃণা হল। কিন্তু তখনই আবার কাতর স্বরে স্ত্রীলোকটা বলে উঠলো—"বাবু চলে যাবেন না—একলা মেয়েমানুষ আমি—ছেলে বুঝি আমার আর

বাঁচে না!' আর আমি থাক্‌তে পাল্লাম না, ফিরলাম। দেখলাম স্ত্রীলোকটার পাংশু মুখে একটা গভীর বেদনার ছাপ পড়েছে—চুলগুলো সব অবিন্যস্ত। দেখে বড় দয়া হল। বল্লাম—'কোথা বাপু, তোমার ছেলে?' বল্লে, 'আসুন, আসুন, আমার ছেলেকে রক্ষা করুন' আমি তার সঙ্গে চল্লাম। একটা ছোট দোতলা বাড়ীর দরজার কাছে এসে দাঁড়াতেই সে বল্লে—চলুন বাবু উপরে। সেখানে উঠতেই বল্লে—'ওই যে, বিছানার পড়ে।' তাড়াতাড়ি গিয়ে বিছানায় বসে দেখলাম, যেন কি ঢাকা রয়েছে—হাত দিয়ে দেখি ঠাণ্ডা। চম্‌কে উঠলাম—তবে তো ছেলে মারাই গেছে। হায় হায়!—এমন সময় দরজা ঝনাৎ করে বন্ধ হল। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে শিকল তুলে দেবার শব্দ পেলাম। কি এ? শিকল দিলে কেন? আলোটা উজ্জ্বল করে দিয়ে চাদরখানা উঠিয়ে দেখলাম—সর্ব্বনাশ, এ যে খুন! ৩০।৩১ বছরের যুবক—এ যে রক্তে ভাসছে! উঃ কি প্রতারণা! মায়াবিনীর কুহকে মুগ্ধ হয়ে এ কোথায় এলাম। হায় হায়, নির্দ্দোষ হয়ে কি শেষে খুনের দায়ী হলাম? পিশাচী নিশ্চয়ই এতক্ষণ পুলিশে খবর দিতে গেছে। তারা এসেই আমাকে গ্রেপ্তার করবে—এই লাশ প'ড়ে—আর কেউ এখানে নেই। আমার কাপড়ে রক্ত—এর চেয়ে খুনের আর দৃঢ় প্রমাণ কি চাই? শেষে ফাঁসি কাঠে ঝোলাই কি কপালে লেখা ছিল? পাগলের মত ঘরে ছুটে বেড়াতে লাগলাম। একটা জানালা দিয়ে বেরুবার চেষ্টা করলাম—ব্যর্থ চেষ্টা। আর একটা জানালার প্রত্যেক গরাদে টানলাম, কোন ফল হল না। হাত কামড়াতে লাগলাম—পরে শেষ চেষ্টায় ভগবানের অনুগ্রহে একটা গরাদে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। তারি ভিতর দিয়ে গলে' বারান্দায় এলাম। তখনও ঝড় বৃষ্টি সমানে চলছে। কোণের লোহার খুটাতে চাদর বেঁধে তাই ধরে ফুটপাথে লাফিয়ে পড়লাম। তারপর ছুটতে ছুটতে ভাই, তোমার কাছে আসছি। তোমায় এই সময় বড় বিরক্ত কল্লাম।"

করালীর এই অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়া আমার দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছিল। আমি বলিলাম—"ভাই বিরক্ত কিছু হই নি, শুনে স্তম্ভিত হলাম। ঘোর বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে যে তোমার জীবন বেঁচেছে তার জন্যে ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ।—তুমি কিছু খাবে?"

সে বলিল—"না, কিছু না, এখন একটু ঘুমোব।"

এই বলিয়া কুঁজা হইতে জল লইয়া সমস্ত মাথাটা বেশ করিয়া ধুইল—তাহার পর পুরা এক গেলাস জল খাইয়া সেই মেজেতেই শুইয়া পড়িয়া বলিল—"ভাই একেবারে আলোটা নিবিয়ে দাও—তা না' হ'লে ঘুম হবে না। আর কথা টথা আজ নয়—সে কাল হবে, তুমিও ঘুমোও—"

মিনিট কয়েকের মধ্যে তাহার গভীর নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। সে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছে দেখিয়া ঔৎসুক্য সত্ত্বেও তাহাকে আর গল্প করিতে জেদ করিলাম না—ঘুমাইতে দিলাম। আমিও শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

ভোর বেলা জাগিয়া দেখিলাম, বন্ধু নাই, উঠিয়া গিয়াছে। তাহার অপেক্ষায় অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম—সে কিন্তু আসিল না। গত রাত্রের রোমাঞ্চকর ঘটনা স্মরণে শিহরিয়া উঠিলাম—ঠিক করিলাম এ কথা কাহাকেও বলা হইবে না। বিশেষ আমার নিজের ট্রাঙ্কেই রক্তমাখা কাপড়চোপড়গুলা রহিয়াছে।

মুখ ধুইয়া টেবিলের উপর হইতে আয়না লইতে যাইব, এমন সময় একখানি চিরকুট নজরে পড়িল। তাহাতে লেখা রহিয়াছে—

"ভাই উপেন, প্রবঞ্চনার জন্য অপরাধ লইও না। নিজ প্রাণরক্ষার জন্য এই প্রথম মিথ্যা কথা কহিলাম। আমার প্রাণদানের জন্য হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জানিও।

ইতি হতভাগ্য—"

কিছু বুঝিতে পারিলাম না। কি প্রবঞ্চনা? কাহাকে এ প্রবঞ্চনা? করালী যে কাল সেই ভীষণ ঘটনার বর্ণনা করিল, সে কি তবে উপন্যাস? তাই ব কেন? আমিই বা তাহার প্রাণরক্ষা করিলাম কি করিয়া?—

এই প্রকার চিন্তার ঘূর্ণিতে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিলাম। নাঃ আর এখানে থাকা নয়। দুপুর বেলায় আবশ্যকীয় শওদা করিয়া সন্ধ্যার গাড়ীতে চুঁচুড়ায় আসিলাম।

এক ভাবনা সেই কাপড়গুলা। সেই দিনই গভীর রাত্রে উঠিয়া ট্রাঙ্ক হইতে বাণ্ডিলসুদ্ধ কোট কাপড় বাহির করিয়া বাড়ীর পিছনের বাগানে পোড়াইলাম—ভস্মাবশেষ মাটিতে পুঁতিতে গিয়া দেখি, একখানি ভোজালি। রক্ত পুড়িয়া গিয়া ব্লেডের উপর দাগ পড়িয়াছে।

কি লোমহর্ষণ ব্যাপার! ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া খিড়কীর বাহিরে গিয়া নিকটবর্ত্তী গঙ্গায় সেই ভোজালি নিক্ষেপ করিলাম। হাত মুখ ধুইয়া তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। আর ঘুম হইল না—সেই সব ঘটনার কথা ভাবিতে ভাবিতে চোখের উপরেই রাত্রি প্রভাত হইল। প্রাতঃস্নান করিয়া আসিয়া একটু ঘুমাইলাম।

আহারাদির পর আর একবার ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় খবরের কাগজ দিয়া গেল। প্রথম পাতাতেই বড় বড় হরফে লেখা রহিয়াছে—

আবার! আবার! বিশহাজার টাকা লুঠ!

কলিকাতায় মোটর ডাকাইতি।

একজন খুন! তিনজন নিমখুন।

"* * * গত বুধবার রাত্রি ১২টার সময়—নং বিডন ষ্ট্রীটে বিখ্যাত ধনী——'র বাটীতে লোমহর্ষণ ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতেরা সকলেই যুবক—সকলেরই মুখোসে মুখ ঢাকা ছিল। গৃহস্বামীর নিকট চাবি চাওয়াতে তিনি তাহা দেন নাই—অধিকন্তু বাধা দিতে যাওয়ায় ছোরার আঘাতে উহারা তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। গোলমাল শুনিয়া গৃহস্বামীর পুত্রদ্বয় ও জামাতা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে যায়। কিন্তু গুলি খাইয়া তাহারা জখম হইয়া পড়িয়াছে।—ডাকাতদের একটা কালো রঙের মোটর ছিল। ডাকাইতি করিয়া সেই মোটরে উঠিয়া তাহারা পলায়। পুলিশ খবর পাইয়া মোটরে করিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল। হেদুয়ার নিকট ডাকাইতদের গাড়ী হইতে একজন লাফাইয়া পড়িয়া পার্শ্বের গলিতে অন্তর্হিত হইয়াছে—পুলিশ খুঁজিয়াও তাহার কোন সন্ধান পায় নাই। ডাকাইতদের মোটরও উধাও হইয়া যায়—কোনও সন্ধান নাই। তদন্ত চলিতেছে। * * *"

এই সংবাদ পড়িয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। কি সর্ব্বনাশ! করালীই কি তবে এই লোমহর্ষণ নাট্যের প্রধান নায়ক?—সংবাদপত্র হাত হইতে পড়িয়া গেল। আমি বজ্রাহতের ন্যায় বসিয়া রহিলাম।

শ্রীকালীপদ মিত্র।

বাদল

প্রভাতে ঘেরেছে সন্ধ্যা, মধ্যাহ্ন মলিন,
সন্ধ্যা চাহে নিশি-কোলে হইতে বিলীন,
নিশি মাগিতেছে অমা করিতে বরণ,
অজস্র বর্ষণ মাঝে ভুবন মগন!

এত অশ্রু ঝরে কার? কোন্ অভাগিনী
দয়িতে হারায়ে হায়, হয়ে উন্মাদিনী
করিতেছে আর্ত্তনাদ! সমবেদনায়
বিষাদের বন্যা বুঝি বহে বসুধায়!

নিবিড় কুন্তল তার ছেয়েছে গগন,
ডুবে গেছে দিবা-নিশি চন্দ্রমা-তপন,
চঞ্চল অঞ্চল ওই ক্ষিপ্ত বায়ুভরে
লুটাইছে মুহুর্মুহুঃ শ্যামল প্রান্তরে!

বেদনা-ব্যাকুল প্রাণে একাকী বসিয়া
আমি শুধু আত্মহারা রয়েছি চাহিয়া।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

তৃতীয় পক্ষ
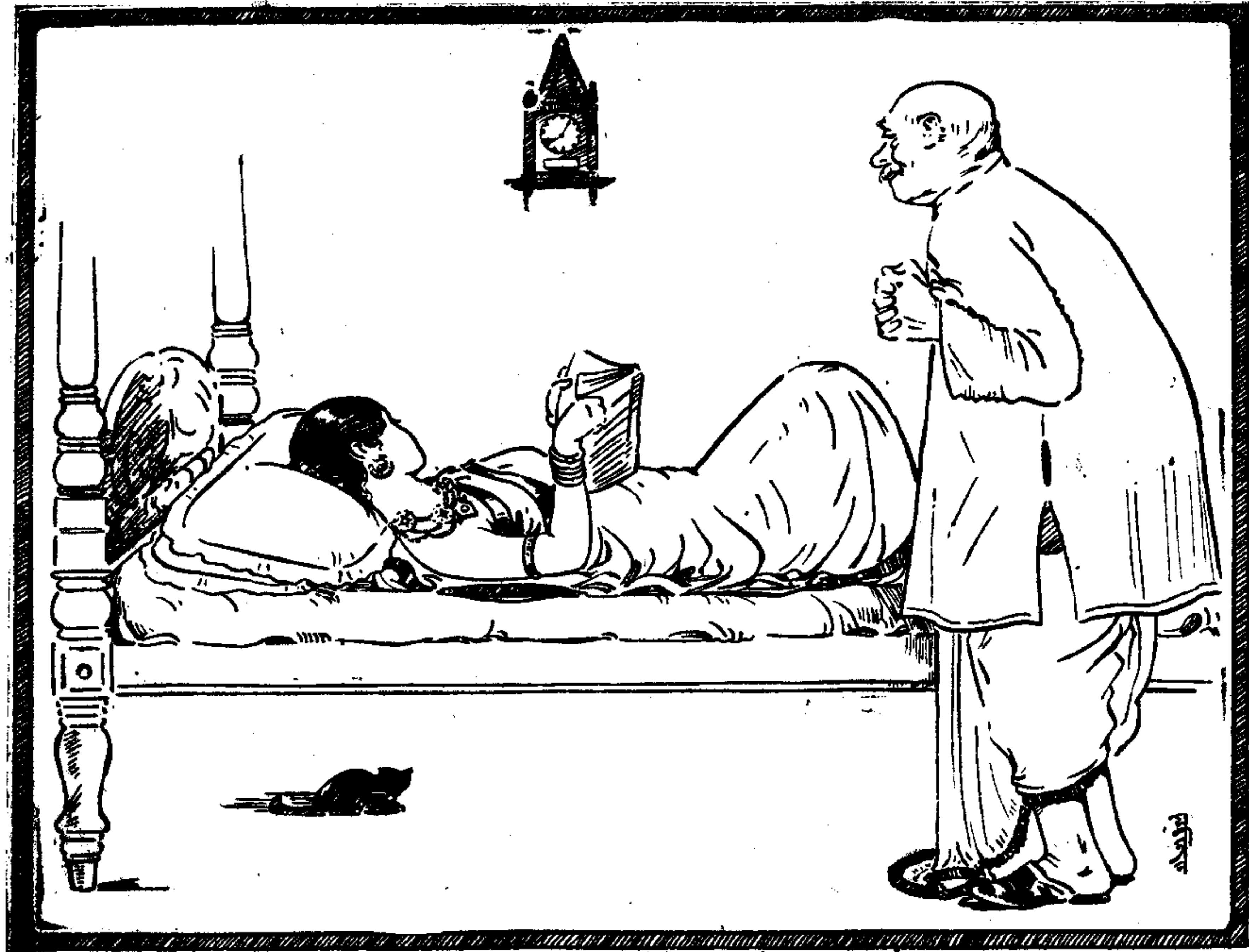
বয়রাম্ খাঁর আধিপত্য ও পতন

আক্‌বর অভিভাবক বয়রাম্ খাঁর তত্ত্বাবধানে সিকন্দর স্থরের দমনকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া পঞ্জাবে সমর-দীক্ষা গ্রহণ করিতেছিলেন; সেই সময় গুরুদাসপুর জেলার কলানৌর নামক স্থানে তাঁহার নিকট পিতার মৃত্যু-সংবাদ পৌছিল। এখন পিতৃশোকে মুহ্যমান থাকিবার সময় নহে; বিপুল কর্ত্তব্য আক্‌বরের সম্মুখে। হিন্দুস্থানের সিংহাসন শূন্য, নবপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য কর্ণধারহীন তরণীর ন্যায় সঙ্কটসঙ্কুল, মোগলগৌরব আসন্ন-বিনাশশঙ্কিত;—মুমূর্ষু পাঠান-রাজশক্তি শেষচেষ্টা-উন্মুখ। প্রধান সেনাপতি ও অভিভাবক বয়রাম্ খাঁ এই সঙ্কটকালে ইতস্ততঃ করিলেন না; উপস্থিত কর্ম্মচারিবর্গ ও সেনানীগণের সম্মতিক্রমে কলানৌরের এক উদ্যানে বালক আক্‌বরকে 'সম্রাট্'পদে অবিলম্বে অভিষিক্ত করিলেন (১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৫৫৬)। অভিষেকের তিনদিন পূর্ব্বে দিল্লীর রক্ষক মোগল-প্রতিনিধি তর্দ্দী বেগ আক্‌বরের নামে 'খুৎবা' পাঠ করাইলেন।

আক্‌বর এখন নামে সম্রাট্; কোন নির্দ্দিষ্ট প্রদেশ তাঁহার অধিকারে নাই। যে অল্পসংখ্যক সৈন্য-সাহায্যে বয়রাম্ খাঁ পঞ্জাবের কতকগুলি প্রদেশ মাত্র বশীভূত করিয়াছিলেন, সে সমস্ত সৈন্যের সাহায্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করাও সে সময় নিরাপদ বলিয়া বিবেচিত হইল না। স্থতরাং রাজধানী ও হিন্দুস্থানের চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রদেশসকলে নবীন বাদশাহের প্রভুত্ব দৃঢ়মূল করাই এখন আক্‌বর ও বয়রাম্ খাঁ প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন; তাঁহারা বুঝিলেন, এই চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইলে অন্যান্য দেশজয়ের পথ অবাধ ও মুক্ত।

সম্রাট্ হুমায়ুন

পাঠানেরা তখন শেষবার মাথা তুলিবার চেষ্টা করিতেছিল। হুমায়ুনের মৃত্যু ও আক্‌বরের অভিষেক-সংবাদ কর্ণগোচর হইবামাত্র,মুহম্মদ্ শাহ্ আদিল্ পাঠান-সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার্থ বদ্ধপরিকর হইলেন। বালক

সম্রাট্ যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে সিংহাসন অধিকার করিতে না পারেন, তজ্জন্য তিনি তাঁহার প্রিয় সেনাপতি হীমুকে দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন। গোয়ালিয়রে আলী কুলী খাঁ, আগ্রায় সিকন্দর খাঁ উজ্‌বেগ প্রভৃতিকে বিধ্বস্ত এবং পুরাতন দিল্লীর নিকট তর্দ্দী বেগকে পরাস্ত করিয়া হীমু-চালিত বাহিনী অপ্রতিহতপ্রতাপে পানিপথ অভিমুখে অগ্রসর হইল।

শেরমণ্ডল

অভিষেকের অনতিকাল পরে জলন্ধর নামক স্থানে অবস্থানকালে আকবর সংবাদ পাইলেন (১৩ই অক্টোবর, ১৫৫৬) যে হীমু, চঘ্‌তাই-প্রধান তর্দ্দী বেগের নিকট হইতে দিল্লী কাড়িয়া লইয়াছেন;—পরাজিত তর্দ্দী বেগ পলাতক! তখন অনেকে পরামর্শ দিল যে, রাজ্যের এই বিশৃঙ্খল অবস্থায় আকবরের কাবুলে প্রস্থান করাই যুক্তিসিদ্ধ; কিন্তু হুমায়ুনের বিশ্বস্ত সহচর, নির্ভীক বয়রাম্ খাঁ বুঝিলেন যে, এ সময় দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করিলে তাঁহার বক্ষঃশোণিতপুষ্ট মোগল-সাম্রাজ্যের বিলোপ অবশ্য-ম্ভাবী। সমর-প্রধান, কঠোর-শাসন-নীতিপরায়ণ বয়রাম্ ভীরুতা-প্রসূত প্রস্তাবে কর্ণপাতমাত্র করিলেন না। অধিকন্তু পাছে এই দুর্ব্বলতা সংক্রামক হয়, তজ্জন্য তিনি পলাতক তর্দ্দী বেগকে কর্ত্তব্যকর্ম্ম অবহেলা করিয়া পলায়ন-অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। হুমায়ুনের শাসনকালেও তর্দ্দী বেগ নানা গর্হিতাচরণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত 'আকবরনামা'-পাঠে জানা যায় যে, তর্দ্দীর সহিত বয়রামের পূর্ব্বশত্রুতাও ছিল; যাহা হউক, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অন্যায়কারিগণের অন্তরে ভীতিসঞ্চার করা এই কঠোর দণ্ডের অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়।

তর্দ্দীকে দণ্ডপ্রদান করিয়া দৃঢ়চেতা বয়রাম্ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া অচিরাৎ সম্রাট্‌সহ সসৈন্যে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং পাছে ছিদ্রান্বেষী সিকন্দর শূর পঞ্জাবে উপদ্রব বাধাইয়া পশ্চাৎ হইতে প্রতিকূলতাচরণ

সম্রাট আকবর

করেন, রণনীতিবিশারদ বয়রাম্ গুলবদনের স্বামী খিজ্‌র খাজাকে তৎপ্রতিবিধানে নিযুক্ত করিয়া গেলেন।

৩০ বৎসর পূর্ব্বে একবার যে পানিপথে বাবরের ভাগ্যপরীক্ষা হইয়াছিল, সেই রণক্ষেত্রে হীমূর সহিত মোগল সৈন্যের পুনরায় ভীষণ সংঘর্ষ হইল (৫ই নভেম্বর, ১৫৫৬)। সৈন্য-সংখ্যায় পাঠানপক্ষ প্রবল হইলেও চক্রনেমির পরিবর্ত্তনে হীমূ চক্ষুতে তীরবিদ্ধ হইয়া বন্দী হইলেন। 'আক্‌বরনামা' ও 'নফাইসুল্ মাসির' পাঠে জানা যায় যে, যুদ্ধের সময় আক্‌বর ও বয়রাম্ রণস্থলে ছিলেন না; যুদ্ধশেষে উভয়ে তথায় উপস্থিত হইলে, ক্ষতবিক্ষতকলেবর হীমূ বন্দীরূপে তাঁহাদের সম্মুখে আনীত হ'ন। তখন হীমূর রক্তে তরবারি রঞ্জিত করিয়া 'ঘাজী' (বা 'বিধর্ম্মী-নিধনকারী') হইবার জন্য বয়রাম্ খাঁ সম্রাট্ আক্‌বরকে অনুরোধ করেন; কিন্তু 'আক্‌বরনামা' ও বদায়ূনীর গ্রন্থে প্রকাশ যে, সহৃদয় আক্‌বর উত্তরে বয়রাম্‌কে বলিয়াছিলেন,—"হীমূ এক্ষণে মৃতবৎ; মৃতের উপর তরবারি-চালনে আমি অসম্মত। যদি তাহার জ্ঞান ও সামর্থ্য থাকিত, তাহা হইলে আমি তাহার শরীরে অস্ত্রাঘাত করিতে পারিতাম।" অতঃপর বয়রাম্‌ই স্বহস্তে হীমূকে বধ করেন।

দিল্লী ও আগ্রা অধিকৃত হইবার পর আক্‌বর সংবাদ পাইলেন যে, সিকন্দর সিওয়ালিকের পার্ব্বত্য-প্রদেশ হইতে অবতরণ করিয়া পঞ্জাব আক্রমণ করিয়াছেন এবং মোগল-প্রতিনিধি খিজ্‌র খাজা তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়া লাহোরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই দুঃসংবাদ প্রাপ্তি-মাত্রই আক্‌বর ও বয়রাম্ খাঁকে সসৈন্যে পুনরায় পঞ্জাব অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। সিকন্দর সূর তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া মানকোটের দুর্জ্জয় গিরিদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সম্রাট্-সৈন্য দুর্গ অবরোধ করিল। ছয়মাস কাল অবরোধের পর সিকন্দর আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন (মে, ১৫৫৭); অতঃপর স্বীয় পুত্রকে প্রতিভূস্বরূপ রাখিয়া, সম্রাটের সম্মতিক্রমে তিনি বাঙ্গালায় গমন করেন, এবং তথায় কয়েক বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আকৃবর এখন প্রায় নিষ্কণ্টক। সুর বংশের আর কেহই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। মুহম্মদ্ শাহ্ আদিল মৃত (১৫৫৭ খ্রীঃ), সিকন্দর খাঁ পরাস্ত—ইব্রাহীম্ খাঁ সুর উড়িষ্যায় পলাতক ; হিন্দু হীমূ নিহত। সিংহাসনের ভিত্তি দৃঢ় করিবার ইহাই পরম সুযোগ।

রাজ্যাঙ্কের দ্বিতীয়বর্ষে (১৫৫৭-৫৮), মানকোট-অবরোধকালে, সিংহাসন অনেকটা নিরাপদ বিবেচিত হইলে, আকৃবরের পালক-পিতা শামৃস্-উদ্দীন্ মুহম্মদ্ খাঁ আট্‌কা* কাবুল হইতে হুমায়ূনের পরিবারবর্গকে আনয়ন করেন। অনেকদিন পরে স্বীয় জননী মরিয়ম্ মকানী (হামীদা বানূ), স্তনদা-ধাত্রীমাতা জীজী অনগ ও প্রধান ধাত্রী মাহম্ অনগ প্রভৃতির পুনর্দ্দর্শনলাভ করিয়া বালক-সম্রাটের অন্তরে বিমল আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হইল। আকৃবর মানকোট হইতে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আত্মীয়গণের যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন।

সিকন্দর সুরের সহিত যুদ্ধকালে আকৃবর কাম্‌রানের শ্যালক আব্‌দুল্লা খাঁ মোগলের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কাম্‌রান্ হুমায়ূনের চিরশত্রু ছিলেন ; তাঁহার নিকট-

আকৃবর-সমীপে বয়রাম্-পুত্র আবদুর রহীম্
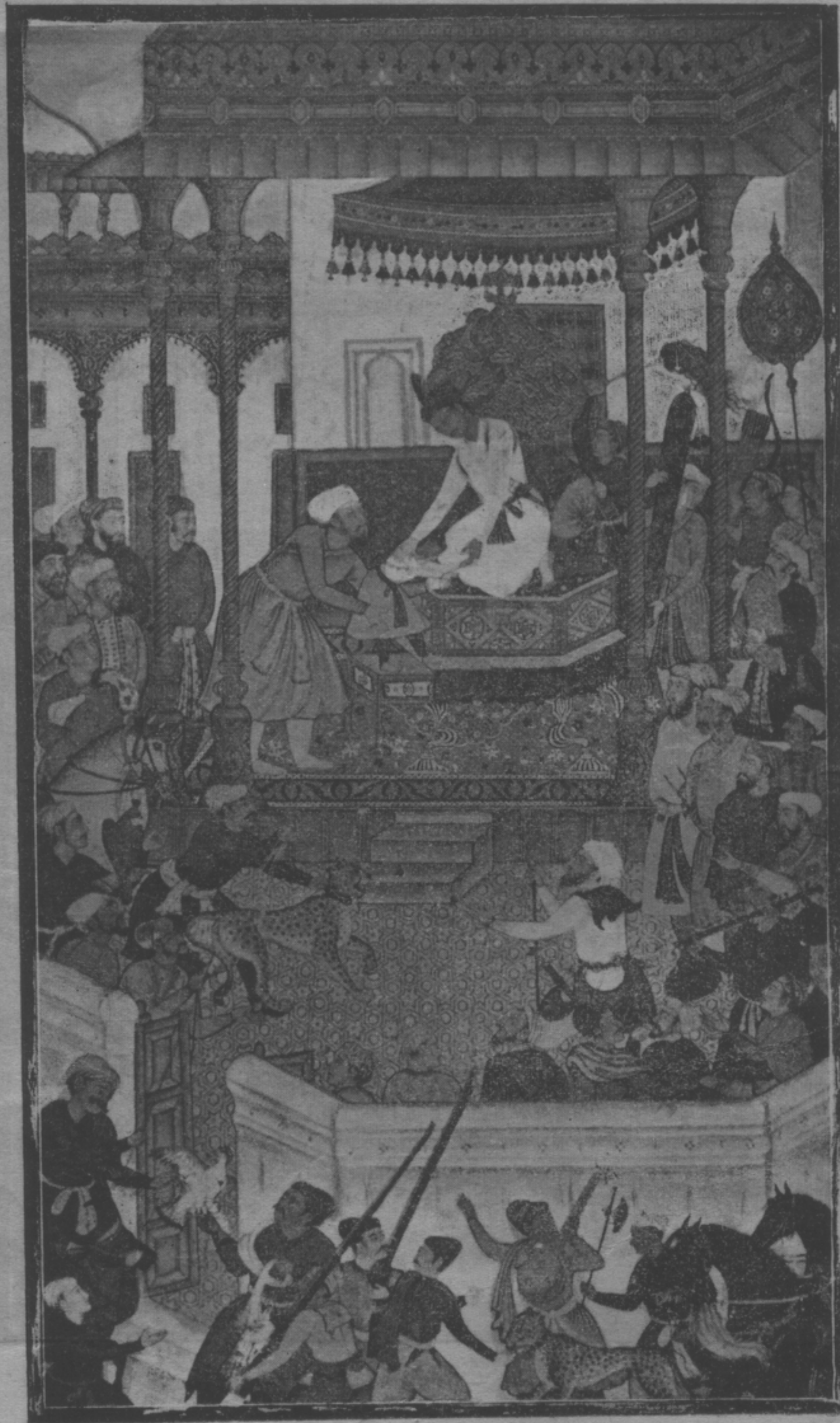
আত্মীয়ের সহিত প্রীতিসম্বন্ধ স্থাপনে বয়রামের মত ছিল

---

* শামৃস্-উদ্দীন্ মুহম্মদ প্রথমে কামরানের অধীনে একজন সাধারণ সৈনিক ছিলেন। কনৌজের যুদ্ধে পরাজয়ের পর সম্রাট্ হুমায়ূন যখন গঙ্গা অতিক্রম করিতেছিলেন, সেই সময়ে শামৃস্-উদ্দীন্ সাহায্যার্থ না আসিলে তিনি নিমজ্জিত হইতেন। সম্রাট্ সে উপকারের কথা বিস্মৃত হ'ন নাই ; তিনি শামৃস্-উদ্দীন্‌কে স্বীয় কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ; তাঁহার পত্নী জীজী, আকৃবরের স্তনদা-ধাত্রী ছিলেন। এই কারণে জীজী অনগ আকৃবরের পালয়িত্রী-মাতা, শামৃস্-উদ্দীন্ পালক-পিতা, এবং তাঁহাদের পুত্রগণ 'কোকা' বা 'কোকল্‌তশ্' নামে পরিচিত। শামৃস্-উদ্দীনের পরিবারবর্গ ইতিহাসে "আট্‌কা খইল্" (Foster-father Battalion) নামে প্রসিদ্ধ।

না ; কিন্তু স্বয়ং আক্‌বরের আগ্রহাতিশয্যে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। এইটী আক্‌বরের দ্বিতীয় পরিণয়।

১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসের শেষে আক্‌বর সসৈন্যে মানকোট ত্যাগ করিয়া লাহোর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ইহার কয়েকমাস পরে জলন্ধরে বয়রাম্ খাঁর সহিত সলীমা সুলতান্ বেগমের বিবাহ হইল। হুমায়ূন দুর্দ্দিনে বয়রামের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, ভারতজয় হইলেই তিনি তাঁহার করে সলীমাকে অর্পণ করিবেন। সলীমা হুমায়ূনের বৈমাত্রেয় ভগিনীর কন্যা, অসামান্যা সুন্দরী এবং বাক্‌পটুতায় অসাধারণ শক্তিশালিনী। 'আক্‌বরনামায়' (ii, 97) প্রকাশ যে, বয়রামের ভাবী শত্রু ও তাঁহার অধঃপতনের মূলস্বরূপিণী, আক্‌বর-ধাত্রী মাহম্ অনগের সমধিক যত্নেই এই বিবাহ সত্বর সম্পন্ন হইয়াছিল। উত্তরকালে বয়রামের হত্যার পর আক্‌বর এই সলীমার পাণিগ্রহণ করেন।

আক্‌বর এখন বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর, কিন্তু স্বকরে শাসনদণ্ড ধরিবার মত শক্তি ও অভিজ্ঞতা এখনও তাঁহার জন্মে নাই ; সুতরাং রাজ্যশাসনরশ্মি রাজ-অভিভাবক বয়রাম্ খাঁর হস্তে ন্যস্ত রহিল। আক্‌বর তাঁহার সহকারিভাবে শাসন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে লাগিলেন। বয়রাম্ 'খান্ খানান্' নামক সর্ব্বোচ্চ পদবীতে ভূষিত হইলেন, এবং সাধারণ্যে যাহাতে তাঁহার অভিভাবক পদ বিশিষ্টরূপে গণ্য হয়, তজ্জন্য 'খান্ বাবা' উপাধি গ্রহণ করিলেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ রাজ্যাঙ্কে (১৫৫৮-৬০) হিন্দুস্থানে আক্‌বরের অধিকার ক্রমে আরও বিস্তৃত হইল। মধ্য-ভারতে অবস্থিত গোয়ালিয়রের দুর্ভেদ্য দুর্গ এবং জৌনপুর প্রদেশ এক্ষণে তাঁহার করগত। রাজপুতানার রণ্‌তাম্‌ভোর দুর্গে সম্রাট্ লোলুপদৃষ্টিপাত করিলেন ; কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিল। অতঃপর মালব-অধিকারের সূচনাপাতে বয়রাম্ খাঁর সহিত আক্‌বরের সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইল, সুতরাং সে চেষ্টাও আর অগ্রসর হইতে পারিল না।

ক্রমে বয়রাম্ খাঁর অবাধ প্রভুত্ব ও অসীম প্রাধান্য

আক্‌বরের সিংহাসন—কলানোর

অনেক আমীর ওমরাহ্‌র চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিল। ইতঃপূর্ব্বে সম্রাট্‌-দরবারে তাঁহার বহু শত্রুর উদ্ভব হইয়াছিল; তন্মধ্যে মাহম্‌ অনগ ও তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র আধম্‌ খাঁই সর্ব্বপ্রধান। ইঁহারা বয়রামের বিরুদ্ধে সম্রাটের নিকট যখন-তখন মিথ্যা অভিযোগ করিতে লাগিলেন।

আক্‌বরের উপর মাহম্‌ অনগের যথেষ্ট প্রভুত্ব ছিল। সম্রাট্‌ হুমায়ুন যখন অস্করীর আক্রমণে শিশু আক্‌বরকে পরিত্যাগ করিয়া পত্নীসহ পারস্যে পলায়ন করেন, সেই সময়ে প্রধান ধাত্রী মাহম্‌ অনগ,* স্তনদা-ধাত্রী জীজী অনগ এবং পালক-পিতা শাম্‌স্‌-উদ্দীন্‌ মুহম্মদ্‌ আট্‌কা খাঁ, এই কয়জন আক্‌বরের তত্ত্বাবধানভার লইয়াছিলেন। তৎপরে আক্‌বর যখন শৈশবে পিতৃবৈরী পিতৃব্যদ্বয় অস্করী ও কাম্‌রানের হস্তে নিপতিত হ'ন, মাহম্‌ অনগ তখন আত্মজীবন উপেক্ষা করিয়া ভাবী সম্রাট্‌কে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। শৈশবধাত্রীর প্রাণপণ সেবা সম্রাট্‌ বিস্মৃত হ'ন নাই,—পরম শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহাকে নিজ অন্তঃপুরের কর্ত্রী করিয়া রাখিয়াছিলেন। আবুল-ফজ্‌ল্‌ সত্যই লিখিয়াছেন,—'শিশুকাল হইতে সিংহাসনালঙ্কৃত করা অবধি, মাহম্‌ আক্‌বরের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন।' (A. N. ii, 86).

কিন্তু কেবলমাত্র অন্তঃপুরকর্ত্রীত্ব লইয়া মাহম্‌ আর পরিতৃপ্ত থাকিতে পারিলেন না। হারেমের উচ্চপ্রাচীর-বেষ্টিত প্রভুত্ব ক্রমে সাম্রাজ্যসীমায় বিস্তারলাভের বাসনায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে বিস্তৃতির দৃঢ় অন্তরায় বয়রাম্‌। প্রমত্ত প্রভুত্ব-লালসায় দৃষ্টিহারা হইলেও কূটবুদ্ধিশালিনী, চতুরা রমণী দিব্যচক্ষে দেখিলেন যে, 'খান্‌ বাবা'র আধিপত্য-হরণ আর মৃত্যুকে বরণ, একই কথা। যখনই মনে হয়, তর্দ্দী বেগের ভীষণ পরিণাম অনগের অন্তরে ভীতিসঞ্চার করে। সম্রাট্‌-ধাত্রী ধৈর্য্যাবলম্বনে সুযোগ প্রতীক্ষায় রহিলেন এবং ক্রমে সম্রাট্‌ই পরোক্ষভাবে তাঁহার কামনার পথ নিষ্কণ্টক করিয়া দিলেন।

আক্‌বর এক্ষণে অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। ধীরে ধীরে তাঁহার মনে প্রভুত্ব-লালসা বৃদ্ধি পাইতেছে। সম্রাট্‌ যে স্বহস্তে রাজদণ্ড ধরিতে সমর্থ, তিনি যে ক্রীড়কের কর-চালিত সুসজ্জিত পুত্তলিকা নহেন, একথা এখন তিনি সর্ব্বসাধারণকে হৃদয়ঙ্গম করাইতে সমুৎসুক। মাহম্‌ অনগ প্রমুখ বয়রামের পতনাভিলাষিগণ সেই ধূমায়মান বহ্নিতে ফুৎকার দিতে লাগিলেন। দুরদৃষ্টক্রমে এই সময়ে বয়রাম্‌ আপনই আপনার অধঃপতনের সহায়তা করিলেন; তাঁহার নিজ কার্য্যই স্বীয় উচ্ছেদের অস্ত্রস্বরূপ হইল। আক্‌বরের একজন প্রীতিভাজন হস্তিচালক ছিল; বয়রাম্‌ কোন কল্পিত অপরাধে তাহার প্রাণদণ্ড করেন। (A. N. ii, 139-40) ক্ষমাভিক্ষার জন্য বাদশাহ্‌ এই মাহুত্‌কে বয়রামের নিকট পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু কোপনস্বভাব বয়রাম্‌ সম্রাটের এ ইঙ্গিত গ্রাহ্য করিলেন না। আক্‌বর এই উদ্ধত তাচ্ছিল্যের কোন প্রতীকার করিতে না পারিয়া মনে মনে রুষ্ট হইলেন, এবং এইরূপ আরও কতকগুলি অন্যায় ও অবৈধ আচরণে * তাঁহার মন ক্রমশঃ তিক্ত হইয়া উঠিল। সম্রাটের অসন্তোষ, মাহমের অবসাদহীন চক্রান্ত, স্বীয় দলভুক্তগণের উপর নির্ব্বিচার পক্ষপাত, তাহার উপর শেখ্‌ গদাই নামক একজন শীয়াকে প্রধান ধর্ম্মাধিকরণ [সদর্‌-ই-সদর্‌] পদ প্রদান করায়, রাজদরবারের সুন্নী-সম্প্রদায় বয়রামের বিষম শত্রু হইয়া উঠিল। খান্‌ খানান্‌ স্বয়ং শীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। সুন্নীগণ অভিযোগ করিতে লাগিলেন যে, বয়রাম্‌ সাম্প্রদায়িকতা-প্রভাবে শীয়াদিগের উপর

* মাহম্‌ অনগ আক্‌বরের স্তনদা-ধাত্রী ছিলেন না। তাঁহার বংশ-পরিচয় বা স্বামীর নাম সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব। সম্প্রতি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত বেভারিজ (H. Beveridge) মহোদয় কর্ণেল হানার (Col. Hanna) নিকট একখানি পুঁথি দেখিতে পান; তাহাতে তিনি নাদিম্‌ কোকাকে মাহমের স্বামীরূপে উল্লিখিত হইতে দেখিয়াছেন। (J. R. A. S. 1899).

* 'আক্‌বরনামা'য় (iii, 161) একখানি সুদীর্ঘ ফর্ম্মানে আক্‌বর বয়রাম্‌ খাঁর দোষাবলীর কথা বিশদ্‌ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার ভাষার তীব্রতা দেখিয়া স্পষ্ট মনে হয় যে, ইহা বয়রামের কোন শত্রু কর্ত্তৃক লিখিত।

অত্যধিক অনুগ্রহ বর্ষণ করিতেছেন। ইতঃপূর্ব্বে তর্দ্দী বেগের হত্যাকাণ্ডে তিনি চঘ্‌তাই-প্রধানগণের বিরাগ-ভাজন হইয়াছিলেন। থান্ থানান্‌কে ভস্মীভূত করিবার জন্য প্রচুর ইন্ধন সংগৃহীত হইল; কিন্তু সম্রাট্ তথাপি অগ্নি-সংযোগে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। সম্ভবতঃ অভিভাবকের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিতে এখনও তাঁহার সঙ্কল্প সুদৃঢ় হয় নাই। যাহা হউক, আপাততঃ কর্ত্তব্য অবধারণে অসমর্থ হইয়া সম্রাট্ থান্ থানানের সান্নিধ্য হইতে দূরে অবস্থান করিবার জন্য, শিকার-গমনচ্ছলে যমুনা পার হইয়া আলিগড় অভিমুখে গমন করিলেন (১৯শে মার্চ্চ, ১৫৬০)।

কিন্তু সম্রাটের এই দীর্ঘসূত্রতা সূক্ষ্মদৃষ্টিশালিনী মাহমের নিকট প্রচ্ছন্ন রহিল না। তিনি দিব্যচক্ষুতে দেখিলেন, সম্রাটের চিত্ত এখনও দোলায়মান; এই সময় কোন ছলে দিল্লীতে হামীদার নিকট আনিতে পারিলে, দিল্লীর শাসনকর্ত্তা শিহাব্-উদ্দীন্ সহায়ে সম্রাটের অব্যবস্থিত চিত্ত দৃঢ়কল্প হইবার সম্ভাবনা। শিহাব্-উদ্দীন্ অনগের আত্মীয় এবং স্বপক্ষ,—ষড়্‌যন্ত্রকারিণীর মনোরথ-সিদ্ধিকল্পে দিল্লী সুরক্ষিত করিলেন।

আক্‌বর তখন সিকান্দ্রা রাও নামক স্থানে পৌছিয়াছেন। মাহম্ তাঁহাকে জানাইলেন যে, সম্রাট্ জননী দিল্লীতে অসুস্থ—শাহান্ শাহের দর্শনাভিলাষিণী। আক্‌বর সংবাদ-প্রাপ্তিমাত্রে দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন।

আক্‌বর দিল্লীতে আসিলে মাহম্, শিহাব্-উদ্দীন্ ও হামীদা তাঁহাকে অবিরত বুঝাইতে লাগিলেন যে, যতদিন স্বেচ্ছাচারী বয়রামের প্রভুত্ব থাকিবে, ততদিন সম্রাট্‌কে তাঁহার ক্রীড়নক হইয়াই থাকিতে হইবে। থান্ থানানের সর্ব্বময় আধিপত্যে দ্বিতীয় প্রভুর স্থান নাই। এইরূপ নিঃসন্দিগ্ধ যুক্তি প্রয়োগের পরেও আক্‌বরকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া মাহম্ তাঁহার ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন; বলিলেন—বয়রাম্ যখন শুনিবেন, মাহম্‌ই তাঁহাকে ছলে দিল্লীতে আনিয়াছেন, তখন তাঁহার নির্যাতন হইতে কেহই মাহম্‌কে রক্ষা করিতে পারিবে না; সে আসন্ন অশনিপাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত মাহম্‌কে মক্কা পলাইতে হইবে। অনগ সাশ্রুনয়নে সম্রাটের নিকট তীর্থগমনের অনুমতি ভিক্ষা করিলেন। কৌশলময়ী রমণীর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল না। বাদশাহ্ বুঝিলেন যে, মাহমের ত্রাস অলীক নহে। বাল্যধাত্রীর সম্ভাবিত বিচ্ছেদ-কল্পনায় সম্রাটের চিত্ত ব্যথিত হইল;—আক্‌বর মাহম্‌কে বিদায় দিতে পারিলেন না; তিনি বয়রাম্‌কে রাজকার্য্য হইতে অবসরগ্রহণের অনুজ্ঞা প্রেরণ করিলেন।

বয়রাম্ খাঁ তখন আগ্রায়। রণপণ্ডিত, রাজনীতি-বিশারদ্, প্রভুসেবাবৃদ্ধ, শতশত্রুজয়ী বীর, রমণীর কূট সংগ্রামে পরাস্ত হইলেন বটে, কিন্তু সে পরাজয় বীরের ন্যায় বুক পাতিয়া লইলেন। দুই-পুরুষের পরীক্ষিত-সেবকের সহিত এই অপরিহার্য্য সঙ্ঘর্ষে যে প্রভু ও ভৃত্য উভয়েরই হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল, তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু নবীন সম্রাট্ ভাবিলেন, এ বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। বয়রাম্ বুঝিলেন, তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, এখন কর্ম্ম হইতে তাঁহার অবসর লইবার সময় উপস্থিত—এ বিধান দৈবাধীন। এতদিন বিষয়-সেবা করিয়াছেন, এখন জীবন-সায়াহ্নে মুসলমানের চরমগতি, পরমতীর্থ মক্কা-গমনই তাঁহার পক্ষে বাঞ্ছনীয়। এদিকে থান্ থানানের সহিত সম্রাটের অকৌশলের কথা যেমন রাষ্ট্র হইল, অমনই একে একে বহু সভাসদ্ বয়রামের মজ্জমান পোত পরিত্যাগ করিয়া, রাজকৃপার নিরাপদ বন্দর আশ্রয় করিলেন। এখনও যাহারা বয়রামের পক্ষে রহিল, তন্মধ্যে শেখ্ গদাই প্রমুখ কয়েকজন তাঁহাকে বিদ্রোহী হইতে উৎসাহিত করিতে লাগিল; কিন্তু প্রভুভক্ত বীর, জীবনের অবসানে তাঁহার নির্ম্মল, সমুজ্জ্বল চরিত্রে বিদ্রোহীর কলঙ্ক কালিমা লেপনে ইচ্ছুক হইলেন না। তিনি মক্কাগমনের সঙ্কল্প স্থির রাখিয়া নাগোরে উপস্থিত হইলেন, এবং বশ্যতার নিদর্শনস্বরূপ সম্রাটের নিকট রাজচিহ্ন প্রত্যর্পণ করিলেন। তথাপি শত্রুগণ তাঁহার কার্য্যের এক অভাবনীয় বিকৃত উদ্দেশ্য আবিষ্কার করিল; মাহম্ ও শিহাব্-উদ্দীন্ সম্রাট্‌কে

বুঝাইলেন যে, বয়রামের পঞ্জাব-আক্রমণের দুরভিসন্ধি আছে। ভাবী বিপদের আশঙ্কায় শিহাব্-উদ্দীন ইতঃপূর্ব্বে দিল্লী সুরক্ষিত করিয়াছেন ; লাহোর ও কাবুল নিরাপদ করিবার সুব্যবস্থাও করা হইয়াছে। আক্‌বর, বয়রাম্‌কে অনুসরণ করিবার জন্য পীর মুহম্মদ্ নামক একজন মুল্লাকে সসৈন্যে পাঠাইলেন।

এই দুর্ব্বৃত্ত পীর মুহম্মদ্ পূর্ব্বে বয়রামেরই অনুগ্রহে সামান্য অবস্থা হইতে উচ্চপদে উন্নীত হইয়াছিল ; কিন্তু উদ্ধত প্রকৃতিবশে একবার সে স্বীয় পৃষ্ঠপোষক প্রভুর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। বয়রাম্ এরূপ দুর্ব্বিনীত, উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারের কখনই প্রশ্রয় দিতেন না ; তিনি পীর মুহম্মদ্‌কে পদচ্যুত ও নির্ব্বাসিত করেন। মুহম্মদ্ গুজরাটে ছিল ; সুযোগ পাইয়া এখন সে সম্রাটের কর্ম্মস্বীকার করিল। সম্রাট্ তাহাকে বয়রামের অনুসরণে প্রেরণ করিলেন। যে ব্যক্তি এক সময়ে বয়রামের আশ্রিত ছিল, তাহারই দ্বারা তাঁহাকে ত্বরায় ভারত হইতে বিতাড়িত করিবার অভিপ্রায় বুঝিয়া বয়রাম্ অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন। সম্ভবতঃ এই নিদারুণ অপমানে তিনি পঞ্জাবে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত করিলেন।* কিন্তু এখন ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার উপর বিরূপ ; শাম্‌স্-উদ্দীন্ মুহম্মদ্ আট্‌কা খাঁর নিকট বয়রাম্ পরাজিত হইলেন। পরাজয়ের পর বয়রামের মনে দারুণ নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। তিনি স্বীয় দুষ্কৃতির জন্য সম্রাটের মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া, নির্ব্বিঘ্নে মক্কা-গমনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। মহানুভব সম্রাট্ ক্ষমা ও প্রার্থিত অনুমতিদানে অণুমাত্র বিলম্ব করিলেন না ; কিন্তু মক্কাদর্শন বৃদ্ধের অদৃষ্টে নাই। মক্কা যাইবার পথে, তিনি গুজরাটে উপস্থিত হইলে, মুবারক্ খাঁ লোহানী নামক জনৈক আফ্‌গান্ তাঁহাকে হত্যা করে (৩১এ জানুয়ারী, ১৫৬১)। বয়রামের হত্যাব্যাপারে আক্‌বর লিপ্ত ছিলেন না ; তিনি অভিভাবকের ঋণের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার পরিবারবর্গের উপর বিশেষ অনুগ্রহ বর্ষণ করিয়াছিলেন। বয়রামের শিশুপুত্র আব্‌দুর রহীমের লালনপালনভার সম্রাট্ স্বয়ং গ্রহণ করেন, এবং কালে উপযুক্ত হইলে তাহাকে উচ্চপদ প্রদান করিয়াছিলেন।

বয়রামের পতন হইল ; কিন্তু তাহাতে যে দেশের মঙ্গল সাধিত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিবার বাসনা থাকিলেও, সম্রাট্ এখনও অব্যবস্থিতচিত্ত, আমোদ-প্রমোদানুরক্ত। রাজনীতিবিশারদ্ বয়রামের একাধিপত্য হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া, আক্‌বর স্বার্থপরায়ণা মাহমের কবলগত হইলেন।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

* বয়রামের বিদ্রোহের কারণ, দরবেশ মুহম্মদ্ খাঁকে লিখিত বয়রামের একখানি পত্রে উল্লিখিত আছে ; আট্‌কা খাঁ সম্রাট্ আক্‌বরকে যে আবেদন-পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে এই পত্রের কিয়দংশ সন্নিবিষ্ট আছে (A. N. ii, 182-5)। বয়রাম্ দরবেশ মুহম্মদ্‌কে লিখিয়াছিলেন,—"আমি সম্রাটের অনুগত ভৃত্য ; তাঁহার উপর আমার কোনরূপ ক্রোধ নাই ; কিন্তু তাঁহার উকীলগণের উপর আমি প্রতিহিংসা সাধন করিব।"

আলোচনা

"দাশু রায়ের কলঙ্ক-ভঞ্জন।"

এই বিংশ শতাব্দীতে যখন বঙ্গদেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু চিন্তাশীল কবি, লেখক ও সংস্কারক দেশের জন্য অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিতেছেন, তখন দাশরথি রায়কে দেশ সমক্ষে লোকশিক্ষক বলিয়া, কবি বলিয়া, ভক্তিরসের অবতারণাকারী বলিয়া উপস্থাপন করা বাহাদুরী ও সাহসের কার্য্য। এই বাহাদুরী ও সাহস দেখাইয়াছেন—শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বি-এ, এম্-বি, রায় বাহাদুর। তিনি বিগত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে "দাশুরায়ের কলঙ্ক ভঞ্জন" শীর্ষক এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে দাশুরায়ের কাব্যগুলি "সরস ও সুমিষ্ট ফলের বৃক্ষ স্বরূপ। ধর্ম্ম

তাহাদের মূল, ভক্তি স্কন্ধ। আনন্দ তাহাদের পুষ্পরাজি এবং লোকশিক্ষা আকাঙ্ক্ষিত ফল।"

অতঃপর সান্যাল মহাশয় দাশুরায়ের "কলঙ্কভঞ্জন" নামক কাব্য হইতে বহু অংশ উদ্ধৃত করিয়া সেইগুলির ভাষার সৌন্দর্য্য ও ভাবের সৌন্দর্য্য, চরিত্র বিশ্লেষণ, প্রেম ভক্তি শান্ত বাৎসল্য হাস্য প্রভৃতি রস-চিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই সকল প্রশংসাবাদ ipse dixit মাত্র, কোনরূপ যুক্তির উপর সংস্থাপিত হয় নাই। দাশুরায়ের এই কাব্যের অধিকাংশ সম্বন্ধে আমি দীননাথ বাবুর প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করি। আমি তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বলিতে পারিতাম যে, দাশুরায়ের কাব্যরূপ অপবৃক্ষগুলির ফল সরস ও অম্লমধুর হইলেও দেশের কুসংস্কার সেগুলির মূল, বাচালতা তাহার স্কন্ধ, আমোদ তাহার পুষ্প এবং কুশিক্ষা ও উচ্চ হাস্য তাহার ফল। কিন্তু আমি যুক্তি প্রদর্শন না করিয়া এরূপ কিছু বলিতে চাহি না। যুক্তি প্রদর্শন করিবার পূর্ব্বে সান্যাল মহাশয়ের আলোচিত কলঙ্কভঞ্জনের আখ্যানবস্তুটা সংক্ষেপে বলিব।

রাধিকা স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসের আচরণ করিয়া গোপনে কৃষ্ণকে দেহ মন অর্পণ করিয়াছিলেন। ইহা সর্ব্বজনবিদিত সংবাদ। সে জন্য তাঁহার বড় দুর্ণাম হইয়াছিল, লোকে তাঁহাকে কলঙ্কিনী বলিত। কিন্তু কৃষ্ণ নাকি ছিলেন ঈশ্বরের অবতার, সেই জন্য একদিন তাঁহাকে নির্জ্জনে পাইয়া বলিলেন, "যেমন অমৃত খাইলে রোগ হইতে পারে না, ব্রহ্মের যেমন মৃত্যু হইতে পারে না, অগ্নি জ্বালিলে যেমন শীত লাগিতে পারে না, গয়ায় পিণ্ড দিলে যেমন পিতৃপুরুষ নরকে যাইতে পারে না, দয়া করিলে যেমন ধর্ম্মনাশ হইতে পারে না, তেমনি তোমাকে আত্মসমর্পণ করায় আমার কলঙ্কিনী হওয়া উচিত নহে।" সান্যাল মহাশয়ের মতে রাধিকা, তাঁহার মকদ্দমাটা কৃষ্ণকে ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। রাধিকা বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন যে কৃষ্ণচন্দ্রের বুদ্ধিটা কিছু মোটা—ভাল করিয়া দৃষ্টান্ত দিয়া না বুঝাইলে বুঝিতে পারিবেন না। সে যাহা হউক, কৃষ্ণ সেই দিনই তাঁহার দুর্ণাম ক্ষালন বা কলঙ্কভঞ্জন করিবেন এই অঙ্গীকার করিলেন। তাহার পর তিনি অসময়ে গোষ্ঠ হইতে ফিরিয়া আসিয়া মূর্চ্ছিত হইবার ভান করিলেন। ইহাতে ব্রজধামে হাহাকার পড়িয়া গেল। মাতা যশোদা তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া রোরুদ্যমানা হইলেন। পিতা নন্দও গোষ্ঠ হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। দেবর্ষি নারদ, কৃষ্ণের কপট মূর্চ্ছা জানিয়া তামসা দেখিবার জন্য সেখানে গিয়া পঁহুছিলেন। সেখানে যাইবার সময়ে তিনি মনে মনে কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওহে করুণহৃদয়, তুমি চৈতন্যরূপ, তবে আমি তোমার অচৈতন্য রূপ দেখিতে যাইতেছি কেন? যদি তুমি বল, 'আমি স্বর্গের সমস্ত ঐশ্বর্য্য লইয়া এখন বৃন্দাবনেই থাকি,' তাহা হইলে আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করি, ভক্তের হৃদয়-মধ্যে কি সে ঐশ্বর্য্য নাই? যদি একথা তুমি বিশ্বাস না কর, তাহা হইলে একবার আসিয়া দেখ, আমার এই হৃদয় বৃন্দাবনে যশোদা, বৃন্দাদূতী প্রভৃতি সকল ঐশ্বর্য্যই আছে। আমার এই হৃদয় বৃন্দাবনে আমার ভক্তিই রাধিকা, আমার মুক্তির ইচ্ছাই বৃন্দাদূতী, আমার স্নেহই মা যশোদা, আমার পাপই গোবর্দ্ধন পর্ব্বত যাহা তোমাকে ধারণ করিতে অনুরোধ করি, আমার মনটা একটা গরু, তুমি কৃপা করিয়া বাঁশী বাজাইয়া সেই গরুটা বশ করিয়া দাও। আমার প্রেমকে যমুনাতট এবং আশাকে বটগাছ ভাবিয়া তুমি আমায় হৃদয়-বৃন্দাবনে বাস কর। রাখাল ত আমি নিজেই, সুতরাং তোমার প্রকৃত বৃন্দাবনেও যাহা যাহা আছে, আমার হৃদয় বৃন্দাবনেও সে সমুদায়ই আছে।"

এই স্তবের প্রথমাংশ পড়িয়া ইংরেজী একটা প্রার্থনার কথা মনে হয়—Paradoxical though it may appear to Thee, O Lord, it is nevertheless true ইত্যাদি। নারদও সেইরূপে অবোধ কৃষ্ণকে দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিতেছেন, তোমার আসল বৃন্দাবন আর আমার রূপক বৃন্দাবন একই বস্তু। দীনবাবু এই স্তব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "কৃষ্ণপ্রাণ নারদেরই মুখে ইহা শোভা পায়। এই যে ভক্তির সুমনোহর কাব্যচিত্র, ইহার তুলনা নাই।" লেখকের এই প্রশংসাবাদ "তুসি সে কাবল প্রভু তুসি সে কাবল" স্মরণ করাইয়া দেয়।

সে যাহাই হউক, আখ্যানটা শেষ করা যাউক। কৃষ্ণ নিজেই নিজের চিকিৎসা করিবার জন্য হরিবৈদ্য নামধারী এক চিকিৎসক সাজিয়া উপস্থিত হইলেন। পথে বৃন্দাদূতীর সঙ্গে তাঁহার অনেক রসিকতা হইল। হরিবৈদ্য আসরে আসিয়া বলিলেন, সহস্রচ্ছিদ্র একটী কলসে জল লইয়া আসিয়া সেই জল মূর্চ্ছাগত কৃষ্ণের মাথায় ঢালিলেই তিনি সারিয়া উঠিবেন; এই কার্য্য সতী ভিন্ন অন্য কোন নারী করিতে পারিবে না। জটিলা ও কুটিলা নামে দুইটী নারী, যাঁহারা কায়মনোবাক্যে সতী ছিলেন, তাঁহারা জল আনিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু পারিলেন না—সমস্ত জল পড়িয়া গেল। রাধিকা তখন সেই কলস জলপূর্ণ করিয়া আনিলেন। সেই জল স্পর্শে কৃষ্ণ ভাল হইয়া উঠিলেন। সুতরাং প্রমাণ হইল যে রাধিকাই সতী। অতএব রাধিকার কলঙ্ক ভঞ্জন হইল।

এই গল্পে যদি কোন শিক্ষা থাকে তাহা হইলে সেই শিক্ষা এই যে, ঈশ্বর সতীকে অসতী রূপে এবং অসতীকে সতীরূপে প্রমাণ করিলেন। আরও শিক্ষা এই যে, ঈশ্বর ছলনা করেন,

ভাণ করেন, দূতীর সহিত বাক্‌চাতুরী করেন। ইহাতে ঈশ্বরের যে স্বরূপ প্রকাশ পায়, তাহা শুনিলে আমাদেরই দেশের উপনিষৎকার ঋষিগণের প্রেতাত্মা কণ্টকিত কলেবর হইতেন সন্দেহ নাই।

দাশু রায়ের মনে যে একেবারে কবিত্ব ছিল না এরূপ বলা আমার অভিপ্রেত নহে। কালিদাস এক একটা বিষয়ের একটা একটা মাত্র উপমা দিয়াছেন, কিন্তু দাশুরায় এক একটা বিষয়ের ১০।১৫।২০ টা উপমার একত্র সমাবেশ করিয়াছেন। উপমা বিষয়ে তিনি কালিদাস অপেক্ষাও সৌভাগ্যশালী। ইহা ভিন্ন তাঁহার ক্ষমতা, অনুপ্রাস ও বাক্‌চাতুরীতে। তাঁহার লেখায় পাণ্ডিত্য নাই, ভাবের গভীরতা নাই, ভাষায় বিশুদ্ধি নাই, চরিত্রের বিশ্লেষণ ও ক্রমবিকাশ নাই। আহারে যেমন চাটনি, কাব্যে তেমনি দাশুরায়ের পাঁচালী—পুষ্টিকর তেজস্কর বস্তুর অভাব উভয়েই—চাটনিতেও, পাঁচালীতেও। প্রকৃত কবি এবং প্রকৃত ঋষি এক বিষয়ে একরূপ। উভয়েই সত্যদর্শী। কলঙ্ক-ভঞ্জনে সত্য দর্শনের লেশ মাত্র নাই। তবে দাশুরায় বঙ্গের বৈষ্ণবদিগকে স্থানান্তরে যে কঠোর গালি দিয়াছেন; তাহা ভাবিলে এক একবার এমন মনে হয় যে, কলঙ্কভঞ্জন বৈষ্ণব-দিগকে উপহাসাস্পদ করিবার জন্যই লিখিত হইয়াছিল। তাহা হইলে প্রবন্ধ-লেখকের সমস্ত প্রশংসাই ব্যর্থ। কিন্তু কলঙ্কভঞ্জন যে শ্লেষকাব্য নহে তাহা পড়িলেই বুঝা যায়। দাশুরায় এই কাব্যে ঈশ্বর, ঐশ্বর্য্য, স্বর্গ, ভক্তি—সংক্ষেপত দেশকালপাত্রের উপযোগিতা যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে মস্তিষ্কবান্ ব্যক্তিমাত্রেই বলিবেন যে, এসকল উচ্চ শ্রেণীর বিষয় বর্ণনা করিবার মত তাঁহার কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। তাঁহার স্বর্গেও একজন বৃন্দাদূতী থাকা চাই! তাঁহার ভক্তিরও সীমা—অনুপ্রাস।

লেখকের মতে এই "কলঙ্কভঞ্জনে" কায়-সতীত্ব অপেক্ষা উচ্চতর সতীত্বের প্রতিষ্ঠা দ্বারা লোককে আদর্শ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। কোন গৃহস্থ যদি সতীত্বের এই আদর্শ নিজ পরিবার মধ্যে প্রচলিত করেন, তাহা হইলে তাঁহার নিজের যে বিলক্ষণ "শিক্ষা" হইবে সে বিষয়ে বোধ হয় কেহই সন্দেহ করিবেন না। লেখক আরও বলিয়াছেন যে, এই কাব্যে জটিলা কুটিলার কায়-সতীত্বকে নিষ্প্রভ ও প্রতিহত করিয়া কায়মনোবাক্যের সতীত্ব-কেই সমুজ্জ্বল করিয়া দেখান হইয়াছে। লেখক কি বলিতে পারেন, তাঁহার এই উপপত্তি কাব্যের কোন্ কোন্ কথা দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে? বিচারক যেমন নথী বা রেকর্ড বহির্ভূত কোন কথা মকদ্দমার রায়ে প্রকাশ করিতে পারেন না, কাব্য-সমালোচকও তেমনি কাব্যে যে কথা নাই সেই কথা হইতে কোন উপপত্তি করিতে পারেন না। জটিলা কুটিলার যে কেবল কায় সতীত্ব ছিল, মনোবাক্যের সতীত্ব ছিল না, এবং রাধিকার যে সেইরূপ সতীত্ব ছিল, এ সংবাদ কাব্যের কোথায় আছে? যিনি রাধিকাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, রাধিকা কি কায়মনোবাক্যে তাঁহার প্রতি সতী ছিলেন? লেখক কর্ত্তৃক প্রশংসিত রাধিকার "আদর্শ সতীত্ব" হইতে ভগবান্ নারীকুলকে রক্ষা করুন।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

সান্যাল মহাশয়ের উত্তর।

প্রতিবাদ-লেখক মহাশয় রাধিকার অসতীত্ব-বাদ ঘোষণা করিতে গিয়া আরম্ভেই কেন যে তিন জন খ্যাতনামা মহোদয়ের নামোচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা বুঝিলাম না। তাঁহারা কৃষ্ণৈক-শরণা, মূর্ত্তিমতী অহৈতুকী-ভক্তি-স্বরূপিণী রাধিকার অসতীত্ব-বাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমাজের কোন্ অঙ্গের সংস্কারে "অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিতেছেন" তাহা আমার জানা কিম্বা শোনা নাই। তবে দুই এক জন নামজাদা লোকের নাম জড়াইয়া ধরিলে প্রবন্ধের গুরুত্ব এবং নিজের আত্মপ্রসাদ সম্ভাবনা, ইহা বুঝা যায়।

বলি, সাহসটা কার বেশী? শুধু বঙ্গদেশের নহে, সমস্ত ভারতবর্ষের কোটী-কোটী নরনারী যুগযুগান্তর ধরিয়া যে রাধিকাকে কৃষ্ণের বামপার্শ্বে স্থাপন করিয়া পরম ভক্তিভাবে যুগলমূর্ত্তির পূজা করিয়া আসিতেছে, শিক্ষিত হিন্দু-সন্তান হইয়া সেই রাধিকাকে "অসতী" বলিয়া ঘোষণা করিতে কোমর বাঁধা—ইহাই ত সাহসের কর্ম্ম। এক কালে পাদরীরা ঐরূপ করিয়াছেন, সত্য; কিন্তু কোনও স্থিরমতি হিন্দুসন্তান মুখে ও কালি-কলমে এরূপ সাহসের কর্ম্ম করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

কৃষ্ণতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্ব কিছুমাত্র না জানিয়া কিম্বা জানিতে চেষ্টা না করিয়া কৃষ্ণলীলায় শুধু হস্তক্ষেপ নহে, পদক্ষেপ পর্য্যন্ত করিতে দ্বিধা না মনে করা অপেক্ষা সাহসের কর্ম্ম আর কিছু আছে বলিয়া বোধ হয় না। তাই বলিতেছি, সাহসের কর্ম্ম আমার, না তাঁহার?

প্রতিবাদটী আগাগোড়া বিদ্বেষ ও ব্যঙ্গভাবে লিখিত। যাঁহারা কলঙ্কভঞ্জনে নারদের প্রশান্ত ভক্তিরসপূর্ণ চিত্রটি ভক্তির চক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহারা দেখিবেন যে, প্রতিবাদ-লেখক মহাশয় সেই নারদকে কিরূপ বিকৃত করিয়া

দেখাইয়াছেন,—আর নারদের মুখে সেই লোক-প্রসিদ্ধ ভক্তি-রসাত্মক গানটী "হৃদি বৃন্দাবনে বাস কর যদি, কমলাপতি"—কিরূপ বিকৃত করিয়া বিবৃত করিয়াছেন!—বোধ হয়, সার্কাসের ভাঁড়েও এতটা পারিত না! যিনি ধর্ম্ম-সাহিত্য লইয়া, তাহার গোড়ার কথা না বুঝিয়া, ঐরূপ বিকৃত-ভাবে আলোচনা করিতে দ্বিধা মনে করেন না, তাঁহার কথার উত্তর দিতে প্রবৃত্তি হয় না;—দিলেও তাহাতে ফল নাই।

কৃষ্ণ যদি একজন সাধারণ মনুষ্য এবং রাধিকা একজন সাধারণ রমণী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের লীলা কখনও ধর্ম্মের বা ধর্ম্ম-সাহিত্যের বস্তু হইত না—হইতে পারিত না। পণ্ডিতপ্রবর লেখক মহাশয় কিন্তু উহার উপরে উঠিতে পারেন নাই। অথচ সমাজ-সংস্কার ও দেশের উপকার রূপ মহৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়াই যে কাব্য খানির আলোচনা করিতে, অক্লান্ত না হউক, কতক পরিমাণে পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছেন, সেই কাব্যে আগাগোড়া এই মুল কথাটি ধ্বনিত যে, কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ হরি, এবং রাধিকা "গোবিন্দপ্রিয়া গুণময়ী গোলোক-বাসিনী।" এই তুইটি কথা মানিয়া না লইলে কৃষ্ণলীলা বুঝিতে বা বুঝাইতে পারা যায় না। প্রসঙ্গাধীন কাব্যে ঐ মূল তত্ত্ব-কথা টুকু নিরন্তর ধ্বনিত হইয়া থাকিলেও, লেখক মহাশয় তাহা বেমা-লুম বাদ দিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন। এরূপ প্রতিবাদের উত্তর দিব কি করিয়া? কৃষ্ণলীলার যাহা অস্থিমজ্জা, তাহা না মানিয়া লইলে কৃষ্ণলীলাত্মক পুরাণাদি এবং তদবলম্বনে রচিত কাব্যাদি অবোধ্য প্রহেলিকা হইয়া দাঁড়ায়।

সমাজসংস্কারকামী লেখক মহাশয় ঐ অস্থিমজ্জাটুকু মানি-বেন না—কেবলমাত্র "যুক্তি" সম্বল করিয়া উহা বুঝিতে গিয়াছেন বলিয়াই মহাপঙ্কে নিমজ্জিত হইয়াছেন। তিনি যাহা বাদ দিয়াছেন বা যাহা মানিতে রাজী নহেন, তাহাই যে এ বিষয়ের সার যুক্তি, ইহা তাঁহাকে বুঝান অসম্ভব। ভক্তিকে কখনই যুক্তির উপরে দাঁড় করান যায় না। ভগবদ্ভক্তির মুলে ভগবদ্বিশ্বাস থাকা চাই। রাধিকা ভগবদ্বিশ্বাসেই কৃষ্ণের প্রতি একান্ত অনুরক্তা হইয়াছিলেন. কৃষ্ণকে স্বামিত্বে বরণ করিয়াছিলেন—পার্থিব কুল-মান-লজ্জা সব তুচ্ছ করিয়া কৃষ্ণে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই ভগবৎপ্রেম বুঝাইবার জন্যই পৌরাণিক কৃষ্ণলীলা। ভগবৎপ্রীতির বশে রাধিকার সর্ব্বস্ব-ত্যাগ কাব্যে দেখাইতে হইলে, প্রথমে তাঁহাকে "সর্ব্বস্ব" দিতে হয়, পরে সর্ব্বস্ব "ত্যাগ" করাইতে হয়। পুরাণ-কবি তাহাই করিয়াছেন। দাশরথি তাহাই অবলম্বনে কাব্য-রচনা করিয়াছেন; আর এই অধম তাহারই মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। রাধাকে "অসতী" বলিলেই যে পুরাণ-ব্যাখ্যা হইল, ইহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসে না; আর দাশরথিকে এবং আমাকে গালাগালি দিলেই যে, কৃষ্ণলীলার অসারত্ব প্রমাণিত হইল, তাহাও ত বোধ হয় না।—এই যে কোটী-কোটী নরনারী রাধাকৃষ্ণের পূজা করিতেছেন, অগণ্য বৈষ্ণব মহা-পুরুষগণ কৃষ্ণলীলার রসাস্বাদনে আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছেন ও করিতেছেন, শ্রীচৈতন্যদেব সংসার ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়াছিলেন;—উহাঁরা সকলেই ভ্রান্ত, কেবল "রাধা অসতী" এই কথাই পরম "সত্য"—ইহা যদি "যুক্তি" সঙ্গত হয়, তবে সে যুক্তি বোধোদয়ে বর্ণিত তিন প্রকার পদার্থের অতীত কোন এক প্রকার পদার্থ হইবে; কিন্তু আমার সম্পূর্ণ বোধাতীত এবং ধারণাতীত।

আমি কাব্যের ব্যাখ্যা অর্থাৎ আমার মতে যে ব্যাখ্যা সমী-চীন, তাহাই করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ব্যাখ্যা কি "নথিতে" থাকে, না, গাছে ফলে? কবি কাব্য লেখেন; ব্যাখ্যাকার তাহা হইতে ব্যাখ্যা নিষ্কাষিত করেন। আমার ব্যাখ্যা ভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু লেখক মহাশয়ও ত অন্য কোন "যুক্তি"সঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেন নাই।

তাঁহার দৃষ্টি কেবল "অসতী"র দিকে। রাধিকাকে "অসতী" বলিতে পারিলেই যেন তাঁহার পরম পুরুষার্থ লাভ। উপনিষৎকারদিগের সহিতও, অন্তত তাঁহাদের "প্রেতাত্মা"দের* সহিত লেখক মহাশয়ের ঘনিষ্ঠতা আছে, দেখিতেছি। কৃষ্ণ-লীলা শুনিয়া তাঁহাদের সেই বিকট "প্রেত কলেবর" কণ্টকিত হইয়া উঠিবে শুনিয়া, দাশরথির কি, তিনি ত অনেকদিন মরিয়া পড়িয়াছেন, এখন আমার দেহ যে কণ্টকিত হইয়া উঠিল, তাহার উপায় কি?

কবি ভারতচন্দ্র কি কম দুঃখে বলিয়াছেন—"যিনি অখিলের পতি, তাঁরে বলে উপপতি, পোড়ালোক না বুঝে বিচার।" "পোড়ালোক" চিরকালই বিদ্যমান। "হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কংস, শিশুপাল, জটিলা-কুটিলা সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালেই আছে এবং থাকিবে। দাশরথিও বলিয়াছেন—

"(এখন) বাঙ্গলাটা করলে অংশ,
দশ হাজার জোটে কংস,
অন্যদেশ ঐক্য হ'লে লক্ষ হতে পারে।

---

* এখানে "প্রেতাত্মা"কে "বঙ্গানুবাদ" বলিয়া কেহ যেন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া না বসেন।—লেখক

কিরূপে ভার ধরেন পৃথ্বী,
পৃথিবীর বুঝি ঘৃণা-পিত্তি
লোপাপত্তি হয়েছে একেবারে ॥"

চেয় হয়েছে, আর "উপপত্তি"তে কাজ নাই। ভক্তিতত্ত্বের কথা বা কবিত্বের কথা যুক্তির গ্রাহ্য নহে। একই প্রকারের দৃষ্টিতে সকল বিষয়ের তথ্যাবগতি হয় না। কিম্বা একই স্থানে দাঁড়াইয়া সকলদিক লক্ষ্যীভূত হয় না। এই জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ লোচনের প্রয়োজন; লোচনহীন হইয়া কোনও বিষয়ের আলোচনা করিলে তাহা কিম্ভূত কিমাকার হইয়া উঠে।

লোচনহীনতার একটা উদাহরণ দিই। এই প্রতিবাদে লেখক বিদ্রূপের ভাষায় বলিয়াছেন যে, "কোন গৃহস্থঘরে রাধার আদর্শে সতীত্ব শিক্ষা দিলে, সে গৃহস্থের বিলক্ষণ শিক্ষা হইবে, সে বিষয়ে বোধ হয় কেহই সন্দেহ করেন না।" এখানে লেখকের লোচন ভগবান কৃষ্ণের দিকে নহে; তাঁহার দৃষ্টি অন্য দিকে। এই যে ভারতবর্ষে গ্রামে-গ্রামে, নগরে-নগরে, গৃহস্থের ঘরে ও দেবমন্দিরে রাধাকৃষ্ণের পূজা হইতেছে, এ দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই—তাই লিখিয়াছেন—কোন গৃহস্থ "যদি সতীত্বের এই আদর্শ নিজ পরিবার মধ্যে প্রচলিত করেন।" রাধিকার সতীত্ব প্রচলিত করিতে গেলে যে "ভগবান" চাই, সেদিকে লেখকের দৃষ্টি নাই। অন্তরে ভগবানের প্রতি রাধিকার ন্যায় মনপ্রাণ সমর্পণ—ইহা যদি কোন গৃহস্থঘরে প্রচলিত হয়, তখন সেই গৃহ যে স্বর্গ হইবে, তাহা ধারণা করিতে সাধারণ লোকেরও বেশী কাঠ খড়ের দরকার হয় না। অথচ ইহা তাঁহার ধারণাতেই আসিল না।

লেখক মহাশয় বলিয়াছেন—"জল আনিল" আর অমনি "সতী হইয়া গেল।" হয়ত, তিনি কোন্ দিন বলিয়া বসিবেন "আগুনের মধ্যে থাকিয়া পুড়িল না, আর অমনি সতী হইয়া গেল।" "ব্রাহ্মণে শাপ দিল, আর অমনি রাজা পূর্ব্বকথা সব ভুলিয়া গেল।" কবিরা কোন্ কাব্যগত প্রয়োজনে এরূপ অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করেন, তাহা বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া, কেবল মাত্র তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিলেই "বীরত্ব" হয় না। তাহা করিতে গেলে শুধু দাশরথি নহে, অনেক মহারথীদিগকেই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিতে হয়।

লেখক স্পষ্টতঃ "অবতার মানি না" একথা লেখেন নাই। তবে অবতার সম্বন্ধে তাঁহার ধারণার যে আভাস দিয়াছেন, তাহা বিচিত্র। অবতার অন্তরঙ্গের সঙ্গে বাক্‌চাতুরী বা হাস্য-পরিহাস করিবেন না, গূঢ় এবং সদুদ্দেশ্য থাকিলেও লোক-সুলভ কোনও প্রকার ব্যবহার বা আচরণ করিবেন না; অর্থাৎ তিনি নিরীহ জড়ভরতের মত বসিয়া থাকিবেন, কথা কহিতে হইলে কেবলমাত্র নীতি-কথাই কহিবেন—গান করিতে হইলে বড় জোর "মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর" গাহিবেন, দুর্দ্দান্তকে দমন করিতে হইলে ধনুর্ব্বাণ বা চক্রের পরিবর্ত্তে কেবল "যুক্তি" অবলম্বন করিবেন এবং উপযুক্ত যুক্তি না দেখাইতে পারিলে তিনি শিষ্টেরও সহায় হইবেন না!—এরূপ অবতার আমার ধারণায় আসে না। অবতারে লৌকিকতার ও অলৌকিকতার সংমিশ্রণ, ইহাই ত দেখিতে পাই। অবতারের লৌকিকতা ঘৃণা করিব এবং অলৌকিকতা বিশ্বাস করিব না, তাহা হইলে অবতার বেচারী দাঁড়ায় কোথায়!

যেমন ভগবানের বেলায়, তেমনি ভক্তের বেলায়। ভগবানকে যাহারা অন্তরঙ্গ রূপে দেখিয়াছেন, ভগবানের প্রতি তাঁহাদের ব্যবহারও তদনুরূপ—আব্‌দার অভিযোগ কখন-কখন নিতান্তই অদ্ভুত (অবশ্য লৌক-চক্ষে)। আমাদের পুরাণ-সাহিত্য ইহার ভুরি-ভুরি উদাহরণে পূর্ণ। লেখক মহাশয় পুরাণকে ধর্ম্ম-সাহিত্য বলিয়া মানিবেন না—কিন্তু "সাহিত্য" ত বলিতেই হইবে এবং সাহিত্যের দিক দিয়াও উহা আলোচনার বিষয়, তাহা তিনি না বলুন, অনেকেই বলিবেন। পুরাণ ছাড়িয়া আধুনিক ভক্ত রামপ্রসাদের কথাই ভাবুন না;—

"এবার, কালী তোমায় খাব।"

প্রতিবাদকারী মহাশয় ভাবিবেন—কি ভয়ানক! ভয়ানকের ভয়ানক! একে নিজের মা থাকিতে ঈশ্বরকে "মা" বলিতেছেন' পার্থিব যুক্তির চক্ষে মাতৃদ্রোহিতা, তাহার উপরে আবার "তোমায় খাব!" নরভোজী ত বাপের ঠাকুর—এ যে মাতৃ-ভোজী! সমাজে এ শিক্ষা প্রচলিত হইলে মাতৃকুল নির্ম্মূল হইয়া যাইবে। অতএব "যুক্তি" বলে, রামপ্রসাদকে পাগ্‌লা গারদে পাঠান উচিত ছিল; ভক্তি বলে, রামপ্রসাদ জগজ্জননীর ক্রোড়ে স্থান পাইয়াছেন; যুক্তি বলে—নিজের বাপ থাকিতে ভগবানকে বাপ বলিলে নিজ জননীর অবমাননা ও পিতৃদ্রোহিতা হয় এবং তাঁহাতে আদর্শ-পিতৃত্ব আরোপ করিলে, সে শিক্ষায় সংসারে পিতৃদ্রোহিতা বাড়িয়া উঠিবে এবং 'কোন গৃহস্থের ঘরে ঐরূপ শিক্ষা প্রচলিত হইলে, পিতার যথেষ্ট "শিক্ষা" হইবে'; যুক্তি বলে কোনও নারী নিজের স্বামী থাকিতে ঈশ্বরকে স্বামী-ভাবে ভজনা করিলে, তাহাকে "অসতী" বলিব; ভক্তি বলে—যিনি সকলের পিতামাতা, তিনিই ত প্রকৃত পিতামাতা, যিনি ব্রহ্মাণ্ডময়ী প্রকৃতির একমাত্র স্বামী, তিনিই ত প্রকৃত স্বামী। যুক্তি সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ। সুতরাং সেই সীমার মধ্যে তাহার কথা খাটিতে পারে। কিন্তু ভক্তির সীমা নাই।—যেখানে হৃদয়ের কথা সেখানে যুক্তির অধিকার নাই। ঈশ্বরকে পিতৃ-

মাতৃ জ্ঞান করিয়া কোথাও সংসারে পিতৃমাতৃদ্রোহিতা বাড়িয়াছে কি? তবে ঈশ্বরকে স্বামী-জ্ঞান করিলে, ভয় পাও কেন? যুক্তি দ্বারা তুমি কামের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিতে পার এবং তাহাতেই স্বত্ব বজায় রহিল, ভাবিতে পার। কিন্তু যুক্তি দ্বারা প্রেমের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিতে পার কি? অঙ্কশাস্ত্রের সহায়ে প্রেম—equationএর unknown quantityটি কেহ কখনও নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিয়াছেন কি? ভগবৎপ্রেম প্রেমের প্রেম, প্রেমের পরাকাষ্ঠা, যুক্তির হাল যেমন করিয়াই নাড়, তাতে "পানি পাবা না।"

প্রতিবাদ-লেখক মহাশয়ের রসবোধও তাঁহার সতীত্ব-বোধের অপেক্ষা কম নয়; বরং বেশী। কলঙ্কভঞ্জনের পালাটি দাশরথি বৈষ্ণবদিগকে উপহাস করিবার জন্যই রচনা করিয়াছেন, লেখক মহাশয় এই "বোধ" করেন। শুধু "বোধ" করিয়াই ক্ষান্ত নহেন, দাশরথির লেখা হইতেই তাহা "প্রমাণ" করিতে পারেন। যেহেতু দাশরথি অন্যত্র বৈষ্ণব-নিন্দা করিয়াছেন, সেই হেতু তাঁহার কৃষ্ণলীলাত্মক পালা উপহাসাত্মক। ইহার নাম "যুক্তি" এবং ইহার নাম "প্রমাণ"। দাশরথি তাৎকালিক ভণ্ড বৈষ্ণবদিগকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন, এ কথাটি লেখক মহাশয় দেখিলেন না—কেন না, it does not serve his purpose। দাশরথি কিন্তু এ কথাটি বারম্বার বলিয়া লোককে সাবধান করিয়াছেন। যাহা হউক, কলঙ্কভঞ্জনের এই ঔপহাসিক ব্যাখ্যাটি বড়ই উপভোগ্য। ইহার উপরে আর কোন কথা বলিয়া, উহার রসভঙ্গ করিতে চাই না।

অবশেষে লেখক মহাশয় নারীকুলকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবানের নাম লইয়াছেন—অর্থাৎ ভগবান যেন এতদিন তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা বা ঔদাসীন্য করিতেছিলেন—এখন লেখকের প্রবন্ধটি পড়িয়া তিনি কর্ত্তব্য বিষয়ে সচেষ্ট হউন। (এ ব্যাখ্যাটি শিখিলাম, লেখক মহাশয় কৃত কৃষ্ণের কাছে রাধিকার নিবেদনের ব্যাখ্যা হইতে। ইহার জন্য আমি লেখক মহাশয়ের কাছে কৃতজ্ঞ)। স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ভগবানের নাম লওয়া আমার অভ্যাস নহে। আমি যখন রাধিকার সতীত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছি, তখন আমার কথাই বা তিনি (যদি কৃষ্ণ ভিন্ন আর কেহ হয়েন) শুনিবেন কেন? তবে আমার ভয় হইয়াছে, পাছে লেখকের এই রচনা পড়িয়া বঙ্গের নরনারীকুল রাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তিগুলি ভাঙ্গিয়া জলে বিসর্জ্জন করেন এবং পটগুলি পোড়াইয়া ফেলেন। এই ভয়েই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি লিখিলাম। যদি ইহার পরে বঙ্গের কোন গৃহে বা কোন মন্দিরে একটি মাত্রও রাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলেই আমার এই ক্লান্ত শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

শ্রীদীননাথ সান্যাল।

কোচবিহারে শিকার

সে আজ প্রায় ৮।৯ বৎসরের কথা, তখন আমি কোচবিহারে বি-এ পড়ি। সেই সময় একবার কোচবিহারের পরলোকগত মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের সহিত গারোদহাট অঞ্চলে শিকারে যাইবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল।

স্বর্গীয় লোকপ্রিয় মহারাজার বা তাঁহার শিকার সম্বন্ধে কিছু বলিবার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ তাঁহার ও তাঁহার শিকারের কথা ভারতের, এমন কি সভ্য জগতের অনেকেই বিশেষরূপ অবগত আছেন। তবে গারোদহাট নামক স্থানটীর বিষয় কিঞ্চিৎ বলিবার আবশ্যকতা আছে।

গারোদহাট কোচবিহার হইতে ২৬ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। এই স্থানে ব্রিটিশ, কোচবিহার ও ভোটান এই তিন রাজ্যের সীমানা আসিয়া মিলিত হইয়াছে। লোকের বসতি খুব কম, জঙ্গলই বেশী। এখানে মহারাজের একটী রিজার্ভ ফরেষ্ট আছে। এককালে গারোদহাটকে গণ্ডারের জন্মভূমি বলা যাইত, কিন্তু এখন গণ্ডার নাই বলিলেই হয়, অন্য জন্তুও কমিয়া গিয়াছে। কয়েক বৎসর একাদিক্রমে শিকারের এই ফল।

আমার অবসর না হওয়ায়, মহারাজ গারোদহাট যাইবার কয়েকদিন পরে আমি তাঁহার অনুগমন করি। একদিন সন্ধ্যা বেলায়, নানারূপ জল্পনা কল্পনার পর

তৎপর দিনই রওনা হইব স্থির করিয়া ফেলিলাম। কাষেই রাত্রি ৯ টার সময় বাইসিকেলে আলো লাগাইয়া সহর হইতে ২।৩ মাইল দূরে অবস্থিত পিলখানায় গিয়া, মাহুতদের ভোর ৪ টার সময় আমাকে আনিবার জন্য একটী হস্তী বাসায় লইয়া যাইতে বলিয়া আসিলাম। বাসায় ফিরিতে রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটা বাজিয়া গেল।

বাসায় আসিয়াই তাড়াতাড়ি আমার ছোট বাক্সটী গুছাইয়া লইলাম। তখন চৈত্র মাসের শেষ; গরম হইবে বলিয়া শীত বস্ত্র কিছুই সঙ্গে লইলাম না।

প্রথমতঃ রাত্রি থাকিতে সামান্য জলযোগ করিয়া যাওয়ার কথাই ঠিক ছিল, কিন্তু পরে অতি প্রত্যূষে আহারাদি সমাপন করিয়া রওনা হইব স্থির করিলাম। আমি স্বভাবতঃ একটু বেলা করিয়া উঠি কিন্তু সেদিন আমার উৎসাহ দেখে কে—ছয়টা বাজিবার পূর্ব্বেই আমি একেবারে প্রস্তুত। ভোর বেলায় হাতী আসিবার কথা ছিল কিন্তু প্রায় আটটা বাজিতে চলিল, তখনও হস্তীর দেখা নাই। আমার মন যে কতটা চঞ্চল হইয়া উঠিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। যাহা হউক, ৮টা বাজিতে কয়েক মিনিট বাকী আছে এমন সময়—শ্যামলাল * আসিয়া দর্শন দিলেন।

গদির উপর তোষক পাতিয়া একপাশে বাক্স ঝুলাইয়া সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক ঠিক আটটার সময় রওনা হইলাম। আমার বালক ভৃত্য হরিপদ খাদ্যপেয় দ্রব্যাদি লইয়া সঙ্গে চলিল।

৮॥ টার সময় পিলখানায় উপস্থিত হইলাম। তথা হইতে আর কতগুলি হস্তী আমাদের সঙ্গ লইল। সেগুলি পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত থাকায় আমাদের আর বিলম্ব করিতে হয় নাই। সূর্য্যবাবুর ওরফে স—সাহেবের লোক আমাদের পথ প্রদর্শন করিতে লাগিল।

পিলখানা হইতে সোজা পথ দিয়া গারোদহাটের রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। গায়ে সাদা সার্ট, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, তাহাতে আবার প্রবল বেগে বাতাস বহিতে-ছিল—সুতরাং শীতে বেশ কষ্ট পাইতে লাগিলাম। কিন্তু কি করিব অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি, তখন গরম কাপড় কেন আনি নাই বলিয়া আপশোষ করিলে কোনই ফল হইবে না।

শুনিলাম, গারোদহাট যাইবার পথ, মহারাজের মোটর গাড়ী যাইবার জন্য কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছে। রাস্তাটী ডবল—অর্থাৎ মোটর যাইবার জন্য একটি উচ্চ ও ভাল রাস্তা এবং তৎপার্শ্বেই গরুর গাড়ীর জন্য অপর একটি ঘোর কর্দ্দমাক্ত পথ। ভাল মন্দের এমন পাশাপাশি সমাবেশ বড়ই চমৎকার, বড়ই শিক্ষাপ্রদ।

আমরা গারোদহাটের রাস্তায় ঘণ্টা বাজাইয়া গজেন্দ্র গমনে চলিতে লাগিলাম। বেলাও বাড়িতে লাগিল এবং আমরাও ঘণ্টায় প্রায় ৩½ মাইল বেগে ক্রমে কতকগুলি অজ্ঞাতনামা খাল এবং কালজানি, রায় ডাক ও জোরাই নামক তিনটী ক্ষুদ্র নদী পার হইয়া দূর হইতে দূরান্তরে যাইয়া পড়িতে লাগিলাম।

মহারাজ মোটরে গিয়াছিলেন। নদী ও খাল গুলিতে তজ্জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। দূর হইতে দ্রুতগামী হাওয়াগাড়ীকে জানাইবার জন্য নদী এবং খাল-গুলির উভয় পার্শ্বস্থিত বড় বড় বাঁশে লাল নিশান প্রদত্ত হইয়াছিল। নদীতে পুল না থাকায় দুইপার ঢালু করিয়া কাটিয়া ও নদী গর্ভে মাটী ফেলিয়া মাচান-বাঁধিয়া নৌকার সহিত সমান উঁচু করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এইরূপ ভাবে নৌকায় তুলিয়া মোটর খানিকে পারাপার করা হইত।

বেলা প্রায় দুই ঘটিকার সময় আমরা কালজানি নদী পার হইয়া কথঞ্চিৎ সমৃদ্ধিশালী এক বস্তিতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। রাস্তার ধারে একটী পাঠশালা, একখানি ডাকবাঙ্গলা এবং কতগুলি দোকান ঘর অবস্থিত। এই স্থানে জলযোগ সমাধা করিয়া লওয়া যাইবে স্থির করিয়া নিকটস্থ সুশীতল ছায়াপ্রদ এক মনোরম স্থানে হস্তী হইতে অবতরণ করিলাম। অতগুলি হস্তী এক সঙ্গে দেখিবামাত্র কৌপিনধারী চাষার ছেলেরা "হাতীরে হাতী—একটা হাতী, দুইটা

* একটী হস্তীর নাম।

হাত্তী তিনটা হাত্তী হুগ্‌গুই ম্যালা" * বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে আমাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। বয়স্কগণ অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে "রাজোয়াড় হাত্তী" (ষ্টেটের হাতী) বলিয়া নিজেদের ভিতর গম্ভীরভাবে কি আলাপ করিতে করিতে সসম্ভ্রমে দূরে দাঁড়াইয়া আমাদের নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এমন কি মস্তকে অপরিমিত সর্ষপতৈল প্রদান-কারী পাঠশালার বালকগণকে গুরু মহাশয়ের প্রবল বেত্রদণ্ড আর কিছুতেই আটকাইয়া রাখিতে পারিল না। শ্লেট ও কেতাব বগলে লইয়া তাহারাও কলরব করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। অল্প-ক্ষণের মধ্যে সেখানে নানারকমের অনেক লোক জমিয়া গেল। শতসহস্র কৌতূহলী চক্ষুর সম্মুখে জল-যোগ করিতে একটু সঙ্কোচ বোধ করায় একটি বৃক্ষের অন্তরালে গিয়া আমরা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে প্রবৃত্ত হই-লাম। মাহুতেরাও তাহাদের যথাসম্বল খাদ্যাদির সদ্ব্যবহার করিল। বলা বাহুল্য হাতীগুলিও বাদ গেল না। তাহারাও এই অবসরে নিকটবর্ত্তী আনারসের জঙ্গলে নিজেদের যৎকিঞ্চিৎ টিফিন চালাইতে লাগিল। আমার যখন সেদিকে লক্ষ্য পড়িল তখন অতবড় আনারসের জঙ্গলটী প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে।

তথায় কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর আবার আমরা চলিতে লাগিলাম। এখন আমরা কোচবিহার হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। লোকালয় ক্রমেই বিরল হইতে লাগিল। চারিদিক জলশূন্য, চারিদিকে জনমানবের চিহ্ন শূন্য, পশুপক্ষীর পর্য্যন্ত কোন সাড়া শব্দ নাই—কেবল জঙ্গল, কেবল জঙ্গল। আমরাই মাত্র কয়েকটি প্রাণী এই নির্জীব দেশের সজীবতা সম্পাদন করিতেছিলাম।

বেলা যখন প্রায় চারিটা তখন আমরা এক চটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কয়েকখানি বড় বড় টিনের ঘর ও কয়েকটী দোকান দেখা গেল। টিনের ঘরের বারান্দায় বসিয়া কতকগুলি মাড়োয়ারী নিজেদের মধ্যে "গেডেবেডে গেডেবেডে" করিয়া সম্ভবতঃ ব্যবসায় সংক্রান্ত কোন বিষয় লইয়া তর্ক করিতেছে। ধন্য তুমি মাড়োয়ারী, ধন্য তোমার বাণিজ্যস্পৃহা! লোটা কম্বল পিঠে বাঁধিয়া তুমি না গিয়াছ এমন স্থান নাই। বাঙ্গালী ঘরে বসিয়াও এই দূর হইতে আগত তোমার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে অক্ষম।

এখান হইতে একটু অগ্রসর হইয়া আমরা অদূরে শিকার ক্যাম্প দেখিতে পাইলাম। জঙ্গলাকীর্ণ সমুচ্চ ক্ষেত্রে শ্বেতবর্ণ তাম্বুগুলি এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া স্থিরভাবে দাড়াইয়া রহিয়াছে।

সাড়ে চারিটার সময় ক্যাম্পে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ক্যাম্প-বাবু সমাদর করিয়া লইয়া গিয়া তাঁহার তাম্বুতে বসাইয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া স্থানটির নৈসর্গিক শোভা নিরীক্ষণ করিতেছি, এমন সময় আমার জন্য জল খাবার আসিয়া উপস্থিত হইল। ট্রে-খানি চায়ের উপাদান কমলা লেবু, আপেল, আঙ্গুর প্রভৃতি সুপক্ক ফল এবং নানাপ্রকারের বিস্কুট ও কেক ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। এই সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যাপী হস্তী আরো-হণের পর এই রকম জলযোগ যে কিরূপ লোভনীয় তাহা পাঠককে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না।

আহারান্তে একটু পরিভ্রমণ করিবার জন্য বাহির হইলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ক্রমে প্রত্যেক তাম্বু, লণ্ঠন ও টেবিল ল্যাম্পের এবং ছাউনির সমস্ত হাতা ল্যাম্প-পোষ্টের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে মহারাজ ও অনুচরবর্গ শিকার হইতে ফিরিয়া আসিলেন; জিজ্ঞাসায় জানিলাম সেদিনকার শিকার একটি বড় "ইন্দুর"—খরগোস ভ্রমে তাহাকে মারা হইয়াছে। ৩০।৪০টী হাতী, ৬।৭জন শিকারী, হাজার দেড়হাজার টাকা মূল্যের ভাল ভাল ১০।১৫টী বন্দুক, এই সব লইয়া সারাদিন পরিশ্রমের ফল হইল কি না মস্ত একটা "ইন্দুর।" ইহাকেই বলে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।

* হাত্তী=হাতী। হুগ্‌গুই=ঐ দেখ। ম্যালা=অনেক।

সে রাত্রির মত সাধারণ তাম্বুতেই আমার শয্যা রচিত হইল। শয়নের অব্যবহিত পরেই গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন হইলাম।

পরদিন প্রাতে আমার জন্য একটি পৃথক তাম্বু নির্দ্দিষ্ট হইল। প্রত্যেক নিমন্ত্রিতের জন্য পৃথক্ পৃথক্ তাম্বু এবং সেগুলি খাট বিছানা টেবিল চেয়ার আয়না আল্‌না এবং গোসলখানার সরঞ্জাম ইত্যাদি দ্বারা সুন্দররূপে সজ্জিত।

সর্ব্বপ্রথমে বাড়ীতে একখানি পত্র লিখিয়া, আমাদের ছাউনীটি বিশেষরূপে দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। যাহা দেখিলাম তাহা অতি সুন্দর, অতি চমৎকার। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের এমন মনোহর স্নিগ্ধ দৃশ্য ইতিপূর্ব্বে আর কখন আমার নয়নপথে পতিত হয় নাই। উত্তরে হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী গলদেশে অসংখ্য ঝরণার উজ্জ্বল মালা পরিয়া সগর্ব্বে বড় বড় নীলমস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান, পাদদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া সবুজ বনরাজি সমতল ক্ষেত্র পর্য্যন্ত স্তরে স্তরে নামিয়া আসিয়াছে, আবার ক্যাম্পের অনতিদূরে স্বচ্ছসলিলা ক্ষীণদেহা জোরাই নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া দ্রুতবেগে প্রবাহিতা। চারিদিকে যতদূর দেখা যায়, কেবলই জঙ্গল—চক্রবাল রেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

এ দিকের জঙ্গলের বিশেষত্ব এই যে, ইহা নল খাগড়ার ন্যায় কেবল একপ্রকার ঘাসের জঙ্গল। এই ঘাস স্থানে স্থানে এত উচ্চ যে হাওদা সমেত হস্তী তাহাতে অনায়াসেই তলাইয়া যায়। গাছপালার বিশেষ সংশ্রব নাই, মধ্যে মধ্যে দুই চারিটি খয়ের বা সিমুল বৃক্ষ দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। অবশ্য ইতস্তত: বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত দু'একটি শাল বনও দেখিতে পাওয়া যায়।

আমাদের শিবির দুই অংশে বিভক্ত। জোরাইয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম পারে কিঞ্চিৎ দূরে মুচি মেথর ও মাহুতদের ক্যাম্প এবং উত্তর-পূর্ব্বপারে ঠিক নদীর ধারে ক্যাম্পের অপর অংশ অবস্থিত। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে জোরাইয়ের এই দুই কূলের মধ্যে কোন প্রকার সামঞ্জস্য নাই—উত্তর-পূর্ব্ব তট দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে প্রায় ১০।১২ ফিট অধিক উচ্চ। জানি না—এই জন্য গিরিকন্যা ক্ষুদ্র জোরাইকে কোনও রূপ গঞ্জনা ভোগ করিতে হয় কি না। যাহা হউক, বড়র আদর সকল সময় সর্ব্বত্রই হইয়া আসিতেছে, তাই মহারাজ ও তাঁহার সহচরবর্গ, দুইজন ডাক্তার সায় ডাক্তারখানা, ক্যাম্পের কর্ম্মচারী এবং অনুচরবৃন্দ সশস্ত্র প্রহরিগণ সকলেই এই বড়রই পক্ষ অবলম্বন করিলেন। নগ্নদেহ লম্বোদর শুভ্র যজ্ঞোপবীতধারী ঘর্ম্মাক্তকলেবর পবিত্র পাচক ব্রাহ্মণ এবং গুরুবেশধারী কৃষ্ণগুম্ফ শুভ্রদশন ক্ষীণ কটি ছিন্ন পাদুকা পরিহিত বাবুর্চি—এমন কি ধোপা নাপিত পর্য্যন্ত নিজেদের ভিতর জাতিগত পেশাগত নানা প্রকার বিষম পার্থক্য থাকা সত্বেও এই বৃহৎ পূজায় যোগদান করিয়াছিল।

শিকার।

বেলা প্রায় ৮টার সময় একজন লোক আসিয়া খবর দিল যে ক্যাম্প হইতে তিন চারি মাইল দূরে বাঘে একটি গরু ধরিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া আমরা সকলে আহ্লাদে একেবারে আট-আষ্টে ৬৪ খানা হইয়া উঠিলাম। চারিদিকে 'সাজ সাজ' রব পড়িয়া গেল। সাড়ে নয়টার সময় বড় বড় শিকারী হাতী, মাহুতদের ছাউনী হইতে গদি সহ আসিয়া, হাওদার তাম্বু হইতে হাওদা (যে শিকারী যে হাতীতে চড়িবেন ইহা পূর্ব্বেই ঠিক হইয়া যায়) এবং বন্দুকের তাম্বু হইতে তাঁহার নির্ব্বাচিত বন্দুক ও টোটা লইয়া শিকার স্থল অভিমুখে রওনা হইল। কিছুক্ষণ পরে আমরা ছোট ছোট দ্রুতগামী হাতীতে ইহাদের অনুগমন করিলাম। এগুলিতে কেবল গদি থাকে, হাওদা থাকে না। হাওদায় অত্যন্ত ঝাঁকি লাগে বলিয়া শিকার ভিন্ন যাতায়াত এইরূপ গদীর হাতীতে হইয়া থাকে।

বেলা প্রায় ১১টার সময় আমরা শিকার স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। হাওদার হাতীগুলি আমা-

দের পূর্ব্বেই আসিয়াছিল। কেহ ছোট হস্তী হইতে নামিয়া মই দিয়া, কেহ বা ছোট বড় দুইটিকে পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া যে যাহার হাওদাতে উঠিয়া পড়িল।

আমরা প্রথমে যে জঙ্গলটি খুঁজিলাম তাহাতে ধৃত গরুটীর কঙ্কালসার শবদেহ ও ব্যাঘ্রের পদচিহ্ন ভিন্ন অপর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। মহারাজ ব্যাঘ্রের পদচিহ্ন দেখিয়া বলিলেন যে, এটি বাঘিনী। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিসে বুঝিলেন?" মহারাজ একটু হাসিয়া উত্তর দিলেন, "দেখিতেছ না, থাবার দাগগুলি লম্বা ধরণের, বাঘের থাবা ইহা অপেক্ষা বড় ও গোলাকার হয়।"

আমরা তার পর জোরাই নদীর অপর পার্শ্বস্থ জঙ্গল অন্বেষণ করাই স্থির করিলাম। সেদিন আমাদের সঙ্গে মোটের উপর ৩৫।৩৬টি হাতী ছিল, তন্মধ্যে ৮টি হাওদা ও বাকিগুলি বনগ্রাহক (Beaters)। জঙ্গলের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে এই হাতীগুলি বন তাড়াইতে তাড়াইতে ক্রমে উত্তর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, এবং আমরা ২৫।৩০ গজ অন্তর অন্তর শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উত্তর দিকে দক্ষিণ মুখ হইয়া জঙ্গল হইতে প্রায় ২০ গজ দূরে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

বাঘ তাড়া খাইয়া নদী পার হইয়া পলাইতে পারে বলিয়া গ-সাহেব এবং ব-সাহেব নদীর অপর তীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এপারে নদীর ঠিক উপরেই জ-সাহেব, তার পর মহারাজ, তার পর আমি, প-সাহেব, য-সাহেব এবং সর্ব্বশেষে স-সাহেবের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

মাহুতেরা নানা প্রকার বোল ও জঙ্গল ভাঙ্গার হড়্ মড়্ খস্ খস্ শব্দের সহিত হাতীগুলি ক্রমেই আমাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং আমরাও উদ্‌গ্রীব হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ এইভাবে থাকিবার পর দেখিলাম মহারাজ আমার হাতীর ঠিক সম্মুখে জঙ্গলের ভিতর একটি স্থান বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছেন। আমি বড় কিছু বুঝিতে না পারিয়া অন্য দিকে দেখিতে লাগিলাম। অকস্মাৎ পূর্ব্বোক্তস্থানে হইতে গাঁক্ গাঁক্ শব্দে বিকট চীৎকার করিতে করিতে হিংস্র বদন ব্যাদান পূর্ব্বক বিকটদংষ্ট্রা ভীষণ দর্শন ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত চক্ষু এক বিরাট ব্যাঘ্র বাহির হইয়া আমার হস্তীর অভিমুখে বেগে ধাবিত হইল। ব্যাঘ্রের গভীর গর্জ্জনে বনজঙ্গল হস্তী ইত্যাদি সব যেন থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। এরূপ বিকট চীৎকার ইতিপূর্ব্বে আর কখনও আমার কর্ণগোচর হয় নাই।

"চিড়িয়াখানায়" পিঞ্জরাবদ্ধ দুর্ব্বল দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ব্যাঘ্রের নিনাদ অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু তাহা এই স্বচ্ছন্দ-বনবিহারী সতেজ ও সুপুষ্ট জীবের গর্জ্জনের শতাংশের একাংশ হইবে বলিয়া মনে হয় না। তখন বুঝিলাম মহারাজ আমার সম্মুখে কি দেখিতেছিলেন। তিনি অনেক পূর্ব্বেই জঙ্গল আন্দোলন দেখিতে পাইয়াছিলেন। যাহা হউক, ব্যাঘ্র বাহির হইবামাত্র আমি ত্রস্তভাবে বন্দুক তুলিয়া লইলাম, কিন্তু "বিধিলিপি কে করে খণ্ডন?"—আর এক সেকেণ্ড হইলে আওয়াজ করি, এমন সময় ব্যাঘ্রকে তাড়াইয়া আসিতে দেখিয়া আমার হস্তীও তাহাকে দ্রুতবেগে আক্রমণ করিল। হস্তীটি হঠাৎ এইরূপ ভাবে দৌড়াইয়া যাওয়াতে আমি ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া হাওদার উপর বসিয়া পড়িলাম, কাজেই আমার গুলি করা হইল না।

শার্দ্দূল প্রবরও হস্তীর তাড়া খাইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে মহারাজের সম্মুখ দিয়া জঙ্গলে ফিরিয়া গেল। মহারাজ এই সময়ে দুইবার গুলি করিলেন কিন্তু ব্যাঘ্র ঝোঁপের অন্তরালে যাওয়াতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেন। বলা বাহুল্য এই সব কাণ্ড নিমেষ মধ্যেই শেষ হইয়া গেল।

এখানে কাহার-কাহারও মনে এ প্রশ্ন আপনা হইতেই উঠিতে পারে যে, আমরা ত ২৫।৩০ গজ দূরে দূরে দাঁড়াইয়া ছিলাম, কিন্তু আমি যখন মারিতে পারিলাম না, তখন মহারাজ মারিলেন না কেন, এবং তিনি যখন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেন, তখন আমি গুলি করিলাম না কেন? ইহার কারণ—যে ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার হেতু বর্ত্তমান আছে, সেই স্থানেই কার্য্যক্ষেত্রের

সীমা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। শিকার সম্বন্ধেও এ নীতির কোন ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না। অন্যথায় উত্তেজিত অবস্থায় অস্ত্রপাণি হইয়া নিবিড় অরণ্যে এই-রূপ কলহের ফল অত্যন্ত বিষময় হইতে পারে। সেই-জন্য কোন শিকারী সম্পূর্ণভাবে অসমর্থ না হইলে বা তাঁহার প্রবল বিপদের আশঙ্কা না থাকিলে তাঁহার সীমানায় অন্য আর একজন গুলি করিতে পারেন না। কাযেই ব্যাঘ্র মহাশয় বা বাঘিনী মহাশয়া আমাদের নিয়মে আমাদেরই ঠকাইয়া নিরাপদে আবার জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন।

অনতিবিলম্বে এক ভালুক, অশীতিপর বৃদ্ধের ন্যায় থপ্‌ থপ্‌ করিয়া বাহির হইয়া আসিল এবং নিমেষ মধ্যে মহারাজের গুলিতে ইহলীলা সংবরণ করিল।

এখন জঙ্গল-তাড়ান হাতীগুলি আরও অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। তাহাদের সম্মুখে আর অল্পমাত্র জঙ্গল অবশিষ্ট, এমন সময় গর্জ্জন করিতে করিতে বাঘটী আবার বাহির হইয়া জ-সাহেবের নিকট দিয়া উত্তরাভি-মুখে দৌড়াইতে লাগিল। এ যাত্রা যেরূপ ভাবে জ-সাহেবের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাতে আমরা সকলেই অনুমান করিয়াছিলাম সে নিশ্চয়ই হাতীর উপরে উঠিয়া পড়িবে। কিন্তু কি মনে করিয়া ৩।৪ হাত দূর হইতে হাতীটিকে বামে রাখিয়া বেগে প্রস্থান করিল। দেখিতে দেখিতে চারিদিক হইতে পট্‌ পট্‌ শব্দে গুলি বর্ষণ আরম্ভ হইয়া গেল। জ-সাহেব দুইটী, মহারাজ একটী, নদীর অপর পার্শ্বস্থ সাহেবদ্বয় দুইটি এবং আমি একটী আওয়াজ করিলাম। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বা ব্যাঘ্রের সৌভাগ্যবশতঃ একটী গুলিও তাহার লোমাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিল না। লেজ উচ্চে উঠাইয়া সে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত তীর-বেগে আমাদের চক্ষুর অন্তরালে গিয়া পড়িল। সূর্য্যদেব সে সময় পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার কিরণজাল সেই ব্যাঘ্রের সদ্যোস্নাত পরিপুষ্ট দেহের উপর পতিত হওয়াতে বড়ই সুন্দর দেখাই-তেছিল। বহুমূল্য মখমলও এই স্বভাবজাত মসৃণ উজ্জ্বল চর্ম্মের নিকট তুলনায় স্থান পায় না।

আবার দাগ দেখিয়া আমরা ব্যাঘ্রের অনুসরণ করিতে লাগিলাম। কিন্তু কিছু দূর যাইতে না যাইতে পদচিহ্ন হারাইয়া গেল, আর দেখিতে পাওয়া গেল না। মহারাজ আমাদের সর্ব্বাগ্রে, তৎপশ্চাৎ আমিও জ-সাহেব পাশাপাশি যাইতেছিলাম এবং আমাদের পশ্চাতে অপর সকলে আসিতেছিলেন। অল্পদূর চলিতে চলিতে মহারাজ কিছু বেশী অগ্রসর হইয়া গেলেন ও স-সাহেব আসিয়া আমাদের ধরিয়া ফেলিলেন।

এই সময় আমরা যে মহাবিপদে পড়িয়াছিলাম তাহা মনে হইলে এখনও পর্য্যন্ত ভয় হয়, আজও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে! জ-সাহেব অন্যমনস্ক ভাবে দাঁড়াইয়া যাইতেছিলেন, তাঁহার মাহুতজী বোধ হয় আপন মনে গৃহস্থিতা বিরহবিধুরা কান্তার কথা ভাবিতে-ছিলেন এবং হস্তীটিও নিজ বিরাট উদর কিসে পূর্ণ হয় সেই চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল—কাযেই অনবধানতাবশতঃ ভালুকের গর্ত্তে হটাৎ তাঁহার সম্মুখের দক্ষিণ পদ একবার বসিয়া গেল। এই অকস্মাৎ বিপৎপাতে জ-সাহেব নিজের ভারকেন্দ্র বজায় রাখিতে পারিলেন না; প্রথম একবার ডিগ্‌বাজী খাইয়া সামলাইয়া গেলেন, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আর এক ঝাঁকিতে, পা উপরের দিকে ও মাথা নিচের দিকে করিয়া সেই ভালুকের গর্ত্তে সশব্দে পড়িয়া গেলেন। কিছুক্ষণ তাঁহার অস্ফুট করুণ আর্ত্তনাদ এবং বুটমণ্ডিত পদাস্ফালন ভিন্ন আর কিছুই আমরা শুনিতে বা দেখিতে পাই নাই। তাঁহার সমস্ত দেহই গর্ত্তের নিম্নে, কেবল পদদ্বয়ের কতক অংশ মাত্র গর্ত্তের উপরে জাগিয়াছিল। এই বিষম দৃশ্য দেখিয়া একবারে হত-ভম্ব হইয়া পড়িলাম। হাত পা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কি করিব কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমার হাতীটি আবার অদ্ভুত গুণসম্পন্ন; তিনি নিজের শুঁড়ের নিকট যাহাকে পান তাহার সহিত একটু বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ পরিচয় না করিয়া ছাড়েন না। সুতরাং লাফাইয়া পড়াও যুক্তিসঙ্গত নহে। যাহা

হউক, আমার মাহুত তাড়াতাড়ি হাতীটিকে বসাইয়া ফেলিল। সেটেলমেণ্ট আফিসের একজন কর্ম্মচারী দর্শকরূপে আমার সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া পড়িয়া জ-সাহেবকে টানিয়া বাহির করিলেন। স-সাহেব জ-সাহেবের বিপদের কথা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া মহারাজকে ডাকিতে লাগিলেন। মহারাজ শুনিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জ-সাহেব তখনও যন্ত্রণায় অধীর, কারণ তাঁহার দুইখানি পঞ্জরাস্থি গুরুতর রূপে জখম হইয়াছে। দ-বাবু (L. M. S.) ডাক্তার আমাদের সঙ্গেই ছিলেন, জ-সাহেবকে তৎক্ষণাৎ তাঁহার জিম্মায় ক্যাম্পে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। এই দুর্ঘটনার ফল অনেকদূর পর্য্যন্ত গড়ায়। জ-সাহেব প্রায় তিন মাস সুস্থ হইতে পারেন নাই। একটী বন্দুকের কুন্দা নল হইতে একবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, আর একটীর কুন্দা নল মচকাইয়া যায় এবং অন্য একটীর কল খারাপ হইয়া গিয়াছিল। বলা বাহুল্য সকল বন্দুকগুলিই বহুমূল্য। মানুষের বিপদ যখন আসে তখন এই ভাবেই আসে। জ-সাহেব একজন সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ শিকারী, তাঁহার জীবনে এইরূপ দৈব বিড়ম্বনা এই প্রথম —এবং আশা করি ইহাই শেষ।

জ-সাহেব ক্যাম্পে ফিরিয়া গেলেন, আমরাও আবার ব্যগ্র উত্তেজনায় অতীতের সমস্ত কথা ভুলিয়া বেগে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এইরূপ বিপদ আপদের উত্তেজনায় আমরা সকলেই ব্যস্ত, সুতরাং আমাদের অলক্ষিতে ঈশান কোণে যে বেশ একখানি মেঘ দেখা-দিয়াছে সে দিকে কেহ মোটেই লক্ষ্য করি নাই। কিন্তু এই সময় প্রবলবেগে জলা ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে লাগিল এবং গুড়গুড় শব্দে মেঘও ডাকিতে আরম্ভ করিল। তখন দেখি, আকাশে মেঘ বিস্তৃত ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এ কয়দিন মধ্যে মধ্যে প্রায়ই শিলাবৃষ্টি হইতেছিল, এখনও হইতে পারে এই আশঙ্কায় আমরা মাঠের মাঝে নিরাশ্রয় ভাবে অবস্থান করা যুক্তিযুক্ত বোধ না করিয়া লোকালয় অন্বেষণে ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। কিঞ্চিৎ দূরে কয়েকঘর গৃহস্থের বসতি আছে জানিয়া তৎক্ষণাৎ সেই দিকে ধাবিত হওয়া গেল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী।

প্রেমের স্পর্দ্ধা

ওহে　বরজ-বিহারী শ্যামরায়!
বাঁশরী বিসরি', করে ন্যায়ের দণ্ড ধরি'
শাসন করিবে কহ কা'য়?
ব্রজের রাখাল যবে গোপিকা সঙ্গে করি'
ফাগুনে ফাগুয়া লয়ে পশিবে মথুরাপুরী,
আভীর-রমনী যবে আবিরে করিবে লাল,
বারণ করিবে কারে হায়?
রাজার সভায় যবে শ্রীদাম সুবল সখা,
খুলিয়া মুকুট, শিরে পরাবে শিখির পাখা,
পরাইবে পীত ধড়া কাড়িয়া রতন-বেশ,
নূপুর বাঁধিয়া দিবে পায়;
বাহুর শিকলি দিয়া বাঁধিয়া রাজায় যবে
মথুরা-নগর-পথে বাহিরি' আসিবে সবে,
আনিবে বৃন্দাবনে বৃন্দাবনের শ্যাম,
কে পথ রোধিবে মথুরায়?
ব্রজের গোপাল গোপী পরাজি' মথুরারাজে
রাখাল-রাজায় আনি' বসাবে হিয়ার মাঝে,
মথুরা-নাগরী হেরি' ফেলিবে আঁখির জল,
কে বল রোধিবে গোপিকায়?

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

বিহারীলাল ও তাঁহার কাব্য *

বার বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা সম্পর্কে সমালোচক সুধী শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন মহাশয় বলিয়াছেন—"এদেশে পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে আনীত নব গীতি-কবিতার আদিকবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী। বিহারীলাল আধুনিক গীতি-সাহিত্যে অতি উচ্চস্থান পাইবার যোগ্য। ইনি প্রকৃতিকে এক নবভাবে দেখিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর কবিতার মূলতত্ত্ব সৌন্দর্য্য-পিপাসা। ইংরাজ কবি কীট্‌সের ন্যায় তাঁহার হৃদয় এই পিপাসায় জগতের দিকে উন্মুক্ত ছিল। 'সারদা মঙ্গল' ও 'বঙ্গসুন্দরী'তে ইনি স্থানে স্থানে এমন মহনীয় কমনীয় সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা ইতিপূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যে আর দেখা যায় নাই। তিনি সৌন্দর্য্য-পিপাসু কবি, এবং জীবনে সেই সৌন্দর্য্য অনুসরণের চেষ্টা করিয়াছেন; সেই জন্য তিনি সর্ব্বজন সমাদৃত কবি হইতে পারেন নাই।"

বাঙ্গালার নব গীতি-কবিতার প্রবর্ত্তক বিহারীলালের সম্বন্ধে আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে, কারণ আধুনিক সাহিত্যে কবিতার যে যুগ চলিতেছে তাহা গীতি-কবিতা এবং খণ্ডকবিতারই যুগ এবং এই গীতি-কবিতাই বঙ্গসাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে পরিগণিত হইয়াছে। মহাকাব্যের যুগ এখন গত; এখন একটী মহান্ বা আদর্শ চরিত্রে কবিদিগের কল্পনা নিবিষ্ট হইয়া থাকিতে পারিতেছে না; মহৎ চরিত্র সৃষ্টির উপযোগী কল্পনার সে স্থৈর্য্য এখন নাই, সৃজনের অবসরই এখন নাই। যাহা বর্ত্তমান, তাহারই অন্তরে প্রবেশ করিয়া তন্ন তন্ন বিশ্লেষণ করা, তাহার মধ্যে যাহা কিছু রহস্য বা সত্য তাহা আবিষ্কার করা, এবং সেই রহস্য হইতে উচ্চতর শ্রেষ্ঠতর কোনও রহস্য বা সত্যের মীমাংসা চেষ্টাই আধুনিক কবিতার লক্ষ্য। "এইরূপে প্রকৃত জীবনই এ কবিতার ভিত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং সহানুভূতি তাহার কেন্দ্র।" সৌন্দর্য্যানুভূতি এ কবিতার প্রাণ এবং সৌন্দর্য্যের স্বরূপ বা মানবহৃদয়ের স্বরূপ ধরিবার জন্য তাহার ব্যাকুলতা। যাহা কিছু প্রত্যক্ষ, যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গম্য, তাহা লইয়া ইহা তৃপ্ত হইতে পারিতেছে না—প্রত্যক্ষের বাহিরে যে এক উদার অনন্ত অতীন্দ্রিয় ভাবজগৎ বা আনন্দজগৎ আছে, যাহার অস্ফুট ধ্বনি, যাহার ক্ষীণ সুরটুকু মাঝে মাঝে যেন কাণে আসিয়া আঘাত করে, আধ আলো আধ অন্ধকারের মধ্যে যাহার অস্পষ্ট মূর্ত্তি একটু যেন স্পষ্ট হয়,—উর্দ্ধে—সেই স্বপ্নময় লোকের দিকেই এ কবিতা ছুটিয়া চলিয়াছে।

আধুনিক কবিতার এই যথার্থ স্বরূপ বিহারীলালের কাব্যের মধ্যে অনেকটা পরিস্ফুট হইয়াছে। তাঁহার কাব্য-জীবন স্বাধীন এবং স্বাতন্ত্র্য-পরায়ণ। উনবিংশ শতাব্দীর যুগসন্ধিস্থলে, পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংস্পর্শফলে মহাকবি মাইকেল মেঘনাদবধ রচনা করিয়া সাহিত্যে একটা নূতন আলোক দেখাইলেন, আশার একটা নূতন রশ্মিপাত করিয়া দিলেন, এবং হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র তাঁহার পথের পথিক হইলেন; বিহারীলালও সেইরূপ স্বাতন্ত্র্যপরায়ণ হইয়া অন্তরের অপরিমেয় সৌন্দর্য্যপিপাসা লইয়া সাহিত্যের আর এক মার্গে একটা নূতন ভাব লইয়া অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার প্রদর্শিত এই পথই পরবর্ত্তী কবিগণের রাজপথ হইয়াছে।

বিহারীলাল অন্তরে বাহিরে যথার্থ উচ্চ অঙ্গের কবি ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তৎসম্বন্ধে তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তে লিখিয়াছেন—"তাঁহার মনের চারিদিক ঘেরিয়া কবিত্বের একটী রশ্মিমণ্ডল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিত,—তাঁহার যেন কবিতাময় একটী সূক্ষ্ম শরীর ছিল তাহাই তাঁহার যথার্থ স্বরূপ। তাঁহার মধ্যে একটি পরিপূর্ণ কবির আনন্দ ছিল!" শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও বলিয়াছেন—"বিহারী বাবু সদাই কবিত্বে মজগুল থাকি-

* প্রেসিডেন্সী কলেজে বাঙ্গালাসাহিত্য সভার অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে পঠিত।

তেন, তাঁহার হাড়ে হাড়ে প্রাণে প্রাণে কবিত্ব ঢালা ছিল, তাঁহার রচনা তাঁহাকে যত বড় কবি বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহা অপেক্ষাও তিনি অনেক বড় কবি ছিলেন।"

বিহারীলাল কাব্যমন্দিরের একনিষ্ঠ ভক্ত সাধক। তাঁহার কবিতার মধ্যে কষ্টকল্পনা নাই, তাহা সরল সহজ প্রাণের সুখ দুঃখ, আশা নৈরাশ্যের সুন্দর সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। "এ কবিতা অতি কোমল, কোমলাদপি কোমল, মিষ্ট মসৃণ আবেশময়ী।" ইহাতে সঙ্গীতের সুর ধ্বনিত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা মনের বেগবান অনুভাব হইতে উদ্ভূত। "অনুভাবের ভাষা ছন্দোবদ্ধ, তাই পূর্ণিমার সমুদ্রের মত তালে তালে তাহার হৃদয়ের উত্থান পতন হইতে থাকে, তালে তালে তাহার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে থাকে।" বিহারীলালের কবিতায় ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। তিনি কবিতা রচনা করিয়া, তাহাতে সুরসংযোগ করিয়া নিজে গান করিতেন এবং মনোমত হইলে পরে প্রকাশ করিতেন। এইরূপে তাঁহার কবিতার মধ্যে ভাব-মাধুর্য্যের সহিত ছন্দ-লালিত্য ও ছন্দ-মাধুর্য্যের সম্মিলন হইয়া এক মনোহর সঙ্গীত ঝঙ্কারের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সঙ্গীতের মতই তাহা আমাদের মন উদ্বেলিত ও বিমুগ্ধ করিয়া তুলে।

বিহারীলাল 'বন্ধুবিয়োগ,' 'প্রেম প্রবাহিনী,' 'নিসর্গ নিদর্শন,' 'বঙ্গসুন্দরী,' 'সারদা মঙ্গল,' 'সাধের আসন' প্রভৃতি খণ্ডকাব্য, 'শরৎকাল" নামে কয়েকটী খণ্ড কবিতা-সমষ্টি, 'বাউলবিংশতি' নামে কয়েকটি সঙ্গীত সমষ্টি, 'মায়াদেবী,' 'দেবরাণী' প্রভৃতি কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন।

'বন্ধু বিয়োগ', 'প্রেম প্রবাহিনী', 'নিসর্গ নিদর্শন' কাব্যত্রয় তাঁহার যৌবন-রচনা। তাঁহার এই প্রথম রচনাগুলিতে, বিশেষতঃ 'বন্ধুবিয়োগ' কাব্যে তাঁহার রচনা-রীতির সহিত কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনা-রীতির বিশেষ সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বিহারীলাল যে সময়ে কবিতা রচনা আরম্ভ করেন, সে সময়ে গুপ্ত কবিই বঙ্গীয় কাব্যরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন এবং তাঁহার প্রভাব যখন বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধুর উপরও পড়িয়াছিল, তখন বিহারীলালের উপর সে প্রভাব বিস্তৃত হইবে ইহা কিছুই বিচিত্র নহে।

'বন্ধুবিয়োগ' কাব্যে কবির কয়েকজন বন্ধুর চরিত্র বর্ণনা এবং তাঁহাদের মৃত্যুতে শোকোচ্ছ্বাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কবির প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুতে বিলাপও ইহার অন্তর্ভুক্ত। এই শোকোচ্ছ্বাস ও বিলাপ, 'সারদামঙ্গল' কাব্যের বিরহ-বিলাপের সহিত অথবা 'সাধের আসন' কাব্যে তাঁহার মহিলা বন্ধুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশের সহিত তুলনীয় হইতে পারে না। ইহা যেন অতিশয়োক্তি বলিয়াই মনে হয়। কবির পরবর্ত্তী রচনার আন্তরিকতা ইহার মধ্যে ঠিক পাওয়া যায় না। এই কাব্য এবং 'প্রেম প্রবাহিনী' কাব্যের স্থানে স্থানে এরূপ বীভৎস বর্ণনা আছে যাহা আধুনিক সাহিত্যে একেবারে বিরল। এই সকল স্থানেই বিশেষ ভাবে মনে হয় যে গুপ্ত কবির প্রভাব তাঁহার উপর পড়িয়াছিল।

'বন্ধুবিয়োগ' কাব্যে বিহারীলালের অতুল কবিত্ব শক্তির বিশেষ কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। কবি নিজের বিশেষত্ব বা স্বরূপ এখনও আবিষ্কার করিতে সামর্থ হন নাই; এখনও তাঁহার আত্মক্ষমতায় বিশ্বাস জন্মায় নাই। তিনি প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বন্ধে নীরব, তাঁহার সৌন্দর্য্যদৃষ্টি সুপ্ত। কিন্তু পরবর্ত্তী 'প্রেম প্রবাহিনী' কাব্যে তাঁহার এই শক্তির একটু অপরিস্ফুট নিদর্শন যেন পাওয়া যায়।

"কিরণের ফুল কাটা নীরদ মণ্ডলে
যেন সব স্বর্ণ পদ্ম ভাসে নীলজলে।"

প্রভৃতি পংক্তিতে দেখিতে পাই যে কবির প্রকৃতির শোভার প্রতি দৃষ্টি উন্মুক্ত হইয়াছে এবং সে দৃষ্টিতে তাঁহার অভিনিবেশ আছে।

'প্রেম প্রবাহিনী' কাব্যে কবি প্রেমের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। সে বর্ণনায় তাঁহার পরবর্ত্তী কাব্যজীবনের উচ্ছ্বাস বা আবেগ নাই, কারণ এ প্রেমের নায়ক কবি নিজে নহেন এবং এ প্রেম সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রধানতঃ কবির নিজের মনের অনুভাব হইতেও উদ্ভূত

নহে। কিন্তু সেই জন্যই এ প্রেমবর্ণনার মধ্যে একটা স্থির শান্তিময় ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এই কাব্যে তাঁহার কাব্যজীবনের পরিবর্ত্তনের সূচনা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এ কাব্যের নায়ক সম্বন্ধে কবি যাহা বলিয়াছেন—

"প্রকৃতি-পবিত্র প্রেমে হইয়ে মগন,
হেরিবে হৃদয়ে প্রেমময় সনাতন।
দর দর আনন্দের ব'বে অশ্রুধারা,
স্থির হয়ে রবে দুটী নয়নের তারা।"

—আমাদের মনে হয় তাহার মধ্যে কবিরই কাব্যজীবনের পরিবর্ত্তনের কথা ব্যক্ত হইয়াছে। কবির জীবনে মোহিনী কল্পনার আবির্ভাব হইয়াছে এবং সে কল্পনা বিশ্বময় প্রেমের স্বরূপ অঙ্কিত করিয়া কবির মনশ্চক্ষের সম্মুখে এক অপরূপ আলেখ্য আনিয়া ধরিয়াছে।

কাব্যের শেষ সর্গে কবি তাঁহার এই নূতন অনুভূতির কথা বলিয়াছেন। "মধুময় সুধাময় শান্তিসুখময় এক রসে" তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ, ইহার মধ্যে প্রবৃত্তির জ্বালাময় অনলদাহের স্থান নাই ; কেবল—

"মন যেন মজিতেছে অমৃত সাগরে
দেহ যেন ফাটিতেছে সমাবেগভরে
* * *
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আজি প্রেমানন্দময়।"

প্রেমের এই কল্পিত নারীমূর্ত্তির চরণতলে হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদন কবি তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা 'সারদা মঙ্গল' কাব্যে করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে বিহারীলালের গীতি-কবিতার প্রাণ তাঁহার অপরিমেয় সৌন্দর্য্যপিপাসা। তিনি সত্য-শিব-সুন্দরের উপাসক। সমস্ত বিশ্বের মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর, প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু মাধুর্য্যময়, মানব অন্তরে যাহা কিছু পবিত্র সুন্দর, সে সমস্তই তিনি খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাঁহার কাব্যে দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার কবিতার পত্রে পত্রে সুন্দরের কমনীয় মহনীয় আলেখ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। সৌন্দর্য্যের অন্তরানুভূতির ক্ষমতা তাঁহার ছিল তাই "বিশ্বের সৌন্দর্য্যরাশি তাঁহার নিকট কি এক পিরীতিময়" বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু এই সৌন্দর্য্যরাশিকে তিনি খণ্ড খণ্ড ভাবে, পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতেন না, সে সমস্তকে মিলিত করিয়া বিশ্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে 'কান্তি'রূপে কল্পনা করিয়া সমুদয় সৌন্দর্য্য তাঁহারই অংশস্বরূপ মনে করিতেন। তাঁহার 'মাধুরী' কবিতায় বলিতেছেন—

"অহো! বিশ্ব-পরকাশী
উদার সৌন্দর্য্য রাশি
জলে স্থলে আকাশে সদাই বিরাজিত ;
যেদিকে ফিরিয়া চাই
সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া যাই,
অত্যুল্লাসকরী, অয়ি
পরম আনন্দময়ী!
কে তুমি মা! কান্তিরূপে সর্ব্বভূতে বিভাসিত?"

আবার—

"তোমারি এ রূপরাশি
আকাশে বেড়ায় ভাসি,
তোমার কিরণজাল
ভুবন করেছে আলো,
গ্রহ তারা শশী রবি,
তোমারি বিম্বিত ছবি,
আপন লাবণ্যে তুমি বিভাসিত আপনি।"

বসন্তের তরুলতায়, শিশুর হাসিতে, ভোরের শুকতারায়, ঊষার রক্তিমাভায় এ 'মাধুরী'র বিকাশ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হন ; অনন্ত নীলাম্বুময় সমুদ্রও যেন সেই 'মাধুরী'র উদ্দেশে ধাবিত।

এই "মাধুরী" প্রতিমাকে তিনি "বিশ্ব-বিকাশিনী, বিশ্ব-রূপিণী, বিশ্বের আলো" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিশ্বের সঙ্গে ইঁহার সম্বন্ধ চিরন্তন। ইহার মধ্যে ধ্বংস প্রলয়ের স্থান নাই। সৌন্দর্য্য অক্ষয় অজর বলিয়া কবি মনে করিয়াছেন, তাই বিশ্বের লয় তিনি কল্পনা করিতে পারেন না, কারণ বিশ্ব ধ্বংস হইলে এ সৌন্দর্য্য বা কান্তি কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে? তাই তিনি বলিতে চান—

"একেবারে লয় নেই,
এক যায় আর আসে
তরুণ সৌন্দর্য্যে ভাসে।"

এ প্রতিমা কবির চক্ষে অনন্তরহস্যময়ীরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। এ মূর্ত্তি তিনি দেখিতে পান কিন্তু ইহার যথার্থ স্বরূপ ধরিতে পারেন না—

"ধরি ধরি করি ধরিতে না পারি
চারিদিকে আমি কি যেন নেহারি।"

বুদ্ধি, জ্ঞান, দর্শনশাস্ত্রের সাহায্যে এ রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে যাইয়া সন্দেহ সংশয় অবিশ্বাসের দোলায় কবি আন্দোলিত হইয়া উঠিলেন,—তাঁহার পূর্ব্ব বিশ্বাস, পূর্ব্ব নিষ্ঠাও হারাইতে বসিলেন, তাই তিনি অনুতপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

"রহস্য ভেদিতে তব আর আমি চাব না;
না বুঝিয়া থাকা ভাল
বুঝিলেই নেবে আলো।"

এ রহস্য রহস্যই থাকিয়া যাক, তাহাতে তাঁহার কোনও দুঃখ নাই—অস্বস্তি নাই।

"রহস্য মাধুরী মালা
রহস্য রূপের ডালা
কবিরা দেখেছে তারে নেশার নয়নে।"

কবি তাহাকে 'নেশার নয়নে' দেখিয়াই পরিতৃপ্ত।

কিন্তু এই নেশা, তুচ্ছ 'চোখের নেশা' মাত্র নহে। কবি অন্তরের মধ্যে এই রহস্যময়ী সৌন্দর্য্যপ্রতিমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাকে প্রেমের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। তাঁহাকে শুধু সৌন্দর্য্যময়ীরূপে নহে, প্রেমময়ীরূপেও কল্পনা করিতেন। জনৈক সমালোচকের ভাষায়—"তিনি সৌন্দর্য্যের কবি হইতে প্রেমের কবিতে পরিণত হয়েন। তিনি বিশ্বপ্রেমকে নারীমূর্ত্তিতে কল্পনা করিয়া অনুরাগবিহ্বল প্রেমিকের অনন্ত ভালবাসা সেই প্রেমময়ীর চরণে সমর্পণ করেন।" তাই এ প্রতিমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—

"কে তুমি মানবদ্বন্দ্ব,
মূর্ত্তিমান প্রেমানন্দ,
* *
কে তুমি জননী, পিতা,
নন্দিনী, রমণী, মিতা,
প্রেমভক্তি-স্নেহরস-উদার-উচ্ছ্বাস?"

এই প্রেম-প্রতিমার উদ্দেশেই তাঁহার কাব্যবীণা স্বতঃই ঝঙ্কৃত হইয়াছে। এই প্রেমপ্রতিমাই কবির চির-আরাধ্যা মূর্ত্তিমতী স্বয়ং 'সারদা' এবং এই সারদার নামেই তাঁহার প্রধান কাব্যের নাম 'সারদা-মঙ্গল' হইয়াছে।

সারদার সঙ্গে কবির সম্বন্ধ বাহিরের সম্বন্ধ নহে—তাহা অন্তরের অতি নিবিড়, অতি পবিত্র, অতি মহান্ সম্বন্ধ। সেই জন্য বিহারীলালের কবিত্বে, তাঁহার উচ্ছ্বাসে আন্তরিকতার সুর ধ্বনিত হইয়াছে। সারদাকে তিনি মনঃপ্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছেন, "ভক্তিভাবে একতানে" তাঁহারই ধ্যানে মজিয়াছেন—

"তুমিই মনের তৃপ্তি,
তুমি নয়নের দীপ্তি,
তোমাহারা হলে আমি প্রাণহারা হই,
করুণা-কটাক্ষে তব
পাই প্রাণ অভিনব
অভিনব শান্তিরসে মগ্ন হয়ে রই।"

এ মূর্ত্তি "কি এক ঘুমঘোরে কি চোখে" দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন, ভুলিবার সাধ্য নাই। ইঁহার স্পর্শে "যেন কি মোহমন্ত্রে তাঁহার অসাড় দেহযন্ত্রে" বিদ্যুৎ-সঞ্চার হয়, হৃদয়তন্ত্রী কি এক অপরূপ তালে বাজিয়া উঠে, মনে হয় যেন বিশ্বের সমস্তই এক পরিপূর্ণ অখণ্ড সঙ্গীতধারা, তাই কবি বিহ্বল হইয়া বলিয়া উঠেন—

"তুমি কি প্রাণের প্রাণ? তুমিই কি চেতনা?"

সারদার প্রতি কবির এই প্রেমে এক স্বর্গীয় উন্মাদনা আছে—তাহাতে সম্ভোগের বাসনা বা ইন্দ্রিয় সুখলালসার কোনও সম্পর্কই নাই। তিনি কন্যার মধ্যে, পত্নীর মধ্যে এই প্রেমের বিকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হ'ন। তিনি পত্নীপ্রেম হইতে এই উচ্চতর সম্ভোগহীন প্রেমে উপনীত হইয়াছেন। পত্নীকে বলিতেছেন—

"তোমার মুরতি ধরে
কে এসেছে মোর ঘরে?
* * *
তুমিই বিশ্বের জ্যোতি
হৃদ্‌পদ্মে সরস্বতী,
প্রেমস্নেহ ভক্তি ভাবে দেখি অনিবার।"

তিনি প্রাণের প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি দিয়া "প্রেমের প্রফুল্ল মালা" গাঁথিয়াছেন, কিন্তু সে মালা তাঁহার প্রেমময়ী সারদার কণ্ঠে অর্পণ করিতে পারেন নাই, তাই বলিতেছেন—

"সৌরভে আকুল হ'য়ে পারিনি পরাতে গায়,
সজল নয়নে শুধু চেয়ে আছি রাঙা পায়।"

অতএব বলিতে হয় যে বিহারীলালের এই প্রেমের কল্পনা অতি বিচিত্র এবং অতি উদার। বিহারীলাল শুধু কবি নহেন, প্রেমিক নহেন—সারদার পূজামন্দিরে তিনি ধ্যানস্তিমিতনেত্র উপাসক, চির অনুরক্ত ভক্ত "যোগাসনে উপবিষ্ট যোগী"। "সারদার স্তোত্রগান"ই এই রোগ শোকতাপময় সংসারে তাঁহার জুড়াইবার স্থান এবং তাঁহার কাছে "যথার্থ মরণহারী সারদার শ্রীচরণ"।

'সারদামঙ্গল' বিহারীলালের প্রধান কাব্য। ইহা তাঁহার কবিত্ব শক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সারদার যে মূর্ত্তি কবির চক্ষের সম্মুখে এতদিন ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, তাহা এই কাব্যে স্পষ্টতর হইয়াছে; যে প্রেম কবির অন্তরে এতদিন অর্দ্ধসুপ্ত ছিল, তাহা ইহাতে সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে, যাহা এতদিন অসম্বদ্ধ অসংলগ্ন আকারে কবির মনে অবস্থিতি করিতেছিল, তাহা এই কাব্যে সুন্দররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

কবি নিজে ভূমিকায় লিখিতেছেন—"মৈত্রীবিরহ, প্রীতিবিরহ, সরস্বতীবিরহ—যুগপৎ ত্রিবিধ বিরহে উন্মত্তবৎ হইয়া আমি সারদামঙ্গল সঙ্গীত রচনা করি।" 'সারদামঙ্গল'কে তিনি সার্থক সঙ্গীত বলিয়াছেন। সারদামঙ্গলের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এক বিচিত্র আবেগপূর্ণ সঙ্গীতের সুর তরঙ্গায়িত হইয়া গিয়াছে। কবিত্ব কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই, মুহূর্ত্তের জন্যও কোথাও বিশ্রাম করিবার অবসর পায় নাই, কেবল গিরিবক্ষোনিঃসৃত বেগশালিনী নির্ঝরিণীর মত আপনার উপল-ব্যথিত প্রবাহ-পথে অবিশ্রান্ত ছুটিয়া চলিয়াছে।

"সারদামঙ্গল" প্রেমের এক অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস—অধীরতা উন্মাদনায় পরিপূর্ণ "আবেগময় জ্বালাময় অমৃতময়" উচ্ছ্বাস। "ইহাতে সারদার সহিত কবির সাক্ষাৎ ও প্রণয়, বিচ্ছেদের ও মিলনের কথা, কবির প্রেমভক্তি আশা নৈরাশ্য হর্ষ বিষাদ সন্দেহ অভিমান প্রভৃতি শত কথা এক অপূর্ব্ব স্বপ্নের মত সূত্রে গ্রথিত।" রবীন্দ্রনাথের মতে—"আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সঙ্গীত এরূপ সহস্রধার উৎসের মত কোথাও উৎসারিত হয় নাই।"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীপাঁচকড়ি সরকার।

সাপুড়ে

সাপটী তাহার মরে গেছে
কাঁদছে আজি বুড়া,
সঙ্গে তাহার কাটলো যে হায়
সাতটী বছর পূরা।
শুকায়নি ত হস্তে তাহার
দংশনেরি ক্ষত,
হায়রে তবু তাহার লাগি
দুঃখ করে কত!
নীরব পড়ে' তুবড়ি পাশে,
শূন্য ঝাঁপির্ তল,
চক্ষু ফেটে ঝরছে বুড়ার
শাওন মেঘের জল!

এ যেনরে কাঁদছে আজি
দস্যু-'খুনে'র বাপ্,
সইলো যে রে জীবন ধরে'
সুতের শত পাপ্!
যাহার লাগি ঝালাপালা
নিতুই জ্বালাতন,
তার লাগিও অশ্রু ঝরে,
হায় রে পোড়া মন!
কখন উড়ে বসিস্ জুড়ে,
হঠাৎ বাঁধিস্ ঘর,
সাবাস্ স্নেহ সর্ব্বনেশে!
তোর চরণে গড়।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

মধ্যযুগে সারনাথ

মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের দেহাবসানের অব্যবহিত পরেই ভারত-সাম্রাজ্যে ঘোর দুর্দ্দশার সূত্রপাত হয়। কেন্দ্র-শক্তির অভাবে উত্তর-ভারতে নানা বিশৃঙ্খলার সঙ্গে সঙ্গে বহু খণ্ড খণ্ড রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। প্রায় তিন শতাব্দী (৬৫০—৯৫০) ব্যাপিয়া এই অরাজকতার হ্রাস ভারত-ইতিহাসে লক্ষিত হয় না। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই আমরা কতিপয় সুদৃঢ় রাজ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হই। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীর মুসলমান আক্রমণে প্রায় সকল হিন্দু-রাজেরই অন্তিমদশা উপস্থিত হয়। এই ষষ্ঠ শতাব্দী ব্যাপী ভারতেতিহাসের মধ্যযুগে ভারতের বহির্দেশ হইতে কোনও অহিন্দু আক্রমণকারী আর্য্যাবর্ত্তকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য আগমন করে নাই। সুতরাং এই সময়ে হিন্দু-ধর্ম্মের নানা সংস্কার লাভের অবসর ঘটিয়াছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধের মধ্যে পার্থক্য নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া বিবিধ সামঞ্জস্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। এ যুগের দেবমূর্ত্তিগুলি কোন্‌টী হিন্দুর, কোন্‌টী বৌদ্ধের ইহা নিশ্চিতরূপে স্থির করা অনেক স্থলে অসম্ভব হইয়া উঠে। এই বিষয়ের জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত বৌদ্ধকেন্দ্র সারনাথে বহুবার লক্ষ্য করা গিয়াছে। সুতরাং মধ্যযুগে উত্তরভারতে হিন্দুরাজার আধিপত্য থাকিলেও সারনাথবিহারের ধর্ম্ম ও শিল্পের সংস্থিতির কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই। এই যুগে আমরা সারনাথে বহু চৈত্য নির্ম্মাণের কথা, বৈদেশিক ভ্রমণকারীর আগমনের কথা, স্থবিরগণের ধর্ম্মচর্চ্চার কথা, বিহারের বিবিধ সংস্কারের কথা, শিল্প-নিদর্শন—লিপিমালা ও সমসাময়িক ইতিহাস হইতে অবগত হইতে পারি। প্রধানতঃ তিনটী দিক হইতে সারনাথ-বিহারের এই তথ্যানুসন্ধান করা যাইতে পারে—শিল্প, ধর্ম্মসম্প্রদায় ও রাজার কর্ত্তৃত্ব। আমরা ক্রমে ক্রমে এই যুগের সারনাথের ইতিহাস যথাসাধ্য বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।

মধ্যযুগে সারনাথ-বিহার

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে উত্তরভারতে কান্যকুব্জের রাজাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠে। বাক্‌পতি কবির "গউড়বহো" নামক কাব্য হইতে কান্যকুব্জরাজ যশোবর্ম্মার রাজ্যের সীমা স্থির করা যায়, তাহাতে বুঝা যায় বারাণসী ও বৌদ্ধ-বারাণসীও তাহার অন্তর্গত ছিল। (১) যশোবর্ম্মা ৭৩১ সালে চীনদেশে একজন দূত প্রেরণ করেন। যদিও তিনি বৈদিকমার্গের পুনরুদ্ধারের জন্য অপরিসীম যত্ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার যত্নে বারাণসীধাম বেদচর্চ্চার প্রধান স্থান হইয়া উঠিয়াছিল (২) তথাপি সারনাথ-বিহারের উন্নতির কোন হানি হয় নাই। সারনাথের খ্যাতি শুনিয়া সুদূর চীন দেশ হইতে পরিব্রাজক তাই সং (Tai-tsong) ৭৬৪ সালে মহাবোধি-বিহার দর্শনান্তে বারাণসী (Po-lo-ni-sen) অথবা মৃগদাবের অন্তর্গত ঋষিপত্তনে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে এই স্থানেই বুদ্ধদেব ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন করেন। (৩) এই চীন-পরিব্রাজকের পূর্ব্বে 'ওয়াং-হুয়েং-সি' নামে অন্য একজন পরিব্রাজক ৬৫৭ সালে ভারতে পর্য্যটন করেন, কিন্তু তাঁহার লিখিত বিবরণে মৃগদাবের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। (৪)

সারনাথ পরিব্রাজক তাই সং

যশোবর্ম্মার মৃত্যুর পর যথাক্রমে বজ্রায়ুধ ও ইন্দ্রায়ুধ কান্যকুব্জের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহাদের বৈদিক বা হিন্দুধর্ম্মে সেরূপ আস্থা ছিল না। অতএব

---

(১) Although confined to the Doab and Southern Oudh as far as Benares it (the kingdom of Kanauj) Still * *" Imp. Gaz. Vol II. p. 310.

(২) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের কাশীপরিক্রমা, ২৪৬ পৃঃ।

(৩) Journal Asiatique, 1895 Vol II. p. 357-366. সারনাথ সম্বন্ধে কোনও লেখায় এ পর্য্যন্ত কেহই এই উল্লেখটি লক্ষ্য করেন নাই।

(৪) Levi's article "Les Missions de Wang-Hiuentse dans" Inde. I. A. 1900.

৯ম ও ১০ শতাব্দীতে সারনাথ

অনুমান হয়, তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিই অধিক অনুরাগী ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদিগের অধিকারভুক্ত বারাণসীর অন্তর্গত সারনাথ-বিহারে নানা উন্নতির সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। নবম শতাব্দীর প্রথমপাদে ইন্দ্রায়ুধ পালনৃপতি ধর্ম্মপাল কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হয়েন। বৌদ্ধ-নৃপতি ধর্ম্মপাল তৎপর চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জরাজ্যের অধীশ্বর করেন। কিন্তু চক্রায়ুধের রাজ্যকাল স্থায়ী হয় নাই। ৮১০ সালে গুর্জ্জর প্রতিহাররাজ নাগভট তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া কান্যকুব্জে স্বকীয় বংশের রাজপদের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের তৃতীয় নৃপতি মহাপরাক্রমশালী মিহিরভোজ অথবা প্রথম ভোজদেব চিত্রকূট গিরি-দুর্গ হইতে অগ্রসর হইয়া প্রায় ৮৪০ খৃঃ কান্যকুব্জ জয় করেন। (৫) "আদি বরাহ" উপাধিধারী এই ভোজের সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছিল। (৬) সুতরাং ইহা স্থির যে সারনাথ বৌদ্ধবিহারও কিছুদিনের জন্য তাঁহার শাসনাধীন ছিল। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। (৭) কিন্তু কদাপি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নাই। কারণ, তাঁহারই রাজত্বে দেবপালের ভ্রাতা এবং প্রথম বিগ্রহপালের পিতা মহাযোদ্ধা জয়পাল সারনাথে দশটি চৈত্য নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সারনাথে প্রাপ্ত তাঁহার লিপি হইতে এ কথা জ্ঞাত হওয়া যায়। (৮) বাক্পালের পুত্র এই জয়পাল দেবপালের শত্রুদলনে ও স্বরাজ্য-বিস্তারে প্রধান সহায় হইয়াছিলেন। তিনি প্রাক্‌জ্যোতিষপুর ও উৎকলের নৃপতিদ্বয়কে দলন করেন। (৯) আবার এই জয়পালই ছন্দোগপরিশিষ্ট প্রকাশকার নারায়ণভট্ট কর্তৃক উত্তররাঢ়ের অধিপতিরূপে পরিচিত হইয়াছেন। (১০) তিনি মহাপণ্ডিত উমাপতিকে পিতৃশ্রাদ্ধে মহাদান করিয়াছিলেন। এক দিকে হিন্দুর কর্ত্তব্য পিতৃশ্রাদ্ধ, অন্যদিকে বৌদ্ধবিহারে চৈত্য দান! পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ যুগে হিন্দু ও বৌদ্ধের মধ্যে আচারগত নানা সমন্বয়ের অভাব ছিল না। ইতিহাসে জয়পালের সময় নবম শতাব্দীর শেষ ভাগ। তাঁহার সারনাথের লিপির অক্ষরও এ কথার পোষকতা করে। লিপিতে সকল লোককে "সর্ব্বজ্ঞ" বা বুদ্ধ হইতে কামনা করা হইয়াছে; ইহা হইতে তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তথা সারনাথের প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধা সূচিত হইতেছে। প্রায় ৮৯০ খৃঃ ভোজের মৃত্যুর অব্যবহিতপরেই গৌড়ের বিগ্রহপাল অল্প সময়ের জন্য কান্যকুব্জপ্রদেশ অধিকার করিয়া আপন নামে মুদ্রার প্রচলন করেন। (১১) অতএব দেখা যাইতেছে খ্রীষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দী ব্যাপিয়া প্রায়ই উত্তরভারতে গুর্জ্জর-পালদ্বন্দ্ব চলিয়াছিল। সুতরাং বারাণসী এবং সারনাথবিহার একবার পালরাজের, একবার কান্যকুব্জাধীশের অধিকারে আসিতেছিল। অবশ্য অধিককালের জন্য কান্যকুব্জরাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। ভোজদেবের পর তাঁহার পুত্র পরাক্রমশালী মহেন্দ্রপাল কান্যকুব্জের সিংহাসনাধিরূঢ় হয়েন। গয়া প্রভৃতি স্থানে তাঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নানা সৎকার্য্যের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। (১২) তিনি

(৫) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে (রাজন্যকাণ্ড) ১৬২ পৃঃ।

(৬) V. A. Smith's Early History of India (2nd Edition) p. 350.

(৭) ভোজদেব গুর্জ্জর-প্রতিহার বংশোদ্ভব বলিয়া কেহ কেহ হয়ত অনার্য্যসম্ভূত বলিবেন। কিন্তু তাঁহার পুত্রের গুরু কবি রাজশেখর মহেন্দ্রপালকে রঘুকুল চূড়ামণি বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কবিকে এ ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী বলিবার সন্তোষজনক কারণ পাই না।

"ভাব কহিজ্জহ এদং কো ভণই রঅণি বল্লহ সিহণ্ডো।
র ঘু উ ল চূ ড়া ম ণি নো মহেন্দ্রপালসস্ কো অ গুরু॥
কর্পূরমঞ্জরী প্রস্তাবনা।

(৮) Sarnath Museum Catalogue No D (f) 54, ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(৯) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৫৭-৫৮, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ কৃত গৌড়রাজমালা, ২৯ পৃঃ।

(১০) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস পৃঃ ১৮৫।

(১১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড) ১৬৫ পৃঃ।

(১২) বাঙ্গলার ইতিহাস, প্রথমভাগ, ২০১ পৃঃ।

বাহুবলে বহুদূর পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, পঞ্চনদ ব্যতীত পশ্চিম সমুদ্র হইতে মগধ পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তরভারত তাঁহার করতলগত ছিল। তাঁহার প্রদত্ত কয়েকখানি লিপি এবং তাঁহার গুরু রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরী হইতে এই সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। (১৩) অতএব সারনাথও তাঁহার অধিকারে আসিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগে মহেন্দ্রপালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন কান্যকুব্জরাজ্যের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়, অন্যদিকে আবার তেমনি দেবপালের মৃত্যুতে গৌড়রাজ্যগৌরব অস্তাচলগামী হইয়া পড়ে। "এই দুইটি পরাক্রান্ত রাজ্যের অধঃপতনের সূচনা হইতেই, উত্তরাপথের অধঃপতনের সূত্রপাত। মুইজুদ্দীন মহম্মদ ঘোরী কর্ত্তৃক উত্তরাপথ বিজিত হইবার এখনও প্রায় তিনশত বৎসর বাকী ছিল। কিন্তু উত্তরাপথের এই তিন শত বৎসরের ইতিহাস তুরুষ্ক-বিজেতার সাদর অভ্যর্থনার উদ্যোগের সুদীর্ঘ কাহিনী মাত্র।" (১৪) মহেন্দ্রপালের পর দশম শতাব্দী ব্যাপিয়া কনৌজের সিংহাসনে পর পর দ্বিতীয় ভোজ, মহীপাল, দেবপাল ও বিজয়পাল প্রভৃতি নরপতিগণ আরোহণ করেন। কিন্তু ইঁহাদের রাজ্যকালে রাষ্ট্রকূট-প্রভাব বিস্তারে ও চন্দেল্লবংশীয় জেজাভুক্তির রাজগণের অভ্যুদয়ে কান্যকুব্জরাজ্য ক্রমশঃই হতশ্রী হইয়া সঙ্কুচিত হইতেছিল। অল্পকালের জন্য দুই একবার কান্যকুব্জ রাষ্ট্রকূটগণ কর্ত্তৃক অধিকৃতও হইয়াছিল। এদিকে আবার গৌড়রাজ্যেরও এই একই দশা। দেবপালের পর পুনঃ পুনঃ রাষ্ট্রকূট কাম্বোজগণের আক্রমণে গৌড়রাজ্য অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। সারনাথবিহার এতদিন কান্যকুব্জরাজ্যাধিকারে থাকিলেও তান্ত্রিক বৌদ্ধমতাবলম্বী পালনৃপতিগণের বিবিধ সাহায্য ও আশ্রয় লাভে বঞ্চিত হয় নাই। কিন্তু দশম শতাব্দীতে এই উভয় রাজ্যের হীন দশায় সারনাথেরও অধঃপতনের সূচনা হইয়াছিল। বৌদ্ধসমাজের বিহারের প্রতি, গন্ধকুটীর প্রতি অবহেলায় বিহারের শিল্পসামগ্রীর জীর্ণতা একাদশ শতাব্দীতে পালরাজ মহীপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাই নানাবিধ সংস্কার কার্য্যের প্রয়োজন অনুভূত হয়। দশম শতাব্দীতে নহে, প্রকৃতপ্রস্তাবে তৎপূর্ব্ব হইতেই, বৌদ্ধ সমাজে তান্ত্রিকতার নানা দোষ স্পর্শ হওয়ায় সারনাথ বিহারের অবনতির পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল। আমরা এস্থলে তান্ত্রিকতার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ধর্ম্মচক্রবিহারে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার প্রভাব

সকলেই জানেন বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে প্রধানতঃ দুইটি সম্প্রদায় চলিয়াছে—একটী হীনযান আর একটী মহাযান। হীনাযান পূর্ব্ববর্ত্তী, মহাযান পরবর্ত্তী। সাধারণতঃ প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মত, মহাযান-মত নাগার্জ্জুনের সময় হইতেই আরম্ভ হয়। কিন্তু নানা প্রমাণ দেখিয়া মনে হয়, মহাযানমত আরও পূর্ব্ব হইতেই চলিতেছিল। (১৫) বৈশালীর বৌদ্ধ সংগীতিতে দুই দলের সৃষ্টি হয়—স্থবিরবাদ ও মহাসাঙ্ঘিক। এই মহাসাঙ্ঘিকগণই কালক্রমে মহাযান হইয়া পড়েন ; নেপালীগণের দেবভাজু ও গুভাজু ধর্ম্ম দেখিয়াও মহাযানদিগের প্রকৃতি বুঝা যায়। (১৬) সারনাথবিহার বৌদ্ধধর্ম্মের আদিভূমি, সুতরাং হীনযান ও মহাযান উভয় সম্প্রদায়েরই নমস্য ক্ষেত্র। তাই আমরা কণিস্কের পর হইতে হর্ষবর্দ্ধনের সময় পর্য্যন্ত হীনযানীয় সম্মিতীয় ও সর্ব্বাস্তিবাদিগণ এবং মহাযানীয়গণের সারনাথে নির্ব্বিরোধে বাসের নানা পরিচয় পাইয়া থাকি। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনের আরম্ভ, সঙ্গে সঙ্গে মহাযান সম্প্রদায়ে তান্ত্রি-

(১৩) 'বৈতালিকঃ—জয় পূর্ব্বদিগঙ্গনা ভুজঙ্গ চম্পাচম্পককর্নপূর লীলানির্জ্জিত রাঢ়াদেশ বিক্রমাক্রান্ত কামরূপ হরিকেলী কেলিকারক অপমানিত জাত্য সুবর্ণ বর্ণ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরত্ব রমনীয়, সুখায় তে ভবতু সুরভি সমারম্ভঃ। (সংস্কৃতানুবাদ) কর্পূরমঞ্জরী ১ম জবনিকান্তর।

(১৪) গৌড়রাজমালা, ৩২ পৃঃ।

(১৫) অশ্বঘোষের গ্রন্থাবলী, লঙ্কাবতার প্রভৃতি এই মতে পূর্ণ।

(১৬) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই মহোদয়ের "বৌদ্ধধর্ম্ম" প্রবন্ধ, নারায়ণ, শ্রাবণ, ১৩২২ এবং N. N. Vasu's Modern Buddhism. Introduction p. 24.

কতারও প্রবেশ লাভ। (১৭) হিন্দুগণের তান্ত্রিকতা গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধগণ সাধনপথে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। বরং তাহাতে বৌদ্ধগণের "হিতে বিপরীত হইল!" তান্ত্রিক মন্ত্রতন্ত্রের অপব্যবহার করিয়া মহাযানীয়গণ নৈতিক অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের বহিরঙ্গের উপাসনায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ যোগিগণের আর সে পূর্ব্বের চরিত্রের শুদ্ধতা, মনের নির্ম্মলতা ছিল না। তাঁহারা অনেক ক্ষেত্রে ভেল্কির আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিলেন। তাই আমরা মহারাজ হর্ষের সময়ে লিখিত নাগানন্দে, যশোবর্ম্মার সময়ে লিখিত মালতীমাধবে এবং মহেন্দ্রপালের সময়ে লিখিত কর্পূরমঞ্জরীতে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার, ভৈরব-ভৈরবীর ভীষণতার বিবরণ দেখিতে পাই। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে মহাযানীয়দিগের যোগাচার সম্প্রদায় ক্রমশঃ মন্ত্রযানে পরিণত হইতেছিল। (১৮) নবম শতাব্দীতে মন্ত্রযানমত বিক্রমশিলা প্রভৃতি স্থানে সর্ব্বজনগৃহীত হইয়াছিল। 'আদি কর্ম্মরচণ' প্রভৃতি এই মতের পুস্তকও এই সময়ে রচিত হয়। দশম শতাব্দীতে মন্ত্রযানের অন্তর্গত কালচক্রযান (১৯) হইতে বজ্রযান (২০) নামে একটী ভীষণ মত জন্মলাভ করে। এই মতবাদ নেপালে ও তিব্বতেই অধিকভাবে আধিপত্য লাভ করিয়াছিল। (২১) মহাযানীয় সকল শাখার মধ্যেই নানা দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। তাঁহারা হিন্দুগণের নিকট হইতে যেরূপ তান্ত্রিকতা গ্রহণ করিয়াছিলেন সেইরূপ অনেক ক্ষেত্রে হিন্দুতন্ত্রোক্ত দেবদেবীর পূজার আদর্শও লইয়াছিলেন। তারা, চামুণ্ডা, বারাহী প্রভৃতি দেবীগণ হিন্দুর পুরাণে তন্ত্রে বহুদিন হইতেই পূজিতা হইয়া আসিতেছেন। মন্ত্রযান ও বজ্রযান সম্প্রদায় এইগুলি সম্ভবতঃ গ্রহণ করিয়া অনেক স্থলে নামের ও আকারের পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। যথা, জঙ্গলীতারা, বজ্রবারাহী, বজ্রতারা মারীচী প্রভৃতি ভীষণাদেবী তাঁহাদের অভিনব সৃষ্টি। (২২) আবার ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, হিন্দুগণ পুনরায় ইহাঁদের নিকট হইতে অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি ধার করিয়াছিলেন। মঞ্জুশ্রী, অক্ষোভ্য অবলোকিতেশ্বর প্রভৃতি মূর্ত্তি মহাযানীয়গণের সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং এ সকল মূর্ত্তির পূজা কুষাণ ও গুপ্তযুগেও বর্ত্তমান ছিল। পরবর্ত্তিকালের হিন্দুগণ বৌদ্ধ মঞ্জুশ্রীকে মঞ্জুঘোষ, বৌদ্ধ অক্ষোভ্যকে শিব বা ঋষি-বত্তালীকে বার্ত্তালীরূপে নীরবে গ্রহণ করিয়াছেন। (২৩) বৌদ্ধতান্ত্রিক প্রভাব ভারতের নানা বৌদ্ধস্থানে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, সারনাথে আমরা বহু বৌদ্ধশক্তিমূর্ত্তি দেখিতে পাই। যথা তারা নং B (*f*) 2, B (*f*) 7, বজ্রতারা নং B (*f*) 6, মারীচী নং B (*f*) 23। এই সকল মূর্ত্তি নিশ্চয়ই পালরাজগণের প্রভাবে নবম ও দশম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। পালনৃপতিগণ সম্ভবতঃ মন্ত্র-বজ্রযানের উপাসক ছিলেন, তাঁহাদিগের মন্ত্রযানের কেন্দ্র বিক্রম শিলাবিহার নির্ম্মাণ এবং তারানাথের উক্তি হইতে একথা সপ্রমাণ করা যায়। (২৪) অতএব ধর্ম্মচক্রবিহারে নবম ও দশম শতাব্দীতে মন্ত্রযান-বজ্রযান সম্প্রদায়ের

(১৭) H. Kern's Manual of Buddhism, p. 133

(১৮) Modern Buddhism, pp. 3, 4.

(১৯) কালচক্রযান অর্থে ধ্বংস হইতে পরিত্রাণ পাইবার গতি বুঝায়। ওয়াডেল সাহেব এই যানকে ভূত-পিশাচবিদ্যা (Demonology) বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রকৃতই ইহা তাই। ইহাতে বুদ্ধকে পর্য্যন্ত পিশাচরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। নেপালের বৌদ্ধধর্ম্ম সাধারণতঃ এই যানের অন্তর্গত।

(২০) এই পথের উপাসনা মধ্যবিত্ত ও বিবাহিত বৌদ্ধগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কামলোক হইতে রূপলোকে যাইতে হইবে। আরও অগ্রসর হইতে হইবে, তবে অরূপলোক। তথায় নিরাত্মাদেবীর সহিত মিশিলেই নির্ব্বাণ হইবে।

(২১) Grunwedel's "Mythologie des Buddhismus, pp. 51, 94, 100. 101.

(২২) Taratantra (V. R. S.) Introduction by Pandit Akhoy Kumar Maitra B. L, p. 11, 21.

(২৩) Introduction to Modern Buddhism by M. M. Haraprashad Sastri c. I. E. p. 12 and N. N. Vasu's "Archæological Survey of Mayurvanja Vol I, Introduction p, XCV. Taratantra, Intro. p. 14.

(২৪) "He (Taranath) adds that during the

বৌদ্ধগণ বিরাজিত ছিলেন ইহা একরূপ স্থিরসিদ্ধান্ত। পালরাজগণ একদিকে নানাস্থানে শিবপ্রতিষ্ঠা করিতেন, অন্যদিকে বৌদ্ধভাবে শিবশক্তিরও উপাসনা করিতেন। এই উভয় বিষয়েরই নিদর্শন সারনাথে আছে।

একাদশ শতাব্দীতে সারনাথের পরিচয়

দশম শতাব্দীর অন্তভাগে কান্যকুব্জরাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। আবার তাহার উপর সবুক্তিগীন, সোলতান মামুদ প্রভৃতি মুসলমানগণ এই সময় হইতে একাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদ পর্য্যন্ত উত্তরভারতে উপর্য্যুপরি যে অত্যাচারপূর্ণ আক্রমণের অভিনয় করিতেছিল তাহাতেও কান্যকুব্জরাজ্যের দুর্দ্দশার অবধি ছিল না। ১০১৮ সালে মামুদের কনৌজ আক্রমণে নৃপতি রাজ্যপাল পলায়ন করিয়াও অব্যাহতি পান নাই। সুতরাং এ সময়ে সারনাথবিহারের অধোগতির বিষয় কল্পনাতীত। কনৌজ অধিকারের পর মামুদ কতেহর (রোহিলখণ্ড) জয় করেন। কাহারও কাহারও মতে তিনি বারাণসীর ও সারনাথের মন্দিরাদিও লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। (২৫) শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, বারাণসী তখন গৌড়রাজ্যভুক্ত এবং গৌড়সেনা-রক্ষিত ছিল এবং সম্ভবতঃ বারাণসী তীর্থ মামুদের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। (২৬) এই মতটী আরও দুইটী কারণে আমাদের সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। প্রথমত পরধর্ম্মদ্বেষী মামুদের আক্রমণ 'যেমন তেমন' হয় না, তিনি যে তীর্থস্থানেই আক্রমণ করিয়াছেন, তাহা ধ্বংস করিয়া ছাড়িয়াছেন। তাঁহার বারাণসী সম্বন্ধে এইরূপ ব্যাপারের পরিচয় কোন ইতিহাসে নাই। দ্বিতীয়তঃ "ঈশান চিত্র ঘণ্টাদি-কীর্ত্তি রত্ন শতানি" নির্ম্মাণ করাইতে মহীপালের বহু সময় লাগিয়াছিল এবং নিশ্চয়ই এগুলির নির্ম্মাণ-সময় সারনাথের সংস্কারকার্য্যের সময়ের অথবা ১০২৬ খৃষ্টাব্দের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। মামুদের আক্রমণ সময়ে অথবা তাহার অব্যবহিতপরে "কীর্ত্তিরত্নশতানি" নির্ম্মাণ করা অসম্ভব ব্যাপার। নিয়ালতিগীনের পূর্ব্বে (১০৩৩) বারাণসী মুসলমানস্পর্শে আসে নাই, একথা মুসলমান ঐতিহাসিকগণও লিখিয়াছেন। (২৭)

সারনাথে মহীপালের সংস্কার কার্য্য

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে নানা কারণে সারনাথ বিহার বহুদিন যাবৎ জীর্ণদশাপন্ন হইতেছিল। একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পাল-নরপাল মহীপালের অভ্যুদয়ে ম্রিয়মাণ বৌদ্ধসমাজ ক্ষণকালের জন্য নবজীবন লাভ করিয়াছিল। তাঁহার সময়ে বহু বৌদ্ধগ্রন্থ লিখিত হয়, বহু বৌদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিব্বতে এই সময়েই বৌদ্ধধর্ম্মের লুপ্তগৌরব পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল। মহীপালই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা অতীশকে বিক্রমশিলায় আহ্বান করিয়া প্রধান আচার্য্যপদে বরণ করেন। সুতরাং এই পাল নৃপতির সময়ে লুম্বিনীবন, নালন্দা প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের আদিস্থান সারনাথেরও যে জীর্ণোদ্ধার কার্য্য সাধিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? ১০২৬ খৃষ্টাব্দে

---

reign of the Pala dynasty there were many masters of magic, Mantra Vajracaryas, who, being possessed of Various Siddhis, performed the most prodigious feats." Kern's Manual of Buddhism p. 135, Taranath 201 (quoted)

(২৫) "This much, however, is certain, that in A. D. 1026 a restoration of the main monuments of Sarnath took place, and we may perhaps connect this restoration with the capture of Benares by Mahmud of Ghazni which occured in A. D. 1017." —Sarnath Catalogue. Vogel's Introduction, p. 7.

(২৬) গৌড়রাজমালা ৪১, ৪২ পৃঃ। ১০২০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই মহীপাল বারাণসী রাজ্য জয় করেন, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। "The Palas of Bengal" by R. D. Banerjee ; Memoirs of A. S. B. Vol. V, No 3, p. 70.

(২৭) Tankhu-s Subuttigin, Elliot's History of India, Vol. II, p. 123.

উৎকীর্ণ মহীপালদেবের সারনাথ-লিপিতে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীবামরাশি নামক গুরুদেবের পাদপদ্ম আরাধনা করিয়া গৌড়াধিপ মহীপাল যাঁহাদের দ্বারা পূর্ব্বে কাশীধামে ঈশান ও চিত্র ঘণ্টাদি (দুর্গার) শত শত কীর্ত্তি-রত্ন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, সেই স্থিরপাল ও বসন্তপালের দ্বারা মৃগদাবে ১০৮৩ সম্বতে "ধর্ম্মরাজিকা" বা অশোকস্তূপ "সাঙ্গ-ধর্ম্মচক্রে" র (?) জীর্ণ সংস্কার করিয়াছিলেন ; এবং অষ্ট মহাস্থান বা সমগ্র বিহারের শিলা-নির্ম্মিত গন্ধকুটী (Main Shrine) নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। (২৮) এই সকল কারণে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এই সময়কে সর্ব্বদেশাবচ্ছিন্ন "সংস্কার-যুগ" বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য সারনাথে এই মর্ম্মের একখানি মহীপাল-লিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

সারনাথের সংস্কারের অব্যবহিতপরেই বারাণসী পালরাজগণের হস্তচ্যুত হইয়া চেদিরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। (২৯) কিছুদিন পর্য্যন্ত বারাণসী ও সারনাথ চেদিরাজ গাঙ্গেয়দেবের অধিকারে ছিল। গাঙ্গেয়দেবই নানা যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় বোধ হয় নব-বিজিত বারাণসী রাজ্যের সেরূপ সুরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। তাই, আমরা তাঁহার সময়ে গজনীর অধীশ্বর মাসুদের (Ma' sud) অধীন লাহোরের শাসন কর্ত্তা নীয়ালতিগীন কর্ত্তৃক কয়েক ঘণ্টার জন্য বারাণসী লুণ্ঠনের কথা শুনিতে পাই। (৩০) এই লুণ্ঠন ব্যাপার অতি সামান্য। বারাণসীতে তিনটী বাজার মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য অধিকারেই ইহার পর্য্যবসান হইয়াছিল। মুসলমানগণের এই আক্রমণ যে সারনাথ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় নাই, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ১০৪০ সালে গাঙ্গেয়দেবের মৃত্যুর পর তৎপুত্র মহাবীর কর্ণদেব সুবিস্তৃত পৈতৃক রাজ্যের অধিকারী হয়েন। একখানি লিপি হইতে জানা যায় যে, ১০৪২ খৃষ্টাব্দে বারাণসীরাজ্য তাহার রাজ্যসীমাভুক্ত ছিল। (৩১) সারনাথেও তাহার কর্ত্তৃত্ব সূচক একখানি লিপি [D (i) ৪] প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহাতে তারিখ রহিয়াছে, কলচুরি সংবৎ ৮১০ অথবা ১০৫৮ খৃষ্টাব্দ। লিপি হইতে বুঝা যায়, সারনাথের তখনও নাম ছিল, "সদ্ধর্ম্ম-চক্রপ্রবর্ত্তন" বিহার, মহাযানীয়গণ ইহাতে প্রবল ছিলেন, মহাযানীয় শাস্ত্র "অষ্টসাহস্রিকার" প্রতিলিপি এই সময়ে প্রস্তুত করান হইয়াছিল। তাহার পিতার সাংবাৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে (৭৯৩ চেদি সংবতে) প্রয়াগ হইতে কর্ণদেব যে তাম্রশাসন দান করেন, তাহাতে আছে যে তিনি কর্ণাবতী নামে নগরী এবং কাশীধামে কর্ণমেরু নামে একটী সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। (৩২) চেদিপতি কর্ণদেব প্রায় ৬ বৎসর রাজত্ব করেন। সুতরাং একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত সারনাথ বিহার তাহারই কর্ত্তৃত্বে ছিল, অনুমান করা যাইতে পারে।

চেদিরাজ কর্ণদেবের ধর্ম্মচক্র-বিহারে কর্ত্তৃত্ব

একাদশ শতাব্দীর প্রায় অন্তভাগে মহোবীর চন্দেল্ল নৃপতি কীর্ত্তিবর্ম্মা কর্ণদেবকে পরাভূত করিয়া

(২৮) গৌড়লেখমালা ১০৪-১০৯ পৃষ্ঠা বিশেষ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য। Venis in J. A. S. B. ও দ্রষ্টব্য।

(২৯) R. D. Banerji's The Palas of Bengal (M. A. S. B.) p. 74.

(৩০) শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় ও প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় উভয়েই নিঃসন্দেহে লিখিয়াছেন যে নীয়ালতিগীণের আক্রমণ সময়ে বারাণসীরাজ্য পালগণের অধিকৃত ছিল। এরূপ লিখিবার কারণ বুঝিতে পারি নাই। মুসলমান ইতিহাসে স্পষ্টতঃ লিখিত আছে—"Unexpectedly he (Niyaltigin) arrived at a city which is called Banaras and which belonged to the territory of Gang. Never had a Muhammadan army reached this." Elliot. Vol II, p. 123. ইহা ছাড়া সারনাথে প্রাপ্ত কর্ণদেবের লিপিও বারাণসীতে চেদী অধিকারের পরিচয় প্রদান করে। প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব মহাশয়ও গাঙ্গেয়দেবের যে রাজ্যসীমা দিয়াছেন তাহাতে বারাণসীও অন্তর্ভুক্ত ছিল, মনে হয়। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড) ১৮৩ পৃঃ।

(৩১) Epi. Ind. Vol II, p. 300.

(৩২) Ibid. ১৮৮ পৃঃ। Ibid, p. 305.

তাঁহার বিস্তৃত কীর্ত্তি ও রাজ্য নানাভাবে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। (৩৩) সম্ভবতঃ এই সময়ে কিছু-কালের জন্য সারনাথও তাঁহার করতলগামী হইয়া-ছিল। ইহার পরে আবার একাদশ শতাব্দীর শেষপাদে কান্যকুব্জের নবপ্রতিষ্ঠিত গাহড়বালবংশের নৃপতি চন্দ্রদেব বারাণসী, অযোধ্যা প্রভৃতি উত্তরাপথের প্রধান রাজ্যগুলি বিজয় করিয়াছিলেন। (৩৩) এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত বারাণসীর তথা সারনাথের শাসন-কর্তৃত্ব গাহড়বালরাজগণের হস্তেই ছিল। তাঁহা-দিগের দ্বারা বারাণসীর এবং সারনাথের বিবিধ উন্নতির পরিচয় আমরা প্রাপ্ত হইয়া থাকি। চন্দ্রদেবের পৌত্র এই বংশের বীর-চূড়ামণি গোবিন্দচন্দ্রের বারাণসী প্রভৃতি স্থানে আবিষ্কৃত অসংখ্য লিপি ও মুদ্রা হইতে তৎকর্তৃক কান্যকুব্জের প্রনষ্ট গৌরবের পুন-রুদ্ধারের বিষয় অবগত হইতে পারা যায়। (৩৫) তাঁহার রাজ্যকাল সম্ভবতঃ ১১১৪-১১৫৪ খৃষ্টাব্দ। তিনি একবার মগধ আক্রমণ করিতে যাইয়া লক্ষ্মণসেনের সহিত সংঘর্ষের সৃষ্টি করেন। তাহার ফলে লক্ষ্মণসেন তাঁহাকে পরাজিত করিয়া কিছু সময়ের জন্য প্রয়াগ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং বিশ্বেশ্বরক্ষেত্রে ও ত্রিবেণীসঙ্গমে যজ্ঞযূপসহ বহু সমরজয়স্তম্ভ স্থাপিত করেন। (৩৬) অবশ্য লক্ষ্মণসেনের এই বারাণসী অধিকার অল্পকালস্থায়ী হইয়াছিল।

গোবিন্দচন্দ্র-মহিষী কুমরদেবী কর্ত্তৃক ধর্ম্মচক্রে মূর্ত্তি-সংস্কার

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে গোবিন্দচন্দ্রের অন্যতমা মহিষী কুমরদেবী সারনাথে ধর্ম্মাশোককালীন একটী ধর্ম্মচক্রজিন বা বুদ্ধমূর্ত্তির সংস্কার উপলক্ষে অপূর্ব্ব গৌড়ী-

পরলোক গত অধ্যাপক ডাঃ ভিনিস্

রীতিতে নিবদ্ধ একখানি দীর্ঘ প্রশস্তি প্রদান করেন। এই প্রশস্তি হইতে অনেকগুলি ঐতিহাসিক সংবাদ অবগত হওয়া গিয়াছে। সংক্ষেপে, রাষ্ট্রকূটবংশীয় মহন-দুহিতা শঙ্করদেবীর সহিত পীঠিপতি দেবরক্ষি-তের বিবাহ হয়। শঙ্করদেবীর গর্ভে কুমরদেবীর জন্ম। কান্যকুব্জরাজ গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার পাণিগ্রহণ

(৩৩) V. A. Smith's Early History of India (2nd Ed.) p. 362; কাশী-পরিক্রমা, ২৪৭ পৃঃ; বাঙ্গালার ইতিহাস ২৩১, ২৩২ পৃঃ, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড) ১৮৭ পৃঃ।

(৩৫) Early History of India (2nd Edn) p. 355—"* * Chandradeva, who established his authority certainly over the Delhi territory."

(৩৫) এই বংশের মুদ্রার কথা শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যো-পাধ্যায় কৃত "প্রাচীন মুদ্রা" প্রথম ভাগ ২১৪, ২১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩৬) রাজন্যকাণ্ড, পৃঃ ৩৩৯, R D. Banerji's "The Palas of Bengal," pp. 106-107.

করেন। (৩৭) রামপালরচিত অনুসারে মহন গৌড়াধিপ রামপালের সম্পর্কে মাতুল হইতেন। কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহকালে এই মহন, গৌড়াধিপের দক্ষিণ হস্তের ন্যায় বিরাজমান ছিলেন। এই লিপিতে মহন কর্ত্তৃক দেবরক্ষিতের পরাজয়ের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহকালে অথবা তাহার পূর্ব্বে পীঠীপতি রামপালের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিবেন। (৩৮) গোবিন্দচন্দ্র হিন্দু হইলেও, কুমরদেবীর বৌদ্ধপ্রীতি সারনাথে বিহার-নির্ম্মাণ বুদ্ধমূর্ত্তির সংস্কার ও "ধর্ম্মচক্রজিন শাসন-সন্নিবদ্ধ" তাম্রশাসন দান প্রভৃতি কাযে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। প্রশস্তিতে আছে, দুষ্ট-তুরুষ্কসেনা হইতে বারাণসীকে রক্ষা করিবার জন্য মহাদেব গোবিন্দচন্দ্রকে প্রহরিরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন। (৩৯) ইহা হইতে অনুমান হয় যে, নীয়াল্‌তিগীণের পরেও তুরস্কগণ বিশ্রাম-সুখ অনুভব না করিয়া বারাণসী প্রভৃতি স্থানের প্রতি ধাবিত হইতে বিরত হন নাই। গৌড়রাজমালায় বহ রামশাহ প্রভৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারাণসী আক্রমণ বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। (৪০) সুতরাং গোবিন্দচন্দ্র দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বারাণসী ও সারনাথকে তুরুষ্ক আক্রমণ হইতে অবশ্যই রক্ষা করিয়াছিলেন।

(৩৭) বল্লভরাজ (পীঠীর) মহন (রাষ্ট্রকূট) চন্দ্র (গহড়বালবংশীয়

দেবরক্ষিত + শঙ্করদেবী — মদনচন্দ্র

কুমরদেবী + গোবিন্দচন্দ্র (১১১৪-১১৫৪)

(৩৮) বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, ২৫৮ পৃঃ।

(৩৯) "বারাণসীং ভুবনরক্ষণদক্ষ একো
দুষ্টাত্ [তু] রুকসুভটাদ্রবিতুং হরেণ।
উক্তো হরিসস্ পুনরত্র বভুব তস্মাদ
গোবিন্দচন্দ্র ইতি [চ] প্রথিতাভিধানৈঃ ॥১৬॥"

কুমরদেবীর প্রশস্তি

Epi. Ind. Vol. IX, pp. 323ff.

(৪০) গৌড়রাজমালা ৬৯ পৃঃ। আক্রমণকারিগণের হিন্দুস্থানে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার কথা পাওয়া যায়। লক্ষ্য করিবার বিষয়, ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে হইলেই ধর্ম্মকেন্দ্র বারাণসীর দিকেই বিধর্ম্মিগণের আগমন স্বাভাবিক। Elliot, Vol. II, p. 251.

ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই গোবিন্দচন্দ্রের পৌত্র জয়চাঁদের নাম অবগত আছেন। তাঁহার জামাতা চৌহাননৃপতি পৃথ্বীরাজের চিরস্মরণীয় নামও পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘোরীকে বহুবার পরাজিত করিয়া নিজেও অদৃষ্টচক্রে পরাজিত হইয়াছিলেন। (৪১) এই পরাজয়ে হিন্দু রাজত্বের অবসান ঘটিয়াছিল। একে একে উত্তরভারতের সমস্ত রাজ্যই মুসলমানগণের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে জয়চন্দ্রকে পরাভূত করিয়া ঘোরীর সেনাপতি কুতব্‌উদ্দীন্ বারাণসীর মন্দিরাদি চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন।

মুসলমান কর্ত্তৃক বারাণসী ধ্বংস

"তাজুল-ম-আসির" নামক মুসলমান ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, মুসলমানগণ ১০০০ মন্দির চূর্ণ করিয়া তৎস্থানে মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন। ঘোরী তৎপরে বারাণসী ও তাহার উপকণ্ঠের শাসনবিধান করিয়া গজনী অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। (৪২) কামিলুৎ তওয়ারিখ্ নামক অন্য মুসলমান ইতিহাসে আছে যে, বারাণসীর রাজা ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজা। ঘোরীর সৈন্যগণ রাজাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া বারাণসীকে সর্ব্বস্বান্ত করেন। সমস্ত হিন্দুর রক্তে মহীতল প্লাবিত হয়, অপরিমিত ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করা হয়। ঘোরী নিজেও বারাণসীতে আসিয়া ১৪০০০ উষ্ট্র-পৃষ্ঠে ধনরাশি বোঝাই করিয়া গজনীর দিকে চলিয়া যান। (৪৩) নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, বারাণসীর হিন্দুমন্দিরের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সারনাথের বৌদ্ধকীর্ত্তিগুলিও মুসলমানগণের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। (৪৪) সেই হইতে সার-

(৪১) রাজপুত-শৌর্য্যের কথা বলিতে কেহই সত্যের অপলাপ করিতে পারেন নাই। Lane Poole's "Mediæval India," p. 61.

(৪২) Elliot's History of India, Vol. II, pp. 223, 224.

(৪৩) Ibid, pp. 250-251.

(৪৪) "It was, no doubt, this violent overthrow

নাথ-বিহার চিরপতিত হইল, আর সমসাময়িক ইতিহাসও তাহার কাহিনী বলিতে পারে না। মুসলমানগণ সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া মানিতেন না। সেই জন্য মুসলমান ইতিহাসে কুত্রাপি 'বৌদ্ধ' নাম দেখিতে পাওয়া যায় না।

ধর্ম্মচক্র-বিহারের অধঃপতন-রহস্য বুঝিতে হইলে সমগ্র ভাবে বৌদ্ধসমাজধ্বংসের কারণ-পরম্পরার কিঞ্চিৎ আলোচনারও প্রয়োজন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বৌদ্ধতান্ত্রিকতার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ সমাজবলেরও হীনাবস্থা লক্ষ্য করা গিয়াছে।

সারনাথ বিহারের তিরোভাব

হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর হইতে উত্তর ভারতে খণ্ড খণ্ড রাজ্যের উৎপত্তি হেতু, জনসাধারণের ন্যায় বৌদ্ধসমাজকেও নানা রাষ্ট্রবিপ্লব সহ্য করিতে হইয়াছিল। আবার হর্ষের পর বৌদ্ধধর্ম্মের শক্তিলোপের জন্য কুমারিল ও শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা শুধু দার্শনিক বিচারে বৌদ্ধগণকে পরাস্ত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, শৈবমতের পুনর্জ্জীবন দান করিয়া নানা স্থানে শৈবমঠ মন্দিরাদিও স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। সেই সময় হইতেই শৈব ও শাক্তমত বিশেষভাবে প্রবল হইয়া উঠে। হিন্দু নৃপতিগণ বৌদ্ধ-সমাজকে কিছু কিছু সাহায্য করিলেও, হিন্দু সমাজ তাঁহাদের আনুকূল্যে উত্তরোত্তর যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছিল, বৌদ্ধ-সমাজও সেইভাবে ক্ষীণতর হইতেছিল। অষ্টম শতাব্দীতে আরবগণের আগমনের সহিতও বৌদ্ধ-সমাজের পতনের নানা সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বৌদ্ধগণের মধ্যে নৈতিক অবনতির যে বিষ প্রবেশ করিয়াছিল তাহাই বৌদ্ধসমাজদেহকে ক্রমে ক্রমে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিতেছিল। এই সকল কারণে হিন্দুগণের বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আস্থা কমিয়া গিয়াছিল। এইরূপে ধ্বংসের মুখে অগ্রসর শিথিল বৌদ্ধসমাজের চরম দশা একটী আকস্মিক কারণেই ঘটিয়াছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে "গর্গযবন কালান্তক কাল" তুরুষ্কগণ বায়ুকোণ হইতে একটী ভীষণ ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় আসিয়া সমগ্র দেশ ছাইয়া ফেলিল, তাহাতে উত্তরাপথের হিন্দুরাজত্ব উড়িয়া গেল, মঠ-মন্দির চূর্ণ হইল, নরনারীর রক্তে গঙ্গা বহিল, বৌদ্ধসমাজও এক ফুৎকারে ধরণীতল হইতে চিরদিনের জন্য অপসারিত হইল। হিন্দুরাজত্ব গেল, হিন্দু সভ্যতা একেবারে গেল না, মাঝে মাঝে হিন্দু গৌরব আবার মাথা তুলিয়াছিল। বারাণসী এক সময়ের জন্য বিধ্বস্ত হইয়া ডুবিল, আবার কালস্রোতে ভাসিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সারনাথের বৌদ্ধ সমাজ কাল-জলধির অতলতলে একবার যে ডুবিল, আর কখনও উঠিয়াছিল কি?

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

---

of Hindu rule in Hindusthan which brought about the final destruction and abandonment of the Great Convent of the Turning of the wheel of the Law." Sarnath Catalogue, Vogel's Introd, p, 8.

হেমচন্দ্র

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

হাইকোর্টে প্রবেশ। সাহিত্য-সাধনার প্রথম ফল—"চিন্তা-তরঙ্গিণী"।

অধ্যাপনা। কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল।

যাঁহারা হেমচন্দ্রকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন এবং তাঁহার চরিত্র সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করেন যে, হেমচন্দ্রের অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠা অসাধারণ ছিল। দরিদ্রের সন্তান সচরাচর সরকারী আফিসে সামান্য চাকুরী পাইলেই জীবন সার্থক বলিয়া মনে করে। কিন্তু হেমচন্দ্র দেশের ও সমাজের সেবা করিবার অধিকতর অধিকার লাভের জন্য চিরদিন আপনার সম্মুখে এক উচ্চ আদর্শ রাখিয়া-

ছিলেন এবং আজীবন তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে আত্মোন্নতি দ্বারা সেই উচ্চ আদর্শে উপনীত হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, বি এ পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইবার পর কেরাণীগিরি করিয়া জীবন অতিবাহিত করিবার ইচ্ছা হেমচন্দ্রের আদৌ ছিল না।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী, মাধবচন্দ্র ধর, পতিতপাবন সেন, গঙ্গাচরণ সেন, যাদবচন্দ্র পালিত এবং বৈষ্ণবচরণ আঢ্য এই কয়জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শঙ্কর ঘোষের লেনে 'কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল' নামক এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথমে ইঁহারাই বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহন করিতেন। পরে বিখ্যাত ধনী শ্যামাচরণ মল্লিক মহাশয় উহার পৃষ্ঠপোষক হন এবং যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করেন। কিছুদিন পরে এই বিদ্যালয় নিজ আয়ে চলিতে সমর্থ হইয়াছিল।

এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবামাত্র হেমচন্দ্র হিসাব বিভাগের চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা মাসিক বেতনে উহার প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী গভর্ণমেণ্ট সেক্রেটারিয়েটে কর্ম্ম করিয়া তখন পেন্সন পাইতেছিলেন। ভবিষ্যতে যে চাকুরীতে উন্নতি ও পেন্সনের আশা ছিল, হঠাৎ সেই চাকুরীর মায়া ত্যাগ করিয়া হেমচন্দ্র বে-সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন নাই, একথা ঠাকুরদাস হেমচন্দ্রকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

প্রথমে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতৃগণ স্বয়ং বিদ্যালয়ের কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। কিন্তু তাঁহারা দেখিলেন যে, এ বিষয়ে অধিকতর অভিজ্ঞ ব্যক্তির হস্তে পরিদর্শনের ভার দিলে বিদ্যালয়ের উন্নতি হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই সময়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনেক অবসর ছিল। সুতরাং বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ বিদ্যাসাগর ও (টেলিমেকস','নীতিপাঠ' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা) পণ্ডিত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই বিদ্যালয়ের কার্য্যাদি পরিদর্শন করিতে অনুরোধ করিলেন এবং তাঁহারা অনুরোধপালনে স্বীকৃত হইলে তাঁহাদিগকে বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য করিয়া লইলেন।
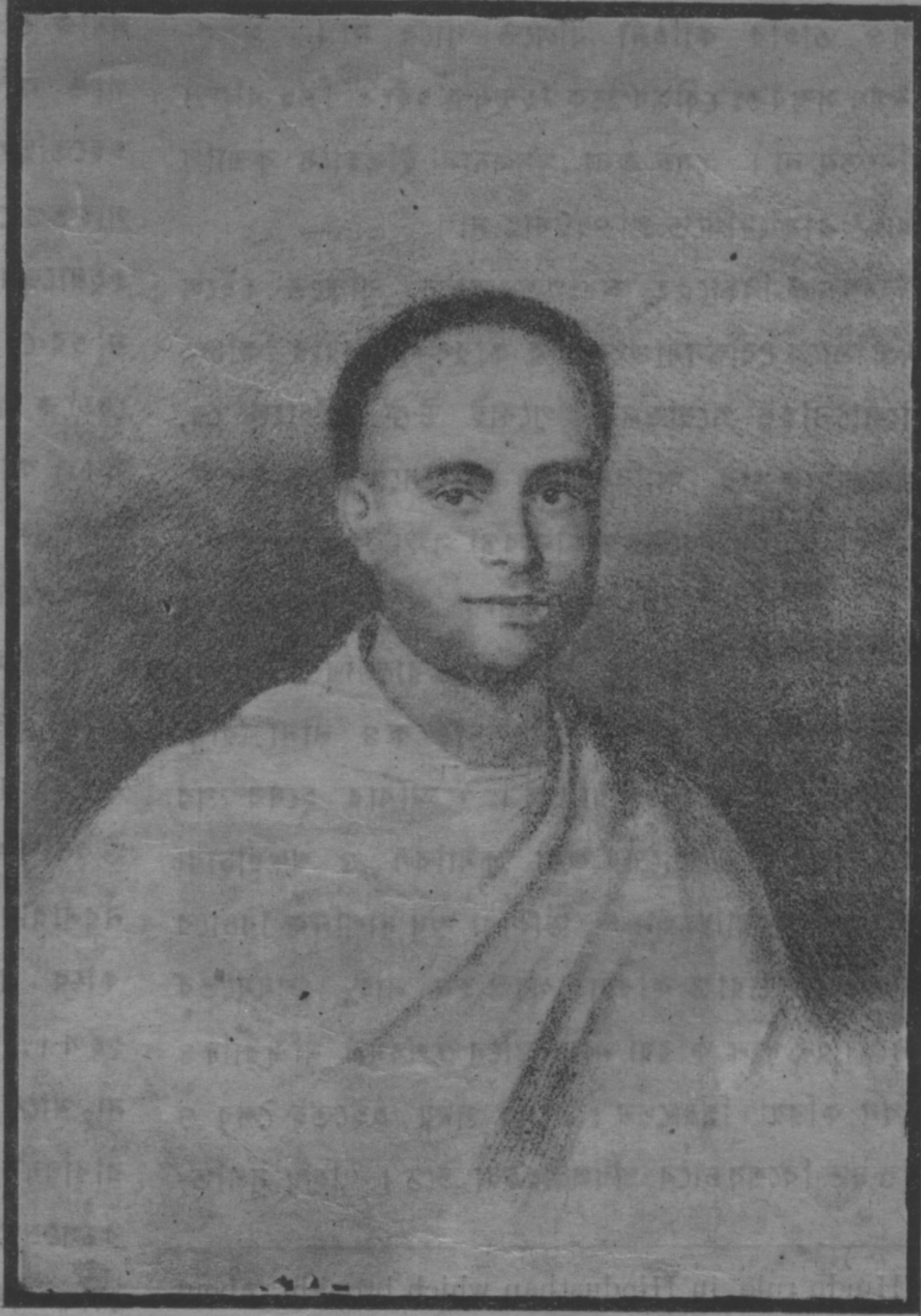
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (তরুণ বয়সে)

পরে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতৃগণ একে একে অবসর গ্রহণ করিলে উহার সম্পূর্ণ ভার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হস্তে আসিয়া পড়ে এবং উহা "মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউসনে" পরিণত হয়।

হেমচন্দ্র অতি সুচারুরূপে এই বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন এবং বিদ্যাসাগর ও রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অধ্যক্ষগণের প্রশংসাভাজন হন।

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রমাপ্রসাদ রায়ের পুত্রগণের গৃহশিক্ষক।

এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ রমাপ্রসাদ রায় * তাঁহার পুত্রদ্বয়ের জন্য একজন উত্তম গৃহশিক্ষকের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। বোধ হয় রমাপ্রসাদের স্বগ্রামনিবাসী, শিষ্য ও স্নেহভাজন প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের সুপারিষে রমাপ্রসাদ হেমচন্দ্রকে তাঁহার পুত্রদ্বয়ের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। বিদ্যালয়ের কার্য্যের পর অবসরকালে হেমচন্দ্র রমাপ্রসাদের দুইপুত্র হরিমোহন ও প্যারীমোহনকে পড়াইতেন।

সহৃদয়তার একটি দৃষ্টান্ত।

যখন হেমচন্দ্র ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিতেন সেই সময়ের একটি ঘটনার কথা আমরা হেমচন্দ্রের সতীর্থ শ্রীযুক্ত নীলমণি কুমার মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি। সেই ঘটনা হইতে হেমচন্দ্রের চরিত্রের একটি বিশেষত্ব স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় বলিয় আমরা এইস্থানে উহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

হেমচন্দ্র অতিশয় কোমল হৃদয় ও পরদুঃখকাতর ছিলেন। একদা বিদ্যালয়ের একটি ছাত্র দৈবদুর্ঘটনাবশতঃ পড়িয়া গিয়া হস্তে ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হয়। হেমচন্দ্র তদ্দর্শনে অতিশয় বিচলিত হন এবং তৎক্ষণাৎ স্বয়ং তাহাকে গাড়ী করিয়া মেডিক্যাল কলেজে লইয়া যান। তখন স্বনামধন্য চিকিৎসক (পরে রায়বাহাদুর) সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন। হেমচন্দ্র সোদরোপম সূর্য্যকুমারকে দেখিয়া আশান্বিত হইলেন এবং বালকটীকে শীঘ্র পরীক্ষা করিয়া ঔষধাদি দিতে অনুরোধ করিলেন। সূর্য্যকুমার উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন "This is an interesting case of compound fracture." সূর্য্যকুমারকে ধীর ও শান্তভাবে পরীক্ষা করিয়া গম্ভীরভাবে উক্ত মন্তব্য উচ্চারণ করিতে শুনিয়া পর-

* সন ১৩২৩ সালের কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণের "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে "নীরবকর্ম্মী রমাপ্রসাদ রায়" শীর্ষক প্রবন্ধে বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক ইঁহার জীবনকথা আলোচিত হইয়াছিল।

দুঃখ নিবারণার্থ অধীরহৃদয় হেমচন্দ্র কিছু বিরক্ত হইয়া বলেন, "তোমরা ত বেশ লোক। একজনের যখন প্রাণ যায় তখন তোমরা Interesting case বলিয়া Experiment কর?" পরে হেমচন্দ্র প্রায় এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া চিকিৎসকগণের হৃদয়ের কঠোরতার জন্য তাঁহাদিগের প্রতি অনুযোগ করিতেন।

রমাপ্রসাদ রায়

(মাননীয় বর্দ্ধমানাধিপতির অনুমতিক্রমে 'মহাতাপ মঞ্জিলে' রক্ষিত তৈলচিত্র হইতে গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে)

এইস্থানে সূর্য্যকুমারের সহিত হেমচন্দ্রের যে কিরূপ ঘনিষ্ঠ সখ্যতা ছিল তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি গল্প বিবৃত করা যাইতে পারে। এ গল্পটি হেমচন্দ্রের মধ্যম জামাতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় হেমচন্দ্রের জননীর মুখে শুনিয়াছিলেন এবং উহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই:—

সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারীর সহিত হেমচন্দ্রের আবাল্য প্রণয় ছিল। বাল্যকালে সূর্য্যকুমার হেমচন্দ্রের বাটীতে আসিলে হেমচন্দ্রের জননী আনন্দময়ী আঁচলে মুড়ী রাখিতেন এবং দুই বন্ধুতে বসিয়া গল্প করিতে করিতে তাহা খাইতেন। যখন উভয়ে সংসারক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া উচ্চ সম্মান ও যশোলাভ করিয়াছিলেন, তখনও সূর্য্যকুমার হেমচন্দ্রের বাটীতে আসিয়া সময় সময় সেই শৈশবের সুখস্মৃতিবিজড়িত পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া আনন্দময়ীকে

রায় সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুর

বলিতেন, "মা, আপনি আজ আবার আঁচলে মুড়ী লইয়া বসুন, আমরা আবার দেখি,—ছেলেবেলার মত দু'জনে আপনার আঁচল হইতে মুড়ী লইয়া খাই।" হেমচন্দ্রের জননী তাহাই করিতেন, দুইবন্ধু তাঁহার দুই পার্শ্বে বসিয়া কত কথা কত গল্প করিতে করিতে তাহা আহার করিতেন। কি সুন্দর, কি মধুর সে দৃশ্য!

এই সুখ-চিত্র হেমচন্দ্রও একস্থানে তাঁহার নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত করিয়াছেন:—

"পড়ে না কি মনে কত দিন, হায়,
'মা' 'মা' বলি প্রবেশি আলয়,
কত সুখে খেতে সখায় সখায়
জননী তুলিয়া দিতেন যাহা?

সেইরূপে পুনঃ করিয়া উৎসব
জীবন-মধ্যাহ্নে এস সখা সব
লভি একদিন—যে সুখ দুর্ল্লভ
সংসার-তুফানে ডুবেছে আহা !"

বি-এল্, পরীক্ষা। যখন হেমচন্দ্র রমাপ্রসাদের পুত্রদ্বয়ের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন, তখন রমাপ্রসাদ ব্যবহারাজীবদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সমাজে তাঁহার অতুলনীয় প্রতিষ্ঠা। বোধ হয়, তাঁহার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়াই হেমচন্দ্র ব্যবস্থাশাস্ত্র অধ্যয়নে উৎসুক হন। তিনি তাঁহার ক্কিলপ্রাপ্ত অবসরকাল ব্যবস্থাশাস্ত্র অধ্যয়নে অতিবাহিত করিতে আরম্ভ করিলেন। খিদিরপুর হইতে

রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর, সি-আই-ই

কলিকাতায় আসিয়া ট্রেণিং স্কুলের শিক্ষকতা, রমাপ্রসাদ রায়ের ছাত্রগণকে অধ্যাপনা এবং নিজের ব্যবস্থাশাস্ত্র অধ্যয়ন, এতগুলি কার্য্য সম্পাদন করিতে অসুবিধা হয় বলিয়া এই সময়ে তিনি চাঁপাতলায় একটি 'মেসে' কিছুকাল অবস্থান করেন। কুচবিহারের ভবিষ্যৎ দেওয়ান রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর এই সময়ে এই 'মেসে' থাকিয়া আইন অধ্যয়ন করিতেছিলেন।

কালিকাদাস বাবুর সহিত হেমচন্দ্রের পূর্ব্ব হইতেই আলাপ ছিল। কালিকাদাস বাবু কৃষ্ণনগর হইতে জুনিয়ার স্কলার্শিপ পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করিয়া যখন কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতে আসেন, তখন তিনি খিদিরপুরে এক ভদ্রপরিবারের মধ্যে বাস করিতেন। এই সময় হইতেই হেমচন্দ্রের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হয়। কালিকাদাস বাবুর অপ্রকাশিত আত্মচরিতের অনেক স্থলে হেমচন্দ্রের নামোল্লেখ দেখা যায়। কালিকাদাস বাবুর অন্যতম পুত্র, হাইকোর্টের উকীল, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সৌজন্যে আমরা তাঁহার মনোরম ও কৌতূহলপ্রদ আত্মচরিতের পাণ্ডুলিপি হইতে কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিতে সমর্থ হইলাম :—

"খিদিরপুর হইতে ছেকড়া গাড়ীতে কলেজ যাইতে হইত। কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একখানা ভাড়াটীয়া গাড়ী ছিল। গাড়ীতে তাঁহার পুত্র হেমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র কলেজ যাইত। আমিও গাড়ীর এক অংশ চারিটাকা মাসিক দেওয়ার অঙ্গীকারে ভাড়া করি। মোটে গাড়ীতে ছয়টি ছাত্র যাইত। ইহাতে কি প্রকার সুখে যাইতাম তাহা অনুভব করা যাইতে পারে। কিন্তু তখন কষ্টে কষ্টবোধ হইত না। সমস্তই সুখময় বোধ হইত। গাড়ীর ঘোড়া দুইটী অতি দুর্ব্বল ছিল। তাহারা খিদিরপুরের পুলে উঠিতে বিশেষ আপত্তি করিত। হুসেন কোচম্যান একবার কোচবাক্স হইতে কশাঘাত করিত, পরে আবার নামিয়া অশ্বদের মুখ ধরিয়া টানিত। এই প্রকার অনেক যত্ন করিলে পুলে উঠা যাইত। কিন্তু তাহার পর আর গোল হইত না। হেমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্রের সহিত আমার বন্ধুতা হয়। তাঁহারা উভয়েই অতি বুদ্ধিমান ও নির্ম্মল চরিত্রের লোক ছিলেন। তাঁহাদের পিতা ও মাতা আমাকে স্নেহ করিতেন। এই হেমচন্দ্রই এক্ষণে বঙ্গের এক মহাকবি। তাঁহাদের অবস্থা আমার অপেক্ষা অতি মন্দ ছিল। কিন্তু অধ্যবসায়ের গুণে তিনি সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া বি-এ ও বি-এল্ পরীক্ষা উত্তমরূপে দিতে সক্ষম হন ও হাইকোর্টের একজন প্রধান উকীল বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে আমার অনেক উপকার হইয়াছিল।"

* * * *

"গৃহস্থ বাটীতে সাড়ে আট বা নয়টার সময় প্রস্তুত অন্ন পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিত। বাটীর মেয়েরা কোন মতে ভাত ও একটা কোন প্রকার তরকারী দিত। কখন কখন এমত ঘটিত যে হেমবাবুরা প্রস্তুত হইয়া আসিয়া রাস্তা হইতে 'কালিকাদাসবাবু, কালিকাদাসবাবু' বলিয়া ডাকিতেন। আমি অর্দ্ধভোজন করিয়া তাঁহাদের গাড়ীতে উঠিতাম।"

* * * *

"খিদিরপুর থাকার সময় হেমবাবু আমার সহিত গ্রীষ্মাবকাশে একবার বল্লা* গিয়াছিলেন। দুইজনে দুইটি পুস্তক ও বস্ত্রের ব্যাগ লইয়া আনন্দ মনে গমন করি। তখন বর্দ্ধমান অতি স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। ম্যালেরিয়া জ্বর পিশাচের আগমন হয় নাই। বর্দ্ধমান রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকটস্থ একটি দোকানে জলপান করিয়া কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে ঐ জলে মিছরী কি গুলা দেওয়া ছিল কি না। অমিশ্রিত নির্ম্মল জল তখন এত সুমিষ্ট ছিল! রৌদ্রের সময় পথিমধ্যে দুইজনে যাইয়া একটি আমবাগানে আম পাড়িয়া খাইয়া তৃষ্ণা নিবারণের কথা এখনও মনে আছে।"

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এল্ পরীক্ষা দেন। কিন্তু অবসরের অল্পতাবশতঃ পাঠে তিনি তাদৃশ মনোযোগ দিতে পারেন নাই বলিয়া বি-এল্ উপাধিলাভের যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে অসমর্থ হইলেন এবং পরীক্ষক তাঁহাকে এল্-এল্ উপাধিলাভের যোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। হেমচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র এবং অধ্যক্ষ সাটক্লিফের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। সাটক্লিফ সাহেব পরীক্ষককে তাঁহার কাগজ পুনরায় পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন এবং হেমচন্দ্রকে সেই পত্রখানি পরীক্ষকের নিকট লইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। হেমচন্দ্র তরুণবয়সসুলভ কৌতূহলবশতঃ লেফাফা হইতে উক্ত পত্রখানি খুলিয়া পড়েন এবং খুলিবার সময় লেফাফাখানি ছিঁড়িয়া ফেলেন। অতঃপর সেই ছিন্ন লেফাফাখানি লইয়া পরীক্ষকের নিকট যাওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে বলিয়া তিনি সেই পত্রখানি তাঁহার কাছে লইয়া যান নাই। যথাসময়ে ফল

* কালিকাদাস বাবুর মাতুলালয়।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশিত হইল। সেই বৎসর রমেশচন্দ্র মিত্র, কালিকাদাস দত্ত প্রভৃতি ৮জন ছাত্র বি-এল্ উপাধি লাভ করেন এবং একমাত্র হেমচন্দ্র এল্-এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়া ঘোষিত হন।

১৮৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি নূতন নিয়ম* হয় যে, যে সকল এল্-এল্ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র গ্রাজুয়েট হইয়াছেন তাঁহারা ৩০৲ টাকা ফি দিলেই বি-এল্ উপাধি প্রাপ্ত হইবেন। হেমচন্দ্র পূর্ব্বেই বি-এ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ৩০৲ টাকা জমা দিয়া ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বি-এল্ উপাধি লাভ করেন। হেমচন্দ্র

* "Any Licentiate in Law who has graduated in Arts, may, on paying the usual fee, be admitted to the Degree of Bachelor in Law without further examination."

তাঁহার বন্ধুগণের নিকট বলিতেন, "কেবল ত্রিশ টাকা দিয়া আমি বি-এল্ হইয়াছি, পরীক্ষা দিয়া বি-এল্ হই নাই।"

মুন্সেফী।—এল্-এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হেমচন্দ্র শিক্ষকের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্থানে রমাপ্রসাদের পুত্রদ্বয়ের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইলেন।

রমাপ্রসাদ হেমচন্দ্রকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। হেমচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বলরত্ন। সুতরাং গভর্ণমেণ্টের বিচারবিভাগে কর্ম্ম পাইতে হেমচন্দ্রকে অধিক আয়াস পাইতে হয় নাই। তিনি প্রথমে শ্রীরামপুরে এবং পরে হাবড়ায় ১০০৲ একশত টাকা মাসিক বেতনে প্রতিনিধি মুন্সেফরূপে নিযুক্ত হইলেন।

হেমচন্দ্র অধিককাল মুন্সেফী করেন নাই। শ্রীযুক্ত নীলমণি কুমার মহাশয় বলেন যে, যে কারণে হেমচন্দ্র চাকুরী পরিত্যাগ করেন তাহা তাঁহার স্বাভাবিক মহত্ত্বের পরিচয় দেয়। একবার কোন মোকদ্দমার রায় প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে হেমচন্দ্র তাঁহার পিতার নিকট সেই মোকদ্দমা সম্বন্ধে কোন কথা শুনিতে পান। তাহাতে তাঁহাকে রায় প্রকাশ করিতে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হয়। তিনি বুঝিতে পারেন যে উপযুক্ত সাক্ষ্যের অভাবে অথবা উকীলদের নির্ব্বুদ্ধিতায় অনেক সময় সত্যনির্দ্ধারণ দুষ্কর হইয়া উঠে। নীলমণিবাবু বলেন, এই জন্যই তিনি মুন্সেফী পরিত্যাগ করিয়া ওকালতী করিতে সঙ্কল্প করেন। অপর কেহ কেহ বলেন, সুদূর প্রবাসে সন্তানকে যাইতে দিতে তাঁহার স্নেহময়ী জননী আপত্তি প্রকাশ করায় মাতৃভক্ত হেমচন্দ্র চাকুরী পরিত্যাগ করা বিধেয় বলিয়া মনে করেন। স্বয়ং হেমচন্দ্রের স্নেহপ্রবণ হৃদয়ও যে প্রিয়তম আত্মীয়স্বজনগণের সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে কাতর হইয়াছিল, এরূপ অনুমানও অসঙ্গত নহে। তাঁহার এক কাব্যের একস্থানে নিম্নোদ্ধৃত পদগুলিতে তিনি যে তাঁহার নিজেরই অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই :—

"যেই জন শিশুকালে, মা বলে জননী কোলে,
ছুটাছুটি করে আসি স্তন্যপান করেছে।
যেই জন নিশাভাগে, নারী সনে অনুরাগে
নিরমল পূর্ণমাসী-শশধরে হেরেছে॥
পীড়াতুর শয্যাগত, প্রাণবায়ু ওষ্ঠাগত,
হয়ে যেবা প্রিয়জন প্রিয়ভাষা শুনেছে।
গৃহবাসে কিবা সুখ, প্রবাসেতে কি অসুখ,
বনবাসে কি যাতনা সেই জন বুঝেছে॥"

হাইকোর্টে প্রবেশ ও নর্টনের Law of Evidence অনুবাদ।—১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ১৯শে মার্চ্চ দিবসে হেমচন্দ্র হাইকোর্টের উকীল শ্রেণীভুক্ত হন এবং ইহার কিছুদিন পরেই ওকালতী আরম্ভ করেন। হাই-কোর্টে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই কাহারও প্রসার প্রতি-পত্তি হয় না—সকলকেই কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হয়। হেমচন্দ্র ধনী ছিলেন না এবং মুন্সেফী পরিত্যাগ করায় তাঁহার আর্থিক কষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এই সময়ে হেমচন্দ্র অতি অপ্রত্যাশিত ভাবে একটি কায প্রাপ্ত হন। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বলেন, গবর্ণমেণ্ট (শ্রীযুক্ত নীলমণি কুমার বলেন, বোধ হয় বিখ্যাত আইন গ্রন্থ প্রকাশক মেসার্স হে এণ্ড কোং) এই সময়ে Norton's Law of Evidence নামক ইংরাজী আইন গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনূদিত করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন এবং হেমচন্দ্রকেই উপযুক্ত পাত্রবোধে তাঁহাকে উচিত পারিশ্রমিক (বোধ হয় ১৫০০৲ বা ২০০০৲) দিয়া এই গ্রন্থের অনুবাদ করিবার ব্যবস্থা করেন। সুতরাং হেমচন্দ্রকে চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া একেবারে আয়শূন্য হইতে হয় নাই।

'চিন্তাতরঙ্গিণী।'—পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে হেমচন্দ্র বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন এবং স্বয়ং মধ্যে মধ্যে কবিতাদি রচনা করিতেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে আচার্য্য কৃষ্ণকমলের জ্যেষ্ঠাগ্রজ সুপণ্ডিত রামকমল ভট্টাচার্য্য আত্মহত্যা করেন। ইহার কিছুদিন পরে হেমচন্দ্রের বাল্যসুহৃদ শ্রীশচন্দ্র তাঁহার পিতার কোন আদেশ তাঁহার বিবেকবিরুদ্ধ বলিয়া পালন করিতে

সঙ্কোচ অনুভব করেন এবং গুরুজনের আদেশলঙ্ঘনরূপ মহাপাপ হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য আত্মহত্যা-রূপ আর একটি মহাপাপের আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, শ্রীশচন্দ্র যে কখনও এরূপ মহাপাপে লিপ্ত হইবেন একথা কেহ স্বপ্নেও ভাবেন নাই। শ্যামাচরণ বাবু বাল্যাবধি অতিশয় রুগ্ন ছিলেন অথচ তাঁহার আকাঙ্ক্ষা অতিশয় উচ্চ ছিল। সেই আকাঙ্ক্ষা কখনও সার্থক হইবে না বলিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার আত্মহত্যা করিবার প্রবৃত্তি হইত এবং অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের সমক্ষে মধ্যে মধ্যে এইরূপ সংকল্প প্রকাশ করিতেন। শ্রীশবাবুই তাঁহাকে বলিতেন আত্মহত্যা মহাপাপ, কদাচ ওরূপ চিন্তাকে প্রশ্রয় দিতে নাই। হেমচন্দ্র বলিতেন "আত্মহত্যা is sheer cowardice."

শ্রীশচন্দ্রের এই আকস্মিক আত্মহত্যায় হেমচন্দ্র অতিশয় শোকাচ্ছন্ন হন, কারণ, হেমচন্দ্রই লিখিয়াছেন,

"শিশু যদি শোক পায়, ভুলালে সে শোক যায়,
জ্ঞানীচিত্ত-শোকানল নাহি ঘুচে বাঁচিতে।"

এবং এই শোকের আবেগেই তাঁহার প্রথম কাব্য 'চিন্তাতরঙ্গিণী' লিখিত হয়। শোকের পবিত্র উচ্ছ্বাসে অনেক প্রসিদ্ধ কবির কাব্য-উৎস উন্মুক্ত হইয়াছে। শোকের আবেগেই মহাকবি মিল্টনের 'Lycidas', শেলীর 'Adonais', টেনিসনের 'In Memoriam,' এবং ম্যাথু আর্ণল্ডের 'Thyrsis' রচিত হইয়াছিল।

'চিন্তাতরঙ্গিণী' কাব্যের মুখপত্রে কবি এই কয়টি কথা লিখিয়াছিলেন :—

'পৃথিবীর সার পদার্থ মনুষ্য, মনুষ্যের সার পদার্থ মন।'

ত্রয়োবিংশ বর্ষীয় যুবক হেমচন্দ্রের এই প্রথম কাব্যগ্রন্থ আজিকার কাব্যের উন্নত আদর্শ লইয়া বিচার করিলে উহার প্রতি অন্যায় করা হইবে। উহার প্রকাশকালে বাঙ্গালায় সুরুচিসম্পন্ন ও সুললিত কাব্যগ্রন্থের একান্ত অভাব ছিল। রঙ্গলালের একখানিমাত্র গ্রন্থ 'পদ্মিনী উপাখ্যান' তখন প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাহা কি ইংরাজীশিক্ষিত, কি ইংরাজী-অনভিজ্ঞ সকলের নিকটেই সমুচিত সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল। মাইকেলের 'তিলোত্তমা' এবং বোধ হয় 'মেঘনাদবধ'ও এই সময় প্রকাশিত হইয়াছিল কিন্তু "অকাল-কোকিল" মধুসূদনের কাব্য উপভোগ করিবার জন্য তখনও বাঙ্গালী পাঠক প্রস্তুত হন নাই। সুতরাং হেমচন্দ্রের 'চিন্তাতরঙ্গিণী' পাঠক সমাজে বোধ হয় কিছু অতিরিক্ত সমাদর লাভ করিয়াছিল। আচার্য্য কৃষ্ণকমল (বোধহয় হাবড়া জিলার অন্তর্গত বেতড় নিবাসী শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত 'হাবড়া হিতকরী' পত্রে) উহার একটি প্রশংসা-সূচক সমালোচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্যের দুই এক-স্থলে ইংরাজী কবিদিগের ভাবসঙ্কলন আছে। আচার্য্য কৃষ্ণকমল সমালোচন প্রসঙ্গে দেখাইয়া দেন যে হেমচন্দ্রের

'কেন বা হইবে আন—পুরুষের শত টান' ইত্যাদি

বায়রণের Man's love, of man's life is a thing apart" (Don Juan, Canto I.) ইত্যাদির অনুবাদ।

তৎকালে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পাঠযোগ্য নির্দ্দোষ কাব্যের অত্যন্ত অভাব ছিল। আচার্য্য কৃষ্ণকমল তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি এই গ্রন্থ কলেজের পাঠ্যপুস্তকশ্রেণীভুক্ত হওয়া উচিত বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন। সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ, হেমচন্দ্রের শিক্ষাগুরু কাউয়েলও এই গ্রন্থের যথেষ্ট প্রশংসা করেন। উভয়ের চেষ্টায় ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের এল্-এ পরীক্ষার্থীদিগের পাঠ্য-পুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়।

"চিন্তাতরঙ্গিণী"তে ভারতচন্দ্র ও কাশীরামের প্রভাব বিশেষভাবে পরিস্ফুট। বাল্যরচনাসুলভ দোষাদি বর্ত্তমান থাকিলেও উহার স্থানে স্থানে এমন কতকগুলি উচ্চভাব-সম্বলিত পদ আছে যে তাহা বাঙ্গালার সুভাষিত-সংগ্রহে চিরদিন স্থান পাইবার যোগ্য। "দেবের অসাধ্য রোগ—চিন্তার বিকার"-গ্রস্ত গ্রন্থনায়ক দেখিতেছেন সংসার নরক-সদৃশ,

"সাধু পুরুষের নয় রহিবার স্থান।
ভীষণ নরক-কুণ্ড কূপের সমান॥
দৌরাত্ম্য, নিষ্ঠুরাচার, ধরা অলঙ্কার।
দ্বেষ পরহিংসা, আর নৃশংস আচার॥
দম্ভ, অহঙ্কার, মিথ্যা, চুরী, পরদার।
প্রতারণা, প্রতিহিংসা কোপ অনিবার॥"

তিনি বলিতেছেন,—

"ধর্ম্মশীল অকুটিল আছে কয় জনা।
কে না মিথ্যা বলে, কে না করে প্রতারণা॥
ইচ্ছা করে একেবারে পৃথিবী জুড়িয়া।
নূতন মানব জাতি আনি হে গড়িয়া॥"

তাঁহার দুঃখ,—

"দেশাচার রাক্ষসীরে বধিতে নারিনু।
স্বদেশের দুঃখভার ঘুচাতে নারিনু॥
*　　*　　*　　*
মনের বাসনা কই পূরাতে পারিনু।
মানবমণ্ডলী কই পবিত্র করিনু॥
প্রীতিবারি সমাজেতে সেচিলাম কই।
স্বার্থ, দ্বেষ, পরহিংসা, নাশিলাম কই॥"

তাঁহার মতে,—

"————অসার সংসার!
দণ্ড দুই আলো. পরে ঘোর অন্ধকার॥
ভয়ের এ নাট্যশালা ছায়াবাজী প্রায়।
দিন দুই ধুমধাম পরেতে ফুরায়॥"

পুনশ্চ :—

"বিঘোর আঁধারময় এ ভব ভিতরে।
সুখ যাহা দেখ তাহা মুহূর্ত্তের তরে।
অমানিশা, তাহে মেঘ, কালির বরণ।
তার মাঝে যেন সৌদামিনী দরশন॥"

কবির প্রবোধবাক্য বা উত্তর কি উত্তেজনাময়ী ও পুরুষোচিত—

"কি ছার পাপের ঢেউ দেখি, ভয় কর।
পায়ে করি ঠেলে দেও, নিজ বীর্য্য ধর॥
সাগরের মাঝে যেন অক্ষয় অচল।
বৃথায় প্রহারে ঝড় তরঙ্গের দল॥
সেইরূপ সাধুজন সংসার ভিতরে।
বদ্ধমূল স্থির ভাব আপনার ভরে॥
কিছুকাল কষ্ট পায় ধার্ম্মিক সুজন।
অনন্ত কালের তারা সুখের ভাজন॥"

অপর একস্থলে কবি বলিতেছেন,—

"বৃথা চিন্তা কর দূর,　　রণমাঝে হও শূর,
কি কারণ এত ভয় পাও।
বিপদে যে ভয় পায়,　　লোকে দেখে হাসে তায়,
পুরুষের প্রতাপ দেখাও॥"

বর্ত্তমান প্রস্তাবে হেমচন্দ্রের এই বাল্যরচনার বিস্তৃত আলোচনা করিবার স্থান নাই। এই কাব্যগ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত পদ্যগুলিতে কবির তাৎকালীন ধর্ম্মবিশ্বাসের ছায়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়, তাই সেগুলির প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমরা 'চিন্তা-তরঙ্গিণী' সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য সমাপ্ত করিলাম :—

"দুর্ব্বল মানব মন সেই সে কারণ।
পূজে ভবদেব করি প্রতিমা গঠন॥
সাকার স্বরূপে তাই নিরাকার ভাবে।
মাটী পূজা করি ভাবে মোক্ষপদ পাবে॥
একবার এরা যদি প্রকৃতি-মন্দিরে।
প্রবেশি ডাকিতে পারে জগত-বন্ধুরে॥
শিব দুর্গা কালী নাম ভুলিবে সকল।
পরব্রহ্ম নাম মাত্র জপিবে কেবল॥
কি প্রতিমা দশভুজা করেছে গঠন।
সে কি তাঁর রূপ যাঁর ব্রহ্মাণ্ড সৃজন॥
কথায় সৃজন যাঁর কথায় প্রলয়।
দশভুজা নারীরূপ তাঁরে কি সাজয়॥
কিবা জবা বিল্বদলে তুষিবে সে জনে।
ধরা পূর্ণ ফলে ফুলে করেছে যে জনে॥
কিবা ধূপ দীপ গন্ধ তাঁর যোগ্য দান।
যেই জন ধূপ ধুনা কস্তুরি নিদান॥
কি মন্দিরে তাঁর মূর্ত্তি করিবে ধারণ।
সসাগরা ক্ষিতি ব্যোম যাঁহার রচন॥
সার মন্ত্র জানি এক পরব্রহ্ম নাম।
মুক্তি পদ জানি সেই পরব্রহ্ম ধাম॥"

(ক্রমশঃ)

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

বিদ্যুৎ-বিলাস

(শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত-ছন্দের অনুসরণে)

সিন্ধুর রোল
মেঘে ভিড়্‌ল আজ,
গরজে বাজ,
বিদ্যুৎ বিলোল—
রক্ত চোখ!
ঝঞ্ঝার দোল
সারা সৃষ্টিময়,—
জাগে প্রলয়;
তাণ্ডব বিভোল্—
ছায় দ্যুলোক।

দেব-ঝর্ণার
জলে জল্‌সা আজ
ধরণী মাঝ,
কিন্নর-বীণার
উঠ্‌ছে তান;
অঞ্জন্ মেঘ
চলে ঐরাবৎ
জুড়ি' জগৎ
ঝঞ্ঝার আবেগ
ছায় পরাণ!

বৃষ্টির স্রোত
করে বিশ্ব লোপ;
নিয়েছে থোপ—
নিশ্চুপ কপোত
নিশ্চপল;
পর্জ্জন্যের
চলে শূন্যে রথ,—
ধ্বনি মহৎ;
নির্জ্জন্ নীপের
কুঞ্জতল।

ইন্দ্রের ধন
হের পৃথ্বী ছায়—
সোণা বিছায়,
বর্ষার সৃজন
দিক্ ছাপায়!
অঙ্কুর তার
ত্যাজে গর্ভবাস,
ফেলে নিশ্বাস—
ভুঁই-ভাগ আবার
ভুঁই চাঁপায়!

সূর্য্যের নাম
হল শব্দ-শেষ,
প্রতি নিমেষ—
তন্দ্রার ত্রিযাম
অন্ধকার!
মেঘ্-মল্লার
শত ঝিল্লি গায়,
যথি লতায়
চুম্বন বিথার
অপ্সরার!

ঝাপ্‌সার রূপ
শুধু পষ্ট আজ
ভুলাল কাজ
মৌনের অরূপ
মূর্চ্ছনায়;
শষ্পের গান
ভরে তুল্‌ছে মন
সারাটি ক্ষণ
বাষ্পের বিতান
রস ঘনায়।

বিদ্যুৎ ঠোঁট
হানে ধূম্রচূড়
ঝড় গরুড়,
পাথ্‌শাট আচোট
বন লোটায় ;
গর্জ্জন, গান,
মেশে হর্ষ, খেদ,—
পাশরি ভেদ ;
বজ্রের বিধান
ফুল ফোটায় !

বজ্রের বীজ
ফেরে রাত্রিদিন
করে নবীন,
মৃত্যুর কিরীচ্‌
প্রাণ বিলায় !
বিস্ময়, ভয়,
মেশে হর্ষে, আজ,
রাজাধিরাজ
রুদ্রের সদয়
দান-লীলায় !

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

শ্রুতি-স্মৃতি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যৌবনের সেই প্রথম সমারম্ভের দিন হইতেই আজিকার এই জীবনাপরাহ্ন পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিতেছি, আমি কোথাও যাইবার সময়ে হয় যাত্রাকালে কিম্বা পথিমধ্যে কোন না কোনও একটা বিভ্রাট ঘটিবেই ঘটিবে—হয় কোন জিনিষপত্র হারাইয়া যাইবে, কেহ পকেট কাটিয়া টাকা পয়সা যাহা পায় তাহা আত্মসাৎ করিবে, কিম্বা সহযাত্রী কাহারও সঙ্গে বিবাদ বচসা কিছু হইবে ; নিতান্ত এরূপ কিছু না ঘটিলেও অদৃষ্ট এবং গ্রহের ফলে গাড়ীর এঞ্জিন বিগ্‌ড়াইয়া ট্রেণখানি এমন কোনও অস্থানে অচল হইয়া দাঁড়াইবে যেখানে কোন আহারাদির ব্যবস্থা অসাধ্য না হইলেও দুঃসাধ্য ত বটেই। প্রয়াগ হইতে আগ্রা যাইবার পথে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই—সহযাত্রী দুইজন পশ্চিম প্রদেশীয় ভদ্র মুসলমান যুবকের সহিত আমাদের বিবাদ বাধিয়া গেল। বৃত্তান্তটী একটু বিশদ করিয়া

প্রয়াগে খরচপত্র হইয়া যে পরিমাণ টাকা সঙ্গে রহিল তাহাতে প্রথম শ্রেণীর একটি কামরা রিজার্ভ করা চলিতে পারিত ; কিন্তু ঐ খরচটা অপব্যয় মনে করিয়া নিজের জন্য একখানি প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনিয়াছিলাম এবং আমার সঙ্গীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিমোহন ঘোষের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা 'বার্থ' লওয়া হইয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম এইরূপে আগ্রায় গিয়া পঁহুছিয়া, শূন্য তহবিল পূর্ণ করিয়া লইবার জন্য বাড়ীতে তার করিয়া টাকা আনাইয়া লইব। রেলওয়ে কোম্পানীর কবল হইতে কিছু অর্থ রক্ষা করিবার এই কৌশল আমার ঘটে যোগায় নাই, ইহা হরিমোহন বাবুরই বুদ্ধিমত্তার ফল। ইহার ফলে কিছু অর্থ বাঁচিল বটে, কিন্তু অনর্থ যাহা ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল তাহা গড়াইলে অনেকদূর যাইতে পারিত।

ঘটনাটি এই :—আমার ট্রাঙ্ক, হাণ্ডব্যাগ, বিছানার

রচনা করিয়া লইলাম, ডাক্তার বাবু সেই গাড়ীরই সংলগ্ন একটী দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় গেলেন; ভগবতী, নবীন এবং সূপকার ঈশানচন্দ্র প্রভৃতি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। আমার কামরায় একটীমাত্র প্রবীণ ইংরাজ যাত্রী ছিলেন, তিনিও আগ্রায় যাইতেছেন। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রবীণে নবীনে প্রণয় হইয়া গেল—যাহা তৃতীয় পক্ষের গৃহিণী ভিন্ন অপরের সহিত হওয়া শুনিয়াছি নাকি অতীব দুর্ঘট। যাহা হউক, এই শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোকটী ভদ্র সন্তান—আমি তাঁহার তৃতীয় পক্ষের ভার্য্যা না হইলেও আমার সহিত তিনি উপযাচক হইয়া ভদ্রোচিত ব্যবহারে আমাকে আপ্যায়িত করিলেন, আমিও যথারীতি সেই ব্যবহারের প্রতিদান তাঁহাকে দিয়া, রাত্রিযাপনের জন্য যথাসম্ভব সুখশয্যা রচনা করিয়া লইলাম। আমাদের উভয়ের মধ্যে যদিও তৃতীয় পক্ষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না এবং যদিও রেলগাড়ীর বেঞ্চের উপরে বিস্তৃত স্বল্প প্রশস্ত শয্যা বাসকশয়নের পুষ্পশয্যার সহিত কোন প্রকারেই তুলনীয় নহে, তথাপি আমার রাত্রি নিরুপদ্রবেই কাটিয়াছিল। কিন্তু হরিমোহন বাবুর অদৃষ্ট দেবতা সে রাত্রিতে তাঁহার উপর সস্মিত কৃপা দৃষ্টিপাত করেন নাই, বরং ভ্রুকুটিভঙ্গী করিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট ভয় দেখাইয়াছিলেন। যে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় ডাক্তার বাবু প্রবেশ করিলেন, সেই কামরায় পূর্ব্ব হইতেই পশ্চিমদেশীয় দুইটি ভদ্রবেশধারী মুসলমান যুবক উপরের দুইখানি ঝুলনা খাটে তাঁহাদের শয্যা রচনা করিয়া পরমানন্দে রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এবং এই বিদেশী বঙ্গবাবুটির সেই কামরায় প্রবেশ তাঁহারা যেন অনধিকার প্রবেশের মত দুষ্কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিলেন এইরূপ তাঁহাদের আচরণে প্রথম হইতেই বুঝা গিয়াছিল। বাবু প্রবেশ করিয়া যখন তাঁহার ভাঙ্গা হিন্দী বুলীতে কুলির সহিত 'বাত্' চালাইতেছিলেন, তখন এই যুবকদ্বয় তাহাদের ভ্রুকুটিকুটিল মুখশ্রী যৎপরোনাস্তি বিভীষণ করিয়া খাস উর্দ্দু জবানে তাঁহার নিকট হইতে জানিতে চাহিয়াছিল তিনি কোন শ্রেণীর টিকিট কিনিয়াছেন। উত্তরটি সম্ভবতঃ প্রশ্নের অনুরূপ মুখভঙ্গীতে দেওয়া হইয়া থাকিবে। এই সকল সূত্রপাত। গাড়ীতে অপর একজন ছিলেন, তিনি পূর্ব্ব হইতেই নীচের তিনখানি বেঞ্চের যেখানিতে নিজের স্থান করিয়া লইয়াছিলেন সেখানি কামরার মধ্যস্থ বেঞ্চ, সুতরাং আমাদের ডাক্তার বাবুকে ঝুলনা খাটের নীচের একখানি বেঞ্চেই আপন বিছানা বিছাইতে হইয়াছিল। তাঁহার মাথার উপরের ঝুলনা খাট যে যুবকটী ছিলেন, তিনি কারণে অকারণে যখনই তাঁহার উচ্চমঞ্চ হইতে অবতরণ করেন, ডাক্তার বাবুর উপাধানটিকে তাঁহার পাদপীঠ করিয়া লন; নৈশ ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য যে সকল সুখাদ্য কোর্মা কাবাব ভোজন করিতেছিলেন, সে সকলের অস্থি প্রভৃতি ত্যজ্য পদার্থ নিতান্ত ভ্রমক্রমে এবং অনবধানতা প্রযুক্ত ডাক্তার বাবুর ক্ষুদ্র শয্যার উপরে না পড়িয়া যায় না; সোডা বা জল (কিম্বা অপর কোনরূপ তীব্রতর পানীয় তাহা ঠিক জানি না) যাহা পান করিতেছিলেন, অসাবধানতা বশতঃ সে সকলের কিয়দংশও গরীব ডাক্তারের শয্যাতল সিক্ত করিয়া দিতে লাগিল। নিরুপায় ডাক্তার অপর বেঞ্চখানিতে গিয়া আশ্রয় লইলেন, কিন্তু সেখানির উপরের ঝুলনায় যে যুবকটি ছিলেন তিনি পূর্ব্ববর্ণিত যুবকের বন্ধু এবং তাঁহার নিকট হইতেও ডাক্তার বেচারা ভদ্রতর ব্যবহার পান নাই।

এই সকল ঘটনা নিশীথ রাত্রি পর্য্যন্ত চলিতেছিল, কিন্তু ইহার বিন্দু-বিসর্গ আমি রাত্রিতে জানিতে পারি নাই। আমার প্রবীণ ইংরাজ সহযাত্রীর সহিত নানাবিধ কথাবার্ত্তায় আমি অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। ডাক্তার বাবু দুই একবার আমার গাড়ীর নিকট আসিয়া আমাকে নিদ্রিত দেখিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। সে ট্রেণে দ্বিতীয় শ্রেণীর অপর গাড়ী না থাকায় সেই গাড়ীতেই কোনও প্রকারে রাত্রিযাপন করিয়াছেন। এইখানে বলিয়া রাখি, আমাদের ডাক্তার হরিমোহন সেদিনে শারীরিক বলবীর্য্যে অনেক বাঙ্গালী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠই ছিলেন, এবং তাঁহার

সাহসও নিতান্ত কম ছিল না, কিন্তু আমার বিনানুমতিতে কোন প্রকার অশিষ্টতা করা সঙ্গত মনে না করিয়াই তিনি পরম ধৈর্য্য সহকারে সে রাত্রি কোনমতে উৎপীড়নকারীর অত্যাচার সহ্য করিয়াছিলেন। রাত্রি প্রভাতে ডাক্তার কেবল চক্ষুরুন্মীলন করিয়াছেন, তখনও শয্যা ত্যাগ করেন নাই, তাঁহাকে জাগ্রত জানিবামাত্র তাঁহার মাথার উপরের উচ্চ মঞ্চ হইতে মুসলমান যুবকটি অবতরণের উদ্যম করিতে লাগিলেন। এরূপ অবস্থায় মানুষ যথেষ্ট সতর্কতাই অবলম্বন করে—পাছে কোন লোকের গায়ে পা লাগিয়া যায়, এবং নামিবার পরেও যথেষ্ট বিনয় সহকারে অপরিহার্য্য অপরাধ এবং অশিষ্টতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া থাকে। এক্ষেত্রে মুসলমানটি সেরূপ কিছুই করেন নাই ; বরং ডাক্তার বাবু বিরক্তি প্রকাশ করিলে উচ্চকণ্ঠে বিশুদ্ধ উর্দ্দু-জবানে অনেক গালাগালি দিয়াছেন এবং অপর ঝুল্না-শায়ী তাঁহার বন্ধু প্রবরের সহিত ডাক্তারকে উপলক্ষ করিয়া অনেক রঙ্গরসের কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অসীম শারীরিক বলশালী ডাক্তার হরিমোহনের তখনও সম্যক্ ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে নাই এবং তখনও ভদ্রপরিচ্ছদধারী লোকের অভদ্রতা এবং অশিষ্ট আচরণ সীমা ছাড়াইয়া কতদূরে যায় তাহাই দেখিবার জন্য নীরবে তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন। বহুক্ষণ তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হয় নাই। তাঁহার নিকট হইতে উপযুক্ত প্রতিব্যবহার না পাইয়া সেই মেড়ুয়া-মর্কটের অশিষ্টতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়াই চলিয়াছে। অবশেষে সে তাহার খাবারের ঝুড়ি হইতে কমলালেবু বাহির করিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইল এবং তাহার ছিল্‌কা ও বীজ হরিমোহনের অঙ্গে নিক্ষেপ করিয়া প্রাণ ভরিয়া উচ্চহাস্য আরম্ভ করিয়া দিল। পুরাণ পাঠে জানিতে পারা যায় যে ধরানিম্নস্থ বাসুকী, বারণ, কমঠ প্রভৃতি যাঁহারা আদি সৃষ্টির দিন হইতে নগনদী কানন কান্তার এবং হ্রদ তড়াগ সাগর সমন্বিতা এই বিস্তীর্ণা অচলাকে নিশ্চল ধৈর্য্যের সহিত ধারণ করিয়া আছেন কারণবশতঃ কখন কখনও তাঁহাদেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে, এবং তাঁহাদের সেই ক্ষণিক অধৈর্য্যের মুহূর্ত্তে ধরিত্রী মুহুর্মুহু কম্পান্বিতা হইয়া তাঁহার বক্ষোবিহারী জীবকুলের মহাত্রাস উৎপাদন করিয়া থাকেন। এক্ষেত্রেও ঘটিল তাহাই। প্রায় সমস্ত রাত্রির নিয়ত উৎপাতে ডাক্তার বাবু অনিদ্রায় রাত্রি কাটাইয়া অপ্রসন্ন মনে যখন চক্ষুরুন্মীলন করিলেন, তখন সেই মুসলমান যুবক তাহার উচ্চমঞ্চ হইতে নামিবার ছলে তাঁহাকে পদাঘাত করিল। ভৃগুমুনির পদচিহ্নের ন্যায় সেই মুসলমান যুবকের পাদপদ্ম ধৈর্য্যের সহিত ধারণ করা ডাক্তার বাবুর কখনই উচিত ছিল না এবং তিনি তাঁহার জীবনে আর কখনই এরূপ ধৈর্য্যের পরিচয় দেন নাই। যাহা হউক তাঁহার এই ক্ষমাগুণে দুষ্টের সাহস অপরিমিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং তাহারই ফলে অনতিবিলম্বে ডাক্তারের অঙ্গে কমলালেবুর বীজ বর্ষণ হইতে লাগিল। যে ট্রেণে আমরা যাইতেছিলাম সে ট্রেণখানি দ্রুতগামী নহে, প্রতি ষ্টেশনেই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, যাত্রী নামানো এবং তুলিয়া লইবার উপলক্ষে অনেকক্ষণ বিলম্ব করিয়া ট্রেণখানি মন্থরগতিতেই যাইতেছিল। এই ঘটনার পরে যে ষ্টেশনে গাড়ী প্রথম দাঁড়াইল, উহা একটী জল কয়লা বদলাইবার ষ্টেশন। সেইক্ষণে ডাক্তার নামিয়া আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং সমস্ত রাত্রির ঘটনা যথাসম্ভব সত্বরতার সহিত আমার নিকট বর্ণন করিয়া কর্ত্তব্য যাহা স্থির করিয়াছেন তাহার আদেশ প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনাটি ঠিক প্রার্থনা নহে, যাহা করিবেন, তাহা আমাকে পূর্ব্বে জানানোই তাঁহার উদ্দেশ্য, ইহা আমি ডাক্তারের মুখের ভাবে এবং চক্ষুর দৃষ্টিতে স্পষ্ট করিয়াই বুঝিতে পারিলাম। বস্তুতঃ এ ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য একটিই এবং সে কর্ত্তব্য সম্পন্ন না করাই কাপুরুষতা। ডাক্তার কেমন করিয়া এতক্ষণ ধৈর্য্য ধরিয়াছিলেন এই কথা ভাবিয়া আমি বারম্বার বিস্মিত হইতে লাগিলাম। ডাক্তারের অবস্থায় আমি পড়িলে কর্ত্তব্য বহুপূর্ব্বেই সম্পন্ন হইত তাহাতে কোন সন্দেহই নাই এবং ডাক্তার বাবুর মুখে তাঁহার সমস্ত রাত্রির দুর্গতির কথা শুনিয়া

সেই বিংশতিবর্ষ বয়সের সমস্ত তরল রক্ত মাথায় উঠিয়া গেল।

তখন সবেমাত্র আমি মুখ হাত ধুইয়াছি, তখনও দিবসের পরিচ্ছদ পরিয়া আমি সমস্ত দিনের কার্য্যকলাপের জন্য প্রস্তুত হই নাই। ডাক্তারবাবুর কথা শুনিয়া আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। আমার সেই নৈশ পায়জামা এবং রাত্রের ঢিলা কোট পরিয়াই আমি তাঁহার সহিত গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম। আমার সহযাত্রী যে প্রবীণ ইংরাজটি ছিলেন,তিনি তখন মুখ হাত ধুইয়া কাপড় পরিতেছেন। আমাকে নামিতে দেখিয়া এবং আমার চোখমুখের অবস্থা বুঝিয়া একটু ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কোথায় যাইতেছি। এইখানে বলিয়া রাখি, এই প্রবীন ইংরাজটি আগ্রার ডেপুটি কমিশনার বা তদ্রূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজপুরুষ, ইহা আমি তাঁহার সহিত পূর্ব্বরাত্রির আলাপেই বুঝিয়াছিলাম। তাঁহাকে সংক্ষেপে অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর দিকে অগ্রসর হইলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "Youngman,don't force me to use my handcuffs." আমি হাসির চেষ্টা করিয়া বলিলাম, "I am not sure about it." আমি যখন দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে প্রবেশ করিলাম, তখনও দেখি ডাক্তারবাবুর বন্ধুর লেবু ভক্ষণ শেষ হয় নাই এবং সেই মুসলমান বন্ধুদ্বয়ের রসালাপও নির্ব্বিঘ্নে চলিতেছে। আমি গিয়া ডাক্তারবাবুর শয্যার উপরে নীরবে বসিলাম, ডাক্তার বাবু অপর বেঞ্চখানিতে আসন লইলেন।

নৈশবেশ বীরবেশ নহে,আমাকে সেই বেশে গাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া উহারা কি ভাবিল বলিতে পারি না, তবে কিছুক্ষণ ধরিয়া অপলকনেত্রে অমার এবং আমার অদ্ভুত বেশের দিকে তাহারা চাহিয়া রহিল। আমি যে ডাক্তারবাবুর সঙ্গের লোক ও তাঁহার বন্ধু এবং তিনিই যে রাত্রির সংবাদ সংক্ষেপে দিয়া আমাকে সেখানে ডাকিয়া আনিয়াছেন, ইহা অতি নির্ব্বোধেরও উপস্থিতক্ষেত্রে বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ইহারাও যে সে কথা বুঝিয়াছিল, তাহা আমি তাহাদের মুখের ভাবে স্পষ্টই জানিতে পারিলাম।

বন্ধুর প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে গিয়াছি, এক্ষেত্রে বাগ্‌যুদ্ধ এবং বাহুযুদ্ধ উভয়ই যে অবশ্যম্ভাবী তাহাও আমার জানা ছিল, সুতরাং আমিও আমার প্রতিপক্ষদিগের আকার প্রকার বক্রদৃষ্টিতে যতটা সম্ভব দেখিয়া লইলাম। দেখিলাম উভয়েই সমবয়স্ক, দুইজনেরই বয়স ত্রিশ হইতে পঁয়ত্রিশের মধ্যে, বাহ্যিক চেহারা বলব্যঞ্জক তাহাতে সন্দেহ নাই! যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অবলীলাক্রমে জয়ী হইব এ আশা তখন করি নাই, মনে হইয়াছিল একটা "গজকচ্ছপীয়" কাণ্ড না হইয়া সে বিগ্রহের শান্তি হইবে না। ইতিপূর্ব্বে এই রেলপথে ভ্রমণকালেই দেশী, বিলাতী এবং "দোআঁসলা" দুইচারিজনের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ আমার হইয়া গিয়াছে, সে সকল বৃত্তান্ত পূর্ব্বে আমার এই জীবন কথার যথাস্থানে নিবেদন করিয়াছি। কলেজের ব্যায়ামশিক্ষক তারকবাবু এবং পালোয়ান লছমন সিংহের শিক্ষাকৌশলে প্রহার করিবার এবং প্রহৃত হইয়া ব্যথা সহ্য করিবার ক্ষমতা আমার জন্মিয়াছিল, সুতরাং এই মুসলমান যুবকদ্বয়ের বলব্যঞ্জক পেশীবহুল মূর্ত্তি দেখিয়া বিশেষ ভীত হইবার কারণ ছিল না—বিশেষতঃ আমি অত্যাচারীর অত্যাচার ও অশিষ্টতার প্রতিশোধ দিবার জন্য সেখানে আসিয়াছিলাম, মনের বল আমার তদনুরূপই ছিল। আরও এক কথা—ডাক্তারবাবুর বয়ঃক্রম তখন ৪৫ বৎসরেরও অধিক ভিন্ন কম ত নহেই, তথাপি জানিতাম সে বয়সেও প্রথম যৌবনের দৃপ্ত তেজের অভাব তাঁহার শরীর মনের কোনও স্থানেও ছিল না এবং তৎপূর্ব্বে দুই একটী ঘটনাসূত্রে তাঁহার বলবীর্য্য যুদ্ধকৌশলের যে পরিচয় আমি পাইয়াছি, তাহাতে তাঁহার সহায়তা পাইবার সম্ভাবনা থাকিলে আমি একাকী দশজনের সঙ্গেও বাহুযুদ্ধে ভীত বা পরাঙ্মুখ হইতাম না—দুইটিমাত্র মুসলমান যুবক ত নগণ্য।

উহাদিগের সহিত লাঠি সোটা ছুরী কাটারি প্রভৃতি কোন প্রকারের মারাত্মক প্রহরণ আছে কি না ইহা দেখিয়া লইবার জন্য আমি সেই

কামরার চতুর্দ্দিকে একবার ভাল করিয়া চাহিলাম। দেখিলাম, পাতলা দুইখানা ওয়াজিরাবাদের রূপা-বান্ধা বেতের ছড়ি ছাড়া অন্য কিছু নাই। ছুরি কাটারি যদি থাকে তবে তাহা তাহাদের বাক্সের মধ্যে থাকিবার কথা, উপযুক্ত সময়ে তাহা বাহির করিয়া লইবার অবসর তাহাদিগকে আমি কখনই দিব না; এই ভাবিয়া আমি যুদ্ধের জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়া রহিলাম। মনে করিলাম, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যখন কোন অশিষ্টতা করিবে, তখন আমি আমার কর্ত্তব্যসাধনে তৎপর হইব, তৎপূর্ব্বে নহে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমাকে সেই কামরায় অদ্ভুত বেশে সহসা প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহাদের বুঝিতে বাকী ছিল না যে আমি সেই পূর্ব্বরাত্রি ও প্রাতের উৎপীড়িত বাঙ্গালীবাবুর বন্ধু, এবং তাঁহারই আহ্বানে আমি সেখানে উপস্থিত হইয়াছি। কিছুক্ষণ আমাকে অনিমেষে দেখিয়া লইয়া নিজেদের মধ্যে বিশুদ্ধ উর্দ্দুতে তাচ্ছিল্যের ভাবে দুই একটি কথা কহিল, যাহার অর্থ—"পোলাও-পুষ্ট মুসলমান, দুই দশজন অন্নভোজী বাঙ্গালী বাবুকে গ্রাহ্য করিয়া যে দিন চলিবে, সে দিনে পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদিত হইবে।" কথা কয়টি কি বলিয়াছিল তাহা এতদিন পরে আজ আমার মনে নাই, কিন্তু সে সময়ে ঐ কথা শুনিয়া, আমার পাদনখ হইতে শীর্ষ পর্য্যন্ত ক্রোধের প্রচণ্ড বহ্নি-শিখা যেমন 'দপ্' করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তেমনি যে ভাষায় যুদ্ধাভিলাষী প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি অমন সুন্দরভাবে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করা যায় সে ভাষার প্রতিও আমার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। যুদ্ধার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া স্ফীতবক্ষে প্রায় আলীঢ় চরণে যখন রণাঙ্গনে দাঁড়াইয়াছি, তখন ভাষার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হওয়া অস্বাভাবিক তাহা স্বীকার করি; কিন্তু যাহা সত্য তাহাই বলিতেছি। উর্দ্দু ভাষার সৌন্দর্য্য এবং উহা বলিবার এক অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে যথার্থই সেই অবশ্যম্ভাবী আসন্ন বিবাদের মুহূর্ত্তেও ঐ ভাষার প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা আকর্ষিত হইয়াছিল—থাক্ সে কথা। আমার অধৈর্য্য হইয়া উঠিতেছেন তাহা তাঁহার চাঞ্চল্যে আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম; এবং আমিও আসন্ন যুদ্ধের জন্য Night coat-এর আস্তিন গুটাইয়া আমার ব্যায়ামখিন্ন সুদৃঢ় পেশীবহুল বাহুযুগল ক্রমশঃ উন্মুক্ত করিয়া দিতে লাগিলাম। প্রথম যৌবনের সৌকুমার্য্যের দিনে কেবল মাত্র আমার মুখশ্রী দেখিয়া আমাকে কেহ বলশালী বলিয়া বুঝিতে পারিত না, কিন্তু আমার উন্মুক্ত বাহু বক্ষ স্কন্ধ ইত্যাদি দেখিলে, কিম্বা ঐসকল স্থানে হস্তস্পর্শ মাত্র সে ভ্রম লোকের অচিরাৎ দূর হইয়া যাইত। সেই জন্যই আমি সেই মুসলমান ভদ্রবেশধারীর ভাষায় উচ্চারিত আমার প্রতি তাচ্ছিল্যের জবাবে, আমার ব্যায়াম বর্দ্ধিত বাহু ও বক্ষের বিশালতা ঈষদুন্মুক্ত করিয়া একবার তাহাদিগকে দেখাইয়া দিলাম এবং ঐ ইঙ্গিতে জানাইয়াও দিলাম যে, আমি সকল প্রকার ঘটনার জন্য সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বদা প্রস্তুত রহিয়াছি।

বিবদমান বৃষ যেমন অপর বৃষের শৃঙ্গ ককুদাদি দেখিয়া স্থির থাকিতে পারে না, আমার মুসলমান বন্ধুরও সেই দশা ঘটিল। আমার মাথার উপরের ঝুল্‌না বেঞ্চে বসিয়া বসিয়া ক্ষণে ক্ষণে সে চঞ্চল হইয়া এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল। আমি নীরবে বেঞ্চে বসিয়া বসিয়া মনে মনে ঠিক করিয়া লইতে লাগিলাম, কোথায় কিরূপভাবে আক্রমণ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে মুহূর্ত্ত মধ্যে পরাজিত করতঃ তাহার অভদ্র ঔদ্ধত্যের সমুচিত শিক্ষা কেমন করিয়া দিব। এরূপ চিন্তার কারণ ছিল;—সকলেই জানেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর রেলগাড়ীতে নীচে তিনখানি বেঞ্চ থাকায় অঙ্গ সঞ্চালনের স্থান অল্পই পাওয়া যায়; তাহার উপরে আরোহিগণের বাক্স ডেক্স প্রভৃতি নানাবিধ ছোট বড় জিনিষ পত্রে বাকী স্থানটুকু প্রায় ভরিয়াই থাকে, সুতরাং বিস্তৃত রণাঙ্গনে পরস্পরবিরোধী যুদ্ধোন্মত্ত ব্যক্তিগণের সদর্প সঞ্চরণ ও আস্ফালনের যে প্রচুর স্থান থাকে এখানে তাহা পাওয়া যাইবে না; প্রথম আক্রমণ যাহাতে প্রচণ্ড হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য না রাখিলে পরাজয় সুনিশ্চিত ইহা জানিয়াই, আমি কিরূপ

স্থির করিয়া রাখিতেছিলাম।

যুদ্ধকামী মুসলমান যুবক আর অধিকক্ষণ স্থির থাকিতে পারিল না। স্নানের ঘরে যাইবার উপলক্ষ করিয়া সে তাহার গৌরবের মঞ্চ হইতে অবতরণের উদ্যোগ করিতে লাগিল—ইচ্ছা ঐ সময়ে আমার অঙ্গের কোন অংশকে তাহার পাদপীঠ করিয়া লইবে এবং সেই সূত্রে তাহরে প্রথম ঈপ্সিত যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। আমি আমার বেঞ্চের ঠিক মাঝখানটাতে বসিয়াছিলাম, সুতরাং সে ঝুল্না হইতে তাহার এক খানি পা বাহির করিয়া দিয়া যখন নীচের বেঞ্চের হাতার উপরে স্থাপিত করিবে, তৎপূর্ব্বে লম্বমান পদ দ্বারা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও এই ব্রাহ্মণ-সন্তানের উত্তম মধ্যম কোন অঙ্গই স্পর্শ করিতে পারিল না। তাহার :এই চেষ্টা সে এরূপ কৌশলে করিতেছিল, যেন দেখিলে মনে হয় নীচের বেঞ্চের হাতার উপরেই পা রাখা তাহার উদ্দেশ্য, আমার অঙ্গ তাহার লক্ষ্যের বিষয় নহে। কিন্তু সে, আমি, তাহার বন্ধু এবং ডাক্তার হরিমোহন—সকলেই আমরা জানি যে, এই ব্রাহ্মণের মস্তকটিই মুসলমানের পাদুকামণ্ডিত পদের একান্ত লক্ষ্য, বেঞ্চের হাতা উপলক্ষ্য মাত্র। যাহা হউক, অধিকক্ষণ ধরিয়া পা ঝুলাইয়া অপরের মস্তক অনুসন্ধান সম্ভবপর নহে, সুতরাং এবার তাহাকে বিফল মনোরথ হইয়াই অবতরণ করিতে হইল। সে স্নানের ঘরে প্রবেশ করিয়া অর্দ্ধমিনিট পরেই আবার বাহির হইয়া আসিল। সেবারে অবরোহণ গিয়াছে, এবারে আরোহণের পালা। সে যখন উপরের ঝুল্না বেঞ্চে চড়িবার জন্য তৎসংলগ্ন লোহার শিকলটি ধরিতে যাইতেছে, আমি ইংরাজীতে অনুচ্চস্বরে এবং বিনীত ভাষায় সতর্কতার সহিত উপরে আরোহণ করিবার অনুরোধ তাহাকে জানাইলাম, বুঝাইয়া দিলাম যে আমার গায়ে তাহার পা না লাগে ইহাই আমার একান্ত উদ্দেশ্য। সে আমার কথা শুনিবামাত্র সগর্ব্বে আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল এবং কিয়ৎকাল আমার আমার যা কিছু বলিবার আছে তাহা যেন উর্দ্দুতে বলি, কারণ ইংরাজী ভাষায় সে অভিজ্ঞ নহে। ইংরাজী না জানা গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পঞ্চ-মহাপাতকের একতম পাতক নহে তাহা সত্য, কিন্তু যে কোন বিষয়ই হউক না কেন তাহা না জানাটা যে অহঙ্কারের বিষয়, এবং সেই অজ্ঞতা প্রকাশ করিবার সময়ে অকারণে বক্ষকে যে গর্ব্বে স্ফীত করিয়া তুলিতে হইবে, তাহা এই আমি প্রথম দেখিলাম, এবং দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি স্থানের পারস্য ভাষায় অভিজ্ঞ মুসলমানের ন্যায় সঙ্গীতের মত রসসিক্ত উর্দ্দু আমি বলিতে পারিতাম না, কিন্তু যেটুকু পারিতাম তাহা আমি বেহারা খিদ্‌মদ্‌গারের নিকট শিক্ষা করি নাই। কলেজের ফার্সী অধ্যাপকের সহিত আমার বিশেষ বান্ধবতা ছিল, এবং কলেজ ছাড়িবার পরে যখন কিছুকাল নাটোরে বসিয়া অলস জীবন যাপন করিতেছিলাম, সেই সময়ে স্থানীয় একজন শিক্ষিত বৃদ্ধ মৌলভীর নিকট কিছুকাল আমি ফার্সী পড়িবার চেষ্টাও করিয়াছিলাম। এতদ্ব্যতীত যাহারা উর্দ্দুভাষায় বিশুদ্ধ কথোপকথন করিতে পারে এরূপ বহুলোকের সংসর্গে আমাকে অনেক সময় কাটাইতে হইয়াছে। এই সকল কারণে, আমি ভাল ফারসী উর্দ্দু লিখিতে পড়িতে না পারিলেও, ভদ্রসমাজে কথা কহিতে ও ভদ্রভাষা বুঝিতে পারি এ পরিমাণ উর্দ্দু আমার জানা ছিল। আমি সেই মুসলমানের গর্ব্বোদ্ধত মূর্ত্তির প্রতি একবার চাহিয়া উর্দ্দুতেই আমার বক্তব্য তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম। কিন্তু বুঝাইয়া কি হইবে? "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী!" সে তাহার মঞ্চে আরোহণ করিয়া ঠিক আমার মাথার উপরে আসিয়া বসিল এবং আমার চক্ষুর সম্মুখে তাহার দুইখানি পা ঝুলাইয়া এমন ভাবে সজোরে আন্দোলিত করিতে লাগিল যে, উহা গায়ে লাগিলে কেবল অপমান নহে, বিশেষভাবে আঘাত পাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

পূর্ব্ব রাত্রে ডাক্তার বাবুর উপর অত্যাচারের বৃত্তান্ত শুনিয়া অবধি একরূপ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া ছিলাম, তাহার

জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলাম। আমার আপাদমস্তকে যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলিয়া গেল। আমি একলম্ফে আসন-ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলাম, চক্ষুর নিমেষে সেই ভদ্রবেশ-ধারী পাষণ্ড মুসলমান' তনয়ের দোদুল্যমান পা দুখানি ধরিয়া একটানে তাহাকে তাহার উচ্চমঞ্চ হইতে নীচে পাড়িলাম। সে এরূপ হঠাৎ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না, আত্মরক্ষার কোন উপায়ই করিতে পারিল না, নিতান্ত নিরুপায় ভাবে তাহার পুষ্টদেহ গাড়ীর মেজের উপরে পড়িয়া গেল। পড়িবার সময়ে নীচের বেঞ্চে লাগিয়া সে তাহার কোমরে যে গুরুতর আঘাত পাইয়াছিল, সেই আঘাতে একরূপ জ্ঞানশূন্যের মত আমার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। আমি ব্যাঘ্রের মত তাহার বুকে চাপিয়া বসিলাম।

তাহার বন্ধু অপর মুসলমানটি পশ্চাৎ হইতে আমাকে আক্রমণ করিবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু অর্দ্ধপথে ডাক্তার বাবু তাহার গ্রীবা এরূপভাবে ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন যে হস্তপদ সঞ্চালন দূরের কথা, তাহার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। শারীরিক বল এবং ভোজনপটুতার জন্য ডাক্তার বাবু "নাটোরের ভীম" পদবী লাভ করিয়াছিলেন। সেই ভীমের কবল হইতে নিজকে রক্ষা করা সমধিক বলশালী পালোয়ানের পক্ষে দুঃসাধ্য, সাধারণ মনুষ্যের অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বর্ণন করিতে সময় লাগিল, ঘটনা ঘটিতে নিমেষার্দ্ধও লাগে নাই। অত্যল্প কালের মধ্যেই যেন ইন্দ্রজাল প্রভাবে সমস্ত ঘটিয়া গেল। শবসাধনের আসনের মত যাহার বক্ষের উপর আমি আসন পাতিয়া বসিয়াছিলাম, মনে করিয়াছিলাম, সে নিজকে মুক্ত করিতে এবং আমাকে প্রতি-আঘাত করিতে তাহার প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগ করিবে। কিন্তু কার্য্যতায় সে সকল কিছুই ঘটিল না। মৃতের মত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সে ভূমিতলে পড়িয়া রহিল, তাহার হস্তপদ লম্বমান, শ্বাসও চলিতেছে কিনা সন্দেহ।

প্রথম বুঝিতে পারি নাই যে কোমরে গুরুতর আঘাত পাইয়াই বেচারা অচেতনপ্রায় হইয়া ওরূপ ভাবে পড়িয়া আছে। আমার মনে হইল যে সে আহত হইবার ভান করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছে, সময় ও সুযোগ পাইলেই আমাকে আক্রমণ করিবে এবং তাহার এই পতনজনিত আঘাত ও লাঞ্ছনা সুদ সহিত আমাকে শোধ করিয়া দিবে। এই বিশ্বাসে আমি তাহাকে সিংহবলে ধরিয়া তাহার বুকের উপরে দৃঢ় আসন পাতিয়াই বসিয়াছিলাম। এরূপ ভাবে কতক্ষণ কাটিল ঠিক সে সময়টা আজ বলিতে পারিব না—বেশী সময় নহে। ইতিমধ্যে ডাক্তার বাবুর চক্ষু একবার আমাদের দিকে কোন্ সুযোগে পড়িয়াছিল জানি না। তিনি তাঁহার চিকিৎসকের চক্ষে দেখিবামাত্র বুঝিয়াছিলেন যে, আমি যাহার হৃদয়াসনে সিংহাসন পাতিয়া বসিয়া আছি, আর কিছুক্ষণ হইলে সে আসন সত্য সত্যই শবাসনে পরিণত হইবে। দেখিবামাত্র তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ছাড়ুন ছাড়ুন, মরিয়া গেল যে!"

আমি তাঁহার চীৎকারে 'হতভম্ব' হইয়া আমার শীকার ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। আমাকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিতে না পারে বলিয়া তিনি যাহার গলা ধরিয়া যুদ্ধস্থল হইতে দূরে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিলেন তাহাকে তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিয়া, এক-লম্ফে স্নানের ঘরে প্রবেশ করতঃ তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র ভিজাইয়া জল আনিয়া, প্রায়-অপহৃতচেতন সেই মুসলমান যুবকের মুখে চ'খে এবং মস্তকের পশ্চাদ্-ভাগে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। তৃতীয় ভদ্রলোকটি যিনি এতক্ষণ নীরবে আমাদের এই "ঘটোৎকচবধ-পর্ব্বাধ্যায়" দেখিতেছিলেন তিনিও তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহার ব্যাগ হইতে একটি জলপাত্র বাহির করিয়া আরও খানিকটা জল আনিয়া এবং একখানা খবরের কাগজ দিয়া বাতাস করিয়া হতচেতন রোগীর শুশ্রূষা কল্পে ডাক্তার বাবুর সাহায্য করিতে লাগিলেন।

প্রায় দুই মিনিট কাল পরে বেচারা চক্ষু মেলিয়া চাহিল এবং অনেকক্ষণের রুদ্ধ শ্বাস জোরে ফেলিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ডাক্তার মহাশয় ধরিয়া তাঁহাকে তুলিলেন এবং তাঁহার যে বিছানায় আমি ইতি-

বসিয়াছিলাম,সেই বিছানায় তাহাকে শয়ন করাইয়া দিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ব্রাণ্ডি।" ডাক্তার বাবুর ঔষধের বাক্স সেই গাড়ীতেই ছিল। আমি বাক্স খুলিয়া মেজর গ্লাসে খানিকটা ব্রাণ্ডি ঢালিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলাম। তিনি রোগীর মুখের নিকট গ্লাসটি ধরিবামাত্র সে উহার সমস্তটাই নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিল।

আমার কৃত কার্য্যে আমি কি পরিমাণ লজ্জিত ও ভীত হইয়াছিলাম, সে দিনের সে মনোভাবের কথা, আজ এতকাল পরে ভাষায় প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিব না। কেবলি মনে হইতে লাগিল যে ভগবান্ রক্ষা করিয়াছেন, নতুবা নরহত্যা-পাপগ্রস্ত হইতে হইত এবং সে জন্য পরলোকের শাস্তি ত পরের কথা, ইহ-লোকের প্রায়শ্চিত্তের দায় হইতে মুক্ত হইবার কোনও পথই আমার ছিল না। আমি কেমন একপ্রকার 'হতভম্বের' মত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আমার মুখে একটি কথাও সরিল না। সেই গাড়ীর তৃতীয় হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকটি ডাক্তার বাবুকে ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় এরূপ হইবার কারণ কি ? ডাক্তার বাবু কহিলেন, "উপরের বেঞ্চ হইতে যখন পড়িয়া যান, হয়তো সেই সময়ে কোনরূপে ইহাঁর মেরু-দণ্ডের সর্ব্বনিম্ন অস্থিতে আঘাত পাইয়াছিলেন, সেইজন্য এরূপ হইয়াছে। শরীর মধ্যস্থ মর্ম্মস্থানগুলির মধ্যে উহা একতম ; ঐখানে সামান্য আঘাত লাগিলেই মানুষের শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা—এবং অধিকাংশ সময়ে বন্ধ হইয়াও যায়। আমি উহার মুখের অবস্থা দেখিয়াই ইহা বুঝিয়াছিলাম।" প্রশ্নকারী ভদ্রলো-কটি কহিলেন, "মহাশয়, আপনি কি ডাক্তার ?" হরিমোহন বাবু মাথা হেঁট করিয়া একটি ছোট্ট 'হুঁ।' বলিয়া রোগীর শুশ্রূষায় পুনরায় মনঃসংযোগ করিলেন।

রোগীর অবস্থা ক্রমেই ভাল হইতে লাগিল এবং দশ মিনিট আন্দাজ সময়ের মধ্যেই তিনি বিছানায় উঠিয়া বসিবার মত বল পাইলেন। তিনি বিছানায় উঠিয়া বসিলে হরিমোহন বাবু তাঁহার নাড়ী পরীক্ষা নাড়ীতে কেবলমাত্র একটু দুর্ব্বলতার লক্ষণ দেখা যাইতেছে ; আপনি আর একটু ব্রাণ্ডি পান করিলেই একেবারে প্রকৃতিস্থ হইয়া যাইবেন।"

এই কথা শুনিয়া মুসলমান যুবকটি একটু হাসিয়া কহিল, "মহাশয়, আমি মুসলমান, মদ্যপান আমাদের ধর্ম্মে নিষিদ্ধ। না জানিয়া ঔষধ মনে করিয়া একবার খাইয়াছি, আর খাইব না।" কথাগুলি বিশুদ্ধ উর্দ্দু ভাষায় উচ্চারিত হইল। লোকটির কণ্ঠস্বরের মধ্যে কি একটি গুণ ছিল জানি না, কথা শুনিলেই মনে হইত যেন বিশুদ্ধ উর্দ্দু ভাষায় কবিতা শুনিতেছি। বিশেষতঃ আঘাতপ্রাপ্ত হইবার পরে সেই তিনি প্রথম কথা কহিলেন। আঘাতজনিত দুর্ব্বলতার জন্যই হউক, কিম্বা লোক সমক্ষে লাঞ্ছনার অপমানেই হউক, তাঁহার এবারের কথাগুলি যেন আরও মিষ্ট শুনাইল এবং কণ্ঠ-স্বরের মধ্যে কেমন একপ্রকার করুণা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিল। আমি আমার আসুরিক ব্যবহারের জন্য ভদ্রসন্তানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত পূর্ব্ব হইতে ব্যাকুল হইয়াছিলাম, তাঁহার এই ঔষধার্থ ব্রাণ্ডি-পানের অসম্মতির উপলক্ষ করিয়া আমি সসঙ্কোচে তাঁহার নিকট গিয়া বসিলাম এবং ঔষধরূপে আরও একটু ব্রাণ্ডি পান করিতে তাঁহাকে বারম্বার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলাম। বাক্যালাপ একবার আরম্ভ হইলে কথা পাড়িবার সুযোগের অভাব হয় না। আমি এই সুযোগে আমার দুর্ব্ব্যবহারের জন্য একান্ত বিনয়ের সহিত তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিলাম। দেখিলাম তিনিও যেন তাঁহার পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য নিতান্ত লজ্জিত হইয়া আমার ও ডাক্তার বাবুর নিকট ক্ষমা চাহিবার সুযোগের অপে-ক্ষায় ছিলেন। মার্জ্জনা চাহিবামাত্র তিনি ব্যগ্র হইয়া উর্দ্দুতে যাহা কহিলেন তাহার ভাবার্থ এই—"সে কি কথা, আপনি কেন ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন ? জানি না কি শয়তান আমার স্কন্ধে চাপিয়াছিল, আমি গত রাত্রি হইতে ডাক্তার বাবুর সহিত যে ব্যবহার করিয়াছি তাহার ক্ষমা নাই, এবং তাহারই প্রায়শ্চিত্তের জন্য আজ

যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা আর ফিরিবে না। সে জন্য আমি কতদূর অনুতপ্ত তাহা একমাত্র খোদাই জানেন, সে কথা প্রকাশ করিবার ভাষা আমি জানি না। এখন কায়মনে প্রার্থনা করি আপনারা উভয়ে আমাকে মার্জ্জনা করুন, গত কথা স্মরণ করিয়া আমার উপরে আর ক্রোধ রাখিবেন না।"

কি সুললিত ভাষা! পুরুষোচিত গম্ভীর অথচ কি মধুর কণ্ঠস্বর, এবং বলিবারই বা কি অপূর্ব্ব ভঙ্গী! এই ব্যক্তি যখন এই ভাষায় এই ভঙ্গিতে আমার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাও যেমন মূর্ত্তিমান হইয়া আমাকে আঘাত করিয়াছিল, এখনকার এই ক্ষমা ভিক্ষাও তেমনি রূপ ধরিয়াই যেন আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। একবার মনে হইয়াছিল যে এ ব্যক্তি বুঝি বা একজন উঁচুদরের অভিনেতা; ভাষা, ভাব, ভঙ্গী প্রভৃতি এমন আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে যে যখন যেরূপ ভাবের কথার প্রয়োজন, সরস্বতী স্বয়ং আসিয়া যেন তাহার কণ্ঠে যোগাইয়া দেন; নতুবা দশ মিনিট পূর্ব্বে যে তেমন করিয়া তাচ্ছিল্যের ক্ষুরধার ছুরিকা হৃদয়ে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিতে পারিয়াছে, সে কি এমন করিয়া ক্ষমাভিক্ষা যথার্থ ই করিতেছে? কিন্তু এভাব আমার মনে অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে পারিল না; জানি না ইহার কণ্ঠস্বরে কি একটা ছিল এবং কথা কহিবার ভঙ্গী ইহার এমনি অনন্যসাধারণ যে, আমার মনে হইতে লাগিল ইহার সারল্যের প্রতি এই ক্ষণিক সন্দেহ হৃদয়ে পোষণ করিয়াও যেন আমি নিতান্ত অবিচার করিতেছি। সকল অন্তর মন দিয়া তাহাকে ক্ষমা ত করিলামই, এবং তাহার বাহ্য নিদর্শন স্বরূপে আমি আমার দক্ষিণ হস্ত তাহার দিকে বড়াইয়া দিলাম। সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দুই হাতে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া আর একবার তাহার পরিশুদ্ধ উর্দ্দূতে কি কয়েকটি কথা কহিল, যাহার ভাবার্থ—"সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা ভিক্ষা এবং স্থায়ী বান্ধবতার একান্ত করুণ প্রার্থনা।" হাত ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে ঈষৎ হাস্য করিয়া রঙ্গচ্ছলে আমার হাতের গুলি দুইটি একবার টিপিয়া দেখিয়া পুনরায় হাসিয়া কহিল, "হাঁ, ঠিক মরদ্‌কা য্যায়সা হোনা চাহিয়ে।" আমার সে সময়ে মনে হইল ধরণী দ্বিধা হইলে আমি লুকাইবার স্থান পাইতাম। ডাক্তার বাবুর সহিতও যথাবিহিত প্রকারে মার্জ্জনার আদান প্রদান হইল এবং ডাক্তার বাবু যাঁহার গ্রীবা ধরিয়া আমাকে অতর্কিত পশ্চাৎ-আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকটেও ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। পূর্ব্বরাত্রি হইতে পরদিন প্রভাতের সেই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যে কয়টি প্রাণী অকিঞ্চিৎকর কারণে পরস্পরের প্রতি বিষম বৈরভাব পোষণ করিয়া আসিতেছিল, এই আকস্মিক দুর্ঘটনার পরে তাহা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া গেল এবং শান্তি ও সন্ধির নিদর্শনস্বরূপ মুসলমান বন্ধুদ্বয়ের উৎকৃষ্ট অম্বুরী তামাক আমরা সকলে মিলিয়া ছিলিমের পর ছিলিম পোড়াইতে লাগিলাম।

আমি আমার গাড়ীতে বহুক্ষণ ফিরিয়া যাই নাই দেখিয়া আমার সহযাত্রী প্রবীণ ইংরাজবন্ধু বুঝি কিছু উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। আমাদের বিগ্রহান্তে সন্ধি হইবার পরে যখন অম্বুরীতামাকের বংশনাশ করিতেছি, সেই সময়ে আমাদের ট্রেণ আসিয়া একটা ষ্টেশনে থামিল। কিছুকাল পরেই দেখি আমার সহযাত্রী সাহেব আমাদের সেই দ্বিতীয় শ্রেণীর দরজার নিকট দাঁড়াইয়া আমার অনুসন্ধানে কামরার মধ্যে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই আমার মুসলমান বন্ধুদ্বয় সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিলেন। আমি কিন্তু ইহার কারণ তখনও বুঝিতে পারি নাই। প্রত্যভিবাদনের পর সাহেব আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "Aren't yon going to dress?" আমি 'হাঁ' বলিয়া তাঁহাকে বিদায় করতঃ সেই মুসলমান যুবককে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহারা সাহেবের সহিত পরিচিত কি না? উত্তরে শুনিলাম, কেবল মাত্র পরিচয় নহে, আগ্রার ডেপুটি কমিশনর সেই সাহেবের অধীনে ইঁহারা উভয়েই "তহশীলদার"—অর্থাৎ ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাব-ডেপুটি কলেক্টরগণের যে সম্বন্ধ, সাহেবের সহিত ইহাঁদের সম্বন্ধ তদনুরূপ। আমার সহিত উপরিতন

কর্ম্মচারী এই সাহেবের পরিচয় আছে জানিতে পারিয়া বোধ হইল যেন আমার প্রতি ইহাঁদের সম্ভ্রম বাড়িয়া গেল এবং পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনা সাহেবের কর্ণগোচর না হয় সেই জন্য উভয়েই আমাকে বারম্বার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি সে বিষয়ে ইহাঁদের মনকে নিশ্চিন্ত করিয়া দিয়া, স্নান এবং বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনের জন্য আমার কামরায় চলিয়া গেলাম—ডাক্তার বাবুকে এই নববন্ধুদ্বয়ের সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিতে রাখিয়া গেলাম।

নিজের কামরায় গিয়া যখন বাক্স খুলিয়া পরিচ্ছদ বাহির করি তখন আমার সহযাত্রী ডেপুটি কমিশনর সাহেব সিগারেট টানিতে টানিতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "What was the row ?"

আমি কহিলাম, "It is not intended for your ears, and after all it is over and we are friends now."

তিনি মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "I suppose the Tahshildars were nasty to your friend. They work under me ; I know them very well, especially one of them is a hot headed youngman,—good hearted though."

আমি হাসিয়া কহিলাম, "You will get no answer from me."

তিনিও হাসিয়া তদুত্তরে বলিলেন, "Good thing there was no need for the hand-cuffs."

আমি কহিলাম, "Thank goodness, no."—ঘটোৎকচবধ পর্ব্বাধ্যায়ের এইখানেই যবনিকা পড়িয়া গেল।

স্নানান্তে বস্ত্রাদি পরিয়া প্রস্তুত হইলাম, কারণ কিয়ৎকাল পরেই প্রাতরাশের সন্ধানে টুণ্ডলা ষ্টেশনে নামিতে হইবে। সে দিনে 'রেষ্টোরাঁ কার' ছিল না। থাকিলেও যে ধীর মন্থর ট্রেণে আমরা যাইতেছিলাম, তাহার যাত্রীদের জন্য সে সুখের ব্যবস্থা রেলকোম্পানী

করিত না। টুণ্ডলা একটি জংশন ষ্টেশন। ষ্টেশন ঘরটি বড়, ওয়েটিং রুম, রিফ্রেস্‌মেণ্ট রুম প্রভৃতি সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাই সে ষ্টেশনে আছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে যাত্রীসংখ্যা অধিক ছিল না ; আমি, আমার সহযাত্রী ইংরাজটি এবং ডাক্তার বাবু আমাদের জঠর-বহ্নি নির্ব্বাপিত করিবার জন্য নিজ নিজ ব্যবস্থা করিয়া লইলাম, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর মুসলমান ভদ্রলোক কয়জন কি ব্যবস্থা করিলেন তাহা জানিতে পারিলাম না। কথাপ্রসঙ্গে ডেপুটি কমিশনরকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "They must have made their own arrangement. All orthodox Muhamedans take every care to avoid ham and bacon. Pig is forbidden by the Prophet, and so the Muhamedans hate that savoury meat like poison—don't you know it ?"

মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে শূকরমাংস ভক্ষণ যে নিষিদ্ধ তাহা আমি তৎপূর্ব্বে জানিতাম না, সেই প্রথম শুনিলাম। আমার জানা ছিল, পান আহার সম্বন্ধে যত কিছু বিধি নিষেধ, সে সমস্তই কেবল মনু, রঘুনন্দন, গোস্বামী-ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির লেখনীর মুখেই বাহির হইয়াছে, এবং পাকশালার শুচিতা প্রাণপণে রক্ষা করিতে পারিলেই ধর্ম্ম বজায় রহিল ইহা কেবল হিন্দু-শাস্ত্রেরই মূলমন্ত্র,—পৃথিবীর অপর সকলেই বুঝি পাবকের ন্যায় সর্ব্বভুক্। সে সংস্কার আমার সেইদিন দূর হইল।

জীবনের প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য—আহার শেষ করিয়া টুণ্ডলা ষ্টেশনের সুদীর্ঘ প্লাটফর্ম্মে পাদচারণ করিতে লাগিলাম, কারণ সেখানে আগ্রা যাত্রীদিগকে বহুক্ষণ থাকিতে হইবে। পশ্চিম দিক হইতে আর একখানি গাড়ী আসিলে উভয় গাড়ীর যাত্রীর দল লইয়া তবে টুণ্ডলা জংশন হইতে আগ্রার গাড়ী ছাড়া হইবে—সে কত বিলম্ব হইবে, কে জানে ? রেলকর্ম্মচারী একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোন উত্তর পাইলাম না এবং ষ্টেশন

এবং অঙ্কপাতের মহারণ্য হইতে আগ্রার গাড়ীর সময় বাহির করা আমার কর্ম্ম নহে ভাবিয়া, পাদচারণে পাক-যন্ত্রাদি অন্তরেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বাড়াইবার চেষ্টায় মনঃ-সংযোগ করিলাম।

সঙ্গীহীন অবস্থায় পাদচারণা বহুক্ষণ ভাল লাগিল না এবং চৈত্রের দ্বিপ্রহরে টুণ্ড্লার সূর্য্যকিরণ তেমন সুখপ্রদও নহে, তাই ওয়েটিং রুমের দ্বারের কাছে আরাম কেদারা খানা টানিয়া লইয়া বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। প্রাতঃ-কালের ঘটনা বা দুর্ঘটনাই মনের অতি সন্নিকটে ছিল, সুতরাং সেইটির উপরেই গিয়া সর্ব্বাগ্রে মন পড়িল। ভাবিতে লাগিলাম—আজ কি সঙ্কট হইতেই রক্ষা পাই-য়াছি! আজ এই মুসলমান যুবকের সেই আঘাতের পর যদি প্রাণ বিনষ্ট হইত, তাহা হইলে অন্ততঃপক্ষে অসা-বধানতা-জন্য নরহত্যার অপরাধ হইতে আমার অব্যা-হতি কোনক্রমেই ছিল না; রাজদণ্ডে দণ্ডিত হওয়া সুনিশ্চিতই ছিল এবং তাহার উপরে আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া একজনের মরণ ঘটিয়াছে এ লোকনিন্দা এবং নিজের অন্তরগ্লানি হইতে আমি কেমন করিয়া নিস্তার পাইতাম? মনে ভাবিলাম, আজ যে রক্ষা পাইয়াছি তাহা আমার কোন সুকৃতির ফলে নহে, আমার পিতা মাতার পুণ্যের প্রতাপে।

সেইদিন সেইখানে বসিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, জীবনে আর কাহারও সঙ্গে কোন প্রকার বিবাদে সংলিপ্ত হইব না। লজ্জার সহিত স্বীকার করিতেছি, সে সংকল্প আমি রক্ষা করিতে পারি নাই—প্রতিপক্ষের দোষে এবং নিজের বয়োধর্ম্মে আরও কয়েকবার বিবাদে আমাকে লিপ্ত হইতে হইয়াছে। যখনই কাহা-কেও ভূপাতিত করিয়াছি, তখনই সেই ডাক্তার-বর্ণিত মেরুদণ্ডের সর্ব্বনিম্ন হাড়খানির কথা মনে পড়িয়াছে; ভূপাতিত প্রতিপক্ষকে আর আঘাত না করিয়া বা তাহার বক্ষের উপর আসন গ্রহণ না করিয়া, তাহার

কথায় আছে "খোঁড়ার পা খালেই পড়ে"। একবার ফুটবল খেলিতে প্রতিপক্ষের একজনকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিয়-ছিলাম। তাহার কষ্টের কপাল, আমারও দুর্ভাগ্য ততোধিক, সে পড়িবার সময়ে সেই মেরুদণ্ডের নিম্নস্থ অস্থিখানির উপরেই গিয়া পড়িয়াছিল। এই পতনের অবশ্যম্ভাবী ফল শ্বাসরোধ—তাহাও তাহার হইল। সেই জলসিঞ্চন এবং ব্রাণ্ডিপান প্রভৃতি যাহা যাহা কর্ত্তব্য তাহা করা হইল। ভাগ্যক্রমে সে লোক পাঁচ মিনিটের মধ্যেই উঠিয়া দাড়াইল; কিন্তু সেই পাঁচ মিনিট কাল আমার হৃদয়যন্ত্র কিরূপভাবে চলিয়াছিল, নিখিল হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা যিনি তিনিই জানিয়াছিলেন। সে কথা মনে আসিলে আজও হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হইয়া আসিতে চাহে। ফুটবলের উপলক্ষে যাহাকে ভূপা-তিত করিয়াছিলাম তিনি আমার বন্ধু এবং আমাদের বাড়ীতে বহুদিন ডাক্তারী করিয়াছেন। এখন তিনি পুঠিয়া চারি আনীর রাজার গৃহচিকিৎসক। তাঁহার সহিত মাঝে মাঝে আজও সাক্ষাৎ হয়। তিনি বেশ পরিপুষ্ট দেহ লইয়া সংসারাশ্রমে সুখে কালাতিবাহিত করিতেছেন, কিন্তু আমার সেই দস্যুজনোচিত কথা উল্লেখ করিয়া সময়ে সময়ে আজও আমাকে লজ্জা দিতে তিনি ছাড়েন না।

যাক্, দীর্ঘ প্রতীক্ষিত আগ্রার গাড়ী প্লাটফরমে আসিয়া দাঁড়াইল। পশ্চিমাগাড়ী আসিতে আর বিলম্ব নাই, টিকিটের ঘণ্টাও পড়িল। আমরা জিনিষপত্র লইয়া নিজ নিজ গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলাম।

টুণ্ডলা হইতে আগ্রা অতি অল্পক্ষণের পথ। গাড়ী কত-ক্ষণে আগ্রায় পঁহুছিবে সে জন্য আমি রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আগ্রায় আমার এই প্রথম পদার্পণ হইবে। বিশ্ববিশ্রুত এই আগ্রা নগরীর সম্পদ সৌন্দর্য্যের ইতিহাস বহু পুস্তকে এবং বহু লোকের মুখে বাল্যকাল হইতে পড়িয়াছি ও শুনিয়াছি, সুতরাং এই নগরী-প্রধানা আগ্রার রাজদুর্গ, বাগ বিপণী, পথ ঘাট, কানন কান্তার,

জানিতাম, যদিও সে সম্রাট্ সাম্রাজ্য বাগ বেগম, সম্পদ সুষমা কিছুই নাই, তথাপি পৃথিবীর স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, লোকদুর্লভ প্রেমের অমর পারিজাত 'তাজ' যাহার কণ্ঠে আজও দুলিতেছে, তাহার সমস্তই আছে। সে আগ্রাকে নিঃস্ব করিতে পারে তাদৃশ শক্তি বিশ্ব-সংহারী কালেরও নাই। এ হেন আগ্রায় কখন্ প্রবেশ করিব সেই জন্যই রুদ্ধশ্বাসে সেই মাহেন্দ্র মুহূর্ত্তের জন্য ব্যগ্র প্রতীক্ষায় বসিয়া ছিলাম।

সে মুহূর্ত্ত আসিল। দিনের চিতায় অগ্নি দিয়া দিননায়ক যখন অস্তশিখরীর অন্তরালে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, ঠিক সেই গোধূলি লগ্নে আমাদের ট্রেণ আগ্রায় পঁহুছিল। 'অস্তমান রবি-রশ্মির শোণিমা তখন জলস্থল অন্তরীক্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছে,—যমুনার নীল সলিল রক্ত-আভায় রাঙিয়া উঠিয়াছে। আগ্রার প্রাসাদ-দুর্গের রক্ত-পাষাণ-প্রাচীরের উপর রক্ত-রবির রশ্মিরেখা পড়িয়া তাহাকে আরও রাঙাইয়া দিয়াছে। দূরে—অতি দূরে, কালিন্দীর তীর-তটসংলগ্ন মরকতশ্যাম-কুঞ্জকানন-মধ্যস্থা "তাজসুন্দরী"র শ্বেতমর্ম্মরশীর্ষে সান্ধ্যসূর্য্যের গলিত স্বর্ণ কি অপূর্ব্ব শোভাই ঢালিয়া দিতেছিল তাহা বলিয়া বুঝাইবার শক্তি সামর্থ্য আমার নাই। সন্ধ্যার সেই সিদ্ধিযোগের সময়ে, প্রিয়-বিরহ বিধুর রাজাধিরাজের মূর্ত্ত বেদনার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল বলিয়া নিজকে ধন্য মনে করিতে লাগিলাম, এবং রাজপ্রিয়ার সেই হেমাভ রৌদ্ররঞ্জিত কবরচূড়ার দিকে দুই হস্ত তুলিয়া বারম্বার নমস্কার করিতে লাগিলাম। সে নমস্কার সম্রাট্‌কে নহে, সাম্রাজ্যকে নহে, অপ্রতিহত মোগল রাজশক্তিকে নহে, মোগলের স্বর্ণ সম্পদকে নহে—সে নমস্কার সেই রাজরাজের সমুদ্রতুল্য সুগভীর প্রিয়-বিরহ-বেদনাকে—যাহা মন্থিত করিয়া "তাজলক্ষ্মীর" অমর জন্ম সম্ভব হইয়াছিল।

ক্রমশঃ

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

বর্ষা-মিলন

নবীন জলদাগমে আজি বসুন্ধরা,
যেন কোনো বিরহিণী বিচ্ছেদ-কাতরা
মিলেছে প্রিয়ের সনে। উতলা বাতাস
বহিতেছে যেন তারি সুদীর্ঘ নিশ্বাস।
ঝর ঝর ঝরে জল—যেন অবিরল
অশ্রুধারে প্রিয় তারে করিছে শীতল।
বিদ্যুতে জ্বলিয়া উঠে প্রাণের বেদনা
মুহুর্মুহু; অভিমানে বিলুপ্ত চেতনা।
স্রস্তবাস; এলাইয়া পড়েছে কুন্তল;
তটিনী-মেখলা-হার দোদুল চঞ্চল।
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষুব্ধ হিয়া উঠিছে গুমরি,
নীপকুঞ্জে তৃণপুঞ্জে শিহরি শিহরি।
অশ্রুরাশি মাঝে আসি হাসির কিরণ
রচিয়াছে ইন্দ্রধনু, আশার স্বপন।

শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু।

সিন্দূর-কৌটা

(উপন্যাস)

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

মুক্তির উপায়।

বুকের মধ্যে দুঃখের গোপন গুরুভার বহিয়া হোটেলে পৌঁছিয়া বিজয় শুনিল, মাত্র আধঘণ্টা পূর্ব্বে দে-মিস্-সাহেব বাহির হইয়া গিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন ?—তাহা আয়া জানে না ; ধর্ম্মতলার দিকে গিয়াছেন। কখন ফিরিবেন ?—দুইটার সময় ফিরিবেন বলিয়া গিয়াছেন। বিজয় ঘড়ি দেখিল, বেলা তখন একটা। আয়াকে বলিল—"আচ্ছা, মিস্-সাহেব আসিলে তাঁহাকে আমার কথা বলিও। ঘণ্টাখানেক পরে আবার আমি আসিব।"—বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

রেল-আপিসে গিয়া টিকিট কিনিয়া, মান্দ্রাজ মেলে বার্থ রিজার্ভ করিয়া, আরও দুই একটা কায সারিয়া বিজয় যখন পুনরায় হোটেলে ফিরিল, সুশী তখন লাঞ্চ শেষ করিয়া ভোজনকক্ষ হইতে অনেকের সহিত বাহির হইতেছে। বিজয়কে দেখিবামাত্র তাড়াতাড়ি সে নিকটে আসিল—উভয়ের দক্ষিণ-পাণিতল সংযুক্ত হইল। বিজয়ের মুখপানে চাহিয়া সুশীর যেন মনে হইল,তাহা আজ অন্যদিনের মত আনন্দোজ্জ্বল নহে। তাই সে ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল—"অসময়ে যে ? কিছু ঘটেছে নাকি ?"

বিজয় বলিল—"না, কি আর ঘটবে ?"

"খবর সব ভাল ?"

"ভাল।"

সুশী যেন আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"তবু ভাল। একটার সময় তুমি এসেছিলে শুনে, আমার মনে নানা রকম ভাবনা হচ্ছিল। বকুরাণী ভাল আছে ?"

"আছে। একটু কথা ছিল, তাই বল্‌তে এলাম। তুমি কোথা গিয়েছিলে ?"

সুশী বলিল—"রুমাল ছিল না, তাই মার্কেটে গিয়েছিলাম রুমাল কিন্‌তে। কথাটা কি ?"

"সে আছে। একটু নিরিবিলি চাই,—কোথা বসা যায় বল দেখি ? লাইব্রেরিতে ?"

অনাত্মীয় পুরুষের পক্ষে, কোনও যুবতীর শয়নঘরে বসিয়া তাহার সহিত বাক্যালাপে নিযুক্ত হওয়া, সাধারণতঃ ইংরাজি সমাজ-নিয়মের বিরুদ্ধ। অথচ এই হোটেলে সুশীর জন্য একটি শয়নঘর মাত্র লওয়া হইয়াছে, বসিবার ঘর লওয়া হয় নাই। তাই বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় বসা যায় বল দেখি ?"

সুশী বলিল—"লাইব্রেরিতে আর নির্জ্জন কোথা ? সারাক্ষণ ত লোকজন আসছে যাচ্ছে। তার চেয়ে না হয় বেরুই চল। ইডেন গার্ডেন কি আর কোথাও—"

বিজয় দুইচারি মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া বলিল—"দাঁড়াও। ম্যানেজারের কাছে যাই, একটা ড্রয়িং রুম সুইট পাওয়া যায় কিনা দেখি।"—বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে সিঁড়ি দিয় নীচে নামিয়া গেল।

ড্রয়িং রুম সুইট পাওয়া গেল। পাশাপাশি দুইটি কামরা—একটি শয়ন কক্ষের উপযোগী করিয়া সজ্জিত ; অপরখানিতে চেয়ার, টেবিল, শোফা প্রভৃতি, দেওয়ালের গায়ে খানকতক ছবি, দুইদিকে দুইখানি বড় আয়না। উভয় কক্ষের মাঝে একটি দ্বারও আছে। সুশীর অল্পপরিমাণ জিনিষপত্র এই নূতন শয়ন-কক্ষে তখনই স্থানান্তরিত হইল। বসিবার কক্ষে প্রবেশ করিয়া সুশী দেখিতে পাইল, এক কোণে তীর্য্যকৃভাবে একটি কটেজ-পিয়ানো রক্ষিত আছে। দেখিয়াই, তাড়াতাড়ি পিয়ানোর ঢাকাটি খুলিয়া সে বাজাইতে বসিয়া গেল।

বিজয় কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"এই যে, তুমি পিয়ানো বাজাতে জান দেখছি।"

যুগল হস্তের অঙ্গুলিগুলি পিয়ানোর পর্দ্দায় পর্দ্দায় নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে পিয়ানো-বাদনের পর সুশী বিজয়ের পানে সহাসনেত্রে চাহিয়া বলিল—"কি বাজাচ্ছি বল দেখি?"

বিজয় বলিল—"কোনও একটা গান।"

সুশী বলিল—"উঃ—কি পণ্ডিত তুমি! কি গান বল দেখি?"

বিজয় বলিল—"ইংরেজি থিয়েটরে যেন শুনেছি শুনেছি মনে হচ্ছে, কিন্তু ধরতে পাচ্ছি নে। San Toy কি?"

"হ্যাঁ তাই"—বলিয়া সুশী আবার বাজাইতে লাগিল। একটা কলির শেষদিকে পৌঁছিয়া বাজনার সঙ্গে সঙ্গে, হাসিতে হাসিতে, মাথাটি দুলাইতে দুলাইতে, মৃদু মৃদু স্বরে সে গাহিতে লাগিল—

"Kowtow, kowtow
To the great Yeng Whow
And wish him the longest of lives,
With his one little, two little,
Three little, four little,
Five little, six little wives.

বিজয় বলিল—"কি সৌভাগ্যবান পুরুষ! একটি নয় দুটি নয়—একেবারে ছ' ছ'টি!"

সুশী বলিল—"চায়নায় যাবে?"

বিজয় বলিল—"তাই না হয় যাওয়া যাক্ চল। কিন্তু উঠ্‌লে কেন, সুশীলা? সবটা গাওনা।"

সুশী তাহার রুমালটি দিয়া বিজয়কে চুপ্ করিয়া মারিয়া বলিল—"নাঃ—এখন আর গান শোনে না। কি কথা আছে বলছিলে যে? এস বসা যাক্।"

উভয়ে সোফায় গিয়া বসিল। সুশী তখনও গুণ্ গুণ্ করিয়া গান গাহিতেছে। হঠাৎ থামিয়া বলিল—"তুমি ত San Toy দেখেছ। ইংরেজ মেয়েকে জাপানী পোষাকে কেমন সুন্দর দেখায় বল দেখি!"

বিজয় বলিল—"তোমার চেয়ে?"

সুশীর গাল দুটিতে ক্ষণকালমাত্র একটু লাল আভা দেখা দিল। তাহার পরেই সে ভাবকে দমন করিয়া কৌতুকপূর্ণ নয়নে সে বলিল—"আমি সুন্দরী নাকি? এই তোমার মত্? বকুরাণীকে একথা বলেছ?"

বিজয় বলিল—"বকুরাণী জানে।"

"কি জানে?"

"তুমি সুন্দরী কি না তা সে জানে। তোমায় দেখেছে।"

সুশী দ্রুতভাবে বলিল—"দেখেছে?--কবে?—কোথা?"

"কাল রাত্রে, থিয়েটরে। ওরাও গিয়াছিল যে। উপরে চিকের আড়ালে সেই লাল পরী সবুজ পরীদের মধ্যে ওরাও ছিল। আমাদের দু'জনকেই ওরা দেখতে পেয়েছিল।"

সুশী জিজ্ঞাসা করিল—"ওরা—আর কে?"

"আমার বোন সৌদামিনী ছিল। আমাদের আরও দু'জন আত্মীয়া, তাঁরা ভবানীপুর থেকে এসেছিলেন।"

"কে তোমায় বল্লে?"

"বকুরাণীই বল্লে।"

সুশী যেন একটু উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি সব কথা বল্লে?"

"বল্লে, বল্লে আমাদের দেখতে পেয়েছিল। তারা বেশীক্ষণ ছিল না, দুটো অঙ্কের পরই বাড়ী চলে এসেছিল।"

সুশী গম্ভীর হইয়া অন্যদিকে চাহিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। একটু পরে বিজয়ের পানে ফিরিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা বিজয়, বকুরাণী রাগ করলে?"

বিজয় বলিল—"রাগের কথা ত আমায় সে কিছু বলে নি।"

সুশী বলিল—"হিন্দু মেয়ে তাই রাগ করেনি। অন্যজাতের মেয়ে হলে অনর্থ করত এতক্ষণ। হিন্দু মেয়েদের খুব স্বামিভক্তি তাই রাগ করেনি।"

বিজয় বলিল—"অন্য জাতের চেয়ে, হিন্দুমেয়েদের

খুব স্বামিভক্তি নাকি? এ খবরটি তুমি কোথায় পেলে সুশীলা?"

সুশী বলিল—"এ আর কে না জানে?—কাল রাতে থিয়েটরেই ত দেখা গেল। স্বামী আর একজনকে ভালবেসেছেন এই শুনে রাণী ঔশীনরী প্রিয়প্রসাদন ব্রত করিলেন। অন্য কোনও জাতের মেয়ে হলে পারত?—অসম্ভব! অসম্ভব!"—বলিয়া সুশী আবার অন্যমনস্ক হইল।

বিজয় একটি সিগারেট ধরাইয়া বলিল—"কি ভাবছ তুমি?"

সুশী মেঝের কার্পেটের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"দেখ বিজয়, বকুরাণী রাগ না করলেও—আমাদের কিন্তু এটা উচিত নয়।"

"কি উচিত নয়?"

"এত মেশামিশি। দিনের মধ্যে দুজনে এতক্ষণ একসঙ্গে থাকা, একসঙ্গে বেড়ান, একসঙ্গে খাওয়া, একসঙ্গে থিয়েটরে যাওয়া—এ সব কি আমাদের উচিত?"

বিজয় একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"জানিনে।"

সুশী বলিতে লাগিল—"না, উচিত নয়। বকুরাণী খুব ভাল, তাই সে কিছু মনে করে না। কিন্তু হাজার হলেও সে ত তোমার স্ত্রী—তার প্রতি তোমার একটা কর্ত্তব্য আছে ত!—না সত্যি, এ রকম কোরো না আর।"

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"কি করব না?"

"আমার সঙ্গে এত মেশামিশি।—যতদিন আমি এ হোটেলে আছি, ততদিন তোমায় এক একবার আসতেই হবে, নৈলে আমায় দেখবে কে? আমি চৌধুরী সাহেবদের ওখানে চলে গেলে, তুমি আর বেশী এস না কিন্তু—কেমন?"

বিজয় গম্ভীরভাবে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—"আচ্ছা, তাই হবে। কাল থেকে আর আস্‌ব না—তোমার আদেশই পালন করব।"

সুশী শঙ্কিত ভাবে বিজয়ের মুখপানে চাহিয়া বলিল—"তুমি বুঝি রাগ করলে?—আমি তোমার ভালর জন্যেই বলছি, তা তুমি বুঝতে পারছ না বিজয়?"—বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু দুইটি ছলছল করিয়া উঠিল।

বিজয় তখন সুশীর একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিল—"না গো সুশীলা, তা নয়। আমি ওকথাটা অন্যভাবে বলেছি। আজ সন্ধ্যার গাড়ীতে আমায় মান্দ্রাজ যেতে হবে কি না—সেই কথাই তোমায় বলবার জন্যে আজ এত আগে এসেছি।"

সুশী চমকিত স্বরে বলিল—"মান্দ্রাজে যাবে? কেন গো?"

বিজয় ইতিপূর্ব্বেই ভাবিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, মান্দ্রাজ যাইবার কারণটা সুশীকে সে খুলিয়াই বলিয়া যাইবে—তাহা হইলে নিজ মনকে সে প্রস্তুত করিয়া লইবার সময় পাইবে। সুশীলার নেক্‌লেস উদ্ধার করিতে জব্বলপুরে গিয়া তথাকার ডাকবাঙ্গালায় পলের নিকট বিজয় যাহা যাহা শুনিয়াছিল, সমস্তই সুশীর নিকট বর্ণনা করিয়া শেষে বলিল—"মাতালের মুখের কথার উপর নির্ভর করে' ত নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না; নিজে গিয়ে এর সত্যমিথ্যা অনুসন্ধান করতে হয়।"

সুশী তাহার জীবনের একটি প্রধানতম ঘটনা সম্বন্ধে এই অপ্রত্যাশিত নূতন সংবাদটি পাইয়া যে বিচলিত হইয়াছে, তাহা তাহার মুখভাব কিংবা আচরণে প্রকাশ পাইল না। সে নীরবে সমস্ত শুনিয়া বলিল—"এরই জন্যে তোমায় মান্দ্রাজ যেতে হবে? যদি সত্যি তার একটা ছেড়ে দশটা বিবাহিতা স্ত্রীই থাকে, তা জেনে আমাদের কি লাভ হবে বিজয়?"—সুশীর শেষের কথাগুলি যেন একটু ভারি হইয়া আসিয়াছিল।

সুশীর মনের এই গোপন ব্যথা বিজয়ের মনেও সঞ্চারিত হইল। কিন্তু সে ভাবকে দমন করিয়া বলিল—"কথাটা সত্য হলে, তোমার সঙ্গে তার সে বিবাহ আইন মতে অসিদ্ধ; তোমার বিয়ে হয় নি ধরতে হবে। তুমি—স্বচ্ছন্দে—যাকে ইচ্ছে বিবাহ করতে পারবে।"

সুশী বিজয়ের পানে তাহার বড় বড় চোখ ছুটি স্থির করিয়া বলিল—"সে বিবাহ অসিদ্ধ হলেই, আমার যাকে ইচ্ছে আমি তাকে বিয়ে করতে পারব ?"

বিজয় বলিল—"নিশ্চয়।"

উন্মুক্ত বাতায়ন পথে ভাইস্‌রীগল লজ-এর পানে চাহিয়া সুশী বলিল—"যদি ধর, ঐ বড়লাট সাহেবকেই বিয়ে করতে আমার ইচ্ছে হয় ?"

বিজয় কষ্টে হাসিয়া বলিল—"তা কি ক'রে হবে ? সাহেবের একটি মেম রয়েছে যে।"

সুশী বলিল—"যাকে ইচ্ছে তাকেই যখন আমি বিয়ে করতে পাব না, তখন এত কষ্টস্বীকার করে' এত টাকা খরচ করে' তোমার মান্দ্রাজ যাওয়ার দরকার ?"

বিজয় মনে মনে বলিল—'এইবার! কথাগুলি বেশ গুছাইয়া বলিতে হইবে।—এবং, বেশ সহজ ভাবে।'—প্রায় আধ মিনিট কাল নীরব থাকিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল—"আহা! লাট সাহেব ছাড়া পৃথিবীতে কি আর অন্য পাত্র নেই ? কলকাতেই তুমি যখন রইলে, কত লোকের সঙ্গে তোমার আলাপ পরিচয় হবে; যদি কারু সঙ্গে তোমার ভালবাসা হয়, তখন বিবাহে কোনও বাধা থাকবে না। পথটা তোমার পরিষ্কার থাকে, এই আমার উদ্দেশ্য আর কি !"

সুশী মাথাটি নীচু করিয়া এই কথাগুলি শুনিতেছিল। বিজয় থামিলে মুহূর্ত্তের জন্য সে একবার তাহার মুখ পানে চাহিল। পরে আবার মেঝের পানে চাহিয়া অনেকক্ষণ কি ভাবিল। শেষে মুখ তুলিয়া বলিল—"আমি চট্‌পট্ একজন কাউকে বিয়ে করে' ফেলি, এই কি তোমার ইচ্ছে ?"

"হ্যাঁ।"

"ওঃ!"—বলিয়া সে আবার নতমুখী হইল।

বিজয় বলিল—"যদি তোমার মনের মত একজন যোগ্য লোককে তুমি বিয়ে কর, সেটা কি সুখের কথা নয় সুশীলা ?"

সুশী আবার মুখখানি তুলিল। তাহার ললাটে এখন কুঞ্চনরেখা দেখা দিয়াছে—ওষ্ঠ যুগল ঈষৎ কম্পিত। অন্যদিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল—"তুমি আমায় বিদায় করতে পারলেই বাঁচ, নয় ? আমি তোমার ভারবোঝা হয়েছি বোধ হয় ?—জিজ্ঞাসাই বা কেন করছি, হয়েছিই ত! আমি নিজে কি আর বুঝতে পারিনে ? তা যাও, মান্দ্রাজে গিয়ে দেখ এস পথটা পরিষ্কার আছে কি না। ফিরে এসে, নিতান্ত কাণাখোঁড়া না হয়, ছুটো ভাত দিতে পারে, এমন একটা কাউকে দেখে আমায় বিদায় করে দিও।"

মান্দ্রাজ যাইবার প্রস্তাব মাত্র সুশী যে এই ভাবে গ্রহণ করিবে, ইহা বিজয় মনে করে নাই। তাহার নিজ জীবনের সূত্রগুলি ত খুবই জট পাকাইয়া উঠিয়াছে;—কিন্তু তাহার আশা ছিল, সুশীর অবস্থা হয়ত তাদৃশ শোচনীয় হয় নাই; একটু চেষ্টা করিলেই, বিজয় নিজে একটু সংযম ও দৃঢ়তা অবলম্বন করিলেই সুশী সামলাইয়া উঠিতে পারে। এই ধারণার উপর নির্ভর করিয়াই গত রাত্রে সে তাহার কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়াছে। কিন্তু এখন সুশীর কথাবার্ত্তায় তাহার মনে আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল—"এ কি ব্যাপার!—এতদূর আসিয়া পড়িয়াছি—দুজনেই ? এবার ত ফেরা আবশ্যক, নহিলে যে অথই জলে গিয়া পড়িতে হইবে। না—না—আর একটি পাও অগ্রসর হওয়া নয়।"

সুশী সোফার কোণে হেলান দিয়া, বাহুদ্বয় বক্ষোপরি স্থাপন করিয়া একদৃষ্টে লাটভবনের বৃক্ষগুলির পানে চাহিয়া আছে। তাহার বড় বড় চক্ষু দুইটি সজল ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বিজয় বলিল—"কি ভাবছ সুশীলা ?"

সুশীলা দৃষ্টি না ফিরাইয়াই বলিল—"ভাবিনি কিছু।

"আমার মান্দ্রাজ যাওয়া সম্বন্ধে তোমার মত কি ?"

সুশী ঠোঁঠ দুইখানি ফুলাইয়া বলিল—"আমি ভারি ত একটা মানুষ—আমার আবার মতামত!"

বিজয় বলিল—"না সুশীলা, তোমার মতামত উড়িয়ে দেবার জিনিষ নয়। তুমি আমার চেয়ে বয়সে কত ছোট—সংসারের কিছুই দেখনি বলতে গেলে, তবু,

আজ তুমি কিছুক্ষণ আগে আমায় যে কথাটি বলেছ, তাতেই তোমার বুদ্ধির, তোমার কর্ত্তব্যজ্ঞানের পরিচয় আমি পেয়েছি। সে কথাটির মূল্য নেই।"

সুশী চক্ষু ফিরাইয়া বলিল—"কি অমূল্য কথা তোমায় বলেছি?"

"বল্লে কিনা, সব দিক বিবেচনা করলে, তোমায় আমায় এতটা মেশামিশি ভাল নয়। খুব ঠিক কথাই তুমি বলেছ।"

সুশী সোফার বাহুতে মাথাটি অসহায় ভাবে হেলাইয়া দিয়া বলিল—"কথাটি তোমার খুব মনের মতন হয়েছে ত!"

এই সময় আয়া আসিয়া প্রবেশ করিয়া বলিল—"হুজুরের চা কি এইখানেই লইয়া আসিতে বলিব?"

সুশী বিজয়কে জিজ্ঞাসা করিল—"চা এখন খাবে?"

আজ দুইজনের কথাবার্ত্তার ভিতর হইতে যেন এক-রাশি প্রচ্ছন্ন ধূম উদ্গত হইয়া বিজয়ের শ্বাসরোধ করিতেছিল। তাই একটু বৈচিত্র্যের আশায় সে বলিল—"মন্দ কি?"

চা পান করিতে করিতে, যেন নিতান্তই নির্লিপ্ত-ভাবে সুশী জিজ্ঞাসা করিল—"তা হলে—আজই মান্দ্রাজ যাওয়া স্থির?"

বিজয় বলিল—"হ্যাঁ—তা—একরকম স্থিরই বৈকি। টিকিট কিনে বার্থ রিজার্ভ করে এসেছি।"

সুশী বলিল—"তা—বেশ।"

বিজয় বলিল—"এখানেই প্রথমে এসেছিলাম। তুমি বেরিয়েছ, দুটোর সময় আসবে, শুনে চলে গেলাম, টিকিট কিনে বার্থটা রিজার্ভ করে এলাম।"

বিজয়ের পেয়ালা পূর্ণ করিতে করিতে সুশী জিজ্ঞাসা করিল—"কবে ফিরবে?"

"এই হপ্তাখানেক মধ্যেই।"

"কটার সময় ট্রেণ?"

সুশীর হাত হইতে পেয়ালাটি লইয়া বিজয় বলিল—"রাত্রি দশটায়। তুমি ষ্টেশনে যাবে সুশীলা?"

"আমায় তুলে দিতে? বল ত আমি যাবার সময় এখান থেকে তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাই।"

সুশী গম্ভীর ভাবে বলিল—"তাতে—তোমার কর্ত্ত-ব্যের কোনও হানি হবে না ত?"

বিজয় হাসিতে চেষ্টা করিয়া বলিল—"হয় হবে—সে আমি বুঝব। তোমার গুরুমশায়গিরি এখন রাখ ত।"

চা পানান্তে বিজয় উঠিয়া বলিল—"চারটে বাজে। বাড়ী গিয়ে জিনিষপত্রগুলো ঠিক করে নিতে হবে। তবে ঐ কথা রইল। রাত্রি ৯টার সময় আমি আসব—তোমায় তুলে নিয়ে যাব। আমার গাড়ীই ষ্টেশনে অপেক্ষা করবে এখন—তোমায় এখানে ফিরে পৌঁছে দিয়ে তার পর বাড়ী যাবে। এখন তা হলে চল্লাম।"—বলিয়া বিজয় হস্ত প্রসারণ করিল।

সুশী নত মস্তকে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিজয়ের হস্ত-স্পর্শ করিল। বিজয় তাহা ধারণ করিয়া বলিল—"আজ তোমার হাতখানি এমন ঠাণ্ডা কেন?"

সুশী ক্ষীণস্বরে বলিল—"এক একদিন এ রকম হয়।"

বিজয় সুশীর পানে চাহিয়া দেখিল, তাহার স্বচ্ছ গৌরবর্ণ মুখখানি, গালদুটি, কাণ দুটি লাল টক্‌টক্ করিতেছে। বুঝিল, ইহা অদ্যকার এই সকল প্রসঙ্গ-আলোচনার ফল।

গাড়ীতে যাইতে যাইতে, দুইহাতে নিজ মুখখানি ঢাকিয়া বিজয় ভাবিতে লাগিল—"আজ ভারি নিষ্ঠুরের কায করেছি, সুশীকে আঘাত করে এসেছি। এই কিন্তু একমাত্র উপায় মুক্তির—তারও আমারও।"

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

মুখ ফুটিল।

রাত্রি পৌনে নয়টার সময় বিজয়ের মোটরগাড়ী বাড়ীর ফটক দিয়া বাহির হইল। ঠিকাগাড়ীতে বাক্স বিছানা প্রভৃতি বোঝাই দিয়া লছমন বেহারা পূর্ব্বেই

হোটেল হইতে ফিরিবার পর বকুরাণীর সহিত বিজয়ের নির্জ্জন সাক্ষাতের অবসর বড় হয় নাই। তাহার অন্তরের মধ্যে যে বিপ্লবের ক্রিয়া চলিতেছে, স্বামীর মুখ দেখিয়াই বকুরাণী তাহার কতকটা আভাস পাইয়াছিল। বিদায়ের সময় বিজয় যখন শয়নগৃহে তাহার ঘড়ি প্রভৃতি লইতে গিয়াছিল, বকুরাণী তখন তথায় আসিয়া নীরবে দাঁড়াইল। বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"কিছু বল্‌বে ?"

বকুরাণী নত হইয়া, স্বামীকে প্রণাম করিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"আমায় আশীর্ব্বাদ কর।" বিজয় ঈষৎ হাসিয়া, দুইটি অঙ্গুলির দ্বারা স্ত্রীর গণ্ডস্থল স্পর্শ করিয়া বলিল—"স্বামী-সোহাগিনী হও।"—বলিয়া বিজয় বাহির হইয়াছিল।

গাড়ী সার্কুলার রোড হইতে ধর্ম্মতলার মোড় লইল। বিজয় বসিয়া ভাবিতে লাগিল—"সুশীকে ষ্টেশনে নিয়ে যাবার প্রস্তাব না করলেই ভাল করতাম। শ্লেষ করে সে যে কথা বলেছিল—'তাতে তোমার কর্ত্তব্য হানি হবে না ত'—সে কথা কিন্তু ঠিক। তখন তার বিষণ্ণ মুখখানি দেখেই আমার ও দুর্ব্বলতাটুকু এসে পড়েছিল। আমার মন এমন দুর্ব্বল!—ছি ছি। আমি অবিবেচনার কায করেছি—দুঃখ পাচ্ছি—এ আমার উপযুক্ত শাস্তিই হচ্ছে। কিন্তু ও বেচারী ত কোনও দোষে দোষী নয়—ওর এই দুঃখের কারণ আর কিছু নয়, শুধু আমার দুর্ব্বলতা। কেন ওকে এ দুঃখে আমি জড়ালাম! আমার মত পাষণ্ড পৃথিবীতে আর নেই বোধ হয়।"

গাড়ী ক্রমে এস্‌প্লেনেডে আসিয়া পড়িল। ক্রমে মোড় ঘুরিয়া হোটেলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বিজয় গাড়ী হইতে নামিয়া হোটেলে প্রবেশ করিল। আজ তাহার সে বলদর্পিত পদক্ষেপ আর নাই—সিঁড়ি উঠিতে যেন কষ্ট হইতেছে। অন্যমনে, প্রথমে সে সুশীর পুরাতন কামরাটির দিকেই যাইতেছিল। অর্দ্ধপথে স্মরণ হইলে ফিরিয়া নূতন কক্ষগুলির দিকে চলিল।

বসিবার ঘরটীতে আলো জ্বলিতেছে, মুক্তদ্বারে পর্দ্দা ফেলা রহিয়াছে, আয়া বাহিরে বসিয়া আছে। বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"মিস্ সাহেব কোথা ?" আয়া বলিল—"ভিতরেই আছেন, যান।"

প্রবেশ করিয়া বিজয় দেখিল, বিকালে যে সোফাটির যেখানে সুশী বসিয়াছিল, এখনও সেইখানে বসিয়া আছে। পদশব্দে সুশী চমকিয়া দ্বারের দিকে চাহিল। বলিল—"এস।"

বিজয় সোফার নিকট দাঁড়াইয়া বলিল—"খেয়ে এসেছ ?"

সুশী নীরবে মাথা নাড়িল।

বিজয় বলিল—"এখনও খাও নি ? ডিনার যে এতক্ষণ শেষ হয়ে গেল বোধ হয়। বেশী ত সময় নেই—এই খানেই তোমার খাবার আনতে বল্‌ব ?"

সুশী বলিল—"এখন থাক।"

"এখন খাবে না ? কখন খাবে ?"

"তোমাকে তুলে দিয়ে এসে।"

বিজয় সোফায় বসিয়া বলিল—"অনেক রাত্রি হয়ে যাবে যে! যদি অসুখ করে ?"

সুশী মাথা নাড়িয়া বলিল—"আমার অসুখ করে না। আমি পাথর দিয়ে তৈরী।"

সুশীর মুখভাব দেখিয়া এবং এই কথা শুনিয়া, বিজয়ের বুকের ভিতরটা যেন কেমন করিয়া উঠিল। তাহার যেন কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। হাতের উপর গালটি রাখিয়া সে নীরবে বসিয়া রহিল।

একটু পরে, কথা কহিবার সামর্থ্য ফিরিয়া আসিলে বলিল—"বিকালে বেড়াতে বেরিয়েছিলে ?"

"না।"

"মাঠে একটু বেড়ালে না কেন ? তাজা হাওয়ায় বেড়ান ভাল। তখন থেকে এইখানেই বসে আছ ?"

সুশী এ কথার কোন উত্তর দিল না। বিজয় ভাবিতে লাগিল, "মান্দ্রাজ যাইবার কারণটা এখনই ইহার নিকট প্রকাশ করিয়া বোধ হয় ভাল করি নাই। ঐ কথা শুনিয়া এতটা ভাঙ্গিয়া পড়িবে তাহাই বা কেমন করিয়া জানিব ? এখন করা যায় কি ? এ

অবস্থায় ফেলিয়াই বা যাই কেমন করিয়া? অথচ না গেলেও নয়। যদি যাওয়া এখন স্থগিত রাখি, তবে আর উদ্ধার নাই—তুইজনেই ডুবিব।—তা, ডুবিই না হয়—আর ত পারি না!"

এমন সময় সুশী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল—"আসবার সময় বকুরাণী কি বল্লে?"

বিজয় সচকিত ভাবে বলিল—"বকুরাণী? কৈ, কিছু বলেনি ত।"

পরমুহূর্ত্তেই বিজয়ের স্মরণ হইল, হাঁ, বলিয়াছিল, একটি মাত্র কথা সে বলিয়াছিল। বকুরাণীর সেই মুখখানি, সেই ছলছল নেত্র, সেই আশীর্ব্বাদ-ভিক্ষা তাহার মনে পড়িল। সে নিজেকে বলিল—"না—না ডুবিলে চলিবে না। উঠিতেই হইবে—বাঁচিতেই হইবে।"

কিয়ৎক্ষণ পরে বিজয় আবার সুশীর সেই বিশাদময়ী মূর্ত্তির পানে চাহিল। তখন তাহার মনে হইল—"আজ না হয় মান্দ্রাজ নাই গেলাম—তুদিন পরেই যদি যাই, তাহাতেই বা এমন ক্ষতি কি? যে অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি, তাহাতে তুইদিন এদিক ওদিকে কি-ই বা এমন তফাৎ হইবে!" কাছে একটু সরিয়া বসিয়া, স্নেহপূর্ণ স্বরে সুশীকে বলিল—"আমার মান্দ্রাজ যাওয়া কি নিতান্ত তোমার অমত?—তা যদি হয়, বল,—আমি যাব না।"

সুশী তাহার এলানো দেহখানি একটু তুলিয়া বসিয়া, বিজয়ের মুখ পানে চাহিল। কম্পিত স্বরে বলিল—"আমার কথায় তুমি যাওয়া বন্ধ করবে?—আমি তোমার কে, বিজয়?"—বলিয়াই সে আবার সোফার গায়ে ঢলিয়া পড়িল। তাহার মাথাটি এদিক ওদিক তুলিতে লাগিল, তুই চক্ষু দিয়া হুহু করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বিজয় তন্মুহূর্ত্তেই সুশীলার হাতখানি ধরিয়া অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে বলিল,—"তুমি আমার কে, তাই জিজ্ঞাসা করছ? তুমি আমার—"

বলিয়া সহসা বিজয় তাহাকে টানিয়া সবলে বুকে জড়াইয়া ধরিল। পাগলের মত জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহার

মুখচুম্বন করিতে করিতে বলিতে লাগিল—"তুমি আমার বুকের রক্ত—তুমি আমার প্রাণ—তুমি আমার ভালবাসা।"

সুশী নিজেকে ছাড়াইয়া লইবার কোন চেষ্টাই করিল না। কেবল মুখটি তুলিয়া মৃতুস্বরে বলিল—"আমি যদি তোমার ভালবাসা—তবে তুমি আমায় বিলিয়ে দিতে চেয়েছিলে কেন?"—বলিয়া সে বিজয়ের স্কন্ধে মাথা রাখিল। তাহার দেহটি শিথিল হইয়া আসিতেছিল।

বিজয় বলিল—"কেন চেয়েছিলাম সে কথা আর তোমায় কি বলব সুশীলা!"—বলিয়া নিজ স্কন্ধ হইতে তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিল।

কিন্তু একি! মাথাটি যে লুটাইয়া পড়ে!

বিজয় সভয়ে ডাকিল—"সুশীলা—সুশীলা—"

কোনও উত্তর নাই।

বিজয় তখন বুঝিল, সুশীর ফিট্ হইয়াছে। সে চীৎকার করিয়া ডাকিল—"আয়া।"

"সা'ব্"—বলিয়া আয়া প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইল। বিজয় পকেট হইতে কাগজ পেন্সিল বাহির করিয়া তাড়াতাড়ি লিখিল—"Room 51 Lady fainted away Doctor quick" (৫১ নং কামরায় একটি মহিলার ফিট হইয়াছে। শীঘ্র ডাক্তার চাই)। কাগজখানি আয়ার হাতে দিয়া বলিল—"ম্যানেজার "সা'ব্"—দৌড়ো।"

সোফায় সুশীকে হেলাইয়া রাখিয়া, সংলগ্ন শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া বিজয় জল অন্বেষণ করিল। কাচের সোরাইয়ে জল ছিল, সেই জল আনিয়া সুশীর মুখে চক্ষে ছিটাইতে লাগিল।

একমিনিট পরে বাহিরে দ্রুত পদশব্দ শ্রুত হইল। আয়ার সহিত একজন স্থূলাঙ্গী ইউরোপীয় মহিলা, একটি ঔষধের ব্যাগ হাতে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"আপনি ইহাঁর স্বামী?"

"না।"

মহিলাটি বলিলেন—"আমি এই হোটেলের ..."

আপনি বাহিরে যান—সেখানে অপেক্ষা করুন।” আয়াকে বলিলেন—“পোষাক উতারো—জেল্‌দি।”

বিজয় বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল।

প্রায় পাঁচমিনিট পরে শব্দে সে জানিতে পারিল, মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়াছে। ক্রমে সে সুশীর ক্ষীণ কণ্ঠস্বরও শুনিতে পাইল। আরও কিয়ৎক্ষণ পরে বুঝিতে পারিল, সুশীকে তাহার বিছানায় লইয়া যাওয়া হইতেছে।

অবশেষে স্থূলাঙ্গী মহিলাটি বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন—“ভিতরে যান, আপনাকে উনি খুঁজিতেছেন। বেশ শান্ত করিয়া রাখিবেন, কোন প্রকার উত্তেজনা না হয়।”

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—“ভয়ের কোনও কারণ নাই ত!”

মেমসাহেব বলিলেন—“না। আমি গিয়া বীফ্‌-টী পাঠাইয়া দিতেছি, গরম গরম পান করাইয়া দিবেন।”—বলিয়া তিনি দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

বিজয় সুশীর শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল। বিছানার কাছে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—“কেমন আছ সুশীলা?”

“ভাল আছি। তুমি আমার কাছে বস। আয়া, কুর্সী দেও।”

বিজয় চেয়ারে বসিয়া সুশীর ভিজা চুলগুলি ললাট হইতে সরাইয়া দিতে লাগিল।

পাঁচ মিনিট পরে বীফ্‌-টী আসিল। ঘ্রাণ লইয়া বিজয় বুঝিল, উহাতে ব্রাণ্ডি মিশ্রিত আছে। তাহা পান করিয়া সুশী একটু সুস্থ হইল; এবং শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল।

বিজয় ঘড়ি খুলিয়া দেখিল, রাত্রি তখন সাড়ে দশটা। মনে মনে বলিল—“কাল ঠিক এই সময়েই—হ্যাঁ, এই সময়েই ত—একজনের ফিট্‌ হয়েছিল। তারই চব্বিশ ঘণ্টা পরে—আর একজনের ফিট্‌ হল। বাঃ—কি ভাগ্যবান পুরুষ আমি!”

কিয়ৎক্ষণ পরে আয়া আসিয়া বলিল—“হুজুরের কুঠীর বেহারা আসিয়াছে।”

বিজয় বাহিরে গিয়া দেখিল, লছমন দাঁড়াইয়া। সে সেলাম করিয়া বলিল—“গাড়ী ত চলিয়া গিয়াছে হুজুর। এখন কি হুকুম হয়?”

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—“জিনিষপত্র কোথা?”

“রাস্তায়, ঠিকাগাড়ীতে। হোটেলের দ্বারবানের জিম্মা করিয়া দিয়া আসিয়াছি।”

বিজয় বলিল—“বাড়ী যা।”

লছমন একটু ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“মেমসাহেব কেমন আছেন হুজুর?”

“ভাল আছেন। ঘুমাইতেছেন। তুই বাড়ী যা”—বলিয়া বিজয় নিঃশব্দে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া, নিদ্রিতা সুশীর শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিল।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা

১৪ এ, রামতনু বসুর লেন, “মানসী প্রেস” হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সতর্ক প্রহরী

MANASI PRESS.
CALCUTTA.

মানসী ও মর্ম্মবাণী

১০ম বর্ষ | ১ম খণ্ড | শ্রাবণ ১৩২৫ সাল | ১ম খণ্ড | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

মীরাবাই

যে সময়ে গৌড়ীয় রূপ সনাতন প্রভৃতি বৈষ্ণবেরা বৃন্দাবনে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়ে বল্লভাচার্য্য নামে অপর একজন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব মথুরার পরপারবর্ত্তী গোকুলে গিয়া তাঁহাদের প্রধান আখড়া স্থাপন করেন। এবং তাঁহার শিষ্যেরা বোম্বাই গুজরাট, রাজপুতনা প্রভৃতি স্থানে যাইয়া তথাকার শৈব শাক্ত অধিবাসিগণকে নবীন বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা দিতেছিলেন। রাজপুতনার মেরতা নামক গ্রামের ভূস্বামী বা রাজা তাঁহাদের নিকট বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষা লইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার নাম "রাজা রাঠৈরবতিয়া রাণা।"

মীরা নামে রাজার একটী পঞ্চমবর্ষীয়া রূপবতী তনয়া ছিল। সেও পিতামাতার দেখাদেখি শিশু-কণ্ঠে মধুর স্বরে বৈষ্ণব পদগুলি গাহিতে শিখিয়াছিল। একদিন রাজবাটীর সম্মুখ দিয়া বাদ্যধ্বনিতে দিক্ মুখরিত করিয়া মহা সমারোহে একটি বর বিবাহ করিতে যাইতেছিল। কন্যা তাহা দেখিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা ও কি যাইতেছে?" পিতা বলিলেন, "দুলাহ (বর) যাইতেছে।" বালিকা আবদার ধরিল, "আমিও দুলা লইব।" পিতা তাহাকে একটী নবনির্ম্মিত কৃষ্ণমূর্ত্তি দিয়া বলিলেন, "এই নাও তোমার দুলা।" বালিকা জিজ্ঞাসা করিল, "দুলাকে লইয়া কি করিতে হয়?" পিতা উপদেশ দিলেন, দুলাকে বসন ভূষণ ও মাল্য চন্দনে সাজাইয়া উত্তম উত্তম দ্রব্য-সামগ্রী ভোগ দিতে হয়। বালিকা মীরা পিতার শিক্ষামত এই কৃষ্ণমূর্ত্তিটিকে বিচিত্র বেশভূষা পরাইল; আপনার খাদ্য অগ্রে ইঁহাকে নিবেদন করিয়া আপনি প্রসাদ খাইতে লাগিল।

মীরা এইরূপে শিশুকাল হইতেই বৈষ্ণব ধর্ম্মাচরণে অভ্যস্তা হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বাটীতে অনেক বৈষ্ণব আসিয়া রাধাকৃষ্ণলীলা-পদ গান করিতেন। তাঁহাদের নিকট মীরা সঙ্গীত শিক্ষা

করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অপূর্ব্ব কবিত্ব-শক্তিরও উন্মেষ হইল।

মীরার অনুপম রূপমাধুরী ও অমৃতনিস্যন্দিনী সঙ্গীতশক্তির কথা ক্রমে চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। যৌবনকাল উপস্থিত হইলে, মেওয়ারের রাণা মুকুলদেবের পুত্র কুম্ভের সহিত তাঁহার পরিণয় হইয়া গেল। ইনি শিবিকার ভিতর করিয়া গিরিধারী বা রণছোড়জী নামক অবাল্য-পূজিত কৃষ্ণ-মুর্ত্তিটী সঙ্গে লইয়া শ্বশুরালয়ে গেলেন। ইঁহার শ্বশুরকুলের প্রায় সকলেই শক্তি-উপাসক। শাশুরী বধূ বরণ করিতে আসিয়া মীরার কৃষ্ণমূর্ত্তিকে দেখিয়া বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহাদের কুলদেবতা কালিকাদেবীর মন্দিরে যাইয়া বধূকে প্রণাম করিতে আদেশ দিলেন। নববধূ এক পদও অগ্রসর হইলেন না; বা নিজ ঠাকুরটিও ফেলিয়া দিলেন না। কাযেই প্রথম দর্শন দিন হইতেই শাশুড়ীর সহিত তাঁহার মনান্তর হইল এবং যে বধূ তাঁহাদের কুলদেবতা কালিকাকে পূজা ও ভক্তি করিতে অসম্মতা, তাঁহাকে তাঁহারা নিজ গৃহে লইতে সম্মত হইলেন না। প্রথম দিন হইতেই নববধূর জন্য প্রাসাদের বহির্দ্দেশে স্বতন্ত্র ভবন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। মীরা সেই ভবনে থাকিয়াই স্বীয় অভীষ্টদেব রণছোড়জীর নির্ব্বিঘ্নে সেবা করিতে লাগিলেন। মাতার কথা অবমাননা জন্য রাণা কুম্ভও পত্নীর মুখদর্শন করিতেন না; কেবল দাস-দাসীরা আসিয়া যথাসময়ে তাঁহার আহারাদি দিয়া যাইত।

মীরা প্রতিদিন নির্জ্জনে আবাল্য অভ্যাস মত অগ্রে আপন আহার্য্য ঠাকুরকে ভোগ দিয়া পরে বৈষ্ণব ও অতিথিগণকে খাওয়াইয়া, শেষে যাহা থাকিত আপনি আহার করিতেন। যথাসময়ে ঠাকুরের আরতি করিয়া ও তাঁহার সমক্ষে ভজনগান গাহিয়া প্রফুল্লচিত্তে দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

একদিন প্রহরীরা আসিয়া রাণা কুম্ভকে জানাইল যে রজনীকালে রুদ্ধদ্বার গৃহে মীরা কাহার সহিত হাস্য পরিহাস, গীতবাদ্য ও অক্ষক্রীড়া করিতেছেন এরূপ শব্দ পাওয়া যায়, অথচ বাহিরের কোন লোককে তাহারা ভিতরে যাইতে দেয় না। রাণা এক রাত্রিতে গুপ্তভাবে মীরার গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন, মীরা গীত গাহিতেছেন ও যেন কাহার সহিত পাশা খেলিতেছেন, অথচ দ্বিতীয় লোক কেহ তথায় নাই। রাণা সক্রোধে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কাহার সহিত পাশা খেলিতেছিলি?" মীরা উত্তর দিলেন, "আমার স্বামীর সহিত।" রাণা মীরাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "তোর আবার অন্য কোন স্বামী আছে?" মীরা হাসিতে হাসিতে নিম্ন লিখিত গানটি গাহিলেন—

মেরে গিরিধর গোপাল দুসরা না কোই।
যাকে শির মোরমুকুট মেরে পতি সোই॥
কৌস্তুভ মণিকণ্ঠ পদিকণ্ঠ উরসি দেশ জোই।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কণ্ঠমাল সোই॥
মৈ তো আয়ি ভক্তি জানি যুক্তি দেখি মোই।
আঁশুন জল সিঁচি সিঁচি প্রেমবীজ বোই॥
সাধুন্ সঙ্গ বৈটি বৈঠি লোকলাজ খোই।
অব তো বাত ফয়ল গৈ জানে সব কোই॥
প্রেম কি মাথানি মতি যুক্তিসে বিলোই।
মাখন ঘৃত কাঢ়ি লেত ছাঁছে পিয়ে কোই॥
রাজন ঘর্ জন্ম লেত সবে বাত হোই।
মীরা প্রভু লগন লগী হোনী হো সো হোই॥

৺অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় উপরি-উক্ত শ্লোকের এইরূপ অর্থ দিয়াছিলেন—

"গিরিধর গোপালই আমার, দ্বিতীয় কেহ নাই। যাঁহার মস্তকে ময়ূর-মুকুট, তিনিই আমার পতি। তাঁহার গলায় কৌস্তুভ মণি ও বক্ষঃস্থলে ভৃগুপদচিহ্ন দেখা যায়। তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও কণ্ঠমালায় সুশোভিত। আমি তো ভক্তি জানিয়া আসিয়াছি; যুক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। অশ্রুজল সেচন করিয়া বীজ বপন করিয়াছি। সাধুগণের সহিত উপবেশন করিয়া লোকলজ্জা ক্ষয় করিয়াছি। এখন তো কথা প্রচার হইয়াছে, সকল লোকেই জানে। প্রেম-রূপ মন্থন দ্বারা যুক্তিপূর্ব্বক মন্থন করিয়া আমি মাখন

ঘৃত বাহির করিয়া লইতেছি, যে হয় কেহ ঘোল খাক্। রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করাতে সকল সুখ সম্ভোগই হইতে পারে, কিন্তু প্রভুর প্রতি মীরার প্রেমানুরাগ হইয়াছে। ইহাতে যা হবার তা হউক।"

রাণা কুম্ভ পত্নীর এইরূপ নির্ভীক অথচ অবিচল ভক্তিমাখা কথা শুনিয়া বিস্মিত স্তম্ভিত ও ভীত হইলেন এবং মীরার প্রার্থনা মত বৈষ্ণব ও অতিথি সেবার অধিকতর বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

মীরা তদবধি বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া, নানা সামগ্রী আনাইয়া ঠাকুরটীর রাজভোগে সেবা করিতে লাগিলেন। একদিন পুরবাসিনী কতকগুলি মহিলা আসিয়া তাঁহাকে এইরূপ অর্থব্যয়সাধ্য বিলাস পরিপূর্ণ সেবা করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করি-করিলেন যে, তিনি যদি বৈষ্ণবী হইয়াই থাকেন তবে এত বেশভূষার ঘটা কেন? উদাসিনী সন্ন্যাসিনী-দিগের মত কৃষ্ণ সাধন করিলেই ত হয়। ইহাতে মীরা তাঁহাদের কথার উত্তর স্বরূপ এই পদটী গাহিয়া-ছিলেন।

> নিত্ নাহানেসে হরি মিলে তো জলজন্তু হোই।
> ফল মূল খাকে হরি মিলে তো বাদুর বাঁদরাই॥
> তিরণ ভখনকে হরি মিলে তো বহুৎ মৃগী অজা।
> স্ত্রী ছোড়কে হরি মিলে তো বহুৎ রহে হেয় খোজা॥
> দুধ পিকে হরি মিলে তো বহুৎ বৎস বালা।
> মীরা কহে বিনা প্রেম্‌সে না মিলে নন্দলালা॥

কিন্তু ইহাতেও রাণার মনের মালিন্য ঘুচিল না। তিনি একদিন একজন তরুণবয়স্ক মনোহর-দেহ বয়স্যকে বৈষ্ণব বেশে সাজাইয়া মীরার গৃহে আতিথ্যলাভের জন্য পাঠাইলেন। সে আসিয়া মীরাকে বলিল যে, বৈকুণ্ঠ হইতে নারায়ণ মীরাকে 'অঙ্গসুখ' দিবার জন্য তাহাকে এখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন। মীরা তাঁহাকে পরদিন মধ্যাহ্নকালে আসিতে বলিলেন। পরদিন সে আসিয়া দেখিল যে প্রাঙ্গণের চারিদিকে বৈষ্ণব বৈরাগী কাঙ্গালী প্রভৃতি ভোজন করিতে বসিয়াছে, মধ্যস্থানে মীরা একখানি পালঙ্কের উপর সুসজ্জিত বেশে বসিয়া তাঁহাদের ভোজনের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। সে কম্পিত হৃদয়ে নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে মীরা সমবেত বৈষ্ণবমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এই লোক আসিয়া আমাকে বলিতেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে বৈকুণ্ঠধাম হইতে আমাকে অঙ্গসুখ দিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমিও আপনাদের সম্মতি লইয়া শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পালন করিতে প্রস্তুত আছি।" এই কথা শুনিবামাত্র সমবেত জনমণ্ডলী আহার পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া সেই লোকটাকে প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিল। কেবল মীরার অনুরোধে তাহার প্রাণটা রহিয়া গেল।

মীরার অপূর্ব্ব ভক্তি ও অনন্যসাধারণ গীত শক্তির কথা দেশবিদেশে প্রচারিত হইয়া পড়িল। আকবর বাদশাহ ইহঁার মুখে সঙ্গীত শুনিবার জন্য তাঁহার প্রিয় গায়ক তানসেনকে সঙ্গে লইয়া ইঁহাদের গৃহে ছদ্ম বৈষ্ণব বেশে অতিথি হইয়াছিলেন। মীরার মুখে সুমিষ্ট ভগবৎ-পদলহরী শুনিয়া পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার হস্তে এক ছড়া বহুমূল্য মুক্তার হার দিয়া, উহা দেবতার গলদেশে বিলম্বিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। মীরা হার দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ছদ্মবেশী আকবরকে তিনি সাধু বলিয়াই বিশ্বাস করিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার আকার দেখিয়া তোমাকে ত ধনী বলিয়া মনে হইতেছে না।" ছদ্মবেশী সাধু বলিলেন, "আমি পূর্ব্বে একজন সওদাগর ছিলাম, নানা দৈব দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া এক্ষণে সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করি-য়াছি। আমার পূর্ব্ব অর্জ্জিত অর্থ হইতে এই মালা কিনিয়াছিলাম। এখন সন্ন্যাসী হইয়া আর এই মালায় আমার কোন প্রয়োজন নাই। আপনার ঠাকুরের গলায় পরাইয়া দিলে এই মালার সমুচিত ব্যবহার হইবে এবং আমিও দেখিয়া নয়ন সার্থক করিব।"

মীরা সন্ন্যাসীর এইরূপ দেবভক্তি দেখিয়া আনন্দিত মনে ও সরল বিশ্বাসে সেই মালাগাছটী লইয়া ঠাকুরের গলায় পরাইয়া দিলেন। বাদশাহ ঠাকুরকে হিন্দুভাবে অভিবাদন করিয়া [illegible]

এই মালা গ্রহণ উপলক্ষেই মীরার জীবনে একটী বিষম পরিবর্ত্তন ঘটিল। লোকমুখে এই সংবাদ রাণা কুম্ভ সিংহের কর্ণে গেল। লোকরসনা কত অলীক কুৎসা রটাইল। রাণা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। নিরপরাধিনী মীরাকে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসন করিয়া দিলেন। *

মীরা কিন্তু ইহাতে কিছুমাত্র ভীতা বা বিচলিতা হইলেন না। যিনি ভগবানের অভয় চরণে আশৈশব ধন-জন মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার আবার কিসের ভয়? মীরা কতকগুলি রাজপুত নরনারীকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাহারা সকলেই মীরার অনুগমন করিল। মীরা প্রফুল্লমুখে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাভূমি বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তথায় অবস্থানকালে একদিন তিনি—

কহি পাঠাইল শ্রীরূপেরে কার দ্বারে
দরশন করি যদি কৃপা করে মোরে॥
গোসাঞি কহেন মুই করি বনে বাস।
নাহি করি স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষ॥
এ কথা শুনিয়া বাই ক্ষোভ পাই মনে।
পুন কহি পাঠাইল গোসাঞির স্থানে॥
এতদিন শুনি নাই শ্রীমান বৃন্দাবনে।
আর কেহ পুরুষ আছয়ে কৃষ্ণ বিনে॥

(ভক্তমাল গ্রন্থ)

রূপগোস্বামী মীরার এই তেজোগর্ভ শ্লেষবাক্য শুনিয়া নিজ নিয়ম ভঙ্গ করিয়া মীরার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং পরস্পর রাধাকৃষ্ণ লীলা ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিষয়ে অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছিল।

কয়েক বৎসর বৃন্দাবনে কাটাইয়া মীরা শ্রীকৃষ্ণের উত্তর লীলাস্থলী দ্বারকায় চলিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, তিনি যখন যেখানে যাইতেন, তাঁহার গিরিধর বা রণছোড় ঠাকুরটীও সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। দ্বারকায় যাইয়া মীরা একটী মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার অনেকগুলি শিষ্য সেবক হইয়াছিল।

রামচন্দ্র যেমন বিশুদ্ধচরিত্রা সীতাদেবীকে বনবাস দিয়াছিলেন এবং পরে তাঁহাকে গৃহে ফিরিয়া লইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, রাণা কুম্ভও তেমনই মীরার অলৌকিক চরিত্রের খ্যাতি শুনিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহাকে গৃহে ফিরিয়া আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন। মীরা তখন বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া বিদায় জন্য রণছোড়জীর মন্দিরের প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। মন্দিরদ্বারে শিবিকা অপেক্ষা করিতেছিল। বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, বাহক ও প্রহরীরা বলপূর্ব্বক মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখিল যে, মীরা তথায় নাই, তাঁহার বস্ত্রালঙ্কার সমস্তই রণছোড়জীর গাত্রে সুশোভিত রহিয়াছে। পূজারীরা সকলে বলিল যে মীরার নশ্বর দেহ দেব-অঙ্গে মিশাইয়া গিয়াছে।

এই অলৌকিক ঘটনার পর হইতে উদয়পুরে প্রতিবৎসর মহাসমারোহে নির্দ্দিষ্ট তিথিতে রণছোড়জীর সহিত মীরার পরিণয় মহোৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং তাঁহাদের পূজাও চলে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে মীরা বাইয়ের নামে ভনিতা দেওয়া অনেক দোঁহাগীত শুনিতে পাওয়া যায়। জনরবে শুনিলাম যে মীরা বাইয়ের নামে একটি সম্প্রদায় আছে। আমরা বাঙ্গালা ভক্তমাল, হিন্দী ভক্তকল্পদ্রুম ও গোস্বামিগণের মুখে যেরূপ আখ্যান জ্ঞাত হইয়াছি তাহাই পাঠকগণকে শুনাইলাম। মীরার নাম

* কলিকাতা হইতে ৬০৬ মাইল দূরে বিন্দকি রোড নামে একটি ষ্টেশন আছে। এই ষ্টেশন হইতে ২ মাইল অন্তরে গঙ্গাতীরে একটি মন্দিরের ভিতর বাম কর উর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া কৃষ্ণ প্রস্তরের গিরিধারী গোপাল মূর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছেন। তথাকার পূজারীরা বলেন যে এই মূর্ত্তিটিকে মীরাবাই পূজা করিতেন। মহারাণা রোষবশে মীরাকে বিষপান করিতে দিলে, দেবানুগ্রহে তাহাতেও কোনরূপ বিষক্রিয়া হইল না দেখিয়া একাকিনী গৃহবহিষ্কৃতা করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি চলিয়া গেলে, পূজারীরা গিরিধারী ঠাকুর লইয়া বারাণসীতে পলাইয়া যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে এখানকার ভূস্বামী বা জমিদার ভক্তিবশে এইখানে ঠাকুরের মন্দির করিয়া দিয়া সেবার জন্য গ্রাম দান করিয়াছেন। মন্দিরটি কিন্তু এখন ভগ্নপ্রায়।

বৃন্দাবনে সকলেই জানেন, কিন্তু তিনি কোন কুঞ্জে বা বাটীতে অবস্থান করিতেন তাহা কেহই বলিতে পারিলেন না। দুই একজন বৃদ্ধের মুখে শুনিলাম যে, মীরাবাই রাজপুতগণ-প্রতিষ্ঠিত যমুনাতীরস্থ যুগল-বিহারীজীর মন্দিরে পূজা করিতে আসিতেন। তাঁহার নিজ ঠাকুর রণছোড়জী কখনও এখানে স্থাপিত হইয়াছিলেন কি না তাহা জানা গেল না।

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত।

বিহারীলাল ও তাঁহার কাব্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সারদা-মঙ্গলের প্রথমে কবি বাল্মীকির সময়ে সারদা মূর্ত্তির চিত্র আঁকিয়াছেন—এ চিত্র করুণাময়ী সমবেদনাময়ী বিষাদিনী উন্মাদিনী সারদার চিত্র। "এ বিষাদময়ী মূর্ত্তির সহিত কবির বিরহিত মৈত্রীপ্রীতির ম্লান করুণামূর্ত্তি মিশ্রিত হইয়া একাকার হইয়া গিয়াছে," সেই জন্যই সারদার এ মূর্ত্তি এরূপ সুন্দর ও প্রাণময়ী হইয়াছে।

সারদার কমলবনে কবি "ভাবে ভোলা খোলা প্রাণে" ক্ষেপার মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কখনও তাঁহার স্তুতি করিতেছেন, আবাহন করিয়া বলিতেছেন—

"এস মা করুণারাণী,
ও বিধুবদন খানি
হেরি হেরি আঁখি ভরি হেরি গো আবার।"

কখনও তাঁহাকে নিতান্ত আপনার, 'শয়নে স্বপনে সাথী' জ্ঞানে বলিতেছেন—

"যখন যেখানে যাই যাও আগে আগে।
জাগরণে জাগ হেসে,
ঘুমালে ঘুমাও শেষে,
স্বপনে মন্দার মালা পরাইয়ে দাও গলে।"

কখনও বা আসন্ন বিচ্ছেদাশঙ্কায় ম্রিয়মান, অধীর হইয়া শোক করিতেছেন—

"কোথা সে প্রাণের আলো,
পূর্ণিমা চন্দ্রিমা জাল,
কোথা সেই সুধামাখা সহাস বয়ান!"

নিজের অক্ষমতা ও সামান্যতার কথা চিন্তা করিয়া বলিতেছেন—

"কিছুই হেথায় নাই,
মনে মনে ভাবি তাই,
কি দেখে আসিতে মন সরিবে তোমার।"

আবার কখনও সারদাকে নিজের প্রতি বিমুখ ও নীরব দেখিয়া দুঃখে অধীর হইয়া বিলাপ করিতেছেন—

"চির অনুরক্ত ভক্ত হয়ে কৃতাঞ্জলি
পাদপদ্মাসন কাছে
নীরবে দাঁড়ায়ে আছে,
কি করিবে কোথা যাবে দাও অনুমতি।"

অভিমান করিয়া বলিতেছেন—

"সে কি গো এমন হবে,
মোর দুখে সুখে রবে,
কাঁদিয়ে ধরিলে কর ফিরাবে বয়ান!"

আবার পরক্ষণে সন্দেহ দূর করিয়া সারদাকে "দুখে দুখী অশ্রুমুখী প্রাণপ্রতিমা"রূপে কল্পনা করিয়া শান্ত হইতেছেন এবং আপনার হৃদয়কে ধিক্কার দিয়া বলিতেছেন—

"সারদা সরলা বালা,
সবে না সন্দেহ জ্বালা,
ব্যথা পাবে সুকোমল হৃদয় কমলে।"

সারদা-মঙ্গলের তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গে সারদার সহিত কবির বিরহোৎকণ্ঠা ও বিরহ-জনিত বিলাপ আর এক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। "পূর্ণিমা-প্রমোদ-আলো" কবির নয়নে ভাল লাগিয়াছে, জগতের এই চন্দ্রকিরণ-পুলকিত

আনন্দ-উৎসবের রাগিণী কবির অন্তরেও ধ্বনিত হইয়াছে, তাই কবির চিত্ত তাঁহার চির-আনন্দময়ী হৃদয়-প্রতিমার সহিত মিলনাশায় ব্যাকুল হইল; কিন্তু কবি দেখিলেন যে তাঁহার সারদা এখনও বিষাদিনীই আছেন। তাঁহার "মনের মধুর গান মনেই বিলীন" হইয়া গেল। সারদা ও কবির মিলনের পথে এক ব্যবধান সৃষ্ট হইল। সকলই তেমনি আছে—

"সেই প্রেম সেই স্নেহ,
সেই প্রাণ, সেই দেহ ;
তবু কেন মন্দাকিনী তীরে দুপারে দুজন !"

কেন এ ব্যবধান, কেন তাঁহাদের মধ্যে এ নদী উথলিয়া উঠিতেছে—

"আকুল ব্যাকুল প্রাণ,
মিলিবারে ধাবমান,
কেন এসে অভিমান সমুখে উদয় !"

তাই কবি দুঃখিত মনে বলিয়া উঠিলেন—

"কেন গো পরের করে
সুখের নির্ভর করে,
আপনা আপনি সুখী নহে কেন নর !"

কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত কবি তাঁহার অন্তরের মধ্যে এ হৃদয়প্রতিমার জ্যোতির্ম্ময়ী লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখিতে পাইতেছিলেন, এক "বিচিত্র সুরতান তাঁহার প্রাণ ভরপূর" করিয়াছিল—ক্রমে তাহাও অন্তর্হিত হইল। "নিবিড় নীরদমালা"র অন্তরালে সে লাবণ্য-বালা লুকাইল, তাঁহার সাধের স্বপন ফুরাইল। এ কি হইল! তাঁহার প্রেমের কি তবে সার্থকতা নাই?

"তবে কি সকলি ভুল !
নাই কি প্রেমের মূল !
বিচিত্র গগন-ফুল কল্পনা লতার ?
মন কেন রসে ভাসে
প্রাণ কেন ভালবাসে
আদরে পরিতে গলে সেই ফুলহার !"

যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে কবি সমস্ত ভুলিবার জন্ত অনন্ত নিদ্রা, অনন্ত মোহ প্রার্থনা করিতেছেন।

"ভালবাসা তারি ভাল,

তবে তাঁহার এ দুর্লভ নিধি, এ শতচাঁদ-নিংড়ান সুধার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি কেন?

কিন্তু তথাপি কবি সারদার অন্বেষণে বিরত হইতে পারিলেন না। সে প্রতিমা যে তাঁহার হইবে না, আর তাঁহাকে দেখা দিবে না, ইহা বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তাঁহার মনের উৎকণ্ঠিত অবস্থায় প্রকৃতির সেই পূর্ব্বতন মনোমোহন রূপরাশি, যাহা তাঁহার নয়ন মন ভুলাইত, তাহাও অন্তর্হিত হইয়াছে, যাহা রহিয়াছে তাহা অন্ধকারময়, জ্বালাময়; তাই চতুর্থ সর্গে দেখিতে পাই যে কবি শান্তির আশায় নির্ঝর পতন-ধ্বনি মুখরিত লতাগুল্মতরুরাজিসমাকীর্ণ শুভ্রতুষার-মণ্ডিতশৃঙ্গ হিমালয়ের বিরাট উদার সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে ছুটিয়া গিয়াছেন—সেই সৌন্দর্য্যের সমারোহের মধ্যে যদি সারদার দেখা পান। এতদিনে কবির আশা পূর্ণ হইল—সে প্রশান্ত গিরিবক্ষে, যেখানে উপত্যকাভূমি মুখরিত করিয়া জাহ্নবী সহস্রধারায় অবতরণ করিতেছেন, সেখানে কবির হৃদয়প্রতিমা মিলিল। বিরহ দুঃখের অবসান হইয়া মিলনের অতুল আনন্দ ফুটিয়া উঠিল, কবির অনন্ত উদার সুখের প্রস্রবণ ছুটিল—

"দেখিয়ে মেটেনা সাধ
কি জানি কি আছে স্বাদ,
কি জানি কি মাখা আছে ও শুভ আননে !"

সারদার আননের বিমল ভাতিতে দশদিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কবি আনন্দাশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া গাহিয়া উঠিলেন—

"বিহঙ্গমা খুলে প্রাণ
ধর রে পঞ্চমে তান !
সারদামঙ্গল গান গাও কুতূহলে !"

কবির এ মিলনানন্দ-গান ভাবসৌন্দর্য্যে অতুলনীয়।

"সাধের আসন" বিহারীলালের আর একখানি খণ্ড-কাব্য। "সাধের আসন" নামের একটু ইতিহাস আছে। কবি নিজেই লিখিয়াছেন—"কোন সম্ভ্রান্ত সীমন্তিনী আমার সারদা-মঙ্গল পাঠে সন্তুষ্ট হইয়া স্বহস্তে বুনিয়া একখানি উৎকৃষ্ট আসন আমাকে উপহার দেন। এই আসনের নাম 'সাধের আসন'। সাধের আসনের

সারদা মঙ্গল হইতে—'হে যোগেন্দ্র! যোগাসনে' ইত্যাদি শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়া আসন প্রদান কালে আসনদাত্রী উক্ত শ্লোকার্দ্ধের উত্তর চাহেন।" এই শ্লোকার্দ্ধের উত্তরে লিখিত বলিয়া কবি উপহৃত আসনের নামে এই কাব্যের নাম "সাধের আসন" রাখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ "জীবনস্মৃতি"তে এ আসনের উল্লেখ করিয়াছেন—এ আসনদাত্রী মহিলা তাঁহার 'বৌঠাকুরাণী'—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্নী।

'সাধের আসন' কাব্য সারদা-মঙ্গলের ন্যায় ততটা সফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। স্থানে স্থানে কবিত্ব অতি সুন্দরভাবে স্ফূর্ত্তিলাভ করিলেও, কাব্যখানি সমগ্রভাবে সারদা-মঙ্গল হইতে নিকৃষ্ট। এই কাব্যে "কবির ভাবে বহুস্থানে অস্পষ্টতা ও অসংলগ্নতা দোষ দৃষ্ট হয়।" ইহাতে বর্ণনীয় বিষয় একটি নহে—সম্পূর্ণ বিভিন্ন অনেকগুলি। কাব্যের প্রথম সর্গে "মাধুরী" নামক কবিতাটীই প্রকৃতপক্ষে সাধের আসনে উদ্ধৃত শ্লোকের উত্তর। এ কবিতায় কবি তাঁহার আরাধ্যাদেবীর বর্ণনা করিয়াছেন—তিনি যাঁহাকে ধ্যান করেন, তাঁহারই মূর্ত্তি পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই এ কবিতার বিশ্লেষণ করিয়াছি—এই কবিতা কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য সারদা-মঙ্গলের পার্শ্বে স্থান পাইবার যোগ্য এবং তাঁহার কবিত্ব শক্তির এক অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। সমালোচক নবকৃষ্ণ বাবু এটীকে "সীমাহীন সৌন্দর্য্যের একটি অপূর্ব্ব স্তোত্র" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

চারি বৎসর বয়সে কবির মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে কবি স্বর্গগতা জননীকে স্মরণ করিয়া শোক করিয়াছেন। এ শোকগাথা করুণ, মর্ম্মস্পর্শী, এ মাতৃপূজা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পৎ। কবি বলিতেছেন—

"দাঁড়াও চরণে ধরি,
প্রাণ ভোরে পূজা করি,
সুশীতল অশ্রুজলে ধুয়াইব শ্রীচরণ,
আজ আমার শুভদিন,
ঘটিয়াছে ভাগ্যাধীন,
পুরাব প্রাণের সাধ, জুড়াব তাপিত মন।"

চতুর্থ সর্গ কবির অতুল পত্নীপ্রেমের নিদর্শন; এই পত্নীপ্রেম বিশ্বপ্রেমে পরিণত হইয়াছে। পত্নীকে ভালবাসিয়া—

"মনেতে জন্মেছে মায়া, ভালবেসে সুখী হই,
ভালবাসি নারী নরে
ভালবাসি চরাচরে
ভালবাসি আপনারে, মনের আনন্দে রই।"

"সাধের আসন" কাব্য সাঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই আসনদাত্রী মহিলার মৃত্যু হয়। কাব্যের শেষ দুই সর্গে তাঁহার মৃত্যুতে কবির শোকোচ্ছ্বাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুকুমার সাহিত্যের উৎসাহদাত্রী এই করুণাময়ী রমণী কিছু দিনের জন্য মাত্র এ সংসারে আসিয়াছিলেন—

"ভোরের গানের মত,
ভোরের তারার মত,
মধুর সুন্দর মূর্ত্তি ত্রিদিব ললনা,
ভোরে ভোরে আসে যায়,
কেহ নাহি দেখে তায়,
রেখে যায় শুধু কোমল কুসুম-দলে
নির্ম্মল দুয়েক ফোটা শিশিরাশ্রুকণা।"

কবির কাব্যজীবনের একাংশ তিনি পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন—কেন এত শীঘ্র চলিয়া গেলেন—"সুখের স্বপন কেন চকিতে ফুরায়?" আকাশে চন্দ্রমা চিরদিন সুন্দর, পূর্ণিমা নিশি চিরদিন সৌন্দর্য্যময়ী, পৃথিবীর নদী-গিরি চিরদিনই সৌন্দর্য্যের আকর, সুন্দর মানবই কেন প্রস্ফুটিত "গোলাপটীর মত অতি অল্পক্ষণেই ঝরিয়া, মরিয়া যায়!" সে দেবী স্বর্গে গিয়াছেন, সারদার সঙ্গিনীবর্গমধ্যে তিনি স্থান পাইয়াছেন—ইহাই কবির সান্ত্বনা। তিনি গিয়াছেন—

"শুভস্মৃতিখানি তব
জাগিতেছে অভিনব,
কুসুমের, আতরের সৌরভের প্রায়।"

বিহারীলাল ও তাঁহার সমসাময়িক কবিবন্ধু ৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বঙ্গসাহিত্যে একটি অমর

সম্পৎ দান করিয়া গিয়াছেন—সেটী তাঁহাদের নারী-পূজা। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য কবিদিগের সহিত তুলনা করিয়া সুধীপ্রবর ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"কিঞ্চিৎ আত্মগর্ব্ব প্রকাশিত হইলেও আমরা সত্যের খাতিরে বলিতে পারি যে, আমাদের এই অধঃপতিত বাঙ্গালী জাতির আধুনিক কালের বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে এমন দুইটী কবি জন্মিয়াছিলেন, যাঁহাদের অকৃত্রিম কাব্যোচ্ছ্বাস রমণী মাহাত্মমূলক এবং সে উচ্ছ্বাস করুণ, অকৃত্রিম, মর্ম্মস্পর্শী ও সার্ব্বভৌমিক।"

বিহারীলালের বঙ্গসুন্দরীকাব্যে আট জন বঙ্গসীমন্তিনীর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। 'বঙ্গসুন্দরী' নামটী সার্থক হইয়াছে; কারণ, 'বঙ্গসুন্দরী'র নারীমূর্ত্তি কল্পনার উজ্জ্বল রেখাপাতে সৃষ্ট, বিভিন্ন গুণরাশির সমাবেশে পুষ্ট, কবির অন্তররাজ্যের অধিবাসিনী কোনও মানসপ্রতিমা নহে। বিভিন্ন দেশের রমণী-আদর্শের সমন্বয় বিধান করিয়া এক অভিনব নারীচরিত্রের সৃজন তাহাতে হয় নাই—এ মূর্ত্তি নিতান্তই আমাদের গৃহের অধিষ্ঠাত্রী, কল্যাণময়ী, মঙ্গলময়ী, স্নেহময়ী, করুণাময়ী সেবাভক্তি পরায়ণা রমণীমূর্ত্তি.

"প্রেমের প্রতিমা, স্নেহের সাগর
করুণা নিঝর দয়ার নদী"—রমণীমূর্ত্তি

যিনি আছেন বলিয়াই এ সংসার সুখময় হইয়াছে, যাঁহার অভাবে "সব চরাচর মরুময়" হইত—এ সেই মূর্ত্তি। বিহারীলাল তাঁহার কাব্যে নারীচরিত্রের বিশ্লেষণ করিতে যান নাই, তিনি মুগ্ধ হইয়া শুধু চরিত্রমাধুর্য্যে প্রভাময় সেই উজ্জ্বল মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া দেখিয়াছেন আর গাহিয়া উঠিয়াছেন—

"জগতের তুমি জীবিতরূপিণী,
জগতের হিতে সতত রতা,
পুণ্য-তপোবন-সরলা-হরিণী
বিজন-কানন-কুসুম-লতা।"

বঙ্গসুন্দরী কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ নারীর একটি আন্তরিক উদার স্তব। এ নারীবন্দনায় রমণীকে রূপের রাশি বা লোভের উপাদান রূপে কল্পনা করা হয় নাই—"নারী কত মহীয়সী" তাহাই দেখান হইয়াছে। তিনি নারীচরিত্রের সকল দিকই দেখাইয়াছেন—কেবল মাত্র পত্নীত্বেই তাঁহার নারীত্বের পরিণতি নহে। সন্তান-ক্রোড়ে জননীর মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার মনে হয়—

"যেন উষাদেবী আসে আলো করি,
তরুণ অরুণ কোলেতে দোলে।"

পুরুষত্বের অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া কবি বলিতেছে—

"বৃথা পুরুষাভিমান, প্রেমেতে প্রধানা নারী,
কতই কতই বেশী স্নেহসুখে অধিকারী।"

সাধের আসন কাব্যের 'পতিব্রতা' কবিতায় তিনি যে সতীচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা পবিত্র, সুন্দর, মহিমোজ্জ্বল।

"সতীর প্রেমের প্রাণ,
পতি প্রতি একটান,
অমর সে ভালবাসা মরণেও মরে না।"

তাই সে সতীর রূপের আভায় অমরাবতী প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহার পুষ্পরথের আগে আগে "নভস্বান্ আগমনী গান গাহিয়া" চলিয়াছেন, যাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য দেববালাগণ উন্মুখ হইয়া আছে—তিনি কিন্তু স্বর্গের এ উৎসব সমারোহের মধ্যে বিষাদে ম্রিয়মাণ। থাকিয়া থাকিয়া ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার সুদূর মর্ত্ত্যলোকের কথা মনে পড়িতেছে, পতির শোকার্ত্ত বিষণ্ণমুখ যেন নয়নসমক্ষে দেখিতে পাইতেছেন—আর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে। স্বর্গের "অত আদরে অত স্নেহেও" তাঁহার মন প্রবোধ মানিতেছে না, তাই কবি বলিতেছেন—

"অমর সে ভালবাসা মরণেও মরে না
স্বর্গ থেকে এসে তাকে
অলক্ষ্যে আগুলে থাকে
সে দেখে নয়ন ভরে কেহ তারে দেখে না।"

পতি জানিতে না পারিলেও—

"পত্নীর করুণা ছায়া বেড়াইছে কাছে কাছে
করুন নয়ন দুটি মুখপানে চেয়ে আছে।"

কবি অক্ষয়কুমারের "এষা" কাব্যেও সেদিন আমরা সতীর এ মূর্ত্তি দেখিলাম।

কিন্তু পুরুষ সকল সময়ে নারীর এই অতুল প্রেমের মাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারে না—সে প্রেমের প্রতিদান দিতে পারে না—তাই সতী "মলিন বিষণ্ণমুখী, নেত্রে ভরা অশ্রুজল।" এই অশ্রুজল দেখিয়া কবি ব্যথিতচিত্তে বলিতেছেন—

"এসো না ধরায়—আর, এস না ধরায়!
দুর্ব্বহ প্রেমের ভার,
যদি না বহিতে পার
ঢেলে দাও আকাশে, বাতাসে ধরাতলে।

*　　*　　*

প্রাণের অমৃতরাশি
ঢেলে দাও মানবের তপ্ত অশ্রুজলে!"

সে প্রেম মানবের তাপিত প্রাণে শান্তি প্রদান করিয়া, ব্যথিতের অশ্রুজল মুছাইয়া, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দিয়া ধন্য হউক্, সার্থক হউক্।

বিহারীলাল পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকরণ করিতে ঘৃণা বোধ করিতেন। প্রাচীন সংস্কৃত কবি বাল্মীকি, কালিদাস, প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের তিনি বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক পাশ্চাত্যগন্ধী কবিতাকে তিনি ব্যঙ্গ করিতে ছাড়েন নাই।

বিহারীলালের ভাষা এবং ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলেই তাঁহার দুইটী বিভিন্ন মূর্ত্তি আমাদের চক্ষে পড়িবে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বিহারীলালের প্রথম রচনাবলীতে ভাষা অথবা রচনারীতি সম্বন্ধে গুপ্ত কবির প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়। 'বন্ধুবিয়োগ' কাব্যে স্থানে স্থানে এরূপ বিকট বীভৎস বর্ণনা আছে যাহা আধুনিক ভদ্রসমাজের অযোগ্য এবং ভাষাও অনেক স্থলে গ্রাম্য, কবির পক্ষে অযোগ্য। কিন্তু 'সারদামঙ্গলে' বা 'সাধের আসনে' এমন কি 'বঙ্গসুন্দরীর'ও স্থলবিশেষে আমরা কবির আর এক মূর্ত্তি দেখিতে পাই। তাঁহার ভাষা মার্জ্জিত ও সংস্কৃত হইয়া আসিয়াছে এবং বর্ত্তমান কালের কবিতার ভাষা হইতে সে ভাষার বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। গদ্যসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা যেমন স্থায়ী হইয়াছে, আমাদের মনে হয়, গীতিকবিতায় বিহারীলালের ভাষাও সেই পরিমাণে স্থায়ী হইয়াছে। তথাপি তাঁহার ভাষার একটা দোষ—গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার—স্থানে স্থানে তিনি পরিহার করিতে পারেন নাই। ছন্দ নির্ব্বাচনেও বিহারীলাল যথেষ্ট কৃতত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার ভাষা ও ছন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন, তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার ছন্দের প্রধান গুণ বেগ বা গতিশীলতা এবং লালিত্য। সমস্ত সারদামঙ্গল কাব্য এক ছন্দে রচিত—অথচ সে ছন্দ কোথাও একঘেয়ে বা শ্রুতিকটু হয় নাই; পাঠকের কোথাও বিশ্রামের অবসর হয় না, ছন্দের নৃত্যচঞ্চল একটানা স্রোতে তাঁহার চিত্ত ভাসিয়া যায়। তাঁহার কবিতা যে বহুস্থলে সঙ্গীত হইয়া পড়িয়াছে—এ কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

এইবার আমরা বিহারীলালের স্বভাব-বর্ণনার কৃতিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিব। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে তিনি সৌন্দর্য্যসম্ভোগের কবি এবং তাঁহার সৌন্দর্য্যপিপাসা স্বতঃই জগতের দিকে উন্মুক্ত ছিল। তিনি পিপাসু নেত্রে প্রকৃতির মধ্যে সুন্দরকে নিরীক্ষণ করিতেন; অতি তুচ্ছ জিনিসের মধ্যেও যেটুকু সুন্দর তাহা তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। তিনি যখনই অবসর পাইয়াছেন, তখনিই তাঁহার কাব্যের মধ্যে সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের অতি কমনীয় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। স্বভাব-বর্ণনায়, এক একটি দৃশ্যের ছোটখাট অপ্রয়োজনীয় অংশগুলি অঙ্কিত করিয়া তিনি তাঁহার চিত্রকে অনর্থক ভারাক্রান্ত করেন নাই। সেই সেই দৃশ্যের প্রধানতম অংশগুলি, যাহা তাঁহার সৌন্দর্য্যপিপাসু চিত্তকে স্বতঃই আকর্ষণ করিতে পারিত, তুলিকার দুই একটি নিপুণ রেখাপাতে ফুটাইয়া তুলিয়া, কথা ও ছন্দে গাঁথা এক একখানি পূর্ণায়তন চিত্র আমাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন। এইখানেই তাঁহার সৌন্দর্য্য দৃষ্টির পরিচয়। সারদামঙ্গল কাব্যের প্রথম গীতটি

"ওই কে সুন্দর বালা দাঁড়ায়ে উদয়াচলে,
ঘুমন্ত প্রকৃতি পানে চেয়ে আছে কুতূহলে।
চরণ কমলে লেখা
আধ আ'ধ রবি-রেখা,
সর্ব্বাঙ্গে গোলাপ আভা, সীমন্তে শুকতারা জ্বলে।
যোগে যেন পায় স্ফূর্ত্তি
সদয়া করুণামূর্ত্তি
বিতরেন হাসি হাসি শান্তি-সুধা ভূমণ্ডলে।
হয় হয় প্রায় ভোর,
ভাঙ্গো ভাঙ্গো ঘুমঘোর
সুস্বপ্নরূপিণী উনি, উষারাণী স'বে বলে।
বিরল তিমির জাল,
শুভ্র অভ্র লালে লাল,
মগন তারকারাজি গগনের নীল জলে।
তরুণ কিরণাননা
জাগে সব দিগঙ্গনা,
জাগেন পৃথিবী দেবী সুমঙ্গল কোলাহলে।"

ছন্দোলালিত্যে ও শব্দমাধুর্য্যে এই গীতিটি অতুলনীয়।

বিভিন্ন সময়ে প্রকৃতির বিভিন্নাবস্থা তাঁহার তুলিকায় উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রভাতে অরুণালোক-উদ্ভাসিত বিহঙ্গকাকলিমুখরিত প্রকৃতির আনন্দ উৎসব—

"সহর্ষ কেতকী-কুঞ্জ,
প্রফুল্ল-চম্পক-পুঞ্জ,
সোণার কদম্ব সব রসে রোমাঞ্চিত কায়,
উল্লাসে মাঠের কোলে
তৃণের-তরঙ্গ দোলে,
কাশের চামরগুলি সোহাগে গড়িয়ে যায়।
গন্ধবায়ু ঝুরু ঝুরু
কাঁপে তরু রেখা ভুরু
আরামে পৃথিবী দেবী এখনও ঘুমায় রে!"

মধ্যাহ্নে প্রখর-তপন-তাপিত প্রকৃতির স্তব্ধ উদাস মূর্ত্তি—

"নীরব মেদিনী, পাদপ নিঝুম
নত-মুখ ফুলফল,
নতমুখী লতা নেতিয়ে পড়েছে
স্তবধ সরসী জল।"

"চরাচর ব্যাপী অনন্ত আকাশে
প্রখর তপন ভায়,
দিগ্‌দিগন্তর উদাস মুরতি
উদার স্ফূরতি পায়।"

অবশেষে সন্ধ্যার শান্ত বৈরাগ্যসঙ্গীত—

"নদীর স্নেহের কোলে
সমীরণ ঘুমে ঢোলে,
স্বপনে সাঁঝের তারা মেলিছে নয়ান।
তীরভূমে তরুগণে
বসিয়াছে যোগাসনে
কে তুমি প্রাণের প্রাণে তুলেছ পূরবী তান!"

কোমল এবং মধুর বর্ণনায় বিহারীলাল যেরূপ সিদ্ধহস্ত, গম্ভীর বর্ণনায়ও তাঁহার সেইরূপ ক্ষমতা দৃষ্ট হয়। সারদামঙ্গল কাব্যে তাঁহার হিমালয়-বর্ণনা বঙ্গসাহিত্যে এক অপরূপ সামগ্রী। তাঁহার সে বিরাট পরিকল্পনা দেখিয়া আমরা বিস্মিত, স্তম্ভিত হই। হিমালয় তাঁহার চক্ষে—

"কে যোগেন্দ্র ব্যোমকেশ যোগে নিমগন!"

এই একটি ছত্রে তিনি "দেবতাত্মা নগাধিরাজের" বিশালত্ব, বিরাটত্ব, গাম্ভীর্য্য, মহত্ত্ব এরূপভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, যাহা যে কোনও কবির পক্ষে শ্লাঘনীয়।

বিহারীলালের কবিতায় দুঃখবাদ স্থান পাইয়াছে। অনেকে মনে করেন পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যে এ দুঃখবাদের উৎপত্তি। সে যাহাই হউক, বিহারীলালের দুঃখ কবির নিজের অনুভূতি হইতে উদ্ভূত; কবি নিজের মনোদুঃখ নিজে প্রকাশ করিয়াছেন। সে দুঃখের অবশ্য কোনও বাস্তব কারণ নাই; কবি সংসারে আর দশজনের দুঃখকষ্ট দেখিয়া দুঃখবাদী হইয়াছেন বলিয়াও মনে হয় না। ইহার মূল তাঁহার জীবনে অতৃপ্তি অবসাদ বা মানবসমাজের প্রতি ঘৃণা। বাস্তবিকই তাঁহার জীবনে দুঃখের কোনও অস্তিত্ব ছিল কিনা, অথবা ইহা তাঁহার কাব্যজীবনের ক্লান্তি বা অবসাদ হইতে উদ্ভূত, তাহা আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি না। কিন্তু ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহার

জীবনে এমন কিছু ঘটিয়াছিল যাহার জন্য তাঁহাকে কিয়ৎ পরিমাণে মানবসমাজ-বিদ্বেষী হইতে হইয়াছিল। সংসারের স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, অর্থলোলুপতা, অহঙ্কার, গর্ব্ব, অভিমানের দিক্‌টা বিশেষ করিয়া তাঁহার চক্ষে পড়িয়াছিল; এই সমস্তের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার সরল শুভ্র, সুখস্বপ্নবিভোর কবি-হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই তিনি লিখিয়াছেন—

"আর কারে করি ভয়,
ব্যাঘ্রে সর্পে তত নয়,
মানুষ জন্তুকে যত ডরি।"

হয়ত মানবসমাজের কৃত্রিম বিধিনিষেধে তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, হয়ত তাঁহার স্বাতন্ত্র্যপরায়ণ কবিহৃদয় মুক্ত বনবিহঙ্গের মত নিজের পথে উদ্দাম হইয়া ছুটিতে চাহিত, যে বাঙ্গালী-জীবনের একঘেয়ে জীবনযাত্রায় বিরক্ত অতৃপ্ত হইয়া রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন—

"ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন,
চরণ তলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।"

হয়ত সে জীবনযাত্রা তাঁহারও প্রীতিকর হইত না; তাই 'লোকমাঝে দেঁতো হাসি হাসি,' তিনি বিরলে নয়নজলে ভাসিতেন, তাই স্বাধীনতার জয়পতাকা তুলিয়া, যেখানে সমুদ্রের উন্মত্ত তরঙ্গরাশি আপন পথে ছুটিয়া চলিয়াছে, বিপুলশব্দে বেলাভূমিকে আক্রমণ করিতেছে, প্রকৃতির সেই লীলাক্ষেত্রে তাঁহার মন গিয়া শান্তিলাভ করিতে চাহিত, তাই তিনি সভ্য সমাজ ছাড়িয়া দূরে জনবিরল নিরালা পল্লীতে কৃষকদিগের বাধাবান্ধহীন জীবনযাত্রার মধ্যে গিয়া পড়িয়া হাঁফ ছাড়িতে চাহিতেন। "তাই তাঁহার গানের মধ্যে অসীম স্বাধীনতার জন্য একটি ব্যাকুলতা, একটি অভ্রভেদী ক্রন্দন বিবিধভাবে এবং বিচিত্র রাগিণীতে প্রকাশ পাইয়াছে।"—[রবীন্দ্রনাথ]

সমালোচক শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় স্বদেশের পরাধীনতাই বিহারীলালের এই অবসাদের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "বিহারীলাল একজন প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন।" তিনি নিজের সম্বন্ধে নিজেই বলিয়াছেন—"জন্মভূমি প্রতি ছিল আন্তরিক প্রীতি"। "স্বজাতির হীনতায় ও দুর্দ্দশায় তিনি যে অবসাদগ্রস্ত হইবেন, এবং সেই জাতিগত অবসাদ যে তাঁহার রচনায় ব্যক্তিগতভাবে প্রতিফলিত হইবে" তাহা সম্ভব হইলেও হইতে পারে। "নিসর্গসন্দর্শন" কাব্যে কবি বলিয়াছেন—

"হায়, জননীর এই বিষণ্ণ দশায়,
কভু কি প্রফুল্ল রয় সন্তানের মন?

কারণ যাহাই হউক, বিহারীলালের এ অবসাদ-সঙ্গীতে শোকের অশ্রুজল নাই; ইহা কেবলমাত্র অতৃপ্তির উষ্ণশ্বাস। অতৃপ্তিতে শান্তি নাই, সেইজন্য বিহারীলালের এ সঙ্গীত অস্থির অশান্ত, ইহার মধ্যে দুঃখকে জীবনে মানিয়া লইয়া সেই দুঃখে সান্ত্বনালাভ করিবার অবকাশ কবির হয় নাই। শোকের সে করুণ পীযূষবর্ষী সুর, যাহার মধ্যে সংশয়বাদ বা ভগবানের মঙ্গলময়ত্বে অবিশ্বাস আসিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই, যাহার মধ্যে একটা সুপ্ত শান্তিময় ভাব বিরাজমান, যাহা আপনার সান্ত্বনার পথ আপনিই খুঁজিয়া আবিষ্কার করিয়া লয়, যাহা নিস্তব্ধ সন্ধ্যার পূরবী রাগিণীর ন্যায় করুণ মূর্চ্ছনায় আমাদের প্রাণমন অভিভূত করে, আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে,—বিহারীলালের গানে ঠিক সেই সুরটি ফুটিয়া উঠে নাই। সেইজন্য কবির এ ভাবের কবিতাগুলি আমাদিগের হৃদয় মন তাদৃশ মুগ্ধ করিতে পারে না।

কিন্তু এই সম্পর্কে আমাদের একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, এই অবসাদের রাগিণী, এই অতৃপ্তির উষ্ণশ্বাস কেবলমাত্র বিহারীলালের প্রথম বয়সের রচনাবলীতেই প্রস্ফুট হইয়াছে। কবি তখনও তাঁহার আরাধ্যাদেবীর জ্যোতির্ম্ময়ী প্রেমময়ী মূর্ত্তি মানসনেত্রের সমক্ষে উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত দেখিতে পান নাই, তাঁহার অন্তরলোক আলোকিত উদ্ভাসিত করিয়া সে মূর্ত্তি তখনও আপন রূপলাবণ্য বিস্তার করে নাই; তাঁহার কাব্যবীণার প্রধান তারটি, যাহার তানলয়পূর্ণ ঝঙ্কার অন্য তার কয়টির ধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া

সম্মিলিত সুরের এক পরিপূর্ণ রাগিণীর সৃষ্টি করিবে—সে তারটি তখনও কবির নিকট অনাবিষ্কৃত; তাই তাঁহার কবিতা অশান্ত, অতৃপ্ত। এ অতৃপ্তি স্থায়ী হয় নাই। সারদায় প্রেমে কবি সান্ত্বনালাভ করিয়া এ দুঃখ বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

সারদামঙ্গলে বিরহ-দুঃখের কথা আছে বটে কিন্তু সে সমস্তই পরিশেষে মিলনের মধ্যে সমাধিলাভ করিয়াছে; মিলনানন্দের মধ্যেই সারদামঙ্গলের পরিসমাপ্তি। প্রেমের কল্যাণে কবির চক্ষে বিশ্বজগৎ এক নূতনভাবে প্রতিভাত হইয়াছে; তাঁহার মধ্যে কবিত্বের যে পরিপূর্ণ আনন্দ অর্দ্ধসুপ্ত ছিল তাহা বিকাশলাভ করিয়া, অসুন্দর নৈরাশ্যময় জগতের ছবি পরিবর্ত্তিত করিয়া এক মনোমোহন চিত্র তাঁহার নেত্রসমক্ষে আনিয়া ধরিয়াছে। তাই "সাধের আসনে" কবি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—

"প্রেমের আনন্দধামে মরণের ভয় নাই।"

তিনি দুঃখকেও স্বীকার করিয়াছেন—তাহাতে ভীত বা অবসন্ন হইয়া পড়েন নাই। অনন্ত সুখের অতৃপ্তি দূর করিবার জন্যই তিনি দুঃখের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। অনন্ত সুখ তাঁহার প্রার্থনীয় নহে—মর্ত্ত্যের সুখ দুঃখ বিমিশ্রিত প্রেমই তাঁহার প্রার্থনীয়। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতাটি স্মর্ত্তব্য।

"মায়াদেবী" নামক কবিতায় এই দুঃখতত্ত্ব কবি আর একভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—দুঃখের উৎপত্তি হইতে, সে দুঃখের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত আর এক ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এ দুঃখ শুধু বিহারীলালের নিজের নহে, কবিমাত্রেই এ দুঃখ তাঁহাদের জীবনে অনুভব করিয়াছেন—এবং রবীন্দ্রনাথ এ দুঃখকে মানব অন্তরের চিরন্তন দুঃখরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

এ জগৎ আমাদের কিছুদিনের বাসস্থান মাত্র—ইহার বাহিরে, সমুদ্রের ওপারে কোন্ সুদূর আনন্দালোকে আমাদের যে "চিরন্তন গৃহ" আছে, তাহারই জন্য কবির প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে। শৈশবে শিশুর আননে সেই আনন্দলোকের প্রতিচ্ছবি, সেই স্বর্গলোকের সুষমা অঙ্কিত থাকে। শিশু নিদ্রায় সে লোকের স্বপ্ন দেখিয়া হাসিয়া উঠে, তাহার আনন্দসঙ্গীত শোনে কিন্তু প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না। শিশু স্বর্গের দূত, তাই পৃথিবীকেও সে আপনার করিয়া লয়। কবি তাই সে আনন্দের মধ্যে ফিরিয়া যাইবার জন্য বিধাতার কাছে শিশুজন্ম প্রার্থনা করিতেছেন। তখন কবির শৈশবের সে সুখস্বপ্ন অন্তর্হিত—এখন—

"সুধার সাগরে উঠেছে গরল,
জীবন যন্ত্রণাময়।"

ইহাই কবির দুঃখ। সৌন্দর্য্য-সম্ভোগের মধ্যেই এ দুঃখের উৎপত্তি; কারণ সৌন্দর্য্যপ্রতিমা মায়াদেবীকে দেখিয়াই কবির সে চিরন্তন বাসস্থান আনন্দলোকের জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। জগতের সমস্ত জিনিস শিশুর মত আনন্দ করিয়া উপভোগ করিতে পারিতেছেন না বলিয়াই কবির দুঃখ। কিন্তু এ দুঃখের সান্ত্বনাও কবি আবিষ্কার করিয়াছেন—সে সান্ত্বনা—প্রেমে। এ দুঃখ ক্ষণিক; কিছুক্ষণের জন্য মাত্র তাঁহার প্রেমে বাধা দিয়াছিল, কিন্তু কবির আনন্দ সে বাধা ছাড়াইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। তাই কবি গাহিতে পারিয়াছেন—

"ফলফুলভরা মনোহরা ধরাখানি,
কোন দেব আনি দিয়েছে না জানি
আমার সুখেরি তরে।

সংসার আর দুঃখময় নহে—সংসার তাঁহার "সুখেরি তরে" যেন কে সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন।

কবির শেষ রচনা 'বাউল বিংশতি'তে কবি প্রথম-জীবনের এই নিরাশার জন্য অনুতাপ করিয়াছেন। প্রথম গানে গাহিয়াছেন—

"বিধাতা নহেন ব্যগ্র,
সুখভরা ধরাধাম,
হৃদয়-আনন্দধামে নিরানন্দ কেন পুষি।"

বাউলবিংশতি কয়েকটী বাউলসঙ্গীতের সমষ্টি। এই গানগুলির মধ্যে যে একটি সহজ সরল গতি আছে,

অনেক গীতে যে প্রেম এবং ভক্তিরসমাধুর্য্যের পরিচয় আছে, তাহাতে মন বিমুগ্ধ, চিত্ত পুলকিত হইয়া উঠে। কবির প্রেম, ভক্তিতে পরিণতি হইয়াছে। তিনি ভগবানের করুণাকে জীবনপথের পাথেয় করিয়াছেন; তাহার মনের অবিশ্বাস দূর করিবার জন্য ভগবানকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

"জাগো হে প্রাণের প্রাণ দাও মনের ধাঁদা খুলে!"

এখানে আমরা কবির আর এক মূর্ত্তি দেখিতে পাই —এ মূর্ত্তি ভক্তিরসবিহ্বল সাধকের মূর্ত্তি। "রোমাঞ্চিত কলেবর, নয়ন বিহ্বল, কপোলে গড়াইয়া দর-দর বহে অশ্রুজল"—ভক্তের মূর্ত্তি।

বিহারীলাল এরূপ কবিত্বশক্তি সম্পন্ন হইয়াও বঙ্গীয় পাঠকবর্গের নিকট আশানুরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া সুধীপ্রবর শশাঙ্কবাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে—"তিনি সৌন্দর্য্যপিপাসু কবি এবং জীবনে সেই সৌন্দর্য্য অনুসরণের চেষ্টা করিয়াছেন; সেই জন্য তিনি সর্ব্বজন-সমাদৃত কবি হইতে পারেন নাই।" বিহারীলালের গানে কেবলই উচ্ছ্বাস—মধ্যে মধ্যে সে উচ্ছ্বাস উন্মত্ততায় পরিণত হয়, সূত্র হারাইয়া যায়। অনেক সময়ে তাহা মানবিকতাপূর্ণ নহে। "করি' (সে) সঙ্গীত-সুধা পান, পাগল হইয়া গেছে প্রাণ," তাই তাঁহার আশেপাশে কোনও দিকে দৃষ্টি নাই। তাঁহার কবিতা কেবলই ছুটিয়া চলিয়াছে—এই চলার সহিত বেগ রাখিয়া সকলে চলিতে পারে নাই বলিয়া বিহারীলাল সকলের নিকট সমাদৃত হইতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার সারদার সাধনায়, ধ্যানে আজীবন মগ্ন ছিলেন এবং তাহারই ফলে তাঁহার কাব্যসঙ্গীত-ধারা স্বতঃই উৎসারিত হইয়াছে—তাই সাধারণ পাঠকের নিকট তাঁহার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। তাঁহার কাব্যের অসংলগ্নতা দোষও অনেক সময়ে পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করে। বিহারীলাল চিরদিনই সাধারণ হইতে একটু উচ্চতর লোকে বিরাজ করিয়াছেন—তাঁহার কল্পনা উধাও হইয়া উর্দ্ধমুখে ছুটিয়াছে—তাঁহার মানস প্রতিমার অন্বেষণে তিনি স্বর্গ ও নন্দন কানন-অভিমুখে ধাবিত হইয়াছেন অথবা হিমালয়ে গিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়াছেন।

কিন্তু এ সমস্ত ছাড়িয়া দিলেও, তাঁহার কবিতা একটু বিশেষ ভাবে ব্যক্তিগত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার সৌন্দর্য্য-প্রতিমা সারদার সহিত তাঁহার বিরহ, মিলন, উৎকণ্ঠাকে মানবহৃদয়ের একটা উচ্চাদর্শের জন্য, সসীমের অসীমের জন্য, চির ব্যাকুলতা বা চিরন্তন আক্ষেপরূপে তিনি অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী কবি রবীন্দ্রনাথ যেমন "মানস-সুন্দরী" বা "জীবনদেবতা"র উদ্দেশে আপনার হৃদয়ের সুখদুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্যে বিশ্বমানবহৃদয়ের চিরন্তন-বাসনাটুকু ফুটাইয়া তুলিয়া তদ্দারা আপনার কবিতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—বিহারীলাল সেইরূপ পারেন নাই।

কিন্তু সাধারণ পাঠকের নিকট তাঁহার প্রতিষ্ঠা আশানুরূপ না হইলেও, প্রকৃত কবি বা কাব্যরসজ্ঞ পাঠকের নিকট বিহারীলাল কবিত্ব-প্রতিভায় অতুলনীয়। আন্তরিক ভাবে ধ্যানের পুরস্কার যদি কিছু থাকে, সাহিত্যরসিক ব্যক্তি তাঁহাকে সে পুরস্কার প্রদানে পরাঙ্মুখ হইবে না।

পরবর্ত্তী সাহিত্যের উপর বিহারীলালের প্রভাব অল্প নহে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি এক যুগসন্ধিস্থলে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। মহাকাব্যের উচ্চশিখর হইতে অবতরণ করিয়া গীতিকাব্যের স্বর্গসিংহদ্বার তিনিই বিশেষভাবে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে কবির নিজের কথা প্রথম বোধ হয় তিনিই শুনাইলেন।" অনুভূতি যদি কবিত্বের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ এবং কবির প্রধান সম্পদ হয়, তাহা হইলে বিহারীলালের স্থান কবি সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি উচ্চে। তিনি মানবকে একটা নূতন বার্ত্তা শুনাইয়া গিয়াছেন। সুন্দরের জন্য বিশ্বে যে একটা চিরন্তন আক্ষেপ বা আকাঙ্ক্ষা আছে তিনি তাহা আপনার জীবনে

অনুভব করিয়া কাব্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তিনি সুন্দরকে ভোগীর চক্ষে দেখেন নাই, ছোট করিয়া দেখেন নাই। সমালোচক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী রবীন্দ্রনাথের কাব্যালোচনা সম্পর্কে বলিয়াছিলেন—"সুন্দরের ধ্যান তখনি সম্পূর্ণ ও সার্থক হয়, সুন্দরের প্রকৃত আস্বাদন তখনি সম্ভব হয়, কবি যখন সুন্দরকে বড় আপনাকে ছোট করিয়া দেখেন; সুন্দর যখন দেবতার মত বরেণ্য, কবি যখন সাধকের ভাবে তাহার সম্মুখে নম্র, সুন্দর যখন পূজার পাত্র, কবি যখন অর্ঘ্যহস্তে সম্মুখে দণ্ডায়মান।" বিহারীলাল সুন্দরকে দেবতার মতই পূজা করিয়াছিলেন—ইহাই বিহারীলালের বিশিষ্টতা।

বিহারীলাল বঙ্গসাহিত্যে আবার চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির যুগ কিয়ৎ পরিমাণে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। বৈষ্ণবীয় ভাব ও ধর্ম্মই বিশেষভাবে বিহারীলালকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। "বৈষ্ণবের যে নিখিল-রসামৃত মূর্ত্তি—বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তির ভিতরে যে অনন্ত প্রেমময় ভগবান আপনাকে প্রত্যক্ষ চোখে দেখা দেন"—এই মূর্ত্তিই বিহারীলালের ধ্যানের বিষয় ছিল; এবং নারী তাঁহার চক্ষে সংসারের শ্রেষ্ঠ পূজ্যা, শ্রেষ্ঠ বরেণ্যা মহিমময়ীরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল বলিয়া তিনি নারীমূর্ত্তিতেই এই অনন্ত প্রেমস্বরূপের পরিকল্পনা করিয়াছেন। বিহারীলালের পত্নীপ্রেমের যে গভীরত্ব ও প্রগাঢ়ত্বে, তাহা এই জন্যই—যে তিনি পত্নীর মধ্যেও এই মূর্ত্তির বিকাশ দেখিতে পাইতেন—এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। নারীকে এত মহীয়সী করিয়া তাঁহার পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যে এক বৈষ্ণব কবিগণ ভিন্ন কে দেখিয়াছেন জানি না। প্রেমের এরূপ মহতী কল্পনাও কে করিয়াছেন বলিতে পারি না। এ প্রেমপ্রতিমার ধ্যানে কে এমন মজিয়াছিলেন—তাহাও জানি না।

কবি বিহারীলালের যে দিক্ পরবর্ত্তী বঙ্গীয় কাব্য সাহিত্যে স্থায়ী হইয়াছে,—আমাদের মনে হয়,—তাহা বিশেষভাবে তাঁহার এই সারদার ধ্যানে তন্ময়ত্বের দিক্‌টা। এই সৌন্দর্য্য বা প্রেমানুভূতি,—সমুদয় খণ্ড, বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্যাকে এক অনন্তের মধ্যে সম্মিলিত ভাবে মিশাইয়া দিয়া, সেই অনন্তের ধারণার চেষ্টা, তাহাকে উপলব্ধি করিবার প্রয়াস, জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য—প্রেমভক্তি ভালবাসা তাহার চরণে সমর্পণ করিবার ব্যাকুলতা—তাঁহার এই দিক্‌টা বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরদিন স্থায়ী হইয়া থাকিবে। বিহারীলালের যাহা কিছু অপূর্ণতা, তাহা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সম্পূর্ণতালাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ হইতে বিহারীলালের গৌরবের বৃদ্ধি। বঙ্গসাহিত্যে এ উন্নতির দিনে বিহারীলালকে বিস্মৃত হইলে আমরা অকৃতজ্ঞতার ভাগী হইব।

সমাপ্ত

শ্রীপাঁচকড়ি সরকার।

আড়াই চাল

(উপন্যাস)

নবম পরিচ্ছেদ।

কলেজের ফেরত বাসায় আসিয়া অমল প্রথমেই নিজের ঘরের ত্রিতল বাটীর দিকের সেই জানালাটা বেশ চাপিয়া বন্ধ করিল। তারপর নিজের ট্রাঙ্ক বই খাতাপত্রগুলা সম্মুখে টানিয়া আনিয়া এমনভাবে স্তূপাকার করিয়া রাখিল, যেন ইচ্ছা সত্বেও জানালাটা আর খুলিতে না পারে।

"হৃদয়োচ্ছ্বাস" বিনিময় লব্ধ মনুসংহিতা খানি হাতে

ঠেকিল। বই খুলিয়া উপহার পৃষ্ঠায় লিখিত সেই অক্ষর কয়টির উপর ভাল করিয়া দৃষ্টি বুলাইয়া, সে নিজেকে উচ্চকণ্ঠে 'গাধা' বলিয়া গালি দিল। সেদিনের আহাম্মুখিতে এমনই অন্ধ হইয়াছিল যে, এই হস্তাক্ষর কয়টা যে মেজবৌদির কলমের ডগা হইতে বহির্গত হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারে নাই।

ইচ্ছা হইল বইখানা টান মারিয়া রাস্তায় বিসর্জ্জন দেয়, কিন্তু মনে পড়িল, ইহা আর যাহাই হউক,—বাস্তবপক্ষে এটা পরের জিনিষ!—একবার ভাবিল, চাকরের মারফৎ ইহা যথাস্থানে পৌছাইয়া দেয়। আবার ভাবিল, না থাকুক, মেজবৌদির দাদা ও ভাবী ভগিনীপতিটি সম্ভবতঃ এখন বাড়ীতে রহিয়াছেন, তাঁহারা যদি এই সূত্রে বহিখানির গমনাগমন বিভ্রাটের সংবাদ জানিয়া ফেলেন,—নাঃ, সে অসহ্য!—

অমল বহিখানা বিছানার তোষকের তলায় চাপা দিয়া রাখিল। মনে ভাবিল ইহা কোন গতিকে উপহার-দাত্রী মেজবৌদির এলেকার মধ্যে সকলের অজ্ঞাতে রাখিয়া আসিবে, তারপর তিনি যাহা খুসী তাহাই করিবেন।

নিজের "হৃদয়োচ্ছ্বাস" বহিখানির কথা মনে পড়িতেই অমলের নিশ্বাস পড়িল। ভাবিল, "আহা কোনও সুযোগে এখন যদি সেখানা একবার হাতে আসিত, তাহা হইলে মলাট মুচড়াইয়া আগে তাহাকে হেদুয়ার জলে বিসর্জ্জন দিয়া তবে সে অন্য কায করিত। নির্লজ্জ মূর্খতার এই স্মৃতিটা লোপ হইলে শান্তি পাইত।

মেজদার বাসায় ফিরিবার জন্য অমলের মন ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, কিন্তু ফিরিবে কি? মেজদার শালির বিবাহ উপলক্ষে এখন দিনকতক সেখানে যে কোলাহল উৎপাতের আশঙ্কা রহিয়াছে, তাহার ভিড়ে মাথা ঢুকাইয়া চিত্তস্থৈর্য্য রক্ষা করা বড় কঠিন! অমল ঠিক করিল, মেজদার শালির বিবাহটা না চুকিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত, নিজে এইখানে নিভৃতবাসে দিন কাটাইবে।

সকল দিক হইতে চোখ কাণ উঠাইয়া লইয়া অমল নিজের কাযে লাগিল। এক মুহূর্ত্ত সময়ও আর বৃথা নষ্ট করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল। কিন্তু অবাধ্য মনটা—তবুও মাঝে মাঝে হাতছাড়া হইয়া, সেই অতীত ঘটনাস্মৃতিগুলার পশ্চাতে ছুটিতে বাহির হইয়া পড়িত—অমল সশঙ্ক হইয়া উঠিত। তখনই মেজদার কথাগুলা খুব ভাল করিয়া স্মৃতিপটে জাগাইয়া দুরন্ত বিদ্রোহী মনের পিঠে চাবুক মারিয়া উচ্চৈঃস্বরে পাঠাভ্যাসে লাগিত। এক এক সময় মনের অবস্থা যখন অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিত, তখন বই ও সাইকেল লইয়া একছুটে অনিলদের শালিখার নির্জ্জন বাগানে উপস্থিত হইয়া—প্রাণপণ চেষ্টায় মনকে সংযত করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিত। এতদিন শুধু বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রিয় ছাত্র হইবার জন্য মাথা খাটাইয়া কায হাসিল করিয়া আসিতেছিল, এইবার অতর্কিত বিপ্লবের আকস্মিক আঘাতে, সত্য সত্যই তীব্রভাবে সচেতন হইয়া অনুতপ্ত হৃদয়টি একান্ত আগ্রহে অকপট নিষ্ঠায় বাণী আরাধনায় উৎসর্গ করিয়া দিল।

কিন্তু অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় একটা অভাবনীয় উৎপাত পিছনে ছুটিয়া, তাহার মনের সুপ্ত-বিদ্রোহিতা আঘাত দিয়া জাগাইয়া মাঝে মাঝে তাহার ধৈর্য্য নষ্ট করিতে লাগিল। উৎপাতটি আর কেহ নহে, মেজদার সেই ভাবী ভায়রাভাই-পরিচিত ভদ্রলোকটী। অমল এখন নিজের কায লইয়া নিজেকে খুবই ব্যতিব্যস্ত রাখিয়াছে, এবং ঐ সুন্দর লোকটার কপাল-জোরের কথা ভাবিয়া কোনরূপ হিংসাকে মনে আমল দিয়া চিত্ত বিক্ষেপ ঘটাইবার ইচ্ছাও এখন তাহার নাই—কিন্তু কি অপরাধে কে জানে, লোকটা যেন কিছুতেই তাহাকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নহে!—অমল যতক্ষণ ঘাড় গুঁজিয়া ঘরের কোণে পড়াশুনা করিত, ততক্ষণ জানিতে পারিত না, ঐ লোকটা বাহিরে কোথায় কি করিতেছে না-করিতেছে, এবং সেটা জানিবার চেষ্টাও এখন তাহার নিকট ভদ্রতা-বিরুদ্ধ, সুতরাং সে সম্বন্ধে বেশ উদাসীন হইয়া সময় কাটাইত। কিন্তু হইলে কি-হয়—ভদ্রলোকটি সেই

'কম্‌লি ছোড়্‌তা নেই' প্রবাদের সার্থকতা রক্ষার জন্ম যেন পূর্ণমাত্রায় ঠক্কর দিয়া চলিতে সুরু করিয়াছেন। কার্য্য উপলক্ষে অমল যখনই বাসা হইতে বাহির হইত, তখনই দেখিত ঐ লোকটী নানাছলে তাহার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিতে সচেষ্ট রহিয়াছে। অমল তাচ্ছিল্যের ভাণে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইত, তবুও স্পষ্ট বুঝিত, লোকটা তাহার তাচ্ছিল্যকে বেশ স্নেহপূর্ণ কৌতুকে উপেক্ষা করিয়া চলিতেছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক এক সময় অমলের অত্যন্ত রাগ ধরিত। বিশেষতঃ সেদিন যখন শালিখার বাগানের নির্জ্জন পাঠাভ্যাসের স্থানটি পর্য্যন্ত ঐ লোকটাকে সাহেবী পোষাকে সাইকেল চড়িয়া তাহার গোপন-অনুসরণ করিতে দেখিল, তখন অমলের বিরক্তির মাত্রা এত উর্দ্ধে উঠিয়াছিল যে, ভাগ্যবশতঃ মেজদার খাতিরটা ঠিক সময়ে না মনে পড়িলে, সে নিশ্চয়ই সেইখানে একটা সংঘর্ষ বাধাইয়া বসিত!—অনেক কষ্টে সামলাইয়া, মনকে সান্ত্বনা দিয়া বুঝাইল যে—ঐ ফুলবাবুটা নূতন বিবাহের আমোদে এখন বিশ্ব সংসারের সমস্ত প্রয়োজনীয় কাযকর্ম্মের নিকট ছুটি লইয়াছে, সুতরাং অকালে ঘুরিয়া মরা ছাড়া উহার এখন কোনই গতি নাই, অতএব যাহা খুসী সে তাহা করুক, কিন্তু অমলের পরীক্ষা আসন্ন, সুতরাং ও সব নিষ্কর্ম্মা লোকের ব্যবহারে চোখ কাণ দিবার তাহার সময় নাই।

এক এক সময় মনে করিত, বাসাটা বদ্‌লাইয়া ফেলে, কিন্তু খরচের টানাটানি, এবং সময়ের মহার্ঘতা হিসাব করিয়া, সে সঙ্কল্পে নিরস্ত হইত। লোকটির সহিত চোখোচোখী হইবার ভয়ে, বাসার কোণ ছাড়িয়া বাহির হওয়া বন্ধ করিল। কলেজের থিয়েটার পার্টির ছেলেরা আসন্ন অভিনয়ের সুপ্রস্তুত রিহার্শেল দেখিতে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া অমলের অসুস্থতার সংবাদ শুনিয়া এবং তাহার এ কয় দিনের নিদারুণ পাঠশ্রমে শুষ্ক শীর্ণ মুখে সে কথার প্রমাণ পাইয়া—ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া

দশম পরিচ্ছেদ।

মেজদার শালির বিবাহের দিন যে ক্রমশঃ নিকটস্থ হইয়া আসিতেছে, এ বিষয়ে অমলের কোনই সন্দেহ ছিল না। কিন্তু কোন্ তারিখে যে বিবাহটা নিশ্চিত ধার্য্য হইল, তাহার কোন সংবাদ সে জানিতে পারিল না। অবশ্য,জানিতে চেষ্টা করিবার অধিকার নাই বলিয়া সে চেষ্টাটুকুও করিল না।

এদিকে বাসা ভাড়া লওয়ার গোণা দিনগুলি একে একে ফুরাইয়া আসিল। অমল দুশ্চিন্তায় পড়িল। গ্রীষ্মের ছুটিতে কলেজ বন্ধ হইলে, হোসেঙ্গাবাদ পলায়নের সুযোগ লাভে যে কয়দিন বিলম্ব আছে, সে কয়দিনের জন্য অগত্যা এখানে থাকিয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিবে কি না তাহাই ভাবিতে লাগিল।

সেদিন প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রথমেই ঐ চিন্তা অমলের মাথায় উদিত হইয়া, তাহার সমস্ত মনটা অত্যন্তই ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। বিমর্ষ ম্লানমুখে অমল বিছানায় বসিয়াই ভবিষ্যৎ ব্যবস্থার চিন্তায় বিভোর হইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে,—এমন সময় সশব্দে দ্বারে প্রকাণ্ড করাঘাত বাজিল। অমল চমকিয়া বলিল, "কে?"

অস্বাভাবিক গম্ভীর স্বরে উত্তর হইল—"জুজু—"

প্রাতঃকালেই ঘুমচোখে এরূপ পরিহাস কাহারও ভাল লাগে না। অমল বিরক্ত হইয়া বলিল, "কে সোজা করে বল, না হলে দোর এখন খুল্‌তে পারব না—"

বিকৃত গম্ভীর কণ্ঠে পুনশ্চ উত্তর হইল, "তোমার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী।"

আগন্তুকের ধৃষ্টতায় অমল অত্যন্তই চটিল। সশব্দে দ্বার খুলিয়া ফেলিল, কিন্তু তখনই তাহার মুখের ক্রুদ্ধ ভ্রুকুটি, বিস্ময়ে লজ্জায় অন্তর্হিত হইল। দেখিল, বক্তা সুপ্রসিদ্ধ পরিহাস-রসিক জামাইবাবু—মেজদার সহোদরার স্বামী—মহিমবাবু!—আর তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া পাশে দাঁড়াইয়া—সৌম্য প্রসন্ন মূর্ত্তি মেজদা মৃদু মৃদু হাসিতেছেন।

কুণ্ঠিত অমল কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে মহিমবাবু বলিলেন, "মেজদার শালির আজ বে,—আমরা নিমন্ত্রণ করতে বেরিয়েছি, চল্, তোকেও যেতে হবে।"

অমল বলিল, "আমার এখনো মুখ ধোয়া হয় নি—"

মহিমবাবু তাহাকে ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুম হচ্ছিল! এ কি, এখনো মশারি টাঙ্গান রয়েছে যে!"—একটানে মশারিটা গুটাইয়া চালের উপর ছুড়িয়া দিয়া মহিমবাবু বলিলেন, "এ কি! মশারির ভিতর আলো নিয়ে বই পড়্‌তে পড়্‌তে ঘুমান হয়েছিল? আহা শয্যাসঙ্গিনী ফিলজফির কেতাব যে এখনো মুক্ত বক্ষে পড়ে রয়েছেন! মরি মরি—কি বাহার!—" অমলের মাথায় একটি চাঁটি মারিয়া বলিলেন, "কর্ত্তার নাকি মাথার অসুখ করেছিল? অ!—তার পর বাগান বাড়ীর বিশুদ্ধ বায়ুসেবনের ফলে এমন গাল দুটো চড়িয়ে ভাঙ্গ্‌লে কে? ভূতে?"

অমল সযত্নে আত্মদমন করিয়া, শালিখার বাগানবাটী হইতে পটলডাঙ্গার মেসের ত্রিতলের কক্ষে আসিয়া পৌছান'র সম্বন্ধে একটা যুক্তিসঙ্গত কৈফিয়ত দিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সেটা মোটেই টিকিল না, উল্টা বামগণ্ডে একটা থাব্‌ড়া খাইল।

মেজদা রাম-রহিম কোন কথা না বলিয়া ক্যাম্বিশের চেয়ারটি টানিয়া লইয়া বসিয়া, বেশ নিশ্চিন্তভাবে একখানি বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। তবে তাঁহার ঠোঁটের চাপা হাসিটুকু দেখিয়া বেশ বোঝা গেল, মহিমবাবুর কথাবার্ত্তা তাঁহার কাণে খুব ভালরকমই পৌছিতেছে।

বিপন্ন অমল দ্বিধা ও উৎকণ্ঠায় অস্থির হইয়া, কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। অথচ স্থাণুবৎ নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া মেজদার সম্মুখে বিনা আপত্তিতে মহিমবাবুর ব্যাঙ্গ বিদ্রূপ গুলাও আর সহ্য করা চলে না। অগত্যা সে বিছানার উপর হইতে খাতা পেন্সিল বহি ও লণ্ঠন ইত্যাদি লইয়া যথাস্থানে সরাইতে মনোযোগী হইল।

মহিমবাবু কিন্তু ক্ষান্ত হইবার পাত্র নহেন। ইত্যবসরে ঘরের চারিদিকে একবার সতর্ক চঞ্চল কটাক্ষপাত করিয়া, বিনাবাক্যে অমলের গালে আর একটা চপেটাঘাত কষাইয়া দিলেন। ট্রাঙ্ক খাতা বহি ইত্যাদি সামগ্রী-সম্ভারে আবদ্ধ সেই পূর্ব্ব পরিচিত জানালাটির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, মহিমবাবু প্রবল গাম্ভীর্য্যের সহিত গোঁফে চাড়া দিয়া, বিস্ময় বিমূঢ় অমলকে কড়া আওয়াজে প্রশ্ন করিলেন, "বলি, মনোবিজ্ঞান শিখ্‌তে গেলে যে শারীর বিজ্ঞান স্বাস্থ্য বিজ্ঞান এ সব তত্ত্বের কোন খোঁজই রাখ্‌তে নেই, একথা কোন শাস্ত্রে মাথার দিব্য দিয়ে লিখেছে বল ত?"

অমল তাহার সঠিক সংবাদ কিছুই বলিতে পারিল না, মাথা চুল্‌কাইয়া বলিল, "ছোট ঘর, অনেক জিনিসপত্র—"

ঘরের অন্যদিকের খালি কোণটা দেখাইয়া মহিমবাবু বলিলেন, "এখানকার জায়গাটা কি অপরাধে 'একঘরে' হল, বুঝিয়ে দে ত?—ষ্টুপিড্ কোথাকার!"

দুড়্‌দাড়্ শব্দে বহিগুলা খাটের উপর ফেলিয়া, একটানে ট্রাঙ্কটা সরাইয়া, মহিমবাবু সশব্দে ধড়াস্ করিয়া জানালাটা খুলিয়া ফেলিলেন। মুখ বাড়াইয়া একবার বাহিরের দৃশ্য বেশ ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া, পরম উৎসাহে সুউচ্চ উচ্ছ্বাসপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "আঃ—কি সুন্দর হাওয়া, কি চমৎকার আলো! মরে যাই, মরে যাই রে,—আহা এখানে দাঁড়ালে, ভাবের আবেগে হৃদয় একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে—"

মেজদা বই ফেলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আঃ মহিমচন্দর, থাম ভাই, আমাকে বিয়ের বাজার করতে যেতে হবে,—ওরে অমু, মুখ ধুয়ে চল্' ভাই, হোসেঙ্গাবাদ থেকে ছেলেদের নিয়ে, কাকাবাবু কাকীমা সবাই এখানে এসেছেন—"

অমল চমকিয়া বলিল, "এঁ্যা, বাবা, মা?—"

ব্যঙ্গস্বরে মহিমবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ!—আজ নয়,—তাঁরা পর্শু এসেছেন, খবর রাখ?"

হতভম্ব হইয়া অমল বলিল, "কিছু না!"

মহিমবাবু বলিলেন, "ওঃ—তার মানে আছে, মাথার

অসুখের ঠেলায় তুমি এখন বিদেহ-কৈবল্য লাভ করেছ, কাযেই ইহলোকের খোঁজ খবর আর কিছু রাখ্‌তে সময় পাও না। এবং—"

মেজদা সন্ত্রস্ত হইয়া বলিলেন, "মহিম, তোমার পায়ে পড়ি ভাই, আমার সময় নেই, কাকাবাবু নূতন বাজারে গিয়ে বসে রয়েছেন, ওদিকে বেলা ন' টার মধ্যে গায়ে হলুদ—নে নে অমু, চ।" আন্‌লা হইতে জামা টানিয়া লইয়া অমলের কাঁধের উপর ফেলিয়া দিয়া মেজদা বলিলেন, "নে জুতোটা পর্—ঘরে চাবি দে, এর পর সুবিধে মত সময়ে এসে জিনিসগুলো নিয়ে গেলেই হবে।"

মুহ্যমান অমল কলের পুতুলের মত মেজদার আদেশ নিঃশব্দে ঘাড় গুঁজিয়া পালন করিল, একটি শব্দ বা এতটুকু আপত্তি প্রকাশ করিতে সাহসী হইল না। তিনজনে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। মেজদা নূতন বাজারের দিকে গেলেন, অমল ও মহিমবাবু মেজদার বাসায় গেলেন।

পিতামাতা পশু আসিয়াছেন, অথচ অমল আজিও সে সংবাদ জানে না,—এই কথাটা লইয়া তাহার মনের মধ্যে খুব তোলাপাড়া চলিতেছিল, অথচ, তাঁহাদের হঠাৎ আসার কারণ কি,একথা জিজ্ঞাসা করিতেও তাঁহার মুখে বাধিতেছিল। রাস্তায় চলিতে চলিতে একবার ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "মহিমবাবু, এঁরা যে সবাই হঠাৎ চলে এলেন, তার মানে কি? সবাই ভাল আছে ত?"

মহিমবাবু বলিলেন, "খুব খুব খুব,—সবাই খুব ভাল আছে, শুধু একজনেরই ব্যাধি প্রবল!—এখন তুমি ঘরের ছেলে, তোমায় ভাল-ভালন্তে ঘরে পৌছে দিতে পারলে আমি নিস্কৃতি পাই।"

অমল ইহার পর আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না।

বাড়ী পৌছিয়া অমল দেখিল আত্মীয় কুটুম্ব ছেলে মেয়ে ঝি চাকরে বাড়ী হৈ হৈ রৈ রৈ করিতেছে!—অমলকে দেখিয়া সকলে খুব হট্টগোল করিয়া উঠিল। কোনরূপে ভিড় ঠেলিয়া, পাশ কাটাইয়া অমল বাড়ীর ভিতর পৌছিয়া, রান্নাঘরে জ্যাঠাইমার নিকট উপবিষ্টা জননীকে গিয়া প্রণাম করিল। জ্যাঠাইমা দাড়ি ধরিয়া তাহাকে চুমা খাইয়া বলিলেন, "কেমন ধারা ছেলে বাবা তুই? বাড়ীশুদ্ধ লোক ধড়ফড়িয়ে মরছি, আর তুই কোথায় গিয়ে লুকিয়ে বসে রইলি বল ত?"

অমল ঘাড় চুলকাইয়া বলিল,"এক্‌জামিনের পড়া—"

জ্যাঠাইমা হর্ষস্মিত মুখে বলিলেন, "আহা হোক্ বাছা আমার মালক্ষীর প'য়ে এবার ভালয় ভালয় পাশ করে উৎরে উঠুক। আহা, বৌ যা হবে ছোট বৌ জানিস, রূপে ঘর আলো করা, যেমন আমার চাঁদের মত ছেলে, তেমনি যুগ্যি বৌ হবে।"

অমলের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। স্তম্ভিত হইয়া বলিল, "বৌ কি বল্‌ছ জ্যাঠাইমা?"

জ্যাঠাইমা হাসিয়া বলিলেন, "শোন ছেলের পাগ-লামি! হ্যাঁরে তুই কি চিরকালই ছেলেমানুষ থাক্‌বি?"

অমল মাথামুণ্ড কিছুই বুঝিতে পারিল না। অনেক কষ্টে অনেক প্রশ্ন তর্ক ও অবিশ্বাসের পর সে নিশ্চিত বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইল যে সম্প্রতি তাহার বিবাহ—পাত্রী মেজদার শ্যালিকা।

তার পর একে একে সে শুনিল যে, মেজদার শ্বশুর হোসেঙ্গাবাদে অমলের পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, ইতিমধ্যে কলিকাতা হইতে মেজদার টেলিগ্রাম যায় যে অমল বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছে, তবে তাহার পরীক্ষা আসন্ন, সে জন্য সে যথাসম্ভব শীঘ্র বিবাহের গোলমাল চুকাইয়া দিয়া পরীক্ষায় প্রস্তুত হইতে ইচ্ছুক। অতএব আপনারা সত্বর আসুন।"—তদনুসারে তাঁহারা কলিকাতায় আসিয়াছেন। অমল আরও শুনিল যে, মেজদা সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন, বিবাহের কোলাহলপূর্ণ বাসায় পড়াশুনার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া অমল কোনও বন্ধুর বাটীতে থাকিয়া একয়দিন পড়াশুনা করিতেছে।

অমল রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেই, মহিম বাবু কোথা হইতে আসিয়া অকস্মাৎ ক্যাঁক্ করিয়া তাহার ঘাড় টিপিয়া ধরিয়া তাহাকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন। সেখানে মেজবৌদি এয়োডালা সাজাইতেছিলেন। মহিমবাবু বলিলেন, "মেজবৌদি

ফেরারি আসামী হাজির, আমি হাত দুটো ধরছি, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে, উত্তম করে' এর কাণ দুটো মলে দিন ত এবার।"

অমলের স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য—সব এবার টলিল। সে সকাতরে বলিল, "দোহাই মেজবৌদি, বালা-চুড়ির ঝঙ্কার দূর থেকেই কাণে মিষ্টি লাগে, কিন্তু কাণের খুব কাছে এসে ওটার ঝনৎকার নিরেট ধাতব পদার্থের বিশ্রী শব্দ বলেই বোধ হয়। বুঝে সুঝে কায করুন, ওর মাধুর্য্যটুকু নষ্ট করবেন না—"

মেজবৌদি স্নিগ্ধ হাস্যে মৃদুস্বরে বলিলেন, "না না, আপনার ভয় নাই, আপনি আমার শ্বশুরের ছেলে, আপনার কাণে হাত দেওয়াটা আমার উচিত হয় না, স্নেহের অনুরোধে আমি শুধু মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করতে পারি।"

অমল প্রণাম করিয়া কৃতজ্ঞকণ্ঠে বলিল, "তাই করুন—"

মহিমবাবু অমলের মাথাটা ধরিয়া মেঝের উপর কপালটা বেশ জোরের সহিত ঠুকিয়া দিয়া হতাশভাবে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হা ভগবান, দুনিয়ার মানুষগুলোর শেষ পর্য্যন্ত এতদূর অধঃপতন হল!"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বকৃত ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া লজ্জায় অমলের মাথা কাটা যাইতেছিল। সুতরাং বিবাহের উৎসবটা হইতে কোনমতে পাশ কাটাইয়া সে ঘাড় গুঁজিয়া, বই মুখে করিয়া সময় কাটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার উপর মহিম বাবুর নির্য্যাতন ছিল, সুতরাং অমল যথার্থই চোর বনিয়া যাইতে বাধ্য হইল।

মেজদা পূর্ব্ব ঘটনার কতদূর পর্য্যন্ত জানেন অমল তাহার কোন সংবাদই পাইল না, সুতরাং মেজদার নিকট অত্যন্তই কুণ্ঠিত হইয়া রহিল। আর একটি বিষয়ে তাহার মন অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল—মেজদার সেই ভাবী ভায়রা-ভাইটি হঠাৎ কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন! অমল আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, তাঁহার নাম কাহারও মুখে একবারও শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না। সহস্র ব্যগ্রতা সত্ত্বেও অমল কিন্তু কাহারও নিকট কোন কথা ভরসা করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। তা ছাড়া সে সুযোগও পাওয়া গেল না,—দুই পক্ষের উৎসবের ভিড়ে ব্যস্ত মেজদা ও মেজবৌদির মাথা চুলকাইবার সময় ছিল না।

যথাসময়ে সপারিষদ বর বিবাহবাটীতে উপস্থিত হইল। অমল দেখিল, মেজদার শ্বশুর সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সহিত আর একজন সুন্দরাকৃতি যুবক আসিয়া নগ্নপদে অনাবৃত দেহে কাঁধে তোয়ালে জড়াইয়া সমাদর সৌজন্যের সহিত বরযাত্রিগণকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। তাহার মুখখানা যেন চিনি চিনি বোধ হইল কিন্তু ভাল চিনিতে পারা গেল না। অমল সন্দেহাকুল দৃষ্টিতে সেই যুবকের পানে চাহিয়া রহিল।

তার পর সম্প্রদান স্থলে সেই ব্যক্তি যখন গরদের যোড় পরিয়া, কন্যা সম্প্রদান করিতে বসিল, তখন উজ্জ্বল আলোক সম্মুখে তাঁহার হাস্যসুন্দর মুখ এবং সোণার চশমা মোড়া চক্ষের স্নিগ্ধ কৌতুকোজ্জ্বল কটাক্ষ দেখিয়া বিস্ময়-স্তম্ভিত অমলের সকল সংশয় ঘুচিয়া গেল। নিজের নির্ব্বুদ্ধিতাকে শত ধিকার দিয়া সে লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া ভাবিল, ছি ছি ছি! অহমিকায় স্ফীত হইয়া সে যেমন বুদ্ধি গৌরবের অভিমানে অন্ধ হইয়া বানর সাজিয়াছিল, সকলে মিলিয়া তেমনই তাহাকে বানর নাচাইয়াছেন!—সোজা বুদ্ধিতে সরলভাবে চলিলে অনেক আগেই অক্লেশে বুঝিতে পারিত, এই ভদ্রলোকটি সুন্দর চেহারার অপরাধে এবং সোণার চশমা ও ডবল ব্রেষ্ট কামিজ পরিয়া ত্রিতলের ঘরে বিশ্রাম করার অজুহাতে—মেজদার ভাবী ভায়রা-ভাই কখনই হইতে পারে না বরং ভূতপূর্ব্ব শ্যালক হওয়াটাই সম্ভব ছিল। এবং এখন বুঝিল, বাস্তবিক সে তাহা ছাড়া আর কিছুই নহে।

বিবাহ অন্তে বর কন্যা বাসর ঘরে প্রবেশ করিল

হইয়া মেজবৌদি আনন্দময়ী মূর্ত্তিতে ঘরে আসিয়া শাদা সিল্কের রুমালে মোড়া একটি জিনিস অমলের হাতে দিলেন। অমল দেখিল রুমালের উপর রাঙা রেশমী সূতা দিয়া লেখা রহিয়াছে—

"যল্লভসে নিজ কর্ম্মোপাত্তং
বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্।"

রুমাল খুলিয়া দেখিল: তাহার ভিতর রহিয়াছে—তাহার সেই—"হৃদয়োচ্ছ্বাস।"

মেজবৌদি বলিলেন, "ভাই ঠাকুরপো, তোমার সেই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিটা যে সম্পূর্ণই ইচ্ছাকৃত দুষ্টামী, সেটা আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধিতেও বেশ স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম। সেই জন্যে মনুর অনুশাসনতন্ত্রখানি তোমাকে দিয়ে এটা তোমার দাদার মোহমুদ্গরের নীচে চাপা দিয়ে এতদিন রেখেছিলুম। এখন তোমার বিষদাঁত ভেঙ্গেছে, কাযেই এটা মুক্ত করে তোমাকে আজ ফিরিয়ে দিচ্ছি। আর এই সঙ্গে একটি কথা বলে দিচ্ছি, সে বাড়ীর বৌদিদি আর এ বাড়ীর বড়দিদি বলে নয়, তোমাকে সত্যিকার স্নেহাস্পদ ছোট ভাইটি মনে করেই এই উপদেশটি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে হৃদয়োচ্ছ্বাস জিনিসটা খুব ভাল সন্দেহ নেই, কিন্তু স্থান কাল পাত্র ভেদে এটা একটু বুঝে খরচ করতে হয়, এর অযথা অপব্যয়টা মোটেই ভাল নয়! তোমার অপরিচিতা বিদ্যুৎটি ভাগ্যিস্ আমার বোন ক্ষণপ্রভা হয়ে গিয়েছিল, তাই রক্ষা, কিন্তু ও যদি আর কেউ হত, তাহলে—হঠাৎ হৃদয়োচ্ছ্বাস উপঢৌকন দেওয়ার ফলটা এ ক্ষেত্রে কি রকম সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়াত, বল দেখি?"

ধরিত্রী সম্মুখে দ্বিধা বিদীর্ণ হইলে অধোবদন অমলের পক্ষে সে সময় বড়ই সুবিধা হইত। কিন্তু তাহা হইল না। অগত্যা সে মেঝের কার্পেটের ফুলের শোভা দেখিতে মনোনিবেশ করিল।

অমলের বামপার্শ্বে উপবিষ্ট বেণারসী ঘোমটা মোড়া বধূটিকে সস্নেহে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া মেজবৌদি স্মিতমুখে বলিলেন, "আর দেখ, আমাদের এই পাগলীটার বুদ্ধিশুদ্ধি ভারি অল্প। তোমার রিহার্শেল দেখে ওর খুব ভাল লেগেছিল, সেটা বেশ জান্‌তে পেরেছি। আর ওরই কাছে খবর পেয়ে আমি অভিনয়কারীকে দেখতে গিয়ে চিনে ফেলেছিলুম যে ইনি আমারই মূর্ত্তিমান দেবর মহাশয়! কিন্তু একটা প্রয়োজনীয় খবর জানিয়ে রাখি শোন। তোমার ব্যবহার থেকে এই নির্ব্বোধটা তোমার মত সভ্য ভদ্রলোককেও একটা অসভ্য পাগল ঠাউরে ফেলেছিল! যাই হোক, ভবিষ্যতে ওর ভুলধারণাটা ভেঙ্গে দিও,—প্রমাণ করে দিও যে তুমি অসভ্যও নও পাগলও নও, তুমি একটা সভ্য প্রকৃতিস্থ এবং কাযের মানুষ।"

শ্যালক প্রমথবাবু কক্ষে প্রবেশ করিয়া সুহাস্য বদনে বলিলেন, "ভাই অমল, তোমার অত সখের রিহার্শেলটা মাটী হয়ে যাওয়ার জন্যে আমি আন্তরিক দুঃখের সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করছি। আর তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে জানাচ্ছি ভাই,—তুমি নৌকোর চালে সোজা কোণ কেটে চলছিলে বেশ,—কিন্তু এই যে মাঝখান থেকে আড়াই চালে বাজিমাৎ হয়ে গেল, এর জন্যে দার্শনিক মতে, দায়ী শুধু বিধাতা। আর বৈজ্ঞানিক মতে, যদি যথার্থ দায়ী কেউ থাকে ত সে আমার বুদ্ধিমতী সহোদরা—তোমার ঐ ভালমানুষ বউদিদিটি! অবশ্য তোমার মেজদাকে নিরীহ ভদ্রলোক মনে কোর না, মনে রেখো এই আড়াইচালের ওয়ান্-ফোর্থের জন্যে তার কেরামতি আছে। আমার পরিচয়টি তিনি যে রকম ভাবে তোমার কাছে প্রকাশ করেছেন, তার জন্যে তাঁকে জেল খাটান উচিত। কিন্তু দোহাই ভাই, আমাকে ওদের দলের একজন মনে কোর না! তোমার পাল্লায় ঠেকে আমার ভগিনীর অনুরোধে—এ যাত্রা আমায় যেটুকু দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে, সেজন্যে আমার প্রতি তোমার করুণা প্রকাশ করা উচিত। আমরা ছাপান্ন পুরুষে কেউ কখনো গোয়েন্দাগিরি করেনি, কিন্তু তোমার ওপর চোখ

রাখবার জন্তে—আমাকে দিয়ে ওঁরা সে কাযও করিয়েছেন!"

মেজদা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "সে যা হবার তা হয়েছে; এখন অমল শোন তোমায় একটা কথা বল্‌তে এলুম—এই ক'মাসের মধ্যে তোমায় বি-এ এগ্‌জ্জামিনের জন্তে তৈরী করে তোলবার ভার আমার উপর পড়েছে। কাকাবাবু বলে দিলেন, কালই তোমার ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে আমাদের কলেজে এসে ঢুকতে হবে"—

গাঁটছড়া বাঁধা বেনারসী উত্তরীয়খানা ঝুপ্‌ করিয়া বধূর ঘাড়ের উপর ফেলিয়া দিয়া তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া অমল বলিল—"এখুনি—"

মেজবৌদি পথ আগলাইয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "দাঁড়াও, আগে বাসি বিয়েটা হয়ে যাক—"

অমল চকিতনেত্রে এদিক ওদিক চাহিয়া জড়িতস্বরে বলিল, "কিন্তু তারপর—"

মেজবৌদিদি তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া চট্‌ করিয়া উত্তর দিলেন, "তারপর তোমার দাদার কাছ থেকে শিখে না-আসা পর্য্যন্ত, না হয় ফুলশয্যার আমোদটা মুলতুবী রাখ্‌বার ব্যবস্থা করব।"—কণ্ঠস্বর আরও খাটো করিয়া, শুধু মেজদা যাহাতে শুনিতে পান, এমনি স্বরে পুনশ্চ বলিলেন, "আর তাতেও যদি আপত্তি থাকে, তবে সেটাও না-হয় দাদার উপর বরাত দিও।"

অমল মাথাটা খুব ঝুঁকাইয়া, আলোর সম্মুখে আসিয়া অঙ্গুলিস্থ দানের অংটির 'রুবি'টা পরীক্ষা করিতে মনোযোগী হইল। মেজদা হাস্যরুদ্ধ অধরে আড়চোখে মেজবৌদির দিকে কোপকটাক্ষপাত করিয়া, শ্যালককে টানিয়া লইয়া নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

সমাপ্ত

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

কোচবিহারে শিকার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছি, হঠাৎ এক বন্য কুক্কুটের শব্দ আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করিল। পক্ষী নিজ সন্ততি লইয়া এক বৃক্ষতলে অবস্থান করতঃ আপন মনে রব করিতেছিল। প-সাহেব পক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িলেন কিন্তু ভ্রমবশতঃ SSE* আওয়াজ করাতে পাখী নির্ব্বিঘ্নে উড়িয়া গেল।

বৃষ্টির বেগ বাড়িয়া উঠিল। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি দূরে বনজঙ্গল আর কিছুই দেখা যাইতেছে না, সব যেন ধোঁয়ায় ঢাকিয়া গিয়াছে। আমরা তাড়াতাড়ি গিয়া এক গৃহস্থের বাড়ীতে নামিয়া পড়িলাম। হাওদা ও বন্দুকগুলি বর্ষাতিতে ঢাকা রহিল। এক বেড়াশূন্য চালা ঘরই তখন আমাদের মাথা রক্ষার একমাত্র উপাদান। তথায় একখানি চৌকি পড়িয়াছিল, তাহারই উপর হাতীর একখানি তোষক পাতিয়া মহারাজ সমেত সকলে উপবিষ্ট হইলাম। সরল প্রাণ গৃহস্থ তাহার দেশের রাজা, তাহার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা মহারাজকে এইভাবে সহচর হস্তী ইত্যাদি সহ তাহার আশ্রয় লইতে দেখিয়া একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। বেচারী সসম্ভ্রমে অনেক "অভ্রম" করিতে লাগিল।

বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইতে লাগিল। টিফিনের সময় উপস্থিত, কিন্তু সারাদিন ঠাণ্ডা থাকাতে কেহই ক্ষুধার্ত্ত বা তৃষ্ণার্ত্ত হন নাই, সুতরাং খাদ্যাদি সমস্তই

* একপ্রকার ছর্‌রা।

সেইভাবে হস্তিপৃষ্ঠে বোঝাই থাকিয়া গেল। হস্তীগুলি শুধু শুধু দাঁড়াইয়া জলে ভিজা কষ্টকর বোধ করিয়া, গৃহস্থের দুই একটি কলাগাছ মড় মড় শব্দে পাতিত করতঃ নিজেদের টিফিন্ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু মহারাজ তাহাদের এ সুখে বাদ সাধিলেন। কলাগাছ পড়ার শব্দ শুনিবামাত্র "আর একটিও যেন নষ্ট না হয়" বলিয়া মহারাজ কিঞ্চিৎ রুষ্টভাবে স-সাহেবকে আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। দেখিতে দেখিতে উক্ত আজ্ঞা নিম্ন হইতে নিম্নতর স্তরে নামিয়া চলিল এবং অবশেষে মাহুতের হস্তস্থিত অঙ্কুশ, লোভী হস্তীর কর্ণপৃষ্ঠে সুস্পষ্টভাবে বলিয়া দিল যে, মহারাজ উপস্থিত থাকিতে তোমরা এরূপভাবে প্রজার অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না।

প্রায় আধঘণ্টা পরে বৃষ্টি থামিয়া গেল এবং আমরা আবার হস্তিপৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইলাম। মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে সেক্রেটারী ব-সাহেব গৃহস্থকে পাঁচটি টাকা বক্‌শিস দিলেন। সে তার শিরাবহুল কর্কশ ও কম্পিত হস্তে উহা গ্রহণ করিয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম করিল এবং আমরা রওনা হওয়া পর্য্যন্ত যুক্তকরে দূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

আমরা আবার সেই ব্যাঘ্রের খোঁজে চলিলাম। অনেকগুলি বনে ঘুরিয়া ফিরিয়া একটি জঙ্গলে আসিয়া উপস্থিত হওয়া গেল। মহারাজ বলিলেন, "নিশ্চয়ই এইখানে বাঘ আসিয়াছে।" আবার আমরা হাওদা লাইনে সেইভাবে দাঁড়াইলাম। আবার জঙ্গল তাড়ান আরম্ভ হইল এবং আবার সেই বাঘ সেই পূর্ব্বপরিচিত ভৈরব নিনাদের সহিত বাহির হইয়া পড়িল। তখন মনে মনে বলিলাম, "হে বৃদ্ধ, তোমার চল্লিশ বৎসর একাদিক্রমে শিকার বিফল হয় নাই। অভিজ্ঞতা যথেষ্টই হইয়াছে।" কিন্তু এখনও সেই পুরাতন দুর্ভাগ্য ছায়াসম আমাদের পশ্চাতে। মহারাজ একটী, প-সাহেব একটি, য-সাহেব একটি এবং গ-সাহেব একটি গুলি করিলেন। কিন্তু হায় ব্যাঘ্র সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া হাওদার লাইন ছিন্নভিন্ন করতঃ বেগে প্রস্থান করিল।

আমরাও ছাড়িবার পাত্র নহি। আবার ব্যাঘ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাওয়া করিলাম। কিন্তু এবারের যত্ন বড়ই অসময়ে হইয়া পড়িল, কারণ দূরস্থিত শালবনের ছায়া তখন দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া পড়িতেছিল এবং সূর্য্যদেব নিজ পূর্ব্বাধিকার ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া ক্ষোভে ও লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছিলেন। যাহা হউক, আমাদের শিকার সমভাবেই চলিতে লাগিল। অন্ধকার হইয়া আসিতেছে দেখিয়া স-সাহেবও এবার বীটের লাইনে গেলেন, কাযেই আমরা অবশিষ্ট কয়েকজন বাহিরে রহিলাম।

বীটের লাইন কিঞ্চিৎ অগ্রসর হওয়ার পরই 'গরু গরু' বলিয়া মাহুতেরা বিষম গোলযোগ বাধাইয়া তুলিল। স-সাহেবও হাঁকিয়া বলিলেন যে দুইটী ছোট বাইসন রহিয়াছে। ছোট বলিয়া মহারাজ বীটের লাইন ফাঁক করিয়া ইহাদের ছাড়িয়া দিতে বলিলেন, এবং যদি বাহির হইয়া আসে তবে উহাদের মারিতে নিষেধ করিলেন।

আমার হস্তী তখন একেবারেই উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মাহুতের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া পাগলের মত এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিল। জঙ্গলে শব্দ শুনিয়া কখনও সেই দিকে, কখনও পশ্চাৎ ফিরিয়া বিপরীত মুখে উর্দ্ধপুচ্ছে ছুটিতে লাগিল। মাহুত বেচারীর চেষ্টার কোনই ত্রুটি ছিল না, কিন্তু কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। অবশেষে সেও ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মারিতে মারিতে নিজের অঙ্কুশ সোজা হইয়া গেলে তাহাকে অপর আর একটী হাতীর মজবুত অঙ্কুশ দিলাম, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইল না।

উত্তেজিত ব্যাঘ্র ও উন্মত্ত হস্তী উভয়ে পরস্পরের দিকে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। দুই এক সেকেণ্ডের মধ্যে সংঘর্ষণ হইবে বলিয়া আমি হস্তীটিকে অপেক্ষাকৃত/ দূরে দাঁড় করাইয়া, বীরের মত ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। একটু পরে এক বৃহদাকার জাম্ববান বাহির হইয়া আসিল।

মহারাজ গুলি করিলেন। লোমশ পশু আহত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে আবার জঙ্গলে ফিরিয়া গেল। বালক হরিপদ তাহার সেই রক্তমাখা ভীষণ মুর্ত্তি দেখিয়া ও বিকট চীৎকার শুনিয়া ভয়ে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। যাহা হউক, বীটের হাতী পুনরায় তাহাকে তাড়াইয়া বাহির করিল এবং মহারাজের হস্তে আর দুই একটি গুলি খাইয়া পড়িয়া গেল। বাঘ আর বাহির হইল না, সম্ভবতঃ বাইসনদের সঙ্গেই পলায়ন করিয়াছিল।

এইবার আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলাম। সামান্য দূর আসিয়াছি, এমন সময় একজন মাহুত আসিয়া খবর দিল যে ভাল্লুকটী তখনও মরে নাই। ইহা শুনিয়া ব-সাহেব তাহাকে একেবারেই শেষ করিবার জন্য ফিরিয়া গেলেন। তিনি যখন আবার আমাদের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, তখন দেখেন, মহারাজ শিকারের সময় যেস্থানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, ঠিক সেই স্থানেই একটি গাছের উপর এক চিতা বাঘ গম্ভীরভাবে বসিয়া আছে। সম্ভবতঃ "আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে প্রয়োজন কি?" এই নীতি বাক্যটি তাহার বিশেষরূপ জানা ছিল। তাই নীচে হাতী, বাঘ, ভালুক বাইসন প্রভৃতির হুড়াহুড়ি,—সে ক্ষুদ্র প্রাণী—এ সব গোলমালে তাহার কোন প্রয়োজন নাই ভাবিয়া বৃক্ষারোহণ পূর্ব্বক শিকার দেখিতেছিল। কিন্তু হায় অদৃষ্ট! তাহার এ সুখশান্তি বেশীক্ষণ টিকিল না। এ দিকে আমাদের মনও আবার ঠিক সেই সময় অত্যন্ত দরাজ হইয়া পড়িয়াছিল। বাঘ,ভালুক পাইতেছি,সুতরাং সামান্য একটা চিতাবাঘে মন উঠিবে কেন? তাই ব-সাহেব চিতাকে ৫নং ছর্‌রা মারিয়া দিলেন। সে বেচারীও শতশত বিন্ধনে প্রপীড়িত হইয়া ঘ্যাক্ ঘ্যাক্ করিতে করিতে তাড়াতাড়ি বৃক্ষ হইতে নামিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পলাইয়া গেল। যাইবার সময় দুই একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া আমাদের বিশেষরূপে দেখিয়াও লইল!

চিতা-কাণ্ড সমাপনান্তে আবার আমরা চলিতে লাগিলাম। তখন বেশ অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। কিয়দ্দূর অগ্রসর হওয়ার পর আমাদের সম্মুখ দিয়া একটি বন্য-ময়ূর উড়িয়া গেল। তাহার অল্পক্ষণ পরেই আমার বামপার্শ্বের জঙ্গল মধ্যে দুইটি প্রাণী উর্দ্ধপুচ্ছে ঘাড় হেঁট করিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া দৌড়াইতেছে দেখিলাম। তাড়াতাড়ি বন্দুক তুলিয়া লইলাম, কিন্তু পরে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখি ইহারা সেই বাইসন,—আমাদের সামনে পড়াতে প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছে। মহারাজের আদেশবাক্য স্মরণ হওয়ায় বন্দুক নামাইলাম।

সমস্ত দিন বৃথা পরিশ্রমের পর আমরা সকলেই অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। সকলেই বাক্যহীন; প্রত্যেকেই চিন্তাযুক্ত। পথে আসিতে আসিতে কত কি চিন্তা করিতে লাগিলাম, তাহার ইয়ত্তা নাই, তবে তন্মধ্যে ব্যাঘ্র-চিন্তাই প্রবল। ভাবিতে লাগিলাম যে এই সামান্য বন্যপশু আজ প্রতীচ্য বিজ্ঞান ও প্রাচ্য চেষ্টা উভয়কে অনায়াসে ফাঁকি দিল। তবে কি সে অমর?—না, তাহা ত কখনই সম্ভবপর নহে, তবে "নিয়তি কেন বাধ্যতে"—বরাত বড় জিনিষ। ইহাই মানুষের গর্ব্বকে খর্ব্ব করিয়া রাখিয়া দেয়। আমরা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারি না। জগতে এরূপ ঘটনা কত শত হইয়া গিয়াছে, কত ঘটিতেছে, আবার কত যে ঘটিবে তাহা কে জানে!

জানি না কতক্ষণ এইরূপ দার্শনিক চিন্তায় মগ্ন ছিলাম। হঠাৎ কতগুলি আলো চক্ষে পড়াতে চমক ভাঙ্গিল—দেখি আমরা একেবারেই ক্যাম্পে উপস্থিত। মহারাজ আমার অল্পদূর অগ্রে, হস্তীপৃষ্ঠে বসিয়া তিনি আপন মনে শিষ দিয়া একটি ইংরাজী গীত গাহিতেছেন।

ক্যাম্পে ফিরিয়া স্নানান্তে পরিধেয় বস্ত্র বদলাইয়া আমরা সকলে একত্র উপবেশন করিলাম, কিন্তু সে দিনকার আড্ডাটা বড় জমিল না। কারণ বোধ হয় পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না। স-সাহেব আমাদের বিষণ্ণতা দূর করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন। তাঁহার ন্যায় অমায়িক ও সদানন্দ লোক আমি আর

কখনও দেখি নাই—কিন্তু সব বৃথা,তাঁহার চেষ্টাও নিষ্ফল হইল। কিছুক্ষণ পরে ডিনার আরম্ভ হইল ও অনুমানিক ৯॥ টার সময় শেষ হইয়া গেল। ডিনার অন্তে—

"যে যার তাঁবুতে গেল টলিতে টলিতে"

অবশ্য নিষ্ফল প্রয়াসহেতু অবসাদই ইহার প্রধান কারণ।

সেদিন বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল, কাযেই লেপমুড়ি দিয়া সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় লইলাম। কতক্ষণ ঘুমাইয়া ছিলাম জানি না, মধ্যরাত্রে অত্যন্ত শীতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখন ভয়ানক শিলাবৃষ্টি ও ঝড় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বোঁ বোঁ শব্দে ঝড় চলিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে ফড় ফড় করিয়া তাঁবুর অনেক অংশ ছিড়িয়া যাইতেছে, বিদ্যুৎ চমকাইয়া কড় কড় শব্দে চারিদিকে বাজ পড়িতেছে, আবার সেই সঙ্গে তাঁবুর উপর টুপটাপ করিয়া অজস্র শিলাবর্ষণ—যেন প্রলয় উপস্থিত! প্রকৃতির সে ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি জীবনে কখন ভুলিতে পারিব কি না সন্দেহ। আমার তাম্বুটি পূর্ব্বমুখ। সেই দিক হইতেই ঝড় বহাতে পর্দ্দা উড়াইয়া তাম্বুর ভিতর প্রবলবেগে ঠাণ্ডা বাতাস আসিতে লাগিল। অন্য কোন সদুপায় না থাকায় দুয়ারের পর্দ্দার উপর কয়েকখানি চেয়ার চাপা দিয়া কোন রকমে বাতাস আসা বন্ধ করিয়া পুনরায় শয়ন করিলাম।

কিছুক্ষণ পরে আবার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে সময় ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, কিন্তু এক ভয়ানক শব্দ কাণে আসিল। তখনও ঘুমের ঘোর ভাল করিয়া কাটে নাই, কাযেই প্রথম কিছুই তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না। পরক্ষণেই বেশ বুঝিলাম—সর্ব্বনাশ এ যে বাঘের ডাক, কি ভয়ানক! তাহাও আবার আমার তাঁবুর ঠিক পশ্চাতে। হৃৎপিণ্ড সবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল। মনে করিলাম, দিনের বাঘটি কি প্রতিশোধ লইতে আসিয়াছে? এখন উপায়? অনেক ক্ষণ স্থির কর্ণে শুনিয়া বুঝিলাম যে ঐ ডাক প্রায় ৪।৫ শত গজ দূর হইতে আসিতেছে; কিন্তু একে রাত্রিকাল, তাহাতে আবার বৃষ্টি হইয়া যাওয়ায় শব্দটা অত্যন্ত নিকটে বোধ হইতেছে। যাহা হউক আমরা সশস্ত্র প্রহরী বেষ্টিত এবং ক্যাম্পের চারিদিকেই আলো জ্বলিতেছে, সুতরাং ভয়ের কোন কারণ নাই বুঝিয়া আবার শুইয়া পড়িলাম।

পরদিন প্রভাতে আকাশে আর মেঘ নাই। নীল আকাশ আমাদের দৃষ্টি পথে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। মেঘান্তরিত নির্ম্মল নভোমণ্ডল ও পর্ব্বতের নীলিমা অন্যদিন অপেক্ষা গাঢ়তর হইয়া উঠিল এবং জঙ্গলগুলিও অধিকতর সবুজবর্ণ ধারণ করিল। চারিদিক শান্তিময়—শান্তির বর্ণে রঞ্জিত। জোরাই নদীরও বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম—তার কলকলধ্বনি আজ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, উপলখণ্ডময় পথের উপর দিয়া আজ সে বড় আনন্দেই ধাবিত। তিত্তির, কুক্কুট, ময়ূর প্রভৃতি পক্ষিগণও চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। মধুর প্রভাতে তাহারাও আনন্দে বিভোর হইয়া তান ধরিয়া দিয়াছে।

পট্টাবাসে বদ্ধ থাকিতে ভাল না লাগায় স-সাহেব ও আমি বাহির হইয়া পড়িলাম। গত কল্যের শিকার সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা করিতে করিতে আমরা ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছি, নাতিশীতল প্রাতঃসমীরণ ধীরে ধীরে আসিয়া আমাদের গাত্র স্পর্শ করিতেছে,এমন সময় আর একটী বাঘের খবর লইয়া একজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। আবার আমরা প্রত্যেকেই স্বস্ব ভবিষ্যৎ-বীরত্বের উজ্জ্বল চিত্র মনে মনে অঙ্কিত করিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু মানুষের আর্জ্জি খোদার মর্জ্জি ভিন্ন মঞ্জুর হয় না। পরক্ষণেই মাহুতদের জমাদার হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল, বিজলীর মাকনা* ক্ষেপিয়া গিয়া এই মাত্র তাহার একজন মাহুতকে পদদলিত করিয়া সমন-সদনে

* মাকনা=দন্তহীন পুংহস্তী। মনুষ্য সমাজে মাকুন্দের ন্যায় ইহারাও ঘৃণার চক্ষে দৃষ্ট হইয়া থাকে। মাকনা হাতী প্রায়ই ভাল হয় না।

পাঠাইয়া দিয়াছে। আমি ত একেবারে অবাক্! স-সাহেব মহারাজকে এই 'শুভ' সংবাদ দিতে ছুটিয়া গেলেন। দেখিতে দেখিতে এ সংবাদ দাবাগ্নির মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সকলেই তাড়াতাড়ি দৌড়াইয়া গিয়া নদীতীরে উপস্থিত হইল, কারণ সেখান হইতে মাহুতদের ক্যাম্প বেশ পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাওয়া যায়। আমরাও বাকী রহিলাম না। তথায় গিয়া ফীল্ড গ্লাস, টেলিস্কোপ প্রভৃতির সাহায্যে মত্ত হস্তীর ক্রিয়া কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। তখন সে এত ভীষণ ভাবে ক্ষেপিয়া গিয়াছে যে অন্য হস্তীরা মনুষ্য দেখিবামাত্র তাহাকে মারিতে দৌড়াইতেছে এবং মাহুতেরা যে যার হস্তী লইয়া যে দিকে পারিতেছে প্রবলবেগে পলায়ন করিতেছে।

সে যখন দেখিল আর কোন জীবই তাহার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, তখন মাহুতদের প্রত্যেক তাম্বুতে শুণ্ড প্রবেশ করাইয়া গন্ধ লইয়া অনুমানে বুঝিতে লাগিল যে তথায় কেহ লুকাইত আছে কিনা। সৌভাগ্যের বিষয় তথায় কেহই ছিল না। কেবলমাত্র একজন লোক—তাহার নিজের মাহুত—তখনও তাহার পৃষ্ঠস্থিত গদি আঁকড়াইয়া ধরিয়া যূপবদ্ধ বলির ন্যায় থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। পাঠক, একবার তাহার অবস্থা চিন্তা করুন, একবার তাহার দশায় নিজকে পতিত মনে করুন। সহচর চক্ষের উপর হস্তিপদদলিত, বিকৃত শবদেহ হস্তপদাদি বিস্তার করিয়া তখনও সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে, চক্ষুর্দ্বয় ও জিহ্বা অস্বাভাবিক ভাবে বাহির হইয়া আসিয়াছে, নাসিকা, কর্ণরন্ধ্র ও মুখগহ্বর তখনও রক্ত উদ্গিরণ করিতেছে, অস্থিপঞ্জর চূর্ণ বিচূর্ণ—সে তখনও এই নরহন্তার পৃষ্ঠারূঢ়।

হতভাগ্য মাহুত কি করিয়া এই বিপদসঙ্কুল অবস্থায় পতিত হইল, একটু খুলিয়া বলা দরকার। হস্তীটী যে সময় ক্ষেপিয়া যায়, সেই সময় একজন মাহুত তাহার উপরে বসিয়া ছিল এবং আর একজন নীচে থাকিয়া তাহার খাদ্যবস্তু কতগুলি ডালাপালা উহার সম্মুখে রাখিয়া দিতেছিল। এরূপ সময় সে কি মনে করিয়া হঠাৎ মাহুতের কোমর শুঁড় দিয়া জড়াইয়া ধরে এবং অল্পক্ষণ এদিক ওদিক টানাটানি করিয়া লোকটীকে উপুড় করিয়া ফেলিয়া একখানি বিরাট পদ তাহার পৃষ্ঠে চাপাইয়া দেয়। ফলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভবযন্ত্রণা দূর হইয়া যায়। পূর্ব্বের মাহুত তাহাকে বাঁচাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফলই দর্শে নাই। হস্তী অধিকন্তু তাহার পর্য্যন্ত সর্ব্বনাশ সাধন করিতে কৃতসংকল্প হইয়া উঠে। পা ধরিয়া টানিয়া ফেলা, ঝাড়িয়া কোন রকমে পৃষ্ঠ হইতে বিচ্যুত করা, এমন কি মাটিতে শুইয়া পড়িয়া মাহুতকে পিশিয়া মারা প্রভৃতি কোনরূপ চেষ্টারই ত্রুটি করে নাই। কিন্তু মাহুতও সকল দিক বিশেষরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক আপন কর্তৃত্ব একবারে ত্যাগ করিয়া নির্ব্বাক নিস্পন্দ ভাবে গদির মধ্যস্থানে গিয়া অবস্থান করিতে থাকে। কাযেই বেচারী এ যাত্রা রক্ষা পাইয়া যায়।

মাক্না কিছুক্ষণ এইরূপ উন্মত্তভাবে ইতস্তত: ভ্রমণ করিবার পর ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া মহারাজ আমাদের প্রত্যেককে এক একটী Big bore রাইফ্‌ল্ লইয়া প্রস্তুত থাকিতে বলিলেন এবং আমরাও সঙ্গে সঙ্গে রাইফ্‌ল্‌ধারী হইয়া বীরদর্পে চারিদিকে চৌকি দিতে লাগিলাম।

গজরাজ আমাদের দিকে কতক দূর অগ্রসর হইয়া, কি মনে করিয়া অন্য দিকে ফিরিয়া গেলেন। সেদিকে কয়েক ঘর লোকের বসতি ছিল। আমরা প্রমাদ গণিলাম। মহারাজ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কারণ গদীওয়ালা হস্তীর পৃষ্ঠে মাহুতকে বসিয়া থাকিতে দখিয়া, কেহই কোনরূপ সন্দেহ করিবেনা, সরল বিশ্বাসে সমীপবর্ত্তী হইবে। আমরা এইরূপ কল্পনা করিতেছি, এমন সময় দেখি, প্রায় ৫০ হস্ত দূরে একজন লোককে দেখিয়া মাক্না প্রবল বেগে তাহাকে তাড়াইয়া যাইতেছে এবং সেও উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতেছে। মহারাজ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, নিজে একটী রাইফ্‌ল্ কাঁধে করিয়া ও একজন আর্দ্দালির হাতে আর একটী দিয়া সেই দিকে ছুটিলেন। কিন্তু লোকটী একখানি ঘরের অন্তরালে গমন করাতে মাক্না তাহাকে আর

দেখিতে না পাইয়া ধীরে ধীরে বনের দিকে চলিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া মহারাজ ফিরিয়া আসিলেন।

সেদিন তাঁহাকে এই ব্যাপার লইয়া বড়ই উদ্বিগ্ন থাকিতে হয়। আহারাদি ভাল হয় নাই, কারণ টেবিল ছাড়িয়া অনেকবার ছুটাছুটি করিতে হইয়াছিল। অপর সকলেরও ঐ একই অবস্থা, সুতরাং সেদিন আর শিকারে যাওয়া হইল না! অন্যান্য হাতীগুলি লইয়া মাহুতেরা বনে জঙ্গলে লুকাইয়া রহিল।

বেলা অনুমান ২টার সময় তাহাদের মধ্যে এক-জন, ছাউনির অদূরে একটী চিতা বাঘ দেখিয়াছে এই সংবাদ লইয়া উপস্থিত হইল। প্রথমে মহারাজ স্বয়ংই যাইবেন স্থির করিলেন, কিন্তু সেই অবসরে পাগলা হাতী কি করে তাহার স্থিরতা নাই বলিয়া আমাকে ও য-সাহেবকে যাইতে বলিলেন। আমরা দুই জনে একটী গদীওয়ালা হাতীতে চড়িয়া চিতা শিকারে গমন করিলাম।

চিতাকে বাহির করিতে বেশী দেরী হইল না, কারণ আর কয়েকটী হাতী তাহাকে পূর্ব্ব হইতে এক-রূপ ঘিরিয়া রাখিয়াছিল বলিলেই হয়। দূর হইতে ২।৩ বার SSG গুলি চালাইবার পরেই চিতা পড়িয়া গেল। সেই সময় হঠাৎ আমার গত রাত্রির কথা মনে হইল এবং ইনিই চীৎকার করিয়া আমার সুখ নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাইয়াছিলেন বলিয়া তাহার প্রতিশোধ কামনায় একটী Paradox গুলি * ত্যাগ করিলাম ;—দ্বীপীও তন্মুহূর্ত্তে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল।

চিতা আমার হাতেই মরিল, কারণ য-সাহেব একে-বারেই আওয়াজ করেন নাই ও করিবার দরকারও হয় নাই। আর চিতার নৈশ-সঙ্গীত যতই ভীতপ্রদ হউক না কেন, তাহার আয়তন যে ক্ষুদ্র ছিল সে বিষয় কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না। বাটীতে থাকিয়াও ২।৫ ক্রোশের ভিতর Leopard মারিয়া থাকি,—আজ আবার এতদূর আসিয়াও সেই চিতাই আমার ভাগ্যে!

চিতা শিকার করিতে যাইয়া আবার এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইল। আর একটী মাকনা হাতী ও তাহার অতিবৃদ্ধ মাহুত নিকটবর্ত্তী এক জঙ্গলে লুকাইয়া-ছিল। আমরা যখন চিতা সংহারে ব্যস্ত, তখন মাহুতজী কোনও স্বভাবিক কারণে হস্তী হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন। ঠিক সেই সময় বন্দুকের কয়েকটী আওয়াজ হওয়াতে মাকনার বীর হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল এবং সে বৃদ্ধকে সেই অবস্থায় ফেলিয়া দ্রুতবেগে পাহাড়ের দিকে ছুটিয়া পলাইতে লাগিল। বৃদ্ধ মাহুত অসংযত অবস্থায় হস্তীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিছুদূর দৌড়িল বটে, কিন্তু তাহাকে ধরিতে বা আদেশ পালন করাইতে সমর্থ হইল না। যাহা হউক তাহার চীৎকার অনেকের কর্ণগোচর হওয়াতে, কয়েকজন মাহুত ছোট ছোট দ্রুতগামী হস্তী লইয়া পলায়নপর মাক্‌নার পশ্চাদ্‌গামী হইল।

আমরা ক্যাম্পে ফিরিয়া মহারাজকে এই অপূর্ব্ব সংবাদ শুনাইলাম। তিনি একটু চিন্তিত হইলেন, কারণ অনেকদিন পূর্ব্বে তাঁহার আর একটী হস্তী এই ভাবে পাহাড়ে পলাইয়া গিয়াছে, আজ পর্য্যন্ত তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। মহারাজের হস্তী সম্প্রদায়ে আজ যেন একটা মহা বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে—কেহ খুন করিতেছে—কেহ যথাইচ্ছা পলায়ন করিতেছে—সমস্তই ঘোর বিশৃঙ্খলতাপূর্ণ!

এদিকে খুনে হাতীটি নানাদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে এক পল্লীতে গিয়া উপস্থিত হইল। সুতরাং আরও অধিক প্রাণক্ষয় অসম্ভব নহে বুঝিয়া মহারাজ মাহুত-দের জমাদার দুই জনকে দুইটী রাইফ্‌ল্‌ দিয়া অশান্তকে চিরশান্তি দিবার আদেশ দিলেন। এতাবৎকাল তিনি হস্তীটীকে ধরিয়া ফেলিবারই চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা প্রায় অসম্ভব হওয়ায়, এই চরম পন্থা অব-লম্বন করিতেই বাধ্য হইলেন।

জমাদারেরা চলিয়া যাইবার পর আমাদিগকে বেশী ক্ষণ উদ্বিগ্ন ভাবে বসিয়া থাকিতে হয় নাই। কারণ পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দুইটী রাইফ্‌লের (Hall-

* Halland's D. B. Single Trigger "Paradox"

ends .465 H. V. D. B Cordite) ঘন ঘন তিনটি আওয়াজ আমাদের জ্ঞাপন করিল যে গজরাজ হয় মৃত, না হয় সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছেন।

শারীরিক ক্লেশ অনেক সময় মানসিক সংযমও আনিয়া উপস্থিত করে। উন্মত্ত হস্তী এতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ দেখিবামাত্র বহুদূর হইতেও তাড়াইয়া মারিতে যাইতেছিল। কিন্তু এইরূপ ভাবে জখম হইয়া সে বুঝিল যে, মনুষ্য নামক ক্ষুদ্র জীব একেবারে উপেক্ষার জিনিষ নহে। এই তিনটি গুলি তাহার পক্ষে যেন হিমসাগর তৈলের কার্য্য করিল এবং মনুষ্য-হিংসার পরিবর্ত্তে এখন তাহার মনে মনুষ্যভীতিই প্রবল হইল।

সেদিন রৌদ্র অত্যন্ত প্রখর হইয়াছিল এবং এই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় আহারও কাহারই ভাল হয় নাই—কাযেই সকলেই অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়িলাম। সোডা, লেমনেড, বরফ, Beer-punch প্রভৃতি অজস্র বর্ষিত হইতেছিল সত্য, কিন্তু সমস্তই "তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম" সঙ্গে সঙ্গে উপিয়া যাইতে লাগিল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে দুইটী হাতীই ধৃত ও যথাস্থানে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে শুনিয়া মহারাজ, ব-সাহেব এবং আমি তিন জনে একটী ছোট হাতীতে চড়িয়া তাহাদিগকে দেখিতে গেলাম। কি জানি, পাগলের মেজাজ পাছে আবার বিগড়াইয়া যায়, এই আশঙ্কায় মহারাজ একটি রাইফ্‌ল্‌ সঙ্গে লইলেন। কিন্তু সুখের বিষয় সেটি ব্যবহার করিতে হয় নাই। আমরা গিয়া দেখি, আহত হস্তী তখন যন্ত্রণায় অধীর হইয়া মধ্যে মধ্যে হুঁ করিয়া কাতরভাবে সমস্ত শরীর আলোড়িত করিতেছে। তিনটি গুলিই তাহার শরীরে বিদ্ধ হইয়াছিল—একটি কুম্ভে,একটি মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে এবং অপরটি পঞ্জরে। যদি স্ফোটক (express) না হইয়া নিরেট (solid) হইত তাহা হইলে এ যন্ত্রণার হাত হইতে বেচারী অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই নিষ্কৃতি পাইত।

দ্বিতীয় হস্তীকে দেখিয়া মহারাজ একবারে 'তেলে বেগুনে' জ্বলিয়া উঠিলেন। সে আরও অনেকবার এইরূপ ভাবে পলাইয়াছিল। মহারাজ তাহার পক্ষে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন ঠিক করিলেন। বুঝিলাম তিনি বিরক্ত হইয়া "দুষ্টু এঁড়ের চেয়ে শূন্য গোহালই" ভাল মনে করিতেছেন। যাহা হউক মাহুত, জমাদার, স-সাহেব ও আমাদের বিশেষ অনুরোধে ফেরারী আসামী এ যাত্রা বাঁচিয়া গেল। তবে মহারাজ তাহার পক্ষে অন্য শাস্তির বন্দোবস্ত করিলেন। তাঁহার আদেশক্রমে, সামনে পিছনে সুদৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া দক্ষিণ ও বামদিক হইতে অপর দুইটি হস্তী তাহাকে যুগপৎ ধাক্কা দিতে ও শুণ্ড দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এই প্রকার লাঞ্ছনা ভোগের পর তাহার কর্ণ মর্দ্দনের আদেশ হইল। স্কুলে পড়িবার সময় হস্তীর নহে, হস্তিমূর্খের এ শাস্তিবিধান অনেকবার দেখিয়াছি এবং নিজেও ভুগিয়াছি; আজ হাতীর কাণমলা দৃশ্য দেখিবার জন্য কৌতূহলী হইলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যে হস্তীটি কর্ণমর্দ্দন করিতে বিশেষ পারদর্শী, সেটি অসুস্থ হইয়া কোচবিহারের পিলখানায় অবস্থান করিতেছিল। কাযেই "হস্তীর কর্ণমর্দ্দন" আর দেখিতে পাইলাম না। শুনিলাম, সে আদেশ পাইবামাত্র শুঁড় দিয়া দুষ্ট হস্তীর কর্ণ জড়াইয়া ধরে এবং পড়্‌পড়্‌ করিয়া সবলে টানিতে থাকে। সে বড় সহজ ব্যাপার নয়!

মহারাজ মৃতব্যক্তির সৎকার ও তাহার পরিবারের সাহায্যকল্পে একশত মুদ্রা দানের হুকুম দিয়া ক্যাম্পে ফিরিয়া আসিলেন। উপর্য্যুপরি বিপদাপদ ঘটাতে তৎপরদিনই ক্যাম্প ভাঙ্গিবার আদেশ দিলেন।

তৎপরদিন আহারান্তে আমরা কোচবিহার রওনা হইলাম। যে পথে যে ভাবে গিয়াছি, ঠিক সেই পথে সেইভাবেই ফিরিলাম। বাসায় পৌঁছিতে বেশ একটু অন্ধকার হইয়া গেল।

স্থানে যেরূপ ঘটিয়া থাকে এক্ষেত্রেও তাহাই—আগ্রহাতিশয্য বশতঃ সকলেই বাটীর বাহিরে আসিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমি উপস্থিত হইবামাত্র বাটীর পুরুষবর্গ কি শিকার করিলাম, এবং স্ত্রীলোকগণ এ কয়দিন কি খাইয়াছি, যুগপৎ এই দুই প্রশ্নে আমাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন।

সমাপ্ত

শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী।

কুণ্ডী—রংপুর।

দার্জ্জিলিং মহাকাল মন্দির-প্রাঙ্গণে

হে রুদ্র, হে মহাকাল, হে শাশ্বত, হে শ্মশানচারী,
বিশ্বে তব মহাসত্তা অজ্ঞ আমি বুঝিতে না পারি ;
সীমাবদ্ধ রূপ তাই, হে অসীম, ধরিয়াছ শত—
মন্দিরে মন্দিরে তাই লক্ষ শির ভক্তি-সমানত।

তুষার মণ্ডিত গিরি রজচ্ছত্র ধরিয়াছে শিরে,
পদতলে শত নদী স্তবগান গাহিতেছে ধীরে,
এ নহে মরতভূমি,—এই মহাহিমাদ্রি শিখর—
লক্ষ স্বর্গ বিলুণ্ঠিত তুমি যথা আছ, মহেশ্বর।

আজি আমি, হে অনাদি, হেরিতেছি কল্পনা নয়নে
সৃষ্টিনাশ করি শেষ প্রলয়ের তাণ্ডব-নর্ত্তনে,
বিরাম লভিছ যোগী স্তব্ধ শান্ত গৈরিক আবাসে ;
আতঙ্ক-আকুল বিশ্ব চেয়ে তব জাগরণ আশে।

প্রলয় সলিল মাঝে মগ্না ধরা তব পদতলে,
সংখ্যাতীত গ্রহ ঋক্ষ ছুটাছুটি করে নভস্তলে,
জলধি-শয়ন পরে ভাসিছেন পুরুষ-পুরাণ,
নাভি-পদ্মে বসি তাঁর বিরিঞ্চি করেন বেদগান।

কল্লোল-মুখর সিন্ধু চাহি আছে জীবসৃষ্টি তরে,
সারা বিশ্ব নিঃস্বতায় বুকফাটা হাহাকার করে—
ব্যর্থতায় নিরাশায় পদ্মযোনি পাণ্ডুর বদন ;
সহসা ভাঙ্গিল ধ্যান ;—তুমি প্রভু মেলিলে নয়ন।

সুনীল জলধি হ'তে সৌন্দর্য্যের ফুলডালা হাতে,
সহসা উঠিল ধরা সদ্যস্নাতা বসন্ত প্রভাতে ;
সহসা থামিয়া গেল প্রলয়ের বিকট হুঙ্কার,
নিদ্রা হ'তে জীবগণ যেন বিশ্বে জাগিল আবার।

আজি মোর মানসের ধূলিমাখা পটের উপর
কি বিরাট চিত্র তুমি ফুটাইলে, হে চিরভাস্বর !
কি মহামহিম খেলা খেল তুমি প্রতিকল্পে শিব,
কি বুঝিব—আমি ক্ষুদ্র, আমি অণু, আমি মর্ত্ত্য জীব !

নিবেদন করি দেব বসি আজি তোমার প্রাঙ্গণে,
মুদে যবে যাবে আঁখি মরণের মৃদু পরশনে,
সারা বিশ্ব মাঝে শুধু সীমাহীন বিরাট আঁধার
রোধিবে নয়ন পথ চিরতরে, দেবতা আমার,

তোমার বরদ পদ, দয়াময়, শুধু একবার
অঙ্কিত হৃদয়পটে দেখি যেন সে সুপ্তিমাঝার—
করুণ নয়নে দেব চেও তুমি সেই শুভক্ষণে—
আর কিছু নাহি সাধ, হে ঈপ্সিত, এ ক্ষুদ্র জীবনে।

শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়।

ইচ্ছা-শক্তি

এই জড় শরীরের ভিতর যে কত অদ্ভুত শক্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহা আমরা কল্পনাতেও ধারণা করিতে পারি না। আমাদের মনে সদসৎ নির্ব্বিশেষে যে নানা প্রকার ইচ্ছার উদয় হইয়া থাকে, তাহার একটা শক্তি আছে এবং সেই ইচ্ছা-শক্তির বলে আমরা সুপথে বা কুপথে চালিত হইয়া কেহ স্বর্গের দেবতা কেহ বা নরকের কীট হইতেছি।

এই ইচ্ছা-শক্তির লীলাক্ষেত্র আমাদের মন; এবং দেহ মন সংযত করিতে পারিলে এ শক্তির সম্যক বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মনঃসংযম করা বহু শ্রম ও কষ্টসাধ্য—যোগ অভ্যাস ব্যতীত কখনও তাহা হয় না।

যোগবলে মনঃসংযম করিতে পারিলে মানুষ নিম্নলিখিত অষ্টমহাসিদ্ধি লাভ করিয়া ইচ্ছানুসারে প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

(১) অণিমা—আয়তনে বৃহৎ হইলেও ইচ্ছানুসারে ক্ষুদ্র হওয়ার সামর্থ্য।

(২) লঘিমা—গুরুভার হইলেও ইচ্ছানুসারে তুলার মত লঘু হওয়ার সামর্থ্য।

(৩) মহিমা—ক্ষুদ্র হইয়াও ইচ্ছানুসারে বৃহৎকায় হওয়ার সামর্থ্য।

(৪) প্রাপ্তি—ইচ্ছামাত্র দূরের বস্তু নিকটে লাভ করিবার সামর্থ্য।

(৫) প্রাকাম্য—ইচ্ছা শক্তির বলে পর্ব্বতাভ্যন্তরে বা ভূমিমধ্যে প্রবেশ করার সামর্থ্য।

(৬) বশিত্ব—ইচ্ছানুসারে ভূত ও ভৌতিক পদার্থ বশীভূত করার সামর্থ্য।

(৭) ঈষিত্ব—ভৌতিক পদার্থকে যেরূপে ইচ্ছা সেইরূপে রাখার সামর্থ্য।

(৮) কামাবসায়িতা—ভূত ও ভৌতিক বস্তুর উপর যখন যে শক্তির উদ্দেশে সঙ্কল্প ধারণ করা যায় সেই সকল বস্তু তখনই তদ্রূপ শক্তি বিশিষ্ট হওয়া। যোগীরা ইচ্ছা শক্তির বলে বিষকে অমৃতশক্তি সম্পন্ন এবং অমৃতকে বিষশক্তি সংযুক্ত করিয়া, মৃতজীবকে জীবিত এবং জীবিতকে মৃত করিতে পারিতেন। *

উপরে আমরা যে অষ্ট মহাসিদ্ধির কথা উল্লেখ করিলাম, তাহার আর এক নাম ঐশ্বর্য্য। এই সকল ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারিলে ভূত গুণের দ্বারা শারীরিক ক্রিয়ার প্রতিবন্ধক হয় না এবং কায়সম্পৎ অর্থাৎ শারীরিক রূপ লাবণ্য বল প্রভৃতিও নষ্ট হয় না। অগ্নি তাহার রূপকে দগ্ধ করিতে পারে না, বায়ু তাহার শারীরিক রসাদি শোষণ করিতে পারে না, জল তাহাকে পচাইতে পারে না। †

উপরি উক্ত অষ্ট মহাসিদ্ধির কথা পুস্তকগত হইয়া রহিয়াছে। প্রকৃত সংযমী যোগী ঋষি বা সন্ন্যাসিগণের সহিত আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয় না, হইলেও তাঁহারা তাঁহাদের এই ঐশ্বর্য্য দেখাইবার জন্য কখনও প্রয়াস পান না। এজন্য ইচ্ছা-শক্তির বলে মানুষ যে প্রকৃতির উপর এতখানি আধিপত্য করিতে পারে একথা সহজে কাহারও বিশ্বাস হইবে না; কিন্তু যোগবলে মানুষ যে অসীম শক্তি লাভ করিতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল হইলেও দুর্ল্লভ নয়।

রণজিত সিংহের রাজত্বকালে পঞ্জাবে কোনও একজন মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়াছিল; তিনি যথেচ্ছাকাল ভূগর্ভে বাস করিতে পারিতেন শুনিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য জেনারেল বেঞ্চুরা নামক কোন উচ্চ পদস্থ ফরাসী তাঁহাকে সিন্ধুকে পূরিয়া মৃত্তিকা খনন করিয়া প্রোথিত করিয়া রাখেন এবং মাটির উপর চাষ দিয়া যব বুনাইয়া দেন।

* পাতঞ্জল দর্শন ১৬৬ পৃষ্ঠা।

† পাতঞ্জল দর্শন ১৬৭—১৬৮ পৃষ্ঠা।

প্রাকাম্য সিদ্ধ এই মহাযোগী দশমাস কাল মৃত্তিকা মধ্যে সেই সিন্ধুকের ভিতর বাস করার পর যখন তাঁহাকে ভূগর্ভ হইতে উত্তোলন করা হয়, তখন যে কেবল তিনি জীবিত ছিলেন তাহা নহে, মাটির তলায় তাঁহাকে পুঁতিয়া রাখার সময় তাহার মূর্ত্তি তাঁহার রূপলাবণ্য প্রভৃতি কায়িক সম্পৎ ও কায়িক ধর্ম্ম অবিকৃত ছিল, কিছুই নষ্ট হয় নাই। *

অনেক দিনের কথা, সুন্দরবনে ধ্যানমগ্ন কোন যোগীর দর্শন পাওয়া যায় এবং কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে কোন বড় লোকের বাড়ীতে তাঁহাকে আনয়ন করিয়া তাঁহার ধ্যানভগ্ন করিবার জন্য নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করা হয়। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া অবশেষে তাঁহাকে গঙ্গাগর্ভে ফেলিয়া দেওয়া হয়। মাসাবধিকাল জলে ডুবিয়া থাকার পর, এক দিন ভাঁটার সময় তিনি ডাঙ্গায় পড়িয়া আছেন দেখিতে পাওয়া গেল। গঙ্গাগর্ভে তাঁহাকে নিক্ষেপ করার পূর্ব্বে তিনি যেমন ছিলেন, পরেও তেমনি ছিলেন; দীর্ঘকাল জলমগ্ন থাকার জন্য তাঁহার শরীর কিছুমাত্র ক্লিন্ন হয় নাই।

দশমাস অনশনে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় মাটীর তলায় বাস করা সত্ত্বেও কালগ্রাসে পতিত না হইয়া রূপলাবণ্য সমন্বিত হইয়া জীবিত থাকা, অগ্নিকুণ্ডের উপর দিয়া অবলীলাক্রমে যাতায়াত করা স্বত্বেও শরীর দগ্ধ না হইয়া অবিকৃত থাকা, দীর্ঘকাল জলে ডুবিয়া থাকা স্বত্বেও শরীর ক্লিন্ন না হওয়া বা পচিয়া না যাওয়া—প্রকৃতির নিয়ম বহির্ভূত এই সকল কার্য্য কখন সম্ভব হইতে পারে না। কিন্তু নিতান্ত অসম্ভব হইলেও, উপরে উদ্ধৃত দুইটী দৃষ্টান্তে অসম্ভব সম্ভবে পরিণত হইয়াছে। এই সকল ঘটনায় ভৌতিক পদার্থের উপর মানুষ যে কতখানি আধিপত্য করিতে পারে তাহার অতি সুন্দর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

* W. G. Osborne's. Court and Camp of Ranjit Sing, p. 124

এ জগতে সম্ভব কি এবং অসম্ভবই বা কি তাহা আমরা জানি না এবং আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ধারণাও করিতে পারি না। আকাশ মার্গে একটি ঢেলা নিক্ষেপ করিলে ঢেলাটী কিয়ৎদূর উর্দ্ধে উঠিয়া মাধ্যাকর্ষণের শক্তি প্রভাবে ভূপতিত হয়, কিন্তু যাহাদের কুম্ভক যোগ অভ্যাস আছে, তাহারা অনায়াসে শূন্যে বসিয়া থাকিতে পারে। বড় বেশী দিনের কথা নয়, কলিকাতায় প্রোফেসার বোসের সারকাস অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। একটী রমণী দুইটী কাষ্ঠ দণ্ডের উপর দুইখানি হাত রাখিয়া শূন্যে দণ্ডায়মানা থাকা অবস্থায় একটী কাষ্ঠ দণ্ড অপসারিত করিয়া লইলে, সে অপর কাষ্ঠ দণ্ডটী আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়াছে এবং তাহার দেহখানিকে একদিকে টানিয়া দিলে তাহার দেহ মাধ্যাকর্ষণের শক্তিকে প্রতিহত করিয়া মাটির সহিত সমান্তরাল ভাবে অবস্থিতি করিয়াছে।

প্রবীণ আর্য্য মুনিঋষিগণ যোগবলে শূন্যে বসিয়া থাকিতে পারিতেন, একথা যদি কাহারও অবিশ্বাস হয় হয় হউক, কিন্তু সামান্য বাজিকরের কুম্ভকের নিকট মাধ্যাকর্ষণের শক্তিকে পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছে।

বাজিকর তাহার গুরুভার দেহ লইয়া শূন্যে যদি ভাসমান থাকিতে পারে, তাহা হইলে যোগসিদ্ধ মহাপুরুষগণ "লঘিমা" নামক ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া ইচ্ছা শক্তির বলে তুলার মত লঘু হইবেন ইহা কিছুই অসম্ভব নয়।

যোগানুষ্ঠান দ্বারা পূর্ব্ব কথিত "বশিত্ব" ও "ঈশিত্ব" শক্তি লাভ করিতে পারিলে ভূত ও ভৌতিক পদার্থ বশীভূত করতঃ তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার অর্থাৎ ভৌতিক পদার্থকে যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ রাখার সামর্থ্য জন্মায় এবং অমৃত বলিয়া বিষ দিলেও অমৃতের ফল উৎপন্ন হয়। প্রকৃতির উপর মানুষ এতখানি আধিপত্য করিতে সমর্থ হইবে ইহা কখন সম্ভব হইতে পারে না, এবং অনেকেই একথা বিশ্বাস করিবেন না; কিন্তু হিপনটাইজ্ বা মেস্‌মেরাইজ করিতে হইলে যে নিয়ম

অবলম্বন করা হয়, তাহাতে যোগের কিছু কিছু লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়; এজন্য এই প্রক্রিয়ার দ্বারা যে এক প্রকার নিদ্রার আবির্ভাব হয় তাহার নাম যোগ-নিদ্রা দেওয়া হইয়াছে।

এই যোগনিদ্রার আবির্ভাব হইলে, যিনি হিপনটাইজ্ বা মেসমেরাইজ্ করিয়া থাকেন, তিনি সেই নিদ্রাবিষ্ট ব্যক্তিকে বশীভূত করতঃ আপন আয়ত্তাধীনে আনিয়া, তাহাকে আজ্ঞাকারী করিয়া তাহার দ্বারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করাইতে পারেন এবং যাহা ইচ্ছা তাহাই বলাইতে পারেন। তাহাকে মদ বলিয়া জল দিলে, সে সেই জল পান করিয়া মদের আস্বাদন পায় এবং তাহাতেই তাহার মাদকতা জন্মে। "তুমি বোবা হইয়াছ" বলিলে তাহার মুখ দিয়া কথা সরে না এবং "স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাক' আদেশ করিলে এক পাও অগ্রসর হওয়ার ক্ষমতা তাহার থাকে না। তাহার নাম হরি নহে, রাম, বলিয়া দিলে সে নিজের নাম ভুলিয়া রামের নামে পরিচয় দেয় এবং তাহাকে কুকুর বা বিড়াল বলিলে সে তাহাতেই রাজি হইয়া, ইতর জন্তর মত হাতে পায়ে ভর দিয়া চলিয়া যায় এবং কুকুর বিড়ালের মত ডাক আরম্ভ করিয়া দেয়।

কৃত্রিম যোগ হিপনটাইজ করিয়া যদি একব্যক্তি অপর ব্যক্তির উপর এতখানি কর্তৃত্ব করিতে পারে, তাহা হইলে যাহারা প্রকৃত যোগী, যাহাদের অষ্ট মহাসিদ্ধি লাভ হইয়াছে, তাহারা ভৌতিক পদার্থের উপর ইচ্ছামত আধিপত্য করিবে ইহা অসম্ভব নয়।

মেস্‌মেরাইজ করিয়া নানা প্রকার কঠিন কঠিন রোগ আরোগ্য করা হয় এবং সে সময় এই ইচ্ছা শক্তির অতি সুন্দর বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। মেস্‌মেরাইজ করার সময় রোগীকে তাহার রোগ নাই বলিয়া সঙ্কেত (suggestion) করা হইয়া থাকে। মায়ার্স সাহেব তাঁহার Human Personality নামক পুস্তকে বলিয়াছেন—The process of effectively impressing upon the subliminal intelligence the wishes of some other person is suggestion—অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ার দ্বারা একজনের মনের ইচ্ছা অপরের মনে চালিত ও গাঢ়ভাবে স্থাপিত করিতে পারা যায়, তাহার নাম suggestion।

মেস্‌মেরাইজ করিয়া রোগ অপনোদন করার সময় রোগীর "রোগ নাই" বলিয়া তাহাকে যে সঙ্কেত (suggestion) করা হয়, তাহা ইচ্ছাশক্তির পরিচালনা করা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

মেসমার (Mesmer) নামে কোন সাহেব এই অভিনব চিকিৎসাপ্রণালী প্রথম আবিষ্কার করেন বলিয়া তাঁহার নাম হইতে মেস্‌মেরাইজ (Mesmerise) কথার উৎপত্তি হইয়াছে; আমাদের দেশে কিন্তু এই চিকিৎসা-প্রণালী অনেক দিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। আমাদের দেশে ওঝারা ঝাড়িয়া ব্যারাম আরোগ্য করিয়া থাকে।

মেস্‌মেরাইজ করা ঝাড়িয়া দেওয়ার নামান্তর মাত্র; শরীরের উপর পাস (pass) দিয়া অর্থাৎ হস্তচালনা করিয়া মেস্‌মেরাইজ করা হয়; আর ওঝারা গায়ে হাত বুলাইয়া ঝাড়িয়া দেয়; মেস্‌মেরাইজ করার সময় রোগীকে যেমন তাহার রোগ নাই বলিয়া suggestion করা হইয়া থাকে, ঝাড়িয়া দেওয়ার সময় ওঝারাও বলিয়া থাকে "নাই।" এই "নাই" কথার তাৎ-পর্য্য যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে রোগীর রোগ আর নাই বলিয়া ওঝারা সঙ্কেত করিয়া থাকে এবং ওঝার সেই সঙ্কেতমত রোগী আরোগ্য হইয়া যায়।

আমাদের দেশের অধিকাংশ ওঝাই অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর লোক। তাহারা লেখাপড়া জানে না এবং ঝাড়িয়া দেওয়ার সময় কেন "নাই" বলে, তাহার তাৎপর্য্যও তাহারা বুঝাইতে পারে না। শিক্ষিত সমাজ এজন্য তাহাদের কার্য্যে বা কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না। কিন্তু মেস্‌মেরাইজ করিয়া suggestion করিলে যদি রোগ আরোগ্য হয়, তাহা হইলে ওঝারা ঝাড়িয়া দেওয়ার সময় "নাই" বলিলে কেন না হইবে? বাক্য উপযুক্ত রূপে প্রয়োগ করিতে পারিলে, ইতর বা ভদ্র যাহার মুখ দিয়াই বাহির হউক, সে বাক্যের একটা শক্তি থাকে—

The power of the word is a literal scientific fact The spoken word is nothing more nor less than the outward expression of the workings of the interior force. The spoken word is then in a sense, the means whereby the thought forces are focussed and directed along any particular line, and this concentration, this giving them direction, is necsesary before any outward or material manifestation of their power can become evident.

In Tune with the Infinite, p 25.

অর্থ—বাক্যের যে মহতী শক্তি আছে, ইহা বিজ্ঞান অনুমোদিত সত্য কথা ; আমাদের মনে কোন একটী ভাবের উদয় হইয়া হৃদয়ের অন্তস্তলে যেরূপে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা প্রকাশ করিতে বাক্যই একমাত্র উপায়। ভাবশক্তিকে সংযত এবং কেন্দ্রীকৃত করিয়া কোন এক নির্দ্দিষ্ট দিকে চালিত করিতে পারিলে তখন তাহার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

ঝাড়িয়া দেওয়ার সময় রোগীর রোগ অপনোদন করিবার জন্য ওঝার মনে যদি প্রগাঢ় একটা ভাব বা ঐকান্তিক একটা ইচ্ছা জন্মে, এবং সেই সময় তাহার "রোগ আর নাই" এই কথাটা যদি অন্তরের সহিত বলিতে পারা যায়, তাহা হইলে এই "নাই" কথার দ্বারা তাঁহার ভাব-শক্তি (Thought force) বা ইচ্ছাশক্তি (will-force) রোগীর মনে পরিচালিত হইয়া তাহার রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

মেস্‌মার সাহেবের তাহাই হইয়াছিল। তিনি চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ছিলেন। কোন সময়ে তিনি কোন রোগীর হাতে অস্ত্রচিকিৎসা করিলে বেগে রক্ত পড়িতে থাকে ; অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও রক্ত বন্ধ করিতে না পারিয়া, তাহার মনে ভয় এবং ভাবনা হইল, হয়ত তিনি রোগীটীকে অস্ত্র-চিকিৎসা [illegible] ফেলিয়াছেন। রক্ত বন্ধ করিবার জন্য তিনি যে সমস্ত ঔষধাদি প্রয়োগ করিতেছিলেন তাহাতে কোনই ফল হইল না দেখিয়া, সে সমস্ত দূরে নিক্ষেপ করতঃ, রোগীর ক্ষতস্থানে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতেছেন ও সেই সঙ্গে তাহার রক্ত বন্ধ হওয়া একান্ত মনে কামনা করিতেছেন, এমন সময় স্রোতের ধারায় যে রক্ত বাহির হইতেছিল, হঠাৎ তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল, ক্ষতস্থানে আর বিন্দুমাত্র রক্ত নাই। দেখিয়া মেসমার চমৎকৃত হইলেন এবং ইহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। অতঃপর আর তিনি জীবনে কখনও কোনও প্রকার ঔষধ ব্যবহার করেন নাই ; রোগীর গায়ে হাত বুলাইয়া এবং ইচ্ছাশক্তি পরিচালনা করিয়া যেমনই কেন কঠিন রোগ হউক না তাহা আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন।

আমাদের দেশেও যখন ঝাড়িয়া দেওয়ার নিয়ম প্রথম প্রচলিত হয়, তখন ইচ্ছা-শক্তি পরিচালন করিবার ব্যবস্থা ছিল। অশিক্ষিত ওঝারা তাহা ভুলিয়া গিয়াছে ; ঝাড়িয়া দেওয়ার সময় "নাই" বলিতে হয় ইহাই জানিয়া রাখিয়াছে।

ইচ্ছা-শক্তির বলে সিদ্ধ পুরুষগণ এই স্থূল শরীর পরিত্যাগ করতঃ সূক্ষ্মশরীরে দেশ দেশান্তর পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন।

ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের অন্তর্গত ফিলাডেল্‌ফিয়া নগরের অনতিদূরে মরিস টুলিং নামে কোন একজন বিদেশী পুরুষ আসিয়া সামান্য কিছু দিনের জন্য বাস করিতে থাকেন। তাঁহার চাল-চলন কেমন অদ্ভুত রকমের ছিল। তিনি কাহারও বাড়ী যাইতেন না এবং তাঁহার বাড়ীতেও বড় কেহ যাতায়াত করিত না। অনেক সময় তিনি দরজা বন্ধ করিয়া একা আপন মনে কি করিতেন, দুইদশদিন বাহিরে আসিতেন না, এবং সে সময় কেহ তাঁহার বাড়ীতে গেলে তাঁহার সহিত দেখা হইত না। তাঁহার ঘরে অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি ছিল এবং ভারতবর্ষ হইতে ডাকে তাহার নামে পত্রাদি আসিত ;—এজন্য লোক মনে করিত তিনি ভারতবর্ষীয়।

টুলিঙের পাড়ায় হ্যাকেট (Hacket) নামে এক ব্যক্তির বাসগৃহ ছিল, তিনি কোন জাহাজের কাপ্তেনের কায করিতেন। অনেক দিন হ্যাকেটের কোন সংবাদ না পাইয়া তাঁহার স্ত্রী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন; এই সময় কোন প্রতিবেশী তাঁহাকে টুলিঙের নিকট গিয়া স্বামীর সংবাদ আনিতে পরামর্শ দিল।

হ্যাকেট পত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহার নিকট কি করিয়া স্বামীর সংবাদ পাওয়া যাইবে ?"

প্রতিবেশিনী উত্তর করিল, "ভারতবর্ষের লোক ভূত ভবিষ্যৎ গণনা করিতে জানে; তোমার স্বামীর সংবাদ সে নিশ্চয়ই গণনা করিয়া বলিয়া দিতে পারিবে।"

এই কথা শুনিয়া হ্যাকেট-পত্নী একদিন টুলিঙের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। টুলিং তাঁহাকে বলিলেন—"আপনাকে কিছুক্ষণ এই স্থানে অপেক্ষা করিতে হইবে; আমি যদি পারি আপনার স্বামীর সংবাদ আনিয়া দিতেছি।"—এই বলিয়া টুলিং পার্শ্বের ঘরে প্রবেশ করিলেন।

বেলা তখন তিনটা। হ্যাকেট পত্নী একা এক ঘরে বসিয়া আছেন, সে বাড়ীতে জন-মানবের সহিত দেখা সাক্ষাৎ নাই, চারিদিক নিস্তব্ধ, কেবল মাথার উপর একটী ঘড়ি টিক্ টিক্ করিতেছিল।

চারিটা বাজিল, পাঁচটা বাজিল, টুলিং ঘর হইতে বাহির হইলেন না। হ্যাকেট পত্নীর আর ধৈর্য্য থাকিল না; তিনি ধীর পাদবিক্ষেপে, যে ঘরে টুলিং প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই ঘরের দুয়ারে যাইয়া উকি দিয়া দেখিলেন ঘর অন্ধকার, উপরে ছোট ছোট গবাক্ষ দিয়া সামান্য আলোক প্রবেশ করিতেছে এবং টুলিং একখানি চৌকির উপর মড়ার মত পড়িয়া আছেন।

হ্যাকেট-পত্নীর মনে ভয় হইল; তিনি চেয়ারে আসিয়া বসিলেন এবং বাড়ী ফিরিবেন কিনা চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময় টুলিং ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"আপনার স্বামী ভাল আছেন; এই মাত্র লণ্ডনে কোনও কাফি হাউসে তাঁহার সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। আপনার কথা তাঁহাকে আমি বলিলাম। তাঁহার অনেক বিপদ আপদ গিয়াছে এজন্য আপনাকে তিনি পত্র লিখিতে পারেন নাই। শীঘ্রই তিনি বাড়ী আসিবেন। লণ্ডন হইতে প্রথম যে জাহাজ ছাড়িবে সেই জাহাজে তিনি বাড়ী ফিরিবেন।"

টুলিঙের কথা শুনিয়া হ্যাকেট-পত্নী অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলেন। কোথায় ফিলাডেল্‌ফিয়া আর কোথায় লণ্ডন! লণ্ডনে স্বামীর সহিত এই মাত্র দেখা হইয়াছিল ইহাও কি সম্ভব!

হ্যাকেট-পত্নীর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া টুলিং আবার বলিলেন, "আমার কথা আপনার বিশ্বাস হইতেছে না, কিন্তু একবর্ণও আপনাকে আমি মিথ্যা বলি নাই। আপনার স্বামী শীঘ্রই বাড়ী ফিরিয়া আসিবেন; আপনি আমার এই কথা বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।"

হ্যাকেট-পত্নী ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী ফিরিলেন। টুলিঙের কথা তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, আবার অবিশ্বাস করিতেও ইচ্ছা হইল না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটিয়া গেল, স্বামী ফিরিয়া আসিলেন না। তখন টুলিঙের উপর হ্যাকেট পত্নীর মনে মনে রাগ হইল; তিনি স্থির করিলেন, টুলিং মিথ্যাবাদী—টুলিং প্রতারক।

ইহজীবনে স্বামীর সহিত পুনরায় দেখা হওয়ার আশা স্ত্রীর মন হইতে বিদূরিত হইয়াছে, এমন সময় একদিন রাত্রে কাপ্তেন হ্যাকেট হঠাৎ বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। হারানিধি পাইয়া স্ত্রীর মনে আনন্দের সীমা নাই। স্বামী তাঁহার বিপদ আপদের কথা সমস্তই বলিলেন। টুলিঙের মুখে তাঁহার যে সকল বিপদ আপদের কথা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন, আজ স্বামীর মুখে সেই সকল কথা আবার শুনিলেন। কিন্তু টুলিং কোন্ শক্তি-বলে স্বামীর সহিত লণ্ডনে দেখা করিয়া তাঁহার বিপদের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিবার আজ আর সময় হইল না,—অন্যান্য কথায় রাত্রি কাটিয়া গেল।

পরদিন মিঃ হ্যাকেট ও তাঁহার স্ত্রী উভয়ে কোনও আত্মীয়ের সহিত দেখা করিতে যাইতেছিলেন, পথে হঠাৎ টুলিঙের সহিত তাঁহাদের দেখা হইল। মিঃ হ্যাকেট দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন, কিন্তু টুলিং কোন কথা না বলিয়া পাশ কাটিয়া অতি দ্রুত বেগে চলিয়া গেলেন। তাঁহার এই ব্যবহারে হ্যাকেট বিস্মিত হইয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "আমি দেশে আসার পূর্ব্বে লণ্ডনে এক কাফি-হাউসে এই ভদ্রলোকটির সহিত আমার দেখা হইলে, তোমার প্রতিবেশী বলিয়া পরিচয় দিয়া তোমার সম্বন্ধে আমাকে কত কথা বলিল, কত আলাপ পরিচয় করিল, আমার আপদ-বিপদের কথা সমস্ত আমি ইহাকে জানাইয়াছিলাম—এখানে ফিরিয়া আসিয়া ও কি তোমাকে সে সকল কথা কিছু জানায় নাই?"

স্ত্রী। সমস্তই জানাইয়াছে।

হ্যাকেট বিস্মিত ভাবে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিলেন,"এ ব্যক্তির সহিত আমার দেখা, সাক্ষাৎ হওয়ার পর লণ্ডন হইতে প্রথম যে জাহাজ ফিলাডেলফিয়া মুখে রওনা হইয়াছে, আমি সেই জাহাজে আসিয়াছি। তৎপূর্ব্বে সেখান হইতে আর কোন জাহাজ এদিকে আসে নাই। এখানে আসিতে হইলে, আমি যে জাহাজে আসিয়াছি, ইহাকেও সেই জাহাজে আসিতে হইয়াছে। কিন্তু জাহাজে ইহাকে আমি দেখি নাই। আমার আগে এ ব্যক্তি কি করিয়া আসিল এবং আমার কথা তোমাকে কি করিয়া বলিল?"

স্ত্রী তখন টুলিঙের সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা হওয়ার বিষয় আনুপূর্ব্বিক স্বামীর নিকট প্রকাশ করিলেন। *

দুই শতাব্দী পূর্ব্বের আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেছি। রচেষ্টার নিবাসিনী মেরি নাম্নী কোন ভদ্রমহিলা পীড়িত হইয়া ৯ মাইল দূরে তাঁহার পিত্রালয়ে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার ছোট ছোট দুইটী শিশু সন্তানকে বাড়ীতে একজন পরিচারিকার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। মেরির পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইলে তিনি তাহার ছেলে দুটীকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলেন এবং তাঁহাকে বাড়ি লইয়া যাইবার জন্য স্বামীকে বারবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তখন তাঁহার উত্থানশক্তি রহিত—তাঁহাকে বাড়ী লইয়া যাইবার কোন উপায় হইল না।

একদিন রাত্রি দুইটা বাজিবার কিছু পূর্ব্বে মেরি হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন; তাঁহার শরীর অবশ ও চক্ষু পলকশূন্য হইয়া গেল। সকলেই মনে করিল তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু রাত্রি প্রভাত হইলে দেখা গেল, তাঁহার আবার জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছে।

মেরির জ্ঞান হইলে তিনি তাঁহার মাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা,কাল শেষ রাত্রে আমি বাড়ী গিয়াছিলাম; দেখিলাম আমার বড় ছেলেটী এক ঘরে আর ছোট ছেলেটী অন্য ঘরে চাকরাণীর কোলে শুইয়া ঘুমাইতেছে—তাহারা ভাল আছে।"

মা কোন উত্তর করিলেন না। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, ছেলেদের দেখিবার জন্য মেয়ের বড় ইচ্ছা হইয়াছিল, তাই সে নিদ্রিত অবস্থায় ঐ স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবে।

এদিকে সেই রাত্রে রচেষ্টারের বাড়ীতে তাঁহার চাকরাণীর হটাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে সে দেখিতে পাইল, যেন তাহার প্রভুপত্নী মেরি পার্শ্বের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছেন। এই পার্শ্বের ঘরে তাঁহার বড় ছেলেটী শয়ন করিয়া ছিল,ঘরের দুয়ার খোলা ছিল। মাঝের ঘরে চাকরাণী ছোট ছেলেটিকে কোলে করিয়া ঘুমাইতেছিল। মেরি ছোট ছেলেটীর শয্যাপার্শ্বে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিলেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহার মুখ নড়িতেছিল কিন্তু কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই; এই সময় ঘড়িতে দুইটা বাজিতে শুনা গিয়াছিল। ঘরের মধ্যে মেরিকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া চাকরাণীর মনে অত্যন্ত ভয়

* Shadows around Us, p. 76.

হইল ; চাকরাণী বলিয়া উঠিল, "ভগবানের নাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি কে ?"

এই কথা বলার পর সে মূর্ত্তি কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। রাত্রি প্রভাত হইলে চাকরাণী, মেরির আত্মীয়া একজন প্রতিবেশিনীর বাড়ী যাইয়া পূর্ব্ব রাত্রের ব্যাপার সমস্ত তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলে তিনি কোন কথাই বিশ্বাস করিলেন না। চাকরাণী স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবে ভাবিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন।

সেই দিন অপরাহ্ণে প্রতিবেশিনীর নিকট সংবাদ আসিল, মেরি বড় পীড়িতা, আর রক্ষা পায় না।

এই প্রতিবেশিনীর সহিত মেরির বড় ভালবাসা ছিল ; তিনি এই সংবাদ পাওয়ামাত্র মেরির সহিত শেষ দেখা করিবার জন্য বাড়ী হইতে যাত্রা করিলেন এবং তাহার পিত্রালয়ে যাইয়া উপস্থিত হওয়ার অব্যবহিত কাল পরেই মেরির মৃত্যু হইল।

প্রতিবেশিনী কথা প্রসঙ্গে মেরির মার নিকট শুনিয়াছিলেন, পূর্ব্ব রাত্রে মেরি তাহার ছেলেদের দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছিল এবং নিদ্রিত অবস্থায় ছেলেদের সহিত দেখা করিবার জন্য বাড়ী গিয়াছিল। প্রতিবেশিনী প্রাতে চাকরাণীর মুখে যে কথা শুনিয়াছিলেন, এক্ষণে মেরির মার মুখেও সেই কথা শুনিতে পাইলেন।

এই ঘটনার বিষয় ধর্ম্মযাজক টিলসন (Tilson) সাহেবের কর্ণগোচর হইলে তিনি মেরির পিতামাতা, ধাত্রী, চাকরাণী এবং প্রতিবেশিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়া, অন্য এক জন ধর্ম্মযাজক রিচার্ড ব্যাক্‌ষ্টার সাহেবকে লিখিয়া পাঠান। *

ছেলেদের দেখিবার জন্য মেরির মনে যে প্রগাঢ় ইচ্ছা জন্মিয়াছিল, সেই ইচ্ছা শক্তির বলে জীবাত্মা তাহার স্থূল দেহ পরিত্যাগ করতঃ সূক্ষ্ম দেহে ছেলেদের নিকট যাইয়া তাহাদের দেখিয়া আসিয়াছিল।

শুনিতে পাওয়া যায়, পুরাকালে কোন কোন ব্যক্তি ইচ্ছা শক্তির বলে নানা রূপ ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিতে পারিতেন, এবং অপর কোন ব্যক্তি বা বস্তুকেও অন্য রূপে বা অন্য আকারে পরিণত করিতে সমর্থ হইতেন। সীতাহরণ কালে মারীচের হরিণরূপ ধারণ করার কথা, মায়াসীতা বধের কথা, কালনেমির মায়া আশ্রমের কথা আমাদের রামায়ণাদি গ্রন্থে আছে। অনেকেই বলিবেন এসকল কথা কবির কল্পনা মাত্র ; কিন্তু এ প্রকার প্রবাদ যে কেবল আমাদের দেশেই আছে তাহা নহে, অন্যান্য দেশেও আছে।

ওডিন ধর্ম্ম সংক্রান্ত যে সকল জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে তাহার সমালোচনা করার কালে স্যাক্‌সা গ্র্যাফেটিকস্ বলিয়াছেন—

"অতি প্রাচীনকালে মগি পণ্ডিতগণ প্রকৃত অবস্থা গোপন করতঃ ইচ্ছামত যে কোন রূপ বা আকার ধারণ করিতে পারিতেন এবং অপরকেও যে কোন আকার দিয়া জন সাধারণের নিকট উপস্থিত করিতে সমর্থ হইতেন।"

শাকদ্বীপ নিবাসী ভোজক ব্রাহ্মণগণকে মগি বলিত। তাঁহারা মহাজ্ঞানী এবং নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। এই সকল ভোজক ব্রাহ্মণগণ ভারতবর্ষে আসিয়া তাঁহাদের অলোকসামান্য যে সকল জ্ঞান ও বিদ্যা প্রচার করেন, তাহাই তাঁহাদের নাম অনুসারে ভোজবিদ্যা নামে প্রচলিত হইয়াছে। (বিশ্বকোষ)

ইংরাজিতে ভোজবিদ্যার নাম ম্যাজিক দেওয়া হইয়াছে এবং মগিদিগের নাম অনুসারে মগীয়বিদ্যা বা ম্যাজিক শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

ম্যাজিক অর্থে ইন্দ্রজাল এবং চলিত কথায় ভেল্‌কি বাজি বুঝায় ; এই ভেল্‌কি বাজি ভোজবিদ্যার অন্তর্ভূত হইলেও, শান্তিকর্ম্ম বশীকরণ স্তম্ভন বিদ্বেষণ উচ্চাটন মারণ প্রভৃতি ষট্‌কর্ম্ম এই বিদ্যার প্রধান অঙ্গ।

অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় এই ষট্‌কর্ম্মের প্রত্যেকটীর মূলে ইচ্ছাশক্তি নিহিত রহিয়াছে। এই ষড়বিধ কর্ম্ম সাধনের জন্য দেবতাবিশেষের আরাধনা করিবার বিধান

* Certainly of the World of Spirits Ch. VII, pp. 147—157.

আছে, সে সকল বিষয় এখানে উল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

যে কর্ম্মদ্বারা কোন কুকৃত্যাদি দোষ নষ্ট করা যায় তাহার নাম শান্তিকর্ম্ম। দেবার্চ্চনা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন আমরা যে সকল নিত্যকর্ম্ম করিয়া থাকি, প্রত্যেক কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে আমরা সঙ্কল্প করিয়া লই। এই সঙ্কল্প কামনা বা ইচ্ছা ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই সঙ্কল্প করিতে ভুল হইলে বা মনে প্রাণে সঙ্কল্প করিতে না পারিলে কোন কার্য্যেই সিদ্ধিলাভ করা যায় না।

শান্তিকর্ম্ম করিলে রোগ, বা কুকৃত্যাদি দোষ নষ্ট হয়, এ কথা হয়ত অনেকেই বিশ্বাস করিবেন না। কিন্তু রোগ অপনোদন বা কুকৃত্যাদি হেতু পাপ বিমোচন করার উদ্দেশ্যে এই প্রকার কোন দৈবক্রিয়া করিতে হইলে দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে হয়। যাঁহারা সঙ্কল্প করিতে জানেন না, নিজের ইচ্ছাশক্তি অপরের মনে পরিচালনা করিবার যাঁহার ক্ষমতা হয় না, তাঁহাদের এই দৈব কার্য্যে সফলতা লাভ করিবার কোন সম্ভাবনাও নাই।

পূর্ব্বে মগি নামক ভোজক ব্রাহ্মণগণ এই শান্তিকর্ম্মে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়া গিয়াছেন এবং এক্ষণেও যাঁহারা পরের মঙ্গল কামনায় পবিত্র ও শুদ্ধান্তকরণে দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া শান্তিকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ফল দেখাইতে পারেন। কিন্তু এ প্রকার লোকের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিতেছে।

মেসমেরাইজ করিয়া Suggestion অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি পরিচালনা করিলে ও অশিক্ষিত ওঝারা ঝাড়িয়া "নাই" বলিয়া ছাড়িয়া দিলে যদি রোগ আরোগ্য হয়, তাহা হইলে পবিত্রচেতা ব্রাহ্মণগণ সঙ্কল্প করিয়া শান্তি কর্ম্ম করিলে রোগ অপনোদন হইবে ইহা কিছুই অসম্ভব নহে।

যে প্রক্রিয়া দ্বারা প্রাণিগণ বশীভূত হয়, তাহাকে বশীকরণ এবং যাহাতে প্রাণীর প্রবৃত্তি রোধ হয়, তাহাকে স্তম্ভন বলে। মগিপণ্ডিতগণ কি উপায়ে এই বশীকরণ ও স্তম্ভন কার্য্য সম্পন্ন করিতেন তাহা আমরা অবগত নহি; কিন্তু একব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বশীভূত করিয়া তাহাকে নিজের আয়ত্তাধীনে আনিয়া তাহার দ্বারা যাহা ইচ্ছা বলান, করান, তাহাকে বোবা সাজাইয়া রাখা প্রভৃতি ঘটনা হিপ্‌নটিজম আবিষ্কৃত হওয়ার পর আর বিরল নহে। ইচ্ছাশক্তির এই অদ্ভুত কার্য্য সর্ব্বদাই দেখা যাইতেছে।

যে উপায় দ্বারা পরস্পর প্রণয়ী ব্যক্তিদিগের প্রণয়ভঙ্গ হইয়া উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিদ্বেষণ বলে। যে কর্ম্ম দ্বারা কোন ব্যক্তিকে স্বীয় দেশ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারা যায় তাহাকে উচ্চাটন এবং যাহাতে একজনের বিনাশ সাধন করা যায় তাহাকে মারণ কহে। এই কার্য্যগুলি অতিশয় গর্হিত, এজন্য কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন, মগিপণ্ডিতগণ পার্থিব এবং অপার্থিব নানা বিষয়ে বহুজ্ঞান সঞ্চয় করিয়া বিদ্বেষণ উচ্চাটন ও মারণ বিদ্যালাভ করিবার জন্য কেন এত প্রয়াসী হইয়াছিলেন? একই কাষ অবস্থানুসারে মন্দ এবং ভাল হইয়া থাকে। কোন দুই ব্যক্তির মধ্যে অবৈধ প্রণয় সঞ্চার হইলে, সে অবস্থায় তাহাদের জাতি কুল সম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্য যদি তাহাদের মধ্যে বিদ্বেষ ভাব জন্মাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে বিদ্বেষণ বিদ্যাকে মন্দ বলা যায় না এবং দেশের শত্রুকে দেশ হইতে ভ্রষ্ট করা বা এককালে মারিয়া ফেলারও প্রয়োজন হইতে পারে; এ জন্য সে অবস্থায় উচ্চাটন ও মারণ বিদ্যাকে গর্হিত বলা যায় না।

যাহা হউক, ভোজক ব্রাহ্মণদিগের এই সকল অসাধারণ বিদ্যা ছিল এবং ইচ্ছা করিলে তাঁহারা এই সকল বিদ্যাবলে বিদ্বেষণ উচ্চাটন মারণাদি কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেন।

মগিদিগের উদ্ভাবিত বিদ্যাসকল এশিয়া ও ইউরোপের নানা স্থানে প্রচারিত হইয়াছিল। মারীচের হরিণ-রূপ ধারণের ন্যায় প্রবাদবাক্য পাশ্চাত্য দেশেও প্রচলিত আছে। সেনাদ্বীপ নিবাসী ড্রুইড্ রমণীগণ ইচ্ছানুসারে যে কোন জীব জন্তুর আকার ধারণ করিতে

পারিতেন। আমেরিকায় গোমেজ ও গোঞ্জালেজের (Gomes and Gonzalez) নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আছে ; তাঁহারা ইচ্ছামত যে কোন জন্তুর আকার ধারণ করিতে সমর্থ হইতেন। কোনও সময় তাঁহারা কোন ভীষণ জন্তুর আকার ধারণ করিয়া উপস্থিত হওয়ায়, জন্তু ভ্রমে তাঁহাদের উভয়কেই গুলি করিয়া মারিয়া ফেলা হয়।

মঁসিয় ইউসিব্‌ সালভার্ট Monsieur Eusibe Salverte মহাজ্ঞানী কিন্তু ঘোর নাস্তিক লোক ছিলেন ; তিনি কিছুই বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু মানুষ যে এক রূপ হইতে অন্য রূপ বা এক আকার হইতে অন্য আকার ধারণ করিতে পারে, ইহা তিনি এককালে অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই।

Night side of Nature, ২৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—Monsieur Eusibe Salverte, the most determined of rationalistic sceptics, admits that we have nnmerous testimonies to the existence of an art, which he confesses himself at some loss to explain, although the opposite quarters from which the accounts of it reach us render it difficult to imagine that the historians have copied each other.

অর্থাৎ—ভোজবিদ্যার ন্যায় কোন একটী বিদ্যা প্রচলিত থাকা সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে এত ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এই বিদ্যাটী যে কিছুই নয়,—একজন ঐতিহাসিক অপর কোন ঐতিহাসিকের বর্ণনা কেবলমাত্র নকল বা উদ্ধৃত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন—ইহা ধারণা করা কখন সঙ্গত হইবে না।

অতীন্দ্রিয় দর্শনশক্তি, অতীন্দ্রিয় শ্রবণশক্তি, ভাব শক্তি প্রভৃতি অন্যান্য আধ্যাত্মিক শক্তির ন্যায় এই ইচ্ছা শক্তিও আমাদের মৃত্যুর পর প্রবল হয়। জীবাত্মাগণ সূক্ষ্ম শরীরে আপনাপন প্রবৃত্তি অনুসারে যে কোন রূপ বা যে কোন আকার ধারণ করতঃ আত্মীয় স্বজনের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন এবং ইচ্ছা শক্তির বলে তাঁহারা অন্য যে কোন কার্য করিতেও সমর্থ হন।

"সূক্ষ্ম-শরীর" শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছি, সিপাহী বিদ্রোহের সময় লক্ষ্ণৌ সহরে স্বামীর বক্ষে গোলা লাগিয়া তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার জীবাত্মা সেই গুলির চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া সৈনিকের পোষাকে তৎক্ষণাৎ বিলাতে যাইয়া নিজ স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

"পন্থা" নামক মাসিক পত্রে পড়িয়াছি, বাঙ্গালায় গঙ্গাতীরে যখন পিতার মৃতদেহ চিতায় দাহ হইতেছিল, সেই সময় তাঁহার জীবাত্মা অর্দ্ধদগ্ধ কলেবরে বেরেলিতে যাইয়া পুত্রের সহিত দেখা করিয়াছিলেন।

ফিনিকস (Finicus) ও মার্কেটস (Mercatus) নামক দুই বন্ধু এক সময়ে পরলোক সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে উভয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে অগ্রে যাহারই মৃত্যু হউক, যদি পরলোক থাকে, তাহা হইলে তিনি অপরের নিকট উপস্থিত হইয়া সেই বিষয় জানাইয়া দিবেন।

এই ঘটনার পর এক দিন প্রাতে মার্কেটস তাঁহার ঘরে বসিয়া পড়াশুনা করিতেছেন, এমন সময় পথে কে যেন ঘোড়া ছুটাইয়া আসিতেছে শুনিতে পাইলেন ; তাঁহার দ্বারদেশে আসিয়া ঘোড়াটী যেমন থামিল, সেই সঙ্গে ফিনিকস্‌ যেন তাঁহাকে উচ্চৈস্বরে ডাকিয়া বলিলেন, "মার্কেটস্‌—ও মার্কেটস্‌, যে বিষয় তর্ক হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ সত্য।"

এই কথা শুনিয়া মার্কেটস্‌ তাড়াতাড়ি জানালা খুলিয়া দেখেন, তাহার প্রিয় বন্ধু ফিনিকস্‌ একটী সাদা ঘোড়ায় চড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন ; মার্কেটস্‌ তাঁহার নাম ধরিয়া কত ডাকিলেন কিন্তু ফিনিকস্‌ কোন উত্তর না দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া গেলেন।

অতঃপর মার্কেটস্‌ অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছিলেন, যে সময় ফিনিকসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, ঠিক সে সময় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

Night side of Nature, p. 265.

কোন কোন ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় যে প্রকার পোষাক পরিধান করিতেন, মৃত্যুর পর তাঁহার জীবাত্মাকে ঠিক সেই পোষাকে উপস্থিত হইতে দেখা গিয়াছে; কখনও কোন মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া না গেলেও তাহার পায়ের শব্দ বা জুতার শব্দ শুনিতে পাওয়া গিয়াছে।

কোন একজন সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তি দীর্ঘকাল যাবত পীড়িত হইয়া শয্যাগত থাকার পর, স্থান ও বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে দেশান্তরে পাঠান হয় এবং তাঁহার অনুপস্থিতি কালে বাড়ীতে তাঁহার এক ভগিনীর সন্তান হয়। ভগিনী একজন বহুদিনের প্রাচীনা দাসীর তত্ত্বাবধানে বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন।

ভগিনী সূতিকাগৃহে নিদ্রা যাইতেছেন এবং দাসী পার্শ্বের ঘরে বসিয়া তাঁহাকে পাহারা দিতেছে, এই সময় সে শুনিতে পাইল যেন তাহার প্রভু সিঁড়ি দিয়া নীচের তালা হইতে উপরে উঠিতেছেন।

প্রভু দীর্ঘকাল যাবত পীড়িত থাকার জন্য প্রায় তাঁহার জুতা পায়ে দেওয়া ঘটিয়া উঠিত না, এজন্য জুতা যোড়াটী প্রায় শুকাইয়া থাকিত এবং যখনই তিনি তাহা ব্যবহার করিতেন, তখনই জুতার একটা ক্যাঁচ্‌ ক্যাঁচ্‌ শব্দ হইত,—সে শব্দ বাড়ীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শুনা যাইত।

আজ জুতার সেই ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ শুনিয়া দাসী মনে করিল তাহার প্রভু আসিয়াছেন; সে তাড়াতাড়ি আলো লইয়া অগ্রসর হইয়া গেল।

দাসী আলো হাতে করিয়া আগে আগে যাইতেছে, পশ্চাৎ পশ্চাৎ জুতার শব্দ হইতেছে—প্রভুর ঘর পর্য্যন্ত যাইয়া দাসী দাঁড়াইল এবং সেই জুতার শব্দও থামিয়া গেল। দাসী তখন পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে, প্রভু নাই।

পরে জানা গিয়াছিল, ঠিক সেই সময় লিস্‌বন নগরে প্রভুর মৃত্যু হইয়াছিল।

Night side of Nature p. 264.

মৃত্যুর পর আত্মিকেরা এই জড় দেহ পরিত্যাগ করতঃ সূক্ষ্মশরীরে পরলোকে যাইয়া বাস করিয়া থাকেন। সেখানে জড় পদার্থে গঠিত আমাদের এ অবয়ব থাকে না এবং আমাদের জড় দেহে গুলির আঘাত লাগিয়া থাকিলে, বা আমাদের চিতায় দাহ করিলে সূক্ষ্ম শরীরে তাহার কোন দাগও লাগে না। এখানে আমরা যে পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করি বা যে গাড়ী ঘোড়া ব্যবহার করি, তাহাও কিছু আমাদের সঙ্গে যায় না। আত্মিকগণ নিজের পরিচয় দেওয়ার জন্য, ইচ্ছাশক্তির বলে পার্থিব কলেবর ধারণ করতঃ, মর্ত্ত্য লোকে তাঁহারা যে পোষাক পরিচ্ছদাদি ব্যবহার করিতেন, সেই পোষাকে আত্মীয় স্বজনের সহিত দেখা করিয়া থাকেন। চির পরিচিত জুতার শব্দ, পায়ের শব্দ বা অন্যান্য কোন সঙ্কেত করিয়া তাঁহাদের আগমন বার্ত্তা জানাইয়া দেন।

অতীন্দ্রিয় দর্শন ও শ্রবণ শক্তির বলে ধর্ম্মপরায়ণা ফ্রেড্রিকা হফের (Fedrica Hauffe) সহিত আত্মিকগণের দেখা সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা হইত। হফ্‌ কোন সময়ে কোন আত্মিককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহারা ইচ্ছামত যে কোন আকার ধারণ করিতে পারেন কি না? উত্তরে আত্মিক বলিয়াছিলেন, সকলের সকল প্রকার আকার ধারণ করিবার ইচ্ছা হয় না এবং ক্ষমতাও নাই। যাহার যেমন প্রকৃতি, সে সেই রকম আকার ধারণ করিয়া থাকে; পশুর ন্যায় যাহাদের প্রকৃতি, তাহারা উন্নত জীবের সৌম্য ও প্রসান্ত মূর্ত্তি কখনও ধারণ করিতে পারে না। যাহারা ঘোর অত্যাচারী, অধার্ম্মিক ও পরশ্রীকাতর ছিল, তাহারা পরলোকে অপদেবতা (evil spirit) হইয়া ইচ্ছামত নানা প্রকার বিকট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেখা দিয়া থাকে।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

পল্লী-যুধিষ্ঠির

(গল্প)

অগ্রহায়ণ মাস। প্রভাত হইলেও তখনও ভাল করিয়া সূর্য্যোদয় হয় নাই। পূর্ব্বাকাশে উদীয়মান সূর্য্যের রক্তাভ রশ্মি রক্তবর্ণ হইতে তখন ধীরে ধীরে স্বর্ণবর্ণে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল।

চড়কডাঙ্গা গ্রামের প্রান্তভাগে অবস্থিত একখানি ক্ষুদ্র একতলা বাটীর দ্বারদেশে আসিয়া একব্যক্তি উচ্চ-কণ্ঠে ডাকিলেন, "বেনোয়ারী, ও বেনোয়ারী!"

যিনি ডাকিতেছিলেন তাঁহার নাম প্রাণধন মল্লিক। বয়স প্রায় চত্বারিংশতের কাছাকাছি। ইনি একজন ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী; এতদ্ব্যতীত তেজারতি, মহাজনী, চালানী প্রভৃতি কারবারে ও অঞ্চলে ইঁহার নাম সমধিক প্রসিদ্ধ।

'বেনোয়ারী' নামে তিনি যাহাকে ডাকিতেছিলেন, তাঁহার নাম বেনোয়ারী লাল 'বৈরাগ্য'। তিনি বৈষ্ণব, স্থানীয় জমীদারের সেরেস্তায় গোমস্তাগিরি করেন। জমীদারী এবং আদালত সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁহার বুদ্ধি অসামান্ত বলিয়াই জনপ্রবাদ। নিকটবর্ত্তী গ্রামের মধ্যে কোন মোকর্দ্দমা বাধিলে কোন না কোন মূর্ত্তিতে তাঁহাকে একপক্ষে দেখা যাইত।

প্রাণধন মল্লিক দ্বিতীয় আহ্বানেও কোন প্রত্যুত্তর না পাইয়া যেন একটু বিরক্তিবশতঃ হস্তস্থিত বংশযষ্টি রুদ্ধদ্বারে দুই এক বার ঠুকিয়া,আরও একটু গলা চড়াইয়া ডাকিলেন, "বলি, বেনোয়ারী বাড়ীতে আছ?"

এইবার ভিতর হইতে খড়মের খট্‌খট্ শব্দ শোনা গেল। মুহূর্ত্তকাল পরেই হুঁকা হাতে করিয়া বেনোয়ারী বৈরাগ্য বাহিরে আসিয়া বলিল, "কেও মল্লিক মশাই, আসুন, বসতে আজ্ঞে হোক্।"

মল্লিক মহাশয় বলিলেন, "থাক এখন আর আমি বসবো না। সেই ব্যাপারটার কি হল কেবল তাই জানবার জন্যে এই ভোরবেলায় হিমে তোমার কাছে এসেছি। তার পর, কায হাঁসিল তো ভায়া?"

ওষ্ঠদ্বয় বিকৃত করিয়া বেনোয়ারী বলিল, "আর মল্লিক মশাই, চাষার কি আর সে কাল আছে? কাল রাত্তির দশটা পর্য্যন্ত বেটার সঙ্গে বকর্ বকর্ করে, আমার মাথা ধরে গিয়েছে—"

প্রাণধন আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিতেছিলেন না। ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "তা হোক, বলি সে রাজি হয়েছে তো?"

ঘাড় দোলাইয়া বেনোয়ারী বলিল, "না!"

অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া প্রাণধন বলিলেন, "না কি হে, এঁ্যা!"

হুঁকায় একটী সুখটান দিয়া বেনোয়ারী বলিল, "তবে আর বলছি কি মল্লিক মশাই! চাষার কি আর সেকাল আছে, যে যা বলবো তাই শুনবে? কাল রাত দশটা পর্য্যন্ত তাকে কত করে বুঝুলাম, তবু বেটা বলে 'বাপরে! মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে ধর্ম্ম খোয়াব?"

প্রাণধন দন্তশ্রেণী নিষ্পেষিত করিয়া বলিলেন, "বেটা ধর্ম্মপুত্তুর রে! টাকার কথা বলেছিলে?"

"সব বলেছিলাম। আপনি ১০৲ টাকার কথা বলে-ছিলেন, আমি পনের পর্য্যন্ত উঠেছিলাম, তবু বেটার সেই এক গোঁ—কুটুম্বুর বিপক্ষে মিথ্যে সাক্ষী দেব না; তাতে কেটেই ফেল আর মেরেই ফেল। আমি বল্লাম ওরে বাপু, এতে তো আর তোর পাপ হচ্ছে না, একটা কথা আদালতে বল্লে যদি কর্‌করে পনেরটা টাকা পাস, তা হলে মন্দ কিরে বেটা! ছমাস খেটে যে একসঙ্গে পনের টাকার মুখ দেখতে পাস নে।"

প্রাণধন বলিলেন, "তবু রাজি হলো না?"

"না। শেষে আপনার নাম করে কতকগুলো যাচ্ছেতাই করে বল্লে—ঝাঁন্তাকুড়ে ফেলে দাওগে অমন

টাকা, ঝাঁটা মারি আমি ও টাকার মাথায়। কুটুম্বর বিপক্ষে সাক্ষী তো দেবই না, আরও বরং তার স্বপক্ষে সাক্ষী দিয়ে আদালতে গিয়ে বলবো যে ইনি আমাকে মিথ্যে সাক্ষী দেওয়াবার জন্তে জবরদস্তি করেছিলেন।"

এতক্ষণে প্রাণধনের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি হস্তস্থিত বংশযষ্টি সজোরে মাটীতে ঠুকিয়া বলিলেন "বটে! হারামজাদা নচ্ছার কোথাকার! একটা সাক্ষী দেওয়াবার জন্তে বেটার এত করে খোসামোদ কল্লাম, তবু বেটার রোখ! এর শোধ হাড়ে হাড়ে নেব না! আচ্ছা বেনোয়ারী, এই তোমার সামনে আমি পিতিজ্ঞে কচ্ছি যে ও বেটার যদি হাড়ির হাল আমি না কত্তে পারি, তা হলে আমি কায়েৎ বাচ্চাই নই। তার সাক্ষী না হলে কি হবেই না আমার মোকর্দ্দমা!"

এই কথা বলিয়া প্রাণধন মল্লিক হনহন্ করিয়া চলিয়া গেলেন। রাগে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ তখন কাঁপিতেছিল। বেনোয়ারীও নিজের দ্বার বন্ধ করিল।

* * * *

ব্যাপারটি অতি সামান্য। কাওরাপোতার এবাদৎ মণ্ডলের সহিত কোন একটা কারণে প্রাণধন মল্লিকের মকর্দ্দমা বাধিয়া উঠিয়াছিল। এবাদৎ মণ্ডলের সহিত রহিমদ্দীর কি রকম একটা সম্পর্ক ছিল। প্রাণধন মল্লিক মোকর্দ্দমার গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, একটা বিশেষ বিষয়ে যদি রহিমদ্দীকে দিয়া এবাদতের বিরুদ্ধে একটী সাক্ষ্য দেওয়াইতে পারা যায় তাহা হইলে তাঁহার বিলক্ষণ সুবিধার সম্ভাবনা।

এ সকল কার্য্যে বেনোয়ারী বৈরাগ্যের দক্ষতা ও অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। সুতরাং রহিমদ্দীকে এই মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রবৃত্ত করাইবার ভার তাহারই উপর পড়িল। বেনোয়ারী এরূপ কার্য্য যে কতশত বার করিয়াছে তাহার ঠিক নাই, সুতরাং ব্যাপারটীকে সে অত্যন্ত সোজা বলিয়াই মনে করিয়াছিল। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া সে দেখিল যে বড় কঠিন ঠাঁই। সে দশটাকার স্থলে পনের টাকার প্রলোভন দেখাইয়াও সেই নিরক্ষর কৃষককে আত্মীয়ের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে সম্মত করিতে পারিল না। উপরন্তু রহিমদ্দী, মল্লিক মহাশয়ের উদ্দেশ্যে কতকগুলি সুমিষ্ট বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া বেনোয়ারীকে জানাইল যে দশ পনের টাকা তো দূরের কথা, একশত টাকা পাইলেও সে এরূপ ঘৃণিত কার্য্যে লিপ্ত হইতে পারিবে না।

২

উক্ত ঘটনার পর এক সপ্তাহ অতিবাহিত হইয়াছে। একদিন দ্বিপ্রহরে চড়কডাঙ্গা ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট-পঞ্চায়েৎ নটবর মিত্রের বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে আসিয়া প্রাণধন মল্লিক ডাকিলেন, "মিত্তিরজা বাড়ী আছ?" তাঁহার হস্তে একটী রজ্জুবদ্ধ ছাগশিশু চীৎকার করিয়া সে স্থানের নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিতেছিল।

আহারাদি সমাপ্ত করিয়া নটবর মিত্র বৈঠকখানার দ্বার বন্ধ করিয়া 'আদর্শ পত্রলিখন' নামক একখানি পুস্তকে, রিপোর্ট লিখিবার আদর্শ প্রণালী পাঠ করিতেছিলেন। এমন সময়ে প্রাণধন মল্লিকের আওয়াজ শুনিয়া দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "কেও প্রাণধন! কি মনে করে হে?"

"মিত্তিরজা, ঘুমুচ্ছিলে বুঝি?"—বলিয়া প্রাণধন ছাগশিশুটীকে জানালার গরাদের উত্তমরূপে বন্ধন করিলেন। সেটীর প্রতি একবার লুব্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া নটবর বলিলেন, "বাঃ খাসা রাজপুত্তুরের মতন নধর পাঁঠাটী তো হে। কোথায় পেলে? কিনলে নাকি?"—বলিয়া সতৃষ্ণনয়নে আর একবার সেদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। প্রাণধনও তাহা লক্ষ্য করিলেন।

প্রত্যুত্তরে প্রাণধন বলিলেন, "পাগল নাকি? একটা খাতক সুদ দিতে পারে নি বলে দুটো বাচ্চা দিয়ে গিয়েছিল, একটা বাড়ীতে রেখেছি, আর একটা নিয়ে এলাম তোমার ছেলের জন্তে।"

একগাল হাসিয়া নটবর বলিলেন, "এ্যাঁ, কেন আবার কষ্ট করে পাঁঠা আনতে গেলে! এমনও ছেলে-

মানুষ তুমি ?"—বলিয়া হস্তস্থিত হুঁকাটী প্রাণধনের হস্তে দিয়া বলিলেন, "নাও, খাও।"

প্রাণধন হুঁকা হস্তে দ্বারের অন্তরালে যাইয়া ধূমপান সমাপন করিয়া আসিলে নটবর বলিলেন, "তারপর, সব খবর ভাল তো হে!"

একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া প্রাণধন বলিলেন, "না, বড় ভাল নয়। সেই জন্যেই একবার তোমার কাছে এসেছি। একটা বিশেষ কথা আছে তোমার সঙ্গে।"

"কি রকম বল দিকিনি।"

প্রাণধন ঘাড়টী একটু নীচু করিয়া থামিয়া থামিয়া বলিতে লাগিলেন, "মিত্তিরজা, শেষে কি এই চৌদ্দ-পুরুষের ভিটে ছেড়ে দিয়ে অন্য গাঁয়ে গিয়ে বাস কত্তে বল তুমি ?"

একটা যে বিশেষ কোন গোলযোগ ঘটিয়াছে তাহা নটবর পূর্ব্বেই অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন, কারণ প্রাণধন মল্লিকের মত লোক যে একটা গুরুতর কারণ ব্যতীত সহসা তাঁহার পুত্রের প্রতি স্নেহ-পরবশ হইয়া তাহার জন্য একটী ছাগশিশু বাড়ী বহিয়া দিয়া যাইবে তাহা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "কেন হে, কি হল আবার? ভিটে ছাড়বে কেন ?"

প্রাণধনের চোখ দুটি যেন ছল ছল করিতেছিল। তিনি মুখখানি আরও ভারী করিয়া বলিলেন, "আর মিত্তিরজা, ভিটে! চাষাভূষোর হাতে মান বাঁচলে তো ভিটে, না তাদের কাছে অপমান হয়ে ভিটেয় থাকবো ? চোদ্দপুরুষের ভিটে, তাই মায়াটা ছাড়তে পারি নে, নৈলে ছেলেটা কতদিন বলেছে যে বাবা, কলকাতায় চল, বাবা কলকাতায় চল। দুর্ব্বুদ্ধি হয়েছিল তখন, তাই যেতে চাই নি, ঝকমারির মাশুল উঠ্‌বে তো ?"

নটবর বলিলেন, "কি বল না হে ব্যাপারখান', কে অপমান কল্লে তোমাকে ? কার ঘাড়ে তিনটে মাথা বল না! সাক্ষাৎ ম্যাজেষ্টার সাহেবের পাউয়ার রয়েছে আমার হাতে, সম্রাট পঞ্চম জর্জের প্রতিনিধি আমি—

গাঁয়ে থাকতে কিনা তোমায় অপমান করবে কি একটা চাষায় ? কোন হারামজাদা সে ?"

ছাগশিশুটি তখনও ব্যা ব্যা করিয়া চীৎকার করিতেছিল। নটবর আবার সেটির প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিলেন।

ওষ্ঠপ্রান্তে হাত বুলাইতে বুলাইতে প্রাণধন মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"তা আর জানি নে মিত্তিরজা! তুমি গাঁয়ে প্রেসিডেন্ট-পঞ্চায়েৎ রয়েছ—আমাদের কত-বড় বল-ভরসা। তুমি থাকতে কি আর অবিচার হবে!"—বলিয়া বিবিধ প্রকারের ভূমিকাসহ তিনি জানাইলেন যে রহিমদ্দী কয়েক বৎসর যাবৎ তাঁহার একটি জমী ওঠবন্দী চাষ করিতেছিল। গত ২।৩ বৎসর সে খাজনা না দিতে পারায় তিনি এবার জমীটি খাস করিয়া লইয়া নিজে তাহাতে ফসল বুনিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে এবার সেই জমীটিতে আশাতীত ধান হইয়াছিল। ইহাতে রহিমদ্দী ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহাকে ২।১ বার বলে যে জমী বরাবরই তাহার দখলে ছিল; সুতরাং মল্লিক মহাশয় ইচ্ছা করিলেই জমী কাড়িয়া লইতে পারেন না, এবার এই ধান সুদ্ধ জমী সে দখল করিবে। এ কথায় প্রথমে তিনি বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই, কিন্তু গতকল্য একেবারে তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে। রহিমদ্দী এক সময় গোপনে আসিয়া উক্ত জমীর পক্কপ্রায় ধান্যগুলির শীর্ষগুলি সমস্ত কাটিয়া একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া দিয়াছে। তাঁহার পুত্র দৈবক্রমে সেদিকে যাইতেছিল, সে সহসা এই ব্যাপার দেখিয়া রহিমদ্দীকে এরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করে, তাহাতে সে নিজ হস্তস্থিত "পাঁচনের" দ্বারা তাহাকে এমন গুরুতর প্রহার করিয়াছে যে তাহার জামা ছিঁড়িয়া গিয়াছে, পিঠ ফাটিয়া কাপড় জামায় রক্ত লাগিয়াছে, এবং আজিও সে বেচারী একেবারে উত্থানশক্তি রহিত।

এই ঘটনাটি আদ্যন্ত বিবৃত করিয়া একটু কাঁপা গলায় প্রাণধন মল্লিক বলিলেন, "এখন এই ব্যাপার

চার তো আর সহ্য হয় না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জলের মত পয়সা খরচ করে' জমীতে ধান বুনলাম, আর একটা গোঁয়ার চাষা এসে আমার সেই জমীর পাকা ধান কেটে দিয়ে আমার সর্ব্বনাশ করলে, আর উল্টে আমারই ছেলেকে মার!"

নটবর হুঁকা ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "বটে, এত বড় আস্পর্দ্ধা! এখনই চৌকীদার পাঠিয়ে তাকে পিঠমোড়া করে বেঁধে এনে তার কি দশা করি দেখ।"—বলিয়া ডাকিলেন—"বদ্‌না!"

গ্রামের চৌকীদার বদনদাস বাহিরে বসিয়া বিচালী কাটিতেছিল এবং এই ব্যাপার শুনিতেছিল। নটবর মিত্র তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "শুনলি তো বদ্‌না। একবার যা তো সেই হারামজাদার কাছে। আমার নাম করে তাকে ডেকে নিয়ে আয়। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা পেয়েছে!"

প্রাণধন দেখিলেন ঔষধ ধরিয়াছে। তিনি আবার বলিলেন, "দাদা, বলেইছি তো, তোমার ভরসাতেই গাঁয়ে থাকা। তা দাদা, একটি অনুরোধ—বেটা যাতে কিছুকাল ধরে জেলে পচে এমন ব্যবস্থাটি যদি কর্ত্তে পার, তা হলে একেবারে তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকব।"—বলিয়াই নটবরের হাত দুখানি জড়াইয়া ধরিলেন।

হাত ছাড়াইয়া লইয়া নটবর বলিলেন, "কিছু বলতে হবে না তোমায়! ধর্ম্মের কল আপনি নড়বে। দেখনা রিপোটখানা কি লিখি! পাঁচ বছর ধরে বেটাকে দিয়ে যদি আমি পাথর না ভাঙ্গাই তা হলে আমি এ পদই ছেড়ে দেব।"

প্রাণধন তখন উঠিলেন। নটবরও তাঁহাকে নিশ্চিন্ত হইতে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে তিনি যতক্ষণ ইংরাজ গভর্মেণ্টের প্রতিনিধি স্বরূপ চড়কডাঙ্গায় আছেন, ততক্ষণ কোনও অবিচার হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

৩

বদনদাস চৌকীদারকে আর শ্রমস্বীকার করিয়া যাইতে হইল না। প্রাণধন মল্লিক চলিয়া যাইবার অল্পক্ষণ পরেই রহিমদ্দী ২।৩ জন প্রতিবেশীসহ নটবর মিত্রের নিকট আসিয়া সেলাম জানাইয়া বলিল যে হুজুরের নিকট তাহারা এক দরবার করিতে আসিয়াছে, তাহাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে আজ্ঞা হয়।

বিপদটা যে কি তাহা নটবর তাহাদিগকে দেখিবামাত্রই বুঝিয়াছিলেন। তথাপি সম্পূর্ণ অজ্ঞতার ভান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?"

ব্যাপার তাহারা যাহা বিবৃত করিল তাহার সহিত প্রাণধন মল্লিকের কথিত বর্ণনার বড় একটা সামঞ্জস্য দেখা যায় না। রহিমদ্দী জানাইল যে কিছুদিন পূর্ব্বে প্রাণধন মল্লিক তাহাকে একটি মোকদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াইবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন, এমন কি সেজন্য তাহাকে পনের টাকা বখশিস্ পর্য্যন্ত দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে আত্মীয়ের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিতে সম্মত না হওয়ায় মল্লিক মহাশয় তাহাকে জব্দ করিবেন বলিয়া শাসাইয়াছিলেন। গত কল্য তাহার সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে। সন্ধ্যার সময় সে অন্য একটি ক্ষেতে নিজের কায সারিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল, এমন সময়ে সবিস্ময়ে দেখিল যে, খামারপোতার মাঠে তাহার সাড়ে তিন বিঘার বন্দে ৩।৪ জন লোক মিলিয়া অর্দ্ধপক্ক ধান্যগুলি সমস্ত কাটিয়া ভূমিসাৎ করিতেছে, এবং প্রাণধন মল্লিকের পুত্র নিজে সেখানে উপস্থিত থাকিয়া এই কার্য্য করাইতেছে। সে এই দৃশ্যে মর্ম্মাহত হইয়া গ্রামের ভিতর যাইয়া ২।৩ জন মাতব্বর লোককে আনিয়া ক্ষেত্রের অবস্থা দেখাইল। তারপর তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া আজ হুজুরের নিকট আসিয়া সুবিচারের প্রার্থনা করিতেছে।

নটবর মুখখানি বর্ষার মেঘের মত গম্ভীর করিয়া বসিয়া রহিলেন। বলিলেন—"ও জমী যে তোমার, আর তাতে তুমিই যে ধান বুনেছিলে, তার কোন প্রমাণ আছে?"

রহিমদ্দী বলিল যে সে ৫।৭ বৎসর ধরিয়া এই জমী

চাষ করিয়া আসিতেছে এ কথা গ্রামের অনেকেই জানে।

নটবর বলিলেন, "জমীর দাখিলা আছে ?"

রহিমদ্দী উত্তরে বলিল যে সে গত ২।৩ বৎসরের খাজনা দিতে পারে নাই। তবে ২৩ বৎসর পূর্ব্বেকার দাখিলা তাহার নিকট আছে।

মুখখানি আরও গম্ভীর করিয়া নটবর বলিলেন, "বাপু হে, সবই আমি শুনেছি। জমী কার আর ধানই বা কার তাও জেনেছি; আর কার ধান কেই বা কেটেছে সে কথাও আমি জেনেছি। প্রাণধন মল্লিকের ছেলেকে তোমরা গোবেড়েন করে মেরেছ, সে বেচারীর জামা ছিঁড়ে গিয়েছে, পিঠ কেটে রক্তারক্তি হয়েছে, উঠতে পারে এমন শক্তিটি নেই। তা বাপু, এ তো মগের মুলুক নয় যে যা খুসী তাই করবে! এ ইংরেজের রাজত্ব, আর আমি রয়েছি তার প্রতিনিধি। এ ব্যাপার আমি অল্পে ছাড়বো না, প্রাণধনও ছেড়ে কথা কইবে না। সে মাটির মানুষ, তাই এখনও কিছু করে নি, কিন্তু যদি একটি ফৌজদারী করে' তা হলে কি দশাটা তোমার হবে ভাব দিকিনি। গলায় শিকল বেঁধে জেলে পাথর ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে সে ধানকাটার মজাটা টের পেয়ে যাবে!"

রহিমদ্দী নিরক্ষর কৃষক। আদালতকে সে যমালয় অপেক্ষা ভীষণ বলিয়া জানিত। এই কথা শুনিয়া সে বলিল—"সে কি কত্তা, আমার ধান কেটে সর্ব্বনাশ করলে, আবার আমারই নামে ফৌজদারী!"

গোঁফে হাত বুলাইতে বুলাইতে নটবর বলিলেন, "তা বৈ কি, কার ধান কে কেটে সর্ব্বনাশ করেছে, আমার তো আর জানতে বাকী নেই। উল্টো চাপ দিয়ে কাকে ভোলাবে বল ?"

এ কথা শুনিয়া রহিমদ্দী একেবারে হতবুদ্ধি হইল। প্রাণধন মল্লিক যে ইতিপূর্ব্বে আসিয়া ব্যাপারটিকে মিত্র মহাশয়ের কর্ণগোচর করিয়াছেন তাহা সে বুঝিয়াছিল, কিন্তু ঠিক কি আকারে যে সেটা মিত্র মহাশয়ের কাণে উঠিয়াছে তাহা বুঝিল না।

যে কয়ব্যক্তি রহিমদ্দীর সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে সোনাই তরফদার নামীয় জনৈক চতুর লোক ছিল। সে কোন এক জমীদারের এষ্টেটে হালসাহানার কার্য্য করিত, মামলা মোকর্দ্দমা সংক্রান্ত সকল তথ্যই নাকি তাহার জানা ছিল। সে জানালার গরাদের রজ্জুবদ্ধ ছাগশিশুটিকে দেখিয়াই ব্যাপার কতকটা অনুমান করিয়া লইয়াছিল। প্রেসিডেণ্ট-পঞ্চায়েতের কথা শুনিয়া সকলে যখন বুঝিল যে কার্য্যোদ্ধারের আশা অতি অল্প, তখন সোনাই সকলকে একটু অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া তাহাদিগকে সেখানে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া, পুনরায় নটবরের সম্মুখীন হইয়া বলিল, "খোকাবাবুকে দেখছিনে যে।"

নটবর বলিলেন, "ইস্কুলে গিয়েছে বোধ হয়।"

সোনাই স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল হইতে ৫৲ টি টাকা বাহির করিয়া নটবরের সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "খোকাবাবুর সন্দেশ খাবার জন্যে এই পাঁচটা টাকা এনেছিলাম।"

টাকা কয়টি মাটিতে ফেলিয়া বাজাইয়া লইয়া নটবর বলিলেন, "পাঁচ টাকায় আর কতটুকু সন্দেশ হবে তরফদারের পো! আমাদের হিন্দুর সন্দেশ খাওয়া তো আবার যে সে কথা নয়! পুরুতবাড়ী দেওয়া, ঠাকুরের ভোগ দেওয়া—এ সবই রয়েছে। পাঁচ টাকা তো ঠাকুরের ভোগেই যাবে।"

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে সোনাই বলিল, "আজ্ঞে কত্তা, বেশী সন্দেশ আর গরীব মানুষ কোথায় পাবে! আপাততঃ ঐ পাঁচটা টাকাই রইলো, তারপর আমরা তো পাদপদ্মে পড়েই আছি।"

নটবর একটু মৃদুহাস্যের সহিত বলিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ তা তা—"

অবসর বুঝিয়া সোনাই জানাইল যে উক্ত জমীটি যথার্থই রহিমদ্দির এবং ধান সেই বুনিয়াছিল। প্রাণধন মল্লিক তাহার উপর আক্রোশবশতঃ ধানগুলি কাটিয়া নিরীহ কৃষকের সর্ব্বনাশ আরও বেশী করিয়া করিবার জন্য ঘটনাটিকে সম্পূর্ণ উল্টাইয়া দিয়া রহিমদ্দীকেই দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন [illegible]

সুবিচার যদি হুজুরের নিকট না হয়, তা হলে গরীব আর কার আশ্রয়ে দাঁড়াইবে ? সুতরাং যাহাতে সে মারা না যায়, দয়া করিয়া তাহারই একটা ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে।

কথাটা একটু ভাল করিয়া ভাবিয়া নটবরও বুঝিলেন যে ভিতরে একটা ষড়যন্ত্র আছে। সুতরাং সোনাইকে বলিলেন যে তিনি ভাল করিয়া ভাবিয়া যাহা হয় একটা ব্যবস্থা করিবেন, কল্য প্রাতঃকালে তাহারা যেন আসিয়া একবার খবর লয়।

সেলাম করিয়া সোনাই চলিয়া গেল। তাহার নির্দ্দেশ অনুসারে রহিমদ্দী ও তাহার সঙ্গীরাও প্রস্থান করিল।

নটবর তখন চৌকীদার বদন দাসকে ডাকিয়া বলিলেন, "বদনা,তুই তো বেটা মুচীর ছেলে। আচ্ছা, বল্ দেখি ঐ পাঁঠাটার দাম কত হতে পারে ?"

বদন দাস জানাইল যে দুই টাকার বেশী দেওয়া সঙ্গত নয়, জোর নয় সিকা দেওয়া যাইতে পারে, আড়াই টাকা দিয়া কিনিলে তাহার মতে ।০ আনা ঠকিতে হয়।

নটবর বলিলেন, "যতই হোক, পাঁচ টাকা তো নয় ?"

বদন দাস বলিল যে পাঁচ টাকায় উহা অপেক্ষা বৃহদাকার ছাগশিশু সে একযোড়া আনিয়া দিতে পারে।

মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া নটবর বদন দাসকে বলিলেন, "বদনা! এক কায কর। প্রাণধন মল্লিকের বাড়ী একবার যা। আমি যে তোকে পাঠিয়েছি তা যেন সে বুঝতে না পারে। তুই যেন এমনি বেড়াতে গিয়েছিস, এই ভাবে গিয়ে তাকে বলবি যে রহিমদ্দী সাক্ষী সাবুদ সব যোগাড় করে' কর্ত্তার কাছে এসে নালিস করেছে, যে সব জনমজুররা ধান বুনেছিল তাদের সব নিয়ে এসেছিল, আর দশটাকা নজর দিয়ে সব জানিয়ে গিয়েছে। ব্যাপার খুব খারাপ দাঁড়িয়েছে। এই কথা যদি বেশ করে গুছিয়ে বলতে পারিস তা হলে ওই পাঁঠার চামড়াখানা তোকে বকশিস দেবো।"

বদন দাস গভর্ণমেণ্টের বেতনভোগী চৌকীদার হইলেও প্রেসিডেণ্ট-পঞ্চায়েতের বাড়ী খাটিতে খাটিতে তাহার প্রাণান্ত হইত। না করিলেও নয়। একবার এক চৌকীদার, পঞ্চায়েতের কি একটা হুকুম প্রতিপালন করিতে অস্বীকার করিয়াছিল, পঞ্চায়েত মহাশয় সেই দিনই তাহার বিরুদ্ধে এমন এক রিপোর্ট লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে শেষে বেচারার চাকরি লইয়া টানাটানি উপস্থিত হয়। আজ প্রভাত হইতে বদন দাস এক বোঝা কাঠ কাটিয়াছে, বাজার করিয়াছে, বাগানের বেড়া মেরামত করিয়াছে, গরুর বিচালী কাটিয়াছে। হয়তো আরও কি কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইত, বদন দাস এই প্রস্তাব শুনিবামাত্র সে স্থান ত্যাগ করিল এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে সেদিন আর সে স্থানের ছায়াও মাড়াইবে না।

প্রভু যাহা বলিয়াছিলেন, তদপেক্ষা চতুর্গুণ মিথ্যা কথার সহিত বদন দাস সন্ধ্যার পুর্ব্বেই প্রাণধন মল্লিককে জানাইল যে, মিত্র মহাশয়কে মাঠে লইয়া গিয়া রহিমদ্দী ক্ষেত্রের অবস্থা প্রত্যক্ষ করাইয়াছে, এবং জমী ও ধান যে তাহারই তাহা প্রমাণের জন্য বিস্তর সাক্ষী সংগ্রহ করিয়াছে। যাহারা ধান বুনিয়াছিল, যাহারা জমীতে লাঙ্গল ভাড়া এবং ধার দিয়াছিল, যে ব্যক্তি বীজধান্য বিক্রয় করিয়াছিল এবং যাহারা পার্শ্ববর্ত্তী জমীর অধিকারী—সকলে আসিয়া একযোগে বলিয়াছে যে জমী রহিমদ্দীরএবং তাহাতে সেই ধান বুনিয়াছিল। প্রাণধন মল্লিক যে লোক দিয়া ধান কাটাইয়াছেন তাহাও অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে বলিয়া সাক্ষ্য দিয়াছে। এই সমস্ত যোগাযোগের উপর আবার রহিমদ্দী মিত্র মহাশয়কে ১০৲ টাকা নজর দিয়াছে এবং তাহাকেও ১৲ বকশিশ দিয়া বলিয়াছে ,যে মকর্দ্দমা মিটিয়া গেলে তাহাকে আরও ৫৲ টাকা দিবে। এ সকল গুপ্ত সংবাদ সে কিছুতেই কাহারও নিকট প্রকাশ করিত না, কেবল মল্লিক মহাশয় চিরদিনই তাহাকে অনুগ্রহ করেন বলিয়া এবং বখশিস্ পাইবে ইহা নিশ্চয় জানিয়া সে তাড়াতাড়ি এই খবর তাঁহাকে দিতে আসিয়াছে।

প্রাণধনের মুখখানি তখন পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে। তথাপি বদন দাসের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে একটী টাকা দিয়া বলিলেন,"বাবা বদন, তোর উপর ভার রইলো বাবা, ওরা যখন যা কিছু করবে, তৎক্ষণাৎ সেই খবরটী এসে আমাকে দিবি। ওরা চাষাভূষো লোক তোকে যা সন্তুষ্ট করবে, তার চাইতে ঢের বেশী সন্তুষ্ট আমি করবো।"

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সাহায্যে টাকাটী বাজাইয়া লইয়া বদন দাস বলিল যে সে চিরকালই মল্লিক মহাশয়ের গোলাম, তিনি যাহা হুকুম করিবেন তাহাই সে করিবে, তবে মাঝে মাঝে মল্লিক মহাশয় যেন তাহার প্রতি এইরূপ কৃপা 'দিষ্টি' করেন।

বদন দাস চলিয়া গেলে প্রাণধনের চিন্তা বৃদ্ধি পাইল। অপর পক্ষ কিরূপ সাক্ষী সাবুদ যোগাড় করিয়াছে, কত টাকাতেই বা নটবরকে বশীভূত করিয়াছে, তাহা প্রাণধন ঠিক বদন দাসের কথার উপর বিশ্বাস করিয়া বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে বাক্স খুলিয়া একখানি ১০৲ টাকার নোট বাহির করিয়া, লণ্ঠন ও লাঠি গাছটী লইয়া বাটী হইতে সেই রাত্রে বাহির হইলেন।

গ্রামের মধ্যেই জমীদারের কাছারী বাড়ী। প্রাণধন বরাবর সেখানে যাইয়া বেনোয়ারীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। উভয়ে মিলিয়া অনেকক্ষণ গুপ্ত পরামর্শ হইল। তারপর তিনি সে স্থান ত্যাগ করিয়া নটবর মিত্রের বাটী আসিলেন।

নটবর বৈঠকখানায় বসিয়া একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র পড়িতেছিলেন, এমন সময়ে প্রাণধন ঘরে ঢুকিয়াই বলিলেন, "কতদূর কি হল মিত্তিরজা!"

কিন্তু মিত্তিরজার মুখের ভাবে বিশেষ কোন হর্ষের লক্ষণ দেখা গেল না। তিনি গম্ভীর ভাবে প্রাণধনকে বলিলেন, "বস ঐ চৌকীখানায়। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।"

প্রাণধন শঙ্কিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিলেন। নটবর বলিলেন, "প্রাণধন, ব্যাপারটা তো নেহাৎ সোজা নয়। তুমি একেবারে আসল ঘটনাটাকে উল্টে দিতে চাও! আসল ব্যাপার আমি সব শুনেছি।"

প্রাণধন মুহূর্ত্তকাল নীরব রহিলেন। সেই সময়ের মধ্যে তাঁহার মুখ চক্ষের ভিতর দিয়া একটা ক্রূর হাস্যের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। মুখভাব গোপন করিবার জন্য ওষ্ঠদ্বয়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি বলিলেন, "তা হলে কি হবে মিত্তিরজা? তোমার ভরসাতেই তো আছি। তুমিও যদি বিমুখ হও তাহলে আর দাঁড়াই কোথায়? এখন কি করতে হবে তার একটা উপদেশ দাও।"

অত্যন্ত বিজ্ঞের ন্যায় শিরঃ সঞ্চালন করিয়া নটবর বলিলেন, "উপায় আছেই। যেখানেই মুস্কিল, আসানও সেখানেই। তবে তোমার খরচ হবে কিছু। কেবল তো আর আমি নই, সদরে পাঁচজনের মুখ চাপা দিতে হবে তো। সে যে বড় সোজায় মিটবে তা তো বোধ হচ্ছে না। তার উপর আবার সাক্ষী সাবুদ ভাঙ্গাতে হবে।"

হাত নাড়িয়া প্রাণধন বলিলেন,"সে সব ভার আমার উপর রইলো। মোকর্দ্দমা যাতে শেষ পর্য্যন্ত টেঁকে তার উপায় আমি করবো। তুমি কেবল রিপোর্টটি লিখে বেটাকে চালান করে দেবে। এইটুকু উপকার আমার জন্যে তোমার কত্তে হবে মিত্তিরজা। খরচের জন্যে তুমি ভেব না—আমি পিছপাও নই। এই ১০৲ টাকা রইলো আপাততঃ, যাকে যা দিতে হয় দিও।"—বলিয়া প্রাণধন মেরজাইয়ের পকেট হইতে নোটখানি বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন।

নটবর বলিলেন, "বড় শক্ত কায বাপু! রিপোর্ট কি অমনি লিখলেই হয়! যাতে শেষ পর্য্যন্ত রিপোর্টটা বজায় থাকে তা তো কত্তে হবে। শেষে মিথ্যা রিপোর্ট দেওয়ার জন্যে কোম্পানী আবার আমার মাথাটী না খেয়ে বসে!"

প্রাণধন হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তুমি মনে করলে কি না করতে পার মিত্তিরজা। তোমার

কলমের উপর কথা বলে এমন লোক তো কই তিনটে জেলার ভেতর দেখতে পাই নে।"

নটবর এ কথায় বড়ই খুসী হইলেন। আগামী কল্য প্রাতে যাহা হউক একটা ব্যবস্থা করিবেন এই আশ্বাস দিয়া প্রাণধনকে বিদায় দিলেন।

৪

প্রাণধন চলিয়া গেলে নটবর মিত্র ব্যাপারটীতে তাঁহার নিজের লাভালাভ হিসাব করিয়া দেখিলেন। রিপোর্টে তিনি যাহাই লিখুন, প্রাণধনের নিকট হইতে নগদ ১০৲ টাকা ও ছাগশিশুটীর মূল্য যদি ২৲ টাকাও ধরা যায় তাহা হইলে সর্ব্বসমেত ১২৲ টাকা ও রহিমদ্দীর নিকট হইতে ৫৲ টাকা মোটের উপর এই ১৭৲ টাকা পাইয়াছেন। আশা করিলেন যে, উভয়পক্ষ হইতে আরও ১০৲ টাকা হইতে পারে। তখন সাপও মরিবে অথচ লাঠিও ভাঙ্গিবে না এইরূপ উভয়কুল বজায় রাখিয়া এক রিপোর্ট তিনি লিখিয়া দিবেন।

এই কথা মনে করিয়া তিনি বদন দাসকে ডাকিলেন। তাহাকে যথাযোগ্য উপদেশাদি দিয়া সেই রাত্রেই রহিমদ্দীর বাটিতে পাঠাইলেন।

বদন দাস রহিমদ্দী ও সোনাই হালসাহানার সম্মুখে জানাইল যে প্রাণধন মল্লিক বহু সাক্ষী সাবুদ যোগাড় করিয়া ব্যাপারটি বেশ পাকা করিয়া তুলিয়াছে, এবং মিত্র মহাশয়কে ১৫৲ টাকা নজর দিয়াছে। এখন রহিমদ্দী যদি তাঁহাকে আর ১৫৲ টাকা, অভাবে ১০৲ টাকাও নজর দিতে পারে, তাহা হইলে তিনি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন যদি রহিমদ্দীকে বাঁচাইতে পারেন।

এ কথা শুনিয়া রহিমদ্দী কিছু বলিল না বটে, কিন্তু সোনাই হালসানা গর্জ্জিয়া উঠিল—"কি, ভদ্রলোকের এত নীচ প্রবৃত্তি! যে ঘুষ বেশী দেবে তারই পক্ষে বিচার হবে! বেচারীর ধান কেটে সর্ব্বনাশ করলে, তার উপরেও বেচারী ধার কর্জ্জ করে ৫৲ টাকা দিয়ে এল, এখন কিনা আবার ১৫৲ টাকা দিতে হবে! আর এক পয়সাও তো আমরা দেবোই না, আরও বরং ম্যাজেষ্টার সাহেবের কাছে এক দরখাস্ত করবো যে এইরকম ঘটনায় আমাদের ওপর এই রকম বিচার করা হয়েছে। তার পর আমাদের কপালে যা থাকে আদালতে গিয়ে হবে।"

সোনাইয়ের এই প্রকার আকস্মিক ক্রোধ দেখিয়া বদন দাস ভয়ে আর তাহার বকশিসের কথা উচ্চারণই করিতে পারিল না। ধীরে ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া আসিয়া নটবর মিত্রকে জানাইল যে সোনাই হালসানা তাঁহার উদ্দেশে যৎপরোনাস্তি গালিগালাজ করিয়া অবশেষে বলিয়াছে যে প্রভাত হইলেই সে সদরে যাইয়া দরখাস্ত করিবে, তিনি প্রকৃত ঘটনা সদরে জ্ঞাপন করেন না, উভয়পক্ষের উৎকোচ গ্রহণ করিয়া যাহার উৎকোচের পরিমাণ বেশী হয়, তাহারই অনুকূলে রিপোর্ট দিয়া থাকেন। এরূপ অত্যাচারী প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েৎকে যেন অবিলম্বে পদচ্যুত করা হয়।

সকল কথা শুনিবার ধৈর্য্য আর নটবর মিত্রের রহিল না। এক নিরক্ষর চাষা, সে কিনা তাঁহার উপর টেক্কা দিয়া আদালতে দরখাস্ত করিবে! বদন দাসকে হুকুম দিলেন, "প্রাণধন মল্লিককে নিয়ে আয়।"

রাত্রি তখন প্রায় ৯টা। প্রাণধন মল্লিক সবেমাত্র আহারাদি শেষ করিয়া তামাক ধরাইতে ধরাইতে মোকর্দ্দমার কথা চিন্তা করিতেছিলেন। অপর পক্ষ যতই সাক্ষী সাবুদ যোগাড় করিতে চেষ্টা করুক না কেন, কার্য্যে তাহার কিছুই হইবে না, কারণ চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জমীর জোতদারগণ সকলেই বেনোয়ারীর বাধ্য এবং বেনোয়ারীও তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছে যে সে সকল লোকের মধ্যে কেহই তাঁহার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে না। তবে তাহাদের মধ্যে ২।১ জনের পূর্ব্ব বৎসরের বাকী খাজনা প্রাণধনকে শোধ করিয়া দিতে হইবে। সুতরাং মোকদ্দমার পরিণামের জন্য তিনি বিন্দুমাত্র চিন্তিত নহে। এখন কেবল নটবর যদি রহিমদ্দীকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়া রিপোর্ট লিখিয়া চালান দেন তাহা হইলে তিনি নিশ্চিন্ত চিত্তে বসিয়া বিপক্ষের সাক্ষিগণকে স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টা করিতে পারেন।

প্রাণধণ যখন মনে মনে এইরূপ নানা প্রকার ফন্দী আঁটিতেছিলেন, তখন সহসা বদন দাস চৌকীদার সেখানে আসিয়া নটবর মিত্রের আহ্বান জ্ঞাপন করিল। তাহা শুনিয়া প্রাণধনের চিন্তা আরও বৃদ্ধি পাইল। হঠাৎ এত রাত্রে নটবরের কি প্রয়োজন হইল তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। অপর পক্ষ আরও বেশী টাকা কবুল করিয়াছে, কিম্বা হয়তো নূতন কোন মতলব করিয়াছে, তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না। বদন দাসকে বসিতে বলিয়া, অন্তঃপুরে যাইয়া আরও তিনটী টাকা বাহির করিয়া ট্যাঁকে গুঁজিলেন। লণ্ঠন ও লাঠি লইয়া চিন্তিত মনে বদন দাসের অনুবর্ত্তী হইলেন।

নটবর তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন, "শুনেছ হে প্রাণধন, হারামজাদাদের কাণ্ড! সদরে যাচ্ছে তোমার নামে নালিশ কর্ত্তে!"

নিজের প্রতি অপমানসূচক কথাগুলি গোপন করিয়া, বাকী কথাগুলির উপর যথেষ্ট রং চড়াইয়া নটবর প্রাণধণের কর্ণগোচর করাইলেন। সকল কথা শুনিয়া প্রাণধন যেন রাগে ফুলিতে লাগিলেন।

নবটর বলিলেন,"বেটা হারমজাদার হাড় খাব, মাস খাব, চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাব তবে আমার নাম নটবর মিত্তির। ৪০ বছর নিতাই উকীলের হেডক্লার্কগিরি করে এলাম, আজ কিনা সোনাই হালসানা আমাকে আইন শিখিয়ে দিতে চায়! শিখিয়ে দিচ্ছি আমি আইন! লেখ তো হে প্রাণধন তোমার কাছে এজেহার।"—বলিয়া কিরূপভাবে এজেহার লিখিতে হইবে তাহা বলিয়া দিলেন।

প্রাণধন মল্লিক যেরূপভাবে প্রথমে ব্যাপারটীকে নটবরের কর্ণগোচর করিয়াছিলেন, সেইভাবে এজেহার লিখিলেন যে তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে, রহিমদ্দী তাঁহার পাকা ধান কাটিয়া নিয়াছে এবং তাঁহার পুত্রকে সাংঘাতিকভাবে আহত করিয়াছে।

প্রাণধনের এজেহারের উপর নটবর রিপোর্ট লিখিলেন যে তিনি স্বয়ং জমীর অবস্থা তদন্ত করিয়াছেন। এজেহারকারী গ্রামের মধ্যে অতি নিরীহ এবং সৎ ব্যক্তি। রহিমদ্দী মণ্ডলকেও তিনি জানেন এবং সে ব্যক্তি এজেহারে লিখিত একজন প্রকৃত বদমায়েসই বটে। বাদীর পুত্র যথার্থই অত্যন্ত আহত হইয়াছে। রহিমদ্দীকে তিনি নজরবন্দী রাখিয়াছেন, কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ পাইলেই চৌকিদারযোগে সদরে প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন। বদমায়েস পলায়ন করিতে পারে সুতরাং গ্রেপ্তারী পরোয়ানা শীঘ্র পাঠাইতে আজ্ঞা হয়।

প্রাণধন এজেহারের উপর মন্তব্য পড়িয়া ভারি খুসী হইলেন। বলিলেন, "মিত্তিরজা তুমি সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠির। বলেছি তো, তুমি গাঁয়ে রয়েছ, তাই আমরা বাস করতে পাচ্ছি, নৈলে ভিটে ছেড়ে দিয়ে কবে চলে যেতাম।"

নটবর বলিলেন, "ভায়া হে, আমার যা করবার তা তো কর্ল্লাম। এখন ভার তোমার উপর। সাক্ষী সাবুদ সমস্ত ঠিক করে রেখ, দারোগা এলে যেন কেসটাকে ফাঁসিও না।"

প্রাণধন তাঁহাকে সে বিষয়ে আশ্বস্ত হইতে বলিয়া অত্যন্ত প্রফুল্ল চিত্তে বাড়ী গেলেন। আসিবার কালীন যে ৩৲ টাকা লইয়া আসিয়াছিলেন, পথিমধ্যে বদন দাস তাহা হইতে আর ১৲ টাকা বকশিস পাইল।

৫

সোনাই হালসানার দরখাস্ত এবং প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েতের রিপোর্ট, এতদুভয়ের উপর তদন্ত করিবার জন্য একজন সাব ইন্‌স্পেক্টর চড়কডাঙ্গায় আসিলেন।

নটবর মিত্র স্বয়ং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ঘটনাস্থলে লইয়া গিয়া কাটা ধান্য দেখাইয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, উক্ত জমী এবং ধান্য প্রাণধন মল্লিকেরই। এই পক্ব-প্রায় আমনধান্য রহিমদ্দী কাটিয়া নিয়া নিরীহ প্রাণধন মল্লিকের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে এবং প্রকৃত ঘটনাকে বিকৃত করিবার জন্য সদরে এক মিথ্যা দরখাস্ত দিয়াছে।

উপযুক্তরূপ দক্ষিণা প্রাপ্ত হইয়া দারোগা প্রাণধন মল্লিকের নির্ব্বাচিত কয়েকজন সাক্ষী তলব করিলেন। জমীদারের গোমস্তা বেনোয়ারী বৈরাগ্য আসিয়া বলিল, প্রাণধন যখন উক্ত জমীতে ধান্য বপন করেন, তখন সে স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া তাঁহার উপকারার্থে বীজধান্য

সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিল।

পার্শ্ববর্ত্তী জমীর কৃষকগণ ইতিপূর্ব্বে রহিমদ্দীর পক্ষে সাক্ষ্য দিবে বলিয়া তাহাকে খুব উৎসাহিত করিয়াছিল, কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত রহিমদ্দী দেখিল যে, তাহারা সকলেই আসিয়া বলিল, জমী এবং ধান্য প্রাণধন মল্লিকেরই। যে সকল জনমজুরেরা রহিমদ্দীর ধান বুনিয়াছিল, বহুচেষ্টা করিয়াও সেদিন সে তাহাদের কাহারও সন্ধান পাইল না।

এবাদৎ মণ্ডল নামক যে ব্যক্তির সহিত ইতিপূর্ব্বে প্রাণধন মল্লিকের মোকর্দ্দমা চলিতেছিল, কেবল সেই আসিয়া বলিল যে ব্যাপার সবই মিথ্যা, উক্ত জমী প্রাণধন মল্লিকের বটে, কিন্তু বহুকাল যাবৎ রহিমদ্দী তাহাতে চাষ করিয়া আসিতেছে এবং এবারও ঐ ধান্য সেই বুনিয়াছিল, মল্লিক মহাশয়ই তাহা কাটাইয়া দিয়া ব্যাপারটীকে এখন উল্টা দাঁড় করাইয়াছেন। দারোগা এবাদৎ মণ্ডলকে এক ধমক দিলেন। সে ব্যক্তি ভয়ে দশহাত পিছাইয়া গেল।

সোনাই হালসানা প্রকৃত ঘটনা বলিতে অগ্রসর হইল, কিন্তু বাক্য উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বেই নটবর দারোগাকে বলিলেন যে এই ব্যক্তিই সদরে মিথ্যা দরখাস্ত দিয়া সত্যঘটনাকে পূর্ব্ব হইতেই বিকৃত করিবার চেষ্টা করিতেছে। দারোগা তাঁহার সঙ্গী কনেষ্টবলকে কি ইঙ্গিত করিলেন, কনেষ্টবল সোনাইয়ের পেটে এক রুলের গুঁতা মারিল। সে পড়িতে পড়িতে পিছাইয়া গেল. আর এক পাও অগ্রসর হইল না।

সাক্ষিগণের এজেহার লিপিবদ্ধ করিয়া, পাণ খাওয়ার খরচ লইয়া, অপরাহ্নে দারোগা ও কনেষ্টবল রহিমদ্দীকে বাঁধিয়া লইয়া চড়কডাঙ্গা ত্যাগ করিলেন।

আদালতে মকর্দ্দমা হইল বটে, কিন্তু তাহাতেও রহিমদ্দী বেচারী একটীও সাক্ষী সংগ্রহ করিতে পারিল না। বেনোয়ারী বৈরাগ্য হলফ পাঠ করিয়া বলিল যে সে স্বচক্ষে রহিমদ্দীকে ধান কাটিতে দেখিয়াছে।

বাদীর ক্ষেত্রে 'দোষযুক্ত অনধিকার প্রবেশ করতঃ ধান্যকর্ত্তন ও মাইরপীট করার অপরাধে রহিমদ্দীর তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ড হইল। প্রাণধন মল্লিক মোকর্দ্দমায় জয়লাভ করিলেন।

পরদিন প্রাণধন মল্লিকের বাটীতে নটবর মিত্র ও বেনোয়ারী বৈরগ্যের নিমন্ত্রণ হইল। প্রাণধন একগাল হাসির সহিত নটবরকে বলিলেন, "মিত্তিরজা, যথার্থই তুমি গাঁয়ের যুধিষ্ঠির। তুমি যদি না থাকতে, তা হলে কি আর গাঁয়ে বাস কর্ত্তে পার্ত্তাম!"

শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত।

বিদ্যাসাগর

বিদ্যা তোমার সাগর, তুমি দয়ার পুরীধাম,
উচ্চারণে পুণ্য দেহ, ধন্য তব নাম।
সকল জাতির জ্ঞাতি তুমি, মুক্ত চিরদিন,
আপন তোমার পথের কাঙাল আতুর দীনহীন।
তোমার বুকে মঠ বেঁধেছে এক সাথেতে সব—
হিন্দু তুমি, বৌদ্ধ তুমি, শাক্ত ও বৈষ্ণব।

বঙ্গভাষা শকুন্তলা কোথায় ছিল পড়ি'
হে মহর্ষি ব্রহ্মচারি, আনলে বুকে করি,
কন্যা করি ধন্যা করি অরণ্যেতে তায়,
শিক্ষা দিলে দীক্ষা দিলে কুটীর আঙিনায়।
বনের বন-জ্যোৎস্না সে যে গৌরব অতুল
পরাজিত পারিজাত ও রাজোদ্যানের ফুল।

মায়ের মত স্নেহ তোমার, দেবের মত দয়া,
পতিত তাপিত উদ্ধারিতে সর্ব্বপাবন গয়া,
পরের দুখে অমনি গল' কঠিন হিমাচল,
হৃষিকেশের গঙ্গা তুমি শান্ত সুশীতল।
উচ্চারণে পুণ্যদেহ, ধন্য তব নাম,
বিদ্যা তোমার সাগর, তুমি দয়ার পুরীধাম।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

মুক্তকেশী-মঙ্গল

১। রাগিণী আলেয়া, তাল একতালা।

কে তুই সুন্দরি, কে তুই সুন্দরি,
জ্যোতি-গরিমায় নীল নভে ভরি,
খা-দিলি আজি? মরি মরি মরি,
একি রূপ! একি রূপ!
রবি শশী তারা কৌতুকে চমকে,
বিহ্বলা ধরণী চমকে পুলকে,
রূপরাশি ঝরে ঝলকে ঝলকে,
একি রূপ! একি রূপ!
ও রূপে লোলুপ ভ্রমর গুঞ্জরে,
শত প্রজাপতি থরে থরে থরে
বসনে অলকে বদনে বিহরে,
নীরব নিঝুম্ চুপ্!
কুহু কুহু কুহু কোকিল কুহরে,
পিউ পিউ রবে পাপিয়া শিহরে,
ঐ কামিনী শেফালী, আনি ফুল-ডালি
জ্বালিছে গুগ্‌গুল ধূপ!

২। রাগিণী আলেয়া, তাল একতালা।

একি সুখস্বপ্ন মধুর মধুর!
একি দেহগন্ধ করে ভুর্ ভুর্!
সারা চিত্ত কেন আনন্দে আতুর?
বুঝি এলোকেশী শ্যামা এল এল!
মুখে গোলাপের দুরন্ত সৌরভ,
বুকে কমলের ফুটন্ত গৌরব,
আজি পেলে শত চক্ষু, অপূর্ব্ব বৈভব,
গেল নয়ন-বন্ধন—আঁখি মেল!
গলে শেফালীর উৎসব উছলে,
ভুজে চম্পকের আনন্দ উথলে,
মোর হৃদয়-কমল, একি টল টল!
বুঝি এলোকেশী শ্যামা এল এল!

৩। রাগিণী আলেয়া, তাল একতালা।

আমি শুনেছি শুনেছি তোর কণ্ঠ-রব,
যেন বীণার মাঝারে উছলে উৎসব!
তারে তারে তারে রাগিণী ঝঙ্কারে,
রিণিঝিণি রিণিঝিণি!
ঐ বাজে তোর কটিতে কিঙ্কিণী,
ঐ বাজে তোর চরণে শিঞ্জিনী,
এক তানে বাজে ছত্রিশ রাগিণী,
রিণিরিণি রিণিরিণি!
এ সব লক্ষণে জেনেছি জেনেছি,
আভাসে ইঙ্গিতে বুঝেছি বুঝেছি,
দেরি নাই আর, দেরি নাই আর,
এলি এলি নিস্তারিণি!
এ নহে কল্পনা, এ নহে জল্পনা,
এ নহে ছলনা, এ নহে বঞ্চনা,
অপূর্ব্ব মোহন, তোর দরশন,
হল বলে' সোহাগিনি।
ঐ গগনে ঝলকে অরুণের লাল,
একি লালে লাল জলদের জাল!
বুঝি, এল দিনমণি, এল দিনমণি,
পোহাইল নিশীথিনী!

৪। রাগিণী আলেয়া, তাল একতালা।

ঐ শোনা যায় জলধি কল্লোল,
তরঙ্গে তরঙ্গে একি মহারোল,
এত দিন পরে হেরিব সাগরে,
হেরিব রূপের সিন্ধু!
অসীম অসীম, অপার অতল,
নিশি দিন ঊর্ম্মি উছল উছল,
হেরিব তাহাতে, আনন্দে পাগল,
বিম্বিত পূর্ণিমা ইন্দু!

উচ্ছ্বসিত তাহে রবির উল্লাস,
খচিত তাহাতে তারকার হাস,
সে মুকুরে চাহি ফেলে নীলাকাশ
আনন্দের অশ্রুবিন্দু !
হেরিয়া চাঁদের মূরতি বিমল,
কোটি বাহু তুলি যেমতি বিহ্বল,
মা শ্যামা, যেমতি পুলকে পাগল
তোর ও রূপের সিন্ধু,—
কোটি বাহু তুলি তেমতি বিহ্বল,
কোটি বাহু তুলি তেমতি পাগল,
হইবে হেরিয়া মোহন উজ্জল
তনয়ের মুখ-ইন্দু !

৫। রাগিণী আলেয়া, তাল একতালা।

গোলাপি সুবাস, গোলাপি উচ্ছ্বাস,
একি চারি ধারে গোলাপি উল্লাস !
বুঝি ঐ ঐ কুঞ্জ শোভাময়ী,
গোলাপে গোলাপে ভরা !
চুমি চুমি চুমি গোলাপের ফুল,
গোলাপি নেশায় হইয়ে আকুল,
ঝঙ্কারিছে ঐ শত বুল্‌বুল্‌,
ধন্য করি সারা ধরা !
মোর বসনে অলকে গোলাপি পরাগ,
মোর বদনে অধরে গোলাপের রাগ,
প্রাণে পশিয়াছে গোলাপি সোহাগ ;
একি গন্ধ মনোহরা !
এই গোলাপি প্রকাশে, বুঝেছি আভাসে,
আর দেরি নাই, হেরিব উল্লাসে,
শ্যামা ও তোর চরণ, ফুল-উপবন—
গোলাপে গোলাপে ভরা !

৬। রাগিণী আলেয়া, তাল একতালা।

বালক যেমতি দিন দিন বাড়ে,
আপন মায়ের জঠর-মাঝারে,
বালেন্দু যেমতি তিল তিল বাড়ে,
অম্বরের অঙ্গ মাঝে,
কে গো মোর এই তনুর ভিতর,
উছলি উছলি বাড়ে নিরন্তর ?
লম্ফে ঝম্পে তার কাঁপি থর থর
মোর তনু-মাঝে কে গো রাজে !
দিন দিন মোর পাণ্ডুর অধর,
বাসি মালা সম ম্লান কলেবর,
চলেনা চরণ, গৃহ কাজে মন
নাহি আর, মরি লাজে !
কত দিনে আর হইবে প্রসব,
কত দিনে আর পাইব বিভব,
রূপে গুণে ধন্যা, অপরূপা কন্যা,
ধরিব এ ক্রোড় মাঝে !
তোরে পরাইব শ্যামা মধুর নূপুর,
রুণু রুণু রুণু বাজিবে ঘুঁঘুর,
অমূল অমূল, কানে দিব দুল,
তোরে সাজাইব শত সাজে !

৭। রাগিণী আলেয়া, তাল একতালা।

প্রথম বয়সে নবীন-যৌবনা
গর্ভিণী যেমন, আনন্দে মগনা,
করে সন্তানের মূরতি-কল্পনা,
প্রসবের বহু আগে,
এ সাধনা-কালে, আমিও তেমতি
করিতেছি ধ্যান তোর ও মূরতি ;
শ্যামা তোর রূপ একি অপরূপ !
একি মূর্ত্তি হৃদে জাগে !
লাবণ্য-সায়রে সদা ঢল ঢল,
শ্যামা, তোর ওই শ্রীমুখ-কমল !
একি শ্রীচরণ, অপূর্ব্ব-মোহন,
রঞ্জিত অলক্ত-রাগে !
প্রতি অঙ্গে একি মহিমা গৌরব !
প্রতি অঙ্গে একি উদ্দাম উৎসব !

একি মুহুমুহু পিক কুহুকুহু,
ও-তনু-রসাল-বাগে!
এ নহে কল্পনা, অয়ি ইচ্ছাময়ি,
ভক্ত-হৃদি-বাঞ্ছা-কল্পতরু তুই,—
মাগো, সেই মূর্ত্তি ধরি, দেখা দিস্ মরি,
যেই মূর্ত্তি ভক্ত মাগে!

৮। রাগিণী আলেয়া, তাল একতালা।

লজ্জা ঘৃণা গেছে, থামে না ক্রন্দন,
অসহ্য বেদনা, যায় যে জীবন,
ছিন্ন ভিন্ন হোলো মর্ম্মের বন্ধন,
একি গো যন্ত্রণা ঘোর!
কেহ নাহি ঘরে বসিতে নিকটে,
প্রাণ যায় যায় এ ঘোর সঙ্কটে;
প্রতিবেশী-মুখে নিন্দা সুধু রটে,
ভাবে তারা ভাণ মোর!
কে যেন গো ওই দিতেছে সান্ত্বনা,
কাণে কাণে কহে, "কেঁদনা কেঁদনা",
প্রাণে প্রাণে বলে, "এ নহে বঞ্চনা,
এযে প্রসব-যন্ত্রণা ঘোর!"
আমি বুঝেছি বুঝেছি, পোহালে যামিনী,
শত পুত্র জিনি পাইব নন্দিনী,
যত অশ্রুরাশি, হবে শুভ্রহাসি,
শ্যামা, চুমি চুমি মুখ তোর,—
হবি অপূর্ব্ব দুহিতা মোর!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

প্রাকৃতিক অভিব্যক্তি

মুনিশ্রেষ্ঠ কপিল বিশ্বের সমস্ত "জড় তত্ত্বকে" এক চরম মহা কারণ হইতে অভিব্যক্ত (Evolved) বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সেই কারণের নাম 'পরা প্রকৃতি' বা 'প্রধান'। এই অভিব্যক্তির স্বরূপ, গতি ও প্রভৃতি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে অগ্রে বুঝিতে হইবে 'জড়' শব্দের অর্থ কি,—এবং সাংখ্যমতে কোন্ পদার্থই বা 'জড়' এবং কোন্ পদার্থই বা চেতন। কারণ, বিদ্যাসাগর মহাশয় চেতন ও অচেতনের যে পরিচয় দ্বারা আমাদের বোধোদয় করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সাংখ্যের কূট দর্শন-কার সেই পরিচয়কে এমন এক অভিনব ও নিগূঢ় বিশ্লেষণের মধ্যে ফেলিয়াছেন, যাহাতে বোধোদয়ের সরল মর্য্যাদা রক্ষিত হওয়া দুষ্কর হইয়াছে। অতএব প্রাকৃতিক অভিব্যক্তি বিচারে আমাদিগকে অগ্রে প্রণিধান করিতে হইবে—

জড় ও চেতন।

কপিল দর্শনের মতে 'পুরুষ' ভিন্ন জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই অচেতন ও জড়; এবং সেই পুরুষ যে শুধুই, জল মাটী প্রভৃতি পরিচিত জড়পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র, তাহা নহে। তাহা শরীর, মন, বুদ্ধি এমন কি অহংভাব বা 'অহংকার' হইতেও ভিন্ন। "শরীরাদিব্যতিরিক্তঃ পুমান্।" (সাং দঃ—১।১৩৬) পুমান্ বা পুরুষ,—শরীর, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও অহংকারাদি হইতে ব্যতিরিক্ত। সুতরাং 'আমি' ও পুরুষ নহি, 'তুমি'ও পুরুষ নহ। সাংখ্য মতে 'তুমি' এবং 'আমি' তথ্যতঃ অচেতন ও জড়,—জল, মাটী, আকাশাদি পদার্থের পর্য্যায়-ভুক্ত। 'আমাদের' সকলকে এই রূপে 'মাটী' করিয়া, কপিল একমাত্র বিশুদ্ধ

'চিৎ'কেই পুরুষ সাব্যস্ত করিয়াছেন। এ হেন 'চিৎ' যে কি, তাহা ত' দেখিতে হয়।

'চিৎ' বলিতে জ্ঞান বা 'জানা-ভাব' বুঝায়। সেই 'চিৎ'এর যাহা 'বিষয়' তাহাই 'জড়'। অর্থাৎ 'জ্ঞানের' যাহা 'বিষয় ও জ্ঞেয়,' 'বেদনার' যাহা 'বেন্থ,' 'দর্শনের' যাহা চরম 'দৃশ্য-স্থানীয়' তাহাই জড় বা অচেতন। এবং জ্ঞেয় বিষয়ের যিনি জ্ঞাতা, বেন্থ বিষয়ের যিনি বেদয়িতা এবং দৃশ্য বিষয়ের যিনি চরম দ্রষ্টা তিনিই জ্ঞান-স্বরূপ পুরুষ। এই দর্শনের মতে জ্ঞান ও জ্ঞাতার মধ্যে কোনই প্রভেদ নাই। উভয়েই অভিন্ন। অর্থাৎ জ্ঞানই জ্ঞাতা এবং জ্ঞাতাই জ্ঞান। "নির্গুণত্বাৎ ন চিদ্ধর্ম্মা" (সাং ১।১৪৬) পুরুষ নির্গুণ বলিয়া, 'চিৎ' পুরুষের ধর্ম্ম (Attribute) নহে, 'চিৎ' পুরুষের স্বরূপ (Essence) অর্থাৎ প্রকাশ স্বরূপ জ্ঞান কোনও 'তুমি' কিম্বা 'আমি'র ধর্ম্ম নহে। 'তোমা' 'আমাকে' আশ্রয় করিয়া বিরাজমান থাকিলেও—তাহা এক স্বয়ং-প্রতিষ্ঠ প্রকাশজ্যোতিঃ। সাংখ্যশাস্ত্র এই জ্যোতিঃ-স্বরূপ চিন্ময় পুরুষকে সূর্য্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া থাকেন। সূর্য্যই যেমন জগৎ-প্রকাশক এবং সূর্য্যের যেমন অন্য কোনও প্রকাশক নাই, তেমনি পুরুষ বা আত্মাই, জড় বিশ্বের প্রকাশক, আত্মার অন্য কোনই আশ্রয়ী প্রকাশক নাই। 'জড়-প্রকাশাযোগাৎ প্রকাশঃ" (সাং ১।১৪৫)—জড়সত্তায় কোনই প্রকাশ-যোগ নাই, সেই জন্য পুরুষ জড়-প্রকাশ-স্বরূপ।

জ্ঞানের অতিরিক্ত যে কোন জ্ঞাতা নাই, ইহা সাংখ্যের এক সূক্ষ্ম যুক্তি। সাংখ্য-সার গ্রন্থে পাওয়া যায়—

> অনুভূতিশ্চিতির্বোধো বেদনং চোচ্যতে পুমান্।
> বেন্থং জড় তমোঽজ্ঞানং প্রধানাদিকমুচ্যতে॥
> বেদনং বেন্থ-সম্বন্ধাৎ বেত্তেত্যভিধীয়তে।
> যথা প্রকাশ্য-সম্বন্ধাৎ প্রকাশোঽপি প্রকাশকঃ॥

অন্বার্থঃ—অনুভূতি, চিতি বা চিদ্ভাব, বেদনা বা বোধকেই পুরুষ বলে। সেই বেদনের যাহা বেন্থ তাহা জড়, তমঃ, অজ্ঞান ও বুদ্ধ্যাদি তত্ত্ব সকল। বেন্থ বিষয়ের সম্বন্ধে যে বেদন বা জ্ঞান তাহাকেই বেত্তা বলে। যেমন প্রকাশ্য বিষয়ের সম্বন্ধে আলোকের যে প্রকাশ তাহাই প্রকাশ্যের প্রকাশক।

ইহার তাৎপর্য্য এই। প্রথমে জ্ঞেয় বিষয়ের দিক্ হইতে জ্ঞান-সত্তা কি বিচার করুন। জ্ঞেয় বিষয় অন্ধ, জড় ও অচেতন—তাহা নিজেকে নিজে জানে না। সেই জড় বস্তুকে প্রকাশ করে কে?—তাহাকে জ্ঞান-সত্তাই প্রকাশ করে। অতএব জ্ঞান জড়ের প্রকাশক।

এখন জ্ঞানের দিক হইতে জ্ঞেয় বিষয়কে দেখুন। জ্ঞান নিজে কি, তাহার স্বরূপ কি? জ্ঞান হইতেছে জড়ের আকার-উল্লেখি জড়ের প্রকাশ-রূপ। তাহা ছাড়া জ্ঞানের অন্য কোন স্বরূপ বা সত্তা নাই। সুতরাং যে জ্ঞান জড়ের প্রকাশক সেই জ্ঞান নিজে জড়-প্রকাশ-স্বরূপ। অতএব—"প্রকাশোঽপি প্রকাশকঃ"।

ইহার একটি দৃষ্টান্ত আছে। আমরা যাহাকে আলোক বলি তাহার রূপ কি?—যে বস্তু প্রকাশ্য এবং আলোক যাহাকে প্রকাশ করে, সেই বস্তুর প্রকাশ রূপই আলোকের রূপ। তাহা ছাড়া আলোকের অন্য কোন রূপ চক্ষু দ্বারা প্রতীত হয় না। অর্থাৎ আলোকের রূপ হইতেছে প্রকাশযোগ্য বস্তুর প্রকাশ-রূপ, এবং আলোকের সেই রূপ হইতেছে প্রকাশ্য বস্তুর পক্ষে প্রকাশক।

কিন্তু জ্ঞান সত্তা 'আমাকে' অধ্যাস বা আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান থাকিলেও, তাহা যে স্বরূপতঃ 'আমা' হইতে স্বতন্ত্র ও নির্লিপ্ত, এ কথায় আপাততঃ আমাদের মহা সন্দেহ উপস্থিত হয়। 'আমি' জ্ঞানও নহি, জ্ঞাতাও নহি, ইহা বুঝা বড় সহজ ব্যাপার নহে। 'আমি-নহি' এমন এক জ্ঞান আমাকে দৃশ্য-স্থানীয় বিষয় করিয়াছে, ইহার সম্পূর্ণ ও সম্যক্ উপলব্ধি যোগী ভিন্ন অন্য কাহারও আয়ত্ত নহে। সাংখ্যের পরম যোগি-গণ, যোগবলে অহংকারের জাল-জঞ্জাল-বিচ্যুত এক নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ আত্ম-চৈতন্যকে প্রথমতঃ উপলব্ধি করিয়া থাকেন। তাঁহারা চিন্মাত্র আত্মার সাক্ষাৎকার

লাভ করেন। সত্যার্থ-দ্রষ্টা বীরবর ভীষ্ম এই বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপ সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—

নির্গুণঃ প্রকৃতিং বেদ, গুণযুক্তামচেতনাম্।
ততঃ কেবলধর্ম্মাসৌ ভবত্যব্যক্তদর্শনাৎ॥ *

অর্থাৎ, সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব আত্মা বা পুরুষ নির্গুণ। সেই নির্গুণ পুরুষই এই গুণ-যুক্তা অচেতনা প্রকৃতিকে জানিতেছেন। অব্যক্ত-স্বরূপা প্রকৃতিকে তিনি দর্শন করেন বলিয়া তিনি কেবল-ধর্ম্মা,—বিবিক্ত জ্ঞানস্বরূপ মাত্র।

দর্শন এই সমুচ্চ আত্ম-জ্ঞানের পদবীর সর্ব্বথা অধিকারী নহেন। সুতরাং উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত সাহায্যে, আমাদিগকে যথাকথঞ্চিৎভাবে চিৎস্বরূপ পুরুষকে অবধারণ করিতে হইবে।

মনে করুন কাল সন্ধ্যাকালে আকাশে রামধনু দেখিয়াছিলাম। যখন উহা দেখিয়াছিলাম তখন 'জ্ঞান' রামধনু বলিয়া এক আকাশস্থ সত্তাকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিল। অর্থাৎ 'জ্ঞান' ঐ বাহ্য সত্তাকে 'বিষয়' করিয়াছিল। অতএব জ্ঞানের বিষয়, ঐ ধনু—জড়।

এখন সে ধনু নাই। কিন্তু ধনুর সেই বিচিত্র রূপটি মনে আছে,—তাহা স্মরণ করিতে পারিতেছি। যখন তাহাকে স্মরণ করিতেছি তখন 'জ্ঞানের' বিষয় কি হইয়াছে?—ধনুর সেই মানস-রূপটিই জ্ঞানের 'বিষয়' হইয়াছে। অতএব সেই মানসরূপ—জড় ও অচেতন।

শুধু তাহাই নহে। যখন কেহ বলে 'আমি একটি ফুল দেখিতেছি',—তখন প্রত্যক্ষভাবে কোন্ কোন্ বিষয় তদাশ্রয়ী বা তাহার জ্ঞানে উপলব্ধ হয়? প্রথমতঃ 'ফুল' বলিয়া একটি বাহ্য বিষয় তাহার জ্ঞানে প্রত্যক্ষ হয়। দ্বিতীয়তঃ 'দর্শন' বা দেখা বলিয়া একটি মানস ব্যাপারও তাহার জ্ঞানে প্রত্যক্ষ থাকে—নতুবা দেখিতেছি বলার কোনই তাৎপর্য্য হয় না। এই মানস ব্যাপারের নাম 'ইন্দ্রিয়'। সাংখ্যেরা স্থূল চক্ষুকর্ণকে ইন্দ্রিয় বলেন না—তাঁহাদের মতে "অতীন্দ্রিয় মিন্দ্রিয়ং" (সাং ২।২৩) ইন্দ্রিয় সকল অতীন্দ্রিয়, অর্থাৎ চক্ষু কর্ণের ব্যাপারসঞ্জাত যে অতীন্দ্রিয় "মানস-ভাব" তাহাই ইন্দ্রিয়। সেই ইন্দ্রিয়ও জ্ঞানের বিষয় এবং জড়।

ইহা ব্যতিরেকে আর একজনও জ্ঞানের 'বিষয়' হইয়াছেন—তিনি 'আমি'। তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে—'আমি দেখিতেছি' 'আমি যাইতেছি', 'আমি করিতেছি' বলার কোনই তাৎপর্য্য থাকিত না। এবং জ্ঞানের সেই বিষয় "আমি" হইতেছি খাটী জনার্দ্দন শর্ম্মা, এবং কোনক্রমেই জয়মর্দ্দ বর্ম্মা কিম্বা নরহরি রায় নহি। সেই মহামান্য 'আমি'র জন্যই বাগান কোঠা তৈয়ারী হইয়াছে, সেই 'আমি'ই তাঁহার সংসারের ধুরন্ধর মালিক ইত্যাদি। সেই 'আমিকে'ও জ্ঞান যখন বিষয়ীভূত করিয়াছে তখন তিনি যতই ধুরন্ধর হউন না কেন, তিনি অচেতন ও জড়। আবার এই জগৎ-লোকারণ্যের "আমির বাজারে"র মধ্যে এই বিশেষ 'আমিকে' যিনি চিনাইয়া দেন তিনি বুদ্ধি। তাঁহার দার্শনিক নাম 'মহৎ'। "অধ্যবসায়" বা নিশ্চিত অবধারণাই তাহার কার্য্য। অহংকারের সঙ্গে মহৎ ও জ্ঞানের প্রত্যক্ষ বিষয় হইয়াছে বলিয়া এই 'আমি'র সঙ্গে অন্য সকল 'আমি'র ভুল হয় না।

এইরূপে চিৎ বা জ্ঞান হইতে বেদ্য বা জ্ঞেয় বিষয়কে পৃথক করিলে, যাহা পাওয়া যায়,—তাহা স্থূল বিষয় হউক, সূক্ষ্ম বিষয় হউক, বহিঃস্থ বিষয় হউক, অন্তরস্থ বিষয় হউক, তাহাই অচেতন ও জড় পদার্থ।

আপত্তি হইবে, বুদ্ধ্যাদি অন্তরস্থ বিষয় ত কোন বস্তু বা দ্রব্য নহে—তাহা ত ফাঁকি, 'খেয়াল' (Idea) মাত্র। কিন্তু আমাদের দর্শন বুঝিতে হইলে এই কথাটিই সর্ব্বাগ্রে মন হইতে বিদায় করিতে হইবে। জ্ঞেয় বিষয় যদি 'আকাশ' কিম্বা 'মনের খেয়ালের' মতও ফাঁকা হয়—তথাপি তাহা ফাঁকা নহে,—তাহা অ-বস্তু নহে, অ-পদার্থ নহে। বুঝিতে হইবে স্থূল হউক, সূক্ষ্ম হউক তাহার কোন না কোন ধাতু আছে। এই জন্য স্বপ্নলব্ধ সিংহাসনও অ-বস্তু নহে, তাহা মনের উপাদান-

* মোক্ষধর্ম্ম, শান্তিপর্ব্ব ৩০৮।১২

নির্ম্মিত এক বাস্তব মানস সিংহাসন। বহির্জগতে তাহার অনুরূপ কোন সিংহাসন নাই বলিয়াই তাহা একেবারে 'শূন্য' 'ফাঁকা' অবস্তু নহে। যাহা শূন্য তাহার কখনই 'সৎ' বলিয়া প্রতীতি হয় না। মন-গড়া সিংহাসন যদি একেবারে শূন্য হইত তবে জ্ঞান-সত্তা তাহাকে মন-গড়া সিংহাসন বলিয়াও জানিতে পারিত না।—"কার্য্যত্বং মহদাদের্ঘটাদিবৎ" (সাং ১।১২৯) মহদাদি বিষয় সকল ঘটাদিবৎ কার্য্যসত্তা। প্রভেদ এই, ঘটের উপাদান মৃত্তিকা স্থূল উপাদান, মহদাদি বিষয়ের উপাদান সূক্ষ্মধাতুক।

ঈথর এবং বিদ্যুৎও সূক্ষ্ম বিষয়—অনেক স্থলে তাহারা নগ্ন ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে। কিন্তু ঈথর-মান-ইলেক্ট্রোমান যন্ত্রে তাহাদের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। যাহাতে মনঃ ধাতুর পরিমাণ হইতে পারে, এমন 'মনোমান' যন্ত্র কোথায়? তাহার অস্তিত্বের পরিমাণ হয় কোন মানে? ইহার উত্তরে আমরা আবার সেই আগে-কার কথাতেই ফিরিয়া আসি—অর্থাৎ জ্ঞানই জগতের বস্তু-মান যন্ত্র, এবং জ্ঞেয় বিষয় মাত্রই কোন না কোন প্রকারের বস্তু ও পদার্থ। যাহা জ্ঞানের মানদণ্ডে আছে—তাহা বাহ্য জগতে না থাকিলেও মনের মধ্যে আছে, এবং মনের মধ্যে থাকিলেও তাহা কোন এক প্রকৃত বিষয়েরই থাকা হয়—'শূন্যের' থাকা হয় না। কারণ মন হইতেছে সূক্ষ্মধাতুক এক পদার্থ।

ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাই—জ্ঞান, আত্মা বা পুরুষ হইতেছে স্বচ্ছ স্ফটিক-সদৃশ। জ্ঞেয় বিষয় জবা-কুসুম সদৃশ তাহাতে ছায়াক্ষেপ করিতেছে। স্বচ্ছ শুদ্ধ নির্ম্মল পুরুষ সেই জবারাগে রঞ্জিত হইয়া বিষয়রাগরক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। এবং জ্ঞান-গত বিষয় রাগই বিষয়ের পরিমাপক হইয়াছে। যে সত্তা জ্ঞানে ছায়াক্ষেপ করে না, তাহারই বস্তুত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু যাহা জ্ঞানে প্রতীয়মান হয়, তাহা অ বস্তু হইতে পারে না।

সাংখ্যের যে জড় ও চেতন বিশ্লেষণ ইহা দর্শন-রাজ্যের মধ্যে এক সম্পূর্ণ অভিনব বিশ্লেষণ তাহা মনে করিবার হেতু আছে। কারণ 'এ-দেশে' কিম্বা 'ও-দেশে' এই বিভাগ ও বিশ্লেষণ যে সর্ব্বথা ও সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হইয়াছে ইহা ভরসা করিয়া বলা যায় না।

'এ-দেশে'—টীকাকারগণ যাহাই বলুন, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন আত্মার চিন্মাত্র-স্বরূপ কখনই স্বীকার করেন নাই। বিশ্বস্ত সূত্রে সংবাদ পাওয়া যায়, "বৈশে-ষিকেরা বলিতেন জ্ঞানের অগোচরেও পদার্থের এক 'প্রাক্-প্রকাশ' আছে। আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইলে সেই 'প্রাক্-প্রকাশে'র 'জ্ঞানাখ্য' প্রকাশ হয়।" * গোতম সূত্র স্পষ্ট বাক্যে সাংখ্য প্রতিষেধ করিয়া বলিতে-ছেন—"বুদ্ধিরুপলব্ধিজ্ঞানমিত্যনর্থান্তরম্।" † বুদ্ধি উপলব্ধি ও জ্ঞান ইহারা অর্থান্তর নহে,—একই অর্থ।

বেদান্ত-দর্শন আত্মার চিৎ ও আনন্দস্বরূপ—উভয়-স্বরূপই স্বীকার করিয়াছেন। সাংখ্যের দর্শন-কার ইহাতে আপত্তি করিয়া তর্কপাদে বলিয়াছেন—"ন একস্য আনন্দচিদ্রূপত্বে—দ্বায়োর্ভেদাৎ"—(সাং-৫।৬৬) একই সত্তার চিৎ-রূপ ও আনন্দরূপ হইতে পারে না—এ দুই রূপ ভিন্ন এবং পরস্পর-বিরোধী। অর্থাৎ আমরা সাংখ্যের জড় ও চেতনের যে বিশ্লেষণ দেখিয়াছি তাহাতে আনন্দ চিতের বিষয় হয়—চিতের রূপ হইতে পারে না।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই উত্তর-বেদান্তের অদ্বৈত-বাদীরা অবিকল সাংখ্যযুক্তি অবলম্বন করিয়াই আত্মার চিদ্রূপ স্থাপনা করিয়া থাকেন। মহামতি ম্যাক্সমূলার অতীব সুসঙ্গত যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে উত্তর-বেদান্ত সাংখ্য দ্বারা বহুধা স্পৃষ্ট হইয়াছিল। ‡ বোধ হয় সেই জন্যই শঙ্করের ন্যায় চতুষ্কোণী অদ্বৈত-বাদীর গ্রন্থেও আমরা হুবহু সাংখ্য-যুক্তি পাইয়া থাকি।

---

* ১।১৪৫ প্রবচন সূত্রের ভিক্ষুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

† ন্যায়সূত্র ১।১।১৫

‡ Six Syastems, p. 215.

জড়প্রকাশকঃ সূর্য্যঃ, প্রকাশাত্মৈব ন জড়ঃ।
বুদ্ধ্যাদিভাসকস্তস্মাৎ চিৎ-স্বরূপস্তথা মতঃ॥ *

সূর্য্য যেমন জড় প্রকাশক, আত্মাও সেইরূপ। প্রকাশ-আত্মা জড় নহে। আত্মা বুদ্ধ্যাদির বিভাসক বলিয়া চিৎ-স্বরূপ নামে অভিহিত হয়।

"এদেশে"—এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বাদানুবাদ নাই। এমন কি Descartes যিনি জ্ঞান-সত্তাকে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র আসন দিয়াছেন, তিনিও জ্ঞানের অতিরিক্ত কোন 'অহং' দেখিতে পান নাই। *Cogito ergo sum*—I think, therefore I am,—ইহাই তাঁহার উক্তি। পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্বের প্রত্যেক ছাত্রই অবগত আছেন, বুদ্ধ্যাদিকে জ্ঞানের অঙ্গীভূত করেন নাই এমন দর্শন-কার অল্পই আছেন।

ইহাতে ক্ষুব্ধ হইবার কোনই কারণ নাই। অহং, বুদ্ধি প্রভৃতি জ্ঞানের এতই সন্নিকৃষ্ট যে তাহার চিদাভাস অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যোগসিদ্ধ তথ্য লইয়া দর্শনের লৌকিক বিচার সর্ব্বত্র সিদ্ধ হইতে পারে না। সেই জন্য বুদ্ধ্যাদির ব্যবহারিক চিত্তা বা চিদ্‌ভাব ভিক্ষুও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—'বুদ্ধেশ্চ যা চিত্তা সা পুরুষ সান্নিধ্যাৎ" †—বুদ্ধির যে চিৎ-ভাব, তাহা পুরুষের সন্নিধিবশতঃ। অর্থাৎ তাহা বাস্তবিক চিত্তাব নহে, তাহা চিদাভাস।

আত্ম-তত্ত্ব-বিচারই সাংখ্যের বৃহত্তম অধ্যায়। জড়-বিচারে সে সমগ্র অধ্যায়কে টানিয়া আনিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু চৈতন্য যে কি তাহা না বুঝিলে জড়কেও বুঝিবার উপায় নাই। সেই জন্যই এই জড়-বিচারে এতদূর পর্য্যন্ত আত্মতত্ত্বে অবগাহন করিতে হইয়াছে। এবং তাহার ফলে আমরা দুই প্রকারের জ্ঞেয় জড় পদার্থের সন্ধান পাইয়াছি। এক জাতীয় জড় পদার্থ,—সূক্ষ্ম ধাতুক ও মনন-বৃত্তিক, তাহা বুদ্ধি, অহংকার, ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রভৃতি। আর এক জাতীয় জড় পদার্থ স্থূল, পৃথিব্যাদি-পঞ্চধাতুক—তাহাই পরিদৃশ্যমান ঘট কলসাদি।

অথচ এই দুই জাতীয় জড় পদার্থ অসংবদ্ধ পৃথক বা স্বতন্ত্র নহে। এক জাতীয় পদার্থ হইতেই অন্য জাতীয় পদার্থের অভিব্যক্তি হইয়াছে। তাহারা এক এক জাতি (Species) বলিয়া চিহ্নিত ও প্রভিন্ন—কিন্তু অন্যতর জাতির উৎপত্তি কারণ বলিয়া অভিন্ন। সূক্ষ্ম-ধাতু হইতে স্থূল-ধাতুর পরিণতি বা বিকার হইয়াছে।

সাংখ্যে জগতের আদ্য ধাতুকে 'পরা' বা 'মূলা' প্রকৃতি বলে। সেই প্রকৃতি হইতে যে সকল 'জাতি'র উৎপত্তি হয় তাহাদিগকে 'বিকৃতি' বলে। সেই জাতির মধ্যে, যে সকল জাতি অন্যতর জাতির উৎপত্তি-কারণ তাহাদিগকে শুধু 'প্রকৃতি' বলে। এমন জাতি আছে যাহা 'বিকৃতি' হইলেও অন্যতর জাতির উৎপত্তি-কারণ বা 'প্রকৃতি'। ইহাদের নাম 'প্রকৃতি-বিকৃতি'।

সাংখ্যকর্ত্তার এই 'প্রকৃতি', 'প্রকৃতি-বিকৃতি' প্রভৃতি বস্তু-বিভাগ চিন্তা করিলে, আমাদের পরিচিত Evolution বাদের তত্ত্ব বিভাগের কথা সহজেই মনে আসে।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই, বিশ্বের নিখিল জড়-প্রবাহ হইতেছে এক ধারাবাহিক অভিব্যক্তির কাহিনী। ইহার চরম প্রস্রবণ পরাপ্রকৃতি। অভিব্যক্তি-পরম্পরার তাহাই "অমূল মূল"। তাহাই মনোজগৎ ও স্থূলজগতের Cosmic-vapour ও Atomic condition। পাশ্চাত্যগণ স্থূল জগতের এক পরম কারণ খুঁজিয়া পান যাহাকে কেহ বলেন Protyle, কেহ বলেন Electron কেহ বলেন Nebulæ এবং কেহ কেহ অন্য কিছু বলেন। কিন্তু আমাদের Protyle ও Nebulæ মূলা প্রকৃতি, শুধু স্থূল জগতের উপাদান নহে তাহা মানস-জগতেরও উপাদান। এবং তাহাই এই বৈচিত্র্যময় জড় বিশ্বের পরম "একঃ।" এই 'বহু' বিচিত্র ও অনেকের মধ্যে সেই একঃ-রই গুণ-শক্তির বিকাশ ও পরিণতি হইতেছে, এই জন্য এ দেশের অভিব্যক্তিবাদের

* সর্ব্ববেদান্ত সংগ্রহ—৬১৯।
† সাংখ্যসূত্র—১।১৬ ভাষ্য।

মূল মন্ত্র হইতেছে—

"একো বহূনাম্ ।"

কপিল নিখিল জড়-বর্গকে চতুর্ব্বিংশতি 'গণ' বা শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। পরা প্রকৃতি তাহার প্রথম 'গণ'। সেই প্রকৃতি হইতে 'মহৎ' বা বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে। মহৎ হইতে 'অহং কার', অহংকার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মাত্র হইতেছে অবিশেষ, ইন্দ্রিয়াত্মক, পৃথিব্যাদি পঞ্চ স্থূল ভূতের উৎপত্তি কারণ। পঞ্চভূত 'বিশেষ' ও স্থূল জগতের ধাতু।

মহদাদি গণ যে কি, তাহার বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্রই সম্ভব। তথাপি, তাহারা যে অনন্ত কালের অভিব্যক্তি প্রবাহে, একটি সুস্পষ্ট প্রভেদ রেখাঙ্কিত (differentiated) স্তর তাহা বুঝিতে কোনই বাধা হয় না। তাহারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র, সত্য ও জাতি। তাহাদের প্রতি জাতিতে অসংখ্য ব্যক্তি, প্রত্যেক সমষ্টিতে অসংখ্য ব্যষ্টি। তাহারা মূলধাতুর পরিণতি বলিয়া বিকৃতি; এবং সেই বিকৃতির মধ্যে যাহারা অবন্ধ্যা বিকৃতি তাহারা প্রকৃতি-বিকৃতি। "মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি-বিকৃতয় সপ্ত" (কা—৩) মহৎ, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সপ্ততত্ত্ব প্রকৃতি-বিকৃতি। কারণ, মহৎ হইতে অহংকার, এবং অহংকার হইতে তন্মাত্র সকল, এবং তন্মাত্র সকল হইতে ভূতসকল উৎপন্ন হয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি অভ্যব্যক্তির যাহা অক্ষয় নির্ঝর, চিরন্তণ প্রস্রবণ—তাহার নাম পরা প্রকৃতি। তত্ত্বসমাসের প্রবীণতম বৃত্তিকার (আসুরি ?) এই প্রকৃতি শব্দের একটি পর্য্যায় দিয়াছেন, তাহা এই—'প্রধান, ব্রহ্ম, পুর, প্রধানক, ক্ষেত্র, অব্যক্ত, অক্ষর, তমঃ ও প্রসূত'। ইহা হইতে বুঝা যায় "কপিল আসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা"—সাংখ্যের পূর্ব্বাচার্য্যেরা—বিশ্বের মূলগত মহা কারণকে অনেক দিক হইতে, অনেক ভাবে, পরিপূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

তাঁহারা দেখিয়াছিলেন বিশ্বের অনন্ত এই জড়-প্রবাহ,—যাহা অনন্তকালে আপনার অপ্রমেয় বিচিত্র ইতিহাস বিরচন করিয়া চলিয়াছে—তাহা কোনও বিশেষ যুগের বা কালের খণ্ডিত কাহিনী নহে। তাহা বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ব্যাপী কোটি কল্পের ইতিহাস। তাহা বিশ্বজননীর অনন্ত সন্তান-সন্ততির এক ধারাবাহিক ঐতিহ্য। তাহার বৈচিত্র্য, বিভেদ, সাদৃশ্যের মধ্যে সেই আদি-মাতারই প্রাণগত কাহিনী যুগ হইতে যুগান্তরে প্রসৃত হইয়াছে। সেই বিশ্ববীজভূতা পরমা প্রকৃতির হৃদয়ে সে অন্তঃরুদ্ধ কাহিনী সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহাই বিশ্বমহাক্রমের পত্রে পত্রে মর্ম্মরিত হইতেছে। তাঁহার প্রাণের নিরুদ্ধ কাহিনী, বিশ্বরূপে আকারিত ও বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। যুগান্তের যোগনিদ্রামগ্ন মহাপুরুষকে বক্ষে করিয়া বিশ্বের অদিতি জননী, প্রলয়ের তমিস্রা নিশায় যে স্বপ্ন ও ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছিলেন, সৃষ্টির প্রথম প্রভাত হইতে তাহাই সত্য ও সম্ভব হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কল্পক্ষয়ের সেই উপমন্ত্রণা যুগারম্ভ হইতে সার্থক হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

এই জন্যই অনৈক্যের মধ্যে যে ঐক্য, বৈচিত্র্যের মধ্যে যাহা অবিচল, ক্ষয়ের মধ্যে যাহা অক্ষয়, অধ্রুবের মধ্যে যাহা ধ্রুব ও নিশ্চিত, তাঁহাই পরা প্রকৃতি। প্রকৃষ্টরূপে এই জগৎ তাঁহারই 'কৃতি' বা কার্য্য বলিয়া তিনি প্রকৃতি। বিশ্ব তাঁহাতেই 'প্রহিত' হয় ("প্রধীয়তে অস্মিন্ ইতি প্রধানং") বলিয়া তিনি প্রধান। ব্যক্তের পূর্ব্বে তিনি অব্যক্ত-রূপ, তাই তিনি অব্যক্ত। সৃষ্টিতে ও প্রলয়ে তাঁহার ক্ষয় নাই বলিয়া তিনি অক্ষর।

শরশয্যাশায়ী কুরুবীর ভীষ্মকে মহারাজ যুধিষ্টির জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'হে মহাবাহো! সাংখ্যমতে ক্ষর ও অক্ষর কাহাকে বলে ?'

ভীষ্ম প্রত্যুত্তরে বলেন—

কৃৎস্নমেতাবত্তাত ! ক্ষরতে ব্যক্ত-সংজ্ঞিতম্।
অহন্যহনি ভূতাত্মা ততঃ ক্ষর ইতি স্মৃতঃ॥
এতদক্ষরমিত্যুক্তং ক্ষরতীদং যথা জগৎ।
জগন্মোহাত্মকং প্রাহুরব্যক্তাৎ ব্যক্তসংজ্ঞিতম্॥

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ৩০২।৩৫-৩৬

ইহার অর্থ—'হে তাত! যাহাকে ব্যক্ত বলে—অর্থাৎ মহৎ হইতে ভূত পর্য্যন্ত ভূতাত্মক তত্ত্ব সকল—দিন দিন পরিণাম ও ক্ষয়কে প্রাপ্ত হইতেছে বলিয়া তাহারা ক্ষর। অব্যক্ত বা পরা প্রকৃতিই একমাত্র অক্ষর। সেই অক্ষর হইতেই জগন্মোমাহাত্মক ব্যক্ত ও ক্ষর সকল উৎপন্ন হইতেছে।'

কার্য্য কারণের অনুলোম গতিতে এই অক্ষরই সৃষ্টি, এবং প্রতিলোম ক্রমে প্রলয়। বিশ্বরূপ সেই অব্যক্তেরই স্ফুটরূপ। জগতের ছন্দে বন্ধে সেই পরা প্রকৃতিরই রাগিণী মূর্চ্ছিত হইতেছে। প্রকাশমানা বিশ্বশক্তিতে সেই অব্যক্তশক্তিই ক্রিয়াশীলা হইয়াছে। এ জগতের সুখ দুঃখ মোহ তাঁহারই মন্ত্রণা। এই গুণময় বিশ্বকে, গুণময়ী বিশ্বজননীই সত্য ও সার্থক করিয়াছেন। বহুর মধ্যে যে লীলা চলিয়াছে তাহা সেই পরম এক অব্যক্তেরই লীলা। জগতের অনৈক্য, বৈচিত্র্য ও বিভেদ সেই 'একের' হৃদয়ে সমঞ্জসীভূত হইতেছে।

একদা রাজা করাল-জনক তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠকে বলেন—'ভগবন্! সাংখ্য মতের 'একত্ব' ও 'নানাত্বে'র বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করি। একই কিরূপে নানা হইতে পারে তাহা বুঝাইয়া দিন।'

বশিষ্ঠ উবাচঃ—

সাংখ্যজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি, পরিসংখ্যা নিদর্শনম্।
অব্যক্তমাহুঃ প্রকৃতিং পরাং প্রকৃতি-বাদিনঃ॥
এতাবদেব তত্ত্বানাং সংখ্যামাহুর্ম্মনীষিণঃ।
সাংখ্যে বিধিবিধানজ্ঞা নিত্যং সাংখ্যপথে রতাঃ॥
অনুলোমেন জায়ন্তে, লীয়ন্তে প্রতিলোমতঃ।
গুণাঃ গুণেষু সততং সাগরস্যোর্ম্ময়ো যথা॥
একত্বং প্রলয়ে চাস্য, বহুত্বঞ্চ যদা সৃজৎ॥
*　　*　　*　　*
একত্বং প্রলয়ে চাস্য বহুত্বঞ্চ প্রবর্ত্তনাৎ॥ *

অস্যার্থঃ—'আমি তোমাকে পরিসংখ্যা অনুসারে সাংখ্য-জ্ঞান বলিতেছি। প্রকৃতি-বাদী সাংখ্যেরা পরা প্রকৃতিকেই অব্যক্ত বলিয়া থাকেন। যাঁহারা সাংখ্যের বিধিবিধানজ্ঞ, যাঁহারা নিত্য সাংখ্যপথে রত, তাঁহারা প্রকৃতি হইতে মহদাদি ত্রয়োবিংশতিতত্ত্ব গণনা করেন। এই সকল তত্ত্ব অনুলোম ক্রমে সৃষ্টিতে উৎপন্ন হয়। এবং প্রতিলোম ক্রমে প্রলয়ে বিলীন হয়। সাগরোর্ম্মির ন্যায় গুণ সকল গুণ হইতে উৎপন্ন হইয়া গুণেতেই বিলীন হয়। প্রলয়েই ইহার একত্ব, এবং সৃষ্টিতে ইহার বহুত্ব। বিরতিতেই ইহার একত্ব এবং প্রবর্ত্তনায় ইহার বহুত্ব।'

অথচ যে বিপুল বিরাট ও বিশ্বব্যাপী 'এক' অনুলোমতঃ সৃষ্টি, এবং বিলোম ক্রমে প্রলয়, তাহা কোন অবশ্য-স্বীকার্য্য পৌরাণিক তত্ত্ব মাত্রই নহে। কারণ, এই পরিদৃশ্যমান ব্যক্তরূপের মধ্যেই সেই অব্যক্ত বিরাজমান। পরিবর্ত্তমান অধ্রুবের মধ্যে-ই ধ্রুব বিদ্যমান। অঙ্কুরও বৃক্ষ-রূপের মধ্যেই বীজ-রূপ রহিয়াছে। 'ব্যক্তির' মধ্যেই 'জাতিত্ব' এবং 'জাতিত্বের' মধ্যেই 'পরা-জাতিত্ব।' পরিধিতে যাহা চলিষ্ণু শক্তি, কেন্দ্রেই তাহা অবিচল স্থিতি। কার্য্য-সত্তার মধ্যেই কারণের লীলাবিভ্রম। সৎকার্য্য-বাদের ইহাই মূল মন্ত্র।

কারণের মধ্যে যাহাকে এক, পরিমাণহীন ও অব্যক্ত শক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, কার্য্যের মধ্যে তাহাই বহু, পরিমাণযুক্তও ব্যক্তরূপে সিদ্ধ হয়। সীমার মধ্যে অসীমেরই বাঁশী বাজিয়া থাকে। সামঞ্জস্যকে অবলম্বন করিয়াই প্রভেদ সার্থক হইতে পারে। নতুবা প্রভেদ এক উচ্ছৃঙ্খল, অপ্রকৃত, অ-জাগতিক প্রভেদ হইয়া দাঁড়ায়। 'এক' আছে বলিয়াই 'বহু' স্ব-ইচ্ছাক্রমে বহু হইতে পায় নাই—এক সংযত ও সংহত বহু হইয়াছে। সেই জন্য 'বহু', নৃশৃঙ্গ ও আকাশকুসুম না হইয়া—জগতের সংযত, পরিদৃশ্যমান সত্যকার 'বহু' হইয়াছে।

---

* মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব

বস্তুত্বের যে সত্য তাহা একত্বের দ্বারাই সংযত। ইহার ফলে বিশ্বব্যাপক কোনও 'এক' কে আশ্রয় করিয়াই এই জগৎ বিকশিত হইতেছে। বিশ্ব এক মধ্য-মেরুর চারিদিকে বিবর্ত্তিত হইতে হইতেই আপনার নির্দ্দিষ্ট অক্ষ-পথে অগ্রসর হইয়াছে।

"ভেদানাং পরিমাণাৎ অন্বয়াৎ, শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ।
কারণ-কার্য্য-বিভাগাৎ, অবিভাগৎ, বৈশ্বরূপস্য॥
কারণমস্তি অব্যক্তম্——(কা ১৫)

অর্থাৎ, বিশ্বরূপের ভেদসকলের পরিমাণ দৃষ্ট হয়। সেই পরিমাণই ভেদের নির্দ্দেশক। বিশ্ব-নিয়মে দেখা যায় 'অ-পরিমিত' কারণ-সত্তাই, পরিমাণের হেতু। পরিমাণ বিহীন মৃৎপিণ্ড হইতে পরিমিত ঘট কলসাদির উৎপত্তি হয়। ব্যক্তমাত্রই যখন জ্ঞানের মানদণ্ডে এক এক পরিমাণ বিশিষ্ট, তখন নিশ্চিতভাবে অনুমান হয় যে ইহাদের 'পরিমাণ-হীন' কোনও অব্যক্ত কারণ আছে। আবার দেখা যায় ভেদ সকল পরস্পর বিভিন্ন হইলেও তাহারা অন্বয়-যুক্ত। তাহাদের মধ্যে এক সম্বন্ধও পাওয়া যায়। বিশ্বকারণ প্রকৃতিতেই তাহারা সমন্বিত হইতে পারে। কার্য্য-সত্তাতে শক্তি দৃষ্ট হয়—তাহা কার্য্য-শক্তি বলিয়া সিদ্ধ হইতে পারে না,—তাহা কারণ-শক্তি। কার্য্য ও কারণ ভিন্ন—ইহা হইতে জানা যায় কার্য্যসত্তা ও কারণসত্তা এক নহে। কিন্তু তাহারা অভিন্নও বটে—যে হেতু কারণই কার্য্যে পুনরাবৃত্তি করে। ইহা হইতে অবধারিত হয় এই বিশ্বকার্য্য হইতে ভিন্ন এক অব্যক্ত অভিন্ন বিশ্বকারণ আছে।

বর্ত্তমান এভোলিউসন-বাদেরও যে ইহাই মূলগত যুক্তি তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা কতক আভাস পাইয়াছি। অব্যক্তের (undifferentiated) ব্যক্ত হওনই (differentiation) যে অভিব্যক্তি—বর্ত্তমান বিজ্ঞান ইহার সাক্ষী।

কিন্তু জগতের আদিম কারণ 'অব্যক্ত'—যাহার সত্তা গুণ ও শক্তি, পরিদৃশ্যমান ব্যক্তের হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়া জগতে স্পন্দিত হইতেছে—তাহা শুধুই এক বিচারসিদ্ধ সম্বন্ধ নহে। তাহা চিত্তের অবস্থা বিশেষে জ্ঞানের প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বিষয়। এই অব্যক্ত সত্তা, বিশ্বব্যাপক হইলেও অতীব সূক্ষ্ম বিষয়। "সৌক্ষ্মাৎ তদনুপলব্ধিঃ" (সাং—১।১০৯)—অতীব সূক্ষ্ম বলিয়া তাহার উপলব্ধি হয় না। কিন্তু "যোগজ ধর্ম্মস্য চিত্তোত্তেজকতয়া প্রকৃতিপুরুষাদীনাং প্রত্যক্ষপ্রমা ভবতি"—যোগজ ধর্ম্মের দ্বারা উপলব্ধির উত্তেজকতা হইলে পুরুষ ও প্রকৃতি দুইই প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় হয়। যে সকল যোগীরা এইরূপ প্রত্যক্ষভাবে প্রকৃতিকে উপলব্ধি করেন তাঁহারা দেখেন বিশ্বকারণ প্রকৃতি—

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং।
তথা চ নিত্যং রসগন্ধবর্জ্জিতম্॥
অনাদিমধ্যং মহতঃ পরং ধ্রুবম্।
প্রধানমেতৎ প্রবদন্তি সুরয়ঃ॥

বিশ্ব জগৎ রূপরসশব্দাদি পরিমাণবিশিষ্ট। কিন্তু সুরিগণ বলেন, অব্যক্ত প্রধান অশব্দ অরূপ ও অব্যয়। তাহা নিত্য ও রসগন্ধবর্জ্জিত। তাহা মহতের পর, ধ্রুব এবং তাহার আদি ও মধ্য নাই। তাহা বিশ্বব্যাপী।

সাংখ্য জড় বিচারে এইরূপেই বহুর অভিব্যক্তি প্রণিধান করিয়াছেন। তাঁহার সেই অভিব্যক্তির মন্ত্র একো বহুনাম্'—এবং আমরা মনে করি এই মন্ত্রই ভারতবর্ষীয় প্রতিভার চিরদিনের নিজস্ব। উপনিষদ্ ও শ্রুতির সময় হইতে অদ্যাবধি, আমাদের দর্শনে, গীতায়, ইতিহাসে, অর্চ্চনায়, এমন কি বিজ্ঞানেও এই ঐক্যের রাগিণীই বাজিয়া আসিতেছে। উপনিষদে আমরা কি দেখি? সেখানে ঋষির মনীষাপ্রদীপ্ত প্রজ্ঞা কি দেখিতেছে?—পাশ্চাত্যগণ বলেন তাহা Rhapsody—উচ্ছ্বাস মাত্র। কিন্তু তাহা কেবলই অসমঞ্জস ভাবপুঞ্জের ফেনা নহে। তাহা উচ্ছ্বাস সত্য, কিন্তু সে উচ্ছ্বাস এক পরম সঙ্গত উচ্ছ্বাস। ঋষির জ্বলমান মন্ত্র,—ছন্দে, গানে, হুংকারে, হাহাকারে এবং 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'র তীব্র উদ্দীপনার মধ্যে সেই 'একেরই' রণভেরী বাজাইতেছে। শুধু বিচারের বিশীর্ণ যুক্তি দ্বারা নহে,—কিন্তু উদার বিস্ময়, ভক্তি ও

ভয়ের মধ্য হইতে তিনি বিরাট 'এক'কেই পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিতেছেন।

উপনিষদের পরযুগ দার্শনিকের অধিকার। সে যুগে ঋষির অগ্নি-উচ্ছ্বাস প্রশান্ত হইয়াছে। তখন দর্শন অবনত মস্তকে পূর্ব্ব যুগের জ্বালাময় সত্যকে অঙ্গীকার পূর্ব্বক তাহার নাম দেন শ্রুতি। এবং তখন তাঁহার কার্য্য হয় সেই বীত-তাপ গলিত-বহ্নি-প্রক্রতির বিভাগ ও বিশ্লেষণ। তাঁহাকে মন্ত্র সকলের সম্বন্ধ, সংস্থিতি, বৈচিত্র্য, পরিণতি ও সঙ্গতি দেখিতে হয়। তাঁহাকে তত্ত্ব সকলের অন্বয় ও আভিজাত্য খুঁজিয়া মেলবন্ধ করিতে হয়। উত্তর আরণ্যকে এই বিভাগ ও বিশ্লেষণ-ক্রিয়ার সুস্পষ্ট আরম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কারিকা ও সূত্র সাহিত্যের মধ্যেই অন্যোন্যসঙ্গত শ্রেণীবিভাগ, এবং বিচারের শাণিত তীক্ষ্ণতা অনুভূত হয়। কিন্তু সেই বিভাগ ও বিচার অবশেষে আসিয়া দাঁড়ায় কোথায়?—তাহার চরম সঙ্গতিলাভ হয় কিসের মধ্যে?—সেই ঋষির 'একের' বিশাল ক্ষেত্রেই পঞ্চাঙ্গ বিচার চরম সঙ্গতি ও নির্বৃতি লাভ করে। সেই জন্যই আমাদের ষড়দর্শনের মুখ্যতম দর্শন সকল একনিষ্ঠ।

পশ্চিম দেশের তত্ত্বালোচনাও যে বরাবর একনিষ্ঠ অন্বেষণাকেই আশ্রয় করিয়া আছে ইহা আমরা বলিতে পারি না। দেখা যায় বরং বর্ত্তমান বিজ্ঞান বিপরীত পন্থা অবলম্বন করিয়াই ধন্য ও সফল হইয়াছে। এমন বিজ্ঞান কমই আছে যাহার পরিধির মধ্যে বিশ্বের সমস্ত তত্ত্বের সংস্থান হয়। বৈজ্ঞানিকের জগৎ কোঠায় কোঠায় বিভক্ত। তিনি আপিসের খোপে খোপে এক এক টুক্‌রা জগৎ লাল ফিতা বাঁধিয়া তুলিয়াছেন। কোন বাণ্ডিলের মাথায় নাম দিয়াছেন Biology, কোন বাণ্ডিলকে বলিতেছেন Chemistry। তাঁহার এক ডিপার্টমেণ্ট অন্য ডিপার্টমেণ্টের উপর প্রায়ই খড়্গহস্ত। তিনি 'বহুকে' তাঁহার গণ্ডীর সীমানার মধ্যে 'এক' করিয়া দেখিতে পটু হইলেও, গণ্ডীর বাহিরে তাঁহার সবই অবিশ্বাস ও উপহাস ও "mere philosophy".

বলা বাহুল্য ইহাতে তাহার লোহালক্কড়ের কারখানার কাজের সুবিধার অন্ত নাই। হিসাবে তাঁহার বিন্দুটি বিসর্গটি পর্য্যন্ত বাদ পড়িতেছে না। তিনি তাঁহার "নোক্তা চূণী" হইতে, পেষণ করিয়া 'বৈজ্ঞানিক তৈল' বাহির করিয়া লইতেছেন। তাহাতে তাঁহার কারবারের খাতা মুনাফায় একেবারে ভরিয়া উঠিতেছে।

আর আমাদের একনিষ্ঠ বিশ্বব্যাপী দর্শন ও উপনিষদ আমাদের কি উপকার করিয়াছে?—আমাদিগকে কাপড় ছাড়াইয়া, কৌপীন পরাইয়া গাছতলা নির্দ্দেশ করিয়াছে। আমরা কারবারি নহি,—আমরা গরীব।

তথাপি যাহা আসিবার তাহা আসিবেই। তাহা লাভ লোকসান মানিবে না—তাহা আসিবেই। দরজা বন্ধ করিয়া দিলে তাহা ছাপ্পর ফুঁড়িয়া, জানালা ভাঙ্গিয়া ঘরে ঢুকিবেই। তাই দেখা যায়, বৈজ্ঞানিক আপিসের প্রতি ডিপার্টমেণ্টেই জগৎব্যাপী ঐক্যের একটা সন্দিগ্ধ হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার উদাহরণ খুঁজিতে বেশী দূর যাইতে হইবে না। এভোলিউসন-গুরু Darwin তাঁহার Evolution দেখিয়াছিলেন জীবনতত্ত্বের মধ্যে, তাঁহার "Organism" জীব জগতে ঝগড়া লড়াই করিয়া কোনমতে প্রাণরক্ষা করিয়া অভিব্যক্তি প্রবাহকে অগ্রসর করিতেছিল। কিন্তু ইউরোপের আর একজন বড় বৈজ্ঞানিক তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন—

"The developmental theory of Darwin is not needed to enable us to understand the regular progress and harmony of the complete series of organic forms, from the simple to the more perfect.

"The existence of general laws of nature explains this harmony, even if we assume that all "beings' have arisen separate-

ly and independently of one another. Darwin forgets that inorganic nature, in which there can be no thought of genetic connection of forms, exhibits the same regular plan and harmony as the organic world, and that, to cite one example only, there is as much *natural system* of minerals as of plants and animals.—*Professor Kolliker* "On the Darwinian Hypothesis.'

জগতের এই 'Harmony', 'Natural' system এবং 'General laws of Nature'-এর উপরই আমাদের একনিষ্ঠ অভিব্যক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত। হার্ব্বার্ট স্পেন্সর প্রমুখ মনীষিবর্গ সেই ব্যাপক একনিষ্ঠ অভিব্যক্তির সংবাদ নানা ছন্দে আশংসা করিতেছেন। উন্নত পদার্থবিদ্যা দিন দিন বিশ্ব-ঐক্যের মন্ত্রে দীক্ষালাভ করিতেছে। ইহার ফলে হয়ত কোন দিন,—কোনও অনাগত শুভক্ষণে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম—Kipling-এর বাণীকে ব্যর্থ করিয়া এক চিরন্তন অখণ্ড বিশ্বব্যাপক সত্যের চন্দ্রাতপ-তলে আসিয়া মিলিয়া যাইবে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ হালদার।

কুড়ো

(গল্প)

(১)

অল্পবয়সে একটী সন্তান হইয়া মারা যাওয়ার পর হইতেই, অবিনাশ বাবুর স্ত্রী হেমলতা যেন কি এক রকম হইয়া গিয়াছিল। কেহ না ডাকিলে খাইতে যাইত না, কেহ না বলিলে স্নান করিত না—কেবল অন্যমনস্ক হইয়া দিন রাত কি ভাবিত, কেহ কথা কহিলে বা কোনও কিছু জিজ্ঞাসা করিলে নিতান্ত ভাসা ভাসা ভাবে দুই এক কথার উত্তর দিত। ডাক্তারেরা বলিয়াছিলেন, কোনও একটা গভীর আঘাতেই মনের ওরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে—কিছু দিন যাউক আপনা হইতেই সারিয়া যাইবে। মধ্যে মধ্যে দেশ ভ্রমণাদিতে কিছু উপকার হইতে পারে। অবিনাশ বাবু এই উপদেশ অনুসারে কায করিতে অবহেলা করেন না—অফিসের ছুটি হইলেই স্ত্রীকে লইয়া দেশ ভ্রমণে বাহির হন।

সেদিন অবিনাশ বাবু স্ত্রীকে লইয়া তারকেশ্বরে গিয়াছিলেন, সঙ্গে তাঁহার ভগিনী রমা ছিল। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেল কোম্পানীর গাড়ী মধ্যপথে 'বানচাল' হইয়া যাওয়ায়—অর্থাৎ এঞ্জিন খারাপ হইয়া যাওয়ায় রাস্তার মধ্যেই হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল। রেল লাইনের পাশেই দুইটি কুকুরছানা খেলা করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে একটি—কি মনে ভাবিল বলা যায় না—খেলা ছড়িয়া, গাড়ীর যেদিকটায় স্ত্রীলোকের কামরা, সেই দিকেই ছুটিয়া গেল। গাড়ীর নিকটে গিয়া গম্ভীর ভাবে গাড়ীখানার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হেমলতাও এতক্ষণ কুকুরছানা দুইটির খেলা দেখিতেছিল, এক্ষণে রমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ঠাকুরঝি, দেখ কেমন সুন্দর একটি কুকুরছানা!"

হেমলতার কথায় রমা গাড়ীর জানালার ধারে আসিয়া কুকুরছানাটীকে দেখিয়া বলিল, "বাঃ বেশ ত!" পরে তাহার গবেষণা-তৎপর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কিরে, গাড়ীতে আসবি?"

কথাটার অর্থ সেই চতুষ্পদের বোধগম্য হইল কিনা

বলিতে পারি না, কিন্তু সে বরাবর আসিয়া লাফাইয়া গাড়ীর 'পা-দানের' উপর উঠিয়া পড়িয়া লেজ নাড়িতে আরম্ভ করিল—ভাবখানা যেন, "দাওনা, গাড়ীর দরজাটা একবার খুলে দাওনা,—যাই একবার তোমাদের কাছে।"

রমা বলিল, "বৌ, ও বোধ হয় গাড়ীর ভিতর আসতে চায়। দেব দরজাটা খুলে?"

হেমলতা উত্তর করিল, "দাওনা,—আহা বেশ কুকুরটি!" গাড়ীর দরজা খুলিবামাত্র কুকুরছানাটি লাফাইয়া একেবারে হেমলতার কোলে গিয়া উঠিল—পরে গাড়ীর জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া নিজের পূর্ব্বতন ক্রীড়া-সঙ্গীর দিকে চাহিয়া রহিল—বোধ হয় তাহাকে মনে মনে বলিতেছিল, "দেখ, আমি কেমন গাড়ীতে চ'ড়েছি।" ক্রমে 'এঞ্জিন' ঠিক হইল, গাড়ী ছাড়িয়া দিল—কুকুরছানাটি কিন্তু আর হেমলতার ক্রোড় হইতে নামিবার কিছুমাত্র চেষ্টা করিল না।

সেই বেঞ্চেই একজন বৃদ্ধা বসিয়া ছিলেন—তিনি বাবা তারকনাথ দর্শনজনিত পুণ্য সঞ্চয় করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন। প্রথমটা তিনি দুই একবার তাঁহার এই অপরিণতবয়স্কা সঙ্গিনী দুইটিকে, কুকুরছানাটা ফেলিয়া দিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার কথায় কেহই কর্ণপাত করিল না। কুকুর শাবক সংস্পর্শে পাছে তাঁহার সদ্যঃসঞ্চিত পুণ্যরাশি নষ্ট হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় তিনি সে বেঞ্চখানি ছাড়িয়া গাড়ীর এক কোণে অপর একখানি বেঞ্চে গিয়া সাবধানে উপবেশন করিলেন এবং তাঁহারই সমবয়স্কা অপর এক বৃদ্ধার সহিত 'আধুনিক হিন্দুসমাজের আচার হীনতা,' মেয়ে ছেলেছেদের লেখাপড়া শেখার কুফল প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

(২)

কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া তাহার নাম হইল, "কুড়ো"। কুড়োকে পাইয়া হেমলতার স্বভাবের অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। ক্রমে সে নিজের বেশভূষার দিকে কিছু কিছু দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। গৃহস্থালীর কাযকর্ম্মও কিছু কিছু দেখিতে লাগিল। অবিনাশ বাবুর জলখাবারটা এখন সে নিজেই তৈয়ার করে, এমন কি এক আধ দিন রমার সহিত এক আধ বাজী তাস খেলাও যে না হয় তাহা নহে। কিন্তু সকল কাযেই কুড়ো থাকে তাহার সঙ্গী—কুড়ো কাছে না থাকিলে তাহার কোনও কাযেই মন লাগে না। জলখাবার তৈয়ারী করিবার সময় কুড়ো কাছে না থাকিলে হয় ত কচুরীগুলা পুড়িয়া যায়, না হয় মোহনভোগে চিনি দিতে ভুল হইয়া যায়, না হয় এমনই আর কিছু একটা গোলযোগ ঘটে। পাণ সাজিবার সময় কুড়ো কাছে না থাকিলে পাণ সাজা ভাল হয় না—হয় চূণ বেশী হইয়া যায়, না হয় খদির বেশী হইয়া যায়, পাণ খাইবার সময় অবিনাশ বাবুর হয় জিব পুড়িয়া যায়, না হয় অতিরিক্ত তিক্ত লাগে—তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলেন, "আজ কুড়ো কাছে ছিল না বুঝি?" হেমলতা অপ্রতিভ হইয়া পড়ে, কোনও দিন মুখখানি লাল হইয়া উঠে, কোনও দিন চোখের কোণ দুটি জলে ভরিয়া যায়। 'বেগতিক' দেখিয়া অবিনাশ বাবু কুড়োকে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দেন; কুড়ো আসিলে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া হেমলতা ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়।

কুড়ো হেমলতার পুত্রের স্থান অধিকার করিয়াছিল। সকাল বেলাই কুড়ো এক বাটি গরম গরম দুধ খাইতে পাইত। বেলা ৯।১০ টার সময় হেমলতা সাবান দিয়া গা রগড়াইয়া কুড়োকে স্নান করাইয়া দিত। মধ্যাহ্নে আহারে বসিয়া হেমলতা নিজে না খাইয়া আগে মাছ মাখিয়া কুড়োকে ভাত দিত, তাহার পর কুড়োও খাইতে আরম্ভ করিত, সেও খাইতে আরম্ভ করিত। রাত্রে শয়নের সময় কুড়ো কোলের কাছে না থাকিলে তাহার ঘুম হইত না।

কুড়োর গুণও ছিল। যত লোকের মধ্য হইতেই হউক না কেন, হেমলতাকে চিনিয়া লইতে তাহার

মোটেই বিলম্ব হইত না। কুড়োর উপদ্রবে বাড়ীতে কোনও ছাগল বিড়াল বা অন্য কুকুরের প্রবেশ করিবার উপায় একেবারেই ছিল না। এতদ্ভিন্ন কুড়োর আর একটা মহৎ গুণ ছিল, মানবের তৃতীয় রিপুটাকে সে এরূপভাবে দমন করিয়াছিল যে, সে ব্যাপার যিনিই দেখিতেন তিনিই আশ্চর্য্য না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। অবিনাশ বাবুর ভাত বাড়িয়া হেমলতা তাঁহাকে ডাকিতে যাইত। কুড়ো থাকিত সে সময় সেখানকার প্রহরী। রান্না ঘরের 'চৌকিদারই' ছিল কুড়ো। গৃহস্থকে না বলিয়া মৎস্য বা দুগ্ধ সংগ্রহ মানসে কোনও দুষ্টবুদ্ধি মার্জ্জার বা তথাবিধ অন্য কোনও জীব রান্না-ঘরে অনধিকার প্রবেশ করিলে কুড়োর সহিত তাহার তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া যাইত। একবার এইরূপ এক যুদ্ধে কুড়োর অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তথাপি সে নিজ কর্ত্তব্য পালনে পশ্চাৎপদ নয়।

(৩)

এত গুণ থাকিলেও কুড়োর যে একটু দোষ না ছিল তাহা নহে। লোভকে সম্পূর্ণভাবে দমন করিতে পারিলেও, ক্রোধকে সে মোটেই আয়ত্ত করিতে পারে নাই। ভাঁড়ার ঘরে মূষিক বা অন্য কোনও শীকারের অনুসরণ করিবার সময় সে প্রায় দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভাঁড়ার ঘরের দ্বার খোলা পাইলেই সে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিত। হাঁড়িকুঁড়ি রাখিবার একখানি ভাঙ্গা 'তক্তাপোষ' তথায় বিছানো আছে। কুড়ো তাহার তলায় গিয়া অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত,মূষিক বাহির হইলেই সে তাহাকে ধরিতে ধাবমান হইত। মূষিক ত গিয়া নিজের গর্ত্তের ভিতর প্রবেশ করিত, কিন্তু কুড়ো মূষিককে ধরিতে না পারিয়া নিষ্ফল ক্রোধে ভাঁড়ার ঘরের ভিতর লাফালাফি আরম্ভ করিয়া দিত এবং ফলে তেলের ভাঁড় ফেলিয়া, ঘিয়ের ভাঁড় উল্টাইয়া, জলের কলসী ভাঙ্গিয়া ক্রোধে ক্লান্ত হইয়া অবশেষে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইত।

প্রথম প্রথম কয়েক দিন হেমলতা এবম্বিধ উপদ্রব বিনাবাক্যে সহ্য করিয়াছিল। কিন্তু একদিন সহ্য হইল না—একটু রাগ হইয়া গেল। ক্রোধের ভরে বলিয়া ফেলিল, "রোজ রোজ তুই এমনই করে জ্বালাতন করবি পাজি? বেরো এখান থেকে।" কুড়ো বোধ হয় কথাটা বিলক্ষণই বুঝিল। একবার কাতর নয়নে হেমলতার মুখের দিক চাহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

এই সামান্য একটা কথায় যে কুড়ো বাড়ী ছাড়িয়া পলাইবে, এ কথা হেমলতা কল্পনাও করিতে পারে নাই; কাযেই সে তখন আর কুড়োর কোনও সন্ধান করিল না। আহারের সময় কুড়োর খোঁজ পড়িল—তাই ত কুড়ো গেল কোথা? খোঁজ খোঁজ, ভাঁড়ার ঘরের তক্তপোষের তলে, শোবার ঘরে আলমারির ফাঁকে, বৈঠকখানার ফরাসের উপর প্রভৃতি নানাস্থানে কুড়োর অনুসন্ধান করা হইতে লাগিল। কিন্তু কোথাও কুড়োকে পাওয়া গেল না।

রমা আসিয়া বলিল, "বৌ খেতে চল।" কোথাও কুড়োকে না পাওয়ায় হতাশ হইয়া হেমলতা বারান্দায় বসিয়া পড়িয়াছিল। রমার কথা শুনিয়া বলিল—"চল যাই।" "তবে ওঠ"—বলিয়া রমা হাত ধরিয়া টানিল।

একদিন হেমলতা এক বিবাহ বাড়ীতে নিমন্ত্রণে গিয়াছিল; কুড়ো বাড়ীতে ছিল; সমস্ত দিন সে কিছু খায় নাই, চুপ করিয়া পড়িয়াছিল। তাহার দুই চোখ দিয়া অনবরত জল পড়িয়াছিল—রাত্রে হেমলতা ফিরিয়া আসিয়া তাহার কাছে বসিয়া খাইলে তবে সে খাইয়াছিল। সেই কথাটা এখন হেমলতার মনে পড়িয়া গেল। মনে হইল, "তাইত, সে আমাকে 'ফেলে' খায় নি, আর আমি তাকে ফেলে খাব?"

হেমলতা উঠিতে যাইতেছিল আবার বসিল। বলিল, "না ঠাকুরঝি, তোমরা খাওগে, আমি এখন খাব না।"

রমা বলিল, "কেন?"

হেমলতা বলিল, "আমার খেতে না দেখে সে সমস্ত খায় নি, আজ সে এখনও খায় নি, আর আমি খাবো?"

রমা বলিল, "কোথায় গেছে, এখনি হয় ত আসবে।"

হেমলতা উত্তর করিল, "তোমরা এখন খাওগে আমি একটু পরে খাব।"—অগত্যা রমা প্রস্থান করিল।

হেমলতা উঠিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। একদিন কি একটা কারণে সে কুড়োকে একটা চড় মারিয়াছিল, কুড়ো সেদিন টেবিলের তলে লুকাইয়া বসিয়া ছিল,আজও যদি থাকে! তাড়াতাড়ি টেবিলের তলায় গিয়া দেখিল,না, সেখানে কুড়ো নাই। কোনও কারণে মনে কষ্টের উদয় হইলেই হেমলতা "আনন্দমঠ" খানি পাঠ করিত—আজও কুড়োকে ভুলিবার জন্য সে আনন্দমঠ লইয়া বসিল। বইখানি খুলিয়া দুই এক খানি পাতা উল্টাইল—পড়া হইল না। মনে হইল, অন্যদিন এরূপ ভাবে বই পড়িতে বসিলেই কুড়ো আসিয়া কোলের কাছে বসে—কিন্তু আজ?—আজ সে কৈ? কুড়োকে মনে, পড়িতেই চখের কোল দুটি জলে ভরিয়া উঠিল, আর বই পড়া হইল না। হেমলতা বই রাখিয়া দিল। সে একটা পশমের 'গলাবন্ধ' বুনিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কাযটা শেষ হয় নাই, ভাবিল এই সময় সেটা শেষ করিয়া ফেলি। কিন্তু তাহাও করা হইল না। পশম হাতে করিয়াই মনে হইল, "অন্য দিন কায করিবার সময় কুড়ো আসিয়া কোলে মাথা দিয়া শুইয়া থাকিত, কিন্তু আজ সে কোথায়?" আর কায করা হইল না। হেমলতা উল রাখিয়া দিল। একবার মনে ভাবিল, 'একটা কুকুর বইত নয়! গেছে গেছেই—তার জন্যে আবার এত শোক কেন?'

হেমলতা মধ্যে মধ্যে এক' একটা কবিতা লিখিত। ভাবিল, এই সময় একটা লিখিয়া ফেলি। কাগজ কলম লইয়া বসিল। লিখিতে বসিয়াই মনে পড়িল, অন্য দিন যখন সে লিখিতে বসে, তখন কুড়ো আসিয়া তাহার কোলে মাথা দিয়া শুইয়া থাকে, সে কুড়োর গায়ের উপর কাগজ রাখিয়া লিখিয়া যায়—কিন্তু আজ? আজ কুড়ো কৈ? অবাধ্য চোখের জল আর বারণ মানিল না, ঝর ঝর করিয়া গড়াইয়া পড়িল। চোখের জল মুছিয়া হেমলতা পুনরায় লিখিতে চেষ্টা করিল। মনে কি ভাবিল, তাহার পর কবিতাটীর নাম দিল "নদী ও সময়।" তাহার পর কবিতা আরম্ভ করিল লিখিল—

কুড়ো রে, কুড়ো রে,
তুই কোথা গেলি রে!

আবার অবাধ্য চোখের জল ঝর ঝর করিয়া ঝরিতে লাগিল। কাযেই আর লেখা হইল না। দুই হাতে যত মোছে ততই আবার গড়াইয়া আসে। চোখের জল বন্ধ না হইলে লেখা হয় কিরূপে?

বেলা ২টার সময় রমা আসিয়া বলিল, "ও বৌ খাবি আয়, তোর জন্যে যে সবাই বসে রয়েছে।"

হেমলতা বলিল, "তোমরা খাওগে না ঠাকুরঝি, আমি একটু পরে খাব।"

রমা বলিল, "দূর! তাই কি হয়? একটা কুকুরের জন্যেই এত কেন ভাই! কোথায় গেছে এখুনি আসবে হয় ত।"

হেমলতা কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, "না ভাই সে আর আসবে না, আমি যে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি।"

রমা বলিল, "হ্যাঁ কুকুরে নাকি আবার মানুষের কথা বুঝতে পারে! দুপুর বেলা ঘরে বসে উপস করে' কি চোখের জল ফেলতে আছে? ওতে দাদার অকল্যাণ হবে যে! আয় খাবি আয়, তোর জন্যে সবাই বসে র'য়েছে।"

না খাইলে স্বামীর অকল্যাণ হইবে শুনিয়া হেমলতা আর স্থির থাকিতে পারিল না। "তবে চল"—বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

আহারে বসিয়া মুখে ভাত তুলিতে গিয়া তাহার মনে হইল, "আহা অন্য দিন কুড়ো আমার, এখানে বসে থাকত,আজ সে কৈ?" আর মুখে ভাত উঠিল না। চোখে জল আসিয়া পড়িল। রমা তাড়া দিয়া বলিল,"ওকি বৌ ভাত খা।" রমার তাড়ায় হেমলতা খাইতে লাগিল। মাছ

খানি মুখে তুলিতে গিয়া মনে হইল, "আহা কুড়ো আমার মাছ মেখে ভাত খেতে বড় ভালবাসে।" আর মাছ খাওয়া হইল না। রমা দেখিয়া আবার তাড়া দিল— কিন্তু না হেমলতা আজ আর খাইতে পারিল না। ভাত লইয়া বার কতক নাড়া চাড়া করিল, দুই একবার জল খাইল তাহার পর শেষে উঠিয়া পড়িল।

অবিনাশ বাবু সন্ধ্যাকালে আফিস হইতে আসিয়া বড় বিপদে পড়িলেন। জলযোগ করিতে বসিয়া একখানা কচুরী মুখে দিয়া দেখেন বেজায় তিক্ত—কচুরী খানা একেবারে পুড়িয়া গিয়াছে। কাযেই ফেলিয়া দিতে হইল। আর একখানা মুখে দিয়া দেখেন যে সেখানা একেবারে কাঁচা, অখাদ্য। আলুর দম মুখে দিয়া দেখেন যে সেটা 'বেজায়' মিষ্ট, বোধ হয় চিনির রসে আলুগুলাকে সিদ্ধ করা হইয়া থাকিবে। মোহনভোগ মুখে দিয়া দেখেন যে তাহাতে এত বেশী লবণ পড়িয়াছে যে সেটা মুখে করে কাহার সাধ্য!

অন্য দিন হেমলতাই পাণ দিতে আসে, কিন্তু আজ সে আসিল না, রমা আসিল। অবিনাশ বাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ জল খাবার কে ত'য়ের ক'রেছে রে রমা?"

রমা। বৌদিদি; কেন ভাল হয় নি?

অবি। যা হ'য়েছে খেয়ে দেখিস্, ঐ সবই পড়ে আছে। আজ কি খাবার ত'য়ের করবার সময় তার কাছে কুড়ো ছিল না?

রমা। কুড়ো আজ কোথায় চলে' গেছে।

অবি। ওঃ! সেই জন্যেই এমন হ'য়েছে। রাত্রের খাবারটা আজ তুই কর'—না হ'লে উপবাসী থাক্‌তে হবে।

রমা। আচ্ছা।

অবিনাশ বাবু পাণ লইয়া বহির্ব্বাটীতে গমন করিলেন।

রাত্রে আহারাদির পর শয়ন করিতে গিয়া অবিনাশ বাবু মশারির মধ্য হইতে কুড়োকে আবিষ্কার করিলেন। বিছানায় মশারি ফেলা ছিল, সেস্থানটায় অনুসন্ধান করা হয় নাই। কুড়ো সেই খানেই লুকাইয়া ছিল। রমা আহার করিবার জন্য হেমলতাকে অনুরোধ করিতেছিল, এমন সময় অবিনাশ বাবুর স্বর তাহাদের কানে পৌছিল—"ও রমা তোদের কুড়োকে নিয়ে যা।"

রমাকে আসিতে হইল না, কুড়োর নাম শুনিয়াই হেমলতা ছুটিয়া আসিল; এবং অবিনাশ বাবুর নিকট হইতে কুড়োকে ছিনাইয়া লইয়া তাহাকে কোলে করিয়া চলিয়া গেল।

তাহার পর কুড়ো কোনও অপরাধ করিলে হেমলতা তাহাকে দুই একটা চড় মারিয়াছে, শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু কখনও "বেরো এখান থেকে" এমন কঠিন কথা বলে নাই।

শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

গান

(শ্রাবণমাসে গীত হিন্দুস্থানী 'সাওয়ন'-এর সুর)

ঝরিছে ঝর ঝর, গরজে গড় গড়,
স্বনিছে শর শর, শ্রাবণ মাহ্।
তটিনী তর তর, সরসী ভর ভর,
ধরণী থর থর শিকত গা;
বিরহী 'ধর ধর'! মানিনী—'সর সর'!
চাহিছে থর থর সুলোচনা!

যুবতী দলে দলে চলিছে গলে গলে;
বিটপী তলে তলে ঝোলে ঝুলা।
কৃষক হলে হলে; বলাকা জলে জলে,
নাচিছে টলে' টলে' শিখীর পা।
পরাণ পলে পলে পড়িছে ঢলে' ঢলে';
উঠিছে বলে' বলে'—তুমি কোথা।

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন।

চিত্রকর—শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন।

“বিয়ে হলেই পুত্র কন্যা আসে যেন প্রবল বন্যা”—দ্বিজেন্দ্রলাল

(সাধু সাবধান!)

হেমচন্দ্র

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

'মেঘনাদবধ'-সমালোচনা ও 'বীরবাহু কাব্য'।

কর্ম্মক্ষেত্রে উন্নতি।

'মেঘনাদবধ'-সমালোচনা। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের প্রকাশকালে উহার দোষ গুণ লইয়া যেরূপ আলোচনা হইয়াছিল, আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের তদ্রূপ আলোচনা হইয়াছে কিনা সন্দেহ। নূতনত্বের বিরোধী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ উহার বিরুদ্ধে তাঁহাদের সমালোচনার শাণিত অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু কাব্যের অভিনবত্বের জন্য গ্রন্থখানি বিক্রয় হইয়াছিল। মধুসূদনের সহপাঠী ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির চেষ্টায় উহা কোন কোন বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের তালিকায় স্থান পাইয়াছিল। সেই জন্য একবৎসরের মধ্যে প্রথম সংস্করণের সহস্র খণ্ড পুস্তক নিঃশেষিত হইয়া গ্রন্থের দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কনের প্রয়োজন হইয়াছিল।

বিদ্যালয়ের অধিকতর উপযোগী করিবার জন্য এবং বিপক্ষবাদিগণকে কাব্যসৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের সংস্কার দূরীকৃত করিবার নিমিত্ত দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রাঙ্কনকালে 'মেঘনাদবধে'র বিস্তৃত সমালোচনা সম্বলিত ভূমিকা সন্নিবিষ্ট করিবার অনুভূত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন [illegible] একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া অপর

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

রচনায় উন্মুখ ছিলেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের একজন অকৃত্রিম অনুরাগী বলিয়া বন্ধু সমাজে তাঁহার খ্যাতি ছিল। সম্ভবতঃ কবিবর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে মধুসূদনের সহিত হেমচন্দ্রের আলাপ হয়, এবং হেমচন্দ্রই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত পাত্রবোধে 'মেঘনাদবধে'র টীকা ও ভূমিকা প্রণয়ন করিতে অনুরুদ্ধ হন। এই অনুরোধের ফলে হেমচন্দ্র 'মেঘনাদবধের' বিস্তৃত টীকা ও সন ১২৬৯ সাল ১০ই শ্রাবণ তারিখ সম্বলিত একটি ভূমিকা লিখিয়া দেন। এই ভূমিকা পাঠে প্রতীত হয় যে, লেখক স্বয়ং একমাস পূর্ব্বে গ্রন্থকারের রচনা পাঠ [করে]ন নাই।" এই ভূমিকার শেষভাগে হেমচন্দ্র "গ্রন্থ[কা]রের স্বহস্ত প্রস্তুত টিপ্পনী দৃষ্টে" মধুসূদনের "জীবন চরিত ঘটিত গুটিকত কথা"ও লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তদ্বিরচিত 'কবি হেমচন্দ্র' শীর্ষক গ্রন্থের একস্থানে হেমচন্দ্রের এই ভূমিকা [সম্বন্ধে] লিখিয়াছেন :—

[দী]র্ঘ ভূমিকায় হেমচন্দ্র বাঙ্গালীকে নবপ্রবর্ত্তিত 'মিতাক্ষর' [বুঝা]ইবার চেষ্টা করিলেন,—বড় আগ্রহে, বড় উৎসাহে, বড় [অনু]রাগে, বড় ব্যাকুলতা সহকারে। * * * 'মধু'ময় মিতাক্ষর [বুঝা]ইবার সেই আগ্রহ, দুর্ব্বোধ মধু কূট বুঝাইবার জন্য টীকায় [সে]ই যত্ন—উকীলের ওকালতি বলিয়া বোধ হইল না। বোধ [হয়] হেমচন্দ্র মধুসূদনের গোঁড়া, মধুসূদনের ভক্ত, মধুসূদনের [illegible]

[হেম]চন্দ্রের ভূমিকা প্রণয়নের প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পরে, [illegible] যখন উপরি উদ্ধৃত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন, [তখন] ভূমিকাটি পুনর্ব্বার পাঠ করিয়াছিলেন কিনা, [ত]াঁহার স্মৃতিশক্তি কতদূর প্রখর ছিল, তাহা [আমর]া অবগত নহি। মন্তব্যটি পাঠ করিলে মনে হয় [হেম]চন্দ্রের ভূমিকাটি মধুসূদনের কাব্যের নিরবচ্ছিন্ন [প্রশং]সায় পরিপূর্ণ। কিন্তু হেমচন্দ্রের ভূমিকায় নিরপেক্ষ [সমালোচনা]দিকে বিচার শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া [যায়। ত]িনি একদিকে মধুসূদনের কবিত্ব শক্তির দুই [দিক]—তেজস্বিতা ও উদ্ভাবকতার—যেরূপ উচ্চ [প্রশংসা করিয়]াছেন, অন্যদিকে মধুসূদনের কাব্যের দোষগুলিও প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। 'সময়ের অনাটন জন্য' সবিস্তার সমালোচনা করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় যতদূর সম্ভব তিনি মধুসূদনের কাব্যের প্রধান প্রধান দোষগুলির উল্লেখ করিয়াছিলেন। প্রথমবারে হেমচন্দ্র যে ভূমিকা লিখিয়াছিলেন, পরে (বোধ হয় ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে) তাহার অনেক পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই পরিবর্ত্তিত ভূমিকাটি মেঘনাদবধের প্রচলিত সংস্করণ গুলিতে সন্নিবেশিত দেখা যায়। আমরা প্রথম সংস্করণ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া, ভূমিকা প্রণয়ন কালে মধুসূদনের কাব্য সম্বন্ধে হেমচন্দ্রের কিরূপ অভিমত ছিল তাহা প্রকটিত করিতেছি :—

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

"মাইকেল মধুসূদনের উৎপাদিকা শক্তির, বুঝি, ইয়ত্তা নাই। * * * বুঝিবা, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয়কবিকে সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে হয়। কবি মাইকেলের যেরূপ কবিত্ব শক্তি, তিনি যদি তাদৃশ সুলেখক হইতেন তবে আর ত তার কথাই ছিল

না—তাঁহার লেখায় বিস্তর দোষ আছে বলিয়া, বুঝি বা, কথাটী বলিতে হয়। * * যাহা হউক, জানিতে ইচ্ছা হয়, কবি মাইকেলের লেখার কি এমন দোষ আছে? অতএব কাহাকে ভাল লেখা বলে, অগ্রে জানা কর্ত্তব্য। যেখানে যে কথাটী খাটে, যে ব্যক্তির মুখে যেরূপ উক্তি সম্ভব, কোন্ উৎপ্রেক্ষা কোন্ কালের উপযোগী, কোন্ শব্দটী, কোন্ পদটী উচ্চারণ করিলে কোন্ রসের উদ্দীপন করে, এই সকলের প্রতি যে লেখক দৃষ্টি রাখিতে পারেন, তাঁহার লেখাই সমুৎকৃষ্ট হয়। কবি মাইকেলের কি এ সকল গুণ নাই—এমন নয়। কিন্তু বোধ হয়, যেন তিনি পদবিন্যাস কালীন কথার হ্রস্বতা ও দীর্ঘতার প্রতিই কেবল লক্ষ্য রাখেন, তাহাদের উপযোগিতা বিবেচনা করেন না। ভারতচন্দ্রের কিন্তু, যে কথাটী না হইলে নয়, সেই কথাটী প্রয়োগ করা আছে সুতরাং সে সকল কথা একবার কর্ণে প্রবেশ করিলে বিস্মৃত হওয়া দুঃসাধ্য।

"মালিনীর প্রতি বিদ্যার লাঞ্ছনা উক্তি, বকুলবিহারী সুন্দর দর্শনে নাগরীয় কামিনীগণের রসালাপ, কোটালের প্রতি মালিনীর ভৎসনা, রাজার প্রতি রাণীর গঞ্জনাভাস, কি চমৎকার কুহকিনী শব্দে বিন্যস্ত হইয়াছে! * * * কবি মাইকেলের কঠোর শব্দ ভেদ করিলে বিস্তর রস পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তাহাদিগকে রসাল শব্দ বলা যায় না। কঠোর বল্কল বেষ্টিত বৃহৎ বটকাণ্ড ভেদ করিলে অনর্গল রস নির্গত হয় সত্য, কিন্তু পরিমলপূর্ণ পুষ্প হস্তে করিয়া যে সুখানুভব হয়, বটকাণ্ডকে আলিঙ্গন করিলে কি তাদৃশ আনন্দোদ্ভব হয়?

"পুনশ্চ, উৎপ্রেক্ষা গুলি সর্ব্বত্রে যথাযোগ্য হয় নাই। স্থল বিশেষে দেশকাল বিবেচনা না করিয়া রাশি রাশি উৎপ্রেক্ষা ছড়ান হইয়াছে। যাহা হউক, সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে মেঘনাদের তুল্য আর একখানি গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় পাওয়া দুর্ঘট। কবি মাইকেলের এই কীর্ত্তি কত দিন যে সজীব থাকিবে বলা দুঃসাধ্য। কিন্তু ভবিষ্যতে কবি মাইকেলের নাম যে ব্যাপক হইবে, এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের নিকট মেঘনাদবধ কাব্য যে বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষা সমাদৃত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।"

ইহা "মধুসূদনের গোঁড়া, মধুসূদনের ভক্ত, মধুসূদনের শিষ্য" হেমচন্দ্রের মধুসূদন-স্তুতি, না চিন্তাশীল, সুপণ্ডিত ও সুলেখক হেমচন্দ্রের নিরপেক্ষ সমালোচনা, পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন।

মধুসূদনের সতীর্থ, যথার্থ পণ্ডিত ও জ্ঞানী ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় একস্থানে লিখিয়াছেন, "মধু আপনার বিদ্যা বুদ্ধি খুবই বেশী বলিয়া মনে করিত।" মধুসূদনের অপর এক সহপাঠী, সত্যনিষ্ঠ ও সরল-হৃদয় রাজনারায়ণ বসুও লিখিয়াছেন, "মধুর আত্মশ্লাঘা কিন্তু কিছু অধিক পরিমাণে ছিল।" আত্মশ্লাঘা দোষের নহে কিন্তু মধুসূদনের আত্মশ্লাঘা ও অহঙ্কার সময়ে সময়ে গগনস্পর্শিনী স্পর্দ্ধার আকার ধারণ করিত। মেঘনাদবধের ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত করিয়া মধুসূদন, তাঁহার পক্ষে যতদূর বিনয় প্রদর্শন সম্ভব তাহা প্রদর্শন করিয়া, স্বীয় কাব্য সম্বন্ধে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—

রাজনারায়ণ বসু

"Some say it is better than Milton—but that is all bosh—nothing can be better than Milton; many say it licks Kalidasa; I have no objection to that. I don't think it impossible to equal Virgil,

Kalidasa and Tasso. Though glorious, still they are mortal poets ; Milton is divine." কালিদাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কবি বলিয়া বিঘোষিত হইতে মধুসূদনের আপত্তি নাই !!! তবে বিনয়ের সহিত মধুসূদন বলিতেছেন, মিল্টনের সমকক্ষ হওয়া যায় না। কিন্তু মধুসূদন বলিলে কি হইবে, যাঁহারা "মধুসূদনের গোঁড়া, মধুসূদনের ভক্ত, মধুসূদনের শিষ্য" (এরূপ ভক্ত এখনও দুই একজন আছেন !) তাঁহারা তাঁহাকে মিল্টনের আসন অপেক্ষা উচ্চতর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। অক্ষয়-চন্দ্র যাহাই বলুন না কেন, হেমচন্দ্র মধুসূদনের এরূপ অন্ধ স্তাবক ছিলেন না। তিনি ভূমিকায় স্পষ্ট লিখিয়াছেন :—

শ্রীমতী কামিনী রায়

"স্বর্গ, মর্ত্ত, দেব, নর, রক্ষ মধ্যে যত কিছু বীর্য্যশালী আছে সমস্তই মেঘনাদে লিপ্ত করা হইয়াছে, অথবা লিপ্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তা বলে, মহাত্মা মিল্টন রচিত জগদ্বিখ্যাত মহাকাব্যের সহিত ইহার তুলনা করা কি সম্ভব ? অনেকে এরূপ তুলনা করেন, তাহাতেই এস্থলে ইহার উল্লেখ করা গেল। সেই বৃহৎ কাব্যের সহিত ইহার তুলনা হওয়া দূরে থাকুক, তাহার শতযোজন অন্তরে অবস্থিতি করিতে পারে কিনা সন্দেহ।"

মোটের উপর হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন যে সমস্ত দোষ সত্ত্বেও "অদ্যাবধি বঙ্গ ভাষায় যে ইহার তুল্য কাব্য রচিত হয় নাই ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে।"

বলা বাহুল্য, সদ্বিদ্বান হেমচন্দ্রের এই নিরপেক্ষ সমালোচনা পাঠ করিয়া কবি মধুসূদন স্বয়ং পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা জুন তারিখ সম্বলিত একখানি পত্রে প্রিয়বন্ধু রাজনারায়ণকে এতৎসম্বন্ধে সানন্দে লিখিয়াছিলেন :—

"Meghnad is going through a second edition with notes, and a *real* B. A. has written a long critical preface, echoing your verdict—namely, that it is the first poem in the language."

বাঙ্গালা সাহিত্যে এখনও মেঘনাদ-বধ কাব্যের স্থান যে অতি উচ্চে তাহা কে অস্বীকার করিবে ? কিন্তু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সে কালে 'মেঘ-নাদবধ' জনসাধারণ বা পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক তেমন আদৃত হয় নাই। হেম-চন্দ্র 'মেঘনাদবধ' সমালোচনায় কাব্যের য উচিত প্রশংসা করিয়াছিলেন নিন্দার

হইতে হইয়াছিল। নিরপেক্ষ সমালোচক হেমচন্দ্র এই অনুচিত নিন্দায় ব্যথিত হইলেও, স্বীয় নির্ভীক অভিমত কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। সপ্তবিংশতি বৎসর পরে, প্রতিভাশালিনী মহিলাকবি কামিনী রায়ের "আলো ও ছায়া"র ভূমিকা লিখিবার সময়ে তিনি এতৎ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"একদিন আমি কবিবর মাইকেলের প্রশংসা করিয়া অনেকের নিকট নিন্দাভাগী হইয়াছিলাম ; এ স্থলেও যদি আবার তাহাই ঘটে, তবে সে সকল নিন্দাবাদেও আমার কিছুমাত্র কষ্ট বোধ হইবে না। তৎকালে মাইকেলের পুস্তক পাঠে আমার মনে যে আনন্দ ও সুখের উদ্রেক হইয়াছিল আমি কেবল তাহাই প্রকাশ করিয়াছিলাম, এখানেও তাহাই করিতেছি; সমালোচকের 'সিংহাসন' গ্রহণ করি নাই।"

ইদানীন্তনকালে যাঁহারা মেঘনাদবধ কাব্য পাঠ করিয়াছেন,তাঁহারা সকলেই তৎসঙ্গে হেমচন্দ্রের ভূমিকাটিও (বোধ হয়, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে পরিবর্ত্তিত ভূমিকাটি) পাঠ করিয়াছেন এবং পাঠ করিয়া আনন্দিত ও উপকৃত হইয়াছেন। অতএব আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে এই ভূমিকা সম্বন্ধে অধিকতর আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করি। আমাদের বিশ্বাস যে শিক্ষার বিস্তারের সহিত মধুসূদনের কাব্যের পাঠক ও ভক্ত দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে এবং হেমচন্দ্রের প্রশংসা কিছুমাত্র অতিরিক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

"বীরবাহু কাব্য"—১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে (১২৭১ সাল ৩১শে বৈশাখ) হেমচন্দ্রের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বীরবাহু কাব্য' প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন :

"প্রায় তিন বৎসর হইল, আমি 'চিন্তাতরঙ্গিণী' নামক একখানি অতি ক্ষুদ্র কাব্য প্রচার করিয়াছি। সেইখানি এক্ষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগ্রহণেচ্ছু ছাত্রগণের প্রথম পরীক্ষার অন্যতম পাঠ্যগ্রন্থস্বরূপ নিয়োজিত হইয়াছে।

"অতঃপর জনসমাজে সমধিক পরিচিত হইবার অভিলাষে আর একখানি কাব্য প্রচার করিতেছি ; কিন্তু নিতান্ত সঙ্কুচিতচিত্তে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। একালে গ্রন্থ,—বিশেষতঃ কবিতা গ্রন্থ প্রচার করা দুঃসাহসের কর্ম্ম ; কপালগুণে হয় ত যশের, নয় ত কঠিন গঞ্জনার ভাগী হইতে হয়। কিন্তু মানুষের মন এত অস্থির এবং তাহার চিত্ত এত যশোলোলুপ যে, জানিয়া শুনিয়াও কেহ এই দুরূহ পথের পথিক হইতে সহজে নিবৃত্ত হয় না। ভাগ্যে যাহাই ঘটুক, একবার চেষ্টা করিয়া দেখি, সকলেই আপনাকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া থাকে। আমিও তদ্রূপ একজন।"

৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার এই বিজ্ঞাপনে প্রকটীকৃত কবির স্বভাবসিদ্ধ সরলতার প্রতি আমাদিগের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়া লিখিয়াছেন :—

"এমন সহজ ভাষায়, সরল ভাবে আর কোন কবি যে ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহা আমি জানি না। মানুষ চাপল্য চাপিয়া রাখে, যশোলিপ্সা লুকাইয়া ফেলে, হেমচন্দ্র স্বচ্ছন্দে যে সেই চাপল্য ও যশোলিপ্সাই আপনার সাফাই করিবার জন্য উপস্থাপিত করিতেছেন, এই সরলতাই তাঁহার প্রশংসার কথা।"

কেহ কেহ বলেন, হেমচন্দ্র মধুসূদনের শিষ্য, মধুসূদন না জন্মিলে আমরা হেমচন্দ্রকে পাইতাম না, মধুসূদনের
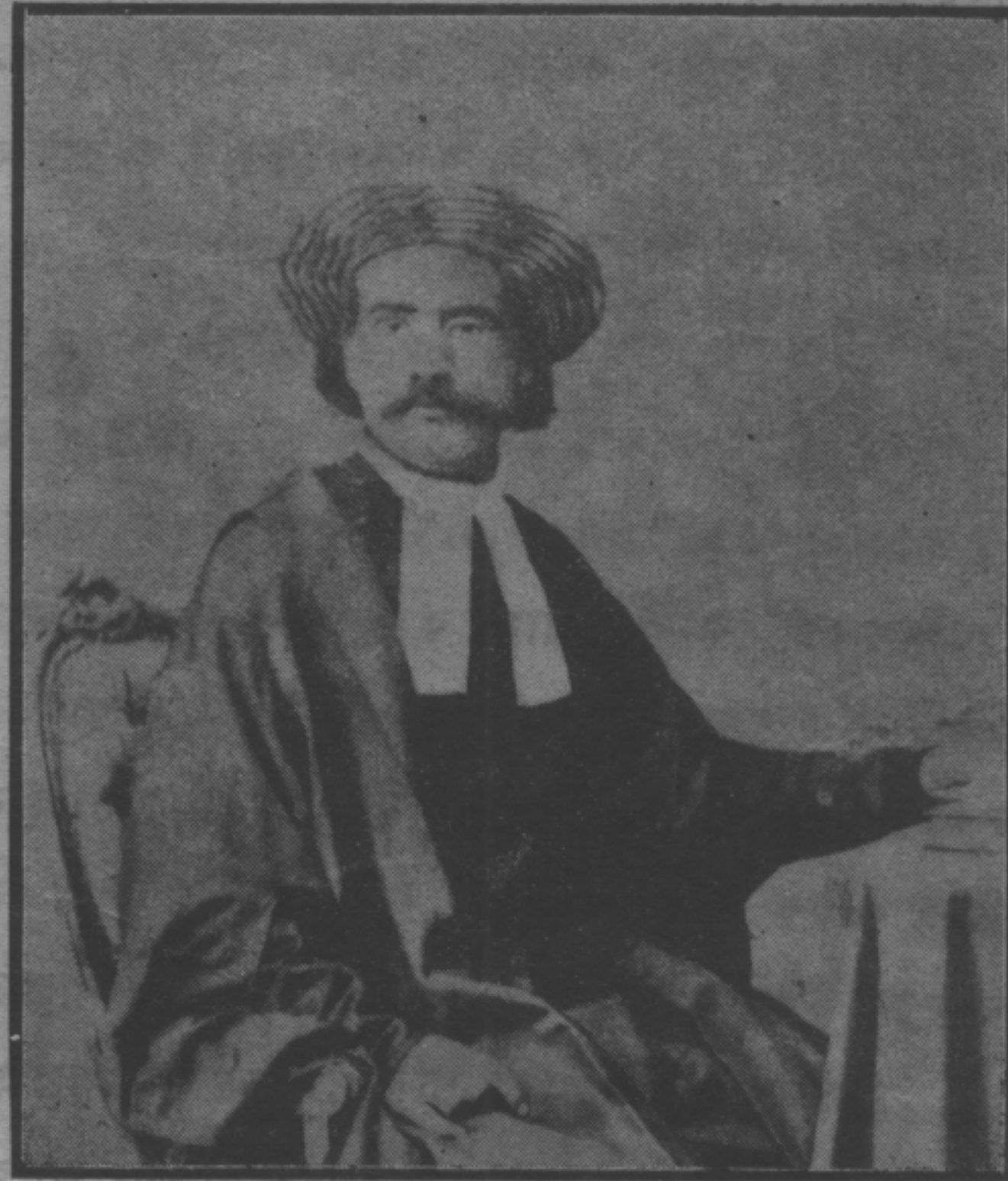
শম্ভুনাথ পণ্ডিত

'মেঘনাদবধ'-সমালোচন কালেই তাঁহার আদর্শে হেমচন্দ্রের কাব্য রচনা করিতে ইচ্ছা হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের মনে হয় যে ধীরভাবে ও সতর্কতার সহিত বিচার করিলে এ সকল সিদ্ধান্ত একান্ত অমূলক ও

ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্র 'মেঘনাদবধে'র সমালোচনা করেন। তাহার পর অন্ততঃ এক যুগের (১২ বৎসর) মধ্যে অর্থাৎ ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে "বৃত্রসংহার, প্রথম ভাগ" প্রকাশের পূর্ব্বে হেমচন্দ্র যে সকল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে মধুসূদনের কোন প্রভাবই লক্ষিত হয় না। 'বৃত্রসংহারে' মধুসূদনের প্রভাব কতটুকু আছে তাহা আমরা পরে অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করিব। 'বৃত্রসংহারে'র পরেও হেমচন্দ্র অনেক কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেও মধুসূদনের প্রভাব দেখিতে পাই না। যখন কোন কবি প্রথম সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, যখন স্বকীয় প্রতিভা সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয় নাই—তখনই তরুণ কবি সমসাময়িক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা সর্ব্বজনপ্রিয় কবির কাব্যের আদর্শে বা অনুকরণে কাব্য রচনা করিয়া যশস্বী হইবার চেষ্টা করেন। নিজের প্রতিভা সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইবার পর, নিজের বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া যশোলাভ করিবার পর, কেহ অনুকরণে প্রবৃত্ত হন না। যদি মধুসূদন যথার্থই হেমচন্দ্রের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেন, তাহা হইলে 'মেঘনাদবধ'-সমালোচনার অব্যবহিত পরে হেমচন্দ্র যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহাতেই সেই প্রভাব অধিক মাত্রায় লক্ষিত হইত। কিন্তু হেমচন্দ্রের কাব্যগুলিতে "অমৃতভাষী" ভারতচন্দ্রের প্রভাব যত লক্ষিত হয়, কোন সমসাময়িক কবির প্রভাব তত দেখা যায় না। বলা বাহুল্য 'বীরবাহু কাব্যে' মধুসূদনের কোনও প্রভাব পরিদৃষ্ট হয় না। যদি এই কাব্যে কোন আধুনিক কবির প্রভাব থাকে, তাহা হইলে বোধ হয় হেমচন্দ্রের উপর এই সময়ে রঙ্গলালের প্রভাব লক্ষিত হইবে। রঙ্গলালের প্রভাব পরিদৃষ্ট হওয়াও অত্যন্ত স্বাভাবিক,—কারণ, 'বীরবাহু কাব্যে'র প্রকাশ কালে 'পদ্মিনী উপাখ্যান' ও 'কর্ম্মদেবী' রচয়িতা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালার সর্ব্বজনপ্রিয় ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি।

'রঙ্গলাল বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি' - একথা শুনিয়া হয়ত আজিকালিকার পাঠকগণ চমকিত হইবেন। তাঁহারা হয়ত মনে করিবেন, আমরা রঙ্গলালকে বাড়াইতেছি। হয়ত মনে করিবেন, যখন মধুসূদনের 'তিলোত্তমা' ও 'মেঘনাদবধ' প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে, তখনও রঙ্গলালকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া আমরা ইতিহাসের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিতেছি। হয়ত মনে করিবেন, মধুসূদনের কাব্যের প্রতি আমাদের অনুরাগ নাই। আমরা পাঠকগণকে আশ্বস্ত করিতেছি যে, "বিজাতীয় শিক্ষা ও সংসর্গে বিকৃত, অনুকরণাধিক্যে মলিনীকৃত, এবং কবির চক্ষে 'নিমে দত্তের' আদর্শীভূত" * মধুসূদন, চরিত্রের জন্য যতই অশ্রদ্ধেয় হউন না কেন, আমরা তাঁহার কাব্যের অত্যন্ত অনুরাগী ও গুণপক্ষপাতী। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের বিশ্বাস যে, শিক্ষার বিস্তারের সহিত মধুসূদনের কাব্যের আদর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে, কিন্তু তথাপি, পুনরায় আমরা বলিব যে রঙ্গলাল সেই সময়ে বাঙ্গালার সর্ব্বজনপ্রিয় ও

দ্বারকানাথ মিত্র

* মধুসূদন সম্বন্ধে ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিকথা।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞ সমালোচকগণ বলিতে পারেন, 'রঙ্গলালকে আমরা কবিবর আখ্যা প্রদান করিতে পারি না,' 'রঙ্গলাল দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি', কিন্তু পাঠকগণকে এখন একবার অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের কথা ভাবিতে হইবে। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে, মধুসূদনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগুলির প্রকাশের পর এবং তাঁহার জীবিত কালেই 'কলিকাতা রিবিউ' পত্রের একজন পণ্ডিত সমালোচক লিখিয়াছিলেন—

"Babu Rangalal Banerjea is one of the best Bengali writers of the day; and though he has written a great deal in prose, is chiefly known as a poet. And he is no mean poet. Indeed to our mind, he is perhaps *the first Bengali poet of the dav.* We are aware of the claims of Mr. M. M. S. Dutta, whom we remember to have been styled the "Milton of Bengal." It reminded us of the incident, when Coleridge, the poet and metaphysician, heard Klopstock, the author of the "Messiah", called the German Milton. Yes, a *very* German Milton,replied Coleridge. Not that we deny merit to Mr. Datta as a poet, his powers are undoubtedly great But he is such a Tartar in the field of Bengali literature, that he is bound by no laws and rules whatever, but deems himself superior to them. Such license may be allowable in superhuman geniuses like Goethe and Shakespeare; but in a poetaster like Mr. Dutta, it is simply intolerable. Mr. Dutta is wild, irregular,eccentric; Babu Rangalal is neat, elegant, and idiomatic A great fault in Mr. Dutta is—and it is a very vulgar fault—that he tries to pick out all the hardest words in the dictionary. The practice of all great poets, like Wordsworth and Tennyson, is just the opposite; they use the most common, simple and familiar words. Mr. Dutta never writes Bengali poetry, one would suppose, without having *Amarkosh* or Wilson's Sanscrit Dictionary before him."

সুতরাং হেমচন্দ্রের বাল্য রচনায় যে রঙ্গলালের ন্যায় শক্তিশালী কবির প্রভাব বিস্তৃত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

হেমচন্দ্র কিন্তু রঙ্গলালের ন্যায় ইতিহাসের ভিত্তির উপর তাঁহার কাব্য রচনা করেন নাই। তিনি 'বীরবাহু কাব্যে'র বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন:—

"উপাখ্যানটী আদ্যোপান্ত কাল্পনিক, কোন ইতিহাসমূলক নহে। পুরাকালে হিন্দুকুলতিলক বীরবৃন্দ স্বদেশরক্ষার্থ কি প্রকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কেবল তাহারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই গল্পটী রচনা করা হইয়াছে। অতএব এই ঘটনার কাল নির্ণয়ার্থ হিন্দুদিগের পুরাবৃত্ত অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক।"

ইতিহাসের ভিত্তির উপর কাব্য রচনা না করিয়া হেমচন্দ্র বোধ হয় ভাল করেন নাই। কারণ আখ্যান-ভাগে বা ঘটনা-সংস্থানে তরুণ গ্রন্থকার তাদৃশ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।

হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী আজি শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই গৃহে গৃহে রক্ষিত, এবং পাঠকগণ সকলেই বোধ হয়, 'বীরবাহু কাব্য' পাঠ করিয়াছেন। তথাপি, আর একবার উহার আখ্যানভাগ স্মরণ করিলে ক্ষতি কি?

নিদাঘের এক সুন্দর প্রভাতে, যখন,—

"যামিনী পোহায়ে যায়,　　　ভূষা পরি উষা ধায়,
　আগে ভাগে ছুটে গিয়ে পথ সজ্জা করিছে।
অরুণে করিয়া সঙ্গে,　　　অলক্ত লেপিয়া অঙ্গে,
　দুই ধারে রাঙা রাঙা ঘনগুলি থুইছে॥

সুধাকরে কোলে করি, শ্বেত সাটী দিয়া ধীরি,
মধু মাখা মুখ তার ভাল ক'রে ঢাকিছে।
চন্দ্রের খেলনা গুনি, তারা পুঞ্জ গুণি গুণি,
অঞ্চলের শেষ ভাগে একে একে বাঁধিছে ॥
তুষিতে দিবার রাজা, ভাল ভাল মুক্তা মাজা,
শ্যাম ধরাতল বুকে সারি সারি গাঁথিছে।
রঞ্জিতে তাঁহারি মন, প্রমোদিত পুষ্পবন,
তরু পরে থরে থরে ফুল মালা বাঁধিছে ॥
বিহগ গায়ক তায়, দিবাকর গুণ গায়,
তার সনে তালে তালে সমীরণ নাচিছে।"

তখন কান্যকুব্জের যুবরাজ গ্রন্থনায়ক বীরবাহু তদীয় পিতা মহারাজ রণবীরের নিকট গ্রীষ্ম উপবনে যাইবার অনুমতি চাহিলেন, এবং অনুমতি লাভ করিয়া সহধর্ম্মিণী হেমলতার নিকটে গিয়া উপবনবাসের প্রস্তাব করিলেন—

"এস প্রিয়ে দুই জনে, গিয়ে গ্রীষ্ম উপবনে,
মিথুন দম্পতি সম বনে বনে ভ্রমিব।
মালতীর মালা পরি, পদ্ম পাতে ছত্র করি,
দোঁহে মিলি ফুল-কুল-পরিমল লুটিব ॥
স্রোতকূলে দোঁহে মেলি, করিব সলিল কেলি,
বাহুতে বাহুতে বাঁধি স্রোতোধারা ধরিব।
রাজহংস পিছে পিছে, যাব বারি সিঁচে সিঁচে,
পদ্মবন মাঝে গিয়া সরোবরে ভাসিব ॥
মৃণাল আনিয়া তুলে, বসিয়া তরুর মূলে,
হরিণী শাবকে কোলে ধরি দোঁহে খাওয়াব।
সারসে আনিয়া ধরে, রক্তজবা মালা করে,
দুইজনে সযতনে গলদেশে পরাব ॥
একদিকে কেতকিনী, একদিকে কমলিনী,
দুই ধারে রাশি করি ভ্রমরারে খেপাব।
তোমার অঞ্চল দিয়ে, কোকিলারে লুকাইয়ে,
ব্যাকুল করিয়া পিকে ডালে ডালে ডাকাব ॥"

বলা বাহুল্য, যুবরাজ-মহিষী এই প্রস্তাবে অতিমাত্র আনন্দিতা হইলেন। উভয়ে উপবনে গিয়া আমোদ আহ্লাদে মত্ত, "হেন কালে যোগিনীর বেশে একজন, ঘাটের উপরে আসি দিল দরশন।" যোগিনী পরিচয় দিলেন, তিনি এক রাজকন্যা, স্বয়ম্বর সভায় অম্বরের ভূপতিকে পতিত্বে বরণ করিয়া পতিগৃহে গমনকালে দুষ্ট যবনের হাতে পড়েন। যবনেরা পতিকে নিহত করিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধা করে। তিনি কৌশল করিয়া স্বীয় উদ্ধার সাধন করেন এবং নানা তীর্থে পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু তীর্থগুলি পর্য্যন্ত ম্লেচ্ছদিগের দ্বারা কলঙ্কিত। এমন কি হিন্দুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যতীর্থ বারাণসীধামও "ম্লেচ্ছপদ অপবিত্র করেছে"—

"নাহি সে সোণার কাশী, পাষাণের বারাণসী,
পাষণ্ড প্লাবিত হয়ে পাপস্রোতে ভাসিছে।"

যোগিনী ওজস্বিনী ভাষায় দেশের দুর্দ্দশা বর্ণনা করিয়া, যুবরাজকে তিরস্কার করিলেন,—

"ভারতে কনোজ ধাম, প্রসিদ্ধ পবিত্র নাম,
তুমি সেই কনোজের বংশধর হইয়া।
এই ভাবে অকারণে, বৃথা কাল বনে বনে,
অপচয় করিতেছ রামাগণে লইয়া ॥"

যোগিনীর উত্তেজনাময়ী ভাষায় যুবরাজ রোমাঞ্চিতকায় হইলেন। তখন,—

"জ্বলিল চিন্তার শিখা হৃদয় ভিতরে।
ভূত ভবিষ্যৎ ভাব জাগিল অন্তরে ॥
যে ভারতে দেবগণ মানব লীলায়।
সুরপুরী পরিহরি করিত আলয় ॥
যে ভারতে মহাবল দনুজের দল।
সুর-শরাঘাত জ্বালা করিত শীতল ॥
যে ভারতে সৌরকুল মহাবীরগণ।
রাক্ষস দানবে রণে করিত দমন ॥
দিলীপ সগর রঘু দশরথ বীর।
যে ভারতে রিপুদলে করিত অস্থির ॥
যে ভারতে বীরবৃন্দ সমর কৌশল।
দেখিতে বিমানে দেব বসিত সকল ॥
সে ভারতে আমা হেন কাপুরুষ দল।
আজি জনমিয়া ধরা করে রসাতল ॥"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, বীরবাহুর

"* * দুর্জ্জয় কোপ জ্বলিয়া উঠিল।
ঘন দেহ চমকিয়া উঠিতে লাগিল ॥
অন্তরের কোপ তবে অন্তরে চাপিয়া।
থাকিয়া থাকিয়া বীর উঠিল কাঁপিয়া ॥

যেন গগনের দর্প, বায়ুর নিঃস্বন।
শুনি ধরা ক্রোধভরে করয়ে কম্পন॥
কিংবা যেন ঘোর মেঘ সাগর গর্জ্জনে।
জানায় আপন দর্প ডাকিয়া সঘনে।"

অনন্তর বীরবাহু অবিলম্বে পিতৃসকাশে প্রত্যাগমন করিলেন এবং কনোজ-পতির নিকটে কনোজ-অভিমুখী যবনসৈন্য বিধ্বস্ত করিবার অনুমতি লইলেন। তিনি রাজাকে বুঝাইলেন "বীর্য্য যার, ধরা তার, বিধির নির্ণয়।"

যবনের সহিত যুদ্ধে বীরবাহু আহত ও অচেতন হইলেন এবং যুবরাজমহিষী শত্রুহস্তগতা হইলেন। যবনরাজ যুবরাজমহিষী হেমলতার ধর্ম্মনাশ করিবার চেষ্টা করেন কিন্তু অপর এক হিন্দুরাজকন্যা, যাঁহার সতীত্ব তিনি পূর্ব্বে অপহরণ করিয়াছিলেন, হেমলতার দুঃখে-দুঃখিনী হইলেন, কারণ,

"ঠেকে শিক্ষা করে যেই,　　সার গ্রহ করে সেই,
তাদৃশ না পারে অন্য পরে।"—

এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন "দিয়াছি আমার ধর্ম্ম, তোমায় রাখিব।" ইহার কৌশলে যবনরাজ প্রতারিত হইলেন।

এদিকে বীরবাহু চেতনালাভ করিয়া অসহ্য শোকে মুহ্যমান হইলেন এবং সঙ্কল্প করিলেন, যেরূপেই হউক "প্রমদার বিমোচন, যবনকুল নিধন, অদ্যাবধি এই মম পণ।" ম্লেচ্ছপদাঙ্ককলুষিত দেশের দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইয়া তিনি একস্থানে বলিতেছেন ;—

"রত্নগর্ভা ভূমি তুমি জগতের সার।
কত নদ হ্রদ গিরি তব অলঙ্কার॥
উচ্চ হিমগিরিচূড়া হিমানী মণ্ডিত।
গর্ব্ব করি স্থির বায়ু করিছে খণ্ডিত॥
অরুণের রথরোধকারী বিন্ধ্যগিরি।
অগস্ত্য ঋষিরে শিরে নোয়াইছে ধিরি॥
গোমুখী-বাহিনী গঙ্গা যমুনাতে মেলি।
দিবা রাতি কলনাদে করিতেছে কেলি॥
নর অংশে জন্ম সেই রামনারায়ণ।
তোমারে জননী ভাবে করিলা পালন॥
তোমার সেবায় পঞ্চপাণ্ডু ছিল রত।
পূজিল তোমায় রাজা বিক্রম আদিত॥
অমর বাল্মীকি ঋষি সুমধুর স্বরে।
রাখিয়াছে তব যশ ত্রিভুবন ভরে॥
বেদব্যাস মহাঋষি ভারত রচিয়া।
প্রচারিলা তব নাম জগৎ জুড়িয়া॥
সরস্বতী-বরপুত্র কবি কালিদাস।
তব যশ রঘুবংশে করিলা প্রকাশ॥
ভবভূতি তব নাম অনাশ্য অক্ষরে।
গাঁথিয়া থুইয়া গেছে মানব অন্তরে॥
এবে সেই দেশমান্যা ভারত চক্ষেতে।
ম্লেচ্ছকুল পদে দলে নিরখি বক্ষেতে॥"

হায়! তাঁহার কত আশা ছিল—

"বিজয় দুন্দুভি পুনঃ হরিষে বাজার।
ভারত জাগিল বলি ভূতলে জানাব।"

এখন "ঘুচিল মনের সাধ জনম মতন।
ভাঙ্গিল নিদ্রার ঘোর ভাঙ্গিল স্বপন।"

অতঃপর বীরবাহু শ্বশুর কলিঙ্গরাজের নিকট হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যবনদিগের বিরুদ্ধে জলপথে যাত্রা করিলেন ;—

"গিয়া সাগরের তীর,　　একত্রেতে যত বীর,
সহস্র তরণী পৃষ্ঠে সকলেতে উঠিল॥

তখন,—

কিবা শোভা দিল তায়,　　যেন জলে ভাসি যায়
সুশোভিত একখানি দারুময় নগরী।"

কিন্তু ভবিতব্য অখণ্ডনীয়। অকস্মাৎ—

"বায়ুকোণে দিল দেখা,　　কালিম জলদ রেখা,
ঢাকিল রবির কর, নভোদেশ ব্যাপিল।
গর্জ্জিল জলদ জাল,　　যেন প্রলয়ের কাল,
সহস্র কেশরি-নাদে জলদল নাদিল॥
মাতিল তরঙ্গকুল,　　ছল ছল কুল কুল,
ডাক ছাড়ি লম্ফ দিয়া শূন্যমার্গে উঠিল।
প্রলয় পবন হাঁকে,　　স্তব্ধ বসুমতী কাঁপে,
তরু লতা গুল্ম লয়ে দিগন্তরে ছুটিল॥
বজ্রের চিচ্চিড় ধ্বনি,　　বাতাসের হন্‌ হনি,
সমুদ্র মেঘের নাদে ত্রিভুবন চমকে।

প্লাবন করিতে সৃষ্টি, উল্কাপাত শিলাবৃষ্টি,
অবিচ্ছেদে মুষলের ধারা বর্ষে ঝমকে ॥
দশদিক অন্ধকার, শূন্য জল একাকার,
হই হই রব মাত্র শুনা যায় শ্রবণে।
চমকে চিকুর রেখা, তাহে মাঝে যায় দেখা
জলধিতরঙ্গরঙ্গ চমকিত নয়নে ॥
পর্ব্বত করিয়া তুচ্ছ, উথলে হিল্লোলে উচ্চ,
হুলুস্থূলু চারিকূল ব্রহ্মডিম্ব ফুটিছে।
দনুজ সহস্র জন, করি ভীম গরজন,
আকাশ মণ্ডল যেন হাতে হাতে লুফিছে।
অথবা অনন্ত যেন, প্রসারি সহস্র ফণ,
তারা সূর্য্য গ্রহগণে ধরি ধরি গিলিছে ॥
কিম্বা যেন দেব দৈত্য, অমৃত লভিতে মত্ত,
পুনর্ব্বার বরুণের রাজ্য ছার করিছে ॥
দেব কীর্ত্তি ভয়ঙ্কর, পৃথিবী সহে না ভর,
কি করিবে তার মাঝে মানুষের সামর্থ্য।
যত তরী দল বল, সব গেল রসাতল,
দৈব বল বাদী হয়ে পাড়ে ঘোর অনর্থ।"

বীরবাহু কোন মতে প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু তাঁহার দুঃখ কি অসীম!—

"হীনবীর্য্য হলে পরে, বুঝি বা সে শোকভরে,
উন্মাদ হইত কিম্বা আত্মহত্যা সাধিত।
মহা তেজ-ধারী বীর, তাই আছিলেন স্থির,
শালতরু রহে যেন হয়ে বজ্র দণ্ডিত ॥
গম্ভীর প্রকৃতি যার, বাহে স্বল্পে শোক তার,
কিন্তু হৃদে নিরবধি চিন্তা ফণী দংশিছে।
মেঘের সৃজন যেন, নহে চক্ষে দরশন,
কিন্তু বাষ্প নিরবধি শূন্য ভেদি উঠিছে ॥"

উদাসীর ন্যায় বীরবাহু—

"যে পথে দেখিতে পায়, সেই পথে চলে যায়,
সুপথ কুপথ কিছু নাহি করে গণনা।"

এমন সময়ে হঠাৎ ছয়জন দেবকন্যার সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইঁহারা শাপগ্রস্তা বরুণ-তনয়া। কোন বিপদ হইতে ইঁহাদিগকে রক্ষা করায়, ইঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া বীরবাহুকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং অলৌকিক উপায়ে যবনরাজধানীতে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছাইয়া দিলেন। এইস্থানে যবনরাজকে মল্লযুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করিয়া এবং অপর হিন্দুরাজন্যবর্গের সহায়তায় যবনকুল বিনষ্ট করিয়া বীরবাহু সহধর্ম্মিণীর উদ্ধারসাধন ও দিল্লীরাজসিংহাসন অধিকার করিলেন।

আমাদের বিবেচনায় এই কাব্যের আখ্যানভাগে হেমচন্দ্র তেমন কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, কিন্তু উপরি উদ্ধৃত পদগুলি পাঠ করিলে প্রতীত হইবে যে, কি মনোহর প্রকৃতি বর্ণনায়, কি সুন্দর কল্পনা শক্তি প্রদর্শনে, কি করুণ রসের অবতারণায়, কি উৎকৃষ্ট ভাব সমাবেশে সকল বিষয়েই তরুণ কবি যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। যে উদ্দেশ্যে তিনি এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহা সফল হইয়াছে।

এই কাব্য সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন,—'বীরবাহুকাব্যে' একদিকে যেমন দেশভক্তির অঙ্কুর দেখা গিয়াছে, অন্যদিকে সেইরূপ ভাষা ও ছন্দের উপর হেমচন্দ্রের আধিপত্য সঞ্চার দেখা যাইতেছে।" পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয়ের মতে 'চিন্তাতরঙ্গিণী'র ন্যায় "এখানিও বাল্যরচনা কিন্তু ইহার রচনা অপেক্ষাকৃত প্রগাঢ়, ইহাতে ভাবসন্নিবেশেরও উৎকর্ষ আছে। * * * দোষাদি সত্ত্বেও অনেক পরিণতবয়স্ক কবি এরূপ কাব্য রচনায় আপনাকে যশস্বী বোধ করিতে পারিতেন।"

হাইকোর্টে উন্নতি। সাহিত্যক্ষেত্রে হেমচন্দ্র যেমন ক্রমশঃ উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতেছিলেন, ব্যবহারজীবনের ব্যবসায়েও তিনি সেইরূপ অপ্রতিহতভাবে উন্নতিলাভ করিতেছিলেন।

হাইকোর্টে প্রবেশ করিবার কিছুদিন পরে হেমচন্দ্রের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক রমাপ্রসাদ রায় পরলোকগমন করেন। হাইকোর্টে কোন শক্তিশালী ব্যক্তি পৃষ্ঠপোষকতা না করিলে ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে শীঘ্র উন্নতিলাভ করা সম্ভব নহে। রমাপ্রসাদের অকাল মৃত্যুর পর হেমচন্দ্র হাইকোর্টে উন্নতির আশা সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া বরিশালে ওকালতি করিতে সঙ্কল্প করেন।

কিন্তু এই সময়ে একটি আকস্মিক অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব ঘটনায় তাঁহার সঙ্কল্পের পরিবর্ত্তন হয়। সে ঘটনাটি আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'পুরাতন প্রসঙ্গে' এইরূপে বিবৃত করিয়াছেন।—

"যখন বরিশালে যাইবার জন্য তিনি এক প্রকার সব স্থির করিলেন, হঠাৎ একটা ঘটনায় তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে মিষ্টার অ্যালেন নামক একজন উকীলের জুনিয়রি করিতেন। একটা মোকদ্দমায় একদিন ঘটনাচক্রে 'সাহেব' নিজে উপস্থিত হইতে পারিলেন না; সুতরাং হেমবাবুকেই argue করিতে হইল। মোকদ্দমা জিতিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাইকোর্টে পসারের বৃদ্ধি হইল। বরিশাল যাওয়া হইল না। অজস্র পয়সা রোজগার করিতে লাগিলেন; আয় মাসে দুই হাজার আড়াই হাজার টাকা হইতে লাগিল।"

বাস্তবিক অতি অল্পদিনের মধ্যেই সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান হেমচন্দ্র তাঁহার প্রতিভাগুণে কি বিচারপতি কি সহকর্ম্মী সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হাইকোর্টের প্রথম দেশীয় বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত এবং প্রধান উকীল কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুকূল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সকলেই হেমচন্দ্রকে ভালবাসিতেন বা শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু তখনকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল (ও পরে হাইকোর্টের বিচারপতি) দ্বারকানাথ মিত্র হেমচন্দ্রকে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসিতেন। দ্বারকানাথ তাঁহার সময়ে একজন অদ্বিতীয় বিদ্বান এবং অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তিনি প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে চিনিতে পারিতেন এবং প্রতিভার আদর করিতে জানিতেন। তিনি মনস্বী রমেশচন্দ্র মিত্র ও হেমচন্দ্রকে যেরূপ স্নেহ করিতেন, বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে আজিকালি সেরূপ ভালবাসা দেখা যায় না। হেমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র প্রায়ই দ্বারকানাথের বাটীতে যাইতেন এবং তিন বন্ধুতে নানাপ্রকার আলোচনায় সময় অতিবাহিত করিতেন।

কালীপ্রসন্ন দত্ত প্রণীত "বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনী"তে দ্বারকানাথ ও হেমচন্দ্র সম্বন্ধে একটি গল্প লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই জীবনী লিখিতে হেমচন্দ্র কালীপ্রসন্নবাবুকে উপকরণাদিসংগ্রহবিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন, সুতরাং গল্পটির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। আমরা নিম্নে উহা উদ্ধার করিলাম।—

"একবার কোন মোকদ্দমায় দ্বারকানাথ ও বাবু অনুকূল মুখোপাধ্যায় একপক্ষের এবং বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অপর পক্ষের উকীল নিযুক্ত ছিলেন। অনুকূল বাবু এবং দ্বারকানাথের মনে বিশ্বাস জন্মে, এই মোকদ্দমায় হেমবাবু আত্মরক্ষা সমর্থনার্থ জজদিগের নিকট মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ইঁহারা মোকদ্দমার বিচারকালে জজদিগের নিকট ইহার উল্লেখ করেন ও পরে বিচারগৃহের বাহিরে আসিয়া দ্বারকানাথ হেমবাবুকে বলেন, "তুই একজন লেঠেল হোবি।" বস্তুতঃ হেমবাবু কোনরূপ মিথ্যা ব্যবহার না করায় ইহাঁদিগের এই ব্যবহারে এবং দ্বারকানাথের এই কথায় তাঁহার মনে বড় কষ্ট হয়, তিনি উকীল দিগের লাইব্রেরী গৃহে যাইয়া, ইঁহাদিগের এই ব্যবহারের জন্য উভয়ের নিকট দুঃখ প্রকাশ করেন। ইহাতে এই ঘটনার এই স্থলেই একপ্রকার শেষ হইয়া যায়। কিন্তু হেমবাবুর এই প্রতিবাদসূচক দুঃখ প্রকাশে দ্বারকানাথের মনে গভীর অনুতাপ উপস্থিত হয়, তিনি সেই দিবস রাত্রি এগারটার সময় হেমবাবুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিয়া পাঠান। তাহাতে এইরূপ লিখিত থাকে;—তোমার কথায় আমার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে। তুমি যতক্ষণ না আমাকে ক্ষমা করিয়াছ বলিয়া পত্র লিখিতেছ—ততক্ষণ আমি আহার করিতে পারিব না ও রাত্রে আমার নিদ্রা হইবে না।"

এই সময়ের আর একটি কৌতুকাবহ গল্প হেমচন্দ্র বন্ধুবান্ধবগণের নিকট প্রায় বলিতেন। আমরা হেমচন্দ্রের মধ্যম জামাতা শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটে সেই গল্পটি যেভাবে শুনিয়াছি, সেই ভাবে নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।*

যখন হেমচন্দ্র মুন্সেফ ছিলেন, তখন তাঁহার আদালতে এক খণ্ড ভূমির দখল সাব্যস্ত লইয়া একটি মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। বাদীপক্ষ ভূমিখণ্ডের দাবী করিয়া বলেন যে উক্তস্থান তাঁহারাই বহুকাল দখল করিয়া আসিতেছেন এবং উহার উপর যে চণ্ডীমণ্ডপ

* আশুবাবু এই গল্পটি হেমচন্দ্রের নিজ মুখে শুনিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটও আমরা এই গল্পটি শুনিয়াছিল।

আছে উহাও তাঁহাদের বহুকালের সম্পত্তি। বিবাদী বলেন যে বাদীর উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা—সেখানে কোন চণ্ডীমণ্ডপ নাই—ভূমি-খণ্ড বিবাদীর বহুকালের সম্পত্তি। হেমচন্দ্র ইহা অবগত হইয়া ঘটনাস্থল দেখিবার জন্য গমন করেন। বিবাদী ইতঃপূর্ব্বেই বাদীর অবর্ত্তমানে চণ্ডীমণ্ডপটী ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ করিয়া দিয়াছিল। হেমচন্দ্র যখন ঘটনাস্থলে আসিলেন তখন তাহার চিহ্নমাত্রও ছিল না। তিনি তাহা দেখিয়াই, আর কোন সাক্ষ্য প্রমাণ না লইয়া মোকদ্দমাটী খারিজ করিয়া দিলেন। বহুদিবস পরে হেমচন্দ্র যখন হাইকোর্টের উকীল, সেই সময়ে এই মোকদ্দমাটি আপিলের জন্য হাইকোর্টে আসে। সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ মিত্র এক পক্ষে উকীল নিযুক্ত হন। ঘটনাচক্রে যেদিন দ্বারকানাথ এই মোকদ্দমার কাগজ পত্র দেখিতেছিলেন, সেই দিন হেমচন্দ্র তাঁহার নিকট বসিয়া ছিলেন। কাগজ দেখিতে দেখিতে দ্বারকানাথ বলিলেন "হেম। মফঃস্বলের এক মুন্সেফের বুদ্ধির দৌড় দেখ!"—এই বলিয়া তিনি মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া বলিলেন "চণ্ডীমণ্ডপটী নাই দেখিয়াই একেবারে রায় প্রকাশের পূর্ব্বে মুন্সেফটীর এই বুদ্ধিটুকু হইল না যে দুই একটি সাক্ষ্য লইয়া চণ্ডীমণ্ডপটী প্রকৃত সেখানে ছিল কি না অনুসন্ধান করিয়া দেখি।" হেমচন্দ্র বলিলেন, "মুন্সেফদের বুদ্ধি প্রায়ই ঐরূপ সূক্ষ্মই হইয়া থাকে। কোন্ শা—মুন্সেফ হে?" দ্বারিকানাথ তখন কাগজপত্র ঘাঁটিয়া মুন্সেফটীর নাম আবিষ্কার করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।" হেমচন্দ্রেরও তখন মনে পড়িয়া গেল যে তিনিও এক সময়ে ঐরূপ একটি মোকদ্দমার তদন্তে গিয়াছিলেন। তখন তিনি হাস্যমুখে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ও দ্বারিক! ও যে আমিই হে!" তখন দুই বন্ধুর হাস্যরোলে সমস্ত গৃহ মুখরিত হইয়া উঠে। সেদিন নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার স্বীকারোক্তি করিতে এবং পরে এই গল্প সহাস্যবদনে বন্ধুবান্ধবদের মজলিসে বা আত্মীয় স্বজনের নিকট বিবৃত করিতে তিনি কোন দিন বিন্দুমাত্র অপমান বোধ করেন নাই। হেমচন্দ্রের প্রকৃতি এইরূপ সরল ও অমায়িক ছিল।

দ্বারকানাথের ন্যায় বন্ধুর সাহায্যে এবং স্বীয় অলৌকিক প্রতিভাবলে হেমচন্দ্র শীঘ্রই হাইকোর্টে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মাসিক আয় দুই সহস্র মুদ্রার কম ছিল না। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে তাঁহার বেশ স্মরণ আছে, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক কাউয়েল যখন ভারত বর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, সেই সময়ে কথোপকথন প্রসঙ্গে শ্যামাচরণ বাবু কাউয়েলের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে শিক্ষাবিভাগে থাকিয়া তিনি মাত্র দুইশত টাকা মাসিক বেতন পাইতেছেন, কিন্তু তাঁহার সহপাঠী হেমচন্দ্র ওকালতীতে মাসিক দুই সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করিতেছেন। ইহাতে শিক্ষাব্রত কাউয়েল সান্ত্বনাচ্ছলে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "ওকালতীতে দুই সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন অপেক্ষা আমি শিক্ষাবিভাগে দুইশত মুদ্রা বেশী পছন্দ করি।"

হেমচন্দ্রের এই দ্রুত উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা দেখিয়া তাঁহার অন্যান্য সহপাঠীরাও বিস্মিত হইয়াছিলেন। তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বি-এ পরীক্ষায় প্রথম হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হাইকোর্টে হেমচন্দ্রের সৌভাগ্যরবি উদিত দেখিয়া তারাপ্রসাদও একবার চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া ওকালতী করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। শ্যামাচরণ বাবু বলেন, তারাপ্রসাদ বাবুর মুখে তিনি শুনিয়াছিলেন যে এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বে একটি গানের কয়েকটি পদ তাঁহার স্মরণ হওয়ায়, তিনি ধ্রুব পরিত্যাগ করিয়া অধ্রুবের নিষেবণ করেন নাই। সে গানটি অনেকেই জানেন,—

"চাষবাস করিয়া খাইত আব্‌দুল,
তখন ছ্যালো ভাল;
জাহাজের খালাসী হয়ে আব্‌দুল
দরিয়ায় ডুবে ম'ল।"

ক্রমশঃ

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

স্থলতান দেওয়ার বক্স ওরফে বোলাকী

"কোথায় রাম রাজা হবে কোথায় বনবাস" এবং "জোর যার মুল্লুক তার" এই দুইটি প্রাচীন কথার সার্থকতা যেমন মোগল রাজবংশে দৃষ্ট হইয়াছে, সেরূপটি যে আর কোন সাম্রাজ্যে হয় নাই, জগতের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সম্রাট্ জাহাঁগীর পরলোকগত হইবার পরে এবং আরঙ্গজীবের রাজদণ্ড গ্রহণ করা পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যের রঙ্গমঞ্চে উক্ত দুইটি বাক্যশীর্ষক নাটকের চূড়ান্ত অভিনয় হইয়া গিয়াছে, এবং আক্‌বর শাহাঁ যদি তাঁহার মুমূর্ষু অবস্থায় আপন সমক্ষে এবং আমীর ওমরাহদিগের সম্মুখে যুবরাজ সেলিম্‌কে রাজপরিচ্ছদে এবং রাজদণ্ডে শোভিত না করিতেন, তাহা হইলে "সম্রাট্ জাহাঁগীর" শব্দ ইতিহাসে স্থান পাইত কি না সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ।

কোনও সম্রাট্ কালগ্রাসে পতিত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, এবং তাঁহার অবর্ত্তমানে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহাসনের অধিকারী হইবে, ইহাই ছিল তাইমুর লঙ্গের বংশগত বিধি। কিন্তু জাহাঁগীরের মৃত্যুর পরে সে নিয়মের বিপর্য্যয় ঘটিল এবং আরঙ্গজীব তাহার চরম দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। উক্ত ব্যবস্থার ব্যতিক্রমে যে মোগল সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ডে অলক্ষিত ভাবে একটা ক্ষতরেখা পড়ে নাই তাহাই বা কে বলিতে পারে? এবং এই ক্ষত নানারূপ অপথ্য সংযোগে শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া যে পরিশেষে বাদশাহ বংশের অধঃপতন আনয়ন করে নাই তাহাও নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না।

সাম্রাজ্যের অধিকার কেবলমাত্র যে শাণিত অসির ঘাত প্রতিঘাতের ফলে সময়ে সময়ে জেতার কবলগত হইয়াছিল এমন নহে, পরন্তু সংগ্রামশক্তি প্রয়োগ না করিয়া কিরূপে ছল এবং কৌশলের দ্বারা যুবরাজ খুরম তাঁহার বহুবৎসর যাবৎ ঈপ্সিত সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, মেনুসীর গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া সংক্ষেপে সেই রহস্যোদ্দীপক ঘটনাটি বর্ণনা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

১৬২৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সম্রাট্ জাহাঁগীর কালগ্রাসে নিপতিত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর এবং ১৬২৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে (১) যুবরাজ খুরমের (পরে শাজাহান) রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার সন্ধিস্থলে, একটি সপ্তদশবর্ষীয় বালক দুই মাসের নিমিত্ত সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছিল। সে বালকটি কে? বালকটির নাম স্থলতান দেওয়ার বক্স, ওরফে বোলাকী, জাহাঁগীরের পৌত্র এবং যুবরাজ খুসরুর জ্যেষ্ঠ পুত্র।

১৬২২ খৃষ্টাব্দে বহুগুণশালী বৃদ্ধ উজীর ইৎমাদুদ্দৌলা (নূরজাহানের পিতা) পরলোকগত হইলে সম্রাট্ জাহাঁগীর তাঁহার পুত্র আসফ খাঁকে তদীয় পিতৃপদে অধিষ্ঠিত করিয়া প্রিয়তমা পত্নী নূরজাহানের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। সম্রাট্ তাঁহার জীবনের শেষ দুই বৎসর দৈহিক এবং মানসিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া হীনবীর্য্য হইয়াছিলেন, তাহার ফলে আসফ্ খাঁ এবং সেনাপতি মহাবৎ খাঁ রাজ্ঞী নূরজাহানের সহযোগিতায় গৌণ ভাবে রাজ্য শাসন করিতেন। স্থতরাং সে সময়ে যেমন এক-দিকে আসফের প্রভাবের সীমা ছিলনা, অন্যদিকে মহাবৎ খাঁরও প্রতিপত্তি যথেষ্ট প্রবল ছিল। সম্রাট্ যখন তাঁহার শারীরিক ক্ষীণতা এবং অস্বচ্ছন্দতা নিবন্ধন উপলব্ধি করিলেন যে তাঁহার শেষদিন সত্বর পাদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র খুসরু ইহ-জগৎ হইতে প্রস্থান করিয়াছে। সে অভাগার রাজ-দ্রোহিতা এবং তাঁহার প্রতি বারম্বার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়া জন্য তাহার প্রতি যে যে কঠিন দণ্ডের ব্যবস্থা তিনি করিয়া-ছিলেন, এমন কি তাহার চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত করিতেও

(১) Lane-Poole's Mediæval India. p, 327,

কুণ্ঠিত হয়েন নাই, দুর্দ্দমনীয় পুত্রবাৎসল্যবশতঃ সেই সমস্ত ঘটনাবলী যথাক্রমে তাঁহার স্মরণ পথে আসিয়া তাঁহার মনঃপীড়ার কারণ হইল, এবং শোকদুঃখ যথাসম্ভব প্রশমিত করণাভিপ্রায়ে তাঁহার মৃত্যুর পরে খুসরুর জ্যেষ্ঠ পুত্র দেওয়ার বক্সকে রাজ্যদান করিতে ইচ্ছা করিলেন। এক দিবস আসফ্ খাঁকে এবং মহাবৎ খাঁকে সম্রাট্ নিভৃতে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "দেখ আসফ্ এবং মহাবৎ! আমার শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা এরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে যে, আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে আমি ইহজগতে আর অধিক দিন বিদ্যমান থাকিব না; তোমাদের উভয়ের প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ, আমার মৃত্যু হইলে যুবরাজ খুসরুর পুত্র সুলতান বোলাকীকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবে, এবং আমার এই আজ্ঞা রাজ্যের সমস্ত আমীর ওমরাহ-দিগকে যথা সময়ে জ্ঞাত করিবে। ইহার কারণ এই যে, সুলতান বোলাকী বালক হইলেও আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র, এবং তাইমুর বংশস্থ নিয়ম অনুসারে একমাত্র সেই রাজসিংহাসনের অধিকারী। দেখিও কেহ যেন তাহাকে হত্যা বা সিংহাসনচ্যুত না করে। তাহার জীবনের জন্য এবং তাহার অভিষেকের নিমিত্ত তোমরা উভয়ে দায়ী রহিলে।" আসফ এবং মহাবৎ জানুদ্বয় মৃত্তিকালগ্ন করিয়া নতশিরে পবিত্র কোরাণ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, সম্রাটের আজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইবে। সম্রাট্ও আশ্বস্ত হইলেন।

খুরমের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও চতুরতা দর্শনে সম্রাট্ পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তিনি জীবিত থাকিতেই খুরমের রাজ্যলিপ্সা বলবতী হইয়াছে এবং তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ফলবতী হওয়াও সম্ভব। কিন্তু তিনি এ অনু-মান পোষণ করিলেও সে সম্বন্ধে কোন কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। খুরম কয়েকবার বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্জলিত করিয়া এবং তাঁহার বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল তাহা তিনি বিস্মৃত হয়েন নাই। যে কারণেই হউক, খুরম তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবে ইহা আদৌ তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, সেই জন্য তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত পুত্রের রাজ্যাকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করিয়াছিলেন। যখন সময় উপস্থিত হইল, তখন আসফ্ খাঁকে এবং মহাবৎ খাঁকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া উভয়ের সমক্ষে তাঁহার অন্তরের কথা ব্যক্ত করিলেন; খুরম সম্বন্ধে কোন কথারই উল্লেখ করিলেন না।

সম্রাটের সময় পূর্ণ হইল। তিনি ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং তাঁহার আদেশানুযায়ী বোলাকী সিংহাসন লাভ করিলেন। রাজ্য অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিবার জন্য দুই জন প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইল। প্রথমটি যুবরাজ খুরম এবং দ্বিতীয়টি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যুবরাজ শাহরিয়ার। ইতিপূর্ব্বে শাহরিয়ারের সহিত নূর-জাহানের একমাত্র কন্যা পরিণীত হওয়ায়, নূরজাহান আপন জামাতাকে রাজ্যের অধীশ্বর করিবেন বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই সময়ে রাজ্য মধ্যে তিনটি পৃথক দলের সৃষ্টি হইল। সামরিক সেনা বোলাকীর পক্ষ অবলম্বন করিল, নূরজাহান প্রমুখ "জানানা মহল" এবং খোজা সকল শাহরিয়ারের পক্ষ-পাতী রহিল এবং উজীর আসফ্ খাঁ এবং সেনানী মহাবৎ খাঁ যুবরাজ খুরমকে সাহায্য করিতে ব্রতী হইলেন। অতএব শাহরিয়ারের পক্ষ যে বিশেষ ক্ষীণ হইল তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। বোলাকী অবলীলাক্রমে নূরজাহানকে এবং তাঁহার জামাতাকে নিজের আয়ত্তাধীন করিয়া উভয়কেই কারাগারে রুদ্ধ করিলেন। এইরূপে বোলাকীর পথের দুইটি কণ্টকের মধ্যে একটি অপসৃত হইল।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে জাহাঁগীরের শাসন-কালে আসফ খাঁ এবং মহাবৎ খাঁ মোগল সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন এবং উভয়েরই গৌরব এবং বৈভবের সীমা ছিল না। অধিকন্তু সম্রাটের মৃত্যুর পরেও যতদিন না তাঁহারা রাজ্যের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল। এই হেতু সাম্রাজ্যের যাবতীয় আমীর ওমরাহগণ তাঁহাদের

অনুরাগী ছিলেন। বোলাকী সপ্তদশবর্ষীয় বালকমাত্র, সুতরাং রাজকার্য্য পরিচালনা সম্বন্ধে আসফ খাঁ এবং মহাবৎ খাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা ব্যতীত তাঁহার গত্যন্তর ছিল না। এই দুই জন আমীরের সম্পূর্ণ ইচ্ছা যে তাঁহারা বলে বা কৌশলে বোলাকীকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া খুরমকে তদুপরি প্রতিষ্ঠিত করিবেন। পৃথিবী রুধিরসিক্ত না করিয়া সহজ উপায়ে কার্য্যসিদ্ধি-কল্পে গুপ্ত মন্ত্রণার বৈঠক বসিল এবং একটা সিদ্ধান্তও হইল। মহাবতের প্ররোচনায় বোলাকী খুরমের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিবার জন্য এবং খুরমের তরফ হইতে সিংহাসনের প্রতি সম্মান গ্রহণ করিবার নিমিত্ত একজন ওমরাহকে প্রেরণ করিলেন। দূত-ওমরাহকে বলিয়া দেওয়া হইল যে, খুরম যদি সহজে রাজাজ্ঞানুযায়ী কার্য্য না করেন,তাহা হইলে তাঁহার প্রতি বল প্রয়োগ করিতে হইবে। অপর দিকে তাঁহারা ব্যবস্থা করিয়া রাখিলেন, খুরমকে একটি যক্ষ্মারোগাক্রান্ত রোগী সাজাইয়া, তাঁহার মুখগহ্বরে ছাগরক্ত পুরিয়া রাখিয়া দূতকে তাঁহার সম্মুখীন করিতে হইবে। এ সমস্ত মন্ত্রণা অবশ্য অতিশয় গোপনে চলিতে লাগিল।

যথাসময়ে দূত খুরমের নিকট উপস্থিত হইল। খুরমও গুপ্ত পরামর্শ অনুযায়ী তাঁহার মুখগহ্বর ছাগরক্তে আপ্লুত করতঃ তাঁহার নাট্যাংশের চূড়ান্ত অভিনয় করিলেন। দূত ব্যাপার অবলোকন করিয়া স্তম্ভিত হইল, তাহার বাক্‌শক্তি তিরোহিত হইল। এই ঘটনার দুই তিন দিন পরেই খুরমের মৃত্যু-সংবাদ রাজধানী আগ্রার মধ্যে এবং সাম্রাজ্য মধ্যে প্রচারিত হইল, এবং তিনিও লোকালয় হইতে হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া কোথায় এবং কিরূপে রহিলেন তাহা মহাবৎ খাঁ এবং খুরমের মুষ্টিমেয় বিশ্বাসী কর্ম্মচারী ব্যতীত অপর কেহই জানিতে পারিল না। বাদ্‌শাহ-পরিবার মধ্যে কোন বয়স্থ ব্যক্তির মৃত্যু হইলে রাজ্যমধ্যে যেরূপ শোকসূচক অনুষ্ঠানাদি হইয়া থাকে, খুরমের ছলিত মৃত্যুতেও সেইরূপ হইল। প্রজাবৃন্দের শোক-দুঃখের সীমা রহিল না। সর্ব্বাপেক্ষা মহাবৎ খাঁ অধিকতর শোকে নিমগ্ন হইলেন, তাঁহাকে সান্ত্বনা দেওয়া কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িল। তাঁহারও অভিনয়ের কোন অংশ অসম্পূর্ণ বা অসংলগ্ন হয় নাই।

খুরমের প্রাসাদস্থ কর্ম্মচারিগণ দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া দূত বোলাকীকে শোকসংবাদ প্রেরণ করিলেন এবং সমাধি বাসরে উপস্থিত থাকিবার জন্য অবকাশের প্রার্থনা করিলেন। অবশিষ্ট কণ্টকটিও অপসৃত হইল বিবেচনা করিয়া বোলাকী হৃষ্ট চিত্তে আবেদন মঞ্জুর করিলেন এবং যথাবিহিত সম্মানের সহিত মৃতকে সমাধিস্থ করিবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলেন। স্বুবর্ণ কারুকার্য্য মণ্ডিত চন্দ্রাতপ দ্বারা একটি শূন্য শবাধার আবৃত করা হইল। সহস্রাধিক আমীর ওমরাহ উহা স্কন্ধদেশে রক্ষা করিয়া মৃদুপাদবিক্ষেপে সমাধিক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা করিলেন। লম্বিত শ্মশ্রুধারী মোল্লাগণ শবাধারের অগ্রপশ্চাতে থাকিয়া গুরুগম্ভীর স্বরে মধ্যে মধ্যে কোরাণ পাঠ করিতেছেন। সহস্র সহস্র ব্যক্তি সসম্মানে একটি বাহুর উপর অঙ্গুটি রক্ষাপূর্ব্বক নতশিরে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছে, এবং অনেকে শোকে মুহ্যমান হইয়া হস্তদ্বারা চক্ষুর্দ্বয় আবৃত করিয়া বিলাপ করিতেছে। মহাবৎ খাঁ শবাধারের অগ্রে চলিয়াছেন; কয়েকজন রাজপুত অশ্বারোহী সৈন্য জনতা হইতে কিয়দ্দূরে থাকিয়া ধীরে ধীরে অগ্রবর্ত্তী হইতেছে। আসফ্ খাঁ এ পর্য্যন্ত রাজপ্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন; শবযাত্রা প্রাসাদের সম্মুখীন পথে উপনীত হইলে তিনি বোলাকীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং পুরাতন প্রথানুসারে তাঁহাকে শবযাত্রায় যোগদান এবং সমাধিক্ষেত্র পর্য্যন্ত যাইতে অনুরোধ করিলেন। বোলাকী নিরুদ্বেগে প্রাসাদের বহির্দ্দেশে আসিয়া শবযাত্রার সম্মুখীন হইলেন।

বিপদের কোনও সম্ভাবনা নাই জানিয়া বোলাকী শোক-সূচক পরিচ্ছদে ভূষিত এবং মুষ্টিমেয় প্রহরী বেষ্টিত হইয়া রাজপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু শবের সহগামী বিপুল জনমণ্ডলী দৃষ্টে ভয়বিহ্বল ও চিন্তিত হইলেন, এবং এই নিঃসহায় অবস্থায় তাঁহাকে প্রথমতঃ বন্দী করিয়া পরে তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট করিবার

উদ্দেশ্যে যে এই চক্রান্তের অবতারণা করা হইয়াছে, অল্পক্ষণেই তাহা উপলব্ধি করিলেন। অতঃপর কতিপয় রাজকর্ম্মচারীর সাহায্যে রাজধানী হইতে তিনি পলায়ন করিলেন।

খুরম মহাসমারোহে প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন এবং শাজাহান নাম ধারণ করিয়া অনতিবিলম্বে হিন্দুস্থানের একচ্ছত্র সম্রাট্ বলিয়া ঘোষিত হইলেন।

শাজাহান সিংহাসনে সমাসীন হইবার তিনমাস পরে তাঁহার দ্বিতীয় কণ্টক শাহরিয়ারকে রাজপ্রাসাদের একটি দ্বারবিহীন অন্ধকার কক্ষে আবদ্ধ করিয়া শমন সদনে প্রেরণ করিলেন; সে অভাগার দুইটি অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রও অব্যাহতি পাইল না, তাহারাও জনকের দশা প্রাপ্ত হইল। যুবরাজ খুসরুর অবশিষ্ট শিশুপুত্রদিগকেও হত্যা করা হইল। প্রয়াগের খুসরুবাগে তাহাদের জনকের সমাধি মন্দিরের সান্নিধ্যে এবং পিতামহী (অম্বর দুহিতা) "শা বেগমের" সমাধি-সৌধমধ্যে তাহাদিগকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হইল। "শা বেগম", খুসরুর জননী, বাদশাহ জাহাঁগীরের প্রাধান্য মহিষী ছিলেন; পুত্র সম্রাটের বিপক্ষে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত করিলে তিনি অত্যধিক মনঃপীড়ায় অহিফেন সেবনে দেহ ত্যাগ করেন। দর্শকমাত্রই এই কয়জনের সমাধি দেখিয়া প্রত্যেকটির উপর এক এক বিন্দু অশ্রুপাত না করিয়া প্রত্যাগত হইতে পারেন না।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী রায়।

নচিকেতা

প্রথম অধ্যায়

তৃতীয় বল্লী।

(১)

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে বৈদিক যুগে দেবলোককে পিতৃ-লোকও বলা হইত। পিতৃলোক তিন ভাগে বিভক্ত। একটী যম বা নক্ষত্র লোক; অপর দুইটী স্বর্লোক এবং ত্রিনাক। যমলোকের উপরে এই দুই লোক অবস্থিত; সেই জন্য ইহাদের দেখা যায় না। (১) ইহাদেরও উপরে 'এক' (বা অদ্বিতীয় পুরুষ) অবস্থান

---

(১) তিস্রঃ। মাতৄঃ। ত্রীন্। পিতৄন্। বিভ্রৎ।
একঃ। ঊর্দ্ধঃ। তস্থৌ। ন। ঈং। অব। গ্লপয়ন্তি॥ ১।১৬৪।১০

তিন মাতৃ (লোক), তিন পিতৃলোক ধারণ করিয়া এক (অর্থাৎ পুরুষ) ঊর্দ্ধে ছিলেন; ইঁহার কেহ গ্লানি করে না।

তিস্রঃ। ভুমিঃ। ধারয়ন্। ত্রীন্। উত। দ্যূন্। ২।২৭।৮

তিন ভূমি ও তিন দ্যুলোক ধারণ করিয়া।

মন্তব্য—'ভূমিঃ' স্ত্রীলিঙ্গ এবং 'দ্যূন্' পুংলিঙ্গ; ইহার দ্বারা তিন মাতৃলোক ও তিন পিতৃলোক বুঝাইতেছে।

তিস্রো দ্যাবঃ সবিতুর্দ্বা উপস্থা একা যমস্য ভুবনে বিরাষাট্।
আনিং ন রথ্যমমৃতাধি তস্থুরিহ ব্রবীতু য উতচ্চিকেতৎ॥ ১।৩৫।৬

দিব্যলোক তিনটী; দুইটী সবিতার নিকট; একটী যমের দেশ, (যথায়) প্রেতপুরুষগণ গমন করে। রথের মত অমৃতগণ তাহার উপরে আছেন। যিনি জানেন, তিনি এখানে বলুন।

যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া
যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ।
যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ১০।১২১।৫

যাঁহার দ্বারা দ্যৌ ও কঠিন পৃথিবী দৃঢ় (বদ্ধ) হইয়াছে, যাঁহার দ্বারা স্বর্লোক ও নাকলোক অচঞ্চল হইয়াছে, যিনি অন্তরিক্ষে মেঘ রচনা করিয়াছেন, (তাঁহা ভিন্ন) কোন্ দেব-তাকে (আমরা) হবি দ্বারা সেবা করিব?

যত্র রাজা বৈবস্বতো যত্রাবরোধনং দিবঃ।
যত্রামূর্যহ্বতীরাপস্তত্রমামমৃতং কৃধী॥ ৯।১১২।৮

করেন। এই লোককে কেহ পরম ব্যোম, (২) কেহ বা ধ্রুবলোক বলেন। যম স্বর্লোক ও ত্রিনাককে স্বর্গলোক নাম প্রদান করিয়াছেন দেখা গিয়াছে। এই স্থানেই অমর দেবগণ থাকেন।

পরম ব্যোমে যিনি আছেন তাঁহাকে 'এক,' 'অজ,' 'পুরুষ' প্রভৃতি নাম দেওয়া হইত। (৩) পুরুষ হইতে যিনি প্রথম জলরাশির গর্ভরূপে উৎপন্ন হন তাঁহাকে ঋষিগণ হিরণ্যগর্ভ নাম প্রদান করিয়াছেন। (৪) ইহাঁকে পরমব্যোমে উৎপন্ন অগ্নি বলা যাইতে পারে। (৫) তাঁহারই অংশে দেবগণ উৎপন্ন। ইঁহাকে বৈদিক যুগে 'স্বর্ধী' নামও দেওয়া হইত। (৬) এখনও ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সেই হিরণ্যগর্ভ-রূপ ব্রহ্মাগ্নি পাইবার জন্য প্রার্থনা করেন। (৭) যম ইহাকেই নাচিকেত অগ্নি নাম দিয়াছিলেন।

(২)

বৈদিক ঋষিদিগের মতে দেব, মানব ও জীব-পূর্ণ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অজ বা পুরুষ হইতে উৎপন্ন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তাঁহারা পুরুষের দেহ বলেন এবং উহাকে

যত্র জ্যোতিরজস্রং যস্মিল্লোকে স্বর্হিতম্।
তস্মিন্ মাং ধেহি পবমানামৃতে লোকে অক্ষিত ॥ ঐ।৭

যেখানে বৈবস্বত রাজা, যেখানে দিব্যলোকের নিম্নাভিমুখী পথ (আছে), যথায় ঐ সকল মহতী আপ (অর্থাৎ বারি) আছে, তথায় আমায় অমৃত কর। হে পবমান সোম! যথায় জ্যোতিঃ অনবরত বর্ত্তমান, যে লোকে স্ব আছেন, তথায় আমায় লইয়া যাও, মরণ-ধর্ম্ম-রহিত অক্ষীন লোকে লইয়া যাও।

(২) যঃ। অস্য। অধ্যক্ষঃ। পরমে। ব্যোমন্। ১০।১২৯।৭
যিনি ইহার (অর্থাৎ এই সৃষ্টির) অধ্যক্ষ পরমব্যোমে (আছেন)।

(৩) বি। যঃ। তস্তম্ভ। ষট্। ইমা। রাজাংসি।
অজস্য। রূপে। কিং। অপি। স্বিৎ। একম্
১।১৬৪।৬

যিনি এই ছয় লোককে নিয়মিত করিয়াছেন তিনিই কি অজরূপে 'একং'?

(৪) তং। ইৎ। গর্ভং। প্রথমং। দধ্রে। আপঃ
যত্র। দেবাঃ। সং অগচ্ছন্ত। বিশ্বে।
অজস্য। নাভৌ। অধি। একং। অর্পিতং
যস্মিন্। বিশ্বানি। ভুবনানি। তস্থু ॥ ১০।৮২।৬

আপ্ সকল সেই গর্ভকেই প্রথম ধারণ করিয়াছিলেন, যাহাতে সকল দেবতা সম্যক্ আগমন করিয়াছিলেন। অজের নাভির উপর 'একং' অর্পিত (ছিলেন) যাঁহাতে সকল ভূত জাত ছিল।

হিরণ্যগর্ভঃ। সং। অবর্ত্তত। অগ্রে। ভূতস্য। জাতঃ।
পতিঃ। একঃ। আসীৎ। ১০।১২১।১

সকল উৎপন্ন প্রাণীর অদ্বিতীয় পালনকর্ত্তা হিরণ্যগর্ভ সকলের প্রথম উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

(৫) আপঃ। হ। যৎ। বৃহতী। বিশ্বং। আয়ন্
গর্ভং। দধানাঃ। জনয়ন্তীঃ। অগ্নিম্।
ততঃ। দেবানাং। সম্। অবর্ত্তত। অসুঃ। একঃ
কস্মৈ। দেবায়। হবিষা। বিধেম ॥ ১০।১২১।৭

বৃহৎ জলরাশি অগ্নি উৎপাদন করিতে করিতে যে গর্ভকে (অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভকে) ধারণ করিয়া সকল দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা হইতে দেবতাদিগের একমাত্র প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। (তাঁহা ভিন্ন) কোন্ দেবতাকে (আমরা) হবি দ্বারা সেবা করিব?

সঃ। জায়মানঃ। পরমে। ব্যোমনি
ব্রতানি। অগ্নিঃ। ব্রতপাঃ। অরক্ষত ॥ ৬।৮।২

সেই ব্রতপালক অগ্নি পরমব্যোমে জন্মাইতে জন্মাইতে ব্রত সকল রক্ষা করিয়াছেন।

(৬) ধিয়ং। বঃ। অপ্সু। দধিষে। স্বঃ সাং
যয়া। অতরন্। দশ। মাসঃ। নবগ্বাঃ।
অয়া। ধিয়া। স্যাম। দেবগোপাঃ।
অয়া। ধিয়া। তুতুর্যাম। অতি। অংহঃ ॥ ৫।৪৫।১১

(হে দেবগণ!) তোমাদিগের স্বসা (যুক্ত) ধীকে জল সকলের মধ্যে স্থাপন করা হইয়াছিল, যাঁহার দ্বারা নবগ্বগণ দশমাস (রূপ জঠর যাতনা) উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই ধী-র দ্বারা আমরা রক্ষক দেবতা হইব; এই ধী-র দ্বারা পাপকে তরিয়া যাইব।

(৭) তৎ। সবিতুঃ। বরেণ্যং। ভর্গঃ। দেবস্য। ধীমহি।
ধিয়ঃ। যঃ। নঃ। প্রচোদয়াৎ ॥ ৩।৬২।১০

সবিতা দেবতার সেই বরেণ্য জ্যোতিঃ ধ্যান করি, তিনি আমাদিগকে ধী প্রেরণ করুন।

'বিরাট পুরুষ' নাম প্রদান করিয়াছেন। পুরুষ বিরাট দেহের আত্মা ; তিনি দিব্যলোকে অবস্থান করেন। প্রত্যেক জীব, জন্তু, স্থাবর, অস্থাবর, বিরাট পুরুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রচনা করিতেছে ; এবং ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে পুরুষ আত্মারূপে অবস্থিত। তাঁহাদের মতে যাহা হইয়াছে এবং যাহা হইবে সকলই পুরুষ। (৮) কঠোপনিষদে যম এই মতই প্রচার করিয়াছেন। তিনি এই মত স্থাপন করিতে বৈদিক ঋষিদিগের দেব ও ব্রহ্মবাদকে যেভাবে সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা প্রদর্শন করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। ঋগ্বেদের কালে প্রাচীনতর কাল হইতে প্রাপ্ত দেব ও ব্রহ্মবাদ সমন্বয়েরও চেষ্টা হইয়াছে। এই রূপ চেষ্টা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন আকার ধারণ করে।

বৈদিক ঋষিদিগের মতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটী পুরুষের দেহ ; অতএব জীবদেহে যেমন আত্মা, মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণ বর্ত্তমান, সেইরূপ বিরাট দেহেও এই সকল আছে। তাঁহাদের মতে পুরুষ আত্মারূপে পরমব্যোমে অবস্থান করিতেছেন ; চন্দ্রেই বিরাট দেহের মন আছে, সূর্য্যই এই দেহের চক্ষু, বায়ু ইহার প্রাণ, দিক্ সকল শ্রবণেন্দ্রিয় এবং অগ্নি ইহার জিহ্বা। (৯) হিরণ্যগর্ভদেব বিরাট পুরুষের ধী বা বুদ্ধি। দেখান গিয়াছে, প্রাচীন ঋষিগণ ধী লাভ করিবার জন্য যজ্ঞাদি করিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাসছিল, ধী লাভ করিলে তাঁহারা বিগতপাপ হইয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইবেন।

(৩)

আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপ লোক কিরূপে পাইতে সক্ষম হন, যম নচিকেতাকে তাহার উপদেশ এই বল্লীতে প্রদান করিতেছেন :—

"সুকৃতের লোকে ঋতপানকারী দ্বয়কে, শ্রেষ্ঠ অপর অর্দ্ধে, গোপনীয় স্থানে প্রবিষ্ট দুইটীকে পঞ্চাগ্নিক ও ত্রিনাচিকেত ব্রহ্মবাদিগণ ছায়া ও আতপ বলিয়া থাকেন।

"যিনি কর্ম্মীদিগের সেতু (তিনি নাচিকেত অগ্নি) ;

---

(৮) সহস্র শীর্ষা। পুরুষঃ। সহস্রাক্ষঃ। সহস্রপাৎ।
সঃ। ভূমিং। বিশ্বতঃ। বৃত্বা। অতি। অতিষ্ঠৎ।
দশাঙ্গুলম্ ॥ ১০।৯০।১

পুরুষ অসংখ্য মস্তক, অসংখ্য চক্ষু, (ও) অসংখ্য পদ বিশিষ্ট। তিনি ভূমিকে দশাঙ্গুলে সম্যক্ আবরণ করিয়া, অধিক হইয়া (বা ভূমিকে অতিক্রম করিয়া) অবস্থান করিতেছেন।

তস্মাৎ। বিরাট্। অজায়ত। বিরাজঃ। অধি। পুরুষঃ। ঐ।৫
পুরুষঃ। এব। ইদং। সর্ব্বং। যৎ। ভূতং। যৎ। চ। ভব্যং।
উত। অমৃতত্বস্য। ঈশানঃ। যৎ। অন্নেন। অতিরোহতি॥ ঐ।২
এতাবান্। অস্য। মহিমা। অতঃ। জ্যায়ান। চ। পুরুষঃ।
পাদঃ। অস্য। বিশ্বা। ভূতানি। ত্রিপাৎ। অস্য। অমৃতং দিবি॥
ঐ।৩
ত্রিপাৎ। উর্দ্ধঃ। উৎ। ঐৎ। পুরুষঃ। পাদঃ। অস্য। ইহ।
অভবৎ। পুনঃ।
ততঃ। বিষঙ। বি। অক্রামৎ। সাশনানশনে। অভি॥ ঐ।৪

তাঁহা হইতে বিরাট উৎপন্ন ; পুরুষ বিরাটের অধিকারী। যাহা হইয়াছে এবং যাহা হইবে সে সকলই পুরুষ ; এবং অমৃতত্বেরও (তিনি) ঈশ্বর, যে (অমৃত) অন্নের দ্বারা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে।

এই সকল তাঁহার মহিমা ; পুরুষ ইহা হইতেও শ্রেষ্ঠ। বিশ্বের প্রাণীসকল তাঁহার এক অংশ ; তাঁহার অমৃত তিন অংশ দিব্যলোকে। পুরুষ তিন অংশ (লইয়া) উর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছেন ; তাঁহার এক অংশ পুনঃ পুনঃ ইহলোকে আসিতেছে। সেই জন্য বিশ্বভুতে (তিনি) ভোজনকারী ও অভোজনকারী (অর্থাৎ প্রাণী ও জড়) রূপে ব্যাপ্ত হইয়াছেন।

(৯) চন্দ্রমাঃ। মনসঃ। জাতঃ। চক্ষোঃ। সূর্য্যঃ। অজায়ত।
মুখাৎ। ইন্দ্রঃ। চ। অগ্নিঃ। চ। প্রাণাৎ। বায়ুঃ। অজায়ত॥
১০।৯০।১৩
নাভ্যাঃ। আসীৎ। অন্তরিক্ষং। শীর্ষ্ণঃ। দ্যৌঃ। সং। অবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং। ভূমিঃ। দিশঃ। শ্রোত্রাৎ। তথা। লোকান্।
অকল্পয়ন্॥ ঐ।১৪।

মন হইতে চন্দ্রমা জন্মে ; চক্ষু হইতে সূর্য্য জন্মিয়াছিল ; ইন্দ্র ও অগ্নি মুখ হইতে এবং প্রাণ হইতে বায়ু জন্মিয়াছে।

নাভি হইতে অন্তরিক্ষ হইয়াছিল ; মস্তক হইতে দিব্যলোক সম্যক্ প্রকারে বর্ত্তমান হইয়াছিল। পদদ্বয় হইতে ভূমি, কর্ণ হইতে দিক্ সকল, তৎপরে লোক সকল কল্পিত হইয়াছিল।

যাহা পরম অক্ষর ব্রহ্ম (তাহা) তিতীর্ষু দিগের অভয় পার; নাচিকেতকে (আমরা যেন পাইতে) সক্ষম হই।"

যমের এই উপদেশ অনুসারে পরম ব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ; কিন্তু তিনি অন্ধকার দ্বারা বেষ্টিত বলিয়া তাঁহাকে কেহ সহজে জানিতে পারে না। ইনি দেবলোকের শ্রেষ্ঠ অর্দ্ধ পরমব্যোমে অবস্থান করেন। দেবলোকে জলরাশি-বেষ্টিত ব্রহ্মাগ্নি আছেন—ইনিই নাচিকেত অগ্নি। নাচিকেত অগ্নি দ্বারা দেবগণ যজ্ঞ করেন এবং তাঁহাতে স্বর্গীয় সোমরস আহুতি প্রদান করেন। সেই জন্য পরমব্রহ্মকে ঋতপানকারী বলা হইয়াছে। নাচিকেত অগ্নিই স্বর্গলোকে যাইবার সেতু। তাঁহাকে আরাধনা করিয়া পাইতে হয়।

এক্ষণে যম শরীরকে রথ এবং আত্মাকে রথীরূপে বর্ণনা করিতেছেন। এই রথে আরোহণ করিয়া আত্মা কিরূপে পরম ধামে যাইতে সক্ষম হয়, যম তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিতেছেন।

"আত্মাকে রথী ও শরীরকে রথ বলিয়া জানিবেন। বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে তাহার রশ্মি (অর্থাৎ লাগাম) রূপে জানিবেন।

"ইন্দ্রিয় সকল (ঐ রথের) অশ্ব ও (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য) বিষয় সকল (উহাদের) পথ বলা হয়। ইন্দ্রিয় (ও) মনযুক্ত আত্মাকে মনীষিগণ ভোক্তা বলেন।

"যিনি অবিজ্ঞানবান্ হন্ (তিনি) কিন্তু অযুক্ত মনের দ্বারা সর্ব্বদা (অবস্থান করেন)। সারথির দুষ্ট অশ্বের মত তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত নহে।

"যিনি বিজ্ঞানবান্ হন (তিনি) কিন্তু যুক্তমনের দ্বারা সর্ব্বদা (অবস্থান করেন)। সারথির সৎ অশ্বের মত ইন্দ্রিয়গণ তাঁহার বশীভূত হয়।

"যিনি অবিজ্ঞানবান্ (তিনি) কিন্তু সর্ব্বদা অমনস্ক ও অশুচি থাকেন। তিনি সেই (পরম) পদ প্রাপ্ত হন না; (তিনি) সংসার প্রাপ্ত হন।

"যে নর বিজ্ঞান-সারথি ও মন-প্রগ্রহ যুক্ত তিনি পথের পার (স্বরূপ) বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হন। (১০)

"ইন্দ্রিয়দিগের হইতে অর্থ শ্রেষ্ঠ; অর্থ সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ; মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠা; বুদ্ধি হইতে মহান্-আত্মা শ্রেষ্ঠ হন।

"মহৎ হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ; অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই। তিনিই কাষ্ঠা (অর্থাৎ গন্তব্য স্থান), তিনিই শ্রেষ্ঠা গতি।"

যম মনুষ্যদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন দেখা যাইতেছে। এক শ্রেণীর নাম বিজ্ঞানবান্ এবং অপর শ্রেণীর নাম অবিজ্ঞানবান্। বিজ্ঞান (বা বুদ্ধি) যাহাদের সারথি হইয়াছে তাহারাই বিজ্ঞানবান্। যম বুদ্ধিকে জ্ঞানাত্মা ও সত্ত্বসংজ্ঞাও প্রদান করিয়াছেন। (১১) অতএব যমের মতে অবিজ্ঞানবান্ দিগের জ্ঞানাত্মা নাই। সেই জন্য মন ইন্দ্রিয়দিগের সহিত যুক্ত থাকিলেও, বুদ্ধি সারথি রূপে না থাকায়, ইন্দ্রিয়গণ অর্থলাভে চালিত হয় না। এরূপ লোকের ইন্দ্রিয় সকল শিক্ষিত অশ্ব-সদৃশ নহে। উহারা বিষয় রসে মত্ত হইয়া মনের সাহায্যে আত্মাকে ভোগ প্রদান করে। যম সেই জন্য মন ও ইন্দ্রিয়যুক্ত আত্মাকে ভোগাত্মা নাম প্রদান করিয়াছেন। এইরূপ লোকেই সংসার ভোগে পুনঃ পুনঃ আগমন করে; বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হয় না। পূর্ব্বে যম ভোগের পথকে প্রেয়-লাভের পথ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে যম বুঝাইতেছেন কেন মনুষ্য এই পথে গমন করে।

---

(১০) তৎ। বিষ্ণোঃ। পরমং। পদং। সদা। পশ্যন্তি। সূরয়ঃ। দিবি ইব। চক্ষুঃ। আততম্॥ ১।২২।২০

দিব্য লোকে বিস্তৃত চক্ষুকে (অর্থাৎ সূর্য্যকে) যেমন (দেখা যায়), সুরিগণ সেইরূপ বিষ্ণুর পরমপদ সদা দেখিয়া থাকেন।

(১১) যচ্ছেৎ বাঙ্ মনসী প্রাজ্ঞস্তৎ যচ্ছেজ্ জ্ঞান আত্মনি। ১।৩।১৩

প্রাজ্ঞ বাক্য মনে নিয়োগ করিবেন; তাহা জ্ঞানাত্মায় নিয়োগ করিবেন।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্। ২।৩।৭ (কঠোপনিষদ)

ইন্দ্রিয়দিগের হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে সত্ত্ব উত্তম।

কিন্তু যিনি বিজ্ঞানবান্ তাঁহার রথে বিজ্ঞান (বা বুদ্ধি) সারথির আবির্ভাব হইয়াছে। পূর্ব্বকালে ইহা-কেই ধী বলা হইত। ইন্দ্রিয়দিগকে বিত্তলাভের পথে গমন করিতে দেখিলে, ধী মন-রশ্মি টানিয়া অর্থ-লাভের পথে তাহাদিগকে চালনা করেন। ইন্দ্রিয়গণ পাছে কোন সময়ে ভোগের পথে ধাবিত হয়, সেই জন্য বুদ্ধি সর্ব্বদা মন-রজ্জু ধরিয়া থাকেন। এরূপ ব্যক্তি সদা সমনস্ক ও শুচি এবং তিনিই বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হন। বুদ্ধি দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ যে পথে চালিত হয় তাহাই শ্রেয়ের পথ। যে আত্মা বুদ্ধি-সারথি প্রাপ্ত হইয়াছেন, যম সে আত্মাকে মহান্ আত্মা নাম প্রদান করেন। মনুষ্য ধী-দ্বারা আত্মার সন্ধান প্রাপ্ত হয়।

বুদ্ধির সাহায্যে কিরূপে আত্মার উপলব্ধি হয়, যম এক্ষণে সেই বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন :—

"সকল প্রাণীতে এই আত্মা গুপ্তভাবে আছেন, প্রকাশিত হন না। সূক্ষ্মদর্শীদিগের সূক্ষ্ম একাগ্রা বুদ্ধি দ্বারা (তিনি) দৃষ্ট হন।

"প্রজ্ঞাবান্ বাক্য মনে নিয়োগ করিবেন ; তাহা জ্ঞানাত্মায় নিয়োগ করিবেন। জ্ঞানকে মহান্ আত্মায় নিয়োগ করিবেন ; তাহা শান্ত আত্মায় নিয়োগ করিবেন।"

যমের মতে, যে ব্যক্তি বুদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তিনিই আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভের উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু সেই বুদ্ধি সূক্ষ্ম ও একাগ্র করিতে হইবে ; কারণ আত্মা সকল প্রাণীতে বর্ত্তমান থাকিলেও লুক্কায়িত হইয়া আছেন ; তাঁহাকে জ্ঞানালোকে দর্শন করিতে হয়।

যম আত্মদর্শন লাভ করিবার যে উপায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহার প্রথম ধাপ বাক্য মনে নিয়োগ করা। কিন্তু বাক্য কিরূপে আসিল, এই বিষয়ে যম কিছুই বলেন নাই। ঋগ্বেদ অনুসারে আমরা ইহার প্রণালী নিম্ন লিখিত রূপ মনে করি। (১২)

যম ইন্দ্রিয়দিগের হইতে অর্থকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। 'অর্থ' কি ? বাহ্য বস্তুর যজ্ঞরূপ পরীক্ষাদ্বারা লব্ধ জ্ঞানকেই অর্থ বলে। ধীমান্ ঋষিগণ মনের দ্বারা উহাকে বাক্যে পরিণত করিয়া প্রকাশ করেন। এইরূপে ঋষিদিগের মনে শাব্দ-জ্ঞানের উৎপত্তি (বা আবির্ভাব) হইয়াছে। এই সকল শাব্দ-জ্ঞান মনে (অর্থাৎ স্মরণে) রক্ষা করিতে পারা যায়। যম বলিয়াছেন, বাক্য মনে নিয়োগ করিতে হয়। বাক্য মনে নিয়োগ করার সম্ভবতঃ ইহাই অর্থ।

জ্ঞান সমূহ নানাভাবে সুচিন্তিত না হইলে আত্মার অস্তিত্ববোধ হয় না, যমের ইহাই মত দেখা গিয়াছে। অতএব মনে যে সকল জ্ঞান সঞ্চিত হইয়াছে, বুদ্ধি দ্বারা তাহাদিগকে বিচার করিয়া তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান আবশ্যক। ইহাকেই জ্ঞানাত্মায় মনের নিয়োগ বলিয়া অনুমান করি।

জ্ঞানাত্মা যখন আত্মার সন্ধান প্রাপ্ত হন, তখন উহাই যে বিশ্বসংসারের সকল পদার্থের অস্তিত্বের মূল, এবং উহাদের মধ্যে গূঢ়ভাবে তিনি অবস্থিত, তাহা তাঁহার প্রতিভাত হয়। ইহাই মহান্ আত্মায় জ্ঞানাত্মার নিয়োগ বলিয়া মনে করি।

কিন্তু বিশ্বসংসারে ব্যাপ্ত এই আত্মার উৎস কোথায়, আত্মজ্ঞানীর মনে এই প্রশ্নের উদয় হয়। যম পরম পুরুষকে অন্ধকারাবৃত জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই অন্ধকার ভেদ না করিলে তাঁহার সাক্ষাৎকার অসম্ভব। যম পরম পুরুষের ছায়াকে অব্যক্ত ও শান্ত-আত্মা নাম প্রদান করিয়াছেন অনুমান করি। মহান্ আত্মাকে শান্ত আত্মা বা অব্যক্তে নিয়োগের অর্থ, মনে করি, ইঁহার সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা। ইনিই বৈদিক ঋষিদিগের স্বধা বা অহং-রূপিণী প্রকৃতি।

---

(১২) সক্তুম্ ইব। তিতউনা। পুনন্তঃ। যত্র। ধীরাঃ। মনসা। বাচম্। অক্রত। ১০।৭১।২

যজ্ঞেন। বাচঃ। পদবীয়ং। আয়ন্। তাং। অনু। অবিন্দন্। ঋষিষু। প্রবিষ্টাম্। ঐ।৩

ছাতুকে যেমন চালুনি দ্বারা পরিষ্কার করে, সেইরূপ ধীযুক্তগণ যথায় (অর্থাৎ যজ্ঞে) মনের দ্বারা বাক্যকে করেন।

যজ্ঞের দ্বারা বাক্যের পথ পাওয়া গিয়াছে। ঋষিদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট তাঁহাকে লাভ করা গিয়াছে।

যম নচিকেতাকে বলিতেছেন ;—

"(হে নচিকেত !) তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার উত্তীর্ণ হওয়ার মত কবিগণ এই পথ দুর্গম বলেন ; (তুমি) উঠ ! (ধ্রুবলোকে) জাগ্রত হও ; শ্রেষ্ঠ সকল প্রাপ্ত হইয়া উদ্বুদ্ধ হও।

"অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয় ও অরস, নিত্য, অগন্ধবৎ যাহা (তাহাকে), মহৎ হইতে শ্রেষ্ঠ, অনাদি, অনন্ত ধ্রুবকে জানিলে—তাঁহাকে (অর্থাৎ জ্ঞাতাকে) মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত করে।"

আত্মজ্ঞান লাভ হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। পরমপুরুষের সহিত নিত্যযুক্তা ছায়া মহতাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছেন ; তাঁহাতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ নাই ; তিনি নিত্য ও অব্যয়। ছায়া বা অন্ধকার সম্বন্ধে চিন্তা করিলেই এই সকল জ্ঞানের উদয় হয়। ইহাঁকে উত্তীর্ণ হইলেই অনাদি, অনন্ত, ধ্রুবকে প্রাপ্ত হইয়া অমৃত হওয়া যায়। আমরা অন্ধকার দেখিয়াই ভীত ও ত্রস্ত; একবার অন্ধকারের ভয় ভাঙ্গিলেই অনন্তের অমৃতত্ব লাভে অধিকারী হই। অতএব যিনি ছায়া ও আতপ-রূপ শ্রেষ্ঠতত্ত্ব জানিয়াছেন, তিনি আর মৃত্যুর অধীন হন না।

ঋষি বলিতেছেন যে, "মৃত্যু দ্বারা উক্ত সনাতন নাচিকেত উপাখ্যান বলিয়া ও শুনিয়া মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহত্ব প্রাপ্ত হন।

"এই পরম গুহ্যকে ব্রাহ্মণ-সভায় বা শ্রাদ্ধকালে শুচি হইয়া শ্রবণ করাইলেই, অনন্ত ফল প্রদান করে, ইহা অনন্ত ফল প্রদান করে।"

ফলশ্রুতি হইতে জানা যাইতেছে যে এই ধর্ম্ম, প্রচারের ধর্ম্ম ; তবে ব্রহ্মজ্ঞান পাইতে ইচ্ছুকগণকেই ইহা শ্রবণ করান বিধেয়। কারণ অপরের পক্ষে ইহা জ্ঞানগম্য নহে। শ্রাদ্ধকালেও ইহা শ্রবণ করান উচিত। কারণ পরিবারের কেহ মৃত হইলে, সে যে একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল না, তাহার আত্মা যে অমর, এই জ্ঞান শোকতপ্ত পরিবারের মধ্যে শান্তি-বারি বর্ষণ করে।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

চেনা-চিনি

মানুষকে চিনিতে হইতে কেমন করিয়া কি উপায়ে তাহাকে সহজ সরল ও সত্যভাবে চিনিতে পারা যায়, এই সমস্যা লইয়া যুগ-যুগ ধরিয়া অনেক বাদানুবাদ, অনেক জল্পনা-কল্পনা চলিয়া আসিয়াছে। কেহ বলিয়াছেন, "মানুষ চিনিতে হইলে তাহার মনোরাজ্যের সমস্ত সংবাদ লওয়া দরকার।" কেহ বলিলেন, "মানুষ চিনিতে হইলে আগে নিজে 'মানুষ' হওয়া চাই।" কেহ বা সে যুক্তি না মানিয়া বলিলেন, "কাহাকেও চিনিতে হইলে হুবহু তাহার মত হইয়া তাহার সঙ্গে মিশিতে হইবে।" ইত্যাদি নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন ; আপন চিন্তাশক্তি দেখাইয়া মানুষকে চেনার অপেক্ষা তাঁহাদের নিজের নামটা জাহির করার চেষ্টাকেই প্রবল করিয়া তুলিয়াছেন।

নিজের মতবাদ প্রকাশ করাটা তত শক্ত নহে, যত শক্ত সেই মত কাজ করা।

"কেমন করিয়া হইবে ?"—এই লইয়াই ত যত গোলমাল ! কি, তাহা অনেকের প্রায় নিজের মত ঠিক হইয়া যায়। Idleএরও ত একটা ideal আছে ! তবে Idleএর পক্ষে তাহার idealকে মানিয়া চলা অনেক সহজ। কিন্তু যাহারা idealকে কর্ম্মক্ষেত্রে intiative বলিয়া ঠিক করিয়া লন, তাঁহাদেরই কাজ করার বেলাই যত মতদ্বৈধ ! মতবাদের নেশায়

বিভোর হইয়া তখন তাঁহাদের সমস্ত কর্ম্মশক্তিটা দ্বৈধ ভাবকে বড় করার দিকে প্রযুক্ত হয়—ideal তখন তাঁহাদের নিকট হইতে অনেক দূরে সরিয়া যায়।

আমার বলার কথা আমি ঠিক আমার কল্পনা বা চিন্তাশক্তি হইতে বলিতে চাহি না—আমার কথা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফল।

মানুষকে চিনিতে চাই, কিন্তু চিনিতে পারি না! তাহার কারণ, হয় তাহাকে চেনার অবকাশ বা সুযোগ পাই না, অথবা চেনার সঠিক উপায় বা criterion নাই, নয়ত নিজের বুদ্ধির দিক্ দিয়া আমি একেবারেই ছোট! ইহাই সাধারণ কথা। এই কারণ কয়টী এখন আমরা নানা দিক্ দিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিব।

এই মানুষকে চেনার চেয়ে একটা এমন জিনিস আমাদের সামনে দাঁড়াইয়া যায় যে, চেনাচিনি ব্যাপারটা তখন নীচে তলাইয়া যায়, উপরে ভাসিয়া ওঠে আমাদের সেই চেনার মানুষটী। সেই মানুষটীর বাহিরটা লইয়া তখন আমরা এমন ব্যস্ত হইয়া পড়ি যে, তাহাকে চিনিতে আসিয়াছি এটা তখন ভুলিয়া যাই। সারা মনটাকে তখন সেই মানুষটী ছাইয়া ফেলে, চেনাটা তখন একটা অজানার (unconscious region) মধ্যেকার সামগ্রী (Psychic state) হইয়া পড়ে।

এই বাহিরের মানুষটাকে, অর্থাৎ তাহার হাত পা ওয়ালা সেইরূপ মানুষকে (organic body) যদি বাদ দিয়া সত্যকার মানুষকে (The real self) চেনার চেষ্টা করি, তবে বোধ হয় এই ব্যাপারের জটিলতা অনেক সরল হইয়া আসে। যাহাকে বলে Superficial back-ground of the real self সেটা মানুষের পোষাকী সরঞ্জাম (Superficial structure)

বাহিরের মানুষ ঠিক সত্যকার মানুষ নয়, কেন না কাল পাত্র ও সময় অনুসারে মানুষের একটা adaptability থাকে। পোষাক দেখিয়া পোষাকী মানুষকে চেনা যায়, কিন্তু ভিতরকার মানুষকে পোষাক দিয়া চিনিতে গেলে কেবল তাহার receptive faculty বা ধারণক্ষম গুণকেই জানিতে পারি—সেটা ষোল আনা মানুষের পাঁচ আনার বেশী নয়।

মনস্তত্ত্বের বিচার পদ্ধতির যে দুটী পন্থা (Introspective and the retrospective methods) তাহা দিয়া দেখি যে আমরা ঐ ভিতরকার সত্য মানুষটীকেই জানিতে চাই! বিশ্বের সমস্ত দর্শন (the World philosophy) ঐ অন্তর-জগতের (The internal reality, the self world,) দিকে নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে।

অন্তরের মানুষকে জানিতে হইলে তাহার অন্তরের সাড়া নেওয়া দরকার।

এখন, কেমন করিয়া এই সাড়া নেওয়া হইতে পারে, একথা মনে হইলে আবার সেই "কেমন করিয়া"র সমস্যা আসিয়া পড়িল। আমরা এ সমস্যা ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিব।

মানুষের হৃদয় একটা এমন কিছু পদার্থ নহে যাহাকে আমরা chemical analysis বা রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা তাহার প্রত্যেক উপাদানটী (element) পৃথক ভাবে বুঝিয়া লইতে পারি। হৃদয়ের উপর কোনও বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া সম্ভবপর নহে। তাহা হইলে হৃদয়কে শুধু জানা নয়, বেশ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া জানা সহজ হইত। এবং বিশ্লেষণাগারেরও একটা পর্য্যায় বাড়িয় গিয়া,বিজ্ঞান মন্দিরে মন-বিশ্লেষণাগারের (Laboratory for mind analysis) সৃষ্টি হইত।

রবিবাবুর গীতাঞ্জলির গানগুলি খুব মিষ্ট, খুব মধুর—এই কথা শুনিয়া যদি কোনও বৈজ্ঞানিক গীতাঞ্জলির একটা ভাল গানের পাতা ছিঁড়িয়া লইয়া আসিয়া Laboratry apparatus এ চড়াইয়া দেন এবং তাহাতে কতটুকু চিনি আছে এ তথ্য বাহির করিতে গিয়া তিনি হতাশ হইয়া পড়েন, তবে রবিবাবু হয়ত সহানুভূতি করিয়া বলিবেন সঃ কৃপণঃ তিনি কৃপার পাত্র!

সঙ্গীতের মিষ্টত্ব বস্তুগত নহে মনোগত।

বস্তুগত হইলে সাধারণ লোকে গীতাঞ্জলির পাতাখানার আস্বাদ লইলেই অন্ততঃ একটা ঠিক করিতে

পারিত যে গানটা মিষ্ট বটে।

তেমনি পথ দিয়া মৃতদেহ লইয়া যাইতে "হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া উঠিল—ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত অমরকোষ কি Encyclopœdia Britanica খুলিয়া তাহার অর্থ খুঁজিতে গেলেন। তিনি 'হরিবোল' কিম্বা 'Horrible' দেখিয়া তাহার অর্থে মৃত্যুটাকে বড় জোর একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার বলিয়া ধরিয়া লইলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁর কতদূর প্রকৃত অর্থবোধ হইল তাহা ভগবানই জানেন।

হরিবোলের অর্থ ভাষায় নয়,—মনে। ভাষাতত্ত্বের মধ্যে মৃত্যুর মাধুরী আজ পর্য্যন্ত কেহ খুঁজিয়া পান নাই—তাহার মাধুরী মনস্তত্ত্বের মধ্যেই প্রকাশ হইয়া আছে।

"অব্যাপারেষু ব্যাপারং"—তাহাতে অর্থ অপেক্ষা অনর্থই বেশী ঘটিয়া থাকে।

অন্তরকে অন্তর দিয়া বুঝিতে হইবে—সেটা বাহিরের Canons বা Lawএর মারপেঁচে নিজেকে ধরা দিবে কেন?

সুপ্তকে জাগাইতে হইলে যেমন তাহাকে ভাল করিয়া নাড়িয়া দেওয়া প্রয়োজন, তেমনি অন্তরকে জাগাইয়া সাড়া লইতে হইলে তাহাকেও একবার নাড়া দিতে হইবে।

মানুষকে বাহির হইতে অন্তরে টানিয়া আনিয়া তাহার সাড়া লইতে হয়, Psychical processএ (মনোজগতের নিয়মে) অন্তর সাড়া দিতে বাধ্য হয়।

অতি সহজ উপায়ে মানুষের অন্তরের খবর লওয়া যায়।

মানুষের স্বার্থে আঘাত কর, তাহার অন্তর তখনই সাড়া দিয়া উঠিবে। স্বার্থে আঘাত পড়িলে মানুষ সাপের মত গর্জ্জিয়া উঠিবে। নিজের সমস্ত দেহটা আন্দোলিত করিয়া ফণা ধরিয়া উঠিয়া পড়িবে—আর সঙ্গে সঙ্গে বহির্জ্জগতের পোষাকী খোলসটা তখন আপনা হইতেই খসিয়া পড়িবে। তখন মানুষ একেবারে নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, একেবারে সত্যকার মানুষকে প্রকাশ করিয়া ফেলিবে! তাহাকে আমরা তখন এই দুইটা চক্ষু দিয়া বেশ ভাল করিয়া দেখার সুযোগ পাইব! কেন না সে যখন দুইটি পোষাকে দুইটি জগতে বেড়াইত, তখন সে কোন্‌টাতে স্ব-রূপে (real personality) বর্ত্তমান সেটা ঠিক করা বেশ একটু কঠিন ছিল। কিন্তু এখন একটা মানুষ স্বরূপে একটা জগতে আসিয়া নিজের জ্বালায় বাহিরের খোলস খুলিয়া নিজেকে প্রকাশ করিয়াছে, এখন তাহাকে চেনা সহজ!

সে যখন তাহার স্বরূপ লইয়া অন্তরের মানুষটীকে দেখাইতে বসে তখন সে একেবারে বাধ্য হইয়া দেখায় তাহার অন্য উপায় থাকে না। কাজেই তখন মুখে দেঁতো হাসি হাসিয়া মনের মধ্যে বিষের ছুরী শানাইতে পারে না, মুখে প্রেমের কথা বলিয়া অন্তরে সর্ব্বনাশের উপায় ভাবা তখন তাহার পক্ষে অসম্ভব। তখন তাহার মধ্যেকার সত্য মানুষকে সহজ সরল ও সত্যভাবে চিনিতে পারি।

কিন্তু এই কি একমাত্র পথ?

ভূমি আকাশ জল বায়ু প্রভৃতি প্রত্যেকেরই সমানধর্ম্মী বস্তুর সঙ্গে মিশিয়া যাওয়ার একটা Tendency আছে।

মানুষের ত কথাই নাই—মানুষ মানুষের সঙ্গে মেশার জন্য পাগল—মানুষের মধ্যে যখন এই পাগলা ভাবটা জাগিয়া উঠে তখনই সে বলে—

"হৃদয় আমার ক্রন্দন করে
মানবহৃদয়ে মিশিতে,
নিখিলের সাথে মহা রাজপথে
চলিতে দিবস নিশীথে।
আজন্মকাল পড়ে আছি মৃত
জড়তার মাঝে হয়ে পরাজিত,
একটি বিন্দু জীবন অমৃত
কেগো দিবে এই তৃষিতে।"

'মানুষের কাছে মানুষের নেশা সব চেয়ে বেশী'
হাজার রঙে জীবনটারে
রঙিয়ে নেওয়ার নেশা

দু'হাত দিয়ে বিলিয়ে দেওয়া
মিলিয়ে নিয়ে মেশা।

—সেই জন্যই নির্জ্জন কারাবাস (Solitary imprisonment) সভ্যজগতে শাস্তির সেরা শাস্তি। ভালমানুষ যে মানুষ-ছাড়া হইয়া থাকিলে পাগল হইয়া যায় এ আমরা অনেক দেখিয়াছি এবং এখনও দেখিতেছি।

মন দিয়া মন জানার যাঁহারা পক্ষপাতী তাঁহাদের কথা বেশ করিয়া ভাবিবার বিষয়।—মানুষের গুণধর্ম্ম সবই মনের জিনিষ; মানুষের মনুষ্যত্ব

"...consists not in the outward things we do, but in the inward things we are."

এই 'outward things' বা বাহিরের জিনিষগুলি ঐ 'inward things' বা মনের অভিব্যক্তি,—'manifestations of mind'—কাজেই সব জ্ঞানের আগের কথা ঐ মানুষের মনটা! অতএব মন দিয়া মন জানাও চলে একথা অস্বীকার করার উপায় নাই।

Search-light যেমন নিজের সীমানার জিনিসগুলিকে চোখের সামনে বেশ উজ্জল স্পষ্ট করিয়া ধরে, তেমনি মনরূপ Search-light দিয়া অন্য মনকে দেখিতে পারিলে মনের দ্রষ্টব্য বিষয়গুলিও আমার মনশ্চক্ষুর (Mind's eye) সাম্নে বেশ পরিষ্কার হইয়া উঠে। Search-lightএর যেমন বহির্জগতকে নিজের সীমানাভুক্ত করিবার একটা নির্দ্দিষ্ট শক্তি (power) আছে, তেমনি মনেরও একটা শক্তি আছে—মনের সে শক্তি Search lightএর মতই গতির উপর নির্ভর করে। কেন না মন নিজেকে বিলাইয়া দিতে দিতে যত দূরে গিয়া মিলাইয়াছে, ততদূরই মনের গতি এবং সেই গতিটাই মনের শক্তি বা power।

মনের Reflectionএর মধ্যে যতগুলি মনকে দেখিতে পাই সেগুলি সম্বন্ধে জানা আর আমাদের কঠিন থাকে না।

কিন্তু মনের প্রথম গুণ ঐ বিলাইয়া দেওয়া; মিলাইয়া যাওয়ার Tendency। সেটা না থাকিলে সে মানুষই নয়। মানুষ যে কত বড় সে বিচার করিতে হইবে তাহার অন্তঃকরণ দিয়া। মনের সম্পদেই মানুষ "বড়লোক"। মনের নিক্তিতে মানুষকে ওজন হইতে হইবে। শুধু অসম্ভব রকমের পশু-শক্তি (Brute strength) থাকিলেই মানুষ, 'মানুষ' হয় না; কারণ তাহা হইলে পশুজগতে খুব বড় মানুষ বা 'অতি মানুষ' (superman) পাওয়া যাইত। Isac Watts বলিয়াছেন—

> Were I so tall to reach the Pole,
> Or grasp the ocean with my span,
> I must be measured by my *soul*,
> *The mind's the standard of man.*

তবেই আমরা দেখিলাম যে রাসায়নিক পরীক্ষাগারে (chemical laboratory) যাহা সম্ভব নয়, তাহা আমাদের প্রকৃতি-গত গুণ-ধর্ম্মের সাহায্যে আমরা প্রতিনিয়ত সাধন করিয়া যাইতেছি।

মানুষ চায় কি?—শান্তি। তাহার জীবনের উদ্দেশ্যই To search for peace—শান্তির সন্ধান। মানুষের চরম পরিণতি তাহার কাম্য শান্তিতে। 'Crucify the flesh and blood to live a life of spirit'—তাহার উদ্দেশ্যও (ultimate end) তাই। আমাদের Individual Personality বা ব্যক্তি-মানুষের চরম উৎকর্ষ Universal humanity বা বিশ্ব মানবত্বে। —কিন্তু কিসের জন্য এই সাধ্যসাধনা?—শান্তির জন্য। এই শান্তি আমাদের Fellowship বা পারস্পরিক মিলনের মধ্যেই আছে।

I love no peace which is no fellowship—একথা প্রাণের কথা! এই fellowship বা মিলনের মধ্যে মনের বিনিময় প্রথাটা অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

এটা মানুষের মনের বৈষয়িক ব্যাপার (Economic transaction) নয়, এটা মানুষের মনের অবস্থা বা Psychical condition.

প্রেম ভক্তি ভালবাসা প্রীতি স্নেহ ও মমত্ববোধ প্রভৃতি মানুষের সুকুমার বৃত্তি প্রকার-ভেদে ও অবস্থা-

ভেদে (difference of kind and condition) ব্যবহারিক জগতে নানা ভাবে আমরা অনুভব করি বটে কিন্তু সেগুলি মূলে এক। এই বৃত্তিগুলির সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সাধন করিতেছে ঐ fellowship বা মিলন।

সঙ্গলাভের জন্য মানুষের একটা ব্যাকুলতা মনের মানুষের বিরহে একটা কাতরতা কে না জানে ?

কেন এ ব্যাকুলতা
কেন এ কাতরতা
আমি ত তোমারি গো তোমারি র'ব !

—এই সান্ত্বনা পাইলে তবে মানুষ শান্ত হয় !

সাধনায় যেমন পুণ্য (Merit) বাড়ে, তেমনি মনের সীমানাও বাড়িতে পারে। যখন মনকে মন দিয়া জানা সহজ হইবে তখন নিজের পথকেও সরল বলিয়া বোধ হইবে।

জগৎটা তখন প্রত্যেক অভিজ্ঞতার দিক দিয়া নিজের ছকা 'Four-square scheme' এর মধ্যে না পড়িলে আমরা অনায়াসে বলিতে পারিব—

There are more things in Heaven and earth,
Than are dreamt of in your Philosophy.

জগৎটা 'Giddy', 'perplexing,' 'bewildering' বোধ হয় তখন, যখন কোনও অভিনব বস্তু বা ঘটনা দেখিলে—"We cannot as a stranger give it welcome."—

মনকে জানা সহজ হইলে একথাটা বলাও সহজ—

'You strive in vain to hide your thoughts from me,who knows too well the inward glowings of a heart in love.'

এই মন দিয়া মন জানাই খুব বড় রকমের জানা। মানুষের পরিচয় মানুষের সম্বন্ধ বিচার মানুষের 'চেনা-চিনি' সেইখানেই সার্থক সত্য ও সফল হইয়া আছে, যেখানে

দু'টী প্রাণতন্ত্রী হ'তে পূর্ণ একতানে,
উঠে গান অসীমের সিংহাসন পানে।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

প্রেমের স্পর্দ্ধা

বিষম বোশেখী রোদে পোড়াদহ ষ্টেশনে
আগুন হ'য়েছে তেতে টিন।
যাত্রীর হুড়োহুড়ি—কার কথা কে শোনে !
ঘেমে পুড়ে ধূলায় মলিন।

আসে গাড়ী, হাঁকে ফেরি, কেহ নামে কেহ উঠে,
কেহ হাঁকে—'আও আও কুলি',
কেহ খায় লেমনেড, কেহ পুল পানে ছুটে
হাতে করি পোঁটলা-পুঁটুলি।

উড়িছে কাঁকর ধূলা আগুনের বাতাসে,
ইঞ্জিনে ফুঁসে বাঁধা তাপ।
টিকিট কুকোর মুখে নিদারুণ হতাশে
লোকে লোকে বেঁধে গেছে চাপ।

এহেন দারুন ঠাঁইয়ে তৃষাতুর দুপরে
কয়েকটী সঙ্গীর সাথ,
চেলি জাঁতি ঘড়ি চেনে গরদে ও টোপরে
বসি' বর সূতা বাঁধা হাত।

শুকায়ে গিয়াছে মুখ, চোখ গেছে বসিয়া,
কণ্ঠে মলিন ফুলমালা।
সারাদিন অনাহারে, রাঙা পানে রসিয়া
ঠোঁট দুটি মোহরের গালা !

নিঙাড়ি সে নীরসতা রসিকতা যা মেলে
সঙ্গীরা ঢালিতেছে কাণে,
অদূর অশথ ছায়ে অজ-অজা গা ঢেলে
আঁখি মুদে নিঃশ্বাস টানে।

বায়স গাছের ডালে বসে' আছে হাঁ করি,
ডাকিবে যে নাই হেন বল।
ঘোরাল তেঁতুলগাছে ডালে ডালে আঁকড়ি
বাদুড়েরা তন্দ্রাবিভল।

গরম টিনের তলে সে আগুন বাতাসে
বেঞ্চি আসনে করি' ভর,
অনিদ্রা অনাহারে চোখ তুলি আকাশে
কোন্ তপে বসি' ভাবী বর?—

"বহে কি মলয় বায়ু, ফুটে কিরে জ্যোছনা,
থেকে থেকে ডাকে কি কোকিল!
চন্দন-নন্দিত পাতা ফুল বিছানা
ফুলে ফুলে ভরিল নিখিল!

"তারি মাঝে হেমছবি প্রেমময় আঁখিরে,
আঁখি পানে চেয়ে নত হয়,
জীবনের যা বাসনা মিটিতে কি বাকী রে?
প্রেম আজি প্রাণ করে জয়।"

সেইদিন মেল ট্রেণে বরফ, তা ফুরাল,
প্রেম তার কোথা পেলে রস!

কর্ম্মের তাপভুমে লাল চেলি উড়াল,
সূতা বেঁধে হাত করি বশ!

মানুষে সাজাল সঙ দূর করি সরমে
এ গরমে পরাল 'ষ্টকিন্;'
ভুলাইল চারিদিক, রেল প্লাটফরমে
বসি গেল ল'য়ে তার বীণ!

ধূধু করে মরুভূমি যত চলি জীবনে,
মরীচিকা পিছাইয়ে যায়।
শুধু দাহ শুধু তাপ এ মানব ভবনে,—
কোথা প্রেম নিত্যরস পায়!

অসীম ব্যাপিয়া নীল মরণের সাগরে
কে ডুবায়ে দিল রে জগৎ!
বিদ্ধ মীন সম ছুটে,—কাটে কত যুগ রে;
নাহি ত্রাণ নাহি মিলে পথ।

এই নীল টানে বুকে, পানে বাড়ে পিয়াসা,
লোমে লোমে পশিছে এ নীল;
ঢোকে ঢোকে মৃত্যু পিয়ে, জীবনের যে আশা
নিবে আসে করে' তিল তিল।

টানাটানি ঠেলাঠেলি—পথ যায় হারায়ে
মরণের নাহি মিলে পার।
অসীমের বেড়া দেওয়া নিদারুণ কারা এ,
কেন প্রেম আনে মিছা 'ছাড়'?

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

তৈল-বন্দনা

হে তৈল, তোমায় আমি নমস্কার করি।

তুমি বহুরূপ। নিতান্ত বিপন্ন অবস্থায় মানব তাহার মানস-নয়নে যে শস্যের পর্য্যাপ্ত পুষ্পসম্ভার নিরীক্ষণ করে, তাহার মধ্যে তুমি অধিষ্ঠান করিতেছ; তুমি ক্ষিত্যূর্দ্ধসঞ্জাত নারিকেলফলাভ্যন্তরে শীতল-ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের মত বিশ্রাম করিতেছ; অতি নগণ্য অপ্রাপ্তক্রমগৌরব এরণ্ডের সাধনাবীজে রহিয়া তাহার জন্ম সার্থক করিয়া দিতেছ; কাবুলের বালুকাশুষ্ক প্রস্তরকঙ্করময় মরুপ্রান্তরে বাদামবীথির ফলকোষে ভ্রূণরূপে বিরাজ করিতেছ; গভীর ঘনান্ধকার ধরণীর বক্ষশোণিতের মত খনির তিমিরগর্ভে পাতালবাসী "পেত্রল" ঋষি-রূপে তুমি যোগমগ্ন। অতএব হে বহুরূপ, তোমায় শত শত নমস্কার।

বাণিজ্যব্যবসায়কল্পে মানবসন্তান প্রতিদিন তোমার দেহে কত কত বর্ণযোজনা করিয়া তোমার অঙ্গরাগ করিতেছে; জগতের ফলমূল আপন নির্য্যাস সৌরভ দিয়া তোমার তরল অবয়বে গন্ধরচনা করিতেছে; নানা কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় স্বাদু তোমায় স্বাদুতর করিতেছে। মানবেন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তকারী হে অনন্তবর্ণগন্ধরসময়, তোমায় নমস্কার!

ভূমিসঞ্জাত সর্ষপ তিল মসিনা শস্যসম্ভারে, নভশ্চুম্বী নারিকেল শীর্ষে, মরুপ্রদেশজাত বাদামবীথিতে, মলয়াচলশিখরবিলাসী চন্দনদ্রুমগাত্রে, ধরণীর জঠরদেশে খনির মধ্যে—সর্ব্বত্রই তুমি বিরাজিত! হে মর্ত্তান্তরীক্ষ-মরুশৈলপাতালচারি, হে সর্ব্বমঙ্গল শুভঙ্কর অনন্তরূপ, তোমায় কোটি কোটি নমস্কার।

তোমার পরোপকারবৃত্তি অতুলনীয়। সর্ষপ-বাহনে আসিয়া, কোঁকট কটকটকট কোঁকোঁকো কুটিলকটুটঙ্কৃত কঠিন কাষ্ঠঘূর্ণিকার অভ্যন্তরে তুমি প্রবেশ করিয়া থাক; অন্ধীকৃত শিববাহন বৃষভরাজ আসন্ধ্যা-প্রভাত তথায় তোমার পরিচর্য্যা করে। গোধনকুল কারণ নিজ দেহাস্থি দান করিয়া, দেহনির্ম্মুক্ত নির্ম্মল পবিত্র জ্যোতির্ম্ময় আত্মাটিও মনুজবংশের রসনাসুখের জন্য উৎসর্গ করিয়া, তুমি দধীচি হইতেও অধিক পুণ্য অর্জ্জন করিতেছ। অতএব হে পুণ্যবান্, তোমায় নমস্কার।

ভগবান মানবজাতির সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধান করিতে যুগে যুগে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন; তুমি প্রতিনিয়ত শতমূর্ত্তিতে আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করিতেছ। আমরা নির্ব্বোধ, তাই তোমায় চিনিতে পারি না। তুমি মহাপুরুষ, আমাদিগের সকল অপরাধ ক্ষমা করিও! তোমায় প্রণাম করি।

তোমার লীলাবিলাস অনন্ত অগণিত। নারিকেল হইতে নির্য্যাসিত হইয়া যখন তুমি এই মরধামে অবতীর্ণ হও, তখন কত কত যুবতীর নয়নসুভগ নিবিড়জলদরুচি অলকগুচ্ছকে মোহনতর চিক্কণতর করিয়া, পুরুষ অপেক্ষা যুবযোষিদ্‌গণেরই সমধিক তুষ্টি-বিধান কর; কখনও আবার হৈয়ঙ্গবের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া উক্ত পদার্থকে স্বাদুতর করিয়া দাও; আবার কখনও শ্রবণসুখদনামমহিমাময় বিবিধদ্রব্যসংযুক্ত হইয়া বিলাসী নরনারীর কৃষ্ণকচকলাপে হস্ত বুলাইয়া চতুর্গুণ মূল্য আদায় কর! হে শক্তিমান, তোমায় নমস্কার।

সর্ষপপ্রপিষ্টনঘূর্ণিকানালকে তুমি পীতাভ অজস্র পীযূষধারার মত নিত্য বিগলিত হইতেছ। এ মূর্ত্তিতে কখনও তুমি রসনায় সুরস রসায়ন; কখনও ব্রহ্মতালু হইতে পদতল পর্য্যন্ত ঘর্ষিত মর্দ্দিত হইয়া দেহাবয়বের স্নিগ্ধতা সম্পাদন কর; কখনও মানবের নাসাপথে প্রবেশ করিয়া নিদ্রালোকের দ্বার মুক্ত করিয়া দাও! অতএব তুমি জয়যুক্ত হও—তোমায় অভিবাদন করি।

কেরোসিনরূপে ভোগবতীর মত তুমি পাতালবাসী। নয়নমনসুভগ স্নিগ্ধ মরকতকান্তি তোমার তরলশ্রী অবলোকনে লোচনের আনন্দ, আঘ্রাণে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি! আপনি দগ্ধ হইয়া তুমি ধরণীর ধ্বান্ত বিনাশ

কর; কিছুদিন তোমার আলোক ব্যবহার করিলে মানবচক্ষু হইতে বিশ্বের আলোক পর্য্যন্ত চলিয়া যায়! নাগলোকের অধিবাসী তুমি, তাই তোমার ধূমে বিষ, শিখায় কালি, দেহে দাহ। আলোকবিধান ব্যতীত জগতের তুমি আরও যে কত হিত করিতেছ—গণিয়া তাহার সংখ্যা কে করিবে? হে জ্যোতির্ম্ময়, তোমার জয় হউক!

তুমি ষ্টোভের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মেস-বাসীর চা-পানের মৌতাত বজায় রাখিতেছ; মোটরে বাষ্পজনন করিয়া তচ্চক্রে বেগসঞ্চার করিতেছ; বাজারে বিজ্ঞাপিত বিবিধবর্ণাভ কেশতৈলের "জমীন" স্বরূপ হইয়া,মথাধরা পায়েধরা প্রভৃতি অসংখ্য রোগের আরোগ্য-বিধানব্যপদেশে অত্যল্পকালেই তৈলব্যবহারকারীর কেশ তুমি আমূল আকর্ষণ করিতেছ। আবার ইদানীং অভিমানিনী, দুঃখিনী, বিরহিণী, অধবা, বিধবা ললনাকুলের পরিধানবাস-সংস্পর্শে আসিয়া, বায়ুবেগে তাহাদিগকে তাহাদের প্রার্থিত সতীলোকে পৌছাইয়া দিতেছ। হে ঐহিক ও পারত্রিকের পরম বন্ধু, তোমার জয়জয়কার হউক!

তোমার রূপ অনন্ত, ক্রিয়া অগণ্য, গুণ অসীম! চরক সুশ্রুত হারীত শার্ঙ্গধরাদি ঋষিগণ জীবের আধি-ব্যাধি নিবারণকল্পে তোমায় কতরূপে যে উপাসনা করিয়াছেন, তাহা আমি আর কি বলিব?

আয়ুর্ব্বেদ নামক পঞ্চম বেদ তোমারই মহিমাকীর্ত্তনে পূর্ণ! সেথায় কখনও তুমি পুষ্পরাজ, সোমরাজী, মহাদশ-মূল, মহাচন্দনাদি; কখনও মহামাষ, মরিচ্যাদি, গুড়ু-চ্যাদি; কখনও বাতারি, ক্ষতাশনি, হিমসাগর, বড়বিন্দু; কখনও সাক্ষাৎ ভগবান যথা—বিষ্ণু, মহাবিষ্ণু, মধ্যম-নারায়ণ। অতএব হে সাকার, তোমায় আমি ভক্তি-ভরে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

হে তৈল, তুমি কখন সাকার কখনও নিরাকার। তুমি যখন নিরাকার (অ)চৈতন্যস্বরূপ—তখনি তোমার লীলা অতুল অনন্ত এবং অসীম।

যুগে যুগে দেশে দেশে প্রত্যেক সমাজে তুমি নিরা-কার অদ্বিতীয় অবিসংবাদিত নিত্য বস্তু হইয়া বিরাজ করিয়া কত অঘটন সংঘটন, কত অসম্ভবকে সম্ভব, কত মিথ্যাকে সত্য করিতেছ তাহার কি ইয়ত্তা আছে? তোমার ক্রিয়া-কমল এইরূপ সঞ্জীবনী মধুধারা না বিলাইলে হয়ত এ জগৎ বাসোপযোগীই হইত না।

এ নিরাকার প্রদানে প্রদায়কের আনুগত্য, প্রশংসা, ভক্তি, ভালবাসা, সমাদর প্রভৃতি বহুবিধ উচ্চাঙ্গ গুণরাজির পরিচয় পাওয়া যায়। মন্দলোকে অসূয়াপরবশ হইয়া তৈলপ্রদাতাকে পরিহাস করে, সুযোগ পাইলে নিগৃহীত লাঞ্ছিত করিতেও ছাড়ে না। অথচ প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে অল্পাধিক পরিমাণে উক্ত পদার্থ প্রদান সকলেই করিয়া থাকেন। জগতে কেবল মাত্র এই পদার্থই নিত্য এবং সৎ, কারণ ইহার ক্ষয় নাই, নাশ নাই, এবং 'যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।' অতএব হে নিত্যনিরঞ্জন, তোমায় নমস্কার।

এই নিত্যরূপের নিত্যলীলা যদি দেখিতে চাও, দেখ—ভৃত্য বলিতেছে যে তাহার প্রভুর মত ষড়ৈশ্বর্য্য-শালী মহানুভব ভূভারতে আর কেহ নাই; বড় বাবু তাঁহার চূর্ণগলিকানিবাসী ডি-সু-জা সাহেবকে European বলিয়া সতত বর্ণনা করিতেছেন; কেরাণী বাবুরা বড় বাবুকে নানাবিধ শ্রবণসুখকর কল্পিত গুণাবলীতে ভূষিত অভিহিত করিয়া উভয় পক্ষেই পুলকিত হইতেছে। হে লীলাময়, আমি তোমায় কোটি কোটি প্রণাম।

যাচক অযাচিত আশীর্ব্বাদ করে; পুরোহিত ন্যুব্জ-দেহে (হাতজোড়া থাকায়) শিরশ্চালনা করিয়া কল্যাণ কামনা করেন; বাবুরা সাহেবের আর্দ্দালি খানসামা-বর্গকে সাধ্যাতীত রকমে বখ্‌শীশ দেন; উমেদার বড় বাবুর কুৎসিত কুরূপ পুত্রকন্যার দেহে অসাধারণ রূপ-লাবণ্যের জ্যোতি দেখে, অকারণে তাদের সুগোল বলিষ্ঠ শরীরের হ্রাস বা দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া দুঃখিত হয়, বাজারে ক্রীত মৃগেল বা রোহিত মৎস্য স্বীয় পিতৃপিতা-

মহগণ কর্তৃক খনিত এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পুষ্করিণী বিশেষ হইতে তন্নিমিত্ত আনীত বলিয়া বড় বাবুকে উপঢৌকন দেয়; কেরাণী বাবু, কোনও ভগিনীপতি পশ্চিমে চাকরী করেন বলিয়া, নগদ দশ টাকায় ক্রীত সাড়ে চারিসের নির্ম্মল গব্যঘৃত বড় বাবুর বাসায় পৌঁছাইয়া দিয়া তাঁহার নিকট হইতে দুইটিমাত্র রজতমুদ্রা মূল্য গ্রহণ করেন। কেন এমন হয়? হে তৈল, এ তোমারই গুণে! অতএব হে সর্ব্বশক্তিমান্, তোমায় আমি প্রণাম করি।

রোগী চিকিৎসককে, মক্কেল উকীলকে, প্রজা নায়েব হইতে জমিদারকে, জমিদার দারোগা হইতে কালেক্টারকে, দোকানী খরিদ্দারকে, এমন কি দাস-দাসী বামুন ঠাকুরকে, সম্পাদক লেখককে, গ্রন্থকার প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতাকে অহরহ তৈল প্রদান করিতেছে—উদ্দেশ্য সকলেরই এক এবং অতি সাধু! হে তৈল, তুমি বিনা জগতের সকল কার্য্যই অচল—তোমায় অসংখ্য প্রণাম করি।

আবার দেখ—নূতন ডাক্তার এক ভিজিটে দুইবার রোগীর গৃহে যাইতেছেন,—তাঁহার অত্যন্ত দয়ার শরীর; নূতন উকীল, দ্বারবানবেশী শক্তুভোজী মক্কেলকে "আইয়ে বাবু সাহেব" বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়া চেয়ার দিতেছেন,—ভদ্রতার খাতির; লেখক সম্পাদককে কত কাকুতি মিনতি করিতেছেন,—তাঁহার কাগজই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; পুস্তক-প্রকাশক গ্রন্থকারের নিকট গ্রন্থ চাহিতেছেন—তদ্দ্বারা প্রকাশকের গৌরব বাড়িবে। এইরূপে মুখ্য ও গৌণ উভয়বিধ কারণের হিন্দোলায়, হে তৈল, তোমারই দোল-লীলা চলিতেছে! তোমার জয় হউক্।

এই বিরাট বৃটিশ শাসনরথ, হে তৈল, তুমিই চালাইতেছ। গ্রাম্য চৌকিদার দফাদারকে, দফাদার পঞ্চায়েতকে, পঞ্চায়েত প্রেসিডেণ্ট-পঞ্চায়েতকে, প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েত থানার জমাদারকে, জমাদার দারোগাকে, দারোগা ইন্‌স্পেক্টরকে, ইন্‌স্পেক্টর ডেপুটিকে, ডেপুটি কালেক্টারকে, কালেক্টার কমিশনারকে, কমিশনার লাটসাহেবকেকে অজস্র তৈল প্রদান করিতেছেন। অবিরত তৈল সিঞ্চনে মসৃণ হওয়ায় রাজ্যরথচক্র পবনবেগে চলিতেছে।

শিক্ষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে দেখ—সেখানেও রীতিমত তৈলের আদান প্রদান।

প্রাগৈতিহাসিক কালে বিদ্যার্থী গুরুর জন্য গোদুগ্ধ ও কাষ্ঠ আহরণ করিত, এ কালে পল্লীপাঠশালার ছাত্রেরা গুরুমহাশয়কে গুড়াকু সরবরাহ করে। বেসরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ সেক্রেটারী মহাশয়ের অথবা স্থানীয় ভূম্যধিকারীর শ্যালক কিম্বা নির্গুণ পুত্রকেও 'রায় গুণাকর' বলিয়া তাহার গুণব্যাখ্যা করিতেছেন। হে তৈল, এ অঘটন সংঘটন তোমারই লীলা। রাজধানীতে, গ্রন্থকারগণ ছলছল নয়নে, মলিন বদনে, নিয়মিত দ্বৌকালীন গমনে, সকরুণ ভঙ্গীতে, নানা কল্পিত দুঃখকষ্টের ইঙ্গিতে, কর্ত্তা-কুলের যশোসঙ্গীতে তোমারই মহিমা রটনা করিতেছেন। তাঁহারা পিতৃআজ্ঞার মত টেক্‌ষ্টবুক-কমিটির সভ্যগণের আদেশ পালন করেন, পত্নীর অভিলাষ পূরণের মত তাঁহাদের অন্যায়ের সমর্থন করেন, প্রণয়িণীর মনস্তুষ্টির মত অসাধ্যসাধনে যত্নবান্ হন—কারণ তাঁহার লিখিত অপাঠ্য গ্রন্থখানি পাঠ্য হওয়া প্রয়োজন।

মাসিকপত্র-জগতে দেখ—সেখানে তৈলের স্রোত অবিরাম বহিয়া চলিতেছে। সাহিত্যে যাঁহাদের নাম-ডাক আছে, মাসিকপত্র-সম্পাদক মহাশয়েরা হিন্দু স্ত্রীর মত তাঁহাদের আজ্ঞাপরায়ণ হয়েন। সে সৌভাগ্যবান্ লেখকের দুয়ার তৈলের মটকায় অবরুদ্ধ! সম্পাদক মহাশয় চাদর ঝুলাইয়া রীতিমত তাঁহার গৃহে গমন করিয়া, প্রবন্ধাকারে তাঁহার গ্রন্থাবলীর প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা ছাপিয়া, তাঁহার উপবিষ্ট, আবিষ্ট, নিদ্রিত, চিৎহওয়া, ডিগ্‌বাজী খাওয়া প্রভৃতি নানা অবস্থার হাফটোন চিত্র প্রকাশ করিয়া, গ্রন্থাবলীর বিজ্ঞাপন বিনামূল্যে দিয়া সাধ্যমত সকল উপায়ে সর্ব্বদা তৈল প্রদান করিয়া থাকেন—বিনা পয়সায় লেখা পাইবার জন্য!

আবার অন্য লেখকগণ, সম্পাদককে তৈল প্রদান

করেন। সমাজ বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয়ের যাহা মত, সেই মতের পোষক গল্প বা প্রবন্ধ লিখিয়া, সম্পাদক মহাশয় যদি কোনওরূপ অদ্ভুত ভাষা অথবা নূতন বানান আবিষ্কার করিয়া থাকেন তবে সেই আদর্শে প্রবন্ধ লিখিয়া হে তৈল, তাঁহারা তোমার মানরক্ষা করিতেছেন। গ্রন্থকারগণ বিখ্যাত ও ধনীব্যক্তিগণকে স্বরচিত পুস্তক উৎসর্গ করিয়া চাতকের মত চাহিয়া থাকেন—অন্ততঃ বহি ছাপানোর ব্যয়টাও যদি পাওয়া যায়। যাঁহারা গ্রন্থ-সমালোচনা লেখেন, গ্রন্থকার তৈলভাণ্ড হস্তে তাঁহাদের দ্বারে নিয়ত দণ্ডায়মান—তাঁহাদের মন পিচ্ছিল হইয়া যদি একটু ভাল সমালোচনা গড়াইয়া পড়ে!

কেবল ধনী ব্যক্তিকে নয়, সম্পাদক-সমালোচকগণকে নয়, পুস্তকের খরিদ্দারগণকেও তৈল প্রদানের রীতিমত ব্যবস্থা আছে—বিজ্ঞাপনের দ্বারা। গ্রন্থ অপেক্ষা গ্রন্থের বিজ্ঞাপনটি ললিততর মধুরতর সুন্দরতর করিয়া গ্রন্থকারগণ এই চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের ভবীগণ তবুও ভোলে না—ইহাই অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

রাজনীতির হাটেও তৈলের কারবার প্রচুর। নেতৃগণও যতদিন প্রাদেশিক কিম্বা ভারতীয় রাষ্ট্রসভায় প্রবেশাধিকার না পান—যতদিন অ-সভ্য থাকেন—ততদিন তাঁহারা "অমাঙ্গবর।" কিন্তু যেমন এই "অ-সভ্য" হইতে "সভ্য" দলে উদ্বর্ত্তিত হন্—অমনি তাঁহারা সুগ্রথিত বাক্যে, সন্নত সেলামে, এবং সুন্দর অপরূপ পোষাকে তৈলের শরণাগত হন্। খবরের কাগজওয়ালারা চিৎকার করিতেছে—মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা চাই, অস্ত্র আইন রহিত হওয়া চাই, জাতিনির্ব্বিশেষে রাজকার্য্যে প্রবেশাধিকার চাই, অরাজকপন্থী রাজবিদ্রোহীদলের দমন চাই, প্রাথমিক শিক্ষা আইন চাই, দেশের উচ্চতর রাজকার্য্যের ভার দেশীয় হস্তে চাই, দায়িত্বপূর্ণ শাসনভার চাই, সম্রাটের স্বদেশবাসী প্রজাগণের সহিত কি রাষ্ট্রীয় কি অন্য সকল বিষয়ে সমান অধিকার চাই, বিচার চাই, দেশের আরও স্কুল কলেজ চাই, দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন্ চাই, দেশীয় ভাষার সমাদর চাই—ইত্যাদি। ব্যস্ত সভ্যগণের সে দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না। কারণ এ সবে কোন ফল নাই। বলেন—সময় যখন হইবে তখন আপনিই এ সকল পাইব। কিন্তু সভ্য প্রতিবারেই হওয়া চাই—নচেৎ দেশের প্রভূত অকল্যাণ সাধিত হইবে! তৈল, তোমার জয় হউক।

স্বর্গের দেবতারাও তৈলের ভক্ত। হোম যোগ যাগ যজ্ঞ স্তব প্রার্থনা পূজা—সমস্তই তৈলের মায়া! ধর্ম্ম-পুস্তকে শত শত কাহিনী পাঠে জানা যায় যে, শক্তিমান্‌কে যখনই কেহ তৈল প্রদানে কুণ্ঠিত হইয়াছে, তখনই তার সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে! তৈল সাধনের বীজমন্ত্র—বলং বলং তৈল বলং।

তৈলদেবতা বলেন—

"যদা যদা হি স্বার্থস্য হানির্ভবতি মানব।
অভ্যুত্থান সুযোগস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় মূর্খানাং বিনাশায় চ দর্পিতান্।
স্বার্থসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

অতএব হে মানব কুলাবতংশগণ, যদি কল্যাণ চাও, যদি জীবন চাও, যদি সুখ চাও, তবে মিথ্যা ভাববশে মুগ্ধ হইয়া নিত্য সত্যবস্তু তৈলকে নিন্দা করিও না। তৈল প্রদাতাকে ঘৃণা করিও না। কল্পিত সুনীতি লইয়া বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠনীতির অপমান করিও না। তৈলমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ কর। তৈলনীতি অধ্যাপনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে ধর', সভাসমিতি কর, agitation কর, টাউন হলে, গোল দীঘিতে বক্তৃতা দাও, প্রবন্ধ লেখ।

হে বিংশ শতাব্দীর জাগ্রত দেবতা, হে সুখ-সৌভাগ্যের বিধাতা, হে নিরাকার তৈল, তোমায় আমি বারম্বার প্রণাম করি।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

"জুতাটা পরায়ে দে"

ইংরাজ আর নবাব-সৈন্যে শেষ হয়ে গেল রণ ;
নবাব-সৈন্য চারিদিকে ওই করিতেছে পলায়ন।
ঝড়ের মতন বেগে
ইংরাজ আসে রেগে ;
"নবাব-সাহেব পালাও"—কহিল
তাঁবুর বাহিরে কে ?
নবাব-সাহেব কহিল ডাকিয়া—
"জুতাটা পরায়ে দে !"

ইংরাজ-সেনা আসিয়াছে ওই তাঁবুর নিকটে বুঝি ;
নবাবের আঁখি ভৃত্যে তাঁহার চারিদিকে দেখে খুঁজি'।
জুতা পরাইতে তাঁরে
কেহ কোথা নাই হা রে !
ইংরাজ-সেনা গরজে অদূরে
"হিপ্—হিপ্—হুর্-রে !"
নবাব কহিল—"কে আছিস্ কোথা,
জুতাটা পরায়ে দে !"

নবাবের ওই যুদ্ধ-পতাকা ভূমিতে পড়েছে লুটি' ;
নবাব-সৈন্য বন্দী করিতে ইংরাজ আসে ছুটি'।
তাঁবুর ভিতরে একা—
নাই নাই কারো দেখা—
নবাব-সাহেব বসিয়া শুনিল
"পালাও,—আসিয়াছে !"
পলায়ন তরে কহিল হাঁকিয়া—
"জুতাটা পরায়ে দে !"

শত্রুসৈন্য নবাবের তাঁবু ঘিরিয়া ফেলিল ত্বরা ;
চীৎকারে সবে—"হিপ্ হিপ্ হুরে—নবাব পড়িল ধরা।"
সেনাপতি, করে অসি
তাঁবুর ভিতরে পশি'
কহে—"এস, তুমি বন্দী মোদের
নবাব সাহেব হে !"
নবাব কহিল—"যাইতেছি—তুই
জুতাটা পরায়ে দে।"

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সিংহ।

সিন্দূর-কৌটা

(উপন্যাস)

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

বস্তুতান্ত্রিক প্রণয়লিপি।

নিদ্রাভঙ্গে সুশীলা চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, কক্ষে বিদ্যুৎ-আলো জলিতেছে, উপরে পাখা ঘুরিতেছে। একটু একটু শীতবোধ হইতে লাগিল। প্রথম কয়েক মুহূর্ত্ত কোন কথাই তাহার স্মরণপথে আসিল না। প্রতিরাত্রে শয়ন করিবার সময় সে আলো নিবাইয়া দেয় ; ভাবিল, আজ বুঝি তাহা করিতে ভুলিয়া গিয়াই শুইয়া পড়িয়াছে। বালিস হইতে মাথাটি একটুখানি তুলিয়া এদিক ওদিক চাহিতেই বুঝিতে পারিল, ইহা পূর্ব্ব কয়েক রজনীর অধিকৃত সে শয়ন-কক্ষখানি নহে—ইহা অপরিচিত—একটু বিস্মিত হইল। দেখিল আয়া মেঝের উপর কম্বল পাতিয়া শুইয়া ঘুমাইতেছে,—তখন পূর্ব্বকথা কিছু কিছু তাহার মনে পড়িতে লাগিল। মনে পড়িল, বিজয়ের মান্দ্রাজ

যাইবার প্রস্তাব, যাত্রার পূর্ব্বে এখানে তাহার আগমন; তাহার পর, উভয়ে সোফায় বসিয়া কথোপকথন; মনের দুঃখে, আত্মসংযম হারাইয়া সে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল—তাহার পর—

সুশীর মুখ ও কাণ লাল হইয়া উঠিল। নিদ্রিতা আয়ার পানে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতে লাগিল—ও তখন কোথায় ছিল, কিছু দেখিয়াছে কিনা কে জানে! ছি ছি—কি লজ্জার কথা। তাহার মন বলিল ছি ছি—কিন্তু হৃদয় এক অপূর্ব্ব পুলকে পূরিয়া উঠিতে লাগিল।

দুই তিন মিনিট কাল এই দুই ভাবের নাগর-দোলায় দুলিয়া, সুশী বিছানায় উঠিয়া বসিয়া অনুচ্চকণ্ঠে ডাকিল—"আয়া।"

আয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন—এ ক্ষীণ স্বরে তাহার ঘুম ভাঙ্গিল না। পাখা বন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে সুশী তখন বিছানা হইতে নামিল। উঃ—দেহ এমন দুর্ব্বল, ভাল করিয়া যেন দাঁড়ান যায় না, পা টলে। কিয়দ্দূরে দেখিল, টেবিলের উপর একখানি ট্রে তাহাতে কি সব খাবার ঢাকা রহিয়াছে, পার্শ্বে একটি স্পিরিট-চুলা। পাখার সুইচ্ বন্ধ করিতে গিয়া দেখিল, নিকটস্থ আয়নার টেবিলে একখানি লেখা কাগজ পাটপিট করা, তাহার উপর হাত-ঘড়িটি চাপা দেওয়া রহিয়াছে। ঘড়িতে আড়াইটা বাজিয়াছে। কাগজখানি তুলিয়া দেখিল, তাহা বিজয়ের হস্তাক্ষর। সেইখানে দাঁড়াইয়া পাঠ করিতে লাগিল। তাহাতে লেখা আছে—

আমার সুশীলা,

রাত্রি এখন বারোটা। তুমি ঘুমাইতেছ। আর অধিকক্ষণ এখানে অপেক্ষা করা আমার উচিত নহে এই বিবেচনায় আমি এখন চলিলাম। তোমার জন্য খাবার আনাইয়া রাখিয়াছি, যখন তোমার ঘুম ভাঙ্গিবে, উঠিয়া খাইও। এক পেয়ালা সুরুয়া, এক প্লেট কোল্ড চিকেন এবং একটা কাষ্টার্ড পুডিং রহিল। সুরুয়াটুকু সে তোমায় গরম করিয়া দিবে। ঘুম যখনই ভাঙ্গুক, সুরুয়াটুকু নিশ্চয়ই পান করিও। অপর খাদ্যগুলি ক্ষুধা অনুসারে খাইও। আমি এখন চলিলাম, কল্য বেলা ৯টার মধ্যে আবার তোমায় দেখিতে আসিব।

এই তোমাকে আমার প্রথম প্রণয়লিপি—এখানি একটু 'বস্তুতান্ত্রিক' হইয়া পড়িল, নয়? আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে খাদ্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য বাবুর্চ্চিখানায় লোক পাঠাইয়া, আবার যখন আমি তোমার বিছানার কাছে চেয়ারখানিতে আসিয়া বসিলাম, দেখিলাম, তোমার অধরে মৃদু হাসির রেখা খেলা করিতেছে। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কি স্বপ্ন দেখিতেছিলে সুশীলা আমার? স্বপ্নটি মনে করিয়া রাখিও, কাল সকালে আসিয়া আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করিব। এখন যাই—না না, আসি। 'যাই' বলিতে তুমি যে আমায় নিষেধ করিয়াছিলে!

তোমার বিজয়।

পত্রখানি হাতে করিয়া সুশীলা আবার বিছানায় আসিয়া বসিয়া, প্রথমটা হাঁফাইতে লাগিল। ভাবিল, দুই পা চলিয়াই আজ এত শ্রান্তিবোধ হইতেছে কেন? আমার এ কি হইল? আর, এত ঘুম আমার চোখেই বা কোথা হইতে আসিয়াছিল? গত রাত্রে থিয়েটর হইতে ফিরিয়া, ঘুম ত ভাল হয় নাই, আজ দিনেও ঘুমাই নাই—রাজ্যের ঘুম আমারই জন্য বুঝি জমা হইয়া ছিল! তিনি যাইবার পূর্ব্বে আমায় জাগাইলেন না কেন?—পত্রখানি আবার সে পড়িতে লাগিল—কারণ, কি পড়িয়াছিল তাহা ভাল মনে পড়ে না। মস্তিষ্কও দুর্ব্বল। শেষ অবধি পড়িয়া আবার আরম্ভ করিল। সুশীর ললাটপ্রান্তে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিল—পাখাটা বন্ধ হওয়ার জন্যই বোধ হয়।

সহসা "দূর্হো ছড়ি মচ্ছড়" বলিয়া কার্পেটশায়িনী আয়া নিজ গণ্ডদেশে এক প্রবল চপেটাঘাত করিয়া, পরক্ষণেই 'উহুহু' বলিয়া উঠিয়া বসিল। নিজের

"মেমসাহেব, কখন জাগিলেন ?"

"এই অল্পক্ষণ হইল।"

"এখন কেমন আছেন ?"

"কেন, আমার কি হইয়াছিল ?"

"আপনার ভারি অসুখ করিয়াছিল, মনে নাই ? আপনি যে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন।"

"মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম ? কখন ?"—বলিয়াই সুশীর যেন মনে পড়িতে লাগিল—সোফায় বসিয়া, বিজয়ের স্কন্ধে মাথা রাখিয়া, সহসা তাহার মাথা ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছিল বটে।

আয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া, অন্যদিকে চাহিয়া একটু মৃদু হাসিয়া বলিল—"সন্ধ্যার পর সাহেব আসিলেন, না ? মান্দ্রাজ যাইবেন কথা ছিল। আপনি কাঁদিতে লাগিলেন।—"

সুশী বাধা দিয়া বলিল—"তুই কোথায় ছিলি ?"

আয়া অম্লানমুখে উত্তর করিল—"আমি দরজার বাহিরে বারান্দায় বসিয়া ছিলাম, মাঝে মাঝে পর্দ্দা একটু উঠাইয়া ভিতরে দেখিতেছিলাম কি না! সাহেব যখন আপনাকে কিস্ করিলেন, সেই সময় আপনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন—আপনার মনে নাই ?"

সুশী একদৃষ্টে আয়ার পানে চাহিয়া ছিল। তাহার কথা শেষ হইলে জিজ্ঞাসা করিল—"তার পর ?"

"তারপর সাহেব আমাকে ডাকিলেন। আমি ছুটিয়া গিয়া ম্যানেজার সাহেবকে খবর দিলাম। ডাক্তার-মেম সাহেব আসিলেন। আপনাকে পালঙ্কে আনা হইল, অনেক কষ্টে আপনার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল।"

সুশীর স্মরণ হইল, ঠিক বটে, ঘুমের মাঝখানে একবার সে জাগিয়া উঠিয়া একজন অপরিচিতা মেমকে দেখিয়াছিল বটে। আয়া বলিতে লাগিল—"সাহেব বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। আপনি তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, সাহেবকে কি সব বলিয়া ডাক্তার-মেম চলিয়া গেলেন। সাহেব আপনাকে সুরুয়া পান করাইলেন। তার পর আপনি ঘুমাইয়া পড়িলেন—এখন মনে হইতেছে

"তার পর ?"

"সাহেব চলিয়া গেলেন। আপনার জন্য চিঠি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন"—বলিয়া আয়া উঠিল, আয়না-টেবিলের নিকট গেল।

সুশী বলিল—"চিঠি আমি পাইয়াছি।"

"আপনার খাবার ঢাকা রহিয়াছে। সুরুয়া গরম করিয়া দিব কি ?"

"আচ্ছা দে।"

আয়া ষ্টোভ জ্বালিয়া সুরুয়া গরম করিতে লাগিল, সুশীলা বসিয়া চিঠিখানি আবার পড়িতে লাগিল। মাঝে মাঝে চিঠি পড়া বন্ধ করিয়া দেওয়ালের দিকে চাহিয়া, সন্ধ্যাবেলার ঘটনাগুলির কথা ভাবিতে লাগিল। একটা কথা মনে পড়িলে আর একটা কথা ভুলিয়া যায়—ঘটনাসূত্র যেন ছিন্নভিন্ন। সে আপন মনে বলিল—"আমার চোখ থেকে ভাল করে' ঘুম এখনও ছাড়ে নি—না, কি ? সে আমায় ভালবাসে বলেছে। আর—আর কি কি হয়েছিল কে জানে!"—তাহার মাথাটি যেন ঝিম্‌ঝিম্ করিতে লাগিল।

বিছানায় বসিয়া গরম সুরুয়াটুকু পান করিবার পর সুশী কতকটা সুস্থবোধ করিল। আয়ার পীড়াপীড়িতে পুডিং হইতেও কিয়দংশ লইয়া খাইল—আর কিছু খাইতে সম্মত হইল না।

আহারের পর, আবার তাহার চোখ দুটি ঘুমে জড়াইয়া আসিতে লাগিল। প্লেটগুলি সরাইয়া লইতে লইতে আয়া বলিল—"হুজুর, শয়ন করুন, এখনও অনেক রাত আছে। কাল সকালেই উঠিতে হইবে, সাহেব ৯টার সময় আসিবেন বলিয়া গিয়াছেন। পাখাটা খুলিয়া দিব কি ? বড় মশা।"

"দে"—বলিয়া সুশী বিছানায় এলাইয়া পড়িল।

দ্বাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

দিন কাটে না

পরদিন প্রভাতে সুশীর ঘুম ভাঙ্গিলে বিছানায়

করিল ; আয়া বলিল—"আটটা প্রায় বাজে মেম-সাহেব। আপনার মুখ ধুইবার গরমজল আনাইয়া রাখিয়াছি, উঠুন। সাহেব ৯টার সময় আসিবেন বলিয়া গিয়াছেন।"

সুশী বলিল—"আটটা বাজে!—আমি যে স্নান করিব। আমার স্নানের জল দিতে বল্।"

"বহুৎ আচ্ছা হুজুর"—বলিয়া আয়া প্রস্থান করিল। সুশী বিছানায় সেইভাবে বসিয়া ভাবিতে লাগিল—তাই ত! এত বেলা হইয়াছে? স্নান করিব কখন, পোষাক পরিব কখন!—স্নান না করিয়া আজ পর্য্যন্ত কোনও দিনই ত বিজয়ের সামনে আমি বাহির হই নাই!—যাহা করি নাই, আজ তাহা করিব?—না না—তাহা অসম্ভব! এত দেরী করিয়া ঘুমভাঙ্গা ভাল হয় নাই—ছি ছি। বড়ই তাড়াতাড়ি হইল।

প্রায় পাঁচমিনিট পরে আয়া আসিয়া বলিল—"স্নানের জল দিতে বলিয়াছি;—আর, সাহেবের দ্বারবান হুজুরের জন্ত এই চিঠি আনিয়াছে। জবাব চায়।"

সুশী পত্র লইয়া কম্পিত হস্তে তাহা খুলিয়া ফেলিল। পড়িল—

আমার সুশীলা,

আজ বেলা ৯টার মধ্যে তোমায় দেখিতে আসিব বলিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা পারিলাম না। বাড়ীতে বড় গোলমাল। ওবেলা তোমার কাছে নিশ্চয়ই আসিব।

কাল সারারাত তুমি কেমন ছিলে, আজ এখন কেমন আছ, লিখিয়া আমায় জানাও। তুমি ভাল আছ ইহা না জানিতে পারিলে, আমার মন কোন মতেই সুস্থির হইতেছে না।

বিকালে আসিয়া সব কথা বলিব।

তোমার বিজয়।

সুশী আয়াকে বলিল—"এখন স্নানের জল দিতে মানা কর্। কাগজ কলম আন্, চিঠি লিখিব।"

আয়া জিজ্ঞাসা করিল—"সাহেব কি এখন আসিবেন না, হুজুর?"

"না, তাঁর বাড়ীতে কায আছে। ওবেলা আসিবেন।"

কাগজ কলম লইয়া সুশী পত্র লিখিল—

প্রিয়তম,

কাল রাত্রে আমি ভালই ছিলাম, এখনও বেশ আছি। তবে শরীরটা কিছু দুর্ব্বল। তুমি আমার জন্য চিন্তা করিও না।

তোমার চিঠি পড়িয়া, ব্যাপার কি আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি যতক্ষণ আসিয়া সকল কথা আমায় না বলিবে, ততক্ষণ আমারও মন কোন মতে সুস্থির হইবে না। শীঘ্র আসিও—তোমার পথ চাহিয়া রহিলাম।

তোমার সুশীলা।

পত্রখানি খামে বন্ধ করিয়া, ঠিকানা লিখিয়া আয়ার হাতে দিয়া সুশী বলিল—"এই জবাব। আমি এখন উঠিব না, আর একটু ঘুমাইব—শরীর এখনও দুর্ব্বল রহিয়াছে। ঘণ্টা খানেক পরে আমার স্নানের জল পাইলেই চলিবে।"

আয়া বলিল—"এক পেয়ালা চা এখন আনাইয়া দিব কি হুজুর?"

"না—এখন নয়,"—বলিয়া সুশী শয়ন করিল।

ঘণ্টাদুই পরে সুশী উঠিয়া স্নানাদি করিল। আহারেও বসিয়াছিল, কিন্তু তাহার মনটি বড়ই চঞ্চল হইয়াছে। বিজয়ের পত্র দুইখানি সে বারম্বার পাঠ করিয়াছে—শেষের খানিতে, "বাড়ীতে বড় গোলমাল" কথাগুলির কোনও অর্থই সে স্থির করিতে পারিতেছে না। কি হইয়াছে?—এই গোলমাল কি তাহারই জন্ত উপস্থিত হইয়াছে? তিনি কি তবে বকুরাণীকে বলিয়াছেন? বলাই সম্ভব। ছল চাতুরী করিবার লোক ত তিনি নহেন! যাহা হইয়াছে, নিশ্চয়ই তিনি বকুরাণীকে বলিয়াছেন—এবং সেই উপলক্ষেই গোলমাল বাধিয়া থাকিবে। গুরুতর কিছু ঘটিয়াই থাকিবে—নহিলে, অন্ততঃ দশ-মিনিটের জন্তও আসিয়া তিনি ত আমায় দেখা দিয়া

যাইতে পারিতেন।

সারাদিন সুশীর বড় কষ্টেই কাটিল। বসিয়া সুখ নাই, শুইয়া সুখ নাই,—খালি বুকের ভিতরটা গুরগুর্ করিতে থাকে। হোটেলের লাইব্রেরীতে গিয়া সংবাদ-পত্র পড়িতে চেষ্টা করিল, ভাল লাগিল না। আলমারি হইতে উপন্যাসের পর উপন্যাস পাড়িয়া পাতা উল্টাইল, কোনও খানি মনের মত হইল না। অবশেষে নূতন ও পুরাতন খানকতক সচিত্র মাসিকপত্র লইয়া নিজ কক্ষে ফিরিয়া আসিল। বসিয়া পড়িতে চেষ্টা করিল—ভাল লাগিল না। বিজয়ের পত্র দুইখানি তাহার ব্লাউজের ভিতর বুকের কাছে ছিল, কেবল সেই দুই খানিই পড়িতে ইচ্ছা করে।

দীর্ঘ দিন এইরূপে অতিবাহিত হইল।

সন্ধ্যা হয় হয়। সুশী তাহার বসিবার কক্ষে এক-খানি মাসিক পত্রের পাতা উল্টাইয়া ছবি দেখিতেছে, আয়া পার্শ্বের কক্ষে তাহার বিছানা ঠিক করিতেছে—এমন সময় বাহিরে কাহার পদশব্দ শুনিয়া সে অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত উঠিয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণেই বিজয় প্রবেশ করিয়া, তাহার দুটি হাত নিজ হাতে লইয়া বলিল—"কেমন আছ সুশীলা?"

সুশী অন্যদিকে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে উত্তর করিল—"ভাল আছি।"

"কেমন ছিলে আজ সারাদিন?"

"ভাল ছিলাম।"

"কাল রাত্রে কখন তোমার ঘুম ভাঙ্গলো?"

"দুটোর সময়।"—বলিয়া সুশী বিজয়ের মুখপানে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—"তোমার চেহারা এ কি হয়ে গেছে!"

বিজয় সুশীর হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল—"কেন? কি হয়েছে?"

সুশী বিজয়ের হাতটি ধরিয়া টানিয়া সোফার নিকট লইয়া গেল। বলিল—"বস।"

বিজয় বসিলে, সুশীও তাহার পার্শ্বে বসিয়া বলিল—"তোমার চোখ বসে গেছে, মুখ শুকিয়ে গেছে—এ কি হয়েছে?"

বিজয় মৃদু হাসিয়া বলিল—"ওঃ—এই!—কাল রাতে ত ভাল ঘুম হয়নি, দিনেও শুই নি, তাই বোধ হয়।"

সুশী উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কেন, দিনে শুলে না কেন? বাড়ীতে কি গোলমাল হয়েছে বল বিজয়! সারাদিন আমার ভারি মন খারাপ গেছে। কিসের গোলমাল?—সবাই ভাল আছে ত?"

"আছে।"

"বকুরাণী?"

"ভাল আছে। তাকে বলেছি।"

"বলেছ? যা ভেবেছি তাই। আমি তখনই জানি।"

বিজয় ঔৎসুক্যের সহিত বলিল—"কি জান তুমি?"

"জান যে কালকের সন্ধ্যেবেলার যা ঘটনা, তা তুমি বকুরাণীকে বল্‌বে।"

বিজয় বলিল—"তুমি জান? আশ্চর্য্য ত! আচ্ছা, তোমরা কি করে এ সব জানতে পার?"

"আমরা কারা?"

"তুমি, বকুরাণী—তোমায় ভালবাসি সে কথা আমি বকুরাণীকে বলেছি। শুনে, সে কি বল্লে জান?"

"সে কি বল্লে?"

"সে বল্লে—তুমিও এখনি যা বল্লে। সে বল্লে—আমি তা অনেকদিন থেকে জানি।"

ইহা শুনিয়া সুশী গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"কি ভাবছ?"

সুশী মুখ তুলিয়া বলিল—"তুমি কি ভাবছ?"

বিজয় বলিল—"কাল আমায় মান্দ্রাজ যেতে হবে, সেই কথা ভাবছি।"

"কেন? আবার মান্দ্রাজ কেন?"

"একই কারণে। বাস্তবিক তুমি অবিবাহিতা কিনা, অনুসন্ধান করবার জন্যে।"

সুশী অনুযোগের স্বরে কহিল—"যে কথার জন্যে কাল এত কাণ্ড হয়ে গেল, আবার তুমি সেই কথা আজ বলছ ?—আমায় তুমি যা বলেছ, যা করেছ, তার পরেও—মান্দ্রাজ যেতে চাও ? এখনও আমায় তুমি বিলিয়ে দিতে চাও ?"

একটা কি কথা বিজয়ের মুখের কাছ অবধি আসিয়াছিল, কথাটাকে হঠাৎ সে আটকাইয়া ফেলিল। তখনই অন্য কোন উত্তরও যোগাইল না।

বিজয়কে নীরব দেখিয়া সুশী চক্ষু নত করিয়া বলিল—"তোমার মনের ভাব আমি যে না বুঝেছি তা নয় বিজয়।"—বলিয়া একটি কম্পিত নিশ্বাস ফেলিল।

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"কি বুঝেছ, শুনি।"

সুশী সোফায় হেলান দিয়া, মুখখানি বিজ্ঞের মত করিয়া বলিল—"পদ্যপাঠ পড়েছ ? তাতে লেখা আছে—

যে মাটীতে পড়ে লোক, উঠে তাই ধরে',
বারেক নিরাশ হয়ে কে কোথায় মরে ?
তুফানে পতিত কিন্তু ছাড়িব না হাল ;
আজিকে বিফল হ'ল, হতে পারে কাল।"

বিজয় বলিল—"অর্থাৎ ?"

সুশী মুখটি নীচু করিয়া বলিল—"অর্থাৎ—আমাকে আজই ঝেড়ে ফেলা তোমার পক্ষে হয়ত শক্ত—কিন্তু তোমার নিরাশ হবার দরকার নেই।"—বলিতে বলিতে তাহার ওষ্ঠযুগল যেন কিঞ্চিৎ স্ফীত হইয়া উঠিল।

বিজয় একটু হাসিয়া, সুশীর কাছে একটু সরিয়া আসিয়া, তাহার হাতখানি একটু নাড়িয়া দিয়া বলিল—"পাগলু !—এ কথা তোমার মনে এল কেন ? আমি তোমায় ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করছি—তোমায় বিলিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করছি—এখনও এই সব কথা ?"

সুশী বলিল—"মন্দ কথা ত কিছু নয়—মন থেকে আমায় ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করাই ত তোমার উচিত। তুমি যদি অবিবাহিত হতে, তা হলে অবশ্য অন্য কথা ছিল—"

বিজয় সুশীর হাতখানা ধরিয়া বলিল—"আমি যদি অবিবাহিত হতাম, তা হলে কি হত সুশীলা ?"

সুশী বলিল—"তা হলে, তুমি চাইলেই আমায় পেতে—আমি তোমার হতাম—তোমার স্ত্রী হতাম।"

"তুমি আমার স্ত্রী হতে ?—কিন্তু আমরা ত হিন্দুমানুষ, আমি যদি বলতাম, মেয়েছেলে জুতো মোজা পরে আমি দুচক্ষে দেখতে পারিনে, যেখানে সেখানে বেড়ায় আমি তা ভালবাসিনে—আমি যদি তোমায় বেরুতে না দিতাম, তোমায় পর্দ্দায় রাখতে চাইতাম ?"

"তাই থাকতাম। জুতো মোজা পরতাম না। সিঁদুর পরতাম, শাঁখা পরতাম।"

বিজয় কিয়ৎক্ষণ বসিয়া কি ভাবিল। শেষে বলিল—"তুমি সত্যি বলছ সুশীলা ? এই যা সব কল্পনা করা যাচ্ছে, তাই যদি বাস্তব হত—আমি যদি অবিবাহিতই হতাম,এই ১৮।১৯ বছর অবধি তুমি ইংরেজী ধরণে মানুষ হয়েছ—তার পর যদি হঠাৎ আমি তোমায় বিয়ে করে, অন্তঃপুরের মধ্যে তোমায় ইণ্টার্ণ করে ফেলে, জবরদস্তি তোমায় হিন্দু করে ফেলবার চেষ্টা করতাম, তা হলে তুমি তা সহ্য করতে পারতে ? তোমার কোনও দুঃখ হত না ?"

সুশী দৃঢ়স্বরে বলিল—"কিসের দুঃখ ! কিচ্ছু না। হিল্লী দিল্লী ছুটোছুটি করে' বেড়িয়ে, আর টেবিলে বসে ছুরিকাঁটা ধরে খানা খেয়ে ত সুখের সীমে নেই !" পরক্ষণেই মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে বলিল—"তবে, পর্দ্দাতেই থাকি আর যাই থাকি, ছুটির সময় তুমি দেশভ্রমণ করতে চাইলে তোমায় একলা ছেড়ে দিতাম না, বুঝেছ গো।"

হাসির কথা—কিন্তু কাহারও মুখে হাসি দেখা গেল না। আকাশ কুসুমের আবাদ করিতে হইলেও, মাটীতে পা রাখিয়াই তাহা করিতে হয়—অন্য উপায় নাই।

সুশী বলিল—"তুমি চা খেয়ে এসেছ ?"

"চা ?—কৈ, মনে ত পড়ে না। খাইনি বোধ হয়।"

সুশী তৎক্ষণাৎ তাহার আয়াকে ডাকিয়া চা আনিতে হুকুম দিল। আয়া চলিয়া গেলে বলিল—"আমি যে জিজ্ঞাসা করলাম—কি নিয়ে বাড়ীতে গোলমাল হয়েছিল ?"

বিজয় বলিল—"তোমার কথা বকুরাণীকে আমি সমস্তই বলেছি—"

সুশী বলিল—"শুধু আমার কথা ? তোমার নিজের কথা বল নি ?"

বিজয় বলিল—"তাও বলেছি বৈ কি।"

সুশী বলিল—"বকুরাণীকে কি সব কথা তুমি বলেছ ?"

বিজয় বলিল—"বল্লাম যে !"

সুশী বলিল—"দেখ বিজয়, আমার মাথার মধ্যে আজ সমস্তই গোলমাল। আজ আমার কি হয়েছে। আবার বল। কখনই বা বকুরাণীর সঙ্গে তোমার দেখা হল, কি সব কথা তুমি তাকে বল্লে, সেই বা কি বল্লে—গোলমালই বা কি হল।"

এমন সময় হোটেলের খানসামা চা আনিয়া হাজির করিল। সুশী বিজয়কে চা ঢালিয়া দিল। খানসামা অপেক্ষা করিতে লাগিল।

চা পান শেষ হইলে বিজয় বলিল—"সুশীলা, চল, একটু বেড়াবে ?"

"কোথা যাবে ?"

"চল, মাঠে একটু বেড়ান যাক্। তার পর, ইডেন গার্ডেনে, একটা নির্জ্জন বেঞ্চি খুঁজে সেইখানে দুজনে বসে সব কথা তোমায় বলব। আজ অনেক কথা তোমায় বলবার আছে।"

"বেশ, চল। আমি জুতো বদলে আসি"—বলিয়া সুশীলা তাহার শয়নকক্ষে গেল।

ফিরিতে সুশীর বিলম্ব হইতে লাগিল। প্রায় পনেরো মিনিট পরে যখন সে ফিরিল, বিজয় দেখিল শুধু জুতা নয়, বস্ত্রাদিও সে পরিবর্ত্তন করিয়া আসিয়াছে। সোহাগপুরে বিজয় তাহাকে যে মান্দ্রাজী শাড়ী খানি কিনিয়া দিয়াছিল, তাহাই পরিয়াছে।

উভয়ে তখন হোটেল হইতে নামিল। বিজয়ের মোটর গাড়ী তথায় অপেক্ষা করিতেছিল। উভয়কে লইয়া গাড়ী ময়দানের দিকে ছুটিল।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

প্রেমের পুনরুজ্জীবন

তোকে নিয়ে নূতন করে' আজ
　　　　প্রণয়-লীলা চলছে মোদের মাঝে ;
তুই-ধনকে বক্ষে ধরে আজ
　　　　প্রণয় আবার এল নূতন সাজে।
　　প্রণয়েরি ধরণ পুরাতন,
　　তাহাতে আর উঠতো নাক' মন,
একই রকম নিত্য কলরব
　　　　মনে হত এক ঘেয়ে আর বাজে,
তোকে নিয়ে প্রণয় এল আজ
　　　　নূতন ভাবে পুন মোদের মাঝে।

তোকে নিয়ে নূতন নূতন খেলা
আবার মোদের চলছে অবিরাম,
তর্ক মোদের প্রতি সাঁজের বেলা
কি হবে তোর একটা ভাল নাম ;
মোদের কারে অধিক ভালবাসিস্,
কাহার কথায় বেশী রকম হাসিস্,
কোন্ পোষাকে মানায় তোরে ভাল
বিতণ্ডা এ চলছে অবিশ্রাম।
তোকে নিয়ে নূতন নূতন খেলা
চলছে, ওরে হৃদয়-অভিরাম!

যতই তোরে ঘুম পাড়াতে চায়
ততই আমি জাগায়ে দেই তোয়,
খাবার জিনিস তোর সমুখে ধরি
যতই কেন লুকায়ে সে থোয়।
লিখ্‌তে যখন বসি টেবিল পাশে
কাছে তোরে রাখিয়ে সে হাসে,
আগায়ে দেই, অনাচারের ভয়ে
যখন সে তোয় সাবধানে না ছোঁয় ;
আফিস যাবার সময় হলে পরে,
দুয়ারে সে পাঠায়ে দেয় তোয়।

মোদের মাঝে বিবাদ বিসংবাদে
বিচারকের অভাব ছিল বড়,
তুই না হলে মিট্‌ত নাক' কিছু,
—দুই জনেরই মেজাজ যেমন খর।
আপন আপন দুঃখের কথা কথা যত
তোরেই মোরা শুনাই অবিরত।
কোন্ দিন বা হতাম নিরুদ্দেশ
—আমার আবার স্বভাব এমন তর!
তুই আসাতে বিবাদ বিসংবাদে
সান্ত্বনাটা পাওয়া গেছে বড়।

শ্রীকালিদাস রায়।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা

আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্রা হয়। এই সময় পুরীধামে নানা দেশ হইতে বহুযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। যত রকম উৎসব আছে তাহার মধ্যে রথযাত্রা সর্ব্বপ্রধান। এই ব্যাপার দ্বিতীয়া হইতে দশমী পর্য্যন্ত ৯ দিন স্থায়ী হয়।

প্রতিবৎসর তিনখানি নূতন রথ প্রস্তুত হয়। জগন্নাথের রথ ২৩ হাত উচ্চ, বলরামের রথ ২২ হাত উচ্চ এবং সুভদ্রার রথ ২১ হাত উচ্চ। জগন্নাথের ১৬ চাকা, ইহাকে নন্দীঘোষ রথ বলে। এই রথ টানিবার জন্য ষোড়শ শত বেঠিয়া (যাহারা রথ টানে) আবশ্যক। বলরামের রথের ১৪ চাকা, ইহাকে তালধ্বজ রথ বলে। এই রথ টানিতে চতুর্দ্দশ শত বেঠিয়া নিযুক্ত হয়। সুভদ্রার রথের ১২ চাকা, ইহাকে পদ্মধ্বজ রথ বলে। এই রথ টানিতে দ্বাদশ শত বেঠিয়া প্রয়োজন। নারিকেল ছোবড়ায় নির্ম্মিত রজ্জুদ্বারা রথ টানা হয়। প্রত্যেক রজ্জু প্রায় ১০০ হাত লম্বা। আজ কাল বেঠিয়ার সংখ্যা অনেক কম হইয়াছে।

সিংহদ্বারের সম্মুখ দিয়া উত্তর দিকে যে প্রশস্ত রাস্তা ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহাকে বড় দাণ্ড বা রথের রাস্তা বলে। রথের সময় এই রাস্তা লোকে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। রাস্তার দুইধারে যত কোঠাবাড়ীর ছাদ আছে তাহাও পরিপূর্ণ হইয়া যায়। যাহাদের মন্দিরের নিকট বাড়ী আছে এই সময় তাহারা বিশেষ লাভবান হয়, এমন কি একবৎসরের ভাড়া এক দিনেই পাইয়া থাকে। রথ টানার অনেক পূর্ব্ব হইতে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজেষ্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব বহুসংখ্যক কনেষ্টবল সহ উপস্থিত থাকেন।

বেলা ১২।১ টার সময় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব রথে আসেন। প্রথমতঃ বলরাম, তৎপরে সুভদ্রা দেবী এবং অবশেষে জগন্নাথদেব আসেন। আন্দাজ দেড় ঘণ্টা পরে রথ চলে। এই সময় বহু কীর্ত্তন হইতে থাকে, তন্মধ্যে ৺ চরণদাস বাবাজীর দল প্রধান। "রথে তু বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে" এই বিশ্বাসের জন্য সকলে প্রাণ ভরিয়া ভক্তি সহকারে রথের উপর জগন্নাথদেবকে দর্শন করে। প্রথমে বলরামের রথ, তাহার পর সুভদ্রার রথ এবং পরিশেষে জগন্নাথদেবের রথ চলিতে থাকে।

স্নানযাত্রা হইতে রথযাত্রা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত বিশ্বাবসু বংশীয়—যাঁহাদিগকে 'দয়িতা নিয়োগ' বলে—তাঁহাদের অধিকার। দয়িতাগণই জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রাকে রথে তুলিয়া থাকেন। ইঁহারাই এই সময়ে সর্ব্বেসর্ব্বা। বিদ্যাপতি বংশীয়েরা—যাঁহাদিগকে 'পতি' বলে—তাঁহারা পূজা কার্য্য সম্পন্ন করেন।

এইরূপে সারাদিনে রথ গুণ্ডিচাবাড়ী অথবা গুঞ্জাবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রথম দিন সায়ংকালে মূর্ত্তিত্রয় যজ্ঞবেদীর নিকট উপস্থিত হন। সেইদিন রাত্রে ইঁহাদিগকে যজ্ঞবেদীস্থ রত্নসিংহাসনে স্থাপন করা হয়। উক্ত বেদীতে ৭ দিন পর্য্যন্ত তাঁহারা অবস্থান করেন। এই সপ্তদিন অন্ন পিষ্টকাদি দ্বারা ভোগ দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে রথত্রয়ের মুখ নীলাদ্রির দিকে স্থাপন করা হয়। নবম দিবসে খুব ভোর বেলায় খেচন্নান্ন ভোগ দিয়া জগন্নাথদেবকে রথারূঢ় করা হয়।

গুঞ্জাবাড়ীতে ৯ দিন থাকিয়া দশমীতে পুনর্যাত্রা হয়। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব প্রথম দিন আসিয়া মন্দিরে প্রবেশ করেন না। দ্বিতীয় দিবসও, সমস্ত জীবকে দর্শন দিবার জন্য বাহিরে রথোপরি থাকেন। তৃতীয় দিন শেষ বেলায় রথ হইতে অবতরণ করেন। প্রথমতঃ বলরাম ও সুভদ্রা মন্দিরে প্রবেশ করেন। জগন্নাথদেবের এই দীর্ঘকাল অনুপস্থিতি হেতু রাগ করিয়া লক্ষ্মীদেবী কবাট বন্ধ করিতে আদেশ দেন। তখন জগন্নাথের পক্ষে পাণ্ডারা এবং লক্ষ্মীর পক্ষে

দেবদাসীরা কথোপকথন করিতে থাকেন। জগন্নাথের পক্ষ হইতে পাণ্ডারা লক্ষ্মীদেবীকে অনেক বস্ত্রালঙ্কারের প্রলোভন দেখান, কিন্তু মানবতী লক্ষ্মী সে কথায় কর্ণপাত করেন না—দ্বারও খোলেন না। প্রায় ৩।৪ ঘণ্টা পরে, যখন জগন্নাথ অত্যন্ত অনুনয় বিনয় আরম্ভ করেন, তখন লক্ষ্মীদেবী কবাট খুলিয়া দেন।

মধ্যে মধ্যে রথ চলিতে চলিতে থামিয়া যায়। ইহা নাকি কোন না কোন অলৌকিক কারণেই ঘটিয়া থাকে। সেই প্রেমময় ভগবানের লীলা আমাদের ন্যায় সামান্য মানব কিরূপে বুঝিতে পারিবে? এসম্বন্ধে নিম্নে একটী কিম্বদন্তী উল্লিখিত হইল।

ভক্তবৎসল হরি, ভক্তের মান চিরকালই রক্ষা করিয়া থাকেন। বলরামদাস নামক কোন এক ভক্ত ইন্দ্রিয়সংযম করিতে অক্ষম হইয়া রথযাত্রার দিন এক বেশ্যাগৃহে গমন করেন। সেদিন যে রথযাত্রা তাহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। রথযাত্রা দেখিতে না যাওয়ার জন্য বারাঙ্গনা তাঁহাকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করে। তখন বলরাম দাস ছুটিয়া রথের উপর উঠিতে গেলেন, কিন্তু সেবকগণ তাঁহার চরিত্র মন্দ শুনিয়া রথ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। বলরাম দুঃখে ও অভিমানে মর্ম্মাহত হইয়া রথস্থান ত্যাগ করিয়া চক্রতীর্থে গমন করিলেন। সে স্থানে বালুকাদ্বারা তিনখানি রথ প্রস্তুত করিয়া জগন্নাথের রথযাত্রা করিতে আরম্ভ করিলেন। ভক্তের টানে ভগবান বালুকা নির্ম্মিত রথে আবির্ভূত হইলেন। এদিকে পুরীধামে জগন্নাথের রথ চলা বন্ধ হইল—সহস্র লোক এবং হস্তী প্রভৃতি দ্বারা রথ টানা হইল, কিছুতেই রথ চলিল না। সকলে হতাশ হইয়া পড়িল। রাজা প্রতাপরুদ্র জগন্নাথের নিকট 'ধরণা' দিলেন। তখন জগন্নাথদেব, রাজা প্রতাপরুদ্রকে স্বপ্নাদেশ করিলেন যে, আমার প্রিয়ভক্ত বলরাম দাসকে তোমার রথের সেবকেরা অপমানিত করিয়াছে; তাহাদিগকে হাতে গলায় বাঁধিয়া বলরাম দাসের নিকট উপস্থিত কর, বলরাম প্রসন্ন হইলেই রথ চলিবে। রাজা এই স্বপ্নাদেশ পাইয়া প্রাতঃকালে সেবকদিগকে হাতে পায়ে বাঁধিয়া বলরাম দাসের নিকট উপস্থিত করিলেন। বলরাম দাস রাজার নিকট সমস্ত শ্রবণ করিয়া ভগবৎপ্রেমে বিমুগ্ধ হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, যদি এত দয়াই না থাকিবে তবে লোকে তাঁহাকে ভক্তবৎসল বলে কেন। তাঁহার মনে হইল, এই কয়দিন যাবৎ জগন্নাথ একেবারে অনাহারে আছেন, আমার জন্য তাঁহার কতই না কষ্ট হইয়াছে! এই ভাবিয়া বলরাম দ্রুতপদে রথের স্থানে উপস্থিত হইয়া জগদ্বন্ধুকে দর্শন করিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর তিনি রথ ঠেলিতে আরম্ভ করিলেন, রথ পুনরায় চলিতে লাগিল এবং অনায়াসে গুণ্ডিচাবাড়ী পৌছিল।

এই রথযাত্রার সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রাতঃস্নান করিয়া আনন্দে বিহ্বল এবং ভাবে বিভোর হইয়া সমস্ত ভক্তগণ সহ জগন্নাথের নিকট উপস্থিত হইতেন। প্রভুর সন্তোষের জন্য রাজা প্রতাপরুদ্র রথের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেন। নানা বর্ণের বস্ত্রদ্বারা রথ সজ্জিত হইত, নানা বর্ণের পতাকা উড়িত এবং কত সুমধুর বাদ্যধ্বনি হইত। রথাগ্রে যে কীর্ত্তন পদ্ধতি আজিও দেখা যায়, তাহা মহাপ্রভু কর্ত্তৃকই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

যখন রথ চলিতে আরম্ভ করিত, তখন লক্ষ লক্ষ লোক রথোপরি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে এবং পদব্রজে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব ও রাজা প্রতাপরুদ্রকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইত। মহাপ্রভু নৃত্য গীত সংকীর্ত্তন করিতে করিতে চলিতেন। কখনও বা ভাবে বিভোর হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন—তখন রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীগৌরাঙ্গের পদদ্বয় আপনার ক্রোড়ে রাখিয়া অতি যত্নে সেবা করিতেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব অষ্টাদশ বর্ষ ব্যাপিয়া এই পুরীধামে কত আনন্দ করিয়াছিলেন।

প্রবাদ এই যে, মন্দিরের প্রাঙ্গণে গরুড় স্তম্ভের নিকট যে কুণ্ড আছে, তাহা মহাপ্রভুর অশ্রুজল পতন দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে। দেওয়ালের গায়ে যে

অঙ্গুলির দাগ আছে তাহা মহাপ্রভুর অঙ্গুলিচিহ্ন। স্তম্ভের গাত্রে যে ষড়ভুজ মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায় তাহা, শ্রীগৌরাঙ্গ যে মূর্ত্তি সার্ব্বভৌমকে দেখাইয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তি। দক্ষিণ দরজায় যে মূর্ত্তি দৃষ্ট হয় তাহাও সেই ষড়ভুজ মূর্ত্তি। মন্দিরের বহির্গাত্রেও সেই ষড়ভুজ মূর্ত্তি আছে। বাস্তবিক সেই সময় শ্রীগৌরাঙ্গদেব পুরীধামের রাজা ছিলেন। প্রতাপরুদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া পাত্র মিত্র সকলেই যেন তাঁহার প্রজা ছিলেন। প্রেমই তাঁহার রাজ্য, রাজা প্রজা সকলেই এই প্রেম লইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল।

পুরীতে যেরূপ শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রা হইয়া থাকে, সেইরূপ ভারতের অন্যান্য স্থানেও এই উৎসব সম্পন্ন হয়। বৌদ্ধ মন্দিরেও রথযাত্রা হয়। যোগী ভক্তেরা এই দেহকেই রথ কল্পনা করিয়া থাকেন। রথ যেমন তিনতলা, মনুষ্য দেহও সেই রূপ তিনতলা। উপর তলায় সহস্রদল পদ্মে শ্রীশ্রীবামনদেব অর্থাৎ জগন্নাথ বিরাজ করেন। বামন অবতারে ভগবান ত্রিভুবন অধিকার করেন, এজন্য তিনি জগান্নথ। যদি কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি সাধনা দ্বারা এই রথে অর্থাৎ সহস্রদলে বামনদেবকে দর্শন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পুনরায় এই পাপতাপপূর্ণ সংসারে আসিতে হয় না। মধ্যতলা হৃদয়। এই হৃদয়ই ভগবানের লীলাক্ষেত্র। সমস্ত অবতার, দেবদেবী ও তাঁহাদিগের কার্য্য এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। নীচের তলায় কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি রিপুগণ বিরাজ করে। বামনদেব রথে উঠিবামাত্র শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতে থাকে, নীচের তলায় সিঁড়ি পড়ে, চারিদিক হইতে ভক্তমণ্ডলী আসিয়া ভিড় করিলে কামাদি রিপুগণ পরিবার লইয়া পলায়ন করে। তখন সত্ব রজঃ তমঃ রূপ প্রকাণ্ড তিন গাছা কাছি লইয়া রথে বাঁধিয়া টানিতে থাকে। সুখদুঃখময় কালচক্র ঘুরিতে ঘুরিতে ঠাকুর মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলে, কাছি খসাইয়া লয়। বুদ্ধদেব সিদ্ধিলাভের পর তাঁহার পঞ্চশিষ্যের নিকট সমস্ত তত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছিলেন। রথরূপ নিজদেহে দেবতা ও কন্দর্পের প্রকাশ, পরে ব্রহ্মলাভ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করাইয়াছিলেন। এই জন্য বৌদ্ধমন্দিরেও রথযাত্রা হইয়া থাকে।

শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ বসু।

ভূতো বাড়ী

ওগো জীর্ণ অট্টালিকা, আজি তোমা ধরেছে ফাটল,
কড়িগুলি পড়'-পড়' কোন দ্বারে নাহিক আগল।
বুজে গেছে পাতকুয়া, বালি চূণ ভরা ঘরময়,
উঠানে গভীর বন শিবাকুল লভেছে আশ্রয়।
আছ তুমি দাঁড়াইয়া উৎসবের শত স্মৃতি বহি,
দীর্ণবক্ষ মর্ম্মাহত কত বর্ষা ঝঞ্ঝাবজ্র সহি।
তব গাত্রে বসুধারা সচন্দন আজ্য আলিপনা
অতীত মঙ্গল কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিছে সূচনা।
কক্ষে কক্ষে বক্ষে তব কত হাসি উৎসবের মেলা,
কত শুভ শঙ্খনাদ, শিশুদের কত নৃত্য খেলা।
ধূপ দীপ গন্ধডালা পুষ্পমালা বাসর শয়ন
কুট্টিমে কুট্টিমে কত রূপসীর নূপুর নিক্কণ,—
আজি সবি স্মৃতিসার! হেরি তোমা চোখে আসে জল
মানুষ ত্যজেছে তোমা লভি বিদ্যা বুদ্ধি অর্থ বল;
অকালে হয়েছ জীর্ণা; তারা আজি নগরের লোক,—
পল্লীভূমে ফিরিবে না, বৃথা আর কর তুমি শোক।
বর্জ্জিত, জর্জ্জর শোকে, তাই তব দশা হেন মত;
বাঁচিবার ছিল আশা সগৌরবে আরো বর্ষ শত।
পেচক মূষিক আদি নিশা-চর হৃদয় জুড়িয়া
তোমারে সান্ত্বনা দেয়। পারাবত গিয়াছে উড়িয়া।
মানুষে পালিয়া বুকে, হারায়েছ মানুষের স্নেহ,
ভূতো বাড়ী বলি তব নিকটেও নাহি আসে কেহ।
আজিকে জীবিত যারা, গেছে ছেড়ে অনাথ করিয়া;
মৃতেরা এসেছে ফিরে প্রেতরূপে মমতা স্মরিয়া।

শ্রীকালিদাস রায়।

গ্রন্থ-সমালোচনা

গল্পমাল্য।—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত ও চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ফুলস্ক্যাপ ১৬ পেজী ২২৯ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য ॥০

"মানসী ও মর্ম্মবাণী"র পাঠকগণের নিকট বসন্ত বাবুর পরিচয় অনাবশ্যক। তাঁহার কবিতা সকলেই উপভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি শুধু কবি নহেন। বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় তাঁহার অনেকগুলি গল্পও প্রকাশিত হইয়াছিল। সেইগুলি এই 'গল্পমাল্যে' গ্রথিত হইয়াছে। তাঁহার কবিতার ন্যায় এই গল্পগুলিও যে সাধারণের মনোরঞ্জন করিবে তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই।

গ্রন্থখানিতে আটটি গল্প আছে, তন্মধ্যে একটি ইংরাজি হইতে অনূদিত। গল্পগুলির একটু বিশেষত্ব আছে। বাস্তব চিত্র হিসাবে যে সবগুলি খুব ভাল হইয়াছে তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু একটা মহৎ আদর্শ, উচ্চ ভাব বা সৎ শিক্ষা প্রত্যেক গল্পটির অন্তরালে থাকিয়া এগুলিকে একটা স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছে। অনূদিত গল্প 'শাপমুক্তি' বাস্তব চিত্রণের সহিত আদর্শমূলকতার অপূর্ব্ব সম্মিলন। এই গল্পটিকে প্রথমে দিয়া লেখক উদ্দেশ্যমূলকতার প্রতি যে পক্ষপাতিতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা প্রায় অন্যান্য সকল গল্পগুলিতেও লক্ষিত হইবে। সুরেন্দ্রনাথের ভ্রাতৃপ্রেম, 'গৌরী'র পাতিব্রত্য ও আত্মত্যাগ, 'ভিক্ষুক' হোসেনির পরক্লেশ মোচনের জন্য আত্মবলিদান প্রভৃতি চিত্রগুলি হয়ত ঠিক রিয়ালিষ্টিক হয় নাই; কিন্তু তাহা হইলেও এ গুলির অন্তর্নিহিত মহদ্ভাব পাঠকের মনোহরণ করে এবং ইহাদের করুণ রসে নয়ন বাষ্পাকুলিত হয়। এই করুণ রসের ধারা অধিকাংশ গল্পের মধ্যেই প্রবাহিত,—জীবনের দুঃখ কষ্টই যেন লেখকের হৃদয়কে গভীর ভাবে স্পর্শ করিয়াছে। 'পুনর্মিলন' ও 'দ্বীপান্তর' গল্পদ্বয়ে মানব জীবনের যে ট্র্যাজিডি অঙ্কিত হইয়াছে তাহা বেশ স্বাভাবিক। 'আমার জীবন' ও 'কবির সুবুদ্ধি' গল্প দুইটি একটু স্বতন্ত্র রকমের। কবিতা ও গল্প লিখিয়া পাঠক বেচারীদের উৎপীড়িত করিতে যাহারা বদ্ধপরিকর, সেই বাতিকগ্রস্ত নব্যলেখক-সম্প্রদায় এই দুটি গল্প হইতে কিছু শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন।

"শ্যামচাঁদ।"

একতারা (কবিতা গ্রন্থ)—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী প্রণীত। কলিকাতা ২২নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক-প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ৫নং মুক্তারাম রো, শ্রীমৃণালকান্তি বাগচী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ১১১ পৃষ্ঠা, মূল্য, ৸০

ইহা দাম্পত্য প্রেম বিষয়ক একখানি উচ্চ শ্রেণীর কাব্য গ্রন্থ। আধুনিক বঙ্গীয় কাব্যসাহিত্যে আমরা এরূপ গ্রন্থ বড় অধিক দেখিতে পাই না। দাম্পত্য প্রেম কত দূর উচ্চ হইতে পারে, কবি গ্রন্থখানিতে তাহার পূর্ণ মাত্রায় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বলিতে কি, দাম্পত্য প্রেমের এরূপ নির্ম্মল পবিত্র ও উজ্জ্বল আদর্শ আমরা ইতঃপূর্ব্বে আর কোন গ্রন্থে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

গ্রন্থকার যে বিশ্বজননীর উদার প্রেমের সাধক, তাঁহার কাব্য পাঠ করিয়া তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাইলাম। কবি এবং কবিপ্রিয়ার নির্ম্মল প্রেমরসতত্ত্ব-কাহিনীতে কাব্যখানি ভরপুর। এ প্রেম শুধু কবি ও কবিপ্রিয়ার মধ্যেই আবদ্ধ নয়। এ প্রেম-মন্দাকিনী কবি ও কবিপ্রিয়ার হৃদয় হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া সমগ্র জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহাই কাব্য খানির বিশেষত্ব। কবি গ্রন্থারম্ভেই রবীন্দ্রনাথ হইতে 'কোট' করিয়াছেন—

"একতারাতে একটি যে তার,
আপন মনে সেইটি বাজা।"

এই "একতারার" "একটি তারে" মধুর দাম্পত্য প্রেমগাথার যে অপূর্ব্ব ঝঙ্কার উঠিয়াছে, তাহা হইতে অবিরাম ধারায় যে প্রেমরসামৃত ক্ষরিত হইতেছে, তাহা মধুর হইতেও মধুর। কবির এই "একটি তারে," একটি নয়, ঝঙ্কারের পর যে ঝঙ্কার উঠিয়াছে তাহা সত্য সত্যই "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া" আমাদের প্রাণকে "আকুল" করিয়াছে। এ ঝঙ্কার যিনি দিতে পারেন তিনি যথার্থ বিশ্বপ্রেমিক এবং ভাবরাজ্যের উচ্চ সাধক। প্রেমিক কবির এই অতি সুন্দর এবং উপাদেয় দাম্পত্য প্রেমকথামৃত একান্ত ভাবে আস্বাদন ও উপভোগযোগ্য।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কবি ও কবিপ্রিয়ার প্রেম শুধু তাঁহাদের মধ্যেই আবদ্ধ নয়। পাঠক কবির উক্তি হইতেই তাহার পরিচয় পাইবেন। তিনি বলিতেছেন,—

"এ মিলন কি মিলন তব শুধু আমার সনে?
ঐ যে উহার বুকের তলে,
সব গগনের তারা জ্বলে,
সব কাননের ফুলের গন্ধ ভাসছে সমীরণে।"

তার পরে বলিতেছেন—

"এ মিলন কি গৃহাঙ্গনের যত্নে ঘেরা কূপ ?
লাগবে তোমার প্রয়োজনে ;
পিপাসিত-বিশ্বজনে
ফিরবে হেরি কঠিন কঠোর জড় নিষেধ স্তূপ ?"

ইহার পরেই বলিলেন—

"এ মিলন যে তীর্থ পরম নিখিল ভুবনের,
কারও হেথা-নাইক মানা,
জানা কিংবা হোক্ অজানা,
ব'হে আনে পূজার অর্ঘ্য আপন জীবনের।"

তার পর—

"মৃত্যু কোথাও রইবেনা আর কোথাও কোন বাধা,
তোমার আমার প্রেমের ডোরে নিখিল ভুবন বাঁধা।"

কিন্তু এই খানেই শেষ হইল না। তিনি আবার বলিলেন,—

"এ জীব লোকে মোদের এ প্রেম ব্যর্থ নহে বন্ধ্যা নহে,
মোদের ছেলের মেয়ের মাঝে মোদের জীবন ধারা বহে।"

* * *

"তাদের প্রতি রক্তকণে জাগ্‌বো মোরা সকল ক্ষণে।"

ইহজগতে ও পরজগতে যে তাঁহারা কিরূপ অমর ও অসীম, কবি উক্ত কবিতায় তাহাই ব্যক্ত করিলেন। ইহার চেয়ে প্রেমের উচ্চ আদর্শ আর কি হইতে পারে ?

তার পর কবি তাঁহার প্রিয়ার সহিত বন্ধন ও মিলন কিরূপ তাহা বলিতেছেন—

"আমি রব ফুটে অমলিন ফুলে,
তুলি তার সুধা সৌরভ।"
"গন্ধেরে বাঁধে কি ডোরে কুসুম,
কে বোঝে মরম তার ?
এক হয়ে রব পরম মিলনে,
নাহি হব একাকার।"

ইহাই প্রেম ও মিলনের শ্রেষ্ঠ ও চরম অবস্থা।

কবির মরণের দিনে, কি জানি প্রিয়া যদি "ক্ষণিক অদর্শন" হেতু "ব্যাকুল" হন, তাই তিনি বলিতেছেন,—

"এই কথাটা মনের মাঝে উজল যেন জেগে রয়,
তুমিও আছো, আমিও আছি কোথাও কিছু নাইকো ভয়।
তুমি আমার যা পেয়েছ সে পাওয়া কি অমনি পাওয়া ?
সে যে আমার তোমার মাঝে তত খানিই হয়ে যাওয়া।
যতই কেন হোক্‌না প্রবল, কোন্ শক্তি ত্রিসংসারে
তোমার আপন হোতে আমায় একটুখানি কাড়তে পারে ?"

পাঠক ইহার মর্ম্ম ও সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করুন।

তারপর কবি-প্রিয়ার উক্তি। পাঠক এতক্ষণ কবির উক্তি শুনিলেন, এইবার কবি-প্রিয়ার উক্তি শুনুন—

"তোমার আপন হাতের দেওয়া প্রেমের উপহার
সে-সব অলঙ্কার।
তোমার চিরযুগের প্রীতি কত আদর সোহাগ স্মৃতি
জড়িয়ে আছে, লাগছে তবু ভার।
তোমার চোখে লাগবে ভালো, তাই ত যতন করি
অঙ্গে সে-সব পরি ;
* * *
তবু আমার জ্ঞান অভিমান ধরম করম ভার
সকল অলঙ্কার ;
আমায় যেন ফেল্‌ছে বেড়ে, লও গো তুমি লও গো কেড়ে,
সইতে আমি পারছিনে যে আর।
তোমার আমার বুকের মাঝে ফুলের ব্যবধান—
এ মোর দেহখান
কত মধু সুবাস ভরা সুখের নেশা বিভল করা,
সেও যে বাধা বাসছে আজ প্রাণ।"

ইহা প্রেম ও মিলনের অতি উচ্চ অবস্থা। এইরূপ আরও অনেক কবিতা আমরা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারি, কিন্তু তাহা করা অসম্ভব। সুতরাং এইখানেই আমাদের বক্তব্য শেষ করিলাম। পাঠকদিগের নিকট আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তাঁহারা এই অমূল্য কাব্যগ্রন্থখানি যেন পাঠ করেন।

উপসংহারে "একতারা"র কবিকে বলি—এইগ্রন্থ খানি লিখিয়া তিনিও ধন্য, এবং ইহা পাঠ করিয়া আমরাও ধন্য হইলাম।

তোড়া। গল্প ও প্রবন্ধ পুস্তক। শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রণীত। কলিকাতা বাগবাজার ৯নং বিশ্বকোষ লেন, 'বিশ্বকোষ' প্রেসে মুদ্রিত এবং কর্ণওয়ালিস বিলডিংস্ হইতে মুখার্জি বসু এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ফুলস্ক্যাপ ১৬ পেজি কাপড়ে বাঁধাই ১৫১ পৃষ্ঠা, মূল্য ॥০

ইহা আজকালকার আটআনা সংস্করণের গ্রন্থমালারই অন্যতম। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন, "এই তোড়া বিয়ের কনের পায়ের তোড়াও নয়, বরের বাপের টাকার তোড়াও নয়—বরের হাতে দেওয়ার জন্য ফুলের তোড়া।" তার পরই বলিয়াছেন, "আশা করি নূতন নূতন গল্প পুস্তকের রসমাধুর্য্যের সঙ্গে ইহা চাটনির ন্যায় ব্যবহৃত হইবে।"

গ্রন্থকার সাহিত্য সংসারে অপরিচিত নহেন। তাঁর সুনামও

আছে। "উড়িষ্যার চিত্র" এবং "ধ্রুবতারা"ই তাহার পরিচয়। সমালোচ্য গ্রন্থখানি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। গ্রন্থে তিনটি প্রবন্ধ এবং আটটি গল্প সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সকলগুলিরই ভাষা পরিষ্কার ও ঝরঝরে, রচনাতেও নিপুণতা আছে। ভাল করিয়া গুছাইয়া লেখায় গল্প ও প্রবন্ধ কয়টি সুখপাঠ্য হইয়াছে। "নূতন গুরু মহাশয়," "কৃষক ও পলিটিসিয়ান্," "বাঙ্গালী রমণীর গৃহস্থালী," "জজের মা" এবং "পাঁচু পুরোহিত" গল্প কয়টি আমাদের বেশী ভাল লাগিয়াছে। "যাত্রাগান" প্রবন্ধটি আজকাল-কার যাত্রাগানের একটি উচিত সমালোচনা। দোষ ত্রুটিগুলি ঠিক দেখানো হইয়াছে। "নূতন গুরু মহাশয়" গল্পে কিণ্ডার-গার্টেন শিক্ষা প্রণালীর প্রতি যে ব্যঙ্গরস মিশ্রিত কটাক্ষটুকু আছে তাহা অযথা হয় নাই। "পাঁচু পুরোহিত" গল্পের সব চরিত্রগুলিই যেমন স্বাভাবিক তেমনি পরিস্ফুট ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। কতিপয় গল্প ও প্রবন্ধের স্থান বিশেষ শ্লেষাত্মক পরিহাসোক্তিগুলি হাস্যোদ্দীপক অথচ অতিরঞ্জনদোষ-শূন্য। "বাঙ্গালীর মজলিস" নামক গল্পটি আমাদের কিছু নীরস লাগিল। মোটের উপর পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

বিকাশ।—(কবিতাগ্রন্থ) শ্রীরজনীকান্ত সেন প্রণীত। কলিকাতা বাগবাজার ৩নং কাশীমিত্রের ঘাট ষ্ট্রীট "কমলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে" সি, গুপ্ত শর্ম্মা কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও তথা হইতে প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, মূল্য ৸৹

কবিতাগুলিকে গ্রন্থকার যথাক্রমে 'ভক্তি' 'শ্রদ্ধা' ও 'প্রীতি' এই তিনটি স্তরে বিভক্ত করিয়াছেন। সবগুলিই বেশ মধুর ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। ইহার সরস ও কোমল ভাবে কবিত্ব আছে, সজীবতা আছে এবং সর্ব্বোপরি আন্তরিকতা আছে,—ইহা আমরা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য মনে করি। এই অন্তরিকতা গুণেই কবিতাগুলি অধিকতর উপাদেয় এবং অধিকতর প্রাণস্পর্শী হইয়াছে। কবির উদ্দেশ্য এবং ভাব, সকল কবিতাতেই বেশ পরিস্ফুট। তাঁহার "সূর্য্যমুখী", "শকুন্তলা," "নিয়তির খেলা" "বিদায়" প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে, বিশেষতঃ শেষোক্ত কবিতা দুইটি। এই কবিতা দুইটি কবির শোকোচ্ছ্বাস সম্ভূত। সে উচ্ছ্বাসের ভাষায় ও ভাবে কিছুমাত্র অতিশয়োক্তি নাই, অসংযম নাই, স্বাভাবিকতা সর্ব্বত্রই অক্ষুণ্ণ।

গ্রন্থে দৃষ্ট দুই একটি সামান্য দোষের কথাও উল্লেখ করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। গ্রন্থকার কবিতাগুলির স্থানে স্থানে শব্দ বিশেষে 'র' এবং 'ড়'-এর স্থলে যথাক্রমে 'ড়' ও 'র' ব্যবহার করিয়াছেন। এরূপ ব্যবহার কথ্য ভাষায় কোন রূপে চলিতে পারে, কিন্তু লেখ্য ভাষায় ইহা পাঠকালে বড়ই অসুবিধা বোধ হয়। কয়েক স্থানে বর্ণাশুদ্ধিও লক্ষিত হইল।

ঊর্ম্মিকা।—(গীতিগ্রন্থ) শ্রীবরদাপ্রসাদ দাস প্রণীত। শ্রীহট্ট পরিদর্শক প্রেসে শ্রীপ্যারিমোহন দাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ডিমাই ১২ পেজী ৪৮পৃষ্ঠা, মূল্য ।০

রচয়িতার হৃদয়ে সময়ে সময়ে যে সকল ভাব উদিত হইয়াছে, তাহাই তিনি সঙ্গীতাকারে নিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা গানগুলি সবই পাঠ করিলাম, অনেকগুলি গান আমাদের ভাল লাগিয়াছে। তবে গান সুরসংযোগে শুনিলে যে রূপ রস এবং মাধুর্য্য উপভোগ করা যায়, শুধু পাঠ করিয়া গেলে তদ্রূপ হয় না। কয়েকটি গান কিছু জটিল এবং অপেক্ষাকৃত নীরস হইয়াছে। দুই একটি গানের তেমন সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না।

গানের ভাব ও ভাষা স্বভাবতঃ গানের অনুযায়ী হইলেই ভাল হয়। হৃদয়ের ভাব গানে প্রকাশ করিতে হইলে তাহার ভাব ও ভাষা খুব সরল, সরস ও সজীব হওয়াই উচিত। তাহা না হইলে গান চিত্তাকর্ষক ও প্রাণস্পর্শী হয় না। আমাদের মনে হয়, গীত রচনায় কবিত্ব প্রদর্শন চেষ্টা অধিক মাত্রায় থাকিলে গানের ভাব ও সজীবতা ক্ষুণ্ণ হয়। প্রাণের কথায় সরল ভাবে গানের উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হইলে পাঠক বা শ্রোতার হৃদয়ে তাহার প্রভাব স্থায়িভাবে কার্য্য করে। কেবল কবিত্ব ও রচনা কৌশল দেখানই গানের উদ্দেশ্য নহে। এজন্য আমরা লেখক মহা-শয়কে পূর্ব্ব পূর্ব্ব খ্যাতনামা কবিগণের রচিত গানের সহিত আধুনিক রচিত গানের তুলনা করিয়া আমাদের কথার সত্যা-সত্যতা নির্ণয় ও বিচার করিতে অনুরোধ করি।

এই নবীন গ্রন্থকারের কল্পনা ও কবিত্ব শক্তি থাকিলেও, ভাব-প্রকাশ ও রচনা পদ্ধতিতে এখনও কিছু কাঁচা গন্ধ পাওয়া যায়। তাঁহার "ঊর্ম্মিকা" "বেসুরা সুরে গাওয়া" নয়, "ইহাতে অন্তরের ধ্বনি ভাল রূপ" না "ফুটিলে" ও ফুটিয়াছে একথা বলিতে পারি। ভূমিকাকার নলিনী বাবু লিখিয়াছেন —"আমার বিশ্বাস কাল ও বয়সের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে কবি ভাবে ও ভাষায় উত্তরোত্তর পরিণতি লাভ করিবেন।" আমাদেরও তাহাই বিশ্বাস।

"কমলাকান্ত।"

কাঞ্চনতলার কাপ—(কবিতাগ্রন্থ) শ্রীনলিনীকান্ত সরকার প্রণীত। রঘুনাথগঞ্জ "পণ্ডিত" প্রেসে মুদ্রিত ও জগতাই গ্রাম, নিমতিতা পোঃ (মুর্শিদাবাদ) হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবলক্রাউন ১৬পেজি ৯পৃষ্ঠা, মূল্য /০

এই পুস্তিকা যিনি আমাদিগকে সমালোচনার্থ পাঠাইয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন—"বাংলা ভাষার বিপক্ষে বাঙ্গালা ভাষার পক্ষাবলম্বীদের যুক্তি এই যে, উহা কলিকাতার কথা বার্ত্তার ভাষা; যদি সেই ভাষা পুস্তকের ভাষা বলিয়া গণ্য হয়, তবে অন্য প্রাদেশিক ভাষাও সাহিত্যে প্রবেশের দাবী করিবে, ফলে বাঙ্গালা ভাষা বহু ভাষায় বিভক্ত হইবে।' বাংলাওয়ালারা উত্তরে বলেন, 'কলিকাতার কথোপকথনের ভাষা সর্ব্বত্র সমাদৃত, তাই তাহাতে বই ছাপান যায়। অন্য প্রাদেশিক ভাষায় বই ছাপান হয় না, হইতে পারে না, হইবে না।' এরূপ ব্যাপার যে সম্ভব, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'কাঞ্চনতলার কাপ' নামক পুস্তিকা পাঠাই। এসম্বন্ধে আপনার বক্তব্যসহ এই পুস্তিকার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া পাঠক সমাজকে আস্বাদন করাইলে কৃতার্থ হইব।"

এই পুস্তিকায়, ১৯১৬ সালে কাঞ্চনতলায় "জিতেন্দ্রলাল মেমোরিয়াল কাপ" লইয়া যে ফুটবল ম্যাচ খেলা হইয়াছিল, তাহারই বিবরণ স্থানীয় 'কথ্য' ভাষায় কবিতাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—

"আজ হোবে ফেণ্ডালের খেল কহছে যত লোকে,
বিশ্যাসজীকে পুছ কোর্ত্তে বুঝিয়া দিলে মোকে,—
সে ফেণ্ডাল লয় যে ফেণ্ডালে গরুর পোকা মারি,
শ্যাষকার খেলকে ফেণ্ডাল কহে ফুডবল খেলোয়াড়ী।
কাঞ্চনতলার ছোট যাকে কহছে সব বি টিম,
পোকোড্যারঘের স'তে লাগলো ভাটাম ভিটিম।
বোরযুগে মাঠ পিছল্যা হোয়্যা বাড়ালে জঞ্জাল,
এক এক খেরু পড়ছে য্যানে ভাদর মাস্তা তাল।
শোকোড্যারঘের কহছে সব পোকোড্যা মিশন,
কাঞ্চনতলার জেল্লা আর কোল্‌কাত্তাই পল্‌টন।
ফেণ্ডালের খেলে শিখ্‌নু লয়্যা লয়্যা বোল,—
শালিসকে 'র‍্যাফারী' কহে, 'চাঁদ'কে কহে 'গোল'।
চাঁদীরূপার বাম্নুন অ্যাকটা 'কাপ' কহছে অ্যাকে,
খেল জিৎলে তিন মাসের লেগ্যা বক্সিস দিবে তাকে।
কাঞ্চনতলা জিৎলে বাজী বাহাল থাক্‌লো গোঁ,
তিনটা গোল খেয়্যা পোকোড় কর্‌লে দেলা বোঁ।
সৎরোটা দল হায়রান হোলো আরে বাপ্‌রে বাপ,
কাঞ্চনতলায় রোহ্যা গ্যালো কাঞ্চনতলার কাপ্‌।"

আমাদের বক্তব্য এই যে, "বাংলা" ভাষার পাণ্ডাগণকে ডাকযোগে এই পুস্তক এক একখানি বিনামূল্যে উপহারস্বরূপ পাঠান উচিত।

ভিখারিণী

(Tennyson হইতে)

ক্ষীণ বাহুদুটি তার লতায়ে রয়েছে বুকে,
মরি রূপের তুলনা ভুবনে মিলেনা হায়;
আজি রাজার দুয়ারে দাঁড়াইল ম্লান মুখে
ঐ দীনা ভিখারিণী নগ্ন দুইটি পা'য়।
শোভে রাজার অঙ্গে মণিময় ভূষা হার,
কভু কনক কিরীট আলোকে ঝলকে শিরে;
তবু করুণায় ভরা আঁখি দুটি যেন তাঁর
আজি বরিয়া লইল পথ হতে দুখিঃনীরে।
'তাহে বিস্ময় কিবা?'—সভাজন কহে সবে
'ওগো দিনের আলো যে এইরূপে ম্লান হবে।'

যেন ছিন্ন মেঘের আড়ালে চাঁদের সম
ঐ ছিন্ন মলিন বসনে শোভিছে বালা;
ওগো কেহ বলে তার পা'দুখানি মনোরম,
আর কেহ কয়, তার নয়নেই সুধা ঢালা!
কেহ মনে ভাবে তার চাহনিতে মধু ঝরে,
আর কেহ কয়, তার কত ঘন কালো চুল;
আজি সুরবালা বুঝি নেমেছে ধরণী 'পরে,
আহা চরাচরে যে গো এ রূপের নাহি তুল!
জাগে রাজার কণ্ঠে সহসা আকুল বাণী,
"ওগো ভিখারিণী, তুমি হবে কি আমার রাণী?"

শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু।

সাহিত্য-সচাচার

শ্রীযুক্ত শ্রীপতিমোহন ঘোষ প্রণীত "মণি-হীরা" উপন্যাস প্রকাশিত হইল। মূল্য ॥০

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ছাপাখানা-সমিতি নিম্নলিখিত সদ্‌গ্রন্থগুলি প্রকাশিত করিয়াছেন—কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস, জ্ঞান-সাগর, সারদামঙ্গল ও নেপালে বাঙ্গালা নাটক।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত "রহস্য লহরী" উপন্যাসমালার একত্রিংশ উপন্যাস "রূপসী ঋণ-রঙ্গিনী" প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত উপন্যাস-মালার পরবর্ত্তী উপন্যাস "জালের জাহাজ" যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া আমরা নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশ করিলাম-

"বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইবে। আনুমানিক কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র টাকা টাকা ব্যয় করিলে উক্ত মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইতে পারিবে। ভাস্করকে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে বলা হইয়াছে।—প্রোক্ত উদ্দেশ্যের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আমি পরিষদের সদস্যগণের নিকট এবং সহৃদয় বঙ্গবাসী মাত্রেরই নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। যিনি যাহা দিবেন তাহা সাদরে গৃহীত হইবে এবং যথারীতি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হইবে। সাহায্যের টাকা নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে। ইতি—শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সম্পাদক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত "পৈত্রিক সম্পত্তি" উপন্যাস প্রকাশিত হইল, মূল্য ১৸০। উক্ত গ্রন্থকারের "তোড়া" নামক একখানি গল্পগ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ॥০

শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নূতন গার্হস্থ্য উপন্যাস "অশান্তি" যন্ত্রস্থ, শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত মাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ প্রণীত গল্পগ্রন্থ "হাসি ও অশ্রু" প্রকাশিত হইল, মূল্য ॥০

আগামী ১২ই ভাদ্র জন্মাষ্টমী দিনে জলপাইগুড়িতে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের একাদশ অধিবেশন আরম্ভ হইবার দিনস্থির হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য প্রণীত একখানি নূতন উপন্যাস "সীতানাথ" যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

মুখার্জি বোস কোম্পানির আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার ৪র্থ গ্রন্থ শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত "অকৃতজ্ঞ' প্রকাশিত হইয়াছে।

অন্নদা বুকষ্টলের আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার দশম গ্রন্থ শ্রীযুক্ত কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "দেউলিয়া" প্রকাশিত হইয়াছে।

মৌলভী ফজ্‌লল্‌ করিম প্রণীত "বিবি রহিমা" যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

১০ম বর্ষ, ১ম খণ্ড সমাপ্ত।

কলিকাতা

১৪ এ, রামতনু বসুর লেন, "মানসী প্রেস" হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ষাণ্মাসিক সূচী

শনিবারের চিঠি, বৈশাখ ১৩৬৫—আশ্বিন ১৩৬৫

সম্পাদক : শ্রীসজনীকান্ত দাস